সত্যকথন

https://facebook.com/shottokothon1
http://shottokothon.com/
http://www.response-to-anti-islam.com/

ইসলামবিরোধীদের বিভ্রান্তির জবাব

#সত্যকথন ১-২০০ পর্ব পর্যন্ত সকল লেখার সংকলন

ভূমিকা

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .أَمَّا بَعْدُ.

আলহামদুলিল্লাহ্। আমরা কৃতজ্ঞ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে, সত্যকথনের লেখকদের কাছে, যারা সত্যকথনের পথচলায় নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাদের সবার কাছে এবং অবশ্যই সত্যকথনের পাঠকদের কাছে। আমরা আশা করি ইন শা আল্লাহ আপনারা আমাদের পাশেই থাকবেন।

ইসলামবিদ্বেষী পশ্চিমা, খ্রিষ্টান মিশনারী, হিন্দুত্ববাদী ও নাস্তিক্যবাদী শক্তি মুসলিমদের মাঝে নানা কৌশলে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং ইসলামবিদ্বেষকে প্রচার করার যে এজেন্ডা নিয়ে এগিয়ে চলছে তার মোকাবেলা করার জন্য লেখক, পাঠক, সকলের সক্রিয় অংশগ্রহন প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে শুধু আপনাদের কাছে লেখাগুলো পৌছে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু আপনাদের দায়িত্ব হল, কর্তব্য হল সাধ্যমত আপনাদের নিজ নিজ বলয়ে এই লেখাগুলো, যুক্তিগুলোকে প্রচার করা। বিশেষ করে আপনাদের আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, এবং পরিবারের কিশোর-তরুণদের মাঝে এই লেখা ও যুক্তিগুলোকে প্রচার করা।

কারণ একজন সালমান রুশদী, একজন তসলিমা নাসরিনের আবর্জনার প্রচার করার জন্য সমগ্র বিশ্ব মিডিয়া থাকলেও তাদের মূর্খতাপূর্ণ 'যুক্তি' ও অভিযোগের যখন জবাব দেওয়া হয় তখন সেটা প্রচারের জন্য কেউ-ই থাকে না। যদি অভিযোগগুলো শুনতে পায় লক্ষ মানুষ, কিন্তু এর জবাব হাজারের চেয়ে বেশি মানুষের কাছে না পৌছায় – তাহলে এটা আমাদেরই ব্যর্থতা, আপনাদেরই ব্যর্থতা। তাই বিশেষভাবে 'সত্যকথন' পেইজের লেখাগুলো প্রচারের জন্য আমাদের সবার মনোযোগী হতে হবে। আশা করি সবাই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং সক্রিয়ভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ সমর্থনে অংশগ্রহন করবেন। নিশ্চয় বিশ্বাসীর কাছে নিজ স্ত্রী-সন্তান-সম্পদ ও জীবনের চাইতেও আল্লাহ ও রাসুল ﷺ অধিক প্রিয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তাঁর রাসূলের ﷺ জন্য আমাদের জান ও মাল তুচ্ছ।

সত্যকথন সাইটঃ http://shottokothon.com/
সত্যকথন ফেইসবুকঃ https://facebook.com/shottokothon1
সত্যকথনের লেখকদের আরো একটি ওয়েবসাইটঃ http://www.response-to-anti-islam.com/

সূচিপত্র

১

একজন অবিশ্বাসীর বিশ্বাস

-আরিফ আজাদ

আমি রুমে ঢুকেই দেখি সাজিদ কম্পিউটারের সামনে উবুঁ হয়ে বসে আছে।খটাখট কি যেন টাইপ করছে হয়তো। আমি জগ থেকে পানি ঢালতে লাগলাম। প্রচন্ড রকম তৃষ্ণার্ত।তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাবার জোগাড়। সাজিদ কম্পিউটার থেকে দৃষ্টি সরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললো,- 'কি রে, কিছু হইলো?'

.

আমি হতাশ গলায় বললাম,- 'নাহ।'

.

– 'তার মানে তোকে একবছর ড্রপ দিতেই হবে?'- সাজিদ জিজ্ঞেস করলো।

আমি বললাম,- 'কি আর করা। আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন।'

সাজিদ বললো,- 'তোদের এই এক দোষ,বুঝলি? দেখছিস পুওর এ্যাটেন্ডেন্সের জন্য এক বছর ড্রপ খাওয়াচ্ছে, তার মধ্যেও বলছিস, আল্লাহ যা করেন ভালোর জন্যই করেন। ভাই, এইখানে কোন ভালোটা তুই পাইলি, বলতো?'

–

সাজিদ সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া দরকার।আমি আর সাজিদ রুমমেট। সে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মাইক্রো বায়োলজিতে পড়ে।প্রথম জীবনে খুব ধার্মিক ছিলো।নামাজ-কালাম করতো। বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে কিভাবে কিভাবে যেন এগনোষ্টিক হয়ে পড়ে। আস্তে আস্তে স্রষ্টার উপর থেকে বিশ্বাস হারিয়ে এখন পুরোপুরি নাস্তিক হয়ে গেছে।ধর্মকে এখন সে আবর্জনা জ্ঞান করে।তার মতে পৃথিবীতে ধর্ম এনেছে মানুষ।আর 'ইশ্বর' ধারনাটাই এইরকম স্বার্থান্বেষী কোন মহলের মস্তিষ্কপ্রসূত।

.

সাজিদের সাথে এই মূহুর্তে তর্কে জড়াবার কোন ইচ্ছে আমার নেই। কিন্তু তাকে একদম ইগনোর করেও যাওয়া যায়না।

.

আমি বললাম,- 'আমার সাথে তো এর থেকেও খারাপ কিছু হতে পারতো,ঠিক না?'

– 'আরে, খারাপ হবার আর কিছু বাকি আছে কি?'

— 'হয়তো।'

– 'যেমন?'

– 'এরকমও তো হতে পারতো, ধর, আমি সারাবছর একদমই পড়াশুনা করলাম না।পরীক্ষায় ফেইল মারলাম।এখন ফেইল করলে আমার এক বছর ড্রপ যেতো।হয়তো ফেইলের অপমানটা আমি নিতে পারতাম না।আত্মহত্যা করে বসতাম।'

সাজিদ হা হা হা হা করে হাসা শুরু করলো। বললো,- 'কি বিদঘুটে বিশ্বাস নিয়ে চলিস রে ভাই।'

এই বলে সে আবার হাসা শুরু করলো।বিদ্রুপাত্মক হাসি।

–

রাতে সাজিদের সাথে আমার আরো একদফা তর্ক হোলো।

.

সে বললো,- 'আচ্ছা, তোরা যে স্রষ্টায় বিশ্বাস করিস, কিসের ভিত্তিতে?'

আমি বললাম,- 'বিশ্বাস দু ধরনের। একটা হোলো, প্রমানের ভিত্তিতে বিশ্বাস।অনেকটা,শর্তারোপে বিশ্বাস বলা যায়। অন্যটি হোলো প্রমান ছাড়াই বিশ্বাস।'

সাজিদ হাসলো। সে বললো,- 'দ্বিতীয় ক্যাটাগরিকে সোজা বাঙলায় অন্ধ বিশ্বাস বলে রে আবুল,বুঝলি?'

আমি তার কথায় কান দিলাম না। বলে যেতে লাগলাম-

.

'প্রমানের ভিত্তিতে যে বিশ্বাস, সেটা মূলত বিশ্বাসের মধ্যে পড়েনা।পড়লেও, খুবই ট্যাম্পোরেরি। এই বিশ্বাস এতই দূর্বল যে, এটা হঠাৎ হঠাৎ পালটায়।'

সাজিদ এবার নড়েচড়ে বসলো। সে বললো,- 'কি রকম?'

আমি বললাম,- 'এই যেমন ধর,সূর্য আর পৃথিবীকে নিয়ে মানুষের একটি আদিম কৌতূহল আছে। আমরা আদিকাল থেকেই এদের নিয়ে জানতে চেয়েছি, ঠিক না?'

– 'হু, ঠিক।'

– 'আমাদের কৌতূহল মেটাতে বিজ্ঞান আপ্রাণ চেষ্টা করে গেছে, ঠিক?'

– 'হ্যাঁ।'

– 'আমরা একাট্টা ছিলাম। আমরা নির্ভুলভাবে জানতে চাইতাম যে, সূর্য আর পৃথিবীর রহস্যটা আসলে কি। সেই সুবাধে, পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা নানান সময়ে নানান তত্ব আমাদের সামনে এনেছেন। পৃথিবী আর সূর্য নিয়ে প্রথম ধারনা দিয়েছিলেন গ্রিক জ্যোতির বিজ্ঞানি টলেমি।টলেমি কি বলেছিলো সেটা নিশ্চয় তুই জানিস?'

সাজিদ বললো,- 'হ্যাঁ। সে বলেছিলো সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে।'

– 'একদম তাই। কিন্তু বিজ্ঞান কি আজও টলেমির থিওরিতে বসে আছে? নেই। কিন্তু কি জানিস, এই টলেমির থিওরিটা বিজ্ঞান মহলে টিকে ছিলো পুরো ২৫০ বছর। ভাবতে পারিস? ২৫০ বছর পৃথিবীর মানুষ, যাদের মধ্যে আবার বড় বড় বিজ্ঞানি, ডাক্তার,ইঞ্জিনিয়ার ছিলো, তারাও বিশ্বাস করতো যে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে ঘোরে।

এই ২৫০ বছরে তাদের মধ্যে যারা যারা মারা গেছে, তারা এই বিশ্বাস নিয়েই মারা গেছে যে, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে।'

.

সাজিদ সিগারেট ধরালো। সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললো,- 'তাতে কি? তখন তো আর টেলিস্কোপ ছিলো না, তাই ভুল মতবাদ দিয়েছে আর কি। পরে নিকোলাস কোপারনিকাস এসে তার থিওরিকে ভুল প্রমান করলো না?'

– 'হ্যাঁ। কিন্তু কোপারনিকাসও একটা মস্তবড় ভুল করে গেছে।'

সাজিদ প্রশ্ন করলো,- 'কি রকম?'

– 'অদ্ভুত! এটা তো তোর জানার কথা। যদিও কোপারনিকাস টলেমির থিওরির বিপরীত থিওরি দিয়ে প্রমান করে দেখিয়েছিলেন যে, সূর্য পৃথিবীর চারপাশে নয়, পৃথিবীই সূর্যের চারপাশে ঘোরে।কিন্তু, তিনি এক জায়গায় ভুল করেন।এবং সেই ভুলটাও বিজ্ঞান মহলে বীরদর্পে টিকে ছিলো গোটা ৫০ বছর।'

– 'কোন ভুল?'

– 'উনি বলেছিলেন, পৃথিবীই সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরে, কিন্তু সূর্য ঘোরে না। সূর্য স্থির। কিন্তু আজকের বিজ্ঞান বলে, – নাহ, সূর্য স্থির নয়। সূর্যও নিজের কক্ষপথে অবিরাম ঘূর্ণনরত অবস্থায়।'

সাজিদ বললো,- 'সেটা ঠিক বলেছিস। কিন্তু বিজ্ঞানের এটাই নিয়ম যে, এটা প্রতিনিয়ত পরিবর্তিত হবে। এখানে শেষ বা ফাইনাল বলে কিছুই নেই।'

– 'একদম তাই। বিজ্ঞানে শেষ/ফাইনাল বলে কিছু নেই। একটা বৈজ্ঞানিক থিওরি ২ সেকেন্ডও টেকে না, আবার আরেকটা ২০০ বছরও টিকে যায়। তাই, প্রমান বা দলিল দিয়ে যা বিশ্বাস করা হয় তাকে আমরা বিশ্বাস বলিনা।এটাকে আমরা বড়জোর চুক্তি বলতে পারি। চুক্তিটা এরকম,- 'তোমায় ততোক্ষণ বিশ্বাস করবো, যতক্ষণ তোমার চেয়ে অথেনটিক কিছু আমাদের সামনে না আসছে।'

.

সাজিদ আবার নড়েচড়ে বসলো। সে কিছুটা একমত হয়েছে বলে মনে হচ্ছে।

.

আমি বললাম,- 'ধর্ম বা সৃষ্টিকর্তার ধারনা/অস্তিত্ব হচ্ছে ঠিক এর বিপরীত। দ্যাখ, বিশ্বাস আর অবিশ্বাসের মধ্যকার এই গূঢ় পার্থক্য আছে বলেই আমাদের ধর্মগ্রন্থের শুরুতেই বিশ্বাসের কথা বলা আছে। বলা আছে- 'এটা তাদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।' (সূরা বাকারা:০২)।

.

যদি বিজ্ঞানে শেষ বা ফাইনাল কিছু থাকতো, তাহলে হয়তো ধর্মগ্রন্থের শুরুতে বিশ্বাসের বদলে বিজ্ঞানের কথাই বলা হতো। হয়তো বলা হতো,- 'এটা তাদের জন্যই যারা বিজ্ঞানমনস্ক।'

কিন্তু যে বিজ্ঞান সদা পরিবর্তনশীল, যে বিজ্ঞানের নিজের উপর নিজেরই বিশ্বাস নেই, তাকে কিভাবে অন্যরা বিশ্বাস করবে?'

.

সাজিদ বললো,- 'কিন্তু যাকে দেখিনা, যার পক্ষে কোন প্রমান নেই, তাকে কি করে আমরা বিশ্বাস করতে পারি?'

– 'সৃষ্টিকর্তার পক্ষে অনেক প্রমান আছে, কিন্তু সেটা বিজ্ঞান পুরোপুরি দিতে পারেনা।এটা বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা, সৃষ্টিকর্তার নয়।বিজ্ঞান অনেক কিছুরই উত্তর দিতে পারেনা। লিষ্ট করতে গেলে অনেক লম্বা একটা লিষ্ট করা যাবে।'

.

সাজিদ রাগি রাগি গলায় বললো,- 'ফাইজলামো করিস আমার সাথে?'

আমি হাসতে লাগলাম। বললাম,- 'আচ্ছা শোন, বলছি। তোর প্রেমিকার নাম মিতু না?'

– 'এইখানে প্রেমিকার ব্যাপার আসছে কেনো?'

– 'আরে বল না আগে।'

– 'হ্যাঁ।'

– 'কিছু মনে করিস না। কথার কথা বলছি। ধর, আমি মিতুকে ধর্ষণ করলাম। রক্তাক্ত অবস্থায় মিতু তার বেডে পড়ে আছে। আরো ধর, তুই কোনভাবে ব্যাপারটা জেনে গেছিস।'

– 'হু।'

– 'এখন বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা কর দেখি, মিতুকে ধর্ষণ করায় কেনো আমার শাস্তি হওয়া দরকার?'

সাজিদ বললো,- 'ক্রিটিক্যাল কোয়েশ্চান। এটাকে বিজ্ঞান দিয়ে কিভাবে
ব্যাখ্যা করবো?'

– 'হা হা হা। আগেই বলেছি। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যার উত্তর বিজ্ঞানে নেই।'

– 'কিন্তু এর সাথে স্রষ্টায় বিশ্বাসের সম্পর্ক কি?'

– 'সম্পর্ক আছে। স্রষ্টায় বিশ্বাসটাও এমন একটা বিষয়, যেটা আমরা, মানে মানুষেরা, আমাদের ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য প্রমানাদি দিয়ে প্রমান করতে পারবো না। স্রষ্টা কোন টেলিস্কোপে ধরা পড়েন না।উনাকে অণুবীক্ষণযন্ত্র দিয়েও খুঁজে বের করা যায়না। উনাকে জাষ্ট 'বিশ্বাস করে নিতে হয়।'

.

সাজিদ এবার ১৮০ ডিগ্রি এঙ্গেলে বেঁকে বসলো। সে বললো,- 'ধুর! কিসব বাল ছাল বুঝালি। যা দেখিনা, তাকে বিশ্বাস করে নেবো?'

আমি বললাম,- 'হ্যাঁ। পৃথিবীতে অবিশ্বাসী বলে কেউই নেই। সবাই বিশ্বাসী। সবাই এমন কিছু না কিছুতে ঠিক বিশ্বাস করে, যা তারা আদৌ দেখেনি বা দেখার কোন সুযোগও নেই।কিন্তু এটা নিয়ে তারা প্রশ্ন তুলে না। তারা নির্বিঘ্নে তাতে বিশ্বাস করে যায়। তুইও সেরকম।'

.

সাজিদ বললো,- 'আমি? পাগল হয়েছিস? আমি না দেখে কোন কিছুতেই বিশ্বাস করিনা, করবোও না।'

– 'তুই করিস।এবং, এটা নিয়ে তোর মধ্যে কোনদিন কোন প্রশ্ন জাগে নি।এবং, আজকে এই আলোচনা না করলে হয়তো জাগতোও না।'

.

সে আমার দিকে তাকিয়ে রইলো। বললাম,- 'জানতে চাস?'

– 'হু।'

– 'আবার বলছি, কিছু মনে করিস না। যুক্তির খাতিরে বলছি।'

– 'বল।'

– 'আচ্ছা, তোর বাবা-মা'র মিলনেই যে তোর জন্ম হয়েছে, সেটা তুই দেখেছিলি? বা,এই মূহুর্তে কোন এভিডেন্স আছে তোর কাছে? হতে পারে তোর মা তোর বাবা ছাড়া অন্য কারো সাথে দৈহিক সম্পর্ক করেছে তোর জন্মের আগে। হতে পারে, তুই ঐ ব্যক্তিরই জৈব ক্রিয়ার ফল। তুই এটা দেখিস নি।

.

কিন্তু কোনদিনও কি তোর মা'কে এটা নিয়ে প্রশ্ন করেছিলি? করিস নি। সেই ছোটবেলা থেকে যাকে বাবা হিসেবে দেখে আসছিস, এখনো তাকে বাবা ডাকছিস। যাকে ভাই হিসেবে জেনে আসছিস, তাকে ভাই। বোনকে বোন।

.

তুই না দেখেই এসবে বিশ্বাস করিস না? কোনদিন জানতে চেয়েছিস তুই এখন যাকে বাবা ডাকছিস, তুই আসলেই তার ঔরসজাত কিনা? জানতে চাস নি। বিশ্বাস করে গেছিস। এখনো করছিস। ভবিষ্যতেও করবি। স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসটাও ঠিক এমনই রে।এটাকে প্রশ্ন করা যায়না। সন্দেহ করা যায়না। এটাকে হৃদয়ের গভীরে ধারন করতে হয়। এটার নামই বিশ্বাস।'

–

সাজিদ উঠে বাইরে চলে গেলো। ভাবলাম, সে আমার কথায় কষ্ট পেয়েছে হয়তো।

পরেরদিন ভোরে আমি যখন ফজরের নামাজের জন্য অযূ করতে যাবো, দেখলাম, আমার পাশে সাজিদ এসে দাঁড়িয়েছে।আমি তার মুখের দিকে তাকালাম।সে আমার চাহনির প্রশ্নটা বুঝতে পেরেছে। সে বললো,- 'নামাজ পড়তে উঠেছি।'

২

আরজ আলী মাতুব্বরের আজগুবি প্রশ্নঃ “সব নবী আরবে এসেছেন?”

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

বাংলাদেশে নাস্তিকতাবাদের অন্যতম পুরোধা হচ্ছেন আরজ আলী মাতুব্বর। পেশায় চাষী এই লোকটির সুতীক্ষ্ণ(?) লেখনী দ্বারা প্রভাবিত হয়ে নাকি এই দেশের অনেক মুক্তমনা তাদের নাস্তিক হবার পথে অনুপ্রেরণা পেয়েছেন। তবে তার সব থেকে বিখ্যাত(অথবা কুখ্যাত) বইটি পড়ে আমি বুঝতে পেরেছি তার জ্ঞানের (নিম্ন)লেভেল সম্পর্কে। আরো বুঝতে পেরেছি যারা তার মানের একজন লেখকের লেখা পড়ে নাস্তিক হতে উদ্বুদ্ধ হয়, তারা কী মানের "বিজ্ঞানমনস্ক"। আরজ আলী তার সেই বইতে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণাভিত্তিক ও আজগুবি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যার একটি হচ্ছে—"লক্ষাধিক নবীর প্রায় সবাই কেন আরব দেশে জন্মগ্রহণ করলেন?"

[আরজ আলী মাতুব্বর রচনাসমগ্র-১, 'সত্যের সন্ধান', পৃষ্ঠা ৯৪]

.

অথচ কুরআন ও হাদিসে কোথাও এই ধরণের কিছু বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে—পৃথিবীর সব জাতির নিকট নবী-রাসুল প্রেরণ করা হয়েছে। [দেখুন—কুরআন সুরা ইউনুস ১০:৪৭,সুরা রা’দ ১৩:৭, সুরা হিজর ১৫:১০, সুরা নাহল ১৬:৩৬]

.

যেই কথাটি কুরআন-হাদিস কোথাও বলা নেই, সেটি নিজে থেকে বানিয়ে সম্পূর্ণ ধারণার বশবর্তী হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে এই প্রশ্নটি করেছেন বাংলার এই কীর্তিমান(?) চাষী। এটি তো একটি নমুনা, এমন আরো অনেক আজগুবি প্রশ্ন পাওয়া যাবে আরজ আলীর বইতে।

৩

স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করলো? হুমায়ুন আজাদের সাথে কথোপকথন!

-আরিফ আজাদ

ল্যাম্পপোষ্টের অস্পষ্ট আলোয় একজন বয়স্ক লোকের ছায়ামূর্তি আমাদের দৃষ্টিগোচর হলো।গায়ে মোটা একটি শাল জড়ানো। পৌষের শীত। লোকটা হালকা কাঁপছেও।

–

আমরা খুলনা থেকে ফিরছিলাম। আমি আর সাজিদ।

.

ষ্টেশান মাষ্টারের রুমের পাশের একটি বেঞ্চিতে লোকটা আঁটসাঁট হয়ে বসে আছে।

.

ষ্টেশানে এরকম কতো লোকই তো বসে থাকে।তাই সেদিকে আমার বিশেষ কোন কৌতুহল ছিলো না।কিন্তু সাজিদকে দেখলাম সেদিকে এগিয়ে গেলো।

.

লোকটার কাছে গিয়েই সাজিদ ধপাস করে বসে পড়লো।আমি দূর থেকে খেয়াল করলাম, লোকটার সাথে সাজিদ হেসে হেসে কথাও বলছে।

আশ্চর্য! খুলনার ষ্টেশান।এখানে সাজিদের পরিচিত লোক কোথা থেকে এলো? তাছাড়া, লোকটিকে দেখে বিশেষ কেউ বলেও মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে কোন বাদাম বিক্রেতা।বাদাম বিক্রি শেষে প্রতিদিন ওই জায়গায় বসেই রাত কাটিয়ে দেয়।

.

আমাদের রাতের ট্রেন। এখন বাজে রাত দু'টো।এই সময়ে সাজিদের সাথে কারো দেখা করার কথা থাকলে তা তো আমি জানতামই। অদ্ভুত!

–

আমি আরেকটু এগিয়ে গেলাম। একটু অগ্রসর হতেই দেখলাম, ভদ্রলোকের হাতে একটি বইও আছে।দূর থেকে আমি বুঝতে পারি নি।

সাজিদ আমাকে ইশারা দিয়ে ডাকলো। আমি গেলাম।

লোকটার চেহারাটা বেশ চেনা চেনা লাগছে,কিন্তু সঠিক মনে করতে পারছি না।

.

সাজিদ বললো,- 'এইখানে বোস।ইনি হচ্ছেন হুমায়ুন স্যার।'

হুমায়ুন স্যার? এই নামে কোন হুমায়ুন স্যারকে তো আমি চিনি না।সাজিদকে জিজ্ঞেস করতে যাবো যে কোন হুমায়ুন স্যার, অমনি সাজিদ আবার বললো,- 'হুমায়ুন আজাদকে চিনিস না? ইনি আর কি।'

.

এরপর সে লোকটার দিকে ফিরে বললো,- 'স্যার, এ হলো আমার বন্ধু, আরিফ।'

লোকটা আমার দিকে তাকালো না। সাজিদের দিকে তাকিয়ে আছে।ঠোঁটে মৃদু হাসি। আমার তখনো ঘোর কাটছেই না।কি হচ্ছে এসব? আমিও ধপাস করে সাজিদের পাশে বসে গেলাম।

–

সাজিদ আর হুমায়ুন আজাদ নামের লোকটার মধ্যে আলাপ হচ্ছে।এমনভাবে কথা বলছে, যেন তারা পরস্পর পরস্পরকে অনেক

আগে থেকেই চিনে।

.

লোকটা সাজিদকে বলছে,- 'তোকে কতো করে বলেছি, আমার লেখা 'আমার অবিশ্বাস' বইটা ভালোমতো পড়তে। পড়েছিলি?'

সাজিদ বললো,- 'হ্যাঁ স্যার। পড়েছি তো।'

– 'তাহলে আবার আস্তিক হয়ে গেলি কেনো? নিশ্চয় কোন ত্যাদড়ের ফাঁদে পড়েছিস? কে সে? নাম বল? পেছনে যে আছে, কি জানি নাম?'

– 'আরিফ......'

– 'হ্যাঁ, এই ত্যাদড়ের ফাঁদে পড়েছিস বুঝি? দাঁড়া, তাকে আমি মজা দেখাচ্ছি.......'

এই বলে লোকটা বসা থেকে উঠতে গেলো।

সাজিদ জোরে বলে উঠলো,- 'না না স্যার। ও কিচ্ছু জানে না।'

– 'তাহলে?'

– 'আসলে স্যার, বলতে সংকোচ বোধ করলেও সত্য এটাই যে, নাস্তিকতার উপর আপনি যেসব লজিক দেখিয়েছেন, সেগুলো এতটাই দূর্বল যে, নাস্তিকতার উপর আমি বেশিদিন ঈমান রাখতে পারি নি।'

.

এইটুকু বলে সাজিদ মাথা নিঁচু করে ফেললো।

.

লোকটার চেহারাটা মূহুর্তেই রুক্ষ ভাব ধারন করলো। বললো,- 'তার মানে বলতে চাইছিস, তুই এখন আমার চেয়েও বড় পন্ডিত হয়ে গেছিস? আমার চেয়েও বেশি পড়ে ফেলেছিস? বেশি বুঝে ফেলেছিস?'
সাজিদ তখনও মাথা নিঁচু করে আছে।

.

লোকটা বললো,- 'যাক গে! একটা সিগারেট খাবো। ম্যাচ নেই। তোর কাছে আছে?'

.

– 'জ্বি স্যার।'- এই বলে সাজিদ ব্যাগ খুলে একটি ম্যাচ বের করে লোকটার হাতে দিলো।সাজিদ সিগারেট খায় না। তবে, প্রয়োজনীয় জিনিসগুলো তার ব্যাগে থাকে সবসময়।

–

লোকটা সিগারেট ধরালো। কয়েকটা জোরে জোরে টান দিয়ে ফুঁস করে একমুখ ধোঁয়া ছাড়লো।ধোঁয়াগুলো মূহুর্তেই কুন্ডুলি আকারে ষ্টেশান মাষ্টারের ঘরের রেলিং বেয়ে উঠে যেতে লাগলো উপরের দিকে।আমি সেদিকে তাকিয়ে আছি।

–

লোকটার কাশি উঠে গেলো। কাশতে কাশতে লোকটা বসা থাকে উঠে পড়লো। এই মূহুর্তে উনার সিগারেট খাওয়ার আর সম্ভবত ইচ্ছে নেই। লোকটা সিগারেটের টুকরোটিকে নিচে ফেলে পা দিয়ে একটি ঘষা দিলো। অমনি সিগারেটের জ্বলন্ত টুকরোটি থেঁতলে গেলো।

.

সাজিদের দিকে ফিরে লোকটা বললো,- 'তাহলে এখন বিশ্বাস করিস যে স্রষ্টা বলে কেউ আছে?'
সাজিদ হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো।

.

– 'স্রষ্টা এই বিশ্বলোক, বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছে বলে বিশ্বাস করিস তো?'

আবারো সাজিদ হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো।

.

এবার লোকটা একটা অদ্ভুত ভয়ঙ্কর রকম হাসি দিলো।এই হাসি এতটাই বিদঘুটে ছিলো যে আমার গা ছমছম করতে লাগলো।

.

লোকটি বললো,- 'তাহলে বল দেখি, স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করলো?'
এই প্রশ্নটি করে লোকটি আবার সেই বিদঘুটে হাসিটা হাসলো। গা ছমছমে।
সাজিদ বললো,- 'স্যার, বাই ডেফিনিশন, স্রষ্টার কোন সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে না।যদি বলি X-ই সৃষ্টিকর্তাকে সৃষ্টি করেছে, তৎক্ষণাৎ আবার প্রশ্ন উঠবে, তাহলে X- এর সৃষ্টিকর্তা কে? যদি বলি Y, তাহলে আবার প্রশ্ন উঠবে, Y এর সৃষ্টিকর্তা কে? এভাবেই চলতে থাকবে। কোন সমাধানে যাওয়া যাবে না।'
লোকটি বললো,- 'সমাধান আছে।'

.

– 'কি সেটা?'

.

– 'মেনে নেওয়া যে- স্রষ্টা নাই,ব্যস!'- এইটুকু বলে লোকটি আবার হাসি দিলো। হা হা হা হা।

.

সাজিদ আপত্তি জানালো। বললো,- 'আপনি ভুল, স্যার।'

.

লোকটি চোখ কপালে তুলে বললো,- 'কি? আমি? আমি ভুল?'

.

– 'জ্বি স্যার।'

.

– 'তাহলে বল দেখি, স্রষ্টাকে কে সৃষ্টি করলো? উত্তর দে।দেখি কতো বড় জ্ঞানের জাহাজ হয়েছিস তুই।'

.

আমি বুঝতে পারলাম এই লোক সাজিদকে যুক্তির গ্যাড়াকলে ফেলার চেষ্টা করছে।

.

সাজিদ বললো,- 'স্যার, গত শতাব্দীতেও বিজ্ঞানিরা ভাবতেন, এই মহাবিশ্ব অনন্তকাল ধরে আছে।মানে, এটার কোন শুরু নেই।তারা আরো ভাবতো, এটার কোন শেষও নাই।তাই তারা বলতো- যেহেতু এটার শুরু-শেষ কিছুই নাই, সুতরাং, এটার জন্য একটা সৃষ্টিকর্তারও দরকার নাই। কিন্তু থার্মোডাইনামিক্সের তাপ ও গতির সূত্রগুলো আবিষ্কার হওয়ার পর এই ধারনা তো পুরোপুরিভাবে ভ্যানিশ হয়ই,সাথে পদার্থবিজ্ঞানেও ঘটে যায় একটা বিপ্লব।থার্মোডাইনামিক্সের তাপ ও গতির দ্বিতীয় সূত্র বলছে- 'এই মহাবিশ্ব ক্রমাগত ও নিরবচ্ছিন্ন উত্তাপ অস্তিত্ব থেকে পর্যায়ক্রমে উত্তাপহীন অস্তিত্বের দিকে ধেয়ে যাচ্ছে।কিন্তু এই সূত্রটাকে উল্টোথেকে প্রয়োগ কখনোই সম্ভব নয়।

.

অর্থাৎ, কম উত্তাপ অস্তিত্ব থেকে এটাকে বেশি উত্তাপ অস্তিত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া আদৌ সম্ভব নয়।এই ধারনা থেকে প্রমান হয়, মহাবিশ্ব চিরন্তন নয়।এটা অনন্তকাল ধরে এভাবে নেই।এটার একটা নির্দিষ্ট শুরু আছে।থার্মোডাইনামিক্সের সূত্র আরো বলে, – এভাবে চলতে চলতে একসময় মহাবিশ্বের সকল শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।আর মহাবিশ্ব ধ্বংস হবে।'

.

লোকটি বললো,- 'উফফফফ! আসছেন বৈজ্ঞানিক লম্পু। সহজ করে বল ব্যাটা।'

.

সাজিদ বললো,- 'স্যার, একটা গরম কফির কাপ টেবিলে রাখা হলে, সেটা সময়ের সাথে সাথে আস্তে আস্তে তাপ হারাতে হারাতে ঠান্ডা হতেই থাকবে।কিন্তু সেটা টেবিলে রাখার পর যে পরিমাণ গরম ছিলো, সময়ের সাথে সাথে সেটা আরো বেশি গরম হয়ে উঠবে- এটা অসম্ভব।এটা কেবল ঠান্ডাই হতে থাকবে। একটা পর্যায়ে গিয়ে দেখা যাবে, কফির কাপটা সমস্ত তাপ হারিয়ে একেবারে ঠান্ডা হয়ে গেছে। এটাই হচ্ছে থার্মোডাইনামিক্সের সূত্র।'

.

– 'হুম,তো?'

.

– 'এর থেকে প্রমান হয়, মহাবিশ্বের একটা শুরু আছে। মহাবিশ্বের যে একটা শুরু আছে- তারও প্রমান বিজ্ঞানিরা পেয়েছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টি তত্বের উপর এ যাবৎ যতোগুলো থিওরি বিজ্ঞানিমহলে এসেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য, প্রমানের দিক থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী থিওরি হলো- বিগ ব্যাং থিওরি।বিগ ব্যাং থিওরি বলছে- মহাবিশ্বের জন্ম হয়েছে একটি বিস্ফোরণের ফলে।তাহলে স্যার, এটা এখন নিশ্চিত যে, মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে।'
লোকটা হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়লো।

.

সাজিদ আবার বলতে শুরু করলো,- স্যার, আমরা সহজ সমীকরণ পদ্ধতিতে দেখবো স্রষ্টাকে সৃষ্টির প্রয়োজন আছে কিনা, মানে স্রষ্টার সৃষ্টিকর্তা থাকতে পারে কিনা।

.

সকল সৃষ্টির একটা নির্দিষ্ট শুরু আছে এবং শেষ আছে........... ধরি, এটা সমীকরণ ১।

.

মহাবিশ্ব একটি সৃষ্টি.......... এটা সমীকরণ ২।

.

এখন সমীকরণ ১ আর ২ থেকে পাই-
সকল সৃষ্টির শুরু এবং শেষ আছে।মহাবিশ্ব একটি সৃষ্টি,তাই এটারও একটা শুরু এবং শেষ আছে।

.

.

তাহলে, আমরা দেখলাম- উপরের দুটি শর্ত পরস্পর মিলে গেলো,এবং তাতে থার্মোডাইনামিক্সের তাপ ও গতির সূত্রের কোন ব্যাঘাত ঘটে নি।
– 'হু'
– 'আমার তৃতীয় সমীকরণ হচ্ছে- 'স্রষ্টা সবকিছু সৃষ্টি করেছেন।'
তাহলে খেয়াল করুন, আমার প্রথম শর্তের সাথে কিন্তু তৃতীয় শর্ত ম্যাচ হচ্ছে না।

.

আমার প্রথম শর্ত ছিলো- সকল সৃষ্টির শুরু আর শেষ আছে।কিন্তু তৃতীয় শর্তে কথা বলছি স্রষ্টা নিয়ে।তিনি সৃষ্টি নন, তিনি স্রষ্টা।তাই এখানে প্রথম শর্ত খাটে না।সাথে, তাপ ও গতির সূত্রটিও এখানে আর খাটছে না।তার মানে, স্রষ্টার শুরুও নেই, শেষও নাই।অর্থাৎ, তাকে নতুন করে সৃষ্টিরও প্রয়োজন নাই।তার মানে স্রষ্টার আরেকজন স্রষ্টা থাকারও প্রয়োজন নাই। তিনি অনাদি, অনন্ত।'এইটুকু বলে সাজিদ থামলো।

.

হুমায়ুন আজাদ নামের লোকটি কপালের ভাঁজ দীর্ঘ করে বললেন,- 'কি ভংচং বুঝালি এগুলা? কিসব সমীকরণ টমীকরণ? এসব কি? সোজা সাপ্টা বল।

.

আমাকে অঙ্ক শিখাচ্ছিস? Laws Of Causality সম্পর্কে ধারনা আছে? Laws Of Causality মতে, সবকিছুর পেছনে একটা Cause বা কারণ থাকে। সেই সূত্র মতে, স্রষ্টার পেছনেও একটা কারণ থাকতে হবে।'

সাজিদ বললো,- 'স্যার, উত্তেজিত হবেন না প্লিজ।আমি আপনাকে অঙ্ক শিখাতে যাবো কোন সাহসে? আমি শুধু আমার মতো ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করেছি।'

.

– 'কচু করেছিস তুই।Laws Of Causality দিয়ে ব্যাখ্যা কর। '- লোকটা উচ্চস্বরে বললো।

.

– 'স্যার, Laws Of Causality বলবৎ হয় তখনই, যখন থেকে Time, Space এবং Matter জন্ম লাভ করে, ঠিক না? কারন, আইনষ্টাইনের থিওরি অফ রিলেটিভিটিও স্বীকার করে যে- Time জিনিসটা নিজেই Space আর Matter এর সাথে কানেক্টেড।Cause এর ধারনা তখনই আসবে, যখন Time-Space-Matter এই ব্যাপারগুলা তৈরি হবে।তাহলে, যিনিই এই Time-Space-Matter এর স্রষ্টা, তাকে কি করে আমরা Time-Space-Matter এর বাটখারাতে বসিয়ে Laws Of Causality দিয়ে বিচার করবো,স্যার? এটা তো লজিক বিরুদ্ধ, বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।'

.

লোকটা চুপ করে আছে। কিছু হয়তো বলতে যাচ্ছিলো। এরমধ্যেই আবার সাজিদ বললো,- 'স্যার, আপনি Laws Of Causality'র যে সংজ্ঞা দিয়েছেন, সেটা ভুল।'

.

লোকটা আবার রেগে গেলো। রেগেমেগে অগ্নিশর্মা হয়ে বললো,- 'এই ছোকরা! আমি ভুল বলেছি মানে কি? তুই কি বলতে চাস আমি বিজ্ঞান বুঝি না?'

.

সাজিদ বললো,- 'না না স্যার, একদম তা বলিনি। আমার ভুল হয়েছে।আসলে, বলা উচিত ছিলো যে- Laws Of Causality'র সংজ্ঞা বলতে গিয়ে আপনি ছোট্ট একটা জিনিস মিস করেছেন।'

.

লোকটার চেহারা এবার একটু স্বাভাবিক হলো।বললো,- 'কি মিস করেছি?'

– 'আপনি বলেছেন, Laws Of Causality মতে, সবকিছুরই একটি Cause থাকে।আসলে এটা স্যার সেরকম নয়। Laws Of Causality হচ্ছে- Everything which has a beginning has a cause.. অর্থাৎ, এমন সবকিছু, যেগুলোর একটা নির্দিষ্ট শুরু আছে- কেবল তাদেরই Cause থাকে।স্রষ্টার কোন শুরু নেই, তাই স্রষ্টাকে Laws Of Causality দিয়ে মাপাটা যুক্তি এবং বিজ্ঞান বিরুদ্ধ।'

.

লোকটার মুখ কিছুটা গম্ভীর হয়ে গেলো।বললো,- 'তুই কি ভেবেছিস, এরকম ভারি ভারি কিছু শব্দ ব্যবহার করে কথা বললেই আমি তোর যুক্তি মেনে নিবো? অসম্ভব।'

.

সাজিদ এবার মুচকি হাসলো। হেসে বললো,- 'স্যার, আপনার হাতে একটি বই দেখছি। ঐটা কি বই?'

.

– ' এটা আমার লেখা বই- 'আমার অবিশ্বাস।'

– 'স্যার, অইটা আমাকে দিবেন একটু?'

– 'এই নে,ধর।'

সাজিদ বইটা হাতে নিয়ে উল্টালো। উল্টাতে উল্টাতে বললো,- 'স্যার, এই বইয়ের কোন লাইনে আপনি আছেন?'

.

লোকটা ভুরু কুঁচকে বললো,- 'মানে?'

– 'বলছি, এই বইয়ের কোন অধ্যায়ের, কোন পৃষ্টায়, কোন লাইনে আপনি আছেন?'

– 'তুই অদ্ভুত কথা বলছিস। আমি বইয়ে থাকবো কেনো?'

– 'কেনো থাকবেন না? আপনি এর স্রষ্টা না?'

– 'হ্যাঁ।'

– 'এই বইটা কালি আর কাগজ দিয়ে তৈরি। আপনিও কি কালি আর কাগজ দিয়ে তৈরি স্যার?'

– 'খুবই ষ্টুপিডিটি টাইপ প্রশ্ন। আমি এই বইয়ের স্রষ্টা। এই বই তৈরির সংজ্ঞা দিয়ে কি আমাকে ব্যাখ্যা করা যাবে?'

.

সাজিদ আবার হেসে দিলো।বললো,- 'না স্যার।এই বই তৈরির যে সংজ্ঞা, সে সংজ্ঞা দিয়ে মোটেও আপনাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। ঠিক সেভাবে, এই মহাবিশ্ব যিনি তৈরি করেছেন, তাকেও তার সৃষ্টির Time-Space-Matter-Cause এসব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না।

.

আপনি কালি,কলম বা কাগজের তৈরি নন, তার উর্ধ্বে।কিন্তু আপনি Time-Space-Matter-Cause এর উর্ধ্বে নন।আপনাকে এগুলো দিয়ে ব্যাখ্যা করাই যায়।কিন্তু সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন এমন একজন,যিনি নিজেই Time-Space-Matter-Cause এর সৃষ্টিকর্তা।তাই তাকে Time-Space-Matter-Cause দিয়ে পরিমাপ করা যাবে না।অর্থাৎ, তিনি এসবের উর্ধ্বে।
অর্থাৎ, তার কোন Time-Space-Matter-Cause নাই।অর্থাৎ, তার কোন শুরু-শেষ নাই।অর্থাৎ, তার কোন সৃষ্টিকর্তা নাই।'

.

লোকটা উঠে দাঁড়ালো।উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বললো- 'ভালো ব্রেইনওয়াশড! ভালো ব্রেইনওয়াশড! আমরা কি এমন তরুণ প্রজন্ম চেয়েছিলাম? হায়! আমরা কি এমন তরুণ প্রজন্ম চেয়েছিলাম?'

.

এটা বলতে বলতে লোকটা হাঁটা ধরলো। দেখতে দেখতেই উনি ষ্টেশানে মানুষের ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেলেন।

–

ঠিক সেই মূহুর্তেই আমার ঘুম ভেঙে গেলো। ঘুম ভাঙার পর আমি কিছুক্ষণ ঝিম মেরে ছিলাম।ঘড়িতে সময় দেখলাম।রাত দেড়টা বাজে।সাজিদের বিছানার দিকে তাকালাম। দেখলাম, সে বিছানায় শুয়ে শুয়ে বই পড়ছে।আমি উঠে তার কাছে গেলাম। গিয়ে দেখলাম সে যে বইটা পড়ছে, সেটার নাম- 'আমার অবিশ্বাস। বইয়ের লেখক- হুমায়ুন আজাদ।

.

সাজিদ বই থেকে মুখ তুলে আমার দিকে তাকালো।তার ঠোঁটের কোণায় একটি অদ্ভুত হাসি।
আমি বিরাট একটা শক খেলাম। নাহ! এটা হতে পারে না।

৪

নাস্তিকতার বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই ১ – “পৃথিবীতে এতো ধর্মের মাঝে কোন ধর্মটি সঠিক?

-আসিফ আদনান

নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী এবং সংশয়বাদীদের কিছু রেডিমেইড ‘যুক্তি’ থাকে। যখন স্রষ্টা, পরকাল ও স্রষ্টার আনুগত্যের আবশক্যতার কথা বলা হয় তৎক্ষণাৎ এই মুখস্থ উত্তরগুলো তারা পেশ করেন, এবং মোক্ষম জবাব দিয়ে প্রতিপক্ষকে লা-জওয়াব করা গেছে এটা ভেবে পরিতৃপ্তি অনুভব করেন। এছাড়া যারা বিশ্বাস রাখেন কিন্তু বিশ্বাস সম্পর্কে তেমন একটা জ্ঞান রাখেন না, তাদের মনে সংশয় সৃষ্টি করতেও নাস্তিকরা এসব রেডিমেইড “যুক্তি” ব্যবহার করেন।

.

এরকম মুখস্থ “যুক্তি”-র সংখ্যা সীমিত হওয়াতে দেখা যায় ঘুরেফিরে একই “যুক্তি” বিভিন্ন আঙ্গিকে সামনে আসছে। এরকম একটি “যুক্তি” হল – সম্ভাব্য উত্তরের সংখ্যাধিক্য ও পারস্পরিক ভাবে সাংঘর্ষিক হবার “যুক্তি”। শুনতে যতো জটিল মনে হয় আসলে বাস্তবে বিষয়টা ততোটা জটিল না। সাধারণত এই “যুক্তি” প্রশ্ন আকারে উপস্থাপন করা হয়। যেমন -

.

পৃথিবীতে এতো ধর্মের মাঝে কোন ধর্মটি সঠিক? প্রতিটি ধর্ম নিজ নিজ স্রষ্টার কথা বলে, প্রতিটি ধর্মের অনুসারীরা দাবি করে একমাত্র তাদের ধর্মই সঠিক, একমাত্র তাদের ধর্ম অনুসরণ করেই মুক্তি পাওয়া যাবে। এর মাঝে আপনার ধর্ম যে সঠিক তার প্রমান কি?

.

নাস্তিকদের এই যুক্তিটির ক্ষেত্রে নিরপেক্ষভাবে এবং আন্তরিকভাবে যদি কোন সাধারণ বুদ্ধিবিবেচনাসম্পন্ন ব্যক্তি চিন্তা করেন তাহলে তার মনে দ্বিতীয় আরেকটি প্রশ্নের উদয় হবার করা (তবে এক্ষেত্রে চিন্তার ক্ষেত্রে কিছুটা নিরপেক্ষ হওয়া এবং স্রষ্টার প্রশ্নের উত্তর খোজার ব্যাপারে আন্তরিক হওয়া আবশ্যক)।

.

প্রশ্নটি হল, এই প্রশ্নের মাধ্যমে প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য কি? প্রশ্নকারী কি এই প্রশ্নের মাধ্যমে ঐ বিষয়গুলোর উত্তর খুজতে সচেষ্ট যে প্রশ্নগুলো নিয়ে ধর্ম আলোচনা করে? অথবা যে প্রশ্নগুলোর উত্তর নিয়ে আস্তিক ও নাস্তিকদের মতপার্থক্য? স্রষ্টা, স্রষ্টার আনুগত্য, সৃষ্টির সূচনা, মানব অস্তিত্বের লক্ষ্য, মৃত্যু, পরকাল, নৈতিকতা, ভালো ও মন্দ – ইত্যাদি বিষয়গুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট উত্তর খোজার লক্ষ্যে কি এ প্রশ্ন করা হচ্ছে? নাকি এটা কি কথার পিঠে বলা একটি কথা – একটি রেটোরিকাল যুক্তি?

.

প্রশ্নটা আরো স্পেসিফিক ভাবে করি। যেই যুক্তি বা প্রশ্নটা নাস্তিকরা উত্থাপন করছেন সেটা কি আদৌ সত্যকে খোজার সাথে সম্পর্কিত? নাকি সেটা একটা নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটে, নির্দিষ্ট একটা কথোপকথনে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ব্যবহার করার জন্য তৈরি করা একটি যুক্তি? সহজ ভাষায় এই প্রশ্নের পেছনে উদ্দেশ্য বা intent কি সত্যের অন্বেষণ নাকি তর্কে জেতা?

.

আপনি যদি লক্ষ্য করেন তাহলে দেখবেন প্রশ্নকারী ইতিমধ্যেই তার প্রশ্নের মাধ্যমে সম্ভাব্য সব উত্তরকে ভুল সাব্যস্ত করে বসে আছেন। এ প্রশ্নটা এমনভাবে তৈরি করা যাতে করে সম্ভাব্য যেকোন উত্তরকে গ্রহণ না করার জাস্টিফিকেশান তৈরি করা যায়। আপনি যে উত্তরই দিন না কেন সে বলবে – “তুমি এটা বলছো কিন্তু আরেকজন তো আরেকটা বলবে। তো আমি তোমাদের কার কথা শুনবো।”

.

অর্থাৎ উত্তর খোজাটা আদৌ প্রশ্নকারীর উদ্দেশ্য না। সে আসলে আপনি কি উত্তর দেবেন তা শুনতে, কিংবা আপনার উত্তর সঠিক কি না তা পরীক্ষা করে দেখতেও আগ্রহী না। বরং তার উদ্দেশ্য হল সম্ভাব্য উত্তরগুলোর সংখ্যাধিক্য এবং পারস্পরিকভাবে সাংঘর্ষিক হবার বিষয়টি উত্থাপন করে সম্ভাব্য সকল উত্তর সম্পর্কে সংশয় সৃষ্টি করা।

.

ধরুন আপনি একজন নাস্তিক। একজন ধর্মে বিশ্বাসী লোক – সেটা যেকোন ধর্ম হতে পারে – আপনাকে এসে প্রশ্ন করলো আপনি ঈশ্বরে বিশ্বাস করেন না কেন? অথবা ধরুন আপনাকে প্রশ্ন করা হল - আপনি কি বিশ্বাস করেন?

.

এক্ষেত্রে ধর্মে বিশ্বাসী লোককে উপরের প্রশ্ন করে আপনি ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দিতে পারবেন – "কোন ঈশ্বরে বিশ্বাস করবো? কোন ধর্মে বিশ্বাস করবো? এ প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তর কি? সঠিক উত্তর কিভাবে বের করবো, যখন সবাই বলছে তার উত্তরই সঠিক?"

.

এটু্কু বলে ধর্মে বিশ্বাসী লোকটাকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেওয়ার পর অধিকাংশ ক্ষেত্রে নাস্তিকরা বলে – "অতএব ধর্ম-টর্ম এগুলো মানুষ নিজের প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছেন, আর মানুষকে নিয়ন্ত্রন করার জন্য এখন এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে। আল্লাহ-ঈশ্বর-ভগবান এসব কিছু নেই, সব মানুষের বানানো..." ইত্যাদি।

.

প্রশ্ন হল যে প্রশ্ন থেকে এই আলোচনার শুরু সেই প্রশ্ন থেকে কি যৌক্তিকভাবে এই উপসংহারে পৌঁছানো যায়? অনেক ধর্ম থাকা, এবং এ ধর্মগুলোর বক্তব্য সাংঘর্ষিক হওয়া কি সবধর্মের ভুল হবার প্রমান?

.

আলোচনা সম্ভবত একটু বেশি তাত্ত্বিক হয়ে যাচ্ছে, আমি একটা উদাহরণ দিয়ে জিনিষটা বোঝানোর চেষ্টা করি।

.

.

মনে করুন সমুদ্রপাড়ের একটি শহর। ধরুন হাজার বছর আগের কথা। একদিন সকালে শহরবাসী আবিষ্কার করলো একটি ছোট্ট নৌকা সৈকতে এসে ভিড়েছে। নৌকাতে অচেতন দুটি প্রাণী। একজন মূমুর্ষু ব্যক্তি এবং তার বুকে আনুমানিক ছয় মাসের একটি শিশু। লোকজন তাদেরকে এনে হাসপাতালে ভর্তি করার কিছুক্ষন পরই লোকটি মারা গেলেন। তবে মৃত্যুর আগে কিছু সময়ের জন্য জ্ঞান ফিরে পেয়ে কিছু তথ্য জানিয়ে গেলেন। শিশুটির মা তাদের সাথেই জাহাজে ছিলেন। জাহাজডুবি হওয়াতে তিনি এবং তার সন্তান জাহাজের অন্যান্য যাত্রীদের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছেন। তিনি শহরের লোকেদের প্রতিজ্ঞা করালেন তার সন্তানকে দেখে রাখার এবং সন্তানের মা আসলে তার কাছে সন্তানটি তুলে দেবার। শহরের লোকজন আর কোন তথ্য লোকটির কাছ থেকে জানার আগেই সে মারা গেল।

.

ধরা যাক, এক বছর পর এক জাহাজে চেপে একশ জন মহিলা হাজির হলেন এবং সকলেই সেই শিশুটির মাতৃত্বের দাবি করে বসলো। একশ জনের একশ জনই নিজের দাবিকে আত্মবিশ্বাসের সাথে সত্য বলে প্রচার করতে থাকলো। নিজের দাবির স্বপক্ষে বিভিন্ন যুক্তি-প্রমান উপস্থাপন করলো। শহরের লোকজন পড়লো মহাসমস্যায়। কি করা যায় তা ঠিক করার জন্য এক রুদ্ধদ্বার বৈঠক ডাকা হল।

.

বৈঠকে শহরের মেয়র দাঁড়িয়ে বললেন – উপস্থিত লোকসকল! আসুন দেখা যাক আমরা এখন পর্যন্ত নিশ্চিত ভাবে কি জানি। আমরা জানি -

.

ক) একশ জনের প্রত্যেকেরই এ শিশুর মা হওয়া সম্ভব না। যদি একজনের দাবি সঠিক হয় তাহলে অবধারিত ভাবে বাকি ৯৯

জনের দাবি ভুল।

.

খ) এই একশ জনের মধ্যে আসলেই এ শিশুর মা উপস্থিত আছে – কেবলমাত্র তাদের দাবির ভিত্তিতে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না।

.

গ) এই একশোজনের মাঝে শিশুটির প্রকৃত মা উপস্থিত নেই- এটাও নিশ্চিত ভাবে বলা যায় না।

.

ঘ) কোন ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে এ শিশুটির মা, সেটাও নিছক দাবির ভিত্তিতে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব না।

.

ঙ) যদি শিশুটির প্রকৃত মা এই একশ জনের মাঝে উপস্থিত থাকে তাহলে এটা আবশ্যক যে ৯৯% দাবিকারী এখানে মিথ্যা বলছে। আর যদি শিশুটির মা এখানে উপস্থিত না থাকে তাহলে এখানে ১০০% দাবিকারীই মিথ্যা বলছে।

.

হে শহরবাসী আপনারা বলুন আমরা কিভাবে এ সমস্যার সমাধান করতে পারি?

.

মেয়রের কথার পর নেমে আসলো পিনপতন নীরবতা। মিনিট খানেক সবাই যেন গভীর চিন্তায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকলো। তারপর এক শিশু দাড়িয়ে বললো, আমি জানি এ সমস্যার সমাধান কি -

.

যেহেতু সবাই বলছে তার দাবিই সঠিক, যেহেতু প্রত্যেকের দাবি অন্যান্যদের দাবির সাথে সাংঘর্ষিক এবং যেহেতু এখানে কমপক্ষে ৯৯% দাবিদার মিথ্যাবাদী - অতএব স্পষ্টভাবে প্রমান হয় যে এই শিশুটির আসলে কোন মা-ই নেই। আমরা ধরে নেবো নৌকায় চেপে আসা সেই ব্যক্তিও মিথ্যা বলেছে এবং মাতৃত্বের দাবিকারীরাও সবাই মিথ্যা বলছে। আর আমরা বিশ্বাস করবো এই শিশুটির কোন মা নেই, এবং তার কোন পিতাও নেই। পিতা ও মাতা ছাড়াই এ শিশু এসেছে। আর যেহেতু শিশুটির কোন মা নেই, পিতাও নেই, তাই সেই ব্যক্তির কাছে আমরা যে প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এটা মানতেও আমরা আর বাধ্য নেই।

.

এই শিশুটির কথাকে কি যৌক্তিক? হতে পারে সে অবুঝ, পাগল, প্রতিবন্ধী। অথবা সে সঠিক উত্তর খুজতেই চায় না। কিন্তু তাকে কি আদৌ সত্যান্বেষী বলা যায়?

.

নাস্তিকদের "যুক্তিটি" এবং যুক্তির ভিত্তিতে দেওয়া তাদের উপসংহার হল এই শিশুর কথার মতো। যেহেতু সবাই নিজেকে ঠিক দাবি করছে, যেহেতু অনেকে দাবি করছে -তাই সব ধর্মই নিশ্চিতভাবে ভুল এবং কোন স্রষ্টা নেই!

.

ধর্মের সংখ্যাধিক্য এবং ধর্মগুলোর বক্তব্য পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হওয়া প্রতিটি ধর্মের ভুল হবার প্রমান না। যদিও এটা অবধারিত যে সবগুলো ধর্ম সঠিক হতে পারেন না। একই ভাবে অনেকগুলো ধর্ম থাকা, প্রতিটি ধর্মের বিভিন্ন বক্তব্য থাকা স্রষ্টার অনস্তিত্বের প্রমান না।

.

যদি সমুদ্রপাড়ের শহরের মানুষ আসলেই সমস্যার সমাধান করতে চায় তবে তাদেরকে হয় মাতৃত্বের দাবিকারীরা কি কি দলিল-প্রমান উত্থাপন করেছে তা পরীক্ষা করতে হবে। অথবা অন্য কোন পদ্ধতিতে শিশুটির মাতৃপরিচয় সম্পর্কে তাদের নিশ্চিত হতে হবে। সমস্যা বেশ জটিল, তাই ধরে নিলাম এই শিশুর মা নেই, বাবা নেই – এটা কোন সমাধান না। তাই নাস্তিকরা যা বলে তা না কোন প্রমান, না কোন সঠিক উত্তর। বরং তারা প্রমানহীন, যৌক্তিকতাহীন আরেকটি দাবি, আরেকটি বিলিফ সিস্টেম বা ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আসেন। আর তা হলঃ কোন স্রষ্টা নেই, অতএব স্রষ্টাকে মানার প্রয়োজনও নেই।

.

কিন্তু যেখানে তারা ভাওতাবাজি করেন, বুঝে কিংবা না বুঝে, তা হল – দুনিয়ার সব ধর্মকে যদি তারা ভুল প্রমান করেনও (যেটা তারা করতে পারেন না) তবুও কিন্তু স্রষ্টার অনস্তিত্ব – স্রষ্টা নেই – এটা প্রমাণিত হয় না। সুতরাং কোন ধর্ম কেন ভুল বা প্রত্যেক ধর্মের ভুল হবার ৯৯% সম্ভাবনা আছে – এধরণের কথা না বলে তাদের উচিৎ এটা প্রমান করে দেখানো যে স্রষ্টা নেই। কিন্তু তারা এই কাজটা করেন না। তারা বরং আলোচনাকে ডাইভার্ট করেন বা ভিন্নখাতে প্রবাহিত করেন, এবং কথার মারপ্যাঁচ এবং রেটোরিকাল যুক্তি দিয়ে সংশয় সৃষ্টির চেষ্টা করেন। কিন্তু অপরের দাবির ব্যাপারে সংশয় সৃষ্টি তাদের দাবির পক্ষে প্রমান না।

.

অর্থাৎ নাস্তিকদের অবস্থানটা হল এই – তারা বিশ্বাস করেন স্রষ্টা নেই। কিন্তু তারা তাদের এই দাবির পক্ষে প্রমান উত্থাপন করতে পারেন না। তারা স্রষ্টা আছে এই দাবিকে ভুলও প্রমান করতে পারেন না, এবং মহাবিশ্বের উৎস ও সূচনার কারন হিসেবেও কোন সন্তোষজনক উত্তর তারা দিতে পারেন না। বরং তারা একটা স্ট্যাটিস্টিকাল পয়েন্টে তর্কটা নিয়ে যাবার চেষ্টা করেন। তারা বলতে চান – যদি অনেক ধর্ম থাকে আর এর মধ্যে শুধু একটি ধর্মই সঠিক হতে পারে, তাহলে স্ট্যাটিস্টিকালি একজন নাস্তিকের অবিশ্বাস ততোটাই যৌক্তিক যতোটা একজন বিশ্বাসীর বিশ্বাস। দুটোরই ভুল হবার সম্ভাবনা সমান। [তাদের এই অবস্থানের মাঝেও একটা ভুল আছে, তবে সেই আলোচনাতে এখন যাচ্ছি না।]

.

সমস্যাটা হল কোন চায়ের আড্ডায়, কিংবা তর্কবিতর্কের ক্ষেত্রে এধরনের আর্গুমেন্টের ব্যবহার হয়তো একজন নাস্তিকের পযিশানকে অপরের সামনে জাস্টিফাই করার ক্ষেত্রে কার্যকর, কিন্তু মূল বিষয়ে – অর্থাৎ স্রষ্টার অস্তিত্ব এবং স্রষ্টার সাথে সৃষ্টির সম্পর্কের বিষয়ে - পক্ষে কিংবা বিপক্ষে, কোন কিছুই এ ধরণের আর্গুমেন্ট থেকে পাওয়া যায় না। আপনি যদি দুনিয়ার সব ধর্মকে ভুল প্রমাণিত করেনও তাও কিন্তু এই মৌলিক প্রশ্নগুলোর জবাব দেওয়া হয় না।

.

এই স্ট্যাটিস্টিকাল পয়েন্টটা এমন সব প্রশ্নের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য যে প্রশ্নের সঠিক উত্তর একটি। কারন যেকোন প্রশ্নের একটি মাত্র উত্তর সঠিক হবার অর্থ অবশ্যই অন্য সকল উত্তর ভুল। ধরুন একটি কাঁচের জারে নির্দিষ্ট সংখ্যক বিভিন্ন আকার ও রঙের ছোট ছোট রাবারের বল আছে। আপনি যদি জারটি এক নজর দেখিয়ে তারপর মানুষকে প্রশ্ন করেন – বলুন তো এখানে কয়টি বল আছে?

.

তাহলে এ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তরের সংখ্যা অসীম। যদি ১০০০ জনকে প্রশ্ন করেন হয়তো ১০০০টা ভিন্ন ভিন্ন উত্তর পাবেন। কিন্তু তার অর্থ কি এ প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর নেই? অবশ্যই না। অবশ্যই একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক বল সেই জারে থাকবে, এই সংখ্যা বদলাবে না। অবশ্যই সঠিক উত্তর একটিই হবে এবং তা ছাড়া বাকি সব উত্তর ভুল হবে। সম্ভাব্য উত্তরের সংখ্যাধিক্য ও তাদের পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হওয়া প্রমান করে না যে, সঠিক উত্তর নেই.[1]

.

ধর্মের অনুসরণ, ধর্মীয় অনুশাসন পালন এগুলো স্রষ্টায় বিশ্বাসের পরবর্তী ধাপ। আবশ্যক প্রথম ধাপকে এড়িয়ে গিয়ে তর্কে জেতা কিংবা নিজের অবস্থানকে জাস্টিফাই করার চেষ্টা বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই হতে পারে কিন্তু নিশ্চিতভাবেই সত্যের অন্বেষণ না। একজন সত্যান্বেষী ব্যক্তি যিনি সংশয়ে আছেন তিনি প্রথমে এই প্রথম ধাপের মীমাংসা করার চেষ্টা করবেন। আর একজন ক্যারিয়ার নাস্তিক বা পেশাদার নাস্তিক বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাইয়ের মাধ্যমে তর্কে জেতার চেষ্টা করবে।

.

সুতরাং যদি কোন নাস্তিক পরবর্তীতে এই প্রশ্ন আপনার সামনে উপস্থাপন করেন তাহলে যদি কেউ তর্কে জিততে চান তাহলে তাকে বলুন –

যদি আমি ধরে নেই দুনিয়ার সব ধর্মই ভুল, তবুও তো সব ধর্মের ভুল হওয়া তোমার বিশ্বাসকে (নাস্তিকতার বিশ্বাস – স্রষ্টা নেই, পরকাল নেই, স্রষ্টার প্রতি সৃষ্টির দায়বদ্ধতাও নেই) সত্য প্রমান করে না। তাই তাদের ভুল তোমার পক্ষে প্রমান না। বরং তুমি তোমার দাবির পক্ষে প্রমান পেশ করো। আর যদি তুমি সেটা না পারো তাহলে অন্ধ বিশ্বাসী আর অন্ধ অবিশ্বাসী তোমার মধ্যে পার্থক্য কি?

.

আর তাই যদি আসলেই কেউ সত্যান্বেষী হন তাহলে এসব মুখস্থ প্রশ্ন বাদ দিয়ে তার উচিত ভিন্ন একটি প্রশ্নের উত্তর খোঁজা। রেটোরিকাল কুতর্ক ছেড়ে মূল বিষয়ে প্রশ্ন করা, শেকড় থেকে শুরু করা। প্রশ্নটি হল –

.

এই মহাবিশ্বের অরিজিন কি? পৃথিবী, সৌরজগত, ছায়াপথ নীহারিকা থেকে শুরু করে ইলেক্ট্রন, প্রোটন পর্যন্ত - ম্যাক্রো স্কেল থেকে শুরু করে ন্যানো স্কেল পর্যন্ত – এসব কিছু কি নিজ থেকে সৃষ্টি হয়েছে? নাকি এগুলো নাকি এগুলো সবসময় ছিল এবং সবসময় থাকবে? নাকি এগুলো নির্দিষ্ট এক পর্যায়ে শুরু হয়েছে এবং নির্দিষ্ট সময় পর বিলীন হয়ে যাবে – আর এর পুরোটাই হবে স্বয়ংক্রিয়ভাবে? নাকি এসব কিছুর একজন স্রষ্টা আছেন?

ফুটনোটঃ

[1] নাস্তিকরা বলতে পারেন এই উদাহরণ তৈরি করা হয়েছে পিতামাতা ছাড়া শিশু জন্মাতে পারে না এই প্রমানিত বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে। জারের উদাহরনেও জারের মধ্যে বল আছে আগে এটা ঠিক করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু স্রষ্টা আছে সেটা একইভাবে প্রমাণিত না। তাই এটি একটি False Analogy.

.

সেই ক্ষেত্রে উত্তর হবে, এটি False Analogy না, কারন এ থেকে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমানের চেষ্টা করা হচ্ছে না। শিশুর জন্য যেহেতু পিতামাতা থাকা আবশ্যক, তাই অবশ্যই মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা থাকা আবশ্যক – এই যুক্তি এখানে দেওয়া হচ্ছে না। এখানে শুধু বলা হচ্ছে দাবিদার অনেক হওয়া, কিংবা অধিকাংশ বা সকল দাবিকারীর দাবির মিথ্যা হওয়াও প্রমান করে না যে শিশুটি পিতামাতা ছাড়া জন্মেছে।সম্ভাব্য উত্তর অনেক হওয়া প্রমান করে না যে জারে কয়টি বল আছে এই প্রশ্নের কোন সঠিক উত্তর নেই। একইভাবে অনেক ধর্ম থাকা এবং তাদের বক্তব্য পারস্পরিকভাবে সাংঘর্ষিক হওয়াও কোন ভাবেই প্রমান করে না যে স্রষ্টা নেই। স্রষ্টার অস্তিত্বের প্রশ্নটা কোন নির্দিষ্ট ধর্মের সঠিক বা বেঠিক হবার উপর নির্ভরশীল না কোন ভাবে সংযুক্তও না।

.

বরং আমরা এটাই বলছি যে ধর্মের সংখ্যা, ধর্মের বক্তব্য, তাদের পারস্পরিক সংঘাত ইত্যাদি ছেড়ে মূল আলোচনায় আসুন। অহেতুক পানি ঘোলা করা বাদ দিয়ে, মূল প্রশ্নের মীমাংসা করুন, একজন বা একাধিক স্রষ্টা আছেন কি না, সেই আলোচনায় আসুন।

৫

অবিশ্বাস থেকে ইসলামঃ একটি অন্যরকম পাথরের গল্প

-মুহাম্মাদ তোয়াহা আকবর

অবিশ্বাস থেকে ইসলামঃ একটি অন্যরকম পাথরের গল্প

.

হ্যারী পটার যখন পড়তাম গোগ্রাসে, মূল ভিলেইন ভোল্ডেমর্টের ফিলোসফারস স্টোনের পেছনে ছুটে চলায় কত্তদিন বুঁদ হয়ে ছিলাম! সেই "ফিলোসফারস স্টোন" যা বদলে দিতে পারে, বদলে দেয়। লর্ড ভোল্ডেমর্ট এর পর আরো একজনের সাথে পরিচয় হয় যে হন্যে হয়ে ফিলোসফারস স্টোন খুঁজে বেড়াতো, তাঁর মাকে ওপারের জগত থেকে ফিরিয়ে আনবে বলে। কি সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, কি সেই মনোবল!! কি কঠিন যুদ্ধই না সেই ১২ বছরের বাচ্চাটি করেছে তাঁর প্রাণপ্রিয় আম্মু আর আদরের ছোট্ট ভাইটার হারিয়ে যাওয়া শরীর ফিরিয়ে আনতে। সেই আন্তরিকতা আর পাহাড় সমান দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সামনে মরণকেও সে কেয়ার করেনি। Full Metal Alchemist Brotherhood এর এডভেঞ্চার যারা দেখেছে তারাই জানে "সত্যিকারের খুঁজে বেড়ানো" কাকে বলে।

.

গাপুসগুপুস করে আমি বই খেতাম সেই ছোট্টবেলা থেকে। সবাই খেলা দেখতো, আমি বই খেতাম। বন্ধুরা আড্ডা দিতো, আমি বই পান করতাম। বন্ধুরা টিভিতে বুঁদ হয়ে থাকতো, আমি বইয়ে ডুবে হাঁসফাঁস করতাম। বই ছিলো আমার প্রথম প্রেম, প্রথম ভালোবাসা। প্রিয় খাবার, পানীয়, বালিশ, জগত সবই ছিলো আমার বইময়। এমন কোন বই ছিলো না যা আমি পড়তাম না। ইন্টার পাশ করার পর হুমায়ুন আজাদের "আমার অবিশ্বাস" বইটি গেলার পর পেটে খুব গ্যাস ফর্ম করে। খুব পানি খেয়ে, রেস্ট নিয়ে পেটের গ্যাস দূর হলো, কিন্তু মাথায় ঠিক ঠিক গ্যাস্ট্রিক হয়ে গেলো।

.

স্রষ্টা কি সত্যিই আছেন? নাকি সব মানুষের বানানো গালগপ্পো? হুম্ম? ধর্ম-টর্ম কি আসলে বানানো কিছু হাস্যকর "রিচুয়াল" না? সমাজের গড়ে তোলা সংস্কারভীতু মন বলে ওঠে, "না না, বাদ দাও তো ওসব ফালতু কথা। ওসব ভাবতে নেই।" যুক্তি বলে, "না না তো করছো, ভিত্তি আছে এই বিশ্বাসের? ভীতু কাপুরুষ কোথাকার?" মেজাজ খাট্টা হয়ে গেলো। কি করা যায়? কি করা যায়? পারি তো খালি একটাই কাজ। পড়া। তো, শুরু হয়ে গেলো আরকি।

.

পড়তে পড়তে আরজ আলী মাতুব্বর থেকে বার্ট্রান্ড রাসেল, কুরআনের অনুবাদ থেকে শুরু করে বেদ-গীতা-বাইবেল কিচ্ছু বাদ থাকলো না। একটাই লক্ষ্য, যেটা সত্যি সেটাকে খুঁজে বের করবো, শুধু সেটাই মানবো। সত্যের সাথে কোন আপস চলবে না, চলতে পারে না। ধর্মগ্রন্থগুলোর অনুবাদ পড়ে নিজেকে প্রশ্ন করলাম, তাহলে এতদিন সব ফালতু বিশ্বাস মেনে এসেছি? হায় হায়! বন্ধ করো এসব। কেন মিলাদ পড়ো? নামাজ কেন পড়ো? মাজারে যাও কেন? মুসলিমই যদি হও তাহলে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ কেন পড়ো না? নিজেকে মুসলিম বলো কি বুঝে? দেব-দেবীর পুজা করছো ভালো কথা, জেনে বুঝে করছো তো?

.

ঘরে-বাইরে, বন্ধু-সহপাঠি, ঈদ-পুজায় সবখানে সবাইকে জ্বালিয়ে মারতাম। কেউ কিচ্ছু জানতো না। উত্তর দিতে পারতোনা কেউ। সব্বাই হই-হই করে উঠতো "মাইরালামু-কাইট্টালামু" শোরগোল তুলে। সার্টিফিকেটধারী বেকুবের দলকে চিনে গেলাম, চিনে গেলাম হাস্যকর জ্ঞান অর্জনের সিস্টেমটাকে আর সেই সিস্টেম থেকে বিজবিজ করতে করতে বেরিয়ে আসা অন্ধ মেরুদন্ডহীনদের। অন্ধবিশ্বাস আর এন্টারটেইনমেন্টের (খেলা, মুভি, টিভি, গেইমস ইত্যাদির) নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা একটা ক্ষয়িষ্ণু সমাজ আবিষ্কার করে অনেকদিন অ-নে-কদিন হতাশায় ভুগেছি,আর তামাক পুড়ে ছাই করেছি।

.

হতাশা ধীরে ধীরে ঘৃণাতে আর ঘৃণা থেকে আস্তে আস্তে বেড়ে উঠলো অহংকার। খুব পড়তাম, আর সবাইকে যেখানেই পেতাম ধুয়ে দিতাম । একেবারে ব্লিচিং পাউডার দিয়ে ডলে, এসিড দিয়ে ঝলসে বিবর্ণ-রংহীন বানিয়ে ছেড়ে দিতাম। ভার্সিটির স্টুডেন্ট হলে তো কথাই নেই। চূড়ান্ত ওয়াশ দিতাম। মিয়া ভার্সিটিতে পড়ো! নামাজ পড়ো, পুজা করো, কেন করছো, কি করছো না বুঝেই করবা, চলবা আর সমাজে গিয়া ভাব নিবা যে “খুব শিক্ষিত হইছি গো” তা হবে না। অসহ্য লাগতো এই সিস্টেম আর মানুষের অবিরাম ভন্ডামী। এখনো লাগে।

.

এভাবে অনার্স সেকেন্ড ইয়ার এক্সাম পার হয়ে গেলো। পড়া কিন্তু থামেনি। সাথে যুক্ত হয়েছে ইন্টারনেট কানেকশান। ধুমিয়ে চলছে ডকুমেন্টারি দেখা। এর মাঝেই একদিন Atheism and Theism নিয়ে এক লেকচার দেখা হয়ে গেলো। খ্রিস্টান প্রফেসর এত এত সুন্দর করে লজিক দিয়ে সব কিছু বোঝালেন যে নড়েচড়ে বসলাম। ভাবনার নিস্তরঙ্গ পুকুরে অনেকদিন পরে তীব্র ঢিলের আঘাত! এইবার Theism এর লজিকের পিছে লাগলাম নিউট্রাল মাইন্ড নিয়েই। এর সাথে একাডেমিক স্টাডি হেল্প করছিলো ইভোলিউশান নিয়ে ভুল ধারণাগুলোর দরজায় আঘাত করতে। সংশয়বাদী মন বারবার বলে উঠতে চাইলো, স্রষ্টা কি সত্যিই আছেন তাহলে? আর অহংকারী মন বারবার তার টুঁটি চেপে ধরছিলো।

.

কি যে কষ্ট এই নিউট্রালি চিন্তা করা! কি যে যন্ত্রণা এই একা একা মানসিক যুদ্ধ করতে থাকা। এত্ত এত্ত অসহায় লাগা সেই অনুভূতি আর দাঁতে দাঁত চেপে যুদ্ধ করে যাওয়া। কেউ পাশে নেই। কেউ না। বারবার শুধু অহংকারী মন “ধর্ম ভুল, স্রষ্টা ভুল” বলে চিৎকার করে ওঠে আর বলে, “শোন, তুমি যা জানো তাই ঠিক। আরো ভালো করে Atheism নিয়ে স্টাডি করো, করতেই থাকো। এইসব সংস্কার, ফালতু সংস্কার।”

.

দিনরাত মাথায় খালি আর্গুমেন্ট আর কাউন্টার আর্গুমেন্ট ঘুরতো। স্রষ্টা যে নেই সেটাই বা কনফার্ম করি কি দিয়ে? সায়েন্টিস্টরা কি বলেন? Macro-Evolutionist Scientist রা তো এই ব্যাপারে কিছু অপ্রমাণিত ধারণা কপচিয়ে Chaos-Agent দের উস্কে দেয়। এই থিওরিগুলো থিওরিই শুধু। হাতে কলমে কাজ করে, অবজার্ভেশানে রেখে রেজাল্ট পাওয়ার জায়গা এটা নয়। বাকি থাকলো দর্শন। শুধু ভাবনা দিয়ে, থট এক্সপেরিমেন্ট করে যে কত্ত অসাম জিনিস বের হয়ে আসে তা সবাই জানে। সায়েন্সের শুরুটাও তো দর্শন থেকেই। শুরু হলো দর্শন যুদ্ধ।

.

পড়তে পড়তে একটা উপলব্ধির শুরু হলো। আমি আসলে কিছুই জানি না, কিচ্ছু না। অহংকার ভেঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে গেলো। দর্শন আর কমন সেন্সের যুদ্ধে নাস্তিক্যবাদ হার মানলো। আমরা কোন কিছু দেখে, ভালোভাবে অবজার্ভ করে, বারবার দেখে তারপর একটা ডিসিশানে যখন আসি তখন সেটাকে সায়েন্টিফিক অবসার্ভেশান বলি। এক্ষেত্রে আমরা আমাদের কমনসেন্স আর ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানকেই কাজে লাগাই।

.

ধরুন আপনাকে আমার এন্ড্রয়েড ফোনটা দেখালাম। তারপর বললাম আমার এন্ড্রয়েডটা সৌদি আরবের মরুভূমিতে কুড়িয়ে পেয়েছি। এত বালি আর তেল এত্ত এত্ত মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে ঝড়ো হাওয়া আর জলে, তাপে আর শৈত্যে, বজ্রের আঘাতে প্রথমে ধীরে ধীরে সিলিকন আর প্লাস্টিক, তারপর আরো মিলিয়ন মিলিয়ন বছরে অন্যান্য পার্টস, ব্যাটারী ইত্যাদিতে বিবর্তিত হতে হতে হতে হতে আজকের এই টাচস্ক্রীণড-এন্ড্রয়েডে Evolved হয়েছে। Samsung লেখাটা যে খোদাই করা দেখছেন, সেটাও এভাবেই এসেছে ভাই। বিশ্বাস করেন ভাই। আপনার দুটি পায়ে পড়ি ভাই, প্লীজ বিশ্বাস করেন। আপনি বিশ্বাস করবেননা। কেন? কেন করবেননা? কারণ, আপনার অবজার্ভেশান বলে এটা Absolutely Impossible. তাই না?

.

একটা জড় পদার্থ থেকে আরেকটা জড় পদার্থ এভাবে তৈরি হওয়ার দাবিকে আপনি ইম্পসিবল বলছেন, যুক্তিসঙ্গত প্রমাণ

চাইছেন আমার দাবির, ভালো ভালো, গুড গুড। এইতো সায়েন্টিফিক মাইন্ড। যেখানে একটা জড় (বালি, তেল ইত্যাদি) থেকে আরেকটা জড়ই (মোবাইল) তৈরি হতে পারে না, অসম্ভব, সেখানে জড় থেকে একটা কোষের মত অসাম অর্গানাইজড আবার রিপ্রোডিউসিবল অর্গানিক ডিভাইস নিজে নিজে এমনি এমনি তৈরি হতে পারে? সম্ভব?

.

আপনি বুদ্ধিমান হলে অলরেডী দুইদিকে মাথা নেড়ে “না, না” বলছেন, আর অন্ধ বিতার্কিক হলে কাউন্টার আর্গুমেন্ট হাতড়ানো শুরু করেছেন। প্রিয় অন্ধ বিতার্কিক, আপনি আপনার অন্ধকূপে হাতড়াতে থাকুন আজীবন, ভাব নিয়ে নিজে যা জানেন তাকেই শুধু সত্য বলে মেনে যান গলার জোরে আর অহংবোধে, নিজের গোলকধাঁধায়। ততক্ষণে আমরা আরেকটু আলোকিত হয়ে নিই, কেমন?

.

যেহেতু এত্তো সফিস্টিকেটেড একটা জিনিস এভাবে নিজে নিজে হয়ে যেতে পারে না, অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আসতে পারে না, তার মানে আমাদের কমন অবজার্ভেশান অনুযায়ী এর একজন স্রষ্টা আছেন। এই দুনিয়া, প্রাণজগতের মাঝে এত্ত অর্ডার আর ডিজাইন, অর্ডার মেনে চলা বিশাল ইউনিভার্স থেকে শুরু করে ছোট্ট ইলেক্ট্রন-প্রোটন সবকিছু একজন অসাম অপার্থিব ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনারের দিকেই ইন্ডিকেট করছে অবিরাম। কাজেই স্রষ্টা আছে, থাকতেই হবে।

.

আবার বাই ডিফল্ট একজনের বেশি স্রষ্টা থাকা অসম্ভব। দর্শন, যুক্তি আর নিউট্রাল কমন সেন্স খাটালেই বুঝা যায় একজনের বেশি স্রষ্টা থাকলে এই এত সুন্দর Order আর Natural Law থাকতো না, Chaos এ ভরে থাকতো পুরো ইউনিভার্স। কিন্তু তা তো না! সব তো কি সুন্দর সিটেম আর অর্ডার মেনে চলছে। স্রষ্টা তাহলে একজনই। তিনি অপার্থিব। সৃষ্টির কোন গুণাবলী তাঁর নেই, থাকতে পারে না। কারণ, যদি থাকে তাহলে তাকে সৃষ্ট হতে হবে। তাকে যে সৃষ্টি করবে তাকে তাহলে আরেকজন সৃষ্টি করতে হবে, তাকে আবার আরেকজন... এভাবে চলতেই থাকবে অসীম পর্যন্ত। এর কোন শেষ নেই।

.

ইজি করার জন্যে একটা এক্সাম্পল দিই। মনে করুন, আপনি একজন ট্রাক ড্রাইভার। গাড়ির ইঞ্জিন রাস্তায় হঠাৎ বিগড়ে গেলো। ঠেলে ঠেলেই আধা মাইল দূরের গ্যারেজে নিতে হবে। ধাক্কা দেয়া দরকার। একজনকে ডাকলেন।

.

তিনি বললেন, “হোক্কে বেবি। নো প্রবলেমো। আমি ধাক্কা দিমু, তবে যদি আমার আরেকজন ফ্রেন্ড রাজি হয় তারপর দিমু, নইলে না।”

তাঁর ফ্রেন্ডকে বললেন ব্যাপারটা।

.

সেই ফ্রেন্ডও উত্তর দিলো, “হোক্কে বেবি। নো প্রবলেমো। আমি ধাক্কা দিমু, তবে যদি আমার আরেকজন ফ্রেন্ড রাজি হয় তারপর দিমু, নইলে না”।

তাঁর ফ্রেন্ডকেও খুঁজে বের করে রিকুয়েস্ট করলেন। সেও একই কথা জানালো। তাঁর আরেকটা ফ্রেন্ড রাজি হলে তিনি ধাক্কা দিবেন।

.

এভাবে যদি চলতেই থাকে, চলতেই থাকে, ফ্রেন্ডের সংখ্যা শুধু বাড়তেই

থাকবে অসীম পর্যন্ত। ধাক্কা আর দেয়া হবে না। গাড়িও আর কোনদিন আধমাইল দূরের গ্যারেজে যাবে না। Right?

.

এভাবে স্রষ্টাও যদি আরেকজন স্রষ্টা দ্বারা, সেই স্রষ্টাও আরেকজন স্রষ্টা দ্বারা তৈরি হতে হয় তাহলে তা অসীম পর্যন্ত চলতেই থাকবে, কাজেই কিছুই আর সৃষ্টি হবেনা, সৃষ্টির মাঝে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের ছাপ পাওয়া তো সুদূর অস্তাচল।

.

কিন্তু সৃষ্টি যেহেতু আছে, তাতে স্রষ্টার ইন্টেলিজেন্সের ছাপও পাওয়া যায় খেয়াল করলেই, তার মানে স্রষ্টাও আছে। কিন্তু সেই স্রষ্টা আমাদের এই লাইফে দেখা কোন কিছুর মতই না। কারণ, যদি কোন কিছুর মত হয় তাহলে তাকে সৃষ্টি হতে হবে আরেকটা ইন্টেলিজেন্স দ্বারা, তাকে আবার আরেকজন দ্বারা, এভাবে অসীম পর্যন্ত চলতেই থাকবে, ফলে আমরা আর কোন সৃষ্টিই দেখবো না। কিন্তু, সৃষ্টিতো আছে। তার মানে হলো, স্রষ্টা আছে, তবে সেই স্রষ্টা আমাদের দেখা কোনকিছুর মত না, কোন সৃষ্টির মত না। কারণ, আমরা আমাদের ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের বাইরে ভাবতে পারি না।

.

তাকে হতে হবে Self-sustaining, Powerful and Intelligent. কারণ, তিনি কারো মুখাপেক্ষী হতে পারেন না। Self-fulfilling না হলে তাকে কে Fulfill করবে? তিনি কারো থেকে জন্ম নেননি (কারো কাছ থেকে জন্ম নিলে জন্মদাতাকে কে জন্ম দিলো এরকম প্রশ্ন আবার অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে) কাউকে জন্মও দেননি। একজন স্রষ্টার এই গুণগুলো থাকতে হবে।

.

স্রষ্টাতো তাহলে মানুষকে পথ দেখানোর জন্যে অনেক ধর্মগ্রন্থ পাঠিয়েছেন শুনেছি। সেগুলো যাচাই করে দেখি কোনটা স্রষ্টাকে ঠিকভাবে বর্ণণা করে। আশে পাশে পাওয়া ধর্মগুলোকেই টার্গেট করা যাক।

.

হিন্দুধর্মঃ ধর্মগ্রন্থের মাঝে আছে বেদ ও গীতা। এখানে আছে অবতারবাদ। অবতারবাদ অনুযায়ী স্রস্টা নিজেকেই মানুষরুপে দুনিয়াতে পাঠান। মানুষ সেলফ সাস্টেইনিং না, তাকে সৃষ্টি হতে হয়। একজন স্রষ্টা একই সাথে সৃষ্ট আবার স্রষ্টা দুটোই হতে পারেন না যুক্তি অনুযায়ীই। কাজেই এই ধর্ম কোন যুগ বা কালে সত্যিকারের পথপ্রদর্শক হিসেবে যদি স্রস্টার কাছে থেকে এসে থাকে, তবুও এটা গ্রহণযোগ্য না। কারণ, এখানে ঘাপলা ঢুকে গেছে শিওর। এটা নিঃসন্দেহে Nullified.

.

খ্রীস্টানধর্মঃ মূল ধর্মগ্রন্থ বাইবেল। এদের আবার দুই ভাগ। একভাগ অনুযায়ী স্রষ্টার সন্তান হচ্ছে যীশু (বা ঈসা নবী)।

.

যীশু মানুষ ছিলেন। লজিক অনুযায়ী স্রষ্টার সন্তান মানুষ হতে পারে না। কারণ, মানুষ সেলফ সাস্টেইনিং না, তাকে সৃষ্টি হতে হয়। একজন স্রষ্টা একই সাথে সৃষ্ট আবার স্রষ্টা দুটোই হতে পারেন না যুক্তি অনুযায়ীই। এছাড়াও, ইতিহাস বলে এরা নিজেরাই ভোটাভুটির মাধ্যমে বাইবেল কে ইচ্ছেমতো বদলে নিয়েছে। বাইবেলের বদলানোর কাজ কয়েকজন করায় এর নানান রকম এডিশান পাওয়া যায়। কাজেই এই ধর্ম কোন যুগ বা কালে সত্যিকারের গাইডেন্স হিসেবে যদি স্রষ্টার কাছে থেকে এসেও থাকে, তবুও এটা আর গ্রহণযোগ্য না। কারণ, এখানেও ঘাপলা ঢুকে গেছে শিওর। এটাও নিঃসন্দেহে Nullified.

.

বৌদ্ধধর্মঃ এটা নিয়ে খুব বেশি পড়াশোনা করিনি। যা পড়েছি মনে হয়েছে এটা একটা দর্শন মাত্র। এই ধর্ম স্রস্টাতেই বিশ্বাস করে না। এটাতো এমনেই বাদ যাবে।

.

ইসলামঃ মূল ধর্মগ্রন্থ আল-কুরআন। এটি অনুযায়ী স্রষ্টা একজন। এটি বলে স্রষ্টার আকার কল্পনা করা যায়না। তিনি Self-sustaining. তাকে কেউ জন্ম দেয়নি, তিনিও কাউকে জন্ম দেননি। এটা সবকটা লজিককে Fulfill করছে। এছাড়াও এটা মানুষের সৃষ্টির শুরু থেকে মানুষের কাছে আসা অন্যান্য Revelation এর কথা বর্ণনা করে, তারপরো মানুষের অন্য দিকে ছুটে যাওয়া, ভুল উপাস্য (যিশু, দূর্গা, কালী, মাজার ইত্যাদি) নির্বাচন, ভুলে ডুবে যাওয়ার ইতিহাস বর্ণনা করে। এটা এই দাবিও করে যে এটা জগতের ধ্বংস পর্যন্ত অবিকৃত থাকবে। এই দাবীর পর ১৪০০ বছর পার হয়ে গেছে, এখনো একটি অক্ষর এদিক ওদিক হয়নি। আর এর বার্তাবাহক যেদিন শেষ হজ্জের ভাষণ দিয়েছেন সেইদিন এই কুরআনেই আল্লাহ ফাইনাল ঘোষণা দিয়ে দিয়েছেন,

.

"আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নিআমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং

ইসলামকে তোমাদের দ্বীন হিসেবে কবূল করে নিলাম।" [সূরা মায়ইদা, আয়াত ৩]

.

এই ফাইনাল রিভিলেশান আল-কুরআনের মাধ্যমেই মহান স্রষ্টা একমাত্র জ্ঞান অর্জন করে যাচাই বাছাই করে এই পথ গ্রহণ করার আহবান জানান দুনিয়ার সব মানুষকে, প্রত্যেকটা মানুষকে। এই পথের নাম শান্তি বা ইসলাম। এই শান্তির পথকে, এই একমাত্র টিকে থাকা সত্যিকার পথকে যেসব মানুষ খুঁজে, জেনে, মেনে চলেন তাদের মুসলিম বলে। কাজেই একজন মানুষ মুসলিম হতে হলে তাকে অবশ্যই স্রষ্টা আর তাঁর বার্তাবাহকের (মুহাম্মাদ ﷺ) কথা পড়ে, বুঝে, জেনে, মেনে চলতে হবে।

.

এখানে কোন শর্টকাট নেই। জন্মসূত্রে নামের আগে একখানা "মোহাম্মদ" থাকলেই সে মুসলিম হয়ে যাবে না। এইখানে (ইসলামিক) জ্ঞানার্জনকে এবং সেই অনুযায়ী জীবনধারণকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। যারা নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে চলবে, তারাই মুসলিম।

.

সব সত্য জেনে শুনেও যেসব মানুষ সমাজের ভয়ে, অহংকারে, নির্যাতনের ভয়ে ইত্যাদি নানা রকম কারণে এক স্রষ্টার পাঠানো এই জীবনব্যবস্থা বিশ্বাস করে না, বিশ্বাস করলেও মানে না, বিরোধীতা করে আর অবিশ্বাসী তাদের চাইতে এই ভন্ডদের শাস্তি হবে আরো ভয়াবহ। এখানে বিচারকে করা হয়েছে সূক্ষ্ম হতে সূক্ষ্মতর। নিখুঁত হতে নিখুঁততর। কাজেই এটাই হচ্ছে সঠিক পথ।

.

আমার এই পথে যাত্রা শুরু হলো। আমি আমার ফিলোসফারস স্টোনটা খুঁজে পেয়েছি। ইসলাম নামের সেই পরশ পাথর টি আমাকে বদলে দিয়েছে একজন সোনালি মুসলিমে। সত্যিকার মুসলিমে। এখন শুধু পথটা ধরে হেঁটে যাওয়ার চেষ্টা করতে থাকা, নিজেকে পূর্ণ করার চেষ্টা করতে থাকা, মানুষকে সত্যটা জানানোর চেষ্টা করতে থাকা।

.

অনেক কথাতো বললাম। ইসলামে আসার পর সেই হই-হই করে মারতে আসা মানুষগুলোকে, সমাজকে যখন হাসিমুখে বলতে গেলাম, জানাতে গেলাম সত্যের কথা, বোঝাতে গেলাম, সেই তারা এরপর কি করলো জানেন? থাক, আজ না। এই বিশাল ভন্ড আর করাপ্টেড সমাজের কথা, সেই Gotham City'র গল্প আরেকদিন করবো ইনশা আল্লাহ।

.

আপনি যদি এই দুনিয়ার কোন মানুষ হয়ে থাকেন, তাহলে আপনাকেও সেই সুমহান সত্যের পথে স্বাগতম, স্বাগতম ইসলামের পথে, স্বাগতম দুনিয়ার চাকচিক্য, প্রদর্শনী, অশ্লীলতা আর গোলামি থেকে মুক্তির পথে, স্বাগতম মানবতার পথে।

.

স্বাগতম স্রষ্টার নিজের দেখানো সত্যের পথে।

৬

আল্লাহ কি এমন কিছু বানাতে পারবেন, যেটা তিনি তুলতে পারবে না?

-আরিফ আজাদ

ছুটির দিনে সারাদিন রুমে বসে থাকা ছাড়া আমার আর কোন কাজ থাকেনা।সপ্তাহের এই দিনটি অন্য সবার কাছে ঈদের মতো মনে হলেও, আমার কাছে এই দিনটি খুবই বিরক্তিকর।ক্লাশ,ক্যাম্পাস,আড্ডা এসব স্তিমিত হয়ে যায়।

.

এই দিনটি আমি রুমে শুয়ে-বসে-ঘুমিয়ে কাটিয়ে দিলেও, সাজিদ এই দিনের পুরোটা সময় লাইব্রেরিতে কাটিয়ে দেয়। লাইব্রেরিতে ঘুরে ঘুরে নানান বিষয়ের উপর বই নিয়ে আসে।

.

আজ সকালেও সে বেরিয়েছে লাইব্রেরির উদ্দেশ্যে।ফিরবে জুমা'র আগে।হাতে থাকবে একগাদা মোটা মোটা বই।

.

বাসায় আমি একা। ভাবলাম একটু ঘুমোবো। কাল অনেক রাত পর্যন্ত বসে বসে এ্যাসাইনমেন্ট রেডি করেছি।চোখদুটো জবা ফুলের মতো টকটকে লাল হয়ে আছে।আমি হাঁই তুলতে তুলতে যেই ঘুমোতে যাবো, অমনি দরজার দিক থেকে কেউ একজনের কাঁশির শব্দ কানে এলো।

.

ঘাঁড় ঘুরিয়ে সেদিকে তাকাতেই দেখলাম, একজোড়া বড় বড় চোখ চশমার ভিতর দিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে।আগাগোড়া চোখ বুলিয়ে নিলাম। পরনে শার্ট-প্যান্ট। চোখে মোটা কালো ফ্রেমের চশমা।লোকটার চেহারায় সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত 'ফেলুদা' চরিত্রের কিছুটা ভাব আছে।লোকটা আমার চোখাচোখি হতেই ফিক করে হেসে দিলো।এরপর বললো,- 'এটা কি সাজিদের বাসা?'

.

প্রশ্নটা আমার গায়ে লাগলো। সাজিদ কি বাইরে সবাইকে এটাকে নিজের একার বাসা বলে বেড়ায় নাকি? এই বাসার যা ভাড়া, তা সাজিদ আর আমি সমান ভাগ করে পরিশোধ করি।তাহলে,যুক্তিমতে বাসাটা তো আমারও।

.

লোকটা যতোটা উৎসাহ নিয়ে প্রশ্নটা করেছে, তার দ্বিগুণ উৎসাহ নিয়ে আমি বললাম,- 'এটা সাজিদ আর আমার দুজনেরই বাসা।'

লোকটা আমার উত্তর শুনে আবারো ফিক করে হেসে দিলো।

.

ততক্ষনে লোকটা ভেতরে চলে এসেছে।

.

সাজিদকে খুঁজতে এরকম প্রায়ই অনেকেই আসে।সাজিদ রাজনীতি না করলেও, নানারকম স্বেচ্ছাসেবী মূলক সংগঠনের সাথে যুক্ত আছে।

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে বললো,- 'সাজিদ মনে হয় ঘরে নেই, না?'

.

আমি হাঁই তুলতে তুলতে বললাম,- 'জ্বি না। বই আনতে গেছে। অপেক্ষা করুন, চলে আসবে।'

.

লোকটাকে সাজিদের চেয়ারটা টেনে বসতে দিলাম।তিনি বললেন,- 'তোমার নাম?'

– 'আরিফ।'

– 'কোথায় পড়ো?'

– 'ঢাবি তে।'

– 'কোন ডিপার্টমেন্ট?'

– 'জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং'

লোকটা খুব করে আমার প্রশংসা করলো।এরপর বললো,- 'আমি প্রথমে ভেবেছিলাম তুমিই সাজিদ।'

লোকটার কথা শুনে আমার ছ নাম্বার হাঁইটা মূহুর্তেই মুখ থেকে গায়েব হয়ে গেলো। ব্যাপার কি? এই লোক কি সাজিদ কে চিনে না?

আমি বললাম,- 'আপনি সাজিদের পরিচিত নন?'

– 'না।'

– 'তাহলে?'

লোকটা একটু ইতস্তত বোধ করলো মনে হচ্ছে।এরপর বললো,- 'আসলে আমি একটি প্রশ্ন নিয়ে এসেছি সাজিদের কাছে। প্রশ্নটি আমাকে করেছিলো একজন নাস্তিক।আমি আসলে কারো কাছে এটার কোন সন্তোষজনক উত্তর পাইনি,তাই।'

.

আমি মনে মনে বললাম,- 'বাবা সাজিদ, তুমি তো দেখি এখন সক্রেটিস বনে গেছো।পাবলিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে তোমার দ্বারস্থ হয়।'

.

লোকটার চেহারায় একটি গম্ভীর ভাব আছে।দেখলেই মনে হয় এই লোক অনেক কিছু জানে,বোঝে।কিন্তু কি এমন প্রশ্ন, যেটার কোন ফেয়ার এন্সার উনি পাচ্ছেন না? কৌতুহল বাড়লো।

.

আমি মুখে এমন একটি ভাব আনলাম, যেন আমিও সাজিদের চেয়ে কোন অংশে কম নই।বরং, তারচেয়ে কয়েক কাঠি সরেশ। এরপর বললাম,- 'আচ্ছা, কি সেই প্রশ্ন?'

.

লোকটা আমার অভিনয়ে বিভ্রান্ত হলো।হয়তো ভাবলো,আমি সত্যিই ভালো কোন উত্তর দিতে পারবো।

.

বললো,- 'খুবই ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন। স্রষ্টা সম্পর্কিত।'

.

আমি মনে মনে তখন প্রায়ই লেজেগোবরে অবস্থা।কিন্তু মুখে বললাম,- 'প্রশ্ন যে খুবই ক্রিটিক্যাল,সেটা তো বুঝেছি। নইলে ঢাকা শহরের এই জ্যাম-ট্যাম মাড়িয়ে কেউ এত কষ্ট করে এখানে আসে?'

.

আমার কথায় লোকটা আবারো বিভ্রান্ত হলো এবং আমাকে ভরসা করলো। এরপর বললো,- ' আগেই বলে নিই, প্রশ্নের উত্তর 'হ্যাঁ/না হতে হবে।

– 'আপনি আগে প্রশ্ন করুন,তারপর উত্তর কি হবে দেখা যাবে।'- আমি বললাম।

– ‘প্রশ্নটা হচ্ছে- স্রষ্টা কি এমন কোনকিছু বানাতে পারবে, যেটা স্রষ্টা উঠাতে পারবে না?’

আমি বললাম,- ‘আরে, এতো খুবই সহজ প্রশ্ন। হ্যাঁ বলে দিলেই তো হয়।ল্যাটা চুকে যায়।’

লোকটা হাসলো। মনে হলো, আমার সম্পর্কে উনার ধারনা পাল্টে গেছে।এই মূহুর্তে উনি আমাকে গবেট, মাথামোটা টাইপ কিছু ভাবছেন হয়তো।
আমি বললাম,- ‘হাসলেন কেন? ভুল বলেছি?’

লোকটা কিছু না বলে আবার হাসলো। এবার লোকটার হাসি দেখে আমি নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে গেলাম। প্রশ্নটা আবার মনে করতে লাগলাম।

.

স্রষ্টা কি এমন কোনকিছু বানাতে পারবে, যেটা স্রষ্টা উঠাতে পারবে না????
উত্তর যদি হ্যাঁ হয়, তাহলে ধরে নিচ্ছি যে, স্রষ্টা জিনিসটা বানাতে পারলেও,সেটা তুলতে পারবে না। আরে, এটা কিভাবে সম্ভব? স্রষ্টা পারে না এমন কোন কাজ আছে নাকি আবার? আর, একটা জিনিস উঠানো কি এমন কঠিন কাজ যে স্রষ্টা সেটা পারবে না?

.

আবার চিন্তা করতে লাগলাম। উত্তর যদি ‘না’ হয়, তাহলে ধরে নিচ্ছি যে- স্রষ্টা জিনিসটা উঠাতে পারলেও বানাতে পারবে না।

.

ও আল্লাহ! কি বিপদ! স্রষ্টা বানাতে পারবে না? এটা কিভাবে সম্ভব? হ্যাঁ বললেও আটকে যাচ্ছি, না বললেও আটকে যাচ্ছি।

.

লোকটা আমার চেহারার অস্থিরতা ধরে ফেলেছে।মুচকি মুচকি হাসতে শুরু করলো।আমি ভাবছি তো, ভাবছিই।

.

এর একটু পরে সাজিদ এলো। সে আসার পরে লোকটার সাথে তার প্রাথমিক আলাপ শেষ হলো।এর মাঝে লোকটা সাজিদকে বলে দিয়েছে যে, আমি প্রশ্নটার প্যাঁচে কি রকম নাকানিচুবানি খেলাম,সেটা।সাজিদও আমার দিকে তাকিয়ে কিছুক্ষণ হেসে নিলো।

.

এরপর সাজিদ তার খাটে বসলো।হাতে একটি কাগজের টোঙার মধ্যে বুট ভাজা।বাইরে থেকে কিনে এনেছে। সে বুটের টোঙাটা লোকটার দিকে ধরে বললো,- ‘নিন, এখনো গরম আছে।’

.

লোকটা প্রত্যাখ্যান করতে চেয়েও করলো না।কেন করলো না কে জানে।
লোকটা এবার সাজিদকে তার প্রশ্নটি সম্পর্কে বললো। প্রশ্নটি হলো-
‘স্রষ্টা কি এমন কিছু বানাতে পারবে, যেটা স্রষ্টা নিজে তুলতে পারবে না?’

.

এইটুকু বলে লোকটা এবার প্রশ্নটিকে ভেঙে বুঝিয়ে দিলো। বললো,- ‘দেখো, এই প্রশ্নের উত্তরে যদি ‘হ্যাঁ’ বলো, তাহলে তুমি ধরে নিচ্ছ যে, স্রষ্টা জিনিসটি বানাতে পারলেও,তুলতে পারবে না। কিন্তু আমরা জানি স্রষ্টা সর্বশক্তিমান। কিন্তু যদি স্রষ্টা জিনিসটা তুলতে না পারে, তিনি কি আর সর্বশক্তিমান থাকেন? থাকেন না।

.

যদি এই প্রশ্নের উত্তরে তুমি ‘না’ বলো, তাহলে তুমি স্বীকার করছো যে, সেরকম কোন জিনিস স্রষ্টা বানাতে পারবে না যেটা তিনি তুলতে পারবেন।এখানেও স্রষ্টার ‘সর্বশক্তিমান’ গুণটি প্রশ্নবিদ্ধ। এই অবস্থায় তোমার উত্তর কি হবে?’

.

সাজিদ লোকটির প্রশ্নটি মন দিয়ে শুনলো।প্রশ্ন শুনে তার মধ্যে তেমন কোন ভাব লক্ষ্য করিনি।নরমাল।
সে বললো,- 'দেখুন সজিব ভাই, আমরা কথা বলবো লজিক দিয়ে,বুঝতে পেরেছেন?।'

.

এরমধ্যে সাজিদ লোকটির নামও জেনে গেছে। কিন্তু এই বয়োবৃদ্ধ লোকটিকে সে 'আঙ্কেল' কিংবা ঢাকা শহরের নতুন রীতি অনুযায়ী 'মামা' না ডেকে 'ভাই' কেন ডাকলো বুঝলাম না।

.

লোকটি মাথা নাড়লো।সাজিদ বললো,- 'যে মূহুর্তে আমরা যুক্তির শর্ত ভাঙবো, ঠিক সেই মূহুর্তে যুক্তি আর যুক্তি থাকবে না।যেটা তখন হবে কু-যুক্তি। ইংরেজিতে বলে- logical fallacy. সেটা তখন আত্মবিরোধের জন্ম দেবে, বুঝেছেন?'

– 'হ্যাঁ।'- লোকটা বললো।

– 'আপনি প্রশ্ন করেছেন স্রষ্টার শক্তি নিয়ে। তার মানে, প্রাথমিকভাবে আপনি ধরে নিলেন যে, একজন স্রষ্টা আছেন, রাইট?'

– 'হ্যাঁ।'

– 'এখন স্রষ্টার একটি অন্যতম গুণ হলো- তিনি অসীম, ঠিক না?'

– 'হ্যাঁ, ঠিক।'

– 'এখন আপনি বলেছেন, স্রষ্টা এমনকিছু বানাতে পারবে কিনা, যেটা স্রষ্টা তুলতে পারবে না। দেখুন, আপনি নিজেই বলেছেন, এমনকিছু, আই মিন something, রাইট?'

– 'হ্যাঁ।'

– 'আপনি 'এমনকিছু' বলে আসলে জিনিসটার একটা আকৃতি, শেইপ,আকার বুঝিয়েছেন, তাই না? যখনই something ব্যবহার করেছেন, তখন মনে মনে সেটার একটা শেইপ আমরা চিন্তা করি, করি না?'

– 'হ্যাঁ, করি।'

– 'আমরা তো এমন কিছুকেই শেইপ বা আকার দিতে পারি, যেটা আসলে সসীম, ঠিক?'

– 'হ্যাঁ, ঠিক।'

– 'তাহলে এবার আপনার প্রশ্নে ফিরে যান। আপনি ধরে নিলেন যে স্রষ্টা আছে।স্রষ্টা থাকলে তিনি অবশ্যই অসীম।এরপর আপনি তাকে এমন কিছু বানাতে বলছেন যেটা সসীম।যেটার নির্দিষ্ট একটা মাত্রা আছে,আকার আছে,আয়তন আছে। ঠিক না?'

– 'হ্যাঁ।'

– 'পরে শর্ত দিলেন, তিনি সেটা তুলতে পারবে না।দেখুন,আপনার প্রশ্নে লজিকটাই ঠিক নেই। একজন অসীম সত্বা একটি সসীম জিনিস তুলতে পারবে না, এটা তো পুরোটাই লজিকের বাইরের প্রশ্ন। খুবই হাস্যকর না? আমি যদি বলি, উসাইন বোল্ট কোনদিনও দৌঁড়ে ৩ মিটার অতিক্রম করতে পারবে না, এটা কি হাস্যকর ধরনের যুক্তি নয়?'

.

সজিব নামের লোকটা এবার কিছু বললেন না। চুপ করে আছেন।
সাজিদ উঠে দাঁড়ালো। এরমধ্যেই বুট ভাজা শেষ হয়ে গেছে।সে বইয়ের তাকে কিছু বই রেখে আবার এসে নিজের জায়গায় বসলো। এরপর আবার বলতে শুরু করলো-

.

'এই প্রশ্নটি করে মূলত আপনি স্রষ্টার 'সর্বশক্তিমান' গুণটাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে প্রমান করতে চাইছেন যে, আসলে স্রষ্টা নেই।

.

আপনি ‘সর্বশক্তিমান’ টার্মটি দিয়ে বুঝাচ্ছেন যে, স্রষ্টা মানেই এমন এক সত্বা, যিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন, রাইট?’

.

লোকটি বললেন,- ‘হ্যাঁ। স্রষ্টা মানেই তো এমন কেউ, যিনি যখন যা ইচ্ছা, তাই করতে পারেন।’

.

সাজিদ মুচকি হাসলো। বললো,- ‘আসলে সর্বশক্তিমান মানে এই না যে, তিনি যখন যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।সর্বশক্তিমান মানে হলো- তিনি নিয়মের মধ্যে থেকেই সবকিছু করতে পারেন।নিয়মের বাইরে গিয়ে তিনি কিছু করতে পারেন না।

.

করতে পারেন না বলাটা ঠিক নয়, বলা উচিত তিনি করেন না।

.

এর মানে এই না যে- তিনি সর্বশক্তিমান নন বা তিনি স্রষ্টা নন।

.

এর মানে হলো এই- কিছু জিনিস তিনি করেন না, এটাও কিন্তু তার স্রষ্টা হবার গুণাবলি। স্রষ্টা হচ্ছেন সকল নিয়মের নিয়ন্ত্রক।এখন তিনি নিজেই যদি নিয়মের বাইরের হন- ব্যাপারটি তখন ডাবলষ্ট্যান্ড হয়ে যায়। তার কিছু বৈশিষ্ট্য আছে।তিনি সেই বৈশিষ্টগুলো অতিক্রম করেন না।সেগুলো হলো তার মোরালিটি।এগুলো আছে বলেই তিনি স্রষ্টা, নাহলে তিনি স্রষ্টা থাকতেন না।’

.

সাজিদের কথায় এবার আমি কিছুটা অবাক হলাম।আমি জিজ্ঞেস করলাম- ‘স্রষ্টা পারেনা এমন কি কাজ থাকতে পারে?’

.

সাজিদ আমার দিকে ফিরলো। ফিরে বললো,- ‘স্রষ্টা কি মিথ্যা কথা বলতে পারে? ওয়াদা ভঙ্গ করতে পারে? ঘুমাতে পারে? খেতে পারে?’

.

আমি বললাম,- ‘আসলেই তো।’

.

সাজিদ বললো,- ‘এগুলো স্রষ্টা পারেন না বা করেন না।কারন, এগুলা স্রষ্টার গুণের সাথে কন্ট্রাডিক্টরি।কিন্তু এগুলো করেন না বলে কি তিনি সর্বশক্তিমান নন? না। তিনি এগুলো করেন না,কারন, এগুলা তার মোরালিটির সাথে যায় না।’

.

এবার লোকটি প্রশ্ন করলো,- ‘কিন্তু এমন জিনিস তিনি বানাতে পারবেন না কেন, যেটা তিনি তুলতে পারবেন না?’

.

সাজিদ বললো,- ‘কারন, স্রষ্টা যদি এমন জিনিস বানান, যেটা তিনি তুলতে পারবেন না- তাহলে জিনিসটাকে অবশ্যই স্রষ্টার চেয়েও বেশি শক্তিশালী হতে হবে।

.

স্রষ্টা যে মূহুর্তে এরকম জিনিস বানাবেন, সেই মূহুর্তেই তিনি স্রষ্টা হবার অধিকার হারাবেন।তখন স্রষ্টা হয়ে যাবে তারচেয়ে বেশি শক্তিশালী ওই জিনিসটি।কিন্তু এটা তো স্রষ্টার নীতি বিরুদ্ধ। তিনি এটা কিভাবে করবেন?’

.

লোকটা বললো,- ‘তাহলে এমন জিনিস কি থাকা উচিত নয় যেটা স্রষ্টা বানাতে পারলেও তুলতে পারবে না?’

.

– ‘এমন জিনিস অবশ্যই থাকতে পারে, তবে যেটা থাকা উচিত নয়, তা হলো- এমন প্রশ্ন।’

– ‘কেনো?’

এবার সাজিদ বললো,- ‘যদি আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করি, নীল রঙের স্বাদ কেমন? কি বলবেন? বা, ৯ সংখ্যাটির ওজন কতো মিলিগ্রাম, কি বলবেন?’

লোকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেলো মনে হলো। বললো,- ‘নীল রঙের আবার স্বাদ কি? ৯ সংখ্যাটির ওজনই হবে কি করে?’

.

সাজিদ হাসলো। বললো,- ‘নীল রঙের স্বাদ কিংবা ৯ সংখ্যাটির ওজন আছে কি নেই তা পরের ব্যাপার।থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে।তবে, যেটা থাকা উচিত নয় সেটা হলো নীল রঙ এবং ৯ সংখ্যা নিয়ে এই ধরনের প্রশ্ন।’

.

সাজিদ বললো,- ‘ফাইনালি আপনাকে একটি প্রশ্ন করি। আপনার কাছে দুটি অপশান। হয় ‘হ্যাঁ’ বলবেন, নয়তো- ‘না’।আমি আবারো বলছি, হয় হ্যাঁ বলবেন, নয়তো- না।’

.

লোকটা বললো,- ‘আচ্ছা।’

.

– ‘আপনি কি আপনার বউকে পেটানো বন্ধ করেছেন?’

.

লোকটি কিছুক্ষন চুপ মেরে ছিলো।এরপর বললো,- ‘হ্যাঁ।’

.

এরপর সাজিদ বললো,- ‘তার মানে আপনি একসময় বউ পেটাতেন?’

.

লোকটা চোখ বড় বড় করে বললো,- আরে, না না।’

.

এবার সাজিদ বললো,- ‘হ্যাঁ’ নাহলে কি? না?’

.

লোকটা এবার ‘না’ বললো।’

.

সাজিদ হাসতে লাগলো। বললো- ‘তার মানে আপনি এখনো বউ পেটান?’

.

লোকটা এবার রেগে গেলো। বললো,- ‘আপনি ফাউল প্রশ্ন করছেন।আমি কোনদিন বউ পেটায়নি।এটা আমার নীতি বিরুদ্ধ।

.

সাজিদ বললো,- ‘আপনিও স্রষ্টাকে নিয়ে একটি ফাউল প্রশ্ন করেছেন। এটা স্রষ্টার নীতি বিরুদ্ধ।

.

আমার প্রশ্নের উত্তরে আপনি যদি হ্যাঁ বলেন, তাহলে স্বীকার করে নিচ্ছেন যে- আপনি একসময় বউ পেটাতেন।যদি ‘না’ বলেন, তাহলে স্বীকার করে নিচ্ছেন

.

– আপনি এখনো বউ পেটান। আপনি না ‘হ্যাঁ’ বলতে পারছেন, না পারছেন ‘না’ বলতে।কিন্তু, আদতে আপনি বউ পেটান না।এটা আপনার নীতি বিরুদ্ধ।

.

সুতরাং, এমতাবস্থায় আপনাকে এরকম প্রশ্ন করাই উচিত না।এটা লজিক্যাল ফ্যালাসির মধ্যে পড়ে যায়। ঠিক সেরকম স্রষ্টাকে ঘিরেও এরকম প্রশ্ন থাকা উচিত নয়।কারন, এই প্রশ্নটি নিজেই নিজের আত্মবিরোধ।

.

নীল রঙের স্বাদ কেমন, বা ৯ সংখ্যাটির ওজন কতো মিলিগ্রাম- এরকম প্রশ্ন যেমন লজিক্যাল ফ্যালাসি এবং এই ধরনের প্রশ্ন যেমন থাকা উচিত নয়, তেমনি, 'স্রষ্টা এমনকিছু বানাতে পারবে কিনা যেটা স্রষ্টা উঠাতে পারবে না'- এটাও একটা লজিক্যাল ফ্যালাসি। কু-যুক্তি। এরকম প্রশ্নও থাকা উচিত নয়।

.

সেদিন লোকটি খুব শকড হলেন। ভেবেছিলেন হয়তো সাজিদ এই প্রশ্নটি শুনেই ডিগবাজি খাবে।কিন্তু বেচারাকে এরকম ধোলাই করবে বুঝতে পারেনি। সেদিন উনার চেহারাটা হয়েছিলো দেখার মতো।বউ পেটানির লজিকটা মনে হয় উনার খুব গায়ে লেগেছে।

৭

ঈসা (আ) এর মা মরিয়ম (আ) কি আসলেই ‘হারুনের বোন’ ?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

আল কুরআনে মহান আল্লাহ কেবল একজন নারীর নাম সরাসরি উল্লেখ করেছেন। তিনি হচ্ছেন মরিয়ম (আ.)। অশ্লীলতা ও ব্যভিচারে পরিপূর্ণ সমাজে থেকেও যিনি পবিত্রতার সাথে বেঁচে থাকতেন। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পুরস্কৃত করেছিলেন। কোন পুরুষের স্পর্শ ছাড়াই তিনি জন্ম দিয়েছিলেন ঈসা (আ.)কে। অলৌকিক উপায়ে ঈসা (আ.) এর এই জন্মকে মহান আল্লাহ পুরো মানবজাতির কাছে একটি নিদর্শন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। [1]

কিন্তু শুধু নারীর মাধ্যমে সৃষ্টির ব্যাপারটা তো মানুষ সহজে মেনে নিতে পারে না। তাই মরিয়ম (আ.) এর উপর অপবাদ দেয়া শুরু হলো।

কুরআনুল কারিমে বলা হয়েছেঃ

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ۖ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا (٢٧)

يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا (٢٨)

অর্থঃ *তারপর সে[মরিয়ম(আ.)] তাঁকে[ঈসা(আ.)] কোলে নিয়ে নিজ সম্প্রদায়ের নিকট এলো। তারা বলল, “হে মরিয়ম! তুমি তো এক অদ্ভুত কাণ্ড করেছো! হে **হারুনের বোন**! তোমার বাবা তো খারাপ লোক ছিল না। আর তোমার মা-ও ছিল না ব্যভিচারিণী’। ”* [2]

খ্রিষ্টান মিশনারী ও নাস্তিক-মুক্তমনারা অভিযোগ করে যে—কুরআনে বর্ণিত ঐতিহাসিক তথ্যগুলোতে ভুল আছে[নাউযুবিল্লাহ]। তাদের দাবিঃ সুরা মারইয়ামের ২৮ নং আয়াতে ঈসা(আ.) এর মা মরিয়ম(আ.)কে “হে হারুনের বোন” বলে সম্বোধন করা হয়েছে। বাইবেলে বর্ণিত আছে যে মুসা(আ.) ও হারুন(আ.) এর বোনের নামও মরিয়ম। [3] কাজেই কুরআনে এই দুই মরিয়মকে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে এবং ভুল তথ্য দেওয়া হয়েছে[নাউযুবিল্লাহ]।

এই প্রশ্ন নবী(ﷺ) এর যুগের খ্রিষ্টানরাও তুলতো। এবং স্বয়ং নবী(ﷺ) এর উত্তর দিয়ে গেছেন।

“মুগীরা বিন শুবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ(ﷺ) আমাকে নাজরানের দিকে পাঠান। তারা আমাকে বলল, ‘তোমরা কি কুরআনে এ বাক্য পড় না— يَا أُخْتَ هَارُونَ [“হে হারুনের বোন”; সুরা মারইয়ামের ২৮নং আয়াত] ? অথচ মুসা ও ঈসার মাঝে কত কালের ব্যবধান ?’

আমি তাদের এ প্রশ্নের কী উত্তর দেব জানতাম না। তাই নবী(ﷺ)-এর কাছে ফিরে এসে তাঁকে এ কথা জানালাম।

---

[1] আল কুরআন, মারইয়াম ১৯:২১

[2] আল কুরআন, মারইয়াম ১৯:২৭-২৮

[3] বাইবেল, যাত্রাপুস্তক(Exodus) ১৫:২০ দ্রষ্টব্য

তিনি বললেনঃ 'তুমি কি তাদেরকে এ সংবাদ দিতে পারলে না যে, ***তারা পূর্ববর্তী নবী ও পূণ্যবান লোকদের নামে তাদের নাম রাখত।'*** *"*[4]

অর্থাৎ মরিয়ম(আ.)কে "হারুনের বোন" বলার অর্থ এই নয় যে তিনি মুসা(আ.) এর সময়কার মানুষ হারুন(আ.) এর বোন। সে যুগে বনী ইস্রাঈলের লোকজন নবী-রাসুল ও পূণ্যবান মানুষের নামে সন্তানদের নামকরণ করত। কাজেই হারুন নামে অনেক মানুষ ছিল।

এরপরেও যদি খ্রিষ্টান মিশনারীরা তাদের এই ভ্রান্ত যুক্তি দেখানো চালিয়ে যেতে চায়, তাহলে আমরা বলব— বাইবেলে বর্ণিত হয়েছে যে মরিয়মের স্বামীর [5] নাম ইউসুফ(Joseph)। [6] এই ইউসুফের বাবার নাম ইয়াকুব। [7] আবার, নবী ইউসুফ(আ.) [prophet Joseph] এর বাবার নামও ছিল ইয়াকুব(আ.) [prophet Jacob]। [8] অথচ নবী ইউসুফ(আ.) বাস করতেন মরিয়মের হাজার বছর পূর্বে। নবী ইউসুফ(আ.) ছিলেন ইয়াকুব(আ.)[ইস্রাঈল] এর ১২ পুত্রের একজন; যেই ১২ পুত্রের বংশধররা বনী ইস্রাঈলের ১২ জাতি। মরিয়ম(আ.) ও তাঁর পরিবারবর্গ সবাই এই বনী ইস্রাঈল বংশের মানুষ। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, হাজার বছর সময়কালের ব্যবধানে বাস করা ২ জন আলাদা মানুষের নাম ইউসুফ, আবার উভয়েরই বাবার নাম ইয়াকুব। বাইবেল লেখকেরা কি তাহলে মরিয়মের স্বামীর সাথে নবী ইউসুফ(আ.)কে মিলিয়ে ফেলেছে?

খ্রিষ্টান মিশনারীরা এর জবাবে অবশ্যই বলবেন—আরে এই ইউসুফ তো সেই ইউসুফ না।
সেকালে বনী ইস্রাঈলের লোকজন নবীদের নামে নিজেদের নাম রাখত। মাতা মেরী বা মরিয়মের স্বামীর নাম নবী ইউসুফের নামানুসারে রাখা হয়েছে ... ইত্যাদি ইত্যাদি। [নাস্তিক-মুক্তমনারাও কোনকালে এ নিয়ে প্রশ্ন তুলবে না।]
এ কথা বলা ছাড়া আসলে তাদের আর কোন উপায় নেই।

খ্রিষ্টান প্রচারক ও নাস্তিক-মুক্তমনাদের তাই বলি— দ্বিমুখী নীতি পরিহার করুন।
সেই সাথে মুসলিমদেরও উচিত এ ব্যাপারে সচেতন হওয়া এবং এমন প্রশ্নের সম্মুখিন হলে দাঁতভাঙা জবাব দেওয়া। যিনি আসমান ও জমীনের প্রভু, তিনি মানবজাতির শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুর ব্যাপারেই সম্যক অবহিত। তাঁর কিতাবে অবশ্যই কোন ঐতিহাসিক ভুল থাকতে পারে না। যে কোন ভুল থেকে মহান আল্লাহ তা'আলা ঊর্ধ্বে।

"তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান।"[9]

---

[4] তিরমিযী, অধ্যায় ৪৭(কুরআন তাফসির অধ্যায়), হাদিস ৩১৫৫; সহীহ(দারুস সালাম); সহীহ মুসলিমেও অনুরূপ হাদিস বর্ণিত আছে

[5] আল কুরআনে মরিয়মের(আ.) কোন স্বামীর কথা বলা নেই

[6] বাইবেল, মথি(Matthew) ১:১৬ ও লুক(Luke) ২:৫ দ্রষ্টব্য

[7] বাইবেল, মথি ১:১৫-১৬ দ্রষ্টব্য

[8] বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis) ৩৭:২; ১ বংশাবলী(1 Chronicles) ২:২ দ্রষ্টব্য

[9] আল কুরআন, আস-সাফফাত ৩৭:১৫৯

৮

নাস্তিকতার বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই ২ - "কিন্তু তোমার ধর্ম তো উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া"

-আসিফ আদনান

নাস্তিক ও সংশয়বাদীদের আরেকটি বহুল ব্যবহৃত যুক্তি হল উত্তরাধিকারসূত্রে ধর্মবিশ্বাস লাভ করার "যুক্তি"। "যুক্তিটা" অনেকটা এরকম –

.

"ধর্ম তো জন্মসূত্রে পাওয়া। হিন্দুর ঘরে জন্মে আজ যে হিন্দু পূজা পালন করে, সে যদি খ্রিষ্টানের ঘরে জন্ম নিত তাহলে ক্রিসমাস পালন করতো। মুসলিমের ঘরে জন্মালে এই একই লোক নামায পড়তো। ব্যক্তির জন্মই তার ধর্মবিশ্বাসকে নির্ধারিত করে দেয়। সবাই নিজ নিজ ধর্মকেই ঠিক মনে করে..."

.

মূলত এটাই হল এই "যুক্তির" ভাষ্য। এইটুকু বলার পর নাস্তিকরা তাদের ধরাবাঁধা মুখস্থ কথায় চলে যায়। সব ধর্মই মিথ্যা। স্রষ্টা বলে আসলে কিছু নেই। বিশ্বাসীরা আসলে বোকা। কাল্পনিক বিশ্বাস নিয়ে থাকে...ইত্যাদি।

.

ডকিন্স, ক্রাউস, হ্যারিস থেকে শুরু করে আরজ আলি মাতুব্বর এবং ফেইসবুকের বিভিন্ন পোস্টে এলেমেলো কমেন্ট করে নিজের প্রতিভার প্রমান রাখতে চাওয়া উঠতি নাস্তিক – সবাই বিভিন্ন ভাবে এই "যুক্তিটি" ব্যবহার করে।

.

নাস্তিকদের অন্যান্য "যুক্তি"গুলোর মতো এই "যুক্তিটিরও" লক্ষ্য হল একাধিক অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে একত্রিত করে ইচ্ছেমতো একটা উপসংহার দাঁড় করানো এবং নাস্তিকদের অন্যান্য "যুক্তির" মতো এই যুক্তিও কোন কিছুকে সঠিক বা ভুল বলে প্রমান করে না।

.

যদি আমরা ধাপে ধাপে বিষয়টা নিয়ে চিন্তা করি তাহলে এক্ষেত্রে নাস্তিকদের বক্তব্য হল নিম্নরূপঃ

.

১) আপনি ধর্মে বিশ্বাস করেন
২) আপনার এই বিশ্বাস উত্তরাধিকারসূত্রে (বা পরিবার থেকে পাওয়া) পাওয়া
৩) অতএব আপনার ধর্মবিশ্বাস ভুল

.

কিন্তু যদি আপনি আসলে যুক্তির অনুসরণ করেন তাহলে দেখবেন ২ থেকে কোনভাবেই কিন্তু ৩ নং ধাপে পৌছানো যায় না। যেমন উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সবকিছুই কি ভুল? পরিবার থেকে আমরা দুইয়ের নামতা বা বর্ণমালা শিখি - এগুলো কি ভুল?

.

হতে পারে পরিবার থেকে আমরা যা কিছু শিখি তার কিছু কিছু ভুল। হতে পারে যে পরিবার থেকে আমরা যা কিছু শিখি তার অধিকাংশই ভুল। কিন্তু পরিবার থেকে আমরা যা কিছুই শিখি তার সবই আবশ্যকভাবে (necessarily) ভুল - এমন কি বলা যায়?

.

অবশ্যই না।

.

কোন বিশ্বাস একজন মানুষ ঠিক কোন উৎস (source) থেকে অর্জন করছে তা কি সেই বিশ্বাসের সঠিক বা ভুল হওয়াকে নির্ধারন করে দেয়? অর্থাৎ আমি একটা বিশ্বাস কিভাবে অর্জন করেছি তার সাথে আমার বিশ্বাস সঠিক বা ভুল হবার সম্পর্ক কি? আমার বিশ্বাস এর উৎস আর আমার আমার বিশ্বাসের সঠিক বা ভুল হওয়া – এদুটি দুটো আলাদা বিষয়।

.

ধরুন ঢাকার কোন এক বস্তির কোন এক খুপরি ঘরে কোন এক মা তার ৭ বছর বয়েসই বাচ্চাকে বলছেন – জানো পৃথিবিতে এমন কিছু জায়গা আছে যেখানে শীতকালে আকাশ থেকে দানা দানা তুষার পড়ে?

.

ধরে নিন বস্তিনিবাসী এই মায়ের সন্তান তার মায়ের এই কথাটি বিশ্বাস করে নিল। এবং সারাজীবনে একবারও চোখের সামনে তুষারপাত না দেখলেও সে এই কথাকে সারাজীবন সত্য বলে বিশ্বাস করলো।

.

এ থেকে কি প্রমাণিত হয় তার এই বিশ্বাস ভুল, যেহেতু সে পরিবার থেকে এই বিশ্বাস পেয়েছে? পৃথিবীর কোন কোন জায়গায় তুষারপাত হয় – এই বিষয়টির সঠিক হওয়া বা না হওয়ার সাথে কি আদৌ কোন উৎস থেকে বিশ্বাসটা আসছে তার কোন সম্পর্কে আছে?

.

আচ্ছা, যদি যুবক বয়সে পরিবার থেকে পাওয়া এই বিশ্বাসকে এই ছেলেটা অস্বীকার করে – কারন এটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বিশ্বাস – তাহলে কি পৃথিবিতে তুষারপাত বন্ধ হয়ে যাবে?

.

ইন ফ্যাক্ট কোন কিছু কি আপনি যৌক্তিক কারনে বিশ্বাস করেন নাকি অন্ধভাবে বিশ্বাস করে সেটা দিয়েও কিন্তু সেই বিশ্বাসের সত্য বা মিথ্যা হওয়াকে প্রমান করা যায় না। যদি কোন সত্যকে আমি অন্ধভাবে বিশ্বাস করি তাহলে কি সেই সত্য মিথ্যা হয়ে যাবে?

.

ধরুন একজন জন্মান্ধ ব্যক্তিকে বলা হল - গাছের পাতা সবুজ। যদি লোকটি এই কথাটি বিশ্বাস করে তাহলে আক্ষরিক ভাবেই তার বিশ্বাস একটি অন্ধ বিশ্বাস। কিন্তু তার মানে কি এই বিশ্বাস ভুল? লোকটি অন্ধভাবে বিশ্বাস করছে তাই বলে কি গাছের পাতা সবুজ এটা মিথ্যা হয়ে যাবে?

.

কোনো একজন মানুষ কোন উৎস থেকে একটি বিশ্বাস পাচ্ছে এ থেকে সর্বোচ্চ ঐ ব্যক্তির বিশ্বাসের ধরন সম্পর্কে কোন মন্তব্য করা যেতে পারে। কিন্তু ঐ বিশ্বাসের ঠিক হওয়া বা না হওয়ার সাথে কোন উৎস থেকে বিশ্বাসটা আসছে তার কোন সম্পর্ক নেই। এ সবকিছুই উক্ত ব্যক্তির বিশ্বাসের ধরনের সাথে সম্পর্কিত কিন্তু কোন কিছুই ঐ বিশ্বাসের সঠিক হওয়া বা না হওয়ার পক্ষে বা বিপক্ষে প্রমাণ না।

.

নাস্তিকরা ঠিক এই জিনিসটাই দাবি করছেন। তাদের এই যুক্তিকে যদি স্পেসিফিক থেকে জেনারেল ফর্মে আনা হয় তাহলে আমরা পাইঃ

.

১) একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করে “ক” - এর অস্তিত্ব আছে
২) এই বিশ্বাস সে পেয়েছে উৎস “খ” থেকে
৩) তার মানে “ক” এর অস্তিত্ব নেই

.

যদি আমরা ৩-কে সত্য প্রমাণ করতে চাই তাহলে আমাদের হয় "ক" এর অনস্তিত্বকে প্রমান করতে হবে, অথবা "ক" এর অস্তিত্বের বিরুদ্ধে কোন প্রমাণ আনতে হবে। কিন্তু যৌক্তিকভাবে ২নং ধাপ থেকে ৩নং ধাপে যাবার কোন পথ নেই।

.

এক্ষেত্রে দুটি অপ্রাসঙ্গিক বিষয়কে – কোনো বিশ্বাস বা দাবির উৎস (origin or source of belief/claim) এবং বিশ্বাসের সঠিক হওয়া (whether the belief/claim is true or false) – একত্রিত করা হচ্ছে। এটি একটি বহুল ব্যবহৃত লজিকাল ফ্যালাসি এবং এটা এতোটাই বহুল ব্যবহৃত যে এই ধরনের ফ্যালাসির আলাদা একটা নাম আছে – Fallacy of origins.

.

কিভাবে একজন মানুষ "স্রষ্টা নেই" – এই দাবি প্রমান করার জন্য এই যুক্তি ব্যবহার করতে পারে তা ঠিক বোধগম্য না। কিভাবে একজন মানুষ – "তোমার ধর্ম ভুল, কারন তুমি পরিবার থেকে তোমার ধর্মবিশ্বাস পেয়েছো" – এই যুক্তি সুস্থ মস্তিস্কে বিশ্বাস করতে পারে এটাও ঠিক বোধগম্য না। সম্ভবত নাস্তিকরা এই কথার মাধ্যমে নিজেদেরকে "স্পেশাল" প্রমান করতে চান।

.

"দেখো সবাই পরিবারের বিশ্বাস গ্রহন করেছে, কিন্তু আমি পরিবারের বিশ্বাস ত্যাগ করেছি" – এই জাতীয় কিছু ভেবে হয়তো তারা নিজেদের বিশেষায়িত মনে করতে চান। কিন্তু বাস্তবতা হল, ঠিক যেইভাবে পরিবার থেকে পাওয়ার কারনে কোন বিশ্বাস মিথ্যা হয়ে যায় না, ঠিক তেমনিভাবে পরিবারের বিশ্বাস ত্যাগ করার মানেই অটোম্যাটিকালি সত্যকে খুঁজে পাওয়া না।

.

পরিবার থেকে পাওয়া বিশ্বাস বা তথ্য ভুলও হতে পারে ঠিকও হতে পারে। কিন্তু নিছক পরিবার থেকে পাওয়া – এটাই কোন কিছুর ভুল বা সঠিক হবার ব্যাপারে প্রমান না। নাস্তিকরা যদি বলতে চায় স্রষ্টা নেই – তাহলে তাদের এ বিষয়ে প্রমাণ উপস্থাপন করতে হবে। কেউ কোন কিছু কেন বিশ্বাস করে, কিভাবে বিশ্বাস করে, কিভাবে সে এই বিশ্বাস অর্জন করলো - স্রষ্টার অনস্তিত্ব প্রমাণ করার ক্ষেত্রে এগুলো অপ্রাসঙ্গিক।

.

একইভাবে যদি নাস্তিকরা দাবি করে অমুক ধর্ম ভুল তাহলে তাদেরকে সেই দাবির পক্ষে প্রমাণ আনতে হবে। কিন্তু নাস্তিকরা যুক্তির কথা খুব করে বললেও, যুক্তি-যুক্তি খেলতে চাইলেও সত্যিকার ভাবে যুক্তির ব্যবহার তারা করতে পারে না। আর তারা ধর্ম বিশ্বাসের ব্যাপারে বারবার প্রমাণের কথা বললেও নিজেদের দাবির পক্ষে বলা চলে কখনোই প্রমাণ উপস্থাপন করে না। গত প্রায় এক শতাব্দীতে নাস্তিকতায় বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এসেছে, কিন্তু এই বৈশিষ্ট্যটি অপরিবর্তিত আছে। নাস্তিকরা তাদের দাবির পক্ষ কোন যুক্তি পেশ করে না, কিন্তু নিজেদের দাবিকে ("স্রষ্টা নেই") যৌক্তিক বলে দাবি করে।

.

তারা বিশ্বাসের সমালোচনায় বারবার অন্ধবিশ্বাসের কথা আনে কিন্তু তারা নিজেরাই অন্ধভাবে একটি অপ্রমাণিত, অবৈজ্ঞানিক এবং অযৌক্তিক বিশ্বাস লালন করে। আর সবচেয়ে বিচিত্র ব্যাপার হল যুক্তি-প্রমাণ-বিজ্ঞানের স্তুতি গাওয়া এই নাস্তিকদের তথাকথিত "যুক্তি"গুলো হতাশাজনক রকমের শিশুসুলভ এবং মোটা দাগের বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই ছাড়া কিছুই না। নাস্তিকদের সমস্ত আর্গুমেন্ট তৈরি করা মানুষের মধ্যে সংশয় তৈরি করা, মানুষকে ভ্যাবাচ্যাকা খাইয়ে দেওয়া, মানুষের মধ্যে আবেগময় প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির জন্য – কিন্তু নিজ অবস্থানের সমর্থনে কোন নিরেট যৌক্তিক বা সায়েন্টিফিক আলোচনা তাদের কথায় নেই। আশ্চর্যজনক বিষয় হল এই জোড়াতালি দেওয়া কুযুক্তি উপস্থাপন করে তারা নিজেদের "বুদ্ধিমত্তার শিখরে আরোহনকারী" জাতীয় কিছু মনে করে এবং অবলীলায় সবাইকে আক্রমণ করে যায়। আবার এরাই মানুষকে মানবতার কথা শেখাতে চায়।

.

তাই বারবার ভাঙ্গা টেপের মতো এই লজিকাল ফ্যালাসিটা রিপিট করে যাওয়া বাঙ্গালী "মুক্তমনা", নাস্তিক, ইসলামবিদ্বেষী, "সুশীল"-দের জন্য আমার একটা পাল্টা প্রশ্ন আছে।

.

আমরা জানি ৭১ সালের যুদ্ধে দুটো পক্ষ ছিল। (যদিও অনেকে বলে পক্ষ ছিল ৩টি কিন্তু আমরা আপাতত দুটিই ধরে নেই)

.

এই দুটো পক্ষের মধ্যে কোন পক্ষটি সঠিক ছিল?

প্রায় নিশ্চিতভাবেই জবাব আসবে – বাঙ্গালীরা সঠিক অবস্থানে ছিল।

কিন্তু একই প্রশ্ন যদি কোন পাঞ্জাবী বা পাকিস্তানীকে করা হয় তবে সে জবাব দেবে – “পাঞ্জাবীরা সঠিক অবস্থানে ছিল। বাঙ্গালীরা গাদ্দার ছিল।”

.

আমরা বাঙ্গালী হবার কারনে আমরা বিশ্বাস করছি ৭১ এর যুদ্ধে বাঙ্গালীরাই সঠিক অবস্থানে ছিল। যদি আমরা পাঞ্জাবী হতাম তাহলে আমরাই বলতাম - বাঙ্গালীরা গাদ্দার, পাঞ্জাবী আর্মিও সঠিক অবস্থানে ছিল।

.

৭১ এর যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের অবস্থান বাঙ্গালী হিসেবে জাতীয়তা সূত্রে পাওয়া একটি বিশ্বাস।

.

এখন প্রশ্ন হল, মুসলিম পরিবারের জন্মগ্রহন করে কেউ মুসলিম হওয়ার কারনে যদি ইসলাম ধর্ম ভুল হয়, তাহলে নিশ্চয় এটাও বলা যায় যে জাতীয়তার কারনে ৭১ এর ব্যাপারে বাঙ্গালী হিসেবে আমরা যে উপসংহার দিচ্ছি তাও ভুল? অর্থাৎ বাঙ্গালী হবার কারনে বাঙ্গালীদের অবস্থান সঠিক ছিল বলে আমরা যে মত দিচ্ছি সেটাও ভুল?

.

একইভাবে পাঞ্জাবী হবার কারনে পাঞ্জাবীদের অবস্থান সঠিক ছিল বলে পাঞ্জাবীরা যে উত্তর দেবে সেটাও ভুল। সুতরাং এই যুদ্ধে আসলে কোন পক্ষই সঠিক ছিল না। দুই পক্ষই ভুল ছিল। পাকিস্তানি আর্মি যদি যুদ্ধে অংশগ্রহন করে মানবতাবিরোধী অপরাধ করে তাহলে বাঙ্গালীরাও যুদ্ধে অংশগ্রহন করে অপরাধ করেছে।

.

এই উপসংহার কি কোন “মুক্তমনা”, “সুশীল”, নাস্তিক মেনে নেবে?

৯

বুদ্ধিমান সত্তাঃ সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বের প্রমাণ!

-মুহাম্মাদ তোয়াহা আকবর

গোবরনামাঃ

.

১০০ বছর আগের একটা ফটো সামনে তুলে ধরা হলো। গোবরের ফটো বলে মনে হচ্ছে। দূরে আউট অফ ফোকাসে একটা গোয়াল ঘর, এবং অনেকগুলো গরুও দেখা যাচ্ছে। তাতেই অবশ্য প্রমাণিত হয়ে যায় না যে এটা গোবরের ফটো। যেহেতু এটা অতীতের ঘটনা, এবং ঘটনাটা ঘটার সময়ে আমি সেখানে ছিলাম না, সেহেতু আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না যে এটা "গোবর"। এক্ষেত্রে এখন যে উপাত্তগুলো (Data) আমার কাছে আছে তার উপর ভিত্তি করেই আমাকে অতীতের সেই ঘটনার ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে হবে।

.

আমার সারাজীবনের (২৫ বছরের) পর্যবেক্ষণ থেকে যে পরিমাণ উপাত্ত আমার মাথায় জড়ো হয়েছে, তা থেকে আমি বুঝতে পারছি যে এটা হাঁস কিংবা বিড়ালের বিষ্ঠা হতেই পারে না। হাতির হওয়াও সম্ভব না। এটা ম্যাচ বাক্স, কম্পিউটার, মানুষ কিংবা টর্চ লাইটের ছবিও না আমি নিশ্চিত। কারণ, এতোদিনের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতার সাথে মিলছে না। তবে হ্যাঁ, ষাঁড়ের হতে পারে। আবার দূরে যেহেতু গোয়াল ঘর আর গরু দেখা যাচ্ছে তাহলে ওই গরুগুলোরও হতে পারে। তবে রঙ, আকার-আকৃতি দেখে এইটুকু নিশ্চিত যে এটা গরু জাতীয় কোন অসভ্য প্রাণীরই কুকর্ম!

.

এই সিদ্ধান্তে আসতে আমার অতীতে উপস্থিত থাকতে হয়নি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঘটনাটা পর্যবেক্ষণও করতে হয়নি। ঘটনাটা যেহেতু অতীতের, ফলে আমি নিজে এক্সপেরিমেন্ট এবং পর্যবেক্ষণ করিনি, এবং তা সম্ভবও নয়। শুধুমাত্র উপাত্ত এবং অভিজ্ঞতার উপরে ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে আসার এই সায়েন্সটাকে বলা হয় Historical Science, আমি যার বাংলা করেছি "ইতিহাসের বিজ্ঞান"। এই বিজ্ঞানে শুধু Effect (গোবর) দেখেই তার পেছনের আসল Cause টা (গরু জাতীয় প্রাণী) কী ছিলো সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্তে চলে আসা যায়।

.

এটাই নিয়ম।

.

আপনার তিনটা ঘটনাঃ

.

১ম ঘটনাঃ

.

আপনার ফোনে লাস্ট যে মেসেজটা এসেছিলো সেটা পড়ে কি মনে হয়েছিলো? মেসেজটাতো পড়ে বুঝতে পেরেছিলেন, নাকি? এটাতো নিশ্চিত যে মেসেজটা আপনাকে এমন একজন পাঠিয়েছে যে পড়তে এবং লিখতে জানে। জানে কিভাবে মেসেজ পাঠাতে হয়। পুরো প্রক্রিয়াটার পেছনে একটা বুদ্ধিমান সত্ত্বার অস্তিত্ব রয়েছে এই ব্যাপারে নিশ্চয়ই আপনার কোন সন্দেহ নেই! আপনি বুদ্ধিমান হলে সন্দেহ থাকার কথা না আর কি! হেহেহেঃ

.

অথচ মেসেজটা একটা ইঁদুর লিখেছে কিনা আপনি তা দেখেন নি। আপনি সেখানে ছিলেন না। পর্যবেক্ষণও করেননি। তবুও

আপনি নিশ্চিত এটার (effect) পেছনে কোন বুদ্ধিমত্তাকে (cause) থাকতেই হবে।

.

এবার দ্বিতীয়ঃ

.

আমি যদি কাঁদতে কাঁদতে চিৎকার করতে করতে গলা ফাটিয়ে দিনরাত বলতে থাকি-

.

“Angry Birds” গেইমসটার পেছনে কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বার হাত নেই, সময়ের সাথে সাথে প্রকৃতিতে এলোমেলোভাবে (random) নিজে নিজেই এটা তৈরী হয়ে গেছে। শুধু তাই না, যে এন্ড্রয়েড ফোনে গেইমসটা চলছে সেটা স্যামসাং কোম্পানী বানায়নি। বরং সেটাও প্রকৃতিতে মিলিয়ন মিলিয়ন বছর থাকার ফলে তৈরী হয়ে গেছে। এমনকি এর গায়ে খোদাই করা স্যামসাং কথাটাও এইভাবেই এসেছে।

.

আমি আপনাকে হাজার যুক্তি দিয়ে বুঝালেও আপনি এটা মেনে নেবেন না। আমাকে পাগল ভাববেন, ঠিক? কারণ, আপনি জানেন সামান্য স্যামসাং শব্দটাও ফোনের গায়ে খোদাই হয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। মিলিয়ন মিলিয়ন বছরেও না। অসম্ভব। এন্ড্রয়েড ফোন নিজে নিজে তৈরী হয়ে যাওয়াতো অনেক অনেক দূরের কথা।

.

আর গেইমসটার পেছনে যে হাজার হাজার লাইনের প্রোগ্রামিং কোড লেখা হয়েছে প্রোগ্রামিং এর ভাষা দিয়ে, এবং সেটা যে অন্ততপক্ষে একজন দক্ষ বুদ্ধিমান প্রোগ্রামার ছাড়া হওয়া কোনদিনও সম্ভব না, এটা আপনি ভালোভাবেই জানেন। আমি যতই আউল ফাউল যুক্তি দিই, প্রোবাবিলিটির অংক কষে আপনাকে দেখাই, আপনি যে টলবেন না সেটা আমি নিশ্চিত।

.

অথচ ফোন কিংবা গেইমসটা প্রস্তুত হয়েছে অনেক আগে। অতীতে। আপনি দেখেননি এটা কিভাবে প্রস্তুত হয়েছে। তবুও আপনি অভিজ্ঞতা থেকে নিশ্চিত জানেন এই ফোন আর গেইমসের (effect) পেছনে অনেকগুলো বুদ্ধিমত্তার পরিশ্রম (cause) জড়িত।

.

৩ নং গল্পঃ

.

আমার বিড়ালটাকে কী-বোর্ডের উপরে ছেড়ে দেয়ায় সে তার উপর কিছুক্ষণ এলোমেলো দৌড়ালো। খটাখট করে অনেক কিছু টাইপ হয়ে গেলো খুলে রাখা মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের ফাইলটাতে। বিড়ালটাকে নামিয়ে ফাইলটাকে “Random” নামে সেইভ করলাম। এবার আমি বিড়াল নিয়ে একটা রচনা লিখলাম টাইপ করে। ফাইলটাকে “Essay” নামে সেইভ করলাম। দুইটা ফাইলেরই সাইজ হলো 50 KB.

.

এরপর আপনাকে ঘাড় ধরে এনে আমার কম্পিউটারের সামনে বসিয়ে ফাইল দুটো দেখিয়ে, মাথায় পিস্তল ঠেকিয়ে বললাম, “ঠিক করে বল ব্যাটা, কোন ফাইলটা আমি টাইপ করেছি? এখানে একটা আমার টাইপ করা, আরেকটা আমার বিড়ালের।”

.

কাঁপা কাঁপা হাতে ফাইল দুটো ওপেন করেই আপনি বুঝে যাবেন “Essay” ফাইলটা আমার টাইপ করা। কেনো? কারণ, আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে প্রতিটা অক্ষর সাজিয়ে অর্থপূর্ণ শব্দ লেখা হয়েছে। শব্দগুলোকে সাজিয়ে বাক্য সাজানো হয়েছে। বাক্যগুলো এমনভাবে বিন্যস্ত যে সেগুলো এক একটা অর্থবোধক অনুচ্ছেদ তৈরী করেছে। সবগুলো অনুচ্ছেদ মিলে একটা রচনা তৈরী করেছে। এটা কোনভাবেই আমার বিড়ালের পক্ষে করা সম্ভব না। এরকম সাজানো গুছানো রচনার নিশ্চয়ই কোন বুদ্ধিমত্তার হাত রয়েছে। যেহেতু এখানে অপশান মাত্র দুইটাঃ আমি আর আমার বিড়াল, সেহেতু এটা নিশ্চিত যে রচনাটা আমারই লেখা।

.

ঠিক?

.

টাইপ হওয়ার সময় আপনি সেখানে ছিলেন না। ঘটনাটা অতীতে ঘটেছে। পর্যবেক্ষণ না করেও "Essay" ফাইলটার (effect) পেছনে যে বিড়ালটার জায়গায় আমার অবস্থানই (cause) বেশি যুক্তিযুক্ত, এটা আপন কিভাবে জানেন? আপনার এতোদিনের পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা থেকে।

.

বেশতো তিনটা ঘটনা একটানা পড়ে ফেললেন। এবার একটা সিদ্ধান্তে আসা যাক। কি বলেন?

.

সিদ্ধান্তঃ

.

মেসেজ, গেইমস, কিংবা ফাইলটাতে আসলে কি ছিলো?

ছিলো Information।

.

ইনফর্মেশান বা তথ্য আছে কিভাবে বুঝলাম? বুঝলাম কারণ, প্রত্যেক ক্ষেত্রেই প্রতিটা ঘটনাই অর্থপূর্ণ উপাত্ত এবং জ্ঞান বহন করছিলো। তথ্য বহন করছিলো। এবং আমাদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা সবসময়েই জানি যেকোন অর্থপূর্ণ ইনফরমেশান বা তথ্যের পেছনে বুদ্ধিমত্তার উপস্থিতি থাকতেই হবে।

.

উপরের অংশটুকু Science। এই সায়েন্স আমার লাইফে সরাসরি প্রভাব ফেলতে পারে যদি আমরা ভাবি, এবং এর পেছনের দর্শনটুকু উপলব্ধি করতে পারি।

.

একটু বিজ্ঞান আর পেছনের দর্শনঃ

.

যদি আমরা নিজেদের দিকে, নিজেদের চারপাশের জগতের দিকে তাকাই, ভাবি, তাহলে আমরা অবাক হয়ে যাবো। আমরা জানি যে, প্রতিটা প্রাণীর একদম গাঠনিক একক হচ্ছে কোষ। সেই কোষের নিউক্লিয়াসের ভেতরে থাকা DNA তে A, T, G, C নামের চারটা অক্ষর দিয়ে সাজানো আমাদের পুরো শরীর কেমন হবে তার ব্যাপারে তথ্য। আজিব না?

.

এই ডি এন এ তেই লেখা আছে আমার নাক কেমন হবে, কান কেমন হবে, চোখের রঙ কেমন হবে, চুল কি কোঁকড়ানো হবে, নাকি সোজা! এই যে আমার এতো জটিল মস্তিস্ক থেকে শুরু করে জটিল হৃদপিন্ড, চোখ, ফুসফুস, কিডনী এসব কিন্তু যাত্রা শুরু করেছে আমার আব্বু আর আম্মুর দুইটা ছোট্ট কোষের fertilization থেকে। এই কোষগুলোতে ছিলো ডি এন এ, যাতে লেখা Genetic Code অনুযায়ী পরবর্তীতে টিস্যু এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো তৈরী হয়েছে। সেই অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলো একত্রিত হয়ে এক একটা সিস্টেম তৈরী করেছে (যেমন নার্ভাস সিস্টেম, ডাইজেস্টিভ সিস্টেম, ইউরিনারী সিস্টেম ইত্যাদি)। সবগুলো সিস্টেম আবার একসাথে কাজ করার ফলেই তৈরী হয়েছে আমার পুরো শরীর। যে শরীরটা ব্যবহার করে আমি এখন লিখছি, আর আপনি পড়ছেন।

.

এই যে ডি এন এ তে Genetic Code লেখা আছে, যেটা আমার শরীরের গঠন কেমন হবে না হবে তার পুরোটাই ঠিক করে দিচ্ছে এটা কি প্রথম কোষটাতে এমনি এমনি চলে এসেছে? অর্থবোধক একটা মেসেজ, একটা প্রোগ্রামিং কোড এবং একটা

গোছানো রচনা নিজে নিজে আসতে পারে না এটা আপনি জানেন। ডি এন এ কিন্তু প্রোগ্রামিং কোডের মতোই Genetic Code বহন করে। বহন করে অর্থপূর্ণ মেসেজ, যে মেসেজ বলে দেয় একটা শরীর কিভাবে রচিত হবে।

.

একটা প্রাণীর শরীর তো অনেক অনেক জটিল ব্যাপার। সেটার কথা বাদ দিয়ে যদি তার ভেতরে থাকা ডি এন এর ভাষা, সজ্জা এবং অর্থবহতার দিকে তাকাই তাহলে এই ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ থাকে না যে এর পেছনে একজন বুদ্ধিমান সত্ত্বা (Intelligence) রয়েছেন।

.

সেই বুদ্ধিমান সত্ত্বা কিন্তু নিজেকে সবকিছুর স্রষ্টা দাবী করে আরো একটা মেসেজ পাঠিয়েছেন আমাদের ম্যানুয়াল হিসেবে। চলার পথ হিসেবে। জীবনকে যাপনের সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে। সেই পদ্ধতি যে শুধু থিওরিটিক্যাল না, প্র্যাকটিক্যালও, সেটারও প্রমাণ দিয়েছেন তাঁর বার্তাবাহকের ﷺ মাধ্যমে।

.

আচ্ছা, এবার নিজেকে একটা প্রশ্ন করি।

.

আমরা সেই মেসেজ অনুযায়ী পুরো জীবনটাকে যাপন করছিতো?

১০

‘কুরআন কি মুহাম্মাদ (ﷺ) -এর বানানো গ্রন্থ?’

-আরিফ আজাদ

বিরাট আলিশান একটি বাড়ি। মোঘল আমলের সম্রাটেরা যেরকম বাড়ি বানাতো, অনেকটাই সেরকম। বাড়ির সামনে দৃষ্টিনন্দন একটি ফুলের বাগান। ফুলের বাগানের মাঝে ছোট ছোট কৃত্রিম ঝর্ণা আছে। এই বাড়ির মালিকের রুচিবোধের প্রশংসা করতেই হয়। ঝঞ্ঝাট ঢাকা শহরের মধ্যে এটি যেন এক টুকরো স্বর্গখন্ড।

.

কিন্তু অবাক করা ব্যাপার হলো, বাগানের কোথাও লাল রঙের কোন ফুল নেই।এতবড় বাগানবাড়ি, অথচ, কোথাও একটি গোলাপের চারা পর্যন্ত নেই। বিস্ময়ের ব্যাপার তো বটেই।

–

আমরা এসেছি সাজিদের এক দূর সম্পর্কের খালুর বাসায়। ঢাকা শহরে বড় বড় ব্যবসা আছে।বিদেশেও নিজের ব্যবসা-বাণিজ্যের শাখা-প্রশাখা ছড়িয়েছেন। ছেলে-মেয়েদের কেউ লন্ডন, কেউ কানাডা আর কেউ সুইজারল্যান্ড থাকে। ভদ্রলোক উনার স্ত্রীকে নিয়ে ঢাকাতেই রয়ে গেছেন কেবল শিকড়ের টানে।

.

তবে, ঢাকায় নিজের বাড়িখানাকে যেভাবে তৈরি করেছেন, বোঝার উপায় নেই যে এটি ঢাকার কোন বাড়ি নাকি মস্কোর কোন ভি আই পি ভবন।

আমাকে এদিক-সেদিক তাকাতে দেখে সাজিদ প্রশ্ন করলো,- ‘এভাবে চোরের মতো এদিক-ওদিক তাকাচ্ছিস কেনো?’

.

আমি ভ্যাবাচেকা খাওয়ার মতো করে বললাম,- ‘না, আসলে তোর খালুকে নিয়ে ভাবছি।’

– ‘উনাকে নিয়ে ভাবার কি আছে?’

আমি বললাম,- ‘অসুস্থ মানুষদের নিয়ে ভাবতে হয়।এটাও একপ্রকার মানবতা, বুঝলি?’

সাজিদ আমার দিকে বড় বড় চোখ করে তাকিয়ে বললো,- ‘অসুস্থ মানে? কে অসুস্থ?’

– ‘তোর খালু।’

– ‘তোকে কে বললো উনি অসুস্থ?’

আমি দাঁড়ালাম। বললাম,- ‘তুই এতকিছু খেয়াল করিস, এটা করিস নি?’

– ‘কোনটা?

– ‘তোর খালুর বাগানের কোথাও কিন্তু লাল রঙের কোন ফুলগাছ নেই। প্রায় সব রঙের ফুলগাছ আছে, লাল ছাড়া।এমনকি, গোলাপের একটি চারাও নেই।’

– ‘তো?’

– ‘তো আর কি? তিনি হয়তো কালার ব্লাইন্ড। স্পেশেফিকলি, রেড কালার ব্লাইন্ড।’

সাজিদ কিছু বললো না। হয়তো সে এটা নিয়ে আর কোন কথা বলতে চাচ্ছে না, অথবা, আমার যুক্তিতে সে হার মেনেছে।

–

সাজিদ কলিংবেল বাজালো।

.

ঘরের দরজা খুলে দিলো একটি তের-চৌদ্দ বছর বয়েসী ছেলে। সম্ভবত কাজের ছেলে। আমরা ভেতরে ঢুকলাম। ছেলেটি বললো,- 'আপনারা এখানে বসুন।আমি কাকাকে ডেকে দিচ্ছি।'

.

ছেলেটা একদম শুদ্ধ বাংলায় কথা বলছে। বাড়ির মালিককে স্যার বা মালিক না বলে কাকা বলছে।সম্ভবত, উনার কোন গরীব আত্মীয়ের ছেলে হবে হয়তো। যাদের খুব বেশি টাকা-পয়সা হয়, তারা গ্রাম থেকে গরিব আত্মীয়দের বাসার কাজের চাকরি দিয়ে দয়া করে।

.

ছেলেটা ভদ্রলোককে ডাকার জন্য সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো।ঘরের ভেতরটা আরো চমৎকার। নানান ধরনের দামি দামি মার্বেল পাথর দিয়ে দেওয়াল সাজানো।

.

দু'তলার কোন এক রুম থেকে রবীন্দ্রনাথের গানের সুর ভেসে আসছে,- 'যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে......'
আমি সাজিদকে বললাম,- 'কি রে, তোর এরকম মোঘলাই ষ্টাইলের একটা খালু আছে, কোনদিন বললি না যে?'

.

সাজিদ রসকষহীন চেহারায় বললো,- 'মোঘলাই ষ্টাইলের খালু তো, তাই বলা হয়নি।'
– 'তোর খালুর নাম কি?'
– 'এম.এম. আলি।'

.

ভদ্রলোকের নামটাও উনার বাড়ির মতোই গাম্ভীর্যপূর্ণ। আমি জিজ্ঞেস করলাম,- 'এম. এম. আলি মানে কি?'

.

সাজিদ আমার দিকে তাকালো। বললো,- 'মোহাম্মদ মহব্বত আলি।'
ভদ্রলোকের বাড়ি আর ঐশ্বর্যের সাথে নামটা একদম যাচ্ছে না। এইজন্যে হয়তো মোহাম্মদ মহব্বত আলি নামটাকে শর্টকাট করে এম.এম. আলি করে নিয়েছেন।

–

.

ভদ্রলোক আমাদের সামনের সোফায় পায়ের উপর পা তুলে বসলেন। মধ্যবয়স্ক। চেহারায় বার্ধক্যের কোন ছাপ নেই। চুল পেকেছে, তবে কলপ করায় তা ভালোমতো বোঝা যাচ্ছে না।

.

তিনি বললেন,- 'তোমাদের মধ্যে সাজিদ কে?'

আমি লোকটার প্রশ্ন শুনে অবাক হলাম খুব। সাজিদের খালু, অথচ সাজিদকে চিনে না। এটা কি রকম কথা?
সাজিদ বললো,- 'জ্বি, আমি।'

– 'হুম, I guessed that'- লোকটা বললো। আরো বললো,- 'তোমার কথা বেশ শুনেছি, তাই তোমার সাথে আলাপ করার ইচ্ছে জাগলো।'
আমাদের কেউ কিছু বললাম না। চুপ করে আছি।

.

লোকটা আবার বললো,- ‘প্রথমে আমার সম্পর্কে দরকারি কিছু কথা বলে নিই। আমার পরিচয় তো তুমি জানোই,সাজিদ। যেটা জানো না, সেটা হলো,- বিশ্ববিদ্যালয় জীবন থেকে আমি একজন অবিশ্বাসী। খাঁটি বাংলায় নাস্তিক। হুমায়ুন আজাদকে তো চেনো, তাই না? আমরা একই ব্যাচের ছিলাম। আমি নাস্তিক হলেও আমার ছেলেমেয়েরা কেউই নাস্তিক নয়।সে যাহোক, এটা নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই।আমি ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী।’

সাজিদ বললো,- ‘খালু, আমি এসব জানি।’

.

লোকটা অবাক হবার ভান করে বললো,- ‘জানো? ভেরি গুড। ক্লেভার বয়।’

– ‘খালু, আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন কেনো তা বলুন।’

– ‘ওয়েট! তাড়াহুড়ো কিসের?’- লোকটা বললো।

এরমধ্যেই কাজের ছেলেটা ট্রে তে করে চা নিয়ে এলো।

আমরা চায়ের কাপে চুমুক দিলাম। লোকটাকে একটি আলাদা কাপে করে চা দেওয়া হলো। সেটা চা নাকি কফি, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

.

লোকটি বললো,- ‘সাজিদ, আমি মনে করি, তোমাদের ধর্মগ্রন্থ, আই মিন আল কোরান, সেটা কোন ঐশী গ্রন্থ নয়। এটা মুহাম্মদের নিজের লেখা একটি বই।মুহাম্মদ করেছে কি, এটাকে জাষ্ট স্রষ্টার বাণী বলে চালিয়ে দিয়েছে।’

.

এইটুকু বলে লোকটা আমাদের দু’জনের দিকে তাকালো। হয়তো বোঝার চেষ্টা করলো আমাদের রিএ্যাকশান কি হয়।

.

আমরা কিছু বলার আগেই লোকটি আবার বললো, – ‘হয়তো বলবে, মুহাম্মদ লিখতে-পড়তে জানতো না। সে কিভাবে এরকম একটি গ্রন্থ লিখবে? ওয়েল! এটি খুবই লেইম লজিক। মুহাম্মদ লিখতে পড়তে না জানলে কি হবে, তার ফলোয়ারদের অনেকে লিখতে-পড়তে পারতো।উচ্চ শিক্ষিত ছিলো। তারা করেছে কাজটা।মুহাম্মদের ইশারায়।’

.

সাজিদ তার কাপে শেষ চুমুক দিলো। তখনও সে চুপচাপ।

লোকটা বললো,- ‘কিছু মনে না করলে আমি একটি সিগারেট ধরাতে পারি? অবশ্য, কাজটি ঠিক হবে না জানি।’

আমি বললাম,- ‘শিওর!’

এতক্ষণ পরে লোকটি আমার দিকে ভালোমতো তাকালো। একটি মুচকি হাসি দিয়ে বললো,- ‘Thank You...’

–

সাজিদ বললো,- ‘খালু, আপনি খুবই লজিক্যাল কথা বলেছেন। কোরান মুহাম্মদ সাঃ এর নিজের বানানো হতেও পারে। কারন, কোরান যে ফেরেস্তা নিয়ে আসতো বলে দাবি করা হয়, সেই জিব্রাঈল আঃ কে মুহাম্মদ সাঃ ছাড়া কেউই কোনদিন দেখেনি।’

লোকটা বলে উঠলো,- ‘এক্সাক্টলি, মাই সান।’

– ‘তাহলে, কোরানকে আমরা টেষ্ট করতে পারি, কি বলেন খালু?’

– ‘হ্যাঁ হ্যাঁ, করা যায়......’

.

সাজিদ বললো,- ‘কোরান মুহাম্মদ সাঃ এর বানানো কি না, তা বুঝতে হলে আমাদের ধরে নিতে হবে যে, মুহাম্মদ সাঃ স্রষ্টার কোন দূত নন। তিনি খুবই সাধারন, অশিক্ষিত একজন প্রাচীন মানুষ।’

.

লোকটা বললো,- ‘সত্যিকার অর্থেই মুহাম্মদ অসাধারণ কোন লোক ছিলো না। স্রষ্টার দূত তো পুরোটাই ভুয়া।’

সাজিদ মুচকি হাসলো। বললো,- 'তাহলে এটাই ধরে নিই?'

.

– 'হুম'- লোকটার সম্মতি।

.

সাজিদ বলতে লাগলো,- 'খালু, ইতিহাস থেকে আমরা জানতে পারি, হজরত ঈউসুফ আঃ এর জন্ম হয়েছিলো বর্তমান ফিলিস্তিনে। ঈউসুফ আঃ ছিলেন হজরত ঈয়াকুব আঃ এর কনিষ্ঠতম পুত্র। ঈয়াকুব আঃ এর কাছে ঈউসুফ আঃ ছিলেন প্রাণাধিক প্রিয়।কিন্তু, ঈয়াকুব আঃ এর এই ভালোবাসা ঈউসুফ আঃ এর জন্য কাল হলো। তার ভাইয়েরা ষড়যন্ত্র করে ঈউসুফ আঃ কে কূপে নিক্ষেপ করে দেয়।

.

এরপর, কিছু বণিকদল কূপ থেকে ঈউসুফ আঃ কে উদ্ধার করে তাকে মিশরে নিয়ে আসে। তিনি মিশরের রাজ পরিবারে বড় হন।ইতিহাস মতে, এটি ঘটে- খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের আমেনহোটেপের রাজত্বকালের আরো তিন'শ বছর পূর্বে। খালু, এই বিষয়ে আপনার কোন দ্বিমত আছে?'

.

লোকটা বললো,- 'নাহ। কিন্তু, এগুলো দিয়ে তুমি কি বোঝাতে চাও?'

.

সাজিদ বললো,- 'খালু, ইতিহাস থেকে আমরা আরো জানতে পারি, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকে চতুর্থ আমেনহোটেপের আগে যেসকল শাসকেরা মিশরকে শাসন করেছে, তাদের সবাইকেই 'রাজা' বলে ডাকা হতো। কিন্তু, খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে চতুর্থ আমেনহোটেপের পরে যেসকল শাসকেরা মিশরকে শাসন করেছিলো, তাদের সবাইকে 'ফেরাউন' বলে ডাকা হতো।

.

ঈউসুফ আঃ মিশরকে শাসন করেছিলেন খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের চতুর্থ আমেনহোটেপের আগে।আর, মূসা আঃ মিশরে জন্মলাভ করেছিলেন চতুর্থ আমেনহোটেপের কমপক্ষে আরো দু'শো বছর পরে।অর্থাৎ, মূসা আঃ যখন মিশরে জন্মগ্রহন করেন, তখন মিশরের শাসকদের আর 'রাজা' বলা হতো না, 'ফেরাউন' বলা হতো।'

– 'হুম, তো?'

– 'কিন্তু খালু, কোরানে ঈউসুফ আঃ এবং মূসা আঃ দুইজনের কথাই আছে। অবাক করা ব্যাপার হচ্ছে, কোরান ঈউসুফ আঃ এর বেলায় শাসকদের ক্ষেত্রে 'রাজা' শব্দ ব্যবহার করলেও, একই দেশের, মূসা আঃ এর সময়কার শাসকদের বেলায় ব্যবহার করেছে 'ফিরাউন' শব্দটি। বলুন তো খালু, মরুভূমির বালুতে উট চরানো বালক মুহাম্মদ সাঃ ইতিহাসের এই পাঠ কোথায় পেলেন? তিনি কিভাবে জানতেন যে, ঈউসুফ আঃ এর সময়ের শাসকদের 'রাজা' বলা হতো, মূসা আঃ সময়কার শাসকদের 'ফেরাউন'? এবং, ঠিক সেই মতো শব্দ ব্যবহার করে তাদের পরিচয় দেওয়া হলো?'

মহব্বত আলি নামের ভদ্রলোকটি হো হো হো করে হাসতে লাগলো। বললো,- 'মূসা আর ঈউসুফের কাহিনী তো বাইবেলেও ছিলো। মুহাম্মদ সেখান থেকে কপি করেছে, সিম্পল।'

.

সাজিদ মুচকি হেসে বললো,- 'খালু, অ্যাস এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট, বাইবেল এই জায়গায় চরম একটি ভুল করেছে। বাইবেল ঈউসুফ আঃ এবং মূসা আঃ দুজনের সময়কার শাসকদের জন্যই 'ফেরাউন' শব্দ ব্যবহার করেছে, যা ঐতিহাসিক ভুল। আপনি চাইলে আমি আপনাকে বাইবেলের ওল্ড টেষ্টামেণ্ট থেকে প্রমান দেখাতে পারি।'

.

লোকটা কিছুই বললো না। চুপ করে আছে। সম্ভবত, উনার প্রমান দরকার হচ্ছে না।

.

সাজিদ বললো,- ‘যে ভুল বাইবেল করেছে, সে ভুল অশিক্ষিত আরবের বালক মুহাম্মদ সাঃ এসে ঠিক করে দিলো, তা কিভাবে সম্ভব, যদি না তিনি কোন প্রেরিত দূত না হোন, আর, কোরান কোন ঐশি গ্রন্থ্ না হয়?’

.

লোকটি চুপ করে আছে। এরমধ্যেই তিনটি সিগারেট খেয়ে শেষ করেছে। নতুন আরেকটি ধরাতে ধরাতে বললো,- ‘হুম, কিছুটা যৌক্তিক।’

.

সাজিদ আবার বলতে লাগলো,-

‘খালু, আর রহমান নামে কোরানে একটি সূরা আছে। এই সূরার ৩৩ নম্বর আয়াতে বলা হচ্ছে,-

‘হে জ্বীন ও মানুষ! তোমরা যদি আসমান ও জমিনের সীমানায় প্রবেশ করতে পারো, তবে করো। যদিও তোমরা তা পারবেনা প্রবল শক্তি ছাড়া’

.

মজার ব্যাপার হলো, এই আয়াতটি মহাকাশ ভ্রমণ নিয়ে। চিন্তা করুন, আজ থেকে ১৪০০ বছর আগের আরবের লোক, যাদের কাছে যানবাহন বলতে কেবল ছিলো উট আর গাধা, ঠিক সেই সময়ে বসে মুহাম্মদ সাঃ মহাকাশ ভ্রমণ নিয়ে কথা বলছে, ভাবা যায়?

.

সে যাহোক, আয়াতটিতে বলা হলো,- ‘যদি পারো আসমান ও জমিনের সীমানায় প্রবেশ করতে, তবে করো’ ,

এটি একটি কন্ডিশনাল (শর্তবাচক) বাক্য। এই বাক্যে শর্ত দেওয়ার জন্য If (যদি) ব্যবহার করা হয়েছে।

.

খালু, আপনি যদি এ্যারাবিক ডিকশনারি দেখেন, তাহলে দেখবেন, আরবিতে ‘যদি’ শব্দের জন্য দুটি শব্দ আছে। একটি হলো ‘লাও’, অন্যটি হলো ‘ইন’। দুটোর অর্থই ‘যদি।’ কিন্তু, এই দুটোর মধ্যে একটি সুক্ষ্ম পার্থক্য আছে। পার্থক্যটি হলো- আরবিতে শর্তবাচক বাক্যে ‘লাও’ তখনই ব্যবহার করা হয়, যখন সেই শর্ত কোনভাবেই পূরণ সম্ভব হবে না। কিন্তু, শর্তবাচক বাক্যে ‘যদি’ শব্দের জন্য যখন ‘ইন’ ব্যবহার করা হয়, তখন নিশ্চয় এই শর্তটা পূরণ সম্ভব।

.

আশ্চর্যজনক ব্যাপার, কোরানে সূরা আর রহমানের ৩৩ নম্বর আয়াতটিতে ‘লাও’ ব্যবহার না করে ‘ইন’ ব্যবহার করা হয়েছে। মানে, কোন একদিন জ্বীন এবং মানুষেরা মহাকাশ ভ্রমণে সফল হবেই।আজকে কি মানুষ মহাকাশ জয় করেনি? মানুষ চাঁদে যায়নি? মঙ্গলে যাচ্ছে না?

.

দেখুন, ১৪০০ বছর আগে যখন মানুষের ধারনা ছিলো একটি ষাঁড় তার দুই শিংয়ের মধ্যে পৃথিবীকে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, ঠিক তখন কোরান ঘোষণা করছে, মহাকাশ ভ্রমণের কথা। সাথে বলেও দিচ্ছে, একদিন তা আমরা পারবো। আরবের নিরক্ষর মুহাম্মদ সাঃ কিভাবে এই কথা বলতে পারে?’

–

এম.এম. আলি ওরফে মোহাম্মদ মহব্বত আলি নামের এই ভদ্রলোকের চেহারা থেকে ‘আমি নাস্তিক, আমি একেবারে নির্ভুল’ টাইপ ভাবটা একেবারে উধাও হয়ে গেলো। এখন তাকে যুদ্ধাহত এক ক্লান্ত সৈনিকের মতোন দেখাচ্ছে।

.

সাজিদ বললো,- ‘খালু, খুব অল্প পরিমাণ বললাম। এরকম আরো শ খানেক যুক্তি দিতে পারবো, যা দিয়ে প্রমান করে দেওয়া যায়, কোরান মুহাম্মদ সাঃ এর নকল করে লেখা কোন কিতাব নয়, এটি স্রষ্টার পক্ষ থেকে আসা একটি ঐশি গ্রন্থ্। যদি বলেন, মুহাম্মদ সাঃ নিজের প্রভাব বিস্তারের জন্য এই কিতাব লিখেছে, আপনাকে বলতে হয়, এই কিতাবের জন্যই মুহাম্মদ সাঃ কে

বরণ করতে হয়েছে অবর্ণনীয় কষ্ট, যন্ত্রণা।

.

এই কিতাবের বাণী প্রচার করতে গিয়েই তিনি স্বদেশ ছাড়া হয়েছিলেন।তাকে বলা হয়েছিলো, তিনি যা প্রচার করছেন তা থেকে বিরত হলে তাকে মক্কার রাজত্ব দেওয়া হবে। তিনি তা গ্রহন করেন নি। খালু, নিজের ভালো তো পাগলও বুঝে। মুহাম্মদ সাঃ বুঝলো না কেনো? এসবই কি প্রমান করেনা কোরানের ঐশি সত্যতা?'

–

লোকটা কোন কথাই বলছেনা। সিগারেটের প্যাকেটে আর কোন সিগারেট নেই।

.

আমরা উঠে দাঁড়ালাম। বের হতে যাবো, অমনি সাজিদ ঘাঁড় ফিরিয়ে লোকটাকে বললো, – 'খালু, একটি ছোট প্রশ্ন ছিলো।'

– 'বলো।'

– 'আপনার বাগানে লাল রঙের কোন ফুল গাছ নেই। কেনো?'

লোকটি বললো,- 'আমি রেড কালার ব্লাইন্ড। লাল রঙ দেখি না।'

সাজিদ আমার দিকে ফিরলো। অবাক দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে বললো,- 'জ্যোতিষী আরিফ আজাদ, ইউ আর কারেক্ট।'

১১

‘সকল প্রশংসা কেনো স্রষ্টার?’

-আরিফ আজাদ

ক্লাশে নতুন একজন স্যার এসেছেন।নাম- মফিজুর রহমান।

.

হ্যাংলা-পাতলা গড়ন।বাতাস আসলেই যেনো ঢলে পড়বে মতন অবস্থা শরীরের।ভদ্রলোকের চেহারার চেয়ে চোখ দুটি অস্বাভাবিক রকম বড়।দেখলেই মনে হয় যেন বড় বড় সাইজের দুটি জলপাই, কেউ খোদাই করে বসিয়ে দিয়েছে।

.

ভদ্রলোক খুবই ভালো মানুষ।উনার সমস্যা একটিই- ক্লাসে উনি যতোটা না বায়োলজি পড়ান, তারচেয়ে বেশি দর্শন চর্চা করেন।ধর্ম কোথা থেকে আসলো, ঠিক কবে থেকে মানুষ ধার্মিক হওয়া শুরু করলো, ‘ধর্ম আদতে কি’ আর, ‘কি নয়’ তার গল্প করেন।

–

আজকে উনার চতুর্থ ক্লাশ। পড়াবেন Analytical techniques & bio-informatics। চতুর্থ সেমিষ্টারে এটা পড়ানো হয়।

স্যার এসে প্রথমে বললেন,- ‘Good morning, guys....’

সবাই সমস্বরে বললো,- ‘Good morning, sir...’

এরপর স্যার জিজ্ঞেস করলেন,- ‘সবাই কেমন আছো? ‘

স্যারের আরো একটি ভালো দিক হলো- উনি ক্লাশে এলে এভাবেই সবার কুশলাদি জিজ্ঞেস করেন।সাধারণত হায়ার লেভেলে যেটা সব শিক্ষক করেন না। তারা রোবটের মতো ক্লাশে আসেন,যন্ত্রের মতো করে লেকচারটা পড়িয়ে বেরিয়ে যান।সেদিক থেকে মফিজুর রহমান নামের এই ভদ্রলোক অনেকটা অন্যরকম।

.

আবারো সবাই সমস্বরে উত্তর দিলো।কিন্তু গোলমাল বাঁধলো এক জায়গায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে কয়েকজন উত্তর দিয়েছে এভাবে- ‘আলহামদুলিল্লাহ ভালো।’

স্যার কপালের ভাঁজ একটু দীর্ঘ করে বললেন,- ‘আলহামদুলিল্লাহ্ ভালো বলেছো কে কে?’

অদ্ভুত প্রশ্ন। সবাই থতমত খেলো।

একটু আগেই বলেছি স্যার একটু অন্যরকম। প্রাইমারি লেভেলের টিচারদের মতো ক্লাশে এসে বিকট চিৎকার করে Good Morning বলেন, সবাই কেমন আছে জানতে চান।এখন ‘আলহামদুলিল্লাহ্’ বলার জন্য কি প্রাইমারি লেভেলের শিক্ষকদের মতো বেত দিয়ে পিটাবেন নাকি?

.

সাজিদের তখন তার প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক বাবুল চন্দ্র দাশের কথা মনে পড়ে গেলো।এই লোকটা ক্লাশে কেউ দুটোর বেশি হাঁচি দিলেই বেত দিয়ে আচ্ছামতন পিটাতেন। উনার কথা হলো- ‘হাঁচির সর্বোচ্চ পরিমাণ হবে দু’টি। দু’টির বেশি হাঁচি দেওয়া মানে ইচ্ছে করেই বেয়াদবি করা।’

.

যাহোক, বাবুল চন্দ্রের পাঠ তো কবেই চুকেছে, এবার এই লোকের হাতেই নাপিটুনি খাওয়া লাগে।

.

ক্লাশের সর্বমোট সাতজন দাঁড়ালো। এরা সবাই 'আলহামদুলিল্লাহ্ ভালো' বলেছে। এরা হচ্ছে- রাকিব, আদনান, জুনায়েদ, সাকিব, মরিয়ম,রিতা এবং সাজিদ।

.

স্যার সবার চেহারাটা একটু ভালোমতো পরখ করে নিলেন। এরপর পিক করে হেসে দিয়ে বললেন,- 'বসো।'

.

সবাই বসলো। আজকে আর মনে হয় এ্যাকাডেমিক পড়াশুনা হবেনা। দর্শনের তাত্বিক আলাপ হবে।

.

ঠিক তাই হলো। মফিজুর রহমান স্যার আদনানকে দাঁড় করালো। বললেন,- 'তুমিও বলেছিলে সেটা, না?'

.

– 'জ্বি স্যার।'- আদনান উত্তর দিলো।

স্যার বললেন,- 'আলহামদুলিল্লাহ্'র অর্থ কি জানো?'

আদনান মনে হয় একটু ভয় পাচ্ছে। সে ঢোঁক গিলতে গিলতে বললো,- 'জ্বি স্যার, আলহামদুলিল্লাহ্ অর্থ হলো- সকল প্রশংসা কেবলি আল্লাহর।'

স্যার বললেন,- ' সকল প্রশংসা কেবলি আল্লাহর।'

স্যার এই বাক্যটি দু'বার উচ্চারণ করলেন।এরপর আদনানের দিকে তাকিয়ে বললেন,- 'বসো।'

আদনান বসলো। এবার স্যার রিতাকে দাঁড় করালেন। স্যার রিতার কাছে জিজ্ঞেস করলেন,- 'আচ্ছা, পৃথিবীতে চুরি-ডাকাতি আছে?'

রিতা বললো,- 'আছে।'

– 'খুন-খারাবি, রাহাজানি, ধর্ষণ?'

— 'জ্বি,আছে।'

– 'কথা দিয়ে কথা না রাখা, মানুষকে ঠকানো,লোভ-লালসা এসব?'

– 'জ্বি, আছে।'

– 'এগুলো কি প্রশংসাযোগ্য?'

– 'না।'

'তাহলে মানুষ একটি ভালো কাজ করার পর তার সব প্রশংসা যদি আল্লাহর হয়, মানুষ যখন চুরি-ডাকাতি করে, লোক ঠকায়, খুন-খারাবি করে,ধর্ষণ করে, তখন সব মন্দের ক্রেডিট আল্লাহকে দেওয়া হয়না কেনো? উনি প্রশংসার ভাগ পাবেন, কিন্তু দূর্নামের ভাগ নিবেন না, তা কেমন হয়ে গেলো না?'

.

রিতা মাথা নিঁচু করে চুপ করে আছে।স্যার বললেন,- 'এখানেই ধর্মের ভেল্কিবাজি। ইশ্বর সব ভালোটা বুঝেন, কিন্তু মন্দটা থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছেন। আদতে, ইশ্বর বলে কেউ নেই।যদি থাকতো, তাহলে তিনি এরকম একচোখা হতেন না। বান্দার ভালো কাজের ক্রেডিটটা নিজে নিয়ে নিবেন, কিন্তু বান্দার মন্দ কাজের বেলায় বলবেন- 'উহু, অইটা থেকে আমি পবিত্র। অইটা তোমার ভাগ।'

.

স্যারের কথা শুনে ক্লাশে যে ক'জন নাস্তিক আছে, তারা হাত তালি দেওয়া শুরু করলো। সাজিদের পাশে যে নাস্তিকটা বসেছে,

সে তো বলেই বসলো,-

.

'মফিজ স্যার হলেন আমাদের বাঙলার প্লেটো।'

স্যার বলেই যাচ্ছেন ধর্ম আর স্রষ্টার অসারতা নিয়ে।

–

এবার সাজিদ দাঁড়ালো। স্যারের কথার মাঝে সে বললো,- 'স্যার, সৃষ্টিকর্তা একচোখা নন। তিনি মানুষের ভালো কাজের ক্রেডিট নেন না। তিনি ততোটুকুই নেন, যতোটুকু তিনি পাবেন।ইশ্বর আছেন।'

.

স্যার সাজিদের দিকে একটু ভালোমতো তাকালেন।বললেন,- 'শিওর?'

– 'জ্বি।'

– 'তাহলে মানুষের মন্দ কাজের জন্য কে দায়ী?'

– 'মানুষই দায়ী।- সাজিদ বললো।

– 'ভালো কাজের জন্য?'

– 'তাও মানুষ।'

স্যার এবার চিৎকার করে বললেন,- 'এক্স্যাক্টলি, এটাই বলতে চাচ্ছি। ভালো/মন্দ এসব মানুষেরই কাজ।সো, এর সব ক্রেডিটই মানুষের।এখানে স্রষ্টার কোন হাত নেই। সো, তিনি এখান থেকে না প্রশংসা পেতে পারেন, না তিরস্কার।সোজা কথায়, স্রষ্টা বলতে কেউই নেই।'

.

ক্লাশে পিনপতন নিরবতা। সাজিদ বললো,- 'মানুষের ভালো কাজের জন্য স্রষ্টা অবশ্যই প্রশংসা পাবেন, কারন, মানুষকে স্রষ্টা ভালো কাজ করার জন্য দুটি হাত দিয়েছেন, ভালো জিনিস দেখার জন্য দুটি চোখ দিয়েছেন, চিন্তা করার জন্য মস্তিষ্ক দিয়েছেন, দুটি পা দিয়েছেন। এসবকিছুই স্রষ্টার দান।তাই ভালো কাজের জন্য তিনি অবশ্যই প্রশংসা পাবেন।'

.

স্যার বললেন,- 'এই গুলো দিয়ে তো মানুষ খারাপ কাজও করে, তখন?'

– 'এর দায় স্রষ্টার নয়।'

– 'হা হা হা হা। তুমি খুব মজার মানুষ দেখছি।হা হা হা হা।'

সাজিদ বললো,- 'স্যার, স্রষ্টা মানুষকে একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন।এটা দিয়ে সে নিজেই নিজের কাজ ঠিক করে নেয়। সে কি ভালো করবে, না মন্দ।'

.

স্যার তিরস্কারের সুরে বললেন, – 'ধর্মীয় কিতাবাদির কথা বাদ দাও,ম্যান। কাম টু দ্য পয়েন্ট এন্ড বি লজিক্যাল।'

.

সাজিদ বললো, – 'স্যার, আমি কি উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি ব্যাপারটা?'

– 'অবশ্যই।'- স্যার বললেন।

সাজিদ বলতে শুরু করলো-

.

'ধরুন, খুব গভীর সাগরে একটি জাহাজ ডুবে গেলো। ধরুন, সেটা বার্মুডা ট্রায়াঙ্গাল। এখন কোন ডুবুরিই সেখানে ডুব দিয়ে

জাহাজের মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে পারছে না।বার্মুডা ট্রায়াঙ্গালে তো নয়ই। এই মূহুর্তে ধরুন সেখানে আপনার আবির্ভাব ঘটলো। আপনি সবাইকে বললেন,- 'আমি এমন একটি যন্ত্র বানিয়ে দিতে পারি, যেটা গায়ে লাগিয়ে যেকোন মানুষ খুব সহজেই ডুবে যাওয়া জাহাজের মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে পারবে।ডুবুরির কোনরকম ক্ষতি হবে না।'

.

স্যার বললেন,- 'হুম, তো?'

– 'ধরুন, আপনি যন্ত্রটি তৎক্ষণাৎ বানালেন, এবং একজন ডুবুরি সেই যন্ত্র গায়ে লাগিয়ে সাগরে নেমে পড়লো ডুবে যাওয়া মানুষগুলোকে উদ্ধার করতে।'

ক্লাশে তখন একদম পিনপতন নিরবতা। সবাই মুগ্ধ শ্রোতা।কারো চোখের পলকই যেনো পড়ছেনা।

সাজিদ বলে যেতে লাগলো-
'ধরুন, ডুবুরিটা ডুব দিয়ে ডুবে যাওয়া জাহাজে চলে গেলো। সেখানে গিয়ে সে দেখলো, মানুষগুলো হাঁসপাশ করছে।সে একে একে সবাইকে একটি করে অক্সিজেনের সিলিন্ডার দিয়ে দিলো। এবং তাদের একজন একজন করে উদ্ধার করতে লাগলো।'

স্যার বললেন,- 'হুম।'

– 'ধরুন, সব যাত্রীকে উদ্ধার করা শেষ।বাকি আছে মাত্র একজন। ডুবুরিটা যখন শেষ লোকটাকে উদ্ধার করতে গেলো, তখন ডুবুরিটা দেখলো- এই লোকটাকে সে আগে থেকেই চিনে।'

এতটুকু বলে সাজিদ স্যারের কাছে প্রশ্ন করলো,- 'স্যার, এরকম কি হতে পারেনা?'

স্যার বললেন,- 'অবশ্যই হতে পারে। লোকটা ডুবুরির আত্মীয় বা পরিচিত হয়ে যেতেই পারে। অস্বাভাবিক কিছু নয়।'

সাজিদ বললো,- 'জ্বি। ডুবুরিটা লোকটাকে চিনতে পারলো। সে দেখলো,- এটা হচ্ছে তার চরম শত্রু।এই লোকের সাথে তার দীর্ঘ দিনের বিরোধ চলছে।এরকম হতে পারেনা,স্যার?

– 'হ্যাঁ, হতে পারে।'

সাজিদ বললো,- 'ধরুন, ডুবুরির মধ্যে ব্যক্তিগত হিংসাবোধ জেগে উঠলো।সে শত্রুতাবশঃত ঠিক করলো যে, এই লোকটাকে সে বাঁচাবেনা। কারন, লোকটা তার দীর্ঘদিনের শত্রু। সে একটা চরম সুযোগ পেলো এবং প্রতিশোধ পরায়ন হয়ে উঠলো। ধরুন, ডুবুরি অই লোকটাকে অক্সিজেনের সিলিন্ডার তো দিলোই না, উল্টো উঠে আসার সময় লোকটাকে পেটে একটা জোরে লাথি দিয়ে আসলো।'

.

ক্লাশে তখনও পিনপতন নিরবতা। সবাই সাজিদের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে।

.

স্যার বললেন,- 'তো, তাতে কি প্রমান হয়,সাজিদ?'

.

সাজিদ স্যারের দিকে ফিরলো। ফিরে বললো,- 'Let me finish my beloved sir....'

– 'Okey, you are permitted. carry on'- স্যার বললেন।

সাজিদ এবার স্যারকে প্রশ্ন করলো,- 'স্যার, বলুন তো, এই যে, এতগুলো ডুবে যাওয়া লোককে ডুবুরিটা উদ্ধার করে আনলো, এর জন্য আপনি কি কোন ক্রেডিট পাবেন?'

.

স্যার বললেন,- 'অবশ্যই আমি ক্রেডিট পাবো। কারন, আমি যদি অই বিশেষ যন্ত্রটি না বানিয়ে দিতাম, তাহলে তো এই লোকগুলোর কেউই বাঁচতো না।'

.

সাজিদ বললো,- 'একদম ঠিক স্যার। আপনি অবশ্যই এরজন্য ক্রেডিট পাবেন।কিন্তু, আমার পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে- 'ডুবুরিটা সবাইকে উদ্ধার করলেও, একজন লোককে সে শত্রুতা বশঃত উদ্ধার না করে মৃত্যুকূপে ফেলে রেখে এসেছে। আসার সময় তার পেটে একটি জোরে লাথিও দিয়ে এসেছে। ঠিক?'

.

– 'হুম।'

– 'এখন স্যার, ডুবুরির এহেন অন্যায়ের জন্য কি আপনি দায়ী হবেন? ডুবুরির এই অন্যায়ের ভাগটা কি সমানভাবে আপনিও ভাগ করে নেবেন?'

.

স্যার বললেন,- 'অবশ্যই না। ওর দোষের ভাগ আমি কেনো নেবো? আমি তো তাকে এরকম অন্যায় কাজ করতে বলিনি।সেটা সে নিজে করেছে।সুতরাং, এর পুরো দায় তার।'

.

সাজিদ এবার হাসলো। হেসে সে বললো,- 'স্যার, ঠিক একইভাবে, আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে সৃষ্টি করেছেন ভালো কাজ করার জন্য। আপনি যেরকম ডুবুরিকে একটা বিশেষ যন্ত্র বানিয়ে দিয়েছেন, সেরকম সৃষ্টিকর্তাও মানুষকে অনুগ্রহ করে হাত,পা,চোখ,নাক,কান,মুখ,মস্তিষ্ক এসব দিয়ে দিয়েছেন। সাথে দিয়েছেন একটি স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি।এখন এসব ব্যবহার করে সে যদি কোন ভালো কাজ করে, তার ক্রেডিট স্রষ্টাও পাবেন, যেরকম বিশেষ যন্ত্রটি বানিয়ে আপনি ক্রেডিট পাচ্ছেন।আবার, সে যদি এগুলো ব্যবহার করে কোন খারাপ কাজ করে, গর্হিত কাজ করে, তাহলে এর দায়ভার স্রষ্টা নেবেন না।যেরকম, ডুবুরির অই অন্যায়ের দায় আপনার উপর বর্তায় না। আমি কি বোঝাতে পেরেছি,স্যার?'

.

ক্লাশে এতক্ষণ ধরে পিনপতন নিরবতা বিরাজ করছিলো। এবার ক্লাশের সকল আস্তিকেরা মিলে একসাথে জোরে জোরে হাত তালি দেওয়া শুরু করলো।

.

স্যারের জবাবের আশায় সাজিদ স্যারের দিকে তাকিয়ে আছে। স্যার বললেন,- 'হুম। আই গট দ্য পয়েন্ট।'- এই বলে স্যার সেদিনের মতো ক্লাশ শেষ করে চলে যান।

১২

ইহুদিরা কি আসলেই উজাইর (Ezra) -কে আল্লাহর পুত্র বলে বিশ্বাস করে?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্ন: ইহুদিরা (Jews) সম্পূর্ণরূপে একেশ্বরবাদী থাকা সত্ত্বেও কুরআন কিসের ভিত্তিতে দাবি করে তারা বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী (Quran 9:30)?

উত্তরঃ আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ۖ ذَٰلِكَ قَوْلُهُم بِأَفْوَاهِهِمْ ۖ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَبْلُ ۚ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ ۚ أَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ

অর্থঃ *ইহুদীরা বলে "উজাইর আল্লাহর পুত্র" এবং খ্রিষ্টানরা বলে "মাসীহ[ঈসা(আ)/যিশু] আল্লাহর পুত্র"। এ হচ্ছে তাদের মুখের কথা। ওরা তো তাদের মতই কথা বলে যারা তাদের পূর্বে কাফির হয়েছে। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন, এরা কোন উল্টো পথে চলে যাচ্ছে!* [10]

ইহুদি তথা ইস্রায়েল জাতির ইতিহাস বহু ঈশ্বরের উপাসনা ও মূর্তিপুজা দ্বারা পরিপূর্ণ। তাদের নিজেদের ধর্মগ্রন্থই এর সাক্ষ্য দেয়।

নবী মুসা(আ)[prophet Moses] ইস্রায়েলীয়দের ছেড়ে তুর পাহাড়ে যাওয়ামাত্রই তারা গরুর বাছুরের মূর্তিপুজা শুরু করেছিল। এ জন্য ঈশ্বরের শাস্তিতে তাদের বহু লোক নিহত হয়। [11] শেষ পর্যন্ত মুসা(আ) তাঁদেরকে আবার মূর্তিপুজা থেকে ফেরান। ইহুদিদের কিতাবমতে তাদের একজন নবী সুলাইমান(আ)[Solomon] স্বয়ং শেষ বয়সে মূর্তিপুজক হয়ে যান এবং দেব-দেবীর মন্দির বানান! [12] (নাউযুবিল্লাহ)

নবী দাউদ(আ)[David] এবং সুলাইমান(আ)[Solomon] এর পর পরই ইস্রায়েলীয়দের রাজ্য ২ভাগে ভাগ হয়ে যায়, ইহুদা(Judah/Southern Kingdom) এবং ইস্রায়েল(Northern Kingdom) এই দুই রাজ্যে। প্রথমে ইস্রায়েল রাজ্যের মানুষেরা মূর্তিপুজা শুরু করে, ফলে ঐশ্বরিক শাস্তি আসে, আসিরিয়া সাম্রাজ্য তাদের আক্রমণ করে দাসে পরিণত করে। পরে ইহুদা রাজ্যের লোকেরা মূর্তিপুজায় লিপ্ত হয় এবং ব্যাবিলোনিয়ানরা তাদের আক্রমন করে দাসে পরিণত করে। সেসব এলাকায় নবীদের দাওয়াতে ইহুদিরা আবার একত্ববাদী ধর্মে ফিরে আসে। পরে পারস্যসম্রাট সাইরাস(Cyrus) ইহুদিদের মুক্ত করেন এবং আবার ফিলিস্তিনে যেতে দেন। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের(Old Testament) এর প্রায় অর্ধেক অংশ জুড়ে এইসব ইতিহাস অনেক বিস্তারিত বর্ণণা করা আছে।

---

[10] আল কুরআন, তাওবাহ ৯:৩০

[11] খ্রিষ্টান বাইবেল/ইহুদি তানাখ(Tanakh) এর যাত্রাপুস্তক(Exodus) ৩২:১-৯ দ্রষ্টব্য

[12] বাইবেল, ১ রাজাবলী(1 Kings) ১১:১-১০ দ্রষ্টব্য
কুরআন এই জাতীয় কথা অস্বীকার করে; কুরআন অনুযায়ী কোন নবী পাপী ছিলেন না; কুরআন সরাসরি বলে যে সুলাইমান(আ) কুফরী করেননি। দেখুন বাকারাহ ২:১০২।

ইহুদিদের মূর্তিপুজা ও বহু ঈশ্বরের উপাসনার আরো অনেক বিবরণ বাইবেলে আছে—বায়াল দেবতার উপাসনাকারী ইস্রায়েলীয়দের তাদের নবী কর্তৃক হত্যা করার ঘটনা, [13] নবী যিশাইয়(Isaiah) এর যুগে ইহুদিদের মূর্তিপুজা এবং নবী কর্তৃক তাদের একত্ববাদে(ইসলাম) ফিরে আসার আহ্বান, [14] নবী ইয়ারমিয়া(যিরমিয়) কর্তৃক সেসময়ের মূর্তিপূজক ইহুদিদের একত্ববাদে ফিরে আসবার আহ্বান, [15] নবী হিজকিল(যিহিস্কেল) এর ঘটনা। [16]

ইহুদিদের নিজ ধর্মগ্রন্থ এ ব্যাপারে যা বলে তার একটা উদাহরণঃ—

"মাবুদ তাঁর সমস্ত নবী ও দর্শকদের মধ্য দিয়ে ইসরাইল ও এহুদাকে এই বলে সাবধান করেছিলেন, "তোমরা তোমাদের খারাপ পথ থেকে ফেরো এবং সমস্ত শরীয়ত যা আমি তোমাদের পূর্বপুরুষদের পালনের জন্য দিয়েছিলাম আর আমার গোলামদের, অর্থাৎ নবীদের মধ্য দিয়ে তোমাদের জানিয়েছিলাম তোমরা সেই অনুসারে আমার সমস্ত হুকুম ও নিয়ম পালন কর।" কিন্তু তারা সেই কথায় কান দেয় নি। ***তাদের পূর্বপুরুষেরা যারা তাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করত না, তাদের মতই তারা একগুঁয়েমি করত।***

তারা তাঁর সব নিয়ম, তাদের পূর্বপুরুষদের জন্য স্থাপন করা তাঁর ব্যবস্থা এবং তাদের কাছে তাঁর দেওয়া সাবধান বাণী মানতে অস্বীকার করেছিল। তারা অসার মূর্তির পূজা করে নিজেরাও অসার হয়ে পড়েছিল। মাবুদ যাদের মত চলতে বনি-ইসরাইলদের নিষেধ করেছিলেন তারা তাদের চারপাশের সেই জাতিগুলোর মতই চলত। তারা তাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র সমস্ত হুকুম ত্যাগ করে নিজেদের জন্য ছাঁচে ফেলে দু'টা বাছুরের মূর্তি এবং একটা আশেরা-খুঁটি তৈরী করে নিয়েছিল। তারা আকাশের তারাগুলোর পূজা করত এবং বা'ল দেবতার সেবা করত।

নিজের ছেলেমেয়েদের তারা আগুনে পুড়িয়ে বলি দিত। তারা গোণাপড়ার ও লক্ষণ দেখে ভবিষ্যতের কথা বলবার অভ্যাস করত এবং মাবুদের চোখে যা খারাপ সেই সব কাজ করবার জন্য নিজেদের বিকিয়ে দিয়ে মাবুদকে রাগিয়ে তুলেছিল।

কাজেই ইসরাইলের লোকদের উপর মাবুদ রাগ হয়ে তাঁর সামনে থেকে তাঁদের দূর করে দিলেন। *বাকী ছিল কেবল এহুদা-গোষ্ঠী,*

কিন্তু এহুদা-গোষ্ঠীও তাদের মাবুদ আল্লাহ্‌র হুকুম মত না চলে ইসরাইল যা করত তারাও তা-ই করতে লাগল।

সেইজন্য মাবুদ সমস্ত বনি-ইসরাইলদেরই বাতিল করে দিলেন। তিনি তাদের কষ্টে ফেললেন এবং লুটেরাদের হাতে তুলে দিলেন, আর শেষে নিজের সামনে থেকে তাদের দূর করে দিলেন।" [17]

ইহুদি তথা ইস্রায়েল জাতির নিজ ধর্মগ্রন্থই সাক্ষ্য দিচ্ছে যে তাদের ইতিহাস পৌত্তলিকতা আর বহু দেবতার পুজায় ভরা। কাজেই চট করে নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর সময়ে "ইহুদিরা সম্পূর্ণরূপে একেশ্বরবাদী ছিল" বলে দেওয়াটা একটু কঠিন বৈকি।

---

[13] খ্রিষ্টান বাইবেল/ইহুদি তানাখ(Tanakh) এর ২ রাজাবলী(2 Kings) ১০ম অধ্যায় দ্রষ্টব্য

[14] খ্রিষ্টান বাইবেল/ইহুদি তানাখ(Tanakh) এর বাইবেল, যিশাইয়(Isaiah) ২:৫-৯ দ্রষ্টব্য

[15] খ্রিষ্টান বাইবেল/ইহুদি তানাখ(Tanakh) এর যিরমিয়(Jeremiah) ৩২:২৮-৩৫ দ্রষ্টব্য

[16] খ্রিষ্টান বাইবেল/ইহুদি তানাখ(Tanakh) এর যিহিস্কেল(Ezekiel) ২০:৩১ দ্রষ্টব্য

[17] বাইবেল,২ বাদশাহনামা/২ রাজাবলী(2 Kings) ১৭:১৩-২০ (কিতাবুল মোকাদ্দস অনুবাদ)

চলুন এখন আমরা দেখি আমরা কোন প্রেক্ষাপটে বা কোন ঘটনার প্রেক্ষিতে আলোচ্য আয়াতটি[সুরা তাওবাহ ৯:৩০] নাজিল হয়েছিল।

সাল্লাম ইবন মিশকাম, নু'মান ইবন আওফা, শাস ইবন কায়স ও মালেক ইবনুস সাইফ রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর কাছে এসে বলল, আমরা কিভাবে আপনার অনুসরণ করতে পারি, অথচ আপনি আমাদের কিবলা ত্যাগ করেছেন, আপনি উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বলে মেনে নেন না? তখন আল্লাহ তাআ'লা এ আয়াত নাজিল করেন। [18]

সুতরাং আমরা ঐতিহাসিক বিবরণ পাচ্ছি যে ইহুদিরা আসলেই উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বলত।

সুরা তাওবাহ এর ৩০নং আয়াতের তাফসিরে ইমাম কুরতুবী(র) বলেনঃ *" "ইহুদীরা বলে" এই কথাটি একটি সাধারণ ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়েছে যদিও এর মানে সুনির্দিষ্ট, কারণ সব ইহুদি এমনটি[উজাইর আল্লাহর পুত্র] বলত না। এটা তো আল্লাহর ঐ বক্তব্যের মত "যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, ..." (আলি ইমরান ৩:১৭৩) অথচ সব লোক তা বলেনি। "* [19] *বলা হয়ঃ ইহুদীদের থেকে যা বর্ণিত হয়েছে তার বক্তা হচ্ছে - সাল্লাম ইবন মিশকাম, নু'মান বিন আবু আওফা, শাস ইবন কায়স ও মালেক ইবনুস সাইফ। তারা এটা [অর্থাৎ উজাইর আল্লাহর পুত্র] নবী(ﷺ)কে বলেছিল। আন-নাক্কাশ বলেনঃ ইহুদিদের মধ্যে এরূপ বলে থাকে এমন কেউ অবশিষ্ট নেই, বরং তারা বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে। কিন্তু, যখন কোন একজন এটি বলে, তখন তার দিকে মনোযোগ নিবদ্ধ করা হয় যতক্ষন না বক্তব্যের কদর্যতা পুরো গোষ্ঠীর উপর আরোপ হয়। যেহেতু তাদের মাঝে বক্তার খ্যাতি-প্রসিদ্ধি রয়েছে। কেননা খ্যাতিমান-প্রসিদ্ধ ব্যাক্তিদের কথা সবসময়ই লোকদের মাঝে প্রচলিত-প্রখ্যাত হয় এবং একে ব্যবহার করে যুক্তি-প্রমাণ দেয়া হয়। সুতরাং এখান থেকেই এটি (বলা) শুদ্ধ হচ্ছে যে, "গোষ্ঠী তার খ্যাতিমান ব্যাক্তিদের (অনুরূপ) কথা বলে থাকে"।*
ইমাম শাওকানী(র) এর ফাতহুল কাদিরেও অনুরূপ মত ব্যক্ত করা হয়েছে।

জি. ডি. নিউবাই তাঁর "আ হিস্টরি অফ দ্য জিউস অফ এরাবিয়া" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, "*আমরা সহজেই ধরতে পারি যে হিজাজের[মক্কা-মদীনা] ইহুদিরা, যারা কিনা সুস্পষ্টভাবেই মোরাকাবার সাথে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মরমি ভাবধারায় আক্রান্ত ছিল, উজাইরকে সেই স্থান দিয়েছিল। এর কারণ ছিল তার কিতাবের অনুবাদের বিবরণ, তার ধার্মিকতা। এবং বিশেষত, ঈশ্বরের অনুলেখক হিসাবে তাকে হনোক(Enoch) এর সাথে তুলনা করা হত। এ দ্বারা ঈশ্বরের পুত্রদের একজনকেও বোঝায়।এবং নিঃসন্দেহে তিনি ধর্মীয় নেতাদের সকল বৈশিষ্ট্য বহন করতেন(কুরআন ৯:৩১এ বর্ণিত 'আহবার'), যাকে ইহুদিরা বন্দনা করত।"* [20]

---

[18] তাবারী, সিরাত ইবন হিশাম ১/৫৭০

[19] সুরা আলি ইমরানের ১৭৩ নং আয়াত—"যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম; তাদের ভয় কর। ..." -- এ আয়াতে 'লোকেরা' কথাটি ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু এখানে এ দ্বারা আরবের সকল লোককে বোঝানো হয়নি বরং অল্প কিছু মুনাফিকের কথা বলা হয়েছে।

[20] G. D. Newby, A History Of The Jews Of Arabia, 1988, University Of South Carolina Press, p. 61

ইমাম কুরতুবী(র) ও ইমাম শাওকানী(র) এর তাফসির থেকে আমরা বুঝতে পারছি যে আলোচ্য আয়াতে সকল ইহুদি সম্পর্কে এটা বলা হয়নি যে তারা উজাইরকে আল্লাহর পুত্র দাবি করে। বর্তমানকালেও ইহুদি ফির্কাগুলোর মধ্যে এমন বিশ্বাস দেখতে পাওয়া যায় না। তবে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণ থেকে আমরা নিশ্চিত হতে পারি যে নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর সময়ে আরবের ইহুদিরা[যারা ছিল ইয়েমেনী(Yemenite) দলীয় ইহুদি] উজাইরকে আল্লাহর পুত্র বলে অভিহীত করত। ইহুদিদের বহু ঈশ্বরের উপাসনার ইতিহাস, ঐতিহাসিক বিবরণ ইত্যাদি উপেক্ষা করে যারা এরপরেও কুরআনকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চান, তাদের উদ্দ্যেশ্যে বলব—সে সময়কার স্থানীয় ইহুদিদের এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি ধর্মীয় বিশ্বাসের ব্যাপারে যদি কুরআন আসলেই মারাত্মক ভুল কোন তথ্য দিত, তাহলে মুহাম্মাদ(ﷺ) এর অনেক সাহাবীরই সেটা চোখে পড়ত। মদীনাবাসী সাহাবীদের ইহুদিদের ধর্মীয় বিশ্বাস খুব ভালো করেই জানা ছিল কেননা মদীনায় তখন প্রচুর ইহুদি বাস করত। কুরআন যদি সত্যিই ইহুদিদের বিশ্বাসের ব্যাপারে এমন ভুল তথ্য দিত, তাহলে সাহাবীরা বুঝতেন যে কুরআন মিথ্যা। তাহলে তাঁদের অনেকেই ইসলাম ত্যাগ করতেন। কিন্তু তাঁরা আদৌ এমন কিছু করেননি। বরং নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) ও কুরআনের উপর বিশ্বাসে অটল ছিলেন। এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ হয় যে কুরআন মোটেও কোন ভুল তথ্য দেয়নি এবং ইসলামবিরোধীদের অভিযোগের কোন সত্যতা নেই।

১৩
কুরআন কি সূর্যের পানির নিচে ডুবে যাওয়ার কথা বলে?’

-আরিফ আজাদ

সাজিদের খুব মন খারাপ।আমি রুমে ঢুকে দেখলাম সে তার খাটের উপর শক্তমুখ করে বসে আছে।

আমি বললাম,- ‘ক্লাশ থেকে কবে এলি?’

সে কোন উত্তর দিলো না। আমি কাঁধ থেকে সাড়ে দশ কেজি ওজনের ব্যাগটি নামিয়ে রাখলাম টেবিলের উপর। তার দিকে ফিরে বললাম,- ‘কি হয়েছে রে? মুখের অবস্থা তো নেপচুনের উপগ্রহ ট্রাইটনের মতো করে রেখেছিস।’

সে বললো,- ‘ট্রাইটন দেখতে কি রকম?’

– ‘আমি শুনেছি ট্রাইটন দেখতে নাকি বাঙলা পাঁচের মতো।’
আমি জানি, সাজিদ এক্ষুনি একটা ছোটখাটো লেকচার শুরু করবে। সে আমাকে ট্রাইটনের অবস্থান, আকার-আকৃতি, ট্রাইটনের ভূ-পৃষ্টে নাইট্রোজেন, কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ, সূর্য আর নেপচুন থেকে ট্রাইটনের দূরত্ব কতো- তার যথাযথ বিবরণ এবং তথ্যাদি দিয়ে প্রমান করে দেখাবে যে, ট্রাইটন দেখতে মোটেও বাঙলা পাঁচের মতো নয়।

.

এই মূহুর্তে তার লেকচার বা বকবকানি, কোনটাই শোনার আমার ইচ্ছে নেই।তাই, যে করেই হোক, তাকে দ্রুত থামিয়ে দিতে হবে। আমি আবার বললাম,- ‘ক্লাশে গিয়েছিলি?’
– ‘হু’
– ‘কোন সমস্যা হয়েছে নাকি? মন খারাপ? ‘

.

সে আবার চুপ মেরে গেলো।এই হলো একটা সমস্যা।সাজিদ যেটা বলতে চাইবে না, পৃথিবী যদি ওলট-পালট হয়েও যায়, তবু সে মুখ খুলে সেটা কাউকে বলবে না।

.

সে বললো,- ‘কিচেনে যা। ভাত বসিয়েছি। দেখে আয় কি অবস্থা।’
আমি আকাশ থেকে পড়ার মতো করে বললাম,- ‘ভাত বসিয়েছিস মানে? বুয়া আসে নি?’
– ‘না।’
– ‘কেনো?’
– ‘অসুস্থ বললো।’
– ‘তাহলে আজ খাবো কি?’

.

সাজিদ জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো।সেদিকে তাকিয়েই বললো,- ‘ভাত বসিয়েছি। কলে যথেষ্ট পরিমাণে পানি আছে। পানি দিয়ে ভাত গিলা হবে।’
সিরিয়াস সময়গুলোতেও তার এরকম রসিকতা আমার একেবারেই ভালো লাগে না।

.

অগত্যা কিচেনের দিকে হাঁটা ধরলাম।
যেটা ভেবেছি ঠিক সেটা নয়।ভাত বসানোর পাশাপাশি সে ডিম সেদ্ধ করে রেখেছে।আমার পেছন পেছন সাজিদও আসলো।

এসে ভাত নামিয়ে কড়াইতে তেল, তেলে কিছু পেঁয়াজ কুঁচি, হালকা গুড়ো মরিচ, এক চিমটি নুন দিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে, তাতে ডিম দুটো ছেড়ে দিলো। পাশে আমি পর্যবেক্ষকের মতো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব দেখছি। মনে হচ্ছে, সাজিদ কোন রান্না প্রতিযোগিতার প্রতিযোগি, আর আমি চিফ জাষ্টিস।

.

অল্প কিছুক্ষণ পরেই ডিম দুটোর বর্ণ লালচে হয়ে উঠলো। মাছকে হালকা ভাঁজলে যেরকম দেখায়, সেরকম। সুন্দর একটি পোঁড়া গন্ধও বেরিয়েছে।

আমি মুচকি হেসে বললাম,- 'খামোখা বুয়া রেখে এতগুলো টাকা অপচয় করি প্রতিমাসে। অথচ, ভুবন বিখ্যাত বুয়া আমার রুমেই আছে। হা হা হা।'

.

সাজিদ আমার দিকে ফিরে আমার কান মলে দিয়ে বললো,- 'সাহস তো কম না তোর? আমাকে বুয়া বলিস?'

আমি বললাম,- 'ওই দেখ, পুঁড়ে যাচ্ছে।'

সাজিদ সেদিকে ফিরতেই আমি দিলাম এক ভোঁ দৌঁড়!

–

গোসল সেরে, নামাজ পড়ে, খেয়ে-দেয়ে উঠলাম। রুটিন অনুযায়ী, সাজিদ এখন ঘুমোবে। রাতের যে বাড়তি অংশটা সে বই পড়ে কাটায়, সেটা দুপুর বেলা ঘুমিয়ে পুষিয়ে নেয়।

.

আমার আজকে কাজ নেই। চাইলেই ঘুরতে বেরোতে পারি।কিন্তু বাইরে যা রোদ! সাহস হচ্ছিলো না।

এরমধ্যেই সাজিদ ঘুমিয়ে পড়েছে।

কিন্তু আমার মনের মধ্যে একটি কচকচানি রয়ে গেলো। সাজিদকে এরকম মন খারাপ অবস্থায় আমি আগে কখনো দেখি নি। কেন তার মন খারাপ সে ব্যাপারে জানতে না পারলে শান্তি পাচ্ছি না। কিন্তু সাজিদকে জিজ্ঞেস করে লাভ নেই। সে কোনদিনও বলবে না।ভাবছি কি করা যায়?

.

তখন মনে পড়লো তার সেই বিখ্যাত (আমার মতে) ডায়েরিটার কথা, যেটাতে সে তার জীবনের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাগুলো হুবহু লিখে রাখে।আজকে তার মন খারাপের ব্যাপারটিও নিশ্চয় সে তুলে রেখেছে।

তার টেবিলের ড্রয়ার খুলে তার ডায়েরিটা নিয়ে উল্টাতে লাগলাম।

মাঝামাঝিতে এসে পেয়ে গেলাম মূল ঘটনাটা।যেরকম লেখা আছে, সেভাবেই তুলে ধরছি-

.

০৭/০৫/১৪

'মফিজুর রহমান স্যার। এই ভদ্রলোক ক্লাশে আমাকে উনার শত্রু মনে করেন। ঠিক শত্রু না, প্রতিদ্বন্দ্বী বলা যায়।

আমাকে নিয়ে উনার সমস্যা হলো- উনি উল্টাপাল্টা কথাবার্তা বলে, ক্লাশের ছেলে-মেয়েদের মনে ধর্ম, ধর্মীয় কিতাব, আল্লাহ, রাসূল ইত্যাদি

নিয়ে সন্দেহ ঢুকিয়ে দেবার চেষ্টা করেন।কিন্তু, আমি প্রতিবারই উনার এহেন কাজের প্রতিবাদ করি।উনার যুক্তির বীপরিতে যুক্তি দিই। এমনও হয়েছে, যুক্তিতে আমার কাছে পরাজিত হয়ে উনি ক্লাশ থেকেও চলে গিয়েছিলেন কয়েকবার।

.

এই কারনে এই বামপন্থি লোকটা আমাকে উনার চক্ষুশূল মনে করেন।

সে যাকগে! আজকের কথা বলি।

.

আজকে ক্লাশে এসেই ভদ্রলোক আমাকে খুঁজে বের করলেন। বুঝতে পেরেছি, নতুন কোন উছিলা খুঁজে পেয়েছে আমাকে ঘায়েল করার।

ক্লাশে আসার আগে মনে হয় পান খেয়েছিলেন। ঠোঁটের এক কোণায় চুন লেগে আছে।

.

আমাকে দাঁড় করিয়ে বড় বড় চোখ করে বললেন,- 'বাবা আইনষ্টাইন, কি খবর?'

.

ভদ্রলোক আমাকে তাচ্ছিল্য করে 'আইনষ্টাইন' বলে ডাকেন। আমাকে আইনষ্টাইন ডাকতে দেখে উনার অন্য শাগরেদবৃন্দগণ হাসাহাসি শুরু করলো।

.

আমি কিছু না বলে চুপ করে আছি। তিনি আবার বললেন,- 'শোন বাবা আইনষ্টাইন, তুমি তো অনেক বিজ্ঞান জানো, বলো তো দেখি, সূর্য কি পানিতে ডুবে যায়?'

.

ক্লাশ স্তিমিত হয়ে গেলো। সবাই চুপচাপ।

আমি মাথা তুলে স্যারের দিকে তাকালাম। বললাম,- 'জ্বি না স্যার। সূর্য কখনোই পানিতে ডুবে না।'

স্যার অবাক হওয়ার ভঙ্গিতে বললেন,- ' ডুবে না? ঠিক তো?'

– 'জ্বি স্যার।'

– 'তাহলে সূর্যাস্ত আর সূর্যোদয় কেন হয় বাবা? বিজ্ঞান কি বলে?'

.

আমি বললাম, – 'স্যার, সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী ঘুরে।সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘোরার সময়, পৃথিবী গোলার্ধের যে অংশটা সূর্যের দিকে মুখ করে থাকে, সে অংশে তখন সূর্যোদয় হয়, দিন থাকে। ঠিক একইভাবে, পৃথিবী গোলার্ধের যে অংশটা তখন সূর্যের বীপরিত দিকে মুখ করে থাকে, তাতে তখন সূর্যাস্ত হয়, রাত নামে।আদতে, সূর্যাস্ত বা সূর্যোদয় বলে কিছু নেই।সূর্য অস্তও যায় না। উদিতও হয়না। পৃথিবীর ঘূর্ণনের কারনে আমাদের এমনটি মনে হয়।'

.

স্যার বললেন,- 'বাহ! সুন্দর ব্যাখ্যা।'

উনি আমার দিকে ঝুঁকে এসে বললেন,- 'তা বাবা, এই ব্যাপারটার উপর তোমার আস্থা আছে তো? সূর্য পানিতে ডুবে-টুবে যাওয়া তে বিশ্বাস-টিশ্বাস করো কি?'

পুরো ক্লাশে তখনও পিনপতন নিরবতা।

.

আমি বললাম,- 'না স্যার। সূর্যের পানিতে ডুবে যাওয়া-টাওয়া তে আমি বিশ্বাস করিনা।'

এরপর স্যার বললেন,- 'বেশ! তাহলে ধরে নিলাম, আজ থেকে তুমি আর কোরআনে বিশ্বাস করো না।'

.

স্যারের কথা শুনে আমি খানিকটা অবাক হলাম।পুরো ক্লাশও সম্ভবত আমার মতোই হতবাক।স্যার মুচকি হেসে বললেন,- 'তোমাদের ধর্মীয় কিতাব, যেটাকে আবার বিজ্ঞানময় বলে দাবি করো তোমরা, সেই কোরআনে আছে, সূর্য নাকি পানিতে ডুবে যায়। হা হা হা।'

.

আমি স্যারের মুখের দিকে চেয়ে আছি। স্যার বললেন, – 'কি বিশ্বাস হচ্ছে না তো? দাঁড়াও, পড়ে শোনাই।'

.

এইটুক বলে স্যার কোরআনের সূরা কাহাফের ৮৬ নাম্বার আয়াতটি পড়ে শোনালেন-

.

‘(চলতে চলতে) এমনিভাবে তিনি (জুলকারনাঈন) সূর্যের অস্তগমনের জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলেন, সেখানে গিয়ে তিনি সূর্যকে (সাগরের) কালো পানিতে ডুবে যেতে দেখলেন।তার পাশে তিনি একটি জাতিকেও (বাস করতে) দেখলেন, আমি বললাম, হে জুলকারনাঈন! (এরা আপনার অধীনস্ত),আপনি ইচ্ছা করলে (তাদের) শাস্তি দিতে পারেন, অথবা তাদের আপনি সদয়ভাবেও গ্রহণ করতে পারেন।’

.

এরপর বললেন,- ‘দেখো, তোমাদের বিজ্ঞানময় ধর্মীয় কিতাব বলছে যে, সূর্য নাকি সাগরের কালো পানিতে ডুবে যায়। হা হা হা। বিজ্ঞানময় কিতাব বলে কথা।’

.

ক্লাশের কেউ কেউ, যারা স্যারের মতোই নাস্তিক, তারা হো হো করে হেসে উঠলো। আমি কিছুই বললাম না।চুপ করে ছিলাম।’

–

এইটুকুই লেখা। আশ্চর্য! সাজিদ মফিজুর রহমান নামের এই ভদ্রলোকের কথার কোন প্রতিবাদ করলো না? সে তো এরকম করে না সাধারণত। তাহলে কি.......? আমার মনে নানা ধরনের প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিতে লাগলো সেদিন।

–

এর চারমাস পরের কথা।

.

হঠাৎ একদিন সন্ধ্যায় সাজিদ আমাকে এসে বললো,- ‘আগামিকাল ডিপার্টমেণ্ট থেকে ট্যুরে যাচ্ছি। তুইও সাথে যাচ্ছিস।’
আমি বললাম, – ‘আমি? পাগল নাকি? তোদের ডিপার্টমেন্ট ট্যুরে আমি কিভাবে যাবো?’

.

– ‘সে ভাবনাটা আমার। তুকে যা বললাম, জাষ্ট তা শুনে যা।’

.

পরদিন সকাল বেলা বেরুলাম।তার ফ্রেন্ডদের সাথে আমার পরিচয় করিয়ে দিলো সাজিদ।স্যারেরাও আছেন। মফিজুর রহমান নামের ভদ্রলোকটির সাথেও দেখা হলো। বিরাট গোঁফওয়ালা। এই লোকের পূর্বপুরুষ সম্ভবত ব্রিটিশদের পিয়নের কাজ করতো।

.

যাহোক, আমরা যাচ্ছি বরিশালের কুয়াকাটা।
পৌঁছাতে পাক্কা চারঘণ্টা লাগলো।
সারাদিন অনেক ঘুরাঘুরি করলাম। স্যারগুলোকে বেশ বন্ধুবৎসল মনে হলো।

.

ঘড়িতে সময় তখন পাঁচটা বেজে পঁচিশ মিনিট। আমরা সমুদ্রের কাছাকাছি হোটেলে আছি।আমাদের সাথে মফিজুর রহমান স্যারও আছেন।

.

তিনি সবার উদ্দেশ্যে বললেন,- ‘গাইজ, বি রেডি! আমরা এখন কুয়াকাটার বিখ্যাত সূর্যাস্ত দেখবো।তোমরা নিশ্চয় জানো, এটি দক্ষিণ এশিয়ার একমাত্র সমুদ্র সৈকত, যেখান থেকে সূর্যোদয় আর সূর্যাস্ত দুটোই দেখা যায়।’

.

আমরা সবাই প্রস্তুত ছিলাম আগে থেকেই। বেরুতে যাবো, ঠিক তখনি সাজিদ বলে বসলো,- ‘স্যার, আপনি সূর্যাস্ত দেখবেন?’

.

স্যার বললেন,- 'Why not! How can I miss such an amazing moment?'
সাজিদ বললো,- 'স্যার, আপনি বিজ্ঞানের মানুষ হয়ে খুব অবৈজ্ঞানিক কথা বলছেন। এমন একটি জিনিস আপনি কি করে দেখবেন বলছেন, যেটা আদতে ঘটেই না।'

.

এবার আমরা সবাই অবাক হলাম। যে যার চেয়ার টেনে বসে পড়লাম। সাজিদ দাঁড়িয়ে আছে।

.

স্যার কপালের ভাঁজ দীর্ঘ করে বললেন,- 'What do u want to mean?'
সাজিদ হাসলো। হেসে বললো,- 'স্যার, খুবই সোজা। আপনি বলছেন, আপনি আমাদের নিয়ে সূর্যাস্ত দেখবেন। কিন্তু স্যার দেখুন, বিজ্ঞান বুঝে এমন লোক মাত্রই জানে, সূর্য আসলে অস্ত যায়না। পৃথিবী গোলার্ধের যে অংশ সূর্যের বীপরিত মুখে অবস্থান করতে শুরু করে, সে অংশটা আস্তে আস্তে অন্ধকারে ছেঁয়ে যায় কেবল। কিন্তু সূর্য তার কক্ষপথেই থাকে।উঠেও না, ডুবেও না। তাহলে স্যার, সূর্যাস্ত কথাটা তো ভুল, তাই না?'

.

এবার আমি বুঝে গেছি আসল ব্যাপার। মজা নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করছি।
মফিজুর রহমান নামের লোকটা একরাশ বিরক্তি নিয়ে বললো,-

'দেখো সাজিদ, সূর্য যে উদিত হয়না আর অস্ত যায়না, তা আমি জানি। কিন্তু, এখান থেকে দাঁড়ালে আমাদের কি মনে হয়? মনে হয়, সূর্যটা যেনো আস্তে আস্তে পানির নিচে ডুবে যাচ্ছে। এটাই আমাদের চর্মচক্ষুর সাধারণ পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। তাই, আমরা এটাকে সিম্পলি, 'সূর্যাস্ত' নাম দিয়েছি।বলার সুবিধের জন্যও এটাকে 'সূর্যাস্ত' বলাটা যুক্তিযুক্ত।

দেখো, যদি আমি বলতাম,- 'ছেলেরা, একটুপর পৃথিবী গোলার্ধের যে অংশে বাংলাদেশের অবস্থান, সে অংশটা সূর্যের ঠিক বীপরিত দিকে মুখ নিতে চলেছে। তারমানে, এখানে এক্ষুনি আঁধার ঘনিয়ে সন্ধ্যা নামবে।আমাদের সামনে থেকে সূর্যটা লুকিয়ে যাবে।চলো, আমরা সেই দৃশ্যটা অবলোকন করে আসি', আমি যদি এরকম বলতাম, ব্যাপারটা ঠিক বিদঘুটে শোনাতো। ভাষা তার মাধুর্যতা হারাতো।শ্রুতিমধুরতা হারাতো। এখন আমি এক শব্দেই বুঝিয়ে দিতে পারছি আমি কি বলতে চাচ্ছি, সেটা।'

.

সাজিদ মুচকি হাসলো। সে বললো,- 'স্যার, আপনি একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। বিজ্ঞান পড়েন, বিজ্ঞান পড়ান। আপনি আপনার সাধারন চর্মচক্ষু দিয়ে দেখতে পান যে- সূর্যটা ডুবে যাচ্ছে পানির নিচে। এই ব্যাপারটাকে আপনি সুন্দর করে বোঝানোর জন্য যদি 'সূর্যাস্ত' নাম দিতে পারেন, তাহলে সূরা কাহাফে জুলকারনাঈন নামের লোকটি এরকম একটি সাগর পাড়ে এসে যখন দেখলো- সূর্যটা পানির নিচে তলিয়ে যাচ্ছে, সেই ঘটনাকে যদি আল্লাহ তা'য়ালা সবাইকে সহজে বুঝানোর জন্য, সহজবোধ্য করার জন্য, ভাষার শ্রুতিমধুরতা ধরে রাখার জন্য, কুলি থেকে মজুর, মাঝি থেকে কাজি, ব্লগার থেকে বিজ্ঞানি,ডাক্তার থেকে ইঞ্জিনিয়ার, ছাত্র থেকে শিক্ষক, সবাইকে সহজে বুঝানোর জন্য যদি বলেন-

.

''(চলতে চলতে) এমনিভাবে তিনি (জুলকারনাঈন) যখন সূর্যের অস্তগমনের জায়গায় গিয়ে পৌঁছুলেন, সেখানে গিয়ে তিনি সূর্যকে (সাগরের) কালো পানিতে ডুবে যেতে দেখলেন',

.

তখন কেনো স্যার ব্যাপারটা অবৈজ্ঞানিক হবে? কোরান বলেনা যে, সূর্য পানির নিচে ডুবে গেছে। কোরান এখানে ঠিক সেটাই বলেছে, যেটা জুলকারনাঈন দেখেছে, এবং বুঝেছে। আপনি আমাদের সূর্যাস্ত দেখাবেন বলছেন মানে এই না যে- আপনি বলতে চাচ্ছেন সূর্যটা আসলেই ডুবে যায়।আপনি সেটাই বোঝাতে চাচ্ছেন, যেটা আমরা বাহ্যিকভাবে দেখি।তাহলে, একই ব্যাপার আপনি পারলে, কোরান কেন পারবে না স্যার?

.

আপনারা কথায় কথায় বলেন,- 'The Sun rises in the east & sets in the west' এগুলা নাকি Universal Truth.. কিভাবে এগুলো চিরন্তন সত্য হয় স্যার, যেখানে সূর্যের সাথে উঠা-ডুবার কোন সম্পর্কই নাই?

কিন্তু এগুলো আপনাদের কাছে অবৈজ্ঞানিক নয়। আপনারা কথায় কথায় সূর্যোদয়, সূর্যাস্তের কথা বলেন। অথচ, সেইম কথা কোরান বললেই আপনারা চিৎকার করে বলে উঠেন- কোরান অবৈজ্ঞানিক। কেন স্যার?'

.

সাজিদ একনাগাড়ে এতসব কথা বলে গেলো। স্যারের মুখটা কিছুটা পানসে দেখা গেলো। তিনি বললেন,- 'দীর্ঘ চারমাস ধরে, এরকম সুযোগের অপেক্ষা করছিলে তুমি, মি. আইনষ্টাইন?'

.

আমরা সবাই হেসে দিলাম।

সাজিদও মুচকি হাসলো। বড় অদ্ভুত সে হাসি।।

১৪

ভুমিকম্প আর প্রবল ঘূর্ণিঝড় হবার মূল কারণ কি কাফের বা অবিশ্বাসীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন বা তাদের নিধন করা?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্ন: ভুমিকম্প আর প্রবল ঘূর্ণিঝড় হবার মূল কারণ কি কাফের বা অবশ্বাসীদের ভয়ভীতি প্রদর্শন বা তাদের নিধন করা? (Quran 16:45, 29:37,17:68) ? তবে মুসলিম দেশগুলোতে এত ভুমিকম্প সংঘটিত হয় কেন?

#উত্তরঃ কুরআন মাজিদে বলা হয়েছেঃ

"যারা কুচক্র করে, তারা কি এ বিষয়ে ভয় করে না যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূগর্ভে বিলীন করে দেবেন কিংবা তাদের কাছে এমন জায়গা থেকে আযাব আসবে যা তাদের ধারণাতীত।"
(কুরআন, নাহল ১৬:৪৫)

" আমি মাদইয়ানবাসীদের প্রতি তাদের ভাই শুআইবকে প্রেরণ করেছি। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, শেষ দিবসের আশা রাখো এবং পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করো না। কিন্তু তারা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলল; অতঃপর তারা ভূমিকম্প দ্বারা আক্রান্ত হল এবং নিজেদের গৃহে উপুর হয়ে পড়ে রইল।"
(কুরআন, আনকাবুত ২৯:৩৬-৩৭)

"তোমরা কি এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত রয়েছ যে, তিনি তোমাদেরকে স্থলভাগে কোথাও ভূগর্ভস্থ করবেন না। অথবা তোমাদের উপর প্রস্তর বর্ষণকারী ঘূর্ণিঝড় প্রেরণ করবেন না, তখন তোমরা নিজেদের জন্যে কোন কর্মবিধায়ক পাবে না।"
(কুরআন, বনী ইস্রাঈল(ইসরা) ১৭:৬৮)

এখানে সুরা নাহলের ৪৫নং আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে। সুরা আনকাবুতের ৩৭নং আয়াতে একটি প্রাচীন জাতির কথা বলা হচ্ছে যারা তাদের নবীকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার জন্য আল্লাহর শাস্তির সম্মুখীন হয়েছিল। সুরা বনী ইস্রাঈলের ৬৮ নং আয়াতেও অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হচ্ছে।

আমরা যদি প্রসঙ্গসহ আলোচ্য আয়াতগুলো পড়ি, তাহলে দেখব যে এখানে কোন জায়গায় ভুমিকম্প, প্রবল ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির মূল কারণের ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি। বরং এই আয়াতগুলোতে অন্য প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে, ভুমিকম্প, প্রবল ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির কারণ তো দূরের প্রসঙ্গ, এখানে ২টি আয়াতে অবিশ্বাসীদেরকে আল্লাহর শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করা হয়েছে। আর অপর আয়াতে একটি প্রাচীন জাতির ধ্বংসের ইতিহাস বর্ণণা করা হয়েছে। ভুমিকম্প, প্রবল ঘূর্ণিঝড় ইত্যাদির মূল কারণ কাফেরদের নিধন করা— এমন কথা এসব জায়গায় বলা হয়নি। বলা হয়েছে যে এগুলোর দ্বারা আল্লাহ মানুষকে শাস্তি দিতে পারেন।

কুরআনের মূল প্রসঙ্গ থেকে দূরে সরে গিয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটি প্রসঙ্গ নিয়ে এসে মিথ্যা অভিযোগ তৈরি করার একটি জ্বলন্ত উদাহরণ এটি।

অভিযোগকারীরা প্রশ্ন তুলেছেনঃ “তবে মুসলিম দেশগুলোতে এত ভুমিকম্প সংঘটিত হয় কেন?”

১৯০০ সাল থেকে এই পর্যন্ত যতগুলো শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়েছে তার মধ্যে মুসলিম দেশ ছিল মাত্র একটি, ইন্দোনেশিয়া! দেখুন- http://earthquake.usgs.gov/earthquakes/world/10_largest_world.php

যেখানেই টেকটনিক প্লেটের সংঘর্ষ হয়, সেখানেই ভুমিকম্প হয়। সেখানে মুসলমান থাকুক আর না থাকুক, কিছুই যায় আসে না। আজকে যদি সব মুসলমান সেখান থেকে সরে যায় এবং হিন্দুরা গিয়ে সেখানে থাকা শুরু করে, তখন ভুমিকম্পটাও সেখান থেকে সরে যাবে না। আল্লাহ তাঁর বানানো মহাবিশ্বের নিয়ম, পদার্থ বিজ্ঞানের আইন মুসলিমদের জন্য আলাদা করে তৈরি করেন নি।

একটা বিষয় আপনাকে মাথায় রাখতে হবে- আল্লাহ্ যদি মুসলিম দেশগুলোকে সবরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে বাঁচিয়ে রাখতেন তাহলে কারও কোন সন্দেহ থাকতো না আল্লাহর সম্পর্কে। তখন আর পরীক্ষা বলে কিছু থাকতো না।

এ ছাড়া পবিত্র কুরআন বা হাদিসে মোটেও এ কথা বলা হয়নি যে মুসলিমদের দুনিয়ার জীবনে কোন পরীক্ষা করা হবে না বা বিপদ দেয়া হবে না। বরং উল্টোটিই কুরআন ও হাদিসে বলা আছে।

“ মানুষ কি মনে করে যে, তারা একথা বলেই অব্যাহতি পেয়ে যাবে যে, “আমরা বিশ্বাস করি”; এবং তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে না? আমি তাদেরকেও পরীক্ষা করেছি, যারা তাদের পূর্বে ছিল। আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন যারা সত্যবাদী এবং নিশ্চয়ই জেনে নেবেন মিথ্যুকদেরকে।”
(কুরআন, আনকাবুত ২৯:২-৩)

" এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করব কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, মাল ও জানের ক্ষতি ও ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্য্যশীলদের। যখন তারা বিপদে পতিত হয়, তখন বলে – “নিশ্চয়ই আমরা সবাই আল্লাহর জন্য এবং আমরা সবাই তাঁরই কাছে ফিরে যাবো।” তারাই হচ্ছে সে সমস্ত লোক, যাদের প্রতি আল্লাহর অফুরন্ত অনুগ্রহ ও রহমত রয়েছে এবং এসব লোকই সুপথপ্রাপ্ত। "
(কুরআন, বাকারাহ ২:১৫৫-১৫৭)

দুনিয়ার জীবনের কষ্ট ও দুর্ভোগ মুমিনদের জন্য চূড়ান্তভাবে কল্যাণ নিয়ে আসে।

"নিশ্চয় কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।অবশ্যই কষ্টের সাথে স্বস্তি রয়েছে।"
(কুরআন, ইনশিরাহ ৩৪:৫-৬)

আবদুল্লাহ ইবন মুহাম্মদ (র).........আবু সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্নিত যে, নবী (ﷺ) বলেছেনঃ মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল যাতনা, রোগ ব্যাধি, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তা, কষ্ট ও পেরেশানী আপতিত হয়, এমনকি যে কাঁটা তার দেহে বিদ্ধ হয়, এ সবের দ্বারা আল্লাহ তার গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দেন।
[সহীহুল বুখারী, হাদিস : ৫৬৪২, অধ্যায়: রোগী। অনুচ্ছেদ: রোগের কাফ্ফারা ও ক্ষতিপূরণ]

১৫

নাস্তিকতার বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই ৩ - নাস্তিকতার অবাস্তব প্রস্তাবনা

-আসিফ আদনান

২০০ টি মার্বেল নিন। প্রতিটির গায়ে ১, ২, ৩... এভাবে একটি করে সংখ্যা লিখুন। একটা বড় টেবিল নিন। টেবিলে ২০০টি মার্বেল সাইযের গর্ত করুন। প্রতিটি গর্তের জন্য একটি করে সংখ্যা অ্যাসাইন করুন।

.

এখন আপনার কাছে ১-২০০ লেখা ২০০টি মার্বেল এবং টেবিলে ২০০টি গর্ত আছে। মার্বেলগুলোকে টেবিলে ছুড়ে দিন। প্রতিটি মার্বেলের কোন না কোন গর্তে পড়ার সম্ভাব্যতা কত? আর প্রতিটি মার্বেল গর্তে পড়বে এবং মার্বেলের গায়ে যে নাম্বারটি লেখা সেই নাম্বারের গর্তেই পড়বে (অর্থাৎ ১ লেখা মার্বেল পড়বে ১ লেখা গর্তে, ২ লেখা মার্বেল পড়বে ২ লেখা গর্তে – এভাবে ২০০ পর্যন্ত) – এর সম্ভাব্যতা কত?

.

আচ্ছা যদি আপনি ২০০ বার এই কাজটা করেন, অর্থাৎ মার্বেল ছুড়ে দেন, তাহলে দুইশবারই এই ভাবে সঠিক নাম্বারের গর্তে সঠিক নাম্বারের মার্বেল পড়ার সম্ভাব্যতা কত?

.

হিসেবটা করতে থাকুন। ততক্ষণে আসুন অবিশ্বাসের বিশ্বাস নিয়ে কিছুটা আলোচনা করা যাক।

.

হাবল টেলিস্কোপের ডেইটার ভিত্তিতে ধারণা করা হয় দৃশ্যমান মহাবিশ্বে (বা মহাবিশ্বের যতোটুকু আমরা দেখতে সক্ষম হয়েছি) গ্যালাক্সির সংখ্যা ২০০ বিলিয়ন। (যদিও সাম্প্রতিক কিছু গবেষণা অনুযায়ী সংখ্যাটা আরো দশগুণ বেশি হতে পারে[1]) নাসার ভাষ্যমতে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সীতে গ্রহের সংখ্যা ১০০ বিলিয়ন। আর দৃশ্যমান মহাবিশ্বে গ্রহের সংখ্যা হল কারও মতে ১ অক্টলিয়ন = ১ এর পর ২৭টি শূন্য, আর কারও মতে ১ সেপ্টিলিয়ন = ১ এর পর ২৪টি শূন্য । (তবে মহাবিশ্বে গ্যালাক্সীর সংখ্যা যদি ২০০ বিলিয়নের জায়গায় ২০০০ বিলিয়ন হয় তাহলে গ্রহের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পাবে।)

.

ষাটের দশকে ধারণা করা হত, কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার জন্য শুধু দুটি গুরুত্বপূর্ণ জিনিসের প্রয়োজনঃ

.

১) সঠিক ধরনের নক্ষত্র (star), এবং
২) সেই সঠিক ধরনের নক্ষত্র থেকে সঠিক দূরত্বে অবস্থিত একটি গ্রহ।

.

সঠিক ধরনের নক্ষত্র বলার কারন হল যে কোন ধরনের নক্ষত্র হলেই তা প্রাণের জন্য সহায়ক হবে না। আর সঠিক দূরত্ব বলার কারন হল, প্রাণের জন্য গ্রহের তাপমাত্রা একটি নির্দিষ্ট রেইঞ্জের মধ্যে থাকতে হবে। তাই যদি কোন গ্রহ, নক্ষত্রের খুব বেশি কাছে বা খুব বেশি দূরে হয় তাহলে সেই গ্রহের তাপমাত্রা প্রাণের জন্য সহায়ক হবে না। অর্থাৎ কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্ব থাকার জন্য এই দুটি চলকের (variable) নির্দিষ্ট (অথবা নির্দিষ্ট রেইঞ্জের মধ্যে) মান থাকা আবশ্যক।

.

এটা ছিল ষাটের দশকের ধারণা। অ্যাস্ট্রোনমার কার্ল স্যাইগান ১৯৬৬ প্রথম এই ধারনার কথা ঘোষণা করেন। স্যাইগান এবং তার রিসার্চ টিম হিসেব করে দেখেছিলেন এই দুটো প্যারামিটার অনুযায়ী মহাবিশ্বের সব নক্ষত্রের (Star) মধ্যে ০.০০১% নক্ষত্রের পক্ষে প্রাণের জন্য সহায়ক হওয়া সম্ভব। স্যাইগানের ভাষায় –

.

"মহাবিশ্বে গ্রহ আছে ১ অকটিলিয়নের মতো – অর্থাৎ একের পর ২৪টি শূন্য। সুতরাং প্রাণের জন্য সহায়ক গ্রহের সংখ্যা হওয়া উচিৎ ১ সেপটিলিয়নের মতো – অর্থাৎ ১ এর পর ২১টি শূন্য[2]।"

.

পরবর্তী প্রায় অর্ধ শতকে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক এরকম আরো দুইশটি প্যারামিটার/চলক খুঁজে পেয়েছেন বিজ্ঞানীরা । অর্থাৎ স্যাইগানের দাবিমতো ২টি নয়, বরং কোন গ্রহে প্রাণের অস্তিত্বের জন্য ২০০টির মত চলকের সুনির্দিষ্ট মান থাকা আবশ্যক।

.

এরকম কিছু প্যারামিটারের উদাহরণ দেওয়া যাক। যেকোন ছায়াপথ বা গ্যালাক্সি প্রাণের জন্য সহায়ক হবে না। গ্যালাক্সাটিকে একটি স্পাইরাল গ্যালাক্সি হতে হবে (যেমন মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সি)। গ্যালাক্সিটিকে একটি নির্দিষ্ট আকারের হতে হবে, তার চাইতে বড় কিংবা ছোট হলে হবে না। গ্যালাক্সিটিকে একটি নির্দিষ্ট বয়সের হতে হবে।

.

স্যাইগানের দুটো প্যারামিটারের সাথে শুধু এই নতুন প্যারামিটারগুলো বসাবার পরই হিসেব থেকে মহাবিশ্বের মোট গ্যালাক্সির প্রায় ৯০ শতাংশকে বাদ দিতে হয়।

.

এছাড়া শুধু নির্দিষ্ট ধরনের গ্যালাক্সিতে সঠিক ধরনের নক্ষত্র হলেই হবে না, সেই নক্ষত্রকে ঐ স্পাইরাল গ্যালাক্সির সঠিক অঞ্চলে অবস্থিত হতে হবে। নক্ষত্রের আকার একটি নির্দিষ্ট রেইঞ্জের মধ্যে হতে হবে, তার ভর একটি নির্দিষ্ট রেইঞ্জের মধ্যে হতে হবে। শুধু তাই না, প্রাণের জন্য সহায়ক হতে গেলে একটি নির্দিষ্ট ধরনের সৌরজগত লাগবে, নির্দিষ্ট ধরনের গ্রহ লাগবে, নির্দিষ্ট ধরনের উপগ্রহ লাগবে, ঐ গ্রহের আশেপাশের গ্রহগুলোকে কিছু নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন হতে হবে। এভাবে লিস্ট লম্বা হতেই থাকে।

.

এরকম আরো কিছু প্যারামিটারের জন্য দেখতে পারেন –
http://www.reasons.org/articles/fine-tuning-for-life-on-earth-june-2004
http://www.konkyo.org/English/DoesLifeExistOnAnyOtherPlanetInTheUniverseAnotherLookAtSETI

.

মনে রাখবেন স্যাইগানের মাত্র দুটো প্যারামিটারের কারনে মহাবিশ্বের সব নক্ষত্রের (Star) মধ্যে প্রাণের জন্য সহায়ক হওয়া সম্ভব এমন নক্ষত্রের সংখ্যা নেমে এসেছিলে ০.০০১% -এ। দুশোটা প্যারামিটারের জন্য হিসেবটা কি হবে?

.

অ্যাস্ট্রোফিযিসিস্ট ডঃ হিউ রসের হিসেব অনুযায়ী ৩২টি প্যারামিটার জন্য, অর্থাৎ কোন একটি গ্রহের ৩২ টি প্যারামিটার পূর্ণ করার সম্ভাবনা হল ১/১ ট্রেডেকসিলিয়ন [১ ট্রেডেকসিলিয়ন = ১ এর পর ৪২টি শূন্য]।অবশ্যই ডঃ রসের হিসেব সম্পর্কে আপত্তি তোলা যেতে পারে। কারন কোন নির্দিষ্ট প্যারামিটারের জন্য তার এস্টিমেশানের হয়তো অন্যান্য বিজ্ঞানীদের সাথে মিলবে না। কিছু প্যারামিটারের ক্ষেত্রে হয়তো অন্যান্য বিজ্ঞানীরা সম্ভাব্যতার মানকে ভিন্ন ভাবে ধরবেন।

.

কিন্তু তাতেও এই সত্যটা বদলায় না যে এই মহাবিশ্বের কোন একটি গ্রহে প্রাণের বিকাশের জন্য (জটিল ও বুদ্ধিমান প্রাণের কথা বাদই দিলাম) বিস্ময়কর ধরনের সুনির্দিষ্ট প্রেক্ষাপটের প্রয়োজন। কাকতালীয়ভাবে সঠিক সিকোয়েন্সে একের একের পর এক দুর্ঘটনার মাধ্যমে এরকম একটি ফলাফল পাওয়া গেছে - যেকোন সাধারন বুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের এটা বিশ্বাস করতে ভালো রকমের কষ্ট করতে হবে।

.

যতোই সময় যাচ্ছে, এলেমেলো বিস্ফোরণ এবং মহাবিশ্বের random বিবর্তনের বদলে বিজ্ঞানীর বরং মহাবিশ্বের মাঝে একটি ফাইন টিউনিং (fine tuning) লক্ষ্য করছেন। যার ফলে পৃথিবীতে জটিল ও বুদ্ধিসম্পন্ন প্রাণের বিকাশ সম্ভব হয়েছে। এখানে শুধুমাত্র মহাবিশ্বের কোন একটি গ্রহের প্রাণের জন্য সহায়ক হবার জন্য প্রয়োজনীয় ফাইন টিউনিং সম্পর্কে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় ফাইন টিউনিং এর গল্পটা আরো অনেক, অনেক বিস্ময়কর। কিন্তু সেটা আরেক দিনের জন্য তোলা থাক।

.

বলা যায় একজন মানুষকে একটা বিশেষ ধরনের ইন্ডক্ট্রিনেশানের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে সাধারন বিবেচনাবোধকে উপেক্ষা করে এমন অতিপ্রাকৃত এবং সত্যি কথা বলতে, অলৌকিক একের পর এক দুর্ঘটনা randomly ঘটেছে এমনটা বিশ্বাস করার জন্য।

.

আর নাস্তিকতার প্রস্তাবনা ঠিক এটাই। তাদের বক্তব্য হল একের পর এক সুনির্দিষ্ট দুর্ঘটনার ফলে দৈবক্রমে এই সুনির্দিষ্ট ফলাফল এসেছে।

.

আমাদের প্রথম প্রশ্নে ফেরত যাওয়া যাক। এই উদাহরনের ক্ষেত্রে যদি আমি আপনাকে বলি দুইশো বার মার্বেল ছুড়ে দেবার পর দুইশোবারই সঠিক নাম্বারের গর্তে সঠিক নাম্বারের মার্বেল পড়বে, এবং এটাই স্বাভাবিক- তাহলে কি আপনি বিশ্বাস করবেন?

.

অবশ্যই না। কারন স্বাভাবিক ভাবে কখনোই এমনটা ঘটে না। আমরা – অর্থাৎ মানবজাতি- কখনোই এমনটা ঘটতে দেখি না, দেখি নি।

.

যদি আপনি সায়েন্টিফিক মেথডের কথা চিন্তা করেন তাহলে প্রথমে পর্যবেক্ষনের ভিত্তিতে হাইপোথিসিস তৈরি করা হবে। আর তারপর সেই হাইপোথিসিসকে পরীক্ষা (Experiment) করতে হবে । কোন হাইপোথিসিস বা ধারণার সত্য হবার জন্য অবশ্যই পরীক্ষায় পর্যবেক্ষণীয় উপাত্তকে (Observable Data) আপনার হাইপোথিসিসের সাথে ম্যাচ করতে হবে, এবং এই পরীক্ষাকে পুনরাবৃত্তি করে একই ফলাফল আনতে পারতে হবে (results of the experiment must be repeatable)।

.

এখন চিন্তা করে দেখুন দৈবক্রমে একের পর এক দুর্ঘটনার মাধ্যমে ফাইন টিউনড মহাবিশ্বে একটি ফাইন টিউনড গ্রহে জটিল ও বুদ্ধিমান প্রাণের উৎপত্তি সংক্রান্ত হাইপোথিসিস বা ধারণা কি আমাদের পর্বেক্ষনীয় উপাত্ত বা Observable Data দ্বারা সমর্থিত? এই হাইপোথিসিস কি আদৌ পরীক্ষা করা সম্ভব? কোন এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে সত্যায়ন করা সম্ভব? সেই পরীক্ষার ফলাফলের কি পুনরাবৃত্তি করা সম্ভব?

.

পরিষ্কারভাবেই নিছক দুর্ঘটনাবশত এই মহাবিশ্বের সৃষ্টি এবং একের পর এক দুর্ঘটনার মাধ্যমে by chance প্রাণের উদ্ভব ও বিকাশের ব্যাপারে নাস্তিকদের প্রস্তাবনা এই প্রস্তাবনা একটি হাইপোথিসিস ছাড়া আর কিছুই না। এবং বেশ দুর্বল হাইপোথিসিস। কিন্তু নাস্তিকরা এই দুর্বল হাইপোথিসিসকে বাস্তব সত্য হিসেবে বিশ্বাস করে। যদিও তাদের এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে কোন প্রমাণ নেই, এবং সাধারণ বিবেচনাবোধের সাথে এই বিশ্বাস সাংঘর্ষিক।

.

শুধু তাই না তারা এই অবৈজ্ঞানিক ও অযৌক্তিক বিশ্বাসকে বিজ্ঞানসম্মত বলেও প্রচার করে, এবং তাদের এই অযৌক্তিক বিশ্বাসকে বুদ্ধিবৃত্তির শিখর মনে করে আত্মবিভ্রমে ভোগেন।

.

আর যখন তাদেরকে বলা হয় তাদের এই বিশ্বাসের স্বপক্ষে যুক্তি পেশ করার তখন তারা কেন অন্যদের বিশ্বাস ভুল তা প্রমানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আর এক কথায় এটাই নাস্তিকতার সবচেয়ে বড় এবং সফল বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই।

.

তারা সফলভাবে অন্য বিশ্বাসগুলোকে আক্রমণ করার মাধ্যমে তাদের নিজেদের বিশ্বাসের পক্ষে কোন প্রমাণ পেশ করার দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে, এবং নিজেদের অযৌক্তিক এবং ম্যাজিকাল বিলিফ সিস্টেমকে যৌক্তিকতা ও বিজ্ঞানমনস্কতার পোশাক পড়িয়ে নিতে সক্ষম হয়েছে। আর এটা করতে তারা সক্ষম হয়েছে নিজ ধর্মের প্রতি ধর্ম বিশ্বাসীদের রক্ষণাত্মক মনোভাবের কারনে।

.

যদি আমি দাবি করি আমি সঠিক তাহলে বাকি সবাইকে ভুল প্রমাণ করা আমার পক্ষে প্রমাণ না। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার দাবির পক্ষে অকাট্য প্রমাণ না আনতে পারছি ততক্ষণ আমার দাবি সঠিক প্রমাণিত হয় না। যদিও অন্য সবার দাবি ভুল হয়।

.

আস্তিকদের এই বিষয়টি উপলব্ধি করা উচিৎ যে নাস্তিকদের আবশ্যক দায়িত্ব তাদের প্রস্তাবনাকে সত্য প্রমাণ করা। বিশ্বাসীদের দায়িত্ব না তাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে নাস্তিকদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব দেওয়া। নাস্তিকরা নিত্যনতুন নকশা করবে আর বিশ্বাসীরা মনযোগ দিয়ে, সময় ব্যয় করে তাদের অসংলগ্ন কথাবার্তা, লজিকাল ফ্যালাসি, লিঙ্গুইস্টিক প্যারাডক্সের উত্তর দেবে - এটার কোন মানেই হয় না।

.

যদি নাস্তিকরা আসলেই তাদের বিশ্বাসের ব্যাপারে সিরিয়াস হয় তাহলে অবশ্যই তাদেরকে তাদের দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। যদি তারা তা না পারে তাহলে তাদেরকে অক্ষমতা স্বীকার করে নিতে হবে। যদি তারা কোনটাই না করে এবং জোর করে নিজেদের অযৌক্তিক, অবৈজ্ঞানিক, ম্যাজিকাল বিলিফ সিস্টেমকে সত্য বলে চালিয়ে দিতে চায় তাহলে তাদের বালকসুলভ ন্যুইসেন্সকে, ন্যুইসেন্স হিসেবেই গণ্য করা হবে।

.

আর তাই নাস্তিকদের আমরা বলি – যদি তোমরা সত্যবাদী হও তবে প্রমাণ উপস্থিত কর।

---

[1] https://www.spacetelescope.org/news...

[2] স্যাইগান ভুল করেছেন। ১ অক্টলিয়ন = ১ এর পর ২৭টি শূন্য, ১ সেপ্টিলিয়ন = ১ এর পর ২৪টি শূন্য, ১ সেক্সটিলিয়ন = ১ এর পর ২১টি শূন্য।

১৬

কুরআনে বিজ্ঞান- কাকতালীয় না বাস্তবতা?

-আরিফ আজাদ

দেবাশীষ বললো, – 'ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজা আর আমাজন জঙ্গলের রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে সভ্যতা খোঁজা একই ব্যাপার। দুইটাই হাস্যকর। হা হা হা হা।'

.

ওর কথায় অন্যরা খুব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। সাকিব বললো, – 'দেখ দেবাশীষ, অন্য ধর্মগ্রন্থগুলোর ব্যাপারে জানি না, তবে আল কোরানে এমন অনেক বৈজ্ঞানিক ফ্যাক্ট নিয়ে বলা আছে যা বিজ্ঞান অতি সম্প্রতিই জানতে পেরেছে।'

.

দেবাশীষ বিদ্রুপের সুরে বললো, – 'হ্যাঁ। এইজন্যই তো মুসলমানদের কেউই নোবেল পায়না বিজ্ঞানে। সব অই ইহুদি-খ্রিষ্ঠানরাই মেরে দেয়। এখন আবার বলিস না যেন অইসব ইহুদি-খ্রিষ্ঠানগুলা কোরান পড়েই এসব বের করছে। হা হা হা। পারিসও ভাই তোরা। হা হা হা।'

.

রাকিব বললো,- 'নোবেল লাভ করার উদ্দেশ্যে তো কোরান নাজিল হয়নি, কোরান এসেছে একটি গাইডবুক হিসেবে।মানুষকে মুত্তাকী বানাতে।'

– 'হুম, তো?'- দেবাশীষের প্রশ্ন।

.

রাকিব কিছু একটা বলতে যাচ্ছিলো। ঠিক সেসময় সাজিদ বলে উঠলো,- 'আমি দেবাশীষের সাথে একমত। আমাদের উচিত না ধর্মগ্রন্থগুলোর মধ্যে বিজ্ঞান খোঁজা।'

.

সাজিদের কথা শুনে আমরা সবাই 'থ' হয়ে গেলাম। কোথায় সে দেবাশীষকে যুক্তি আর প্রমান দিয়ে একহাত নেবে তা না, উল্টো সে দেবাশীষের পক্ষেই সাফাই করছে।

.

সাজিদ আবার বলতে লাগলো,- 'আরো ক্লিয়ারলি, বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মগ্রন্থগুলোকে যাচাই করা ঠিক না। কারণ, ধর্মগ্রন্থগুলো ইউনিক।পাল্টানোর সুযোগ নেই।কিন্তু বিজ্ঞান প্রতিনিয়তই পাল্টায়। বিজ্ঞান এতোই ছলনাময়ী যে, পৃথিবীর ইতিহাসের সবচে সেরা বিজ্ঞানি, স্যার আলবার্ট আইনষ্টাইনকেও তার দেওয়া মত তুলে নিয়ে ভুল স্বীকার করতে হয়েছে।'

.

দেবাশীষ বললো,- 'মানে? তুই কি বলতে চাস?'

.

সাজিদ মুচকি হাসলো। বললো,- 'দোস্ত, আমি তো তোকেই ডিফেন্ড করছি। বলছি যে, ধর্মগ্রন্থে বিজ্ঞান খোঁজা আর তা দিয়ে ধর্মগ্রন্থকে জাজ করা করাটা বোকামি। আচ্ছা বাদ দে। দেবাশীষ, শেক্সপিয়ারের রচনা তোর কা.ছে কেমন লাগে রে?'

আমি একটু অবাক হলাম। এই আলোচনায় আবার শেক্সপিয়ার কোথেকে এসে পড়লো? যাহোক, কাহিনী কোনদিকে মোড় নেয় দেখার জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।

.

দেবাশীষ বললো,- 'ভালো লাগে। কেনো?'

– 'হ্যামলেট পড়েছিস?'
– 'হ্যাঁ।'
– 'পড়ে নিশ্চয় কান্না পেয়েছে?'

.

দেবাশীষ বাঁকা চোখে সাজিদের দিকে তাকালো।সাজিদ বললো,- 'আরে বাবা, এটা তো কোন রোমান্টিক রচনা না যে এটা পড়ে মজা পেয়েছিস কিনা জিজ্ঞেস করবো। এটা একটা করুণ রসভিত্তিক রচনা। এটা পড়ে মন খারাপ হবে, কান্না পাবে এটাই স্বাভাবিক, তাই না?'
দেবাশীষ কিচ্ছু বললো না।

.

সাজিদ আবার বললো,- 'শেক্সপিয়ারের A Mid Summer Night's Dream পড়েছিস? কিংবা, Comedy Of Errors?'
– 'হ্যাঁ।
– 'Comedy Of Errors পড়ে নিশ্চই হেসে কুটিকুটি হয়েছিস, তাই না? 'হাহাহাহা।'

.

দেবাশীষ বললো,- 'হ্যাঁ। মজার রচনা।'
সাজিদ বললো,- 'তোকে শেক্সপিয়ারের আরেকটি নাটকের নাম বলি। হয়তো পড়ে থাকবি। নাটকের নাম হচ্ছে 'Henry The Fourth'. ধারনা করা হয়, শেক্সপিয়ার এই নাটকটি লিখেছিলেন ১৫৯৭ সালের দিকে এবং সেটি প্রিন্ট হয় ১৬০৫ সালের দিকে।'
– 'তো?'
– 'আরে বাবা, বলতে দে। সেই নাটকের একপর্যায়ে মৌমাছিদের নিয়ে দারুন কিছু কথা আছে। শেক্সপিয়ার দেখিয়েছেন, পুরুষ মৌমাছিদের একজন রাজা থাকে। রাজাটা নির্ধারিত হয় পুরুষ মৌমাছিদের ভেতর থেকেই। রাজা ব্যতীত, অন্যান্য মৌমাছিরা হলো সৈনিক মৌমাছি। এই সৈনিক মৌমাছিদের কাজ হলো মৌছাক নির্মান, মধু সংগ্রহ থেকে শুরু করে সব। রাজার নির্দেশমতো, সৈনিক মৌমাছিরা তাদের প্রাত্যহিক কাজ শেষ করে দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়ে রাজা মৌমাছির কাছে জবাবদিহি করে। অনেকটা প্রাচীন যুগের রাজা বাদশাহদের শাসনের মতো আর কি।'

.

আমরা সবাই শেক্সপিয়ারের গল্প শুনছি। কারো মুখে কোন কথা নেই।

.

সাজিদ আবার শুরু করলো-
'চিন্তা কর, শেক্সপিয়ারের আমলেও মানুষজনের বিশ্বাস ছিলো যে, মৌমাছি দু প্রকার। স্ত্রী মৌমাছি আর পুরুষ মৌমাছি। স্ত্রী মৌমাছি খালি সন্তান উৎপাদন করে, আর বাদবাকি কাজকর্ম করে পুরুষ মৌমাছিরা।'

.

সাকিব বললো,- 'তেমনটা তো আমরাও বিশ্বাস করি। এবং, এটাই তো স্বাভাবিক,তাই না?'
– 'হা হা হা। এরকমটাই হওয়া স্বাভাবিক ছিলো, কিন্তু মৌমাছির জীবনচক্র অন্যান্য কীট পতঙ্গের তুলনায় একদম আলাদা।'
– 'কি রকম?'- রাকিবের প্রশ্ন।

.

সাজিদ বললো,- '১৯৭৩ সালে অষ্ট্রিয়ান বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch 'Physiology of Medicine' বিষয়ে সফল গবেষণার জন্য চিকিৎবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছেন।তার গবেষণার বিষয় ছিল 'মৌমাছির জীবনচক্র'।অর্থাৎ, মৌমাছিরা কিভাবে তাদের জীবন নির্বাহ করে।

.

এই গবেষণা চালাতে গিয়ে তিনি এমন সব আশ্চর্জজনক জিনিস সামনে নিয়ে এলেন, যা শেক্সপিয়ারের সময়কার পুরো বিশ্বাসকে পাল্টে দিলো। তিনি ফটোগ্রাফি এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করে করে দেখিয়েছেন যে, মৌমাছি দুই প্রকার নয়, মৌমাছি আসলে তিন প্রকার।
প্রথমটা হলো, পুরুষ মৌমাছি।
দ্বিতীয়টি হলো স্ত্রী মৌমাছি। এই মৌমাছিদের বলা হয় Queen Bee. এরা শুধু সন্তান উৎপাদন করা ছাড়া আর কোন কাজ করে না। এই দুই প্রকার ছাড়াও আরো একপ্রকার মৌমাছি আছে। লিঙ্গভেদে এরাও স্ত্রী মৌমাছি তবে একটু ভিন্ন।'

.

– 'কি রকম?'- দেবাশীষ প্রশ্ন করলো।
'আমরা জানি, পুরুষ মৌমাছিরাই মৌচাক নির্মান থেকে শুরু করে মধু সংগ্রহ সব করে থাকে কিন্তু এই ধারনা ভুল। পুরুষ মৌমাছি শুধু একটিই কাজ করে, আর তা হলো কেবল রানী মৌমাছিদের প্রজনন প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা। মানে, সন্তান উৎপাদনে সহায়তা করা। এই কাজ ছাড়া পুরুষ মৌমাছির আর কোন কাজ নেই।'
– 'তাহলে মৌচাক নির্মান থেকে শুরু করে বাকি কাজ কারা করে?'- রাকিব জিজ্ঞেস করলো।
– 'হ্যাঁ। তৃতীয় প্রকারের মৌমাছিরাই বাদ বাকি সব কাজ করে থাকে। লিঙ্গভেদে এরাও স্ত্রী মৌমাছি, কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে এরা সন্তান জন্মদানে অক্ষম।সোজা কথায়, এদের বন্ধ্যা বলা যায়।'

.

আমি বললাম,- 'ও আচ্ছা।'

.

সাজিদ আবার বলতে লাগলো,- 'বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch এই বিশেষ শ্রেণীর স্ত্রী মৌমাছিদের নাম দিয়েছেন Worker Bee বা কর্মী মৌমাছি। এরা Queen Bee তথা রানী মৌমাছির থেকে আলাদা একটি দিকেই।সেটা হলো রানী মৌমাছির কাজ হলো সন্তান উৎপাদন, আর কর্মী মৌমাছির কাজ সন্তান জন্ম দেওয়া ছাড়া অন্যসব।'
সাকিব বললো,- 'বাহ, দারুন তো। এরা কি প্রাকৃতিকভাবেই সন্তান জন্মদানে অক্ষম হয়ে থাকে?'

.

– 'হ্যাঁ।'
– 'আরো, মজার ব্যাপার আছে। বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch আরো প্রমান করেছেন যে, এইসব কর্মী মৌমাছিরা যখন ফুল থেকে রস সংগ্রহে বের হয়, তখন তারা খুব অদ্ভুত একটি কাজ করে।সেটা হলো, ধর, কোন কর্মী মৌমাছি কোন এক জায়গায় ফুলের উদ্যানের সন্ধান পেলো যেখান থেকে রস সংগ্রহ করা যাবে। তখন অই মৌমাছিটি তার অন্যান্য সঙ্গীদের এই ফুলের উদ্যান সম্পর্কে খবর দেয়।

.

মৌমাছিটি ঠিক সেভাবেই বলে, যেভাবে যে পথ দিয়ে সে অই উদ্যানে গিয়েছিলো।মানে, এক্সাক্ট যে পথে সে এই উদ্যানের সন্ধান পায়, সে পথের কথাই অন্যদের বলে।আর, অন্যান্য মৌমাছিরাও ঠিক তার বাতলে দেওয়া পথ অনুসরণ করেই সে উদ্যানে পৌঁছে। একটুও হেরফের করেনা।বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch এই ভারি অদ্ভুত জিনিসটার নাম রেখেছে 'Waggle Dance'..

.

আমি বললাম,- 'ভেরি ইন্টারেষ্টিং......'
সাজিদ বললো,- 'মোদ্দাকথা, Karl Von-Frisch প্রমান করেছেন যে, স্ত্রী মৌমাছি দু প্রকারের। রানী মৌমাছি আর কর্মী মৌমাছি। দুই প্রকারের কাজ সম্পূর্ণ আলাদা।আর, পুরুষ মৌমাছি মৌচাক নির্মান, মধু সংগ্রহ এসব করে না। এসব করে কর্মী স্ত্রী মৌমাছিরাই।'
এই পুরো জিনিসটার উপর Karl Von-Frisch একটি বইও লিখেছেন। বইটির নাম- 'The Dancing Bees'. এই জিনিসগুলা

প্রমান করে তিনি ১৯৭৩ সালে চিকিৎসাবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পান।

.

এতোটুকু বলে সাজিদ থামলো। দেবাশীষ বললো,- ‘এতোকিছু বলার উদ্দেশ্য কি?’

.

সাজিদ তার দিকে তাকালো। এরপর বললো,- ‘যে জিনিসটা ১৯৭৩ সালে বিজ্ঞান প্রমান করেছে, সেই জিনিসটা ১৫০০ বছর আগে কোরান বলে রেখেছে।’
দেবাশীষ সাজিদের দিকে চোখ বড় বড় করে তাকালো।

.

সাজিদ বললো,- ‘কোরান যেহেতু আরবি ভাষায় নাজিল হয়েছে, আমাদের আরবি ব্যাকরণ অনুসারে তার অর্থ বুঝতে হবে। বাংলা কিংবা ইংরেজি কোনটাতেই পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য আলাদা আলাদা ক্রিয়া (Verb) ব্যবহৃত হয় না।

.

যেমন ইংলিশে পুংলিঙ্গের জন্য আমরা বলি, He does the work, আবার স্ত্রী লিঙ্গের জন্যও বলি, She does the work..

.

খেয়াল করো, দুটো বাক্যে জেন্ডার পাল্টে গেলেও ক্রিয়া পাল্টেনি। পুংলিঙ্গের জন্য যেমন does, স্ত্রীলিঙ্গের জন্যও does. কিন্তু আরবিতে সেরকম নয়। আরবিতে জেন্ডারভেদে ক্রিয়ার রূপ পাল্টে যায়।’

.

আমরা মনোযোগী শ্রোতার মতো শুনছি।

.

সে বলে যাচ্ছে-
‘কোরানে মৌমাছির নামেই একটি সূরা আছে। নাম সূরা আন-নাহল। এই সূরার ৬৮ নাম্বার আয়াতে আছে- ‘(হে মুহাম্মদ) আপনার রব মৌমাছিকে আদেশ দিয়েছেন যে, মৌচাক বানিয়ে নাও পাহাড়ে,বৃক্ষে এবং মানুষ যে গৃহ নির্মান করে, তাতে।’

.

খেয়াল কর, এখানে সন্তান জন্মদানের কথা বলা হচ্ছে না কিন্তু। মৌচাক নির্মানের কথা বলা হচ্ছে।
Karl Von-Frisch আমাদের জানিয়েছেন, মৌচাক নির্মানের কাজ করে থাকে স্ত্রী কর্মী মৌমাছি।এখন আমাদের দেখতে হবে কোরান কোন মৌমাছিকে এই নির্দেশ দিচ্ছে।স্ত্রী মৌমাছিকে? নাকি, পুরুষ মৌমাছিকে।

.

যদি পুরুষ মৌমাছিকে এইই নির্দেশ দেয়, তাহলে ধরে নিতে হবে, আধুনিক বিজ্ঞান অনুসারে কোরান ভুল। আরবি ব্যাকরণে, পুরুষ মৌমাছিকে মৌচাক নির্মান কাজের নির্দেশ দিতে যে ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় তা হলো ‘ইত্তাখিজ’ আর স্ত্রী মৌমাছির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয় ‘ইত্তাখিজি’।
অত্যন্ত আশ্চর্জনক ব্যাপার হচ্ছে, কোরান এই আয়াতে ‘মৌমাছিকে নির্দেশ দিতে ‘ইত্তাখিজ’ ব্যবহার না করে, ‘ইত্তাখিজি’ ব্যবহার করেছে।মানে, এই নির্দেশটা কোরান নিঃসন্দেহে স্ত্রী মৌমাছিকেই দিচ্ছে, পুরুষ মৌমাছিকে নয়।

.

বলতো দেবাশীষ, এই সুক্ষ্ম বৈজ্ঞানিক ব্যাপারটি মুহাম্মদ সাঃ ১৫০০ বছর আগে কোন মাইক্রোস্কোপ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছেন? এমনকি, শেক্সপিয়ারের সময়কালেও যেখানে এটা নিয়ে ভুল ধারনা প্রচলিত ছিলো?’
দেবাশীষ চুপ করে আছে। সাজিদ আবার বলতে লাগলো,- ‘শুধু এই আয়াত নয়, এর পরের আয়াতে আছে ‘অত:পর, চোষন করে নাও প্রত্যেক ফুল থেকে,এবং চল স্বীয় রবের সহজ-সরল পথে’।

.

চোষণ বা পান করার ক্ষেত্রে আরবিতে পুংলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় ‘কুল’ শব্দ, এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় ‘কুলি’। কোরান

এখানে ‘ক্কুল’ ব্যবহার না করে ‘ক্কুলি’ ব্যবহার করেছে। ‘সহজ সরল পথে’ চলার নির্দেশের ক্ষেত্রে পুংলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত শব্দ ‘উসলুক’, এবং স্ত্রীলিঙ্গের জন্য ব্যবহৃত হয় ‘উসলুকি’। মজার ব্যাপার, কোরান ‘উসলুক’ ব্যবহার না করে, ‘উসলুকি’ ক্রিয়া ব্যবহার করেছে।মানে, নির্দেশটা পুরুষ মৌমাছির জন্য নয়, স্ত্রী মৌমাছির জন্য।

.

আরো মজার ব্যাপার, এই আয়াতে কোরান মৌমাছিকে একটি ‘সহজ সরল’ পথে চলার নির্দেশ দিচ্ছে।আচ্ছা, মৌমাছির কি পরকালে জবাবদিহিতার কোন দায় আছে? পাপ পূণ্যের? নেই। তাহলে তাদের কেনো সহজ সরল পথে চলার নির্দেশ দেওয়া হলো?

.

খেয়াল কর, বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch মৌমাছিদের ব্যাপারে যে আশ্চর্যজনক ব্যাপারটি লক্ষ্য করেছেন, তা হলো- তারা ঠিক যে পথে কোন ফুলের উদ্যানের সন্ধান পায়, ঠিক একই পথের,একই রাস্তা অন্যদের বাতলে দেয়।কোন হেরফের করে না। অন্যরাও ঠিক সে পথ অনুসরণ করে উদ্যানে পৌঁছে।এটাই তাদের জন্য সহজ-সরল পথ।বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch এটার নাম দিয়েছেন ‘Waggle Dance’. কোরানও কি ঠিক একই কথা বলছে না?

.

দেবাশীষ, এখন তোকে যদি প্রশ্ন করি, কোরান কি এই জিনিসগুলো বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch এর থেকে নকল করেছে? তোর উত্তর হবে ‘না।’ কারন, তিনি এসব প্রমান করেছেন মাত্র সেদিন। ১৯৭৩ সালে। কোরান নাজিল হয়েছে আজ থেকে ১৫০০ বছর আগে। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাবিহীন নিরক্ষর মুহাম্মদ সাঃ এই বৈজ্ঞানিক ব্যাপারগুলো ঠিক কোথায় পেলেন? কোরান কেনো এই নির্দেশগুলো পুরুষ মৌমাছিকে দিলো না? কেনো স্ত্রী মৌমাছিকে দিলো?

.

যদি এই কোরান সুপার ন্যাচারাল কোন শক্তি, যিনিই এই মৌমাছির সৃষ্টিকর্তা, যিনিই মৌমাছিদের এই জীবনচক্রের জন্য উপযুক্ত করে সৃষ্টি করেছেন তার নিকট থেকে না আসে, তাহলে ১৫০০ বছর আগে আরবের মরুভূমিতে বসে কে এটা বলতে পারে?

.

যে জিনিস ১৯৭৩ সালে আবিষ্কার করে বিজ্ঞানি Karl Von-Frisch নোবেল পেলেন, তা কোরানে বহু শতাব্দী আগেই বলা আছে।কই, মুসলিমরা কি দাবি করেছে Karl Von-Frisch কোরান থেকে নকল করেছে? করে নি। মুসলিমরা কি তার নোবেল পুরষ্কারে ভাগ বসাতে গেছে? না, যায় নি।কারন এর কোনটাই কোরানের উদ্দেশ্য নয়।

.

আমরা বিজ্ঞান দিয়ে কোরানকে বিচার করি না, বরং, দিনশেষে, বিজ্ঞানই কোরানের সাথে এসে কাঁধে কাঁধ মিলায়।

.

এতোটুকু বলে সাজিদ থেমে গেলো। দেবাশীষ কিছুই বলছে না। সাকিব আর রাকিবের চেহারাটা তখন দেখার মতো। তারা খুবই উৎফুল্ল এবং খোশমেজাজি একটা চেহারায় দেবাশীষের দিকে তাকিয়ে আছে। যেন তারা বলতে চাইছে- ‘দে দে ব্যাটা। পারলে এবার কোন উত্তর দে............’

১৭

"আল-কুরআন কী?" (What is Qur'an)

-একের আহ্বানে - Calling to the One

আল-ক্বুর'আন - আল ফুরক্বান। সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী। ক্বিয়ামত পর্যন্ত মানব জাতির জন্য দিকনির্দেশনা। সেই কিতাব, সেই মহাগ্রন্থ যার মাধ্যমে আল্লাহ রাব্বুল ইযযাহ আমাদের প্রতি তাঁর নি'আমত সম্পূর্ণ করেছেন, আমাদের দ্বীনকে পূর্ণ করেছেন। এটা হল সেই কিতাব যার কারনে সমগ্র আরব, সমগ্র বিশ্ব রাহমাতুললিল আলামিন মুহাম্মাদ ইবন আব্দুল্লাহর ﷺ বিরোধিতা করেছে। এটা হল সেই কিতাব যা মানব জাতিকে তাওহিদের মাপকাঠিতে পৃথক করেছে, হক্ব ও বাতিলকে সুস্পষ্ট করেছে। এটা হল সেই কিতাব যা মানবিতিহাসের গতিপথ বদলে দিয়েছে। এটা হল সেই কিতাব যা আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় আপনার ও আমার মুক্তির চাবি।

.

আর এটা হল সেই কিতাব যার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় ওরয়েন্টালিস্ট, নাস্তিক ও মুশরিক আজো ব্যর্থ। আর তাই এই কিতাবের ব্যাপারে তাদের আক্রোশটাও সবচেয়ে বেশি। একারনে তারা ক্রমাগত চালিয়ে যায় এই ক্বুর'আনের ব্যাপারে নানা ধরনের মিথ্যে প্রচারণা। আর অজ্ঞতার কারনে অনেক মুসলিম ভাইবোন এতে বিভ্রান্ত হয়ে যান।

.

এই বিভ্রান্তিতে থেকে বাঁচার উপায় হল দ্বীন সম্পর্কে 'ইলম অর্জন করা। নাস্তিকদের, ইসলামবিদ্বেষীদের যুক্তিখন্ডনের চাইতেও প্রকৃতপক্ষে এ কাজটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু দুঃখজনকভাবে দ্বীন নিয়ে তর্কে আমাদের যতোটা আগ্রহ দেখা যায়, দ্বীন সম্পর্কে জানার ও দ্বীনকে পালনের ক্ষেত্রে অতোটা আগ্রহ আমরা দেখাই না। আবার অনেক সময় দেখা যায় জানার ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও আমরা বুঝতে পারি না ঠিক কোন জায়গা থেকে শুরু করা উচিৎ। আর ঠিক এ দুর্বলতার সুযোগ নেয় নাস্তিক-ইসলামবিদ্বেষী ও ওরিয়েন্টালিস্টরা।

.

তাই এ শুধুমাত্র যুক্তিখন্ডনই, সত্যকথনের পক্ষ থেকে আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করবো আমাদের মাঝে বিদ্যমান এ অজ্ঞানতা ও দুর্বলতাকে দূর করার - ইন শা আল্লাহ। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে আজ আমরা আপনাদের জন্য উপস্থাপন করছি একের আহ্বানে-Calling to The One কর্তৃক প্রকাশিত ভিডিও* - "আল-ক্বুর'আন কী? (What is Qur'an)। ইন শা আল্লাহ ৬ মিনিটের এই ছোট্ট ভিডিওটি আমাদের অনেক কনফিউশান দূর করতে সক্ষম হবে।

.

ভিডিওটির ইউটিউব লিঙ্কঃ https://youtu.be/nSHED-pmfeE
ভিডিওটির লিখিত ট্রান্সক্রিপ্টের জন্য দেখুনঃ https://www.facebook.com/971473962974903/videos/1030917580363874/

১৮

সাহাবী উবাই বিন কা’ব(রা) এর কুরআনে কি আসলেই দুইটি অতিরিক্ত সুরা ছিল?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

প্রখ্যাত সাহাবী উবাই বিন কা’ব(রা) এর মুসহাফের{লিপিবদ্ধ পূর্ণ কুরআন} সুরাসংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তোলে দেশ-বিদেশের খ্রিষ্টান মিশনারী, তাদের মিডিয়া ইভানজেলিস্ট, নাস্তিক-মুক্তমনা এবং বিদেশী ওরিয়েন্টালিস্টরা।তারা বিরামহীনভাবে প্রচারণা চালিয়ে যাচ্ছে যে—সাহাবী উবাই বিন কা’ব(রা) এর ব্যক্তিগত মুসহাফে ১১৬টি সুরা ছিল-অর্থাৎ দুইটি ‘অতিরিক্ত’ সুরা ছিল।এ দ্বারা তার প্রমাণ করতে চায় যে বর্তমান কুরআনের সাথে সাহাবীদের কুরআনে সুরাসংখ্যায় বেশি-কম ছিল।এভাবে তারা উসমান(রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআনের গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়। অর্থাৎ কুরআন নাকি যথার্থরূপে সংরক্ষণ করা হয়নি।এর এহেন প্রশ্ন তোলার অর্থ হচ্ছে ইসলামকেই প্রশ্নবিদ্ধ করা।

এহেন দাবি তোলার জন্য ইসলামবিরোধীরা নিম্নের বর্ণণাটি ব্যবহার করে—

“এবং উবাই(রা) এর মুসহাফে ছিল ১১৬টি(সুরা/অধ্যায়) এবং শেষ থেকে তিনি লিপিবদ্ধ করেন সুরা হাফদ এবং খাল’। ”
[আল ইতকান, জালালুদ্দিন সুয়ুতি, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২২৬]
উল্লেখ্য, ‘সুরা’ শব্দের অর্থ অধ্যায়।
উবাই(রা) তাঁর মুসহাফে যে অতিরিক্ত অংশটুকু লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাও জালালুদ্দিন সুয়ুতি(র) বর্ণণা করেছেনঃ
اللَّهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ وَنَسْتَغْفِرُكَ وَنُثْنِي عَلَيْكَ وَلَا نُكْفُرُكَ وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَنْ يَفْجُرُكَ
.اللَّهُمَّ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَلَكَ نُصَلِّي وَنَسْجُدُ وَإِلَيْكَ نَسْعَى وَنَحْفِدُ نَرْجُو رَحْمَتَكَ وَنَخْشَى عَذَابَكَ إِنَّ عَذَابَكَ بِالْكُفَّارِ مُلْحَقٌ

অর্থঃ হে আল্লাহ, আমরা শুধু আপনার কাছেই সাহায্য চাই, শুধু আপনার কাছেই ক্ষমা চাই, আপনার গুণগান করি, আপনার অকৃতজ্ঞ হই না, আর যারা আপনার অবাধ্য তাদের থেকে আলাদা ও বিচ্ছিন্ন হই। হে আল্লাহ, আমরা শুধু আপনারই ইবাদত করি, শুধু আপনার নিকট প্রার্থনা করি, শুধু আপনার প্রতি নত হই(সিজদাহ করি), আপনার দিকে ধাবিত হই।আর আমরা আপনার কঠিন শাস্তিকে ভয় করি, আপনার দয়ার আশা রাখি।নিশ্চয়ই আপনার শাস্তি তো অবিশ্বাসীদের জন্য নির্ধারিত।
[আল ইতকান, জালালুদ্দিন সুয়ুতি ১/২২৭]

কোন কোন রেওয়ায়েতে সামান্য কিছু শব্দের পার্থক্য দেখা যায়।
জালালুদ্দিন সুয়ুতি(র) এরকম অনেক রেওয়ায়েত বর্ণণা করেছেন যাতে উল্লেখ আছে যে সাহাবী(রা)গণ নামাজে এই “সুরা”দ্বয় পাঠ করেছেন। যে শব্দগুলোকে কুরআনের সুরার সাথে মিলিয়ে অপপ্রচার চালানো হচ্ছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে জিব্রাঈল(আ) কর্তৃক রাসুল(ﷺ)কে শেখানো দোয়া।

ইমাম বাইহাকী(র) বর্ণণা করেছেনঃ
بَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو عَلَى مُضَرَ إِذْ جَاءَهُ جَبْرَئِيلُ فَأَوْمَأَ إِلَيْهِ أَنِ اسْكُتْ فَسَكَتَ، فَقَالَ: " يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ لَمْ يَبْعَثْكَ سَبَّابًا وَلَا لَعَّانًا، وَإِنَّمَا بَعَثَكَ رَحْمَةً، وَلَمْ يَبْعَثْكَ عَذَابًا {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَإِنَّهُمْ ظَالِمُونَ} [آل عمران: 128] ثُمَّ عَلَّمَهُ هَذَا الْقُنُوتَ: اللهُمَّ إِنَّا نَسْتَعِينُكَ ...
“যখন রাসুলুল্লাহ(ﷺ) মুদ্বার গোত্রের বিরুদ্ধে দোয়া করছিলেন, জিব্রাঈল(আ) তাঁর নিকট আসলেন এবং তাঁকে থামতে ইঙ্গিত করলেন, তাই তিনি থেমে গেলেন।এরপর জিব্রাঈল(আ) বললেন, “হে মুহাম্মাদ(ﷺ), আল্লাহ আপনাকে অবমূল্যায়ন করতে বা

দোষ দিতে পাঠাননি বরং তিনি আপনাকে এক দয়াস্বরূপ পাঠিয়েছেন।আর তিনি আপনাকে আযাব আনবার জন্যও পাঠাননি।
.
{এরপর বললেন} “তিনি(আল্লাহ) তাদেরকে ক্ষমা করবেন কিংবা শাস্তি দেবেন এটা আপনার সিদ্ধান্ত নয়, আর নিশ্চয়ই তারা তো জালিম।”(আলি ইমরান ৩:১২৮)

এরপর তিনি তাঁকে কুনুতটি শিক্ষা দিলেনঃ “হে আল্লাহ, আমরা শুধু আপনার কাছেই সাহায্য চাই,... ...”। ”
(সুনানুল কুবরা, ইমাম বাইহাকী, হাদিস নং ৩১৪২)

আনাস(রা)কে আব্বান বিন আবু আয়াশ এ কুনুতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি উত্তর দেনঃ
وَالله إن أَنْزَلَتَا إِلَّا من السَّمَاء
অর্থঃআল্লাহর শপথ, এগুলো তো আসমান থেকে নাজিল হয়েছে।
(দুররে মানসুর(দারুল ফিকর, বৈরুত থেকে প্রকাশিত),জালালুদ্দিন সুয়ুতি, খণ্ড ৮, পৃষ্ঠা ৬৯৫)

অতএব আমরা দেখলাম যে, নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) যখন জালিম মুদ্বার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে দোয়া করছিলেন, তখন ফেরেশতা জিব্রাঈল(আ) এসে তাঁকে স্মরণ করিয়ে দেন যে আল্লাহ তাঁকে দয়াস্বরূপ প্রেরণ করেছেন। এরপর তিনি তাঁকে সেই কুনুতটি(নামাজে পাঠ করা দোয়া) শিখিয়ে দেন।জালালুদ্দিন সুয়ুতি(র) তাঁর আল ইতকানের বিভিন্ন বর্ণনায়{দেখুন আল ইতকান ১/২২৭-২২৮} উমার(রা), উবাই(রা) এবং আবু মুসা(রা) তাঁদের নামাজে সেই কুনুত পাঠ করেছেন বলে বিবরণ উল্লেখ করেছেন। যদিও নামাজে যে কোন দোয়া করা যায়, কিন্তু যেহেতু জিব্রাঈল(আ) সরাসরি এসে মুহাম্মাদ(ﷺ)কে ঐ কুনুত শিখিয়েছেন, সাহাবী(রা)গণও নামাজে সেই কুনুতটি পড়তে পছন্দ করতেন, অনেক সাহাবী থেকে এর বিবরণ পাওয়া যায়।আমরা দেখেছি কিভাবে কুরআন নাজিলের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ উপায়ে বাক্যগুলো জিব্রাঈল(আ) এর দ্বারা মুহাম্মাদ(ﷺ)কে শেখানো হয়েছে।এ কারণে সুন্নাহপ্রেমী সাহাবীগণ নামাজে সে বাক্যগুলো কুনুত হিসাবে পড়তে ভালোবাসতেন। এই কুনুতটি বিতর নামাজে পড়া হয়।

ফজরে কুনুত পড়বার বিবরণও পাওয়া যায়।সাহাবীগণ যেভাবে নামাজ পড়তেন, বর্তমান মুসলিমরাও হুবহু সেভাবেই নামাজ পড়েন। বর্তমান মুসলিমরাও নামাজে কুনুত পাঠ করে থাকেন।ইসলামবিরোধীরা যে এই শব্দগুলোকে “হারিয়ে যাওয়া সুরা” বলে প্রতষ্ঠিত করতে চায়, এর দ্বারা এই তত্ত্বের অসারতাই প্রমাণিত হয়।

ওরিয়েন্টালিস্ট, খ্রিষ্টান মিশনারী এরা বলতে চায় যে—বর্তমানে মুসলিমরা যে কুরআন পড়ে, তা খলিফা উসমান বিন আফফান(রা) কর্তৃক সংকলিত হয়েছে এবং সেই কুরআনের সাথে সেই সময়কার অর্থাৎ প্রথম যুগের মুসলিমদের কুরআনের সাথে পার্থক্য ছিল।তিনি শুধুমাত্র ক্ষমতার প্রয়োগ দ্বারা স্বেচ্ছাচারীভাবে কুরআন সংকলন করেছেন, অন্যান্য মুসলিমদের সাথে মিল রেখে সংকলন করেননি। এর প্রমাণ হিসাবে তারা উবাই(রা) এর মুসহাফসংক্রান্ত রেওয়ায়েত এবং সাহাবীদের নামাজে কুনুত পড়বার রেওয়াতগুলো অপব্যাখ্যা করতে হয়।

কিন্তু তাদের এই বাজে তত্ত্ব সহজেই অসার প্রমাণ করা যায় কেননা উবাই(রা) এবং অন্যান্য সাহাবীদের কেউ কখনো এই দাবি করেননি যে ঐ বাক্যগুলো কুরআনের অংশ। উসমান(রা) এর যদি কুরআন থেকে কোন বাক্য সরানোর ইচ্ছা আসলেই থাকতো(নাউযুবিল্লাহ), তাহলে তিনি নিজেই কেন সেই বাক্যগুলো নামাজে পাঠ করতেন? উবাই(রা) এর মুসহাফের যে অতিরিক্ত অংশগুলো উসমান(রা) কুরআন থেকে বাদ দিয়েছেন বলে ইসলামবিরোধীরা অভিযোগ তোলে, উসমান(রা) স্বয়ং সেই বাক্যগুলো নামাজে পাঠ করতেন। এবং অন্য সকল সাহাবীর মতই তা কুনুত হিসাবে পাঠ করতেন; কুরআনের অংশ হিসাবে নয়। কোন

বাক্য যদি তাঁর বাদ দেবারই ইচ্ছা থাকতো, তাহলে তিনি নিজে কেন নামাজে সেই বাক্যগুলোই পাঠ করবেন??

“হুসাইন বিন আবদুর রহমান বর্ণণা করেনঃ তিনি উসমান জিয়াদের পিছনে নামাজ আদায় করেছেন। নামাজের পরে তিনি তাঁকে বলেন যে, তিনি সেই বাক্যগুলো দ্বারা কুনুত পড়েছেন।অতঃপর বলেন, উমার বিন খাত্তাব(রা) এবং উসমান বিন আফফান(রা)ও এভাবেই তা আদায় করতেন”
(মুসান্নাফ ইবন আবি শাইবাহ, হাদিস নং ৭০৩২)

বিরোধীরা এবার হয়তো বলবে—তাহলে উবাই বিন কা’ব(রা) কেন তাঁর মুসহাফে অতিরিক্ত ‘সুরা’ দুইটি লিপিবদ্ধ করেছিলেন, যদি তা কুরআনের অংশ না হয়?

এ বিষয়ে প্রথমেই যেটি বলবঃ ‘সুরা’ শব্দের অর্থ অধ্যায়। উবাই(রা) এর ব্যক্তিগত মুসহাফটিতে মোট অধ্যায় বা সেকশন ছিল ১১৬টি। কিন্তু এর মানে এই নয় যে তার সকল অধ্যায় বা সুরা কুরআনের অংশ।

মুহাম্মাদ আবদুল আজিম আল জুরকানী(র) এ ব্যাপারে উল্লেখ করেছেনঃ “যে সকল সাহাবীর এক বা তার অধিক ব্যক্তিগত কপি ছিল, তাঁরা সে সমস্ত কপিতে এমন কিছুও উল্লেখ করতেন যা কুরআনের অংশ ছিল না।তাদের লিপিবদ্ধ এই অতিরিক্ত অংশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে কুরআনের যে অংশগুলো বোঝা কঠিন হত সেগুলোর ব্যাখ্যা(তাফসির) কিংবা দোয়া, যেগুলো অনেকটা কুরআনের দোয়ার মতই ছিল।সেই দোয়াগুলো নামাজে কুনুত হিসাবে পড়া হত।এবং তাঁরা জানতেন এগুলো কুরআনের অংশ নয়।লেখার সরঞ্জামের অভাবের জন্য তারা এমনটি করতেন।এবং তারা শুধুমাত্র নিজেদের পড়বার জন্য কুরআন লিখতেন কাজেই এগুলো বোঝা তাঁদের জন্য সহজ ছিল এবং কুরআনের সাথে মিশে যাবার ভয় ছিল না।”
(মানাহিল আল ইরফান ফি উলুমুল কুরআন(দারুল কুতুব আল আরাবি, বৈরুত থেকে প্রকাশিত), পৃষ্ঠা ২২২)

রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এগুলোর দ্বারা কুনুত পড়তেন এবং উমার(রা), আলী(রা) এবং অন্যান্য সাহাবীদের(রাদিয়াল্লাহু আনহুম)কে শিখিয়েছেন। তাঁরা সবাই এগুলোর দ্বারা নামাজে আল্লাহর নিকট দোয়া করতেন।মুসলিমগণ তা শুনেছেন এবং তাঁদের থেকে বর্ণণা করেছেন এবং কিতাবসমূহে উল্লেখ করেছেন।
(আল কুরআন ওয়া নাক্বদ মাতা’ইন আর রুহবান(দারুল কালাম,দামেস্ক থেকে প্রকাশিত), পৃষ্ঠা ২৭৭)

عن عطاء أن عثمان بن عفان لما نسخ
القرآن في المصاحف أرسل إلى أبي بن كعب، فكان يملي على زيد بن ثابت وزيد
يكتب ومعه سعيد بن العاص يعربه، فهذا المصحف على قراءة أبي وزيد

আতা(র) থেকে বর্ণিত; যখন কুরআন মুসহাফে লিপিবদ্ধ করা হবে, উসমান বিন আফফান(রা) উবাই(রা) এর নিকট প্রেরণ করলেন। অতএব তিনি যায়িদ বিন সাবিত(রা) এর নিকট বর্ণণা করলেন এবং যায়িদ লিপিবদ্ধ করলেন এবং তারঁ সাথে ছিলেন সাঈদ বিন আস(র), প্রকাশ করার জন্য।অতএব এটি উবাই ও যায়িদের কিরাত অনুযায়ী মুসহাফ।
(কানজুল উম্মাল, খণ্ড ২, হাদিস ৪৭৮৯)

এই বিবরণের দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল যে, বর্তমানে আমরা ১১৪সুরার যে মুসহাফ পাঠ করি, তা স্বয়ং উবাই(রা) বর্ণিত ছিল এবং তাঁর কিরাতও ভিন্ন কিছু ছিল না। ফলে সামান্যতম সন্দেহেরও আর অবকাশ থাকলো না যে তাঁর লিখিত ব্যক্তিগত কুরআনে বর্তমান কুরআনের থেকে বেশি কিছু ছিল না যাকে তিনি কুরআনের অংশ বলে গণ্য করতেন।

এবং আল্লাহ সর্বাধিক উত্তম জানেন।

১৯

‘শূণ্যস্থান থেকে স্রষ্টার দূরত্ব’

-আরিফ আজাদ

সাজিদের কাছে একটি মেইল এসেছে সকালবেলা। মেইলটি পাঠিয়েছে তার নাস্তিক বন্ধু বিপ্লব ধর। বিপ্লব দা’কে আমিও চিনি। সদা হাস্য এই লোকটার সাথে মাঝে মাঝেই টি.এস.সিতে দেখা হতো।দেখা হলেই উনি একটি হাসি দিয়ে জিজ্ঞেস করতেন,- ‘তুই কি এখনো রাতের বেলা ভূত দেখিস?’

.

বিপ্লব দা মনে হয় হাসিটি প্রস্তুত করেই রাখতো।দেখা হওয়া মাত্রই প্রদর্শন। বিপ্লব দা’কে চিনতাম সাজিদের মাধ্যমে। সাজিদ আর বিপ্লব দা একই ডিপার্টমেন্টের। বিপ্লব দা সাজিদের চেয়ে দু ব্যাচ সিনিয়র।

.

সাজিদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে যে প্রথমে নাস্তিক হয়ে গিয়েছিলো, তার পুরো ক্রেডিটটাই বিপ্লব দা’র। বিপ্লব দা তাকে বিভিন্ন নাস্তিক, এ্যাগনোষ্টিকদের বই-টই পড়িয়ে নাস্তিক বানিয়ে ফেলেছিলো। সাজিদ এখন আর নাস্তিক নেই।

.

আমি ক্লাশ শেষে রুমে ঢুকে দেখলাম সাজিদ বরাবরের মতোই কম্পিউটার গুতাচ্ছে।আমাকে দেখামাত্রই বললো,- ‘তোর দাওয়াত আছে।’

– ‘কোথায়?’- আমি জিজ্ঞেস করলাম।

সাজিদ বললো,- ‘বিপ্লব দা দেখা করতে বলেছেন।’

.

আমার সাথে উনার কোন লেনদেন নেই।আমাকে এভাবে দেখা করতে বলার হেতু কি বুঝলাম না।সাজিদ বললো,- ‘ঘাবড়ে গেলি নাকি? তোকে একা না, সাথে আমাকেও।’

.

এই বলে সাজিদ বিপ্লব দা’র মেইলটি ওপেন করে দেখালো।মেইলটি হুবহু এরকম-

.

‘সাজিদ,

.

আমি তোমাকে একজন প্রগতিশীল, উদারমন সম্পন্ন, মুক্তোমনা ভাবতাম।পড়াশুনা করে তুমি কথিত ধর্মীয় গোঁড়ামি আর অন্ধ বিশ্বাস থেকে বেরিয়ে এসেছিলে।কিন্তু তুমি যে আবার সেই অন্ধ বিশ্বাসের জগতে ফিরে যাবে- সেটা কল্পনাও করিনি আমি।আজ বিকেলে বাসায় এসো। তোমার সাথে আলাপ আছে।’

.

আমরা খাওয়া-দাওয়া করে, দুপুরের নামাজ পড়ে বিপ্লব দা’র সাথে দেখা করার জন্য বের হলাম।বিপ্লব দা আগে থাকতেন বনানী, এখন থাকেন কাঁটাবন। জ্যাম-ট্যাম কাটিয়ে আমরা যখন বিপ্লব দা’র বাসায় পৌঁছি, তখন আসরের ওয়াক্ত হয়ে গেছে।বিপ্লব দা’র সাথে হ্যান্ডশেক করে আমরা বসলাম না।

.

সাজিদ বললো,- ‘দাদা, আলাপ একটু পরে হবে। আসরের নামাজটা পড়ে আসি আগে।’

.

বিপ্লব দা না করলেন না।আমরা বেরিয়ে গেলাম।পার্শ্ববর্তী মসজিদে আসরের নামাজ পড়ে ব্যাক করলাম উনার বাসায়।

.

বিপ্লব দা ইতোমধ্যেই কফি তৈরি করে রেখেছেন।খুবই উন্নতমানের কফি।কফির গন্ধটা পুরো ঘরময় ছড়িয়ে পড়লো মূহুর্তেই।

.

সাজিদ কফি হাতে নিতে নিতে আমাকে উদ্দেশ্য করে বললো,- 'জানিস, বিপ্লব দা'র এই কফি বিশ্ববিখ্যাত।ভূ-মধ্য সাগরীয় অঞ্চলের কফি।এইটা কানাডা ছাড়া আর কোথাও পাওয়া যায় না। বিপ্লব দা কানাডা থেকে অর্ডার করিয়ে আনেন।'

.

কফির কাপে চুমুক দিয়ে মনে হলো আসলেই সত্যি।এত ভালো কফি হতে পারে-ভাবাই যায় না।

.

সাজিদ এবার বিপ্লব দা'র দিকে তাকিয়ে বললো,- 'আলাপ শুরু হোক।'

.

বিপ্লব দা'র মুখে সদা হাস্য ভাবটা আজকে নেই। উনার পরম শিষ্যের এরকম অধঃপতনে সম্ভবত উনার মন কিছুটা বিষন্ন। তিনি বললেন,- 'তোমার সিদ্ধান্তের প্রতি আমার যথেষ্ট শ্রদ্ধা আছে। তবে, তোমাকে একটি বিষয়ে বলার জন্যই আসতে বলেছি। হয়তো তুমি ব্যাপারটি জেনে থাকবে-তবুও।'

সাজিদ কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললো,- 'জানা বিষয়টাও আপনার মুখ থেকে শুনলে মনে হয় নতুন জানছি। আমি আপনাকে কতোটা পছন্দ করি তা তো আপনি জানেনেই।'

.

বিপ্লব দা কোন ভূমিকায় গেলেন না।সরাসরি বললেন,- 'ওই যে, তোমার সৃষ্টিকর্তা, উনার ব্যাপারে বলতে চাই। তুমি বিজ্ঞানের ছাত্র, তুমি হয়তো এ ব্যাপারে জানো। সম্প্রতি বিজ্ঞান প্রমান করেছে, এই মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে সৃষ্টিকর্তার কোন দরকার নেই।মহাবিশ্ব সৃষ্টি হয়েছে শুন্য থেকেই।

.

আগে তোমরা,মানে বিশ্বাসীরা বলতে, একটা সামান্য সুঁচও যখন কোন কারিগর ছাড়া এমনি এমনি তৈরি হতে পারেনা, তাহলে এই গোটা মহাবিশ্ব কিভাবে তৈরি হবে আপনাআপনি? কিন্তু বিজ্ঞান এখন বলছে, এই মহাবিশ্ব শুন্য থেকে আপনাআপনিই তৈরি হয়েছে।কারো সাহায্য ছাড়াই।'

এই কথাগুলো বিপ্লব দা এক নাগাড়ে বলে গেলেন।মনে হয়েছে তিনি কোন নিঃশ্বাসই নেন নি এতক্ষণ।

.

সাজিদ বললো,- 'অদ্ভুত তো। তাহলে তো আমাকে আবার নাস্তিক হয়ে যেতে হবে দেখছি। হা হা হা হা।'

.

সাজিদ চমৎকার একটা হাসি দিলো। সাজিদ এইভাবে হাসতে পারে, তা আমি আজই প্রথম দেখলাম। বিপ্লব দা সেদিকে মনোযোগ দিয়েছেন বলে মনে হলো না।

.

উনি মোটামুটি একটা লেকচার শুরু করেছেন।আমি আর সাজিদ খুব মনোযোগি ছাত্রের মতো উনার বৈজ্ঞানিক কথাবার্তা শুনছিলাম। তিনি যা বোঝালেন, বা বললেন, তার সার সংক্ষেপ এরকম।-

.

'পদার্থ বিজ্ঞানে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছে কোয়াণ্টাম মেকানিক্স। এই কোয়ান্টাম মেকানিক্সে একটি থিওরি আছে, সেটি হলো- 'কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান। এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মূল কথা হলো,- 'মহাবিশ্বে পরম শুন্য স্থান বলে আদতে কিছু নেই। মানে, আমরা যেটাকে 'Nothing' বলে এতদিন জেনে এসেছি, বিজ্ঞান বলছে, আদতে 'Nothing' বলতে কিছুই নেই।প্রকৃতি শূন্য স্থান পছন্দ করেনা। তাই, যখনই কোন শুন্যস্থান (Nothing) তৈরি হয়, সেখানে এক সেকেন্ডের বিলিয়ন

ভাগের এক ভাগ সময়ের মধ্যে কণা এবং প্রতিকণা (Matter & anti-matter) তৈরি হচ্ছে, এবং একটির সাথে অন্যটির ঘর্ষণে ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।

.

তোমরা জানো কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের ধারনা কোথা হতে এসেছে?’

.

আমি বললাম,- ‘না।’

.

বিপ্লব দা আবার বলতে শুরু করলেন,- ‘ এই ধারনা এসেছে হাইজেনবার্গের বিখ্যাত ‘অনিশ্চয়তা নীতি’ থেকে। হাইজেনবার্গের সেই বিখ্যাত সূত্রটা তোমরা জানো নিশ্চয়?’

.

সাজিদ বললো,- ‘হ্যাঁ। হাইজেনবার্গ বলেছেন, আমরা কখনও একটি কণার অবস্থান এবং এর ভরবেগের সঠিক পরিমাণ একসাথে একুরেইটলি জানতে পারবো না। যদি অবস্থান সঠিকভাবে জানতে পারি, তাহলে এর ভরবেগের মধ্যে গলদ থাকবে।আবার যদি ভরবেগ সঠিকভাবে জানতে পারি, তাহলে এর অবস্থানের মধ্যে গলদ থাকবে।দুটো একইসাথে সঠিকভাবে জানা কখনোই সম্ভব না। এইটা যে সম্ভব না, এটা বিজ্ঞানের অসারতা না, আসলে এটা হলো কণার ধর্ম বা বৈশিষ্ট্য। ‘

.

বিপ্লব দা বললেন,- ‘এক্সাক্টলি। একদম তাই।হাইজেনবার্গের এই নীতিকে শক্তি আর সময়ের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায়।হাইজেনবার্গের এই নীতি যদি সত্যি হয়, তাহলে মহাবিশ্বে ‘শূন্যস্থান’ বলে কিছু থাকতে পারেনা। যদি থাকে, তাহলে তার অবস্থান ও ভরবেগ দুটোই শূন্য চলে আসে, যা হাইজেনবার্গের নীতি বিরুদ্ধ।’

.

এইটুকু বলে বিপ্লব দা একটু থামলো। কফির পট থেকে কফি ঢালতে ঢালতে বললেন,- ‘বুঝতেছো তোমরা?’

.

সাজিদ বুঝছে কিনা জানিনা, তবে আমার কাছে ব্যাপারটি দূর্বোধ্য মনে হলেও, বিপ্লব দা’র উপস্থাপন ভঙ্গীমা সেটাকে অনেকটাই প্রাঞ্জল করে তুলছে।ভালো লাগছে।

.

বিপ্লব দা কফিতে চুমুক দিলেন। এরপর আবার বলতে শুরু করলেন,- ‘তাহলে তোমরা বলো না, যে বিগ ব্যাং এর আগে তো কিছুই ছিলো না।না সময়, না শক্তি, না অন্যকিছু।তাহলে বিগ ব্যাং এর বিস্ফোরনটি হলো কিভাবে? এর জন্য নিশ্চয় কোন শক্তি দরকার? কোন বাহ্যিক বল দরকার,তাই না? এইটা বলে তোমরা স্রষ্টার ধারনাকে জায়েজ করতে।তোমরা বলতে, এই বাহ্যিক বলটা এসেছে স্রষ্টার কাছ থেকে। কিন্তু দেখো, বিজ্ঞান বলছে, এইখানে স্রষ্টার কোন হাত নেই। বিগ ব্যাং হবার জন্য যে শক্তি দরকার ছিলো, সেটা এসেছে এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান থেকে।সুতরাং, মহাবিশ্ব তৈরিতে স্রষ্টার অস্তিত্বকে বিজ্ঞান ডাইরেক্ট ‘না’ বলে দিয়েছে।আর, তোমরা এখনো স্রষ্টা স্রষ্টা করে কোথায় যে পড়ে আছো।’

.

এতটুকু বলে বিপ্লব দা’র চোখমুখ ঝলমলিয়ে উঠলো। মনে হচ্ছে, উনি যে উদ্দেশ্যে আমাদের ডেকেছেন তা সফল হয়ে গেছে। আমরা হয়তো উনার বিজ্ঞানের উপর এই জ্ঞানগর্ভ লেকচার শুনে এক্ষুনি নাস্তিকতার উপর ঈমান নিয়ে আসবো।

.

যাহোক, ইতোমধ্যে সাজিদ দু কাপ কফি গিলে ফেলেছে। নতুন এক কাপ ঢালতে ঢালতে সে বললো,- ‘এই ব্যাপারে ষ্টিফেন হকিংয়ের বই আছে।নাম- ‘The grand design’। এটা আমি পড়েছি।’

.

সাজিদের কথা শুনে বিপ্লব দা’কে খুব খুশি মনে হলো।তিনি বললেন,- ‘বাহ, তুমি তাহলে পড়াশুনা ষ্টপ করোনি? বেশ বেশ!

পড়াশুনা করবে।বেশি বেশি পড়বে।’

.

সাজিদ হাসলো। হেসে সে বললো, – ‘কিন্তু দাদা, এই ব্যাপারে আমার কনফিউশান আছে।’

.

– ‘কোন ব্যাপারে?’- বিপ্লব দা’র প্রশ্ন।

.

– ‘ষ্টিফেন হকিং আর লিওনার্ড ম্লোদিনোর বই The grand design এর ব্যাপারে।’

.

বিপ্লব দা একটু থতমত খেলো মনে হলো। মনে হয় উনি মনে মনে বলছে- এই ছেলে দেখছি খোদার উপর খোদাগিরি করছে।

.

তিনি বললেন,- ‘ক্লিয়ার করো।’

.

সাজিদ বললো,- আমি দুইটা দিক থেকেই এটার ব্যাখ্যা করবো।বিজ্ঞান এবং ধর্ম। যদি অনুমতি দেন।’

.

– ‘অবশ্যই।’- বিপ্লব দা বললেন।

.

আমি মুগ্ধ শ্রোতা। গুরু এবং এক্স-শিষ্যের তর্ক জমে উঠেছে।

.

সাজিদ বললো,- ‘প্রথম কথা হচ্ছে, ষ্টিফেন হকিংয়ের এই থিওরিটা এখনো ‘থিওরি’, সেটা ‘ফ্যাক্ট’ নয়।এই ব্যাপারে প্রথম কথা বলেন বিজ্ঞানি লরেন্স ক্রাউস।তিনি এইটা নিয়ে একটি বিশাল সাইজের বই লিখেছিলেন।বইটার নাম ছিলো- ‘A Universe from nothing’।

.

অনেক পরে, এখন ষ্টিফেন এটা নিয়ে উনার The grand design এ কথা বলেছেন। উনার এই বইটা প্রকাশ হবার পর সি এন এনের এক সাংবাদিক হকিংকে জিজ্ঞেস করেছিলো,- ‘আপনি কি ইশ্বরে বিশ্বাস করেন?’

.

হকিং বলেছিলো,- ‘ইশ্বর থাকলেও থাকতে পারে, তবে, মহাবিশ্ব তৈরিতে তার প্রয়োজন নেই।’

.

বিপ্লব দা বললো,- ‘সেটাই।উনি বোঝালেন যে, ইশ্বর মূলত ধার্মিকদের একটি অকার্যকর বিশ্বাস।’

.

– ‘হকিং কি বুঝিয়েছেন জানিনা, কিন্তু হকিংয়ের ঐ বইটি অসম্পূর্ণ।কিছু গলদ আছে।’

.

বিপ্লব দা কফির কাপ রাখতে রাখতে বললেন,- ‘গলদ? মানে?’

.

– ‘দাঁড়ান, বলছি। গলদ মানে, উনি কিছু বিষয় বইতে ক্লিয়ার করেন নি। যেহেতু এটা বিজ্ঞান মহলে প্রমানিত সত্য নয়, তাই এটা বিজ্ঞান মহলে প্রচুর বিতর্কিত হয়েছে।

.

উনার বইতে যে গলদগুলো আছে, সেগুলো সিরিয়ালি বলছি।

.

গলদ নাম্বার ০১

হকিং বলেছেন, শূন্য থেকেই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মাধ্যমে বস্তু কণা তৈরি হয়েছে,এবং সেটা মহাকর্ষ বলের মাধ্যমে নিউট্রালাইজ হয়েছে।

এখানে প্রশ্ন হলো,- 'শূন্য বলতে হকিং কি একদম Nothing (কোনকিছুই নেই) বুঝিয়েছেন, নাকি Quantum Vaccum (বস্তুর অনুপস্থিতি) বুঝিয়েছেন সেটা ক্লিয়ার করেন নি।হকিং বলেছেন, শূন্যস্থানে বস্তু কণার মাঝে কোয়াণ্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান হতে হলে সেখানে মহাকর্ষ বল প্রয়োজন।

.

কিন্তু ঐ শূন্যস্থানে (যখন সময় আর স্থানও তৈরি হয়নি) ঠিক কোথা থেকে এবং কিভাবে মহাকর্ষ বল এলো, তার কোন ব্যাখ্যা হকিং দেয় নি।

.

গলদ নাম্বার- ০২

হকিং তার বইতে বলেছেন, মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে একদম শূন্য থেকে, কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মাধ্যমে। তখন 'সময়' (Time) এর আচরন আজকের সময়ের মতো ছিলো না। তখন সময়ের আচরন ছিলো 'স্থান' (Space) এর মতো। কারন, এই ফ্ল্যাকচুয়েশান হবার জন্য প্রাথমিকভাবে সময়ের দরকার ছিলো না, স্থানের দরকার ছিলো।

.

কিন্তু হকিং তার বইতে এই কথা বলেন নি যে,যে সময় (Time) মহাবিশ্বের একদম শুরুতে 'স্থান' এর মতো আচরন করেছে, সেই 'সময়' পরবর্তীতে ঠিক কবে আর কখন থেকে আবার Time এর মতো আচরন শুরু করলো এবং কেনো?'

আমি বিপ্লব দা'র মুখের দিকে তাকালাম। তার চেহারার উৎফুল্ল ভাবটা চলে গেছে।

.

সাজিদ বলে যাচ্ছে-

.

গলদ নাম্বার- ০৩

পদার্থবিদ্যার যে সূত্র মেনে কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান হয়ে মহাবিশ্ব তৈরি হলো, তখন শূন্যাবস্থায় পদার্থবিদ্যার এই সূত্রগুলো বলবৎ থাকে কি করে? এইটার ব্যাখ্যা হকিং দেয়নি।

.

গলদ নাম্বার – ০৪

আপনি বলেছেন, প্রকৃতি শূন্যস্থান পছন্দ করেনা। তাই, শূন্যস্থান পূরণ করতে আপনা আপনি কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশান হয়ে মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে। আমার

.

প্রশ্ন হলো- যেখানে আপনি শূন্যস্থান নিয়ে কথা বলছেন, যখম সময় ছিলো না,স্থান ছিলো না, তখন আপনি প্রকৃতি কোথায় পেলেন?'

সাজিদ হকিংয়ের বইয়ের পাঁচ নাম্বার গলদের কথা বলতে যাচ্ছিলো। তাকে থামিয়ে দিয়ে বিপ্লব দা বললেন,- 'ওকে ওকে। বুঝলাম। আমি বলছি না যে এই জিনিসটা একেবারে সত্যি। এটা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হবে।আলোচনা-সমালোচনা হবে।আরো পরীক্ষা-নীরিক্ষা হবে।তারপর ডিসাইড হবে যে এটা ঠিক না ভুল।'

.

সাজিদের কাছে বিপ্লব দা'র এরকম মৌন পরাজয় আমাকে খুব তৃপ্তি দিলো।মনে মনে বললাম,- 'ইয়েস সাজিদ, ইউ ক্যান।'

.

সাজিদ বললো,- 'হ্যাঁ, সে পরীক্ষা চলতে থাকুক। যদি কোনদিন এই থিওরি সত্যিও হয়ে যায়, তাহলে আমাকে ডাক দিয়েন না

দাদা। কারন, আমি কোরান দিয়েই প্রমান করে দিতে পারবো।'

.

সাজিদের এই কথা শুনে আমার হেঁচকি উঠে গেলো। কি বলে রে? এতক্ষন যেটাকে গলদপূর্ণ বলেছে, সেটাকে আবার কোরান দিয়ে প্রমান করবে বলছে? ক্যামনে কি?'

.

বিপ্লব দা'ও বুঝলো না। তিনি জিজ্ঞেস করলেন,- 'কি রকম?'

.

সাজিদ হাসলো। বললো,- 'শূন্য থেকেই মহাবিশ্ব সৃষ্টির কথা আল কোরানে বলা আছে দাদা।'
আমি আরো অবাক। কি বলে এই ছেলে?

.

সে বললো,- 'আমি বলছি না যে কোরান কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের কথাই বলেছে। কোরান যার কাছ থেকে এসেছে, তিনি তার সৃষ্টি জগতের সৃষ্টির ব্যাখ্যা দিয়েছেন।এখন সেটা বিগ ব্যাং আসলেও পাল্টাবে না, কোয়ান্টাম ফ্লাকচুয়েশান থিওরি আসলেও পাল্টাবে না। একই থাকবে।'
বিপ্লব দা বললো,- 'কোরানে কি আছে বললে যেন?'
– 'সূরা বাকারার ১১৭ নাম্বার আয়াতে আছে-

.

'যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে অনস্তিত্ব হতে অস্তিত্বে আনায়ন করেন (এখানে মূল শব্দ 'বাদিয়্যু'/Originator- সেখান থেকেই অস্তিত্ব-অনস্তিত্বের ধারনা) এবং যখন তিনি কিছু করবার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন শুধু বলেন হও, আর তা হয়ে যায়।'

.

'Creator of the heavens and the earth from nothingness, He has only to say when He wills a thing, "Be," and it is'....

.

দেখুন, আমি আবারো বলছি, আমি এটা বলছি না যে, আল্লাহ তা'লা এখানে কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের কথাই বলেছেন। তিনি তার সৃষ্টির কথা বলেছেন।

.

তিনি 'অনস্তিত্ব' (Nothing) থেকে 'অস্তিত্বে' (Something) এ এনেছেন।এমন না যে, আল্লাহ প্রথমে মহাবিশ্বের ছাদ বানালেন। তারপর তাতে সূর্য, চাঁদ, গ্যালাক্সি এগুলা একটা একটা বসিয়ে দিয়েছেন। তিনি কেবল নির্দেশ দিয়েছেন।

.

হকিংও একই কথা বলছে। কিন্তু তারা বলছে এটা এমনি এমনি হয়ে গেছে, শূন্য থেকেই। আল্লাহ বলছেন, না, এমনি হয়নি। আমি যখন নির্দেশ করেছি 'হও' (কুন), তখন তা হয়ে গেলো।

.

হকিং ব্যাখ্যা দিতে পারছে না এই কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের জন্য মহাকর্ষ বল কোথা থেকে এলো, 'সময়' কেন, কিভাবে 'স্থান 'হলো, পরে আবার সেটা 'সময়' হলো।

.

কিন্তু আমাদের স্রষ্টা ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন 'হতে', আর তা হয়ে গেলো।

.

ধরুন একটা ম্যাজিশিয়ান ম্যাজিক দেখাচ্ছে। ম্যাজিশিয়ান বসে আছে ষ্টেজের এক কোণায়।কিন্তু সে তার চোখের ইশারায় ম্যাজিক দেখাচ্ছে।দর্শক দেখছে, খালি টেবিলের উপরে হঠাৎ একটা কবুতর তৈরি হয়ে গেল,এবং সেটা উড়েও গেলো।

.

দর্শক কি বলবে এটা কোয়ান্টাম ফ্ল্যাকচুয়েশানের মাধ্যমে হয়ে গেছে? না, বলবে না।

.

এর পেছনে ম্যাজিশিয়ানের কারসাজি আছে।সে ষ্টেজের এক কোণা থেকে চোখ দিয়ে ইশারা করেছে বলেই এটা হয়েছে।

.

স্রষ্টাও সেরকম।তিনি শুধু বলেছেন, 'হও', আর মহাবিশ্ব আপনা আপনিই হয়ে গেলো।.....

.

আপনাদের সেই শূন্যস্থান থেকে স্রষ্টার দূরত্ব কেবল ঐ 'হও' পর্যন্তই।

.

মাগরিবের আজান পড়তে শুরু করেছে। বিপ্লব দা'কে অনেকটাই হতাশ দেখলাম। আমরা বললাম,- 'আজ তাহলে উঠি?'

.

উনি একটা নিঃশ্বাস ছেড়ে বললেন,- 'এসো।'

.

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। আমি অবাক হয়ে সাজিদের দিকে তাকিয়ে আছি। কে বলবে এই ছেলেটা গত ছ'মাস আগেও নাস্তিক ছিলো। নিজের গুরুকেই কি রকম কুপোকাত করে দিয়ে আসলো।কোরানের সূরা বাকারার ১১৭ নাম্বার আয়াতটি কতো হাজার বার পড়েছি, কিন্তু এভাবে কোনদিন ভাবিনি।আজকে এটা সাজিদ যখন বিপ্লব দা কে বুঝাচ্ছে, মনে হচ্ছে আজকেই নতুন শুনছি এই আয়াতের কথা। গর্ব হতে লাগলো আমার।

[বিঃদ্রঃ নোটঃ সাজিদ এখানে শূন্য থেকে মহাবিশ্ব তৈরির বিরোধিতা করেনি। হকিংয়ের বইতে যে গ্যাপ আছে, তা-ই বলেছে। হকিংয়ের বইটা বিজ্ঞানি মহলেও অনেক বিতর্কিত। সমালোচক বিজ্ঞানিদের পয়েন্টগুলোই সাজিদ উল্লেখ করেছে শুধু]

২০

হুর আল আইন ও ডাবলস্ট্যান্ডার্ড

-আরিফ আজাদ

দৃশ্যপট - ০১

- 'বুঝলেন ভাই? বন্ধু ছাড়া লাইফ ইমপসিবল।'

-- 'জ্বি ভাই। আমাদের নবী আদম আঃ ও জান্নাতে একা একা থাকতে পারেন নি। বন্ধু ছাড়া উনার লাইফও ইমপসিবল ছিলো।তাই আল্লাহ তা'লা অনুগ্রহ করে উনার জন্য হাওয়া আঃ কে বন্ধু হিসেবে সৃষ্টি করে বন্ধুর ব্যবস্থা করেছিলেন। আমাদের মৃত্যুর পরের জীবনেও যাতে আমরা একাকী অনুভব না করি, এরজন্যে জান্নাতে আল্লাহ তা'লা হুরের ব্যবস্থা করে রেখেছেন বন্ধু হিসেবে।'

-- 'ধুর! সবখানে মিয়া ধর্মের প্যাঁচাল পাড়েন ক্যা?'

- 'ভাই, আমিও তো বন্ধুর কথাই বললাম। বন্ধু ছাড়া লাইফ ইমপসিবল। সেটা দুনিয়া আর জান্নাত, দুই খানেই।'

-

দৃশ্যপট - ০২

- 'ভাঙ্গীয়া, পর্দাহীন, বেগানা মহিলার সাথে একাকী সময় কাটাতে, ঘুরতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন।'

-- 'ক্যানো?'

- 'কারন, এতে করে শয়তান মনের মধ্যে কু-প্রস্তাব ঢুকিয়ে মানুষকে বিপথে ফেলার ধান্ধায় থাকে। নারী-পুরুষ এমনিতেই পরস্পর-পরস্পরের প্রতি আকর্ষিত হয়। শয়তান এটাকেই কাজে লাগায়।'

- 'আচ্ছা মিয়া, আপনারা দু'জন ছেলে-মেয়েকে একসাথে দেখলে সেক্স ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারেন না? ভাবতে পারেন না, তারা দু'জন সেক্স বেইসড রিলেশান ছাড়াই খুব ভালো বন্ধু? একাকীত্বের সাথী? এমন ভালো বন্ধু, যার সাথে সেক্স ছাড়াই হাতে হাত রেখে, যার চোখে চোখ রেখে হাজার বছরের পথ পাড়ি দেওয়া যায়? খালি কি মাথায় সেক্স ঘুরে নাকি?'

- 'না ভাই।সেক্স ঘুরবে কেনো? কিন্তু শয়তানের তো আর বিশ্বাস নাই। সে হাতে হাত রাখাতে গিয়ে না জানি এই হাত কতোদূরে নিয়া যায়। যাহোক, আল্লাহ আমাদের বলেছেন, দুনিয়াতে আমরা এসব অশালীন সম্পর্কগুলো থেকে মুক্ত থাকলে, পরকালে তিনি আমাদের প্রত্যেককে হুর দিবে, যাদের সৌন্দর্যের সাথে দুনিয়ার কোনকিছুর তুলনা চলে না।'

-- 'হাহাহাহা। মুহাম্মদের জান্নাতের হুরের কথা বলছেন? তা ভাই, জান্নাত কি মুমিনদের জন্য সেক্স প্লেইস নাকি? এত্তগুলা হুর একেকজনের জন্য।'

- 'ভাই, আপনারা জান্নাতি ব্যক্তি আর হুরের মাঝে সেক্স ছাড়া আর কিছু কি ভাবতে পারেন না?
ভাবতে পারেন না, জান্নাতি ব্যক্তি আর হুরেরা সেক্স বেইসড রিলেশান ছাড়াই খুব ভালো বন্ধু? একাকীত্বের সাথী? এমন ভালো বন্ধু, যাদের সাথে সেক্স ছাড়াই হাতে হাত রেখে, চোখে চোখ রেখে অনন্তকাল পাড়ি দেওয়া যায়? খালি কি মাথায় সেক্স ঘুরে নাকি?'

- ' না, ইয়ে, মানে............

২১

একটি অসম্ভাব্য কথোপকথন

-সত্যকথন ডেস্ক

একটি অসম্ভাব্য কথোপকথন

.

মুসলিমঃ আচ্ছা তুমি কিসে বিশ্বাস কর?

নাস্তিকঃ আমি কোনো কিছুতে বিশ্বাস করি না। আমি কোনো ধর্মে বিশ্বাস করি না। আমি বিজ্ঞান মানি। যা প্রমাণ করা যায় আমি সেটা বিশ্বাস করি।

.

মুসলিমঃ আচ্ছা তার মানে কি তুমি কোন কিছুই বিশ্বাস করো না?

নাস্তিকঃ কেন বিশ্বাস করবো? কোন ধর্ম বিশ্বাস করবো? এই যে তোমার ধর্মে জিহাদের কথা আছে, এটা একটা আধুনিক মানুষ কিভাবে মেনে নিতে পারে? তারপর ধর তোমার ধর্মে আছে...

.

মুসলিমঃ দাঁড়াও, দাঁড়াও...তুমি সম্ভবত আমার প্রশ্নটা বুঝতে পারো নি। তুমি কেন আমার ধর্মে বিশ্বাস করো না আমি সেটা জিজ্ঞেস করি নি। আমি জিজ্ঞেস করেছি তুমি কি কোনো কিছুতেই বিশ্বাস করো না?

নাস্তিকঃ হ্যা। আমি কোন কিছুই বিশ্বাস করি না। যা বিজ্ঞানের মাধ্যমে প্রমাণ করা যায় আমি শুধু সেটাই মানি। এটাই আমার নীতি।

.

মুসলিমঃ তুমি কি বিশ্বাস করো স্রষ্টা নেই?

নাস্তিকঃহ্যা আমি বিশ্বাস করি কোনো স্রষ্টা নেই।

মুসলিমঃ এটা কি একটা বিশ্বাস না?

নাস্তিকঃ উমম...না...

মুসলিমঃ তাহলে স্রষ্টা নেই – এটার প্রমাণ দাও।

.

নাস্তিকঃ(কিছুক্ষন চিন্তা করে) আমি প্রমাণ দিতে পারছি না। আমি কিন্তু এটাও বলছি না যে কারো কাছে এমন কোন প্রমাণ নেই। হয়তো আছে, যেহেতু বিজ্ঞানের এতো উন্নতি হয়েছে। তবে আমার জানা নেই। এমনো হতে পারে এখন না থাকলেও কোন এক সময়ে এমন প্রমাণ পাওয়া যেতে পারে...

মুসলিমঃ ঠিক আছে। খুব ভালো কথা। কিন্তু তুমি তো একটু আগেই বললে যা প্রমাণিত তুমি শুধু সেটাই মানো। আবার তুমি নিজেই বলছো তুমি কোন প্রমাণ দিতে পারছো না। তাহলে দেখা যাচ্ছে তুমি কোন প্রমাণ ছাড়াই দাবি করছো যে স্রষ্টা নেই। তাহলে কি এটা একটা বিশ্বাস না?

নাস্তিকঃ (চুপ)

.

মুসলিমঃ তাহলে কি বলা যায় যে স্রষ্টা আছে কি নেই তা তুমি নিশ্চিত ভাবে জানো না? কারন তুমি যদি বলো তুমি প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করো তাহলে তো তুমি নিজেই তোমার নীতি লঙ্ঘন করছো

নাস্তিকঃ হ্যা, হ্যা। আমি আসলে জানি না। হয়তোবা স্রষ্টা আছে হয়তোবা স্রষ্টা নেই। আমি স্রষ্টাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করি না।

.

মুসলিমঃ ঠিক আছে। স্রষ্টাকে নিয়ে নাহয় খানিক পরে কথা বলা যাবে। আমি আগে তোমার ব্যাপারটা একটু বুঝতে চাচ্ছি। দেখো তুমি যদি বলো স্রষ্টা আছে কি নেই এটা তুমি জানো না – তাহলে কিন্তু আর তোমাকে নাস্তিক বা Atheist বলা যায় না। বরং তুমি আসলে একজন agnostic বা অজ্ঞেয়বাদী।

নাস্তিকঃ দুটার মধ্যে পার্থক্য কি?

.

মুসলিমঃপার্থক্য হল একজন নাস্তিক (atheist) একটা দাবি বা claim করে। তার দাবি হল – স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই। যদি তুমি কোন দাবি করো, তাহলে সেই দাবিকে প্রমাণ করার দায়িত্ব তোমার। তোমাকে প্রমাণ দিতে হবে যে স্রষ্টা নেই। কিন্তু নাস্তিকরা কোন গ্রহনযোগ্য প্রমাণ দেওয়া তো দূরের কথা কোন সম্ভাব্য প্রমাণ উপস্থাপনও করতে পারে না। সাধারণত তাদের কথাবার্তা বিভিন্ন ধর্মের প্রতি আক্রমণ করার মাঝেই সীমাবদ্ধ থাকে। তারা বেশিরভাগ সময়ই অন্যের অবস্থানের সমালোচনা করে, কিন্তু কখনোই নিজের অবস্থানের পক্ষে কোন প্রমাণ দেয় না।

.

নাস্তিকঃ ওকে, তাহলে একজন agnostic কি বলে?

.

মুসলিমঃ একজন agnostic বা অজ্ঞেয়বাদী কোন দাবি করে না। সে বলে – একজন স্রষ্টা আছেন কি না, এটা আমি জানি না। যেহেতু সে কোন দাবি করছে না, তাই তাকে কোন প্রমাণও দিতে হচ্ছে ন।

.

নাস্তিকঃ রাইট। হ্যা, আমি একজন agnostic

মুসলিমঃ ওকে। তাহলে তুমি কোন ধরণের agnostic?

নাস্তিকঃ মানে?

মুসলিমঃ দেখো অজ্ঞেয়বাদীদের মধ্যে দুটো ধারা আছে। কেউ বলে – আমি কিছু নিশ্চিত ভাবে জানি না। আবার কেউ বলে- কোন কিছু নিশ্চিত ভাবে জানা সম্ভব না। এটাকে অ্যাকচুয়ালি সংশয়বাদ বলা যায়।

আরেকদল আছে যারা বলে স্রষ্টা আছেন কি নেই এটা নিয়ে চিন্তা বা কথা বলার কোন প্রয়োজন নেই। অভিয়াসলি তুমি তিন নাম্বার ক্যাটাগরিতে পড়ছো না, যেহেতু ধর্ম, স্রষ্টা এগুলো নিয়ে তোমার অনেক কিছু বলার আছে। তো প্রথম দুই দলের মধ্যে তুমি কোন দলে?

.

নাস্তিকঃ দ্বিতীয়টা। কোন কিছু নিশ্চিতভাবে জানা সম্ভব না।

মুসলিমঃ কিন্তু তুমি যদি বল কোন কিছু নিশ্চিত ভাবে জানা সম্ভব না তাহলে তুমি কিভাবে নিশ্চিতভাবে বল আমার বিশ্বাস ভুল? আর যদি কোন কিছু সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে জানা না যায় তাহলে – এই কথাটা যে সঠিক এটা তুমি কিভাবে নিশ্চিত হবে?

.

নাস্তিকঃ বুঝতে পারছি না, তোমার কথার মানে কি?

.

মুসলিমঃ মানে হল, তুমি কিভাবে নিশ্চিতভাবে জানলে কোন কিছু সম্পর্কে নিশ্চিত ভাবে জানা সম্ভব না? ব্যাপারটা কি সাংঘর্ষিক হয়ে গেল না? আর তুমি যদি সংশয়বাদী হও তাহলে তুমি কিভাবে তোমার সংশয়ের ব্যাপারে সংশয়হীন হও? নিশ্চয় তোমার সংশয়ের ব্যাপারেও তোমার সংশয় থাকার কথা? কিন্তু সংশয়ের ব্যাপারে সন্দিহান হবার অর্থ তো নিশ্চয়তার দিকে যাওয়া, তাই

না?

.

নাস্তিকঃ (কিছুক্ষন চুপ করে থেকে) ঠিক আছে। হয়তো নিশ্চিত ভাবে জানা সম্ভব, হয়তো না, কিন্তু স্রষ্টা আছেন কি না আমি জানি না।

.

মুসলিমঃ গুড। তাহলে তুমি স্বীকার করো যে আসলে তুমি জানো না। এটা বেশ ভালো একটা অবস্থান। এতক্ষণ তুমি নিজেকে ছাড়া বাকি সবকিছু নিয়ে কথা বলছিলে। এতক্ষণে তুমি মূল জায়গায় নজর দিচ্ছো। তাহলে এখন প্রশ্ন হল, স্রষ্টা যে আছেন এটা তুমি কেন জানো না?

.

নাস্তিকঃ আমি জানি না, হয়তো আমি বিষয়টা নিয়ে যথেষ্ট চিন্তা করি নি। হয়তো আমি যথেষ্ট প্রমাণ পাই নি?

.

মুসলিমঃ যদি তোমাকে প্রমাণ দেখানো হয় তাহলে কি তুমি তা দেখতে ও বিবেচনা করতে রাজি হবে?

.

নাস্তিক (নাকি agnostic?)ঃ হ্যা

.....

শেষপর্যন্ত আস্তিক এবং নাস্তিক দুজনেই বিশ্বাসের জায়গা থেকেই তর্ক করে। পার্থক্য হল এক পক্ষ স্বীকার করে, আরেকপক্ষ স্বীকার করে না। কিন্তু ঐ ব্যক্তি কখনোই সত্যের সন্ধান পাবার আশাও করতে পারে না, যে তার বিশ্বাস (অবিশ্বাসের) বাস্তবতাকে স্বীকার করতে রাজি না।

.

এই কথোপকথনটা আনলাইকলি কারন সাধারণ নাস্তিকরা যৌক্তিকভাবে চিন্তা করে না। তারা অন্ধভাবে তাদের বিশ্বাস আঁকড়ে থাকে, নিজ বিশ্বাসের পক্ষে কোন প্রমাণ দেয় না এবং তারা কখনো প্রশ্নের জবাব দেয় না। যদি কখনো জবাব দেয়ও তখন বাংলা প্রথম পত্রের মতো জবাব দেয়। আকারে বিশাল, সাবস্টেন্সের দিক থেকে শূন্য এবং কখনোই টু দা পয়েন্ট না। যদিও তারা আশা করে অন্য সবাই তাদেরকে প্রমাণ দিতে বাধ্য, এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য, তারা যেভাবে চায় সেভাবেই উত্তর দিতে বাধ্য।

.

সহজ ভাবে বললে এই কথোপকথনটা বা এই চিন্তার ট্রেনটা অনুসরণের জন্য চিন্তার যে পরিপক্কতা বা ম্যাচিউরিটি দরকার সেটা অধিকাংশ নাস্তিকদের মধ্যে অনুস্পস্থিত। আর যেহেতু তারা অন্ধ অবিশ্বাসের অবস্থান থেকে কথা বলে তাই তারা এ বিষয়ে কোন যুক্তি কিংবা প্রমাণ বিবেচনা করতেও রাজি না

.

তবুও পরবর্তীতে কোন হামবড়া গোছের নাস্তিকের সাথে দেখা হলে (অবশ্য তাদের অধিকাংশই হামবড়া) তাকে এই প্রশ্নগুলো করতে পারেন। বাংলা প্রথম পত্র জাতীয় কথাবার্তা আর গরু রচনা জাতীয় অপ্রাসঙ্গিক কথার স্রোতে বাঁধ দিয়ে কথা চালিয়ে যদি মাঝামাঝি পর্যন্ত কথা চালিয়ে নিতে পারেন তাহলে ইন শা আল্লাহ হামবড়া নাস্তিকের হামবড়া ভাব আর থাকবে না।

২২

"একজন অ্যান্টনি ফ্লিউয়ের গল্প"

-সত্যকথন ডেস্ক

প্রায় ৫০ বছর ধরে নাস্তিকতার প্রচার চালিয়ে যাবার পর ২০০৪ সালে পৃথিবীর নেতৃত্বস্থানীয় এবং সুপরিচিত নাস্তিক অ্যান্টনি ফ্লিউ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, অবশ্যই এ মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন।
জীবনভর দার্শনিক অনুসন্ধানের পর, এবং একজন নাস্তিক হিসেবে নিজের প্রায় সম্পূর্ণ জীবন কাটানোর পর শেষপর্যন্ত অ্যান্টনি ফ্লিউ এই উপসংহারে পৌছোন যে সকল যুক্তিপ্রমাণ একজন স্রষ্টার অস্তিত্বের দিকেই নির্দেশ করে।

.

জীবনের বেশীরভাগ সময় ধরেই নাস্তিকতায় দার্শনিক বীরপুরুষ হিসেবে পরিচিত ফ্লিউ যখন তার এই উপসংহার ঘোষণা করলেন তখন তাড়াহুড়ো করে অন্যান্য নাস্তিকরা তাকে জরাগ্রস্থ, ভীমরতিতে পাওয়া বুড়ো বলে প্রমানের জন্য উঠেপড়ে লাগলো। তারা প্রমাণ করতে ব্যস্ত হয়ে গেল শেষবয়সে গিয়ে ফ্লিউ কিছু খ্রিষ্টানদের দ্বরা প্রভাবিত হয়ে নিজের মত বদলেছেন।

.

ফ্লিউ এই অভিযোগ অস্বীকার করলেন এবং নাস্তিকতা থেকে আস্তিকতার দিকে তাঁর এই দার্শনিক যাত্রা বর্ননা করে একটি বই লিখলেন, There Is A God, How The World's Most Notorious Atheist Changed His Mind।

.

কোন যুক্তি ও প্রমানের প্রেক্ষিতে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছুলেন এই বইতে ফ্লিউ তা ব্যাখ্যা করলেন।

.

"এখন আমি বিশ্বাস করি এক অসীম বুদ্ধিমত্তা এই মহাবিশ্বকে অনস্তিত্ব থেকে অস্তিত্বে আনয়ন করেছেন। আমি বিশ্বাস করি যে সুক্ষাতিসুক্ষ নিয়মগুলো দ্বারা এই মহাবিশ্ব পরিচালিত হয় সেগুলোর মাধ্যমে একজন স্রষ্টার ইচ্ছা ও অস্তিত্ব প্রতিভাত হয়। আমি বিশ্বাস করি জীবন এবং জীবন ধারার উৎস ঐশ্বরিক।" [১]

.

অ্যান্টনি ফ্লিউ আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সমাজতান্ত্রিকদের পাঠচক্রে খুঁজে পাওয়া স্রোতের সাথে গাঁ ভাষানো নিরামিষ নাস্তিক কিংবা সামওয়্যার ইন ব্লগ বা মুক্তমনাতে ইংরেজি থেকে অনুবাদ করে “মুক্তচিন্তার” পতাকা উড়ানো গালিবাজ শব্দসন্ত্রাসী জাতীয় নাস্তিক ছিলেন না। খুব অল্প বয়সে নাস্তিকতার উপর একটি লেখা প্রকাশ ফ্লিউ করে দার্শনিক অঙ্গনে হইচই ফেলে দিয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে প্রকাশিত Theology and Falsification নামের এই পেপারটি গত পঞ্চাশ বছরে বারবার পুনর্মুদ্রণ করা হয়েছে। ফ্লিউয়ের এই লেখা দার্শনিক অঙ্গনে ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল এবং ফ্লিউয়ের জন্য এনেছিল একজন তুখোড় দার্শনিক হিসেবে বিশ্বজোড়া খ্যাতি।

.

পুরো ক্যারিয়ার জুড়েই একাডেমিক জগতের সর্বোচ্চ পর্যায়ে ছিল ফ্লিউয়ের অবস্থান। একপর্যায়ে তিনি অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির একজন প্রফেসর হিসেবেও দায়িত্বরত ছিলেন। তবে অধিকাংশ নাস্তিকদের মধ্যে উপস্থিত একটি বৈশিষ্ট্য থেক ফ্লিউ মুক্ত ছিলেন। অধিকাংশ নাস্তিক নিজের নাস্তিকতার দিকে যাত্রার প্রাথমিক পর্যায়ে বিজ্ঞান, দশন, যুক্তি নিয়ে সামান্য ঘাঁটাঘাঁটি করে। কিন্তু নাস্তিকতার বিশ্বাসে সম্পূর্ণভাবে প্রবেশ করার সর্বশেষ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, এবং দার্শনিক যুক্তিতর্ক সম্পর্কে তারা চিন্তা করা বন্ধ করে দেয়, অথবা শুধুমাত্র নিজেদের সংকীর্ণ অবিশ্বাসের বিশ্বাসের লেন্স দিয়ে সবকিছুকে বিচার করে।

.

এই জায়গাটাতে ফ্লিউ ছিলেন আলাদা। ফ্লিউয়ের একটি দুর্লভ গুণ ছিল, "প্রমাণাদি যেদিকে নিয়ে যায় তার অনুসরণ করা"র

নীতির কথা তিনি বাকি নাস্তিকদের মতো শুধু মুখে দাবি করতেন না, বরং সত্যিকার ভাবেই এই নীতির অনুসরণ করতেন।

.

ফ্লিউয়ের নিজের ভাষায় -

.

"এমনকি বিগ ব্যাং তত্ত্ব কিংবা ফাইন-টিউনিং তত্ত্ব প্রকাশের বহুপূর্বেই আমার অন্যতম সেরা দুইটি ধর্মতত্ত্ব বিরোধী বই প্রকাশিত হয়েছিলো। কিন্তু আশির দশকের শুরুর দিকে আমিএই বিষয়গুলো নিয়ে পুনরায় চিন্তাভাবনা শুরু করতে বাধ্য হলাম । আমি এই কথা স্বীকার করেছিলাম যে সমসাময়িক মহাজাগতিক আবিষ্কারগুলোর কারনে নাস্তিকরা বিব্রত হতে বাধ্য। কারন থমাস অ্যাকুইনাস দশর্নের মাধ্যমে যেটি প্রমাণ করতে পারে নি ["মহাবিশ্বের একটি শুরু আছে] তা মহাবিশ্বতত্ত্ববিদরা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করতে শুরু করলেন।" [২]

.

আর এ কারনেই শেষপর্যন্ত আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতিই এবং নতুন আবিষ্কার তাকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে যে - একজন বুদ্ধিমান সত্তাই এই মহাবিশ্বের উদ্ভাবন এবং ডিজাইন করেছেন। তিনি দেখলেন যে বিগ ব্যাং তত্ত্বানুসারে ধারণা করা হয় মহাবিশ্ব আনুমানিক তের বিলিয়ন বছর আগে সৃষ্টি হয়েছে। যদি একে সঠিক বলে ধরে নেওয়া হয় তাহলে আমরা বর্তমানে জটিল পর্যায়ের জীব এবং জীববৈচিত্র [complex life & complexity of life] দেখি, বিবর্তনের মাধ্যমে তাতে উপনীত হবার মতো যথেষ্ট সময় পাওয়া যায় না। এছাড়া, মাইক্রো বায়োলজি এবং ডিএনএ এর ব্যাপারে আধুনিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিস্কার তাকে এই সিদ্ধান্তে আস্তে বাধ্য করে যে, এসব কিছুর পেছনে অবশ্যই একটি বুদ্ধিমান সত্ত্বা আছে।

.

২০০৭ সালে বেনজামিন উইকারের সাথে সাক্ষাৎকারে ফ্লিউ বলেছিলেন -

.

"আমার সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করার পেছনে কাজ করেছে আইনস্টাইন সহ আরো বহু বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের মতের সাথে ক্রমবর্ধমান একাত্মতা যা আমি অনুভব করছিলাম। আইনস্টাইন সহ আরো অনেক বিজ্ঞানী তাদের সুক্ষদর্শিতার কারনে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে এই মহাবিশ্বের অন্তর্নিহিত এবং সুসংহত জটিলতার (integrated complexity) পেছনে একজন বুদ্ধিমান সত্ত্বার ভূমিকা আবশ্যক। এছাড়া আমি নিজে ব্যক্তিগত এই উপসংহারে পৌছেছিলাম যে জীবন ও জীববৈচিত্র – যা মহাবিশ্বের চাইতেও বেশি জটিল – শুধুমাত্র একটি বুদ্ধিমান উৎসের দ্বারাই ব্যাখ্যা করা যায়। [৩]

.

নাস্তিকরা সবসময় দাবি করে শুধু সাধারণ অশিক্ষিত, অজ্ঞ লোকেরা যারা কোন চিন্তাভাবনা করে না তারাই ধর্মে বিশ্বাস করে। কিন্তু অ্যান্টনি ফ্লিউ নাস্তিকদের সব যুক্তি জানতেন। এমনকি বর্তমানে নাস্তিকরা যেসব যুক্তি ব্যবহার করে এর অনেকগুলো তিনি নিজেই দাঁড় করিয়েছিলেন। নাস্তিকতার পক্ষে তিনি ৩০টির মতো বই লিখেছিলেন। কিন্তু যেহেতু তিনি অন্ধ অবিশ্বাসী ছিলেন না তাই শেষপর্যন্ত তিনি সেই উপসংহারে পৌছেছিলেন সব যুক্তি ও প্রমাণ যে দিকে নির্দেশ করছিল। আর তাই তিনি স্বীকার করে নিয়েছিল, এ মহবিশ্বের একজন স্রষ্টা থাকা আবশ্যক।

.

একজন নাস্তিক হিসেবে অ্যান্টনি ফ্লিউয়ের দার্শনিক পথ পরিক্রমার সবচেয়ে ইউনিক বৈশিষ্ট্য হল প্রমাণ ও যুক্তির অনুসরণের ব্যাপারে তার স্বদিচ্ছা, যা অন্যান্য নাস্তিকদের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময়ই অনুপস্থিত। যখন ফ্লিউয়ের পাশাপাশি আপনি একজন ডকিন্স, হ্যারিস কিংবা ডেনেটকে দাড় করাবেন তখন তাদের আত্বকেন্দ্রিক, উগ্র, অপরিপক্ক এবং ঝগড়াটে রূপ খুব সহজেই ধরা পড়বে।

.

.

২০১০ সালে অ্যান্টনি ফ্লিউ মারা যান। একজন আস্তিক হিসেবে কিন্তু কোন নির্দিষ্ট ধর্মের অনুসারী না হয়ে। আর এখানে

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট। আমরা সত্যকথনের পাঠকদের জন্য, কিংবা নাস্তিকদের জন্য অ্যান্টনি ফ্লিউকে আস্তিকতার স্বপক্ষে কোন প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত করছি না। আমরা এই কারনে অ্যান্টনি ফ্লিউয়ের গল্প আপনাদের সাথে শেয়ার করছি কারন নাস্তিক এবং মুসলিম – দুই পক্ষের জন্যই এতে শিক্ষণীয় বিষয় আছে।

.

নাস্তিকদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়টি ইতিমধ্যে আলোচিত হয়েছে – আর তা হল অবিশ্বাসের অন্ধ বিশ্বাস বাদ দিয়ে বিশুদ্ধ ভাবে স্রষ্টার অস্তিত্ব বিষয়ে চিন্তার স্বদিচ্ছার বিষয়টি।

.

আর মুসলিমদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয়টি হল আস্তিক হওয়া শেষপর্যন্ত আমাদের লক্ষ্য না। নাস্তিকদের তর্কে পরাজিত করাও আমাদের উদ্দেশ্য না। যদিও আমরা স্বীকার করি এ কাজটা আনন্দদায়ক। আমাদের উদ্দেশ্য ঈমান ও বিশুদ্ধ তাওহিদ অর্জন করা। আস্তিক হওয়া মানে হেদায়েত পাওয়া না। এ হল শুধু বাস্তবতাকে স্বীকার করে নেওয়া। আমাদের কাজ হল বাস্তবতাকে স্বীকার করার পর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার আনুগত্য করা।

.

অনেক সময়েই দেখা আস্তিক-নাস্তিক বিতর্ক, কম্পারেটিভ রিলিজিয়েন নিয়ে আলোচনা ইত্যাদি নিয়ে আমরা এতোটাই ব্যস্ত হয়ে পড়ি যে আমরা আমাদের ঈমানের দিকে আমাদের তাওহিদের বিশ্বাসের দিকে অমনযোগী হয়ে পড়ি। বুদ্ধি আপনাকে একটা পর্যায় পর্যন্ত এগিয়ে দিবে, যেমন অ্যান্টনি ফ্লিউয়ের ক্ষেত্রে তা তাকে সত্য পর্যন্ত পৌছে দিয়েছিল। কিন্তু এটুকুই যথেষ্ট না। সত্য পর্যন্ত পৌছানোর পর আমাদের দায়িত্ব শেষ না, বরং আমাদের মূল দায়িত্ব শুরু।

.

আমাদের মূল দায়িত্ব হল সত্যকে খুঁজে পাবার পর তার অনুসরণ করা। শোনা ও মানা। কারন যখন আপনি বুঝবেন মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছে, যখন আপনি উপলব্ধি করবেন আপনার একজন স্রষ্টা আছে, তখন আপনি এও বুঝবেন যে এই স্রষ্টার প্রতি আপনার দায়িত্ব আছে।
নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিকর্তা, এই সুবিশাল মহাবিশ্ব ও এই অবিশ্বাস্য জটিল ও বৈচিত্রময় জীবনের সৃষ্টিকর্তা নিরর্থক আপনাকে, আমাকে, এই সবকিছুকে সৃষ্টি করেন নি।

.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন –

.

হে বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে করা উচিৎ এবং তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যু বরণ করোনা। [আলে ইমরান, ১০২]

.

নিশ্চয় হেদায়েত কেবলমাত্র আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল -এর পক্ষ থেকেই।

১। *There Is A God, page 88*

২। *There Is A God, page 135.*

৩। *Dr. Benjamin Wiker: Exclusive Flew Interview, 30 October 2007*

২৩
"সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) কি আসলেই ৩টি সুরাকে কুরআনের অংশ বলে মানতেন না?" [প্রথম পর্ব]

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

কুরআন সংকলন ও সংরক্ষণকে প্রশ্নবিদ্ধ করে খ্রিষ্টান মিশনারী, নাস্তিক-মুক্তমনা ও ইসলাম বিদ্বেষী প্রাচ্যবিদরা যেসব অভিযোগ করে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে—প্রখ্যাত সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) এর মুসহাফে(লিপিবদ্ধ পূর্ণ কুরআন) ১১১টি সুরা ছিল। তিনি সুরার প্রচলিত কুরআনের ৩টি সুরা অন্তর্ভুক্ত করেননি। অতএব আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা)এই ৩টি সুরাকে কুরআনের অংশ হিসাবে মানতেন না এবং তাঁর কুরআন ছিল উসমান(রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআন তথা বর্তমানে প্রচলিত কুরআন থেকে ভিন্ন!!! ---এই হচ্ছে তাদের অভিযোগ।

এই প্রবন্ধে ইসলামবিদ্বেষীদের দাবির পোস্টমর্টেম করে তাদের ভ্রান্ত অভিযোগের স্বরূপ উন্মোচন করা হবে ইন শা আল্লাহ।

জালালুদ্দিন সুয়ুতি(র)এর উলুমুল কুরআন সম্পর্কিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'আল ইতকান' এ একটি রেওয়ায়েত আছে যাতে বলা হয়েছে যে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) এর মুসহাফে তিনটি সুরা ছিল না। যথাঃ সুরা ফাতিহা ও মুয়াওয়িযাতাইন(সুরা ফালাক ও সুরা নাস) অর্থাৎ ১,১১৩ ও ১১৪নং সুরা। [১]

এই লেখায় প্রকৃত সত্য উন্মোচনের জন্য সুরা ফাতিহা ও মুয়াওয়িযাতাইন(সুরা ফালাক ও নাস) এর ব্যাপারে সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) এর অবস্থান পৃথক পৃথকভাবে দলিল-প্রমাণসহ আলোচনা করা হবে।

সুরা ফাতিহার ব্যাপারে ইবন মাসউদ(রা) এর অবস্থানঃ

'ফাতিহা' মানে হচ্ছে সূচনা, ভূমিকা কিংবা সূত্রপাত করা। এর পুরো নাম "ফাতিহাতুল কিতাব" বা কিতাবের(অর্থাৎ কুরআনের) সূচনা। সুরা ফাতিহার বিষয়টি এমন যে এই সুরার অস্তিত্বের ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর সন্দেহের দূরতম সম্ভাবনাও নেই। প্রতিদিনের ৫ ওয়াক্ত সলাতের প্রত্যেক রাকাতেই এই সুরাটি আবশ্যকীয়ভাবে পড়তে হয়। সলাত(নামাজ) আদায়কারী মুসলিমমাত্রই একে আল কুরআনের অংশ হিসাবে জানেন।
সুরা ফাতিহার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছে স্বয়ং কুরআনঃ

সুরা ফাতিহার অস্তিত্বের স্বীকৃতি দিচ্ছে স্বয়ং কুরআনঃ
وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ
" আমি তোমাকে[মুহাম্মাদ(স)] সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি।" (কুরআন, হিজর ১৫:৮৭)

এখানে 'সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত' দ্বারা সুরা ফাতিহাকে নির্দেশ করা হচ্ছে।

ইবন জারির তাবারী(র)-কে উদ্ধৃত করে জালালুদ্দিন সুয়ুতি(র) নিম্নোক্ত রেওয়ায়েতটি বর্ণণা করেনঃ

عن ابن مسعود في قوله: {ولقد آتيناك سبعا من المثاني} قال: فاتحة الكتاب

ইবন মাসউদ(রা) থেকে আল্লাহর বাণীর ব্যাপারে বর্ণিত আছে, “ আমি তোমাকে[মুহাম্মাদ(স)] সাতটি বার বার পঠিতব্য আয়াত এবং মহান কুরআন দিয়েছি।” তিনি বলেনঃ এ হচ্ছে ফাতিহাতুল কিতাব(সুরা ফাতিহা)। [২]

এখানে দেখা যাচ্ছে যে স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) কুরআনের আয়াত হিসাবে সুরা ফাতিহার কথা কুরআন থেকে বর্ণণা করছেন। এই বিবরণ থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হচ্ছে যে, সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) সুরা ফাতিহাকে কুরআনের অংশ বলে বিশ্বাস করতেন, ঠিক যেভাবে অন্য সকল মুসলিম বিশ্বাস করত।

ইবন মাসউদ(রা) কেন সুরা ফাতিহাকে তাঁর মুসহাফে অন্তর্ভুক্ত করলেন না? :

ইবন মাসউদ(রা) যদি সুরা ফাতিহাকে কুরআনের অংশ বলেই বিশ্বাস করতেন, তাহলে কেন তিনি একে তাঁর মুসহাফে অন্তর্ভুক্ত করলেন না? তাঁর নিজ বক্তব্যেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়।

আবু বকর আল আনবারী(মৃত্যু ৩০৪ হিজরী) উল্লেখ করেছেন, বর্ণিত আছে যে--

قيل لعبد الله بن مسعود: لم لم تكتب فاتحة الكتاب في مصحفك؟ قال: لو كتبتها لكتبتها مع كل سورة. قال أبو بكر: يعني أن كل ركعة سبيلها أن تفتتح بأم القرآن قبل السورة المتلوة بعدها، فقال: اختصرت بإسقاطها، ووثقت بحفظ المسلمين لها

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা)কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কেন তিনি সুরা ফাতিহাকে তাঁর মুসহাফে উল্লেখ করেননি। তিনি জবাবে বলেছিলেন, “যদি লিপিবদ্ধ করতামই, তাহলে আমি একে প্রত্যেক সুরার আগে লিপিবদ্ধ করতাম।”

আবু বকর আল আনবারী এই কথার ব্যাখ্যায় বলেন, প্রত্যেক রাকাত(নামাজে) শুরু হয় সুরা ফাতিহার দ্বারা এবং এর পরে অন্য সুরা তিলাওয়াত করা হয়। ইবন মাসউদ(রা) এর বক্তব্য ছিল ঠিক এই বক্তব্যের ন্যায়ঃ “আমি সংক্ষিপ্ততার জন্য একে বাদ দিয়েছি এবং মুসলিমদের দ্বারা এর সংরক্ষণের ব্যাপারে আস্থা রাখছি।” [৩]

এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে, কোন একটি অংশ মুসহাফে উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে এটিকে তিনি কুরআনের অংশ বলে মনে করেন না। এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট যা পাঠকদের মনে রাখবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

মুয়াওয়িযাতাইন (সুরা ফালাক ও নাস) এর ব্যাপারে ইবন মাসউদ(রা) এর অবস্থানঃ

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) যে সুরা ফালাক ও সুরা নাসকে কুরআনের অংশ বলে বিশ্বাস করতেন— এই কথার পেছনে বেশ কিছু শক্তিশালী প্রমাণ রয়েছে।

১। স্বয়ং ইবন মাসউদ(রা) থেকে মুয়াওয়িযাতাইন এর বিবরণঃ

আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) থেকে সুরা ফালাক ও সুরা নাস এর মর্যাদার বর্ণণা পাওয়া যায়।

عن ابن مسعود قال: استكثروا من السورتين يبلغكم الله بهما في الآخرة المعوذتين

ইবন মাসউদ(রা) থেকে বর্ণিতঃ “দুইটি সুরা বেশি করে পড়ো, আল্লাহ এর জন্য আখিরাতে তোমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন। আর তারা হচ্ছেঃ আল মুয়াওয়িযাতাইন(সুরা ফালাক ও সুরা নাস)।” [৪]

.

এটা কী করে সম্ভব হতে পারে যে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) সুরা ফালাক ও সুরা নাসের মর্যাদা বর্ণণা করবেন, অথচ এই সুরাদ্বয়কে কুরআনের অংশ বলে মনে করবেন না তথা এদের অস্তিত্ব অস্বীকার করবেন? সুবহানাল্লাহ; ইসলামবিরোধীদের অভিযোগের অসারতা এই রেওয়ায়েতের দ্বারা স্পষ্টভাবে ফুটে উঠছে।

২। ইবন মাসউদ(রা) থেকে বর্ণিত সকল কিরাতে মুয়াওয়িযাতাইন এর উপস্থিতিঃ

প্রাচীন যুগ থেকেই কুরআন সংরক্ষণের প্রধানতম মাধ্যম ছিল হাফিজগণের স্মৃতি। আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবী (ﷺ)কে বলেনঃ
وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء
"আমি তোমার উপর কিতাব নাজিল করেছি যা পানি দ্বারা ধুয়ে যাওয়া সম্ভব নয়" [৫]
{{ পানি দ্বারা সেই জিনিস ধুয়ে যাওয়া সম্ভব যা কাগজের উপর কালি দ্বারা লেখা হয়। যা স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে, তার পক্ষে ধুয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।}}
মুসলিম কিরাত বিশেষজ্ঞগণ সবসময়েই কুরআনকে অবিচ্ছিন্ন বর্ণণাক্রম দ্বারা হিফাজত করেছেন যা স্বয়ং রাসুল(ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। মুতাওয়াতির কিরাতগুলো কুরআনের সংরক্ষিত থাকবার একটি বড় প্রমাণ।

সকল মুতাওয়াতির কিরাতের মধ্যেই সুরা ফালাক ও সুরা নাস বিদ্যমান(এবং অবশ্যই সুরা ফাতিহাও সেগুলোতে রয়েছে।)। এই কিরাতগুলোর মধ্যে চারটি কিরাত রয়েছে, যেগুলোর বর্ণণাক্রম আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) থেকে রাসুল(ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছেছে।

নিম্নে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) থেকে বর্ণণাকৃত কিরাতগুলোর ব্যাপারে সংক্ষিপ্তভাবে আলোকপাত করা হল।

ক) আসিম এর কিরাতঃ এর বর্ণণাক্রম যির থেকে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) থেকে মুহাম্মাদ(ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছেছে।
উল্লেখ্য যে, উক্ত আসিম(মৃত্যু ১২৮ হিজরী) এবং যির(মৃত্যু ৮৩ হিজরী) মুসনাদ আহমাদ এর বর্ণণাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। এই বর্ণণাকারীগণ থেকে এমন বিবরণ পাওয়া যায় যাতে বলা হয়েছে যে ইবন মাসউদ(রা) তাঁর মুসহাফে সুইটি সুরা(ফালাক ও নাস) উল্লেখ করেননি। অথচ তাঁদের থেকেই আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) এর সূত্রে যে কিরাত বর্ণিত হয়েছে, তাতে সুরা ফালাক ও সুরা নাস বিদ্যমান, আলহামদুলিল্লাহ। অতএব স্বয়ং বর্ণণাকারীগণ থেকে প্রমাণিত হল যে, মুসহাফে উল্লেখ না করলেও আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) এই সুরাদ্বয়কে কুরআনের অংশ হিসাবে তিলাওয়াত করতেন। [৬]

খ) হামজা এর কিরাতঃ এর বর্ণণাক্রম আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) এর সূত্রে নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। [৭]

গ) আল কিসাই এর কিরাতঃ এর বর্ণণাক্রমও আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) থেকে মুহাম্মাদ(ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। [৮]

ঘ) খালাফ এর কিরাতঃ এর বর্ণণাক্রমও আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) থেকে মুহাম্মাদ(ﷺ) পর্যন্ত পৌঁছেছে। [৯]

এই মুতাওয়াতির কিরাতগুলোর বর্ণাক্রমের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) রয়েছেন এবং কিরাতগুলোর প্রত্যেকটিতে সুরা ফাতিহা, সুরা ফালাক ও সুরা নাস রয়েছে, আলহামদুলিল্লাহ। এর ফলে সামান্যতম সন্দেহেরও আর অবকাশ রইলো না যেঃ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) সুরা ফাতিহা, সুরা ফালাক ও সুরা নাসকে আল কুরআনের অংশ হিসাবে তিলাওয়াত করতেন।

তথ্যসূত্রঃ

[১] আস সুয়ুতি, আল ইতকান ফি উলুমিল কুরআন,(কায়রোঃ আল হাইয়া আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৭৪) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭

[২] আস সুয়ুতি, দুরর মানসুর ফি তাফসির বিল মাসুর, (বৈরুতঃ দারুল ফিকর) খণ্ড ৫, পৃষ্ঠা ৯৪

[৩] কুরতুবী, জামি লি আহকাম আল কুরআন, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১১৫(কায়রোঃ দারুল কুতুব আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৬৪)

[৪] আলী আল মুত্তাকী, কানজুল উম্মাল, (বৈরুতঃ আর রিসালাহ পাবলিকেশন্স, ১৯৮১) হাদিস নং ২৭৪৩

[৫] মুসলিম, আস সহীহ, (রিয়াদঃ মাকতাবা দারুস সালাম, ২০০৭) হাদিস ৭২০৭

[৬] আল জাযরী, আন নাশর ফি কিরাআত আল 'আশার, (কায়রোঃ মাকতাবা আত তিজারিয়াহ আল কুবরা) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৫৫

[৭] প্রাগুক্ত; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৬৫

[৮] প্রাগুক্ত; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৭২

[৯] প্রাগুক্ত; খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ১৮৫

২৪
"সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রা) কি আসলেই ৩টি সুরাকে কুরআনের অংশ বলে মানতেন না?" [দ্বিতীয় পর্ব]

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

কিছু বিপরীত বর্ণণা সম্পর্কে আলোচনাঃ

এবার আমরা কিছু রেওয়ায়েতের পর্যালোচনা করব যেগুলো ব্যবহার করে ইসলামবিরোধিরা অপপ্রচার চালায়।

বর্ণণা ১:
আবদাহ এবং আসিম যির থেকে বর্ণণা করেছেন, তিনি বলেনঃ
قلت لأبي: إن أخاك يحكهما من المصحف، قيل لسفيان: ابن مسعود؟ فلم ينكر
"আমি উবাই(রা)কে বলেছি, "আপনার ভাই ইবন মাসউদ(রা) সেগুলোকে(সুরা ফালাক ও নাস) তাঁর মুসহাফ থেকে মুছে ফেলেছেন", এবং তিনি এতে কোন আপত্তি করলেন না।" [১০]

বিভ্রান্তি অপনোদনঃ

আমরা এই বর্ণণাটিতে দেখছি যে, ইবন মাসউদ(রা) সুরাগুলো মুছে ফেলেছেন শুনেও কুরআনের আলিম সাহাবী উবাই বিন কা'ব(রা) কোন আপত্তি বা প্রতিবাদ করছেন না। অথচ ইসলামের একটি সুপ্রতিষ্ঠিত আকিদা হচ্ছেঃ কেউ যদি কুরআনের একটি আয়াতও অস্বীকার করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় এবং কাফির হিসাবে পরিগণিত হয়। অতএব ইবন মাসউদ(রা) যদি আসলেই সুরাদ্বয়কে কুরআনের অংশ হিসাবে মানতে অস্বীকার করতেন, তাহলে উবাই(রা) অবশ্যই কোন না কোন প্রতিক্রিয়া দেখাতেন। অথচ তিনি তেমন কিছুই করেননি।

এ থেকে সুপষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে যেঃ উবাই(রা) এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে ইবন মাসউদ(রা) উক্ত সুরাদ্বয়কে কুরআনের অংশ হিসাবে মানতে অস্বীকার করছেন না। শুধুমাত্র নিজ মুসহাফে উল্লেখ করেননি মাত্র।
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছেঃ যে আসিম ও যির এই রেওয়ায়েতের বর্ণণাকারী, তাঁরা স্বয়ং আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) এর সূত্রে বর্ণিত কিরাত থেকে সুরা ফালাক ও সুরা নাস পাঠ করেছেন।

বর্ণণা ২:
" عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: كان عبد الله، " يحك المعوذتين من مصاحفه، ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله
আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ বর্ণণা করেছেনঃ ইবন মাসউদ(রা) মুয়াওয়িযাতাইন(সুরা ফালাক ও সুরা নাস)কে তাঁর মুসহাফ থেকে মুছে ফেলেছেন এবং বলেছেন এগুলো কুরআনের অংশ নয়। [১১]

একই বিবরণ ইমাম তাবারানী(র) এর মু'জামুল কাবিরেও এসেছে।[১২]

বিভ্রান্তি অপনোদনঃ

.

এই বর্ণাটি সত্য হতে পারে না কেননা এটি একটি শাজ বা বিচ্ছিন্ন বর্ণনা যা শুধুমাত্র আব্দুর রহমান বিন ইয়াজিদ বর্ণণা করেছেন। হাদিস শাস্ত্রে মুতাওয়াতিরের বিপরীতে বিচ্ছিন্ন বর্ণণা দ্বারা কোন বিষয় প্রমাণিত হয় না।এমনকি ঐ বর্ণণার সনদ সহীহ হলেও। এক্ষেত্রে একে মু'আল্লাল বা ত্রুটিপূর্ণ বর্ণণা বলে।[১৩]

বিপরীত বর্ণণাগুলো সম্পর্কে উলামাগণের অভিমতঃ

ইমাম নববী(র) বলেনঃ

أجمع المسلمون على أن المعوذتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد منها شيئا كفر وما نقل عن ابن مسعود باطل ليس بصحيح.

"এ ব্যাপারে মুসলিমগণের ইজমা রয়েছে যে মুয়াওয়িযাতাইন ও সুরা ফাতিহা কুরআনের অংশ এবং যে তা অস্বীকার করে সে কাফির হয়ে যায়।আর এ ব্যাপারে ইবন মাসউদ(রা) থেকে যা বর্ণিত আছে তা মিথ্যা এবং সহীহ নয়।"[১৪]

আবু হাফস ইবন আদিল আল হাম্বালী(র) লিখেছেনঃ

هذا المذهب عن ابن مسعود نقل كاذب باطل

"ইবন মাসউদ(রা) এর থেকে বর্ণিত এই অভিমতটি মিথ্যা ও বানোয়াট।"[১৫]

আল খিফাজী(র) বলেনঃ

وما نقل عن ابن مسعود رضي الله عنه من أنّ الفاتحة والمعوّذتين ليست من القرآن لا أصل له

"আর, ইবন মাসউদ(রা) থেকে সুরা ফাতিহা ও মুয়াওয়িযাতাইন কুরআনের অংশ নয় মর্মে যা বর্ণিত হয়েছে তার কোন ভিত্তি নেই।"[১৬]

.

এছাড়া ইমাম ইবন হাজম(র) থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।[১৭]

ইমাম সুয়ুতি(র) আবু বকর আল বাকিলানী(র) থেকে উদ্ধৃত করেছেনঃ

لم يصح عنه أنها ليست من القرآن ولا حفظ عنه. إنما حكها وأسقطها من مصحفه إنكارا لكتابتها لا جحدا لكونها قرآنا لأنه كانت السنة عنده ألا يكتب في المصحف إلا ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإثباته فيه ولم يجده كتب ذلك ولا سمعه أمر به.

"এটি মোটেও তাঁর{ইবন মাসউদ(রা)} থেকে প্রমাণিত নয় যে এই সুরাদ্বয় কুরআনের অংশ নয়। কুরআনের অংশ হিসাবে অস্বীকার করে তিনি এই সুরাদ্বয়কে তাঁর মুসহাফ থেকে মোছেননি বা বাদ দেননি। তাঁর নিকট বিষয়টি এরূপ ছিল যে, তিনি নবী(ﷺ) এর নির্দেশ ব্যতিত কিছুই মুসহাফে লিখতেন না।এবং তিনি এ ব্যাপারে কিছু লিখিত পাননি বা এ ব্যাপারে কোন নির্দেশ শোনেননি। "[১৮]

অতএব, উপরিউক্ত আলোচনা ও দলিল-প্রমাণ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল যেঃ সাহাবী আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) এর বিরুদ্ধে ৩টি সুরাকে(ফাতিহা, ফালাক ও নাস) কুরআনের অংশ হিসাবে না মানার যে অভিযোগ তোলা হয় তা থেকে তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত এবং এই সম্মানিত সাহাবী অন্য সকল মুসলিমের ন্যায় একই কুরআন পাঠ করতেন। সেই সাথে উসমান(রা) কর্তৃক সংকলিত কুরআনের বিরুদ্ধে ইসলামবিদ্বেষীদের অভিযোগও মিথ্যা প্রমাণিত হল।

এবং আল্লাহ ভালো জানেন।

তথ্যসূত্রঃ

[১০] আহমাদ বিন হাম্বাল, আল মুসনাদ, (বৈরুতঃ আর রিসালাহ পাবলিকেশনস, ২০০১) হাদিস নং ২১১৮৯

[১১] আহমাদ বিন হাম্বাল, আল মুসনাদ, হাদিস নং ২১১৮৮

[১২] আত তাবারানী, মু'জামুল কাবির, (কায়রোঃ মাকতাবা ইবন তাইমিয়া, ১৯৯৪) হাদিস নং ৯১৫০

[১৩] মু'আল্লাল বা ক্রুটিপূর্ণ বর্ণণার ব্যাপারে জানতে দেখতে পারেনঃ Ibn as-Salah, An Introduction to the Science of Hadith, Translated by Dr. Eerik Dickinson (Berkshire: Garnet Publishing Ltd., 2006) page 57 & 67

[১৪] আস সুয়ুতি, আল ইতকান, খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭১

[১৫] ইবন আদিল আল হাম্বালী, আল বাব ফি উলুমুল কিতাব, (বৈরুতঃ দারুল কুতুব আল ইলমিয়্যাহ, ১৯৯৮) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৪৯

[১৬] আল খিফাজী, ইনায়া আল কাযি ওয়া কিফায়া আর রাজি 'আলা তাফসিরুল বাইযাওয়ি, (বৈরুত, দারুস সদর) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৯

[১৭] ইবন হাজম, আল মুহাল্লা(বৈরুতঃ দারুল ফিকর) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ৩২

[১৮] আস সুয়ুতি, আল ইতকান, (কায়রো: হাইয়া আল মিসরিয়্যাহ, ১৯৭৪) খণ্ড ১, পৃষ্ঠা ২৭১

সহায়ক ওয়েবসাইট-

http://www.icraa.org/

http://www.letmeturnthetables.com/

২৫

"কেন" ও "কিভাবে"

-মোহাম্মাদ মশিউর রহমান

বড়ই পিকুলিয়ার দুটি প্রশ্ন।

একটার উত্তর হলো "কারণ"। অন্যটার হলো "প্রসেস" বা "প্রক্রিয়া"।

.

আধুনিক যুগের নব্য মডারেট মুসলিমরা বা আর্টস,কমার্স,সাহিত্য প্রভৃতি ব্যাকগ্রাউন্ডের "তুখোড় বিজ্ঞানী"রা যখন শুধুমাত্র বিজ্ঞানেরই আলোকে সবকিছুকে আলোকিত করে ফেলে ব্যাখ্যা করতে যায়,তখন তারা ভুলে যায় যে বিজ্ঞান জিনিসটা দাঁড়িয়েই আছে মূলত পর্যবেক্ষণের ওপরে। আর প্রকৃতপক্ষে গোটা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেবলমাত্র অতীব ক্ষুদ্র অংশ পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাপ্ত। যার কারনে কিছু বিজ্ঞানীরা তো বলেন যে এই বিশ্বজগত হলো অসীম,আর কিছু বলেন তা এখন পর্যন্ত মহাবিশ্বের যা পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে সম্পূর্ণ মহাবিশ্ব তার আরও ২০গুণ বেশি।

.

কাজেই পর্যবেক্ষণ নেই,তো এই "বিশেষ জ্ঞান"-এর কোমড়ে জোরও খুঁজতে গেলে দেখা যাবে নেই।

.

এরই ফলে দেখা যায় যে বাঘ,পেঁচা প্রভৃতির মুখোশ নিয়ে মঙ্গল কামনা করতে বের হওয়া এই প্রবল বিজ্ঞানমনস্ক সম্প্রদায়,কোন একটা ঘটনা কি কারণে ঘটে বিপুল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে তার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে "কেন" ও "কিভাবে"-এর মধ্যে লেজে-গোবরে পাকিয়ে একেবারে বীভৎস এক পরিস্থিতির জন্ম দেয়,যা তারা নিজেরাও জানে না;বা জানলেও হয়তো আস্তে করে চেপে যায়,আল্লাহ ভাল জানেন।

.

যেমন উদাহরণস্বরূপ প্রশ্ন করা হলো - বৃষ্টি কেন হয়?

.

এদের ব্যাপারে একটা কথা বলাই বাহুল্য,যে এরা কিছু জানুক আর নাই জানুক;পান্ডিত্য জাহির করার ক্ষেত্রে সবার আগে গলা বাড়িয়ে ছুটে আসে।তা কেউ এদের কাছে জবাব চাক বা না-ই চাক।

.

বৃষ্টি কেন হয়-জবাবে দেখা যাবে কথার তুবড়ি ছুটে গেছে। এর মধ্যে দু-একটা কথার মর্মোদ্ধার করা সম্ভব হলে বোঝা যাবে,যে তারা বলার চেষ্টা করছে -

.

"সূর্যের তাপে পানি উপরে উঠে,উঠে নিম্নতাপমাত্রায় জমে,তারপর ওজনের ভারে নিচে নেমে আসে" ইত্যাদি ইত্যাদি।

.

কিন্তু বাতাস যত উত্তপ্ত হয় ততই হালকা হয়ে উপরে উঠতে থাকে, অর্থাৎ বায়ুমন্ডলের উপরের দিকে থাকে হালকা উত্তপ্ত বাতাস। নিচে ভারী তুলনামূলকভাবে শীতল বাতাস। তাহলে উত্তপ্ত বাতাস ঠান্ডা হয় কীভাবে,বা এসবের মধ্যে শিশিরাঙ্ক নামক বস্তুর কাজই বা কী - এসব কিছু এদেরকে জিজ্ঞেস না করাই উত্তম হবে আল্লাহু 'আলাম।

.

কারণ এদেরকে বৃষ্টি হবার কারণ জিজ্ঞেস করায় আপনি অলরেডী উত্তর পেয়েছেন বৃষ্টি হবার প্রসেস বা প্রক্রিয়া সম্পর্কে।

.

আবার যেমন ভূমিকম্প।

.

সবার আগে দৌঁড়ে এসে জ্ঞানের পসরা খুলে বসে বলবে,"টেকটোনিক প্লেটে প্লেটে সংঘর্ষের কারণে মাটি কেঁপে উঠেছে। এখানে অন্য কিছু মনে করার অবকাশ নেই। ওসব মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনা"।

.

ফলাফল একই,ঘুরেফিরে আবারও সেই "ফির পেহলে সে"।

.

মানে ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে,আপনার কোন এক বন্ধুকে হঠাৎ কক্সবাজারে ঘুরতে দেখে আপনি জিজ্ঞেস করলেন "এখানে কেন?"

আর সে উত্তরে বললো "কক্সবাজারে আসার বাসে চড়েছি,বাস এখানে এসে নামিয়ে দিয়েছে,তাই এখানে"।

.

কিন্তু না,এক্ষেত্রে যেকোন সুস্থ মস্তিষ্কের মানুষই থামিয়ে দিয়ে বলবেন -

.

"না না,কক্সবাজারে যাবার এটা তো কোন কারণ হতে পারে না;এটাতো সে ব্যক্তি কিভাবে এখানে এসেছে তা বলা হলো। কারণ তো হবে হয়তো বেড়ানো,বা আত্মীয়স্বজনের সাথে দেখা করা বা অন্য কিছু"।

.

আসল ব্যাপারটা ঠিক এই জায়গায়।

.

বৃষ্টি বা ভূমিকম্প-এদেরকে আপনি একটু গলার জোর বাড়িয়ে বলুন যে প্রসেস না, এ ব্যাপারগুলোর কারন সম্পর্কে বলতে। দেখবেন বিজ্ঞানমনস্করা শোলমাছের মত পিছলে যাবার ধান্দায় আছে।

.

বিশ্বজগত সৃষ্টির কারণ জিজ্ঞেস করার পর বিং ব্যাং-এর মুখস্থ বুলি কপচানো শুরু করলে হালকা করে একটা ঝাড়ি দিয়ে বলুন -

কিভাবে না,কেন সৃষ্টি হয়েছে তা বলতে। দেখবেন বিজ্ঞানীরা নিশ্চুপ।

.

কেন জন্মেছে? এ প্রশ্ন এদেরকে জিজ্ঞেস করলেও দেখা যাবে শুক্রাণু আর ডিম্বাণুর নিষেকের কাহিনী শুরু করেছে। কেন মারা যাবে? জিজ্ঞেস করলে দেখা যাবে ব্রেইনডেড হবার বুলি আওড়াচ্ছে।

.

আসলে এরা সবসময়ই কনফিউশনে থাকে;এদের জীবনটা চলেও কনফিউশনে,শেষও হয় কনফিউশনে।

.

এরাই শাইত্বানের অন্যতম হাতিয়ার;তার নিজের দল ভারী করার জন্য,মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের কাছে করে আসা তার অভিশপ্ত ওয়াদা পূরণের জন্য।

.

.

কাজেই চিন্তা করুন,মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হউন।

জানুন যে বিশ্বজগতের সৃষ্টি কোন অ্যাক্সিডেন্ট নয়,বা মালিকুল মুলকের কোন ক্রীড়াকৌতুক নয়।

.

■আকাশ ও পৃথিবী এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে,তা আমি ক্রীড়াচ্ছলে সৃষ্টি করি নি।

-সূরাহ আল আম্বিয়া,১৬

.

জানুন যে আপনার জন্ম বা মৃত্যু আপনার জন্য পরীক্ষা,কখনোই কারণহীন বা উদ্দেশ্যহীন নয়।

.

■পূণ্যময় তিনি যাঁর হাতে রাজত্ব,এবং তিনি সবকিছুর উপর ক্ষমতাশালী।

■যিনি সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন,যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন-কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।এবং তিনিই সর্বশক্তিমান,ক্ষমাময়।

-সূরাহ আল মুলক,১ ও ২

.

চিন্তা করুন...

■...এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন,যাতে তোমরা চিন্তা করো।

-সূরাহ আল বাক্বারা,২১৯ এর শেষাংশ

.

■...এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন-যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করো।

-সূরাহ আল বাক্বারা,২৬৬ এর শেষাংশ

.

■...আপনি বলে দিন:"অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে?তোমরা কি চিন্তা করো না?"

-সূরাহ আল আনআম,৫০ এর শেষাংশ

.

■...আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন।তোমরা কি চিন্তা করো না?

-সূরাহ আল আনআম,৮০ এর শেষাংশ

.

■...নিশ্চয়ই আমি প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য,যারা চিন্তা করে।

-সূরাহ আল আনআম,৯৮ এর শেষাংশ

.

■...ইনিই আল্লাহ,তোমাদের রব;কাজেই কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো।তোমরা কি কিছুই চিন্তা করো না?

-সূরাহ ইউনুস,৩ এর শেষাংশ

.

■তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন,এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পাহাড়-পর্বত ও নদনদী এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দুটি করে প্রকার সৃষ্টি করেছেন।তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন।এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে,যারা চিন্তা করে।

■এবং যমীনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে-একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আঙুরের বাগান আছে আর শস্য ও খর্জুর রয়েছে-একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়।এগুলোকে একই পানি দ্বার সেচ করা হয়।আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্টতর করে দেই।নিশ্চয়ই,এগুলোর মধ্যে নিদর্শন আছে তাদের জন্য যারা চিন্তা করে।

-সূরাহ আর রা'দ,৩ ও ৪

.

■...আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন,যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।

-সূরাহ ইবরাহীম,২৫ এর শেষাংশ

.

■এটা (ক্বুরআন) মানুষের জন্য একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে উপাস্য তিনিই-একক;এবং যাতে বুদ্ধিমানেরা চিন্তাভাবনা করে।

-সূরাহ ইবরাহীম,৫২

.

■তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যেসব রং-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিছেয়েন,সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তাভাবনা করে।

-সূরাহ আন নাহল,১৩

.

■যিনি সৃষ্টি করেন,তিনি কি তার সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না?তোমরা কি তবে চিন্তা করবে না?

-সূরাহ আন নাহল,১৭

.

■আমি এই ক্বুরআনকে নানাভাবে বুঝিয়েছি,যাতে তারা চিন্তা করে।অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখীতাই বৃদ্ধি পায়।

-সূরাহ আল ইসরা,৪১

.

■তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না?...

-সূরাহ আল মু'মিনূন,৬৮ এর প্রথমাংশ

.

■...বলুন:"যারা জানে এবং যারা জানে না,তারা কি সমান হতে পারে?"চিন্তাভাবনা কেবল তারাই করে,যারা বুদ্ধিমান।

-সূরাহ আয-যুমার,৯ এর শেষাংশ

.

■তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নির্দশনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে নাযিল করেন রুযী।চিন্তাভাবনা তারাই করে,যারা আল্লাহর দিকে ঋজু থাকে।

-সূরাহ গাফির,১৩

.

■তারা কি ক্বুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না,না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?

-সূরাহ মুহাম্মাদ,২৪

.

■যদি আমি এই ক্বুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম,তবে তুমি দেখতে যে,পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি,যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।

-সূরাহ আল হাশর,২১

২৬

"বিজ্ঞানমনস্কতা"

-আরিফ আজাদ

'আমি ভাই বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ।চাক্ষুষ প্রমাণ সহ চোখে না দেখা অবধি আমি কোনকিছুই বিশ্বাস করি না।'

-- 'তাই নাকি?'

- 'হ্যাঁ, একদম।'

.

-- 'তা ভাই, আপনি বিবর্তনবাদে বিশ্বাস করেন?'

- 'অবশ্যই। এটা তো প্রমাণিত সত্য।'

-- 'বিবর্তনবাদ বলে, বিলিয়ন বিলিয়ন বছর আগে একটি এককোষী ব্যাকটেরিয়া থেকে বিবর্তিত হতে হতে পৃথিবীতে সকল প্রাণীর উদ্ভব ঘটেছে। অর্থাৎ, সেই একটি ব্যাকটেরিয়া থেকেই বাঘ, ভাল্লুক, সাপ, কচ্ছপ, খচ্চর, ইঁদুর, মশা, হাতি,নীলতিমি থেকে বানর-শিম্পাঞ্জি হয়ে মানুষ এসেছে।'

- 'হ্যাঁ। তো?'

.

- 'কিন্তু আমার প্রশ্ন হচ্ছে, আপনি তো চোখে না দেখা অবধি কোনকিছুই আবার বিশ্বাস করেন না। আপনি আজ পর্যন্ত কোন শিম্পাঞ্জিকে বিবর্তিত হতে হতে মানুষে রূপান্তর হতে দেখেছেন?'

- 'না, আসলে.........সব যে চোখে দেখেই বিশ্বাস করি ঠিক তা নয়। বিজ্ঞানীরা বলেছেন এমনটিই হয়েছে। তারা নিশ্চই এটি গবেষণা করে বলেছেন। তাই তাদের কথায় তো বিশ্বাস করাই যায়, তাই না?'

.

- 'ও আচ্ছা। তাই বলেন। কিন্তু বিজ্ঞান তো আজ পর্যন্ত এমন কোন প্রমাণ দেখাতেই পারলো না যেখানে একটি প্রাণী সময়ের ব্যবধানে সম্পূর্ণ আরেকটি প্রানীতে পরিণত হয়ে গেছে, এরকম। যেটাকে ম্যাক্রো ইভোলুশান বলে আর কি!

এমনকি, বিবর্তনবাদী বিজ্ঞানী রিচার্ড লেনস্কি ই.কোলাই ব্যাকটেরিয়ার উপরে ল্যাবরেটরিতে দীর্ঘ ২৪ বছর একটানা মিউটেশন ঘটিয়ে পরীক্ষা করেছেন। আশা ছিলো- মিউটেশনের ফলে কোন একসময় এই ব্যাকটেরিয়া অন্য একটি প্রজাতিতে রূপান্তরিত হবে। মিউটেশন ঘটিয়ে ব্যাকটেরিয়াকে অন্য প্রজাতিতে রূপান্তরিত করার জন্য ২৪ বছর খুব যথেষ্ট সময়। কারন, ব্যাকটেরিয়ার রিপ্রোডাকশান সবচে দ্রুত হয়।

.

কিন্তু আশার মধ্যে গুড়ে বালি দিয়ে দেখা গেলো, ২৪ বছর মিউটেশন ঘটানোর পরেও ল্যাঙরা, ব্যাকা-ত্যারা,থ্যাতলা ব্যাকটেরিয়া ছাড়া আর কিছুই পাওয়া যায় নাই। অর্থাৎ, ই.কোলাই ব্যাকটেরিয়া ২৪ বছর পরেও ব্যাকটেরিয়াই থেকে গেছে। অন্য কোন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় নি।'

.

- 'দেখুন, বিবর্তন খুব স্লো প্রসেস। ধরুন, আপনাকে যদি আমাজন বনের রেড ইন্ডিয়ানদের মধ্যে রেখে আসা হয়, সময়ের বিবর্তনে, পারিপার্শ্বিক অবস্থার সাথে তাল মিলাতে মিলাতে আপনি একসময় রেড ইন্ডিয়ানদের মতো কাঁচা মাংশ খেতে অভ্যস্ত হয়ে যাবেন। আপনার এই কাঁচা মাংশ খেয়ে টিকে যাওয়াকে বলে 'ন্যাচারাল সিলেকশান।' এভাবেই বিবর্তন কাজ করে। ছোট ছোট সিম্পটম গুলো, আই মিন মাইক্রো ইভোলুশান গুলো আস্তে আস্তে, সময়ের পরিক্রমায় একদিন বৃহৎ বিবর্তন তথা ম্যাক্রো ইভোলিউশন ঘটিয়ে ফেলে। ছোট ছোট বিবর্তনগুলো দেখেই আমরা বুঝতে পারি যে বড় বিবর্তনও সম্ভব।'

.

- 'আমাজন জঙলে আমি হয়তো সময়ের পরিক্রমায় রেড ইন্ডিয়ানদের সাথে কাঁচা মাংশ খাওয়া শুরু করবো। কিন্তু সেটা কোনভাবেই প্রমান করে না যে, আমি কোন একদিন রেড ইন্ডিয়ান থেকে নীলতিমি তে পরিণত হয়ে সমুদ্র ভ্রমণে বের হবো।'

- 'আপনি ভাই আসলে বিজ্ঞান বুঝেনইই না।'

- 'আচ্ছা,, ধরে নিলাম যে,পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়াতে যে ছোট ছোট পরিবর্তন গুলো হয়, সেগুলোই প্রমাণ করে যে- এভাবে অনেক সময় দিলে একদিন একটি প্রানী সম্পূর্ণ অন্য আরেকটি প্রাণীতে রূপান্তরিত হবে, ঠিক আছে?'

.

- 'এই তো লাইনে আসছেন।'

- 'আচ্ছা, পরের প্রশ্ন। বলুন তো, কেউ যখন প্রেগন্যান্ট হয়, তার মধ্যে তখন কোন প্রাথমিক লক্ষণগুলো দেখা যায়?'

- 'এই যেমন- বমি বমি ভাব, মাথা ধরা, মাথা ঘুরা, শরীর দূর্বল দূর্বল লাগা এইসব।'

.

- 'আচ্ছা বেশ। ধরুন, কাল সকালে উঠে দেখলেন যে আপনার বমি বমি ভাব লাগছে, মাথাও ঘুরছে ভোঁ ভোঁ করে। সাথে শরীরটাও খুব দূর্বল। তাহলে, এই ছোট ছোট লক্ষণগুলো দেখে আমরা কি ধরে নিতে পারি যে আপনি অদূর ভবিষ্যতে কোন একদিন সত্যি সত্যিই প্রেগন্যান্ট হয়ে যাবেন?'

.

- 'আমি কিভাবে প্রেগন্যান্ট হবো?'

- 'কেন? এই যে, ছোট ছোট লক্ষণ, সিম্পটম এইসবই তো প্রমান করার জন্য যথেষ্ট যে আপনি কোন একদিন প্রেগন্যান্ট হয়ে যাবেন, যেমন করে ছোট ছোট পরিবর্তনগুলো প্রমাণ করে যে আমি একদিন রেড ইন্ডিয়ান থেকে নীল তিমি হয়ে যাবো।'

- 'না, আসলে, ইয়ে...... মানে....... ধুরো, আপনি বিজ্ঞানের 'ব' ও বুঝেন না মিয়া। কাঠমোল্লা কোনহানের।'

২৭

“কখনোই তোমরা তা পারবে না”

-শিহাব আহমেদ তুহিন

একেক যুগে মানব সভ্যতার একেকটি দিক উৎকর্ষতা লাভ করে। যেমনঃ মুসা(আঃ) এর যুগে জাদুবিদ্যা ছিল উৎকর্ষতার শীর্ষে। আল্লাহতায়ালা মুসা(আঃ) কে মুযিযা হিসেবে এমন এক লাঠি দিয়েছিলেন যা দিয়ে তিনি সে সময়ের সেরা সেরা জাদুকরদের পরাজিত করেছিলেন। ঈসা(আঃ) এর যুগ ছিল চিকিৎসা বিজ্ঞানে রোমানদের সেরা যুগ। আল্লাহতায়ালা ঈসা(আঃ) কে এমন কিছু দিয়েছিলেন যেটা তার সময়ে কেউই করতে সক্ষম ছিল না। আল্লাহর ইচ্ছায় ঈসা (আঃ) মৃতকে জীবিত করতেন,কুষ্ঠ রোগীদের সুস্থ করতেন।

.

ঈসা(আঃ) এর পর আসে মুহম্মদ(সাঃ) এর কথা। তিনি এমন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন যখন আরব সভ্যতা সাহিত্যের বিচারে ছিল শ্রেষ্ঠ। কবিতাই ছিল তাদের নিজেদের আবেগ,ভালবাসা,হিংসা,ক্রোধ এমনকি অশ্লীল যৌনতা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম। আল্লাহতায়ালা সে সময় মুহম্মদ(সাঃ) কে রিসালাতের মর্যাদা দান করলেন আর পুরো মানজাতির উদ্দেশ্যে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিলেন -

.

“আমি আমার বান্দার প্রতি যা অবতীর্ণ করেছি, তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে, তোমরা এর অনুরুপ একটি সূরা নিয়ে আস।”

[সূরা আল বাকারা ২;২৩]

.

তারপর এটাও বলে দিলেন-

.

“এবং তোমরা যদি সত্যবাদী হও, তাহলে আল্লাহ্ ব্যতীত তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তা না পার, এবং কখনোই তোমরা তা পারবে না। তাহলে সেই আগুন কে ভয় কর, অবিশ্বাসীদের জন্য যা প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে, মানুষ এবং পাথর হবে যার জ্বালানী।” [২;২৩-২৪]

.

প্রায় ১৪০০ বছর পুরানো চ্যালেঞ্জ! অনেকের ধারণা আরবরা তো এখন শুধু মুসলিম, তাই এখন আর এই চ্যালেঞ্জ খাটে না। অনেকেই জানেন না, আরবদের মধ্যে এখনো রয়েছে প্রায় ১৪ মিলিয়ন আরব খৃষ্টান,এছাড়া রয়েছে অনেক নাস্তিক-এগনোস্টিক। তারা কেউই এই চ্যালেঞ্জ এর সামনে বলার মত তেমন কিছু নিয়ে আসতে পারেননি। যারা চেষ্টা করেছেন তারা শুধু হাসির খোরাকই যুগিয়েছেন।

.

১৯৯৯ সালে আনিস সরোস নামে এক খৃষ্টান এভেঞ্জালিস্ট কুরআনের মত একটা বই রচনার দাবী নিয়ে আসেন। রচনা করেন একটা বই-“আল ফুরকানুল হক” বা “The true Furqan” । শুধু যে বইয়ের নাম 'ফুরকান' কুরআন থেকে কপি তাই ই নয় বরং অনেক সূরা কুরআন থেকে ডাইরেক্ট কপি-পেস্ট করা হয়েছে, শুধু শব্দগুলো একটু এদিক,সেদিক করা হয়েছে। আর আমরা জানি আল্লাহতায়ালা কুরআনে যথাযথ শব্দ-চয়ন করছেন। তাই শব্দের এদিক-সেদিক করে তিনি যে জগাখিচুড়ি বানিয়েছেন, তা তাঁর বইয়ের মান নামিয়েছে অনেক নীচে।

.

আর তাকে খুব একটা দোষ দেয়া যায় না। কারণ, আরবী সাহিত্যের সেরা সময়ে যারা সেরা ছিলেন, তারাই এই চ্যালেঞ্জ

মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছিলেন। যেমনঃ ওয়ালিদ ইবন মুগিরা, আরবের অন্যতম সেরা ভাষাবিদ ও বুদ্ধিজীবি, রাসূল(সাঃ) এর সাথে ডিবেট করতে যান এবং সম্পূর্ণ নাস্তানাবুদ হয়ে কুরাইশদের উদ্দেশ্যে বলেন -

.

"আমি কি বলব? তোমাদের মধ্যে কেউই কাব্য এতোটা ভালো জানো না, যতটা আমি জানি, না তোমাদের মধ্যে কেউ আমার সাথে ভাষা গঠন ও অলংকরণের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতায় পারবে। তারপরেও আমি বলছি, আল্লাহর কসম, মুহম্মদের কথার সাথে আমি যা জানি তার কোন কিছুরই সাদৃশ্য নেই আর আমি আল্লাহর কসম করে বলছি সে যা বলে তা খুবই মাধুর্যপূর্ণ।"

.

রাসূল(সাঃ) এর প্রধান শত্রু আবু জাহল কুরআন সম্পর্কে বলে, " বনু হাশিম যা কিছু করেছে আমরা তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করেছি।কিন্তু এখন তারা এমন কিছু নিয়ে এসেছে(কুরআন) যার সাথে আমরা কখনোই পারব না।"

.

ভন্ড নবী মুসাইলিমা আল-কাযযাব- এর কথা কে না জানে! সে দাবী করেছিল তার কাছেও জিবরাইল(আঃ) ওহী নিয়ে আসেন, যা কুরআনের মতই পবিত্র। সে কুরআনের বেশ কয়েকটি সূরার অনুরূপ সূরা তৈরীর চেষ্টা করে।যেমনঃ সূরা-ফীল কপি করে একটা সূরা তৈরীর চেষ্টা করে।

.

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ [١٠٥:١]

আপনি কি দেখেননি আপনার পালনকর্তা হস্তীবাহিনীর সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন?

أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ [١٠٥:٢]

তিনি কি তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করে দেননি?

وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ [١٠٥:٣]

তিনি তাদের উপর প্রেরণ করেছেন ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী,

تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ [١٠٥:٤]

যারা তাদের উপর পাথরের কংকর নিক্ষেপ করছিল।

فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ [١٠٥:٥]

অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃণসদৃশ করে দেন।

.

.

এর অনুরূপে মুসাইলিমা যে সূরাটি বানায়, তা হচ্ছে-

الفيل

হাতি।(আল-ফীল)

ما الفيل

হাতি কি? (মাল ফীল?)

وما أدراك ما الفيل

তুমি কি জানো হাতি কি? (ওয়া মা আদরকা মাল ফীল?)

له ذنب وبيل والخرطوم طويل

এর প্রশস্ত দুই কান এবং লম্বা একটা নাক আছে। (লাহু জানাবুন ওয়াবিল, ওয়া খুরতুমুন তাওইল)

.

.

......

হাস্যকর এক চেষ্টা তাতে কোন সন্দেহ নেই, না আছে মাথা,না আছে মুন্ডু। তার উপর প্রথম তিনটি আয়াত কুরআনের সূরা

আল-কারিয়া কে কপি করার চেষ্টা করা হয়েছে (আল কারিয়াতু,মাল কারিয়া,ওয়ামা আদরাকা মাল কারিয়া)।

.

আমর ইবনুল আসকে(রাঃ) মুসাইলিমার কাছে পাঠানো হয়েছিল যাতে সে তওবা করে। মুসাইলিমার কাছে গেলে সে আমর ইবনুল আসকে জিজ্ঞেস করে-

.

“তোমার বন্ধুর কাছে কি নতুন কোন ওহী এসেছে।?”
আমর ইবনুল আস উত্তর দেন, “একটি ছোট তবে যথাযথ সূরা তাঁর উপর নাযিল হয়েছে।

.

মুসাইলিমা জিজ্ঞেস করে, “কি সেটা?”
আমর ইবনুল আস তখন সূরা আসর তিলওয়াত করেন-

.

- وَالْعَصْرِ
কসম যুগের (সময়ের),
إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ
নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত;
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

.

.

তিলওয়াত শুনে মুসাইলিমা কিছুক্ষণ চুপ করে ভাবে। তারপর বলেন, আমার কাছেও অনুরূপ সূরা নাযিল হয়েছে।তারপর সে তিলয়াত করে,
يا وبر يا وبر ،
হে জংলী ইদুর! হে জংলী ইদুর! ।(ইয়া ওয়াবারু,ইয়া ওয়াবারু)
نقز إنما أنت أذنان وصدر
তুমি তো দুইটা কান আর বক্ষ ছাড়া কিছুই না।(ইন্নামা আনতা আযনানী ওয়া সাদরুন)
وسائرك حفز بقر ،
আর সবই তো তোমার নগণ্য।(ওয়াসাইরুকা হাকরুন বাকরুন)।



.

মুসাইলিমা এরপর আমর ইবনুল আস(রাঃ) কে জিজ্ঞেস করে, “কেমন হয়েছে (আমার সূরা)?”

.

আমর(রাঃ) জবাব দেন, “আমায় আর কি জিজ্ঞেস করছ? যেখানে তুমি নিজেই জানো এর সবই মিথ্যা।”

.

আমরা অনেকেই সত্য অস্বীকারে মুসাইলিমা থেকে কম এগিয়ে না। জীবনের কোন এক পর্যায়ে এসে আবু জাহলের মত আমরা সত্য কিছুটা হলেও চিনতে পারি। কিন্তু বাঁধা দেয় আমাদের ইগো,ক্ষমতার দাপট আর নিজেকে মুক্ত ভাবার অহংকার।

.

পূর্ববর্তী যুগের মানুষদের ঈসা(আঃ) কিংবা মুসা(আঃ) এর মুযিযাকে অস্বীকার করার একটা এক্সকিউজ ছিল। কারণ, তাদের মিরাকল তাদের দুনিয়া ত্যাগের পর পরবর্তী মানুষের কাছে স্রেফ একটা গল্পের মত ছিল। কিন্তু মুহম্মদ(সাঃ) এর মিরাকল সম্পূর্ণ আলাদা। তিনি কিয়ামত পর্যন্ত এমন এক জীবন্ত নিদর্শন নিয়ে এসেছেন যা অন্তদৃষ্টিসম্পন্ন যে কোন মানুষই বুঝতে

পারবে।

.

যারা ১৪০০ বছর ধরে কুরআনের একটা চ্যালেঞ্জই মোকাবেলা করতে পারে না অথচ কুরআনকে অলীক রূপকথা বলতে চায়, তাদের জন্য আমরা কেবল করুণাই করতে পারি। 🙂:)

.

“আমি কোরআনে এমন বিষয় নাযিল করি যা রোগের সুচিকিৎসা এবং মুমিনের জন্য রহমত। জালিমদের তো এতে শুধু ক্ষতিই বৃদ্ধি পায়।” [১৭:৮২]

২৮

কুর'আনে কি দুই রকম কথা বলা আছে? আকাশ ও জমিন সৃষ্টি ৬ দিনে না ৮ দিনে?

-সাদাত (সদালাপ ব্লগ)

ইসলামবিদ্বেষী ইংরেজি সাইট থেকে লেখা অনুবাদ করে অভিজিৎ রায় তার একটি লেখায় কুর'আনের পরস্পরবিরোধীতার অভিযোগ আনে এই বলে যে, কুর'আনের কিছু আয়াতে আকাশ ও জমিন সৃষ্টি হয়েছে ছয় দিনে অথচ সুরা ফুসসিলাতের ৯-১২ নং আয়াতে হিসাব করলে দেখা যায় সংখ্যাটা ৮ দিন।

.

(আল-কুরআনে পরস্পরবিরোধিতার অভিযোগ ও তার জবাব)

.

অভিযোগ-১: আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি ছয় দিনে না আট দিনে?

.

১.১ কুরআনের বেশ কিছু আয়াতে(৭:৫৪, ১০:৩, ১১:৭, ২৫:৫৯, ৩২:৪, ৫০:৩৮, ৫৭:৪) বলা হয়েছে আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে।

.

.

১.২ কিন্তু ৪১:৯-১২ নং আয়াত অনুসারে দেখা যায় আল্লাহ মহাবিশ্ব সৃষ্টি করেছেন আট দিনে।

.

.

অভিযোগের জবাব:

আনুষঙ্গিক পাঠ:

১টা গর্ত খুঁড়তে একজন শ্রমিকের ১ ঘন্টা লাগলে, ৩টা গর্ত খুঁড়তে ৩ জন শ্রমিকের কয় ঘন্টা লাগবে? গণিতে যারা কাঁচা, তারা বলবে ৩ ঘন্টা। যারা গণিত মোটামুটি বুঝে তারা হয়ত বলবে ১ ঘন্টা। যারা আরেকটু বেশি বুঝে তারা বলবে প্রদত্ত তথ্যের ভিত্তিতে প্রশ্নটার উত্তর দেওয়া সম্ভব না। কারণ এখানে বিভিন্ন রকমের কেস হতে পারে।

.

কেস ১:

.

৩ জন শ্রমিক একসাথে কাজ শুরু করল সেক্ষেত্রে সময় লাগবে ১ ঘন্টা ।

.

১।।১।।১ = ১

.

কেস ২:

.

২ জন শ্রমিক একসাথে কাজ শুরু করল। তাদের কাজ শেষ হল। অত:পর ৩য় শ্রমিক কাজ শুরু করল। এক্ষেত্রে সময় লাগবে

২ ঘন্টা।

.

(১।।১)+১=১+১=২

.

কেস ৩:

.

১ম শ্রমিক কাজ শেষ করল। অত:পর ২য় শ্রমিক কাজ শুরু করল।

.

২য় শ্রমিক কাজ শেষ করল। অত:পর ৩য় শ্রমিক কাজ শুরু করল।

.

এক্ষেত্রে সময় লাগবে ৩ ঘন্টা।

.

১+১+১=৩

.

এ ধরণের কেস হতে পারে অগণিত। কাজেই এ প্রশ্নের উত্তর দেবার আগে জানতে হবে কে কখন কাজ শুরু করল। তথ্য পাবার সাথেই ১+১+১=৩ হিসাব করা যাবে না।]

.

.

১.১ এর আয়াতসমূহ: (প্রাসঙ্গিক অংশ)

৭:৫৪ তিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন

.

১০:৩ নিশ্চয়ই তোমাদের পালনকর্তা আল্লাহ যিনি তৈরী করেছেন আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে

.

১১:৭ তিনিই আসমান ও যমীন ছয় দিনে তৈরী করেছেন

.

২৫:৫৯ তিনি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের অন্তর্বর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃস্টি করেছেন

.

৩২:৪ আল্লাহ যিনি নভোমন্ডল, ভুমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন

.

৫০:৩৮ আমি নভোমন্ডল, ভূমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয়দিনে সৃষ্টি করেছি

.

৫৭:৪ তিনি নভোমন্ডল ও ভূ-মন্ডল সৃষ্টি করেছেন ছয়দিনে

.

.

বিশ্লেষণ:

.

নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টি করা হয়েছে মোট ছয় দিনে।

.

আবার, নভোমন্ডল, ভুমন্ডল ও এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু সৃষ্টি করা হয়েছে ছয় দিনে।

.

গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট হচ্ছে,

.

এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে সৃষ্টি করতে কোন আলাদা সময় নেওয়া হয় নাই। নভোমণ্ডল/আকাশ এবং ভূমণ্ডল/পৃথিবী সৃষ্টির সাথে সাথে সমান্তরালভাবে এতদুভয়ের মধ্যবর্তী সবকিছুকে সৃষ্টি করা হয়।

অর্থাৎ ৬ দিনের মধ্যে পৃথিবী এবং আকাশ সৃষ্টিকালে সমান্তরালভাবে অন্যান্য সৃষ্টিও হয়েছে।

.

.

১.২ এর আয়াতসমূহ:

.

৪১:৯ বলুন, তোমরা কি সে সত্তাকে অস্বীকার কর যিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন দু'দিনে এবং তোমরা কি তাঁর সমকক্ষ স্থীর কর? তিনি তো সমগ্র বিশ্বের পালনকর্তা।

.

৪১:১০ (وَجَعَلَ) তিনি পৃথিবীতে উপরিভাগে অটল পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, তাতে কল্যাণ নিহিত রেখেছেন এবং চার দিনের মধ্যে তাতে তার খাদ্যের ব্যবস্থা করেছেন-পূর্ণ হল জিজ্ঞাসুদের জন্যে।

.

৪১:১১ (ثُمَّ اسْتَوَى)অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন যা ছিল ধুম্রকুঞ্জ, অতঃপর তিনি তাকে ও পৃথিবীকে বললেন, তোমরা উভয়ে আস ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায়। তারা বলল, আমরা স্বেচ্ছায় আসলাম।

.

৪১:১২ (فَقَضَاهُنَّ)অতঃপর তিনি আকাশমন্ডলীকে দু'দিনে সপ্ত আকাশ করে দিলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তার আদেশ প্রেরণ করলেন। আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দ্বারা সুশোভিত ও সংরক্ষিত করেছি। এটা পরাক্রমশালী সর্বজ্ঞ আল্লাহর ব্যবস্থাপনা।

.

.

লক্ষ্যণীয়:

.

১১ এবং ১২ নম্বর আয়াতের শুরুতে 'অতঃপর' শব্দ আছে (আরবীতে 'সুম্মা' বা 'ফা')।

.

কিন্তু ১০ নম্বর আয়াতের শুরুতে কোন 'এর পর' /'আরো'/'অত:পর'/'তারপর' এ জাতীয় কোন শব্দ(আরবীতে 'সুম্মা' বা 'ফা') নেই।

.

বিশ্লেষণ:

.

৯ নম্বর আয়াতের কাজ তথা পৃথিবী সৃষ্টির জন্য লেগেছে ২ দিন।

.

১০ নম্বর আয়াতের অন্যান্য কাজের জন্য সময় লেগেছে ৪ দিন। কিন্তু ১০ নম্বর আয়াতের শুরুতে যেহেতু ‘এর পর’ /’আরো’/’অত:পর’/’তারপর’ এ জাতীয় কোন শব্দ(আরবীতে ‘সুম্মা’ বা ‘ফা’) নেই, কাজেই এই কাজ যে পৃথিবীর সৃষ্টি শেষ হবার পর শুরু হয়েছে এমন কোন তথ্য এখানে নেই, বরং এই কাজ কখন শুরু হয়েছে তা এখানে বলা নেই।

.

১১ নং আয়াতের নির্দেশ দেওয়া হয় ১০ নং আয়াতের অন্যান্য কাজের পর (আয়াতের শুরু হয়েছে ‘অত:পর’ দিয়ে), এখানে কোন কাজ নাই, কোন সময়ের প্রয়োজনও হয় নাই, উল্লেখও নেই।

.

১২ নম্বর আয়াতের কাজ তথা আকাশ সৃষ্টির জন্য লেগেছে ২ দিন। এই কাজ শুরু হয়েছে ১১ নং আয়াতের নির্দেশের পর (আয়াতের শুরু হয়েছে ‘অত:পর’ দিয়ে) তথা ১০ নম্বর আয়াতের অন্যান্য কাজ (যথা খাদ্যের ব্যবস্থা) শেষ হবার পরপরই।

.

এক নজরে আয়াত ৪টি হতে প্রাপ্ত তথ্য:

.

পৃথিবী সৃষ্টিতে ব্যয়িত সময়= ২দিন

.

অন্যান্য কাজে ব্যয়িত সময়= ৪ দিন

.

আকাশ সৃষ্টিতে ব্যয়িত সময়= ২ দিন

.

আকাশ সৃষ্টি শুরু হয় অন্যান্য কাজের পরে এটা বলা থাকলেও অন্যান্য কাজ যে পৃথিবী সৃষ্টি শেষ হবার পর শুরু হয়েছে এমন কোন তথ্য এখানে নেই।

.

কাজেই এই আয়াতগুলো থেকে যারা হিসাব করেন যে মহাবিশ্ব সৃষ্টি করতে (২+৪+২) বা ৮ দিন লেগেছে, তারা আনুষঙ্গিক পাঠের গণিতে কাঁচাদের মতোই হিসেব করেন। সমান্তরালভাবে যে একাধিক কাজ হতে পারে এটা যেন তাদের ধারণাতেই আসে নাই।

.

প্রথমে যেহেতু পৃথিবী সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে কাজেই পৃথিবী সৃষ্টিতে লেগেছে প্রথম ২ দিন।

.

শেষে যেহেতু আকাশ সৃষ্টির কথা বলা হয়েছে কাজেই আকাশ সৃষ্টিতে লেগেছে শেষের ২ দিন।

.

আর ১০ নং আয়াতের অন্যান্য কাজ (যথা খাদ্যের ব্যবস্থা) সম্পাদিত হয়েছে আকাশ সৃষ্টির আগের ৪ দিনে

.

ফলাফল:

.

১.১ এর আয়াতগুলো হতে আমরা জেনেছি:

.

মহাবিশ্ব সৃষ্টিতে মোট সময় লেগেছ ৬ দিন এবং একাধিক কাজ সমান্তরালেও ঘটেছে। কাজেই আমরা বলতে পারি, পৃথিবী

সৃষ্টির সাথে অন্যান্য কাজ ও সমান্তরালে সম্পাদিত হতে থাকে। ২য় দিনে পৃথিবী সৃষ্টি শেষ হয়, ৪র্থ দিনে অন্যান্য কাজ শেষ হয়, শেষের ২ দিনে আকাশ সৃষ্টি শেষ হয়। এভাবে পৃথিবী সৃষ্টির শুরু হতে আকাশ সৃষ্টির শেষ পর্যন্ত মোট ৬ দিনই লাগে।

.

সুতরাং, এখানে পরস্পরবিরোধিতার অভিযোগ একেবারেই অযৌক্তিক।

২৯

S.E.T.I এবং ডিএনএ

-সত্যকথন ডেস্ক

মজার একটা গল্প বলি। এইলিয়েন বা ভিন গ্রহের প্রানী নিয়ে অ্যামেরিকানদের আগ্রহের কথা সবারই। নানা টিভি সিরিয়াল, মুভি, সাইন্স ফিকশান বই এমনকি হ্যালোউইনের পোশাকেও এইলিয়েনদের উপস্থিতি। তবে এখানেই শেষ না। অ্যামেরিকানরা এইলিয়েনদের নিয়ে এতোটাই ফ্যাসিনেটেড যে তারা রীতিমতো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার খরচ করে মহাবিশ্বে এইলিয়েনদের খুঁজে বেড়ায়।

.

আর এইলিয়েনদের খোজ করার এই কাজটা যে সংস্থাটা করে সেটা হল S.E.T.I Institute [Search for Extraterrestrial Intelligence]। S.E.T.I থেকে অনেক ধরণের কাজ করা হলেও তাদের মূল কাজ হল মহাবিশ্বের অন্য কোথাও কোন বুদ্ধিমান প্রাণের অস্তিত্ব আছে কি না টা খুজে বের করার চেষ্টা করা।

.

কিন্তু মহাবিশ্বের কোন এক কোণায় কোণ এক বুদ্ধিমান প্রানী যদি থেকেও থাকে তাহলে পৃথিবীতে বসে কিভাবে আপনি তা বের করবেন? এই সমস্যার সমাধানের সেটির বিজ্ঞানীরা একটা সুন্দর সমাধান বের করলেন।

.

যদি কাদামাটির উপর দিয়ে আপনি হেটে যান তাহলে যেমন মাটিতে আপনার পায়ের ছাপ পড়বে. যেই ছাপের দিকে তাকালে বোঝা যাবে কেউ একজন এখান দিয়ে হেটে গেছে। কারন কাঁদার বুকে নিজে নিজে মানুষের পায়ের ছাপের আকৃতির গর্ত তৈরি হয়ে যায় না। অর্থাৎ আপনি যখন সেখানে উপস্থিত থাকবেন না, তখনও আপনার উপস্থিতির নিদর্শন সেখানে থেকে যাবে। এক্ষেত্রে কাঁদার উপর তৈরি হয়া পায়ের ছাপের মাধ্যমে।

.

একইভাবে বুদ্ধিমত্তারও কিছু নিদর্শন আছে। যেমন আপনি যদি মহাবিশ্বের কোন প্রান্তে বেতার তরঙ্গ, এক্স-রে, তড়িৎ চুম্বকীয় রশ্মি – এধরনের কিছু অস্তিত্ব দেখা যায় তাহলে ধারণা করা যেতে পারে কোন বুদ্ধিমান প্রানীর কারনে এগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি। আবার বুদ্ধির একটি মৌলিক বৈশিষ্ট্য হল প্যাটার্ণ রেকোগনিশান। যেমন আমি যদি একটা দেয়ালে ০,১,১,২,৩,৫,৮,১৩,___ এরকম লিখে রেখে যাই এবং পরের দিন এসে দেখি শূন্যস্থানে ২১ লেখা আছে। তাহলে আমি ধরে নেব কোন বুদ্ধিমান প্রানী এটা করেছে।

.

আমি এমন একটা নাম্বার সিরিয লিখেছি যেখানে প্রতিটি সংখ্যা হল তাদের আগের দুটি সংখ্যার যোগফল। এই সিরিজ সম্পূর্ণ করতে হলে অবশ্যই প্রথমে সিরিজটিকে বুঝতে হবে এবং তারপর একে পূর্ণ করা যাবে। এটা হল প্যাটার্ন চিনতে পারার একটা উদাহরণ। সুধু বুদ্ধিমান প্রানীরাই প্যাটার্ণ চিনতে পারে।

.

ভিন গ্রহনের বুদ্ধিমত্তার খোঁজে সেটি বিভিন্ন ধরণের প্যাটার্ন, কোড, এগুলোর ব্যবহার করে, এবং মহাবিশ্বে এই ধরণের প্যাটার্ন বা কোডের খোজ করে। দশকের পর দশক সেটি মহাবিশ্ব বুদ্ধিমান প্রাণীর খোজ করে বেড়াচ্ছে। নিজেরা কোড, প্যাটার্ন পাঠাচ্ছে। কোড, প্যাটার্ন খুজছে। কিন্তু ফলাফল শূন্য।

.

কিন্তু সম্প্রতি বিজ্ঞানী ভ্লাদিমির আই. শ্চারবাক ও ম্যাক্সিম এ. মাকুকভ এক অদ্ভুত এবং অসাধারন কাজ করে বসলেন।

বুদ্ধিমত্তার অস্তিত্ব নির্নয়ের জন্য যে মাপকাঠি S.E.T.I তে তৈরি করা হয়েছে, তারা ঠিক করলেন সাম্প্রতিক গবেষণার ফলে ডি.এন.এ. এর যে ডেইটাগুলো পাওয়া গেছে, সেগুলোর উপর ঐ ক্রাইটেরিয়া বা নির্নায়ক গুলো প্রয়োগ করার। সহজ ভাষায় মহাবশ্বের দিকে তাকিয়ে বুদ্ধিমত্তার যে নিদর্শন খোজা হচ্ছিলো, তারা ঠিক করলেন ডিএনএ-র মধ্যে তা খোজার।

.

ফলাফল? "WOW!!!!" [১]

.

তারা দেখলেন ডি.এন.এ –তে যে প্যাটার্ন বিদ্যমান তা কেবল মাত্র বুদ্ধিমান সত্ত্বা দ্বারাই সৃষ্টি সম্ভব। আর কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বার ফলে নিছক এলেমেলো বিবর্তন (undirected natural selection by means of random mutation) বা র‍্যান্ডম ভাবে এমন প্যাটার্ন তৈরি হবার সম্ভাবনা ১/১ ট্রিলিয়নের চেয়েও কম।

.

এ থেকে এটাই স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয় যে ডিএনএ – বিক্ষিপ্ত বা এলেমেলোভাবে সৃষ্ট না। বরং একজন অতি বুদ্ধিমান সত্ত্বার সুক্ষাতিসুক্ষ নকশার ফল।

.

অ্যাস্ট্রোবায়োলজিস্ট ভ্লাদিমির আই. শ্চারবাক ও ম্যাক্সিম এ. মাকুকভ তাদের এই গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন Icarus [২] নামের প্রথম সারির peer-reviewed জার্নালে। এই জার্নালটি peer-reviwed হবার কারনে অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পুনঃপঠিত হবার পর, তাদের গবেষনার পদ্ধতি ও উপসংহার বিশ্লেষিত হবার পর, তাদের সম্মতিক্রমেই এই গবেষণাপত্রটি জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে।

.

আপনি বা আমি হয়তো এই অসাধারন খবরটা সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানি না, কারন স্বাভাবিকভাবে আমরা এই ধরনের জার্নালের খোজখবর রাখি না। আর মেইন্সট্রিম মিডিয়া আপনাকে এই খবর গুলো দেবে না কারন মেইন্সট্রিম মিডিয়া জীবনের উৎস সম্পর্কে একটি ম্যাটেরিয়ালিস্টিক বা বস্তুবাদী ব্যাখ্যাকে সত্য হিসেবে প্রচার করতে বদ্ধ পরিকর। আর নাস্তিকরা তো অবশ্যই এধরনের বিষয়গুলো চেপে যাবে, কারন প্রথমত তারা নিজেরা বিজ্ঞানমনস্কতার দাবি করলেও বেশিরভাগই তেমন একটা বিজ্ঞান বোঝে না। আর দ্বিতীয়ত তারা সৎ ভাবে বিতর্ক করে না। তাদের বিতর্কে উদ্দেশ্য থাকে সত্য-মিথ্যা, গালিগালাজ সব কিছু মিলিয়ে যেকোন মূল্যে তর্কে জেতা।

.

কিন্তু আপনি নিজে একটু ব্যাপারটা একটু ভেবে দেখুন। এতোদিন ধরে মহাবিশ্বের দিকে, বুদ্ধিমত্তার খোজে শুন্যতায় দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রাখার পর, যখন আমাদের সবার মাঝে থাকা ডিএনএ – এবং জেনেটিক কোডের দিকে তাকানো হল, যখন সেখানে বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন এখন বুদ্ধিমান সত্ত্বার সিগনেচার খোজা হল তখন সেখানে তা পাওয়া গেল যা এতোবছর শুন্যতায় পাওয়া যায় নি।

.

একই সাথে এটাও প্রমাণ হল অনিয়ন্ত্রিত, এলেমেলো বিবর্তন, natural selection by means of randaom variation - এই কোন কিছু দিয়ে ডিএনএ এবং জেনেটিক কোডের এই জটিলতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। তাহলে কোন সেই মহান সত্ত্বা যিনি এই অতিসুক্ষ সৃষ্টি করেছেন?

.

তারা সত্যবাদী হলে এ রকম একটা কালাম তারা নিয়ে আসুক না কেন।
তারা কি স্রষ্টা ব্যতীত সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আসমান ও যমীন সৃষ্টি করেছে? আসলে তারা নিশ্চিত বিশ্বাসী নয়।
তোমার রবের ভান্ডার কি তাদের নিকট রয়েছে, না তারা এ সমুদয়ের নিয়ন্তা? নাকি তাদের কাছে, সিঁড়ি আছে যাতে তারা

(আকাশে উঠে যায় আর গোপন কথা) শুনে থাকে? থাকলে তাদের (সেই) শ্রোতা স্পষ্ট প্রমাণ হাজির করুক। [সূরা আত-তূর, ৩৪-৩৮]

---

১) The "Wow! signal" of the terrestrial genetic code. Vladimir I. shCherbak, Maxim A. Makukovb

http://www.sciencedirect.com/.../article/pii/S0019103513000791

অ্যাবস্ট্রাক্টের কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হলঃ আমরা এখানে দেখাচ্ছি এই পার্থিব কোড [অর্থাৎ ডিএনএর জেনেটিক কোড] কি সুক্ষ, সুনির্দিষ্ট সুবিন্যস্ততা প্রকাশ করছে। আমরা যাকে কোন বুদ্ধিমত্তা থেকে উৎসারিত Informational Signal বলি এই কোড তার সকল বৈশিষ্ট্য পূরন করে। এই কোডের সাধারণ বিন্যাস থেকে একই সাংকেতিক ভাষার গাণিতিক ও চিত্রলিপি আকারের রূপ প্রকাশ পায়। সুক্ষ, নির্দিষ্ট ও নিয়মানুগ এই প্যাটার্নগুলো থেকে মনে হয় এগুলো সুনির্দিষ্ট লজিক এবং নন-ট্রিভিয়াল কম্পিউটিং এর ফলাফল কোন sochastic (অর্থাৎ random) প্রক্রিয়ার ফলাফল না। ডিএনএ –এর জটিলতা নিছক দৈবক্রমে ও বিবর্তন প্রকিয়ার মাধ্যমে সৃষ্ট এই নাল হাইপোথিসিসটি প্রত্যাখ্যাত কারন এতে P এর মান আসে ১/১০^(১৩) এর চেয়েও ছোট। [(the null hypothesis that they are due to chance coupled with presumable evolutionary pathways is rejected with P-value < 10 (exp) –13]

.

ডিএনএ এবং জেনেটিক কোডে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান ও সহজেই প্রতিভাত হয় যা অপ্রাকৃত। যেমন the symbol of zero, the privileged decimal syntax and semantical symmetries. এছাড়া এই সংকেত থেকে তথ্য সংগ্রহের জন্য সহজ যুক্তি নির্ভর কিন্তু abstract operations এর প্রয়োজন। যে কারনে কোন ভাবেই এই প্যাটার্নগুলো ধাপে ধাপে প্রাকৃতিক উৎস থেকে উৎসারিত এমন বলা যায় না।

.

২) Icarus Issue available online March 6, 2013. Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Icarus_(journal)

৩০

ইসলাম কি দত্তক নেয়াকে নিষিদ্ধ করে?

-শিহাব আহমেদ তুহিন

দত্তক (adoption) নেয়া নিশ্চয়ই একটি মানবীয় গুণ। সন্তান না হওয়া সত্ত্বেও আজীবন কাউকে সন্তানের মত পালন করতে হলে অবশ্যই অনেক বিশান হৃদয়ের অধিকারী হতে হয়। তবে দত্তক প্রধানত দুই প্রকারের হতে পারেঃ

.

i) কাউকে নিজের সন্তান হিসেবে দত্তক নেয়া। সেক্ষেত্রে, শিশুটি পিতা-মাতার পরিচয় হিসেবে যে ঘরে প্রতিপালিত হচ্ছে, সে ঘরের পরিচয় গ্রহণ করে।

.

ii) আরেক প্রকারের দত্তক হচ্ছে, কাউকে প্রতিপালন করা কিন্তু শিশুটি যে ঘরে প্রতিপালিত হচ্ছে তাদের পরিচয় গ্রহণ করে না।

.

অনেকে ধারণা করে থাকেন ইসলামে দত্তক নেয়া হারাম। প্রকৃতপক্ষে, ইসলামে কেবল প্রথম প্রকারের দত্তককেই হারাম করেছে, দ্বিতীয় প্রকারের দত্তক ইসলামে সম্পূর্ণ বৈধ[১]। আল্লাহ প্রথম প্রকারের দত্তক সম্পর্কে বলেন-

.

"“আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা যিহার কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন।” [২]

.

আল্লাহ খুব সুন্দরভাবে আমাদের উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন; যেভাবে মানুষের মধ্যে দুইটা মন থাকতে পারে না, ঠিক একইভাবে একটি ছেলের দুইটি পিতা হওয়া অসম্ভব। এটা আমাদের মুখের কথা মাত্র এবং আমাদের মনের সাথে তার কোন সংযোগ নেই। তেমনিভাবে,যদি নিজেদের স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করি(যিহার), তবে তারা আমাদের মা হয়ে যায় না, স্ত্রীই থাকে।[৩]

.

তাই আল্লাহতায়ালা কারো পিতৃ-পরিচয় জানা থাকলে তাকে তার পিতৃপরিচয়েই ডাকার নির্দেশ দিয়েছেনঃ

.

“তোমরা তাদেরকে তাদের পিতৃপরিচয়ে ডাক। এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায়সঙ্গত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান, তবে তারা তোমাদের ধর্মীয় ভাই ও বন্ধুরূপে গণ্য হবে। এ ব্যাপারে তোমাদের কোন বিচ্যুতি হলে তাতে তোমাদের কোন গোনাহ নেই, তবে ইচ্ছাকৃত হলে ভিন্ন কথা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। ” [৪]

.

অনেকেই প্রশ্ন তুলতে পারেন, পিতার পরিচয় বহন করলে এমন কি সমস্যা? প্রকৃত ব্যাপার হচ্ছে, ইসলাম স্পেডকে স্পেড বলে। তাই সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হয়েছে, পিতার পরিচয় বহন করলেই কেউ পিতা হয়ে যায় না। এ কারণে একই ঘরে প্রতিপালিত হলেও যে ছেলে কিংবা মেয়েকে দত্তক নেয়া হয়েছে তার অভিভাবকের যদি কোন সন্তান থাকে তবে সে তাদের ভাই-বোন হিসেবে গণ্য হবে না। এক্ষেত্রে, বিপরীত লিঙ্গের হলে তারা গায়রে মাহরাম(যাদের সাথে বিয়ে বৈধ) বলে সাব্যস্ত হবে।

.

তবে, এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে, যদি কোন মহিলা কোন শিশুকে প্রথম দুই বছরের মধ্যে পাঁচ বা তার বেশীবার বুকের দুধ পান করান, তবে সে তার সন্তানের ভাই-বোন বলে গণ্য হবে[৫]। আল্লাহ বলেন -

.

"তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকণ্যা; ভগিনীকণ্যা তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন।"[৬]

.

পাশ্চত্যের ফোস্টার প্যারেন্টিং সিস্টেম দেখে অনেকে ইসলামের এই বিধানটাকে বাড়াবাড়ি বলতে চান।যদিও তারা মুদ্রার অপর পিঠটা কখনোই বলেন না। পরিসংখ্যান অনুসারে, খোদ যুক্তরাজ্যেই প্রতি বছর ২০০০-২৫০০ অভিযোগ পাওয়া যায় ফোস্টার অভিভাবকদের বিরুদ্ধে যারা কিনা তাদের দত্তককৃত শিশুদের শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত করেছেন। লাঞ্ছিত শিশুদের মধ্যে ৬০ ভাগ মেয়ে আর তাদের গড় বয়স মাত্র নয়! [৭]

.

যারা ঢালাওভাবে "ইসলামে দত্তক প্রথা নেই" এই কথা বলতে চান, তারা অবশ্যই ইসলামকে ভুলভাবে উপস্থাপন করেন। কারণ, আমি দ্বিতীয় প্রকারের যে দত্তকের কথা বলেছি, তাতে ইসলামী শরীয়াতে কোন বাঁধা নেই। বরং আশা করা যায়, যারা কোন অসহায় শিশুর আশ্রয়দাতা হবেন, আল্লাহতায়ালা তাদের পরকালে উত্তম প্রতিদান দিবেন।
আর আল্লাহতায়ালাই তো সর্বোত্তম পুরষ্কারদাতা।

---

[১] IslamQA-Adoption is of two types – forbidden and prescribed : https://islamqa.info/en/10010
[২] আল কুরআন; সূরা আল আহযাব, আয়াতঃ৪
[৩] তাফসীর ইবনে কাসির, ১৫ নং খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৩৬
[৪] আল কুরআন; সূরা আল আহযাব, আয়াতঃ ৫
[৫] IslamQA-He found a baby and adopted him – what is the ruling?- https://islamqa.info/en/33020
[৬] আল কুরআন;সূরা আন-নিসা- আয়াতঃ২৩
[৭] Major study reveals true scale of abuse of children living in care-http://www.independent.co.uk/.../major-study-reveals-true-sca...

৩১

প্রিয় লেজ!

-মুহাম্মাদ তোয়াহা আকবর

আমাকে যদি কেউ জিজ্ঞেস করে বসে, 'ভাই, কোন লেজটি আপনার সবচে' প্রিয়?'। আমি নাক-মুখ খিঁচে নির্দ্বিধায় বলে দেবো, 'ব্যাকটেরিয়ার লেজ'। কেন? কারণ, ধরার বুকে এত সহজ-সরল সুন্দরতম লেজ আর দ্বিতীয়টি নেই। আর সহজ-সরলের পাশাপাশি সৌন্দর্যের প্রতি ভালোবাসা মানুষের চিরন্তন। হুঁহুঁ বাবা! থাকতেই হবে।

আমি যদিও আদর করে ব্যাকটেরিয়ার লেজ বলছি, বিজ্ঞানীরা কিন্তু এটাকে লেজ বলেননা। সবকিছুতে কঠিন কঠিন নাম না দিলে ব্যাপারটা বোধহয় ঠিক বিজ্ঞান বিজ্ঞান লাগেনা। তাই বিজ্ঞানীরা একে "ফ্ল্যাজেলা" (একবচনে ফ্ল্যাজেলাম) বলে আমাদের মতো অঘামঘাদের দাঁত ভাঙ্গার পথ খোঁজেন। ফ্ল্যাজেলা আর লেজ যেহেতু একই ব্যাপার, তাই আমরা একে ব্যাকটেরিয়ার লেজ বলেই ডাকবো। দেখি কে কি করতে পারে!

আমরা কমবেশি সবাই জানি ব্যাকটেরিয়া এক ধরণের জীবাণু। এরা দেখতে কেমন? ব্যাকটেরিয়া দেখতে গোলগাপ্পু কিউট হতে পারে, লোহার রডের মতো সোজা হতে পারে আবার সাপের মতো সর্পিলাকারও হতে পারে। [১]
[দেখুন ছবি ১]

.

এদের মাঝে কিছু ব্যাকটেরিয়ার লেজ (আসলে ফ্ল্যাজেলা) থাকে। কারো একপাশে একটা লেজ থাকে, কারো বা একগুচ্ছ। কারো কারো দুইপাশেই লেজগুচ্ছ থাকে আবার কেউ কেউ এমন আছে যে সারা শরীর জুড়েই তীব্র লেজের ঘনঘটা। আণুবীক্ষণিক এই ব্যাকটেরিয়ার সুক্ষ্ম লেজগুলো দেখতে অনেকটা চুলের মতো। আর এটাতো সবাই জানিই যে আমরা মিলিয়ন মিলিয়ন কোষ দিয়ে তৈরী হলেও, ব্যাকটেরিয়া শুধু একটামাত্র কোষ দিয়ে তৈরী। তো সেই কোষের দেয়াল ভেদ করে এই লেজ(গুলো) বের হয়ে আসে আর এরাই ব্যাকটেরিয়াকে নড়াচড়া করতে, সাঁতার কেটে সুবিধাজনক জায়গায় যেতে সাহায্য করে। [২]
[দেখুন ছবি ২]

.

এই লেজ বড়ই মজার, বড়ই ইন্টারেস্টিং। কত মজার ব্যাপার যে এই লেজের মাঝে লুকানো আছে, তার কিছুটা আজ এখানে পকরপকর করার চেষ্টা করবো।

.

খুব ভালোভাবে দেখলে দেখা যায়, ব্যাকটেরিয়ার কোষ ভেদ করে বেরিয়ে আসা এই লেজ আসলে চাবুকের মতো। পরিবেশ থেকে পাওয়া নানান রকম ক্যামিকেল সিগন্যালে সাড়া দিয়ে এই লেজ করে কি, মোটরের মতো সাঁইসাঁই করে ঘুরে ঘুরে ব্যাকটেরিয়াকে ঠিক জায়গামতো নিয়ে যায়।
[দেখুন ছবি ৩]

.

এরকম একটা সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার লেজ চল্লিশটারও বেশি বিভিন্ন রকমের প্রোটিন একত্রিত হয়ে তৈরী হয়। ভাবা যায়? প্রোটিন নিজেই এক অতি জটিল আণুবীক্ষণিক জিনিস। একদম সঠিক সাইজের, সঠিক সজ্জা আর সঠিক গঠনের না হলে, ঠিকভাবে ফোল্ডিং বা ভাঁজ না হলে প্রোটিন নিজেই তার কাজ করতে পারেনা, অচল আর চিৎপটাং হয়ে পড়ে থাকে। শুধু তাই নয়, কখনো কখনো ভুল গঠনের, ভুল ফোল্ডিং বা ভাঁজের প্রোটিন জীবদেহের ভয়ংকর অসুখের কারণ হয়, এমনকি একটা ভুল গঠনের প্রোটিন মানুষ এবং বিভিন্ন প্রাণির জীবননাশের কারণও হয়ে দাঁড়ায়। [৩]

.

যেখানে ঠিকঠাক মতো একটা প্রোটিন তৈরী হওয়াও বেশ জটিল আর সুক্ষ্ম একটা ব্যাপার, সেখানে চল্লিশটারও বেশী ঠিকঠাক প্রোটিন একত্রিত হয়, আবার একত্রিত হয়ে একটা অর্থপূর্ণ মোটরের মত ফাংশানাল লেজ তৈরী করে। ব্যাপারটা কেমন জানি মাথা ঘুরিয়ে দেয়ার মতো!

.

মানুষ যে মোটর ডিজাইন করে সেই মোটরে অনেকগুলো জিনিস একসাথে কাজ করে। বিশাল হ্যাপা বলা যায়। সেই মোটরে রোটর থাকতে হয়, স্ট্যাটর থাকতে হয়, ড্রাইভ শ্যাফট থাকতে হয়, বুশিং, ইউনিভার্সাল জয়েন্ট থাকতে হয়, প্রপেলার থাকতে হয়।

.

মজার ব্যাপার হলো গিয়ে, ব্যাকটেরিয়ার লেজের গঠনেও ভালোভাবে খেয়াল করলে রোটর, স্ট্যাটর, ড্রাইভ শ্যাফট, প্রপেলার, ইউনিভার্সাল জয়েন্ট ইত্যাদি পার্টসগুলো খুঁজে পাওয়া যায়, যেগুলো একত্রিত হয়ে কাজ করে, আর লেজটাকে হুবহু মানুষের বানানো মোটরের মত কাজ করতে, বাঁই বাঁই করে ঘুরতে সাহায্য করে। [৪] আমাদের দেখা ইলেক্ট্রিক্যাল মোটর যেরকম, ব্যাকটেরিয়ার লেজও (ফ্ল্যাজেলা) সেরকম তবে অতি আণুবীক্ষণিক একটা মোটর। যখন ব্যাকটেরিয়ার কোষের ভেতরের পর্দা দিয়ে পজিটিভ চার্জের হাইড্রোজেন আয়ন যায় তখন সেটা লেজের ঘূর্ণণের শক্তি যোগায়, ঠিক যেভাবে বিদ্যুৎ প্রবাহ ইলেকট্রিক মোটরকে ঘোরায়। [৫, ৬] যতই এই সহজ সরল লেজ নিয়ে গবেষণা চলছে, ততই এর যান্ত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলো একে একে বের হয়ে আসছে। [৭, ৮, ৯, ১০]

একটা ইলেট্রিক্যাল মোটর হচ্ছে মানুষের বুদ্ধিমত্তা থেকে তৈরী হওয়া ডিজাইনের একেবারে নিখুঁত উদাহরণ। একটা মোটরের বিভিন্ন পার্টস দেখলেই বোঝা যায় এর প্রত্যেকটা অংশের পেছনের নিখুঁত চিন্তাভাবনা আর অসাধারণ প্ল্যানিং। আসলে আমার কাছে একটা মোটর হচ্ছে একটা আর্ট, শিল্প। থ্রী-ডি আর্ট বা তার চেয়েও বেশি কিছু বলা যায়। যেই থ্রী-ডি আর্টটা একটা অনন্য মাস্টারপীস, একটা অসাধারণ বুদ্ধিমত্তার চিহ্ন হিসেবে নিজেকে প্রকাশ করে।

.

এই মাস্টারপীসের মাঝে থাকা এতগুলো উপাদানের প্রত্যেকটা একেবারে সুনির্দিষ্টভাবে পরস্পরের সাথে মিথস্ক্রিয়া করে আর কার্যকরী হয়, ঘুরতে থাকে। একেবারে প্রত্যেকটা পার্টস তার নিজের জায়গাতে ঠিকভাবে এবং ঠিক সময়ে থাকলেই কেবল একটা যন্ত্র চলতে পারে। একটা অংশও যদি এদিক ওদিক হয় তাহলে পুরো মেশিনটাই অকেজো হয়ে যায়। তাই খুব সাবধানে ঠিক অংশটা ঠিকভাবে তৈরী হতে হয়, সঠিক জায়গায় থাকার জন্যে নিখুঁত আর সুক্ষ্মভাবে প্ল্যানিং করতে হয়, সবকিছু অশেষ যত্ন নিয়ে বুদ্ধি খাঁটিয়ে ডিজাইন করতে হয়। সব যন্ত্রপাতিই পদার্থবিদ্যা আর রসায়নবিদ্যার সূত্রগুলো মেনে চলতে বাধ্য।

.

মজার ব্যাপার হচ্ছে পদার্থবিদ্যা আর রসায়নবিদ্যার সব সূত্র মিলেও কিন্তু একটা যন্ত্র তৈরী করে ফেলতে পারেনা, কক্ষণো না। যতক্ষণ না কেউ একজন এসে সবকিছু নিয়ে গভীরভাবে ভেবে, প্ল্যান করে একটা নিখুঁত ডিজাইন করছে, সবকিছু ঠিকঠাকভাবে তৈরী করছে, এবং ঠিকভাবে একটার পাশে একটা বসিয়ে এটাকে চালু করছে ততক্ষণ পর্যন্ত একটা মেশিন তৈরী হয়না।

.

“একটা গাড়ির ইঞ্জিন কোত্থেকে এলো” এই প্রশ্নটাকে প্রাকৃতিক নিয়মকানুন বা সূত্রাবলী দিয়ে কোনভাবেই ব্যাখ্যা করা যায়না। মোটর খুবই অসাধারণ আর খুবই জটিল একটা যন্ত্র এবং এর প্রতিটা বৈশিষ্ট্যই এমন ইউনিক যে একজন বুদ্ধিমান ডিজাইনার ছাড়া একটা মোটর তৈরী হওয়া সম্ভব না। এটা বুঝতে রকেট সায়েন্টিস্ট হতে হয়না, কমনসেন্স থাকলেই চলে।

.

ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে, মোটর আর যন্ত্রপাতি শুধুমাত্র গাড়ির ইঞ্জিনের হুডের নিচেই ঢাকা থাকেনা। জীবের কোষের ভেতরে ঢুকলেই দেখা যায়, এটা নানান রকম যন্ত্রপাতিতে ঠাসা এক অদ্ভুত কর্মব্যস্ত নগরী। বিংশ শতাব্দীর শেষদিকে বায়োকেমিস্ট্রির অগ্রযাত্রা এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি জীবের ভেতরের অধিকাংশ বায়ো-ক্যামিকেল সিস্টেম

একেবারে মলিকিউলার লেভেলের মেশিন হিসেবেই কাজ করে। হ্যাঁ, একেবারে মেশিনের মতোই! আরো মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই মেশিনগুলোর মাঝে থাকা বেশ কিছু বায়ো-মলিকিউলার মোটর অদ্ভুতভাবেই মানুষের তৈরী করা ইঞ্জিনের ডিজাইনের সাথে মিলে যায়। যদিও, এই বায়ো-মেশিনগুলো মানুষের তৈরী যন্ত্রপাতির চেয়ে আরো অনেক অনেক বেশি সুক্ষ্ম আর ডিজাইনের দিক থেকেও অসাধারণ। [১১]

.

আজ পর্যন্ত জীব-কোষের ভেতরে আমাদের আবিস্কার করা বায়ো-মেশিনগুলোর অতিসুক্ষ্ম আর অত্যন্ত জটিল গঠন, দুর্দান্ত কার্যক্ষমতা, আর অসাধারণ ডিজাইনের নৈপূন্যতা বারবার ধাক্কা দিয়ে মনে করিয়ে দেয় একজন সুপিরিয়র বিজ্ঞানীর কথা, একজন অসাধারণ আর্কিটেক্টের কথা, একজন ইঞ্জিনিয়ারদের গ্রান্ডমাস্টারের কথা এবং একজন সুপারস্মার্ট বায়োলজিস্টের কথা।

.

কি অদ্ভূত! কি অসাধারণ! অলৌকিকতার দরকার নেই, কোন মিরাকল ঘটে যাওয়ারও দরকার নেই। শুধুমাত্র একটা সাধারণ ব্যাকটেরিয়ার একটা সাধারণ লেজের অসাধারণ দোলার জ্ঞানই সচেতন মানুষের উদ্ধত, অহংকারী মাথাকে একজন অসাধারণ সত্ত্বার সামনে শ্রদ্ধায় আর বিনয়ে নত করে মাটিতে লুটিয়ে দেয়ার জন্যে যথেষ্ট।

তথ্যসূত্রঃ

১] Michael J. Pelczar, Microbiology, 5th edition, 74

২] Michael J. Pelczar, Microbiology, 5th edition, 78

৩] Nelson and Cox, Lehninger Principles of Biochemistry, 4th edition, 150

৪] David F. Blair, "How bacteria sense and swim," Annual review of Microbiology 49 (October 1995): 489-520

৫] David F. Blair, "Flagellar movement driven by proton translocation," FEBS Letters 545 (June 12, 2003): 86-95;

৬] Christopher V. Gabel and Howard C. Berg, "The speed of the flagellar rotary motor of E. coli varies linearly with protonomotive force," Proceedings of the National Academy of Sciences, USA 100 (July 22, 2003): 8748-51

৭] Scott A. Lloyd et al., "Structure of the C-terminal Domain of FliG, a component of the rotor in the bacterial flagellar motor," Nature 400 (July 29, 1999): 472-75;

৮] William S. Ryu et al, "Torque-generating units of the flagellar motor of E. coli have a high duty ratio," Nature 403 (January 27, 2000): 444-47;

৯] Fadel A. Sametry et al., "Structure of the bacterial flagellar hook and implication for the molecular universal joint mechanism," Nature 431 (October 28, 2004): 1062-68;

১০] Yoshiyuki Sowa et al., "Direct observation of steps in rotation of the bacterial flagellar motor." Nature 437 (October 6, 2005): 916-79

১১] Dr. Fazale Rana, The Cell's Design, 69-70

৩২

'কোরআন, আকাশ, ছাদ এবং অভিজিৎ রায়ের মিথ্যাচার'

-আরিফ আজাদ

মফিজুর রহমান স্যার সাজিদের দিকে এক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন। তাকানোর ভঙ্গি এরকম,- 'বাছা! আজকে তোমাকে পেয়েছি!! আজ তোমার বারোটা যদি না বাজিয়েছি, আমার নামও মফিজ না।'

সাজিদ মাথা নিঁচু করে ক্লাশের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। বিশ মিনিট দেরি করে ফেলেছে ক্লাশে আসতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশ মিনিট দেরি করে ক্লাশে আসা এমন কোন গুরুতর পাপ কাজ নয় যে এরজন্য তার দিকে এভাবে তাকাতে হবে।

সাজিদ সবিনয়ে বললো,- 'স্যার, আসবো?'

মফিজুর রহমান স্যার অত্যন্ত গুরুগম্ভীর গলায় বললেন,- 'হু'।

এমনভাবে বললেন, যেন সাজিদকে দু চার কথা শুনিয়ে দরজা থেকে খেদিয়ে পাঠিয়ে দিতে পারলেই উনার গা জুড়োয়।

সাজিদ ক্লাশ রুমে এসে বসলো। লেকচারের বেশ অর্ধেকটা শেষ হয়ে গেছে। মফিজুর রহমান স্যার আর পাঁচ মিনিট লেকচার দিয়ে ক্লাশ সমাপ্ত করলেন।

সাজিদের কপালে যে আজ খুবই খারাপি আছে সেটা সে প্রথম থেকেই বুঝতে পেরেছে।

মফিজুর রহমান স্যার সাজিদকে দাঁড় করালেন।

খুব স্বাভাবিক চেহারায়, হাসি হাসি মুখ করে বললেন,- 'সাজিদ, কেমন আছো?'

সাজিদ প্রায় ভূত দেখার মতো চমকে উঠলো। এই মূহুর্তে সে যদি সত্যি সত্যিই ডুমুরের ফুল অথবা ঘোড়ার ডিম জাতীয় কিছু দেখতো, হয়তো এতটা চমকাতো না। মিরাকল জিনিসটায় তার বিশ্বাস আছে, তবে মফিজুর রহমান স্যারের এই আচরণ তার কাছে তারচেয়েও বেশি কিছু মনে হচ্ছে।

এই ভদ্রলোক এত সুন্দর করে,এরকম হাসিমুখ নিয়ে কারো সাথে কথা বলতে পারে, এটাই এতদিন একটা রহস্য ছিলো।

সাজিদ নিজেকে খানিকটা সামলে নিয়ে বললো,- 'জ্বি স্যার, ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ্। আপনি কেমন আছেন?'

তিনি আবারও একটি মুচকি হাসি দিলেন। সাজিদ পুনঃরায় অবাক হলো। মনে হচ্ছে সে কোন দিবাস্বপ্নে বিভোর আছে। স্বপ্নের একটা ক্রাইটেরিয়া হচ্ছে, স্বপ্নে বেশিরভাগ সময় নেগেটিভ জিনিসকে পজিটিভ আর পজিটিভ জিনিসকে নেগেটিভ ভাবে দেখা যায়।মফিজুর রহমান স্যারকে নিয়ে তার মাত্রাতিরিক্ত নেগেটিভ চিন্তা থেকেই হয়তো এরকম হচ্ছে। একটুপরে সে হয়তো দেখবে, এই ভদ্রলোক তার দিকে রাগি রাগি চেহারায় তাকিয়ে আছে এবং বলছে,- 'এ্যাই ছেলে? এত দেরি করে ক্লাশে কেনো এসেছো? তুমি জানো আমি তোমার নামে ডীন স্যারের কাছে কমপ্লেইন করে দিতে পারি? আর কোনদিন যদি দেরি করেছো..............'

সাজিদের চিন্তায় ছেদ পড়লো। তার সামনে দাঁড়ানো হালকা-পাতলা গড়নের মফিজুর রহমান নামের ভদ্রলোকটি বললেন,- 'আমিও খুব ভালো আছি।'

ভদ্রলোকের মুখে হাসির রেখাটা তখনও স্পষ্ট।

মফিজুর রহমান স্যার সাজিদকে বললেন,- 'আচ্ছা বাবা আইনষ্টাইন, তুমি কি বিশ্বাস করো আকাশ বলে কিছু আছে?'

সাজিদ এবার নিশ্চিত হলো যে এটা কোন স্বপ্নদৃশ্য নয়। মফিজুর রহমান স্যার তাচ্ছিল্যভরে সাজিদকে 'আইনষ্টাইন' বলে ডাকে। সাজিদকে যখন আইনষ্টাইন বলে, তখন ক্লাশের অনেকে খলখল করে হেসে উঠে। এই মূহুর্তে সাজিদ একটি চাপা হাসির শব্দ শুনতে পাচ্ছে। তাহলে এটা কোন স্বপ্নদৃশ্য নয়।বাস্তব।

সাজিদ বললো,- 'জ্বি স্যার, বিশ্বাস করি।'

ভদ্রলোক আরেকটি মুচকি হাসি দিলেন। উনি আজকে হাসতে হাসতে দিন পার করে দেবার পণ করেছেন কিনা কে জানে।

তিনি বললেন,- 'বাবা আইনষ্টাইন, আদতে আকাশ বলে কিছুই নেই।আমরা যেটাকে আকাশ বলি, সেটা হচ্ছে আমাদের দৃষ্টির প্রান্তসীমা। মাথার উপরে নীল রঙা যে জিনিসটি দেখতে পাও, সেটাকে মূলত বায়ুমন্ডলের কারণেই নীল দেখায়। চাঁদে বায়ুমন্ডল নেই বলে চাঁদে আকাশকে কালো দেখায়। বুঝতে পেরেছেন মহামতি আইনষ্টাইন?'

স্যারের কথা শুনে ক্লাশের কিছু অংশ আবার হাসাহাসি শুরু করলো।

স্যার আবার বললেন,- 'তাহলে বুঝলে তো আকাশ বলে যে কিছুই নাই?'

সাজিদ কিছুই বললো না। চুপ করে আছে।

স্যার বললেন,- 'গতরাতে হয়েছে কি জানো? নেট সার্চ দিয়ে একটি ব্লগ সাইটের ঠিকানা পেলাম। মুক্তমনা ব্লগ নামে। অভিজিৎ নামে এক ব্লগারের লেখা পেলাম সেখানে। খুব ভালো লিখে দেখলাম। যাহোক, অভিজিৎ নামের এই লোকটা কোরানের কিছু বাণী উদ্ধৃত করে দেখালো কতো উদ্ভট এইসব জিনিস। সেখানে আকাশ নিয়ে কি বলা আছে শুনতে চাও?'

সাজিদ এবারো কিছু বললো না। চুপ করে আছে।

স্যার বললেন,- 'কোরানে বলা আছে- '

'আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। অথচ, তারা আমাদের নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।'

'And We made the sky a protected ceiling, but they, from its signs, are turning away - Al Ambia- 32'

দেখলে তো বাবা আইনষ্টাইন, তোমাদের আল্লাহ বলেছে, আকাশ নাকি সুরক্ষিত ছাদ। তা বাবা, এই ছাদে যাবার কোন সিঁড়ির সন্ধান কোরানে আছে কি? হা হা হা হা।'

চুপ করে থাকতে পারলে বেশ হতো। কিন্তু এই লোকটির মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়িতে সাজিদ মুখ খুলতে বাধ্য হলো।

সে বললো,- 'স্যার, আপনার সেই ব্লগার অভিজিৎ আর আপনার প্রথম ভুল হচ্ছে, আকাশ নিয়ে আপনাদের দু'জনের ধারনা মোটেও ক্লিয়ার না।'

- 'ও, তাই নাকি? তা আকাশ নিয়ে ক্লিয়ার ধারনাটি কি বলো শুনি?'- অবজ্ঞা ভরে লোকটির প্রশ্ন।

সাজিদ বললো,- 'স্যার, আকাশ নিয়ে ইংরেজি অক্সফোর্ড ডিকশনারিতে বলা আছে,- 'The region of the atmosphere and outer space seen from the earth', অর্থাৎ, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে বায়ুমন্ডলের এবং তার বাইরে যা কিছু দেখা যায়, সেটাই আকাশ।

আকাশ নিয়ে আরো ক্লিয়ারলি বলা আছে উইকিপিডিয়াতে। আপনি নেট ঘেঁটে মুক্তমনা ব্লগ অবধি যেতে পেরেছেন, আরেকটু এগিয়ে উইকিপিডিয়া অবধি গেলেই পারতেন। যাহোক, আকাশ নিয়ে উইকিপিডিয়া তে বলা আছে,- 'The sky (or celestial dome) is everything that lies above the surface of the Earth, including the atmosphere and outer space', অর্থাৎ, পৃথিবীর ভূ-পৃষ্টের উপরে যা কিছু আছে, তার সবই আকাশের অন্তর্গত। এর মধ্যে বায়ুমন্ডল এবং তার বাইরের সবকিছুও আকাশের মধ্যে পড়ে'।

- 'হু, তো?'

- ' এটা হচ্ছে আকাশের সাধারন ধারনা। এখন আপনার সেই আয়াতে ফিরে আসি।

আপনি কোরান থেকে উল্লেখ করেছেন,-

'আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। অথচ, তারা আমাদের নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে।'

আপনি বলেছেন, আকাশ কিভাবে ছাদ হয়, তাই না?

স্যার, বিংশ শতাব্দীতে বসে বিজ্ঞান জানা কিছু লোক যদি এরকম প্রশ্ন করে, তাহলে আমাদের উচিত বিজ্ঞান চর্চা বাদ দিয়ে গুহার জীবনযাপনে ফিরে যাওয়া।'

- 'What do u mean?'

- 'বলছি স্যার। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে বিজ্ঞানিরা পৃথিবীর উপরিভাগে যে বায়ুমন্ডল আছে, তাতে কিছু স্তরের সন্ধান

পেয়েছেন।আমাদের পৃথিবীর বায়ুমন্ডল এসব পুরু স্তর দ্বারা গঠিত।এই স্তরগুলো হচ্ছে-

১/ ট্রপোস্ফিয়ার

২/ স্ট্রাটোস্ফিয়ার

৩/ মেসোস্ফিয়ার

৪/ থার্মোস্ফিয়ার

৫/ এক্সোস্ফিয়ার।

এই প্রত্যেকটি স্তরের আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে। আপনি কি জানেন, বিজ্ঞানি Sir Venn Allen প্রমান করে দেখিয়েছেন, আমাদের পৃথিবীর ভূ-পৃষ্টের চারদিকে একটি শক্তিশালী Magnetic Field আছে। এই ম্যাগনেটিক ফিল্ড আমাদের পৃথিবীপৃষ্ঠের চারদিকে একটি বেল্টের মতো বলয় সৃষ্টি করে রেখেছে। বিজ্ঞানি স্যার Venn Allen এর নামে এই জিনিসটার নাম রাখা হয় Venn Allen Belt...

এই বেল্ট চারপাশে ঘিরে রেখেছে আমাদের বায়ুমন্ডলকে। আমাদের বায়ুমন্ডলের দ্বিতীয় স্তরটির নাম হচ্ছে 'স্ট্রাটোস্ফিয়ার।' এই স্তরের মধ্যে আছে এক জাদুকরি উপ-স্তর। এই উপ-স্তরের নাম হলো 'ওজোন স্তর।'

এই ওজোন স্তরের কাজের কথায় পরে আসছি। আগে একটু সূর্যের কথা বলি। সূর্যে প্রতি সেকেন্ডে যে বিস্ফোরণগুলো হয়, তা আমাদের চিন্তা-কল্পনারও বাইরে। এই বিস্ফোরণগুলোর ক্ষুদ্র একটি বিস্ফোরণের তেজস্ক্রিয়তা এমন যে, তা জাপানের হিরোশিমায় যে এ্যাটমিক বোমা ফেলা হয়েছিলো, সেরকম দশ হাজার বিলিয়ন এ্যাটমিক বোমার সমান। চিন্তা করুন স্যার, সেই বিস্ফোরণগুলোর একটু আঁচ যদি পৃথিবীতে লাগে, পৃথিবীর কি অবস্থা হতে পারে?

এখানেই শেষ নয়। মহাকাশে প্রতি সেকেন্ডে নিক্ষিপ্ত হয় মারাত্মক তেজস্ক্রিয় উল্কাপিন্ড। এগুলোর একটি আঘাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে যাবে পৃথিবী।

আপনি জানেন আমাদের এই পৃথিবীকে এরকম বিপদের হাত থেকে কোন জিনিসটা রক্ষা করে? সেটা হচ্ছে আমাদের পৃথিবীর বায়ুমন্ডল।আরো স্পেশেফিকলি বলতে গেলে বলতে হয়, 'ওজোন স্তর।'

শুধু তাই নয়, সূর্য থেকে যে ক্ষতিকর অতিবেগুনি রশ্মি আর গামা রশ্মি পৃথিবীর দিকে ধেয়ে আসে, সেগুলো যদি পৃথিবীতে প্রবেশ করতে পারতো, তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রাণীই বেঁচে থাকতে পারতো না। এই অতি বেগুনি রশ্মির ফলে মানুষের শরীরে দেখা দিতো চর্ম ক্যান্সার। উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষন হতো না।আপনি জানেন, সূর্য থেকে পৃথিবীর দিকে ধেঁয়ে আসা এসব ক্ষতিকর জিনিসকে কোন জিনিসটা আটকে দেয়? পৃথিবীতে ঢুকতে দেয় না? সেটা হলো বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর। এই ওজোন স্তর এসব ক্ষতিকর উপাদানকে স্ক্যানিং করে পৃথিবীতে প্রবেশে বাঁধা দেয়।

মজার ব্যাপার কি জানেন? এই ওজোন স্তর সূর্য থেকে আসা কেবল সেসব উপাদানকেই পৃথিবীতে প্রবেশ করতে দেয়, যেগুলো পৃথিবীতে প্রাণের জন্য সহায়ক। যেমন, বেতার তরঙ্গ আর সূর্যের উপকারি রশ্মি। এখানেই শেষ নয়। পৃথিবীর অভ্যন্তরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় যে তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়, তার সবটাই যদি মহাকাশে বিলিন হয়ে যেতো, তাহলে রাতের বেলা পুরো পৃথিবী ঠান্ডা বরফে পরিণত হয়ে যেতো। মানুষ আর উদ্ভিদ বাঁচতেই পারতো না। কিন্তু, ওজোন স্তর সব কার্বন ডাই অক্সাইডকে মহাকাশে ফিরে যেতে দেয় না। কিছু কার্বন ডাই অক্সাইডকে সে ধরে রাখে যাতে পৃথিবী তাপ হারিয়ে একেবারে ঠান্ডা বরফ শীলত না হয়ে পড়ে।বিজ্ঞানিরা এটাকে 'গ্রীন হাউস' বলে।

স্যার, বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তরের এই যে ফর্মুলা, কাজ, এটা কি আমাদের পৃথিবীকে সূর্যের বিস্ফোরিত গ্যাস, সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি, মহাকাশীয় উল্কাপিণ্ড থেকে 'ছাদ' এর মতো রক্ষা করছে না? আপনার বাসায় বৃষ্টির পানি প্রবেশ করতে পারে না আপনার বাসার ছাদের জন্য। বিভিন্ন দূর্যোগে আপনার বাসার ছাদ যেমন আপনাকে রক্ষা করছে, ঠিক সেভাবে বায়ুমন্ডলের এই ওজোন স্তর কি আমাদের পৃথিবীকে রক্ষা করছে না?

আমরা আকাশের সংজ্ঞা থেকে জানলাম যে, - পৃথিবীপৃষ্ঠ হতে উপরের সবকিছুই আকাশের মধ্যে পড়ে। বায়ুমন্ডলও তো তাহলে

আকাশের মধ্যে পড়ে, এবং আকাশের সংজ্ঞায় বায়ুমন্ডলের কথা আলাদা করেই বলা আছে।
তাহলে বায়ুমন্ডলের এই যে আশ্চর্যরকম 'প্রটেক্টিং পাওয়ার', এটার উল্লেখ করে যদি আল্লাহ বলেন-

'আর আমরা আকাশকে করেছি সুরক্ষিত ছাদ। অথচ, তারা আমাদের নিদর্শনাবলী থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখে',
তাহলে স্যার ভুলটা কোথায় বলেছে? বিজ্ঞান তো নিজেই বলছে, বায়ুমন্ডল, স্পেশালি বায়ুমন্ডলের ওজোন স্তর একটি ছাদের ন্যায় পৃথিবীকে রক্ষা করছে। তাহলে আল্লাহও যদি একই কথা বলে, তাহলে সেটা অবৈজ্ঞানিক হবে কেনো?
আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি, হয় আপনার সেই অভিজিৎ রায় বিজ্ঞান বুঝেন না, নয়তো তিনি বিশেষ কোন গোষ্ঠীর পেইড এ্যাজেন্ট, যাদের কাজ সুস্পষ্ট প্রমান থাকা সত্বেও মনগড়া কথা লিখে কোরানের ভুল ধরা।'

কথাগুলো বলে সাজিদ থামলো। পুরো ক্লাশে সে এতক্ষন একটা লেকচার দিয়ে গেলো বলে মনে হচ্ছে। তাকে আইনষ্টান বলায় যারা খলখল করে হাসতো, তাদের চেহারাগুলো ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।
মফিজুর রহমান স্যার কিছুই বললেন না। See u next বলে ক্লাশ থেকে বেরিয়ে গেলেন সেদিন।

৩৩

আল্লাহ দয়ালু হলে জাহান্নাম বানালেন কেন?

উৎস: অ্যাবাউট ইসলাম ডট নেট;

অনুবাদ: আরমান নিলয়, মুসলিম মিডিয়া প্রতিনিধি

আল্লাহ দয়ালু হলে জাহান্নাম বানালেন কেন?

.

ইবরাহীমের ('আলাইহিসসালাম) অনুসারী দাবীদারদের অধিকাংশই (অর্থাৎ মুসলিম, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানগণ) পরকাল এবং জান্নাত ও জাহান্নামের অস্তিত্বে বিশ্বাসী। পুনর্জন্মে বিশ্বাসীরা বিশ্বাস রাখে যে মৃত মানুষ তার কর্মের ভিত্তিতে ভালো বা খারাপ জীবন নিয়ে পুনর্জন্ম লাভ করে। এর বিপরীতে ইবরাহীমের অনুসারীগণ মানেন যে জীবন মাত্র দুটিই। একটি মায়ের গর্ভ থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, আরেকটি মৃত্যুর পর আখিরাতে পুনরুত্থান।

.

পুরষ্কার বনাম শাস্তি

.

তো সকল ধর্মের অনুসারীরাই পুরষ্কার ও শাস্তির ধারণায় বিশ্বাসী। কিন্তু সবার ধারণার প্রকৃতি ঠিক একই রকমের নয়। ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান ধর্মের মতো ইসলামেও আল্লাহকে ন্যায়বিচারক বলে বিশ্বাস করা হয়। তিনি দ্রুত পুরষ্কার দেন এবং শাস্তি দিতে দেরী করেন। কিন্তু তিনি যদি প্রেমময় সত্ত্বাই হয়ে থাকেন, তাহলে তিনি শাস্তি দেন কেন?

.

এ আলোচনা গড়ায় আমরা আসলেই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাস করি কিনা সেই প্রশ্নে গিয়ে। আমরা যদি সত্যিই তাঁর অস্তিত্ব এবং পরিপূর্ণ ন্যায়বিচারে বিশ্বাস করি, তাহলে মানতেই হবে যে তিনি আমাদেরকে সরল পথ প্রদর্শন করবেন। এটি সম্ভব শুধুমাত্র তাঁর নবীদের কাছে পাঠানো ওয়াহীর মাধ্যমে যা তাঁরা স্বজাতির কাছে পৌঁছে দেন। প্রতিটি সংরক্ষিত ঐশী গ্রন্থই একজন দয়ালু স্রষ্টার নিদর্শন বহন করে। বিভিন্নভাবে আল্লাহ আমাদের সঠিক পথের ব্যাপারে জানিয়েছেন যাতে মানুষ ভুল না করে। কাজেই মুমিনের জন্য আল্লাহর ভয় হলো তার ঈমানকে মজবুত করার অংশ। আল্লাহকে বিশ্বাস করতে হলে তাঁর প্রতি ভালোবাসা, ভয় এবং আশা থাকতেই হবে।

.

ভালোবাসা এবং আশার আলোচনা অত্যন্ত ব্যাপক। এখানে যেহেতু আল্লাহর শাস্তি ও ন্যায়বিচার নিয়ে কথা হচ্ছে, তাই আমরা ভয়ের অংশটি নিয়েই আলোচনা করবো। কারণ এটিই হলো জাহান্নাম থেকে মুমিনের মুক্তির হাতিয়ার।

.

মুমিনের ভয় ও আশা

.

পুরষ্কার, শাস্তি এবং এদের যে কোনো একটি অর্জনের উপায় সম্পর্কে একজন মুমিন জানে। জানে বলেই সে আল্লাহর শাস্তি থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে তাঁর সন্তুষ্টির নিকটবর্তী হতে চায়। এভাবেই তার আত্মিক পরিশুদ্ধি সম্পূর্ণ হয়। সে আল্লাহর দেওয়া সীমাসমূহকে সম্মান করে, সচেষ্ট থাকে এবং সর্বশ্রেষ্ঠ উপায়ে আল্লাহর রহমতের খোঁজ করে। কারণ এটিই তাকে বিচার দিবসের ভয়াবহ অবস্থা এবং জাহান্নামের চিরস্থায়ী আযাব থেকে রক্ষা করবে।

.

"যারা স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করে, রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে। তাদের জন্য তাদের প্রতিদান রয়েছে তাদের

প্রতিপালকের কাছে। তাদের কোনো আশংকা নেই এবং তারা চিন্তিতও হবে না।" [সূরা বাকারাহ (২):২৭৪]

.

কোরআনের বর্ণনা অনুযায়ী, যে মুমিনের অন্তরে তাকওয়া আছে এবং আল্লাহর যাত ও সিফাত নিয়ে যে চিন্তাভাবনা করে, তার অন্তরে অবশ্যই আল্লাহর বড়ত্বের অনুভূতি জাগ্রত হবে। তাঁর অসীম ক্ষমতা মুমিনের হৃদয়ে ভয়ের সৃষ্টি করবে। ফলে সে ইখলাসের সহিত নিজেকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি উদ্রেককারী কাজ থেকে বাঁচিয়ে রাখবে। ফলে আল্লাহ তাকে পুরস্কৃত করবেন দুনিয়ায় শান্তি এবং আখিরাতে জান্নাত দান করার মাধ্যমে।

.

"যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দুটি জান্নাত।" [সূরা আর-রহমান (৫৫):৪৬]

.

তারপরও প্রশ্ন আসতে পারে যে কীভাবে কেউ জানবে কীসে আল্লাহ খুশি হন আর কীসে নারাজ হন। উত্তর সোজা। আল্লাহ কোরআনে যা বলেছেন তার ব্যাপারে জ্ঞান অর্জন করার মাধ্যমে।

.

"আল্লাহর বান্দাদের মাঝে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী ও ক্ষমাশীল।" [সূরা ফাতির (৩৫):২৮]

.

এমন এক মুমিন অবশ্যই জানবে যে আল্লাহর ন্যায়বিচারের কোনো তুলনা হয় না। আল্লাহ যা কিছুর ব্যাপারে ভয় দেখিয়েছেন, তার সবকিছুতে সে বিশ্বাস করে।

.

"এবং (মুমিন তো তারাই) যারা প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং তাদের পালনকর্তার শাস্তি সম্পর্কে ভীত-কম্পিত। নিশ্চয় তাদের পালনকর্তার শাস্তি থেকে নিঃশঙ্ক থাকা যায় না।" [সূরা আল-মাআরিজ (৭০):২৬-২৮]

.

এমনটাই রবের ন্যায়বিচার। মুমিন কেবল তাঁর প্রতিই আশা ও ভয় রাখে।

.

"...তারা তাদের পালনকর্তাকে ডাকে ভয় ও আশা সহকারে...।" [সূরা সাজদাহ (৩২):১৬]

.

এ প্রসঙ্গে নবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, "মুমিনের হৃদয় যখন ভয় ও আশায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়, আল্লাহ তখন তার আশা পূরণ করেন এবং সে যার ভয় করে তা থেকে তাকে রক্ষা করেন।" (ইবনে মাজাহ)

.

আল্লাহর ন্যায়বিচার

.

আখিরাত অস্বীকারকারীরা বিচার দিবসে জান্নাত ও জাহান্নাম প্রত্যক্ষ করলে তাদের অবস্থা কেমন হবে?

.

"...তারাই সত্যিকার ক্ষতিগ্রস্ত যারা তাদের নিজেদের ও পরিবারের ব্যাপারে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। জেনে রাখো, এটাই সুস্পষ্ট ক্ষতি। তাদের জন্য উপর ও নিচ হতে আগুনের জ্বালা থাকবে। এ শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন যে, হে আমার বান্দারা! আমাকে ভয় কর।" [সূরা আয-যুমার (৩৯):১৫-১৬]

উৎস: অ্যাবাউট ইসলাম ডট নেট

মূল আর্টিকেলের লিঙ্কঃ http://aboutislam.net/reading-islam/understanding-islam/god-is-merciful-why-hell/

অনুবাদ: আরমান নিলয়, মুসলিম মিডিয়া প্রতিনিধি

মুসলিম মিডিয়ার আর্টিকেলের লিঙ্কঃ http://www.muslimmedia.info/2016/12/29/why-did-allah-create-hell-if-he-is-merciful

পুনঃপ্রকাশ, মুসলিম মিডিয়া অনুমোদিত

৩৪

মায়ের গর্ভে কী আছে - এটা কি একমাত্র আল্লাহই জানেন?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্ন: একমাত্র আল্লাহ জানেন গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে(Quran 31:34), যা অন্য কারো পক্ষে জানা সম্ভব নয় (Sahih Bukhari 2:17:149) ! তিনি কি জানতেন না ভবিষ্যতে আল্ট্রাসনোগ্রাফি আবিষ্কৃত হবে?

উত্তরঃ কুরআন মাজিদে বলা হয়েছে—

إِنَّ ٱللَّهَ عِندَهُۥ عِلْمُ ٱلسَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ ٱلْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِى ٱلْأَرْحَامِ ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا ۖ وَمَا تَدْرِى نَفْسٌۢ بِأَىِّ أَرْضٍ تَمُوتُ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌۢ

অর্থঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাতৃগর্ভে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না আগামীকাল সে কি উপার্জন করবে, এবং কেউ জানে না কোন স্থানে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" [21]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেনঃ "গায়েবের কুঞ্জি হল পাঁচটি, যা আল্লাহ ব্যতিত কেউ জানে না। কেউ জানে না যে আগামীকাল কী ঘটবে। কেউ জানে না যে মায়ের গর্ভে কী আছে। কেউ জানে না যে, আগামীকাল সে কী অর্জন করবে। কেউ জানে না যে, সে কোথায় মারা যাবে। কেউ জানে না যে, কখন বৃষ্টি হবে।" [22]

এখানে আলোচ্য আয়াত বা হাদিসে কোথাও এটা বলা হয়নি যে—"একমাত্র আল্লাহ জানেন গর্ভের সন্তান ছেলে না মেয়ে হবে।" ছেলে বা মেয়ের কথাই আলোচ্য আয়াত বা হাদিসে আসেনি। এখানে কোথাও লিঙ্গের কথা বলা হয়নি। এটি অভিযোগকারীরা নিজে থেকে যোগ করেছে কুরআন ও হাদিসের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলার জন্য। লিঙ্গ[جنس] শব্দটি পুরো কুরআনেও কোথাও আসেনি। আলোচ্য আয়াত ও হাদিসে বলা হয়েছে যে—মাতৃগর্ভে যা থাকে, আল্লাহই তা জানেন এবং তিনি ছাড়া কেউ জানে না। এখানে এখানে "মায়ের গর্ভে কী আছে" বলতে শুধুমাত্র ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তানই বোঝায় না বরং এর সাথে সাথে কী রকম হায়াতপ্রাপ্ত সন্তান, নেক সন্তান নাকি পাপী সন্তান, কীরকম রিযিকপ্রাপ্ত সন্তান, কেমন স্বভাবের সন্তান—এই সব কিছুকেই বোঝায়। [23] এ ছাড়া সন্তানটি সুস্থ সন্তান নাকি বিকলাঙ্গ সন্তান, দেখতে কেমন হবে এগুলোও এ সব বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত। "মায়ের গর্ভে কী আছে" বলতে এর সবগুলোকেই বোঝায় এবং এই সমস্ত তথ্য সম্পর্কেই আল্লাহ তা'আলা অধিক জ্ঞাত। কী রকম হায়াতপ্রাপ্ত সন্তান, নেক সন্তান নাকি পাপী সন্তান, কী রকম রিযিকপ্রাপ্ত সন্তান—আল্লাহ ব্যতিত আর কারো পক্ষে এইসব তথ্য জানা সম্ভব নয়। আল্ট্রাসনোগ্রাফি বা অন্য কোন প্রযুক্তি ব্যবহার করে এগুলো জানা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তা ছাড়া

---

[21] আল কুরআন, লুকমান ৩১:৩৪

[22] সহীহ বুখারী; খণ্ড ২, অধ্যায় ১৭, হাদিস নং : ১৪৯

[23] দেখুনঃ তাফসির ইবন কাসির, সুরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াতের তাফসির;
'কুরআনুল কারিম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির' (ড. আবু বকর মুহাম্মাদ জাকারিয়া), ২য় খণ্ড, সুরা লুকমানের ৩৪ নং আয়াতের তাফসির

আল্ট্রাসনোগ্রাফি দ্বারা একটা নির্দিষ্ট সময় পর সন্তানের লিঙ্গ জানা যায়। গর্ভধারণের ১১ সপ্তাহের আগে কোনক্রমেই জানা সম্ভব না সন্তানটির লিঙ্গ কী হবে। [24]

এগুলো হচ্ছে গায়েবের সংবাদ যা কোন মানুষের পক্ষে জানা অসম্ভব; যেমনভাবে কেউ জানে না পরদিন সে কী উপার্জন করবে বা কোন দেশে সে মারা যাবে। এমনকি ১০০% নিখুঁতভাবে এটাও বলা সম্ভব না যে কখন বৃষ্টি হবে। বাতাসের আর্দ্রতা, মেঘের অবস্থান এসব জিনিস দেখে আবহাওয়াবিদগণ বৃষ্টির পূর্বাভাষ দেন। কিন্তু কখন কোথায় মেঘ জমবে এটা নিশ্চিতভাবে তারা বলতে পারেন না। আবহাওয়াবিদগণ শুধুমাত্র একটা সম্ভাব্যতা বলতে পারেন, কিন্তু তা কখনো শতভাগ নির্ভুল হয় না।

কাজেই আলোচ্য আয়াত ও হাদিসে যথার্থরূপেই বলা হয়েছে যে—একমাত্র আল্লাহই জানেন মায়ের গর্ভে কী আছে।

---

[24] “When will I be able to find out my baby's gender on a scan?” (Baby Center)

https://www.babycenter.com.au/x2200/when-will-i-be-able-to-find-out-my-babys-gender-on-a-scan

৩৫

রিচার্ড ডকিন্সের "দা গড ডিল্যুশান"- এর জবাব

মূলঃ হামযা যর্তযিস

অনুবাদঃ সত্যকথন ডেস্ক

রিচার্ড ড্যাকিন্সের "দা গড ডিল্যুশান" বইটি হাতে তুলে নেয়ার সময় আমি ভেবেছিলাম হয়তো নতুন এমন কিছু যুক্তির সম্মুখীন হব যা দিয়ে নাস্তিকতার দর্শনের পক্ষে ইতিবাচক [১]যৌক্তিক আলোচনা তুলে ধরা হবে।

.

কিন্তু বলতে বাধ্য হচ্ছি, বইটা পড়ার পর আমি হতাশ হয়েছি। যা পড়লাম তা ঘষামাজা করে মান্ধাতার আমলের, অসংলগ্ন পুরনো যুক্তিগুলোর পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই না। বুঝলাম, রিচার্ড ডকিন্স দর্শন-তত্ত্বে অতোটা পারদর্শী নন। এ বিষয়ে পরিচিতও নন।

.

এ জন্য আমার মনে হল ইতিমধ্যে যেসব আলোচনা এ বিষয়ে হয়েছে সেগুলোর সংকলন করে নিম্নোক্ত উপায়ে তার প্রধান যুক্তিগুলোর জবাব দেওয়া যেতে পারে :

.

১/ যে যুক্তিকে ডকিন্স তার প্রধান যুক্তি হিসেবে গণ্য করে সেটার জবাব
২/ দার্শনিকদের মতে যেটি ডকিন্সের সবচেয়ে ভালো যুক্তি, সেটার জবাব

.

ডকিন্সের প্রধান যুক্তির জবাবঃ

.

ডকিন্স যেটাকে তার বইয়ের “প্রধান যুক্তি” হিসেবে অভিহিত করেছে, তার একটি সারাংশ দেওয়া হয়েছে “দা গড ডিল্যুশান” বইয়ের ১৫৭-১৫৮ পৃষ্ঠাতে -

.

“১/ মানুষের বুদ্ধিমত্তার জন্য এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের একটি হলো মহাবিশ্বের জটিল এবং অসম্ভাব্য ডিজাইন বা নকশাকে ব্যাখ্যা করা।

.

২/ সাধারণ প্রবনতা হলো আপাতভাবে যাকে (ইচ্ছাকৃত) ডিজাইন বলে মনে হয়, সেটাকে প্রকৃতপক্ষেই কোন নকশাকারের ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা নকশা বা ডিজাইন হিসেবে ধরে নেওয়া।

.

৩/ এই প্রবণতাটি ভুল কারণ “ডিজাইনার হাইপোথিসিস” [অর্থাৎ একজন বুদ্ধিমান ডিজাইনার বা নকশাকার (স্রষ্টা) ইচ্ছাকৃতভাবে মহাবিশ্বকে এভাবে সৃষ্টি করেছেন] আমাদের সামনে সাথে সাথে আরো একটি বড় সমস্যা দাড় করিয়ে দেয়। সেটা হলো নকশাকারের নকশা কে করেছে ?

.

৪/ বর্তমানের আমাদের কাছে থাকা সবচেয়ে সৃজনশীল এবং শক্ত ব্যাখ্যা হল ডারউইনের “প্রাকৃতিক নির্বাচন দ্বারা বিবর্তনের মতবাদ” [evolution by natural selection]। আর পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে আমাদের কাছে এর সমতুল্য কোন ব্যাখ্যা নেই।

.

৫/ জীববিজ্ঞানের ক্ষেতরে ডারউইনের বিবর্তনবাদ যেমন তেমনি পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রেও এমন শক্তিশালী এবং ভালো ব্যাখ্যা একসময় পাওয়া যাবে এমন আশা আমাদের ছেড়ে দেয়া উচিত না।

.

(অতএব) প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।"

.

.

প্রারম্ভিক আলোচনাঃ

.

ডকিন্সের মূল পয়েন্টগুলো নিয়ে আলোচনায় যাবার আগে যাওয়ার আগে - "প্রায় নিশ্চিতভাবেই বলা যায় ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই।" – ডকিন্সের এই উপসংহার বা সিদ্ধান্তের ব্যাপারে কিছু কথা বলতে চাই।

.

আমার মূল প্রশ্ন হলো - কিভাবে উপরের ৫টি বিবৃতি থেকে ডকিন্স এই উপসংহারে পৌছায় যে ঈশ্বরের অস্তিত্ব নেই? কোন যৌক্তিক ক্রমধারার মাধ্যমে প্রথম পাঁচটি বিবৃতি থেকে শেষের উপসংহারটি পাওয়া যায়? যেন সে স্রেফ হাওয়া থেকে তার উপসংহার নিয়ে আসল।

.

প্রথম পাঁচটি বিবৃতি থেকে এই উপসংহারে উপনীত হওয়াটা কেবল ডকিন্সের যুক্তির ভিত কতোটা দুর্বল সেটাই প্রমান করে। আমার কাছে মনে হয়, এখানে একমাত্র ডিল্যুশান হল ডকিন্সের এ দৃঢ় বিশ্বাস যে তার যুক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্বকে নাকচ করে দায়।

.

ডকিন্সের পাঁচটি বিবৃতি থেকে যদি কোন উপসংহারের আসতেই হয়, তবে যৌক্তিকভাবে আমরা বড়জোর এটুকু বলতে পারি যে – মহাবিশ্বের ডিজাইন থাকার উপর ভিত্তি করেই আমাদের এই উপসংহারে আসা উচিত না যে স্রষ্টা আছেন। তবুও, যদি আমরা এটাকে সত্যি বলে ধরেও নেই, তাও কিন্তু এ থেকে "স্রষ্টার অস্তিত্ব নেই" - এটা প্রমান হয় না [২]। অন্য অনেক যুক্তি দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্বের ব্যাপারে আমরা উপসংহার টানতে পারি। যার মধ্যে আছে :

.

• নৈতিকতা থেকে যুক্তি [Argument from morality]

• কুরআনের মু'জিযা

• মহাজাগতিক ঘটনাবলী থেকে যুক্তি [The Cosmological Argument]

• প্রত্যেকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে যুক্তি [Argument from Personal Experience]

• প্রত্যেক মানুষের আত্মবোধ থেকে যুক্তি [Argument from consciousness] [৩]

.

যদি আমরা ডকিন্সের পাঁচটি বিবৃতির প্রতিটিকে সঠিক হিসাবে গ্রহণ করেও নেই, তবুও স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে এমন ধারণাকে নাকচ করে দেয়ার জন্য তা যথেষ্ট হবে না । আর অবশ্যই এ থেকে নাস্তিকতার দর্শনের পক্ষে কোন ইতিবাচক যৌক্তিক অবস্থান তৈরি করা সম্ভব না।

.

তবে ডকিন্সের বিবৃতিগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই ভুল। আসুন ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর বিশ্লেষণ এবং উত্তর দেয়া যাক।

.

[ইন শা আল্লাহ চলবে]

১। a positive case for the Atheist worldview – সাধারন নাস্তিকরা বিভিন্ন ধর্মকে ভুল প্রমান করার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থানকে সঠিক প্রমান করতে চায়। অর্থাৎ বাকিদের ভুল প্রমান করার মাধ্যে তারা নিজেদের সঠিক প্রমান করতে চায় (i.e Negative case)। কিন্তু তাদের দাবির (স্রষ্টা নেই) পক্ষে যুক্তি তর্ক পেশ করে না, কিংবা তাদের দার্শনিক অবস্থানের পক্ষে ইতিবাচক প্রমান (Positive Case) আনে না।

.

২। যদি "ক" থেকে "খ" এর অস্তিত্ব প্রমান না করা যায়, তার মানে এই না যে "খ" এর অস্তিত্ব নেই এটা প্রমাণিত।

.

৩। ই প্রতিটি যুক্তি নিয়ে দীর্ঘ ও বিস্তারিত আলোচনা আছে। তবে সেগুলো তুলে ধরা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য না হওয়াতে এখানে কেবল নাম উল্লেখ করা হয়েছে। আগ্রহী পাঠক এ ব্যাপারে পড়ে নিতে পারেন।

৩৬

শিলা (Hail) কি আকাশে অবস্থিত কোন শিলাস্তূপ থেকে নিক্ষিপ্ত হয় (Quran 24:43) ?

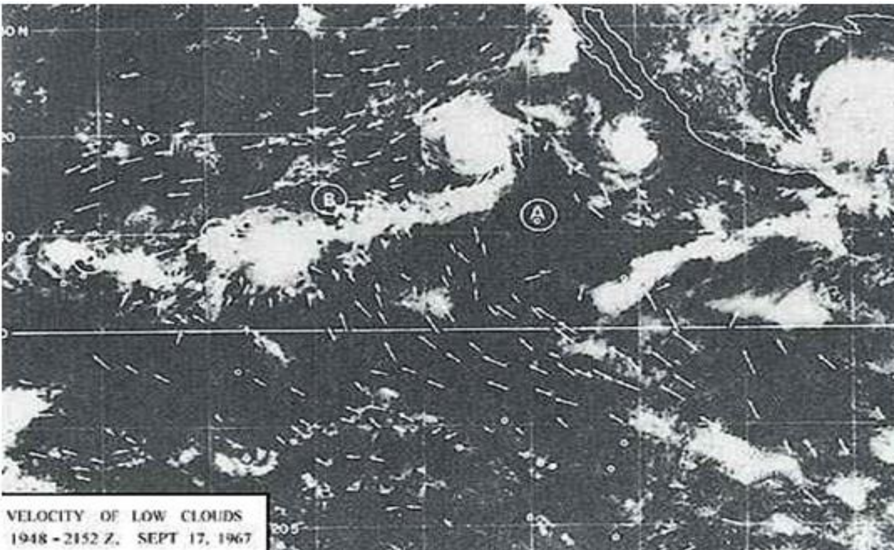
-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরণের মেঘমালার উপর গবেষণা করেছেন। তারা প্রমাণ করেছেন যে, বৃষ্টিবাহী মেঘ নির্দিষ্ট পদ্ধতি ও প্রক্রিয়ায় গঠিত হয়। তা গঠিত হয় নির্দিষ্ট প্রকারের বাতাস ও মেঘ দ্বারা। এক প্রকার মেঘের নাম "সাহাবুর রুকাম" তথা "মেঘপুঞ্জ" "Cumulonimbus"। মহাকাশ বিজ্ঞানীরা উক্ত মেঘের গঠন, বৃষ্টি, শিলা ও বিজলি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তারা প্রমাণ করেছেন যে, উক্ত মেঘপুঞ্জ বৃষ্টি তৈরির জন্য নিম্নের প্রক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করে থাকে:

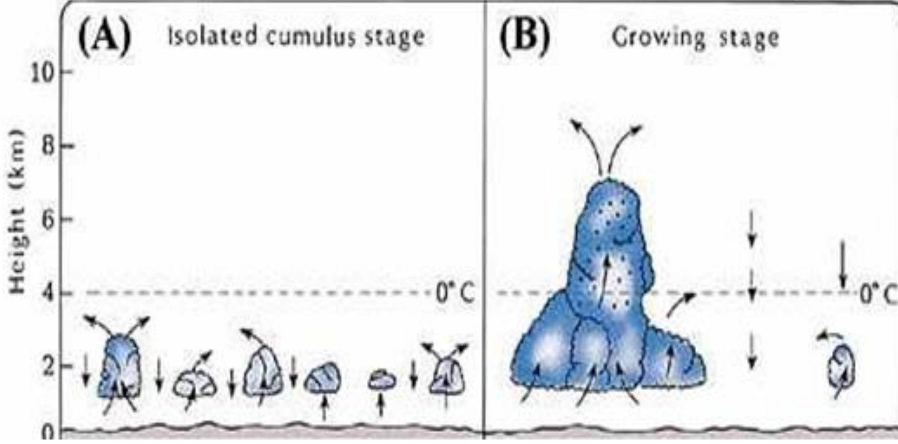
১) বাতাস কর্তৃক মেঘকে ধাক্কা দেয়া: ছোট মেঘখণ্ডকে বাতাস যখন ধাক্কা দেয় তখন Cumulonimbus বা "বৃষ্টিবাহী মেঘপুঞ্জ" নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে তৈরি হতে শুরু করে। (১ ও ২ নং চিত্র দেখুন)



চিত্র-১: স্যাটেলাইট থেকে নেয়া ছবিতে দেখা যাচ্ছে যে, মেঘ B, C ও D এর মিলন স্থলের দিকে ঘূর্ণায়মান। তীর চিহ্নগুলো বাতাসের গতিপথ নির্দেশ করছে। (The Use of Satellite Pictures in Weather Analysis and Forecasting, Anderson and others, p.188.)



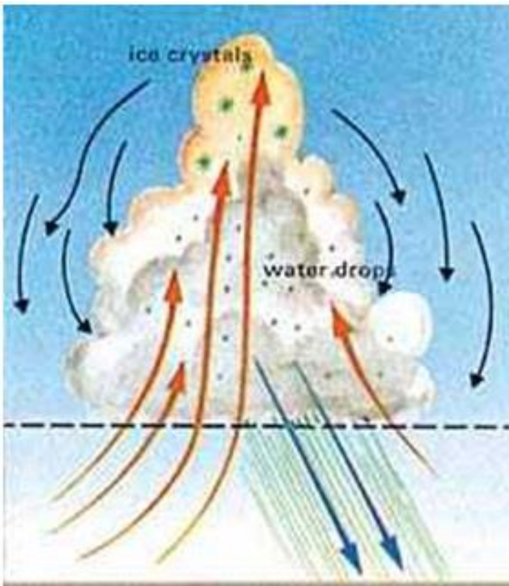
চিত্র-২: মেঘের ছোট ছোট টুকরা (স্তূপীকৃত মেঘমালা Cumulus) ছুটাছুটি করছে শেষ প্রান্তের বড় মেঘখণ্ডের উদ্দেশ্যে। (Clouds and storms. Ludlam, plate 7.4)



চিত্র-৩: (A) বিচ্ছিন্ন ছোট ছোট মেঘমালা একত্রিত হয়ে বড় মেঘে পরিণত হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। (B) ছোট ছোট মেঘ কণাগুলো একত্রিত হয়ে বড় মেঘমালায় পরিণত হয়েছে। পানির ফোটা (*) চিহ্নিত। (The Atmosphere, Anthes and others, p. 269)

২) মেঘখণ্ডের মিলন: ছোট ছোট মেঘখণ্ড একসাথে মিলিত হয়ে বড় মেঘমালায় পরিণত হয়। [১] (দেখুন ২ ও ৩ নং চিত্র)

৩) স্তূপ করে রাখা: যখন ছোট ছোট মেঘখণ্ড একত্রে মিলিত হয় তখন তা উঁচু হয়ে যায় এবং উড্ডয়মান বাতাসের গতি পার্শ্ববর্তী স্থানের তুলনায় মেঘের মূল কেন্দ্রের নিকটে বৃদ্ধি পেয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী হয়। এই উড্ডয়মান বাতাসের গতি মেঘের আকার বৃদ্ধি করে মেঘকে স্তূপীকৃত করতে সাহায্য করে। (দেখুন-৩.B, ৪ ও ৫নং চিত্র) এই মেঘের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে মেঘটি বায়ুমণ্ডলের অধিকতর ঠাণ্ডা স্থানের দিকে বিস্তৃতি লাভ করে সেখানে পানির ফোটা ও বরফের সৃষ্টি করে এবং তা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। এরপর যখনই এগুলো অধিক ওজন বিশিষ্ট হয়ে যায় তখন বাতাস আর তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে, মেঘমালা থেকে তা বৃষ্টি ও শিলা হিসেবে বর্ষিত হয়। [২]



৪



৫

চিত্র-৪: ছোট ছোট মেঘখণ্ড একত্রিত হয়ে গঠিত "বৃষ্টিবাহী cumulonimbus মেঘপুঞ্জ" থেকে বৃষ্টি বর্ষণ হচ্ছে। (Weather and Climate, Bodin, p.123)

চিত্র-৫ : Cumulonimbus Cloud বা বৃষ্টিবাহী মেঘ। (A Colour Guide to Clouds, Scorer and Wexler, p.

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা অতি সম্প্রতি কম্পিউটার, বিমান, স্যাটেলাইট সহ বায়ুর চাপ, আর্দ্রতা পরিবর্তন প্রভৃতি নিয়ে গবেষণার যন্ত্রপাতিসহ অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মেঘের সৃষ্টি, গঠন প্রণালী ও তার কাজ-কর্ম সম্বন্ধে জেনেছেন। [৩]

মেঘ ও বৃষ্টি নিয়ে আলোচনা করার পর কুরআন বরফ ও বিদ্যুৎ সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। আল্লাহ বলেনঃ

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَامًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِن جِبَالٍ فِيهَا مِن بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَن مَّن يَشَاءُ ۖ يَكَادُ سَنَا بَرْقِهِ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ

অর্থ: "তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। আর তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলা বর্ষণ করেন। এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা সরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক যেন তার দৃষ্টিশক্তিকে বিলীন করে দিতে চায়।"
(কুরআন, নুর ২৪:৪৩)

মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, cumulonimbus তথা বৃষ্টিবাহী মেঘপুঞ্জ, যা থেকে শিলা-বৃষ্টি বর্ষিত হয়— তার উচ্চতা ২৫০০০ থেকে ৩০০০০ ফুট (৪.৭ থেকে ৫.৭ মাইল) পর্যন্ত হয়ে থাকে। [৪] তাকে পাহাড়ের মতই দেখায় যেমনটি আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন: (وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ)অর্থাৎ "আর তিনি আকাশস্থিত পাহাড় (শিলাস্তূপ) থেকে শিলা বর্ষণ করেন।" (দেখুন চিত্র-৫)

এই আয়াত নিয়ে প্রশ্ন হতে পারে— আয়াতে বরফের দিকে নির্দেশ করে "سَنَا بَرْقِهِ" (তার বিদ্যুৎঝলক) বলা হল কেন? তাহলে কি তার অর্থ দাঁড়ায় যে, শিলাই বিদ্যুৎঝলক সৃষ্টিতে প্রধান ভূমিকা রাখে?

আসুন! আমরা দেখি Meteorology Today গ্রন্থ এ সম্বন্ধে কি বলে। উক্ত গ্রন্থে বলা হয়েছে— বরফ পড়ার দ্বারা মেঘে বৈদ্যুতিক চার্জের সৃষ্টি হয়। পানি ফোটার সাথে বরফের সামান্য সংস্পর্শ পেয়েই জমাট বেধে তাতে গোপন তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়। আর বরফ টুকরার কারণে উক্ত বরফ পৃষ্ঠে সমুদ্র পৃষ্ঠের চেয়ে বেশি তাপমাত্রার সৃষ্টি হয়।

এ ছাড়া এখানে আরেকটা আশ্চর্যজনক প্রক্রিয়া সংঘটিত হয়; তাহলো— এখানে বিদ্যুৎ অধিক ঠাণ্ডা থেকে অধিক গরমে পরিণত হয়ে নেগেটিভ চার্জের সৃষ্টি করে। এমনভাবে ঠাণ্ডা পানির ফোটার সাথে বরফের সংস্পর্শের পর এর ছোট ছোট কণাগুলো পজিটিভ চার্জ হয়ে ঊর্ধ্বগামী বাতাসের মাধ্যমে মেঘের উপরে চলে যায় এবং অন্য শিলাগুলো নেগেটিভ চার্জ হয়ে মেঘের নিচের দিকে চলে আসে। এখানে মেঘের নিচের অংশেও নেগেটিভ চার্জ হয়। আর এই নেগেটিভ চার্জই বিদ্যুৎ হয়ে প্রজ্বলিত হয়। [৫]

সারকথা হল- শিলাই বিদ্যুৎ সৃষ্টির প্রধান উপকরণ।

অতি সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা বিদ্যুৎঝলক সম্বন্ধে এ সমস্ত তথ্য আবিষ্কার করেছেন। প্রায় ১৬০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত দার্শনিক এরিস্টটলের তত্ত্বই সারা পৃথিবীতে প্রভাব বিস্তার করে রেখেছিল। তিনি বলেছিলেন: বায়ুমণ্ডল দু'টি নিঃশ্বাসের সম্মিলনের ফলাফল: আর্দ্র ও শুকনো। তিনি আরও বলেছেন: বজ্রধ্বনি হল শুকনা নিঃশ্বাসের সাথে অত্যাচারী মেঘের সংঘর্ষের ফল। আর বিদ্যুৎঝলক হল ভীতিকর আগুনের মত করে শুকনা নিঃশ্বাসকে পুড়ে যাওয়া। [৬]

এগুলো মহাকাশ সংক্রান্ত তথ্যাদির মধ্যকার কিছু তথ্য; যা ১৪০০ বছর আগে কুরআন নাযিলের সময়ে প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু কুরআনে তৎকালিন ভুল মতবাদের ছিটেফোঁটাও দেখা যায় না।বরং এমন সব তথ্য কুরআনে সন্নিবেশিত আছে যা আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সম্পুর্ণ সঠিক।

অন্ধ বিদ্বেষীরা কি চোখ খুলবে?

তথ্যসূত্রঃ

[১] দেখুন, The Atmosphere, Anthes and others, p. 268-269, এবং Elements of Meteorology, Miller and Thompson, p. 141.

[২] দেখুন, The Atmosphere, Anthes and others, p. 269, এবং Elements of Meteorology, Miller and Thompson, pp. 141-142.

[৩] ই'জাজুল কুরআনিল কারীম ফি ওয়াসফি আনওয়া'ইর রিয়াহি ওয়াস সাহাবি ওয়াল মাত্বার, ম্যাকি ও অন্যান্য, পৃষ্ঠা-৫৫।

[৪] Elements of Meteorology, Miller and Thompson, p. 141.

[৫] Meteorology Today, Ahrens, p. 437.

[৬] The Works of Aristotle Translated into English: Meteorologica, vol. 3, Ross and others, pp. 369a-369b.

সহায়ক গ্রন্থঃ

'ইসলামের সচিত্র গাইড' [ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://islamhouse.com/bn/books/338947/]

মূলঃ আই. এ. ইবরাহীম; অনুবাদ: মুহাম্মাদ ইসমাঈল জবীহুল্লাহ

সম্পাদনা: আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া - মো: আব্দুল কাদের

উৎস: ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ

৩৭

রিচার্ড ডকিন্সের "দা গড ডিল্যুশান"- এর জবাব [২য় কিস্তি]

মূলঃ হামযা যর্তযিস

অনুবাদঃ সত্যকথন ডেস্ক

[আগের পর্বের জন্য দেখুন (সত্যকথন) ৩৫]

.

এর আগে আমরা আলচনা করেছি কেন "দা গড ডিল্যুশান বই"-এর 'প্রধান যুক্তিকে' সঠিক প্রমান করার জন্য রিচার্ড ডকিন্স যে পাঁচটি বিবৃতি উপস্থাপন করেছে তার প্রতিটিকে যদি আমরা সঠিক হিসাবে গ্রহণ করেও নেই, তবুও স্রষ্টার অস্তিত্ব আছে এমন ধারণাকে নাকচ করে দেয়ার জন্য তা যথেষ্ট হবে না ।

.

তবে ডকিন্সের বিবৃতিগুলোর মধ্যে অনেকগুলোই ভুল। আসুন ধারাবাহিকভাবে সেগুলোর বিশ্লেষণ এবং উত্তর দেয়া যাক ।

.

বিবৃতি ১ : "মানুষের বুদ্ধিমত্তার জন্য এ পর্যন্ত সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জের একটি হলো মহাবিশ্বের জটিল এবং অসম্ভাব্য ডিজাইন বা নকশাকে ব্যাখ্যা করা।"

.

-আমি মনে করি যখন আমরা স্রষ্টাকে বাদ দিয়ে একে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি কে কেবলমাত্র তখনই এটা চ্যালেঞ্জে পরিণত হয়। যদি আপনি নাস্তিকতার অবস্থানকে সঠিক ধরে নিয়ে শুরু করেন তাহলে আসলেই এই জটিল এবং অসম্ভাব্য ডিজাইনকে ব্যাখ্যা করা অত্যন্ত কঠিন। তবে যারা চিন্তাশীল এবং এ ব্যাপারে গভীরভাবে চিন্তা করে তাদের জন্য আমার মতে সবচেয়ে সরল এবং শ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা হল "এই ডিজাইনের পেছনে একজন অপার্থিব ডিজাইনার আছেন" ।

.

আমার পরবর্তী পয়েন্টে কেন একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব বিশ্বজগতের নকশার ব্যখ্যা দিতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।

.

বিবৃতি ২ঃ “সাধারণ প্রবনতা হলো আপাতভাবে যাকে (ইচ্ছাকৃত) ডিজাইন বলে মনে হয়, সেটাকে প্রকৃতপক্ষেই কোন নকশাকারের ইচ্ছাকৃতভাবে তৈরি করা নকশা বা ডিজাইন হিসেবে ধরে নেওয়া।”

.

-এটা শুধুমাত্র একটা সাধারন প্রবণতা না। বরং মহাবিশ্বের সূচনার সময়কার ফাইন-টিউনিং [১] এর আলোকে বিচারবুদ্ধি ও বিবেচনাবোধের আলোকে পাওয়া যৌক্তিক উপসংহার । এই যুক্তিটির পেছনের ভিত্তিগুলো উপস্থাপন করে এ নিয়ে আরেকটু আলোচনা করা যাক। আমার এই কথার পেছনের পূর্বানুমান বা ভিত্তি [premise] হলোঃ

.

ক) প্রানের অস্তিত্বের জন্য অপরিহার্য মহাবিশ্বের ফাইন টিউনিং এর উদ্ভব তিন ভাবে হতে পারেঃ অপরিহার্যতার [physical necessity] কারনে, দৈবভাবে অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে করা ডিজাইনের কারনে।

.

খ) মহাবিশ্বের ফাইন টিউনিং প্রাকৃতিক অপরিহার্যতার কারনে বা দৈবভাবে আসেনি।

.

গ) অতএব, এই ফাইন টিউনিং ইচ্ছাকৃতভাবে করা ডিজাইনের ফসল।

.

প্রস্তাবনা ক-এর ব্যাখ্যাঃ

.

মানব অস্তিত্বের অনুকূল একটি মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকার কারন হল প্রাণের উপযোগী করার জন্য এই মহাবিশ্বের কাঠামোকে সুক্ষাতিসুক্ষভাবে নির্দিষ্ট করা হয়েছে [tune করা হয়েছে]। আর এই টিউনিং এতোই সুক্ষ ও সুনির্দিষ্ট যে তা আমাদের বোধশক্তির বাইরে । নিচের উদাহরণগুলোকে বিবেচনা করা যাক :

.

• মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এবং দুর্বল পারমাণবিক বল : ফিজিসিস্ট পি.সি.ডব্লিউ ডেইভিস বলেন যে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি অথবা দুর্বল পারমাণবিক শক্তিতে অতি ক্ষুদ্র পরিবর্তনও মানব অস্তিত্বের জন্য সহায়ক একটি মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য বাধা হয়ে দাঁড়াত। পি.সি.ডব্লিউ ডেইভিসের মতে এই শক্তিগুলোতে ১০^১০০ ভাগের এর একভাগ পরিমাণ এদিকওদিক হলে মহাবিশ্ব মানুষের অস্তিত্বের জন্য সহায়ক হতো না।

.

• সম্ভাব্য বিশ্বজগতগুলোর phase-space [২] এর আয়তন : অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটির রজার পেনরোয এর ব্যাখ্যায় বলেন, কেউ যদি আমাদের আমাদের বিশ্বজগতের অনুরূপ একটি বিশ্বজগত তৈরি করতে চায় তবে তাকে নিশানা করতে হবে সম্ভাব্য বিশ্বজগতগুলোর ফেইজ স্পেসের খুব ক্ষুদ্র একটি আয়তনের দিকে । এটা টেকনিক্যাল সাইন্স যা অনেকের কাছে বোধগম্য নাও হতে পারে। তবে এটা নিয়ে আমাদের অতোটা চিন্তা না করলেও হবে। কিন্তু যা আমাদের বোধগম্য এবং যে প্রশ্নটা আমাদের করা উচিত তা হল -

.

"আমাদের মহাবিশ্বের অনুরূপ মহাবিশ্ব সৃষ্টির জন্য কত ছোট আয়তনের দিকে নিশানা করতে হবে?"
পেনরোযের মতে এই আয়তন হবে ১/১০^x, যেখানে x= ১০^(১২৩)।

.

ব্যাপারটা এভাবে চিন্তা করুন। সমগ্র মহাবিশ্ব যদি একটা ডার্টবোর্ডের আকৃতির হয়, তাহলে একটা প্রোটনের আকার কতোটুকু হবে? আমাদের বিশ্বজগতের মত আরেকটি বিশ্বজগত তৈরি করতে যে পরিমান সুক্ষাতিসুক্ষ হিসেব এবং নির্ভুলতা প্রয়োজন তা ডার্টবোর্ড আকৃতির মহাবিশ্বে একটি প্রোটনের যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র আকার হবে তাতে আঘাত করার জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতার চেয়েও অনেক, অনেক বেশি ।

.

উপরের বক্তব্য গুলোর আলোকে বলা যায় যে , উপরে উল্লিখিত বিশ্বজগতের ফাইন-টিউনিং এর ব্যাপারে এখানে শুধু ৩টি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় -

.

১/ অপরিহার্যতা [physical necessity]
২/ দৈবক্রমে
৩/ ইচ্ছাকৃতভাবে করা ডিজাইন

.

প্রাকৃতিক অপরিহার্যতা কেন সম্ভাব্য ব্যাখ্যা হতে পারে নাঃ

.

এই ব্যাখ্যাটি অযৌক্তিক । ধ্রুবক এবং রাশি গুলোর যেই সুনির্দিষ্ট মান আছে , এখানে এগুলোর ঠিক এরকম মান হবার কোন বাস্তবিক বাধ্যবাধকতা বা অপরিহার্যতা নেই । পি.সি.ডব্লিউ ডেইভিস একে ব্যাখ্যা করেন এভাবেঃ

.

"পদার্থবিদ্যার সুত্রগুলো যদি ইউনিকও হত , তার মানে এই না যে প্রাকৃতিক মহাবিশ্বও ইউনিক... মহাবিশ্বের প্রারম্ভিক অবস্থার [initial condition] মাধ্যমেই পদার্থ বিদ্যার সুত্রগুলোর উদ্ভব হতে হবে... বরং মহাবিশ্বের প্রারম্ভিক অবস্থার সূত্র [laws of initial conditions] সম্পর্কে এখনো পর্যন্ত আমরা যা জানি তাতে এমন কোন কিছুই নেই যা থেকে আমরা ধরে নিতে পারি যে পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর প্রারম্ভিক অবস্থার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবার অর্থ মহাবিশ্বের অনন্য হওয়া। বরং আপাতভাবে এটাই প্রতীয়মান যে মহাবিশ্ব অন্য রকমও হতে পারতো। ঠিক এরকমই হবার কোন আবশ্যকতা ছিল না।" [৩]

.

তাছাড়া যদি কেউ এমন ভাবে যে প্রাণের উপযোগী আমাদের এ মহাবিশ্বে যে ফাইন টিউনিং আছে, এটার উদ্ভব হয়েছে মহাবিশ্বের সূচনার সময় কোন আবশ্যকতার [physical necessity] কারনে, তাহলে এটার অর্থ হবে যে প্রাণীর বেঁচে থাকার অনুপযোগী কোন মহাবিশ্ব পাওয়া অসম্ভব ! [৪]

.

তবে পদার্থবিজ্ঞানীদের মতে আমরা যে বিশ্বজগতে বাস করি তা এখন যেমন আছে এমন নাও হতে পারত এবং আরো অনেক বিশ্বজগত থাকতে পারত যা মানুষের জীবনধারণের জন্য উপযোগী হতো না ।

.

কেন ফাইন টিউনিং দৈব ভাবে হতে পারে নাঃ

.

কিছু লোক আছে যারা র‍্যান্ডলি, বাই চান্স বিশ্বজগতের আবির্ভাবের অসম্ভব হবার বিষয়টা বোঝার কারনে বলে "এমনি-এমনিই এটা হওয়া সম্ভব !"

.

কিন্তু যদি সকালে উঠে দেখলে কেউ দেখে তার গ্যারেজে একটি হাতি ঘুমিয়ে আছে, অথবা তার বাগানে একটি বোয়িং ৭৪৭ বিমান নেমে এসেছে, তবে কি সে সে বলবে এমনি-এমনি, বাই চান্স, র‍্যান্ডমলি এমনটা হয়েছে?

.

এমনকি তাদের অযৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি ধরিয়ে দেভার পরেও তারা এমনি-এমনিতেই, বাই চান্স, র‍্যান্ডমলি এই বিশ্বজগতের আবির্ভাব হওয়ার থিওরির উপর বিশ্বাস করে বসে থাকে এর জবাবে আমি এটা বলব যে এটা শুধুমাত্র র‍্যান্ডম চান্স না বরং এটা একটি ব্যাপার যাকে অনেকে "সুনির্দিষ্ট সম্ভাব্যতা" [specified probability] বলেছেন ।

.

"সুনির্দিষ্ট সম্ভাব্যতা" হল এমন একটি সম্ভাব্যতা যা একটি স্বতন্ত্র ও স্বাধীন প্যাটার্ন মেনে চলে। ধরুন একটি বানরকে আপনার ল্যাপটপটা দিয়ে একটা রুমে বসিয়ে দিলেন। বানরটা এই রুমে ২৪ ঘন্টা থাকবে, আর এই পুরোটা সময়ে সে টাইপ করে যাবে। পরদিন সকালে রুমে ঢুকে আপনি দেখলেন সে টাইপ করেছে , "টু বি অর নট টু বি!"। [৫]

.

বিস্ময়করভাবে বানরটি শেক্সপিয়ারের বিশ্ববিখ্যাত নাটকের একটি লাইন লিখে ফেলেছে ! আপনি হয়ত আশা করেছিলেন সে "ঘর","গাড়ি" , "আপেল" এর মত কোন শব্দ টাইপ করবে । তবে এক্ষেত্রে সে শুধু অসম্ভাব্য ভাবে একাধিক ইংরেজি শব্দই টাইপ করে ক্ষান্ত হয়নি বরং সঠিকভাবে ইংরেজী ব্যাকরনের স্বতন্ত্র ও স্বাধীন নিয়মেরও অনুসরণ করেছে।

.

এই ঘটনা এমনি-এমনিই, বাই চান্স হয়ে গেছে এমন ভাবাটা শুধু অযৌক্তিক না বরং পুরোই বিচার-বিবেচনার বিপরীত কথা। কারণ এই দৃষ্টিকোণ থেকে যে কেউ যেকোনো কিছু দাবি করতে পারে । এটা আসলে কতোটা অসম্ভাব্য তা একটু পরিস্কার করা যাক। ব্রিটিশ গণিতবিদরা হিসাব করে দেখেছেন যে, যদি একটি বানর সম্ভাব্য সকল মুহূর্তে টাইপ করে , তাহলে "টু বি অর নট টু বি! " শব্দ গুলো টাইপ করতে বানরটির ২৮ বিলিয়ন বছর লাগবে !

.

শেষ কথা , এমনি-এমনিতেই ঘটনা ঘটার হাইপোথিসিস [chance hyposthesis]] গ্রহণ করা আমাদের নিজ বিশ্বজগতের অস্তিত্ব অস্বীকার করার সমান ।

.

সুতরাং যেহেতু আমরা দেখলাম ১ এবং ২ নং বিবৃতি সত্যি , তাহলে এটা বলা যায় যে অতিপার্থিব পরিকল্পনাই [supernatural design] হল বিশ্বজগতের ফাইন-টিউনিং এর সবচেয়ে যৌক্তিক ব্যাখ্যা ।

[ইন শা আল্লাহ চলবে]

১। ফাইন টিউনিংঃ ফাইন টিউনিংকে অনেকসময় সৃষ্টির বুদ্ধিদীপ্ত নকশা বা Inetelligent Design ও বলা হয়। একবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করলেন মহাবিশ্বের মৌলিক শক্তি এবং ধ্রুবকগুলোর মান যদি এখন যে মান আমরা দেখি তার চেয়ে বিন্দুমাত্র কম বেশি হতো তাহলে আমাদের চেনা মহাবিশ্বের অস্তিত্ব থাকতো না। এই মানগুলো অত্যন্ত সুক্ষ এবং সুনির্দিষ্ট। আর এর যে কোন একটিতে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরিবর্তন হলে মহাবিশ্বের প্রাণের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব হতো না।

পদার্থবিজ্ঞানীরা এতোগুলো রাশির একইসাথে সুক্ষাতিসুক্ষভাবে সুনির্দিষ্ট মান হওয়াকে ফাইন টিউনিং বলেন।
এই রাশিগুলোর মান এতো সুনির্দিষ্ট কিভাবে হল? নিছক দুর্ঘটনাবশত?নাকি কেউ একজন খুব সুস্পষ্টভাবে এই সকল রাশির মান নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন??

প্রকৃতির দোহাই দিয়ে এই পর্যায়ের সুক্ষতা ও সুনির্দিষ্টতাকে ব্যাখ্যা করা যায় না। এমনকি ডকিন্স স্বীকার করে যে মহাবিশ্বের ফাইন টিউনিংকে বর্তমান বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারে না। [ডকিন্সের বিবৃতি ১ দ্রষ্টব্য]

২। https://en.wikipedia.org/wiki/Phase_space

৩।"Even if the laws of physics were unique, it doesn't follow that the physical universe itself is unique...the laws of physics must be augmented by cosmic initial conditions...there is nothing in present ideas about 'laws of initial conditions' remotely to suggest that their consistency with the laws of physics would imply uniqueness. Far from it...it seems, then, that the physical universe does not have to be the way it is: it could have been otherwise."

৪। যদি মহাবিশ্ব সূচনার সময়কালে সংঘটিত মহাবিশ্বের অস্তিত্বের জন্য আবশ্যক ঘটনার ফসল হিসেবে ফাইন টিউনিং এসে থাকে তাহলে যেকোন মহাবিশ্বের ক্ষেত্রে এই একই ফসল অর্থাৎ ফাইন টিউনিং পাওয়া যাবে।

৫। উইলিয়াম শেইক্সপিয়ারের বিখ্যাত ট্র্যাজিডি হ্যামলেটের একটি প্রসিদ্ধ লাইন

৩৮

“একেই বলে সভ্যতা” [ইসলাম বনাম সেকুলার হিউম্যানিজম]

-আসিফ আদনান

নাস্তিক, "মুক্তমনা"-দের একটা কমন বক্তব্য হল ইসলাম "মধ্যযুগীয় ধর্ম"। ইসলামী শারীয়াহ "অমানবিক", "বর্বর"। আর সভ্যতা, মানবিকতা এবং নৈতিকতার মানদন্ড হিসেবে ইসলামের বিকল্প হিসেবে তারা প্রস্তাব করে সেক্যুলার হিউম্যানিযমের কথা। আসুন দেখা যাক সেক্যুলার হিউম্যানিযমের আদর্শের উপর গড়ে ওঠা জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা বাহিনীর সভ্যতা, মানবিকতা ও নৈতিকতার নমুনা। আসুন দেখা যাক তারা যে আদর্শের নৈতিক শ্রেষ্ঠত্বের কথা বলে, প্রায়োগিক ক্ষেত্রে তার অবস্থা কেমন।

.

২০১৩ সাল থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে (CAR) একশোরও বেশি নারী, কিশোর-কিশোরী ও শিশু “শান্তিরক্ষীদের” দ্বারা নির্যাতিত হবার কথা ডকুমেন্টেড হয়েছে। গত ২৬ মার্চ জাতিসংঘেরই একজন মানবাধিকার বিষয়ক কর্মকর্তার সফরের সময় ভয়ঙ্কর একটি ঘটনার কথা উঠে এসেছে, যা একজন সুস্থ মানুষের জন্য পড়াটাও কষ্টকর। ফ্রেঞ্চ “শান্তিরক্ষী”-দের দ্বারা সংঘটিত এ ঘটনাটির বর্ণনা সম্প্রতি প্রকাশ করা হয়েছে আমি তার অনুবাদ তুলে ধরছি। পাঠকের কাছে মাফ চেয়ে নিচ্ছি, কোন সুস্থ মানুষের একরকম অসুস্থতার মুখোমুখি হওয়া উচিত না, বাস্তবে তো না-ই, অনলাইনেও না। কিন্তু মানবতা আর শান্তির পতাকাধারীরা গালভরা বুলির আড়ালে, শান্তির ধোঁয়া তুলে আসলে কি করছে তা তুলে ধরা দরকার মনে করছি। এই হল এদের সভ্যতা আর মানবতার রূপ, এই হল শান্তিরক্ষী বাহিনীর আনা শান্তির নমুনা-

.

“তিনজন মেয়ে জানিয়েছেন, চতুর্থ আরেকজন ভিকটিম সহ তাদের চারজনকে সাঙ্গারিস বাহিনীর ক্যাম্পে বন্দী করা হয়। সাঙ্গারিস বাহিনীর মিলিটারি কম্যান্ডার তাদেরকে ক্যাম্পের ভেতর বেঁধে ফেলেন এবং বিবস্ত্র করেন। তারপর তাদেরকে বাধ্য করেন একটি কুকুরের সাথে সঙ্গম করতে।

.

ঘটনার পর প্রতিজনকে ৫০০০ ফ্র্যাঙ্ক [স্থানীয় মুদ্রা - প্রায় ৭০০ টাকা] দেওয়া হয়। ভিকটিমদের একজন ঘটনার কিছুদিন পর অজানা রোগে মৃত্যুবরণ করেন। আরেকজন ভিকটিম জানান এই ঘটনার পর থেকে তাকে “সাঙ্গারিস কুত্তি” বলে ডাকা হয়। সাঙ্গারিস হলো মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত ফ্রেঞ্চ সামরিক বাহিনীর নাম।”

.

সূত্রঃ http://tinyurl.com/zfoeug8

.

যদি কেউ মনে করেন জাতিসংঘ শান্তিবাহিনীর দ্বারা নির্যাতনে এবং পাশবিকতার এটাই প্রথম ঘটনা, তবে ভুল করবেন। বিপর্যস্ত, অসহায় মানুষ, যাদের “সাহায্য” করার অজুহাতে জাতিসংঘ বিভিন্ন অঞ্চলে তাদের সাম্রাজ্যবাদী-ক্রুসেইডার সেনাবাহিনি প্রেরণ করে, তাদেরকে নির্যাতন করা জাতিসংঘের জন্য নতুন কিছু না। প্রায় দুই দশক ধরে তারা এরকম করে আসছে, এবং অপরাধীদের দায়মুক্তির ব্যবস্থা করে দিচ্ছে। কিন্তু বার বার, ধারাবাহিক ও নিয়মিতভাবে এ ঘটনাগুলো ঘটার পরেও জাতিসংঘ তেমন কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করে নি বরং পাশবিকতার মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছে।

.

“রক্ষকই যখন ভক্ষক” - এ কথাটা “শান্তি ও মানবতার” ধারক-বাহক জাতিসংঘের সাথে যেভাবে খাপে খাপে মিলে যায়, বর্তমান বিশ্বে আর কারো সাথে মনে হয় না অতোটা মেলে। নিচে গত বিষ বছরে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের নারী-শিশুদের উপর চালানো যৌন নির্যাতনের সংক্ষিপ্ত টাইম লাইন দেওয়া হলঃ

•

অগাস্ট ১৯৯৬ – মোযাম্বিকের সাবেক শিক্ষামন্ত্রী এবং জাতিসংঘর মহাসচিবের কার্যালয়ের অধীনস্ত বিষেশজ্ঞ গ্রাসা মিশেল জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে একটি রিপোর্ট উপস্থাপন করেন। "শান্তিরক্ষী" বাহিনীর দ্বারা ছেলে ও মেয়ে শিশুদের উপর চালানো যৌন নির্যাতনের বিষয়টি প্রথমবারের মতো এই রিপোর্টে উঠে আসে।

•

১৯৯৯ – বসনিয়াতে জাতিসংঘের "আন্তর্জাতিক পুলিশ বাহিনীর" কার্যক্রম পর্যবেক্ষনের দায়িত্ব থাকা ক্যাথেরিন বলকোভ্যাচ, বসনিয়াতে এই বাহিনী আসলে কি করছিল তা প্রকাশ করে দেন। জাতিসংঘের পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা নিয়মিত পতিতা গমনে অভ্যস্ত ছিল। তার চেয়েও ভয়ঙ্কর তথ্য হল, যুদ্ধ বিধ্বস্ত বসনিয়ার মেয়ে ও কিশোরীদের পূর্ব ইউরোপে যৌনদাসী হিসেবে বিক্রি ও পাচারের সাথে সরাসরি যুক্ত ছিল জাতিসঙ্ঘের পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা। যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়েছে তাদের কারো কোন শাস্তি হয় নি। ক্যাথেরিনকে বরখাস্ত করা হয়।

•

ফেব্রুয়ারী ২০০২ – খোদ জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা UNHCR এবং Save The Children এর উপদেষ্টাদের তৈরি একটি রিপোর্টের মাধ্যমেই গিনি, লাইবেরিয়া, সিয়েরা লিওন এবং সার্বিকভাবে পশ্চিম আফ্রিকায় জাতিসংঘের "শান্তিরক্ষীদের" দ্বারা উদ্বাস্তু নারী ও শিশুদের যৌন নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র ফুটে ওঠে। রিপোর্ট থেকে জানা যায় UNHCR এর অধীনে থাকা ক্যাম্প গুলোতেই সর্বাধিক যৌন নির্যাতন ও জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তির ঘটনা ঘটে।

•

অক্টোবর ২০০২ – পশ্চিম আফ্রিকাতে উদ্বাস্তু নারী ও শিশুদের উপর জাতিসংঘের "মানবাধিকার" কর্মী, "ত্রানকর্মী" এবং "শান্তিরক্ষীদের" দ্বারা সংঘটিত যৌন নির্যাতনের ব্যাপারে জাতিসংঘের অভ্যন্তরীণ তত্ত্বাবধান পরিষদ (OIOS) একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে।

•

অক্টোবর ২০০৩ - এসব ঘটনার প্রেক্ষিতে জাতিসংঘ বাধ্য হয় নারী- ও শিশুদের যৌন নির্যাতন করা থেকে বিরত থাকার জন্য বিশেষ ভাবে তাদের "শান্তিরক্ষীদের" আহবান জানাতে।

•

ফেব্রুয়ারী ২০০৪ – কঙ্গোতে উদ্বাস্তু নারী ও শিশুদের উপর চালানো "শান্তিরক্ষীদের" পাশবিকতার অফিশিয়াল তদন্ত শুরু। সমস্ত কঙ্গো জুড়েই, এবং উত্তর-পশ্চিম কঙ্গোর বুনিয়া শহরে বিশেষভাবে, জাতিসংঘের ক্যাম্পের ভেতরে নারী ও শিশুদের ধর্ষন ও জোর পূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করা হয়। সামরিক এবং সিভিলিয়ান, জাতিসংঘের উভয় ধরনের কর্মী এবং অফিসাররা এ অপরাধের সাথে যুক্ত ছিল।

•

মার্চ ২০০৫ - জাতিসংঘের শান্তিরক্ষীদের যৌন নির্যাতন সম্পর্কে প্রথম বিশ্লেষনর্মী রিপোর্ট "যাইদ রিপোর্ট" – এর প্রকাশ। জাতিসংঘের বাহিনীর সদস্যদের মধ্যে অসহায়দের উপর যৌন নির্যাতনের এই ধারার ব্যাপক প্রচলন এবং জাতিসংঘের ভেতরে একে "সাধারণ ঘটনা" হিসেবে মেনে নেওয়ার মনোভাবের কথা উঠে আসে।

•

২০০৬ – বিবিসির অনুসন্ধানী রিপোর্টে উঠে আসে কিভাবে হাইতি এবং লাইবেরিয়াতে "শান্তিরক্ষীরা" শিশুদের নিয়মিত ধর্ষন ও জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করে। ছোট মেয়েরা বিবিসির সাংবাদিকদের জানায় কিভাবে খাবার ও টাকার জন্য শান্তিরক্ষীরা নিয়মিত তাদেরকে যৌনকর্মে বাঁধ্য করতো।

•

জানুয়ারী ২০০৭ – ২০০৫ সালে দক্ষিণ সুদানে শান্তিরক্ষীদের দ্বারা শিশু ও কিশোরীদের সিস্টেমেটিক ধর্ষন ও যৌন নির্যাতনের খবর প্রায় দুই বছর পর মিডিয়াতে প্রকাশ পায়। ১২ বছরের মেয়েরাও শান্তিরক্ষীদের লালসার শিকার হয়।

.

২০০৮ – জাতিসংঘের ত্রানকর্মী ও শান্তিরক্ষীদের বিরুদ্ধে আইভরি কোস্ট, দক্ষিণ সুদান এবং হাইতিতে শিশুদের যৌন নির্যাতনের অভিযোগ। জাতিঙ্সঘের শান্তি ও মানবাধিকারের ধারক-বাহকদের দ্বারা ধর্ষিত হয় ৬ বছরে শিশুও। শুধুমাত্র Save The Children অভিযোগ প্রমাণিত হবার প্রেক্ষিতে তিনজন কর্মীকে বরখাস্ত করে দায় সারে।

.

সেপ্টেম্বর ২০১৩ – দক্ষিণ মালীতে শান্তিরক্ষীদের দ্বারা গণধর্ষন। কোন বিচার নেই।

.

নভেম্বর ২০১৩ – একদল স্বাধীন বিশেষজ্ঞ দলের অধীনে করা রিপোর্ট জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে জমা দেওয়া হয়। নিজেদের সদস্যদের দ্বারা দক্ষিণ সুদান ও লাইবেরিয়াতে ব্যাপকভাবে সঙ্ঘটিত ধর্ষন ও নারী ও শিশুদের পতিতাবৃত্তিতে বাধ্য করার ঘটনার বিচারের ক্ষেত্রে জাতিসংঘের উদাসীনতা নিয়ে এই রিপোর্টে কড়া ভাষায় সমালোচনা করা হয়। ২০১৫ পর্যন্ত এ রিপোর্ট ধামাচাঁপা দিয়ে রাখা হয়। ২০১৫ সালে "এইডস মুক্ত পৃথিবী" (AIDS Free World) নামে একটি আন্তর্জাতিক অ্যাডভোকেসি গ্রুপ স্বউদ্যেগে মিডিয়ার কাছে গোপনে এই রিপোর্ট পৌছে দেওয়ার পর, রিপোর্টটি আলোর মুখ দেখে।

.

এপ্রিল ২০১৫ – জাতিসংঘের অভ্যন্তরীন একটি রিপোর্ট AIDS Free World গোপনে সংগ্রহ করার পর মীডিয়াতে প্রকাশ করে। রিপোর্টে থেকে জানা যায় মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রের রাজধানী বাঙ্গুই-এ "শান্তিরক্ষীরা" খাবার এবং টাকার জন্য ৮ থেকে ১৫ বছর বয়েসী দশ থেকে বারো জন ছেলেকে নিয়মিত ধর্ষন করে। ধর্ষন সংঘটিত হয় অভ্যন্তরীণ উদ্বাস্তুদের জন্য তৈরি জাতিসংঘের নিজস্ব সেন্টারের ভেতরে।

.

মে ২০১৫ – জাতিসংঘের বিরুদ্ধে তাদের সদস্য কতৃক নারী-শিশু ধর্ষন ও নির্যাতনের তথ্য গোপন করা এবং অপরাধীদের বাঁচিয়ে দেওয়ার অভিযোগ।

.

জানুয়ারী ২০১৫ – মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্রে "শান্তিরক্ষীদের" দ্বারা মেয়েদের ধর্শনের আরও প্রমাণ।

.

মার্চ ২০১৬ – জাতিসংঘের একটি প্রকাশিত রিপোর্ট অনুয়ায়ী ২০১৫ সালে দশটি জাতিসংঘ মিশনে মোট ৬৯ টি ধর্ষনের অভিযোগ উথাপিত হয়েছে।

.

সূত্রঃ http://tinyurl.com/z3bwr8q

.

.

এই হল জাতিসংঘের মানবতা আর সভ্যতার নমুনা। এই হল সেক্যুলার হিউম্যানিযমের আদর্শের উপর গড়ে ওঠা "মহান" জাতিসংঘের "মহান" শান্তিরক্ষা বাহিনীর সভ্যতা, ভব্যতার নমুনা। এভাবেই তারা শান্তি প্রতিষ্ঠা করে আসছে। সবচেয়ে গরীব, সবচেয়ে অসহায়, সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্থ মানুষদের এভাবে তারা "সাহায্য" করছে।

.

প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা খরচ করে চালু করা এনজিও আর অ্যাডভোকেসি গ্রুপগুলো, "মুক্তমনা", চেতনামনা আর সুশীলদের মুখ দিয়ে এই জাতিসংঘের আদর্শই আমাদের শেখাতে চাচ্ছেন, আমাদের স্কুলের পাঠ্যবইয়ের মাধ্যমে এই জাতিসংঘের আদর্শ আমাদের শিশুদের মাথায় ঢুকিয়ে দিচ্ছেন। প্রথম আলো-ডেইলি স্টার-একাত্তরের মতো মিডিয়াগুলো জাতিসংঘের সিলেবাস অনুযায়ী আমাদের নারী অধিকার, শিশু অধিকার আর শান্তি-সভ্যতা সংজ্ঞা শেখাতে চাচ্ছে। আমাদের সামনে এসব ধর্ষক-নির্যাতক, পিশাচকে হিরো হিসেবে উপস্থাপন করছে, তাদের নৈতিকতাকে (!) উৎকৃষ্ট হিসেবে উপস্থাপন

করছে আর আমাদের বোঝাচ্ছে ইসলাম কতো মধ্যযুগীয়, কতো বর্বর, কতো পাশবিক! আর তাই তো নাসির বাচ্চু-খুশি কবীররা এদেশে সমকামীতার লাইসেন্স চায়, ৭১ বিকৃতাচারের পক্ষে নাটক বানায়, শাহবাগীরা পহেলা বৈশাখে "সমকামী প্যারেড" করেন।

.

.

তাই পরের বার যখন শারীয়াহ নিয়ে এসব নাস্তিক-মুক্তমনা-শাহবাগী, মিডিয়া কিংবা সুলতানা কামালদের ‘‘আসক’’-এর মতো সংস্থাগুলোর কথা চোখে পরবে, যখন এরা তনু ধর্ষন নিয়ে তোলপাড় করবে কিন্তু কৃষ্ণকলির স্বামীর মুখের আঁচড়ের দাগ, গৃহ পরিচারিকার মৃত্যু, ময়না তদন্ত রিপোর্ট নিয়ে রহস্যজনক নীরবতা পালন করবে - তখন মাথায় রাখবেন ঠিক কোন মানবতার সংজ্ঞা, কোন ধরণের স্বাধীনতা, কোন ধরনের সভ্যতা, কোন ধরনের শান্তি, কোন ধরনের ইনসাফের নমুনা তাদের ফিরিঙ্গি আন্তর্জাতিক প্রভুরা উপস্থাপন করেছেন, আর তারা অনুসরণ করছে। হয়তোবা অসহায় মানুষকে কুকুরের সাথে সঙ্গমে বাধ্য করাটাই তাদের কাছে সভ্যতা ও স্বাধীনতা, হয়তো বা পশুকাম, শিশুকাম, ধর্ষন আর পতিবৃত্তির অধিকারই তাদের কাছে মানবাধিকার, হয়তো তাদের এই বিশ্বব্যবস্থায় এটাই নৈতিকতা, এটাই এ বিশ্বব্যবস্থার ধর্ম - কিন্তু নিশ্চয় সৃষ্টিকর্তার নাযিলকৃত শারীয়াহর মাপকাঁঠিতে এরা জঘন্য অপরাধী। আর নিঃসন্দেহে এই জঘন্য অপরাধ ততোদিন বন্ধ হবে না, যতোদিন আল্লাহর আইন দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে,। ততোদিন এসব অপরাধীর বিচার হবে না, যতোদিন আল্লাহ্‌র শারীয়াহর অধীনে এসব জন্তুর বিচার করা হচ্ছে।

.

‘‘আর যখন তাদেরকে বলা হয় যে, দুনিয়ার বুকে ফাসাদ সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরা তো শান্তির পথ অবলম্বন করেছি।‘‘ [আল-বাক্বারাহ, ১১]

৩৯

মুখোশ উন্মোচনঃ পর্ব-১ [পশ্চিমা সভ্যতা বনাম ইসলাম]

-উৎস: লস্ট মডেস্টি ব্লগ

আমেরিকা, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড নিজেদেরকে দাবী করে এক মহান সভ্যতার ধারক হিসেবে। দেশীয় নাস্তিক-মুক্তমনা-শাহবাগী, কথিত প্রগতিশীল-সুশীল গোষ্ঠীও তোতা পাখির মতো ফিরিঙ্গি প্রভুদের কথাগুলোর নিরন্তর পুনরাবৃত্তি করে যায়। ঘুরেফিরে, ইনিয়েবিনিয়ে, ছলে-বলে-কৌশলে, শুধু গরু রচনা মুখস্থ করে পরীক্ষা দিতে আসা ছাত্রের মতো যে কোন আলোচনায়, যে কোন বিষয়ে তারা প্রমান করার চেষ্টা করে ইসলামী শরীয়া কতোটা খারাপ, কতোটা বর্বর, কতোটা "মধ্যযুগীয়"। আর উদারনৈতিক গণতন্ত্রের [Liberal Democracy] আদর্শে গড়ে ওঠা আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতাকে তারা উপস্থাপন করে এক মহান, মানবিক এবং অবশ্য অনুসরনীয় সভ্যতা হিসেবে।

.

যার অন্যতম ফিচার গনতন্ত্র, মানবাধিকার, বাকস্বাধীনতা আর নারীদের সমান অধিকার। পৃথিবীর বুকে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদের তোড়জোড়ের অভাব নেই। war on terror এর নামে তারা মুসলিম দেশ গুলোতে আক্রমণ করতে দুইবার চিন্তা করে না। মুসলিম নারীদের জন্য তাদের মায়াকান্নার শেষ নেই। তারা বলে মুসলিমরা নারীদেরকে বোরখার আড়ালে রেখে,নারীদেরকে ঘরে বন্দী করে রেখে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করছে, তাদেরকে এক অদৃশ্য দাসত্বের শিকলে বেঁধে রেখেছে। তারা মুসলিম নারীদেরকে বোরখার আড়াল থেকে বের করে এনে, শরীয়া আইনের দাসত্বের শৃঙ্খল ভেংগে ফেলে তাদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দিতে চায় ।

.

অথচ তাদের দেশেই তারা নারীদের অধিকার কেড়ে নিয়ে নারীদেরকে পন্য বানিয়ে ফেলেছে। তারাই পর্ণ ইন্ড্রাস্টী বানিয়েছে, তারাই সেখানে নারীদের সাথে পশুর মতো আচরণ করছে। বাসায়, স্কুলে, কলেজে, রাস্তাঘাটে, অফিসে, হাসপাতালে , সেনাবাহিনীতে কোথাও নারীরা নিরাপদ নয়। সবখানেই নারীরা চরম ভাবে যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছে। আমাদের এই সিরিজে আমরা চেষ্টা করব এই পাশ্চাত্য সভ্যতার ভন্ডামী আপনাদের সামনে তুলে ধরার। আমরা চেষ্টা করব সেই সব হতভাগ্য বোনদের বুকফাটা হাহাকার গুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে দেবার যারা এই তথাকথিত আধুনিক, মক্তমনা, নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী সমাজের দ্বারা ভয়ংকর যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন ।

.

"আমেরিকান আর্মির মহিলা সদস্যরা শত্রুদের নিয়ে ততোটা বেশী শংকিত থাকে না, যতটা বেশী শঙ্কিত থাকে তাদের পুরুষ সহকর্মীদের হাতে যৌন নিপীড়িত হবার ভয়ে ......।"

.

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ছেড়েই এই কথা গুলো বললেন ডোরা হারনান্দেজ যিনি প্রায় দশ বছরেরও বেশী সময় ধরে কাজ করেছেন আমেরিকান নেভী এবং আর্মি ন্যাশনাল গার্ড এ। ডোরা হারনান্দেজ সহ আরো কয়েকজন প্রবীণ ভদ্রমহিলার সঙ্গে কথা হচ্ছিল যারা আমেরিকার সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছেন অনেক বছর , ইরাক এবং আফগানিস্থান যুদ্ধেও অংশগ্রহণ করেছেন। এই ফ্রন্টগুলোতে কোনমতে তারা সারভাইভ করতে পেরেছেন কিন্তু পুরো কর্মজীবন জুড়ে তাদেরকে আরোও একটি যুদ্ধ করতে হয়েছে নীরবে-এবং সেই যুদ্ধে তারা প্রতিনিয়তই পরাজিত হয়েছেন। তাদের সেই নীরব যুদ্ধ ধর্ষণের বিরুদ্ধে ।

.

পেন্টাগনের নিজেস্ব রিসার্চ থেকেই বের হয়ে এসেছে যে আমেরিকান সামরিক বাহিণীর প্রতি চার জন মহিলা সদস্যের একজন তাদের ক্যারিয়ার জুড়ে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়।

.

ডোরা হারনান্দেজ থেমে যাবার পর মুখ খুললেন সাবিনা র‍্যাংগেল , টেক্সাসে, এলপাসোর অদূরে তাঁর বাসার ড্রয়িংরুমে বসেই আমাদের কথা হচ্ছিল, " আমি যখন আর্মির বুট ক্যাম্পে ছিলাম তখন আমি যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছিলাম এবং যখন নেভীতে গেলাম তখন একেবারে ধর্ষণের শিকার হলাম"।

.

জেমি লিভিংস্টোন ছয় বছরেরও বেশী সময় ধরে কাজ করেছেন ইউ.এস নেভীতে। তিনি বললেন, আমি জানতাম ইউ এস আর্মির কালচারটাই এমন যে সৈনিক এবং অফিসাররা রেপ করাকে তাদের অধিকার মনে করে। তাই আমি রেপের ঘটনা গুলো চেপে যেতাম আর আমার বসই আমাকে রেপ করত, কাজেই আমি কাকে রিপোর্ট করব?

.

ভদ্রমহিলাগন একে একে আমেরিকান আর্মিতে তাঁদের উপর করা যৌন নির্যাতনের ঘটনাগুলো বলে চলছিলেন। তারা কেউই পূর্ব পরিচিত ছিলেন না, কিন্তু আমেরিকান আর্মিতে নিজেদের সহকর্মী এবং বসদের হাতে তাঁরা যে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়েছেন সেই দুঃসহ অভিজ্ঞতাই তাদেরকে একে অপরের কাছে নিয়ে এসেছে। হৃদয়ের সবকটা জানালা খুলে দিয়ে তাঁরা একজন অপরজনের দুঃখগুলো ভাগাভাগি করে নিচ্ছিলেন।

.

পেন্টাগনের সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে (২০১০ সাল,) ইউ এস আর্মিতে প্রতি বছর উনিশ হাজারের মতো যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটে। (২০১১ সালে এটার পরিমাণ ছিল ছাব্বিশ হাজার)ইউ এস আর্মির মহিলা সদস্যরা আমেরিকার বেসামরিক মহিলাদের থেকে অধিক মাত্রায় যৌন নির্যাতনের ঝুকিতে থাকে। পেন্টাগনের Sexual Assault Prevention and Response office এর প্রধান গ্যারী প্যাটন বলেন, আমাদের অবশ্যই এই কালচারটা পরিবর্তন করতে হবে। যৌন নির্যাতনকে স্বাভাবিক ব্যাপার হিসেবে মেনে নিলে চলবে না। ভিক্টিমের ইউনিটের সবাইকে যৌন নির্যাতনের ব্যাপারটিকে খুব গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে।

.

সাবিনা র‍্যাংগেল হাইস্কুল শেষ করেই আর্মিতে জোগদান করেছিলেন। তার ক্ষেত্রে যৌন নির্যাতনের ব্যাপারটা শুরু হয়েছিল আর্মির বুট ক্যাম্পে একদিন ট্রেনিং করার সময় তার ড্রিল সার্জেন্ট এর দ্বারা। সাবিনা র‍্যাংগেল প্রথমে ভেবেছিলেন তার সার্জেন্ট বোধহয় তাকে ড্রিল করার ব্যাপারে নির্দেশনা দিচ্ছেন, কিন্তু আসলে সার্জেন্ট তার শরীরের স্পর্শ কাতর জায়গাগুলোতে হাত বুলানোর চেষ্টা করছিলেন।

.

সাবিনা র‍্যাংগেল বুট ক্যাম্প শেষ করার পর আর আর্মি ছেড়ে চলে আসেন। যৌন নির্যাতনের ঘটনা চেপে যান সবার কাছ থেকে ।

.

পেন্টাগনের পরিসংখ্যান অনুসারে মাত্র ১৪ শতাংশ যৌন নির্যাতনের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়। বাকী ৮৬ শতাংশ ঘটনা লোকচক্ষুর আড়ালেই থেকে যায়। অনেক ভিক্টিম অভিযোগ করেন তার নির্যাতনকারী তার চেয়ে উচু র‍্যাংকের। অনেকে অভিযোগ করেন যৌন নির্যাতনের শিকার হলে যেই কর্মকর্তার কাছে রিপোর্ট করতে হবে, সেই সব কর্মকর্তাই আমাকে যৌন নির্যাতন করেছে। র‍্যাংগেলের ক্ষেত্রেও এইরকমটা হয়েছিল ।

.

র‍্যাংগেল ২০০০ সালের দিকে আবার ইউ এস সামরিক বাহিনীতে যোগদান করেন। এইবার তিনি নেভীতে। এল পাসোতে ইউ এস নেভীর একটা ঘাঁটিতে তিনি কাজ করার দায়িত্ব পান।

.

একবার তার বেতনের চেকে কিছুটা সমস্যা হলে তিনি তাঁর কমান্ডার এক সার্জেন্ট মেজরের সঙ্গে যোগাযোগ করলেন । সেই

সার্জেন্ট মেজর তাঁকে তার অফিসে ডেকে পাঠালেন। তবে তিনি র‍্যাংগেলকে এই প্রস্তাবও দিলেন, " তুমি যদি আমার সঙ্গে হোটেলে দেখা কর তাহলে, আমি তোমাকে খুশি করে দিব"।

.

র‍্যাংগেল এই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিলেন। কিন্তু সেই সার্জেন্ট মেজর এতে একটুকুও না দমে র‍্যাংগেলকে বিছানায় যাবার প্রস্তাব দিতেই থাকলেন।

.

আমি যখন তার অফিসে গেলাম তখন আর কোন উপায় না পেয়ে তার পি.এস (যিনি নিজেও একজন মহিলা) কে বললাম , যখন বস আমাকে ডাকবে এবং আমি যাবার পর ভেতর থেকে দরজা লক করে দিবে, প্লীজ আপনি এই সময়টাতে একটু পর পর দরজায় নক করবেন। তিনি কিছুটা ক্লান্তস্বরে উত্তর দিলেন , "সাবিনা! শুধু তোমার সাথেই না, বস সবার সাথেই এরকম করে ...।

.

আমরা অনেক সামরিক বাহিনীতে কর্মরত ছিলেন বা আছেন এমন অনেক অনেক মহিলার সঙ্গে কথা বলেছি, যারা সবাই একটা ব্যাপারে একমত হয়েছেন – ইউ.এস সামরিক বাহিনীর পুরুষরা, সামরিক বাহিনীর নারীদের ধর্ষণ করাকে তাদের অধিকার মনে করে। সামরিক বাহিনীতে তো একটা কৌতুক প্রচলিতই আছে – পুরুষ সহকর্মী বা অফিসারদের হাতে ধর্ষিত হওয়া নারী অফিসার বা সৈন্যদের পেশাগত দায়িত্বের মধ্যেই পড়ে।

.

সাবিনা র‍্যাংগেল একবার এক মিশনের দায়িত্ব পেলেন। সেই মিশনেও এই সার্জেন্ট মেজর ছিলেন । এই সার্জেন্ট মেজর আর একজন সার্জেন্ট মেজরকে নিয়ে সাবিনা র‍্যাংগেল কে ধর্ষণ করতে থাকেন।

.

সাবিনা র‍্যাংগেল বিভিন্ন সময় তার কমান্ডারদের (যাদের মধ্যে একজন মহিলা কমান্ডারও ছিলেন) তার ধর্ষিত হবার ঘটনা জানালে , তারা কোন পদক্ষেপ না নিয়ে সাবিনাকে ঘটনা গুলো চেপে যেতে বললেন। এমনকি কোন কোন অফিসার তাঁকে এই ধর্ষণের ঘটনা নিয়ে উত্যক্ত করত ।

.

সাবিনা র‍্যাংগেল আস্তে আস্তে মানসিক ভাবে ভেঙ্গে পড়লেন। একদিন তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন সামরিক বাহিনী ছেড়ে চলে যাবার - ব্যস অনেক হয়েছে আর এই পাশবিক নির্যাতন সহ্য করা যাবে না। তিনি জীবন নিয়ে হতাশ হয়ে পড়লেন । ধর্ষিত হবার দুঃসহ স্মৃতি গুলো তাঁকে সারাক্ষন তাড়া করে বেড়াতে লাগলো। আত্মহত্যার চেষ্টাও করলেন কয়েকবার......

.

সৌদি আরবে অপরাধ করার কারণে নারীদের দোররা মারলে আমেরিকার মিডিয়াতে প্রতিবাদের ঝড় উঠে, মুসলিমদের তুলোধুনো করে দেওয়া হয়, নারীবাদীরা মায়া কান্না কাঁদে, নাস্তিক-মুক্তমনারা হই চই শুরু করে দেয় – মুসলিমরা বর্বর, মধ্যযুগীয়, মুসলিমরা নারী স্বাধীনতার বিরোধী ব্লা ব্লা ব্লা...

.

অথচ তাদের নিজেদের দেশে, তাদের স্বপ্নের পসচিমের আর্মিতেই যে ভয়াবহ নারী নির্যাতন হয় সে ব্যাপারে তারা চুপ। কোথায় তাদের মানবাধিকার, মত প্রকাশের অধিকার, কোথায় নারী স্বাধীনতা ?

.

#ডাবলস্ট্যান্ডার্ড

তথ্যসূত্রঃ

১) http://www.npr.org/2013/03/20/174756788/off-the-battlefield-military-women-face-risks-from-male-troops

২)http://www.protectourdefenders.com/factsheet/

৩) http://www.globalresearch.ca/sexual-assault-against-women-in-the-us-armed-forces/5374784

=====================================

৪০

মুহাম্মাদ (ﷺ) কি সন্তান জন্মে নারীর ভূমিকার ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্ন: কুরআনে বার বার উল্লেখ হয়েছে পুরুষের নির্গত বীর্য থেকে সন্তানের জন্ম হয় (Quran 86:5-6, 76:2, 23:13-14, 53:45-46, 80:19, 2:223) ! কিন্তু স্ত্রীর ডিম্বাণুর যে ভূমিকা সে ব্যাপারে কিছুই বলা হয়নি! এটা কি মুহাম্মাদের (ﷺ) অজ্ঞতা ছাড়া অন্য কিছু হতে পারে? [নাউযুবিল্লাহ, নাসতাগফিরুল্লাহ]

.

#উত্তরঃ আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ

إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا

অর্থঃ আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি সংমিশ্রিত শুক্রবিন্দু থেকে, তাকে আমি পরীক্ষা করব এইজন্য তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন।

(কুরআন, দাহর(ইনসান) ৭৬:২)

.

উপরের আয়াতে نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ বা "সংমিশ্রিত শুক্রবিন্দু" দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে? প্রাচীন তাফসিরকারকরা কিভাবে কুরআনের এই আরবি বুঝতেন? তাঁরা কি এই আয়াতের ক্ষেত্রে এটা বুঝতেন যে - মানবসৃষ্টিতে নারীর ডিম্বাণুর কোন ভূমিকাই নেই যেমনটি অভিযোগকারীরা দাবি করে থাকে? চলুন দেখি।

.

ইমাম তাবারী(র) কুরআনের সব থেকে প্রাচীন তাফসিরকারকদের একজন।

সুরা দাহরের ৭৬নং আয়াতের তাফসিরে ইমাম তাবারী(র) বলেনঃ আল্লাহ মানুষকে এমন অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন যে তার নিকৃষ্টতা ও দুর্বলতার কারণে সে উল্লেখযোগ্য কিছুই ছিল না। তিনি তাকে পুরুষ ও নারীর মিলিত শুক্রের মাধ্যমে সৃষ্টি করেছেন এবং বিভিন্ন অবস্থায় পরিবর্তিত করার পর তাকে বর্তমান রূপ ও আকৃতি দান করেছেন।

(তাবারী ২৪/৮৯)

[সূত্রঃ তাফসির ইবন কাসির(হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, মার্চ ২০১৪ সংস্করণ), ৮ম খণ্ড, সুরা দাহর(ইনসান) এর ২নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ৬৮৫]

এখানে নর ও নারীর মিশ্র বীর্য বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মানুষের সৃষ্টি পুরুষ ও নারীর দু'টি আলাদা বীর্য দ্বারা হয়নি {অর্থাৎ আলাদা আলাদাভাবে ২টি বীর্য থেকে হয়নি}। বরং দু'টি বীর্য সংমিশ্রিত হয়ে যখন একটি হয়ে গিয়েছে, তখন সে সংমিশ্রিত বীর্য থেকে মানুষের সৃষ্টি হয়েছে।এটিই অধিকাংশ তাফসিরকারকের মত।

[বাগভী, কুরতুবী, ইবন কাসির,ফাতহুল কাদির]

[সূত্রঃ কুরআনুল কারীম(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির), ড.আবু বকর জাকারিয়া, ২য় খণ্ড, সুরা দাহরের ২নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ২৭৩৭-২৭৩৮]

এখানে আমরা বেশ কয়েকজন প্রাচীন তাফসিরকারকের মতামত দেখলাম। তাঁরা সকলেই এই আয়াতে نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ বা "সংমিশ্রিত শুক্রবিন্দু" দ্বারা এটা বুঝতেন যে পুরুষ ও নারীর উভয়ের ভূমিকার দ্বারা মানবসৃষ্টির সূচনা হয়। অভিযোগকারীরা এরিস্টল, গ্যালেনের অভিমত ও প্রাচীন ভারতীয় ভ্রূণবিদ্যার কথা উল্লেখ করেন এবং বলেন যে কুরআনে মানবসৃষ্টিতে নারীর

ডিম্বাণুর ভূমিকা উল্লেখ করা হয়নি। অথচ আমরা দেখছি যে কুরআনের প্রাচীন তাফসিরকারকরা মোটেও প্রাচীন ভ্রূণবিদ্যার ভুল তত্ত্বগুলোর ন্যায় নারীর ভুমিকার তথা ডিম্বাণুর কথা অস্বীকার করেননি।

.

নুতফা (نُطْفَةٌ) অর্থ আমরা বিখ্যাত সব অ্যারাবিক টু ইংলিশ ডিকশনারিতে খুঁজলে প্রধাণত দু'টি অর্থ পাবো। সেগুলো হলো- 'Drop of fluid of parents' এবং 'Sperma (seed) of man and of a woman'। অর্থাৎ, পানির ফোঁটা যা পিতা-মাতা থেকে নির্গত হয় বা পুরুষ অথবা নারীর বীজ। বীজ এর বৈশিষ্ট্য গাছ উৎপাদন করা। তাই পুরুষ কই। সুতরাং, নুতফা শব্দ দিয়ে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, এই শব্দ দিয়ে পুরুষ এবং নারীর যথাক্রমে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুকে বুঝানো হয়েছে। সুতরাং 'কুরআনে শুধু শুক্রাণুর কথা বলা হয়েছে কিন্তু ডিম্বাণুর কথা নেই।' - এই অভিযোগ ভুল।"

অভিযোগকারীরা দাবি করেন মানবসৃষ্টিতে স্ত্রীর ডিম্বাণুর ভুমিকার ব্যাপারে নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) নাকি অজ্ঞ ছিলেন। আমরা বলব— মুহাম্মাদ(ﷺ) অজ্ঞ ছিলেন না, বরং অভিযোগকারীরাই অজ্ঞ।

.

মুসাদ্দাদ (র) .... উম্মে সালামা (রা) থেকে বর্ণিত যে, উম্মে সুলায়ম (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ)! আল্লাহ সত্য প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না । মেয়েদের স্বপ্নদোষ হলে কি তাদের উপর গোসল ফরয হবে ? তিনি বললেন, হ্যাঁ। যখন সে বীর্য দেখতে পারবে।

এ কথা শুনে উম্মে সালামা (রা) হাসলেন এবং বললেন, মেয়েদের কি স্বপ্নদোষ হয় ?

তখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তা না হলে সন্তান তার সদৃশ হয় কিভাবে।

[সহীহ বুখারী, অধ্যায়: নবী ও রাসুলগন | অনুচ্ছেদ: আদম (আ) ও তাঁর সন্তানাদির সৃষ্টি; হাদিস : ৩৩২৮]

আরেকটি বর্ণণায় আছে, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বললেনঃ (তা না হলে) তাঁর সন্তান তাঁর আকৃতি পায় কিরূপে? [সহীহ বুখারী,অধ্যায়: ইলম | অনুচ্ছেদ: 'ইলম শিক্ষা করতে লজ্জাবোধ করা'; হাদিস : ১৩০]

.

আলোচ্য হাদিসগুলোতে আমরা দেখছি যে নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মানবশিশুর জন্মের ব্যাপারে নারীর ভূমিকার কথা বলছেন।

এছাড়া কুরআনে আরো বিভিন্ন জায়গায় মানবসৃষ্টির প্রক্রিয়া আলোচনা করা হয়েছে এবং শুক্রের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে সেসব জায়গায় ডিম্বাণুর কথা সরাসরি না এলেও মোটেও ডিম্বাণুর কথা অস্বীকার করা হয়নি। "চিনি থেকে সরবত তৈরি হয়"— এই কথা বলার অর্থ এই নয় যে সরবত তৈরিতে পানির ভূমিকা অস্বীকার করা হচ্ছে।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ আশরাফুল আলফ সাকিফ; লেখকঃ 'অ্যান্টিডোট']

৪১
নাস্তিকতার বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই ৪ – অপ্রমাণ্য নাস্তিকতা
-আসিফ আদনান

১.

নন-প্র্যাকটিসিং ইহুদি পরিবারে জন্ম নেওয়া হাঙ্গেরিয়ান-অ্যামেরিকান পলিম্যাথ জন ভন নিউম্যান ছিলেন একজন অ্যাগনস্টিক। কিন্তু প্যানক্রিয়েটিক ক্যান্সারে ভুগতে থাকা ভন নিউম্যান মৃত্যুর কিছুদিন আগে সিদ্ধান্ত নেন একজন ক্যাথলিক পাদ্রিকে ডেকে খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহন করার। স্বাভাবিকভাবেই ভন নিউম্যানের সিদ্ধান্ত তার পরিবার ও বন্ধুদের অবাক করে। আজীবন লালিত অজ্ঞেয়বাদকে বাদ দিয়ে বিশ্বাসকে গ্রহন করার কারন সম্পর্কে তার কাছে জানতে চাওয়া হলে ভন নিউম্যান জবাব দেন – Pascal had a point ["প্যাসকেলের কথায় যুক্তি ছিল।"]

.

ভন নিউম্যান এখানে ফরাসী গণিতবিদ, দার্শনিক এবং পদার্থবিজ্ঞানী ব্লেইয প্যাসকালের বিখ্যাত "বাজির" কথা বলছেন। Pascal's Wager নামে খ্যাত এই যুক্তির মূল বক্তব্য হল-

.

যেহেতু কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে স্রষ্টার অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব নিশ্চিত ভাবে প্রমান করা সম্ভব না, তাই স্রষ্টায় বিশ্বাসের ক্ষেত্রে প্রতিটি মানুষ এক অর্থে একটি বাজিতে অংশগ্রহন করে। কেউ বেছে নেবে স্রষ্টা আছেন। কেউ বেছে নেবে স্রষ্টা নেই। গাণিতিক ভাবে এক্ষেত্রে যেকোন মানুষের সঠিক বা ভুল হবার সম্ভাবনা হল ১/২।

.

ব্যাপারটা অনেকটা কয়েন দিয়ে টস করার মতো। হেড বা টেইলস (আমরা ক্রিকেট খেলার সময় বলতাম "শাপলা" আর "ফলমূল") আপনি কয়েনের যেকোন একটি দিক বেছে নেবেন। আপনার জেতার সম্ভাবনা থাকবে ১/২।
এখন দেখা যাক সম্ভাব্য এই দুটি ফলাফলের ক্ষেত্রে লাভ ও ক্ষতি কি রকম -

.

স্রষ্টা আছেনঃ বিশ্বাসীরা দুনিয়াতে স্রষ্টার আদেশ-নিষেধ মেনে চলার কারনে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হবে। অর্থাৎ তাদের কিছু পরিমাণ আনন্দ, বিনোদন এবং সুখ পরিত্যাগ দিতে হবে। এটাকে আমরা ক্ষতি হিসেবে ধরবো। তবে যেহেতু আমরা জানি দুনিয়ার জীবন সীমিত। তাই বিশ্বাসীদের এই ক্ষতি হবে সীমিত। আর এই সীমিত ক্ষতির পরিবর্তে বিশ্বাসীর মৃত্যুর পর পাবে অসীম সময় ধরে পুরস্কার। যেহেতু আখিরাতের জীবন অসীম।
অন্যদিকে অবিশ্বাসী দুনিয়াতে স্রষ্টার বাধানিষেধ না মেনে ইচ্ছেমতো যেকোন কিছু করার কারনে সীমিত পরিমাণ লাভ পাবে। কিন্তু মৃত্যুর পর তাকে অসীম সময় ধরে শাস্তি ভোগ করতে হবে।

.

অর্থাৎ যদি স্রষ্টা থাকেন, তাহলে সীমিত ক্ষতির বিনিময়ে বিশ্বাসী পাবে অসীম লাভ। আর সীমিত লাভের বিনিময়ে অবিশ্বাসী পাবে অসীম ক্ষতি।
স্রষ্টা নেইঃ যেহেতু মৃত্যুর পর আর কোন কিছু নেই এবং দুনিয়ার জীবনই সব তাই আদেশ-নিষেধ মেনে চলার কারনে বিশ্বাসীদের দুনিয়ার সীমিত জীবনে সীমিত পরিমাণ ক্ষতি হবে। আর বাধানিষেধ না মেনে ইচ্ছেমতো যেকোন কিছু করার কারনে দুনিয়ার জীবনে অবিশ্বাসীরা সীমিত পরিমাণ লাভ করবে।

.

সুতরাং একজন বিশ্বাসীর জন্য এই বাজিতে সম্ভাব্য ফলাফলের সেট দুটো – (সীমিত সময় জুড়ে ক্ষতি, তারপর অসীম সময়

জুড়ে পুরস্কার) অথবা (সীমিত সময় জুড়ে ক্ষতি, তারপর শুন্যতা)।

.

একজন অবিশ্বাসীর জন্যও সম্ভাব্য ফলাফল দুটো – (সীমিত সময় জুড়ে লাভ, তারপর অসীম সময় জুড়ে শাস্তি) অথবা (সীমিত সময় জুড়ে লাভ, তারপর শুন্যতা)।

.

সুতরাং যদি স্রষ্টা না থাকে তাহলে বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী দুজনের জন্যই মৃত্যুর পর ফলাফল এক। শুন্যতা। কিন্তু যদি স্রষ্টা থাকেন তাহলে বিশ্বাসীর পুরস্কার অসীম, অন্যদিকে অবিশ্বাসীর শাস্তি অসীম। তাই বাজি বা কয়েন টসের সময় একজন বুদ্ধিমান মানুষ বুঝতে পারবে তাকে মূলত সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে সীমিত আর অসীমের মধ্যে।

.

প্যাসকেলের বক্তব্য হল সীমিত লাভের সম্ভাবনার জন্য অসীম সময়জুড়ে শাস্তির ঝুঁকি নেওয়া অযৌক্তিক। এ কারনে সম্ভাব্য ফলাফলের বিবেচনায় গাণিতিক ও যৌক্তিকভাবে "স্রষ্টা আছেন" এই অবস্থান নেওয়াই অধিকতর নিরাপদ।

.

প্যাসকেলের প্রায় ৬০০ বছর আগে মুসলিম কালামশাস্ত্রবিদ জিয়াউদ্দিন আব্দুল মালিক আল-জুয়াইনি একই ধরনের যুক্তির ব্যবহার করেছিলেন।

.

এছাড়া আমাদের দেশের ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহর ক্ষেত্রে একটি প্রসিদ্ধ ঘটনার কথা শোনা যায় যেখানে মূলত এই যুক্তিরই একটি ব্যবহৃত হয়েছে।

.

একজন নাস্তিক ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহকে প্রশ্ন করলোঃ আপনি যে অতো ধর্ম-কর্ম করেন এতো বিধিনিষেধ মানেন। যদি মরার পর দেখেন আল্লাহ নাই, তাহলে কেমন হবে? এসবই কি তাহলে লস না?

.

ডঃ মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ জবাবে বললেনঃ যদি তুমি মরার পর দেখো আল্লাহ আছেন তাহলে তোমার যা হবে তার তুলনায় আমার লস কিছু না।

.

তাই প্যানক্রিয়েটিক ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষারত ভন নিউম্যান ঠিক কোন অবস্থান থেকে বলেছিলেন – Pascal had a point - তা বোধগম্য। একজন মৃত্যুপথযাত্রী রোগীকে একটি ওষুধের কথা বলা হলো যেটা খেলে ৫০% সম্ভাবনা হল মারা যাবার আর ৫০% সম্ভাবনা হল সম্পূর্ণভাবে আরোগ্য লাভের। এক্ষেত্রে ওষুধটি খেলে রোগীটির হারানো কিছু থাকে না কিন্তু পাবার সব কিছুই থাকে। এই সহজ সমীকরণ ভন নিউম্যানের মিস করার কথা না।

.

প্যাসকেলের বাজি স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে যুক্তি না। তবে নিঃসন্দেহে নাস্তিকরা বিশ্বাসীদের অবস্থানকে অযৌক্তিক বলে যে দাবি করে তার বিরুদ্ধে সহজবোধ্য এবং শক্তিশালী জবাব। আর একই সাথে নাস্তিকতার অবস্থানের যৌক্তিকতার ব্যাপারেও একটি বড় প্রশ্নবোধক চিহ্ন।

২.

১৯৫৩ সালে Look ম্যাগাযিনের একটি সাক্ষাৎকারে বিখ্যাত নাস্তিক বার্ট্রান্ড রাসেলকে প্রশ্ন করা হয়েছিল – ঠিক কি ধরনের প্রমান পেলে আপনি বিশ্বাস করবেন স্রষ্টা আছেন?

.

জবাবে রাসেল বলেছিলঃ যদি আমি আকাশ থেকে স্রষ্টার গায়েবি কণ্ঠ শুনতে পাই, আর যদি এই কণ্ঠ আগামী ২৪ ঘন্টায় আমার

সাথে কি কি ঘটবে তা হুবহু ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে। তাহলে আমি বিশ্বাস করবো স্রষ্টা আছেন।

.

বলাবাহুল্য আস্তিক বা নাস্তিক কেউই বিশ্বাস করে না যে প্রতিটি ব্যক্তির সাথে স্রষ্টা এই ভাবে কথোপকথন করবেন এবং স্বীয় অস্তিত্বের প্রমান দেবেন।

.

রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন মক্কার মুশরিকদের কাছে তাওহিদের দাওয়াত দিচ্ছিলেন তখনো তাদের অনেকেই রাসেলের মতোই দাবি করেছিল।

.

"কেন একজন ফেরেশতা আমাদের চোখের সামনে আসমান থেকে নেমে আসে না?" "কেন আমাদের চোখের সামনে আসমান থেকে একটি কিতাব নেমে আসে না?" "কেন তোমার রব আসমান থেকে একটি সিঁড়ি নামিয়ে দেন না, আর তুমি সেই সিঁড়ি দিয়ে আসমানে উঠে যাও না?" ইত্যাদি ইত্যাদি।

.

তবে এটা অবিশ্বাসীদের অবস্থানের ব্যাপারে একটা ধারণা দেয়। যদিও অনেক কিছুই তারা চাক্ষুস প্রমান ছাড়াই বিশ্বাস করে, কিন্তু স্রষ্টার ক্ষেত্রে তারা চাক্ষুস প্রমান চায়। মিরাকল বা কেরামতপূর্ণ ঘটনা দেখতে চায়। এক্ষেত্রে আরো একটি কথাও বলা যায়। যদি নাস্তিকরা স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এতো মোটা দাগের প্রমান দাবি করে, তাহলে ইনসাফ হল স্রষ্টার অনস্তিত্বের ব্যাপারের তাদের দাবি প্রমান করার জন্য তারা একই ধরনের মোটা দাগের কোন প্রমান উপস্থাপন আবশ্যক। যদিও অতি সুক্ষ দাগের কোন ইতিবাচক প্রমানও (Positive proof) নাস্তিকরা আজো উপস্থাপন করতে পারে নি।

৩.

ভন নিউম্যান এবং রাসেলের এ দুটো ঘটনা থেকে মূলত যা প্রমান হয় তা হল শেষ পর্যন্ত স্রষ্টার ব্যাপারে অবস্থান - সেটা আস্তিকতা হোক বা নাস্তিকতা হোক – একটা দার্শনিক বা দর্শনগত অবস্থান। এটা কোন বৈজ্ঞানিক অবস্থান না। কারন আমাদের বিজ্ঞান দিয়ে স্রষ্টার অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব প্রমান করা সম্ভব না। একজন মানুষ এই দুটো অবস্থানের কোনটি গ্রহন করছে সেটা থেকে বুদ্ধিমত্তা বা জ্ঞান সম্পর্কেও (পার্থিব বিচারে) কোন ধারণা করা যায় না।

.

ভন নিউম্যান, কিংবা প্যাসকেল নিশ্চিত ভাবেই অশিক্ষিত, মূর্খ ব্যক্তি ছিলেন না। তারা যুক্তি, বিজ্ঞান বুঝতেন না এমন দাবি করার চিন্তা করাটাও হাস্যকর। অন্যদিকে ম্যাথমেটিশিয়ান এবং দার্শনিক রাসেলকেও পার্থিব বিচারের মূর্খ আহাম্মক বলা যায় না।

.

স্রষ্টায় বিশ্বাস ও তাঁর আনুগত্যের ব্যাপারে শেষ পর্যন্ত প্রতিটি মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয় নিজ বিচার, বিবেচনা ও বোধবুদ্ধির আলোকে। আর আধুনিক মিলিট্যান্ট বা নিউ অ্যাইথিস্টরা যতোই চিৎকার চেচামেচি করুক না কেন বিজ্ঞান এই ক্ষেত্রে কোন সিদ্ধান্ত দিতে সক্ষম না। সুতরাং যারাই শুধুমাত্র বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করে আস্তিকতা কিংবা নাস্তিকতাকে সঠিক প্রমান করতে চান তারা দুইদলই একটি মৌলিক ভুল করেন। বিজ্ঞান শুধু কিছু পর্যবেক্ষণকে আপনার সামনে তুলে ধরতে পারে যা স্রষ্টার অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্বের প্রশ্নের ব্যাপারে নিউট্রাল বা নিরপেক্ষ। আস্তিক আর নাস্তিকরা এই পর্যবেক্ষনগুলোকে নিজ অবস্থানের পক্ষে ব্যবহার করে। কিন্তু তারা যে উপসংহার উপস্থাপন করে তা তাদের নিজ নিজ ব্যাখ্যা; বিজ্ঞান না।

.

নাস্তিকরা এই ভুলটা অনেক সময়ই ইচ্ছাকৃতভাবেই করে, কারন দর্শনের দিক থেকে নাস্তিকতার দাবি প্রমানের ক্ষেত্রে কোন ইতিবাচক প্রমান বা যুক্তি উপস্থাপন করতে দশকের পর দশক ধরে তারা ব্যর্থ হয়েছে। তাই তাদের জন্য বিজ্ঞানকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করা, বিজ্ঞানমনস্কতার ভান করাটাই লাভজনক।

.

আর আস্তিকদের একটা বড় অংশ একই ভুল করে নাস্তিকদের এই আপাত বিজ্ঞানমনস্কতার প্রতিক্রিয়া হিসেবে। নাস্তিকদের জবাব দেয়ার জন্য বিজ্ঞান ব্যবহার করা থেকে শুরু হলেও অনেকেই এই অবস্থানে চলে যান যেখানে তারা বিশ্বাসকে বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা চেষ্টা করেন। আর এটিও বিশ্বাস এবং যুক্তি – উভয় দৃষ্টিকোন থেকেই ভুল।

৪.

তাহলে উপায় কি? এই বিতর্কের মীমাংসা হবে কি করে?
একজন মুসলিম আপনাকে বলবে এর মীমাংসা হবে মৃত্যুর পর।

.

"...অনন্তর আমারই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন; তখন আমি তোমাদের মধ্যে ফায়সালা করে দেব যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করছ" [আলে ইমরান, ৫৫]

.

কিন্তু একজন নাস্তিক কি বলবে? বার্ট্রান্ড রাসেল কিংবা মক্কার কুরাইশরা যেরকমের মিরাকল দাবি করেছে সেগুলোর অবর্তমানে নাস্তিকতার দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে, শুধু একটি জিনিসই এ বিতর্কের মীমাংসা করতে পারে। আর তা হল মৃত্যু পরবর্তী অভিজ্ঞতার মাধ্যমে প্রমান, যাকে অনেকে এস্ক্যাটোলজিকাল ভেরিফিকেশান (Eschatological Verification) বলে থাকেন।

.

সেক্ষেত্রে যদি মৃত্যু পরবর্তী সম্ভাবনা হয়ঃ
১) স্রষ্টা তথা পরকাল/আখিরাত এবং
২) কোন চেতনা, কোন কিছুর অস্তিত্ব না থাকা; শুন্যতা (Oblivion),

.

তাহলে যদি #১ সত্য হয় তাহলে বিশ্বাসীরা সঠিক প্রমাণিত হবে। আর যদি #২ সত্য হয় তাহলে নাস্তিকরা সঠিক প্রমাণিত হবে।

.

মজার ব্যাপারটা হল যদি সম্ভাব্য ফলাফল এই দুটোই হয় তাহলে আমরা নিশ্চিত ভাবে যা বলতে পারি তা হলঃ

.

১) বিশ্বাসীরা যদি ভুলও হয় তবুও তারা কখনোই জানতে পারবে না যে তারা ভুল।

২) নাস্তিকরা যদি ঠিকও হয় তবুও তারা কখনোই জানতে পারবে না যে তারা ঠিক। [১]

.

সুতরাং বিজ্ঞানের দিক থেকে এবং দর্শনের দিক থেকে নাস্তিকতাকে প্রমান করা অথবা ভেরিফাই করা অসম্ভব। আমাদের দেশীয় অধিকাংশ নাস্তিক - যারা মুক্তমনা জাতীয় ব্লগ, আরজ আলী মাতব্বর-হুমায়ুন আজাদের বই পড়ে এবং ডকিন্স-ক্রাউস-হ্যারিসদের বই/ভিডিও থেকে ধরাবাঁধা যুক্তি মুখস্থ করে বিজ্ঞানমনস্কতার ভান করে, বুদ্ধিবৃত্তিক ও যৌক্তিক শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করে, ডোমের মতো গালাগালি, আর লজিকাল ফ্যালাসির ভঙ্গুর প্রাসাদ বানানো আর বেশি থেকে বেশি হলে লিঙ্গুইস্টিক প্যারাডক্স আওড়ানোকে ইসলামের "মুখোশ উন্মোচন" জাতীয় কিছু একটা মনে করে - এই সত্যটা তারা হয়তো ধরতে পারবে না। যেহেতু অ্যাকচুয়ালি চিন্তা করার চাইতে গালাগালি, সস্তা রসিকতা এবং যেকোন মূল্যে তর্কে জেতাই তাদের মূল আগ্রহ।

.

তবুও নাস্তিকতার দৃষ্টিকোন থেকেই এতোশত বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই আর বিজ্ঞানমনস্কতার ভান করার পর, দিন শেষে একজন নাস্তিক শেষপর্যন্ত কখনোই তার বিশ্বাসের সত্যতার ব্যাপারে নিশ্চিত হতে পারবে না - এটা জানাটা আশ্চর্য রকমের তৃপ্তিদায়ক।

১। যদি মৃত্যুর পর কোন কিছুই না থাকে, কোন চেতনার (consciousness) অস্তিত্ব না থাকে, কোন সত্ত্বার অস্তিত্ব না থাকে, কোন কিছু না থাকে তাহলে আস্তিক বা নাস্তিক - সবার শেষ মৃত্যুতেই। মৃত্যুর সাথে সাথে আমাদের অস্তিত্ব সমাপ্ত হয়ে যাচ্ছে ।যেহেতু মৃত্যুর পর কেউ ফিরে আসতে পারছে না, কিংবা মৃত্যুর পর কারো অস্তিত্ব থাকছে না তাই মৃত্যুর মাধ্যমে কি সিদ্ধান্ত পাওয়া যাচ্ছে সেটা জানা যাচ্ছে না। যাচাইও করা যাচ্ছে না।

৪২

নাস্তিকদের ভেল্কিবাজির সাতকাহন – ২১ [বিবর্তনবাদ]

-আরিফ আজাদ

আমাদের আড্ডাটির কথাতো আগেই বলেছি। সাপ্তাহিক আড্ডা। শিক্ষামূলক বটে। একেক সপ্তাহে একেক টপিকের উপর আলোচনা চলে।

আমি আর সাজিদ মাগরিবের নামাজ পড়ে এগুচ্ছিলাম। উদ্দেশ্য- আড্ডাস্থল। আজ আড্ডা হচ্ছে সেন্ট্রাল মসজিদের পেছনে। অই দিকটায় একটা মাঝারি সাইজের বট গাছ আছে। বটতলাতেই আজ আসর বসার কথা।

.

খানিকটা দূর থেকে দেখলাম আড্ডাস্থলে বেশ অনেকজনের উপস্থিতি। কেউ একজন যেন দাঁড়িয়ে হাত নেঁড়ে নেঁড়ে কথা বলছে।

তাকে দেখে শামসুর রাহমানের কবিতার দুটি লাইন মনে পড়ে গেলো-

.

'স্বাধীনতা তুমি-
বটের ছায়ায় তরুণ মেধাবী শিক্ষার্থীর
শানিত কথার ঝলসানি লাগা সতেজ ভাষণ।'

.

আড্ডাস্থলে পৌঁছে দেখি হুলস্থুল কান্ড। আলোচনা তখন আর আলোচনায় নেই, বাড়াবাড়িতে রূপ লাভ করেছে।

.

দাঁড়িয়ে হাত নেঁড়ে যে কথা বলছিলো, সে হলো রূপম। ঢাবির ফিলোসপির ষ্টুডেন্ট। এথেইজমে বিশ্বাসী। তার মতে, ধর্ম কিছু রূপকথার গল্প বৈ কিছু নয়। সে তর্ক করছিলো হাসনাতের সাথে। হাসনাত জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে এন্থ্রোপোলজিতে পড়ে।

.

রূপমের দাবি- একমাত্র নাস্তিকতাই স্বচ্ছ, সৎ আর বিজ্ঞানভিত্তিক কথা বলে। কোন প্যাঁচগোচ নেই, কোন দুই নাম্বারি নেই, কোন ফ্রডগিরি নেই। যা বাস্তব, যা বিজ্ঞান সমর্থন করে - তাই নাস্তিকতা।

.

মোদ্দাকথা, নাস্তিকতা মানে প্রমাণিত সত্য আর স্বচ্ছতার দিশা।

হাসনাতের দাবি- ধর্ম হলো বিশ্বাসের ব্যাপার। আর বিশ্বাসের ব্যাপার বলেই যে একে একেবারে 'রূপকথা' বলে চালিয়ে দিতে হবে, তা কেনো?

ধর্ম ধর্মের জায়গায়, বিজ্ঞান বিজ্ঞানের জায়গায়। ধর্মের সাথে বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যতা দেখাতে গিয়ে সে আলবার্ট আইনষ্টাইন সহ বড় বড় কিছু বিজ্ঞানী আর দার্শনিকদের মন্তব্য কোট করতে লাগলো।

.

আমি গিয়ে সাকিবের পাশে বসলাম। তার হাতে বাদাম ছিলো। একটি বাদাম ছিলে মুখে দিলাম।

.

সাজিদ বসলো না।

সে রূপমের পাশে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখলো। বললো, 'এতো উত্তেজনার কি আছে রে?'

.

-'উত্তেজনা হবে কেনো?'- রূপম বললো।
- 'তোকে দেখেই মনে হচ্ছে অনেক রেগে আছিস। এ্যানিথিং রং?'
হাসনাত বলে উঠলো, 'উনি নাস্তিকতাকে ডিফেন্ড করতে এসছেন। উনার নাস্তিকতা কতো সাঁধু লেভেলের, তা প্রমান করার জন্যই ভাষণ দেওয়া শুরু করেছেন।'

.

সাজিদ হাসনাতকে ধমক দেওয়ার সুরে বললো, 'তুই চুপ কর ব্যাটা। তোর কাছে জানতে চেয়েছি আমি?'

.

হাসনাতকে সাজিদের এইভাবে ঝাঁড়ি দিতে দেখে আমি পুরো হাঁ করে রইলাম। হাসনাত সাজিদের সবচে প্রিয় বন্ধুদের একজন।আর এই রূপমের সাথে সাজিদের পরিচয় ক'দিনের? মনে হয় একবছর হবে। রূপমের জন্য তার এতো দরদ কিসের? মাঝে মাঝে সাজিদের এসব ব্যাপার আমার এতো বিদঘুটে লাগে যে, ইচ্ছে করে তার কানের নিচে দু চারটা লাগিয়ে দিই।

.

সাজিদের ধমক খেয়ে বেচারা হাসনাতের মনটা খারাপ হয়ে গেলো। হবারই তো কথা।

.

সাজিদ আবার রূপমকে বললো, 'বল কি হয়েছে?'
- 'আমি বলতে চাইছি ধর্ম হলো গোঁজামিলপূর্ণ একটা জিনিস। সেই তুলনায় নাস্তিকতাই স্বচ্ছ, সত্য আর বাস্তবতাপূর্ণ। কোন দুই নাম্বারি তাতে নেই।'
সাজিদ বললো, 'তাই?'
- 'হুম, Any doubt?'

.

সাজিদ হাসলো। হাসতে হাসতে সে এসে মিজবাহ'র পাশে বসলো। রূপম বসলো আমার পাশে। বটগাছের নিচের এই জায়গাটা গোলাকার করে বানানো হয়েছে। সাজিদ আর রূপম এখন মুখোমুখি বসা।

.

সাজিদ বললো, 'বন্ধু, তুই যতোটা স্বচ্ছ, সত্য আর সততার সার্টিফিকেট তোর বিশ্বাসকে দিচ্ছিস, সেটা এতোটা স্বচ্ছ, সত্য আর সৎ মোটেও নয়।'
রূপম বললো, 'মানে? কি বলতে চাস তুই? নাস্তিকরা ভূয়া ব্যাপারে বিশ্বাস করে? দুই নাম্বারি করে?'
- 'হুম। করে তো বটেই। এটাকে জোর করে বিশ্বাসও করায়।'
- 'মানে?'
সাজিদ নড়েচড়ে বসলো। বললো, ' খুলে বলছি।'

.

এরপরে সাজিদ বলতে শুরু করলো-

.

'বিজ্ঞানীরা যখন DNA আবিষ্কার করলো, তখন দেখা গেলো আমাদের শরীরের প্রায় 96-98% DNA হলো নন-কোডিং, অর্থাৎ, এরা প্রোটিনে কোনপ্রকার তথ্য সরবরাহ করে না। 2-4% DNA ছাড়া বাকি সব DNA-ই নন-কোডিং। এগুলোর তখন নাম দেওয়া হলো- Junk DNA । Junk শব্দের মানে তো জানিস,তাইনা? Junk শব্দের অর্থ হলো আবর্জনা। অর্থাৎ, এই 98% DNA'র কোন কাজ নেই বলে এগুলোকে 'বাতুল DNA' বা 'Junk DNA' বলা হলো।

.

ব্যস, এটা আবিষ্কারের পরে বিবর্তনবাদী নাস্তিকরা তো খুশীতে লম্ফঝম্প শুরু করে দিলো। তারা ফলাও করে প্রচার করতে

লাগলো যে, আমাদের শরীরে যে 98% DNA আছে, সেগুলো হলো Junk, অর্থাৎ, এদের কোন কাজ নেই। এই 98% DNA ডারউইনের বিবর্তনবাদের পক্ষে অনেক বড় প্রমান। তারা বলতে লাগলো- 'মিউটেশনের মাধ্যমে এক প্রজাতি থেকে আরেক প্রজাতিতে রূপান্তরিত হবার সময় এই বিশাল সংখ্যক DNA আমাদের শরীরে রয়ে গেছে।

.

যদি কোন বুদ্ধিমান স্রষ্টা আমাদের সৃষ্টি করতো, তাহলে এই বিশাল পরিমাণ অকেজো, অপ্রয়োজনীয় DNA তিনি আমাদের শরীরে রাখতেন না। কিন্তু কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বার হাত ছাড়া, প্রকৃতির অন্ধ প্রক্রিয়ায় আমরা অন্য একটি প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছি বলেই এই বিশাল অপ্রয়োজনীয়, অকেজো DNA আমাদের শরীরে এখনো বিদ্যমান।'

.

বিবর্তনবাদীদের গুরু, বিখ্যাত বিবর্তনবাদী জীব বিজ্ঞানী রিচার্ড ডকিন্স তো এই Junk DNA কে বিবর্তনবাদের পক্ষে বড়সড় প্রমাণ দাবি করে করে একটি বিশাল সাইজের বইও লিখে ফেলেন। বইটির নাম 'The Selfish Gene' ।

.

কিন্তু বিজ্ঞান অই Junk DNA তে আর বসে নেই।

.

বর্তমানে এপিজেনেটিক্সের গবেষণা থেকে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে যে, এতোদিন যে DNA কে Junk বলে বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো, তার কোনকিছুই Junk নয়। আমাদের শরীরে এগুলোর রয়েছে নানারকম বায়োকেমিক্যাল ফাংশান। যেগুলোকে নাস্তিক বিবর্তনবাদীরা এতোদিন অকেজো, বাতিল,অপ্রয়োজনীয় বলে বিবর্তনের পক্ষে বড়সড় প্রমাণ বলে লাফিয়েছে, সাম্প্রতিক গবেষণায় বেরিয়ে এসেছে- এসব DNA মোটেও অপ্রয়োজনীয়, অকেজো নয়। মানবদেহে এদের রয়েছে নানান ফাংশান। তারা বলতো, প্রকৃতির অন্ধ প্রক্রিয়ায় মানুষ অন্য একটি প্রাণী থেকে বিবর্তিত হয়েছে বলেই এরকম অকেজো,নন ফাংশনাল DNA শরীরে রয়ে গেছে। যদি কোন সৃষ্টিকর্তা বিশেষভাবে মানুষকে সৃষ্টি করতো, তাহলে এরকম অপ্রয়োজনীয় জিনিস আমাদের শরীরে থাকতো না।

.

কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে এসব DNA মোটেও নন-ফাংশনাল নয়। আমাদের শরীরে এদের অনেক কাজ রয়েছে। তাহলে বিবর্তনবাদীরা এখন কি বলবে? তারা তো বলেছিলো 'অপ্রয়োজনীয়' বলেই এগুলো বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ। কিন্তু এগুলোর প্রয়োজন যখন জানা গেলো, তখনও কি তারা একই কথা বলবে? ডকিন্স কি তার 'The Selfish Gene' বইটা সংশোধন করবে? বিবর্তনবাদীরা কি তাদের ভুল শুধরে নিয়ে ভুলের জন্য ক্ষমা চাইবে? বল দোস্ত, এইটা কি দুই নাম্বারি না?'

.

সাজিদ থামলো। রূপম বললো, 'বিজ্ঞানের অগ্রগিতে এরকম দু একটি ধারণা পাল্টাতেই পারে। এটা কি চিটিং করা হয়?'

.

সাজিদ বললো, 'না। কিন্তু বিজ্ঞান কোন ব্যাপারে ফাইনাল কিছু জানানোর আগেই তাকে কোন নির্দিষ্ট কিছু একটার পক্ষে প্রমাণ বলে চালিয়ে দেওয়া, প্রতিপক্ষকে এটা দিয়ে একহাত নেওয়া এবং এটার পক্ষে কিতাবাদি লিখে ফেলাটা চিটিং এবং নাস্তিকরা তাই করে।'

.

সাজিদ বললো, শুধু Junk DNA নয়। আমাদের শরীরে যে এপেন্ডিক্স আছে, সেটা নিয়েও কতো কাহিনী তারা করেছে। তারা বলেছে, এপেন্ডিক্স হলো আমাদের শরীরে অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ। আমাদের শরীরে এটার কোন কাজ নেই। যদি কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বা আমাদের সৃষ্টি করতো, তাহলে এপেন্ডিক্সের মতো অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ আমাদের শরীরে রাখতো না। আমরা শিম্পাঞ্জী জাতীয় একপ্রকার এপ থেকে প্রকৃতির অন্ধ প্রক্রিয়ায় বিবর্তিত বলেই এরকম অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ আমাদের শরীরে রয়ে গেছে।এটার কোন কাজ নেই।

.

এটাকে তারা বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ বলে চালিয়ে দিতো।

.

কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে, এপেন্ডিক্স মোটেও কোন অপ্রয়োজনীয় অঙ্গ নয়। আমাদের শরীরে যাতে রোগ জীবাণু, ভাইরাস ইত্যাদি প্রবেশ করতে না পারে, তার জন্য যে টিস্যুটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে, সেটার নাম লিম্ফ টিস্যু। এই টিস্যু আমাদের শরীরে অনেকটা সৈনিক তথা প্রহরীর মতো কাজ করে। আর, আমাদের বৃহদন্ত্রের মুখে প্রচুর লিম্ফ টিস্যু ধারণকারী যে অঙ্গটি আছে, তার নাম এপেন্ডিক্স।
যে এপেন্ডিক্সকে একসময় 'অকেজো' ভাবা হতো, বিজ্ঞান এখন তার অনেক ফাংশানের কথা আমাদের জানাচ্ছে।বিবর্তনবাদীরা কি আমাদের এ ব্যাপারে কোনকিছু নসীহত করতে পারে? এখনো কি বলবে এপেন্ডিক্স অকেজো? বিবর্তনের পক্ষে প্রমাণ?'

.

রূপম চুপ করে আছে। সাজিদ বললো, এতো গেলো মাত্র দুটি ঘটনা। তুই কি মিসিং লিঙ্কের ব্যাপারে জানিস রূপম?'

.

আমার পাশ থেকে রাকিব বলে উঠলো, 'মিসিং লিঙ্ক আবার কি জিনিস?'
সাজিদ রাকিবের দিকে তাকালো। বললো, 'বিবর্তনবাদীরা বলে থাকে একটা প্রাণী থেকে ধীরে ধীরে অন্য একটা প্রাণী বিবর্তিত হয়।তারা বলে থাকে- শিম্পাঞ্জি থেকে আমরা, মানে মানুষ এসেছে বিবর্তন প্রক্রিয়ায়। যদি এরকম হয়, তাহলে শিম্পাঞ্জি থেকে কিন্তু এক লাফে মানুষ চলে আসেনি।

.

অনেক অনেক ধাপে শিম্পাঞ্জি থেকে মানুষ এসেছে। ধর, ১ সংখ্যাটা বিবর্তিত হয়ে ১০ এ যাবে। এখন ১ সংখ্যাটা কিন্তু এক লাফে ১০ হয়ে যাবে না। তাকে অনেকগুলো মধ্যবর্তী পর্যায় (২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯) অতিক্রম করে ১০ হতে হবে। এই যে ১০ এ আসতে সে অনেকগুলো ধাপ (২, ৪, ৭, ৮, ৯) অতিক্রম করলো, এই ধাপগুলোই হলো ১ এবং ১০ এর মিসিং লিঙ্ক।'

.

রাকিব বললো, 'ও আচ্ছা, বুঝলাম। শিম্পাঞ্জি যখন মানুষে বিবর্তিত হবে, প্রাথমিক পর্যায়ে তার মধ্যে কিছু মানুষের কিছু শিম্পাঞ্জীর বৈশিষ্ট্য আসবে। এই বৈশিষ্ট্য সম্বলিত পর্যায়টাই মিসিং লিঙ্ক,তাই না?'

.

- 'হুম। যেমন ধর, মৎস্য কন্যা। তার অর্ধেক শরীর মাছ, অর্ধেক শরীর মানুষ। তাহলে তাকে মাছ এবং মানুষের একটি মধ্যবর্তী পর্যায় হিসেবে ধরা যায়। এখন কেউ যদি দাবি করে যে মাছ থেকে মানুষ এসেছে, তাহলে তাকে ঠিক মৎস্য কন্যার মতো কিছু একটা এনে প্রমাণ করতে হবে। এইটাই হলো মিসিং লিঙ্ক।'

.

রূপম বললো, 'তো এইটা নিয়ে কি সমস্যা?'
সাজিদ আবার বলতে লাগলো, 'বিবর্তনবাদ তখনই সত্যি হবে যখন এরকম সত্যিকার মিসিং লিঙ্ক পাওয়া যাবে।পৃথিবীতে কোটি কোটি প্রাণী রয়েছে। সেই হিসাবে বিবর্তনবাদ সত্য হলে কোটি কোটি প্রাণীর বিলিয়ন বিলিয়ন এরকম মিসিং লিঙ্ক পাওয়া যাওয়ার কথা। কিন্তু মজার ব্যাপার, এরকম কোন মিসিং লিঙ্ক আজ অবধি পাওয়া যায়নি। গত দেড়শো বছর ধরে অনেক অনেক ফসিল পাওয়া গেছে কিন্তু সেগুলোর কোনটিই মিসিং লিঙ্ক নয়। বিবর্তনবাদীরা তর্কের সময় এই মিসিং লিঙ্কের ব্যাপারটা খুব কৌশলে এড়িয়ে যায়। কেউ কেউ বলে, 'আরো সময় লাগবে। বিজ্ঞান একদিন ঠিক পেয়ে যাবে,ইত্যাদি।'

.

কিন্তু, ২০০৯ সালে বিবর্তনবাদীরা একটা মিসিং লিঙ্ক পেয়ে গেলো যা প্রমাণ করে যে মানুষ শিম্পাঞ্জী গোত্রের কাছাকাছি কোন এক প্রাণী থেকেই বিবর্তিত। এটার নাম দেওয়া হলো- Ida.

.

বিবর্তনবাদ দুনিয়ায় রাতারাতি তো ঈদের আমেজ নেমে আসলো। তারা এটাকে বললো 'The eighth wonder of the

world' ।

.

কেউ কেউ তো বলেছিলো, 'আজ থেকে কেউ যদি বলে বিবর্তনবাদের পক্ষে কোন প্রমাণ নেই, তারা যেন Ida কে প্রমাণ হিসেবে হাজির করে। বিবর্তনবাদীদের অনেকেই এইটাকে 'Our Monalisa' বলেও আখ্যায়িত করেছিলো। হিষ্ট্রি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফী, ডিসকভারি চ্যানেলে এটাকে ফলাও করে প্রচার করা হলো। সারা বিবর্তনবাদ দুনিয়ায় তখন সাজ সাজ রব।

.

কিন্তু, বিবর্তনবাদীদের কান্নায় ভাসিয়ে ২০১০ সালের মার্চে টেক্সাস ইউনিভার্সিটি, ডিউক ইউনিভার্সিটি আর ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো'র গবেষক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে দেখালেন যে, এই Ida কোন মিসিং লিঙ্ক নয়। এটা Lamour নামক একটি প্রাণীর ফসিল।তাদের এই রিসার্চ পেপার যখন বিভিন্ন নামীদামী সাইন্স জার্নালে প্রকাশ হলো, রাতারাতি বিবর্তনবাদ জগতে শোক নেমে আসে। বল রূপম, এইটা কি জালিয়াতি নয়? একটা আলাদা প্রাণীর ফসিলকে মিসিং লিঙ্ক বলে সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দেওয়া কি চিটিং নয়?'

.

এরচেয়েও জঘন্য কাহিনী আছে এই বিবর্তনবাদীদের। ১৯১২ সালে Piltdown Man নামে ইংল্যান্ডের সাসেক্সে একটি জীবাশ্ম পাওয়া যায় মাটি খুঁড়ে। এটিকেও রাতারাতি 'বানর এবং মানুষের' মিসিং লিঙ্ক বলে চালিয়ে দেওয়া হয়। এটাকে তো ইংল্যান্ডের ন্যাশনাল জাদুঘরে প্রদর্শনীর জন্য রেখে দেওয়া হয়। বানর এবং মানুষের এই মিসিং লিঙ্ক দেখতে হাজার হাজার দর্শনার্থী আসতো।

.

কিন্তু ১৯৫৩ সালে কার্বণ টেষ্ট করে প্রমাণ করা হয় যে, এটি মোটেও কোন মিসিং লিঙ্ক নয়। এটাকে কয়েকশো বিলিয়ন বছর আগের বলে চালিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।গবেষণায় দেখা যায়, এই খুলিটি মাত্র ৬০০ বছর আগের আর এর মাড়ির দাঁতগুলো ওরাং ওটাং নামের অন্য প্রাণীর। রাতারাতি বিবর্তন মহলে শোক নেমে আসে।

.

বুঝতে পারছিস রূপম, বিবর্তনবাদকে জোর করে প্রমাণ করার জন্য কতোরকম জালিয়াতির আশ্রয় নেওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে? একটা ভূয়া জিনিসকে কিভাবে বছরের পর বছর ধরে প্রমাণ হিসেবে গিলানো হয়েছে?

.

নেট ঘাঁটলে এরকম জোঁড়াতালি দেওয়া অনেক মিসিং লিঙ্কের খবর তুই এখনো পাবি। মোদ্দাকথা, এই নাস্তিকতা, এই বিবর্তনবাদ টিকে আছে কেবল পশ্চিমা বস্তুবাদীদের ক্ষমতা আর টাকার জোরে।

.

এই বিবর্তনবাদই তাদের সর্বশেষ সম্বল ধর্মকে বাতিল করে দেওয়ার। তাই এটাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য, দাঁড় করানোর জন্য, মানুষকে গিলানোর জন্য তাদের যা যা করতে হয় তারা করবে। যতো জালিয়াতির আশ্রয় নিতে হয় তারা নিবে।

.

এরপরও কি বলবি তোর নাস্তিকতা সাঁধু? সৎ? প্রতারণাবিহীন নির্ভেজাল জিনিস?

.

রূপম কিছু না বলে চুপ করে আছে। হাসনাত বলে উঠলো, 'ইশ! এতক্ষণ তো নাস্তিকতাকে নির্ভেজাল, সৎ, সাঁধু, কোন দুই নাম্বারি নেই, কোন ফ্রডবাজি নেই বলে লেকচার দিচ্ছিলি। এখন কিছু বল?'

.

এশা'র আজান পড়লো। আমরা নামাজে যাওয়ার জন্য উঠে দাঁড়ালাম।আমাদের সাথে রাকিব আর হাসনাতও আছে। অল্প একটু পথ হাঁটার পরে আমি হঠাৎ থেমে গেলাম। সাজিদ বললো, 'তোর আবার কি হলো রে?'
আমি রাগি রাগি চেহারায়, বড় বড় চোখ করে বললাম, 'তুই ব্যাটা হাসনাতকে তখন ওইভাবে ঝাঁড়ি দিয়েছিলি কেনো?'

.

সাজিদ হাসনাতের দিকে তাকালো। মুচকি হেসে বললো, 'শেক্সপীয়র বলেছেন - 'Sometimes I have to be cruel just to be kind'.....

আমরা সবাই হা হা হা করে হেসে ফেললাম।

(এখানে আরো কিছু এড করা যেতো। যেমন- কৃত্রিম প্রাণ তৈরির ঘটনা, এপেন্ডিক্সের মতো আরো কিছু অঙ্গ যেমন - ককিক্স ইত্যাদি। লেখাটির বেশি দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে বলে তা করা হয়নি।)

তথ্যসুত্রঃ

Junk DNA এর রেফারেন্স-

১/ Report of 'The Guardian'- Breakthrough study overturns theory of 'junk DNA' in genome (5 September 2012)

2/ Report Of 'New York Times'- Bits of Mystery DNA, Far From 'Junk,' Play Crucial Role (5 September 2012)

3/ Report Of 'Evolutionnews'- Junk No More: ENCODE Project Nature Paper Finds "Biochemical Functions for 80% of the Genome" (September 05, 2012)

'এপেন্ডিক্স' এর রেফারেন্সঃ-

4/ Report Of 'Science Daily'- Immune cells make appendix 'silent hero' of digestive health (November 30, 2015)

5/ Report Of 'Science Daily'- Appendix Isn't Useless At All: It's A Safe House For Good Bacteria (October 08, 2007)

6/ Report Of 'Fox News'- Appendix May Produce Good Bacteria, Researchers Think (October 05, 2007)

মিসিং লিঙ্ক 'Ida' এর রেফারেন্সঃ-

7/ Report Of 'Daily Mail'- Missing link? Ida was not even a close relative say fossil experts (October 22, 2009)

8/ Report Of 'Ideacenter'- The Rise and Fall of Missing Link Superstar "Ida"

জালিয়াতিপূর্ণ ফসিল 'Piltdown Man' এর রেফারেন্সঃ-

9/ Report Of 'Science Mag'- Study reveals culprit behind Piltdown Man, one of science's most famous hoaxes (August 09, 2016)

10/ Report Of 'Live Science'- Piltdown Man: Infamous Fake Fossil (September 30, 2016)

৪৩

মুখোশ উন্মোচন -২ [পর্দার বিধান এবং তথাকথিত পশ্চিমা নারী স্বাধীনতা]

-উৎস: লস্ট মডেস্টি ব্লগ

নাস্তিক-মুক্তমনা-মুশরিক এবং পশ্চিমা ইসলামবিদ্বেষীদের একটা প্রিয় টপিক হল ইসলামের পর্দার বিধান। ইসলামে শালীনতা বজায় রাখার জন্য যেসব বিধিবিধান দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে বিদেশে থেকে ব্লগ লিখে কিংবা নানা ভিডিও আপলোড করে ইসলাম নিয়ে কটূক্তি করা লোকদের মাথাব্যাথার সীমা নেই। ইসলাম নারীদের প্রতি অবিচার করেছে, তাদের বন্দী করেছে এমন নানা কথা বলতে বলতে তারা আক্ষরিক অর্থেই মুখে ফেনা তুলে ফেলে। এছাড়া টিভিতে টকশো করে পর্দার বিধানকে মধ্যযুগীয় বিধান, আরবের কালচার, ধর্মান্ধতা বলার মতো প্রগতিশীল-সুশীলদেরও কোন অভাব হয় না।

.

এরা সবাই নারী স্বাধীনতা এবং নারী অধিকার নিশ্চিত ও সংরক্ষন করার মডেল হিসেবে আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতাকে উপস্থাপন করে। পশ্চিমা সভ্যতার অধঃপতনের ধারা যখন আদনান কবির থেকে ঐশীদের কাছ পর্যন্ত পৌছে যায় তখনো এই বুদ্ধিব্যবসায়ীগুলো দশক দশক আগে পাঠচক্রে মুখস্থ করা কথাগুলোই উগড়ে দিতে থাকে।

.

একটা কথা এদের মুখে খুব শোনা যায় -

.

"""উপমহাদেশে মেয়েরা শালীন পোশাক পরে চলাফেরা করলেও রাস্তাঘাটে ইভটিজিং, হয়রানির শিকার হতে হয়; অথচ পশ্চিমা দেশে মেয়েরা কত খোলামেলা পোশাকে দিব্যি একা একা চলাফেরা করে কোন সমস্যা ছাড়াই। নিশ্চয়ই সমস্যা শুধু আমাদের সমাজের লোকজনেরই, পশ্চিমা দেশগুলো নারীদের জন্য কতই না নিরাপদ, নারীরা

.

এমন অনেকেরই ধারণা, ইউরোপ, আমেরিকা নারীদের স্বাধীন চলাফেরার স্বর্গরাজ্য। মেইনস্ট্রিম মিডিয়া তাদের সমাজকে সকলের সামনে যেভাবে তুলে ধরে তাতে অবশ্য খালি চোখে দেখলে এরকম ধারণা হওয়াটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিশ্বাস করা কষ্টকর হলেও সত্যি, বাস্তব চিত্র এর বিপরীত। পশ্চিমা দেশে নারীরা ঘরে-বাইরে, পথে-ঘাটে পুরুষদের দ্বারা প্রতিনিয়ত যেভাবে যৌন নিপীড়নের শিকার হয় তা আমাদের সমাজের অবস্থার চেয়ে ভালো কিছু তো নয়ই, বরং ক্ষেত্রবিশেষে আরো তীব্র পর্যায়ের।

.

আর পর্ন ইন্ডাস্ট্রির সূতিকাগার যে সমাজে তারা নারীকে সম্মানের চোখে দেখে নিরাপদ থাকতে দেবে এ আশা করাও তো অবাস্তব। যারা পর্নোগ্রাফিতে নারীকে ভোগ্যবস্তু বানিয়ে পশুর মত ব্যবহার করে, সেসব পুরুষরা রাস্তাঘাটে পরিচিত বা অপরিচিত যেকোন নারীকে দেখে চাইলেও পারে না তাদেরকে স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে সম্মানের চোখে দেখতে। ফলস্বরূপ সেসব দেশে নারীরা রাস্তায়, জনসমাগমপূর্ণ স্থানে, পার্কে, গণপরিবহনে, সবখানে হয়ে চলেছেন চরমভাবে নির্যাতনের শিকার যা খবরের আড়ালেই থেকে যাচ্ছে।

.

আমাদের এই সিরিজের এ পর্বে আমরা তুলে ধরার চেষ্টা করব পাশ্চাত্য সমাজে ঘরের বাইরে নারীদের চলাফেরার ক্ষেত্রে নিরাপত্তার প্রকৃত চিত্র, যা তথাকথিত মূলধারার মিডিয়া কখনোই আপনাদের কাছে প্রকাশ করবে না।

প্যারিসের গনপরিবহণ গুলোতে ভ্রমণ করার সময় শতকরা একশজন নারীই যৌন নিপীড়নের শিকার হন.
সূত্র- টেলিগ্রাফ [http://bit.ly/1b6GAme]

একটি নতুন গবেষণায় দেখা গেছে যে, লন্ডনের প্রায় অর্ধেক তরুণী জনসমক্ষে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। অনেককে এমনকি বাসে এবং ট্রেনেও নির্যাতন সহ্য করতে হয়েছে। End Violence Against Women (EVAW) নামে একটি সংস্থার একটি রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, ৩৪ বছরের নিচে ৪১ শতাংশ মহিলাকেই রাস্তায় যৌন হয়রানির শিকার হয়ে হয়েছে। এর মধ্যে ২১ শতাংশ বলেছেন যে, তাদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য ও অংগভংগি করা হয়েছে এবং ৪ শতাংশ বলেছেন তাদের শরীরে হাত দেওয়া হয়েছে।

.

যারা গণপরিবহনে যাতায়াত করেন তাদের ক্ষেত্রে সংখ্যাটা আরো ভয়াবহ। ১০৪৭ জনের মধ্যে চালানো একটি জরিপের মধ্যে এক তৃতীয়াংশই বলেছে যে তাদের উদ্দেশ্যে অশ্লীল মন্তব্য করা হয়েছে। ৫ শতাংশ বলেছেন বাসে এবং ট্রেনে তাদের শরীরে হাত দেওয়া হয়েছে। এই বিস্ময়কর তথ্য প্রকাশের ফলে স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ এবং জাতীয় সরকার যৌন হয়রানির প্রতি আরো কঠোর মনোভাব দেখানোর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে শুরু করেছে। বিগত বছরগুলো ধরে অনেক ওয়েবসাইট এবং সামাজিক সংগঠনগুলো মেয়েদেরকে উৎসাহিত করে যাচ্ছে তাদের সাথে ঘটা ঘটনাগুলো পুলিশে রিপোর্ট করতে এবং তারা পুলিশকে অপরাধীকে ধরার জন্য আরো প্রচেষ্টা চালানোর জন্য চাপ দিয়ে যাচ্ছে।

.

এ তো জানা গেল কিছু পরিসংখ্যাগত তথ্য। এখন কয়েকজন ভুক্তভোগীর ভাষ্য শোনা যাক যারা এধরণের নিপীড়নের শিকার হয়েছেন।

.

একজন ভুক্তভোগী রোজি ওয়েইড(২০) পেশায় একজন সংগীতশিল্পী। বসবাস করেন পুর্ব লন্ডনে। “লন্ডনে আসার পরে আমাকে অনেকবার হয়রানির শিকার হতে হয়েছে। আমাকে তিনবার আক্রমণ করা হয়েছে। আমাকে ঘরে বা ট্রেনে অনুসরণ করা হয়েছে। আমাকে পাতালরেলে আক্রমণও করা হয়েছে একবার।” রোজি তার এক দিনের তিক্ত অভিজ্ঞতার কথা বর্ণনা দেন এভাবে –

.

“কিছুদিন আগে আমি আক্রান্ত হই লিভারপুল স্ট্রিট স্টেশনে। আমার বাসায় আসতে আসতে রাত হয়ে গিয়েছিল। মোটামুটি ১১ টা ৩০ বাজে। আমি একটি ক্যাশ পয়েন্ট ব্যবহার করছিলাম। হঠাৎ এক লোক এগিয়ে আসে। তারা আমাকে জিজ্ঞেস করে, ‘তোমার নাম কি?’ আমি ক্যাশ পয়েন্টটি থেকে টাকা তুলতে যাই কিন্তু সেটা ছিল আউট অফ অর্ডার। আমি সেখান থেকে সরে আসি। কিন্তু সে আমাকে অনুসরণ করতেই থাকে। আশেপাশে অনেক মানুষও ছিল। এই অবস্থায় আমি পরিষ্কার করে জানিয়ে দেই যে, আমি তার সাথে কথা বলতে ইচ্ছুক না। সে এরপরেও আমাকে অনুসরণ করতে থাকে। সে তার হাত দিয়ে আমাকে জড়িয়ে ধরে। সে ‘তোমার কি বয়ফ্রেন্ড আছে’ ‘আমার বাসায় আসতে চাও’ এইরকম নানা কথা জিজ্ঞেস করতে থাকে। আমি ধীরে ধীরে আক্রমণাত্মক হয়ে উঠি। এক পর্যায়ে সে আমার চুল ধরে টান দেয়। আমি চিৎকার করে উঠি।”

.

আরেক ভুক্তভোগী এক্সটারনিবাসী নাটালি জানান, “আমি কয়েকজন বন্ধুর সাথে শুক্রবার কাজ শেষে একটি ক্যাশপয়েন্টের লাইনে দাড়িয়েছিলাম। আমি ছিলাম শহরের ব্যস্ত একটি এলাকায়। রাতটি অনেক ঠান্ডা ছিল তাই আমি একটি গরম কোট গায়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ পাঁচজন লোক জগিং করতে করতে আসছিল। তাদের একজন আমার পিছনে হাত দিয়ে জোরে চাপ দিল। এত তাড়াতাড়ি ঘটনাটা ঘটে গেল যে আমি দেখতেই পারিনি তাদের মধ্যে কোনজন এই কাজটি করেছে। আমার তখন নিজেকে অনেক ক্ষুব্ধ আর দুর্বল মনে হচ্ছিল।”

.

উত্যক্তকারীরা আক্রমন করলে আপনি যদি তাদেরকে থামতে বলেন তো পরিস্থিতি খুব শীঘ্রই উত্তপ্ত হয়ে উঠে-এক ভুক্তভোগীর মন্তব্য ছিল এমন। “আমরা রাস্তার মুল সড়কে ছিলাম। আমি যখন ছোট একটা রাস্তায় উঠলাম তারা আমাকে তিনটা রাস্তা পর্যন্ত অনুসরণ করতে থাকে। আমি তাদের পিছে ফেলার জন্য দৌড়াতে থাকি। তারা চিৎকার করে নানারকম অশ্লীল কথা বলতে

থাকে আমাকে লক্ষ্য করে। আমি খুবই আতংকে ছিলাম।”

.

‘সাউথ লন্ডন রেপ ক্রাইসিস’ থেকে ফিওনা এলভিনস জানান, রাস্তায় কোনপ্রকার যৌন হয়রানির শিকার হননি এমন মহিলার সাক্ষাত পাওয়া এখন রীতিমত সৌভাগ্যের ব্যাপার। মহিলারা প্রত্যেকদিনই হয়রানি থেকে বাঁচতে তাদের নিজের রুটিন, সিদ্ধান্ত ইত্যাদি পরিবর্তন করেন। কিন্তু এটা তাদের আত্মবিশ্বাসে অনেক নেতিবাচক প্রভাব ফেলেই চলেছে। জানা যায় শুধুমাত্র গত বছরেই লন্ডন পুলিশের কাছে ৪৫০০০টি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স আর ৩০০০ টি ধর্ষনের ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে!

.

“বাস/ট্রেনের সীটে কিংবা স্টপেজে আপনি কাউকে না কাউকে দেখতে পাবেন যে আপনার উদ্দেশ্যে বাজে মন্তব্য করার জন্য অপেক্ষা করছে।” মিস গ্রীন একটি ঘটনার কথা বর্ণনা করেন। এই ঘটনাটা বার্মন্ডসিতে ঘটেছিল। তাকে দুইজন একটি সাদা ভ্যানে অনুসরণ করছিল যখন তিনি সাইকেল চালাচ্ছিলেন। “তারা আমার উদ্দেশ্যে এমন কথা বলেছিল যে, আমি অতিষ্ঠ হয়ে যাই।” ইউগভ সার্ভে-তে অনেক মহিলা জানিয়েছেন তারা গণপরিবহন ব্যবহারে অনিরাপত্তায় ভোগেন। কেউ কেউ জানিয়েছেন তাদেরকে গন্তব্যের অনেক আগেই ট্রেন থেকে নামতে হয়েছে অথবা বগি পরিবর্তন করতে হয়েছে উত্যক্তকারীর হাত থেকে বাঁচার জন্য। “আমি রাতে যদি একা বাসায় যাই তো অনেক আতংকে থাকি। আমি প্রায়ই ট্রেনের বগি পরিবর্তন করি অথবা বাস পরিবর্তন করি।”এমনটাই ছিল ইউগভ সার্ভে-তে মন্তব্যকারীর মতামত।

.

“দোতলা বাসে চলার সময়ে উপরের তলায় কিছু আপত্তিকর ঘটনা ঘটেছে। বিশেষ করে রাতের বেলা আমি উপরে থাকতে নিরাপদ বোধ করি না। ড্রাইভারের কাছে বসাটাই আমার জন্য নিরাপদ মনে হয়।”

.

যৌন নিপীড়নের শিকার ভিকি সিমিস্টার(২৭) একটি সামাজিক সংগঠন গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নেন। ২০১০ সালে তিনি কিছু লোকের দ্বারা উত্তর লন্ডনের ম্যানর হাউস আন্ডারগ্রাউন্ড স্টেশনে আক্রান্ত হন। এরপরে তিনি ইউকে এ্যান্টি স্ট্রিট হ্যারাসমেন্ট ক্যাম্পেইন নামে সংগঠনটি গড়ে তুলেন। তিনি বলেন, “আমি রাস্তা দিয়ে হাটছিলাম। তখন একটা গাড়িতে করে কিছু মানুষ আমার পাশে ব্রেক করে। তখন অন্ধকার হয়ে আসছিল। তারা আমাকে লক্ষ্য করে আমার পোশাক নিয়ে মন্তব্য করতে পারে।” “তারা গাড়ির গতি কমিয়ে আমি টিউব স্টেশনে যাওয়া পর্যন্ত আমাকে অনুসরণ করতে থাকে। প্রায় পনের মিনিট সময় ধরে এই ঘটনা ঘটে।” “আমি অনেক আঘাত পেয়েছিলাম। আমি তাদের বলেছিলাম আমাকে বিরক্ত না করতে।” “তারা আমাকে স্টেশন পর্যন্ত অনুসরণ করে। তারা আমাকে দেয়ালের সাথে ঠেসে ধরে। আমাকে আশেপাশের মানুষের সাহায্য খুবই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।”

.

এরকম ঘটনার উদাহরন অসংখ্য। যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে অভিযোগ ও সচেতনতামূলক ওয়েবসাইট গুলোতে প্রতি মাসে হাজার হাজার হিট আসে। তারা তাদের সাথে নিত্যদিন ঘটে যাওয়া অপ্রীতিকর ঘটনাগুলো সেখানে শেয়ার করেন। বয়স ১৩ হোক বা ৭০; তারা সকলেই জানতে চান কেন তাদের এসব পরিস্থিতির শিকার হতে হচ্ছে।

.

এখন মনে কৌতুহল জাগতে পারে, পাশ্চাত্যে নারীরা যদি এতই অনিরাপদ হন তাহলে তা আমাদের কান পর্যন্ত আসে না কেন? কেন আমাদের সমাজে মেয়েদের নিরাপত্তার অবস্থা আর তাদের সমাজে মেয়েদের নিরাপত্তার অবস্থাকে কাছাকাছি বলে ধরে নেওয়া হয় না? এর কারণ, পশ্চিমা সমাজের একটা বড় অংশ অশ্লীল মন্তব্য বা অংগভংগি করাকে সাধারণভাবে মেয়েদের ‘আকৃষ্ট করার প্রচেষ্টা’র থেকে বেশি কিছু মনেই করে না। একারণে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে তাদের গড়ে তোলা সামাজিক আন্দোলনগুলোও তেমন পাত্তা পাচ্ছে না। বরং কেউ মুখ খুললে বলা হয় সে বাড়াবাড়ি করছে। আবার সব নারীরা একে খুব একটা ‘হয়রানি’ ভাবেনও না, এমন কেউ কেউ আছেন যারা রাস্তায় কেউ তাদেরকে উদ্দেশ্য করে কোন আপত্তিকর মন্তব্য করলে এটা উপভোগ করেন! ভাবেন তার রূপের প্রশংসা করা হচ্ছে বা খানিকটা ‘harmless flirting’(!) হচ্ছে। তবে এদের সংখ্যা

উল্লেখযোগ্য হলেও এরা অধিকাংশ নন।

.

আমেরিকা, ইউরোপের মিডিয়া নিজেদের দেশের নারীদের নিরাপত্তা ও স্বাধীনতার এই রূপ কখনো উল্লেখ করে না, বরঞ্চ নারী স্বাধীনতার মডেল হিসেবে নিজেদের তুলে ধরে। নিজেদের দেশের নারীদের নিরাপত্তার এমন দশা অথচ অন্য দেশের নারীদের স্বাধীনতার জন্য তাদের হইচইয়ের শেষ নেই।

#ডাবলস্ট্যান্ডার্ড

তথ্যসূত্রঃ

১) *http://www.dailymail.co.uk/.../Sexual-harassment-40-young-wom...*

২) *http://www.theguardian.com/.../four-10-women-sexually-harassed*

৩) *http://www.independent.co.uk/.../catcalls-whistles-groping-th...*

৪৪

রাসূল (ﷺ) ও আয়েশা (রাঃ) কে নিয়ে যত মিথ্যাচার – ১

-শিহাব আহমেদ তুহিন

মক্কার লোকগুলো প্রচন্ড অতিষ্ঠ। আব্দুল্লাহর ছেলে মুহাম্মদ ﷺ কি এক নতুন ধর্ম নিয়ে এসেছে, বলছে সব দেব-দেবী ছেড়ে এক আল্লাহর ইবাদত করতে। শত অত্যাচার করেও তাঁকে একটুও দমানো গেল না। কুরাইশরা তখন একটা মাষ্টারপ্ল্যান হাতে নিল। তারা ভেবে দেখল, সাধারণত সম্পদ,নারী আর রাজত্ব-এই তিনটি বিষয়ের জন্যই মানুষ এতো হাঙ্গামা করে পৃথিবীতে। তাই কুরাইশদের প্রতিনিধি হয়ে উতবাহ ইবনে রাবীআহ মুহাম্মদ ﷺ কে বললঃ

.

"যদি তুমি তোমার দারিদ্র্যের কারণে এমনটা করছ, আমাদের বল তাহলে।আমরা টাকা তুলে তোমাকে সমগ্র কুরাইশদের মধ্যে সবচেয়ে ধনী বানিয়ে দিব। যদি তুমি রাজত্ব চাও, আমরা তোমাকে আমাদের রাজা বানিয়ে দিব। যদি তুমি নারী চাও, কুরাইশদের মধ্যে যাকে খুশী পছন্দ কর। আমরা দশজন নারীকে তোমার হাতে তুলে দিব।"

.

বর্তমান ইসলাম বিদ্বেষী প্রচারণার একটা অন্যতম মুখ্য হাতিয়ার রাসূল ﷺ কে নারী লোভী হিসেবে উপস্থাপন করা। কারণ, তার ঘোর বিরুদ্ধচারীরাও জানে মুহম্মদ ﷺ এর সম্পদের প্রতি কোন আসক্তি ছিল না। মৃত্যুর সময় তিনি একটা দিরহাম ও রেখে যাননি[১]। রাসূল ﷺ যদি সত্যিই নারীলোভী হতেন তবে কুরাইশের সেরা সেরা দশ নারীকে বিয়ে করার জন্য এর চেয়ে মোক্ষম সুযোগ আর ছিল না। কিন্তু তিনি এই সুযোগ গ্রহণ করেননি।

.

মক্কার মুশরিকরা তাঁকে পাগল বলেছে, বলেছে জাদুকর। কিন্তু কখনোই নারীলোভী কিংবা শিশুকামী বলেনি। কারণ, তারা তাঁকে ছোট থেকে বড় হতে দেখেছে। যখন তাদের সংস্কৃতিতে অবৈধ যৌনাচার একদম স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল তখনো তিনি কোন নারীর নিকট কখনো গমন করেননি। মক্কার সবচেয়ে সুদর্শন পুরষ হয়েও মাত্র ২৫ বছর বয়সে বিয়ে করেন ৪০ বছর বয়সী খাদিজা(রাঃ) কে। খাদিজা(রাঃ) এর মৃত্যু পর্যন্ত তার সাথে ঘর করেছেন একটানা ২৫ বছর। এরপর বিয়ে করেন পঞ্চাশ বছর বয়সী সওদা(রাঃ) কে। তারপর আল্লাহর নির্দেশেই বিয়ে করেন ছয় বছর বয়সী আয়েশা(রাঃ) কে। তারপরেও তার ঘোর শত্রুরা তাঁকে কখনো নারীলোভী কিংবা শিশুকামী বলেনি। আর তার শত্রুরা হয়তো ভুলেও কল্পনা করেনি যে, প্রায় চৌদ্দশ বছর পর তাদেরই মত কিছু ইসলামের শত্রুরা এটা নিয়ে এতো জল ঘোলা করবে।

.

সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে, কিছু তথাকথিত মুসলিমরা বলার চেষ্টা করে যে, রাসূল ﷺ আয়েশা(রাঃ) কে বিয়ে করে ঠিক কাজ করেননি। এই হাদীসটি লক্ষ্য করুন-

.

আয়েশা (রাঃ) নিজেই বর্ণনা করে গিয়েছেন রাসূল ﷺ বলেছেন-"তোমাকে বিয়ে করার আগে আমাকে ২ বার স্বপ্ন দেখান হয়েছিল। আমি দেখেছি একজন ফেরেশতা তোমাকে এক টুকরো রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে আসছেন। আমি বললাম- আপনি নিকাব উন্মোচন করুন! যখন তিনি নিকাব উন্মোচন করলেন তখন আমি দেখতে পেলাম যে ঐ মহিলা তুমিই। আমি তখন বললাম –এটি যদি আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন। তারপর আবার আমাকে দেখানো হলো যে, একজন ফেরেশতা তোমাকে এক টুকরো রেশমি কাপড়ে জড়িয়ে আমার কাছে নিয়ে আসছেন। আমি বললাম- আপনি নিকাব উন্মোচন করুন! যখন তিনি নিকাব উন্মোচন করলেন তখন আমি দেখতে পেলাম যে ঐ মহিলা তুমিই। আমি তখন বললাম –এটি যদি আল্লাহর তরফ থেকে হয়ে থাকে তাহলে তিনি তা অবশ্যই বাস্তবায়ন করবেন।[২]

.

আমরা জানি নবীদের স্বপ্ন হচ্ছে ওহীর মত। তাই আল্লাহতায়ালাই এই বিয়ে ঘটিয়েছিলেন। তাই এই বিয়ের পেছনে অবশ্যই একটা হিকমাহ ছিল। এরপরেও কোন মুসলিম যদি এই বিয়ে নিয়ে আপত্তি তুলেন তবে অবশ্যই ঈমান হারা হবেন। রাসূল ﷺ কে নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষীদের একটি প্রধান অভিযোগ হলোঃ

.

"মুহাম্মদ ﷺ pedophile বা শিশুকামী ছিলেন"

.

যারা pedophilia তে ভোগেন তাদের IQ লেভেল এবং স্মৃতিশক্তি অনেক কম থাকে[৩]। যিনি পুরো কুরআন মুখস্থ বলে যেতে পারতেন তাঁকে আমরা অবশ্যই স্মৃতিশক্তির দোষে দুষ্ট বলতে পারি না। আর মেধার প্রয়োগ এবং সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তিনি যে জিনিয়াস ছিলেন তা পাশ্চাত্যের অনেক লেখকই স্বীকার করেছেন[৪][৫]। Pedophilia তে আক্রান্ত ব্যক্তিরা প্রধান যেসব উপসর্গে ভোগেন তার কোনটাই তার মধ্যে প্রকট ছিল না। আসুন দেখি উইকিপিডিয়াতে pedophilia এর সংজ্ঞা হিসেবে কি বলা হয়েছেঃ

.

“Pedophilia or paedophilia is a psychiatric disorder in which an adult or older adolescent experiences a primary or exclusive sexual attraction to prepubescent children. the manual defines it as a paraphilia involving intense and recurrent sexual urges towards and fantasies about prepubescent children.” [৬]

.

এখানে pubescent বা বয়ঃপ্রাপ্তির বিষয়টা বোঝা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, ভৌগলিক অবস্থা বিবেচনায় একেক অঞ্চলের মেয়েরা একেকসময় বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। যেমনঃ মরুভূমি অঞ্চলের মেয়েরা শীতপ্রধান অঞ্চলের মেয়েদের চেয়ে দ্রুত বয়ঃপ্রাপ্ত হয়। মরুভূমির মেয়েরা যেখানে ১০ বছর বয়সে বয়ঃপ্রাপ্তি লাভ করে সেখানে অনেক শীতপ্রধান অঞ্চলের মেয়েরা ১৩-১৫ বছর হয়ে গেলেও বয়ঃপ্রাপ্ত হয় না।

.

ফ্রেঞ্চ ফিলোসফার Montesqueu তার ‘Spirit of Laws’ বইটিতে[৭] উল্লেখ করেছেন, উষ্ণ অঞ্চলে মেয়েরা ৮-৯-১০ বছর বয়সেই বিয়ের উপযুক্ত হয়ে যায়। বিশ বছর বয়সে তাদেরকে বিয়ের জন্য বৃদ্ধ ভাবা হয়। ‘Spirit of Laws’ বইটি আমেরিকার সংবিধান তৈরীতে ব্যবহৃত হয়েছে। নীচের তালিকাটি [৮] ভালোভাবে লক্ষ্য করুন [দেখুন চিত্র ১] - তালিকাটাতে তিনটা ভিন্ন শতকে মেয়েদের বিয়ের জন্য অনুমোদিত বয়স কত ছিল সেটা উল্লেখ করা হয়েছেঃ

.

ভালোভাবে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাব, ১৮৮০ সালের দিকে অধিকাংশ জায়গায় বিয়ের জন্য অনুমোদিত বয়স ছিল ১০-১২ এর মধ্যে। আমরা যদি ইতিহাসে আরো পেছনে যেতে পারি তাহলে আরো কম বয়স লক্ষ্য করতে পারব। আবার যত সামনে আগাব লক্ষ্য করলে দেখা যাবে অনুমোদিত বয়সের সীমা ক্রমাগত বাড়ছে। এর পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হলো মানুষের দৃষ্টিভংগীর পরিবর্তন।

.

Pedophilia এর সংজ্ঞায় আরো গুরুত্বপূর্ণ দিক উল্লেখ করা হয়েছে- “intense and recurrent sexual urges towards and fantasies about prepubescent children”। অর্থাৎ, একজন pedophile বয়ঃপ্রাপ্ত হয়নি এমন শিশুদের প্রতি বারবার প্রবল আকর্ষণ বোধ করে। মুহম্মদ ﷺ কি এমন কিছু প্রদর্শন করেছিলেন? তিনি কি বাছাই করে শুধু শিশুদের বিয়ে করেছিলেন? নিচের তালিকাটি লক্ষ্য করুন [দেখুন চিত্রঃ২]। এখানে আমি মুহাম্মদ ﷺ এর বিভিন্ন বিয়ের সময় তাঁর স্ত্রীদের বয়স উল্লেখ করেছিঃ

.

অর্থাৎ, তাঁর স্ত্রীদের যখন বিয়ে করেছিলেন তাদের মধ্যে ৯০ ভাগেরই বয়স ছিল ১৭ কিংবা তার চেয়েও বেশী। একমাত্র আয়েশা(রাঃ) এর বয়স ছিল দশের নীচে। যারা আয়েশা(রাঃ) এর বয়স দেখে খুশিতে-“Yes, we got it. All moslems are pedophile” বলে চিৎকার করে উঠেন তারা অবশ্য খাদিজা(রাঃ), উম্মে হাবীবাহ(রাঃ) ও সওদা(রাঃ) এর বয়স দেখলে যথাক্রমে বোবা, বধির ও অন্ধ হয়ে যান।

.

ইন শা আল্লাহ চলবে

তথ্যসূত্রঃ

[১] সিরাতুর রাসূল-মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃষ্ঠা-৭৪৮

[২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৪১৮

[৩] Cantor JM, Blanchard R, Christensen BK, Dickey R, Klassen PE, Beckstead AL, Blak T, Kuban ME (2004). "Intelligence, memory, and handedness in pedophilia". Neuropsychology 18 (1): 3–14.

[৪] Michael Hart in 'The 100, A Ranking of the Most Influential Persons In History,' New York, 1978.

[৫] Sir George Bernard Shaw in 'The Genuine Islam,' Vol. 1, No. 8, 1936.

[৬] "Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Edition". American Psychiatric Publishing. 2013

[৭] Montesqueu-The spirit of Laws- Book-16,page 264

[৮] http://chnm.gmu.edu/cyh/primary-sources/24

৪৫

রাসূল (ﷺ) ও আয়েশা (রাঃ) কে নিয়ে যত মিথ্যাচার – ২

-শিহাব আহমেদ তুহিন

[আগের পর্বের জন্য দেখুন – (সত্যকথন) ৪৪]

.

"তারপরেও ছয় বছর বয়স স্বামী সংসারের জন্য উপযুক্ত না"

.

যারা ৬ বছর বয়সে আয়েশা(রাঃ) এর বিয়ে নিয়ে আপত্তি তুলেন তারা অবশ্য ইতিহাসের একটা সত্য এড়িয়ে যান। সেটা হচ্ছে রাসূল ﷺ এর পূর্বেই আয়েশা(রাঃ) জুবাইর ইবনে মুতিম এর সাথে engaged ছিলেন। পরবর্তীতে, আবুবকর(রাঃ) ইসলাম গ্রহণ করলে এ বিয়ে ভেংগে যায়। এ থেকে আমরা বুঝতে পারি, সে সময় এই বয়সেই বিয়ে করা আরবে একেবারেই স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল। পরবর্তীতে আল্লাহর নির্দেশে মুহাম্মদ ﷺ তাঁকে বিয়ে করেন। ৬ বছর স্বামী সংসারের জন্য উপযুক্ত নয় বলেই তিনি ৯ বছর বয়সে স্বামীগৃহে উঠেন।

.

Pedophile রা যেমন শিশুদের পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠে, মুহাম্মদ ﷺ কখনোই এমন কিছু প্রদর্শন করেননি। তাই ৯ বছর বয়সে আয়েশা(রাঃ) উপযুক্ত হলে আয়েশা(রাঃ) এর পরিবারই তাকে স্বপ্রণোদিত স্বামীগৃহে উঠিয়ে দেন[১]। আজ থেকে ২০০ বছর আগে মেয়েরা ১০ বছর বয়সে বিয়ের জন্য উপযুক্ত হলে তা মেনে নিতে যদি আমাদের আপত্তি না থাকে তাহলে ১৪০০ বছর আগে একজন নারীর নয় বছর বয়সে সংসার করা নিয়ে অভিযোগ তোলা কি ডাবল- স্ট্যাণ্ডার্ড এর মাঝে পড়েনা?

.

কমনসেন্স,পরিসংখ্যান আর বিজ্ঞান এই তিনটাই সাক্ষ্য দেয় যে, স্বামীগৃহে উঠার সময় আয়েশা(রাঃ) “Pre-pubescent” স্টেজে ছিলেন না। যারা এমনটা বলেন তারা অবশ্যই মিথ্যাচার করেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, ১৯০৫ সালের আগ পর্যন্ত মুহাম্মদ ﷺ এর সাথে আয়েশা(রাঃ) এর বিয়ে কোন ইশ্যুই ছিল না। ১৯০৫ সালে জোনাথন ব্রাউন সর্বপ্রথম এটা নিয়ে জল ঘোলা করেন। কারণ, এর আগে এটা সবার কাছে একদম স্বাভাবিক ব্যাপার ছিল।

.

যাদের এরপরেও ব্যাপারটা হজম করতে কষ্ট হয় তাদের ছোট্ট একটা এক্সপেরিমেন্ট করতে বলব। আপনার দাদী কিংবা নানী বেঁচে থাকলে তাদের জিজ্ঞেস করুন তাদের কত বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, সম্ভব হলে তাদের কাছ থেকে জেনে নিন আপনার বড়-দাদী এবং বড়-নানীর বিয়ে কত বছর বয়সে হয়েছিল। দেখবেন বয়সটা ৯-১৫ এর বেশী না। এখন পারবেন কি নিজেদের পূর্বপুরুষদের শিশুকামী বলতে? আল্লাহ-তায়ালা এভাবেই মানুষের মিথ্যাগুলোকে মানুষের দিকেই ফিরিয়ে দেন।

.

এবার সভ্য দেশগুলোর দিকে তাকাই। মেক্সিকোতে ছেলে মেয়ের দৈহিক সম্পর্কের জন্য এই আধুনিক সময়ে নূন্যতম বয়স মাত্র ১৩। খোদ ইউ.এস স্টেটে মেয়েদের বিয়ের বয়সের ভিন্নতা আছে। যেমনঃNew Hampshire এ বয়স ১৩, New York এ ১8, South Carlonia তে বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে ১৫। আপনি কোন বয়সটাকে সঠিক বলবেন?

.

তবে এটা ঠিক যে, অপরিপক্ক বয়সে বিয়ে হলে, মেয়েরা আত্নগ্লানিতে ভোগেন এবং স্বামীর প্রতি এতোটা অনুরক্ত হন না। আয়েশা(রাঃ) এর সাথে কি এমনটা হয়েছিল?

.

.

"কেমন ছিল আয়েশা(রাঃ) ও রাসূল ﷺ এর দাম্পত্য জীবন?"

.

মহানবী রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্তরে আয়েশা রাদিআল্লাহ আনহার যে মহত্ব ও মর্যাদা ছিল, তা অন্য কোন স্ত্রীর জন্য ছিল না। তার প্রতি এ ভালবাসা তিনি কারো থেকে গোপন পর্যন্ত করতে পারেননি, তিনি তাকে এমন ভালবাসতেন যে, আয়েশা (রাঃ) যেখান থেকে পানি পান করতেন, তিনিও সেখান থেকে পানি পান করতেন, আয়েশা (রাঃ) যেখান থেকে খেতেন, তিনিও সেখান থেকে খেতেন।

.

অষ্টম হিজরিতে ইসলাম গ্রহণকারী আমর ইবনুল আস (রাঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করেন : "হে আল্লাহর রাসূল, আপনার নিকট সবচেয়ে প্রিয় কে ?" তিনি বললেন : "আয়েশা"। আমর (রাঃ) জিজ্ঞাসা করলেন : পুরুষদের থেকে ? তিনি বললেন : "তার পিতা"। {বুখারি ও মুসলিম}

.

রাসূলুল্লাহ ﷺ তার সাথে খেলা-ধুলা, হাসি-ঠাট্টা ইত্যাদিতে অংশ গ্রহণ করতেন। কোন এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতায়ও অংশ নেন।

.

আয়েশা (রাঃ) আরো বর্ণনা করেন, যার দ্বারা তার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্নেহ, মমতার প্রকাশ পায়।তিনি বলেন : "আল্লাহর শপথ, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ দেখেছি, তিনি আমার ঘরের দরজায় দাঁড়াতেন, হাবশিরা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলা-ধুলা করত, আর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে তার চাদর দিয়ে ঢেকে নিতেন, যেন আমি তাদের খেলা উপভোগ করি তার কাঁধ ও কানের মধ্য দিয়ে। অতঃপর তিনি আমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতেন, যতক্ষণ না আমিই প্রস্থান করতাম"। {আহমদ}

.

তার প্রতি রাসূলুল্লাহ ﷺ ভালোবাসার আরেকটি আলামত হচ্ছে, মৃত্যু শয্যায় তিনি আয়েশার নিকট থাকার জন্য অন্যান্য স্ত্রীদের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছেন, যেন আয়েশা (রাঃ) তাকে সেবা শুশ্রূষা প্রদান করেন।

.

"আয়েশা(রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ﷺ আমাকে বলেন : তুমি কখন আমার উপর সন্তুষ্ট থাক আর কখন রাগ কর আমি তা বুঝতে পারি। তিনি বলেন, আমি বললাম : কিভাবে আপনি তা বুঝেন ? তিনি বললেন : তুমি যখন আমার উপর সন্তুষ্ট থাক, তখন বল, এমন নয়- মুহাম্মদের রবের কসম, আর যখন আমার উপর রাগ কর, তখন বল, এমন নয়- ইবরাহিমের রবের কসম। তিনি বলেন, আমি বললাম : অবশ্যই হে আল্লাহর রাসূল, তবে আমি শুধু আপনার নামটাই ত্যাগ করি"। {মুসলিম}

.

আয়েশা(রাঃ) রাসূল ﷺএর প্রতি এতোটা আত্নসম্মান বোধ করতেন যে তিনি মুহাম্মদ ﷺ কে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন, "কেন আমার মত একজন নারী, আপনার মত একজন পুরুষকে নিয়ে আত্মসম্মান বোধ করবে না ?" {মুসলিম}

.

এরপরেও যারা এই বিয়ে নিয়ে জলঘোলা করে তাদের বলব, "If Ayesha (R) was happy and satisfied with her marriage, who are you to point your finger at her marriage?"

.

.

"বিয়ের পেছনে হিকমাহ"

.

মুহাম্মদ ﷺ ও আয়েশা(রাঃ) এর বিয়ের কারণে মুসলিম উম্মাহ নানাদিক থেকে লাভবান হয়েছিল। আয়েশা(রাঃ) মুহাম্মদ ﷺ এর

স্ত্রীদের মধ্যে থেকে সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনা করেছিলেন।[২] [চিত্র ১]

.

সবচেয়ে বেশী হাদীস বর্ণনাকারীদের মাঝে তিনি ছিলেন চতুর্থ। আবু হুরাইরা,আবদুল্লাহ ইবনে উমার এবং আনাস ইবনে মালিকের পরেই তার অবস্থান। তিনি যেসব বিষয়ে হাদীস বর্ণনা করেছিলেন তা যদি তিনি বর্ণনা না করতেন তাহলে ইসলামী শরীয়তের একটা বড় অংশ অপূর্ণ থেকে যেত।

.

হাদীস এবং তাফসীরের এমন কোন বই নেই যাতে, আয়েশা(রাঃ) নামটি জ্বলজ্বল করে না।

.

রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর লম্বা একটা সময় তাঁর জ্ঞান আয়েশা(রাঃ) সাহাবী ও তাবেয়ীদের মাঝে ছড়িয়ে দিতে পেরেছিলেন। ইবনে হাজার আসকালানী(রহঃ) এজন্য বলেছিলেন, " মহিলাদের মধ্যে আয়েশা(রাঃ) ছিলেন ইসলামের সবচেয়ে বড় আলেম।" [৩]

.

উরওয়া বিন জুবায়ের বলেছেন-" আমি কখনও কাউকে পাই নাই যিনি কুরআন ও হালাল এবং হারামের আদেশ নিষেধ, ইলমুল আনসাব বা নসব-শাস্ত্র এবং আরবি কবিতায় আয়েশা (রাঃ) এর চেয়ে বেশি জানতেন। সেই কারণে অনেক বয়োজৈষ্ঠ সাহাবিয়ে কেরামগণ জটিল কোন বিষয় নিরসনে আয়েশা(রাঃ) এর সাহায্য গ্রহণ করতেন। [৪]

.

আবার মক্কার মুশরিক কুরাইশদের কাছে ফিরে যাই। নানাভাবে মুহাম্মদ ﷺ কে প্রলোভন দেখিয়েও তারা মুহাম্মদ ﷺ এর সাথে কোন সমঝোতা করতে পারেনি। মুহাম্মদ ﷺ যদি নারীলোভী হতেন তবে তখনকার পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে আরবের সবচেয়ে সুন্দরী নারীদের বিয়ে করতে পারতেন, শিশুকামী হলে পারতেন বেছে বেছে শিশুদের ভোগ করতে। তিনি তার কিছুই করেননি। কারণ, তাঁর মিশন ছিল সত্যের পথে আজন্ম সংগ্রামের। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মানুষকে 'সৃষ্টির দাসত্ব থেকে স্রষ্টার দাসত্ব' এর দিকে নিয়ে যাওয়া। তাই তো সত্য প্রচারের জন্য অনমনীয় থেকে তিনি বলেছিলেন-

.

"আমার এক হাতে সূর্য আরেক হাতে চন্দ্র এনে দিলেও আমার ধর্ম থেকে আমি বিরত হব না। হয় আল্লাহ আমাকে জয়ী করবেন, নতুবা আমি শেষ হয়ে যাব। কিন্তু এ কর্তব্য থেকে বিচ্যুত হব না।" [৫]

তথ্যসূত্রঃ

[১] সহীহ মুসলিম, কিতাবুল নিকাহ

[২] সিরাতুর রাসূল-মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, পৃষ্ঠা- ৭৬৮

[৩] Young Ayesha-Anwar Al Awlaki

[৪] ইবনে কাইয়্যুম ও ইবনে সা'দ কর্তৃক জালা-উল- আফহাম খন্ড ২, পৃষ্ঠা-২৬

[৫] সীরাতে ইবনে হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৩১৪

৪৬
পশ্চিমা বিশ্ব এবং মুসলিম বিশ্বে তাদের অন্ধ অনুসারীরা ইসলামকে আক্রমণ করার সময় যে সব আর্গুমেন্ট ব্যবহার করে

-আসিফ আদনান

পশ্চিমা বিশ্ব এবং মুসলিম বিশ্বে তাদের অন্ধ অনুসারীরা ইসলামকে আক্রমণ করার সময় কয়েকটা ধরাবাঁধা আর্গুমেন্ট ব্যবহার করে। এগুলোর বেশীরভাগই হল প্রাচ্যবিদ বা ওরিয়েন্টালিস্টদের দ্বারা ব্যবহৃত নানা বস্তাপচা যুক্তি, যেগুলোকে বাস্তবতা বিবর্জিত এবং তথ্যগত ভাবে ভুল। যুক্তিগত বা নৈতিক উৎকর্ষ না, ফ্যাকচুয়াল অ্যাকিউরিসি না, এই আর্গুমেন্টগুলোর মূল চালিক শক্তি হল এগুলোর ইনবিল্ট ইসলামবিদ্বেষ।

.

দুঃখজনক ভাবে আমাদের সমাজে এরকম মানুষের অভাব নেই যারা হাসি মুখে এবং খুশি মনে পশ্চিমা বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক গোলামীকে মেনে নিয়েছেন। পশ্চিমাদের যেকোন দাবি তারা বিনাবাক্য ব্যয়ে মেনে নিতে রাজি। এই কারণে আর্গুমেন্টগুলোর প্রচার আমাদের শিক্ষিত সমাজের মধ্যেও বেশ ভালো মতোই হয়েছে।

.

ইসলামবিদ্বেষীদের এরকম একটি আর্গুমেন্ট হল মরাল সুপিরিওরিটি-র আর্গুমেন্ট। পশ্চিমা উদারনৈতিক চিন্তাধারা [Liberalism] এবং সেক্যুলারিসমকে নৈতিকভাবে ইসলামের চাইতে শ্রেষ্ঠতর দাবি করা। লিবারেলিসম আর সেক্যুলারিসমের এথিকাল সিস্টেমকে ইসলামের দেয়া নৈতিক ব্যবস্থার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর দাবি করা।

.

ইসলামবিদ্বেষীরা দুই ভাবে এই দাবির পক্ষে যুক্তি দেয়ার চেস্টা করে। প্রথমত তারা ইসলামকে আক্রমণ করে। "ইসলাম নারী স্বাধীনতা দেয় না, ইসলাম চোরের হাত কাটতে বলে, ইসলাম অমানবিক, ইসলাম বর্বর, ইসলাম চারটা বিয়ের অনুমতি দিয়েছে, ইসলামে বাক স্বাধীনতা নেই, ইসলামের জিহাদের কথা আছে..." এরকম বিভিন্ন কথা বলে। এটা হল নৈতিক ভাবে ইসলাম অধম এটা প্রমাণ করার জন্য চেস্টা।

.

দ্বিতীয়ত, তারা বিভিন্ন ভাবে প্রমাণ করার চেস্টা করে কেন তাদের দর্শন এবং নৈতিক চিন্তাধারা উন্নততর। তারা কত নৈতিক, তারা কত উদার, তারা নীতির প্রশ্নে কতোটা আপোষহীন, তারা মানবাধিকারে কত বিশ্বাসী, মানবতার ধারকবাহক – এসব ব্যাপারে বিভিন্ন দাবি করে।

.

আমরা সবাই এদুটো অ্যাপ্রোচের সাথেই পরিচিত। আমরা সবাই কমবেশী এই আর্গুমেন্টগুলো শুনেছি। অনেকে হয়তো কিছুটা প্রভাবিতও হয়েছি। কিন্তু বাস্তবতা কি আসলে পশ্চিমাদের, এবং তাদের বাদামী চামড়ার অন্ধ অনুসারীদের এই বক্তব্যগুলোকে সমর্থন করে?

.

কোন জাতি বা সভ্যতা কতোটা নৈতিক এটা পরিমাপ করার একটা ভালো উপায় হল সেই জাতি বা সভ্যতা তার অধিনস্ত এবং দুর্বলদের সাথে কি রকম আচরণ করে সেটা লক্ষ্য করা। যাদের উপর তারা কতৃত্ব অর্জন করেছে তাঁদের সাথে কি রকম আচরণ করে সেটা থেকে কোন জাতি আসলেই কতোটা নৈতিক সেটা আপনি বুঝতে পারবেন। প্রয়োজনের তাগিদে কেউ তার নৈতিকতা কতোটা কম্প্রোমাইয করে সেখান থেকেও আপনি একটা ধারনা পাবেন।

নিচের লিঙ্কটি হচ্ছে ২০ শে সেপটেম্বর, ২০১৫ তে নিউইয়র্ক টাইমস পত্রিকায় প্রকাশিত একটি আর্টিকেলের।

.

http://tinyurl.com/psqpqqd

.

লিঙ্ক থেকে আপনারা সম্পূর্ণ আর্টিকেল পড়তে পারবেন, আমি এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে মূল বিষয়টা বলছি। যেকোন দেশে আগ্রাসন চালানোর সময় আগ্রাসী ভিনদেশী সেনাদল কিছু স্থানীয় লোককে ব্যবহার করে। তারা এসব কোলাবরেটরদের মিত্র বা অ্যালাই বলে থাকে। আফগানিস্তানের মুসলিম তথা তালিবানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অ্যামিরিকানরাও কিছু স্থানীয় দালালদের ব্যবহার করছে। অ্যামিরিকার এসব মিত্রদের অনেকেরই হবি হচ্ছে ধর্ষণ । বিশেষ করে কমবয়েসী ছেলেদের ধর্ষণ করা। অ্যামিরিকানদের এই মিত্রদের কম্যান্ডাররা কমবয়েসী শিশু এবং কিশোরদের নিজেদের যৌনদাস হিসেবে ব্যবহার করতো। তাঁদেরকে ২৪ ঘন্টা বিছানার সাথে শেকল দিয়ে বেধে রাখা হতো আর রাতে ধর্ষণ করা হতো। এবং এই কাজগুলো হতো অ্যামিরিকানদের বেইসের ভেতরে।

.

অর্থাৎ অ্যামিরিকানদের সেনাঘাটিতে, অ্যামিরিকানদের মিত্ররা, অ্যামেরিকানদের উপস্থিতিতে শিশুদের ধর্ষণ করতো। শুধু তাই না, অ্যামিরিকান সেনাবাহিনী এই বিকৃতকাম, ধর্ষক ও সমকামিদের বিভিন্ন গ্রামের নেতৃত্বের পদে বসাতো। তাই এটা বলা অনুচিত হবে না যে, এই শিশু কিশোরদের উপর নির্যাতনের জন্য অ্যামেরিকা দায়ী। এরকম একটি মেরিন বেইসে কিছু কিশোর মুক্ত হবার চেস্টা করার সময় একজন অ্যামেরিকান সেনাকে গুলি করে হত্যা করে। ঐ সেনা মারা যাবার প্রেক্ষিতেই নিউইয়র্ক টাইমসের এই আর্টিকেলটি লেখা। এমন না যে তারা মুসলিম শিশুদের অধিকার নিয়ে উদ্বিগ্ন হয়ে আর্টিকেলটি লিখেছে।

.

অনেকে মনে করতে পারেন এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা। দেখা যাক অ্যামেরিকানরা অন্য যে দেশটিতে আগ্রাসন চালিয়েছে সেখানে কি অবস্থা। ইরাকে অ্যামেরিকান আগ্রাসন চলাকালীন সময়ে কুখ্যাত আবু গ্রাইব কারাগারে অ্যামেরিকানর বন্দীদের উপর ভয়ঙ্কর নির্যাতন চালানো হয়। যা সে সময় বিশ্ব মিডিয়াতে ব্যাপকভাবে সমালোচিত হয়। কিন্তু যা মূল ধারার মিডিয়াতে আলোচিত হয় নি সেটা হল অ্যামেরিকান সেনারা আবু গ্রাইব কারাগারে শুধু মুসলিম নারীদেরকেই ধর্ষণ করে নি, বরং তাঁদের সামনে তাঁদের ছোট ছেলেদের ধর্ষণ করেছে এবং সেটার ভিডিও করেছে। লা হাওলা ওয়ালা কু'আতা ইল্লাহ বিল্লাহ। আল্লাহ আমাদের অক্ষমতা ক্ষমা করুন।

.

http://tinyurl.com/otfeory

http://tinyurl.com/qyqrjh

এ ব্যাপারে পুলিৎযার জয়ী সাংবাদিক সিমোর হারশ এর বক্তব্যঃ http://tinyurl.com/nnhh59u

.

এমনকি হতে পারে এটা শুধু অ্যামেরিকানরা করছে, অথবা এটা শুধু ইরাক এবং আফগানিস্তানেই ঘটেছে? আচ্ছা আমরা একটু অন্যদিকে তাকাই।

.

জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা বাহিনী এমন একটি সেনবাহিনী যা পরিচালিত জাতিসংঘের আদর্শ অনুযায়ী। যেমন সোভিয়েত আর্মির পেছনে চালিকা শক্তি ছিল সোশ্যালিসম, যা ছিল তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শ। তেমনিভাবে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বাহিনীর চালিকা শক্তি হল জাতিসংঘের আদর্শ – সেক্যুলার হিউম্যানিসম বা "ধর্ম নিরপেক্ষ মানবতাবাদ"।

জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা বাহিনির সদস্যরা সেক্যুলার হিউম্যানিসমের মহাম আদর্শে উজ্জীবিত হয়ে যেসব অঞ্চলে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য গেছেন সেখানে ধর্ষণের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে এসেছেন। মালি, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, কঙ্গো বিভিন্ন জায়গায় এই

শান্তিরক্ষীরা এই কাজ করেছে। হাইতিতে প্রায় এক দশক ধরে এই ধর্ষণ চলছে।

.

http://tinyurl.com/kq3zytd http://tinyurl.com/nqthgh9http://tinyurl.com/ndahex4 http://tinyurl.com/q72ojgb
[এব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন #সত্যকথন_৩৮]

.

এই ধর্ষণের স্বীকার শুধু নারীরা না। প্রতিটি ক্ষেত্রে শিশুদের ধর্ষণ করা হয়েছে। একটু প্যাটার্নটা লক্ষ্য করুন। প্রতিটি ক্ষেত্রে ভিকটিম হলেন যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে নারী, শিশু এবং বন্দীরা। প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা দাবি করেছে তারা এসব দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যাচ্ছে, গণতন্ত্র আনার জন্য যাচ্ছে, মানবাধিকারের জন্য যাচ্ছে। অর্থাৎ এই মহান আদর্শগুলো দ্বারা বলীয়ান সেনারা সবচেয়ে দুর্বল মানুষগুলোকে তাঁদের সবচাইতে দুর্বল সময়ে আক্রমণ করেছে। এবং মানবতা, শান্তি, গন্ততন্ত্র এই আদর্শগুলো তাঁদের এই পৈশাচিকতা, এই প্রিডেটরি বিহেইভিয়ারকে থামাতে পারে নি।

.

সবচাইতে ভয়ঙ্কর ব্যাপার হল তারা তো এসব ঘটনা চেপে রাখার চেস্টা করেছেই, কিন্তু প্রকাশিত হবার পরও তারা এই ব্যাপারে কোন ব্যবস্থা নিতে ইচ্ছুক না। তারা কিন্তু বুক ফুলিয়ে বলে বেড়ায় তাদের সেনাবাহিনী কত নৈতিক, কত মানবতাবাদী। মুসলিমরা জঙ্গী আর তারা মানবতাবাদী। অথচ তাদের সেনাবাহিনী, তাদের আদর্শের ধারকরাই, আফগানিস্তান ও ইরাকে তেজস্ক্রিয় অস্ত্র ব্যবহার করে, ওয়াইট ফসফরাস ব্যবহার করে, শিশুদের ধর্ষণ করে, নারীদের ধর্ষণ করে সেটার ভিডিও করে, নিজেরা নিজেদের ধর্ষণ করে, ড্রোন হামলা করে নিয়মিত শিশু হত্যা করে, ঘন জনবসতি পূর্ণ এলাকায় নির্বিচারে বম্বিং করে।

.

এতো কিছু করার পরও তারা মানবিক। তারা মানবতাবাদী তারা মহান, আর মুসলিমরা বিশ্বাস করে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর বিরুদ্ধে কটুক্তিকারীর শাস্তি মৃত্যুদন্ড, তালিবান মনে করে চুরির শাস্তি হাত কাঁটা, আমরা মনে করি শারীয়াহ মানবজাতির একমাত্র সংবিধান – এজন্য আমরা বর্বর, মধ্যযুগীয়, জঙ্গি!

.

পশ্চিমা ওরিয়েন্টালিস্ট, ইসলামবিদ্বেষী এবং তাদের বাদামী চামড়ার সন্তানরা আমাদের খুব করে বোঝানোর চেস্টা করেন ইসলামকে মানুষকে বন্দী করে, অসম্মানিত করে, অধিকার কেড়ে নেয় আর পশ্চিমাদের আদর্শগুলো মানুষকে সম্মানিত করে। বাস্তবতা হল পশ্চিমাদের আদর্শ মানুষ চরমভাবে অসম্মান করে এবং তাঁকে পশুর চেয়েও নিকৃষ্ট পর্যায়ে নামিয়ে আনে। এসব আদর্শ পুরুষকে লম্পট এবং নারীকে পণ্যে পরিণত করে।

.

এই আদর্শগুলো মানুষকে “অধিকার, মানবতা, স্বাধীনতা"-র মতো কিছু সুন্দর সুন্দর শব্দ শুনিয়ে অন্ধ ও বধির বানিয়ে রাখে। দোলনা থেকে কবর পর্যন্ত অর্থ-সম্পদ-নারীর পেছনে ছুটে চলা এক ঘোরগ্রস্থ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করে। এই আদর্শগুলো ন্যায়বিচার দেয় না, সুশাসন দেয় না, নৈতিক উৎকর্ষতা আনে না বরং উল্টোটা করে। এই আদর্শ এমন কিছু মানুষ তৈরি করে যারা মুখে মানবতা আর মানবাধিকারের কথা বলে, কিন্তু কাজের মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে। তাদের বর্বরতা অনেক ক্ষেত্রেই তাদের ক্রুসেইডার পূর্বপুরুষদের হিংস্র পাশবিকতাকেও ছাড়িয়ে যায়।

.

অন্যদিকে ইসলাম প্রকৃত ভাবে মানুষকে মুক্ত করে। ন্যায়বিচার নিশ্চিত করে। স্বচ্ছতা ও সুশাসন নিশ্চিত করে। নারীকে তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেয়, সুরক্ষিত রাখে এবং মানবচরিত্রের অন্ধকার দিকটিকে লাগাম দিয়ে রাখে। ইসলাম মানুষকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে আলোর দিকে আনে। সৃষ্টির উপাসনা থেকে মুক্ত করে মানুষকে এক আল্লাহ-র ইবাদাতে নিয়োজিত করে। অর্থ, সম্পদ, সম্মান, ক্ষমতার পেছনে ছোটার বদলে আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য মানুষকে প্রতিযোগিতা করতে শেখায়।

.

এ কারণে যেসব বিকৃতকাম, সমকামি, শিশুকামিদের অ্যামেরিকান সেনারা মিত্র হিসেবে গ্রহণ করে তালিবান তাদের খুঁজে বের করে হত্যা করে। অ্যামেরিকানরা যেখানে পপি চাষ থেকে অর্থ উপার্জন করে তালিবানের শাসনামলে সেই পপি চাষ নেমে আসে শুন্যের কোঠায়। অ্যামেরিকা তার তথাকথিত সুপিরিওর শাসন ব্যবস্থা দিয়ে প্রায় এক দশক চেস্টা করেও প্রহিবিশানের সময় মদ নিষিদ্ধ করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু তালিবান মাত্র কয়েক বছরে পপি চাষ বন্ধ করে ফেলে। ব্রিটীশরা মুসলিম নারীদের ধর্ষণ করে আর তালিবানের কাছে বন্দী ইয়োভন রিডলী ইসলাম গ্রহণ করে। এটা হল এক সুস্পষ্ট পার্থক্য এই দুই আদর্শের মধ্যে। নিশ্চয় এটা একটি সুস্পষ্ট পার্থক্য, এবং নিশ্চয় এর মাঝে প্রমাণ আছে তাঁদের জন্য যারা নিজেদের বিচার-বুদ্ধি-বিবেককে এখনো সম্পূর্ণভাবে পশ্চিমাদের কাছে বন্ধক দেননি।

.

বাহ্যিক চাকচিক্য, চটকদার কথা, মানবতা ও শান্তির রেটেরিক এবং পশ্চিমাদের বৈষয়িক, সামরিক ও প্রযুক্তিগত সাফল্যে আমরা বিভ্রান্ত হই। বিশেষ করে আমরা যারা সেক্যুলার শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হই তাঁদের মাথায় ছোটবেলা থেকেই গেঁথে দেয়া হয় যে সফলতার সংজ্ঞা হল পশ্চিমাদের মতো হওয়া। একই সাথে এই শিক্ষা ব্যবস্থা এবং সমাজ আমাদের শেখায় পশ্চিমাদের সব দাবিগুলোকে ধ্রুব বাস্তব সত্য হিসেবে মেনে নিতে। কোন অপ্রিয় প্রশ্ন উত্থাপন না করতে। আমরা পশ্চিমাদের বড় বড় স্কাইস্ক্রেইপার আর বিশাল অর্থনীতি দেখি, কিন্তু এগুলোর পেছনে ঔপনিবেশিক এবং নব্য-ঔপনিবেশিক লুটপাটের ভূমিকা দেখি না।

.

আমরা রেনেসন্স আর এনালাইটেনমেন্ট থেকে শেখার কথা বলি কিন্তু রেনেসন্স আর এনলাইটেমেন্ট মুসলিমদের কাছে কতোটা ঋণী সেটা জানার চেস্টা করি না। আমরা জেনেভা কনভেনশানের কথা বলি, কিন্তু জেনেভা কনভেনশানের প্রায় সাড়ে ১৩০০ বছর আগে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ যে মানবাধিকার এবং যুদ্ধবন্দীর অধিকারের ব্যাপারেয়া মানব ইতিহাসের সর্বোৎকৃষ্ট নীতিমালা প্রণয়ন করে গেছেন এটা নিয়ে বলতে সংকোচ বোধ করি। জন স্টুয়ারট মিল, বেন্থাম, লিঙ্কনম, প্লেইটো, মার্ক্স যেখানে এতো কারুকার্যময় ব্যাখ্যা দিয়েছেন এগুলোর মাঝে আল্লাহ-র দেয়া সরল ব্যাখ্যা, যা বেদুইন আর বিজ্ঞানী, সবার কাছেই বোধগম্য, আমাদের আকর্ষণ করে না।

.

আমাদের মধ্যে ইনফিরিওরিটি কমপ্লেক্স কাজ করে। আমরা নিজেদের ক্ষুদ্র, অপাংতেয় মনে করি। আমরা মনে করি আমাদের গুরুত্বপূর্ণ হবার উপায় হল পশ্চিমাদের অনুসরণ করা। আমাদের সফল হবার উপায় হল ফিরিঙ্গীদের মতো হবার চেস্টা করা। তাই আমাদের সমাজে পশ্চিমাদের অনেক বাদামী চামড়ার সন্তান আছেন যারা পশ্চিমাদের ইসলাম বিদ্বেষ অনুসরণ করাকে সভ্যতা, সাফল্য আর জ্ঞানের মাপকাঠি মনে করেন, এতে অবাক হবার কিছু নেই। এই মানুষগুলো পশ্চিমা বিশ্বকে প্রভু হিসেবে, পশ্চিমা আদর্শকে জীবনবিধান, দ্বীন, হিসেবে গ্রহন করেছে।

.

এই বাদামী ফিরিঙ্গী, নাস্তিক এবং কাফিরদের কথাবার্তা, প্রচার প্রচারণা এবং মিডিয়ার প্রভাবের কারণে অনেক সাধারণ মুসলিম প্রভাবিত হয়ে পড়েন। কিন্তু আপনি যদি অন্ধভাবে ওরিয়েন্টালিস্ট এবং তাদের গোলামদের বক্তব্য গ্রহণ না করে একটু খুঁটিয়ে দেখার চেস্টা করেন, তাহলে দেখবেন, মিথ্যা, প্রতারণা, অনৈতিকতা, পাশবিকতা, এবং পাপাচার কিভাবে এই সভ্যতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে মিশে আছে, দেখবেন কিভাবে অন্ধকার এই সভ্যতাকে ঘিরে রেখেছে। আমি এখানে তাদের সেনাদের আচরণের মাধ্যমে মাত্র একটি উদাহরণ দিয়েছি, এরকম অসংখ্য উদাহরণ আছে। আপনি যদি একটু চিন্তা করেন তাহলে এই বুলি সর্বস্ব আদর্শের অন্তঃসারহীনতা আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে পড়বে।

.

এরা যেসব আদর্শের ক্যানভাসিং করছে এগুলো গত দুইশ বছরে হত্যা, লুটপাট, ধর্ষণ আর নোংরামি ছাড়া পৃথিবীকে কিছু দিতে পারে নি। যেখানে ইসলামের সত্যতার সাক্ষ্য দিচ্ছে ১৩০০ বছরের খিলাফাহ-র ইতিহাস। ১৩০০ বছর ধরে শারীয়াহ এর

আলোকে ইসলাম দ্বারা ব্যক্তি, সমাজ ও রাস্ট্রের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। কারো যদি আসলেই প্রশ্ন জাগে কোন আদর্শ মানব জীবনের সমাধান দেয়ার ব্যাপারে সফল, তাহলে সে ইতিহাস দেখে নিক। ইতিহাস সাক্ষ্য দেবে, ইসলামই প্রথম মানবাধিকার নিশ্চিত করেছে, ইসলাম নারীকে সম্মান এবং স্বাধীনতা দিয়েছে, ইসলাম ন্যায়বিচার নিশ্চিত করেছে, ইসলাম প্রথম ওয়েলফেয়ার স্টেইটের ধারণা এনেছে এবং বাস্তবায়ন করেছে, ইসলাম রাস্ট্রীয় ভাবে জ্ঞানবিজ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। ইসলাম মানবজাতিকে সর্বোত্তম আদর্শ দিয়েছে। ইসলামই একমাত্র ব্যবস্থা যা মানবজীবনের সমস্যার সফলতার সাথে সমাধান করেছে, বহিঃশত্রুর মোকাবেলা করে টিকে থেকেছে, নিজ আদর্শের বিস্তার করেছে। ইসলাম এই কাজগুলো বাস্তবে করেছে।

.

ইসলাম পশ্চিমাদের আদর্শের মতো কথায় সীমাবদ্ধ না। ইসলাম কাজের মাধ্যমে তাঁর আদর্শিক উৎকর্ষ প্রমাণ করেছে। পশ্চিমা চিন্তাধারা জীবনবিধানের ব্যাপারে অনেকগুলো মডেল দিয়েছে কিন্তু কোনটাই বাস্তব সমাধান তো দেয়-ই নি বরং নতুন সমস্যা সৃষ্টি করেছে। আর ইসলাম একটি মডেল দিয়েছে এবং ১৩০০ বছর ধরে সেই মডেলের বাস্তবায়নের মাধ্যমে মানব জাতির সমস্যার সমাধান দিয়েছে। একজন চিন্তাশীল ব্যক্তির জন্য প্রমাণ হিসেবে এটুকুই যথেস্ট। এবং ইন শা আল্লাহ, ইসলামী খিলাফাহ আবারো প্রতিষ্ঠিত হবে, আল্লাহ-র মাটিতে আল্লাহ- র শারীয়াহ আবারো কায়েম হবে। আমরা সমর্থন করি আর না করি এটা আল্লাহ-র প্রতিশ্রুতি যা হবেই।

.

যে বিষয়টা নিয়ে আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে হবে তা হল আমরা নিজেদের কিভাবে দেখতে চাই। আমরা কি নিজেদের সম্মানিত অবস্থায় দেখতে চাই, আমরা কি মাথা তুলে মর্যাদা এবং গর্বের সাথে বাঁচতে চাই? নাকি আমরা চাই পশ্চিমা দাসত্ব মেনে নেয়ার মাধ্যমে অপমান আর অন্ধ অণুসরণের এক জীবন?

.

আল্লাহ রাব্বুল ইযযাহ আমাদের ইসলামের মাধ্যমে সম্মানিত করেছেনঃ

.

"তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে..." [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১১০]

.

তাই আমাদের সম্মান ইসলামেই নিহিত। আমাদের জন্য আল্লাহ ইসলামকে মনোনীত করেছেন, তাই আর যা কিছুরই অনুসরণ আমরা করি না কেন আমরা কখনোই সফল হতে পারবো না।

.

"নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য দ্বীন একমাত্র ইসলাম... " [সূরা আলে ইমরান, আয়াত ১৯]

.

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেনঃ তোমরা যখন ধারে ক্রয়-বিক্রয় করবে, গাভীর লেজ ধরে থাকবে, কৃষি কর্মে লিপ্ত হয়ে পড়বে এবং জিহাদ ছেড়ে দিবে, তখন আল্লাহ্ তোমাদের উপর অপমান চাপিয়ে দেবেন এবং তা তোমরা হটাতে পারবে না, যতক্ষন না তোমরা নিজের দ্বীনের দিকে ফিরে আস।(আহমদ, আবু দাউদ, আল হাকিম)

.

আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল আমাদের সবাইকে বোঝার তাউফিক্ব দান করুন, আমিন।

৪৭

মুখোশ উন্মোচন - ৩ [পশ্চিমা সমাজের মরিচিকাঃ তথাকথিত নারী স্বাধীনতার নামে নারীদের ভোগ করা]

-উৎস: লস্ট মডেস্টি ব্লগ

[আগের পর্বগুলোর জন্য দেখুন (সত্যকথন) ৪৩ এবং (সত্যকথন)৩৯]

.

নাস্তিক-ইসলামবিদ্বেষীরা যে পশ্চিমা নারী অধিকার ও নারী স্বাধীনতার কল্পকথা শুনিয়ে ইসলামকে আক্রমন করে, মধ্যযুগীয় ও বর্বর বলে, ইসলাম নারীকে অসম্মানিত করেছে এমন দাবি করে, আসুন দেখা যাক সেই পশ্চিমের শিক্ষিত, স্বাধীন, অধিকারপ্রাপ্ত নারীদের আসলে কিসের মুখোমুখি হতে হয়। আসুন দেখি সভ্য পশ্চিম স্বাধীন নারীদের সাথে ঠিক কিভাবে আচরণ করতে শেখায়।

.

২০১৩ সালের আগস্ট । ইউ.এস. এ. । ১৯ বছরের সারা (ছদ্মনাম) খুব খুশি । তার এতদিনের স্বপ্ন পূরন হতে চলেছে । অনেক চেষ্টার পর সে সুযোগ পেয়েছে ইউনিভার্সিটিতে পড়ার । অবশেষে এসেছে সেই মুহূর্ত। ক্যাম্পাসের দ্বিতীয় রাতে তার সব ক্লাসমেটেরা পার্টী করছিল ভার্সিটিতে ভর্তির আনন্দে । সারাও ছিল সেখানে ।

.

রাত প্রায় ১ টার দিকে তার এক পুরুষ ক্লাসমেটের সঙ্গে তার দেখা হয়ে গেল। এই ছেলেটাকে সে আগে কখনো দেখেনি তবে মাঝে মাঝে অনলাইনে কথা হয়েছে । কিছুক্ষন গল্প গুজব করার পর ঐ ছেলেটা তাকে বলল, "চল কিছু ড্রিংক করা যাক I মাথা নেড়ে সায় জানালো সারা – ভালো বলেছ । আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে । ছেলেটা সারার গ্লাসে ড্রিংকস ঢেলে দিল । সারা চুমুক দিল গ্লাসে । তারপর তার আর কিছুই মনে নেয় ।

.

নয় ঘন্টা পর যখন তার জ্ঞান ফিরল সে নিজেকে আবিষ্কার করল অপরিচিত এক রুমের বিছানায় । মাথাটা ঝিম ঝিম করছিল, গায়ে একটা সুতা পর্যন্তও নেই, চুলগুলো এলোমেলো । বিছানার পাশে চেয়ারে বসে আছে একটা ছেলে – এই ছেলেটায় গতকাল রাতে তার গ্লাসে মদ ঢেলে দিয়েছিল মনে পড়লো তার । স্থানীয় একটা হাসপাতালে মেডিক্যাল চেকআপের রিপোর্ট থেকে নিশ্চিত হওয়া গেল সারাকে ধর্ষণ করা হয়েছে । সারা অবশ্য আগে থেকেই এমনটা অনুমান করেছিল ।

.

খুবই দুঃখের বিষয় ইউরোপ আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে এরকম ঘটনা খুবই কমন । ধর্ষণ আমেরিকার শিক্ষার্থীদের কাছে ডালভাতের মতোই সাধারণ ঘটনা । এই দেশের কলেজ ইউনিভার্সিটিগুলো পৃথিবীর গতিপথ পাল্টে দেওয়া মানুষ তৈরি করছে সত্য , কিন্তু সেই সাথে তৈরি করছে অনেক ধর্ষক। আমেরিকার স্কুল , কলেজ , ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাস গুলোই নারীদের জন্য বিশ্বের সবচেয়ে অনিরাপদ ক্যাম্পাস ।

.

কিছু পরিসংখ্যান সাহায্য করবে অবস্থার ভয়াবহতা বুঝতে –

.

এমন ছয়লাখ তিয়াত্তর হাজার শিক্ষার্থী যারা এ মুহূর্তে আমেরিকার কলেজ এবং ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করছেন তাঁরা জীবনে অন্তত একবার ধর্ষণের শিকার হয়েছেন । (২০০৭ সালের জরিপ)

.

প্রতি ২১ ঘন্টায় আমেরিকার কোন না কোন কলেজের ক্যাম্পাসে ধর্ষণের ঘটনা ঘটে

.

প্রতি ১২ জন কলেজেগামী পুরুষ শিক্ষার্থীর মধ্যে ১ জন ধর্ষণের সাথে জড়িত

.

ধর্ষিত হওয়া ৫৫ শতাংশই নারী সে সময় মাতাল ছিলেন । ৭৫ শতাংশ ধর্ষকেরাই ধর্ষণ করার সময় মাতাল ছিল বা তার অল্প কিছুক্ষন আগে ড্রাগস নিয়েছিল ।

.

ইংল্যান্ডের প্রতি তিনজন মহিলা শিক্ষার্থীর মধ্যে একজন তাঁর নিজ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই ধর্ষণের শিকার হয় (টেলিগ্রাফ)

.

আন্ডারগ্র্যাড লেভেলের অর্ধেক মহিলা শিক্ষার্থী জানিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই এমন কাউকে চিনেন যারা তাদের নিজেদের ক্যাম্পাসেই নিজেদের বন্ধুদের দ্বারা ধর্ষণের শিকার হয়েছে । (টেলিগ্রাফ)

.

"It is estimated that 1 in 5 women on college campuses has been sexually assaulted during their time there — 1 in 5." –President Obama, remarks at White House, Jan. 22, 2014

.

"We know the numbers: one in five of every one of those young women who is dropped off for that first day of school, before they finish school, will be assaulted, will be assaulted in her college years." –Vice President Biden, remarks on the release of a White House report on sexual assault, April 29, 2014 (Washington post)

.

এই রেপগুলোর পেছনের প্রভাবক হিসেবে কাজ করে অনেক গুলো বিষয়। তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ গুলো হল- পর্ণমুভি, মদ্যপান , গাঁজা, কোকেন এককথায় ড্রাগস , নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশ, নারীদের অভদ্র (indecent) পোশাক আশাক ।

.

ফার্স্ট ইয়ারের ফ্রেশ স্টুডেন্টদের জন্য ওরিয়েন্টশানের দিন থেকে শুরু করে থ্যাংকসগিভিংডে পর্যন্ত এই ছয় সপ্তাহ সবচেয়ে ভয়াবহ । এই সময় তারা সবচেয়ে বেশী ঝুঁকির মধ্যে থাকে যৌন নিপীড়নের । এই সময়টাতে নতুন পরিবেশের সাথে খাপ খাওয়ানোর জন্য তাদের সংগ্রাম করতে হয় । সেই সাথে সিনিয়রদের "দাদাগিরি" ফলানোতো আছেই ।

.

Association of American Universities এর নতুন প্রতিবেদন (৬) থেকে দেখা যায় গ্র্যাজুয়েশান কোর্স শেষ করার পূর্বে প্রতি চার জন্য নারীর মধ্যে একজন ধর্ষণের শিকার হন । এই প্রতিবেদনটি তৈরি করা হয়েছে গত বসন্তে ২৭ টি টপ ইউনিভার্সিটির প্রায় দেড়লাখ শিক্ষার্থীদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে । এই প্রতিবেদনে আমেরিকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে নারী নির্যাতনের যে চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে তা ২০১৪ সালের আগের প্রতিবেদন (1 in a 5 stats, এই প্রতিবেদন দেখেই ক্যাম্পাসে নারী শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার প্রশাসন গঠন করেছিল – white house task force to protect students from sexual assault) থেকে অনেক ভয়াবহ . White house task force এর প্রথম রিপোর্টে (not alone) অবশ্য বলা হয়েছিল প্রতি চার জন নারী শিক্ষার্থীর মধ্যে তিন জন ক্যাম্পাসে থাকাকালীন যৌন নির্যাতনের শিকার হন ।

.

প্রায় ৮৪ শতাংশ ক্ষেত্রে ধর্ষক ভিক্টিমের পরিচিত থাকে । বেশীর ভাগক্ষেত্রেই ধর্ষণের ঘটনা ঘটায় ভিক্টিমের বন্ধু, ক্লাসমেট , এক্স- বয়ফ্রেন্ড অথবা পরিচিত অন্য কেউ । প্রতিবেদনে আরো দেখা যায় – ধর্ষণের সময় অধিকাংশ ভিক্টিম স্বাভাবিক সচেতন

অবস্থায় ছিলেন না – তারা হয় মাতাল ছিলেন বা কোন হার্ড ড্রাগস নিয়েছিলেন অথবা কোন ভাবে হুঁশ হারিয়ে ফেলেছিলেন ।

.

.

সারা তার ধর্ষকের বিরুদ্ধে কোন চার্জ আনেননি এবং জনসম্মুখে প্রকাশও করেননি ঠিক কে তাকে ধর্ষণ করেছিল । আমেরিকাতে ধর্ষণের ঘটনা চেপে যাওয়া অস্বাভাবিক কিছু না । American Civil Liberties Union এর রিপোর্ট অনুযায়ী ৯৫ শতাংশ ধর্ষণের ঘটনাই আনরিপোর্টেড থেকে যায় । এক্সপার্টদের মতে এর কারন হতে পারে ভিক্টিমের মানসম্মান হারানোর ভয়, ধর্ষকদের বিচার না করা বা তাদের প্রতি সমাজের সহানুভূতি । ধর্ষণের ঘটনা রিপোর্ট করা হলেও , বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই ধর্ষকের গায়ে ফুলের টোকাটা পর্যন্ত পড়ে না আইনী এবং প্রশাসনিক জটিলতার কারণে । বোঝেন আমেরিকার এই সমাজ কতটা পচে গেছে ।

.

অবস্থা এতটাই ভয়াবহ যে খোদ আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে হস্তক্ষেপ করতে হচ্ছে । অবস্থা সামাল দিতে হিমশিম খাচ্ছে তার প্রশাসন । হিলারী ক্লিনটন ক্যাম্পেইন করছেন , সরকারের তরফ থেকে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে । তবে সেগুলো খুব একটা ফলপ্রসু হচ্ছে না কলেজ, ইউনিভার্সিটির কর্তৃপক্ষের অসহযোগিতার কারণে । u.s. senate subcommittee on financial & contracting oversight স্বীকার করেছে ৪৪০টি কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি স্যাম্পলের মধ্যে ৪০ শতাংশেরও বেশী কলেজ এবং ইউনিভার্সিটি গত ৫ বছরে একটা যৌন নিপীড়নের ঘটনার তদন্তও ভালোমতো করেনি । বেশীরভাগ কলেজ , ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ চাচ্ছে না তাদের ক্যাম্পাসে ঘটা নারী নির্যাতনের ঘটনা গুলো বের হয়ে আসুক ।

.

কে আর নিজেদের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন করতে চায় ? কেই বা চাইবে নিজেদের গোমর ফাঁস করে দিয়ে সরকার বা কোন দাতব্য সংস্থার ফান্ডিং হারাতে । বাধ্য হয়ে সারা'র মতো শিক্ষার্থীরা নিজেদের মতো চেষ্টা করছেন ক্যাম্পাসে নারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য । বিভিন্ন সোসাইটি বা মুভমেন্টের মাধ্যমে তারা চেষ্টা করছেন ধর্ষণের বিরুদ্ধে সবাইকে এক প্লাটফর্মে নিয়ে আসার ।

.

সুবহানআল্লাহ! উপরে যতই মহান , সভ্য , উদার , মানবিক বলে মনে হোক না কেন এই হল পাশ্চাত্যের বস্তুবাদী সভ্যতার আসল চেহারা । স্বাধীনতা আর নারীর সমানাধিকার বলে চিল্লাপাল্লা করে গলা ফাটিয়ে ফেললেও দিন শেষে নারীর ইজ্জতের চেয়ে তাদের কাছে ভাবমূর্তি আর ডলারের মূল্য অনেক বেশী । মদীনাতে একজন মুসলিম মহিলার সম্মানের জন্য মহানবী (সাঃ) ইহুদীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষনা করে ফেলেছিলেন প্রায় । মাত্র একজন মহিলার জন্য । অথচ এই ইসলামকে আজ পুরো বিশ্ব জুড়ে খুব সুপরিকল্পিত ভাবে রিপ্রেজেন্ট করা হচ্ছে নারী স্বাধীনতার হন্তারক হিসেবে । বোরখার আড়ালে মুসলিমরা নারীদের ঘরের চার দেয়ালে আটকে রাখে , সম্পত্তিতে নারীদের সমানাধিকার দেয় না , মুসলিমরা সেক্স স্টারভড ব্লা ব্লা ব্লা ......

#ডাবলস্ট্যান্ডার্ড

তথ্যসূত্রঃ

1. One in Four USA. Sexual Assault Statistics.http://www.oneinfourusa.org/statistics.php

2. National Center for Victims of Crime , U.S. Department of Justice, Office for Victims of Crime (OVC). National Crime Victims' Rights Week Resource Guide. 2009. 3. U.S. Department of Justice. Center for Problem-Oriented Policing. Acquaintance Rape of College Students.http://www.cops.usdoj.gov/pdf/e03021472.pdf 4. U.S. Department of Justice.2005 National Crime Victimization Study. 2005. 5.

Crisis Connection. National College Health Risk Behavior Survey. Fisher, Cullen & Turner, 2000. Warshaw, 1998.http://www.crisisconnectioninc.org/.../college_campuses_and_r...

6. *https://www.notalone.gov/assets/report.pdf*

৪৮

সাফিয়া (রাঃ)- নিপীড়িত যুদ্ধবন্দীনি নাকি সম্মানিত উম্মুল মুমিনীন ?

-শিহাব আহমেদ তুহিন

একই গল্প একটু অন্যভাবে বললে পুরো গল্পটাই বদলে যায়। আবার মাঝে মাঝে অন্যভাবে বলার ও প্রয়োজন নেই। শুধু প্রসঙ্গটা গোপন রাখতে পারলেই হলো- প্রসঙ্গবিহীন গল্প পড়ে একেবারে ঝানু পাঠক ও বোকা বনে যেতে পারে। এজন্য যখন আমরা ইতিহাস পড়ি তখন অবশ্যই উচিৎ প্রসঙ্গসহ পুরো ঘটনাটা পড়া। পড়ার পর যদি কোন কিছু গ্রহণযোগ্য মনে না হয় সেখানে আমাদের দেখতে হবে সমালোচকরা ব্যাপারটা নিয়ে কি বলেন, তারপর দেখা উচিৎ অপরপক্ষ ব্যাপারটা নিয়ে কি বলে। এভাবে যদি আমরা ইতিহাস না পড়ি তবে আমরা কেবল তাই ই দেখতে পাব যা আমাদের মন দেখতে চায় কিংবা সমালোচকরা আমাদের দেখাতে চায়। একটা উদাহারণ দেই। ধরা যাক, কেউ এসে আপনাকে বলল-

" আনিস সাহেব রাতের বেলায় এক যুবতী নারীর বাসায় গেলেন। নারীটি তখন বাড়িতে একা ছিল।"

.

এই দুই লাইন পড়ে প্রায় সবাই ই মনে করবে আনিস সাহেব খুবই বাজে লোক। সে রাতের বেলায় যুবতী মেয়ের সাথে মজা লুটে। কিন্তু কেউ ভালোমত খোঁজখবর নিয়ে গল্পের প্রসঙ্গটা জানতে পারল। গল্পটা তখন এমন হলো-

"আনিস সাহেব একজন দয়ালু লোক। পাশের বাড়ীর এক যুবতী মেয়ে সদ্যই বিধবা হয়েছে। তাকে দেখাশুনার কেউ নেই। আনিস সাহেব তাই রাতের বেলায় মেয়েটিকে কিছু অর্থ দান করতে গেলেন।"

.

দেখলেন তো! প্রসঙ্গটা জানার পর পুরো গল্পটাই কেমন বদলে গেল! এখন এই গল্প পড়ে সমালোচকরা হয়তো বলতে পারে, 'আনিস সাহেব কেন রাতের বেলায় যাবেন? তিনি কি দিনের বেলায় যেতে পারতেন না?' আপনি দেখলেন অপরপক্ষ বলছে, 'আনিস সাহেব সপ্তাহে সাত দিনই ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হাড় ভাঙ্গা পরিশ্রম করেন। তার নিশ্বাস ফেলার ও সময় থাকে না। তাই রাতে যাওয়া ছাড়া তার উপায় নেই।

.

আপনি দুই পক্ষের মত আর প্রসঙ্গসহ আনিস সাহেবের গল্প পড়ে ফেললেন। এখন তাকে বিচার করার দায়িত্ব আপনার! আজ আমরা ঠিক এই কাজটাই করব। দুইজন মানুষের গল্প জানব দুইপক্ষের মতসহ, প্রসঙ্গসহ। তাঁরা হলেন মুহম্মাদ (সাঃ) ও সাফিয়া(রাঃ)।

.

কে ছিলেন সাফিয়া(রাঃ) ?

.

সাফিয়া(রাঃ) ছিলেন ইহুদী গোত্র বনু নাদীরের প্রধান হুয়াই বিন আখতারের কন্যা। বাবার বেশ আদরের মেয়ে ছিলেন উনি। তাঁর বর্ণনায়ঃ

"আমি ছিলাম আমার বাবা এবং আমার চাচাদের প্রিয় সন্তান। যখন আল্লাহর রাসূল ﷺ মদীনাতে আসলেন এবং কুবাতে অবস্থান করলেন, আমার বাবা তাঁকে রাতের বেলায় দেখতে যান। যখন তাঁরা ফেরত আসে তাদেরকে খুব চিন্তিত আর ক্লান্ত লাগছিল। আমি আনন্দের সাথে তাদেরকে অভ্যর্থনা জানালাম কিন্তু অবাক হয়ে দেখলাম তাদের কেউই আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। তারা এতোটাই চিন্তিত ছিলেন যে তারা আমার উপস্থিতিই অনুভব করল না। আমি শুনতে পারলাম আমার কাকা,আবু ইয়াসির, আমার আব্বাকে বলছেন, 'উনিই কি সেই ব্যক্তি?' আব্বা জবাব দিলেন, 'হ্যাঁ।' আমার কাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি

কি সত্যিই তাকে চিনতে পেরেছেন এটা নিশ্চিতভাবে বলতে পারেন?' তিনি বললেন, 'হ্যাঁ।' তখন আমার কাকা জিজ্ঞেস করলেন, 'তার ব্যাপারে এখন আপনার চিন্তা-ভাবনা কি?' তিনি বললেন, "আমি যতদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকব তাঁর শত্রু হবো।' [১]

.

আরবের ইহুদিরা তখন একজন নবীর অপেক্ষা করছিল। । 'উনি কি সেই ব্যক্তি বলতে' তাদের সেই নবীর কথাই বলা হয়েছে। ইতিহাস ঘাটলে দেখা যেত, যখনই কোন আরব গোত্রের সাথে ইহুদিদের ঝগড়া হতো তখন তারা আরবদের এই বলে হুমকি দিত, "যখন আমাদের প্রতিশ্রুত নবী আসবে তখন আমরা তোমাদের দেখে নিব।"

>>তাওরাতে সেই নবীর কিছু চিহ্ন বলে দেয়া ছিলঃ-
'তিনি জেন্টাইলদের(যারা ইহুদী নয়) মাঝে শান্তি প্রতিষ্ঠা করবেন। তিনি কখনো চিৎকার করবেন না, তাঁর স্বরও উঁচু করবেন না, আর কখনো রাস্তাঘাটে তাঁর কণ্ঠস্বর শোনাবেন ও না।'[২]

সীরাত গ্রন্থ পড়লে জানা যায়, রাসূল(সাঃ) বেশ নরম প্রকৃতির মানুষ ছিলেন। তিনি কখনো চিৎকার করে কথা বলতেন না। বাজারে তাঁর স্বর উঁচু করতেন না। [৩]

.

আবার সরাসরি সেই নবীর নামও বলে দেয়া হয়েছেঃ
חִכּוֹ, מַמְתַקִּים, וְכֻלּוֹ, מַחֲמַדִּים; זֶה דוֹדִי וְזֶה רֵעִי, בְּנוֹת יְרוּשָׁלִָם.

- 'তাঁর মুখের ভাষা বড়ই মিষ্টি, হ্যাঁ! সে বড়ই প্রেমময়। হে জেরুজালেমের কন্যারা! সে হচ্ছে আমার প্রিয়জন, সে হচ্ছে আমার বন্ধু(হাবীব)।"[৪]

এখানে বড়ই প্রেমময় কথাটার হিব্রু "מחמד" উচ্চারণ করলে হবে 'Mahammad-im'। হিব্রুতে 'im' ব্যবহৃত হয় 'Plural of respect' হিসেবে।

.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, ইহুদিদের কিতাবে বেশ ভালোভাবেই মুহম্মদ ﷺ এর নাম ও বৈশিষ্ট্য লিখিত ছিল। কিন্তু ইহুদিরা আশা করেছিল তাদের মধ্যে থেকেই সেই নবীর আবির্ভাব ঘটবে। তাই যখন আরবদের মধ্যে থেকে সে নবীর আবির্ভাব ঘটল তখন তারা সেটা মেনে নিতে পারল না। অনেকের কাছে এটা অবাক লাগতে পারে কিন্তু ইহুদিদের ইতিহাসই এমন। যাকে তারা প্রায় সবাই নবী বলে মেনেছিল সেই মূসা(আঃ) এর ঈশ্বরের বিরুদ্ধেই তারা বিদ্রোহ করেছিল। মুসা(আঃ) বেশ আক্ষেপ নিয়ে বলেছিলেন,

"যতদিন ধরে আমি তোমাদেরকে চিনি ততদিনই তোমরা ঈশ্বরের সাথে বিদ্রোহ করে এসেছ।"[৫]

.

তাই সাফিয়া(রাঃ) এর বাবা মুহাম্মদ ﷺ কে নবী হিসেবে চিনতে পারলেও তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহে অটল রইলেন। তবে সাফিয়া(রাঃ) এর কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, তিনিই সেই প্রতিক্ষীত নবী। এদিকে খন্দকের যুদ্ধে ইহুদিরা কুরাইশদের সহযোগিতা করে চূড়ান্ত বিশ্বাস-ঘাতকতা করল এবং রাসূল ﷺ এর সাথে চুক্তি ভঙ্গ করল। মক্কার মুশরিকদের সাথে হাত মিলিয়ে বনু কোরাইজা আর খায়বারের ইহুদিরা মুসলিমদের বেশ ভুগিয়েছিল। তাই রাসূল ﷺ খন্দকের যুদ্ধের পর খায়বারে অভিযান প্রেরণ করলেন। যুদ্ধে ইহুদিরা চূড়ান্তভাবে পরাজিত হলো।

সাফিয়া (রাঃ) এর বাবা, স্বামী মুসলিমদের হাতে মারা গেলেন, তিনি নিজে বন্দী হলেন। ইসলামে অবশ্যই ঢালাওভাবে যুদ্ধবন্দী করার উপায় নেই, এর কিছু নিয়ম আছে। এখানে এতো বিস্তারিতভাবে আলোচনা সম্ভব না। যারা ইসলামে দাসপ্রথা নিয়ে জানতে ইচ্ছুক তারা এই লেখাটি পড়তে পারেন[৬]।

ইন শা আল্লাহ চলবে

তথ্যসূত্রঃ
[১] Ibn Hisham, As-Sirah an-Nabawiyyah, vol. 2, pp. 257-258
[২] Holy Bible, Isaiah, 42 :1-2
[৩] When the Moon split-Shafiur Rahman Mubarakpuri,page-319
[৪] Holy Bible, Song of Solomon 5:16
[৫] Holy Bible, Deuteronomy 9:24
[৬] http://www.quraneralo.com/islam-and-slavery/

৪৯

সাফিয়া (রাঃ)- নিপীড়িত যুদ্ধবন্দীনি নাকি সম্মানিত উম্মুল মুমিনীন ? - ২

-শিহাব আহমেদ তুহিন

প্রথম পর্বের জন্য দেখুন #সত্যকথন_৪৮

.

আমরা এখন যুদ্ধ পরবর্তী অবস্থা প্রসঙ্গসহ সমালোচকদের দৃষ্টিতে দেখব, এরপর যুক্তিগুলো খন্ডনের চেষ্টা করবঃ

.

রাসূল ﷺ সাফিয়া(রাঃ) কে বিয়ে করলেনঃ

.

সাফিয়া(রাঃ) কে নিয়ে মিথ্যাচারের জন্য ইসলাম-বিদ্বেষীরা বুখারী শরীফের একটি হাদীস প্রায়ই ব্যবহার করে থাকে। হাদীসটিতে সামান্য কিছু কথা যোগ করলে আর প্রসঙ্গ বাদ দিলে রাসূল ﷺ খুব সহজেই একজন নিষ্ঠুর মানুষ হিসেবে উপস্থাপন করা যায় বলে এটি ইসলাম-বিদ্বেষী মহলে খুব জনপ্রিয় একটি হাদীসঃ

.

আনাস ইবনে মালিক(রাঃ) থেকে বর্ণিত, "আমরা খায়বার জয় করলাম। তখন যুদ্ধবন্দীদের সমবেত করা হল। দিহয়া এসে বললেন, 'হে আল্লাহর নবী ﷺ! বন্দীদের মধ্যে থেকে আমাকে একটি দাসী দিন।' তিনি বললেন, 'যাও তুমি একটি দাসী নিয়ে যাও।' তিনি সাফিয়া বিনত হুয়াই(রাঃ) কে নিলেন। তখন এক ব্যক্তি নবী(সাঃ) এর কাছে এসে বললঃ ইয়া নবী! বনু কোরাইজা ও বনু নাযীরের অন্যতম নেত্রী সাফিয়্যা বিনত হুয়াইকে আপনি দিহয়াকে দিচ্ছেন? তিনি তো একমাত্র আপনারই যোগ্য। তিনি বললেনঃ

.

দিহয়াকে সাফিয়াসহ ডেকে আন। তিনি সাফিয়াসহ উপস্থিত হলেন। যখন নবী ﷺ সাফিয়াকে দেখলেন তিনি(দিহয়াকে)বললেনঃ তুমি বন্দীদের মধ্যে অন্য একজন দাসীকে বেছে নাও। রাবী বলেনঃ নবী ﷺ সাফিয়া(রাঃ) কে আযাদ করে দিলেন এবং তাঁকে বিয়ে করলেন। রাবী সাবিত(রাঃ) আনাস(রা:) কে জিজ্ঞেস করলেনঃ তিনি তাঁকে কি মোহর দিয়েছিলেন? আনাস(রাঃ) জবাব দিলেনঃ তাঁকে আযাদ করাই তাঁর মাহর। এর বিনিময়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করেছেন।[১]

.

মুহম্মাদ ﷺ কি সাফিয়া(রাঃ) এর রুপে আসক্ত হয়ে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন?
অনেকে বলতে চান যে, হাদিসটিতে বলা আছে, রাসূল ﷺ সাফিয়া(রাঃ) কে দেখে নিজের জন্য পছন্দ করেছেন, অর্থাৎ রূপ দেখে পাগল হয়েছেন। কিন্তু আরেকটু পিছনে পড়লেই আমরা দেখতে পারি এটা কোন কারণই ছিল না। এক ব্যক্তি যখন রাসূল ﷺ এর কাছে এসে বলল, 'বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীরের অন্যতম নেত্রী সাফিয়্যা বিনত হুয়াইকে আপনি দিহয়াকে দিচ্ছেন'-তখন রাসূল ﷺ সাফিয়া(রাঃ) কে ডেকে পাঠান। গোত্র প্রধানের মেয়ে এবং নেত্রী হিসেবে তিনি মুসলিমদের নেতার সাথেই বিয়ের জন্য সবচেয়ে বেশী উপযুক্ত। তাই রাসূল(সাঃ) তাকে বিয়ে করেন। যদি এই ব্যক্তিটি এসে এমনটা বলত, 'বনূ কুরাইযা ও বনূ নাযীরের সবচেয়ে সুন্দরী নারীকে আপনি দিহয়াকে দিচ্ছেন' আর এরপর রাসূল ﷺ সাফিয়া(রাঃ) কে ডেকে নিয়ে এসে বিয়ে করতেন, তাহলে মুহাম্মদ ﷺ এর দিকে এই অভিযোগ তোলা যেত।

.

এছাড়া আরবে একটি রীতি ছিল শত্রু যদি গোত্রের কোন মেয়েকে বিয়ে করত তবে তার সাথে তারা শত্রুতা শেষ করে ফেলত। এ কারণেই আবু সুফিয়ানের মেয়ে উম্মে হাবীবাহ(রাঃ) কে রাসূল ﷺ বিয়ে করার কারণে তাঁর সাথে আবু সুফিয়ানের শত্রুতা

শেষ হয়ে যায়। রাসূল ﷺ এই বিয়ের মাধ্যমে ইহুদীদের সাথে শত্রুতা শেষ করার জন্য একটি হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সাফিয়া(রাঃ) কে তার সাথী এক মহিলা সহ বিলাল(রাঃ) রাসূল ﷺ এর কাছে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে, স্বজাতি ইহুদিদের লাশ দেখে তাঁর সাথী মহিলা চিৎকার জুড়ে দিল। সাফিয়া(রাঃ) এসে রাসূল ﷺ এর পিছনে নিজেকে অত্যন্ত গুটিয়ে নিয়ে দাঁড়ালেন। রাসূল ﷺ তাঁর উপর নিজের চাদর বিছিয়ে দিলেন। তখন উপস্থিত মুসলিমরা বুঝে নিল যে, রাসূল(সাঃ) তাঁকে তাঁর নিজের জন্য পছন্দ করেছেন। রাসূল ﷺ এরপর বিলাল(রাঃ) কে তিরস্কার করে বললেন, 'তোমার হৃদয় থেকে কি দয়া-মায়া উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল হে বিলাল! তুমি এই দুই মহিলাকে তাদের আত্নীয়-স্বজনের দেহ মাড়িয়ে নিয়ে এলে?' [২] ।

.

আর বিয়ের আগে সব মুসলিমই তার হবু বধূকে দেখে। এটা রাসূল ﷺ এর নির্দেশ। এর ফলে পুরুষের হৃদয়ে স্ত্রীর জন্য ভালবাসা সৃষ্টি হয়। শুধু ইসলাম না বরং সব ধর্ম আর সংস্কৃতিতে এটাই স্বাভাবিক ব্যাপার। এটা নিয়ে এতো লাফালাফি করার কারণ আমার নিকট পরিষ্কার না।

.

পিতা ও স্বামীর হত্যাকারীকে কেউই বিয়ে করতে চাইবে না। তাই সাফিয়া(রাঃ) কি বিয়েতে রাজী ছিলেন?

.

পিতা এবং চাচার কথা-বার্তায় সাফিয়া(রাঃ) এর কাছে এটা পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে, মুহাম্মদ(সাঃ) ই তাদের প্রতীক্ষিত নবী। এছাড়া সাফিয়া(রাঃ) খায়বার বিজয়ের পূর্বে অদ্ভুত একটা স্বপ্ন দেখেন। সাফিয়া(রাঃ) এর চোখের উপর ভাগে আঘাতের চিহ্ন ছিল। প্রথমবার যখন সাফিয়া(রাঃ) রাসূল ﷺএর সামনে উপস্থিত হন তখন নবী ﷺ তাঁকে এই আঘাতের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন। সাফিয়া(রাঃ) তখন তাঁর স্বপ্নের কথা বর্ণনা করেন-
'একবার আমি স্বপ্ন দেখলাম আকাশ থেকে উজ্জ্বল এক নক্ষত্র এসে আমার কোলে পড়ল। আমি এর তাৎপর্য বুঝতে না পেরে আমার স্বামীকে স্বপ্নের কথা বললাম।

.

শুনে তিনি ক্ষুদ্ধ হলেন, ক্রুদ্ধ হলেন আর বললেন, 'কি! হিজাজের বাদশাহকে স্বামীরূপে পেতে তোর কামনা!' আর তাই তিনি স্বপ্নে তোমার কোলে এসে পড়েন। এই না বলে তিনি আমার মুখে কষে দিলেন এক থাপ্পড়। আঘাতের সেই চিহ্নটি রয়ে গেছে মুখের উপর।' [৩]

.

সাফিয়া(রাঃ) এর মানসিক অবস্থা তখন বেশ নাজুক ছিল। একদিক থেকে তিনি জানতেন মুহাম্মদ(সাঃ) ই সত্য নবী, অন্যদিকে নিজের পিতা এবং স্বামীকে হারনোর কারণে তিনি মুহাম্মদ(সাঃ) কে দায়ী করছিলেন। এ কারণে তার অন্তরে তৈরী হয়েছিল মুহাম্মদ(সাঃ) এর প্রতি তীব্র ঘৃণাবোধ। সাফিয়া(রাঃ) নিজেই তাঁর সেই অবস্থার কথা বর্ণনা করেছেনঃ

.

'আমার নিকট রাসূল(সাঃ) অপেক্ষা ঘৃণ্য আর কেউই ছিল না। কারণ উনি আমার পিতা ও স্বামীকে হত্যা করেছিলেন। কিন্তু নবী(সাঃ) তাকে বোঝালেন, 'হে সাফিয়া! তোমার পিতা পুরো আরবকে আমার বিরুদ্ধে উসকে দিয়েছিল এবং সে এটা এবং এটা করেছিল......।' এভাবে তিনি বোঝাতে থাকলেন এবং (ঘৃণার) সেই অনুভূতিটা আমার মাঝ থেকে দূর হয়ে গেল।' [৪]

.

এই হাদিসের মাধ্যমে এটা পরিষ্কার যে, পিতা ও স্বামীকে হারানোর কারণে তার মাঝে যে সহজাত ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছিল তা মুহাম্মদ ﷺ যথাযথ কারণ ব্যাখ্যা করে দূর করে দেন। ধরা যাক, আপনি জানতে পারলেন বিচারক আপনার পিতাকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। আপনার প্রথমে প্রচণ্ড রাগ লাগবে।কারণ, প্রত্যেকটা মানুষই তাদের কাছের মানুষদের নিরপরাধ ভাবতে ভালবাসে। কিন্তু যখন আপনি জানতে পারবেন যে, আপনার পিতা এক ব্যক্তিকে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করেছে আর এর জন্য তার মৃত্যুদণ্ডই প্রাপ্য, তখন আর আপনার আগের মত ক্রোধ কাজ করবে না।

.

বন্দী হিসেবে কি তাঁর প্রস্তাব গ্রহণ করা ছাড়া আর কোন উপায় ছিলয় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বন্দীদের নিজেদের মতামতের কোন মূল্য থাকে না। সাফিয়া(রাঃ)কে কি জোর করেই বিয়েতে বাধ্য করা হয়েছিল? ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে-

.

"যখন সাফিয়া(রাঃ) রাসূল ﷺ এর সামনে আসলেন তখন নবী(সাঃ) তাঁকে বললেন, 'ইহুদিদের মধ্যে তোমার পিতা ততক্ষণ পর্যন্ত আমার সাথে শত্রুতা বন্ধ করেনি যতক্ষণ পর্যন্ত না আল্লাহ তাকে ধ্বংস করেছেন।' সাফিয়া(রাঃ) জবাবে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেছেন, 'কেউই অপরজনের পাপের ভার বহন করবে না [তিনি মূলত বাইবেলের একটা verse উদ্ধৃত করলেন- Ezekiel 18:20]'।

.

তখন রাসূল ﷺ তাঁকে বললেন, 'Make your choice! তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর তবে আমি তোমাকে নিজের জন্য বেছে নিব। আর যদি তুমি ইহুদি থাকাটাকেই বেছে নাও তবে আমি তোমাকে মুক্ত করে দিব এবং তোমাকে তোমার লোকজনের নিকট পাঠিয়ে দিব। সাফিয়া(রাঃ) জবাবে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কাছে আসার পর আপনি আমাকে দাওয়াত দেবার আগেই আমি ইসলামকে গ্রহণ করেছি আর আপনাকে সত্য বলে মেনেছি। ইহুদিদের মাঝে আমার কোন অভিভাবক নেই, বাবা নেই, কোন ভাই ও নেই। আমি ইসলামকে কুফরের উপর প্রাধান্য দিলাম। মুক্ত হয়ে আমার লোকজনের নিকট যাবার চেয়ে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই আমার নিকট অধিক প্রিয়।' [৫]

.

ইন শা আল্লাহ চলবে

তথ্যসূত্রঃ

[১] সহীহ বুখারী, খন্ড ১ অধ্যায় ৮ হাদীস নং ৭৬৩

[২] সীরাত ইবনে হিশাম, ৩য় খন্ড, পৃষ্ঠা-৩৫৩

[৩] যাদুল মা'আদ-হাফিজ ইবনুল কাইয়্যিম,পৃষ্ঠা-৩১৫

[৪] সিলসিলা সহীহাহ-আলবানী, হাদীস নং-২৭৯৩

[৫] ইবনে সা'আদ, ৮/১২৩

৫০

সাফিয়া (রাঃ)- নিপীড়িত যুদ্ধবন্দীনি নাকি সম্মানিত উম্মুল মুমিনীন ? - ৩

-শিহাব আহমেদ তুহিন

[আগের পর্বগুলোর জন্য দেখুন (সত্যকথন) ৪৮, ও (সত্যকথন) ৪৭]

.

মুহাম্মদ ﷺ যদি সত্যিই নারীলোভী না হয়ে থাকেন তবে ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করেননি কেন?

এটা খুব জনপ্রিয় একটা মিথ্যা অভিযোগ। যুদ্ধবন্দীনির ক্ষেত্রে ইদ্দত পালনের বিধানটুকু নবী(সাঃ) অবশ্যই পালন করেছিলেন। আবু সাঈদ খুদরী(রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল ﷺ আওতাস গোত্রের যুদ্ধবন্দীনির ব্যাপারে বলেন, ‘‘গর্ভবতী নারীরা যতক্ষণ পর্যন্ত না সন্তান প্রসব করে ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের সাথে মিলিত হওয়া যাবে না আর যারা গর্ভবতী নয় তাদের একটি মাসিক না হওয়া পর্যন্ত মিলিত হওয়া যাবে না।’’[১] অর্থাৎ যুদ্ধবন্দীনিদের ক্ষেত্রে তাদের একটি মাসিক পর্যন্ত সময়টুকুই হচ্ছে ইদ্দত।

.

সাফিয়া (রাঃ) কিন্তু প্রথমে যুদ্ধবন্দিনীই ছিলেন অতঃপর রাসূল ﷺ তাঁকে মুক্ত করে বিয়ে করেন। বুখারী শরীফের হাদিসের মাধ্যমে আমরা জানতে পারি রাসূল ﷺ ইদ্দতের সময়টুকু অপেক্ষা করেছিলেনঃ আনাস ইবনে মালিক(রাঃ) থেকে বর্ণিত, ‘রাসূল ﷺ সাফিয়া(রাঃ)কে নিজের জন্য পছন্দ করলেন এবং তাঁকে নিয়ে রওনা দিলেন। একসময় আমরা সাদ-আস-সাহবা নামক স্থানে পৌঁছালাম। এসময় সাফিয়া(রাঃ) তাঁর মাসিক অবস্থা থেকে পবিত্র হলেন। অতঃপর রাসূল(সাঃ) তাঁকে বিয়ে করলেন।’[২]

.

কেমন ছিল সাফিয়া (রাঃ) ও রাসূল ﷺ এর দাম্পত্যজীবন?

.

সাফিয়া(রাঃ) যদি সত্যিই মন থেকে ইসলাম কবুল করে থাকেন তবে তা তাঁর পরবর্তী আচরণেই প্রকাশ পাবার কথা। দেখা যাক, এ ব্যাপারে হাদীস ও সীরাতগ্রন্থগুলো কি বলছেঃ

- ‘রাসূল ﷺ যখন প্রচন্ড অসুস্থ হয়ে মৃত্যু শয্যায় ছিলেন, তাঁর স্ত্রীরা তাঁর চারপাশে জড় হলেন। তখন সাফিয়া(রাঃ)বললেন, ‘হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর শপথ! আপনার জায়গায় যদি আমি থাকতে পারতাম ।’ তাঁর কথা শুনে অন্য নবী পত্নীরা মুখটিপে হাসলেন। রাসূল ﷺ তাঁদের দেখে ফেললেন এবং বললেন, ‘তোমাদের মুখ ধুয়ে ফেল।’ তাঁরা বলল, ‘হে আল্লাহর রাসূল! কেন?’ তিনি জবাবে বললেন,‘কারণ তোমরা তাঁকে বিদ্রুপ করেছ। আল্লাহর শপথ সে সত্য বলছে।’[৩]

,

- ভ্রমণে যাবার সময় রাসূল ﷺ তাঁর হাঁটু সাফিয়া(রাঃ) এর জন্য বিছিয়ে দিতেন যাতে তিনি তাতে পা দিয়ে (উটের পিঠে) চড়তে পারেন।[৪]

.

-সাফিয়া (রাঃ) বলেন, ‘একবার ভ্রমণের সময় নবী ﷺ আমার প্রতি সীমাহীন মায়া মমতা দেখিয়েছিলেন। সে সময় আমার বয়স কম ছিল তাই প্রায় সময়ই হাওদাতে বসে থাকতে থাকতে আমার তন্দ্রা এসে যেত আর আমার মাথা কাঠের হাওদাতে বাড়ি খেত। নবী ﷺ অনেক ভালবাসা আর মমতার সাথে আমার মাথা ধরে রাখতেন আর বলতেন, ‘ওহে হুয়ায়ের কন্যা! নিজের দিকে খেয়াল রাখ, না হয় ঘুমিয়ে কিংবা ঝিমিয়ে পড়ে ব্যাথা পাবে।’[৫]

.

-একবার ভ্রমণের সময় সাফিয়া (রাঃ) আর রাসূল ﷺ উট থেকে পড়ে যান। আবু তালহা (রাঃ) দৌড়ে রাসূল ﷺ এর কাছে গেলে

তিনি তাঁকে প্রথমে সাফিয়া (রাঃ) এর খোঁজ নিতে বলেন।[৬]

.

-সাফিয়া (রাঃ) বলেন, "একবার রাসূল ﷺ ঘরে এসে দেখতে পান আমি কাঁদছি। রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, 'কি হয়েছে তোমার?' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! আপনার কিছু স্ত্রী আপনার পরিবার আর কুরাইশদের সাথে সম্পর্কযুক্ত। তাঁরা বলে যে,তাঁরা কুরাইশদের সাথে সম্পর্কযুক্ত আর আমি একজন ইহুদির কন্যা। রাসূল ﷺ বললেন, 'ওহে হুয়ায়ের কন্যা! এতে কান্নার কি আছে? তোমার তাদেরকে জবাব দেয়া উচিৎ ছিল, 'কিভাবে তোমরা আমার থেকে উত্তম হতে পারো? যখন হারুন আমার পিতা, মুসা আমার চাচা আর মুহাম্মদ আমার স্বামী!' [৭]

.

-সাফিয়া (রাঃ) বলেন, 'একবার রাসূল ﷺ তাঁর স্ত্রীদের সাথে হজ্বে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে আমার উট বসে পড়ল কারণ ওটা ছিল সবচেয়ে দুর্বল উট, আর তাই আমি কেঁদে ফেললাম। নবী ﷺ আমার কাছে আসলেন আর আমার চোখের জল নিজের জামা ও হাত দিয়ে মুছে দিলেন। তিনি আমাকে যতই আমাকে কাঁদতে নিষেধ করলেন, আমি ততই কাঁদতে থাকলাম।'[৮]

.

- একবার আয়েশা (রাঃ) , সাফিয়া (রাঃ) এর খাটো অবয়ব সম্পর্কে ইংগিত করলে রাসূল ﷺ বললেন, 'তুমি এমন একটা কথা বলেছ যেটা সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে তা পুরো সমুদ্রের পানি দুর্গন্ধময় করার জন্য যথেষ্ট।' [৯]

.

- মুহাম্মদ ﷺ আজীবন সাফিয়া(রাঃ) এর প্রতি ভালোবাসা ও মমতা দেখিয়েছেন। তাইতো সাফিয়া(রাঃ) বলতেন, 'আমি রাসূল ﷺ থেকে উত্তম ব্যক্তি কখনো দেখিনি।'[১০]

.

কারো অবস্থা বর্ণনার সময় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে এটা দেখা যার সম্পর্কে বলা হচ্ছে সে নিজে এই পরিস্থিতি সম্পর্কে বলে। সাফিয়া(রাঃ) কে নিপীড়িত প্রমাণ করতে ইসলাম বিদ্বেষীরা যে বিশাল বিশাল লেখা লিখে, তাঁর নিজের কথায় কিন্তু একেবারে বিপরীত চিত্র ফুটে উঠে।

.

রাসূল ﷺ এর মৃত্যুর পর কেমন ছিল সাফিয়া(রাঃ) এর জীবন ?

.

অনেকে বলতে পারে, যে মুহাম্মদ ﷺ এর ভয়েই সাফিয়া(রাঃ) অনুগত থেকেছেন। তাদের হতাশ করে বলতে হয় মহানবী ﷺ এর মৃত্যুর পর সাফিয়া(রাঃ) একই আনুগত্য দেখিয়ে গিয়েছেন। কারণ, তাঁর আনুগত্য ছিল ইসলামের প্রতি। আল্লাহর প্রতি।

,

- "একবার কিছু লোক রাসূল ﷺ এর স্ত্রী সাফিয়া (রা:) এর ঘরে জড় হয়েছিল। তারা আল্লাহকে স্মরণ করে কুরআন তিলওয়াত করছিল এবং সিজদা করছিল। সাফিয়া(রাঃ) তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমরা সিজদা করলে আর কুরআন তিলওয়াত করলে। কিন্তু (আল্লাহর ভয়ে) তোমাদের (চোখে) অশ্রু কোথায়?"[১১] -

.

" সাফিয়া (রাঃ) নবী পরিবারের সাথে উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তিনি ফাতেমা (রাঃ) কে তাঁর প্রতি স্নেহের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে গয়না উপহার দেন। এছাড়া তিনি খায়বার থেকে যে গয়না এনেছিলেন তা নবীপত্নীদের উপহার দেন।"[১২]

.

-"সাফিয়া (রাঃ) খুবই দানশীল ও উদার রমণী ছিলেন। তিনি আল্লাহর জন্য তাঁর যা আছে তাঁর সবই দান করতেন, অবস্থা এমন হয়েছিল যে তিনি জীবিত থাকা অবস্থাতেই তাঁর বাড়ি দান করে যান।"[১৩]

.

- প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে কাসির(রহ:) তাঁর সম্পর্কে বলেন, "ইবাদত, ধার্মিকতা, দুনিয়াবিমুখীতা এবং দানশীলতায় তিনি

ছিলেন অন্যতম সেরা নারী।"[১৪]

.

প্রায় সব ইসলাম-বিদ্বেষীরাই সাফিয়া(রাঃ) এর সাথে রাসূল এর বিয়ে নিয়ে নিজেদের কল্পনার রং ছড়িয়ে গল্প বলার চেষ্টা করে। তাদের গল্পটা এমন- 'যুদ্ধবাজ মুহাম্মদ ﷺ বিনা কারণে খায়বার দখল করেন আর সাফিয়া (রাঃ) এর নিরাপরাধ পিতা ও স্বামীকে হত্যা করেন। অতঃপর সাফিয়া (রাঃ) কে নিজের পিতার লাশ মাড়িয়ে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। নারীলোভী হবার কারণে ইদ্দতের সময়টুকু অপেক্ষা না করেই সাফিয়া(রাঃ)কে ধর্ষণ করেন।'[নাউজুবিল্লাহ]

.

তাদের বলা গল্প অনেকটা-'আনিস সাহেব রাতের বেলায় এক যুবতী নারীর বাসায় গেলেন। নারীটি তখন বাসায় একা ছিল।' এই টাইপের হয়ে যায়। অধিকাংশ সময়েই নিজেদের কথা ঢুকিয়ে তারা গল্পটিকে বিকৃত করে ফেলে। এ কারণে প্রসঙ্গসহ দুই পক্ষের বিশ্লেষণের মাধ্যমে ইতিহাস জানাটা জরুরী। সকল প্রশংসা আল্লাহতায়ালার যিনি মুসলিমদের এমন কিছু স্কলার দান করেছেন যারা বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে খুবই খুঁতখুঁতে ছিলেন। যার কারণে ইসলামের ইতিহাসের ক্ষেত্রে জালিয়াতির সুযোগ খুব কম, বড়জোর সম্ভব ইতিহাসটিকে ভুলভাবে উপস্থাপন করা।

.

অধিকাংশ নাস্তিক ও ইসলাম-বিদ্বেষীরা নিজেদের ট্রুথ-সিকার হিসেবে উপস্থাপন করে। তাদের দাবী হচ্ছে, তারা সত্য খুঁজে খুঁজে আজকের অবস্থানে এসেছে, যেখানে আস্তিকরা কেবল অন্ধ-অনুসরণ করে। ট্রুথ-সিকার তো সে যে নিরেপক্ষ থেকে সকল উৎস থেকে সত্য জানার চেষ্টা করে। একপেশে তথ্য তো কেবল প্রবঞ্চনাই নিয়ে আসে যদি না তাতে সত্য থাকে।

.

অবশ্য আলোর জানালা বন্ধ করে যারা সত্য খোঁজে তাদের প্রবঞ্চনা ছাড়া কিছু পাওয়াও উচিৎ না।

তথ্যসূত্রঃ

[১] আবু দাউদ, হাদীস নং-২১৫৭ [১৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৮৮৯

[২] ইবনে সা'আদ, তাবাকাত। খন্ড ৮, পৃষ্ঠা ১০১

[৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪২১১

[৪] মাজমা আল জাওয়া'ইদ-আলী ইবনে আবু বকর, খন্ড ৮

[৫] সহীহ বুখারী, কিতাবুল জিহাদ

[৬] Muhammad ibn' Isa at Tirmidhi, "Kitabul Manaaqib Bab Fadhlu Azwaajin Nabi," in Al-Jami' As-Sahih

[৭] আহমাদ, খন্ড-৬,পৃষ্ঠা-৩৩৭

[৮] সুনানে আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৮৭৫

[৯] মুসনাদ, খন্ড-১৩, পৃষ্ঠা-৩৮

[১০] Abu Nu'aym al Asbahani, Hilyat al-Awliya, Vol-2, page-55

[১১] ইবনে সা'আদ-তাবাকাত, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১০০

[১২] ইবনে সা'আদ-তাবাকাত, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-১০২

[১৩] ইবনে কাসির-আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, খন্ড-৮, পৃষ্ঠা-৪৭

৫১
অর্ধশতক পূর্ণ হওয়া এবং কিছু কথা

-সত্যকথন ডেস্ক

বিসমিল্লাহির রাহমানীর রাহিম। নিশ্চয় সকল প্রশংসা শুধুই আল্লাহর। সালাত ও সালাম বর্ষিত হোক আমাদের নবী ও নেতা মুহাম্মাদের উপর, তার পরিবারের উপর ও তার সাহাবীদের উপর। নিশ্চয় বিশ্বাসীর কাছে নিজ স্ত্রী-সন্তান-সম্পদ ও জীবনের চাইতেও তিনি ﷺ অধিক প্রিয়। নিশ্চয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা ও তাঁর রাসূলের জন্য আমাদের জান ও মাল তুচ্ছ।

.

আলহামদুলিল্লাহ্। সত্যকথন – পেইজ থেকে গত দুই মাসে ৫০টি লেখা আল্লাহর ইচ্ছায় আমরা আপনাদের কাছে পৌছে দিতে পেরেছি। আমরা আশা করি ইন শা আল্লাহ আমরা এই ধারা জারি রাখতে পারবো। এই সময়টাতে আমরা পেয়েছি আপনাদের ভালোবাসা ও সমর্থন। অনেকেই আমাদের ইনবক্সে, এবং কমেন্টে ধন্যবাদ জানিয়েছেন, এই লেখাগুলো তাদের উপকারে এসেছে বলে জানিয়েছেন। এজন্য আমরা প্রথমত কৃতজ্ঞ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কাছে, তারপর লেখকদের কাছে, এবং অবশ্যই সত্যকথনের পাঠকদের কাছে। আমরা আশা করি ইন শা আল্লাহ আপনারা আমাদের পাশেই থাকবেন।

.

ইসলামবিদ্বেষী পশ্চিমা, ব্রাহ্মণ্যবাদী ও নাস্তিক্যবাদী শক্তি মুসলিমদের মাঝে নানা কৌশলে ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করা এবং ইসলামবিদ্বেষকে প্রচার করার যে এজেন্ডা নিয়ে এগিয়ে চলছে তার মোকাবেলা করার জন্য লেখক, পাঠক, সকলের সক্রিয় অংশগ্রহন প্রয়োজন। আমাদের পক্ষে শুধু আপনাদের কাছে লেখাগুলো পৌছে দেওয়া সম্ভব। কিন্তু আপনাদের দায়িত্ব হল, কর্তব্য হল সাধ্যমত আপনাদের নিজ নিজ বলয়ে এই লেখাগুলো, যুক্তিগুলোকে প্রচার করা। বিশেষ করে আপনাদের আত্মীয়, বন্ধু-বান্ধব, এবং পরিবারের কিশোর-তরুণদের মাঝে এই লেখা ও যুক্তিগুলোকে প্রচার করা। যদি আপনার কোন প্রভাবশালী ব্যক্তি অথবা উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার সাথে পরিচয় থাকে তবে তাদের কাছে লেখাগুলো পৌছে দেওয়া। আপনি যদি ফেইসবুকের মাধ্যমেও তার কাছে পৌছে দিতে পারেন তবে তাই করা।

.

কারন একজন সালমান রুশদী, একজন তসলিমা নাসরিনের আবর্জনার প্রচার করার জন্য সমগ্র বিশ্ব মিডিয়া থাকলেও তাদের মূর্খতাপূর্ণ "যুক্তি" ও অভিযোগের যখন জবাব দেওয়া হয় তখন সেটা প্রচারের জন্য কেউ-ই থাকে না। যদি অভিযোগগুলো শুনতে পায় লক্ষ মানুষ, কিন্তু এর জবাব হাজারের চেয়ে বেশি মানুষের কাছে না পৌছায় – তাহলে এটা আমাদেরই ব্যর্থতা, আপনাদেরই ব্যর্থতা। তাই বিশেষভাবে সত্যকথনের পোস্টগুলো প্রচারের জন্য আমাদের সবার মনোযোগী হতে হবে। আশা করি সবাই বিষয়টির গুরুত্ব অনুধাবন করবেন এবং সক্রিয়ভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ﷺ সমর্থনে অংশগ্রহন করবেন।

.

এছাড়া আরেকটি কথা বিশেষ ভাবে আমরা বলতে চাই। সত্যকথনের পেইজের উদ্দেশ্য কখনোই নাস্তিকদের সাথে তর্ক করা ছিল না। আমরা শুরু থেকেই বলেছি, এখনো বলছি আমাদের মূল উদ্দেশ্য হল নাস্তিক-অজ্ঞেয়বাদী-ইসলামবিদ্বেষীদের অভিযোগ এবং সৃষ্ট সংশয়গুলোর জবাব দেওয়া যাতে করে মুসলিমরা অজ্ঞানতাবশত প্রভাবিত ও বিভ্রান্ত না হন। অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখি আস্তিকতা বনাম নাস্তিকতা তর্কে জড়িয়ে অনেক আন্তরিক ভাইবোন মূল লক্ষ্য সম্পর্কে ভুল করেন। আমাদের উদ্দেশ্য কখনোই আস্তিকতার প্রচার না। আমাদের উদ্দেশ্য ইসলাম প্রচার করা, তাওহিদ প্রচার করা। নবী-রাসূলগণ যে সত্য মানবজাতির কাছে পৌছে দিয়েছেন তা প্রচার করার চেষ্টা করা। আস্তিক হওয়া আমাদের বিচারের দিনে কোন কাজে আসবে না, যদি আমরা আল্লাহর নাযিলকৃত শরীয়াহর অনুসরণ না করি। তাই আমাদের সবার সব ক্ষেত্রে এ কথাটি মাথায় রাখা উচিৎ।

.

একইসাথে আমাদের অনুধাবন করা উচিৎ আইনস্টাইন বা প্যাসকেল আমাদের আদর্শ না। আমরা আইনস্টাইন, প্যাসকেল, কিংবা অ্যান্টনি ফ্লিউয়ের মতো ইমান চাই না। আমরা ইমান চাই সাইয়্যেদিনা আবু বাকরের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মতো। অনেক সময় আমরা দেখি অনেক মুসলিম ভাইবোন বিজ্ঞান এবং শুধুই বিজ্ঞান দিয়ে ইসলামকে ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছেন। বিজ্ঞানের সাথে ইসলামকে খাপ খাওয়াতে চাচ্ছেন। আমরা স্বীকার করি নাস্তিক ও ইসলামবিদ্বেষীরা যেহেতু বিজ্ঞানমনস্কতা পোশাক এবং বিজ্ঞান সম্পর্কে অধিকাংশ মানুষের অজ্ঞতাকে পুজি বানিয়ে নাস্তিকতা ও ইসলামবিদ্বেষের প্রচার করে। আর এই কারনে বিজ্ঞান ব্যবহার করে তাদের পাল্টা জবাব দেওয়া প্রয়োজন। এক্ষেত্রে ইসলামের সমর্থনে বিজ্ঞান একটি উপকরণ।

.

কিন্তু এই উপকরণ যদি মাপকাঠিতে পরিণত হয় তবে সেটা মারাত্মক ধরনের সমস্যা। আল্লাহ 'আযযা ওয়া জাল আমাদের উপর বিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক করেন নি। ইমানকে করেছেন, তাওহিদকে করেছেন। তাগুতের বর্জন আর এক আল্লাহর উপর ইমান আনাকে আমাদের উপর তিনি সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বাধ্যতামূলক করেছেন।

আর তাঁর কিতাবে তিনি বলে দিয়েছেন – এই কিতাবে কোন সন্দেহ নেই এবং এ হল দিকনির্দেশনা তাদের জন্য যারা গ্বাইবের উপর ইমান এনেছে।

.

আল ইসরা ওয়াল মিরাজের ঘটনার পর আবু জাহলের নেতৃত্বে মক্কার ক্বুরাইশ মুশরিকরা মুসলিমদের নিয়ে ঠাট্টা-উপহাসে মেতে উঠেছিল। এটা কিভাবে সম্ভব যে একজন ব্যক্তি এক রাতের মধ্যে মক্কা থেকে জেরুসালেম গিয়ে ফেরত আসবে? এটা কিভাবে সম্ভব যে সে সাত আসমানের উপর যাবে?

.

অনেক মুসলিম সে সময় এই উপহাস, বিদ্রূপ সহ্য করতে না পেরে মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। অনেকে মুরতাদ হয়েছিল এতে বিশ্বাস করতে না পেরে। অনেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ – কে বলেছিল, যদি এমন ঘটেও থাকে তাহলে এখন বলার কি দরকার ছিল? কারন মিরাজের এই ঘটনা ছিল এমন যা আমাদের আকলের সাথে, সাধারন বুদ্ধি-বিবেচনার সাথে খাপ খায় না। কিন্তু যখন আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহুকে এই ব্যাপারে প্রশ্ন করা হয়েছিল তখন তার জবাব কি ছিল?

.

মিরাজের ঘটনার সম্পর্কে আবু বাকর রদ্বিয়াল্লাহু আনহু সর্বপ্রথম জানতে পারেন আবু জাহলের কাছ থেকেই। আবু জাহল, তাকে প্রশ্ন করে – মুহাম্মাদ কি বলছে তুমি জানো? সে নাকি এক রাতের মধ্যে জেরুসালেমে গিয়ে আবার ফেরত এসেছে।

.

জবাবে আস-সিদ্দিক আবু বাকর রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেছিলেন – যদি তিনি তা বলে থাকেন তবে তিনি সত্য বলেছেন। আমি তাকে আসমানের খবরাখবরের ব্যাপারে বিশ্বাস করি। আমি বিশ্বাস করি একজন ফেরেশতা তার কাছে ওয়াহি নিয়ে আসেন। তাহলে তিনি অল্প সময়ে জেরুসালেমে গিয়ে ফেরত এসেছেন এতে বিশ্বাস কেন আমি করবো না, যখন এগুলো পৃথিবীতেই?

.

আল্লাহু আকবর। আমাদের অনেকের সেন্সিবিলিটির সাথে হয়তো এই কথাগুলো খাপ খায় না, তবে এই হল প্রকৃত ইমান। আমরা তো বিশ্বাস করেই নিয়েছি, আমরা তো সাক্ষ্য দিয়েই দিয়েছি – আল্লাহ ব্যাতীত আর কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ ﷺ তাঁর রাসূল। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ আযযা ওয়া জাল আসমানের উপর থেকে জিব্রিল আলাইহিস সালাম-কে ওয়াহি সহ পাঠাতেন তাঁর উম্মি নবীর কাছে। আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ সত্য, তাঁর রাসূল সত্য, তাঁর মনোনীত এই দ্বীন সত্য, তাঁর শরীয়ত সত্য, তাঁর জান্নাত ও জাহান্নাম সত্য, আখিরাত সত্য, তাঁর ফেরেশতাগণ সত্য। তাহলে কিভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সুপ্রমানিত কোন কথা অস্বীকার করার কোন সুযোগ আমাদের কাছে থাকে?

.

আমাদের আইনস্টাইন বা ফ্লিউয়ের ইমানের দরকার নেই। আমাদের আবু বাকর আস-সিদ্দিকের রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু মতো ইমান

দরকার। আমরা দুয়া করি, এবং আশা করি আমাদের সকল আন্তরিক মুসলিম ভাই ও বোনেরা এই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি অনুধাবন করবেন।

.

আমরা আশা করছি খুব শীঘ্রই আমরা একটি সুসংবাদ আপনাদের দিতে পারবো। সত্যকথনের সব পাঠক, লেখক, শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য রইলো ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা ও দুয়া।

.

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের সবাইকে সিরাতুল মুস্তাক্বিমের উপর চালিত করুন, আমীন।

৫২
যুক্তির আঘাতে মুক্ত করি চেতনার জট
-নিলয় আরমান

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

.

মূল এজেন্ডা গোপন রেখে ধাপে ধাপে কাজ করাটা শাইত্বানের একটা কমন হাতিয়ার। যেমন আদাম 'আলাইহিসসালাম-কে নিষিদ্ধ ফল খাওয়ানোর জন্য সে বলে নি "যাও আল্লাহকে অমান্য কর।" সে বলেছে "এটা খেলে তুমি ফেরেশতা হয়ে যাবে, অমর হয়ে যাবে।" সূরাহ আ'রাফ(৭)এর ২০ আয়াত দ্রষ্টব্য। এছাড়া মূর্তিপূজার প্রচলন ঘটাতে শাইত্বান প্রথমে পূর্ববর্তী নেক ব্যক্তিদের সম্মানার্থে মূর্তি তৈরি করায়, কালক্রমে এসবের পূজা শুরু হয়। সূরাহ নূহ(৭১)এর ২৩ আয়াতে আছে এমনই কিছু ব্যক্তি তথা মূর্তির নাম- ওয়াদ্দ, ইয়াগুস, নাস্র।

.

নাস্তিকতা নামক ধর্মটি তার ভ্রূণাবস্থায় এমনই ছিল। ধর্মের কথাগুলোকেই অদ্ভুতভাবে ঘোরাতো তারা। রবার্ট ব্রাউনিং রচিত Fra Lippo Lippi শিরোনামের একটা কবিতায় দেখা যায় লিপো একজন চার্চ-সন্ন্যাসী যাকে জোর করে চার্চে আনা হয়েছে। ধর্মীয় পেইন্টিং আঁকা তার কাজ। একসময় সে বেশ্যালয়ে গমন করে, সাধু-সন্ত না এঁকে নারী আঁকতে শুরু করে। যুক্তি দেয় "নারীদেহ তো গডেরই সৃষ্টি। নারীদেহ এঁকে আমি গডের মহিমা খুঁজে পাই।" (উল্লেখ্য, এমনটা ধরে নেয়া ঠিক না যে কবির নিজস্ব মতও এটাই)

.

এভাবেই শুরু। তারপর এই ধারণা প্রচারিত হতে শুরু করে যে পরম সত্য বলে কিছু নেই, সবই interpretation (খেয়াল করবেন, নিজেকেই পরম সত্য বলে দাবি করাটা কিন্তু ধর্মের বৈশিষ্ট্য). ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে চ্যালেঞ্জ করার একটা ভিত্তি এভাবে দাঁড়ালো। কিছু বৈজ্ঞানিক অনুমান যখন নাস্তিকতার পক্ষে এলো, তখন থেকে আত্মবিশ্বাসের সহিত নাস্তিকতা একটি ধর্ম হিসেবে আবির্ভূত হলো।

.

অদ্ভুত ব্যাপার হলো, নাস্তিকতা একসময় ধরেই নিলো যে সে সত্য। অন্যান্য যে কোনো ধর্মের মত সে নিজেও যে প্রশ্নের উর্ধ্বে নয়, তা বেমালুম চেপে গেল। নাস্তিকদের কথাবার্তা থেকেই তা স্পষ্ট হয়। ধরুন কেউ বললো "আমি ফেমিনিজম নিয়ে একটা লেকচার দিচ্ছিলাম, কিন্তু শ্রোতা তার ধর্মান্ধতার জন্য শুনতেই চাইলো না।" হতেও তো পারে বক্তার কথা ভুল, শ্রোতার ধর্মবিশ্বাসই ঠিক। কিন্তু বক্তা ধরেই নিয়েছে নাস্তিক হওয়ার কারণে সে-ই সঠিক (উল্লেখ্য, ফেমিনিজম মানেই নাস্তিকতা নয়। কেবল উদাহরণ দেয়া হয়েছে)।

.

মুসলিমরা যদি নিজেদের 'শান্তিকামী' পরিচয় দেয়, তাহলে সেটা 'মুসলিমে'র প্রতিস্থাপক হবে না। কারণ এতে পক্ষপাতিত্ব হয়। মুসলিমরা শান্তিকামী হলে অমুসলিমরা কি অশান্তিকামী? অথচ নাস্তিকরা দিব্যি নিজেদেরকে 'প্রগতিশীল', 'মুক্তমনা' বলে বেড়ায়। ধর্মগুরুদের নিয়ে চটি লিখে অনলাইন ভরিয়ে ফেলা নাস্তিকেরাও নাকি প্রগতিশীল, এমনকি মিডিয়াতেও এসব শব্দই ব্যবহৃত হয়! এসব শব্দ বলতে হয় কারণ 'নাস্তিক' কথাটাই গালির মত শোনায়। 'প্রতিবন্ধী' বা disableকে যেভাবে শুদ্ধ করে বলা হয় 'specially able', নাস্তিকদের প্রগতিশীলতাও এমনই।

.

নাস্তিকতার যেহেতু লিখিত বিধিবিধান নেই, এটা একেক জায়গায় একেকটা ঢাল ব্যবহার করে। যেমন বিজ্ঞান। এদের ধারণা

বিজ্ঞান এদের নিজস্ব সম্পত্তি। মরিস বুকাইলির লেখা "বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান" বইটা পড়ে তসলিমা নাসরিন দাঁত কিড়মিড়িয়ে লিখেছিলো "মোল্লারাও আজকাল বিজ্ঞান চর্চা করে।" এত শত কোটি নাস্তিকের মাঝে কয়জন আর বিজ্ঞানী? অনেকেই আর্টস কমার্স পড়ে। বিজ্ঞানের ব্যাপারে এদের জ্ঞান খুব সরলীকৃত। বৈজ্ঞানিক সত্য আর তত্ত্বের পার্থক্য অনেকেই করতে পারে না। কিছু শুনলেই বলে "বিজ্ঞান বলে...।" আচ্ছা বিজ্ঞান তো কোনো ব্যক্তি না। বিজ্ঞান বলে মানে বিজ্ঞানীরা বলেন। বিবর্তনবাদের জটিল আলাপে গেলাম না। একজন মুসলিম বলবে "শাইত্বানের প্ররোচনাই হাই ওঠে।" নাস্তিক বলবে, "কিন্তু বিজ্ঞান তো বলে অক্সিজেনের অভাবে হাই ওঠে।" উইকিপিডিয়ায় গিয়ে দেখেন এই তত্ত্ব বহু আগেই ভুল প্রমাণিত। হাই ওঠার আসল কারণ কী, একজনের দেখাদেখি আরেকজনের হাই ওঠে কেন এ সব আজও এক রহস্য।

.

এবার আসুন নীতি নৈতিকতার প্রশ্নে। এটা নাস্তিকদের জন্য সবচেয়ে অস্বস্তিকর ফীল্ডগুলোর একটি। এখানে তারা দেখে কোনটা মানলে ধর্মীয় বিধানের বিপরীতটা করা যায়। তাই তারা ইসলামের প্রাণের বদলে প্রাণ নীতির বিরুদ্ধে। কিন্তু যুদ্ধাপরাধ ইশ্যুতে এসে লেগেছে প্যাঁচ। অনেকে বলেছিল এই একটা মৃত্যুদন্ডই তারা চায়, তারপর আর না। তসলিমা নাসরিন বলেছিল সে যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসি চায় না। বাঙালিরা তখন আস্তিক-নাস্তিক নির্বিশেষে তাকে ধুয়েছে। আরজ আলি আর হুমায়ুন আজাদরা মরে গিয়ে বেঁচে গেছে। কখনো ভেবে দেখেছেন সব নাস্তিক কেন 'মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষের শক্তি'? কারণ পাকিস্তান ইসলামকে ঢাল বানিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধকে ব্যবহার করলে তাই ধর্মকে পঁচানোর একটা সুযোগ পাওয়া যায়। নরওয়ে বা জার্মানি আর বাংলাদেশ মিলে যদি এক দেশ হতো, তারপর ভাষার প্রশ্নে বাংলাদেশ যদি আলাদা হতো, তখন রাজাকারদের দাড়ি টুপি না-ও থাকতে পারতো। দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে নৈতিকতার কথাও ধরুন। সমকামিতা তাদের কাছে ব্যক্তিস্বাধীনতা কেন? কারণ ধর্ম এটা নিষিদ্ধ করেছে। অপেক্ষা করুন। অজাচার, মৃতকামিতা, পশুকামিতাও শীঘ্রই ব্যক্তিস্বাধীনতা হয়ে যাবে।

.

নাস্তিকদের অন্ধবিশ্বাসের আরেকটা উদাহরণ দিয়ে শেষ করছি। ধার্মিকদেরকে তারা বলে জন্মগত ধার্মিক, বাবা মা আস্তিক বলে সন্তানও আস্তিক। আর তারা বুদ্ধি বিবেচনা করে নাস্তিক। বাবা মা থেকে আলাদা হওয়াটাই যদি বুদ্ধি বিবেচনার লক্ষণ হয় তাহলে তো হুমায়ুন আজাদের ছেলেও অন্ধবিশ্বাসী, বাপের দেখাদেখি নাস্তিক। বুদ্ধি বিবেচনা খাটিয়েই কি কেউ বাপ মায়ের ধর্ম বেছে নিতে পারে না?

.

'প্রগতিশীলতা'র তাসের ঘর ফুঁ দিলেই পড়ে যায়। চটকদার শব্দশৈলীতে ঘাবড়ে না গিয়ে ফুঁ-টা দিতে হয়। শাইত্বানের চক্রান্ত অতিশয় দুর্বল।

৫৩

"একেক বিজ্ঞানী একেক কথা বলে। কারটা শুনবো?"

-উৎস: "হুজুর হয়ে"

সন্ধানীর কথায় চমকে তার দিকে ফিরলো কানিজ। টিএসসি'র এই প্রাণবন্ত পরিবেশে কথাটা কেমন বেখাপ্পা ঠেকলো। বেশ কয়েকদিন যাবত বই-ব্লগ-ফেসবুক ঘেঁটে বিবর্তনবাদের বিরুদ্ধের কয়েকটা লেখা পড়ছে সন্ধানী। সেগুলোই তার মাথা খেয়েছে।

.

কানিজ সাহস যুগিয়ে বললো, "আরে আজব! একেকজন একেক কথা বললেই কি তুই মেনে নিবি নাকি? তোর কি নিজের বিবেক-বুদ্ধি নেই?"

.

"বিবেক-বুদ্ধি আছে," অধৈর্য ভঙ্গিতে বললো সন্ধানী, "কিন্তু টেকনিকাল টার্মসের জটিল আলাপের একটা পর্যায়ে গিয়ে সেগুলো আর কাজ করে না, বুঝলি?"

.

"তো কোনো টার্ম না বুঝলে নেট ঘেঁটে জেনে নে। অথবা আমাকে জিজ্ঞেস কর। আমিও না পারলে বায়োকেমিস্ট্রির নাবিলা আছে। একটু কষ্ট করলেই তো হয়।"

.

"দ্যাখ তুই ফিজিক্সে পড়েই তো বিবর্তনবাদের অনেক কিছুই ক্লিয়ারলি বুঝিস না। জানি নাবিলারও অনেক কিছু ক্লিয়ার না। এখন আমরা যারা আর্টস-কমার্সের ছাত্রী, তারা কী করবো? পৃথিবীর এত রিকশাওয়ালা, শ্রমিক, কৃষক এরা কী করবে? সবাই একেকজন আরজ আলী মাতুব্বর হবে? তুইই বল, এটা সম্ভব?"

.

"দ্যাখ, সন্ধানী। কারো বোঝা-না বোঝা দিয়ে তো কিছু আসে যায় না, তাই না? যার পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আছে, যুক্তি আছে, মানুষ চাক্ষুষ দেখছে, সেসব কি মিথ্যা হয়ে যাবে?"

.

"আচ্ছা বল তো কানিজ, কয়জন জীবনে পানির ভেতর দিয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করে এক অণু অক্সিজেন আর দুই অণু হাইড্রোজেন তৈরি হতে দেখেছে?"

.

"আরে বাবা বিজ্ঞানীরা তো দেখেছেন নাকি?"

.

"তাহলে আমরা তাদের কথা শুনেই বিশ্বাস করবো?"

.

"তা কেন? তুই কোনো ল্যাবে গিয়ে বল, তোকে চাক্ষুষ দেখিয়ে দেবে।"

.

"আর বাকি কোটি কোটি যত থিওরি, সেসব দেখাবে? এক জীবনে সব দেখে শেষ হবে? নিয়ান্ডারথাল থেকে মানুষের উৎপত্তি আমাকে ল্যাবে দেখাবে?"

.

"শোন সন্ধানী, তোকে একটা কথা বলি।" মৃদু হাসলো কানিজ, "সবকিছু নিজ চোখেই দেখতে হবে তা তো আমরা বলি না।

বিজ্ঞানীরা হলেন বিজ্ঞানের প্রতিনিধি। সত্যবাদী প্রতিনিধি। তাঁদের সত্যবাদিতাই আমাদের জন্য যথেষ্ট। এতজন একসাথে মিথ্যা কেন বলবে?"

.

"এখন মুসলমানরা যদি বলে মোহাম্মদের (সাঃ) ৪০ বছরের সত্যবাদিতাই উনার ধর্মের সত্যতার প্রমাণ হিসেবে যথেষ্ট? সোয়া লাখ না জানি দুই সোয়া দুই লাখ...কতজন নবী যেন তোদের?"

.

"কী জানি মনে নেই।" জোর করে চেপে গেলো কানিজ।

.

সন্ধানী মরিয়া হয়ে বললো, "আচ্ছা এক লক্ষই ধরলাম। এখন যদি কেউ বলে এক লাখ মানুষ একজন ঈশ্বরের আরাধনা করতে বলে গেলো। এটা মিথ্যা হয় কী করে? কী জবাব দিবো?"

.

কানিজ মনে মনে জবাব গোছাতে গোছাতেই সন্ধানী আবার বললো, "এক বিজ্ঞানীর মরার একশ বছর পর প্রমাণ হয় তার থিওরি ভুল। কারো থিওরি নিয়ে জীবিতদের মধ্যেই হাজারো ডিবেট। ভয় হয় বুঝলি কানিজ, এই এক জীবনে এত ডিবেটের ভেতর থেকে সত্যটা বের করে নিতে পারবো কিনা।"

.

কানিজ বললো, "না পেলে না পেলি! কী আসে যায়? মরে গেলে সব শেষ।"

.

"যদি সব শেষ না হয় তখন?"

.

"তখন আল্লাহ, গড, ঈশ্বরকে বলিস তুই যথেষ্ট প্রমাণ পাসনি উনাকে বিশ্বাস করার।"

.

জিদ লাগলো সন্ধানীর। কানিজ যে নিজেই নিজের বিশ্বাসে অটল না, সেটা প্রায়ই কথার ফাঁকে টের পেয়ে যায় সন্ধানী। একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে গেলো সে, "সামনের মাসেই একটা নাটক নামাবো আমরা। অ্যাবসার্ডিস্ট থিয়েটারের। অ্যাবসার্ডিস্ট ফিলোসফি জানিস তো নাকি?"

.

"হুম," খুশি হয়ে উঠলো কানিজ, "জোস হবে তাহলে। কোন নাটক?"

.

"তাহলে তো এগুলোর মূল কথাগুলো জানিসই," বলে চললো সন্ধানী, "কেন এলাম? কোথায় যাবো? কেন বেঁচে আছি? কীই বা হবে বিবর্তনবাদ সত্যি হলে বা মিথ্যা হলে? কেন ভার্সিটিতে পড়ছি? মৃত্যুই যদি শেষ কথা হবে, তো আত্মহত্যা নয় কেন? অ্যাবসার্ড এই জগতের বাইরে সত্যিই কি কোনো মহাশক্তিধর সত্ত্বা আছে, যার কারণে এই অর্থহীন পৃথিবী অর্থপূর্ণ হয়? বল তো আমাদের নাস্তিকদের কাছে সত্যিই এর কোনো জবাব আছে?"

.

হাসার চেষ্টা করলো কানিজ, "জীবনটা অর্থহীন, তাই তুই এর উপর নিজের মতো করে অর্থ আরোপ করবি। এটাই তো অ্যাবসার্ডের সবচেয়ে সুন্দর দিকটা, নাকি?"

.

"হুম," দীর্ঘশ্বাসের ভঙ্গিতে বললো সন্ধানী, "হয়তো আমি আবার ধার্মিক হয়ে যাবো রে।"

.

"কী বলিস?" মুখ বাঁকালো কানিজ, "এত ধর্মের মাঝে কোনটা ঠিক কীভাবে বের করবি?"

.

"একটা একটা করে বাদ দিতে দিতে যাবো। আজ যেমন নাস্তিকতা নামের ধর্মটা বাদ দিলাম। এভাবেই যেতে থাকবো। শেষে কিছু না পেলে deist হয়েই থাকবো নাহয়, তবু atheist না।"

.

অনেকক্ষণ নীরবতার পর সন্ধানী হোস্টেলে ফেরার জন্য উঠলো, "যাই রে।" কিছু বললো না কানিজ। একটু দূর গিয়ে পেছন ফিরে সন্ধানী বললো, "কানিজ, শোন। ঠাকুমা আমার নাম সন্ধানী রেখেছেন একটা কারণে। যাতে আমি সত্যটা খুঁজে নেই। আমি সে নামের সার্থকতা রাখবোই।" বলে আবার হাঁটা দিলো সে।

.

তাকিয়ে ছিলো কানিজ। মাগরিবের আজানের শব্দে হুঁশ ফিরলো। রাতের ডানাগুলো ছড়িয়ে যাচ্ছে। অপ্রিয় একটা বাস্তবতার সময় ঘনিয়ে আসছে, যা সে ছাড়া কেউ জানে না। আগামী ১০-১১ ঘন্টা আস্তিক থাকবে সে। রাতের ভয়াল পরিবেশটা কেটে গিয়ে আবার যখন পাখি গাইবে গান, সূর্য ছড়াবে আলো, মানুষের পদভারে গমগম করবে শহর, তখন আবার সে ফিরে আসবে প্রিয় নাস্তিকতায়। প্রশান্তির দায়িত্বহীনতায়।

[বিঃদ্রঃ হুজুর হয়ে পেইজের লেখার লিঙ্কঃ https://www.facebook.com/Hujur.Hoye/posts/614380502088336

৫৪

ইসলাম কি তরবারীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছিল? একটি চতুরতাপূর্ণ প্রশ্ন

-শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ (হাফিযাহুল্লাহ)

বাংলা অনুবাদঃ সরল পথ

কাফির-মুশরিক-মুরতাদ, ইসলামবিদ্বেষী, নাস্তিক, প্রগতিশীল-সুশীল ও মুক্তমনাদের ইসলামের যে বিষয়টির ব্যাপারে সব চেয়ে বেশি অ্যালার্জি সেটা কি?

.

এক কোথায় উত্তর দেওয়া কঠিন। তবে যদি কোন শর্টলিস্ট করা হয় তবে পর্দা এবং জিহাদ একেবারে উপরের দিকেই থাকার করা। শুধু কাফির-মুশরিক, ইসলামবিদ্বেষীরাই না, বর্তমানের অনেক মুসলিমেরও এ দুটি বিষয়কে মেনে নিতে কষ্ট হয়। আর ইসলামবিদ্বেষীরাও তাদের এই হীনমন্যতাকে কাজে লাগিয়ে মডারেট নামধারী পরাজিত মানসিকতার এই মুসলিমদের দিয়েই ইসলামের নতুন গান্ধীবাদী, নারীবাদী, আধুনিক ব্যাখ্যা তৈরি করতে চায়।

.

"ইসলাম কি তরবারীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছিল" - খুব প্রচলিত একটি প্রশ্ন। আর প্রচলিত এই প্রশ্নের আছে বেশ কিছু প্রচলিত উত্তর। কিন্তু সঠিক উত্তর কি? জবাব দিচ্ছেন শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ হাফিযাহুল্লাহ।

.

.

আলহামদুলিল্লাহ, আমরা ইতোপূর্বে আলোচনা করেছি জিহাদ দুই প্রকারের হয়ে থাকে; লড়াইয়ের জন্য নিজে থেকে অগ্রসর হওয়া এবং আত্মরক্ষার্থে জিহাদ করা অর্থাৎ দুই প্রকারের জিহাদের একটি হচ্ছে আক্রমণাত্মক জিহাদ ও অপরটি আত্মরক্ষামূলক জিহাদ।

.

নিসন্দেহে আক্রমণাত্মক জিহাদের জন্য পদক্ষেপ ও প্রস্তুতি নেয়ার সাথে ইসলামের প্রসারের একটি বিরাট প্রভাব রয়েছে, এর মাধ্যমেই দলে দলে মানুষদের আল্লাহর দীনের দিকে নিয়ে আসা যায়। আর একারণেই, শত্রুদের অন্তর সদা সর্বদা জিহাদের ভয় কম্পমান থাকে।

.

ইংরেজি ভাষার একটি ম্যাগাজিন "মুসলিম ওয়ার্ল্ড" বলছে, “পশ্চিমা বিশ্বে অবশ্যই এক ধরণের ভয় কাজ করতে পারে, এর অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে মক্কায় সেই প্রথম ইসলামের প্রতিষ্ঠার পর থেকে ইসলামের অনুসারীদের সংখ্যা কখনো কমেনি, বরং এটা সব সময় শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে আর প্রসারিত হয়েছে। উপরন্তু ইসলাম নিছক একটি ধর্ম নয়, বরং এর অন্যতম একটি খুঁটি হচ্ছে জিহাদ”।

.

রবার্ট বেন বলেন, “মুসলিমরা আগেও একবার গোটা দুনিয়া বিজয় করে ছেড়েছে, আর এটা তারা আবারও করতে পারে”। ওরিয়েন্টালিস্টরা ইসলামের নামে বিষোদগার করে থাকে এই দাবী করার মাধ্যমে যে, এটা তরবারীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে।

.

প্রাচ্যবিদ থমাস আরনল্ড তার একটি বই “The Preaching of Islam” এ লিখেছেন, ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়নি, বরং এটা প্রসারিত হয়েছে শান্তিপূর্ণ দাওয়াহর মাধ্যমে, কোন ধরণের শক্তি প্রয়োগ ছাড়াই; উদ্দেশ্য মুসলিমদের মাঝে জিহাদের চেতনাকে বিনষ্ট করে দেয়া আর প্রমাণ করা যে, ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে প্রচারিত প্রসারিত হয়নি।

.

আর মুসলিমরা (এভাবেই)তাদের সেই সাজানো ফাঁদে ধরা দিল। একদিকে যখন তারা শুনতে পেল, প্রাচ্যবিদেরা(ওরিয়েন্টালিস্ট) অভিযোগ করছে যে, ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে, তারা বলতে লাগল, "তোমরা ভুল করছো, আরে তোমাদের নিজেদের লোকের কাছ থেকেই এর খণ্ডন হচ্ছে, তোমাদের নিজেদের লোকেরাই তোমাদের এই দাবীর বিরোধিতা করছে, এই যে দেখো থমাস বলেছে এই কথা, এটা ইত্যাদি"

.

মুসলিমদের মাঝে যারা পরাজিত মানসিকতার অধিকারী তারা এগিয়ে এল ইসলামকে রক্ষা করতে ! আর তারা ইসলামকে এই মিথ্যা অভিযোগের হাত থেকে মুক্ত করতে চাইল ! তাই ইসলাম তরবারীর মাধ্যমে প্রসারিত হয়েছে, একথা তারা অস্বীকার করলো, আর তারা বললো, ইসলামে জিহাদ বলে কিছু নেই, অবশ্য আত্মরক্ষার জন্য হলে ভিন্ন কথা। তাদের দৃষ্টিতে ইসলামে নিজে থেকে প্রস্তুতি নিয়ে আক্রমণাত্মক জিহাদ বলে কিছু নেই।

.

অথচ এ ধরণের মন্তব্য সত্যনিষ্ঠ মুসলিম আলেমগণের বক্তব্যের বিরুদ্ধে যায়, কুর'আন সুন্নাহর দলীল থেকে প্রমাণাদি উপস্থাপনের বিষয়টি তো আরো দূরে।

.

শাইখুল ইসলাম ইবনু তাইমিয়্যাহ রাহিমাহুল্লাহ মাজমু আল ফাতওয়া ২৮/২৬৩ এ বলেনঃ

.

উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল ধর্ম, মতবাদ হতে হবে শুধুমাত্র এক আল্লাহর জন্যে, আর আল্লাহর কালেমার দাবী হচ্ছে তা সবকিছুর উপরে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর কালাম হচ্ছে শ্রেষ্ঠ বাণী যার মাধ্যমে আল্লাহর কিতাবে তাঁর বক্তব্য সংরক্ষিত আছে, আর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, "আমি আমার রসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে"। [হাদীদ ৫৭;২৫]

.

নবী রাসূলগণ প্রেরণ ও কিতাব নাযিলের উদ্দেশ্য হচ্ছে মানবজাতি যেন ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে আর এটাই হচ্ছে সৃষ্টির উপর স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের হক। এরপর আল্লাহ মহামহিম বলছেন -

.

"আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচন্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্যে যে, আল্লাহ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রসূলগণকে সাহায্য করে"। [হাদীদ ২৫]

.

কাজেই যে বিচ্যুত হয়ে পড়ে আল্লাহর কিতাবের পথ হতে তাকে ফিরিয়ে আনতে হবে লৌহের শক্তি দ্বারা হলেও। এভাবেই এই দীনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা পায় কুর'আন ও তরবারীর মাধ্যমে। জাবির ইবন আব্দুল্লাহ(রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে আদেশ করেছেন এটা দিয়ে আঘাত করতে, মানে তরবারী দ্বারা, যে কেউ এটা থেকে ফিরে যায়, অর্থাৎ কুর'আন হতে"।

.

ইবনুল কাইয়িম রাহিমাহুল্লাহ তাঁর আল-ফারুসিয়াহ গ্রন্থে (পৃ ১৮) বলেনঃ

.

আল্লাহ তাঁকে (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কিয়ামত দিবসের পূর্বে প্রেরণ করেছেন- (এক হাতে) হেদায়াতের কিতাব কুর'আন ও (অন্য হাতে) বিজয়ী তরবারী সহকারে। (উদ্দেশ্য) যাতে, একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত উপাসনা বন্দেগী করা হয়ে থাকে শরীকবিহীন অবস্থায়, আর তাঁর রিযিক নির্ধারিত হয়েছিল তরবারী ও বর্শার ছায়াতলে। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা এই দীন ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন একদিকে দলীল প্রমাণ সাক্ষ্য সহকারে, এবং অপরদিকে তরবারী ও বর্শা দিয়ে, উভয়ে

এমনভাবে একত্রিত আছে যার একটি থেকে অপরটি আলাদা করা যায় না।

.

এখন কুর'আন ও সুন্নাহ হতে কিছু প্রমাণাদি উপস্থাপন করা হচ্ছে, এই দলীল প্রমাণাদি সুস্পষ্টভাবে তুলে ধরছে যে তরবারী হচ্ছে ইসলাম প্রচারের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম-

.

১-আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন, (অনুবাদ)-
"আল্লাহ যদি মানবজাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) গির্জা, এবাদত খানা, (ইহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলাতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন,যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর"। [সূরা হাজ্জ ২২;৪০]

.

"আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেতো। কিন্তু বিশ্ববাসীর প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু, করুণাময়।" [সূরা বাকারাহ ২৫১]

.

২- আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা আমাদেরকে আদেশ করেছেন কুফফারদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের প্রস্তুতি ও উপাদান সংগ্রহের জন্যে ও তাদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করে রাখার জন্য। আল্লাহ বলেন -

.

"আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চেনেন"। [সূরা আনফাল ৬০]

.

ইসলাম যদি কেবলমাত্র শান্তিপূর্ণ গোবেচারা নিরীহ উপায়েই বিস্তার লাভ করে থাকে, তাহলে কি সেই কারণ যার কারণে কুফফাররা এত ভীত সন্তস্ত হয়ে থাকে? তাদের এতে ভীত হওয়ার কি আছে? তাহলে কি তারা কেবলমাত্র মুখের জিভ নিঃসৃত কথা আর দাওয়াত শুনেই ভীত সন্ত্রস্ত?

.

সহীহ কিতাবদ্বয়ে একথা স্পষ্টভাবে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "I have been supported with fear as far as a month's journey." কুফফাররা কি এ কারণে ভয় পাবে যদি কেবল বলা হয়ে থাকে, "মুসলিম হও, আর যদি না হও তাহলে তোমরা স্বাধীন, যা ইচ্ছা তাই বিশ্বাস নিয়ে থাক আর যা খুশি তাই করে বেড়াও?" নাকি তাদের ভীত হবার কারণ জিহাদ (এর মুখোমুখি হওয়া) , (অন্যথায়) জিযিয়াহ কর আরোপ আর অপমান? যাতে করে তারা ইসলামে প্রবেশ করে আর এর মাধ্যমে তারা যাবতীয় অপমান থেকে মুক্তি পেতে পারে।

.

৩-যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকদেরকে ইসলামের দিকে আহবান করতেন, তার সে আহবানের সঙ্গী ছিল তরবারী, তিনি যাদেরকে আমীর করে পাঠাতেন তাদেরকেও অনুরুপ পদ্ধতি অনুসরণের আদেশ দিতেন, আর যখন লোকেরা ইসলামের দিকে আহবানের এই সর্বাত্মক পদ্ধতিটি দেখত, তখন তা তাদের আল্লাহর দীনের ব্যাপারে সন্দেহ দূর করার জন্যে যথেষ্ট বলে গণ্য হত।

.

বুখারী ৩৮৯৫ ও মুসলিম বর্ণণা করছেন, সাহল ইবন সাদ রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত, খায়বারর যুদ্ধে একদা রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আগামীকাল সকালে আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করবো যার হাতে আল্লাহ খায়বারে বিজয় দান করবেন এবং যাকে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল ভালবাসেন আর সেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে

ভালোবাসে। সাহল রা) বলেন, মুসলমানগণ এ জল্পনা কল্পনার মধ্যেই রাত কাটালো যে, তাদের মধ্যে কাকে অর্পণ করা হবে এ ঝাণ্ডা।

.

সকাল হলো, সবাই রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে আসলেন, আর প্রত্যেকেই মনে মনে এ ঝাণ্ডা লাভ করার আকাঙ্ক্ষা করছিলেন। তখন রাসুলুল্লাহ সা) বললেন, আলি ইবন আবু তালিব কোথায়? সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! তিনি তো চক্ষুরোগে আক্রান্ত অবস্থায় আছেন। তিনি বললেন, তাকে লোক পাঠিয়ে সংবাদ দাও। সে মতে তাঁকে আনা হল। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর উভয় চোখে থুথু লাগিয়ে তাঁর জন্যে দুয়া করলেন। ফলে চোখ এরূপ সুস্থ হয়ে গেল যে, যেন কখনো চোখে কোন রোগই ছিল না। এরপর তিনি তাঁর হাতে ঝাণ্ডা অর্পণ করলেন।

.

তখন আলী রা) বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! তারা আমাদের মত (মুসলমান) না হওয়া পর্যন্ত আমি তাদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাবো। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি বর্তমান অবস্থায়ই তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে উপনীত হও , এরপর তাদেরকে ইসলাম গ্রহণের প্রতি আহবান করো (যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে) ইসলামী বিধানে ওদের উপর যেসব হক বর্তায় সেসব সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত করে দিও। কারণ আল্লাহর কসম ! তোমার দাওয়াতের মাধ্যমে আল্লাহ যদি মাত্র একজন মানুষকেও হেদায়েত দান করেন তা হলে তা তোমার জন্য লোহিত বর্ণের (মূল্যবান) উটের মালিক হওয়া অপেক্ষাও অনেক উত্তম।

.

কাজেই ইসলামের দিকে এই আহবানটি শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে হয়েছিল।

.

মুসলিম (৩২৬১) বর্ণিত হাদীসে বুরাইদা বলেন, ‘যখন আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন একজন ব্যক্তিকে কমাণ্ডার(আমির) নিযুক্ত করতেন কোন বাহিনীর নেতা হিসেবে কিংবা কোন কাফেলা আক্রমণকারী দলের প্রধান হিসেবে, তিনি সেই ব্যক্তিকে উপদেশ দিতেন আল্লাহকে ভয় করতে, তার নিজের জন্য ও তার সাথী মুসলিমদের জন্য, এরপর তিনি বলতেন,

.

“...যে আল্লাহর সাথে কুফরী করে, ‘বিসমিল্লাহ’ বলে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো। যুদ্ধ করো, তবে তোমরা সীমালংঘন করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, হাত পা কেটে খণ্ড খণ্ড করে বিকৃত করো না এবং শিশুদেরকে হত্যা করো না। আর যখন তোমার মুশরিক শত্রুদের সাথে যুদ্ধ বেঁধে যায়, তখন তিনটি নীতির দিকে তাদেরকে আহবান জানাও। এর যে কোনটি সে যখন মেনে নেয় তখন তা গ্রহণ করে নাও এবং যুদ্ধ বন্ধ করে দাও।

.

অতঃপর তাদেরকে সর্বপ্রথম ইসলাম কবুল করার দিকে আহবান জানাও। যদি তারা তোমার এ আহবানে সাড়া দেয় তখন তুমি তাদের এ সাড়া কবুল করে নাও এবং জিহাদ বন্ধ করে দাও।...আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায় তখন তাদেরকে জিযিয়াহ কর প্রদানে বাধ্য করো। যদি তারা তা মেনে নেয়, তোমরা তা কবুল করে নাও এবং তাদের সাথে এ অবস্থায়ও জিহাদ বন্ধ রাখো। আর যদি তারা উক্ত জিযিয়াহ প্রদানে অস্বীকৃতি জানায়, তখন (তৃতীয় ও শেষ ফয়সালা) আল্লাহর কাছে মদদ ও সাহায্য কামনা করো এবং তাদের সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো...।“

.

কাজেই আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কমাণ্ডারদের আদেশ করেছেন কুফফারদের আহবান করতে ইসলামের দিকে যখনএই আহবানের সংগী ছিল মাথার উপরে তরবারীর ঝলকানি। যদি তারা মুসলিম হতে অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদের অবশ্যই জিযিয়াহ কর দিতে হবে বিনয়াবনত হয়ে। আর যদি তারা এতেও রাজী না হয়, তাহলে তাদের জন্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকল না তরবারী ব্যতীত- “যদি তারা (উক্ত জিযিয়াহ প্রদানে) অস্বীকৃতি জানায়, তখন (তৃতীয় ও শেষ ফয়সালা) আল্লাহর কাছে মদদ ও সাহায্য কামনা করো এবং তাদের সাথে প্রত্যক্ষ যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়ো ”

.

৪- আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "আমি কিয়ামত দিবসের পূর্বে তরবারী হাতে এ উদ্দেশ্য প্রেরিত হয়েছি যে, কেবলমাত্র এক আল্লাহ (সুবহানাহু ওয়া তায়ালারই) ইবাদত করা হবে, আর আমার রিযিক আসে আমার বর্শার ছায়া হতে, আর যারা আমার আদেশের বিরুদ্ধে যাবে তাদের জন্য অপমান (আর লাঞ্ছনা) তাকদীরে নির্ধারিত হয়েছে, আর যে কেউ তাদের অনুকরণ করে সে তাদেরই একজন"। মুসনাদে আহমান, ৪৮৬৯; সহীহ আল জামে',২৮৩১.

.

এ ঘটনাটি, অর্থাৎ ইসলামের প্রসারের একটি মাধ্যম হিসেবে তরবারী ও শক্তি ব্যবহৃত হয়েছে এটি ইসলামের জন্য লজ্জা বা হীনমন্যতার কিছু নয়, বরং এটি ইসলামের একটি শক্তি ও গুণ, কেননা এর ফলে মানুষ সেই দীনের সাথে লেগে থাকে যা তাদের দুনিয়া ও আখেরাতে উপকৃত করবে। বেশির ভাগ লোকেরাই বোকা এবং জ্ঞান ও বিচক্ষণতার অভাব তাদের মধ্যে রয়েছে, আর তাদেরকে যদি তাদের নিজেদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেয়া হয় তাহলে তারা সত্যের প্রতি বরাবরের মতই অন্ধ গাফেল হয়ে থাকে।

.

তারা তাদের খামখেয়ালী মনোভাব ও কামনা বাসনার মাঝে নিমজ্জিত হতে থাকে। কাজেই আল্লাহ জিহাদের প্রেসক্রিপশন দিয়েছেন যাতে তাদেরকে সত্যের উপর ফিরিয়ে আনা যায় আর এটা তাদের উপকার করে। নিসন্দেহে বিচক্ষণতা নির্দেশ করে যে, বোকাদেরকে তাদের মূর্খতাপূর্ণ কাজ থেকে বিরত রাখতে হবে এবং তাদেরকে এমন কিছুর দিকে জোর করতে হবে যা তাদের উপকার করবে।

.

আল বুখারী (৪৫৭৭) বর্ণনা করেছেনঃ "তোমরাই হলে সর্বোত্তম উম্মত, মানবজাতির কল্যানের জন্যেই তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দান করবে ও অন্যায় কাজে বাধা দেবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনবে"।(আলে ইমরান ১১০) এই আয়াতটি সম্পর্কে আবু হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, মানুষের জন্য মানুষ কল্যাণজনক তখনই হয় যখন তাদের গ্রীবাদেশে শিকল লাগিয়ে নিয়ে আসে, এরপর তারা ইসলামে প্রবেশ করে"। জিহাদ ব্যতীত কি লোকদের ঘাড়ে শিকল লাগানো অবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব?

.

এটা এমন একটি বিষয়, যার জন্য ইসলাম প্রশংসার দাবীদার, নিন্দনীয় নয়। পরাজিত ধ্বজাধারীদের উচিত আল্লাহকে ভয় করা এ কারণে যে তারা আল্লাহর দীনকে বিকৃত করছে, আর একে দূর্বল করে তুলছে বার বার এ দাবী করে যে, এটা হচ্ছে শান্তির ধর্ম।

.

হ্যাঁ, এটা শান্তির ধর্ম ঠিক, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে কথাটি বলা হয়ে থাকে তা হচ্ছে, সমস্ত মানবজাতিকে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কিছুর ইবাদত করা থেকে রক্ষা করার মাধ্যমে, আর সমগ্র মানব জাতিকে আল্লাহর আইন বিধানের নিকট আত্মসমর্পণ করার মাধ্যমে। এটা হচ্ছে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালার মনোনীত দীন, কোন ব্যক্তি বা মানুষের উর্বর চিন্তাধারার ফসল নয়। কাজেই যারা এর প্রচারের জন্য কাজ করছে তাদের উচিত নয় এই দীনের চূড়ান্ত লক্ষ্য প্রকাশে লজ্জাবোধ করা, আর তা হচ্ছে সকল দীনের উপর আল্লাহর দীন বিজয়ী থাকবে এবং সকল ইবাদত একমাত্র আল্লাহর জন্যেই হতে হবে।

.

যখন লোকেরা এমন কিছু মতবাদ (মার্কসবাদ, জাতীয়তাবাদ, উদারতাবাদ ইত্যাদি) আর তন্ত্র মন্ত্র(গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র ইত্যাদি) ধ্যান ধারণার অনুসরণ করে যেগুলোর জন্মই হয়েছে মানুষের মস্তিষ্ক হতে, প্রতিটি মতবাদ আর ধ্যান ধারণা, প্রতিটি সিস্টেম, আইন কানুন যা আমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে । এই মানব রচিত মতবাদগুলোর একটি আরেকটি থেকে আলাদা বৈশিষ্ট্যের হয়ে থাকে, ফলে এদের একটি সিস্টেম আরেকটি সিস্টেমের উপর শ্রেষ্ঠত্ব বা প্রাধান্য বিস্তারের চেষ্টা করে থাকে, কাজেই এই মতবাদগুলো একে অপরের মোকাবেলায় ততক্ষণ পর্যন্ত টিকে থাকে বা সহ অবস্থান করতে পারে যখন তা

নিজেদের (ভৌগলিক কিংবা রাজনৈতিক) সীমানা দ্বারা রক্ষিত হয়, তখন এক সীমারেখার আইন অন্য সীমানায় চলে না।

.

এভাবে ভিন্ন বৈশিষ্ট্য হওয়া সত্ত্বেও এই সাংঘর্ষিক মানব রচিত বিধান ও সিস্টেমগুলো একে অপরের মোকাবেলায় টিকে থাকে। কিন্তু যখন এদের সাথে এমন একটি বিধান থাকে যা মানব রচিত নয়, বরং আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সিস্টেম ও আইন বিধান, আর এগুলোর পাশাপাশি যদি মানুষের রচিত আইন বিধান থাকে, সিস্টেম থাকে, তখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ মৌলিকভাবে ভিন্ন। তখন (এই মতবাদগুলোর সহাবস্থানের কোন সম্ভাবনা নেই) আল্লাহ কর্তৃক মনোনীত সিস্টেমের অধিকার হচ্ছে এই সকল বাধা বিপত্তিকে অপসারণ করা আর মানুষ হয়েও মানুষের গোলামী থেকে মানুষকে মুক্ত করা । [ফিকহ আল-দাওয়াহ , সাইয়েদ কুতুব ২১৭-২২২]

.

ফাতাওয়া আল লাযনাহ আল দাইমাহ (১২/১৪) তে বর্ণিতঃ

.

যারা ইসলামের বার্তার প্রতি সাড়া দিয়েছে ও কর্ণপাত করেছে তাদের ক্ষেত্রে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে দলীল-প্রমাণাদি সহকারে, আর যারা উদ্ধত, দাম্ভিক অহংকারী ও গোঁয়ার তাদের ক্ষেত্রে ইসলাম প্রসারিত হয়েছে শক্তি ও তরবারীর মাধ্যমে, যে পর্যন্ত না তারা নত হয়েছে, অহংকার দাম্ভিকতা পরিত্যাগ করেছে, আর সবশেষে সত্য ও বাস্তবতার সামনে আত্মসমর্পণ করেছে।

.

আর আল্লাহই সবচেয়ে ভালো জানেন।

.

[বিঃদ্রঃ শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদের (হাফিযাহুল্লাহ) islamqa.info/en সাইট থেকে গৃহীত
বাংলা অনুবাদঃ সরলপথ
ইংরেজি আর্টিকেলের লিঙ্কঃ https://islamqa.info/en/43087]

৫৫

যে বিয়ে আকাশে হয়েছিল

-শিহাব আহমেদ তুহিন

ইতিহাসে যে মানুষটির বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী বই লেখা হয়েছে তিনি হচ্ছেন মুহম্মদ ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ। ভাবতে অবাক লাগে, সেই তিনিই ইতিহাসে একমাত্র ব্যক্তি যিনি একটা জাতির ব্যবসা-বাণিজ্য,রীতি-নীতি থেকে শুরু করে সবকিছু প্রায় রাতা-রাতি সময়ের ব্যবধানে পরিবর্তন করেছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধচারীরা যখন তাঁর দেখানো অনুপম আদর্শের চেয়ে ভালো কিছু প্রবর্তন করতে ব্যর্থ হয়েছে, তখন অভিযোগের আঙ্গুল তুলেছে তাঁর পবিত্র ব্যক্তিগত জীবনের দিকে। যাদের নিজেদের ভালো-খারাপের কোন ষ্ট্যাণ্ডার্ড নেই, তারাই বলতে গেল তাঁর জীবনের প্রায় সবকিছুরই সমালোচনা করেছে। এই সমালোচনার লিস্টে তাদের খুব প্রিয় একটা টপিক "রাসূল ﷺ ও যয়নাব(রাঃ) এর বিয়ে।"

.

যয়নাব(রাঃ) ছিলেন রাসূল(সাঃ) এর ফুফাতো বোন আর তাঁর আযাদকৃত দাস এবং একসময়কার পালকপুত্র যায়েদ বিন হারেছার তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রী। যয়নাব(রাঃ) এর সাথে রাসূল ﷺ এর বিয়ে নিয়ে বিভিন্ন তাফসীর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করে এবং তাতে নিজেদের কল্পনার রং ছড়িয়ে ইসলাম-বিদ্বেষীরা প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, রাসূল ﷺ একজন নারী-লোভী ছিলেন এবং তিনি যয়নাব(রাঃ) কে অর্ধ-উলঙ্গ দেখে তার রূপে আসক্ত হয়ে তার প্রেমে পড়ে যান এবং পরবর্তীতে তাকে বিয়ে করেন। এক্ষেত্রে তারা ইবনে ইসহাক, আল ওয়াকিদী, ইবনে সাদ এবং ইবনে জারীর তাবারী থেকে উদ্ধৃত করে। তবে সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং সবচেয়ে বেশী উদ্ধৃত করা হয় ইবনে জারীর তাবারী(রহঃ) এর গ্রন্থ থেকে ।

.

তাবারী(রহঃ) এর গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেয়ার পূর্বে আমি পাঠকদের এই তথ্যটুকু দিতে চাই যে, রাসূল ﷺ সম্পর্কিত কোন বর্ণনা বা উদ্ধৃতি পেলেই মুসলিমরা সেটাকে সত্যরূপে গ্রহণ করে না। পূর্ববর্তী আলেমগণ বেশ নিষ্ঠার সাথে গড়ে তুলেছিলেন "হাদীস শাস্ত্র"। তারা দেখিয়েছিলেন কিভাবে একটি হাদীস সঠিক, দুর্বল কিংবা মিথ্যা কিনা তা নির্ণয় করা যায়। একটি হাদীসের মূলত দুটি ভাগ থাকে। একটি হচ্ছে সনদ বা তথ্যসূত্র এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে মতন বা বর্ণনা। একটি হাদীস বেশ কয়েকজন রাবী (হাদীস বর্ণনাকারী) বর্ণনা করে থাকেন; যদি প্রত্যেক রাবী বিশ্বস্ত এবং ধারাবাহিক না হয়ে থাকেন, তবে সে হাদীস গ্রহণযোগ্য হয় না। ইবনে জারীর তাবারী(রহঃ) তার গ্রন্থে হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে এ নীতির প্রয়োগ করেননি। তিনি ভালো-খারাপ সকল ব্যক্তির কাছ থেকেই বর্ণনা গ্রহণ করেছেন। তার তাবারী গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি লিখেন-

.

"আমি পাঠকদের সতর্ক করতে চাই যে, এই বইয়ে আমি কিছু মানুষ আমার নিকট যে খবর বর্ণনা করেছে তার উপর নির্ভর করে সবকিছু লিখেছি। আমি কোন যাচাই-বাছাই ছাড়াই গল্পগুলোর উৎস হিসেবে বর্ণনাকারীদেরকে (ধরে) নিয়েছি........। যদি কেউ আমার বইয়ে বর্ণিত কোন ঘটনা পড়ে ভয় পেয়ে যান, তাহলে তার জানা উচিৎ যে, এই ঘটনা আমাদের কাছ থেকে আসেনি। আমরা শুধুমাত্র তাইই লিখেছি যা বর্ণনাকারীদের কাছ থেকে পেয়েছি।"

.

ইবনে কাসির(রহঃ), ইবনে জারীর তাবারী(রহঃ) এর এই নীতির সমালোচনা করে লিখেন, "ইমাম ইবনে জারীর(রহঃ) সঠিক নয় এরূপ বহু অসার বর্ণনা করেছেন, যেগুলো বর্ণনা করা উচিৎ নয় বলে আমরা তা ছেড়ে দিলাম। কেননা, এগুলোর মধ্যে একটিও প্রমাণিত ও সঠিক নয়।"[১]

.

অপরদিকে ইবনু হাজার(রহঃ) , ইবনে জারীর তাবারী(রহঃ) কে কিছুটা ডিফেন্ড করে লিখেন, " এটি তাবারীর একক বিষয় নয়

এবং এই বিষয়ে তাকে পৃথকভাবে দোষ দেয়ার কিছু নেই। দ্বিতীয় হিজরী শতাব্দী থেকে পরবর্তী যুগের অধিকাংশ মুহাদ্দিসগণ মনে করতেন যে, সনদসহ সহীহ হাদীস উল্লেখ করলেই দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল এবং তারা যিম্মাদারী থেকে মুক্ত হয়ে গেলেন।"[২]

....

এখন দেখা যাক, ইবনে. জারীর তাবারী(রহঃ) আসলে কি লিখেছিলেন যা নিয়ে মুহাদ্দিসগণ এতোটা আপত্তি তুলেছিলেন। ইবনে জারীর তাবারী(রহঃ) তার তারীখ(৩/১৬১) এবং ইবনে সাদ তার তাবাকাত(৮/১০১) গ্রন্থে উল্লেখ করেন,

.

"মুহম্মদ ইবনে উমার বলেছেন,আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আল আসলামী বলেছেন, মুহম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া ইবনে হিশাম বলেছেন "রাসূল ﷺ যায়েদ বিন হারেছার বাসায় তাকে খুঁজতে গেলেন, তখন যায়েদ কে বলা হতো 'মুহম্মদের পুত্র'। কিন্তু তিনি তাকে বাসায় খুঁজে পেলেন না। এমতাবস্থায়, যয়নাব তাকে অভ্যর্থনা জানাতে তার রাতের পোশাক পরে বের হলেন। নবী ﷺ তার মুখ ফেরালেন এবং তিনি(যয়নাব) বললেন, 'এ আল্লাহর নবী! সে এখানে নেই, দয়া করে ভেতরে আসুন।' কিন্তু নবী ﷺ [ভেতরে প্রবেশ করতে] রাজী হলেন না। তিনি(যয়নাব) রাতের পোশাক পরে বের হয়েছিলেন,কারণ তাকে বলা হয়েছিল নবী ﷺ দরজায় দাঁড়িয়ে, তাই তিনি তাড়াহুড়ো করেছিলেন। তিনি নবীর হৃদয়ে জায়গা করে নিলেন। নবী ﷺ অস্পষ্ট গুঞ্জন করতে করতে বের হয়ে গেলেন, (যার মধ্যে শুধু এতোটুকু বোঝা গেল) 'সকল প্রশংসা তার যিনি হৃদয়ের পরিবর্তন করেন।'

.

যখন যায়েদ বাসায় আসলেন তখন তাকে বলা হলো, নবী ﷺ তাদের বাসায় এসেছিলেন। যায়েদ তখন যয়নাবকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি কি তাকে ভেতরে আসতে বলনি?' যয়নাব বললেন, 'আমি বলেছিলাম কিন্তু তিনি আসেননি। যায়েদ জিজ্ঞেস করলেন, 'তিনি কি কিছু বলে যাননি?' যয়নাব(রাঃ) বললেন, 'তিনি গুঞ্জন করতে করতে বের হয়ে গেলেন, আমি তার কিছুই বুঝতে পারিনি, শুধু এতোটুকু বলতে শুনেছিলাম, 'সকল প্রশংসা তার যিনি হৃদয়ের পরিবর্তন করেন।'

.

তারপর যায়েদ, রাসূল ﷺ এর কাছে আসলেন এবং বললেন, ' হে আল্লাহর নবী! আমাকে বলা হয়েছে আপনি আমাদের বাসায় এসেছিলেন কিন্তু ভেতরে আসেননি। যদি এটা এই কারণে হয়ে থাকে, আপনি যয়নাবকে পছন্দ করেন, তাহলে তাকে আপনার জন্য আমি ত্যাগ করব। কিন্তু নবী ﷺ বললেন, 'তোমার স্ত্রীর সাথে থাক'। এরপর যায়েদ পুনরায় জিজ্ঞেস করলে নবী ﷺ আবার বললেন, 'তোমার স্ত্রীর সাথে থাক।' কিন্তু যায়েদ যয়নাবকে তালাক দিল এবং তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে গেল।

.

এরপর (একদিন) নবী ﷺ যখন আয়েশা(রাঃ) এর সাথে কথা বলছিলেন তখন জিবরাইল(আঃ) তার কাছে ওহী নিয়ে আসলেন। তিনি স্বস্তি পেলেন এবং হেসে হেসে বললেন, 'কে যয়নাবের কাছে যাবে এবং তাকে বলবে যে আল্লাহ তাকে আমার স্ত্রী বানিয়েছেন। তারপর তিনি এ আয়াতটি তিলওয়াত করলেন, ' আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন....................' থেকে শেষ পর্যন্ত।"

.

এবার আমরা দেখি এ বর্ণনার সনদে কোন সমস্যা আছে কিনা!

প্রথম সমস্যাঃ মুহম্মদ ইবনে উমার আল ওয়াকেদীকে মিথ্যাবাদী বলা হয়। আহমেদ ইবনে হাম্বল বলেছেন, ' সে একজন মিথ্যাবাদী, যে কিনা হাদীস বানাত।' মুরা বলেছেন, 'তার হাদীস লিখা উচিৎ না।' দারকান্দী বলেছেন, 'তার মধ্যে দুর্বলতা আছে।'[৩]

.

দ্বিতীয় সমস্যাঃ আবদুল্লাহ ইবন আমীর আল আসলামীকে দুর্বল বলা হয়। ইবনে হাজার আল আসকালানী এবং আমীর আল মাদানি তাকে দুর্বল বলেছেন। [৪]

.

তৃতীয় সমস্যাঃ মুহম্মদ ইবনে ইয়াহিয়া। তিনি বিশ্বস্ত কিন্তু সমস্যা হচ্ছে তিনি কখনো নবী ﷺ এর সাথে সরাসরি কথা বলেননি। ইমাম আল-যাহবী বলেছেন, 'তিনি ৪৭ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন'[৫] আমরা জানি নবী(সাঃ) ১১ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। তাই নবী(সাঃ) ও ইবনে ইয়াহিয়ার জন্মের মাঝে প্রায় ছত্রিশ বছরের ব্যবধান ছিল।

....

.

ইবনে তাবারী(রহঃ) তার বই আল তারিখে(২২/১৩) তে একই ঘটনা একটু অন্যভাবে বর্ণনা করেছেনঃ

.

"ইউনুস আমাকে বলেছেন,নবী ﷺ যায়েদ বিন হারিছাকে তার ফুফাতো বোন যয়নব বিনতে জাহশের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন,একদিন নবী ﷺ তাকে খুঁজতে তার বাসায় গেলেন, তার বাসায় দরজা বলতে ছিল কেবল একটুকরো কাপড়, বাতাসে কাপড়টি উড়ে গেল এবং যয়নাবকে প্রকাশ করে দিল।উনার পা অনাবৃত ছিল। তিনি নবীর হৃদয়ে জায়গা করে নিলেন এবং তারপর থেকে তিনি অপরজনকে(যায়েদকে) ঘৃণা করতেন। একদিন যায়েদ নবী ﷺ এর কাছে এসে বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমি আমার স্ত্রীকে ত্যাগ করতে চাই।' তিনি [নবী ﷺ] বললেন, 'কেন? তোমার কি তার ব্যাপারে কোন সন্দেহ আছে?' তিনি(যায়েদ) উত্তর দিলেন, " না! আল্লাহর শপথ! আমার তার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।আমি তো তার মাঝে কেবল ভালোই দেখেছি।' তারপর নবী ﷺ বললেন, 'তোমার স্ত্রীর সাথে থাক এবং তার ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করো!

.

এই কারণেই আল্লাহ বলেছেন, 'তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত।' [৬]

.

এই হাদীসটি মুদিল(অর্থাৎ, কমপক্ষে দুইজন বর্ণনাকারী এখানে মিসিং)। কারণ ইবনে যায়েদ সাহাবী কিংবা তাবেয়ী কোনটাই ছিলেন না। এছাড়া এখানকার বর্ণনাকারীগণ নির্ভরযোগ্য নন।

....

.

এবার ইবনে ইসহাকের বর্ণনা উল্লেখ করছিঃ

.

"যায়েদ অসুস্থ থাকার কারণে রাসূল ﷺ তাকে দেখতে যান। যায়েদের স্ত্রী যয়নাব তখন তার মাথার কাছে বসে তার সেবা করছিলেন। যখন সে (যয়নাব) কিছু কাজ করতে বাইরে গেলেন,তখন নবী ﷺ তার দিকে তাকালেন,তার মাথা নিচু করলেন এবং বললেন, 'সকল প্রশংসা তাঁর! যিনি চোখ ও হৃদয়ের দিক পরিবর্তন করেন।' তখন যায়েদ বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমি কি তাকে আপনার জন্য তালাক দিব? কিন্তু নবী ﷺ জবাব দিলেন, 'না'। তারপর এই আয়াত অবতীর্ণ হলোঃ ' আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন; তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর। আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিত।"[৭]

.

এই হাদীসটির সবচেয়ে বড় সমস্যা হচ্ছে এর কোন সনদই উল্লেখ করা হয়নি, এছাড়া ইবনে ইসহাক রচিত, 'সিরাত ইবনে হিশাম' গ্রন্থে এমন কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

....

সুতরাং, আমরা বুঝতে পারলাম যে তিনটি হাদীসেরই সনদে বড়-সড় সমস্যা আছে। এবার যদি আমরা হাদিসগুলোর মতন বা বর্ণনাগুলোর দিকে তাকাই, তাহলে অনেক অসামঞ্জস্যতা দেখতে পাব। কোথাও বলা আছে যয়নাব(রাঃ) রাতের পোশাক পরে বের হন, আরেক জায়গায় বলা আছে, বাতাসে পর্দা উড়ে যাওয়াতে যয়নাব(রাঃ) এর পা দেখা গিয়েছিল। ইবনে ইসহাকের বর্ণনায় যায়েদ(রাঃ) অসুস্থ ছিলেন অপরদিকে তাবারীর বর্ণনায়, যায়েদ(রাঃ) বাসার বাইরে ছিলেন। কিভাবে একজন মানুষ একইসাথে অসুস্থ হয়ে বিছানায় আবার বাসার বাইরে একইসময়ে থাকেন?

.

অনেকে ভাবতে পারেন এই গল্পগুলো কিতাবগুলোতে আসলো কিভাবে যদি সত্যিই এর কোন উৎস না থেকে থাকে। এর কারণ সম্ভবত দুইটিঃ

.

১) আল ওয়াকেদী যিনি কিনা মিথ্যাবাদী হিসেবে সুপরিচিত, তিনি এই গল্পটি তৈরি করেছিলেন।

.

২) বাইবেলে বর্ণিত রাজা দাউদ ও বাতসেবার গল্প পড়ে কেউ এই গল্পটি তৈরি করেছে।[৮] গল্পটিতে রাজা দাউদ, সুন্দর দেহের অধিকারী বাতসেবাকে নগ্ন অবস্থায় গোসল করতে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং পরবর্তীতে বাতসেবার স্বামীকে হত্যা করে বাতসেবাকে নিজের কাছে নিয়ে নেন।

[ইন শা আল্লাহ চলবে]

=======================

তথ্যসূত্রঃ

[১] তাফসীর ইবনে কাসির-১৫ নং খন্ড, পৃষ্ঠা-৮০৫

[২] লিসানুল মিযান ৩/৭৪

[৩] মিযান আল-আতিদাল ফি নিকাদ আল রিজাল- ইমাম শামসুদ্দিন - খন্ড ৬, পৃষ্ঠা-২৭৩

[৪] তাকবীর আল তাদীব-ইবনে হাজার আসকালানী-পৃষ্ঠা ২৫১

[৫] সিয়ার আল আম আল নুবালা-ইমাম শামস আল দ্বীন আল যাহবী, খন্ড ২, পৃষ্ঠা-৫৬২

[৬] The history of Al Tabari- The victim of Islam, Translated by Michael Fishbein [State University of New York Press, Albany, 1997], Volume VIII, pp. 2-3

[৭] জেনারেল আহমাদ আবুল ওয়াহাব, তাঅ'আদুদ নিসা আলা আমিয়া ওয়া মাকান্নাত আল মার'আ ফি আল ইয়াহুদিয়া ওয়া আল মাসিয়াহ ওয়া আল ইসলাম, পৃষ্ঠা-৬৮

[৮] Holy Bible, 2 Samuel, Chapter 11

৫৬

যে বিয়ে আকাশে হয়েছিল -২

-শিহাব আহমেদ তুহিন

(প্রথম পর্বের জন্য দেখুন (#সত্যকথন) ৫৫)

.

মুহম্মদ ﷺ কেন যয়নাব (রাঃ) কে বিয়ে করেছিলেন?

এর কারণটা জানতে হলে আমাদের ইতিহাসটা একটু নিরেপেক্ষভাবে জানার চেষ্টা করতে হবে। প্রথমে দেখি, যায়েদ(রাঃ) ও যয়নাব(রাঃ) এর বিয়ে পূর্ব ও পরবর্তী প্রেক্ষাপট কেমন ছিল। জনপ্রিয় ও অন্যতম বিশুদ্ধ তাফসীর গ্রন্থ তাফসীর ইবনে কাসির আমাদের বলছে,

.

"রাসূল ﷺ যখন যায়েদ বিন হারেসার পয়গাম নিয়ে যয়নাব বিনতে জাহশ(রাঃ) এর কাছে হাজির হন। তিনি (যয়নব) উত্তর দিলেন, "আমি তাকে বিয়ে করবো না।"[১]

.

যয়নাব(রাঃ) সরাসরি প্রত্যাখ্যান অনেকের কাছে বেশ রুঢ় মনে হতে পারে, কারণ এখানে প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন স্বয়ং রাসূল ﷺ। কেন তিনি সরাসরি না করেছিলেন? এর উত্তর দিয়েছেন মাওলানা ইদরীস কান্ধলবী(রহঃ) তার 'সীরাতে মোস্তফা' গ্রন্থে। তিনি লিখেছেন,

.

"যায়েদ বিন হারেছা(রাঃ) ছিলেন রাসূল ﷺ এর আযাদকৃত ক্রীতদাস। অপরদিকে হযরত যয়নাব (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত খানদান পরিবারের সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মহিলা। সেই সাথে তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ এর ফুফাতো বোন। আর দেশের সামাজিক প্রচলন হিসেবে তারা আযাদকৃত ক্রীতদাসের সাথে আত্মীয়তা গড়াকে খুবই আপত্তিকর,মানহানিকর ও অশোভনীয় বলে বিবেচনা করতেন। আর তাই রাসূল ﷺ যখন তার আযাদকৃত গোলাম যায়েদের জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিলেন তখন যয়নাব ও তার ভাই তা সুস্পষ্টভাবে প্রত্যাখ্যান করলেন।[২]

.

এ পর্যায়ে আল্লাহর নির্দেশ এলোঃ

.

"আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন কাজের আদেশ করলে কোন ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীর সে বিষয়ে ভিন্ন ক্ষমতা নেই যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ অমান্য করে সে প্রকাশ্য পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়।" [৩]

.

এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসির বর্ণনা করেন, " এটা(আয়াতটা) শুনে হযরত যায়নাব (রাঃ) বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল ﷺ ! আপনি কি এ বিয়েতে সম্মত আছেন?' উত্তরে তিনি বললেন, 'হ্যাঁ'। তখন হযরত যয়নাব (রাঃ) বললেন, 'তাহলে আমারও কোন আপত্তি নেই। আমি আল্লাহর রাসূল ﷺ এর বিরোধিতা করবো না, আমি তাকে আমার স্বামী হিসেবে বরণ করে নিলাম।'[১]

.

যারা আলোচনার দীর্ঘসূত্রিতায় বিরক্ত হচ্ছেন, তাদেরকে বলব ধৈর্য ধরে আরেকটু পড়ে যেতে। কারণ,এতোক্ষণ যা আলোচনা করেছি তা অনেক সন্দেহ নিরসন করবে। সূরা আল আহযাবের ৩৮ নং আয়াত এখানে ভেঙ্গে ভেঙ্গে উল্লেখ করছিঃ

.

i) আল্লাহ যাকে অনুগ্রহ করেছেন; আপনিও যাকে অনুগ্রহ করেছেন: এ আয়াতে যায়েদ বিন হারেছার(রাঃ) কথা বলা হয়েছে। তার প্রতি আল্লাহর বিশেষ অনুগ্রহ ছিল। তাকে আল্লাহ ইসলাম ও নবী ﷺ কে খুব কাছ থেকে অনুসরণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। যায়েদ(রাঃ) যখন খাদিজা (রাঃ) এর ক্রীতদাস ছিলেন, তখন তার চাল-চলন রাসূল ﷺ কে মুগ্ধ করে এবং তিনি তাকে মুক্ত করে দেন। তিনি ছিলেন রাসূল ﷺ এর পালকপুত্র আর সবাই তাকে যায়েদ বিন মুহম্মদ" ডাকত। এটা ছিল যায়েদ (রাঃ) এর প্রতি রাসূল ﷺ এর বিশেষ অনুগ্রহ।

.

কিন্তু আল্লাহতায়ালা পালক পুত্রের বিধান রহিত করে দিলেন এবং পিতৃ-পরিচয় জানার পরেও কাউকে ভিন্ন নামে ডাকতে নিষেধ করে দিলেনঃ

"আল্লাহ কোন মানুষের মধ্যে দুটি হৃদয় স্থাপন করেননি। তোমাদের স্ত্রীগণ যাদের সাথে তোমরা যিহার কর, তাদেরকে তোমাদের জননী করেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তোমাদের পুত্র করেননি। এগুলো তোমাদের মুখের কথা মাত্র। আল্লাহ ন্যায় কথা বলেন এবং পথ প্রদর্শন করেন।" [৪]

.

আল্লাহ খুব সুন্দরভাবে আমাদের উপমা দিয়ে বোঝাচ্ছেন; যেভাবে মানুষের মধ্যে দুইটা মন থাকতে পারে না, ঠিক একইভাবে কেউ পুত্র না হয়েই পুত্রের পরিচয় বহন করতে পারে না, এটা আমাদের মুখের কথা মাত্র এবং আমাদের মনের সাথে তার কোন সংযোগ নেই।

.

তেমনিভাবে,যদি নিজেদের স্ত্রীকে মায়ের সাথে তুলনা করি (যিহার), তবে তারা আমাদের মা হয়ে যায় না, স্ত্রীই থাকে। তাই পরবর্তীতে রাসূল(সাঃ) আর যায়েদ (রাঃ) কে নিজের পুত্র হিসেবে সম্বোধন করেননি, বরং বলেছিলেন, "তুমি আমার ভাই এবং বন্ধু।" [৫]

.

ii) তাকে যখন আপনি বলেছিলেন, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর: এ আয়াতটি আলোচনায় চলুন আবার 'সীরাতে মোস্তফা' গ্রন্থটিতে ফিরে যাওয়া যাকঃ "আল্লাহর হুকুম মোতাবেক হযরত যায়েদ বিন হারিছা(রাঃ) এর সাথে হযরত যয়নব (রাঃ)- এর বিবাহ হয়ে গেল। বিবাহ তো হয়ে গেল, কিন্তু যায়নাবের দৃষ্টিতে যায়দ নীচ ও হীনই রইলেন। ফলে তাদের মধ্যে বনিবনা হলো না মোটেই। হযরত যায়েদ (রাঃ) বারবার রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট যায়নাব (রাঃ)-এর বেপরোয়া ভাবভংগি এবং যায়দকে উপেক্ষা করার অভিযোগ করতে লাগলেন। এ অবস্থায় তিনি বারবার যায়নাবকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন।" রাসূল ﷺ বিয়ে ভাঙ্গতে নিষেধ করেন এবং বলেন, 'তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছেই থাকতে দাও এবং আল্লাহকে ভয় কর।' [৬]

.

iii) আপনি অন্তরে এমন বিষয় গোপন করছিলেন, যা আল্লাহ পাক প্রকাশ করে দেবেন আপনি লোকনিন্দার ভয় করেছিলেন অথচ আল্লাহকেই অধিক ভয় করা উচিতঃ পূর্বে ইমাম তাবারী (রহ.) থেকে যে বর্ণনা উল্লেখ করেছি,তার সাহায্যে অনেকেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, 'অন্তরে এমন বিষয় গোপন করেছিলেন' বলতে নবী ﷺ এর যয়নাব (রাঃ) এর প্রতি হঠাৎ আসক্ত হয়ে পড়াকে বোঝানো হয়েছে। পাশ্চাত্যের অনেক লেখকই এ বর্ণনার সাথে নিজেদের কল্পনার রং ছড়িয়ে যাচ্ছে-তাই লিখেছেন তাদের বইয়ে।[৭]

.

হঠাৎ আসক্ত হয়ে পড়ার বিষয়টি আসলে কিছু মানবমনের কল্পনা ছাড়া কিছুই না। কারণ,

.

প্রথমত, ইমাম তাবারী যে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তা নির্ভরযোগ্য নয়।

দ্বিতীয়ত, যদিও ধরে নেই সে হাদীস নির্ভরযোগ্য,তবুও রাসূল ﷺ এর হঠাৎ যয়নাবের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়াটা অবাস্তব। কারণ,

যয়নাব (রাঃ) ছিলেন রাসূল ﷺ এর ফুফাতো বোন। রাসূল ﷺ তার রূপ,গুণ সম্পর্কে বহু পূর্বে অবগত ছিলেন।

.

তৃতীয়ত, যদি এটাও ধরে নেই তিনি আসলেই যয়নাবের প্রতি আসক্ত ছিলেন, তাহলে কেন তিনি যয়নাবকে যায়েদের সাথে বিয়ে দিবেন? সেরকমটা হলে তো তিনি নিজের জন্যই প্রস্তাব দিতেন।

.

তাহলে প্রশ্ন আসতে পারে, 'অন্তরে যে বিষয় গোপন করেছিলেন' বলতে তাহলে কি বুঝানো হয়েছে? মুসনাদে আবু হাতিমে রয়েছে যে, যয়নাব বিনতে জাহশ (রাঃ) যে রাসূল ﷺ এর স্ত্রী হবেন, এ কথা বহু পূর্বে আল্লাহ তাকে অবহিত করেছিলেন। কিন্তু রাসূল ﷺ এ কথা প্রকাশ করেননি বরং তিনি যায়েদ(রাঃ) কে স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতে বলেছিলেন। তাই আল্লাহ এ আয়াত অবতীর্ণ করে বোঝালেন এ কথা রাসূল ﷺ যতই গোপন রাখুন না কেন, আল্লাহতায়ালা তা প্রকাশ করে দিবেন।

.

iv) অতঃপর যায়েদ যখন যয়নবের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে আপনার সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করলাম যাতে মুমিনদের পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সেসব স্ত্রীকে বিবাহ করার ব্যাপারে মুমিনদের কোন অসুবিধা না থাকে। আল্লাহর নির্দেশ কার্যে পরিণত হয়েই থাকেঃ

.

এ আয়াতে আল্লাহতায়ালা একেবারে পরিষ্কারভাবে বলেছেন, কেন আল্লাহতায়ালা যয়নাব(রাঃ) কে রাসূল ﷺ এর সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন। যাতে পোষ্যপুত্রের স্ত্রীকে বিয়ে করার মাধ্যমে 'পালকপ্রথা' চিরতরে দূর হয়ে যায়। পরবর্তীতে যায়েদ (রাঃ) যখন যয়নাব (রাঃ) এর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করেন এবং তার ইদ্দত পূর্ণ হয়ে যায়, তখন রাসূল ﷺ তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তা গ্রহণ করেন।

যয়নাব (রাঃ), রাসূল ﷺ কে বলতেন, 'আল্লাহতায়ালা আমার মধ্যে এমন তিনটি বিশেষত্ব রেখেছেন যা আপনার অন্যান্য স্ত্রীদের মাঝে নেই। প্রথম এই যে, আমার নানা ও আপনার দাদা একই ব্যক্তি। দ্বিতীয় এই যে, আপনার সাথে আমার বিয়ে আল্লাহতায়ালা আকাশে পড়িয়েছেন। আর তৃতীয় এই যে, আমাদের মাঝে সংবাদ-বাহক ছিলেন হযরত জিবরাইল(আঃ)।'

.

যয়নাব(রাঃ), রাসূল ﷺ এর অন্যান্য স্ত্রীদের সাথে বেশ গর্ব করে বলতেন, 'তোমাদের বিয়ে দিয়েছেন তোমাদের অভিভাবক ও ওয়ারিশগণ। আর আমার বিয়ে দিয়ছেন স্বয়ং আল্লাহতায়ালা সপ্তম আকাশের উপর।'[৮]

.

যারা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ইনসেস্ট,সমকামিতার মত জঘন্য বিষয়গুলোকে বৈধতার রায় দেন, তারা এরপরেও ঠিক কিসের ভিত্তিতে এই বিয়ে নিয়ে আপত্তি তুলেন তা আমার বোধগম্য নয়। আর আমার এই লিখাটা তাদের জন্যও নয় যাদের একমাত্র রেফারেন্স হচ্ছে ইসলাম-বিদ্বেষ। এ লেখাটা তাদের জন্য যারা হৃদয় দিয়ে সত্য খুঁজে।

.

আমি বিশ্বাস করি হৃদয়টাকে খোলা রেখে সত্য খুঁজলে পরম করুনাময় তার করুণার ধারা অবশ্যই বর্ষণ করবেন।

---

[১] তাফসীর ইবনে কাসির-১৫ নং খন্ড, পৃষ্ঠা-৮০৫

[২] সীরাতে মোস্তফা-মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী(রহ.),পৃষ্ঠা- ৭২৮

[৩] আল কুরআন ,সূরা আল আহযাব,আয়াতঃ৩৬

[৪] আল কুরআন, সূরা আল আহযাব, আয়াতঃ৪

[৫]তাফসীর ইবনে কাসির, ১৫ নং খন্ড, পৃষ্ঠা-৭৩৮

[৬] সীরাতে মোস্তফা-মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী(রহ.),পৃষ্ঠা- ৭২৮

[৭] Muir,W-The life of Mohamet,Vol.3,page-231

[৮] সহীহ বুখারী

৫৭

মাতৃগর্ভে ২টি শিশুর কথোপকথন

-ইংরেজি থেকে অনূদিত

এক মায়ের গর্ভে দু'টি শিশু ছিল।

একদিন একজন অন্যজনকে জিজ্ঞাসা করল, "তুমি কি জন্মের পরের জীবনে বিশ্বাস কর?"

.

অন্যজন জবাব দিল, "কেন! অবশ্যই করি। জন্মের পর কিছু না কিছু তো আছেই। হয়তো পরে যা হবে, তার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে আমরা এখন এখানে আছি।"

.

"যতসব বোকার মত কথা!" অন্যজন বলল, "জন্মের পর কোন জীবন নেই। তা, সে জীবন কেমন হবে শুনি?"

.

"আমি ঠিক জানি না। কিন্তু, সেখানে হয়ত এখানকার চেয়ে অনেক বেশী আলো থাকবে।হয়ত, আমরা আমাদের পা দিয়ে হাঁটব এবং মুখ দিয়ে খাবার খাব।"

.

অন্যজন বলল, "অসম্ভব! হাঁটার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। আর মুখ দিয়ে খাবার খাওয়া! যতসব হাস্যকর কথা! বুঝেছ, এই আমবিলিক্যাল কর্ড আমাদেরকে পুষ্টি সরবরাহ করে। জন্মের পর জীবন থাকা সম্ভব নয়, কারণ, এই নাড়ি খুবই ছোট।কীভাবে এটা হেঁটে বেড়ান মানুষকে পুষ্টি সরবরাহ করবে?"

.

"আমার কিন্তু মনে হয়, কিছু একটা অবশ্যই আছে, যা হয়ত এখানকার চেয়ে একেবারে আলাদা।"

.

অন্যজন জবাব দেয়, "কেউ কি কখনও সেখান থেকে ফিরে এসে কিছু বলেছে? কোনদিন না। শুনে রাখো, জন্মের মাধ্যমে জীবনের সমাপ্তি ঘটে মাত্র, আর, এরপর অন্ধকার ও নীরবতা ছাড়া আর কিছুই নেই।জন্মগ্রহণ আমাদেরকে কোথাও নিয়ে যায় না।"

.

"ভালো কথা! আমি ঠিক জানি না। কিন্তু, অবশ্যই আমরা তখন মাকে দেখতে পাব এবং তিনি আমাদের যত্ন নেবেন।"

.

"মা ?! তুমি বিশ্বাস কর যে, 'মা' বলে কেউ আছেন?! তিনি তাহলে এখন কোথায়?"

.

"তিনি সবসময় আমাদের চারপাশে আছেন। তাঁর মাঝেই আমরা বেঁচে আছি। তাঁকে ছাড়া এই ভূবনের কথা চিন্তাও করা যায় না।"

.

"কই, আমি তো তাকে দেখতে পাই না! তাই, এটা বিশ্বাস করাই যৌক্তিক যে, যাকে আমি দেখতে পাই না, তার কোনো অস্তিত্ব নেই।"

.

এর জবাবে অন্যজন বলল, "তুমি যখন চুপ করে থাক, তখন কখনও কখনও তাঁর কথা শুনতে পাও, তাঁকে অনুভব করতে

পার। আমি বিশ্বাস করি, জন্মের পরের জীবন হলো এক বাস্তবতা এবং সেই বাস্তবতার সম্মুখীন হওয়ার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতেই আজ আমরা এখানে।"

৫৮

ডারউইনিজম, লজিক্যাল কষ্টিপাথর এবং অন্যান্য -১

-মোহাম্মাদ মশিউর রহমান

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম .

.

"অন দি অরিজিন অফ স্পিসিস বাই মীনস অফ ন্যাচারাল সিলেকশন"... অথবা, "দি প্রিজারভেশন অফ ফেভার্ড রেইসেস ইন দা স্ট্রাগল ফর লাইফ"... . . ১৮৫৯ সালে চার্লস রবার্ট ডারউইন নামক জনৈক প্রকৃতিবিদ এই নামে একটি পুস্তক প্রকাশ করে 'হইচই" ফেলে দেন। যার সরল বঙ্গানুবাদে পাওয়া যায়- "প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে জীবপ্রজাতির উৎপত্তির ওপর",অথবা "জীবন সংগ্রামে অনুকূলীয় জাতির সংরক্ষণ"।

.

তবে যেই তথাকথিত হইচই ডারউইন সাহেব ফেলেছিলেন,তার গণ্ডগোলের মধ্যে বোধহয় কেউ খেয়াল করে নি;যে রচনাটির নামের মধ্যেই কেমন যেন একটা ঘাপলার টক টক গন্ধ আছে। কিছুটা খুলে,ভেঙেচুরেই আলোচনা করা যাক। . . আলোচনার এই পর্যায়ে,যুক্তির খাতিরে "মুক্তচিন্তার" বিকাশ করে জনাব ডারউইনের সাথে একমত হয়েই আগানো যাক।

.

তার যে বিবর্তনবাদ তত্ত্ব,তাতে মূলত বেশ কয়েকটি ঘটনা প্রবাহ আছে। আরও স্পেসিফিক্যালি বললে,মোটমাট প্রায় ৬টি ঘটনা প্রবাহ আছে;আর প্রতি ২টি ঘটনা প্রবাহ মিলে আবার ১টি করে নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত।

.

অর্থাৎ ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব অনুযায়ী কোন একটি প্রাণী বা প্রজাতি,এই ধরণীর বুকে টিকে থাকার উপযুক্ত হিসেবে নির্বাচিত অথবা সংরক্ষিত হয়,এই ৬টি ঘটনা প্রবাহ বা ৩টি সিদ্ধান্তের প্রত্যেকটিই ধারাবাহিকভাবে অতিক্রমের মাধ্যমে। . . কিন্তু আসল ঘাপলাটি ঠিক এই জায়গায়।

.

যদিও একটি কুফরী সিস্টেম,তবুও এই ঘাপলার ব্যাপারটা একটু ভালোভাবে বুঝতে গণতান্ত্রিক ভোটাভুটির আলোচনা আনছি;আল্লাহ রাব্বুল আলামীন মাফ করুন। . . এটা সবারই জানা যে কোথাও যখন কোন ভোট অনুষ্ঠিত হয়,একাধিক প্রার্থী সেখানে অবশ্যই বিদ্যমান থাকে। ভোটাররা লাইন ধরে এসে একে একে ভোট দেয়,নির্ধারিত সময় শেষে সেখান থেকে গণনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটপ্রাপ্তকে নির্বাচিত করা/ধরে নেওয়া হয়।

.

অর্থাৎ ভোটাররা এক্ষেত্রে হলো নির্বাচক। এখন ধরুন যদি কোন নির্বাচকই না থাকে,তাহলে একটা প্রশ্ন রইলো যে- নির্বাচন প্রক্রিয়াটি কীভাবে সম্পন্ন হবে অথবা অন্য কথায় বললে,কোন প্রার্থী নির্বাচিত কী করে হবে? . মানে যদি কেউ ভোটই না দেয়,সমস্ত ব্যালট পেপার শূন্য অবস্থায় পড়ে থাকে;তাহলে এমতাবস্থায় যদি কোন প্রার্থী উঠে দাঁড়িয়ে বলে যে আমিই নির্বাচিত প্রার্থী, তাহলে তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত আল্লাহু 'আলাম,কিন্তু প্রতিবাদের যে একটা তীব্র ঢেউ আলতো করে পরশ বুলিয়ে যাবে,তা অতি অবশ্যই খুব যুক্তিসঙ্গত।

.

.

ডারউইনের রচনার সাথে আমরা যে মুক্তমনা ও একমত হয়ে আগাচ্ছিলাম;সেখানে তাহলে এখন ছোট করে একটি ফোঁড়ন কাটি- আচ্ছা বলা যাবে কি,কোন একটি বিশেষ প্রাণী বা জীবপ্রজাতি যে পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য নির্বাচিত/সংরক্ষিত

হবে,এই সিদ্ধান্ত নেবেটা কে? অর্থাৎ সহজ ভাষায়,সেই বিশেষ প্রাণী বা প্রজাতির নির্বাচক বা সংরক্ষক কে?

.

যেহেতু বইয়ের রচনায় ডারউইন সাহেব নাম দিয়েছেন "সিলেকশন বা নির্বাচন" অথবা "প্রিজারভেশন বা সংরক্ষণ";তাহলে নিশ্চয়ই নির্বাচন/সংরক্ষণ প্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে একজন থার্ড পার্সোন্যালিটি থাকা আবশ্যক,যে নির্বাচক/সংরক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে?

.

অন্যথায় হাউ ইজ ইট পসিবল,যে কোন নির্বাচক/সংরক্ষক ছাড়াই কোন একটি প্রাণী বা জীবপ্রজাতি গলা বাড়িয়ে দিয়ে বলবে,যে আমিই এই পৃথিবীতে টিকে থাকার ক্ষেত্রে অধিকতর যোগ্য;এবং অতঃপর নিজেরাই নিজেদেরকে নির্বাচিত বা সংরক্ষিত করে ফেলবে?

.

মুক্তচিন্তার সাথে কেমন যেন একটু যায় না যায় না ভাব,তাই নয় কি?

.

আচ্ছা আসুন,মুক্তচিন্তা বাদ দিয়ে এখন একটু অন্যদিকের আলোচনায় যাই। . বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, "বৈশাখ" নামক জনৈক প্রাণহীন,অস্তিত্বহীন বস্তুকে আগমনের জন্য উদাত্ত আহ্বানকারী যেসকল বিজ্ঞানীরা- মানুষকে যে অসীম বুদ্ধিমত্তার অধিকারী কোন একজন দ্বারা সুন্দরতম অবয়বে সৃষ্টি করা হয়েছে[১] -এমন "অবৈজ্ঞানিক" কথা মানতে নারাজ; তাদের মধ্যে ডারউইনের এই যে বিবর্তনবাদ বা প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব,এর অন্যতম মুখরোচক ও আলোচিত যে বিষয়;তা হলো মানুষ ও বানরের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্ক স্থাপনের আলোচনা।

.

এক্ষেত্রে যে প্রধান দুটি মত উল্লেখযোগ্য,সেগুলো হলো- ১. মানুষ বানর থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে উদ্ভুত প্রজাতি ২. মানুষ ও বানর উভয়েই একটি কমন বা সাধারণ পূর্বপুরুষ থকে উদ্ভুত প্রজাতি . আধুনিক তথাকথিত "বিজ্ঞানমনস্করা" যদিও নিজেদের পরিচয় দেবার সময় ১ নং মতবাদটি ব্যবহার করতেই অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে থাকে,তবুও আলোচনার সুবিধার্থে উভয়দিক থেকেই একটু ঘাঁটাঘাটি করা যাক। কারণ কারও দেহের যখন কোন স্থান জ্বলে যায়,তখন চিকিৎসক একটি পিন বা সুঁই নিয়ে সবদিক থেকেই গুঁতিয়ে দেখে -তারই অনুকরণ বলা যায় আরকি।

.

আলোচনায় শুরুর দিকে বলা হয়েছিলো,যে ডারউইনের তত্ত্বটির মোট ৬টি ঘটনা প্রবাহ বা ৩টি সিদ্ধান্ত আছে। সেই ৩টি সিদ্ধান্তের সর্বশেষ যে সিদ্ধান্ত,অর্থাৎ "নতুন প্রজাতির উদ্ভব";সে সিদ্ধান্তের পেছনে কাজ করা ২টি ঘটনা প্রবাহ হলো যথাক্রমে "যোগ্যতমের জয় এবং অযোগ্যের বিলুপ্তি" ও "প্রাকৃতিক নির্বাচন"।

.

"প্রাকৃতিক নির্বাচন" নিয়ে তো উপরের আলোচনায় যৎসামান্য মুক্তচিন্তা করাই হলো,এখন একটু তার আগের ঘটনা প্রবাহ অর্থাৎ "যোগ্যতমের জয় এবং অযোগ্যের বিলুপ্তি" নিয়ে নাড়াচাড়া করা যাক।

.

নাম থেকে যা বোঝা যায়,ডারউইনের তত্ত্বের এই ঘটনা প্রবাহ হলো একধরনের প্রতিযোগিতার ব্যাপারে;"Survival of the fittest"(*)-কথাটির উদ্ভব মূলত এর থেকেই। [হার্বার্ট স্পেন্সার সর্বপ্রথম ডারউইনের লেখা পড়ে (*)-এটি ব্যবহার করেন;যা পরবর্তীতে আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেসের উপদেশে ডারউইন "প্রাকৃতিক নির্বাচন"-এর বিকল্প হিসেবে ১৮৬৮ সালে প্রকাশিত "দা ভ্যারিয়েশন অফ অ্যানিমলস অ্যান্ড প্লান্টস আন্ডার ডমেস্টিকেশন"-এ,এবং ১৮৬৯ সালে তার উপরোল্লিখিত আলোচিত বইয়ের ৫ম সংস্করণে ব্যবহার করেন।] . তবে এক্ষেত্রে একটা ব্যাপার উল্লেখ করে নেওয়া ভালো,যে এখানে "Fit" বলতে শারীরিক সামর্থ্য বা যোগ্যতার কথা বোঝানো হয় না;বোঝানো হয় বংশবৃদ্ধির হার,জেনেটিক মিউটেশনের ফলে সৃষ্ট ভ্যারিয়েশন বা বৈচিত্র্য,উন্নত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি। অর্থাৎ পৃথিবীর বুকে ঘুরে বেড়ানো তাবৎ জীবজগতের মধ্যে যারা এসকল দিক থেকে যোগ্য

বা উন্নত,কেবল তারাই টিকে বা বেঁচে থাকবে;বাকি যারা অনুন্নত ও অযোগ্য,তারা সব গোল্লায় যাক ধরণের ব্যাপার-স্যাপার আরকি। . .

.

১ নং মতবাদটি বিবেচনায় আনলে যা পাওয়া যায়,মানুষ বেশকিছু মধ্যবর্তী ধাপ অতিক্রম করে বানর থেকে বর্তমান উন্নত প্রজাতিতে পরিণত হয়েছে। এই মধ্যবর্তী ধাপগুলোকেই মূলত আদিম মানুষ বা গুহামানব বলে অভিহিত করা হয়,যেমন উদাহরণ হিসেবে বলা যায় নিয়ানডার্থাল গুহামানবের কথা। বর্ণনার সুবিধার কথা চিন্তা করে সমস্ত মধ্যবর্তী ধাপগুলোকে আপাতত "নিয়ানডার্থাল" হিসেবে ধরে নিয়ে আগানো যাক,কারণ এরা আধুনিক মানুষের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত ছিল,৯৯.৭% DNA-র মিলের মাধ্যমে।

.

যদিও বানর এবং মানুষের মধ্যে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য সকল মধ্যবর্তী ধাপকেই চিহ্নিত করা যায় নি,অর্থাৎ মাঝে মাঝে "মিসিং লিঙ্কস" রয়েই গেছে। যেমন বর্তমানে জানতে পারা গেছে,যে চারটি Humanoid বা মানবসদৃশ প্রাণী রয়েছে। প্রথম স্টেজ বা পর্যায়কে বলা হয় হলো "অস্ট্রেলোপিথেকাস",এরপরের ধাপকে বলে "ক্রো-ম্যাগনন",এরপর পাওয়া গেছে উপরোল্লিখিত "নিয়ানডার্থাল" -কিন্তু দেখা গেছে,যে এদের মাঝে কোন লিঙ্কস বা পারস্পারিক সম্বন্ধ নেই।

.

তবে বিপুল বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ভিত্তিতে লালন সাঁইয়ের আরাধনাকারী,চৈত্র সংক্রান্তি,জানা অজানা নামের হাজারো পালা-পার্বণ প্রভৃতি উৎযাপনকারী বিজ্ঞানীরা,এসব বোধহয় গোণায়ও ধরেন না। যাই হউক,এগিয়ে যাই। . . বানর => মধ্যবর্তী ধাপ/নিয়ানডার্থাল => মানুষ . এখন ডারউইনের তত্ত্বের "যোগ্যতমের জয় এবং অযোগ্যের বিলুপ্তি"-মতে পর্যায়ক্রমে ধাপে ধাপে বিবর্তনের ফলেই নিম্নশ্রেণীর প্রাণী থেকে উচ্চশ্রেণীর প্রাণি উদ্ভুত হবে,এবং হয়ে কেবল তারাই টিকে থাকবে এবং নিম্নশ্রণীর প্রাণী বা জীবগোষ্ঠী বিলুপ্ত হবে। তাহলে এখন উপরের ধারাটির দিকে লক্ষ্য করা যাক।

.

বানর থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে নিয়ানডার্থাল (পূর্বের কথা অনুযায়ী সমস্ত গুহামানবকেই এর দ্বারা উল্লেখ করা হলো) উদ্ভুত হয়,যাদের থেকে আবার কালক্রমে বিবর্তিত হয়ে আধুনিক উন্নত মানবজাতি অস্তিত্বে আসে। আধুনিক মানবজাতির আবির্ভাবে ডারউইনের তত্ত্বের নিয়মানুযায়ী স্বাভাবিকভাবেই যা দেখা যায়,যে উন্নত মানুষের সাথে প্রতিযোগিতায় ব্যর্থ অনুন্নত বা অযোগ্য নিয়ানডার্থালরা বিলুপ্ত হয়ে গেছে;অর্থাৎ এক্ষেত্রে "যোগ্যতমের জয় এবং অযোগ্যের বিলুপ্তি" খুবই খাপে খাপে বসে গেছে-ঠিক?

.

মুক্তচিন্তকদের নাকটা একটু খাড়া হয়ে গেল কি? তা হোক,সমস্যা নেই। . কিন্তু প্রশ্ন হলো,বানর থেকে তাহলে যখন নিয়ানডার্থালরা উদ্ভুত হলো,তখন অযোগ্য হিসেবে কেন বানর প্রজাতিরা বিলুপ্ত হয়ে গেল না?

.

এক জামানার কলাসাহিত্যের ছাত্র থাকা স্বঘোষিত বিজ্ঞানীরা তো আর এটা মানেন না যে "হুট করে" বা সরাসরি মানুষের আবির্ভাব/সৃষ্টি[২] এই ধরিত্রীতে হয়েছে,কাজেই তাদের তো অবশ্যই এটা মানার কথা যে বানর থেকে প্রথমে নিয়ানডার্থাল বা গুহামানবেরাই এসেছিলো,তারপর দীর্ঘসময় পর সেখান থেকে মানুষ? তাহলে তো এটা নিশ্চয়ই স্বীকারযোগ্য যে বানরদের তুলনায় তখনকার সময়ে শুধুমাত্র আদিম বা গুহামানবেরাই ছিল সর্বোন্নত জাতি? বিভিন্ন গুহাচিত্র বা হাড় ও পাথরের টুলসের ব্যবহার,অথবা আগুনের ব্যবহার কিংবা জটিল সামাজিক দলে আবদ্ধ থাকা -এর সবই তো সেদিকেই নির্দেশ করে।

.

আবার তারা তো নিশ্চয়ই তাদের "তালই" ডারউইনের বিপরীতে যেয়েও বলতে পারবেন না যে- না না,আসলে নিম্নশ্রেনীর জীব বানর থেকে এক্ষেত্রে আরও অধিকতর নিম্নশ্রেণির জীবের আবির্ভাব হয়েছিলো,অতঃপর সেই "সবচাইতে" নিম্নতম শ্রেণী থেকেই অনেক সময় পর সর্বাধুনিক ও উন্নত মানবজাতির উৎপত্তি হয়েছে? কারণ তাদের পরম পূজনীয় বিবর্তনবাদ তত্ত্ব তো বলে যে বিবর্তনের শুরুর প্রান্তে থাকে নিম্নশ্রেণীর প্রাণী বা প্রজাতি,আর সমাপ্তির প্রান্তে থাকে তার উচ্চশ্রেণীর সসদ্য।

.

তাহলে যে নিয়ম বর্তমান উন্নত বৈশিষ্ট্যের মানুষ ও আংশিক উন্নত আদিম মানুষের ক্ষেত্রে খাটতে দেখা গেল,সেই একই নিয়ম কেন সেই একই আংশিক উন্নত জীবগোষ্ঠী ও তাদের চেয়ে অনুন্নত বানরগোষ্ঠীর ওপর খাটলো না? কেন এখনো পৃথিবীর বুকে শিম্পাঞ্জী,হনুমান, ওর‍্যাংউট্যাং, গোরিলা,রাঙামুখো,ময়দামুখো ইত্যাদি বিভিন্ন প্রজাতির বানর সম্প্রদায়কে অবাধে বিচরণ করতে দেখা যায়;যেখানে তাদের চেয়েও উন্নত নিয়ানডার্থালরা ডারউইন ও তার ১৮৫৯ সালের হলদে রঙের পেপারব্যাককে স্বাভাবিকের চেয়ে মোটা বৃদ্ধাঙ্গুলী দেখিয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে?

.

মানে,কীভাবে কী? জাস্ট "how what"? . .

[ইন শা আল্লাহ চলবে]

---

[১] ■আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম অবয়বে। -সূরাহ আত-তীন,৪ . .

[২] ■হে মানব,আমি তোমাদেরকে এক পুরুষ ও এক নারী থেকে সৃষ্টি করেছি... -সূরাহ আল-হুজুরাত,১৩ এর প্রথমাংশ

৫৯

ডারউইনিজম, লজিক্যাল কষ্টিপাথর এবং অন্যান্য -২

-মোহাম্মাদ মশিউর রহমান

[প্রথম পর্বের জন্য দেখুন (#সত্যকথন) ৫৮]

.

আচ্ছা,এখন আসা যাক ২ নং মতবাদটিতে। অর্থাৎ "মানুষ ও বানর উভয়েই একটি কমন বা সাধারণ পূর্বপুরুষ থকে উদ্ভুত প্রজাতি"-এটিতে।

.

এই মত অনুযায়ী যদি বিবর্তনের একটি ধারা তৈরী করা যায়,তাহলে পাওয়া যাবে যে- কমন/সাধারণ পূর্বপুরুষ => বানর => নিয়ানডার্থাল => আধুনিক উন্নত মানুষ [এর মাঝে মাঝে "Insert Missing links" মেসেজ উইন্ডো আসতে দেখা যাবে]

.

এদেরকে যোগ্যতার ভিত্তিতে যথাক্রমে বিভক্ত করলে মোটামুটি নিচের মত একটা ব্যাপার পাওয়া যাবে- ->কমন/সাধারণ পূর্বপুরুষ - অযোগ্যতম ->বানর - আংশিক অযোগ্য ->নিয়ানডার্থাল - আংশিক যোগ্য ->আধুনিক উন্নত মানুষ - যোগ্যতম . তো এখন যদি চারদিকে একটু চোখ বুলিয়ে আসা হয়,তাহলে দেখা যাবে যে এদের মধ্যে কেবল মনুষ্য প্রজাতি এবং বানর প্রজাতিরাই বর্তমানে এই পৃথিবীর বুকে অক্সিজেন খরচ করছে।

.

তারমানে অযোগ্যতমের বিবর্তনের মাধ্যমে যোগ্যতমের উৎপত্তি হওয়ার মধ্যে, "অযোগ্যতম" ও "আংশিক যোগ্য"-রা হাপিশ হয়ে গেছে,কিন্তু "যোগ্যতম" -এর সাথে "আংশিক অযোগ্য"-রা বহাল তবিয়তে টিকে আছে।

.

কিন্তু ডারউইন সাহেব সুদীর্ঘ পাঁচ বছর যাবৎ নুড়িপাথর,আবর্জনা (মতান্তরে ফসিল) ঘেঁটে যে "থিওরী" দিয়ে গেছেন;তাতে তো কেবল যোগ্যতমেরই টিকে থাকার,বা কোন নির্বাচক/সংরক্ষক ছাড়াই নিজে নিজেই নির্বাচিত/সংরক্ষিত হয়ে যাবার কথা। আর সেই "যোগ্যতম"-এর বিবর্তনের ধারার অন্যান্য প্রান্তে যারা আছে,হোক তারা "অযোগ্যতম" অথবা "আংশিক অযোগ্য"-সবারই তো বিলুপ্ত হয়ে যাবার কথা।

.

যদিওবা গাঁইগুঁই করে করা তর্কের খাতিরে ধরে নেওয়া হয় যে কোন কোন ক্ষেত্রে কেবল "যোগ্যতম"একা না,তার সাথে অন্যান্য গোষ্ঠী বা প্রজাতিও টিকে থাকে/থাকতে পারে;তাহলেও তো "যোগ্যতম" আধুনিক উন্নত মানুষের সাথে 'আংশিক উন্নত" নিয়ানডার্থালরাই টিকে থাকার অধিকারের অধিক হকদার। তাহলে বানরেরা এই সমীকরণে কোনদিক দিয়ে কীভাবে খাটে?

.

আবার বানর ও মানুষের একটি কমন/সাধারণ পূর্বপুরুষের ক্ষেত্রে "অস্ট্রেলোপিথেকাস"-এর নাম বসিয়ে বলতে দেখা যায় যে,মানুষ ও শিম্পাঞ্জীরা এর থেকে এসে ৫ বা ৬ মিলিয়ন বছর পূর্বে পরস্পর থেকে দুটি ধারায় বিভক্ত/আলাদা হয়ে গেছে। কিন্তু "Sahelanthropus tchadensis",বা সাধারণভাবে "Toumai" নামে পরিচিত জনৈক ৭ মিলিয়ন বছর পূর্বের প্রাণী, অথবা কমপক্ষে ৬ মিলিয়ন বছর বয়স্ক "Orrorin tugenensis" নামের একটি প্রাণীর ব্যাপারে তেমন কোনকিছু না জানার কারণে বিজ্ঞানীরা যখন তর্কের হাতাহাতিতে ব্যস্ত;তখন আবার জনৈক আরেকটি থিওরী "সাজেস্ট" করে যে মানুষ ও শিম্পাঞ্জীরা প্রথমে কোন এক সময়ে আলাদা হয়েছিলো,তারপর কিছু জনগোষ্ঠী বিভক্ত হবার ১ মিলিয়ন বছরের আশেপাশে নিজেদের মধ্যে "ইন্টারব্রীড" বা "আন্তঃপ্রজনন" করেছিলো।

.

ধৃষ্টতা মাফ করবেন, কিন্তু আমি কি একটু বলতে পারি,"হাউ মাছ পানি"?

.

" এতই কি ঠুনকো তাহলে এই ১৫৭ বছরের পুরনো "থিওরী"? " এর উত্তর অবশ্য আর কারও কথায় না বলে স্বয়ং চার্লস ডারউইনের ভাষায়ই কিঞ্চিৎ বলা যাক।

.

চার্লস ডারউইন ১৮৬১ সালে তার বন্ধু থমাস থমসনকে একটি চিঠি লেখেন,যার অংশবিশেষে তিনি বলেন-
'...I have got no proof for my theory of evolution,but it helps me in classification of embryology,rudimentary organ..."

.

অর্থাৎ তার নিজের কাছেই স্বীয় বিবর্তনবাদ তত্ত্বের কোন প্রমাণ নেই;কিন্তু এটা তাকে ভ্রূণবিদ্যা,প্রাথমিক বা মৌলিক অঙ্গ ইত্যাদির ব্যাপারে বুঝতে সাহায্য করে বিধায় এই তত্ত্ব নিয়ে তার মাতামাতি।

.

আচ্ছা,জৈব যৌগের নাম তো নিশ্চয়ই প্রায় সবাই-ই জানে। কিন্তু এই জৈব যৌগের ব্যাপারে যে একটা মৌলিক ভুল ব্যাখ্যা বা মতবাদ ঊনিশ শতকের প্রায় মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রচলিত ছিল,তা কি জানা আছে?

.

সেই মতবাদটির নাম ছিল "প্রাণশক্তি মতবাদ",প্রবক্তা ছিলেন সুইডিস বিজ্ঞানী বার্জেলিয়াস। এ মতবাদ বলে- "জৈব যৌগ পরীক্ষাগারে তৈরী করা সম্ভব নয়।যৌগগুলো উদ্ভিদ ও প্রাণীদেহে উপস্থিত কোন রহস্যময় প্রাণশক্তির প্রভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে।"

.

১৮২৮ সালে জার্মান বিজ্ঞানী ফ্রেডরিক ভোলার এই মতবাদ ভুল প্রমাণের পূর্ব পর্যন্ত সমগ্র বিজ্ঞানী মহলে এটিই গ্রহণযোগ্য ও প্রচলিত ছিল। অর্থাৎ এই মতবাদটি বার্জেলিয়াসসহ তৎকালীন তাবৎ বিজ্ঞানীদেরকে প্রাণী ও উদ্ভিদদেহে প্রাপ্ত রাসায়নিক পদার্থগুলোর উৎপত্তি বুঝতে সাহায্য করেছিলো। কিন্তু তাই বলে তা ধ্রুবকের ন্যায় নির্ভুল হয়ে গিয়েছিল কিনা -এ প্রশ্নের জবাব কে দেবে হে পাঞ্জেরী?

. .

কিন্তু আনাচে-কানাচে থেকে ব্যাঙের ছাতার মত গজিয়ে উঠা তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্ক,নাস্তিক অথবা নব্য মডারেট মুসলিমদের এসমস্ত ব্যাপার বুঝে আসবে কিনা,বা আসলেও তা প্রকাশ বা স্বীকার করবে কিনা আল্লাহু 'আলাম। কারণ সমগ্র বিশ্বজগত জুড়ে তাদের সো-কল্ড এত অসীম পরিমাণ "অ্যাক্সিডেন্ট"-এর মধ্যে,কোথাও কোন সামান্যতম বিশৃঙ্খলার অনুপস্থিতি যে একজন SUPREME BEING এর দিকেই নির্দেশ করে -না এটা তাদের বুঝে আসে; আর না- এই বিশ্বের সমস্ত জীবিত প্রানীরই একইরকমের ডিজাইনের হওয়া, অর্থাৎ কেবলমাত্র কার্বন বেইজড প্রাণ হওয়ার পেছনে যে একজনই মাত্র MASTER DESIGNER এর হাত আছে -এটা তাদের রব্বের দেওয়া প্রায় ১০ বিলিয়ন নিউরনের মস্তিষ্ককে অতিক্রম করে।

.

দিনশেষে,এদেরকে কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মত করেই বলা যায়- " সালামুন 'আলা মানিত্তাবা 'আল হুদা " - সৎপথ অবলম্বনকারীদের প্রতি শান্তি . . . . .

৬০

কুরআনে কি আসলেই অসম্পূর্ণ পানিচক্রের বিবরণ আছে?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্ন: কুরানের প্রতিটা আয়াত (Quran 7:57, 13:17, 15:22, 23:18, 24:43, 25:48-49, 30:24, 30:48, 35:9, 39:21, 45:5, 50:9-11, 56:68, 78:14-15) নির্দেশ করে, বৃষ্টিপাত হয় সরাসরি আকাশ থেকে নয়তো আল্লাহ থেকে! সূর্যতাপে পানি বাষ্প হয়ে উর্ধ্বাকাশে ঘনিভূত হয়ে যে মেঘ ও পরবর্তীতে বৃষ্টি তৈরি হয় তা কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে! এর থেকে কি কুরানের রচয়িতার অজ্ঞতা প্রকাশিত হয় না?

.

#উত্তরঃ পানিচক্রের ধাপগুলো হচ্ছে—

.

১) বাষ্পীভবন
২)মেঘ উপন্ন হওয়া
৩)বৃষ্টিপাত হওয়া
৪) বৃষ্টির পানি ভূমিতে আসা ও ভূমি কর্তৃক এই পানি ধারণ

.

এরপর আবার প্রথম থেকে প্রক্রিয়াটির পুনরাবৃত্তি হয়। এভাবে প্রক্রিয়াগুলোর চক্রাকারে পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে পানিচক্র চলতে থাকে। অভিযোগকারীরা বলেছেন যেঃ পানি বাষ্প হয়ে উর্ধ্বাকাশে ঘনীভুত হয়ে যে মেঘ ও পরবর্তীতে বৃষ্টি তৈরি হয় তা কুরআনে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। চলুন দেখি তাদের অভিযোগ কতটুকু সত্য।

.

“ আমি বৃষ্টিগর্ভ বায়ু পরিচালনা করি অতঃপর আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করি, এরপর তোমাদেরকে তা পান করাই। বস্তুতঃ তোমাদের কাছে এর ভাণ্ডার নেই।” (কুরআন, হিজর ১৫:২২)

.

-------->>> আলোচ্য আয়াতে বৃষ্টিপাতের পূর্বে “বৃষ্টিগর্ভ বায়ু” পরিচালনার কথা বলা হয়েছে। অর্থাৎ এমন বায়ু যা বৃষ্টিকে ধারণ করে। এটি নিঃসন্দেহে বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ার নির্দেশক।

.

অন্য একটি আয়াতে বলা হয়েছেঃ
“শপথ আসমানের, যা ধারণ করে বৃষ্টি।” (কুরআন, তারিক ৮৬:১১)

.

এই আয়াতের তাফসিরে ইমাম শাওকানী (র) এর ‘ফাতহুল কাদির’ গ্রন্থে বলা হয়েছেঃ “বৃষ্টিকে প্রত্যাবর্তনকারী বলার আর একটি কারণ এটাও হতে পারে পৃথিবীর সমুদ্রগুলো থেকে পানি বাষ্পের আকারে উঠে যায়। আবার এই বাষ্পই পানির আকারে পৃথিবীতে বর্ষিত হয়।”
[সূত্রঃ কুরআনুল কারীম (বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির), ড.আবু বকর জাকারিয়া, ২য় খণ্ড, সুরা তারিকের ১১নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ২৮০৭]

.

পানিচক্রে বাষ্পীভবনের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে তা থেকে মেঘ উৎপন্ন হওয়া। এরপর ঘনীভুত মেঘ থেকেবৃষ্টিপাত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

.

"তিনিই বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানিপূর্ন মেঘমালা বয়ে আনে, তখন আমি এ মেঘমালাকে মৃত শহরের দিকে হাঁকিয়ে দেই। অতঃপর এ মেঘ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সব রকমের ফল উৎপন্ন করি। এমনি ভাবে মৃতদেরকে বের করব - যাতে তোমরা চিন্তা কর।"
(কুরআন, আ'রাফ ৭:৫৭)

.

"আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, অতঃপর সে বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমি তা মৃত ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর এর দ্বারা সে ভূখণ্ডকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করে দেই। এমনিভাবে হবে পুনরুত্থান।" (কুরআন, ফাতির ৩৫:৯)

.

আয়াতে বলা হচ্ছে -'সুসংবাদবাহী' বায়ু মেঘমালা সঞ্চারিত করে পানিচক্রের ২য় ধাপ মেঘ উৎপন্ন হওয়ার ব্যাপারেও কুরআন এভাবে আলোচনা করেছে। শুধু তাই নয়, মেঘ উৎপন্ন হওয়া, শিলা তৈরি ও বৃষ্টিপাতের ব্যাপারে কুরআন এমন অসামান্য সব তথ্য দিয়েছে যা সম্পর্কে দেড় হাজার বছর আগের বিজ্ঞান ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞ।

.

"তুমি কি দেখ না যে, আল্লাহ মেঘমালাকে সঞ্চালিত করেন, অতঃপর তাকে পুঞ্জীভূত করেন, অতঃপর তাকে স্তরে স্তরে রাখেন; অতঃপর তুমি দেখ যে, তার মধ্য থেকে বারিধারা নির্গত হয়। আর তিনি আকাশস্থিত শিলাস্তূপ থেকে শিলা বর্ষণ করেন। এবং তা দ্বারা যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন এবং যার কাছ থেকে ইচ্ছা সরিয়ে দেন। তার বিদ্যুৎঝলক যেন তার দৃষ্টিশক্তিকে বিলীন করে দিতে চায়।"
(কুরআন, নুর ২৪:৪৩)

.

আধুনিক বিজ্ঞান আবিষ্কার করেছে যে—ছোট মেঘখণ্ডকে বাতাস যখন ধাক্কা দেয় তখন Cumulonimbus বা "বৃষ্টিবাহী মেঘপুঞ্জ" নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে তৈরি হতে শুরু করে।ছোট ছোট মেঘখণ্ড একসাথে মিলিত হয়ে বড় মেঘমালায় পরিণত হয়। [১]

.

যখন ছোট ছোট মেঘখণ্ড একত্রে মিলিত হয় তখন তা উঁচু হয়ে যায়। উড্ডয়মান বাতাসের গতি মেঘের আকার বৃদ্ধি করে মেঘকে স্তূপীকৃত করতে সাহায্য করে। এই মেঘের ক্রমাগত বৃদ্ধির ফলে মেঘটি বায়ুমণ্ডলের অধিকতর ঠাণ্ডা স্থানের দিকে বিস্তৃতি লাভ করে সেখানে পানির ফোটা ও বরফের সৃষ্টি করে এবং তা আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে। এরপর যখনই এগুলো অধিক ওজন বিশিষ্ট হয়ে যায় তখন বাতাস আর তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। ফলে, মেঘমালা থেকে তা বৃষ্টি ও শিলা হিসেবে বর্ষিত হয়। [২] মহাকাশ বিজ্ঞানীরা দেখেছেন যে, cumulonimbus তথা বৃষ্টিবাহী মেঘপুঞ্জ, যা থেকে শিলা-বৃষ্টি বর্ষিত হয়— তার উচ্চতা ২৫০০০ থেকে ৩০০০০ ফুট (৪.৭ থেকে ৫.৭ মাইল) পর্যন্ত হয়ে থাকে। [৩] তাকে পাহাড়ের মতই দেখায় যেমনটি আল্লাহ তা'আলা কুরআন মাজিদে বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন: ﴿وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ﴾অর্থাৎ "আর তিনি আকাশস্থিত পাহাড় (শিলাস্তূপ) থেকে শিলা বর্ষণ করেন।"

.

মেঘ উৎপন্ন হওয়া ও বৃষ্টিপাত—পানিচক্রের এই দু'টি ধাপ আমরা কুরআন থেকে দেখলাম।বৃষ্টির পানি ভূমিতে আসা ও ভূমি কর্তৃক এই পানি ধারণ সম্পর্কে কুরআন যা বলে—

.

"আমি[আল্লাহ] আকাশথেকে পানি বর্ষণ করে থাকি পরিমিতভাবে; অতঃপর আমি তা মাটিতে সংরক্ষণ করি এবং আমি তা

অপসারণও করতে সক্ষম।”
(কুরআন, মু’মিনুন ২৩:১৮)
.
“তিনি তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। এই পানি থেকে তোমরা পান কর এবং এ থেকেই উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, যাতে তোমরা পশুচারণ কর।”
(কুরআন, নাহল ১৬:১০)
.
“তুমি কি দেখোনি যে আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন, অতঃপর সে পানি যমীনের ঝর্ণাসমূহে প্রবাহিত করেছেন, এরপর তদ্দ্বারা বিভিন্ন রঙের ফসল উৎপন্ন করেন, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তোমরা তা পীতবর্ণ দেখতে পাও। এরপর আল্লাহ তাকে খড়-কুটায় পরিণত করে দেন। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমানদের জন্যে ”
(কুরআন, যুমার ৩৯:২১)
.
“তিনি আকাশ থেকে বৃষ্টিপাত করেন। ফলে উপত্যকাসমূহ তাদের পরিমাণ অনুযায়ী প্লাবিত হয় এবং প্লাবন তার উপরের আবর্জনা বহন করে। এরূপে আবর্জনা উপরে আসে যখন অলঙ্কার বা তৈজসপত্র নির্মাণের উদ্যেশ্যে কিছুকে আগুনে উত্তপ্ত করা হয়। এভাবে আল্লাহ সত্য ও অসত্যের দৃষ্টান্ত দিয়ে থাকেন। যা আবর্জনা তা ফেলে দেয়া হয় এবং যা মানুষের উপকারে আসে তা জমিতে থেকে যায়। এভাবে আল্লাহ উপমা দিয়ে থাকেন।”
(কুরআন, রা’দ ১৩:১৭)
.
কুরআনের আয়াতগুলো থেকে আমরা দেখতে পেলাম যে পানিচক্রের সবগুলো ধাপই অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে আলোচনা করা হয়েছে। অতএব যারা দাবি করে কুরআনে অসম্পূর্ণ পানিচক্র বর্ণণা করা হয়েছে, তাদের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা প্রমাণিত হল। সপ্তম শতকের মানুষ তাদের উপযোগী শব্দমালা থেকে এই আয়াতগুলো থেকে জ্ঞানলাভ করেছে; বর্তমান যুগের বিজ্ঞান জানা মানুষ দেড় হাজার বছর আগের একটি গ্রন্থে পানিচক্রের এমন বিবরণ দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে কুরআনের অসাধারাণত্ব স্বীকার করে নিচ্ছে।
.
‘বিজ্ঞানমনস্ক’(?) হবার দাবিদার কুরআন-বিরোধীদের অবগতির জন্য জানাচ্ছি যে, সপ্তম শতাব্দীতে যখন কুরআন নাযিল হয়, তখন পানিচক্র নিয়ে মানুষের নানা ভ্রান্ত ধারণা ছিল। এ বিষয়ে ২জন বিশেষজ্ঞ জি গাসটানী ও বি ব্লাভোক্স বিশ্বকোষে (ইউনিভার্সালিস এনসাইক্লোপিডিয়া) প্রাচীনকালের পানিচক্র বিষয়ক মতবাদগুলো নিয়ে আলোচনা করেছেন।
তারা বলেছেন - প্লেটো বিশ্বাস করতেন যে মাটির নিচে কোন গভীর সুরঙ্গপথ(টারটারাস) দিয়ে পানি মাটির নিচ থেকে সাগরে ফিরে যায়.অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত এ মতবাদের অনেক সমর্থক ছিলেন এবং তাদের মধ্যে একজন হচ্ছেন ডেসকার্টেস।
এরিস্টোটল মনে করতেন যে, মাটির নিচের পানি বাষ্প হয়ে পাহাড়ী এলাকার ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে ভূগর্ভে হ্রদ সৃষ্টি করে থাকে এবং সেই পানিই ঝর্ণার আকারে প্রবাহিত হয়ে থাকে। এ মতবাদ সেনেকা(১ম শতাব্দী) ও ভলগার এবং আরো অনেকে ১৮৭৭ সাল পর্যন্ত পোষণ করতেন। ১৫৮০ সালে বার্নার্ড পালিসি পানির গতিচক্র সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা গঠন করেন। তিনি বলেন যে, মাটির নিচে যে পানি আছে তা উপর থেকে বৃষ্টির পানি চুঁইয়ে আসা। সপ্তদশ শতকে ম্যারিওট এবং পি পেরোল্ট এ মতবাদ সমর্থন ও অনুমোদন করেন।
আল কুরআনে বর্ণিত আয়াতগুলোতে মুহাম্মাদ (ﷺ) এর সময়ে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণাগুলোর লেশমাত্রও নেই।

তথ্যসূত্রঃ

[১] দেখুন, The Atmosphere, Anthes and others, p. 268-269, এবং Elements of Meteorology, Miller and Thompson, p. 141.

[২] দেখুন, The Atmosphere, Anthes and others, p. 269, এবং Elements of Meteorology, Miller and Thompson, pp. 141-142.

[৩] Elements of Meteorology, Miller and Thompson, p. 141.

৬১

"আল্লাহ এতো মহান হলে তিনি কেন মানুষের কাজে রাগান্বিত হন?"

-লেখকঃ নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক

"আল্লাহ এতো মহান হলে তিনি কেন মানুষের কাজে রাগান্বিত হন?"

.

নাস্তিকেরা একটি প্রশ্ন প্রায়ই সামনে এনে থাকে তা হল "তোমাদের আল্লাহ কেন এত সংকীর্ণ মানসিকতা সম্পন্ন যে তিনি তুচ্ছ মানুষের কর্মকাণ্ডে রাগান্বিত হন।" এসব যুক্তি কখনই আমাকে বিভ্রান্ত করতে পারেনি। এগুলো না আল্লাহর অস্তিত্বকে বাতিল প্রমাণ করতে পারে, না কোন যুক্তিতর্ককে (যা কিনা মিথ্যার উপর দাঁড়িয়ে) শক্তিশালী করতে পারে। (এটাকে Appeal to Disgust বলা হয়)।

.

প্রশ্নটির দুর্বলতা গুলো বের করার জন্য আমরা যুক্তিতর্কগুলোকে কিছু ভাগে ভাগ করে নেই।

.

১.আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্বশক্তিমান।

.

২.আমরা মানুষেরা হচ্ছি ক্ষুদ্র।

.

৩. আল্লাহ একজন সর্বশ্রেষ্ঠ সত্ত্বা তাই আমাদের কর্মকাণ্ডে তাঁর বিচলিত হওয়া উচিত নয়।

.

৪.ইসলাম/আব্রাহামীয় স্রস্টা আমাদের কর্মকাণ্ডে (গুনাহ, শিরক ইত্যাদি) রাগান্বিত হন।

.

৫.সুতরাং এ কারনে আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ হতে পারেন না এবং আমি আল্লাহর অস্তিত্ব সম্পর্কে সন্দিহান।

.

এখন এই পাঁচটি পয়েন্টকে সামনে রেখে আমরা এখন দেখব কেন উক্ত প্রশ্নটি খুব একটা শক্তিশালী নয়।

.

আল্লাহ শুধুমাত্র সর্বশক্তিমানই নন তিনি একই সাথে সর্বজ্ঞ ও ন্যায়বিচারক। এটা কিভাবে একজন সর্বজ্ঞ এবং ন্যায়বিচারক স্রষ্টার পক্ষে মানানসই হতে পারে যে অন্যায় ও অবিচার চলতে থাকবে আর তিনি এর মধ্যস্ততা করবেন না?

.

সমগ্র সৃষ্টিজগতের নিয়ম-নীতিমালার অনেক ব্যাপক। এর বিশালতা এতই বেশি যে তা আমাদের কল্পনারও বাইরে কিন্তু আস্তিকেরা আল্লাহকে সর্বজ্ঞ এবং ন্যায়বিচারক হিসেবে বিশ্বাস করে। তার মানে দাঁড়াচ্ছে আল্লাহ আমাদের অন্যায় কাজগুলো সম্পর্কে জানেন আর যেহেতু তিনি ন্যায়বিচারক তাই তিনি আমাদের এই কাজগুলোর প্রতি মনোনিবেশ করেন।

.

.

দ্বিতীয়ত যেকোন সম্পর্কের ক্ষেত্রে 'ক্ষুদ্র/তুচ্ছ' শব্দটি আপেক্ষিক এবং তা দৃষ্টিভঙ্গির উপর নির্ভর করে। অন্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি আসলে নির্ধারণ করে দেয় কার কাজ তুচ্ছ এবং কার কাজ গুরুত্বপূর্ণ। আমরা যদি কাউকে ভালবাসি তাহলে তার ছোটখাটো কাজও আমাদের জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। অন্যদিকে আমরা যদি কারও প্রতি নির্বিকার থাকি তাহলে তার খুব

গুরুত্বপূর্ণ কাজও আমাদের কাছে ছোট মনে হয়। আল্লাহ/স্রস্টা বারবার উল্লেখ করেছেন যে তিনি আমাদের প্রতি স্নেহশীল, তিনি আমাদের সাথেই আছেন এবং সর্বোপরি তিনি আমাদের ভালোবাসেন। তাহলে কেন আমরা এভাবে চিন্তা করতে পারি না যে একজন স্নেহশীল সত্ত্বা আমাদের কাজের জন্য উদ্বিগ্ন হবেন?

.

সেই সাথে এটাও যোগ করা যায় যে আল্লাহর যে ন্যায়বিচারকশীল গুণের কথা বলা হয়েছে তা থেকে আমরা এই উপসংহারে আসতে পারি, যদি আল্লাহর অস্তিত্ব থেকেই থাকে তাহলে কখনোই তিনি আমাদের প্রতি উদাসীন হতে পারেন না বরং মনোযোগী হবেন।

৬২

“কুরআন কি আসলেই সকল অমুসলিম হত্যা করে ফেলতে বলে?”

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্ন : ভবিষ্যতে যদি কখনো মুসলিমরা শক্তিশালী হয়ে ওঠে আর কুরান (Quran 4:89) এর নির্দেশ অনুসারে সকল অমুসলিমদের হত্যা করে তবে সেটা কোনভাবেই অন্যায় বলে গণ্য হবে না (Quran 3:157, 3:169) ! আপনার কি এরপরেও মনে হয় ইসলাম কোন সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত ধর্ম হতে পারে?

.

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

.

“ তারা চায় যে, তারা যেমন অবিশ্বাসী, তোমরাও তেমনি অবিশ্বাসী হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সমান হয়ে যাও। অতএব, তাদের মধ্যে কাউকে আওলিয়া(পৃষ্ঠপোষক/অভিভাবক/বন্ধু)রূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত না তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়, তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও সংহার কর। তাদের কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না।

কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা এমন সম্প্রদায়ের সাথে মিলিত হয় যে তাদের সঙ্গে তোমরা চুক্তিবদ্ধ অথবা তোমাদের কাছে এভাবে আসে যে, তাদের অন্তর তোমাদের সাথে এবং তাদের কওমের সাথে যুদ্ধ করতে অনিচ্ছুক।

...”

(কুরআন, নিসা ৪:৮৯-৯০)

.

“আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুমুখে পতিত হও, তোমরা যা কিছু সংগ্রহ করে থাকো আল্লাহর ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম।” (কুরআন, আলি ইমরান ৩:১৫৭)

.

“ আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের প্রভুর নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত।”

(কুরআন,আলি ইমরান ৩:১৬৯)

.

প্রশ্নকর্তাগণ যে আয়াতের ব্যাপারে প্রশ্ন তুলেছেন, সেই আয়াত(নিসা ৪:৮৯) প্রসঙ্গে সাহাবী ইবন আব্বাস(রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, মক্কায় এমন কিছু লোক ছিল যারা ইসলামের কালিমা পাঠ করেছিল।কিন্তু এরা মুসলিমদের বিরুদ্ধে মুশরিকদের সাহায্য করত। {অর্থাৎ এরা মদীনা ইসলামী রাষ্ট্রে শত্রুর এজেন্ট হিসাবে কাজ করত} তাদের বিশ্বাস ছিল যে মুহাম্মাদ(ﷺ) এর সাহাবীগণ তাদেরকে কোন বাধা প্রদান করবেন না কেননা তারা প্রকাশ্যে ইসলামের কালিমা পাঠ করেছিল।

.

এদের ব্যাপারে কী করা হবে, তা নিয়ে সাহাবীদের মধ্যে মতানৈক্য হয়েছিল।রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এ ব্যাপারে নিরব থাকলেন।অতঃপর আলোচ্য আয়াত(নিসা ৪:৮৯) নাজিল হল এবং ঐসব শত্রুর চরের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে ফয়সালা এলো।

[তাবারী ৯/১০ এবং ইবন কাসির, নিসা ৪:৮৯ এর তাফসির দ্রষ্টব্য]

.

পরবর্তী আয়াতে(নিসা ৪:৯০) এটাও পরিষ্কার বুঝিয়ে দেয়া হল যেঃ এই ফয়সালা তাদের জন্য নয় যারা মুসলিমদের সাথে

চুক্তিবদ্ধ কোন সম্প্রদায়ের নিকট যায় কিংবা যারা মুসলিমদের সাথে যুদ্ধ করতে ইচ্ছুক নয়। ঐ আদেশ শুধু তাদের ব্যাপারে যারা মুসলিমদের মধ্যে শত্রুর চর হিসাবে কাজ করছিল।

.

কোথায় শত্রুর গুপ্তচরে প্রতি শাস্তির নির্দেশ আর কোথায় সকল অমুসলিমকে হত্যা করা!!!

বরাবরের মতই কুরআনের বিধানকে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিকভাবে ও বিকৃতভাবে ব্যাখ্যা করে আলোচ্য প্রশ্নটি উত্থাপন করা হয়েছে।আমরা জানি যে বর্তমানে পৃথিবীর সকল সেকুলার রাষ্ট্রেও শত্রুর গুপ্তচরের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তিমূলক ব্যাবস্থা গ্রহণ করা হয়।নাস্তিক-মুক্তমনাদের কিন্তু কখনো এসবের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় না।প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্রের ক্ষতিসাধণকারী শত্রুর গুপ্তচরের বিরুদ্ধে যে শাস্তিমূলক ব্যাবস্থা নেওয়া দরকার, এটা নিয়ে প্রশ্ন তুলবার কোন সুযোগই কারো নেই। আর একারণেই কুরআনের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তুলবার জন্য এর আয়াতকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করার প্রয়োজন হয়েছে নাস্তিকদের। পরকাল আর স্রষ্টার বিচারে যাদের বিশ্বাস নেই, তাদের কাছ থেকে আর কতটুকু সত্যবাদিতাই বা আমরা আশা করতে পারি?

.

প্রশ্নকর্তাদের উল্লেখিত অপর আয়াতদ্বয় আলি ইমরান ৩:১৫৭ ও আলি ইমরান ৩:১৬৯ এ শহীদগণের মর্যাদা বর্ণণা করা হয়েছে। আল্লাহর পথে লড়াই করে মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তিগণ শহীদ। আর আল্লাহর পথে যে লড়াই হয় তা সবসময়েই ন্যায়সঙ্গতভাবে হয়।একটি আয়াতেও “সকল অমুসলিমদের হত্যা করা”র নির্দেশ নেই। কুরআনে জিহাদের লক্ষ্য ও উদ্যেশ্য খুব পরিষ্কারভাবে বর্ণণা করা আছে। ফিতনা দূর করা ও আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করা(সুরা আনফাল ৮:৩৯ দ্রষ্টব্য) ও মুসলিমদের জুলুম-নির্যাতন থেকে রক্ষা করা(নিসা ৪:৭৫ দ্রষ্টব্য)।কুরআন কস্মিণকালেও সকল অমুসলিমকে হত্যা করতে বলে না কিংবা কোন মানুষের উপর জুলুম করতে বলে না। বরং এর বিপরীত কথাই কুরআনে পাওয়া যায় [কয়েকটি নমুনার জন্য সুরা মুমতাহিনা ৬০:৮-৯, আনকাবুত ২৯:৪৬, মায়িদাহ ৫:৮-৯, আনআম ৬:১৫১-১৫২ দেখা যেতে পারে]।

.

হাদিসে বলা হয়েছে---

.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, যে ব্যক্তি কোন কারণ ব্যতিত মু’আহিদ(ইসলামী রাষ্ট্রে চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম) কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দেবেন।
[সুনান আবু দাউদ; জিহাদ অধ্যায় ১৫, হাদিস ২৭৬০(সহীহ)]

.

মুতার যুদ্ধে রওনার সময় রাসূলুল্লাহ(ﷺ) তাঁর বাহিনীকে নির্দেশ দেন :
‘তোমরা কোনো নারীকে হত্যা করবে না, অসহায় কোনো শিশুকেও না; আর না অক্ষম বৃদ্ধকে। আর কোনো গাছ উপড়াবে না, কোনো খেজুর গাছ জ্বালিয়ে দেবে না। আর কোনো গৃহও ধ্বংস করবে না।’
[মুসলিম : ১৭৩১]

.

"... আমি তোমাদের কয়েকটি উপদেশ দিয়ে প্রেরণ করছি : (যুদ্ধক্ষেত্রে) তোমরা বাড়াবাড়ি করবে না, ভীরুতা দেখাবে না, (শত্রুপক্ষের) কারো চেহারা বিকৃতি ঘটাবে না, কোনো শিশুকে হত্যা করবে না, কোনো গির্জা জ্বালিয়ে দেবে না এবং কোনো বৃক্ষও উৎপাটন করবে না।''
[মুসান্নাফ আবদুর রাযযাক : ৯৪৩০]

.

যুদ্ধের ময়দানেও এভাবে ইসলাম ন্যায়-ইনসাফের নির্দেশ দিয়েছে। মোটেও “সকল অমুসলিমদের হত্যা করা”র নির্দেশ দেয়নি।

.

যারা বলতে চায় ইসলাম "সকল অমুসলিমকে হত্যা করা"র নির্দেশ দেয়, তারা এক মারাত্মক নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দেয়। সকল অমুসলিমকে যদি হত্যাই করা হয়, ইসলামের দাওয়াত দেওয়া হবে কাকে বা ইসলামের বিস্তার হবে কিভাবে?

.

সব শেষে প্রশ্নকর্তা নাস্তিক-মুক্তমনাবৃন্দের উদ্দেশ্যে বলতে চাইঃ আপনারা এহেন রেফারেন্স উল্লেখ করে {সেই সাথে অপ্রাসঙ্গিক ও বিকৃত ব্যাখ্যা করে} প্রশ্ন তুলেছেন কী করে ইসলাম সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত ধর্ম হতে পারে। আমার প্রশ্নঃ আপনারা কি আদৌ কোন সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস করেন? যে সৃষ্টিকর্তাকে আপনারা বিশ্বাসই করেন না, তখন কিভাবে আপনারা "সৃষ্টিকর্তার ধর্ম"র ব্যাপারে আস্তিকদের কাছে প্রশ্ন করেন? এটা কি কপটতা নয়? আর সৃষ্টিকর্তার নির্দেশিত ধর্ম কীরকম হওয়া উচিত বলে আপনারা মনে করেন? আপনাদের কি কোন প্রস্তাবনা আছে? আপনারা কি আসলেই স্রষ্টায় অবিশ্বাস করেন, নাকি নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ(বা উপাসনা) করে নিজেদের মনমত স্রষ্টার কল্পনা করেন?

.

"তুমি কি তাকে দেখো না, যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে?"
(কুরআন, ফুরকান ২৫:৪৩)

৬৩

তাকদির আগে থেকে নির্ধারিত হলে মানুষের বিচার হবে কেন? যাদের কাছে ইসলামের দাওয়াহ পৌঁছেনি তাদের কী হবে?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

নাস্তিক প্রশ্ন: মানুষ জান্নাতে যাবে নাকি জাহান্নামে যাবে—তা তো আগে থেকেই তাকদিরে লেখা। আর এর ব্যতিক্রমও ঘটবে না। আল্লাহর হুকুম ছাড়া নাকি কোনো গাছের পাতাও পড়ে না; পৃথিবীর সব অপরাধ তো তাহলে আল্লাহর হুকুমেই হয়। অমুসলিমরা অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে আর মুসলিমরা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। কেউ যদি হিন্দু বা নাস্তিক হওয়ার জন্য জাহান্নামে যায়—এটা তো সেই ব্যক্তির দোষ না। এটা সৃষ্টিকর্তারই দোষ।

উত্তর: আরবি 'তাকদির'(تقدير) শব্দটি 'কদর'(قدر) শব্দের সাথে সম্পর্কিত। শাব্দিকভাবে 'কদর' এর অর্থ – পরিমাপ, পরিমাণ, মর্যাদা, শক্তি। আর 'তাকদির' এর অর্থ – পরিমাপ করা, নির্ধারণ করা, সীমা নির্ণয় করা ইত্যাদি। [25]

তাকদির হচ্ছে, সর্বজ্ঞানী হিসাবে আল্লাহ তা'আলার পূর্ব জ্ঞান ও হিকমতের দাবি অনুযায়ী সমগ্র সৃষ্টিজগতের জন্য সব কিছু নির্ধারণ। [26]

আল-কুরআন আমাদেরকে জানাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যত সব কিছুর ব্যাপারে জানেন। বলা হয়েছে –

"নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের গোপন রহস্য আল্লাহর কাছেই রয়েছে।..." [27]

*"তুমি কি জানো না যে, আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সম্পর্কে আল্লাহ জানেন? **এসব বিষয় একটি কিতাবে সংরক্ষিত আছে**। নিশ্চয়ই এটা আল্লাহর পক্ষে অতি সহজ।"* [28]

*"অদৃশ্য জগতের চাবিকাঠি তাঁরই নিকট রয়েছে; তিনি ছাড়া আর কেউঁই তা জ্ঞাত নয়। পৃথিবীতে ও সমুদ্রের সব কিছুই তিনি অবগত আছেন, তাঁর অবগতি ব্যতীত বৃক্ষ হতে একটি পাতাও ঝরে পড়ে না এবং ভূ-পৃষ্ঠের অন্ধকারের মধ্যে একটি দানাও পতিত হয় না, এমনিভাবে কোনো সরস ও নিরস বস্তুও পতিত হয় না; **সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট কিতাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে।** "* [29]

"এগুলো অদৃশ্যের খবর, যা ওহীর মাধ্যমে আমি তোমার [মুহাম্মাদ(ﷺ)] *কাছে প্রেরণ করি। তুমি তাদের কাছে ছিলে না, যখন তারা ষড়যন্ত্র করে নিজেদের সিদ্ধান্ত স্থির করে ফেলেছিলো।"* [30]

---

[25] ইবনু ফারিস, মু'জামু মাকায়িসিল লুগাহ ৫/৫৬;

'কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকীদা' – খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর(র); পৃষ্ঠা ৩৩৯

[26] 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা' – শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন(র), পৃষ্ঠা ৮২ (islamhouse); ডাউনলোড লিঙ্কঃ http://bit.ly/2jsTGEP অথবা https://goo.gl/aBwSFN

[27] আল-কুরআন, সুরা আন-নাহল ১৬:৭৭

[28] আল-কুরআন, সুরা হাজ ২২:৭০

[29] আল-কুরআন, সুরা আন'আম ৬:৫৯

[30] আল-কুরআন, সুরা ইউসুফ ১২:১০২

"তিনিই সেই সত্তা, যিনি আকাশসমূহ ও পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন যথোচিত। যেদিন তিনি বলবেন, 'হয়ে যাও!' তখন হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য। যেদিন শিঙ্গায় ফুঁৎকার করা হবে, সেদিন আধিপত্য হবে তাঁরই। তিনি অদৃশ্য বিষয়ে এবং প্রত্যক্ষ বিষয়ে জ্ঞাত। তিনিই প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ। " [31]

"নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছেই কিয়ামতের জ্ঞান রয়েছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং গর্ভাশয়ে যা থাকে, তিনি তা জানেন। কেউ জানে না, আগামীকাল সে কী উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না, কোন দেশে সে মৃত্যুবরণ করবে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।" [32]

"তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী, পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞাময়।" [33]

পৃথিবীর সব অপরাধ কি আল্লাহর হুকুমেই হয়?

হুকুম মানে নির্দেশ। আল্লাহ তা'আলা কখনোই অপরাধ বা খারাপ কাজের নির্দেশ দেন না। আল্লাহ বলেন—

*"... **আল্লাহ মন্দ কাজের আদেশ দেন না।** তোমরা এমন কথা আল্লাহর প্রতি কেন আরোপ কর, যা তোমরা জানো না? "* [34]

আল্লাহ তা'আলা সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা। পাপ কিংবা পূণ্য – মানুষের সকল কর্মও আল্লাহর সৃষ্টি। পৃথিবীতে যা ঘটে এবং মানুষ যা করে – এগুলোর সবগুলোই আল্লাহর অনুমতিক্রমে বা ইচ্ছায় হয়।

আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা ২ প্রকারের। [35] যথাঃ

১। কাউনিয়্যাহ

২। শারইয়্যাহ

১। কাউনিয়্যাহঃ

এ ধরণের ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকৃত জিনিসটি সম্পন্ন হয়। তবে জিনিসটি আল্লাহ তা'আলার কাছে পছন্দনীয় হওয়া জরুরী নয়। আর এটা দ্বারাই 'মাশিয়াত' বা ইচ্ছা বোঝানো হয়। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"...আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন, তাহলে তারা পরস্পর লড়াই করতো না। কিন্তু আল্লাহ তাই করেন, যা তিনি ইচ্ছা করেন।" [36]

২। শারইয়্যাহঃ

[31] আল-কুরআন, সুরা আন'আম ৬:৭৩

[32] আল-কুরআন, সুরা লুকমান ৩১:৩৪

[33] আল-কুরআন, সুরা তাগাবুন ৬৪:১৮

[34] আল-কুরআন, সুরা আ'রাফ ৭:২৮

[35] 'আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের আকীদা' – শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন(র), পৃষ্ঠা ২০-২২ (islamhouse)

[36] আল-কুরআন, সুরা বাকারাহ ২:২৫৩

এ ধরণের ইচ্ছা দ্বারা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাকৃত জিনিসটি সম্পন্ন হওয়া অপরিহার্য নয়। তবে এ ক্ষেত্রে ইচ্ছাকৃত জিনিস বা বিষয়টি তাঁর পছন্দনীয়। যেমনঃ আল্লাহ তা'আলা বলেনঃ

"আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিতে চান।... " [37]

উদাহরণঃ

আবু বকর(রা.) এর ঈমান আনা – এই ঘটনাটি একই সাথে আল্লাহর কাউনিয়্যাহ ও শারইয়্যাহ ইচ্ছার উদাহরণ। এটি কাউনিয়্যাহ ইচ্ছা এই জন্য যেঃ এটি সংঘটিত হয়েছিল। শারইয়্যাহ ইচ্ছা এই জন্য যেঃ এটি আল্লাহর পছন্দনীয় ছিল। আবার ফিরআউনের কুফরী – এটি শুধুমাত্র আল্লাহর কাউনিয়্যাহ ইচ্ছার উদাহরণ। এটি কাউনিয়্যাহ ইচ্ছা এই কারণে যেঃ এটি সংঘটিত হয়েছিল। কিন্তু এটি শারইয়্যাহ ইচ্ছা নয় কেননা এর পেছনে আল্লাহর কোন অনুমোদন বা সন্তুষ্টি ছিল না। আল্লাহ মুসা(আ.)কে তার নিকট ঈমানের দাওয়াত দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। [38]

আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন যাকাত আদায় করার, তিনি মানুষকে চুরি করতে নিষেধ করেছেন। এ নির্দেশগুলো পালন করা আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দেওয়া হয়েছে যা দ্বারা সে এ আদেশগুলো মানতেও পারে আবার ভঙ্গও করতে পারে। মানুষ যদি নিজ ইচ্ছাশক্তি দ্বারা যাকাত আদায় না করে কিংবা চুরি করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তাকে জোর করে যাকাত আদায় করতে বাধ্য করেন না কিংবা চুরি করা আটকে দেন না। যদিও আল্লাহর এ ক্ষমতা আছে। মানুষ যদি যাকাত আদায় না করে কিংবা যদি চুরি করে, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তা হতে দেন। কিন্তু এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি নেই।

যেহেতু মানুষের সকল কর্ম আল্লাহর সৃষ্টি কাজেই পূণ্যের সাথে সাথে পাপও আল্লাহর ইচ্ছাক্রমে হয়। তবে তা কেবলমাত্র এ অর্থে যে আল্লাহ এগুলোকে(পাপ) নির্ধারিত করেছেন; এ অর্থে নয় যে আল্লাহ এগুলো অনুমোদন করেন বা আদেশ দেন। পৃথিবীতে যত খারাপ কাজ বা অপরাধ সংঘটিত হয়, এগুলোর উপর আল্লাহ তা'আলার কোনো সন্তুষ্টি নেই। আল্লাহ এগুলো ঘৃণা করেন, অপছন্দ করেন এবং এগুলো থেকে বিরত হবার আদেশ দেন। [39]

পৃথিবীতে যত অপরাধ সংঘটিত হয়, এগুলোর উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি না থাকা সত্ত্বেও কেন আল্লাহ এগুলো সংঘটিত হতে দেন এর উত্তরে বলা যেতে পারে – কুফর যদি না থাকত, তাহলে মু'মিন ও কাফির আলাদা করা যেত না বরং সবাই মু'মিন হত। [40]
একইভাবে, পাপ যদি না থাকতো, তাহলে পূণ্য বলে কিছু থাকতো না, সৎকর্ম ও মহত্ত্বেরও কোনো মানে থাকতো না। যদি অশুভ শক্তি না থাকতো, তাহলে শুভ ও কল্যাণকর জিনিসের কোনো মূল্য থাকতো না। অন্ধকার আছে বলেই আলোর গুরুত্ব আছে। পৃথিবীতে নিষ্ঠুরতা বা নৃশংসতা না থাকলে মানবতারও কোনো আলাদা অস্তিত্ব বা অর্থ থাকতো না। কাজেই পৃথিবীতে অন্যায়, পাপ ইত্যাদির অস্তিত্বও আল্লাহর সৃষ্টির অসামান্য হিকমতের পরিচায়ক।
এ ব্যাপারে একটি কবিতা খুবই প্রাসঙ্গিক –

---

[37] আল-কুরআন, সুরা নিসা ৪:২৭

[38] 'Are we Forced or do we have a Free Will' by Shaykh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen; page 27-29; ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://islamhouse.com/en/books/373557/

[39] 'শারহ আকিদা আত ত্বহাওয়ী' – ইবন আবিল ইজ্জ হানাফী(র); পৃষ্ঠা ৩৮(ইংরেজি অনুবাদ)

[40] 'Are we Forced or do we have a Free Will' by Shaykh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen; page 32

"আলো বলে, "অন্ধকার তুই বড় কালো,"
অন্ধকার বলে, "ভাই তাই তুমি আলো।" "

মানুষের কর্ম তার পরিণতির কারণ

কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা এটি সাব্যস্ত হয়েছে যে – মানুষ যে কর্ম করবে ঠিক সে অনুযায়ী প্রতিদান পাবে। মানুষের প্রতিদান নির্ধারিত হবে তার কর্মের ভিত্তিতে।

*"নিশ্চয়ই আমি [আল্লাহ] **মানুষকে শ্রমনির্ভররূপে সৃষ্টি করেছি**।"* [41]

*"সেখানে প্রত্যেকে **যাচাই করে নিতে পারবে যা কিছু সে ইতিপূর্বে করেছিল** এবং আল্লাহর প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে যিনি তাদের প্রকৃত মালিক, আর তাদের কাছ থেকে দূরে যেতে থাকবে যারা মিথ্যা বলত।"* [42]

*"আর যত লোকই হোক না কেন, যখন সময় হবে, **তোমার প্রভু তাদের সকলেরই আমলের প্রতিদান পুরোপুরি দান করবেন।** নিশ্চয়ই তিনি তাদের যাবতীয় কার্যকলাপের খবর রাখেন।...*

*"আর ধৈর্য্যধারণ কর, **নিশ্চয়ই আল্লাহ পূণ্যবানদের প্রতিদান বিনষ্ট করেন না**।"* [43]

*"আজকের দিনে [শেষ বিচারের দিন] কারও প্রতি জুলুম করা হবে না এবং **তোমরা যা করবে কেবল তারই প্রতিদান পাবে।"*** [44]

*"যে মন্দ কর্ম করে, সে কেবল **তার অনুরূপ প্রতিফল পাবে**, আর যে, পুরুষ অথবা নারী মুমিন অবস্থায় সৎকর্ম করে তারাই জান্নাতে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে বেহিসাব রিযিক দেয়া হবে।"* [45]

আল কুরআন আমাদের জানাচ্ছে যে – মানুষ তার সৎকাজের জন্য পুরষ্কার পাবে। মানুষ দুনিয়াতে যে কর্ম করে, পরকালে তার প্রতিফলস্বরূপ জান্নাত লাভ করবে।

*" তাদেরই জন্য **প্রতিদান হলো** তাদের পালনকর্তার ক্ষমা ও জান্নাত, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে প্রস্রবণ যেখানে তারা থাকবে অনন্তকাল। যারা **আমল করে তাদের জন্য কতইনা চমৎকার প্রতিদান**।"* [46]

*" আর পুরুষ কিংবা নারীর মধ্য থেকে **যে সৎকাজ করবে এমতাবস্থায় যে, সে মু'মিন(বিশ্বাসী)**, তাহলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং **তাদের প্রতি খেজুর বিচির আবরণ পরিমাণ জুলুমও করা হবে না**।"* [47]

*"তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, কখনও তা শেষ হবে না। **যারা ধৈর্য ধরে, আমি তাদেরকে প্রাপ্য প্রতিদান দেব তাদের উত্তম কর্মের প্রতিদানস্বরূপ যা তারা করত**। যে সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং যে*

---

[41] আল-কুরআন, সুরা বালাদ ৯০:৪

[42] আল-কুরআন, সুরা ইউনুস ১০:৩০

[43] আল-কুরআন, সুরা হুদ ১১: ১১১, ১১৫

[44] আল-কুরআন, সুরা ইয়াসিন ৩৬:৫৪

[45] আল-কুরআন, সুরা মু'মিন(গাফির) ৪০:৪০

[46] আল-কুরআন, সুরা আলি ইমরান ৩:১৩৬

[47] আল-কুরআন, সুরা নিসা ৪:১২৪

*ঈমানদার— সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং **প্রতিদানে তাদেরকে তাদের উত্তম কাজের কারণে প্রাপ্য পুরষ্কার দেব যা তারা করত।"*** [48]

"যে কষ্ট স্বীকার করে, সে তো নিজের জন্যেই কষ্ট স্বীকার করে।** নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্ববাসীর উপর প্রাচুর্যশীল। আর **যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আমি অবশ্যই তাদের মন্দ কাজগুলো মিটিয়ে দেব এবং তাদেরকে কর্মের উৎকৃষ্টতর প্রতিদান দেব।" [49]

*" নিশ্চয়ই যারা বলে, আমাদের প্রভু আল্লাহ অতঃপর অবিচল থাকে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা চিন্তিত হবে না। তারাই জান্নাতের অধিকারী। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। **তারা যে কর্ম করত, এটা তারই প্রতিফল। "*** [50]

" এটা তোমাদের প্রতিদান। তোমাদের প্রচেষ্টা স্বীকৃতি লাভ করেছে।" [51]

পক্ষান্তরে, মানুষ তার কর্মের জন্যই পরকালে শাস্তির সম্মুখীন হবে।

*"বস্তুতঃ যারা মিথ্যা জেনেছে আমার আয়াতসমূকে এবং আখিরাতের সাক্ষাতকে, তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ধ্বংস হয়ে গেছে। **তেমন বদলাই সে পাবে যেমন আমল করত।"*** [52]

*" পার্থিব জীবনে সামান্যই লাভ, অতঃপর আমার নিকট প্রত্যাবর্তন করতে হবে। তখন আমি তাদেরকে আস্বাদন করাব কঠিন আযাব-**তাদেরই কৃত কুফরীর বদলাতে।"*** [53]

*" যেদিন আমি পর্বতসমূহকে পরিচালনা করব এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি উন্মুক্ত প্রান্তর এবং আমি মানুষকে একত্রিত করব অতঃপর তাদের কাউকে ছাড়ব না। তারা তোমার প্রভুর [আল্লাহ] সামনে পেশ হবে সারিবদ্ধ ভাবে এবং বলা হবেঃ তোমরা আমার কাছে এসে গেছ; যেমন তোমাদেরকে প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। না, তোমরা তো বলতে যে, আমি তোমাদের জন্যে কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দিষ্ট করব না। আর আমলনামা সামনে রাখা হবে। তাতে যা আছে; তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে ভীত-সন্ত্রস্ত দেখবে। তারা বলবেঃ "হায় আফসোস, **এ কেমন আমলনামা। এ যে ছোট বড় কোন কিছুই বাদ দেয়নি-সবই এতে রয়েছে!" তারা তাদের কৃতকর্মকে সামনে উপস্থিত পাবে। তোমার প্রভু কারও প্রতি জুলুম করবেন না।"*** [54]

*"হে অপরাধীরা! আজ তোমরা আলাদা হয়ে যাও। হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে বলে রাখিনি যে, শয়তানের দাসত্ব করো না, সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? এবং আমার দাসত্ব কর। এটাই সরল পথ। শয়তান তোমাদের অনেক দলকে পথভ্রষ্ট করেছে। তবুও কি তোমরা বোঝোনি? এই সে জাহান্নাম, যার ওয়াদা তোমাদেরকে দেয়া হতো। **তোমাদের কুফরের কারণে আজ এতে প্রবেশ কর।"*** [55]

তাদের কর্মই তাদের জিম্মাদার। এবং এই কর্ম আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতিক্রমে হয়ে থাকে। এই আয়াত ও হাদিসগুলোতে পুরো ব্যাপারটি খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে---

---

48 আল-কুরআন, সুরা নাহল ১৬:৯৬-৯৭

49 আল-কুরআন, সুরা আনকাবুত ২৯:৬-৭

50 আল-কুরআন, সুরা আহকাফ ৪৬:১৩-১৪

51 আল-কুরআন, সুরা দাহর(ইনসান) ৭৬:২২

52 আল-কুরআন, সুরা আ'রাফ ৭:১৪৭

53 আল-কুরআন, সুরা ইউনুস ১০:৭০

54 আল-কুরআন, সুরা কাহফ ১৮:৪৭-৪৯

55 আল-কুরআন, সুরা ইয়াসিন ৩৬:৫৯-৬৪

*"এখন মুশরিকরা বলবে, '**যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন, তবে না আমরা শিরক করতাম, না আমাদের বাপ-দাদারা আর না আমরা কোনো বস্তুকে হারাম করতাম।**' এমনিভাবে তাদের পূর্ববর্তীরা **মিথ্যারোপ করেছে,** পরিশেষে তারা আমার শাস্তি আস্বাদন করেছে। বলো, **তোমাদের কাছে কি কোনো জ্ঞান আছে, যা আমাকে দেখাতে পারো? তোমরা যে-সবের পেছনে চলছো, তা ধারণা-অনুমান ছাড়া কিছু না। তোমরা শুধু অনুমান করেই কথা বলো।** বলে দাও: অতএব, পরিপূর্ণ যুক্তি আল্লাহরই। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের সবাইকে পথপ্রদর্শন করতেন।"* [56]

*আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসুলুল্লাহ(ﷺ) একখণ্ড কাঠ হাতে নিয়ে উপবিষ্ট ছিলেন। তিনি তা দ্বারা যমীনে টোকা দিচ্ছিলেন। এরপর তিনি তার মাথা উঠালেন। তখন তিনি বললেনঃ তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার জান্নাত ও জাহান্নামের ঠিকানা পরিজ্ঞাত (নির্ণীত) নয়। তাঁরা বললেন, **ইয়া রাসুলুল্লাহ(ﷺ)! তাহলে আমরা কাজ-কর্ম ছেড়ে কি ভরসা করে বসে থাকব না? তিনি বললেন, না, বরং আমল করতে থাকো।** যাকে যে জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তাই তার জন্য সহজ করা হয়েছে।*

*এরপর তিনি তিলওয়াত করলেনঃ "**সুতরাং কেউ দান করলে, মুত্তাকি হলে এবং যা উত্তম তা গ্রহণ করলে, আমি তার জন্য সুগম করে দেব সহজ পথ। এবং কেউ কার্পণ্য করলে ও নিজেকে স্বয়ংসম্পূর্ণ মনে করলে, এবং যা উত্তম তা বর্জন করলে, তার জন্য আমি সুগম করে দেবো কঠোর পরিণামের পথ।**" (সূরা লাইল ৯২:৫-১০)* [57]

*আনাস বিন মালিক(রা.) থেকে বর্ণিত; একজন ব্যক্তি বলল, "হে আল্লাহর রাসুল(ﷺ), আমি কি আমার উট বেঁধে আল্লাহর উপর ভরসা করব, নাকি আমি ওটাকে না বেঁধে ছেড়ে রেখেই আল্লাহর উপর ভরসা করব?" তিনি [রাসুল(ﷺ)] বললেন, **"ওটাকে বাঁধো এবং [এরপর আল্লাহর উপর] ভরসা কর।"*** [58]

কাজেই— "আল্লাহ না চাইলে তো পাপ কাজ করতাম না, তাকদিরে আছে বলেই পাপকাজ করেছি"—এই জাতীয় কথা বলার কোনো মানে নেই। কারণ এরূপ কথা বলার অর্থ হচ্ছে—গায়েবের জ্ঞান থাকার দাবি করা। "তাকদিরে পাপ করার কথা আছে"—এটা তো কেউ আমাদের বলে দেয়নি। এই জ্ঞান তো আমাদের কারো নেই। কাজেই এধরনের কথা বলার অর্থ হচ্ছে, আন্দাজের অনুসরণ করা এবং ইচ্ছাকৃতভাবে পাপকাজে লিপ্ত হওয়া।

মানুষের কি আদৌ কোনো ইচ্ছাশক্তি আছে, নাকি তাকে বাধ্য করা হচ্ছে? আল্লাহ কি কাউকে জোর করে জাহান্নামে পাঠাবেন?

কে জান্নাতে যাবে আর কে জাহান্নামে যাবে এটা আল্লাহ তা'আলা স্বাভাবিকভাবেই আগে থেকে জানেন। তবে এর মানে এই নয় যে, আল্লাহ্ জোর করে কাউকে জাহান্নামের পাঠান।

কুরআন ও হাদিসে বলা হয়েছে—

*"**...আল্লাহ এমন নন যে, তোমাদের ঈমান নষ্ট করে দেবেন।** নিশ্চয়ই মানুষের প্রতি আল্লাহ অত্যন্ত স্নেহশীল, করুণাময়।"* [59]

---

[56] আল-কুরআন, সুরা আন'আম ৬:১৪৮-১৪৯

[57] সহীহ মুসলিম, হাদিস: ৬৪৯২

[58] সুনান তিরমিযি, হাদিস: ২৫১৭, হাসান

[59] আল-কুরআন, সুরা বাকারাহ ২:১৪৩

"তিনিই (আল্লাহ) প্রথমবার অস্তিত্ব দান করেন এবং পুনরায় জীবিত করেন। ***তিনি ক্ষমাশীল, প্রেমময়; মহান আরশের অধিকারী।"*** [60]

"উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার নবী (ﷺ)-এর নিকট কিছুসংখ্যক বন্দি আসে। বন্দিদের মধ্যে একজন মহিলা ছিলো। তার স্তন দুধে পূর্ণ ছিল। সে বন্দিদের মধ্যে কোনো শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিতো এবং দুধ পান করাতো। নবী (ﷺ) আমাদের বললেন, ***"তোমরা কি মনে করো, এ মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলে দিতে পারে?" আমরা বললাম, "না। ফেলার ক্ষমতা রাখলেও সে কখনো ফেলবে না।" তারপর তিনি বললেন, "এ মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটুকু দয়ালু, আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি এর চেয়েও বেশি দয়ালু।"*** [61]

"আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন, "যে ব্যক্তি নেক কাজের ইচ্ছা করে অথচ এখনও তা সম্পাদন করেনি, তার জন্য একটি সাওয়াব লেখা হয়। আর যে ইচ্ছা করার পর কার্য সম্পাদন করে, তবে তার ক্ষেত্রে দশ থেকে সাতশ' গুণ পর্যন্ত সাওয়াব লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে কোনো মন্দ কাজের ইচ্ছা করে আর তা না করে, তবে কোনো গুনাহ লেখা হয় না; আর তা করলে (একটি) গুনাহ লেখা হয় ।" [62]

শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়া(র) মানুষের কর্মের ভূমিকা সম্পর্কে বলেছেনঃ *মানুষ প্রকৃতই কর্ম করে, এবং আল্লাহ তাদের কর্মের স্রষ্টা। কোনো ব্যক্তি মু'মিন অথবা কাফির হতে পারে, পূন্যবান কিংবা পাপী হতে পারে, সলাত আদায় ও সিয়াম পালন করতে পারে –****মানুষের তার কর্মের উপর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তার নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি রয়েছে।*** *এবং আল্লাহ তার এ নিয়ন্ত্রণ ও ইচ্ছাশক্তির স্রষ্টা। যেরূপ আল্লাহ বলেছেন—"[এটা] তার জন্যে, যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়।*

তোমরা ইচ্ছা করবে না, যদি জগতসমূহের প্রভু আল্লাহ ইচ্ছা না করেন।" (সুরা তাকওয়ির ৮১:২৮-২৯) [63]

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন(র) বলেছেনঃ ***"...মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে*** *যেমন মানুষের খাওয়া ও পান করার ক্ষমতা আছে। যেমনঃ ফজরের সলাতের সময় মানুষ (ওযু করতে) পানির দিকে যায় নিজ ইচ্ছায়, যখন ঘুম আসে, তখন মানুষ বিছানায় যায় নিজ ইচ্ছায়। ...****এভাবে প্রতিটি কর্মের ব্যাপারেই মানুষের নিজস্ব ইচ্ছাশক্তি আছে। যদি তা না হত, তাহলে পাপীকে শাস্তি দেয়া অন্যায্য হত। মানুষকে এমন কিছুর জন্য কিভাবে শাস্তি দেয়া যেতে পারে যার উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই? যদি তা না হত, তাহলে কিভাবে পূণ্যবানকে পুরস্কার দেয়া যেতে পারে, যেখানে ঐ কর্মের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না?*** *...কাজেই মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে তবে সে আল্লাহর নির্ধারণকৃত তাকদিরের বাইরে কোনো কাজ করে না কারণ তার কর্মের উপর আল্লাহর নিয়ন্ত্রণ রয়েছে।* ***কিন্তু আল্লাহ মানুষকে বাধ্য করেন না। মানুষের স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি আছে এবং এ অনুযায়ী মানুষ কাজ করে।***

যদি নিজের ইচ্ছার বাইরে মানুষ কোনো কাজ করে ফেলে, তবে এ জন্য তাকে দায়ী করা হয় না। আল্লাহ গুহাবাসীদের(আসহাবে কাহফ) ব্যাপারে বলেছেনঃ "তুমি মনে করবে তারা জাগ্রত, অথচ তারা নিদ্রিত। ***আমি [আল্লাহ] তাদেরকে পার্শ্ব পরিবর্তন করাই*** *ডান দিকে ও বাম দিকে। ..." (সুরা কাহফ ১৮:১৮)*

---

[60] আল-কুরআন, সুরা বুরূজ ৮৫:১৩-১৫

[61] সহীহ বুখারি, হাদিসঃ ৫৯৯৯; সহীহ মুসলিম, হাদিসঃ ২৭৫৪

[62] সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, হাদিস ২৩৬

[63] আল ওয়াসিত্বিয়া মা'আ শারহ হাররাস, পৃষ্ঠা ৬৫;

"Is man's fate pre-destined or does he have freedom of will?" (islamqa)

https://islamqa.info/en/20806

এখানে তাদের পার্শ্ব পরিবর্তন করার কর্মটি আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা হয়েছে কারণ তারা ছিল ঘুমন্ত এবং তাদের নিজেদের উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আল্লাহর রাসুল(ﷺ) বলেছেন, "যদি কেউ ভুলক্রমে খায় ও পান করে তবে সে যেন তার সিয়াম(রোজা) পূর্ণ করে নেয়, কেননা আল্লাহ তা আলাই তাকে এ পানাহার'করিয়েছেন।"বুখারী] : ১৯৩৩; মুসলিম : ১১৫৫[এখানে খাওয়া ও পান করার কর্মগুলো আল্লাহর দিকে ন্যস্ত করা হয়েছে কারণ মানুষ রোজা অবস্থায় ভুলবশত এ কাজগুলো করে ফেলে। সে নিজে থেকে খেয়ে বা পান করে নিজের রোজা নষ্ট করবার সিদ্ধান্ত নেয়নি।" [64]

ইসলামবিরোধীরা অভিযোগ করতে চায় যে – ইসলাম বলে মানুষের কর্মের কোনো ভূমিকা নেই বরং শুধুমাত্র পূর্বনির্ধারনের জন্যই মানুষ জান্নাত লাভ করে বা জাহান্নামে যায়। তাদের মতে সব কিছু পূর্ব নির্ধারণ অনুযায়ী সংঘটিত হয়, এতে মানুষের ব্যক্তিগত কোনো স্বাধীনতা নেই। প্রচণ্ড বাতাসে কারো ছাদ থেকে নিচে পড়ে যাওয়া আর সিঁড়ি বেয়ে স্বেচ্ছায় নিচে নেমে আসা একই কথা। অথচ এগুলো ছিল একটি বাতিল ফির্কা(heretic) 'জাবারিয়াহ'দের আকিদা। [65] মুসলিম আলিমগণ এরূপ ভ্রান্ত বিশ্বাস খণ্ডন করে কলম ধরেছেন। যে ধরণের বিশ্বাস ইসলামে নেই এবং যে বিশ্বাসকে খণ্ডন করে মুসলিম আলিমগণ কলম ধরেছেন, সেই বিশ্বাস ইসলামের উপর চাপিয়ে দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ তুলে যারা ইসলামকে প্রশ্নবিদ্ধ করতে চায়, তাদের উদ্দেশ্য অবশ্যই সৎ নয়।

পার্থিব জীবন মানুষের জন্য পরীক্ষা

আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করে স্বাধীন ইচ্ছাশক্তি দিয়েছেন, ভালো-খারাপ উভয় পথই মানুষের জন্য উন্মুক্ত রয়েছে, এবং এটিই মানুষের জন্য পরীক্ষা।

*"আমি তো মানুষকে সৃষ্টি করেছি মিলিত শুক্রবিন্দু হতে, **তাকে পরীক্ষা করার জন্য।** এজন্য আমি তাকে করেছি শ্রবণ ও দৃষ্টিশক্তিসম্পন্ন। আমি তাকে পথনির্দেশ দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে।"* [66]

*"আমি কি তার জন্য সৃষ্টি করিনি দুই চক্ষু? আর জিহবা ও দুই ঠোঁট? এবং **আমি কি তাকে দুইটি পথই দেখাইনি?**"* [67]

তাকদিরের এই প্রশ্নের সাথে সম্পর্কিত আরেকটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, মুসলিমরা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। আবার হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানরা নিজ নিজ পরিবারে জন্মগ্রহণ করে। আবার অনেকের কাছে হয়তো আদৌ ইসলামের দাওয়াতই পৌঁছেনি। এদের কী হবে? ইসলাম এসব ব্যাপারে খুব পরিষ্কারভাবে আমাদেরকে অবহিত করেছে।

মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারীরা মুসলিম আর অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণকারীরা অমুসলিম; মানুষের পরিণতি কি তবে জন্মের ভিত্তিতে?

---

[64] 'Are we Forced or do we have a Free Will' by Shaykh Muhammad Ibn Salih Al Uthaymeen; page 54-55

মূল আরবির জন্য দেখুনঃ শারহ হাদিস জিব্রীল [শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন(র)]

ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://goo.gl/mGrWGn অথবা http://bit.ly/2jjYxnQ

[65] 'ফতোওয়া আরকানুল ইসলাম' – শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন(র); পৃষ্ঠা ১০৫-১০৬

'তাক্বদীর—আল্লাহর এক গোপন রহস্য' – আব্দুল আলীম ইবন কাওছার; পৃষ্ঠা ৩১

[66] আল-কুরআন, সুরা দাহর (ইনসান) ৭৬:২-৩

[67] আল-কুরআন, সুরা বালাদ ৯০:৮-১০

যারা মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, তারা জন্মের জন্য জান্নাতে যাবে না; বরং তাদের বিশ্বাস ও কর্মের জন্য জান্নাতে যাবে। অনেক মানুষ আছে, যারা মুসলিম পরিবারে জন্ম নিয়েও সলাত(নামায) আদায় করে না, অথচ সলাত ঈমান ও কুফরের মধ্যে পার্থক্যকারী।[68] আবার অনেকেই মুসলিম পরিবারে জন্মেও ইসলাম ত্যাগ করে। মুসলিম পরিবারে জন্ম নেয়া অবশ্যই জান্নাতের গ্যারান্টি নয়। আর যে অমুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছে, তার জন্য সেটি একটি পরীক্ষা। সে যদি সঠিক ও অবিকৃতভাবে ইসলামের দাওয়াত পায়, তাহলে ইসলাম গ্রহণ করা তার জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে।

*"যিনি (আল্লাহ) সৃষ্টি করেছেন মরণ ও জীবন, **যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করতে পারেন—কে তোমাদের মধ্যে কর্মে শ্রেষ্ঠ।** তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাময়।"*[69]

"...অতঃপর যদি তোমাদের নিকট আমার পক্ষ থেকে কোনো হেদায়েত পৌঁছে, তবে যে ব্যক্তি আমার সে হেদায়েত অনুসারে চলবে, তার উপর না কোনো ভয় আসবে, না (কোনো কারণে) তারা চিন্তাগ্রস্ত ও সন্তপ্ত হবে। আর যে লোক তা অস্বীকার করবে এবং আমার নিদর্শনগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার প্রয়াস পাবে, তারাই হবে জাহান্নামবাসী; তারা অনন্তকাল সেখানে থাকবে ।"[70]

এ প্রসঙ্গে ইবন আবিল ইজ্জ হানাফী(র) {১৩৩১-১৩৯০ খ্রি./৭৩১-৭৯২ হি.} বলেছেন, *"...কেউ যদি সত্যের প্রমাণ সন্ধান ছাড়াই অন্ধভাবে বাবা-মা'কে অনুসরণ করে এবং তার সামনে প্রকাশ হয়ে যাওয়া সত্যকে অগ্রাহ্য করে, তাহলে সে প্রকৃতপক্ষে নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। এ থেকে সতর্ক করে আল্লাহ বলেছেন, "এবং যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর, তখন তারা বলেঃ বরং আমরা ওরই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি; যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিলনা এবং তারা সুপথগামীও ছিলনা।" (সুরা বাকারাহ ২:১৭০) এই একই ব্যাপার মুসলিম পরিবারে জন্মানো অনেকের জন্যও সত্য। তারা বিশ্বাস ও কর্মের ক্ষেত্রে তাদের বাপ-দাদাদেরকেই অনুসরণ করে যায়। এগুলো যদি ভুলও হয় তবুও তারা সে ব্যাপারে সচেতন হয় না। এরা পরিবেশের দ্বারা মুসলিম, পছন্দের দ্বারা নয়। যখন এমন কাউকে কবরে জিজ্ঞেস করা হবেঃ "কে তোমার প্রভু?" সে বলবেঃ "হায়, আমি জানি না। আমি জানি না। আমি লোকজনকে কিছু জিনিস বলতে শুনতাম এবং আমিও তাই বলতাম।"*[71]

যাদের কাছে পৌঁছেনি সত্য ধর্মের দাওয়াত

এক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্ন আসে যে, অনেকের কাছে তো ইসলামের দাওয়াতই পৌঁছায় না। পৃথিবীতে অনেক দুর্গম জায়গা আছে যেখানে হয়তো ইসলামের দাওয়াত যায়নি। আবার অনেকে বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার জন্য (যেমন বার্ধক্য, জ্ঞান লোপ হওয়া) ইসলামের দাওয়াত থেকে বঞ্চিত হয়। এসব ব্যাপারেও ইসলাম আমাদেরকে সুস্পষ্টভাবে অভিহিত করে। আল্লাহ কারো প্রতি সামান্যতম অন্যায় করবেন না। এটি আল্লাহর সিফাত বা গুণ নয় যে তিনি বান্দার প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করেন।

*"**নিশ্চয়ই আল্লাহ কারো প্রতি বিন্দুমাত্রও জুলুম করেন না;** আর যদি তা (মানুষের কর্ম) সৎকর্ম হয়, তবে তাকে দ্বিগুণ করে দেন এবং নিজের পক্ষ থেকে বিপুল সওয়াব দান করেন।"*[72]

"...বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের ওপর কোনো অন্যায় করেননি, কিন্তু তারা নিজেরাই নিজেদের ওপর অত্যাচার করছিলো।"[73]

---

68 সুনান তিরমিজি, হাদিস: ২৬১৯-২৬২৩

69 আল-কুরআন, সুরা মুলক ৬৭:২

70 আল-কুরআন, সুরা বাকারাহ ২:৩৮-৩৯

71 'শারহ আকিদা আত ত্বহাওয়ী' – ইবন আবিল ইজ্জ হানাফী(র); পৃষ্ঠা ১৯০(ইংরেজি অনুবাদ)

72 আল-কুরআন, সুরা নিসা ৪:৪০

73 আল-কুরআন, সুরা আলি ইমরান ৩:১১৭

"তারপর এদের প্রত্যেককে নিজ নিজ পাপের কারণে আমি পাকড়াও করেছিলাম; তাদের কারো ওপর আমি পাথরকুচির ঝড় পাঠিয়েছি, কাউকে পাকড়াও করেছে বিকট আওয়াজ, কাউকে আবার মাটিতে দাবিয়ে দিয়েছি আর কাউকে পানিতে ডুবিয়ে দিয়েছি। ***আল্লাহ এমন নন যে, তাদের উপর জুলুম করবেন বরং তারা নিজেরা নিজেদের ওপর জুলুম করতো।"*** [74]

"আর যখন তোমার পালনকর্তা বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করলেন তাদের সন্তানদেরকে এবং নিজের উপর তাদেরকে প্রতিজ্ঞা করালেন, 'আমি কি তোমাদের পালনকর্তা নই?' তারা বললো, 'অবশ্যই, আমরা অঙ্গীকার করছি।' আবার না কিয়ামতের দিন বলতে শুরু করো যে, এ বিষয়টি আমাদের জানা ছিল না।" [75]

"কোনো রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।" [76]

"চার প্রকারের লোক কিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলার সাথে কথোপকথন করবে। প্রথম হলো বধির লোক, যে কিছুই শুনতে পায় না। দ্বিতীয় হলো সম্পূর্ণ নির্বোধ ও পাগল লোক, যে কিছুই জানে না। তৃতীয় হলো অত্যন্ত বৃদ্ধ, যার জ্ঞান লোপ পেয়েছে। চতুর্থ হলো ঐ ব্যক্তি, যে এমন যুগে জীবন যাপন করেছে যে যুগে কোনো নবী আগমন করেননি বা কোনো ধর্মীয় শিক্ষাও বিদ্যমান ছিলো না। বধির লোকটি বলবে, "ইসলাম এসেছিলো, কিন্তু আমার কানে কোনো শব্দ পৌঁছেনি"। পাগল বলবে, "ইসলাম এসেছিলো বটে, কিন্তু আমার অবস্থা তো এই ছিলো যে শিশুরা আমার ওপর গোবর নিক্ষেপ করতো।" বৃদ্ধ বলবে, "ইসলাম এসেছিলো, কিন্তু আমার জ্ঞান সম্পূর্ণ লোপ পেয়েছিলো, আমি কিছুই বুঝতাম না।" আর যে লোকটির কাছে কোনো রাসুল আসেনি এবং সে তাঁর কোনো শিক্ষাও পায়নি সে বলবে, "আমার কাছে কোনো রাসুল আসেননি এবং আমি কোনো সত্যও পাইনি। সুতরাং আমি আমল করতাম কীভাবে?" *তাদের এসব কথা শুনে আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে নির্দেশ দেবেন—"আচ্ছা যাও, জাহান্নামে লাফিয়ে পড়ো।" রাসুল (ﷺ) বলেন, "যাঁর হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ!* ***যদি তারা আল্লাহর আদেশ মেনে নেয় এবং জাহান্নামে লাফিয়ে পড়ে, তবে জাহান্নামের আগুন তাদের জন্য ঠাণ্ডা আরামদায়ক হয়ে যাবে।"*** *অন্য বিবরণে আছে যে,* ***যারা জাহান্নামে লাফিয়ে পড়বে তা তাদের জন্য হয়ে যাবে ঠাণ্ডা ও শান্তিদায়ক। আর যারা বিরত থাকবে, তাদের হুকুম অমান্যের কারণে টেনে হিঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"***

ইমাম ইবন জারির (রহ.) এই হাদিসটি বর্ণনা করার পরে আবু হুরাইরা (রা.) এর নিম্নের ঘোষণাটি উল্লেখ করেছেন, "এর সত্যতা প্রমাণ হিসেবে তোমরা ইচ্ছা করলে আল্লাহ তা'আলার وَ مَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا (কোনো রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।) বাক্যও পাঠ করতে পারো।" [77,78]

"কিয়ামতের দিন অজ্ঞ ও বোধহীন লোকেরা নিজেদের বোঝা কোমরে বহন করে নিয়ে আসবে এবং আল্লাহ্ তা'আলার সামনে ওজর পেশ করে বলবে, ***"আমাদের কাছে কোনো রাসুল আসেননি এবং আপনার কোনো হুকুমও পৌঁছেনি। এরূপ হলে আমরা মন খুলে আপনার কথা মেনে চলতাম।"***

তখন আল্লাহ তা'আলা বলবেন, "আচ্ছা, এখন যা হুকুম করবো তা মানবে তো?" উত্তরে তারা বলবে, "হাঁ, অবশ্যই বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নেবো।" তখন মহামহিমান্বিত আল্লাহ বলবেন, "আচ্ছা যাও, জাহান্নামের পার্শ্বে গিয়ে তাতে প্রবেশ করো।" তারা তখন অগ্রসর হয়ে জাহান্নামের পার্শ্বে পৌঁছে যাবে। সেখানে গিয়ে যখন ওর উত্তেজনা, শব্দ এবং শাস্তি দেখবে তখন ফিরে আসবে এবং বলবে, "হে আল্লাহ! আমাদেরকে এর থেকে রক্ষা করুন।" আল্লাহ তা'আলা বলবেন, "দেখো, তোমরা অঙ্গীকার করেছো যে, আমার হুকুম মানবে। আবার এই নাফরমানী কেন?" তারা উত্তরে বলবে, "আচ্ছা, এবার মানবো।" অতঃপর তাদের কাছ থেকে দৃঢ় অঙ্গীকার নেয়া হবে। তারপর এরা ফিরে এসে বলবে, "হে আল্লাহ্, আমরা তো ভয় পেয়ে গেছি। আমাদের দ্বারা তো আপনার এই আদেশ মান্য করা সম্ভব নয়।" তখন প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলবেন, "তোমরা নাফরমানি করেছো। সুতরাং এখন লাঞ্ছনার

---

[74] আল-কুরআন, সূরা আনকাবুত ২৯:৪০

[75] আল-কুরআন, সুরা আ'রাফ ৭:১৭২

[76] আল-কুরআন, সুরা বনী ইসরাইল (ইসরা) ১৭:১৫

[77] মুসনাদ আহমাদ, তাফসির ইবন কাসির {তাফসির পাবলিকেশন কমিটি (ড. মুজিবুর রহমান)}, সুরা বনী ইসরাইল ১৫ নং আয়াতের তাফসির

[78] ইমাম মুহাম্মাদ ইবন ইয়াহইয়া যাহলী (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি রেওয়াতে নবীশূন্য যুগের লোক, পাগল ও শিশুর কথাও এসেছে

*সাথে জাহান্নামি হয়ে যাও।" রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেন যে, **"প্রথমবার তারা যদি আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী জাহান্নামে লাফিয়ে পড়তো, তবে তার অগ্নি তাদের জন্য ঠাণ্ডা হয়ে যেতো এবং তাদের দেহের একটি লোমও পুড়তো না।"*** [79]

আল্লাহর গুণাবলি সম্পর্কে কুরআন ও হাদিস থেকে আমরা যা জানতে পারি তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে—যারা আদৌ ইসলামের দাওয়াত পাবে না, তাদের প্রতি পরকালে যে পরীক্ষা হবে তা মোটেও তাদের সাধ্যাতীত কিছু হবে না। অনেক লোকই আগুনের সেই পরীক্ষাতেও নিজ যোগ্যতায় পাশ করে যাবে এবং অনেকে নিজ অযোগ্যতায় ব্যর্থ হবে।

***"আল্লাহ কাউকে তার সাধ্যাতীত কোনো কাজের ভার দেন না;** সে তা-ই পায় যা সে উপার্জন করে এবং তা-ই তার ওপর বর্তায় যা সে করে।..."* [80]

ইসলাম বলে যে—মানবজাতির কাছ থেকে তাদের জন্মের পূর্বেই আল্লাহ তাঁর একত্ববাদের সাক্ষ্য নিয়েছিলেন। আল্লাহ আদি যুগ থেকে নবী-রাসুল প্রেরণ করে মানুষকে একত্ববাদের ধর্মের দিকে আহ্বান করেছেন। শেষ নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর মাধ্যমে এই ধর্মের প্রচার আজও আছে। যুগে যুগে প্রত্যেকের কাছেই আল্লাহর পক্ষ থেকে দূত এসেছে। যারা তাদের নিজ যুগের নবীকে মেনেছে বা মানবে, তারা মুক্তি পাবে। আর যাদের কাছে আদৌ এই আহ্বান পৌঁছেনি, তাদের ফয়সালার কথা ইতিমধ্যে উল্লেখ করা হয়েছে।

"(শুরুতে) সকল মানুষ একই জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলো। তারপর (যখন তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলো, তখন) আল্লাহ তা'আলা নবীদের পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভীতিপ্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্যসম্বলিত কিতাব, যাতে তারা মানুষের মধ্যে সেসব বিষয়ে মীমাংসা করে দেন, যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ ছিলো। আর (পরিতাপের বিষয় হলো,) অন্য কেউ নয়; বরং যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিলো, তারাই সমুজ্জ্বল নিদর্শনাবলি আসার পরও কেবল পারস্পরিক রেষারেষির কারণে তাতেই (সেই কিতাবেই) মতভেদ সৃষ্টি করলো। তারপর যারা ঈমান এনেছে, আল্লাহ তাদেরকে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করতো, সে বিষয়ে নিজ ইচ্ছায় সঠিক পথে পৌঁছে দেন। আর আল্লাহ যাকে চান, তাকে সরল-সঠিক পথে পৌছে দেন।" [81]

"আমি তোমার [মুহাম্মাদ (ﷺ)] পূর্বে পূর্ববর্তী সম্প্রদায়ের মধ্যে রাসুল প্রেরণ করেছি।" [82]

"আমি প্রত্যেক উম্মতের মধ্যেই রাসুল প্রেরণ করেছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত(আল্লাহ ব্যতিত যার উপাসনা করা হয়) থেকে নিরাপদ থাকো। এরপর তাদের মধ্যে কিছুসংখ্যককে আল্লাহ হিদায়াত করেছেন এবং কিছু সংখ্যকের জন্যে বিপথগামিতা অবধারিত হয়ে গেলো। সুতরাং তোমরা পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দেখো মিথ্যারোপকারীদের কীরূপ পরিণতি হয়েছে।" [83]

"যে-কেউ সৎপথে চলে, তারা নিজের মঙ্গলের জন্যেই সৎপথে চলে। আর যে পথভ্রষ্ট হয়, তারা নিজের অমঙ্গলের জন্যেই পথভ্রষ্ট হয়। কেউ অপরের বোঝা বহন করবে না। কোনো রাসুল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকেই শাস্তি দান করি না।" [84]

---

[79] মুসনাদ বাযযার, ইমাম ইবন কাসির (রহ.) এর মতে ইমাম ইবন হিব্বান (রহ.) নির্ভরযোগ্যরূপে বর্ণনা করেছেন; তাফসির ইবন কাসির {তাফসির পাবলিকেশন কমিটি (ড. মুজিবুর রহমান)}, সুরা বনী ইসরাইল ১৫ নং আয়াতের তাফসির, ইয়াহইয়া ইবন মুঈন (রহ.) ও নাসাঈ (রহ.) এর মতে এতে (সনদের ব্যাপারে) ভয়ের কোনো কারণ নেই।

[80] আল-কুরআন, সুরা বাকারাহ ২:২৮৬

[81] আল-কুরআন, সুরা বাকারাহ ২:২১৩

[82] আল-কুরআন, সুরা হিজর ১৫:১০

[83] আল-কুরআন, সুরা নাহল ১৬:৩৬

[84] আল-কুরআন, সুরা ইসরা ১৭:১৫

"তোমরা কুফর অবলম্বন করলে নিশ্চিত জেনে রেখো, আল্লাহ কারো মুখাপেক্ষী নন; তিনি তাঁর বান্দাদের জন্য কুফর পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো, তাহলে তিনি তা তোমাদের জন্য পছন্দ করবেন। আর কোনো ভারবাহী অন্যের বোঝা বহন করবে না। তারপর তোমাদের প্রভুর নিকটেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তিনি তোমাদের জানিয়ে দেবেন যা তোমরা করে যাচ্ছিলে। নিঃসন্দেহে অন্তরের ভেতরে যা আছে, সে সম্বন্ধে তিনি সম্যক অবগত।" [85]

এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ফতোয়ার ওয়েবসাইট *islamqa* থেকে শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ (হাফিজাহুল্লাহ) এর এই ফতোয়াটি দেখা যেতে পারে:--

"The fate of kuffaar who did not hear the message of Islam" [86]

অমুসলিমদের মারা যাওয়া শিশু সন্তানদের পরিণতি কী হবে?

প্রত্যেক মানুষকেই স্রষ্টা আল্লাহ সঠিক ফিতরাত বা স্বভাবধর্মের ওপর সৃষ্টি করেন। আর সেটি হচ্ছে একত্ববাদ, স্রষ্টার প্রতি পূর্ণাঙ্গ আত্মসমর্পণ বা ইসলাম। পরবর্তীতে মানুষ পিতামাতা ও পারিপার্শ্বিক প্রভাবে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস লাভ করে। বিভিন্ন অমুসলিম সম্প্রদায় (হিন্দু, খ্রিষ্টান, বৌদ্ধ, ইহুদি) এর শিশু সন্তানের ব্যাপারে ইসলাম যা বলে—

আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইরশাদ করেছেন, "প্রতিটি নবজাতকই জন্মলাভ করে ফিতরাতের ওপর। এরপর তার মা-বাপ তাকে ইহুদি বা খ্রিষ্টান বা অগ্নিপূজারীরূপে গড়ে তোলে। যেমন, চতুষ্পদ পশু একটি পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাদের মধ্যে কোনো (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও?" পরে আবু হুরায়রা (রা.) তিলাওয়াত করলেন—

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ

"আল্লাহর দেয়া ফিতরাতের (অর্থাৎ, ইসলাম) অনুসরণ করো, যে ফিতরাতের ওপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। এটাই সরল সুদৃঢ় দ্বীন।" (সুরা রূম: ৩০:৩০) [87]

সামুরা ইবন জুনদুব (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (ﷺ) প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে (রা.) বলতেন, তোমাদের কেউ কোনো স্বপ্ন দেখেছো কি? রাবি বলেন, যাদের বেলায় আল্লাহর ইচ্ছা, তারা রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করতো।

তিনি [রাসুলুল্লাহ (ﷺ)] একদিন সকালে আমাদের বললেন, গত রাতে আমার কাছে দু'জন আগন্তুক আসলেন। তাঁরা আমাকে ওঠালেন। আর আমাকে বললো, চলুন। ......তাঁরা আমাকে বললেন, চলুন, চলুন। তিনি বলেন, আমরা চললাম এবং একটা সজীব শ্যামল বাগানে উপনীত হলাম, যেখানে বসন্তের হরেক রকম ফুলের কলি রয়েছে। আর বাগানের মাঝে আসমানের থেকে অধিক উঁচু দীর্ঘকায় একজন পুরুষ রয়েছে, যার মাথা যেন আমি দেখতেই পাচ্ছি না। এমনিভাবে তার চতুষ্পার্শে এতো বিপুল সংখ্যক বালক-বালিকা দেখলাম যে, এতো বেশি আর কখনো আমি দেখিনি। আমি [মুহাম্মাদ (ﷺ)] তাদেরকে বললাম, উনি কে? এরা কারা? তাঁরা আমাকে বললেন, চলুন, চলুন। ...... আর ঐ দীর্ঘকায় ব্যক্তি যিনি বাগানে ছিলেন, তিনি হলেন, ইবরাহিম (আ.)। ***আর তাঁর আশেপাশের বালক-বালিকারা হলো ঐসব শিশু, যারা ফিতরাত (স্বভাবধর্মের) ওপর মৃত্যুবরণ করেছে। তিনি বলেন, তখন কিছু সংখ্যক মুসলিম জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসুল (ﷺ)! মুশরিকদের(বহু ঈশ্বরবাদী/পৌত্তলিক) শিশু সন্তানরাও কি? তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, মুশরিকদের শিশু সন্তানরাও। ...*** *"* [88]

---

[85] আল-কুরআন, সুরা যুমার ৩৯:৭

[86] https://islamqa.info/en/1244

[87] সহীহ বুখারি, হাদিস: ৯৫৩১

[88] সহীহ বুখারি; খণ্ড ৯, অধ্যায় ৮৭ (স্বপ্নের ব্যাখ্যা প্রদান অধ্যায়), হাদিস নং ১৭১

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, *"প্রত্যেক শিশু ফিতরাতের ওপর জন্মগ্রহণ করে থাকে।" জনগণ তখন উচ্চস্বরে তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "মুশরিকদের শিশুরাও কি?" উত্তরে তিনি বলেন,* ***"মুশরিকদের শিশুরাও।"*** [89]

রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন যে, "***মুশরিকদের শিশুদেরকে জান্নাতবাসীদের খাদেম বানানো হবে।*** " [90]

শিশু অবস্থায় মারা গেলে সেটি তাদের জন্য ওজর হিসাবে গণ্য হতে পারে। কিন্তু প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় যে কোনো মানুষের বুদ্ধি ও বিবেক থাকে। এই সময়ে যদি তার কাছে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছায় এবং সে যদি তা গ্রহণ না করে, তাহলে হিন্দু, খ্রিষ্টান বা নাস্তিক পরিবারে জন্মগ্রহণ করা তার জন্য অজুহাত হতে পারে না। নিজ কর্মের জন্যই সে জাহান্নামের উপযুক্ত হয়। তার জন্য নির্ধারিত পরীক্ষায় অকৃতকার্য হবার দ্বারা। পৃথিবীতে বহু মানুষ এই পরীক্ষায় কৃতকার্য হচ্ছে, অমুসলিম থেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করছে।

উপসংহার:

আমরা উপসংহারে বলতে পারি যে— দুনিয়াতে যার নিকট ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেছে এবং সে তা অস্বীকার করেছে, পরকালে তার আর কোনো ওজর পেশ করার সুযোগ নেই। যাদের নিকট দুনিয়াতে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছেনি, পরকালে তাদের এক প্রকারের পরীক্ষা হবে এবং তাতে উত্তীর্ণ ব্যক্তিরা মুক্তিলাভ করবে। সকলের প্রতি ন্যায়বিচার করা হবে, কারো প্রতি সামান্যতম জুলুমও করা হবে না। পৃথিবীতে অন্যায় আছে বলেই ন্যায়ের মহিমা প্রকাশ পায়। পাপ না থাকলে পূণ্য বলে কিছু থাকতো না, পূণ্যবানের পূণ্যের কোনো মূল্য থাকতো না। পৃথিবীতে যত অন্যায়-অপরাধ হয়, এর কোনোটির উপর আল্লাহর সন্তুষ্টি নেই। আল্লাহ মানুষের তাকদির নির্ধারণ করেছেন। মানুষকে ইচ্ছাশক্তিও দিয়েছেন, মানুষের বিশ্বাস ও কর্ম দ্বারা সে জান্নাত বা জাহান্নামের উপযোগী হয়। আল্লাহ মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুমও করেন না। পরিণতি জানা সত্ত্বেও আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ার পরীক্ষাক্ষেত্রে পাঠান, তার ভালো-মন্দ পরীক্ষা করার জন্য। মানুষের কর্ম অনুযায়ী আল্লাহ এর প্রতিদান দেন। আল্লাহ সব থেকে বড় ন্যায়বিচারক। মানুষকে চেতনা, বিবেক ও বিচারবুদ্ধি দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ মানুষকে বিবেক-বুদ্ধি এইজন্য দিয়েছেন যেন মানুষ তা ব্যবহার করে। সুনির্দিষ্টভাবে সাহাবীদের— ***"তাহলে আমরা কাজ-কর্ম ছেড়ে কি ভরসা করে বসে থাকব না??'*** —প্রশ্নের উত্তরে রাসুল (ﷺ) এটি করতে নিষেধ করেছেন এবং সাধ্যানুযায়ী সৎকর্মের উপদেশ দিয়েছেন। মানুষ যদি এরপরেও তাকদিরের ওপর দোষ দিয়ে বসে থাকে ও সৎকর্ম না করে, তবে এজন্য আল্লাহ মোটেও দায়ী নন। কারণ তাকে তো তার তাকদির জানিয়ে দেয়া হয়নি। কে তাকে বলে দিয়েছে যে সে জাহান্নামেই যাবে? বরং এই বসে থাকাটাই তার জন্য অপরাধ হিসেবে গণ্য হবে।

এবং আল্লাহই ভালো জানেন।

---

[89] হাফিজ আবু বকর বারকানি (রহ.), আল মুস্তাখরিজ 'আলাল বুখারি

[90] তাবারানি, তাফসির ইবন কাসির {তাফসির পাবলিকেশন কমিটি (ড. মুজিবুর রহমান)}, সুরা বনী ইসরাইল ১৫ নং আয়াতের তাফসির

৬৪

অভিযোগঃ কুরআন বলে মহাকাশে কোন ফাঁটল নেই; অথচ মহাকাশে ব্লাকহোলের অস্তিত্ব রয়েছে।

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্ন : কুরান অনুসারে আল্লাহ এই মহাবিশ্ব তৈরি করেছেন কোন ধরণের অসঙ্গতি বা ফাঁটল ব্যতিত(Quran 67:3)! তিনি কি ব্ল্যাক হোলের (Black Hole) ব্যাপারে কিছু জানতেন না?

উত্তরঃ আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا ۖ مَّا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ ۖ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَىٰ مِن فُطُورٍ

অর্থঃ যিনি স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন সাত আসমান। রহমানের{দয়াময় আল্লাহ} সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না।তুমি আবার তাঁকিয়ে দেখ, কোন খুঁত দেখতে পাও কি?

(কুরআন, মুলক ৬৭:৩)

কোন কোন অনুবাদক فُطُورٍ শব্দকে ‘ফাঁটল’ অনুবাদ করেছেন।আবার কেউ কেউ ‘ত্রুটি’, ‘অসামঞ্জস্যতা’ অনুবাদ করেছেন।

ব্ল্যাক হোল কি ত্রুটি, বা ফাঁটলজাতীয় কিছু? মোটেও না।

১৯৬৯ সালে আমেরিকান বিজ্ঞানী জন হুইলার(John Wheeler) সর্বপ্রথম Black Hole(কৃষ্ণবিবর) কথাটি ব্যবহার করেন। এ জিনিসটি সম্পর্কে এরও পূর্বে, ১৮৮৩ সালে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জন মিচেল(John Mitchell) ধারণা প্রদান করেন। তিনি বলেন, একটি নক্ষত্র বা তারকায়(Star) যদি যথেষ্ট ভর ও ঘনত্ব থাকে, তাহলে তার মহাকর্ষীয় ক্ষেত্র এত শক্তিশালী হবে যে, আলো সেখান থেকে নির্গত হতে পারবে না।সেই তারকার পৃষ্ঠ থেকে নির্গত আলো বেশি দূর যাওয়ার আগেই তারকাটির প্রবল মহাকর্ষীয় আকর্ষণ তাকে পেছনে টেনে নিয়ে আসবে।এরকম বহুসংখ্যক তারকা রয়েছে বলে মিচেল ধারণা করেছিলেন।ঐ সব তারকা থেকে আলো আসতে পারে না বলে আমরা এদের দেখতে পাই না।তবে এদের মহাকর্ষ আকর্ষণ আমাদের বোধগম্য হয়। এই সমস্ত বস্তুপিণ্ডকে বলা হয় ব্ল্যাক হোল।

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ব্ল্যাক হোল হচ্ছে নক্ষত্র বা তারকার একটি অবস্থা বা পর্যায় যে পর্যায়ে এ থেকে আলো নির্গত হতে পারে না। কুরআনের সুরা মুলকের ৬৭নং আয়াতে বলা হচ্ছে—“...রহমানের{দয়াময় আল্লাহ} সৃষ্টিতে তুমি কোন খুঁত দেখতে পাবে না।তুমি আবার তাঁকিয়ে দেখ, কোন খুঁত/ফাঁটল দেখতে পাও কি?” প্রসঙ্গসহ পড়লে স্পষ্ট বোঝা যায় যে এখানে নিখুঁতভাবে সৃষ্ট আকাশমণ্ডলীর কথা বলা হচ্ছে এবং এই সৃষ্টিতে যে কোন খুঁত নেই সে কথা বলা হচ্ছে।
ব্ল্যাক হোল কোন ফাঁটল নয়, কিংবা এটি আল্লাহর সৃষ্টির কোন ত্রুটি নয়। বরং এটি আল্লাহর সৃষ্টিকুলেরই একটি উপাদান।

‘বিজ্ঞানমনস্ক’(!) হবার দাবিদার যেসব মানুষ এই আয়াত থেকে বৈজ্ঞানিক ভুল খুঁজতে যায়, তারা যে আসলে বিজ্ঞান সম্পর্কে কতটা অজ্ঞ, তাদের দাবি থেকেই সেটা পরিষ্কার বোঝা যায়।

৬৫

নাস্তিকদের অপ-বিজ্ঞানযাত্রা

-সাইফুর রহমান

'বিবর্তন নিয়ে আরিফ আজাদের মিথ্যাচার'- শিরোনামে লেখা দেখলাম বিজ্ঞান যাত্রা নামক ফেইসবুক পেজে। ভাবলাম দেখি আরিফ আজাদ কি এমন মিথ্যাচার করেছে যার জন্য এমন শিরোনামে নোট প্রকাশ করে প্রচারণা চালানো হচ্ছে।

.

পোস্টার শুরুতেই কোরান এবং হাদিস নিয়ে কটাক্ষ করা হয়েছে যার সাথে শিরোনামের কোনো মিল নেই। উদ্দেশ্য পরিষ্কার, বিজ্ঞানের আবরণে ইসলামকে কটাক্ষ করা। যাই হোক এইগুলা যেহেতু ওদের রুটি রুজির উপকরণ তাই এই প্রসঙ্গ না তোলাই ভালো।

.

লেখক দাবি করেছেন, আরিফ আজাদের ৪০০০০ ফলোয়ারের সবাই ধর্মান্ধ ও বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ। প্রথমেই লেখক ভুল করে বসেছে, আমি নিজেও তার একজন ফলোয়ার যে লেখকের চেয়ে শিক্ষাগত যোগ্যতা, বিজ্ঞান গবেষণা ও অধ্যায়নে বিন্দুমাত্র পিছিয়ে আছে বলে মনে করে না!!!!

.

লেখক বলেছে, বিজ্ঞানের কোনো আলোচনায় ধর্মকে টানা উচিত না। খুবই ভালো প্রস্তাব, কিন্তু সমস্যা করেছে তো আপনাদের মতো ধূর্ত বিজ্ঞান ব্যবসায়ীরা যারা বিজ্ঞান দিয়ে ধর্মকে ভুল প্রমানে ব্যস্ত, তাই বাধ্য হয়ে আরিফ আজাদরা ধর্মের মধ্যে বিজ্ঞান টেনে নিয়ে আসে।

.

এর ঠিক পরেই লেখক বিশাল এক অলঙ্ঘনীয় শপথ করে বিজ্ঞান দিয়ে সব কিছু চুরমার করার ঘোষণা দিলেন।

.

প্রথমেই শিরোনাম, 'রেফারেন্স নিয়ে ভাঁওতাবাজি'

.

খুবই অন্যায় কথা, রেফারেন্স নিয়ে ভাওতাবাজি ? এটা মানা যায় না। আমি নিজেও বিজ্ঞান গবেষণা করি, তাই রেফারেন্সে গরমিল হলে মাথা গরম হয়ে যায়। লেখক বলেছে আরিফ আজাদের দেয়া রেফারেন্স একটাও পিয়ার রিভিউইড সায়েন্টিফিক জার্নাল নয়!!! দেখে এমন হাসি পেলো ভাবলাম, এরা দেখি অনেক বিজ্ঞান করে। আরিফ আজাদ কি তার লেখা কোনো বিজ্ঞান সাময়িকীতে ছাপানোর জন্য লিখেছে যে সে সরাসরি সাইন্টিফিক জার্নাল থেকে রেফারেন্স দিবে? এইটা হলো লেখকের একটা ধূর্তামি। সাধারন জনতাকে এই সমস্ত হেভি হেভি টার্ম ইউজ করে ভড়কিয়ে দেয়া আর দেখিয়ে দেয়া এই দেখো আমরা অনেক বিজ্ঞান করি।

.

যাইহোক, তারপরেও লেখকের দেয়া স্ক্রিনশট থেকে 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার লিংকে ঢুকলাম, 'Breakthrough study overturns theory of 'junk DNA' in genome' এই শিরোনামে লেখা রিপোর্টে বিস্তারিত আছে, কোথাকার বিজ্ঞানীরা এই বিষয়ে কাজ করেছে, কোন জার্নালে ছাপিয়েছে সব বিস্তারিত। কারো দরকার হলে 'গার্ডিয়ান' পত্রিকার লিংক থেকে সব তথ্য জেনে নিতে পারবে। এতো স্বচ্ছ আর নিখুঁত একটা রেফারেন্স দেয়ার পরেও লেখক কেনো এতো বিজ্ঞান করলেন সেটা বুঝতে পেরেছেন আপনারা? রেফারেন্স নিয়ে অভিযোগের একটা খণ্ডন করলাম বাকি গুলা একই পদ্ধতিতে আপনারা যাচাই করে নিতে পারেন।

.

এরপরে আরিফ আজাদের জাঙ্ক ডিএনএ সম্পর্কিত স্ক্রিন শট দিলেন, যেখানে আরিফ আজাদ লিখেছে প্রথমে বিজ্ঞানীরা মনে করতো ডিএনএ'র ৯৮% কোনো কাজে আসেনা কিন্তু এখন এর কিছু কিছু ফাঙ্কশন জানা যাচ্ছে। কথাটা পুরাই সঠিক।

.

লেখক সাহেব হটাৎ রেগে গিয়ে জাঙ্ক ডিএনএ কাকে বলে কত প্রকার ও কি কি ইত্যাদি অপ্রাসঙ্গিক বয়ান দিতে শুরু করলেন, এক পর্যায়ে নেচার ম্যাগাজিনের এক লিংক দিয়ে, বলে দিলেন, জাঙ্ক ডিএনএ-এর অন্যতম কাজ হলো, এটি প্রাণীদের বিবর্তনে বড় ভূমিকা রাখে।

.

ভাইরে, লিংকে গিয়ে পেপারটা পড়তেই লেখকের জালিয়াতি প্রকাশ পেয়ে গেলো। প্রথমত যদিও এটা একটা নেচার পেপার, কিন্তু এটা রিভিউ পেপার, যার মানে হলো এখানে সব প্রপোজিশন, অনুমান, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি সম্পর্কে তাত্ত্বিক কথা বার্তায় ভরপুর, এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্স পাওয়ার আগে যার কোনো মূল্য নাই। যাইহোক, এই পেপারে বলা হয়েছে জাঙ্ক ডিএনএ দ্বারা কিভাবে স্ট্রেসফুল কন্ডিশনে এনিম্যাল-প্লান্ট খাপ খাইয়ে চলতে পারে, এপি জেনেটিক্স কিভাবে এইসব আপাত দৃষ্টিতে অকর্মন্য ডিএনএ কে কাজে লাগিয়ে মিউটেশন, ডাইভারসিটি ইত্যাদি তৈরী করে।

.

লেখক সন্তপর্নে এড়িয়ে গেছেন এই পেপারের লেখকদ্বয় এভোলুশনে এই জাঙ্ক ডিএনএ'র ভূমিকা বলতে 'মাইক্রো ইভোল্যুশন' বুঝিয়েছে, কোথাও ডারউইনজমের 'ম্যাক্রো এভোল্যুশন' বুঝান নি। লেখক মনে হয় অতিরিক্ত বিজ্ঞান করতে গিয়ে বেমালুম ভুলে গেছেন যে ডারউইনের ইভোল্যুশন থিওরির সাথে ফান্ডামেন্টালী দ্বিমত পোষণ করতো যেই জাঙ্ক ডিএনএ নিয়ে লাফাইতেছেন তার উদ্ভাবক নোবেল জয়ী বারবারা ম্যাক ক্লিনটক!! অন্যের নাম মিথ্যাচার খুঁজতে গিয়ে আপনার নিজের চূড়ান্ত জালিয়াতি প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছে!!!

.

'পূর্বপুরুষ নিয়ে তথ্যগত ভুল'

.

এই অংশে লেখক বলেছে, মানুষ, শিম্পাঞ্জি, বোনোবো, ওরাং ওটান, আর গরিলা প্রজাতিগুলো একই পূর্বপুরুষ-প্রজাতি থেকে এসেছে। রেফারেন্স হিসাবে এই বার অবশ্য উনি নেচার বা সাইন্স ম্যাগাজিন দেন নি। এতো বড় আবিষ্কারের খবর তো নেচার, সাইন্স, সেল ম্যাগাজিনে ছাপা হওয়ার কথা!!! শিম্পাঞ্জি আর মানুষের পূর্বপুরুষ এক আদি পূর্বপুরুষ থেকে এসেছে বলে যে দাবি লেখক করেছে তা কিন্তু ওই পেপারে নেই। ওখানে আছে মানুষের সাথে শিম্পাঞ্জির জিনোমে ২৩% অমিল!!! কিছু দিন আগের গবেষণায় যে পার্থক্য ৪০% ছিলো আর ৫-৬ বছরের ব্যবধানে সেটা কমে গিয়ে ২৩% এ নামলো!!! লেখক আপনি সমজদার হলে ঠিকই বুঝবেন এই ধরণের গবেষণা কতটা 'ফ্যাক্টর' ডিপেন্ডেন্ট আর হাইপোথেটিক। এইগুলা দিয়ে সাধারণ মানুষদের ধোঁকা দেয়া খুব সহজ।

.

সাধারণ একটা কথা মনে রাখেন, ডিএনএ'র মিল থাকলেই সবকিছু হয়ে যায় না। ডিএনএ'ই শেষ কথা নয়, ডিএনএ থেকে আর.এন.এ হয়, তার পরে প্রোটিন তৈরী হয়। প্রোটিন হলো সব কিছুর মুলে। অনেকেই জানে না, একই জিন (পার্ট অফ ডিএনএ) থেকে বিভিন্ন ধরণের আর.এন.এ. তৈরী হতে পারে, একই আর.এন.এ. বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন তৈরী করতে পারে, একই প্রোটিনের বিভিন্ন আইসোফর্ম (দেখতে একই কিন্তু কাজ আলাদা) থাকতে পারে। তার মানে ডিএনএ'র মিল হলেই সবকিছু হয়ে যায় না। ব্যাক্টেরিয়ার ডিএনএ আর আমাদের ডিএনএ একই জিনিস দিয়ে তৈরী, তাই বলে ব্যাক্টেরিয়ার ডিএনএ যে কাজ আমাদের ডিএনএ কি একই কাজ করে? অবশ্যই নয়। প্রাণীদের ডিএনএ র সাদৃশ্য থাকতে পারে এবং থাকাটা স্বাভাবিক, মূল পার্থক্য হলো তাদের কাজে এবং এখানেই সবাই স্বাতন্ত্র ও আলাদা।

.

শেষের কথা দিয়ে শেষ করছি, উনি শেষে বলেছেন 'আপনার যদি বিবর্তন তত্ত্বকে ভুল মনে হয়, আপনি ধুরন্ধর ধর্মব্যবসায়ীর

মতো অযাচিতভাবে ধর্মকে না টেনে আপনার মতের পক্ষে যুক্তি-প্রমাণ উপস্থাপন করে একটি গবেষণাপত্র লিখে ফেলুন, তারপর সেটি পাঠিয়ে দিন কোনো বৈজ্ঞানিক জার্নালে। আপনার যুক্তি-প্রমাণ যদি নিখাদ হয়ে থাকে, যে কোনো ভালো জার্নাল অবশ্যই প্রকাশ করবে আপনার গবেষণাপত্র।'

.

লেখক সাপ, এতক্ষন ধরে আরিফ আজাদের নামে 'মিথ্যাচার' শিরোনামে প্রবন্ধ ঝাড়লেন এইটা কোন বৈজ্ঞানিক জার্নালে ছাপাইছেন ? আমরা যে ডারউইনিজম মানতেছিনা, এইটা নিয়ে একখান যুক্তি, প্রমানসহ প্রবন্ধ নেচার সায়েন্স ছাপায় দেন , আপনারে নিষেধ করছে কে? বায়োলজি যে তাত্ত্বিক যুক্তি প্রমানের বিষয় না এইটা বুঝার ক্ষমতাও এই মাত্রাতিরিক্ত 'বিজ্ঞান করা' লেখকের মাথায় নাই।

.

পাদটীকা:

.

সত্যিকার অর্থে জানার ইচ্ছা থাকলে এই সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্নের উত্তর দেয়া যাবে, বিস্তারিত জানতে চাইলে ইনবক্সে।

.

বৈজ্ঞানিকভাবে তর্ক করতে চাইলে কন্ডিশন: বায়োলজি বিষয়ে বিশেষ করে মলিকুলার বায়োলজি বিষয়ে ন্যূনতম অনার্স/মাস্টার্স।

.

কলাভবনে পড়ুয়া বা ইন্টারমিডিয়েট সাইন্স ছিলো, এই ধরণের পাব্লিকেরা সাইন্টিফিক আর্গুমেন্ট করার জন্য অযোগ্য বলে বিবেচিত।

৬৬

আদি পিতা আদম(আ) কি আরবিভাষী ছিলেন? তাহলে পৃথিবী জুড়ে এত ভাষা কেন?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্ন: --- আল্লাহ যদি আদমকে আরবি ভাষা শিখিয়েই পৃথিবীতে পাঠান (Quran 2:31-32) তবে তাঁর বংশধরেরা যেখানেই বসবাস শুরু করুক না কেন, আরবি ভাষাই ব্যবহার করবে! তবে আজ সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় পাঁচ হাজারের উপরে ভাষা বিরাজ করছে কী করে?

.

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

.

অর্থঃ আর আল্লাহ আদমকে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীর নাম শিখালেন। তারপর সে সমস্ত বস্তু-সামগ্রীকে ফেরেশতাদের সামনে উপস্থাপন করলেন। অতঃপর বললেন, আমাকে তোমরা এগুলোর নাম বলে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

.

তারা বলল, আপনি পবিত্র; আমরা কোন কিছুই জানি না, তবে আপনি যা আমাদেরকে শিখিয়েছেন (সেগুলো ব্যতীত) নিশ্চয় আপনিই প্রকৃত জ্ঞানসম্পন্ন, হেকমতওয়ালা।
(কুরআন, বাকারাহ ২:৩১-৩২)

.

আমরা আলোচ্য আয়াতগুলোতে দেখতে পাচ্ছি যে—"আল্লাহ আদমকে আরবি ভাষা শিখিয়ে পৃথিবীতে পাঠান" এমন কোন কথাই সেখানে নেই। সম্পূর্ণ অর্থহীন একটি অভিযোগ।

.

এ ধরণের উদ্ভট প্রশ্নের উৎস বোধ করি বাংলাদেশে নাস্তিকতাবাদের অন্যতম পুরোধা আরজ আলী মাতুব্বর, যিনি তার একটি বইতে ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন ধারণাভিত্তিক ও আজগুবি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন যার একটি হচ্ছে—লক্ষাধিক নবীর প্রায় সবাই কেন আরব দেশে জন্মগ্রহণ করলেন? [আরজ আলী মাতুব্বর রচনাসমগ্র-১, 'সত্যের সন্ধান', পৃষ্ঠা ৯৪]

.

অথচ কুরআন ও হাদিসে কোথাও এই ধরণের কিছু বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে—পৃথিবীর সব জাতির নিকটা নবী-রাসুল প্রেরণ করা হয়েছে। [দেখুন—কুরআন সুরা ইউনুস ১০:৪৭,সুরা রা'দ ১৩:৭, সুরা হিজর ১৫:১০, সুরা নাহল ১৬:৩৬]

.

কুরআন বা হাদিস কখনোই এমন উদ্ভট দাবি করেনি যে আদম(আ) আরবিভাষী বা আরব ছিলেন। আদম(আ) তো অনেক আগের মানুষ, নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) এর পূর্বপুরুষ ইসমাঈল(আ) এর সম্পর্কেও হাদিসে বলা হয়েছে যে তিনি জুরহুম গোত্রের কাছ থেকে আরবি ভাষা শেখেন। অর্থাৎ তিনিও আরব বা আরবিভাষী ছিলেন না।

.

"... অবশেষে (ইয়ামান দেশীয়) জুরহুম গোত্রের একদল লোক তাদের কাছ দিয়ে অতিক্রম করছিল।তারা মক্কার নিচু ভুমিতে অবতরণ করল এবং তারা দেখতে পেল একঝাঁক পাখি চক্রাকারে উড়ছে । তখন তারা বলল, নিশ্চয় এ পাখিগুলো পানির উপর উড়ছে । আমরা এ ময়দানের পথ হয়ে বহুবার অতিক্রম করেছি । কিন্তু এখানে কোন পানি ছিল না। তখন তারা একজন কি দু'জন লোক সেখানে পাঠালো । তারা সেখানে গিয়েই পানি দেখতে পেল । তারা সেখান থেকে ফিরে এসে পানির সকলকে পানির সংবাদ দিল । সংবাদ শুনে সবাই সেদিকে অগ্রসর হল । রাবী বলেন, ইসমাঈল(আ)-এর মা পানির নিকট ছিলেন ।

তারা তাঁকে বলল, আমরা আপনার নিকটবর্তী স্থানে বসবাস করতে চাই । আপনি আমাদেরকে অনুমতি দিবেন কি ? তিনি জবাব দিলেন, হ্যাঁ । তবে, এ পানির উপর তোমাদের কোন অধিকার থাকবে না । তারা হাঁ, বলে তাদের মত প্রকাশ করলেন ।

.

ইবন আব্বাস (রা) বলেন, নবী (ﷺ) বলেছেন, এ ঘটনা ইসমাঈলের মাকে একটি সুযোগ এনে দিল । আর তিনিও মানুষের সাহচর্য চেয়েছিলেন । এরপর তারা সেখানে বসতি স্থাপন করল এবং তাদের পরিবার –পরিজনের নিকটও সংবাদ পাঠাল । তারপর তারাও এসে তাদের সাথে বসবাস করতে লাগল । পরিশেষে সেখানে তাদের কয়েকটি পরিবারের বসতি স্থাপিত হল । আর ইসমাঈলও যৌবন উপনীত হলেন এবং তাদের থেকে আরবী ভাষা শিখলেন । যৌবনে পৌঁছে তিনি তাদের কাছে অধিক আকর্ষণীয় ও প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন । এরপর যখন তিনি পূর্ণ যৌবন লাভ করলেন, তখন তারা তাঁর সঙ্গে তাদেরই একটি মেয়েকে বিবাহ দিল । এরই মধ্যে ইসমাঈলের মা হাযেরা (আঃ) ইন্তেকাল করেন ।

...”

[সহীহ বুখারী, হাদিস : ৩৩৬৪]

.

অভিযোগকারীরা প্রশ্ন তুলেছেনঃ সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় পাঁচ হাজারের উপরে ভাষা বিরাজ করছে কী করে। তাদের অবগতির জন্য জানাতে চাই- আদম(আ) যদি আরবিভাষী হয়েও থাকতেন{যে কথা কুরআন-হাদিস কোথাও বলা হয়নি}, তারপরেও পৃথিবীজুড়ে অনেক ভাষা বিরাজ করাই স্বাভাবিক। আদম(আ) এর ভাষা আরবি হলে বর্তমান পৃথিবীর সবার ভাষাও যে আরবি হবে- এটা একটা উদ্ভট চিন্তা। আমরা জানি যে ভাষা নদীর মত, চিরন্তন প্রবাহমান ও পরিবর্তনশীল। কালের পরিক্রমায় এর পরিবর্তন হয়, এক ভাষা থেকে জন্ম নেয় আরেক ভাষা। ইউরোপ ও এশিয়ার বেশ কিছু ভাষার ধ্বনিতে ও শব্দে গভীর মিল লক্ষ্য করা যায়। এ ভাষাগুলো যে অঞ্চলে ছিল ও এখন আছে, তার সব চেয়ে পশ্চিমে ইউরোপ এবং পূর্বে ভারত ও বাংলাদেশ।ভাষাতাত্ত্বিকরা মনে করেন—ভারতীয় উপমহাদেশের ভাষাগুলো একটি ভাষাবংশের সদস্য।এই ভাষাবংশের নাম “ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ”।

.

ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের বেশ কিছু শাখা তৈরি হয় যার একটি শাখা হচ্ছে ভারতীয় আর্যভাষা। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার প্রাচীন রূপ পাওয়া যায় ঋগবেদের মন্ত্রগুলোতে, যা লেখা হয়েছিল ১০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। এক সময় কালের পরিক্রমায় এই ভাষা মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ঠেকে কারণ দৈনন্দিন ব্যবহার হতে হতে ভাষা অনেকখানি পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল।

.

খ্রিষ্টপূর্ব ১২০০ থেকে ৮০০ অব্দ পর্যন্ত বৈদিক বা বৈদিক সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার ছিল। খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দ থেকে পাওয়া যায় সংস্কৃত ভাষার ব্যবহার, যেটি ব্যাকরণবিদ পাণিনির হাতে বিধিবদ্ধ হয়েছিল। প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা বলা হয় বৈদিক ও সংস্কৃতকে; এ ছাড়াও ছিল মধ্য ভারতীয় আর্যভাষা যা প্রাকৃত ভাষা নামেও পরিচিত। খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দ থেকে ১০০০ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এ ভাষাগুলোর কথ্য ও লেখ্য রূপ প্রচলিত ছিল। এ ভাষার অপভ্রংশ(বিকৃত রূপ) থেকে জন্ম নিয়েছে নানা আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষা যেমনঃ বাংলা, হিন্দী, গুজরাটী, মারাঠী, পাঞ্জাবী প্রভৃতি ভাষা। আমাদের বাংলা ভাষার আদি রূপ পাওয়া যায় চর্যাপদে যা প্রায় ১ হাজার বছর আগে লেখা হয়েছিল। মাত্র ৩০০০ বছর সময়ের মধ্যে শুধু ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের এতগুলো আধুনিক ভাষা জন্ম নিয়েছে।

.

১ হাজার বছর আগের চর্যাপদের বাংলা আর আজকের বাংলা ভাষার মধ্যে রয়েছে বিরাট পার্থক্য। আজ থেকে প্রায় ৫০০ বছর আগের শেক্সপিয়ারের যুগের ইংরেজির সাথেও বর্তমান ইংরেজির অনেক পার্থক্য দেখা যায়। ৫০০ বা ১০০০ বছর তো দীর্ঘ সময়; ১০০ বছর আগেই বাংলা ও ইংরেজির যে রূপ ছিল, তা আজকের বাংলা ও ইংরেজির চেয়ে অনেক ভিন্ন।

.

আমরা দেখলাম যে ভাষা কিভাবে সময়ের সাথে পরিবর্তিত হয়। এক ভাষা থেকে কত ভাষা জন্ম নিতে পারে। কাজেই পৃথিবীর আদি মানব আদম(আ) যে ভাষায় কথা বলতেন, আজকের পৃথিবীতেও সবাই সেই ভাষাতেই কথা বলবে—এটা ভ্রান্ত ও অজ্ঞতাপূর্ণ চিন্তা ছাড়া কিছুই না। এ ধরণের চিন্তা-ভাবনাকে মোটেও "বিজ্ঞানমনস্ক" বলা যাচ্ছে না।

৬৭

অস্তিত্বের উদ্দেশ্যহীনতা ও নৈতিকতার অনস্তিত্ব

-নিলয় আরমান

আচ্ছা চুরি করা কি খারাপ? কেন খারাপ? কারো ক্ষতি হচ্ছে বলে? আচ্ছা ক্ষতি করা কি খারাপ? কেন খারাপ?...

.

প্রশ্নগুলো আপনার কাছে আজগুবি ঠেকলে বলতে হয় আপনি এখনো বিজ্ঞানমনস্কতার মাকামে পৌঁছতে পারেননি। আপনাকে একটু বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টা ব্যাখ্যা করি।

.

বিজ্ঞানমনস্করা বলে যে, বিজ্ঞানীরা বলেন যে, বিজ্ঞান বলে এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টির পেছনে আল্লাহর কোনো ভূমিকা নেই। মানে বুদ্ধিমান কোনো সত্ত্বা এর পেছনে দায়ী নয়। এই গোটা বিশ্বজগৎ একটি অন্ধ শক্তির দ্বারা সংঘটিত দুর্ঘটনা। জড় পদার্থ থেকে আস্তে আস্তে এককোষী জীব, সেখান থেকে আস্তে আস্তে বর্তমান মানুষের উদ্ভব।

.

এই বিবর্তন প্রক্রিয়ায় 'ভালো' বা 'খারাপ' নামক কোনো বস্তু কখনো তৈরি হয়নি। ইনফ্যাক্ট, একটা জিনিসকে সর্বসম্মতভাবে 'ভালো' বা 'খারাপ' বলে আখ্যা দেয়ার কোনো মানদণ্ড নেই। সত্ত্বাগতভাবে একটা জিনিস কখনো 'ভালো' বা 'খারাপ' হয় না। কেউ যখন সেটাকে 'ভালো' বলে, তখনই কেবল সেটা 'ভালো'। কেউ 'খারাপ' বললে 'খারাপ'। আবার একজন ব্যক্তি বা একটি গোষ্ঠী বা জাতির কাছে যা ভালো, অন্য ব্যক্তি/গোষ্ঠী/জাতির কাছে তা খারাপ হতেই পারে। বিভিন্ন যুগে একই জিনিস কখনো ভালো, কখনো খারাপ বলে বিবেচিত হয়।

.

আমরা যা কিছুকে ভালো বা খারাপ বলে জানি, তা হলো কোনো না কোনো ধর্ম বা সামাজিক রীতিনীতি বা রাষ্ট্রীয় আইনের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত ভালো-খারাপ। আমরা আমাদের মনকে সে অনুযায়ী প্রোগ্রাম করে নেই। কিন্তু আমাদের এই নির্মাণ এবং প্রোগ্রামের বাইরে একটা নির্লিপ্ত বাস্তবতার অস্তিত্ব আছে। নির্লিপ্ত বলার কারণ হলো, বুদ্ধিমান সত্ত্বার হস্তক্ষেপ ছাড়াই নিজে নিজে সৃষ্ট এই জড় প্রকৃতিতে ভালো-খারাপ, ন্যায়-অন্যায়ের কোনো পার্থক্য নেই। সাপ ব্যাঙকে খায়। এখানে অন্যায়কারী কে?

.

তাই বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে, আপনার চারপাশে আপনি যতকিছুর অস্তিত্ব দেখছেন তা পয়েন্টলেস। মানে এদের অস্তিত্বের কোনো উদ্দেশ্য নেই। আপনার আমার তৈরি করা 'ভালো', 'খারাপ', 'ন্যায়', 'অন্যায়ে'র এই সিস্টেমটাও আসলে উদ্দেশ্যহীন। সবকিছুর শেষে ওই এক জিনিস- মৃত্যু!

.

আরো কঠিন করে ব্যাখ্যা করা যায়। এ নিয়ে বিজ্ঞান, তত্ত্ব ও সাহিত্যের ফীল্ডে জিনিসপাতির ভাণ্ডার রয়েছে। সেদিকে গেলে আলোচনাটা জটিল হয়ে যায় ও প্রাসঙ্গিকতা হারায়।

.

অস্তিত্বশীল এই জগতের উদ্দেশ্যহীনতাকে যদি আপনি স্বীকার করেন (অর্থাৎ ধর্মীয় কোনো বিশ্বাসের মাধ্যমে জগতের উদ্দেশ্যহীনতাকে অস্বীকার না করেন), তাহলে আপনার সামনে কয়েকটা অপশান খোলা থাকে।

.

একটা অপশান হলো আপনি সুইসাইড করে ফেলতে পারেন। সবকিছুই যখন অর্থহীন, সবকিছুর শেষ পরিণতি যখন মৃত্যু, তো এখনই নয় কেন? আরেকটা অপশান হলো বিনোদন। সবরকমের দৈহিক চাহিদা পূরণ করে আপনি চরমতম বিনোদনময়

জীবনযাপন করে মৃত্যুর জন্য অপেক্ষাটাকে ভুলে থাকতে পারেন। অথবা রক্তপিপাসু ক্ষমতাধর শাসক হয়ে জীবনের সর্বোচ্চ মজাটা লুটে নিতে পারেন মরার আগে। অথবা নিজের জীবনের উপর নিজেই একটা অর্থ আরোপ করতে পারেন যে 'আমি এই এই উদ্দেশ্যে বাঁচবো'।

.

বিজ্ঞানমনস্ক জীবনদর্শনের ভয়াবহ দিক হলো উপরে এখন পর্যন্ত যা যা বলা হলো তা। কিন্তু বিজ্ঞানমনস্করা আপনাদের সামনে তাদের ধর্মের সবকিছু উল্লেখ করে না। করলে আপনারা তাদের উপর বিরক্ত হয়ে যেতেন। আসিফ মহিউদ্দীনরা যখন দাবি করে যুক্তি ব্যবহার করা তাদের রীতি, আর চাপাতি দিয়ে কোপানো মুমিনদের রীতি- এ কথা দিয়ে সে মুমিনদের উপর বিজ্ঞানমনস্কদের একটা মোরাল সুপিরিওরিটি প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু তার এ কথাটা কোনো ভ্যালু বহন করে না।

.

কারণ সব যুক্তি নিয়ে বেঁচে থাকার পরও অর্থহীন জীবনের শেষটা হয় ওই অর্থহীন মৃত্যুর মাধ্যমে। আর বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে যেহেতু ন্যায়-অন্যায় বলে কিছু নেই, তাই চাপাতি দিয়ে কোপানোটাও একটা প্রাকৃতিক ফেনোমেনন ছাড়া কিছু না। খনি থেকে আহরিত লোহা প্রক্রিয়াজাত হয়ে হাতলযুক্ত ধারালো ইস্পাত হয়। একটি হোমো সেপিয়েন্সের ঐচ্ছিক পেশীর নড়াচড়ায় অপর হোমো সেপিয়েন্সের খুলিতে ফাটল হয়। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির কারণে ভেতরকার সেরেব্রাল বডিগুলো ভূমিতে পড়ে যায়। এর বেশি কিছু না।

.

উপরের এই জটিল ঝামেলা অল্প কথায় সমাধান হয়ে যায় ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণের একটা সত্ত্বায় বিশ্বাস করলে। আল্লাহ বলেছেন ন্যায়, অতএব ন্যায়। আল্লাহ বলেছেন অন্যায়, অতএব অন্যায়।

.

ইসলামী শাস্ত্রের পণ্ডিতদের জিজ্ঞেস করলে দেখবেন, কী কী কারণে মানুষকে হত্যা করা যায় তার লিস্ট আছে। কিন্তু কী কী কারণে মানুষকে হত্যা করা যায় না, তার কোনো লিস্ট নেই। কারণ সেটা অসীম। লিস্ট করে শেষ করা যাবে না। ওই নির্ধারিত কারণগুলোর বাইরে একটা মানুষকে হত্যা করা মানে সমগ্র মানবজাতিকে annihilate করে ফেলা। কেন? আল্লাহ বলেছেন তাই।

.

বিজ্ঞানমনস্ক না হয়ে আমার ইসলামে বিশ্বাস করার কারণগুলোর মাঝে একটা হলো এই যে এটা আমার জীবনকে সহজ করে। ইসলাম আমার জীবনকে একটা উদ্দেশ্য দেয়। বিজ্ঞানমনস্কদের মতো পাতার পর পাতা কঠিন ভাষায় মোটা মোটা বই লিখে শেষে উপসংহারে গিয়ে আমাকে বলে না "তোমার এই অস্তিত্ব অর্থহীন, তোমার মৃত্যু অর্থহীন।"

৬৮

“কুরআনের স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারে একটি দার্শনিক পর্যালোচনা”

মূলঃ হামজা এ. যর্তযিস

অনুবাদঃ কাজি মাহদি মাহমুদ উৎস

সম্পাদনাঃ মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ছিলেন ইংরেজি ভাষার একজন কবি ও নাট্যকার। ইংরেজি ভাষার শ্রেষ্ঠ লেখক হিসাবে তিনি বিবেচিত হয়ে থাকেন।স্বতন্ত্র ঘরানার সাহিত্যকর্মের রচয়িতা হিসাবে তাঁর উদাহরণ প্রায়ই তুলে ধরা হয়। কেউ কেউ যুক্তি দেখান, একজন মানুষ হয়েও যদি শেক্সপিয়ার তাঁর কবিতা ও গল্প একটি স্বতন্ত্র উপায়ে উপস্থাপন করতে পারেন, তাহলে কুরআন যতই স্বতন্ত্র হোক না কেন সেটি কোন ব্যাপারই নয়— এটিও অবশ্যই একজন মানুষের রচনা।

.

সত্যি কথা বলতে, উপরের যুক্তিতে কিছু সমস্যা আছে।উপরের যুক্তিতে কুরআনের স্বাতন্ত্র্যের প্রকৃত স্বরূপ বিবেচনায় নেয়া হয়নি এবং এর দ্বারা শেক্সপিয়ারের মত সাহিত্য প্রতিভার স্বাতন্ত্র্যও ঠিক উপলব্ধি করা যায় না।যদিও শেক্সপিয়ারের গল্প ও কবিতাগুলো অপ্রতিদ্বন্দ্বী শৈল্পিক নিদর্শন হিসাবে সমাদৃত হয়েছিল, তবুও তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের ক্ষেত্রে যে রূপরেখা অনুসরণ করতেন তা কিন্তু স্বতন্ত্র ছিল না।অনেক ক্ষেত্রেই শেক্সপিয়ার প্রচলিত ল্যাম্বিক পেন্টামিটার (ল্যাম্বিক পেন্টামিটার কাব্যের একটি ছন্দ। এর দ্বারা এমন একটি লাইনকে বোঝায়, যা পাঁচটি চরণ নিয়ে গঠিত।“সাধারণভাবে পেন্টামিটার” শব্দটির মানে হচ্ছে – যে লাইনে পাঁচটি চরণ আছে।) ব্যবহার করেছিলেন।কিন্তু কুরআনের ভাষার ক্ষেত্রে রয়েছে একটি সম্পূর্ণ অপরিচিত ও অতুলনীয় সাহিত্যরূপ। কুরআনের বাচনভঙ্গির গাঠনিক বৈশিষ্ট্যই এর স্বতন্ত্রতা প্রদর্শন করে, এর সাহিত্যিক ও ভাষাগত রূপরেখার বিষয়কেন্দ্রিক মূল্যায়ন কিন্তু তা করে না।

.

এই বিষয়গুলোকে মাথায় রেখে আমরা দু”টি পদ্ধতি অবলম্বন করতে পারি যেগুলো আমাদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরবে যে, কুরআন যে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে আগত এবং এটি যে একটি অলৌকিক গ্রন্থ -এই বিশ্বাসের পিছনে অনেক বড় ধরনের যুক্তি রয়েছে। প্রথম পদ্ধতিটি হচ্ছে ‘যৌক্তিক সিদ্ধান্ত’ এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে ‘অলৌকিকতার দর্শন’।

.

যৌক্তিক সিদ্ধান্তঃ

.

‘যৌক্তিক সিদ্ধান্ত’ হল সেই চিন্তন পদ্ধতি যেখানে যৌক্তিক সিদ্ধান্তসমূহ সর্বসম্মতভাবে গৃহিত কোন বিবৃতি অথবা প্রমাণযোগ্য কোন উদাহরণ থেকে নেওয়া হয়।এই পদ্ধতিটিকে ‘যুক্তিসঙ্গত হস্তক্ষেপ’ বা ‘যুক্তিসম্মত সিদ্ধান্ত’ও বলা হয়।

.

কুরআনের স্বাতন্ত্র্যের প্রসঙ্গ আসলে প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্যের পণ্ডিতরা যে কথাটির ব্যাপারে একমত হয়ে যান সেটি হচ্ছেঃ

.

"কুরআন নাযিলের সময় এটি আরবদের দ্বারা যথাযথভাবে নকল করা হয় নি।”

.

এই বিবৃতি থেকে আমরা নিচের যৌক্তিক সিদ্ধান্তগুলোতে আসতে পারি:

.

১। কুরআন কোন আরবের দ্বারা রচিত নয়।কেননা কুরআন নাযিলের সময় আরবরা তৎকালীন সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষা

বিশারদ ছিল এবং তারা কুরআনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হয়।তারা এটাও স্বীকার করে যে, কুরআন কখনোই একজন মানুষের দ্বারা রচিত হতে পারে না।

.

২। কুরআন কোন অনারবের দ্বারাও রচিত হতে পারে না।কারণ কুরআনের ভাষা হল আরবি এবং কুরআনকে সফলভাবে চ্যালেঞ্জ জানানোর অন্যতম পূর্বশর্ত হল আরবি ভাষার জ্ঞান থাকা।

.

৩।নিম্নের কারণগুলোর জন্য কুরআন নবী মুহাম্মাদের (ﷺ) দ্বারাও রচিত হওয়া সম্ভব নয়ঃ -

.

ক. নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) নিজে একজন আরব ছিলেন, কিন্তু সকল আরব কুরআনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন।

.

খ. কুরআন নাযিলের সময় যে সকল আরব ভাষাবিদ ছিলেন, তারা কখনো নবী মুহাম্মাদকে (ﷺ) কুরআনের রচয়িতা বলে অভিযুক্ত করেননি।

.

গ. নবী মুহাম্মাদ (ﷺ) তাঁর এই রিসালাতের দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে অনেক দুঃখ-দুর্দশার শিকার হয়েছেন।উদাহরণস্বরূপ— তাঁর সন্তানেরা মারা গেল, তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রী খাদিজা(রা) দুনিয়া থেকে বিদায় নিলেন, তাঁকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হয়েছে, তাঁর নিকটতম সাথীদের অত্যাচার করা হয়েছে এবং অনেককেই হত্যা করা হয়েছিল। কিন্তু কুরআনের সাহিত্যরূপ আগের মতই ঐশ্বরিক ধ্বনি ও স্বভাবমণ্ডিত থাকল।কুরআনের কোথাও নবী মুহাম্মাদের (ﷺ) অশান্তি বা আবেগের প্রকাশ ঘটল না। নবী (ﷺ) এসব অবস্থার ভিতর দিয়ে গেলেন অথচ কুরআনের সাহিত্যিক ভঙ্গিমার কোথাও তাঁর আবেগের কোন বহিঃপ্রকাশ ঘটলো না— মনস্তাত্বিক ও শারীরবৃত্তীয় দিক দিয়ে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ব্যাপার ছিল, যদি তিনি আদৌ কুরআনের রচয়িতা হয়ে থাকতেন।

.

ঘ. সাহিত্যিক মান বিবেচনায় কুরআন একটি অসামান্য গ্রন্থ হিসাবে পরিগণিত। অথচ এর আয়াতগুলো সে সময়ে সংঘটিত বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ঘটনার প্রেক্ষিতে বিভিন্ন সময়ে নাযিল হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কোন পুনঃনিরীক্ষণ বা কাট-ছাট করা ছাড়াই এগুলো অসামান্য সাহিত্যিক কর্ম। যত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকর্ম আছে, এর সবগুলোরই নিখুঁত হওয়া নিশ্চিত করার জন্য পুনঃনিরীক্ষণ বা কাট-ছাট করার প্রয়োজন হয়েছে। কিন্তু কুরআন (বিভিন্ন ঘটনার প্রেক্ষিতে) তাৎক্ষণিকভাবে নাযিল হয়েছে।

.

ঙ. নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর হাদিস বা বিবরণগুলো কুরআনের বর্ণনাভঙ্গির তুলনায় সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির।কিভাবে একজন মানুষ ২৩ বছর (যেটা কুরআন নাযিলের সময়কাল) ধরে দু'টি সম্পূর্ণ ভিন্ন স্টাইলে মৌখিকভাবে সেগুলো(কুরআন ও হাদিস) বর্ণনা করতে পারে? সাম্প্রতিক গবেষণার ভিত্তিতে প্রমাণ হয়েছে যে শারিরীক ও মানসিকভাবে এটি একটি অসম্ভব ব্যাপার।

.

চ. মানুষের সব ধরণের অভিব্যক্তির অনুকরণ সম্ভব, যদি সেই অভিব্যক্তির প্রতিরূপ বা ব্লুপ্রিন্ট বিদ্যমান থাকে।উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি, কিছু চিত্রকর্মকে যদিও অনন্যসাধারণ কিংবা বিস্ময়কর রকমের স্বতন্ত্র বলে মনে করা হয়, কিন্তু তবুও সেগুলো নকল করা সম্ভব।কিন্তু কুরআনের ক্ষেত্রে এটি নিজেই তার ব্লুপ্রিন্ট হিসাবে বিদ্যমান। কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউই এর অদ্বিতীয় সাহিত্যরূপের অনুকরণ করতে সক্ষম হয়নি।

.

৪। কুরআন অন্য কোন সত্ত্বা, যেমন জিন বা প্রেতাত্মার দ্বারা রচিত হতে পারে না, কারণ কুরআন এবং ঐশ্বরিক বাণীসমূহ নিজেরাই হল তাদের অস্তিত্বের ভিত্তি।তাদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় ঐশ্বরিক বাণীর ভিত্তিতেই, কোন গবেষণামূলক তথ্য দ্বারা নয়।সুতরাং যদি কেউ দাবি করে কুরআনের উৎস হল অন্য কোন সত্ত্বা, তাহলে তাকে এর (সত্ত্বার)অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হবে এবং এর দ্বারা ঐশ্বরিক বাণীর সত্যতাই প্রমাণ হয়ে যাবে।এক্ষেত্রে যদি জিনদের অস্তিত্ব প্রমাণ করার জন্য কুরআনকে ঐশ্বরিক

বাণী হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তাহলে এই যৌক্তিক সিদ্ধান্ত প্রক্রিয়াটি ব্যবহার করার কোন প্রয়োজনই হবে না, কেননা কুরআন ইতিমধ্যেই একটি ঐশ্বরিক বাণী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। কারণ জিনদের অস্তিত্ব বিশ্বাস করার অর্থই হল সবার আগে কুরআনে বিশ্বাস করা।

.

৫। কুরআন শুধুমাত্র স্রষ্টার নিকট থেকেই আসতে পারে, কেননা এটাই একমাত্র যৌক্তিক ব্যাখ্যা এবং অন্যান্য সকল ব্যাখ্যাই বাতিল প্রমাণিত হয়েছে।কারণ তারা একটি বোধগম্য ও সুসঙ্গত উপায়ে কুরআনের এই স্বাতন্ত্র্যের ব্যাখ্যা দিতে পারে না।

.

অলৌকিকতার দর্শনঃ

.

অলৌকিকতার ইংরেজি প্রতিশব্দ হল 'miracle' যেটি ল্যাটিন শব্দ 'miraculum' থেকে উদ্ভূত, যার মানে হচ্ছে - "বিস্ময়কর কোন কিছু"।সাধারণত অলৌকিক তাকেই বলা হয়, যেটা প্রকৃতির সাধারণ নিয়মকে ভঙ্গ করে(lexnaturalis); যদিও এটি একটি অসংলগ্ন সংজ্ঞা।প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম সম্পর্কে আমাদের যে বুঝ, সেজন্যই এই অসংলগ্নতা; দার্শনিক বিলিয়নস্কির ভাষ্য অনুযায়ী, "... "যে পর্যন্ত প্রকৃতির সাধারণ নিয়মগুলোকে সার্বজনীন প্রস্তাবনামূলক সিদ্ধান্ত হিসাবে বিবেচনা করা হবে, সে পর্যন্ত সাধারণ নিয়ম মেনে না চলার ধারণাটা অসঙ্গতিপূর্ণ হিসাবে বিবেচিত হবে"।"

.

প্রকৃতির সাধারণ নিয়মগুলো হল এমন কিছু প্রস্তাবনামূলক সিদ্ধান্ত যেগুলো আমরা এই মহাবিশ্বে পর্যবেক্ষণ করি।যদি অলৌকিকতার সংজ্ঞা হয় সাধারণ নিয়মের লঙ্ঘণ, অন্য কথায় আমরা মহাবিশ্বে যেসব রীতি পর্যবেক্ষণ করছি সেগুলোর ব্যতিক্রম, তাহলে একটি সুস্পষ্ট ধারণাগত ভুল ঘটে।ভুলটি হলঃ কেন আমরা রীতির এই অনুভূত লঙ্ঘণকে রীতির একটি অংশ মনে করতে পারছি না? সুতরাং, অলৌকিকতার সব থেকে সঙ্গতিপূর্ণ সংজ্ঞা হল - কোন কিছুর লঙ্ঘণ নয় বরং অসম্ভাব্যতা।দার্শনিক উইলিয়াম লেন ক্রেইগ "প্রকৃতির সাধারণ নিয়মের লঙ্ঘণ""-অলৌকিকতার এই সংজ্ঞাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন এবং এর পরিবর্তে একটি সঙ্গতিপূর্ণ সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।তা হল -""যে সকল ঘটনা প্রকৃতির কার্যকর ক্ষমতার বাইরে অবস্থান করে"।" এটা দ্বারা যা বোঝাচ্ছে তা হল - অলৌকিক ঘটনা হচ্ছে কার্যকারণ সম্বন্ধীয় বা যৌক্তিক সম্পর্কের বিবেচনায় অসম্ভব কোন কাজ।

.

অলৌকিক কুরআনঃ

.

যে বিষয়টি কুরআনকে অলৌকিক করে তুলেছে তা হল, এটা আরবি ভাষার প্রকৃতির কার্যকর ক্ষমতার বাইরে অবস্থান করে।আরবি ভাষার ক্ষেত্রে কার্যকর ক্ষমতার প্রকৃতিটি হল - আরবি ভাষার ব্যাকরণগত যে কোন শুদ্ধ প্রকাশভঙ্গি সর্বদাই প্রচলিত আরবি গদ্য বা পদ্যের সাহিত্য কাঠামোর মধ্যে পড়বে।

.

কুরআন একটি অলৌকিক গ্রন্থ, কেননা এর সাহিত্যভঙ্গি আরবি ভাষার কার্যকর ক্ষমতা দ্বারা ব্যাখ্যা করা যায় না। কেননা আরবি শব্দ, বর্ণ ও ব্যাকরণিক নিয়মের সকল সম্ভাব্য সমন্বয়ই ব্যয় করা হয়েছে, কিন্তু এর পরেও কুরআনের সাহিত্যভঙ্গিমা নকল করা সম্ভব হয়নি।আরবদের মধ্যে যারা সে সময়ের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আরবি ভাষাবিদ হিসাবে পরিচিত ছিল, তারা কুরআনের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ব্যর্থ হয়।প্রখ্যাত ব্রিটিশ প্রাচ্যবিদ ও অনুবাদক ফর্স্টার ফিটজেরাল্ড আরবুথনট বলেনঃ

.

"মার্জিত সাহিত্য যতদূর পর্যন্ত যেতে পারে তার সীমার মধ্য বেশ কিছু প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে এর(কুরআন) মত একটি কীর্তি তৈরি করার জন্য, কিন্তু এখনো পর্যন্ত কোনটাই সফলকাম হয়নি"।" [১]

.

এর যে তাৎপর্য হতে পারে তা হল -কুরআন এবং আরবি ভাষার মধ্যে কোন সংযোগ নেই! যদিও এটা অসম্ভব মনে হয় কারণ কুরআন আরবি ভাষায় রচিত। অপরদিকে আরবি শব্দ ও বর্ণের যত প্রকার সমন্বয় ব্যবহার করা সম্ভব, তা ব্যবহার করা হয়েছে কুরআনকে পরীক্ষা করা ও এর অনুরূপ তৈরির জন্য।অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনিত হতে পারি যে, কেবলমাত্র অলৌকিকতাই পারে কুরআনের এই অবিশ্বাস্য আরবি সাহিত্যরূপের সঙ্গতিপূর্ণ ব্যাখ্যা দিতে ।

.

যখন আমরা কুরআনের স্বতন্ত্র সাহিত্যরূপের জবাব খোঁজার জন্য আরবি ভাষার কার্যকর ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করি, তখন আমরা এটার (আরবি ভাষার) এবং এই ঐশ্বরিক গ্রন্থের মধ্যে কোন সংযোগ খুঁজে পাই না। সুতরাং এভাবে একটি অসম্ভব পরিস্থিতি তৈরি হয় এবং অলৌকিক কোন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়।অতএব, যৌক্তিকভাবে এই সিদ্ধান্তে আশা যায় যে, যদি কুরআন একটি সাহিত্যকর্ম হয় যেটি আরবি ভাষার কার্যকর ক্ষমতার সীমার বাইরে অবস্থান করে, তাহলে সংজ্ঞানুযায়ী এটি একটি অলৌকিক গ্রন্থ।

তথ্যসূত্রঃ

[১] এফ.এফ.আরবুথনট, ১৮৮৫, বাইবেল ও কুরআনের গঠনকৌশল, লন্ডন, পৃষ্ঠা নং ৫।

৬৯

ডারউইনিজমের ব্যবচ্ছেদ: পর্ব - ১

-সাইফুর রহমান

'ডারউইনিজম' 'ইভোল্যুশন' 'এথেইজম' ইত্যাদি 'টার্ম' গুলোর সাথে আমরা সবাই কম বেশি পরিচিত। 'ডারউইনিজম' 'ইভোল্যুশন' নামগুলো শুনলে অনেকে বুঝে অথবা না বুঝে পক্ষে বিপক্ষে অবস্থান নেয়। 'ইভোল্যুশন' বা বিবর্তনবাদ শব্দটি শুনলেই আমরা মনে করি, এটা ডারউইন আর নাস্তিকদের সম্পত্তি, তাই ধর্মবিশ্বাসী অনেকেই চোখ বন্ধ করে এর বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে নেয়, যেটা আসলে সঠিক নয়।

.

জীব বিজ্ঞানের ভাষায় বিবর্তন হলো জীবের বৈশিষ্টের ধারাবাহিক পরিবর্তন। প্রকৃতি বিজ্ঞানী চার্লস ডারউইনের বিবর্তনবাদ থিওরির আগেও বিবর্তন নিয়ে অনেক হাইপোথিসিস ছিলো। বিজ্ঞানী কার্ল লিনিয়াস, পিয়েরে লুইস মৌপার্টিয়াস, ব্যাপ্টিস্ট ল্যামার্কস সহ অনেকে ইভোল্যুশন নিয়ে কাজ করেছেন।

.

ডারউইনের সাফল্য হলো সে সর্বপ্রথম বিবর্তনের মোটামুটি গ্রহণযোগ্য একটা তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছিলেন। ডারউইনের দেয়া বিবর্তনের ব্যাখ্যা অনুযায়ী জীবের মধ্যকার বৈশিষ্ট্য পরিবর্তিত হয় 'ন্যাচারাল সিলেকশন' এর মাধ্যমে। প্রতিকূল পরিবেশের সাথে যে খাপ খাইয়ে চলতে পারে সেই বেঁচে থাকে-সোজা বাংলায় বলতে গেলে এটাই হচ্ছে 'ন্যাচারাল সিলেকশন' থিওরি। আমরা অনেকে ডারউইনিজম ও 'ন্যাচারাল সিলেকশন' থিওরি একই জিনিস মনে করি, যেটা আসলে ভুল।

.

ডারউইন ছাড়াও আরো অনেক বিজ্ঞানী 'ন্যাচারাল সিলেকশন' থিওরী নিয়ে কাজ করেছেন, যেমন আলফ্রেড রাসেল ওয়ালেস (ডারউইনের সহ-কর্মী), উইলিয়াম চার্লস ওয়েলস, প্যাট্রিক ম্যাথিউ তাদের মধ্যে অন্যতম। '

.

ডারউইনিজম' হলো বিজ্ঞানী ডারউইনের 'ন্যাচারাল সিলেকশন' থিওরির নিজস্ব ব্যাখ্যা। পরবর্তীতে হার্বার্ট স্পেন্সার এই থিওরিকে 'সারভাইভাল অফ দ্যা ফিটেস্ট' নামে কিছুটা ভিন্ন রূপে ব্যাখ্যা করেন। ডারউইন তার 'ওরিজিন অফ স্পেসিস' বইয়ে সকল জীব একই আদিরূপ থেকে এসেছে বলে যে মতামত দিয়েছে এটাও ডারউইনিজমের অন্যতম একটা মতবাদ। ডারউইনের 'ন্যাচারাল সিলেকশন' আরো দশটা বৈজ্ঞানিক থিওরির মতোই আলোচিত সমালোচিত হয়েছে। তৎকালীন অনেক খ্যাতিমান বিজ্ঞানী যেমন, কার্ল ফন নাগেলি, উইলিয়াম থম্পসন, ফ্লেমিং জেনকিন তার ব্যাখ্যার বিপক্ষে দারুন সব বৈজ্ঞানিক যুক্তি উপস্থাপন করেন ফলস্বরূপ ডারউইনকে তার বইয়ে কিছু পরিবর্তন আনতে হয়। উল্লেখিত বিজ্ঞানীগণ একাডেমিক্যালি ডারউইনের থেকে অনেক বেশি যোগ্যতাসম্পন্ন ছিলেন।

.

মজার ব্যাপার হলো, ডারউইনের সময়েই খুব অল্প সংখ্যক বিজ্ঞানী ইভোলুশনের সাথে ন্যাচারাল সিলেকশনের সম্পৃক্ততা স্বীকার করতো, অধিকাংশের মতে 'ন্যাচারাল সিলেকশন' খুবই 'মাইনর' একটা ভূমিকা পালন করে এ ক্ষেত্রে। বিংশ শতাব্দীতে এসে 'ন্যাচারাল সিলেকশন' তত্ত্ব 'ডেথ বেড'এ চলে যায়। সামগ্রিকভাবে সবাই 'ইভোল্যুশন' তত্ত্ব মেনে নিলেও 'ন্যাচারাল সিলেকশন' থিওরিকে অগ্রহনযোগ্য বলে রায় দেন অনেক খ্যাতিমান বিজ্ঞানী যেমন, এবেরহার্টেড ডেনার্ড, ভার্নন কেলোগ সহ আরো অনেকে। কিছুদিনের মধ্যেই 'ন্যাচারাল সিলেকশন' থিওরির বিপরীতে আরো চারটি মতবাদ প্রতিষ্ঠা পায় তার মধ্যে 'সালট্যাশনিজম' অন্যতম।

.

এই ইভোলুশনারি মেকানিজমটা ডারউইনের থেকে পুরোটাই আলাদা। ডারউইন যেখানে বলেছিলো ইভোল্যুশন ধীরে ধীরে অনেক সময় নিয়ে হয়, সেখানে 'সালট্যাশনিজম' তত্ত্ব অনুসারে 'দ্রুত বৃহৎ মিউটেশন' এর মাধ্যমে ইভোল্যুশন সংঘটিত হয়। এই তত্ত্বে বিশ্বাসীদের মধ্যে জেনেটিক্সের প্রাণপুরুষ হুগো দ্যা ভ্রেইস থেকে শুরু করে আধুনিককালের কার্ল ভয়েস, নোবেল জয়ী বারবারা ম্যাক ক্লিনটকও আছেন। মডার্ন মলিকুলার বায়োলজি সমর্থিত এই তত্ত্বটি অন্য সব থিওরি থেকে বেশি গ্রহণযোগ্য ও বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।

.

উপরের সংক্ষেপিত আলোচনা থেকে এটা পরিষ্কার বিবর্তনবাদের উপরে আদি থেকে আজ পর্যন্ত যত থিওরী পাওয়া যায় তার মধ্যে ডারউইনের 'ন্যাচারাল সিলেকশন' থিওরী বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে সবচেয়ে অনির্ভরযোগ্য ও অপ্রায়োগিক। প্রশ্ন হতে পারে, তারপরেও বাকি সব থিওরি থেকে ডারউইনের থিওরী কেনো বেশি আলোচিত ও সমালোচিত? এর পিছনেও অনেক কারণ আছে, তার যতটা না বৈজ্ঞানিক তার থেকেও সামাজিক ও রাজনৈতিক। পরবর্তী পর্বে এই বিষয়ে আলোচনা হবে ইনশাআল্লাহ।

৭০

অভিযোগঃ কুরআন বলে আকাশ ও পৃথিবী তৈরিতে ৬ দিন লেগেছে অথচ বিজ্ঞান বলে কয়েক মিলিয়ন বছর লেগেছে

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্নঃ আল্লাহ যদি পৃথিবী ও আকাশমণ্ডলী ছয় দিনে সৃষ্টি করে থাকেন (Quran 50:38) [যা মানুষের হিসেবে ১০০০ বছর (Quran 22:47, 32:5) অথবা ৫০০০০ বছর (Quran 70:4)], তবে বিজ্ঞান কেন বলে বিগ ব্যাং সংগঠিত হওয়ার পর পৃথিবী তৈরি হতে প্রায় কয়েক মিলিয়ন বছর সময় লেগেছে?

.

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

.

“ আমি আকাশমণ্ডলী, পৃথিবী ও এই দুইয়ের মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় ‘আইয়ামে’(দিন/সময়কাল) সৃষ্টি করেছি এবং আমাকে কোনরূপ ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।”
(কুরআন, ক্বফ ৫০:৩৮)

.

"তারা তোমাকে আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তোমার প্রভুর কাছে একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান। "
(কুরআন, হাজ্জ ২২:৪৭)

.

" তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। “
(কুরআন, সাজদা ৩২:৫)

.

“ফেরেশতাগণ এবং রূহ তাঁর(আল্লাহর) দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন একদিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।”
(কুরআন, মাআরিজ ৭০:৪)

.

আরবি ভাষায় يَوْم [উচ্চারণঃ ইয়াওম; বহুবচনঃ أَيَّام (আইয়াম)] শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়।আরবিতে শব্দটি দিন, পর্যায়কাল, সময়কাল ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। [১]

.

সুরা ক্বফ এর ৩৮নং আয়াতে যে أَيَّام (আইয়াম) এর কথা বলা আছে তা অবশ্যই ২৪ ঘণ্টার দিন হওয়া সম্ভব নয়।কারণ সে সময়ে সূর্য তৈরি হয়নি; কাজেই সৌর দিনের হিসাব এখানে অবান্তর।সুরা হাজ্জ ২২:৪৭ ও সাজদা ৩২:৫ তে হাজার বছরের দিন এবং সুরা মাআরিজ ৭০:৪ এ ৫০ হাজার বছরের দিনের কথা উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য যে, হাজ্জ ২২:৪৭ ও সাজদা ৩২:৫তে أَلْف سَنَةٍ বা ‘হাজার বছর’ এর দিনের কথা উল্লেখ আছে; যা দ্বারা যেমন নির্দিষ্টভাবে ১০০০ বছর বোঝাতে পারে, আবার ‘হাজার বছর’ তথা বিশাল দৈর্ঘ্যের একটি সময়কালকেও বোঝাতে পারে। কুরআনে শব্দটির ব্যবহারের এই বৈচিত্র্য দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে যে-- يَوْم (ইয়াওম) শব্দটির অর্থ ব্যাপক; এ দ্বারা যে কোন সময়কালের দিনই বোঝাতে পারে। এ দ্বারা ২৪ঘণ্টা, ১ হাজার বছর,

৫০,০০০ বছর এমনকি হাজার বছর বা বিশাল দৈর্ঘ্যের একটি সময়কালকেও বোঝাতে পারে।মোট কথা, শব্দটি দ্বারা যে কোন time period বা পর্যায়কাল/সময়কাল বোঝাতে পারে।

.

আধুনিককালে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে সব থেকে গ্রহণযোগ্য মতবাদ হচ্ছে বিগ ব্যাং। মুসলিমদের নিকট অবশ্যই কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব মানদণ্ড নয়, কারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রায়শই পরিবর্তন হয়। মুসলিমদের নিকট মানদণ্ড হচ্ছে কুরআন ও সুন্নাহ।কারণ এগুলো ওহীর অন্তর্ভুক্ত, মানুষের জ্ঞানের থেকে এগুলো অগ্রগামী।তবে বিগ ব্যাং তত্ত্বের সঙ্গে কুরআনের তথ্যের কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা কুরআনে যে ছয় 'আইয়ামে'(দিন/সময়কাল) সৃষ্টি করার কথা বলা আছে, তা মিলিয়ন বছর সময়কালের 'আইয়াম'ও হতে পারে। يَوْم এর কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই।সব থেকে আগ্রহোদ্দীপক বিষয় হচ্ছে, আধুনিক বিজ্ঞান অনুযায়ী মহাবিশ্ব তৈরি হয়েছে ছয়টি পর্যায়কালে। যথাঃ

.

1.Plank time 2.Inflationary 3.Formation of proton & neutron 4.Formation of nucleus 5.Formation of matter & separation of radiation 6.Familiar universe. [২]

.

যা কুরআনের বর্ণণার{৬ আইয়াম} অনুরূপ। অতএব আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মহাবিশ্বের উৎপত্তি সম্পর্কে আধুনিক বিজ্ঞান ও কুরআনের তথ্যের কোন বিরোধ নেই।

.

এবং আল্লাহ ভালো জানেন।

তথ্যসূত্রঃ

[১] http://www.almaany.com/.../di.../ar-en/yawm+%28+day,+period+%29/

[২] বিস্তারিতভাবে Epoch বা সময়কালের ধাপগুলোর বিবরণ দেখা যেতে পারে National Geographic Magazine, February 1982 (Vol. 161, No. 2) থেকে। আমাজনে অর্ডার করার লিঙ্কঃ https://www.amazon.com/National-Geographic-Mag.../.../B000PCFDSM

৭১

ডারউইনিজমের ব্যবচ্ছেদ: পর্ব-২

-সাইফুর রহমান

[প্রথম পর্বের জন্য দেখুন (#সত্যকথন) ৬৯]

.

ডারউইনিজম নিয়ে বিস্তারিত বলার আগে ইভোল্যুশন নিয়ে কিছু আলোচনা করা যাক। ইভোল্যুশন নিয়ে অনেকের মাঝে অস্পষ্টতা আছে। আগেই বলা হয়েছে, ইভোল্যুশন বা বিবর্তন হলো জীবের জন্মগত বৈশিষ্টের ধারাবাহিক পরিবর্তন। বিবর্তনকে দুইভাগে ভাগ করা যায়, ম্যাক্রো ইভোল্যুশন বা বৃহৎ বিবর্তন ও মাইক্রো বা ছোট বিবর্তন। আমরা সবাই সাধারণত ম্যাক্রোইভোলুশন নিয়ে কথা বলি, তর্ক বিতর্ক করি।

.

ম্যাক্রোইভোলুশন থিওরী মতে জীবের টার্ন্সফর্মেশন বা রূপান্তর, এক জীব থেকে আরেক জীবে পরিণত হওয়া সম্ভব। সাইন্টিফিক তথ্য অনুযায়ী জীবের এই পূর্ণাঙ্গ পরিবর্তন সম্ভব নয়, বিশেষ করে বহু কোষী (মাল্টিসেলুলার) জীবের ক্ষেত্রে তো নয়ই। কিছু স্টাডি আছে যেখানে দেখা গেছে কিছু এক কোষী প্রোক্যারিওট গুলোর মধ্যে জিনগত সাদৃশ্য অনেক।

.

যেমন কিছু কিছু ব্যাকটেরিয়া প্রজাতির মধ্যে জিনগত সাদৃশ্যতা অনেক, এই সাদৃশ্যতা হয়তো এভোলিউশনারী মেকানিজমের মাধ্যমে হয়েছে। এক কোষী জীবে ইভোল্যুশন হওয়া খুবই সম্ভব এবং বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত।
সমস্যা হয় তখন, যখন আমরা এই মেকানিজম মাল্টিসেলুলার বা বহুকোষী প্রাণী যেমন, এনিম্যাল, প্লান্ট ইত্যাদির ক্ষেত্রেও একই রকম সহজ ও সরল মনে করি। আমরা সবাই কমবেশি আদি ও প্রাকৃত কোষের পার্থক্য ছোট বেলায় পড়েছি!!! এই দুই প্রকার কোষের স্ট্রাকচারাল/কাঠামোগত পার্থক্য আকাশ পাতাল। তাদের রিপ্রোডাকশন/প্রতিলিপি তৈরির প্রদ্ধতি একেবারেই আলাদা।

.

উদাহরণ দিলে ক্লিয়ার হবে- ব্যাকটেরিয়া (এক কোষী) যেখানে সেখানে জন্মাতে পারে, একটা ব্যাকটেরিয়া থেকে আরেকটা ব্যাকটেরিয়া হতে ৪ থেকে ২০ মিনিট সময় লাগে, পক্ষান্তরে একটা এনিম্যাল সেল (কোষ) থেকে আরেকটা হতে কমপক্ষে ২৪ ঘন্টা সময় লাগে । এই রকম হাজারো উদাহরণ দেয়া যাবে, যা থেকে এটাই স্পষ্ট হবে এক কোষী আর বহু কোষী জীবের মধ্যে আদৌ কোনো মিল নাই। তাই ব্যাক্টেরিয়াতে ইভোল্যুশন হলেই এটা বলে দেয়া চূড়ান্ত বোকামি যে বহুকোষী জীবেও ইভোল্যুশন (ম্যাক্রো) হয়।

.

বহুকোষী জীবে মাইক্রোইভোল্যুশন প্রতিনিয়ত হচ্ছে। প্রধানত মিউটেশন (জিনের গঠনগত পরিবর্তন), জিন ফ্লো, জেনেটিক ড্রিফট (জিনের স্থানান্তর) ইত্যাদি কারণে প্রাণী দেহে মাইক্রোইভোলুশন হয়। আমাদের যে ক্যান্সার হয়, এটাও একপ্রকার ইভোল্যুশন (মাইক্রো)। ক্যান্সার হলে কোষের ডিএনএ'র স্বাভাবিক গঠন পরিবর্তিত হয়ে যায়, ফলে অনিয়ন্ত্রিত কোষ বৃদ্ধি হয়, কিছু প্রোটিন বা মলিক্যুলের উৎপাদন কমে বা বেড়ে যায় কিন্তু এর ফলে মানুষ কখনো বানর বা হনুমান হয়ে যায় না!!

.

মূলকথা হলো, মাইক্রোইভোলুশনের মাধ্যমে দেহের বিশেষ করে, কোষের মধ্যকার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন হতে পারে, কিন্তু তাতে একধরণের প্রাণী/উদ্ভিদ অন্য কোনো প্রাণী বা উদ্ভিতে রূপান্তরিত হয়ে যায় না বা বাইরের (ফেনোটিপিক্যাল) গঠনগত পরিবর্তন হয় না।

.

আরো একটা বিষয় পরিষ্কার করা দরকার, আমরা প্রায়ই শুনি বানর, শিম্পাঞ্জি সাথে আমাদের ডিএনএ'র অনেক মিল, তাই আমরা ধরে নিতেই পারি এদের সাথে হয়তো আমাদের এক কালে সাদৃশ্যতা ছিল।এটাও অজ্ঞতার এক বহিঃপ্রকাশ।

.

যারা মলিকুলার বায়োলজি ভালো জানে তাদের জন্য বুঝা অনেক সহজ, ডিএনএ'র মিল থাকলেই সবকিছু হয়ে যায় না। ডিএনএ'ই শেষ কথা নয়, ডিএনএ থেকে আর.এন.এ হয়, তার পরে প্রোটিন তৈরী হয়। প্রোটিন হলো সব কিছুর মুলে। অনেকেই জানে না, একই জীন (পার্ট অফ ডিএনএ) থেকে বিভিন্ন ধরণের আর.এন.এ. তৈরী হতে পারে, একই আর.এন.এ. বিভিন্ন ধরনের প্রোটিন তৈরী করতে পারে, একই প্রোটিনের বিভিন্ন আইসোফর্ম (দেখতে একই কিন্তু কাজ আলাদা) থাকতে পারে। তার মানে ডিএনএ'র মিল হলেই সবকিছু হয়ে যায় না। ব্যাক্টেরিয়ার ডিএনএ আর আমাদের ডিএনএ একই জিনিস দিয়ে তৈরী, তাই বলে ব্যাক্টেরিয়ার ডিএনএ যে কাজ আমাদের ডিএনএ কি একই কাজ করে? অবশ্যই নয়। প্রাণীদের ডিএনএ র সাদৃশ্য থাকতে পারে এবং থাকাটা স্বাভাবিক, মূল পার্থক্য হলো তাদের কাজে এবং এখানেই সবাই স্বাতন্ত্র ও আলাদা।

(ইন শা আল্লাহ চলবে)

৭২

কুরবানীর জন্য কাকে নেওয়া হয়েছিল — ইসমাঈল (আ) নাকি ইসহাক (আ) ?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

সম্প্রতি বেশ কিছু ভাই মেসেজে জানালেন কুরবানীর জন্য কাকে নেওয়া হয়েছিল—ইসমাঈল(আ) নাকি ইসহাক(আ) এটা নিয়ে নাকি কনফিউশনের সৃষ্টি করা হচ্ছে।এ নিয়ে নাকি নাস্তিক-মুক্তমনারা জল ঘোলা করছে।তারা নাকি বাইবেল ও কুরআন উভয় গ্রন্থ থেকে প্রমাণ করেছে ইসহাক(আ) ছিলেন কুরবানীর জন্য নির্বাচিত সন্তান! খ্রিষ্টান মিশনারীরা তাদের ধর্ম প্রচার করার জন্য অনেক আগে থেকেই এ নিয়ে প্রচার চালিয়ে আসছিল।এখন তাদের দলে নাস্তিকরাও যোগ দিয়েছে। এ যেন চোরে চোরে মাসতুতো ভাই! যা হোক, এ বিষয়টা নিয়ে এই লেখা।

.

ইসলামী আকিদা হচ্ছে—নবী ইব্রাহিম(আ) এর বড় ছেলে ইসমাঈল(আ)কে কুরবানীর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল অর্থাৎ ইসমাঈল(আ) হচ্ছেন ‘জবিহুল্লাহ’।কুরআন দ্বারা এটি প্রমাণিত এবং এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর ইজমা রয়েছে।অপরদিকে বাইবেল বলে যে, ইব্রাহিম(আ) এর অন্য ছেলে ইসহাক(আ)কে কুরবানীর জন্য নির্বাচিত করা হয়েছিল।বাইবেলের Old Testament(পুরাতন নিয়ম) অংশটি ইহুদি ও খ্রিষ্টান উভয় ধর্মালম্বীদের ধর্মগ্রন্থ।কাজেই এ নিয়ে মুসলিমদের বিশ্বাস এক এবং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিশ্বাস আরেক।নাস্তিকরা মূলত ইসলামের বিরোধিতা করে এবং অনেক সময়েই অটোমেটিক চয়েস হিসাবে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের অবস্থানকে ডিফেন্ড করে। আমরা এখন কুরআন-হাদিস এবং বাইবেল সকল প্রকারের উৎস থেকেই ইব্রাহিম(আ) এর কুরবানীর ঘটনাটি নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করব এবং দেখব আসলে কে কুরবানির জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন—ইসমাঈল(আ) নাকি ইসহাক(আ)।

.

কুরআনে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যে ইব্রাহিম(আ) এর বড় ছেলে অর্থাৎ ইসমাঈল(আ)কে কুরবানী দেবার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়েছিল।দেখুনঃ সুরা আস সফফাত ৩৭:৯৯-১১২ {{এখান থেকে আয়াতগুলো দেখুনঃ https://goo.gl/Po8LXS}}। এখানে পুরো কুরবানীর ঘটনা বর্ণণা করার পরে ১১২নং আয়াতে ইসহাক(আ) এর জন্মের কথা বলা হয়েছে।অর্থাৎ ঐ ঘটনার সময়ে ইসহাক(আ) এর জন্মই হয়নি।আরো দেখুন, সুরা হুদ ১১:৬৯-৭১ {{এখান থেকে আয়াতগুলো দেখুনঃ https://goo.gl/3ewS1T}}। এখানে স্পষ্টত বলা হচ্ছে ফেরেশতারা একই সাথে ইব্রাহিম(আ)কে ইসহাক(আ) ও ইয়া'কুব(আ) এর সুসংবাদ দেন।ইসহাক(আ) যদি জবিহুল্লাহ হয়ে থাকেন,তাহলে ইয়া'কুব(আ) এর সংবাদ কিভাবে দেওয়া হবে? তিনি তো কুরবানীই হয়ে যাবেন! তাহলে তো ইব্রাহিম(আ)কে কোন পরীক্ষা করা হল না।পরীক্ষার ফল আগে থেকেই জানা,ইসহাক(আ) বেঁচে যাবেন ও তাঁর ছেলে ইয়া'কুব(আ) নবী হবেন! কুরআন থেকে এভাবে মুসলিম উম্মাহ নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করে ইসমাঈল(আ) হচ্ছেন জবিহুল্লাহ।

.

খ্রিষ্টান-মিশনারী কিংবা নাস্তিকরা এই বলে জল ঘোলা করে যেঃ কুরআনে কেন সরাসরি নাম বলা হয়নি? আমরা ইতিমধ্যেই দেখেছি যে সরাসরি নাম না বললেও কুরআনে এটা স্পষ্ট যে ইসমাঈল(আ)ই জবিহুল্লাহ।কুরআনে কুরবানীর পুরো ঘটনা উল্লেখ করে(সুরা আস সফফাত ৩৭:৯৯-১১২) জবিহুল্লাহর নাম উহ্য রাখা হয়েছে।ঘটনা বর্ণণা শেষ করার পরে ইসহাক(আ) এর বৃত্তান্ত শুরু করা হয়েছে।এরপর মুসা(আ) ও হারুন(আ) এর বৃত্তান্ত।এ দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে কুরবানীর উদ্যেশ্যে ইসহাক(আ)কে নেওয়া হয়নি বরং বড় ছেলে অর্থাৎ ইসমাঈল(আ)কে নেওয়া হয়েছিল।মুসলিম,ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা একমত যে ইসমাঈল(আ) বড় ছেলে।কুরআন অনেক সময়েই মহিমান্বিত ব্যক্তির নাম উহ্য রেখে বিশেষণ দিয়ে ঐ ব্যক্তিকে প্রকাশ করা হয়েছে।এটা কুরআনের একটি বর্ণণাভঙ্গি।ইসমাঈল(আ) ছাড়াও ইউনুস(আ) এর নাম উহ্য রেখে এক স্থানে তাঁকে 'যান নুন'(মাছওয়ালা) বলে উল্লেখ

করা হয়েছে[দেখুনঃ সুরা আম্বিয়া ২১:৮৭; https://goo.gl/qJKoeR]।

.

এবার আমরা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থ থেকে ঘটনাটি বিশ্লেষণ করব।

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থ [ইহুদিদের তানাখ, খ্রিষ্টানদের বাইবেলের পুরাতন নিয়ম(Old Testament) অংশের 'আদিপুস্তক'(Genesis)] ইব্রাহিম(আ) কর্তৃক তাঁর বড় ছেলে ইসমাঈল(আ)কে পারানের(আরবদেশ) মরুভূমিতে রেখে আসার ঘটনাটি বর্ণণা করেছে।

সহীহ বুখারীতেও [৩১২৫ নং হাদিস] ঘটনাটি আছে {{হাদিসটি দেখুন এখান থেকেঃ https://goo.gl/xrvAeV }}।

হাদিস এবং আদিপুস্তক(Genesis) এ ব্যাপারে একমত যে—ইসমাঈল(আ)কে যখন পারানের(আরব দেশ) মরুভূমিতে রেখে আসা হয়, তখন তিনি ছিলেন ছোট শিশু।

ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে ঘটনাটি যেভাবে আছে----

.

[ঈশ্বর বললেন] "আমি দাসীর ছেলেটিকেও এক মহা জাতিতে পরিণত করব কারণ সে তোমার বংশধর।" পরদিন সকালে আব্রাহাম[ইব্রাহিম(আ)] কিছু খাবার এবং চামড়ার থলেতে পানি নিলেন এবং হাগারকে(বিবি হাজিরা) দিলেন।তিনি সেগুলোকে তার কোলে তুলে দিলেন এবং ছেলেটির সাথে তাকে পাঠিয়ে দিলেন।তিনি[হাগার/বিবি হাজিরা] চলে গেলেন এবং বেরশেবার মরুভূমিতে ঘুরতে লাগলেন।চামড়ার থলের পানি যখন শেষ হয়ে গেল, তিনি বাচ্চাটিকে ঝোঁপের নিচে রাখলেন।তিনি উঠে গেলেন এবং কাছেই তীর ছোড়ার দূরত্বে গিয়ে বসে পড়লেন।

কারণ তিনি ভাবছিলেন, "আমি বাচ্চাটার মরণ দেখতে পারব না।" তিনি কাছে বসে ছিলেন এবং বাচ্চাটি কাঁদতে শুরু করল।

ঈশ্বর বাচ্চাটির কান্না শুনলেন।ঈশ্বরের স্বর্গদূত স্বর্গ থেকে হাগারকে আহ্বান করলেন, "কী হয়েছে হাগার? ভয় পেয়ো না।ঈশ্বর বাচ্চাটির কান্না শুনতে পেয়েছেন কারণ ও এই স্থানে শুয়ে আছে।

বাচ্চাটিকে তোল এবং কোলে নাও, কারণ আমি তাকে এক মহান জাতিতে পরিনত করব।"

অতঃপর ঈশ্বর তাঁর চোখ খুলে দিলেন এবং তিনি পানির এক কূপ [জমজম কূপ] দেখতে পেলেন। তিনি সেদিকে গেলেন, চামড়ার থলে পানি দিয়ে ভর্তি করলেন এবং বাচ্চাটিকে পানি খাওয়ালেন।ঈশ্বর সেই ছেলেটির সাথে ছিলেন, এবং সে আস্তে আস্তে বড় হল। সে মরুভূমিতে বাস করতে লাগলো এবং একজন তীরন্দাজ হল।সে পারানের মরুভূমিতে থাকতো এবং তার মা মিশরের একটি মেয়ের সাথে তার বিয়ে দিলেন।"

(বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis) ২১:১৩-২১)

.

কিন্তু ইহুদি-খ্রিষ্টানদের আদিপুস্তক(Genesis) এর বর্ণণায় এখানে একটা বড়সড় সমস্যা আছে। ২১নং অধ্যায়ে পরিষ্কার বলা হচ্ছে যে ইসমাঈল(আ)কে মরুভূমিতে রেখে আসার সময়ে তিনি এক ছোট শিশু ছিলেন। ঠিক যেভাবে রাসুল(স) এর হাদিসে বলা হয়েছে।

কিন্ত,একটু আগেই,ঐ একই অধ্যায়ে[আদিপুস্তক ২১:৫-১১] বলা হচ্ছে—ইসমাঈল(আ)কে মরুভূমিতে রেখে আসার কারণ ছিল তিনি ইসহাক(আ)কে ভেঙিয়েছিলেন! এ কী করে সম্ভব, যে ছেলে একটা কাউকে ভেঙানোর মত বড়, এক অধ্যায় পরেই সেই ছেলেটি একটি দুধের শিশুতে পরিনত হয় যে পানির জন্য কাঁদে??

.

"ইসহাকের যখন জন্ম হয়, তখন আব্রাহামের[ইব্রাহিম(আ)] বয়স ১০০বছর। সারা বললেন, "ঈশ্বর আমার মুখে হাসি ফিরিয়ে দিলেন। আর যে এ খবর শুনবে, সেও হাসবে।"

তিনি আরো বললেন, "আব্রাহামকে কেই বা বলতে পেরেছিল যে সারা একসময় বাচ্চা লালনপালন করবে? তারপরেও আমি বৃদ্ধা বয়সে তাঁকে একটা সন্তান এনে দিলাম।"

বাচ্চাটি বড় হল এবং দুধ খাওয়া ছাড়ল। আর যেদিন ইসহাক দুধ খাওয়া ছাড়ল, সেদিন আব্রাহাম এক বিশাল ভোজের আয়োজন করলেন।

কিন্তু সারা লক্ষ্য করলেন যে, আব্রাহামের মিশরীয় দাসীর ছেলেটি[ইসমাঈল(আ)] ভেঙচি কাটছিলো।

সারা আব্রাহামকে বললেন, "ঐ দাসী আর তার ছেলেটাকে বের করে দাও।কারণ দাসীর ছেলে আমার ছেলে ইসহাকের উত্তরাধিকারের অংশীদার হতে পারে না।"

(আদিপুস্তক(Genesis) ২১:৫-১২)

.

বাইবেলের বর্ণণামতে ইসমাঈল(আ) ছিলেন ছোট ভাই ইসহাক(আ) এর চেয়ে ১৪ বছরের বড় [দেখুন আদিপুস্তক ১৬:১৬ ও ২১:৫]। ইসহাক(আ)এর দুধ ছাড়াতে ২ বছর লাগার কথা। সেই হিসাবে ইসহাক(আ) এর দুধ ছাড়ানোর ভোজসভার সময়ে ইসমাঈল(আ) এর বয়স ছিল ১৪+২=১৬ বছর। বাইবেলের বর্ণণামতে, ১৬ বছরের ছেলেটিকে ভেংচি কাটার জন্য তার মা-সহ ইব্রাহিম(আ) বের করে দিয়েছিলেন। অথচ বের করে দেবার পরেই আদিপুস্তক(Genesis) ২১:১৩-২১ এর বর্ণণায় ইসমাঈল(আ) দুধের শিশু হয়ে গেলেন!!!

এর অর্থ হচ্ছে—ইসমাঈল(আ) কর্তৃক ভেংচি কাটার ঘটনাটি একটি বানোয়াট ঘটনা। এই ঘটনার কারণেই বাইবেলে এত বড় স্ববিরোধিতা দেখা দিচ্ছে।

.

মুহাম্মাদ(স) এর হাদিস এবং আদিপুস্তক(Genesis) ২১:১৩-২১ উভয়ের বর্ণণা অনুযায়ী বের করে দেবার সময়ে ইসমাঈল(আ) ছিলেন শিশু। কুরআনের বর্ণণা অনুযায়ী—ইসহাক(আ) এর জন্মের সুসংবাদ দেওয়ারও আগে ইসমাঈল(আ)কে কুরবানী দিতে নিয়ে যাবার ঘটনা ঘটেছিল [দেখুন সুরা আস সফফাত ৩৭:৯৯-১১২]।এর মানে ইসমাঈল(আ)কে মরুভূমিতে রেখে আসার ঘটনাটাও ঘটেছিল ইসহাক(আ) এর জন্মেরও বহু আগে। কাজেই ইসমাঈল(আ) কর্তৃক ইসহাক(আ) এর ভোজসভায় ভেংচি কাটার ঘটনা ঘটবার প্রশ্নই আসে না।

.

বাইবেলের বর্ণণায়ও দেখা যায় যে ইব্রাহিম(আ)কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল তাঁর একমাত্র পুত্রকে কুরবানী দিতে নিয়ে যাবার জন্য [দেখুন আদিপুস্তক ২২:২], অথচ নামের জায়গায় ইসহাক(আ) এর নাম। ইসহাক(আ) কখনোই ইব্রাহিম(আ) এর একমাত্র পুত্র ছিলেন না কারণ তিনি ছিলেন তাঁর ২য় ছেলে। কেবলমাত্র বড় ছেলে ইসমাঈল(আ) এরই ইব্রাহিম(আ) এর "একমাত্র পুত্র" হওয়া সম্ভব। ইসহাক(আ) এর জন্মের আগ পর্যন্ত ১৪ বছর ধরে তিনিই ছিলেন ইব্রাহিম(আ) এর "একমাত্র পুত্র"।

.

প্রকৃতপক্ষে ঝামেলাটা আছে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থে। ইহুদিরা এই ঘটনায় ইসমাঈল(আ) ও ইসহাক(আ) এর নাম অদলবদল করতে গিয়ে ফ্যাকরাটা বাঁধিয়েছে। ইহুদিরা চেয়েছিল কুরবানীর ঘটনায় ইসমাঈল(আ) এর নাম বদলে ইসহাক(আ) এর নাম বসানোর কারণ ইসহাক(আ) তাদের পূর্বপুরুষ। এই কুকাজটা করতে গিয়ে তাদের কিতাবে এই হাস্যকর বৈপরিত্য বা স্ববিরোধিতা দেখা দিয়েছে।

.

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে—কুরআন ও হাদিসের বর্ণণায় কোন বৈপরিত্য বা ঝামেলা নেই।বরং ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ তানাখ ও বাইবেলে ইসমাঈল(আ) ও ইসহাক(আ) এর নাম অদল-বদল করে ইসমাঈল(আ)কে কুরবানীর ঘটনা থেকে সরানো এবং ইসমাঈল(আ) এর নামে একটি বানোয়াট ঘটনা অন্তর্ভুক্ত করবার কারণেই তাদের গ্রন্থে এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। কুরআন ও হাদিসের বর্ণণা মেনে নিলে আর এই সমস্যা থাকে না বরং ব্যাপারগুলো খাপে খাপে বসে যায়। অথচ নাস্তিক-মুক্তমনারা অন্ধভাবে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থের বিবরণের উপরেই নির্ভর করে, শুধুমাত্র ইসলামকে ভুল প্রমাণ করার জন্য। অথচ এ দ্বারা তাদের নিজেদের ভুল অবস্থান তো প্রমাণ হলই, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের বিকৃতিও প্রমাণ হল।আমরা মুসলিমগণ আল্লাহর

প্রেরিত পুরুষদের মধ্যে পার্থক্য করি না[সেখুন সুরা বাকারাহ ২:২৮৫], আমরা সকল নবী-রাসুলকেই বিশ্বাস করি ও ভালোবাসি।কুরআন-হাদিসে যদি বলা হত ইসহাক(আ) জবিহুল্লাহ, তাহলে আমরা নির্দ্বিধায় তা মেনে নিতাম।ইসমাঈল(আ) ও ইসহাক(আ) উভয়কেই আমরা ভালোবাসি।কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে কুরআন-সুন্নাহ এবং বাইবেল সকল সূত্র থেকেই এটা প্রমাণিত যে ইসমাঈল(আ)ই জবিহুল্লাহ। আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে ষড়যন্ত্রমূলক অপপ্রচার থেকে রক্ষা করুন।

.

এই বিষয়টি নিয়ে গত বছর ঈদুল আযহার দিন ইস্রায়েলী ইহুদি পণ্ডিত বেন আব্রাহামসনের সঙ্গে আমার অনলাইনে ডিবেট হয়েছিল। সেই ডিবেটে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল।ডিবেটের আলোচনা দেখতে পারেন এই নোটেঃgoo.gl/aqb2jk

.

এ ছাড়া এই টপিকে খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর(র) এর একটি অসাধারণ বই আছেঃ--- “তাওরাত, যাবুর, ইঞ্জিল ও কুরআনের আলোকে কুরবানী ও জাবীহুল্লাহ”। বইটির ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://goo.gl/PV414o

৭৩

ডারউইনিজমের ব্যবচ্ছেদ: পর্ব – ৩

-সাইফুর রহমান

[আগের পর্বগুলোর জন্য দেখুন (#সত্যকথন) ৬৯ ও (#সত্যকথন) ৭১]

.

'বিজ্ঞানী' ডারউইনকে আসলেই 'জীব বিজ্ঞানী' বলা যায় কিনা তা নিয়ে অনেক সন্দেহ আছে, বিশেষ করে ডিএনএ'র গঠন জানার পরে তার দেয়া 'থিওরি' কোনো মতেই আধুনিক জীব বিজ্ঞানের অংশ হতে পারে না। বিত্তশালী পরিবারের সন্তান ডারউইন প্রথমে চিকিৎসা শাস্ত্র পড়ার জন্য স্কটল্যান্ডের এডিনবুর্গে যান, পড়াশোনা শেষ না করেই চলে আসেন, তার পিতা প্রচন্ড হতাশ হয়ে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি করে দেন যাতে সে রেক্টর বা ক্লারিক জাতীয় সম্মানজনক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে, সেটা করতেও সে ব্যর্থ হয়, পরে ব্যাচেলর অফ আর্টস ডিগ্রী নেন।

.

প্রভাবশালী ও ধনবান পরিবারের সন্তান হওয়ার কারণে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য দেখার পিছনে অনেক সময় ও অর্থ ব্যয় করতে পিছপা হননি। নিজ উদ্যোগে জীব বিজ্ঞানের শ্রেণী বিন্যাসের উপরে পড়াশোনা করেন। পরে ক্যাপ্টেন রবার্ট ফিটজরয়ের নেতৃত্বে জাহাজ এইচ.এম.এস বিগলে করে সারা দুনিয়া চষে বেড়িয়েছেন, বিশেষ করে দক্ষিণ আমেরিকার গালাপস দ্বীপে অনেক দিন অতিবাহিত করেন, সেখান কার জীববৈচিত্র, সাথে আদি মানুষদের জীবনযাত্রা প্রত্যক্ষ করেন, এবং লিখে ফেলেন তার আলোচিত 'অরিজিন অফ স্পেসিস' বই।

.

এখানে প্রায়োগিক বিজ্ঞান বলতে কিছু ছিলোনা, পুরোটাই তার মনগড়া নিজস্ব জীবন দর্শন। ডারউইন অবশ্যই প্রচন্ড মেধাবী একজন মানুষ ছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু কোনো মতেই তাকে আধুনিক বিজ্ঞানের চর্চা অনুযায়ী 'জীব বিজ্ঞানী' বলা চলে না।

.

এবার থিওরি বা 'তত্ত্ব' নিয়ে কিছু বলা যাক। থিওরি হলো যুক্তি তর্কহীন অনুমান নির্ভর কিছু প্রস্তাবনা, সেটা সঠিক/ভুল যেকোনো একটা হতে পারে। একটা বিষয় পরিষ্কার হওয়া দরকার, বিজ্ঞানের অন্য সব শাখায় 'থিওরি' গ্রহণ যোগ্য হলেও 'জীব বিজ্ঞানের' ক্ষেত্রে পরীক্ষাগারে অপ্রমাণিত 'থিওরি' অসাড় একটা জিনিস। পদার্থ বিজ্ঞানে আইনস্টাইনের 'আপেক্ষিকতার তত্ত্ব', কম্পিউটার বা টেলিকমুনিকেশনে ক্লাউডে শ্যাননের 'ইনফরমেশন থিওরি', প্রায়োগিক গণিত শাস্ত্রের জন নিউম্যানের 'গেম থিওরি', রসায়নে লাভসিওরের 'অক্সিজেন দহন তত্ত্ব', ম্যাক্স প্লাঙ্কের 'কোয়ান্টম তত্ত্ব', স্টাটিস্টিকের টমাস ব্যাসের 'বেইস তত্ত্ব' সহ আরো অসংখ্য বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আছে যেগুলো এখনো প্রয়োগসাধ্য ও বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণিত।

.

পদার্থ বা গণিত শাস্ত্রে একটা থিওরী দাঁড় করাতে একটা পেপার আর পেন্সিলই যথেষ্ঠ, পরীক্ষা নিরীক্ষার দরকার পড়ে না, উদাহরণ, আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব। জীব বিজ্ঞানে আপনি চাইলেই আপনার মন গড়া 'তত্ত্ব' বানাতে পারেন না। এক্সপেরিমেন্টাল এভিডেন্স ছাড়া জীব বিজ্ঞান কোনো কিছুই বিশ্বাস করে না।

.

আধুনিক কম্পিউটেশনাল বায়োলজিতে অনেক সময় সিমুলেশন বা ম্যাথমেটিক্যাল মডেলিংয়ের মাধ্যমে অনেক কিছু প্রেডিক্ট/অনুমান করা হয়, বাস্তবে যখন বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে টেস্ট করা হয় তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রে পূর্বানুমান ভুল প্রমাণিত হয়। জীববিজ্ঞানের মতো বিজ্ঞানের অন্য কোনো শাখা এতো রহস্যময়, জটিল ও বৈচিত্রময় নয়। আরো বলে রাখা ভালো, মানুষ মঙ্গলে পা রাখতে চলেছে, ইলেক্ট্রন, প্রোটন নিয়ে কাজ করছে, রোবট বানাচ্ছে আরো কত অ্যাডভান্স টেকনোলজি আমাদের

সামনে, তারপরেও এখন পর্যন্ত আমাদের ডিএনএ র ৯০ ভাগেরও বেশি অংশ কি কাজ তা আমরা জানতে পারিনি । এতো জটিল একটা বিষয়ে একজন মানুষ বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়িয়ে, কিছু বানর, হনুমান, আর জংলী মানুষদের সাথে থেকেই 'জীব বিজ্ঞানের' থিওরি দিয়ে দিলো, আর কোটি কোটি মানুষ সেটা এইযুগেও বিশ্বাস করে চলেছে ভাবতেই আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা নিয়ে সংকিত হই।

.

এবার জেনে নেই ডারউইনের এভোলিউশনারী থিওরি সম্পর্কে তার সমসাময়িক প্রথিতযশা ও আধুনিক বিজ্ঞানীরা কে কি বলেছেন। বিখ্যাত ডেনিশ এম্ব্রায়োলজিস্ট সোরেন লোভট্রপ তার বই Darwinism: The Refutation of a Myth এ লিখেছেন -

.

"...the reasons for rejecting Darwin's proposal were many, but first of all that many innovations cannot possibly come into existence through accumulation of many small steps, and even if they can, natural selection cannot accomplish it, because incipient and intermediate stages are not advantageous."

.

ক্যামব্রিজে পড়াশোনা করা বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ এডাম সিজুইক ডারউইনিজম নিয়ে তামাশা করেছেন -

.

"...parts (of Darwin's Origin of Species) I laughed at till my sides were almost sore..."

.

ব্রিটিশ বায়োলজিস্ট জর্জ জ্যাকসন এই তত্ত্বকে "The Incompetency of 'Natural Selection' বলে অবহিত করেছেন। মার্কিন বায়োলজিস্ট লুইস অগাস্টের মন্তব্য -

.

"There are...absolutely no facts either in the records of geology, or in the history of the past, or in the experience of the present, that can be referred to as proving evolution, or the development of one species from another by selection of any kind whatever."

.

আরেক বিখ্যাত মার্কিন গণিত ও পদার্থবিদ উলফস্গাং স্মিথ তার 'Teilhardism and the New Religion' বইয়ে বলেছেন -

.

'evolutionism is in truth a metaphysical doctrine decked out in scientific garb'.

.

একজন মার্কিন 'আধুনিক এভোলিউশনারী' থিওরিস্ট মাইকেল বিহি তার 'Darwin's Black Box' বইয়ে নিও-ডারউইনিজমকে -

.

'a minor twentieth-century religious sect' বলে উল্লেখ করেছেন।

.

'Ultimately the Darwinian theory of evolution is no more nor less than the great cosmogenic myth of the twentieth century'- কথাটা বলেছেন বিখ্যাত ব্রিটিশ বায়োকেমিস্ট মাইকেল ডেনটন তার Evolution: A Theory in Crisis বইয়ে।

.

ডারউইনের সমসাময়িক বিখ্যাত বায়োলজিস্ট, স্যার রিচার্ড ওয়েন তার 'Darwin on the Origin of Species' বইয়ে ডারউইনের তত্ত্বকে ধুয়ে দিয়েছেন। এই রকম উদাহরণ অসংখ্য দেয়া যাবে যারা ডারউইনের এই আষাঢ়ে গল্প নিয়ে হাসি তামাশা করেছেন।

.

আরো একটা বিষয় আপনাদের জানানো দরকার, ডারউইনকে ইউরোপ আমেরিকার লোকেরাই বিজ্ঞানী মনে করে না। সাধারণত ইউরোপ আমেরিকাতে বড় বড় বিজ্ঞানীদের নামে বিভিন্ন ধরণের বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের নামকরণ হয়ে থাকে যেমন, স্যাঙ্গার ইনস্টিটিউট, ম্যাক্স প্লাঙ্ক ইনস্টিটিউট, পাস্তুর ইনস্টিটিউট, সাল্ক ইনস্টিটিউট, গর্ডন ইনস্টিটিউট, ফ্রান্সিস ক্রিক ইনস্টিটিউট, ওয়াটসন স্কুল অফ বায়োলজিক্যাল সাইন্স, এই রকম আরো অনেক নাম দেয়া যাবে যেখানে বিখ্যাত বিজ্ঞানীদেরকে সন্মান জানানো হয়েছে তাদের নামে নামকরণের মধ্য দিয়ে। অবাক করা বিষয় ডারউইনের মতো বিখ্যাত বিজ্ঞানীর (!!) নামে জীব বিজ্ঞানের কোনো ইনস্টিটিউটের নাম করণহয়নি এখন পর্যন্ত!!! তার মানে ডারউইনের দেশের মানুষরাই তাকে বায়োলজি ফিল্ডে বড় কোনো বিজ্ঞানী হিসাবে স্বীকৃতি দেয় না।

(ইন শা আল্লাহ চলবে)

৭৪

“অকাট্যতা: যাই হোক, তুমি যতই বুদ্ধিমান হও না কেন – আমার এমন কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলোর উত্তর আমাকে এখনও পর্যন্ত কেউ দিতে পারেনি।...”

-তানভীর আহমেদ

“যাই হোক, তুমি যতই বুদ্ধিমান হও না কেন – আমার এমন কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলোর উত্তর আমাকে এখনও পর্যন্ত কেউ দিতে পারে নি। তুমিও দিতে পারবে না। আর যারা দিয়েছে তারা আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে নি। আমার প্রশ্নগুলোর অকাট্য উত্তর কেউ দিতে পারলে আমি আস্তিক হয়ে যেতাম। তোমাকে বলি শোন...”

.

“দাঁড়াও দাঁড়াও... এত তাড়াহুড়ো কীসের? আমি তো এসেছি কেবল মেহমানের সাথে দেখা করতে – আরমানের চাচাত ভাই বলে কথা। চল চল, কথা যদি বলতেই হয়, চা খেতে খেতে বলা যাবে।”

.

আরমান আর ওর ভাই দুইজনেই বিরক্ত হল। যেন ওরা একদমই ধরে নিয়েছিল যে আমি এসব নাস্তিকতা নিয়েই কথা বলতে এসেছি। দুজনের মুখ দেখেই মজা পেলাম। আরমান রেগেছে কারণ ওর আসলে তর সইছে না।

.

চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে আমিই শুরু করলাম, “তুমি বলছ তোমার এমন কিছু প্রশ্ন আছে যেগুলোর উত্তর কেউ দিতে পারে নাই; আর তোমার ধারণা আমিও দিতে পারব না, তাই তো? মানে The absolute question বা questions, ঠিক?”

.

“হ্যাঁ, আমি তাহলে শুরু করি...”

.

“তোমার প্রশ্ন আমার শোনা লাগবে না! সেটা তাকদীর বা ভাগ্য নিয়ে নাকি পাথর নিয়ে আমার তা জানা লাগবে না। শুধু শুনে যাও। মুসলিমদের পক্ষ থেকে The Absolute Answer বা অকাট্য উত্তরের বৈশিষ্ট্যই এমন... প্রশ্নই শোনার প্রয়োজন নেই।”

.

মানুষকে মাঝে মাঝে অবাক হতে সময় দিতে হয়, তানাহলে পরবর্তী ঘটনা বা কথায় মনোযোগ কমে যাবার আশাংকা থাকে। তাই একটু থেমে আবার বলতে শুরু করলাম।

.

“শুনে রাখ, আমরা আল্লাহ সুবহানাহুর ওপর দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস স্থাপন করেছি তাঁকে না দেখেই। কোনও প্রমাণ ছাড়াই। আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন কুরআনের শুরুতেই সূরা বাকারাহের ২য় ও ৩য় আয়াতে বলেছেন তাঁর কিতাব তাদেরই পথপ্রদর্শক ‘যারা অদেখা বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে’, এর তাৎপর্য হল এই যে, কিছু মানুষ কখনোই বিশ্বাস করবে না। এমনকি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করে দেখালেও তারা বলবে যে সেটা যাদু ছিল... হেন ছিল, তেন ছিল - কিন্তু বিশ্বাস স্থাপন করবে না। শেষমেশ বিশ্বাস ওই ‘না দেখা বিষয়েই’ গিয়ে পড়বে। আর তাই তুমি বিশ্বাস করবে কি করবে না সেটা তোমার নিয়্যাতের উপরই নির্ভরশীল হবে।

.

তুমি যদি বিশ্বাস করতে চাও তবে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর না জেনেই করতে হবে, আর বিশ্বাস করতে না চাইলে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জেনেও তুমি বিশ্বাস করবে না। তুমি প্রয়োজনে প্রমাণের অযোগ্য ‘মাল্টিভার্স’ থিউরিতে বিশ্বাস করবে, বিশ্বাস করবে কিছু গোঁড়ামিপূর্ণ মানুষ... মানুষের দেওয়া থিউরিতে... শুধুমাত্র বিশ্বাস না করবার জন্য প্রয়োজনে তোমার পূর্ব পুরুষদেরও বানর বলে

দাবি করবে... ভাবতেও হাস্যকর লাগে, এতসব মানবরচিত থিউরির জোড়াতালি আর প্রশ্নের ছড়াছড়ি শুধুমাত্র আল্লাহকে অবিশ্বাস করবার জন্য! এই ধরনের থার্ডক্লাস মানুষেরা আবার জিজ্ঞাসা করে আল্লাহ কেন জাহান্নাম বানালেন!

.

কিন্তু হ্যাঁ, তার মানে এই না যে ওইসব ফালতু প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই। অবশ্যই আছে আর সেগুলো আর কেউ না জানলেও আল্লাহ রব্বুল আলামীন ঠিকই জানেন!” চায়ের কাপে শেষ চুমুকটা দিয়ে রেখে দিলাম। আমার কণ্ঠ আরও জোরালো হল।

.

বলতে থাকলাম, “আমাদেরকে সমস্ত প্রশ্নের উত্তর জানানো হয় নাই। কারণ আমাদের সেগুলোর প্রয়োজন নাই। ‘আল্লাহ কেন মহাবিশ্ব সৃষ্টি করলেন, কীই বা হতো কিছু না সৃষ্টি করলে? এমনই একটি প্রশ্নের উত্তর আল্লাহ ফেরেশতাদেরই বলেছিলেন ‘আমি যা জানি, তোমরা তা জান না’।

.

সুতরাং আমরা জানি না তো কী হয়েছে, আল্লাহ সুবহানাহু হলেন ‘আল-আলীম’ অর্থাৎ সর্বজ্ঞ The All Knowing, তাঁর জ্ঞানের উপর কোনো জ্ঞান বা প্রশ্ন নেই। তোমাদের প্রশ্ন তো কিছুই না।

.

আর তুমি যেমন বললে না! ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে প্রশ্নগুলোর উত্তর পাবার। তার মানে তোমার মনে এই ধারণাও আসা স্বাভাবিক যে ক্ষীণ সম্ভাবনা রয়েছে সৃষ্টিকর্তা থাকবার। তুমি আর তোমার মত সমস্ত নাস্তিকেরাই তাদের বিশ্বাস নিয়ে দোদুল্যমান। আর সেটাই স্বাভাবিক। কারণ আল্লাহ মানুষের ভেতর তাঁকে বিশ্বাসের বিষয়টি ফিতরাতগতভাবে দিয়ে দেন, আর তা অবিকল থাকে যতক্ষণ না মানুষ দুনিয়ার বস্তাপচা তত্ত্ব খেয়ে খেয়ে সেই ফিতরাত নষ্ট করে ফেলে।

.

আমার কিন্তু কোনোই সন্দেহ নেই যে আল্লাহ রয়েছেন এবং একজনই রয়েছেন। এটি সবচেয়ে বড় সত্য। আর বিশ্বাস কর, তোমার আর তোমার মত নাস্তিকদের সমস্ত প্রশ্নের জবাব আল্লাহ দিয়ে দিতে পারবেন। কিন্তু কিয়ামতের দিনের আগে সেসবের জবাব তোমাদের পাওয়া হবে না। সেদিন তোমাদের কিছুই করার থাকবে না! ভয়ঙ্কর-মজার ব্যাপার কী জান? সেদিন তোমাদের সাথে অবিচারও করা হবে না। এ অবস্থায় মারা গেলে তোমরা সেদিন কী বলে কান্নাকাটি করবে জান? বলবে,‘আমরা নিজেদের সাথে জুলুম করেছি। ইয়া আল্লাহ, আপনি আমাদের আরেকটি সুযোগ দিন’ কিন্তু কেউ সেদিন একথা বলবে না যে ‘আমার প্রশ্নগুলোর উত্তর পাই নি’ বা ‘আমার উপর জুলুম করা হয়েছে’।

.

না না, আসলে তাও না। আল্লাহ হচ্ছেন আমাদের রব! তিনি তো বাধ্য নন তাঁরই এক নগন্য সৃষ্টির প্রশ্নের উত্তর দিতে! আল্লাহকে অবিশ্বাস করে কোনো বড় কিছু হয়ে যায় নি কেউ যে আল্লাহ তাকে উত্তর দিতে বাধ্য। বরং আমরাই তাঁর বান্দা! আমরাই না আল্লাহর কাছে বাধ্য! আল্লাহু আকবার! তাই আমার তো মনে হয়, নাস্তিকদেরকে কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়েই জাহান্নামে ফেলে দেওয়াও হতে পারে। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। তবে হ্যাঁ, আল্লাহ যদি তোমাদের প্রশ্নের উত্তর না ই দেন, তখন কী করবে?”

.

এতক্ষণে দেখলাম ছেলেটার চোখমুখ ফ্যাকাশে হয়ে এসেছে। কিন্তু আমি থামলাম না।

.

“তখন তোমরা এটা জানবে যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তিনি আল্লাহ। কিন্তু বান্দা হয়ে তোমার সৃষ্টিকর্তার সাথে দেখা তো দূরের কথা, কথাও বলতে পারবে না। এই মানসিক শাস্তিই তো তোমাদের জ্বালিয়ে পুড়িয়ে মারবে। তুমি কি ভেবেছিলে জাহান্নামের আগুনের উত্তাপই সেখানকার সর্বোচ্চ শাস্তি! আর তুমি তোমার প্রশ্নগুলোর উত্তর পেয়ে সেখানে দিব্যি মানসিক শান্তিতে থাকবে! মোটেও না। জাহান্নামকে গড়া হয়েছে শারীরিক মানসিক সবদিক থেকে কষ্ট দেওয়ার জন্য।

.

তোমার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে তোমাকে জাহান্নামে পাঠানো হবে নাকি না দিয়েই পাঠানো হবে সে বিচার আল্লাহ করবেন। কিন্তু একথাও আমরা জানি যে আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন তাঁর জান্নাতি বান্দাদের সাথে সরাসরি দেখা করবেন ও কথা বলবেন। আর এটাই হল জান্নাতিদের সবচেয়ে বড় পাওয়া – তাঁদের রবের সাথে সাক্ষাত, যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যাঁকে বান্দারা না দেখেই, কোনো অকাট্য প্রমাণ ব্যতিরেকেই, প্রশ্নগুলোর উত্তর না পেয়েই বিশ্বাস করেছিল। অথবা হয়ত সে সৃষ্টির মধ্যেই যথেষ্ট প্রমাণ মেনে নিয়েছিল বা প্রশ্নগুলোর জানা উত্তরেই সন্তুষ্ট ছিল – কারণ সে মূলত বিশ্বাস করতে চেয়েছিল।

.

আমি ভাবলেও শিওরে উঠি যখন নাস্তিকেরা জানবে যে একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, তাদের বিচারও হল। দুনিয়ায় থাকাকালীন ওই 'না দেখে বিশ্বাস করা' মানুষগুলো জান্নাতে গিয়ে আল্লাহকে দেখতে পাচ্ছে অথচ তখন এত ঠাঁটবাট নিয়ে চলা নাস্তিকগুলো এত বিদ্যে আওড়ানোর পরও তাঁদের রবকেই দেখতে পাবে না। একটুখানি বিজ্ঞানের গোঁড়ামিতে একটুখানি বিশ্বাসই আর করা হল না! অথচ বিজ্ঞানের জ্ঞানও আল্লাহর রহমতেই আমাদের পক্ষে জানা সম্ভব হয়েছিল! আফসোস এদের জন্য!"

.

আমার কণ্ঠ জোরালো হয়ে যাওয়ায় আশেপাশের অনেকেরই অনাকাঙ্ক্ষিত মনোযোগ আকর্ষণ করে ফেলেছি। আরমানের চাচাতো ভাই বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে। আরমানও ব্যতিক্রম নয়। যদ্দুর মনে পড়ে, এমন কড়াভাবে ও আগে কখনও আমাকে কথা বলতে দেখে নাই হয়ত।

.

আমি এবার একটু শান্ত হয়ে বললাম, "দেখো, তোমার যদি সত্যিই এমন কোনো প্রশ্ন থাকে যেগুলোর উত্তর তুমি সত্যিই জানতে চাও তাহলে তুমি জান্নাতে গিয়ে আল্লাহ সুবহানাহুতা'লাকে সরাসরি জিজ্ঞেস করলেই পার! সুতরাং তোমারও ওই একটাই পথঃ সিরতল মুস্তাকিম!

.

তুমি বলেছ তোমার প্রশ্নগুলোর অকাট্য উত্তর কেউ দিতে পারলে তুমি আস্তিক হয়ে যেতে! হাস্যকর। তুমি আস্তিক হও বা না হও তাতে কেবল একজন ছাড়া কারও কোনো লাভক্ষতি নেই, কারও কিছু আসে যায় না। সে একমাত্র মানুষটি হচ্ছ তুমি নিজে। জান্নাত নয়তো জাহান্নাম... পছন্দ তোমার।

.

এটাই তোমার সমস্ত প্রশ্নের সোজাসাপ্টা উত্তরঃ কোনো প্রমাণ নেই। আর প্রমাণ নেই বলেই আমরা মু'মিন অর্থাৎ বিশ্বাসী। অকাট্য প্রমাণ বা সোজা কথায় আল্লাহকে দেখলে পরে তো যে কেউই বিশ্বাস করতো। না দেখে বা অকাট্য প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাস করাটাই হলপরীক্ষা।

.

তাই তুমি যে যুক্তিই খোঁজো না কেন কোন সময়েই তা তোমার কাছে বিতর্কের ঊর্ধে যাবে না... যতক্ষণ না তুমি আসলে প্রমাণ ছাড়াই বিশ্বাস করতে চাও। তাই বলছি তোমার নিয়্যাত ঠিক করে নাও। সমস্ত উত্তর পেয়ে যাবে। "

.

-বলে উঠে পড়লাম।

.

আসার আগে বলে আসলাম, "মানুষকে মাঝে মাঝে একা চিন্তা করবার জন্য সময় দিতে হয়। তুমি চালাক হলে বুঝতে পারবে যে এই সময়টাতে শয়তান তোমাকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করবে। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে নিও।"

.

ওখানে আমি আর তখন দাঁড়াই নি। সালাম দিয়ে চলে এসেছি। শেষবার শুধু দেখলাম বিস্ফোরিত চোখে তাকিয়ে আছে ছেলেটি। আরমানের দিকে খেয়াল করি নি।

.

.

আমি ছেলেটিকে তেমন কথাই বলতে দিই নাই। কারণ আমি চেয়েছি ও যেদিন বলবে সেদিন যেন বাকিরা শোনে। কিন্তু তার জন্য আগে শোনানোর প্রয়োজন ছিল। যাই হোক, সেদিন রাতে আরমানের সাথে মসজিদে দেখা হলে ও বলল ওর কাজিন নাকি এরপর তেমন একটা কথাই বলে নাই। মাগরিবের আগেই নাকি চলে গিয়েছিল।

.

"সুবহানাল্লাহ! ভাল লক্ষণ... ওর জন্য আমাদের দুয়া করা উচিত। এক কাজ করিস, আমার পুরনো ডায়েরিটা ওর সাথে দেখা হলে ওকে দিয়ে দিস। ওহ হো! তোর কাজিনের নামটাই তো জিজ্ঞাসা করা হয় নাই!"

.

..."সাজিদ"

৭৫

জিন (Jinn) কিভাবে আগুনের তৈরি হতে পারে ?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক প্রশ্নঃ পূর্বে ধারণা করা হত যে পৃথিবীর সব কিছু চারটি উপাদান থেকে তৈরি-মাটি,পানি,বায়ু ও আগুন! কিন্তু এখন আমরা জানি আগুন কোন উপাদান/পদার্থ নয় বরং এক ধরণের রিঅ্যাকশনারী কেমিক্যাল প্রসেস! তাহলে জ্বিন(Jinn) কিভাবে আগুনের তৈরি হতে পারে(Quran 55:15) ?

.

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

.

“ এবং তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা থেকে।”
(কুরআন, আর রহমান ৫৫:১৫)

.

আলোচ্য আয়াতে مَّارِجٍ অর্থ অগ্নিশিখা। نَّارٍ অর্থ এক বিশেষ ধরণের আগুন।কাঠ বা কয়লা জ্বালালে যে আগুন সৃষ্টি হয় এটা সে আগুন নয়।এর অর্থঃ ধোঁয়াবিহীন শিখা। [তাফসির কুরতুবী, তাফসির ফাতহুল কাদির, কুরআনুল কারীম(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির), ড.আবু বকর জাকারিয়া, ২য় খণ্ড, সুরা আর রহমানের ১৫নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ২৫২৮]

.

সাহাবী ইবন আব্বাস(রা) বলেনঃ ইহা হল ধুম্রহীন আগুনের শিখা যা মানুষকে মেরে ফেলে। (তাবারী ১৭/৩৩)

.

আবু দাউদ তায়ালিসী(র) বলেন যে, আবু ইসহাক(র) থেকে শু’বাহ(র) তাদেরকে বর্ণণা করেছেনঃ উমার আল আসাম(র) যখন অসুস্থ তখন আমরা তাঁকে দেখতে যাই।তিনি তখন বলেনঃ আমি তোমাদেরকে একটি হাদিস বলছি যা আমি আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) থেকে শুনেছি।অতঃপর তিনি বলেন, বর্ণিত এই ধুম্রহীন আগুন হল সেই ধুম্রহীন আগুনের তেজের সত্তর ভাগের এক ভাগ যে ধুম্রহীন আগুন থেকে জিন জাতিকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতঃপর তিনি পাঠ করেন, “এর পূর্বে সৃষ্টি করেছি জিনকে, প্রখর শিখাযুক্ত অগ্নি হতে{হিজর ১৫:২৭}” (তাবারী ১৬/২১)

.

জিনদের প্রকৃতি সম্পর্কে কুরআনে আরো উল্লেখ আছে—

.

“ সুলাইমান বললেন, হে পরিষদবর্গ, তারা আত্নসমর্পণ করে আমার কাছে আসার পূর্বে কে তার{সাবার রাণী} সিংহাসন আমাকে এনে দেবে?
জনৈক শক্তিশালী-জিন বলল, আপনি আপনার স্থান থেকে ওঠার পূর্বে আমি তা এনে দেব এবং নিশ্চয়ই আমি এ কাজে শক্তিমান, বিশ্বস্ত।
কিতাবের জ্ঞান যার ছিল, সে বলল, আপনার দিকে আপনার চোখের পলক ফেলার পূর্বেই আমি তা আপনাকে এনে দেব। ...”
(কুরআন, নামল ২৭:৩৮-৪০)

.

অর্তাৎ জিনেরা মানুষের মত কোন প্রাণী নয়।এরা এমন এক প্রকারের প্রাণী মুহূর্তের মধ্যেই যাদের এক স্থান থেকে অন্য স্থানে যাতায়াতের ক্ষমতা আছে।কিংবা হয়তো এরা মানুষের থেকে ভিন্ন কোন মাত্রা(dimension) এর প্রাণী।আল্লাহ ভালো জানেন।

জিনের অস্তিত্ব বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণ করাও সম্ভব হয়নি, নাকচ করাও সম্ভব হয়নি।কুরআনে জিন সম্পর্কে যা বলা আছে, বিজ্ঞান তা সম্পর্কে এখনো অজ্ঞ।

.

নাস্তিক-মুক্তমনাগণ প্রশ্ন তোলেন যেঃ আগুন যেহেতু কোন উপাদান বা পদার্থ নয় কাজেই এটি জিন বা কোন প্রাণী সৃষ্টির উপাদান হতে পারে না।কাজেই কুরআনে জিন জাতি সম্পর্কিত তথ্য অত্যন্ত 'অবৈজ্ঞানিক'।

.

এর জবাবে আমরা মুসলিমরা বলবঃ আপনাদের চিন্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ। আপনাদের কেন এমন চিন্তা হল যে মহাবিশ্বের সকল প্রাণই পৃথিবীর প্রাণের মত কোন উপাদান দ্বারা গঠিত হতে হবে? এ থেকে ভিন্ন কোন মেকানিজমে মহাবিশ্বের কোন প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে না এ নিশ্চয়তা আপনাদের কে দিল? সত্যিকারের বিজ্ঞানীরা কিংবা বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তিরা কখনোই এটা কল্পনা করে না যে মহাবিশ্বের সকল প্রাণীই পৃথিবীর প্রাণীর ন্যায় তৈরি। বরং অনেক ধরণের প্রাণের সম্ভাব্যতায় একজন বিজ্ঞানমনস্ক ব্যক্তি বিশ্বাস করতে বাধ্য।

.

বিজ্ঞানী G. Feinberg এবং R.Shapiro তাঁদের 'LIFE BEYOND EARTH' বইতে(প্রকাশক William Morrow and Co., Inc., New York) উল্লেখ করেছেন যে, আমাদের পৃথিবীর বাইরে প্রাণের বিস্তার সব থেকে বেশি সম্ভব সূর্য বা অন্য কোন নক্ষত্রে প্লাজমার মাঝে। প্লাজমার মাঝে উদ্ভুত সম্ভাব্য সেই প্রাণীদেরকে তাঁরা 'Plasmabeasts' বা প্লাজমা-জন্তু বলে অভিহীত করেছেন। [১]

.

সমান সংখ্যক ইলেক্ট্রন ও ধণাত্মক আয়নযুক্ত উচ্চ আয়নিক গ্যাসকে প্লাজমা বলা হয়। আন্তঃনাক্ষত্রিক জগতে বিশেষ করে সূর্য ও অন্যান্য নক্ষত্রের বায়ুমণ্ডলে গ্যাসসমূহ উচ্চ আয়নিত অবস্থায় থাকে, তাই সেখানে প্লাজমা অবস্থা বিরাজ করে। এ ছাড়া পরীক্ষাগারে ক্ষরণ নলে কিংবা তাপ নিউক্লিয় রিএক্টরে প্লাজমা অবস্থা সৃষ্টি করা যায়। প্লাজমা অবস্থা তৈরির জন্য ৫০,০০০ K থেকে বেশি তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়।আন্তঃনাক্ষত্রিক প্লাজমাকে সহজেই "ধোঁয়াবিহীন অগ্নিশিখা" বলে অহিহীত করা যায়।

.

বিজ্ঞানী G. Feinberg এবং R.Shapiro প্লাজমাকে বলেছেন 'Plasmabeasts' গঠনের উপাদান।

.

একেবারে সাম্প্রতিক সময় ২০০৭ সালে V.N. Tsytovich এর নেতৃত্বে General Physics Institute of the Russian Academy of Science এর বিজ্ঞানীদের একটি দলও মত প্রকাশ করেছে যেঃ প্লাজমা অবস্থা থেকে প্রাণের বিকাশ হওয়া খুবই সম্ভব। [২]

.

বিজ্ঞানী Robert A. Freitas মহাবিশ্বে 'নন-বায়োলজিক্যাল' প্রাণের সম্ভাব্যতার ব্যাপারে মত প্রকাশ করেছেন।তাঁর মতে এ ধরণের প্রাণ ব্যবস্থায় বিপাক ক্রিয়া চারটি ধাপ দ্বারা হতে পারে। যথাঃ

.

ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিজম, শক্তিশালী নিউক্লিয় বল(strong nuclear force), দুর্বল নিউক্লিয় বল(weak nuclear force), এবং মহাকর্ষ।এই সম্ভাব্য জীবন প্রক্রিয়ার নামকরণ করা হয়েছেঃ Chromodynamic, Weak Nuclear Force And Gravitational Life।পৃথিবীর প্রাণীকূল কার্বনভিত্তিক।বিজ্ঞানী Robert A. Freitas এর মতে Chromodynamic life শক্তিশালী নিউক্লিয় বলভিত্তিক।এ ধরণের প্রাণের বিকাশের পরিবেশ থাকতে পারে কেবল নিউট্রন স্টারে।তিনি আরো বলেন যেঃ মহাকর্ষীয় প্রাণী(Gravitational creatures) এর অস্তিত্ব থাকাও সম্ভব যারা সরাসরি মহাকর্ষীয় বল থেকে শক্তি আহরণ করতে পারে।

.

Robert A. Freitasসহ অন্যান্য বিজ্ঞানীরা মহাশূণ্যে প্রাণের বিস্তার ও এর সম্ভাব্যতার ব্যাপারে এছাড়াও অনেকগুলো তত্ত্ব দিয়েছেন। [৩]
সেগুলোর সবগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত উল্লেখ করা হলে একটা বই হয়ে যেতে পারে।

.

মহাবিশ্বে সম্ভাব্য প্রাণের বিকাশ সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের উত্থাপিত অল্প কিছু তত্ত্ব উপরে আলোচনা করা হল। আমরা বলব না বিজ্ঞানীদের এই তত্ত্বগুলোই কুরআনে বর্ণিত জিনদের বর্ণণা; কেননা বিজ্ঞানীদের এই তত্ত্বগুলো এখনো প্রমাণিত নয়। তবে এখানে লক্ষ্যনীয় যে, বিজ্ঞানীরা মহাবিশ্বে সম্ভাব্য প্রাণ সম্পর্কে এমন সব তত্ত্ব দিয়েছেন যার সঙ্গে পৃথিবীর প্রাণীদের কোন মিল নেই। প্লাজমা থেকে প্রাণের উদ্ভবের তত্ত্ব বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন, কিন্তু তা দেখে কেউ কিন্তু এটা বলেনি যেঃ

.

"প্লাজমা অবস্থার ভয়ানক তাপে কিভাবে প্রাণের বিকাশ হতে পারে??"

.

শক্তিশালী নিউক্লিয় বলভিত্তিক প্রাণ এমনকি মহাকর্ষীয় প্রাণীর প্রস্তাবনা পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা দিয়েছেন যারা কিনা সরাসরি মহাকর্ষ বল থেকে প্রয়োজনীয় শক্তি পেতে পারে। বাংলার নাস্তিক-মুক্তমনাকূলকে কিন্তু কোন বিজ্ঞানীকে কটাক্ষ করে বলতে দেখা গেল না যেঃ

.

"শক্তিশালী নিউক্লিয় বল কিংবা মহাকর্ষ – এর কোনটাই উপাদান/পদার্থ নয়।তাহলে এ থেকে কিভাবে প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে?"

.

কিন্তু ৭ম শতাব্দীতে নাজিলকৃত গ্রন্থ আল কুরআনে যখন এক বিশেষ ধরণের অগ্নি(ধোঁয়াহীন আগুনের শিখা) থেকে গঠিত প্রাণীর কথা উল্লেখ করা হয়, তখন তাদেরকে কটাক্ষ করে বলতে দেখা যায় যে--"রিঅ্যাকশনারী কেমিক্যাল প্রসেস থেকে কিভাবে প্রাণ সৃষ্টি হতে পারে??"
এটা কি দ্বিমুখিতা নয়? এটা কি চিন্তার সংকীর্ণতা নয়?

তথ্যসূত্রঃ

.

[১] ['LIFE BEYOND EARTH' বইটির আমাজন-অর্ডার লিঙ্কঃ https://www.amazon.com/Life-Beyond-Earth-Intel.../.../0688036422]

.

[২] ☛ http://www.dailygalaxy.com/.../inorganic-cosmic-dust-points-t...
☛ https://www.sciencedaily.com/releas.../2007/.../070814150630.htm

[৩] http://listverse.com/20.../.../17/10-hypothetical-forms-of-life/

৭৬

সাইনটিজম (Scientism) : “বিজ্ঞানই সত্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস” –এই মতবাদ কতটুকু যৌক্তিক?

-নাফিয মুক্তাদির

সাইনটিজম (scientism) : এই মতবাদে বিশ্বাসীরা বিশ্বাস করে বিজ্ঞানই সত্যের একমাত্র নির্ভরযোগ্য উৎস। অর্থাৎ বিজ্ঞান যা বলবে তাই সত্য। অধিকাংশ নাস্তিকরাই এই মতবাদে বিশ্বাসী।

.

প্রথমত, নাস্তিকরা সত্য অনুসন্ধানের জন্য একমাত্র বিজ্ঞানকেই নির্ভরযোগ্য উৎস হিসেবে গ্রহন করে, তাতে আমার কোন সমস্যা নেই। কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় তখন, যখন মুসলিমরাও বিজ্ঞানকে সত্যের মানদণ্ড হিসেবে গ্রহন করে।

.

সমস্যা এই কারনে যে, বিজ্ঞান সদা পরিবর্তনশীল; অনেকটা এরশাদের মত, আজ এই কথা তো কাল সেই কথা। যেমন বিজ্ঞান আগে বলত, সূর্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরে; এখন বলে পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘুরে। তাই আজ যদি বলে ইসলাম সত্য, কাল বলবে মিথ্যা; তখন আপনি কি করবেন?

.

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান দ্বারা ইসলামের সবকিছুকে যাচাই করা সম্ভব নয়, যেমন ঈসা (আঃ) এর জন্ম, চাঁদ দ্বিখণ্ডকরণ। বিজ্ঞানকে কেটে হাজার টুকরো করলেও কখনও স্বীকার করবে না যে, দু,হাজার বছর পূর্বে একজন নারী কোন প্রকার পুরুষের সংস্পর্শ ব্যতীত একটি সন্তান জন্ম দিয়েছিল।

.

তবে এটি ইসলাম নয় বরং বিজ্ঞানেরই সীমাবদ্ধতা। হাজার হোক বিজ্ঞান তো মানুষ দ্বারাই পরিচালিত। তাছাড়া এটি কিভাবে সম্ভব যে, আমরা মানুষ, আল্লাহর এক নগণ্য সৃষ্টি হয়ে রহস্য ভেদ করে ফেলব ঐ সত্তার যিনি চন্দ্র, সূর্য,পৃথিবী, মানুষ এবং পৃথিবীর সব কিছুরই সৃষ্টিকর্তা।

.

আমাদের মনে রাখতে হবে, অন্য সবকিছুর মত বিজ্ঞানেরও সীমাবদ্ধতা আছে, আছে হাজারো ভুল। তাই ত্রুটিপূর্ণ ও সদা পরিবর্তনশীল বিজ্ঞান দ্বারা ধ্রুব সত্য ইসলামকে যাচাই করে বাতুলতা বৈ আর কি?

৭৭

“তিন বন্ধুর কথোপকথন; থিউরী অব ইভোলিউশন।”

-মুহাম্মাদ রেযাউল করিম ভূঁইয়া

৩ বন্ধুর কথোপকথন। থিউরী অব ইভোলিউশন।

.

তিন বন্ধু। মাহমুদ, সুজন আর সুমন। এর মধ্যে সুজন আর সুমন একটু নাস্তিক কিসিমের। মাহমুদ আস্তিক, নামাজ রোজা করে ; কিন্তু তা নিয়া সুজন আর সুমনের হাসির শেষ নাই।

.

যাই হোক,গতকাল সুজন আর সুমন ল্যাপটপ কিনতে মেলায় গিয়েছিল। সুজন নিলো একটা লেনোভো থিংকপ্যাড ..... সুমন নিলো লেনোভো ইয়োগা... ।

.

পরদিন সকালে তিন বন্ধুর দেখা। মাহমুদ জিজ্ঞেস করলো :

---> কিরে সুজন, তোর প্রসেসর কি?

==> 'ইনটেল কোর-আই ৫'

--->সুমন তোরটা?

==>'ইনটেল কোর-আই ৭'

--> এর মানে কি জানস?

==> কি?

---> এর মানে তোর আর সুজনের ল্যাপটপ দুইটার প্রসেসর প্রায় ৯৫% একই। তা থেকে প্রমাণিত হয় যে : তোদের এই দুইটা ল্যাপটপ একটা কমন ল্যাপটপ থেকে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে আজকের এই দুইটা ল্যাপটপ হয়েছে। বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে এই প্রক্রিয়া সংগঠিত হয়... বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে একটা কমন ল্যাপটপ রোদ,বৃষ্টি ঝড়ে বিভিন্ন ক্রিয়া প্রকৃয়ায় পরিবর্তীত হয়ে তা থেকে দুই ধরনের ল্যাপটপ হয়েছে : একটা সুজনের ল্যাপটপ একটা সুমনের ল্যাপটপ.... বিশ্বাস করতে সমস্যা কি?

.

সুমন আর সুজন বুঝতে পারলো যে ইভোলিউশন থিউরী নিয়ে মাহমুদ ফান করছে।

.

জবাব দিলো সুমন : পাগলামী করিস না তো মাহমুদ, দুইটা এক জিনিস না। তুই জানস লেনোভো কোম্পানী ল্যাপটপ দুইটা বানাইছে, এমনি এমনি কি আর ল্যাপটপ হয় নাকি? একটা ইনটেল কোর-আই প্রসেসর লক্ষ কোটি বছরেও এমনি এমনি হয়না তুই জানস।

.

মাহমুদ : তার মানে দুইটা জিনিস একই রকম হলে তার একজন কমন ম্যানুফ্যাকচারার আছে তাইনা? তাহলে মানুষ আর শিম্পাঞ্জীর জিন গুলো যদি ৯০% একই হয়, তাদের ম্যানুফ্যাকচারার একজন , তা সত্য হতে পারবেনা কেন? কেন মানুষ আর শিম্পাঞ্জীর একটা কমন এনসেস্টর থাকতে হবে?

.

সুজন: আরে মাহমুদ, ইভোলিউশন আর লেনোভো ল্যাপটপ প্রডাকশন এক না।

.

মাহমুদ: আরে আমি জানি তো এক না। এখন বল যে ইনটেল প্রসেসর বেশী কমপ্লেক্স, নাকি হিউম্যান ব্রেইন বেশী কমপ্লেক্স।

.

==> অবশ্যই 'হিউম্যান ব্রেইন'

.

--> একটা ইনটেল প্রসেসর তৈরী করতে যদি হাজার হাজার মানুষের কয়েক যুগের পরিশ্রম লাগে এবং তা পরীক্ষাগারে তৈরী করতে হয়, তা এমনি এমনি রৌদ্র, বৃষ্টি, ঝড়ে কোটি কোটি বছরেও উৎপন্ন হওয়া সম্ভব নাহয়; তাহলে মানব মস্তিষ্ক কিভাবে এমনি এমনি হয়ে যায়? মানুষের চোখ, কান, হার্ট, লীভার, কিডনী, ব্লাড , রেড -হোয়াইট ব্লাড সেল, শিরা উপশিরা , বোনস, স্কিন .... এগুলো কিভাবে এমনি এমনি কারো কোন ডিরেকশন ছাড়া হয়ে যায়?

.

ইভেন একটা 'বায়োলজিকাল সেল' কিভাবে এমনি এমনি হয়, একটা কোষ এর ভিতরে থাকা মাইটোকন্ড্রিয়াই তো ইনটেল প্রসেসর থেকে বেশী কমপ্লেক্স ... ওই মাইটোকন্ড্রিয়া কিভাবে হল? কিভাবে নিউক্লিয়াস হল? কিভাবে রাইবোসম হল? কিভাবে ডিএনএ হয়ে গেল? কেউ ডিরেকশন দিলোনা, এমনি এমনি কেমনে হল?

.

==> এসব বুঝতে হলে তোকে দ্য সেলফীশ জীন বইটা পড়তে হবে... রিচার্ড ডকিন্স এর? উনি দুনিয়ার সবচে' বড় বিজ্ঞানী ...

.

---> তুই পড়ছস?

.

==> এখনও পড়িনাই, তবে আসিফ ভাই পইড়া কইছে যে ইভোলিউশন থিউরী ঠিক আছে। এটা বৈজ্ঞানিক থিউরী। এটা অস্বীকার করা মানে বিজ্ঞান কে অস্বীকার করা।

.

---> প্রথম কথা হল তুই নিজে পড়স নাই। দ্বিতীয় কথা হল যে, থিউরী হল থিউরী, ফ্যাক্ট না। ইভোলিউশণ হল একটা থিউরী, এর পক্ষে যেমন অনেক বিজ্ঞানী আছে, বিপক্ষেও অনেক বিজ্ঞানী আছে। এটা পরীক্ষাগারে প্রমাণিত কোন থিউরী না। এটা হল স্পেকুলেশন বা ধারণাপ্রসূত থিউরী, এর পক্ষের প্রমাণগুলো কোন অকাট্য প্রমাণ না। বরং নিছক ধারণা ।

.

কেউ বিলিয়ন বিলিয়ন বছর ধরে অবজার্ভ করে নাই, যে অ্যামিবা থেকে সরীসৃপ হইয়া , তা থেকে বানর জাতীয় প্রাণী হয়ে, তা থেকে মানুষ হয় গেছে।

.

কেউ পরীক্ষাগারে একটা অ্যামিবা থেকে হাইড্রা এখনও বানাইতে পারে নাই। ইভেন কেউ পরীক্ষাগারে প্রোটিন অনুর সাথে প্রোটিন অনুর বাড়ি খাওয়াইয়া একটা অ্যামিবাও বানাইতে পারে নাই। ১০০ বছর ধরে যদি প্রোটিন অনুর সাথে প্রোটিন অনুর বাড়ি খাওয়ার একটা এক্সপেরিমেন্ট করা হইতো, আর তার থেকে একটা ব্যাকটেরিয়াও উৎপন্ন করা যাইতো, তাও না হয় মনরে একটু বুঝ দিতাম।

.

মানুষের মতন দেখতে কয়েকটা কংকাল পাইলেই কি প্রমাণ হয় যে ওই কংকালগুলো মানুষ আর বানরের পূর্বপুরুষ ছিল? কেউ কি টাইম মেশিনে গিয়ে দেখে এসছে? এটা কি হতে পারেনা, যে ওরা ডিফারেন্ট কোন এইপ? কত এইপ ই তো বিলুপ্ত হয়েছে? ওরা ওরকম বিলুপ্ত এইপ?

.

দুইটা প্রাণীর মধ্যে মিল থাকলেই কেন তাদের একটা কমন এনসেস্টর থাকতে হবে?কেন কমন এনসেস্টর এর থেকে

ইভোলিউশণ এর মাধ্যমে তাদের পয়দা হতে হবে? কেন তাদের একজন কমন ক্রিয়েটর থাকতে পারবেনা?

.

==> এত এত বিজ্ঞানীর এত এত প্রমাণ তুই এভাবে ফেলে দিতে পারিস না মাহমুদ।

.

----> আদৌ প্রমাণ করতে পারলে এ না ফেলার প্রশ্ন আসতো। আর বিজ্ঞান গণতন্ত্র না। অধিকাংশ বিজ্ঞানী যখন বলছে যে পৃথিবী স্থির , সূর্য তার চারিদিকে ঘুরে, কোপার্নিকাস বলছে যে পৃথিবী স্থির না , বরং তা সূর্যের চারিদিকে ঘুরে। কিন্তু কোপার্নিকাসই ছিল সঠিক, সেটা পরে প্রমাণিত হয়েছে ।

.

মেন্ডেলিফও জেনেটিক্স এর দুইটা ল দিছিল, কিন্তু কেউ এক্সেপ্ট করে নাই। পরে মেন্ডেল মরার পর তা সত্য প্রমাণিত হইছে। তার মানে অধিকাংশ বিজ্ঞানী(৯৯.৯৯৯৯%) ও ভুল হতে পারে।

.

তাই যদি অধিকাংশ বিজ্ঞানীও ইভোলিউশন এর পক্ষে থাকে , তার থেকেও ইভোলিউশন প্রমাণিত হয়ে যায় না। পৃথিবী যে ঘুরে , এটা হল প্রমাণিত ফ্যাক্ট..... এরকম অনেক ফ্যাক্ট বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করছে, কিন্তু ইভোলিউশন -- এটা তো স্টীল থিউরী। কিছু কংকাল আর প্রাণীগুলোর মধ্যে থাকা কিছু মিল দেখিয়ে --- তা থেকে দেয়া একটা নিছক থিউরী, যা নিয়ে অনেক অনেক কোশ্চেন আছে , এবং সেইসব কোশ্চেন এর কোন প্রপার উত্তর তারা দিতে পারেনাই। এটা একটা কমপ্লিট গোঁজামিল।

.

==> কিন্তু দেখ, জিনগুলোর মধ্যে কিন্তু মিউটেশন হয়,, এটা কিন্তু প্রমাণিত সত্য।

.

---> তুই একটা টয়োটা কার কিনলী। এখন ৩ বছর চালানোর পর তোর ব্রেকপ্যাড টা নষ্ট হইলো। এইটা হইলো মিউটেশন। এখন ব্রেকপ্যাড তার অবস্থার পরিবর্তন করতে পারছে , তার মানে এইনা যে তোর 'টয়োটা কার' টা টয়োটা কোম্পানী ছাড়াই আপনা আপনি লক্ষ লক্ষ বছরের ক্রিয়া বিক্রিয়ায় তৈরী হয়ে গেছে।

.

==> তাহলে তোরা তোদের প্রপজিশন নিয়ে নেচারে পেপার পাবলিশ করছিস না কেন? প্রমাণ করছিস না কেন?

.

----> যে থিউরী দিছে, তাকে তার থিউরী প্রমাণ করতে হবে। প্রমাণ করতে না পারলে বুঝতে হবে থিউরীতে প্রবলেম আছে। তোরা থিউরী দিসছ, তোরা প্রমাণ করবি। তোরা প্রমাণ করতে পারস নাই, এটা তোদের প্রবলেম । আমরা আবার কি প্রমাণ করবো? ' কিছু একটা নাই ' তা নিয়ে তো পেপার লেখা যায় না। পেপার লেখা যায় 'কিছু একটা থাকলে'। যেটা অস্তিত্বহীন, তা নিয়ে আমরা কি পেপার লেখবো?

.

===> শুন বুঝতে চেষ্টা কর। প্রথমে খুব সরল কোষ ছিল, পরে আস্তে আস্তে জটিল হইতে হইতে , মানুষ হইয়া গেছে।

.

----> এভাবে নন স্পেসিফিকালী বললে হবে না। ডিটেইলস ইভোলিউশন প্রসেস সূক্ষাতিসূক্ষ ভাবে বর্ণনা করতে হবে।

.

গুগলে গিয়ে ইউটিউব ভিডিও দেখ যে চোখ কিভাবে দেখে বা কান কিভাবে শুনে, বা কিডনী কিভাবে রক্ত পরিষ্কার করে, বা হার্ট কিভাবে রক্ত সঞ্চালন করে -- এই ফুল প্রসেসগুলো।

.

এরপর তোকে দেখাতে হবে, যে একটা প্রাণী যার চোখ নেই, কিভাবে তার মধ্যে চোখের জিন চলে এলো এবং সেই জিন থেকে কিভাবে চোখ উৎপন্ন হল, একই ভাবে : কান কিভাবে হল, মস্তিষ্কের ডেনড্রাইট আর এক্সন কিভাবে হল। মস্তিষ্কের জিন কিভাবে

হয়ে গেল একটা এ্যামিবা জাতীয় প্রাণী থেকে.... কিভাবে শরীরের প্রতিটা অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হল। কিভাবে হাড় হল ? কিভাবে চামড়া হল? এগুলোর জিন কিভাবে তৈরী হল তা তোকে দেখাতে হবে। পারলে তা দেখিয়ে নেচারে পেপার পাবলিশ কর। দুইটা নোবেল একসাথে পাবি।

.

আরও আছে ....

.

সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়াটা মনে আছে?

.

===> আছে । খুবই জটিল। অনেক বড় প্রক্রিয়া।

.

----> এই প্রক্রিয়া গাছের পাতার মধ্যে কিভাবে এলো? এ প্রক্রিয়াটা কিভাবে র‍্যানডমলী হয়ে গেল , তা ব্যাখ্যা করতে হবে। এই প্রক্রিয়াটা গাছের পাতায় করতে হলে গাছের যেই জেনেটিকাল ফরমেশন দরকার, তা এমনে এমনে কেমনে হল, তা ব্যাখ্যা করতে হবে।

.

মনে রাখিস সালোক সংশ্লেষণ ছাড়া এই পৃথিবীতে একটা প্রাণীও বর্তমান অবস্থায় বেঁচে থাকতে পারতোনা।

.

===> আসলে এটা র‍্যানডমলী হওয়া একটু কঠিন বৈকি। স্বীকার করলো সুজন।

.

আমতা আমতা করছে সুমন । ....

.

----> লক্ষ লক্ষ মিল্কিওয়ে, তার মধ্য থেকে বিলিয়ন বিলিয়ন (বা ট্রিলিয়ন) সংখ্যক পৃথিবীতেও কি একটা ইনটেল প্রসেসর... হার্ড ডিস্ক.... র‍্যাম তৈরী হয়ে এমনি এমনি জোড়া লেগে একটা ল্যাপটপ হতে পারে?
একটা ইঞ্জিন সহ টয়োটা কার হতে পারে?
একটা স্পেসশীপ হতে পারে?
একটা এরোপ্লেন হতে পারে?
এমনি এমনি, ইভোলিউশন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে?

.

===> হবার তো কথা না.... । বললো সুমন....কেউ একজন ডিরেক্ট করতে হবে, কেউ একজন ডিজাইন করতে হবে, একমাত্র তাহলেই সম্ভব।

.

কিন্তু যারা বিজ্ঞান মনস্ক তারা যে বলেন....

.

------> আচ্ছা, মশাকে উড়তে দেখছিস, বা মাছি? দেখেছিস তারা কিভাবে উড়ে। তুই ইচ্ছামতন দুইটা পাখা দিয়ে একটা বস্তু বানালেই কিন্তু তা উড়তে পারেনা, রাইট? তোকে এরো ডাইনামিক্স বুঝতে হবে এবং কিভাবে বলবিদ্যা কাজ করবে একটা বস্তু উড়ার সময় তাও বুঝতে হবে, তারপর বস্তুটা বানাতে হবে। এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টার ইঞ্জিনিয়ার রা আগে থেকে ডিজাইন করে তারপরেই বানায় , এবং তারপরই এগুলো উড়ে।
র‍্যানডমলী দুইটা পাখা বানায় যদি উড়া যাইতো, মানুষ অনেক আগেই উড়তো। অথচ হাজার বছর চেষ্টা করেও মানুষ তা পারেনাই। কারণ ব্যাপারটা আসলেই কঠিন। দুনিয়ায় সুপার পাওয়ার ছাড়া নরমাল রাষ্ট্রগুলো তাই এরোপ্লেন-হেলিকপ্টার বানাতে

পারেনা। বরং তারা ক্রয় করে, সুপার পাওয়ার থেকে।

.

এখন দেখ , মশা, মাছি, ফড়িং, বাটার ফ্লাই, পাখি (বিভিন্ন ধরনের) -- এগুলো সবগুলোই উড়তে পারে?

.

তুই এটা কিভাবে বিশ্বাস করিস যে আপনা আপনি কোন প্রাণীতে জেনেটিকাল মিউটেশন ঘটে এমন জিনের আবির্ভাব ঘটেছে, যে থেকে র‍্যানডমলী দুইটা পাখা গজিয়েছে এবং সেই পাখা দিয়ে পাখি গুলো বা পোকামাকড় উড়ছেও। কতটা ফানি আইডিয়া তা চিন্তা করছিস? ওই পাখা গুলো কেউ খুব সূক্ষাতিসূক্ষভাবে ডিজাইন করতে হবেনা? বায়ুচাপ হিসাব করতে হবেনা? পাখাগুলো কত দ্রুত নড়বে তা হিসাব করতে হবেনা? পাখাগুলোর শেইপ ডিজাইন করতে হবেনা? পাখাগুলো কি দ্বারা তৈরী হবে তা ঠিক করতে হবেনা? ভূমি থেকে কত হাজার ফুট উপরে একটা পাখি উড়বে , তার হাড়গুলো হালকা হওয়া লাগবে, ফুসফুস ৪ প্রকোষ্ঠ বিশিষ্ট হওয়া লাগবে(যাতে কম বায়ুচাপে পাখিগুলো নি:শ্বাস নিতে পারে)

.

.... এগুলো এমনি এমনি হয়ে গেছে? একেকটা পাখি বা পোকা কিন্তু আবার একেক ভাবে উড়ে। এরোডাইনামিক্স ডিফারেন্ট...কেউ ডিজাইন করলোনা , কিন্তু এগুলো সব এমনি এমনি হয়ে গেলো? পারলে মশার দুইটা পাখা বানাতো , দেখ পারিস কিনা?

.

তুই তো ফুস ফুস দ্বারা বাতাস থেকে অক্সিজেন নিস, তাইনা? মাছ নেয় ফুলকা দিয়ে , পানি থেকে। মাছের মধ্যে ওই জিন কিভাবে তৈরী হল যা থেকে ফুলকা দিয়ে পানি থেকে অক্সিজেন নেবার প্রসেস চলে এলো? কেউ ডিজাইন করলোনা, এমনি এমনি কেমনে হল?

.

চিন্তা কর, ইভেন তোর ফুসফুসটা কিভাবে হল যা বাতাস থেকে অক্সিজেন তোর শরীরের রেড ব্লাড সেল এর মাধ্যমে নিয়ে নেয় এবং শ্বসন প্রকৃয়ার মাধ্যমে তুই শর্করাকে পুড়িয়ে শক্তি পাস। এমনি এমনি জিন পরিবর্তীত হয়ে ফুসফুস কিভাবে হল, আর রেড ব্লাড সেলই বা কিভাবে হল?

.

ইভেন তোরা প্রজনন প্রক্রিয়া নিয়ে চিন্তা কর, কিভাবে দুই ধরণের মানুষ পুরুষ ও নারী সৃষ্টি হল, এবং তাদের মধ্যে আকর্ষণ এলো এবং তারা নতুন মানুষ জন্ম দিতে পারলো? শুক্রাণু ও ডিম্বাণু কিভাবে হল? কিভাবে একটি মানব ভ্রূণ বেড়ে উঠে মায়ের জঠরে একটি সুবিন্যস্ত প্রকৃয়ায়? একটু ভুল হলেই তো মানব শিশু আর হতে পারতোনা। এই সুবিন্যস্ত প্রকৃয়া সাধনের জন্য যেই জেনেটিকাল কমপোজিশণ দরকার ছিল, সেই জেনেটিকাল কমপোজিশন কিভাবে মানুষের শরীরের কোষে এমনি এমনি হয়ে গেল?

.

কিভাবে হজম প্রক্রিয়া হল যার মাধ্যমে তুই খেয়ে হজম করিস? বৃহদ্রান্ত-ক্ষুদ্রান্ত হল? এগুলোতে থাকা এনজাইমগুলো কিভাবে হল? ওই এনজাইমগুলো তৈরী করতে যেই জিন থাকা দরকার , তা তোর শরীরে কিভাবে এমনি এমনি কেমনে হয়ে গেল?

.

এগুলো শুধু মানুষ না, সকল প্রাণীর ক্ষেত্রেই সত্য। দুনিয়ায় থাকা প্রতিটা প্রাণীর জীবন প্রণালী নিয়ে গবেষণা করে তুই এ ধরণের প্রশ্ন করতে পারবি। একটা মশা, তেলাপোকা, ঘাসফড়িং, একটা চড়ুই পাখি -- ইভেন একটা কুকুর বা বিড়াল নিয়ে গবেষণা করে তুই এইসব প্রশ্ন করতে পারবি।

.

কিভাবে ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে পচন প্রকৃয়ার এলো পৃথিবীতে, এটা না থাকলে তো মৃতদেহ সরানো যেতোনা পৃথিবীতে.... এমনি এমনি কেমনে হল? একটা কমপ্লিট সিস্টেম যে পৃথিবীতে আমরা দেখছি, তা কি একটি সুপারন্যাচারাল পাওয়ারের অস্তিত্বকে

প্রমাণ করেনা যিনি আমাদের সবার স্রষ্টা?

.

===> আসলে দেখ , এত বড় বড় বিজ্ঞানীরা নাস্তিক, আমরা কই যাই বল? একসঙ্গে বললো সুজন সুমন।

.

----> আইসিস নিয়া মিডিয়া নাচে, কারণ সে ব্যতিক্রম। কিন্তু অধিকাংশ মুসলমান আইসিস করেনা। কিন্তু মিডিয়ায় আইসিস দেখে মনে হয় যেন ১.৭ বিলিয়ন মুসলিম সবাই আইসিস। কিন্তু ৯৯.৯৯ % মুসলমানই আইসিস না।

.

এরকম এখনও আমেরিকায় কোন বিজ্ঞানী নাস্তিক হইলে তার ঘটনা পত্রিকায় আসে, কারণ অধিকাংশ বিজ্ঞানীই আস্তিক । যে নাস্তিক সে হইলো ব্যতিক্রম, ব্যতিক্রম হিসেবে তারে নিয়া মিডিয়া নাচে। তার মানে এই না যে সবাই নাস্তিক।

.

===> কিন্তু বাংলাদেশে যে দেখি? বিজ্ঞানীরা নাস্তিক।

.

----> তোরা কিসে পড়স?

===> চারুকলায়, জবাব দিল সুমন।

===>বাংলায়, জবাব দিল সুজন।

----> আমি কিসে পড়ি?

------> ফিজিক্সে... বলল মাহমুদ নিজেই

.

তাহলে চিন্তা কর , তোরা তোদের আশে পাশে সব নাস্তিক দেখিস , কারণ কারণ যারা বাংলা-চারুকলায় পড়ে তারাই এদেশে বেশী নাস্তিক। যাদের আসলে ইংরেজীতে পাবলিশ হওয়া নেচারের পেপার পড়ার যোগ্যতা নাই। দ্য সেলফিশ জীন পড়ে বুঝার যোগ্যতা নাই। বাংলার নাস্তিক কুল কেউই এসব পড়ে নাস্তিক হয়নি। কলকাতার দাদাবাবুদের বাংলা বই আর অশিক্ষিত আরজ আলী মাতুব্বরের বই পড়ে নাস্তিক ইসলাম বিদ্বেষী হয়েছে। এমন কোন জ্ঞানের দৌড় এদের নেই।

.

কিন্তু বুয়েট, মেডিকেল বা ভার্সিটিগুলোর সাইন্স ডিপার্টমেন্টে গেলেই নাস্তিক তো পাবিই না, বরং দেখবি তাদের মধ্যে হুজুর এর সংখ্যাই বেশী। তার মানে বাংলার ব্রিলিয়ান্ট ছাত্র-ছাত্রীরা নাস্তিক তো নয়ই বরং ৯৯% ই আস্তিক।

.

====> কিন্তু পেপার পত্রিকা পড়লে তো মনে হয় যে অনেক নাস্তিক।

.

----> হুম , গুড পয়েন্ট। কারণ যারা সাংবাদিক তাদের মধ্যে নাস্তিক বেশী, তারা বেসিকালী সাইন্স বুঝে না। কিন্তু ইসলাম বিজ্ঞান ময় নহে --- এই অভিযোগ তাদের বেশী। কিন্তু তারা নিজেরাই বিজ্ঞান বুঝে না্ । এরা মূলত কলকাতার প্রভাবে নাস্তিক।

.

আসলে নাস্তিকতা বাংলাদেশে মিডিয়ায় বেশী, যাদের সাইন্স সম্বন্ধে কোন ধারণা নাই। পশ্চিমা বিশ্বের একটি বিশেষ শ্রেণীকে তারা অন্ধ অনুকরণ করে থাকেন...

.

পশ্চিমা বিশ্ব বহুদিন ধরে চার্চ কর্তৃক নিষ্পেষিত হয়েছে। যার ফলে তারা ইভোলিউশন থিউরী পেয়েই চার্চকে অস্বীকার করার একটা উসিলা পেয়েছে।

.

এজন্য ইভোলিউশন থিউরী আসলে অনেকটা পলিটিকাল , সাইন্টিফিক না। কারণ পলিটিকাল লীডার রা এই থিউরী দিয়ে মানুষকে নাস্তিক বানিয়ে চার্চকে দুর্বল করতে চেয়েছে ।

.

আমাদের দেশে বা মুসলিম বিশ্বে আমরা মসজিদ কর্তৃক নিষ্পেষিত হইনি। আর আমাদের এসব মিথ্যা থিউরীর দরকারও নেই। আমরা অন্ধভাবে পশ্চিমা বিশ্বকে ফলো করিনা। আমরাই মুক্ত চিন্তা করেই আল্লাহ কে বিশ্বাস করি।

.

আর তোমরা নাস্তিকরাই বদ্ধ চিন্তা ভাবনার অধিকারী। কলকাতার চিন্তা চেতনা থেকে এখনও বের হতে পারোনি....
এমন সময় যোহরের আযান দিলো ...

.

-----> আয়, মসজিদে যাই, যোহরের সময় হল। বলল মাহমুদ...

=======> নানা, দোস আমাদের প্যান্ট নষ্ট, পরে আরেকদিন হবে। দেখি আমরা একটু চিন্তা করে নি......পরে দেখা হবে।

.

পুনশ্চ: আরিফ আজাদ ভাই কর্তৃক অনুপ্রাণিত হয়ে এই লেখাটা লিখা হয়েছে। উনাকে যে বিজ্ঞানযাত্রা রিফিউট করেছে, তা পড়েই জবাব হিসেবে এটা লিখলাম। প্রিপারেশণ ছাড়াই, তাই একটু বিক্ষিপ্ত....
ভবিষ্যতে সময় পেলে দ্য সেলফিশ জিন সহ ওদের নেচারের পেপার গুলো পড়ে তারপর নোট লিখার ইচ্ছা আছে। দোয়া করবেন।

৭৮

“কুরআনে কি Embryology (ভ্রুণতত্ত্ব) নিয়ে অবৈজ্ঞানিক তথ্য আছে?”

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক প্রশ্নঃ মুসলিমরা দাবি করে কুরআনের আয়াত 23:12-14 দ্বারা মানুষের এম্ব্রাইয়োলজি(অর্থাৎ ভ্রূণ তত্ত্ব) ব্যাখ্যা করা যায়, যদিও ভ্রুণতত্ত্বের প্রথম ধাপ (১.ধুলা বা কাদা মাটি থেকে তৈরি) এর কোন ব্যাখ্যা তাদের কাছে নেই।এটা কি জোরপূর্বক কুরআনকে বিজ্ঞানময় করার অপচেষ্টা নয়?

.

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

.

“ আমি মানুষকে মাটির সারাংশ থেকে সৃষ্টি করেছি।
অতঃপর আমি তাকে শুক্রবিন্দু রূপে এক সংরক্ষিত আধারে স্থাপন করেছি।

.

এরপর আমি শুক্রবিন্দুকে ‘আলাক’{জমাট রক্ত/ঝুলে থাকা বস্তু/জোঁক আকৃতির বস্তু}রূপে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর ‘আলাককে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি, এরপর সেই মাংসপিণ্ড থেকে অস্থি সৃষ্টি করেছি, অতঃপর অস্থিকে মাংস দ্বারা আবৃত করেছি, অবশেষে তাকে নতুন রূপে দাঁড় করিয়েছি। নিপুণতম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত কল্যাণময়।“
(কুরআন, মু’মিনুন ২৩:১২-১৪)

.

নাস্তিক-মুক্তমনাগণ প্রশ্ন তুলেছেন যে—সুরা মু’মিনুন ২৩:১২-১৪ আয়াতে ভ্রুণতত্ত্বের যে বিবরণ দেয়া আছে, তার প্রথম ধাপের ব্যাখ্যা নাকি মুসলিমদের জানা নেই। আরেকটি অপব্যাখ্যা; নিজ থেকে মুসলিমদের নামে কিছু একটা বানিয়ে বলে সেটাকেই আবার প্রশ্নবিদ্ধ করার আরেকটি উদাহরণ এটি। মুসলিমদের নিকট অবশ্যই সুরা মু’মিনুন ২৩:১২-১৪ আয়াতে উল্লেখিত প্রক্রিয়ার প্রথম ধাপের ব্যাখ্যা আছে। যে কোন মুসলিমকে জিজ্ঞেস করলেই এটা বলে দিতে পারবে, তাফসির দেখারও প্রয়োজনও নেই। এমনই সহজ ব্যাখ্যা এটি।

.

কোন মুসলিম কখনোই এটা বলে না যে উল্লেখিত আয়াতসমূহের প্রথম ধাপ অর্থাৎ মাটির সারাংশ থেকে মানুষ সৃষ্টি ভ্রুণতত্ত্বের কোন ধাপ।এখানে ‘মানুষ’ বলতে আদম(আ)কে বোঝানো হয়েছে, তাঁকে সৃষ্টি করবার প্রক্রিয়া বর্ণণা করা হয়েছে, এরপর তাঁর বংশধরদের সৃষ্টির প্রক্রিয়া আলোচিত হয়েছে।আলোচ্য আয়াতের তাফসিরে ইমাম ইবন কাসির(র) একটি হাদিস উল্লেখ করেছেনঃ

.

আবু মুসা(রা) হতে বর্ণিত আছে যে, নবী(ﷺ) বলেছেনঃ “আল্লাহ আদম(আ)কে এক মুষ্টি মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন যা তিনি পৃথিবীর বিভিন্ন যমিন হতে গ্রহণ করেছিলেন। ...”

.

[আহমাদ ৪/৪০০, আবু দাউদ ৫/৬৭, তিরমিযি ৮/২৯০; ইমাম তিরমিযি(র) এর মতে হাসান-সহীহ]

.

এবং আল্লাহ ভালো জানেন।

[কুরআনে উল্লেখিত ভ্রূণতত্ত্বের বিস্তারিত বিবরণ দেখুন এখানেঃ https://www.islam-guide.com/ch1-1-a.htm]

৭৯

‘নাসখ’ – যদি স্রষ্টা মানুষকে কিছু বলেন, তবে তাতে কি ভুল থাকা সম্ভব?

-শিহাব আহমেদ তুহিন

যদি স্রষ্টা মানুষকে কিছু বলেন - তবে তাতে কি ভুল থাকা সম্ভব?
উত্তর হচ্ছে না। সকল ধর্মের লোকেরাই এই ক্ষেত্রে একমত হবে। বিশেষ করে যারা দাবী করে তাদের কাছে কিতাব আছে (মুসলিম, ইহুদি ও খৃষ্টান সম্প্রদায়)। তারা তো সবার আগে মাথা ঝাঁকাবে।

.

এখন যদি বলা হয়- স্রষ্টা কি এমন বিধান দিতে পারেন, যা পরবর্তীতে রহিত করতে হয়? এক্ষেত্রেও আহলে কিতাবরা বলবেঃ অসম্ভব! এটাও হতে পারে না । অনেক মুসলিমও হয়তো অজ্ঞতার কারণে কিংবা মডারেট হয়ে বলবেঃ এটা সম্ভব না। যুক্তি হচ্ছে-

.

“কুর’আন অনুসারে আল্লাহ ভবিষ্যত জানেন। যদি কুর’আনের রচয়িতা আল্লাহই হন, তবে কেন তিনি এমন বিধান দিবেন যা পরবর্তীতে রহিত করতে হয়? তিনি কি জানতেন না যে তার বিধান ভবিষ্যতে অকার্যকর হয়ে পড়বে? ”

.

ইসলামী পরিভাষায় ‘রহিতকরণ’ বলতে এমন কিছুই বোঝানো হয় না।

.

.

রহিতকরণ কি?
আরবী ‘নাসখ’ শব্দের অর্থ রহিত করা। পারিভাষিকভাবেঃ নাসখ মানে সকল শর্ত পূরণ করেছে এমন কোন কর্মবিষয়ক বিধান পালনের সময়সীমার সমাপ্তি ঘোষণা করা।
অর্থাৎ, নাসখ বলতে স্রষ্টার একটি বিধান নতুন আরেকটি বিধান দ্বারা রহিত হয়ে যাওয়াকে বোঝায়।

.

.

রহিতকরণ কি সত্যিই আছে?
কুর’আন-সুন্নাহ ও সালাফদের থেকে রহিতকরণ বা ‘নাসখ’ এর বিষয়টি পরিষ্কারভাবে প্রমাণিত। আর এটা আমাদের অনেকের কমনসেন্সের সাথে না মিললেও একটু গভীরভাবে চিন্তা করলেই রহিতকরণের পিছনে প্রজ্ঞাটা ধরতে পারা যায়।

.

আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুর’আনে এ সম্পর্কে বলেনঃ
“আমি কোন আয়াত রহিত করলে অথবা বিস্মৃত করিয়ে দিলে তদপেক্ষা উত্তম অথবা তার সমপর্যায়ের আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জান না যে, আল্লাহ সব কিছুর উপর শক্তিমান?” [১]
এছাড়া সহীহ হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি, সূরা আহযাব এক সময় আকারে সূরা বাকারার মত ছিলো। পরবর্তীতে এর অধিকাংশ আয়াত রহিত করে দেয়া হয়। [২]

.

সাহাবাদের নিকট ‘রহিতকরণ’ এর জ্ঞান থাকাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, অনেক সময়ে কেউ কেউ হালাল ভেবে নিজে হারাম কাজে লিপ্ত হয়ে পড়তে পারে, আর অন্যকেও সে দিকে আমন্ত্রণ জানাতে পারে। একবার চতুর্থ খলিফা আলী(রাঃ)

একজন বিচারককে জিজ্ঞেস করলেন, তিনি মানসুখ(রহিত) আইন-কানুন সম্পর্কে বিস্তারিত জানেন কি না। বিচারক জবাব দিলেন, "না।" আলী(রাঃ) তাকে বললেন, "তুমি নিজে ধ্বংস হয়েছো আর অন্যদেরও ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছো।" [৩]

.

আমাদের সালাফরাও নাসখ নিয়ে প্রচুর বই লিখে গেছেন। সম্ভবত এর মধ্যে সর্বাধিক প্রাচীন গ্রন্থটি হলো বিখ্যাত তাবিয়ী, হাদীস বিশেষজ্ঞ কাতাদাহ ইবনু দিয়ামা'র লেখা 'আন নাসিখ ওয়াল মানসুখ ফী কিতাবিল্লাহ'। এছাড়া নাসখ নিয়ে বই লিখেছেন ইবনু হাযাম যাহিরী, মাকী ইবনু আবী তালিব, ইবনুল জাওযী প্রমুখ।

.

উল্লেখ্য যে, বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত নাসখের সংক্রান্ত ঘটনার সংখ্যা মাত্র অল্প কয়েকটি। আর সেগুলো সনাক্ত করার সুনির্দিষ্ট তিনটি পদ্ধতি রয়েছে। সেগুলো হলোঃ

ক) নবী(সাঃ) কিংবা তাঁর কোন সাহাবীর সুস্পষ্ট বক্তব্য।

.

খ) রহিতকারী ও রহিত- উভয়ের আইনের ব্যাপারে প্রথম দিকের মুসলিম বিশষজ্ঞদের পূর্ণ মতৈক্য।

.

গ) এ বিষয়ের নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক জ্ঞান যে, যে আইনটিকে রহিত করা হয়েছে সেটি রহিতকারী আইনটির পূর্বে নাযিল হয়েছে এবং তা রহিতকারী আইনটির কোন সম্পূরক বিধি নয়, বরং তার সাথে সুস্পষ্টভাবে সাংঘর্ষিক।

.

.

নাসখ কত প্রকারের হতে পারে?

.

মূলতঃ তিন ধরনের নাসখ সংঘটিত হতে পারে।

ক) কুর'আন দ্বারা কুর'আনের নাসখ। [৪]

খ) কুর'আনের মাধ্যমে সুন্নাহর নাসখ। [৫]

গ) সুন্নাহর মাধ্যমে সুন্নাহর নাসখ। [৬]

.

শুধু কুর'আনের মধ্যেই তিনটি ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে নাসখ হতে পারেঃ

ক) নতুন আইন দ্বারা পূর্বের আইনটি বাতিল হবার সাথে সাথে সংশ্লিষ্ট আয়াতের পাঠও কুর'আন থেকে সরিয়ে ফেলা হয়। [৭]

.

খ) আইনটি বলবৎ থাকে, শুধু আয়াতের তিলাওয়াত রহিত হয়ে যায়। [৮]

.

গ) আয়াতের তিলাওয়াত বহাল থাকবে, শুধু আইন রহিত হয়ে যাবে। [৯]

.

----- এখানে উল্লেখ্য যে, প্রত্যেক প্রকারের নাসখই স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার অনুমোদনেই হয়ে থাকে।

.

প্রতিস্থাপনের প্রকারভেদঃ

.

ক) আয়াতটি প্রতিস্থাপন না করেই রহিত করা। [১০]

.

খ) একটি সহজ আইনের মাধ্যমে পূর্বের কঠিনতর আইনের নাসখ। [১১]

.

গ) একই ধরনের আইনের মাধ্যমে নাসখ। [১২]

.

ঘ) একটি কঠিনতর আইনের মাধ্যমে নাসখ। [১৩]

.

.

নাসখ কেন করা হয়? এর পিছনে কি কোন প্রজ্ঞা রয়েছে?
শায়খ রাহমাতুল্লাহ কীরানবী(রহঃ) তার অনবদ্য বই 'ইযহারুল হক' এ নাসখের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেনঃ

.

"আল্লাহ জানতেন যে, এই বিধানটি অমুক সময় পর্যন্ত তার বান্দাদের মধ্যে প্রচলিত থাকবে এবং এরপর তা স্থগিত হয়ে যাবে। যখন তার জানা সময়টি এসে গেলো তখন তিনি নতুন বিধান প্রেরণ করলেন। এই নতুন বিধানের মাধ্যমে তিনি পূর্বতন বিধানের আংশিক বা সামগ্রিক পরিবর্তন সাধন করতেন। প্রকৃতপক্ষে, এ হলো পূর্বতন বিধানের কার্যকারিতার সময়সীমা জানিয়ে দেয়া। তবে যেহেতু আগের বিধানটি দেয়ার সময় এর সময়সীমা উল্লেখ করা হয়নি, সেহেতু নতুন বিধানটির আগমনকে আমরা আমাদের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার কারণে বাহ্যত 'পরিবর্তন' বলে মনে করি।

.

আল্লাহর সাথে কোন সৃষ্টির তুলনা হয় না। তাই, তুলনার জন্য নয়, শুধু বোঝার জন্য একটা উদাহারণ দেয়া যায়। আপনি আপনার একজন কর্মচারীকে একটি কর্মের দায়িত্ব প্রদান করলেন। আপনি তার অবস্থা জানেন এবং আপনার মনের মধ্যে সিদ্ধান্ত রয়েছে যে, এক বছর পর্যন্ত সে উক্ত কর্মে নিয়োজিত থাকবে। এরপর আপনি তাকে অন্য কর্মে নিয়োগ করবেন। কিন্তু আপনার এই সিদ্ধান্ত আপনি কারো কাছে প্রকাশ করেন নি। যখন নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেল তখন আপনি আপনার পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুসারে তাকে অন্য কর্মে নিয়োযিত করলেন। এই বিষয়টি উক্ত কর্মচারীর নিকট 'রহিতকরণ' বলে গণ্য। অনুরূপভাবে, অন্য সকল মানুষ যাদের নিকট আপনি আপনার সিদ্ধান্ত প্রকাশ করেওন নি, তারাও বিষয়টিকে 'পরিবর্তন' বলে গণ্য করবেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এবং আপনার কাছে বিষয়টি 'পরিবর্তন' নয়।

.

এরূপ রহিতকরণ যুক্তি বা বিবেকের দৃষ্টিতে অসম্ভব না। ঈশ্বরের ক্ষেত্রেও তা তাঁর মহত্ত্ব বা মর্যাদার পরিপন্থী নয়।

.

পাঠক কি দেখেন না যে, ভালো ডাক্তার রোগীর অবস্থার প্রেক্ষিতে তার ঔষধ পরিবর্তন করেন। তিনি সর্বদা রোগীর জন্য সর্বোত্তম ব্যবস্থা প্রদানের চেষ্টা করেন। কেউই তার এই বিধানকে অজ্ঞতা বা মূর্খতা বলে গণ্য করেন না। কাজেই অনাদি-অনন্ত জ্ঞানের অধিকারী সর্বজ্ঞানী মহান স্রষ্টার এইরূপ প্রজ্ঞাময় পরিবর্তনকে আমরা কিভাবে অজ্ঞতা বলে অপব্যাখ্যা দিতে পারি? [১৪]

.

ড. বিলাল ফিলিপ্স তার বইয়ে নাসখের তিনটি মৌলিক কারণ উল্লেখ করেছেনঃ

.

১) আসমানী আইনসমূহকে ধীরে ধীরে পূর্ণতার স্তরে নিয়ে যাওয়া।

.

২) ঈমানদারদের পরিক্ষা করা। কখনো তাদের একটি আইন মানতে বলা হয় আর কিছু কিছু জায়গায় তাদের সে আইন মানতে বারণ করা হয়। এভাবে পরিক্ষা করা হয়, ঈমানদাররা সবসময় আল্লাহর আইন মানতে কতটুকু প্রস্তুত।

.

৩) কখনো কঠিন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে ঈমানদারদের পুরস্কার অর্জনের সুযোগ করে দেয়া হয়। কারণ- কাঠিন্য যত বেশী, পুরস্কারও বেশী। আবার সহজ আইন প্রণয়ন করে ঈমানদারদের একটু বিশ্রাম প্রদান করে এ বিষয়টি স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়,

আল্লাহ মূলত তাদের কল্যাণই কামনা করেন। [১৫]

.

.

যেসব বিষয় রহিত হয় নাঃ

.

রহিত হবার বিষয়টা নিয়ে তখনই আপত্তি তোলা যেতে পারে, যখন একই কিতাবের কোন কাহিনী, ঘটনা এবং ভবিষ্যৎবাণী সেই কিতাবেই রহিত করা হয়। আমরা মানুষেরা এটা প্রায়ই করি। নিজেদের লেখা বইয়ে কোন তথ্যের ভুল থাকলে তা সংশোধন করি। কিন্তু স্রষ্টার পক্ষে ভুল তথ্য দেয়া অশোভন। কুর'আন তথ্যের ও ভবিষ্যৎবাণীর রহিতকরণ না করে হুকুমের রহিতকরণ করে আমাদের আরো পরিষ্কারভাবে বুঝিয়ে দিয়েছে এটা মানুষের তৈরি কোন বই নয়।

.

অনেকে দাবী করেন, বাইবেলের নতুন ও পুরাতন নিয়মের কাহিনী কুর'আন দ্বারা রহিত হয়ে গেছে। ব্যাপারটা মোটেও সেরকম নয়। তাছাড়া বাইবেলের মধ্যে অনেক মিথ্যা কাহিনী রয়েছে। যেমনঃ

.

* লূত(আঃ) মদ খেয়ে মাতাল হন এবং তাঁর দুই মেয়ের সাথে পর পর দুই রাতে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ফলে তাঁর দুই মেয়ে পিতার দ্বারা গর্ভবতী হয়। [১৬]

.

* দাউদ(আঃ) দূর থেকে উরিয়র স্ত্রী বাতসেবাকে নগ্ন অবস্থায় গোসল করতে তাকে প্রাসাদে ডেকে পাঠান এবং বাতসেবার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। ফলে বাতসেবা গর্ভবতী হয়। বিপদ বুঝতে পেরে, তিনি সেনাপতিকে পরামর্শ দেন কৌশলে যুদ্ধের মাঠে উরিয়কে হত্যা করার জন্য। এভাবে উরিয় নিহত হন আর দাউদ(আঃ) বাতসেবাকে ভোগ করেন। [১৭]

.

* সুলাইমান(আঃ) শেষ বয়সে মেয়েলোকের পাল্লায় পরে ধর্মত্যাগ করে মুরতাদ হয়ে যান। তিনি মূর্তিপূজা শুরু করেন। [১৮]

.

* হারুন(আঃ) একটি বাছুরের মূর্তি তৈরি করেন এবং এর উপাসনা করা শুরু করেন। শুধু তাই না, তিনি বনী ইসরাইলকে এই বাছুরকে উপাসনা করার নির্দেশ ও দেন। [১৯]

.

আমরা বিশ্বাস করি, সকল নবীই নিষ্পাপ। তাই এই কাহিনীগুলো মিথ্যা ও বাতিল। আমরা বলি না যে, এগুলো রহিত। কারণ, রহিত তো কেবল সত্য কিছুই হয়ে থাকে।

.

.

রহিতকরণ কি কেবল কুর'আনেই আছে?

.

আগেই উল্লেখ করেছি, ইহুদি ও খৃষ্টানরা এটা বিশ্বাস করতে পারে না যে, স্রষ্টার অভিধানে 'রহিত' শব্দটি থাকতে পারে। যদিও তাদের বাইবেলে প্রচুর 'রহিতকরণ' এর ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়। কয়েকটি উল্লেখ করছিঃ

.

* বিকৃত বাইবেল অনুসারে, ইব্রাহীম(আঃ) এর স্ত্রী সারা তাঁর সৎ-বোন ছিলেন । যার অর্থ, ইব্রাহীম(আঃ) এর জন্য নিজের সৎ-বোনকে বিয়ে করা বৈধ ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে আমরা দেখতে পাই, তোরাহ তে সৎ-বোনকে বিয়ে করার বিধান নিষিদ্ধ করা হয়। [২০]

.

* বিকৃত বাইবেল অনুসারে, মূসা(আঃ) এর শরীয়াতে, যে কোন কারণে একজন স্বামী তাঁর স্ত্রীকে তালাক দিতে পারেন। স্ত্রী ঘর থেকে বের হয়ে গেলে অন্য পুরুষ তাকে বিয়ে করতে পারেন। যিশু খ্রিষ্ট ব্যভিচারের কারণ ছাড়া তালাক দেয়া রহিত করেন। আর যে এমন তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীকে বিয়ে করবে তাকেও ব্যভিচারী হিসেবে সাব্যস্ত করেন। [২১]

.

* বিকৃত বাইবেল অনুসারে, শনিবার(সাবাত) কে সম্মান করে সকল প্রকার কাজ থেকে বিরত থাকা মূসা(আঃ) এর ব্যবস্থায় একটি অলঙ্ঘনীয় চিরস্থায়ী বিধান। কিন্তু বাইবেলেই আমরা দেখতে পাই, যিশু খৃষ্ট বারবার এই আইন ভঙ্গ করছেন[২২]।

.

বর্তমানেও খৃষ্টানরা বাইবেলের এই বিধান পালন করে না। অথচ তাদের অনেক স্কলারই দাবী করে, পুরো বাইবেলই ঈশ্বরপ্রদত্ত আর সেখানে কোন রহিত হবার বিধান নেই।

.

তারা কি জানেন, এই বাইবেল অনুসারেই চিরস্থায়ী 'সাবাত' ভঙ্গ করার কারণে তাদের সবার শাস্তি মৃত্যুদণ্ড হওয়া উচিৎ? কারণ, বাইবেল পড়লে জানা যায়, শনিবারের দিনে শুধু কাঠ কুড়ানোর অপরাধে এক লোককে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করা হয়েছিলো। [২৩]

.

* বিকৃত ইঞ্জিলেই এক বিধান কর্তৃক আরেক বিধান রহিত হবার প্রমাণ মেলে। মথি লিখিত সুসমাচারে যিশু তার শিষ্যদেরকে জেন্টাইল(যারা ইহুদী নয়) দের কাছে যেতে নিষেধ করেন। তিনি আরো বলেন, বনী-ইসরাইল ছাড়া তিনি আর কারো কাছে প্রেরিত হননি। জেন্টাইলদের তিনি 'কুকুর' বলে সম্বোধন করেছেন। আবার অন্য গস্পেল পড়লে জানা যায়, সেই তিনিই সকল সৃষ্টির নিকট তাঁর সুসমাচারগুলো প্রচার করতে বলছেন। [২৪]

.

* " নিশ্চয়ই জান্নাত রয়েছে তরবারির ছায়াতলে" – রাসূল(সাঃ) এর এই হাদিসকে অনেক খৃষ্টান স্কলার ব্যঙ্গ করে থাকেন। অথচ বাইবেল অনুসারে, যিশু খৃষ্ট বলেছেন, "একথা ভেবো না যে আমি পৃথিবীতে শান্তি দিতে এসেছি। আমি শান্তি দিতে আসি নি কিন্তু তরবারি দিতে এসেছি।"
আবার সেই তিনিই ইহুদিদের হাতে বন্দী হবার প্রাক্কালে তাঁর সাথী পিতরকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "যারা তরবারি চালায়, তারা তরবারিতেই মারা পড়ে।" [২৫]

.

সুতরাং, শুধু কুর'আনেই নয় বরং পূর্ববর্তী কিতাবগুলো বিকৃত হওয়ার পরেও তাতে অনেকগুলো রহিত বিধান রয়েছে। সমস্যা হচ্ছে, যে চোখ দিয়ে ইহুদি ও খৃষ্টানরা কুর'আনকে দেখে সেই একই চোখে তারা বাইবেলকে দেখে না।

.

.

আমাদের বর্তমান প্রজন্মের একটি মূল সমস্যা হচ্ছে, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল(সাঃ) এর প্রতি ঈমান আনার দাবী করার পরেও ইসলাম বিদ্বেষীদের কিছু সাধারণ ছোড়া প্রশ্নে আমরা সংশয়বাদী হয়ে যাই। আমরা দাবী করিঃ আল্লাহতায়ালা পবিত্র কুর'আনে আমাদের আকল ব্যবহার করতে বলেছেন।

.

হ্যাঁ, এটা সত্যি যে, আল্লাহ আমাদেরকে আকল ব্যবহার করতে বলেছেন, চিন্তা করতে বলেছেন। কিন্তু তিনি আমাদেরকে আমাদের আকলের পূজা করতে বলেননি।

.

আমরা অবশ্যই সত্যকে জানার চেষ্টা করব। কিন্তু যিনি মহাবিশ্বের সবকিছু জানেন তাঁর জ্ঞানের সাথে আমাদের আকলের সবকিছু সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে এমনটা ভাবাই বা কতটুকু বুদ্ধিমানের কাজ?

.

শান্তি তাদের উপর বর্ষিত হোক যারা হেদায়েতের উপর চলে।

.

“আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন তিনিই সে সম্পর্কে ভাল জানেন, যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত উপস্থিত করি তখন এরা বলে, ‘তুমি নিজেই এ কুর’আনের রচয়িতা’; আসলে এদের অধিকাংশই প্রকৃত সত্য জানে না।” [আল কুর’আন- সূরা নাহল, আয়াতঃ ১০১]

তথ্যসূত্রঃ

১। আল কুর’আন- সূরা আল বাকারাহঃ ১০৬

২। আবু দাউদঃ হাদীস নংঃ ৫৪০

৩। আল ইতকানঃ জালালুদ্দিন সূয়তী- খন্ড ৩, পৃষ্ঠাঃ ৫৯

৪। সূরা নিসার ১৫ নং আয়াতের বিধান রহিত হয়েছে সূরা আন-নূরের ২নং আয়াতের মাধ্যমে ।

৫। আশুরার আবশ্যিক রোযা রহিত হয় কুর’আনের রোযার বিধানের মাধ্যমে।

৬। রান্না করা খাবার খাওয়ার পর অযু করার বিধান পরবর্তীতে সহীহ হাদীস দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

৭। সহীহ মুসলিম, খণ্ড ২, হাদীস নং ৩৪২১

৮। সহীহ মুসলিম, খণ্ড ৩, হাদীস নং ৪১৯৪

৯। সূরা আল বাকারাহ’র ২৪০ নং আয়াতটি রহিত হয় ২৩৪ নং আয়াতের মাধ্যমে।

১০। সূরা আল মুজদালাহ এর ১২ নং আয়াত রহিত হয় ১৩ নং আয়াতের মাধ্যমে।

১১। রোযা রাখার সময় রাতের বেলা পানাহার না করার বিধান রহিত হয় সূরা আল বাকারার ১৮৭ নং আয়াতের মাধ্যমে।

১২। মাসজিদুল আক্বসা থেকে মাসজিদুল হারামে কিবলা বদলানো।

১৩। রোযার পরিবর্তে ফিদইয়া এর বিধান রহিত করে শারীরিক ভাবে সক্ষম সকল ব্যক্তির জন্য রোযা ফরজ করে দেয়া।

১৪। ইযহারুল হক- আল্লামা রাহমাতুল্লাহ কীরানবী, পৃষ্ঠাঃ ৪৬৭-৪৬৮

১৫। কুরআন বোঝার মূলনীতি- ডা.বিলাল ফিলিপ্স, পৃষ্ঠাঃ ২২৮-২২৯

১৬। Holy Bible, Genesis- chapter:19, verse:30-38

১৭। Holy Bible, 2 Samuel- chapter:1, verse: 1-27

১৮। Holy Bible, 1 kings- chapter 11, verse: 1-13

১৯। Holy Bible, Exodus- chapter 32, verse: 1-35

২০। Holy Bible, Genesis- chapter 20, verse-12 কে রহিত করছে Leviticus- chapter 18, verse 9

২১। Holy Bible, Deuteronomy- chapter 24, verse:1-2 কে রহিত করছে Gospel of Matthew, Chapter 5, verse: 31-32

২২। Holy Bible, Exodus- chapter 35, verse: 2-3 কে রহিত করছে Gospel of John-chapter 5, verse 16

২৩। Holy Bible, Numbers-chapter 15, verse: 32-36

২৪। Holy Bible, Gospel of Matthew- chapter 15, verse: 24-26 কে রহিত করছে Gospel of Mark- chapter 16

২৫। Holy Bible, Gospel of Matthew- chapter 10, verse: 34 কে রহিত করছে Gospel of Matthew- chapter 26, verse: 52

৮০

“কুরআনে কি পর্বতরাজি সম্পর্কে অবৈজ্ঞানিক তথ্য আছে?”

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্নঃ পর্বতরাজি কি আসলেই ভুমিকম্প প্রতিরোধ করে বা পৃথিবীকে কম্পন থেকে রক্ষা করে (Quran 16:15, 21:31, 31:10, 79: 32-33) ? তবে বিজ্ঞান কেন ভিন্ন কথা বলে?
কুরান অনুসারে, আল্লাহ পৃথিবীর ওপর পর্বতরাজিকে স্থাপন করেছেন বা পেরেকের মত গুজে দিয়েছেন (Quran 16:15, 15:19, 41:10, 50:7, 78:6-7) ! কিন্তু বিজ্ঞান কেন বলে পর্বত তৈরি হয় lithospheric plate এর গতির ফলে?

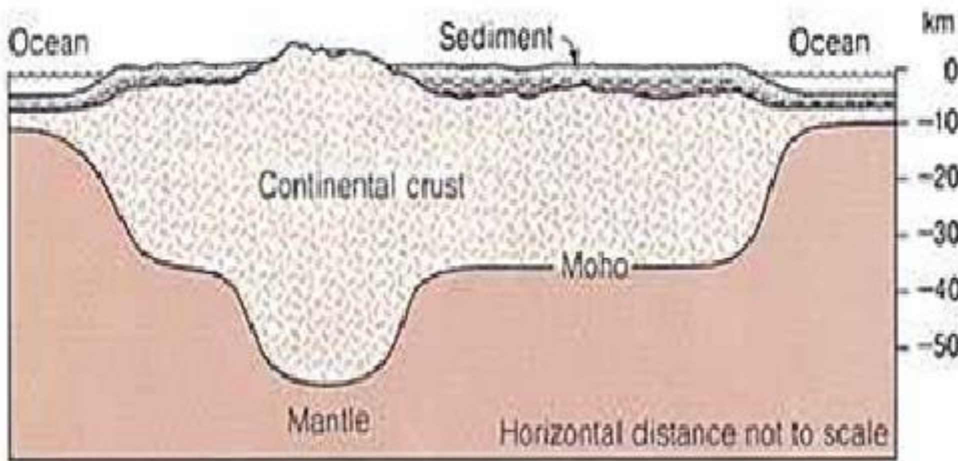
.

উত্তরঃ একটি বই, নাম তার Earth (পৃথিবী)। বইটি পৃথিবীর বহু বিশ্ববিদ্যালয়ের মৌলিক রেফারেন্স হিসেবে স্বীকৃত। “প্রফেসর ফ্রাঙ্ক প্রেস” বইটির রচয়িতাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের বিজ্ঞান-বিষয়ক উপদেষ্টা। পরবর্তীতে ১২ বছর তিনি ছিলেন ওয়াশিংটনের জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমি প্রধানের দায়িত্বে। এই গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, পাহাড়ের নিচে শিকড় রয়েছে।
[Earth, Press and Siever, পৃ. ৪৩৫. আরও দেখুন, Earth Science, Tarbuck, and Lutgens, পৃ. ১৫৭।]

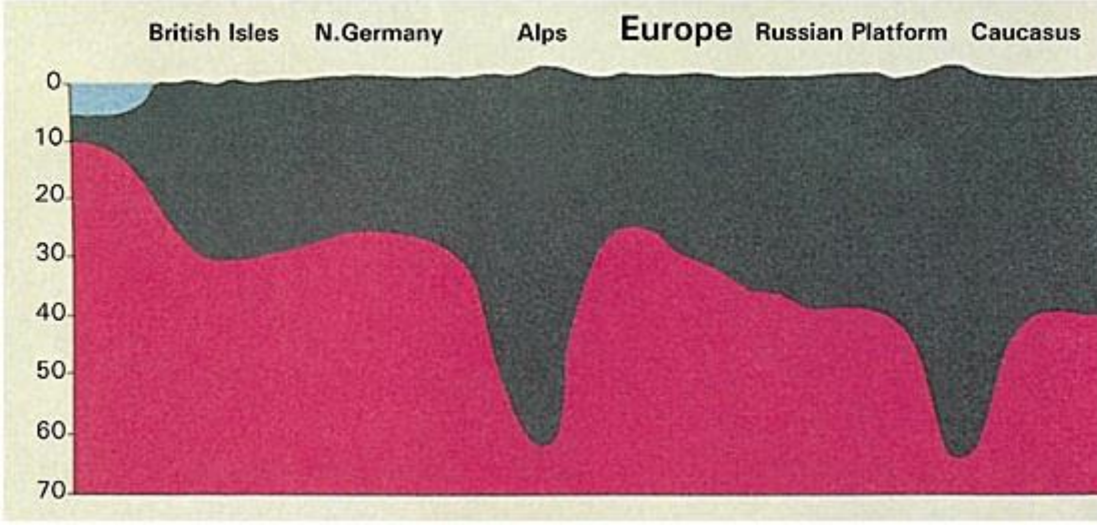
.

আর শিকড়গুলো মাটির অত্যন্ত গভীর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই শিকড়গুলো দেখতে অনেকটা পেরেকের মতই।

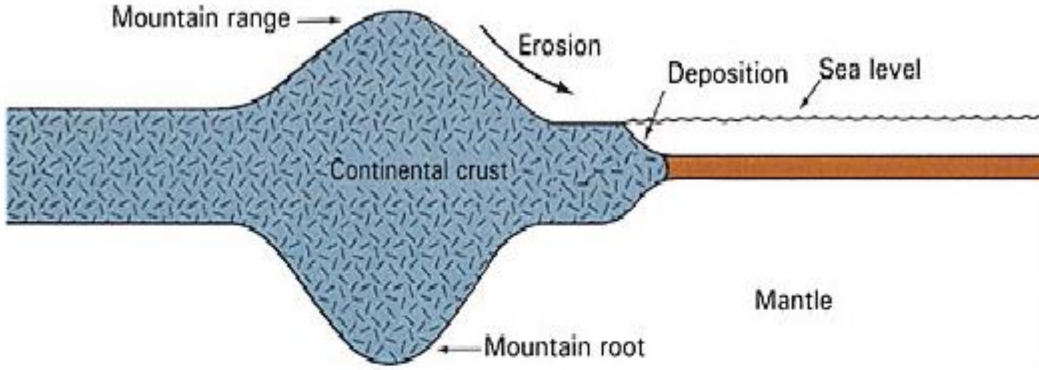
দেখুন: ১,২,৩ নং চিত্র।



. চিত্র-১ : এখানে চিত্রে দেখা যাচ্ছে মাটির নিচে পাহাড়ের গভীর শিকড় বিদ্যমান। (Earth, প্রেস ও সিফার:৪১৩ পৃষ্ঠা)



চিত্র-২: চিত্রে পাহাড়কে পেরেকের মত দেখা যাচ্ছে মাটির গভীরে যার রয়েছে প্রোথিত শিকড়। (Anatomy of the Earth, ২২০ পৃষ্ঠা)



চিত্র-৩: মাটির ভিতর গভীর শিকড় থাকার কারণে পাহাড় কিভাবে পেরেকের মত রূপ নিয়েছে চিত্রটি তা ব্যাখ্যা করছে। (Earth Science, Tarbuck and Lutgens)

এভাবেই আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে পাহাড়ের কথা বর্ণনা করেছেন। আল্লাহ বলেন:

.

অর্থাৎ "আমি কি জমিনকে বিছানা এবং পাহাড়কে পেরেকের মত করি নি?"
(আল-কুরআন, সূরা আন-নাবা: ৬-৭)

.

আধুনিক ভূ-তত্ত্ব বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, জমিনের নিচে পাহাড়ের রয়েছে গভীর শিকড়। (৩ নং চিত্র দেখুন) সে শিকড়গুলো সমতল ভূমি থেকে পাহাড়ের যে উচ্চতা তার কয়েকগুণ পর্যন্ত হতে পারে।
[The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, আল-নাজ্জার, পৃষ্ঠা-৫।]

.

তাই, পাহাড়ের গুণাবলি বর্ণনা করতে গিয়ে "পেরেক" শব্দ ব্যবহার করাই উত্তম। কারণ, পেরেকের প্রায় সবটুকুই জমিনের ভিতর লুকিয়ে থাকে। বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায় যে, পাহাড়ের এ পেরেক সংক্রান্ত তথ্যগুলো ১৮৬৫ সালে জ্যোতির্বিদ "স্যার জর্জ আইরি" র মাধ্যমে সর্বপ্রথম জানা গেছে। [Earth, Press and Siever, p. 435. আরও দেখুন, The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, p. 5.]

.
ভূ-পৃষ্ঠকে স্থির রাখার পিছনে পাহাড়ের উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে। পাহাড় ভূ-কম্পন রোধে ভূমিকা রাখে।
[The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, p. 44-45.]

.

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

.

অর্থাৎ "আর তিনি পৃথিবীর উপর সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যেন কখনো তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরি করেছেন যাতে তোমরা সঠিক পথ প্রদর্শিত হতে পার।" (আল-কুরআন, সূরা আন-নাহল: ১৫)

.

সম্প্রতি টেকটোনিক প্লেট (Tectonic plate) গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পাহাড় পৃথিবীকে স্থির রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এই ধারণাটা মাত্রই বিংশ শতাব্দীর ৬০-এর দশকে টেকটোনিক প্লেটের (Tectonic plate) উপর গবেষণার আগে জানা যায় নি।
[The Geological Concept of Mountains in the Qur'an, p. 5.]

.

মুহাম্মদ(ﷺ) এর যুগে কোনো ব্যক্তির পক্ষে কি সম্ভব ছিল পাহাড়ের গঠন সম্বন্ধে জানার?! কারও পক্ষে কি এটা কল্পনা করা সম্ভব ছিল যে, তাদের চোখের সম্মুখস্থ সুদৃঢ় এ পাহাড় মাটির গভীর পর্যন্ত তার শিকড় বিস্তৃত করে রেখেছে? পাহাড়ের গভীর শিকড় রয়েছে তা আজকের বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছে। আজকের ভূ-তত্ত্ব প্রমাণ করেছে যে, কুরআনে বর্ণিত উক্ত বিষয় সত্য।

.

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নাস্তিক-মুক্তমনারা যে তথ্যকে "বৈজ্ঞানিক ভুল"(!) বলার চেষ্টা করেছে তা আসলে কুরআনের বৈজ্ঞানিক মিরাকল।
এবং আল্লাহ ভালো জানেন।

.

[কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ ইসলামের সচিত্র গাইড; মূলঃ আই. এ. ইবরাহীম; বঙ্গানুবাদ: মুহাম্মদ ইসমাইল জাবীহুল্লাহ । ডাউনলোড লিঙ্কঃ goo.gl/OiwRI0]

৮১

কুরআনের কিছু আয়াত কি আসলেই বকরীতে খেয়ে ফেলেছিল? – ১

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

সুনান ইবন মাজাহতে বর্ণিত একটি রেওয়ায়েত ব্যবহার করে খ্রিষ্টান মিশনারী ও নাস্তিক-মুক্তমনারা দাবি করতে চায় যেঃ কুরআনের কিছু আয়াত চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে কেননা সেগুলো যে পৃষ্ঠায় লেখা ছিল, সেটিকে একটি বকরী খেয়ে ফেলেছিল। কুরআনের সংরক্ষণকে প্রশ্নবিদ্ধ করে ইসলামবিরোধীরা যেসব (অপ)যুক্তি দাঁড় করায়, তার মধ্যে অন্যতম বিখ্যাত(অথবা কুখ্যাত) যুক্তি এটি। এই নোটে সেই রেওয়ায়েতটিকে বিশ্লেষণ করে সত্য উন্মোচন করা হবে ইন শা আল্লাহ।

.

ইবন মাজাহ এর রেওয়ায়েতটি হচ্ছেঃ

.

আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, "রজমের ও বয়স্কদের দশ ঢোক দুধপানের আয়াত নাযিল হয়েছিল এবং সেগুলো একটি সহীফায় (লিখিত) আমার খাটের নিচে সংরক্ষিত ছিল। যখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ইন্তিকাল করেন এবং আমরা তাঁর ইন্তিকালে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লাম, তখন একটি বকরী এসে তা খেয়ে ফেলে।" [সুনান ইবন মাজাহ, হাদিস নং ১৯৪৪]

.

রেওয়ায়েতটির বিশুদ্ধতা কতটুকুঃ

.

কোন দাবি পেশ করতে হলে সবার আগে যাচাই করা জরুরী যে এর দলিল হিসাবে পেশকৃত রেওয়ায়েতের বিশুদ্ধতা কতটুকু।

.

মুহাদ্দিসদের মতে রেওয়ায়েতটিতে কিছু সমস্যা আছে।এই রেওয়ায়েতের একজন বর্ণাকারী মুহাম্মাদ বিন ইসহাক এটি বর্ণণা করছেন عن(থেকে) শব্দ ব্যবহার করে যে কারণে বর্ণণাটি যঈফ(দুর্বল) হয়ে গেছে।কেননা তিনি একজন তাদলিসকারী। {{যেসব বর্ণণাকারী তাদের ঊর্ধ্বতর বর্ণণাকারীর পরিচয়ের ব্যাপারে ভুল তথ্য দেন তাদেরকে তাদলিসকারী বলা হয়। তাদলিসের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ http://www.islamic-awareness.org/Hadith/Ulum/asb4.html}} [মুফতি তাকি উসমানী, 'তাকমালা ফাতহুল মুলহিম' ১/৬৯, দারুল আহইয়া আত তুরাছুল 'আরাবী, বৈরুত]

.

মুসনাদ আহমাদেও একই রেওয়ায়েত পাওয়া যায়। শায়খ শু'আইব আরনাউত(র) তাঁর মুসনাদ আহমাদের তাহকিকে একে যঈফ(দুর্বল) বলে মন্তব্য করেছেন। [দেখুনঃ মুসনাদ আহমাদ ৬/২৬৯, হাদিস নং ২৬৩৫৯]

.

এই সনদ কোন উপায়েই কুরআনের বিশুদ্ধতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে নাঃ

.

এই রেওয়ায়েতটি যদি সহীহও হত, তাহলেও এ দ্বারা প্রমাণ হত না যে কুরআন সংরক্ষিত নেই।

.

কারণঃ

.

১। এই রেওয়ায়েত অনুসারে দাবিকৃত 'হারিয়ে যাওয়া' আয়াত দু'টির ১টি আয়াত ছিল রজমের ব্যাপারে। {{বিবাহিত পুরুষ কিংবা মহিলা ব্যাভিচার করলে তাদেরকে পাথর নিক্ষেপে মৃত্যুদণ্ড প্রদানকে 'রজম' বলে।}}

.

কিন্তু অন্য একাধিক বর্ণণাতে আমরা দেখি যে, রজমের ব্যাপারে হুকুম নাজিল হয়েছিল কিন্তু নবী(ﷺ) সেটিকে কুরআনের অংশ হিসাবে লিপিবিদ্ধ করতে নিষেধ করেছিলেন।এ থেকে বোঝা যায় যে এটি কুরআনের অবিচ্ছেদ্য কোন অংশ ছিল না।

.

বর্ণণাগুলো নিম্নরূপ—

.

ক) কাসির বিন সালত থেকে বর্ণিতঃ যাঈদ(বিন সাবিত) বলেনঃ আমি রাসুলুল্লাহ(ﷺ) কে বলতে শুনেছি যে, "যখন কোন বিবাহিত পুরুষ অথবা মহিলা ব্যাভিচার করে, তাদের উভয়কে রজম কর।"

.

(এটি শুনে)আমর বলেন, "যখন এটি নাজিল হয়েছিল, আমি নবী(ﷺ) এর নিকট আসলাম এবং এটি লিপিবদ্ধ করব কিনা তা জানতে চাইলাম। তিনি{নবী(ﷺ)} তা অপছন্দ করলেন।" [মুসতাদরাক আল হাকিম, হাদিস ৮১৮৪; ইমাম হাকিম(র) একে সহীহ বলেছেন]

.

খ) এই আয়াতের ব্যাপারে কাসির বিন সালত বলেনঃ তিনি(কাসির), যাঈদ বিন সাবিত ও মারওয়ান বিন হাকাম আলোচনা করছিলেন কেন একে কুরআনের মুসহাফসমূহে লিপিবদ্ধ করা হয়নি।উমার বিন খাত্তাব(রা) তাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তাদের আলোচনা শুনছিলেন।তিনি বললেন যে তিনি এ ব্যাপারে তাদের থেকে ভালো জানেন।তিনি তাদের বললেন যে তিনি{উমার(রা)} রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর নিকট গিয়েছিলেন এবং জিজ্ঞেস করেছিলেন-

.

"হে আল্লাহর রাসুল, আমাকে রজমের আয়াতটি লিখে দেওয়া হোক।তিনি{রাসুলুল্লাহ(ﷺ)} বললেন, আমি তা করতে পারব না।"

[সুনানুল কুবরা বাইহাকী ৮/২১১ এবং সুনানুল কুবরা নাসাঈ হাদিস নং ৭১৪৮। আলবানী(র)এর মতে সহীহ]

.

যদি আলোচ্য আয়াত স্থায়ীভাবে কুরআনের অংশ হিসাবে নাজিল হত, তাহলে কেন রাসুলুল্লাহ(ﷺ) তা লিখিয়ে দিতে বললেন না? এ থেকে বোঝা যাচ্ছে এটি ছিল সেই সমস্ত মানসুখ বা রহিত আয়াতের একটি যা কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অস্থায়ীভাবে নাজিল হয়েছিল। এটি রহিত হয়েছে, যা স্বয়ং আল্লাহর রাসুল(ﷺ) দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে। কাজেই সাহাবীগণ বা উম্মুল মু'মিনীনগণ এই আয়াত 'হারিয়ে ফেলেছেন' তা নিতান্তই অসার কথা।

.

(ইন শা আল্লাহ আগামী পর্বে সমাপ্য)

৮২

কুরআনের কিছু আয়াত কি আসলেই বকরীতে খেয়ে ফেলেছিল? – ২

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

[প্রথম পর্বের জন্য দেখুন (#সত্যকথন) ৮১]

.

দ্বিতীয় যে আয়াত “হারিয়ে গেছে” বলে দাবি করা হয়, সেটি বয়স্কদের দশ ঢোক দুধপান সংক্রান্ত।কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটিও মানসুখ বা রহিত আয়াত।সহীহ মুসলিমে এ সংক্রান্ত একটি বর্ণণা নিম্নরূপঃ

.

আয়িশা(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরআনে নাযিল হয়েছিল যে, দশবার দুধপানে বিবাহ হারাম হওয়া/মাহরাম হওয়া সাবিত হয়। তারপর তা পাঁচবার দুধপান দ্বারা রহিত হয়ে যায়।তারপর রাসুলুল্লাহ(ﷺ) ইন্তিকাল করেন আর সেগুলো তো কুরআনের আয়াত হিসাবে তিলাওয়াত করা হত।”
[সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৬৩৪]

.

পাঁচবার দুধপানের বিধানটিও একটি মানসুখ বা রহিত বিধান।এ ব্যাপারে স্বয়ং উম্মুল মু’মিনিন(রা)গণ থেকে একটি বর্ণণা রয়েছে।

“ সাহলা বিনত সুহাইল(রা) ছিলেন আমির ইবনে লুয়াই গোত্রের,তিনি রাসুল(ﷺ) এর কাছে আসলেন এবং বললেন, হে আল্লাহর রাসুল, সালিমকে আমরা পুত্ররূপে গ্রহন করেছিলাম। সে আমার কক্ষে প্রবেশ করে এই অবস্থায় যখন আমি একটি কাপড় পরিধান করে থাকি(অর্থ্যাৎ মাথা খালি থাকে)। আর আমার ঘরও মাত্র একটি। এ ব্যাপারে আপনার মতামত কী?
তখন রাসুল(ﷺ) বললেন এ বিষয়ে আমাদের কথা হল তাকে পাঁচবার দুধপান করাও।

.

... ...

... নবী(ﷺ) এর অন্যান্য সহধর্মিণী এই প্রকার দুধপানের দ্বারা কোন পুরুষের তাদের নিকট প্রবেশ করাতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতেন। তারা বলতেন(আয়শা(রা) কে উদ্দেশ্য করে) আল্লাহর কসম, আমরা মনে করি রাসুল (ﷺ) সাহলা বিনতে সুহেইল (রা) কে যে অনুমতি দিয়েছিলেন তা কেবলমাত্র সালিম (রা) এর জন্য রাসুল (ﷺ) এর পক্ষ থেকে রুখসত ছিল। কসম আল্লাহর, এইরূপ দুধপান করানোর দ্বারা কেউ আমাদের নিকট প্রবেশ করতে পারবেনা। নবী করীম(ﷺ) এর সকল সহধর্মিণী এই মতের উপর অটল ছিলেন। ” [সুনান আবু দাউদ, অনুচ্ছেদ ১০৪, হাদিস ২০৫৭]

.

এই বিবরণগুলো দ্বারা স্পষ্টভাবে বোঝা যাচ্ছে যে পাঁচবার ও দশবার দুধপানের বিধান রহিত হয়েছিল।

.

কুরআনের মানসুখ বা রহিত আয়াতগুলো সম্পর্কে ইসলাম বিরোধীদের জবাবঃ--goo.gl/VvUwbP

.

এছাড়া উল্লেখ্য যে - যতদিন ধরে কুরআন সংকলন হয়েছে, আয়িশা(রা) তাঁর পূর্ণ সময় জীবিত ছিলেন। আবু বকর(রা) কর্তৃক সংকলন ও উসমান(রা) কর্তৃক সংকলন উভয় সময়েই আয়িশা(রা)কে একজন গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদানকারী ছিলেন। বিশেষত উসমান(রা) কর্তৃক কুরআন সংকলনের সময়ে আয়িশা(রা) এর নিকট থেকে সংকলনকর্ম যাচাই করা হত। [দেখুনঃ তারিখুল মাদিনাহ, ইবন শাব্বা; পৃষ্ঠা ৯৯৭]

.

যদি সত্যি সত্যিই কুরআনের আয়াত হারিয়ে যাবার মত এমন মহা দুর্ঘটনা ঘটতো (!!), তাহলে আয়িশা (রা) অবশ্যই সে ব্যাপারে সাহাবীগণের (রাঃ) দৃষ্টি আকর্ষণ করতেন। সে সময়ে প্রচুর পরিমাণে হাফিজ সাহাবী জীবিত ছিলেন যাঁরা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর কাছ থেকে কুরআন শিখেছেন। কিন্তু আয়িশা(রা) কখনোই এমন কিছু করেননি।

.

আর যদি এমনও হয়ে থাকে যে—কুরআনের কিছু আয়াত আসলেই আয়িশা(রা) এর খাটের নিচ থেকে বকরীতে খেয়ে ফেলেছিল এবং আয়িশা(রা) সে ব্যাপারে কোন সাহাবীরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেননি বরং চেপে গিয়েছেন, (নাউযুবিল্লাহ) [এমন ষড়যন্ত্র তত্ত্ব কোন কোন খ্রিষ্টান মিশনারী প্রচার করে থাকেন] তাহলেও এর দ্বারা "কুরআনের কিছু আয়াত হারিয়ে গেছে" এই তত্ত্ব প্রমাণ করা সম্ভব না। কারণ—কুরআন মূলতই লিখিত বই নয় বরং অগণিত মানুষের মুখস্থ বই। অবতরণের পর থেকেই মুহাম্মাদ(ﷺ) ও সাহাবীগণ তা মুখস্থ করেছেন। মুহাম্মাদ(ﷺ) রমজান মাসের শুরু থেকে তাহাজ্জুদে, তারাবীহে ও তিলাওয়াতে অগণিতবার খতম করেছেন। সকল যুগেই একই অবস্থা। কুরআনের লিখিতরূপ শুধু সহায়ক মাত্র। কুরআন প্রথম অবতরণ থেকেই প্রতিটি মুমিনের প্রতিদিনের পাঠ্য বই। প্রতিদিন নিজের নামাযে, জামাতে নামাযে ও সাধারণভাবে প্রত্যেক মুমিন তা তিলাওয়াত করেন বা শোনেন।

.

বর্তমান সময়ের চেয়ে সাহাবীদের যুগে কুরআন মুখস্থ করার আগ্রহ অনেক বেশি ছিল। হাজার হাজার হাফিজ সাহাবী-তাবিয়ী মুসলিম বিশ্বে ছড়িয়ে ছিলেন। সুতরাং ২-১টি আয়াত কেন, কুরআনের সকল আয়াতও যদি বকরীতে খেয়ে ফেলত, তাহলেও একটি আয়াতও "হারিয়ে যাওয়া" সম্ভব ছিল না। কেননা হাজার হাজার হাফিজ সাহাবী ও তাবিয়ী ঐ যুগে ছিলেন যাঁদের স্মৃতিতে পূর্ণ কুরআন সংরক্ষিত ছিল। সেই যুগ থেকে আজ পর্যন্ত একই অবস্থা। কাজেই বকরীতে খাওয়ার ফলে কিছু আয়াত চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে—তা নিতান্তই হাস্যকর অভিযোগ।

.

আজও যদি কুরআনের সকল লিখিত পাণ্ডুলিপি, পিডিএফ কপি, অনলাইন কুরআন, কুরআনের মোবাইল এ্যাপস—এ সকল কিছুও ধ্বংস করে ফেলা হয়, তাহলেও কুরআনের একটি অক্ষরও হারিয়ে যাবে না।কেননা কোটি কোটি কুরআনের হাফিজ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছেন।তাঁদের স্মৃতি থেকে আবারও সম্পূর্ণ কুরআন পুনরুদ্ধার করা যাবে।

.

আল্লাহ তা'আলা প্রিয় নবী (ﷺ)কে বলেনঃ

.

"আমি তোমার উপর কিতাব নাজিল করেছি যা পানি দ্বারা ধুয়ে যাওয়া সম্ভব নয়" [সহীহ মুসলিম হাদিস নং ৭২০৭]

.

পানি দ্বারা সেই জিনিস ধুয়ে যাওয়া সম্ভব যা কাগজের উপর কালি দ্বারা লেখা হয়। যা স্মৃতিতে সংরক্ষিত থাকে, তার পক্ষে ধুয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

এবং আল্লাহ ভালো জানেন।

তথ্যসূত্র ও কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ

- *http://icraa.org/*
- *http://www.letmeturnthetables.com/*
- *কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম – খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর(র)*

৮৩

'উপলব্ধি' {যে বিতর্কের কখনো শেষ হবে না}

-তানভীর আহমেদ

ভার্সিটি পরীক্ষার আগের সেই মন্থর সময়কার ঘটনা। এক রাতে সারারাত জেগে জেগে দেখলাম একজন নাস্তিক আর মুসলিমের মধ্যকার একেবারে ওয়ার্ল্ডক্লাস বিতর্ক। মুসলিম ভাইটি বোঝান কেন সৃষ্টিকর্তা ছাড়া সম্ভব ছিল না কিছুই, আবার নাস্তিক সাহেব দাবি করেন যে মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাখ্যায় সৃষ্টিকর্তার কোনও প্রয়োজন নেই ইত্যাদি ইত্যাদি।

.

একবার এই পক্ষ আর আরেকবার ওই পক্ষের দুর্বার বিতর্কে ভন ভন করতে লাগল আমার মাথা। একবার মনে হয় 'আয় হায়, মুসলিম ভাইটা তো হেরে যচ্ছে!" আবার মনে হয় "হায় হায়! নাস্তিকের এই প্রশ্নের জবাব কী হবে?" পরে ঠিকই আবার জবাব নিয়ে আসেন মুসলিম ভাইটি। প্রায় ২ ঘণ্টার শ্বাসরুদ্ধ সময় কাটল।

.

অবশেষে বিতর্ক যখন শেষ প্রায় তখনই ফজরের আযান হল। ঢুলু ঢুলু চোখ আর ভন ভন মাথা নিয়ে অযু করে একরকম টলতে টলতে শেষপর্যন্ত মাসজিদে গিয়ে পৌঁছেছিলাম আলহামদুলিল্লাহ।

.

এরপর ঘটেছিল আমার জীবনের আরেকটি স্মরণীয় ঘটনা যা প্রকাশ করলেও অপ্রকাশ্যই রয়ে যাবে। যা এতদিন ছিল কেবলই আমার আর আমার রব্বের মাঝে। যা হয়েছিল তা হলঃ আমার মাথায় শুধু ঘুরছিল ডিবেটের সমস্ত কথাবার্তা। এইটা এরকম হলে ওইটা ওইরকম, তারমানে হল এই... আরও কত কী! সালাতে মনোযোগ দিত খুবই কষ্ট হচ্ছিল। এরই মধ্যে ইমাম সাহেব সূরা ফাতিহা তিলাওয়াত শেষ করে ফেললেন। এরপর শুরু করলেন -

.

'আম্মা ইয়াতা সা-আলুন
'আনিন নাবাইল আযীম
আল্লাযিহুম ফিহী মুখতালিফুন
কাল্লা সায়া'লামুন
সুম্মা কাল্লা সায়া'লামুন...

.

(১) তারা পরস্পরে কি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে?
(২) মহা সংবাদ সম্পর্কে,
(৩) যে সম্পর্কে তারা মতানৈক্য করে।
(৪) না, সত্ত্বরই তারা জানতে পারবে,
(৫) অতঃপর না, অতিসত্বরই তারা জানতে পারবে।

.

আরবি না বুঝলেও এই সূরা 'নাবা' এর অর্থ জানা ছিল। সাথে সাথে চোখ পানিতে ভিজে উঠল আমার। যেন আমার রব আমাকে উদ্দেশ্য করেই ইমাম সাহেবের মাধ্যমে শুনিয়ে দিচ্ছেন তাঁর বাণী।

.

মক্কার কাফিররা আখিরাতের অস্তিত্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলত। করত মতানৈক্য, দেখাত যুক্তি-পাল্টা যুক্তি। আল্লাহ তাদের জবাব হিসেবে

নাযিল করেছিলেন এই সূরা। সুবহানাল্লাহ! আজ ১৪০০ বছর পরও এইসব বিষয়ে মতানৈক্য আর বিতর্কের শেষ হয় নি। শেষ হবেও না। আর একইসাথে বদলে যাবে না আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের জবাব... আর থেমে থাকে নি আমার মত অধম কিছু বান্দাদেরকে এখনও সেই একই আয়াতগুলো দিয়ে একইভাবে উজ্জীবিত করা।

.

যার অন্তর যেমন সে ওইদিকেই ধাবিত হবে। আর শেষ পর্যন্ত ওই অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করবে। আর আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের পক্ষ থেকে যেমন নিদর্শনই আসুক না কেন তা কখনওই কিছু মানুষের সন্দেহের সীমা অতিক্রম করবে না। একটা না একটা অন্যরকম ব্যাখ্যা তাতে থাকবেই। শেষপর্যন্ত তা না দেখেই বিশ্বাস অর্থাৎ 'গায়েবে বিশ্বাস' – এতেই এসে যাবে। কারণ আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা এটাই চান যে তাঁর বান্দারা না দেখেই বিশ্বাস স্থাপন করুক।

.

"এ হল সেই কিতাব যাতে কোনই সন্দেহ নেই। পথ প্রদর্শনকারী তাকওয়া আওবলম্বনকারীদের জন্য, যারা অদেখা বিষয়ের উপর বিশ্বাস স্থাপন করে..."(সূরা বাকারাহ, ২: ২-৩)

.

তাই আপনারা যারা জানতে চান সেদিনের সেই বিতর্কে শেষপর্যন্ত কে জিতেছিল তাদের বলি, কেউ জেতেনি। তর্কশাস্ত্রের একটি পন্থা হল নিজেকে রাজি করাতে বলে নিজের সিদ্ধান্তে অটল থাকা। অর্থাৎ আগে থেকেই যে বিশ্বাস ছিল তাতেই শক্তভাবে অবস্থান করা। মক্কার কাফির-নাস্তিকরা তাই ১৪০০ বছর আগে যেমনিভাবে মানে নি, আজকের কাফির-নাস্তিকরাও তেমনিভাবেই মানবে না। ওদের মানানোর জন্য যদি চাঁদ পর্যন্ত দ্বিখণ্ডিত করা হয়, তাহলেও তারা বলবে এটা ছিল যাদু বা দৃষ্টিভ্রম ইত্যাদি ইত্যাদি।

.

তাই শেষপর্যন্ত বিষয়টা আপনার ওপরেই। কোন দলে ভিড়বেন আপনি? বিশ্বাসীদের দলে নাকি অবিশ্বাসীদের? থেকে যাবেন সংশয় সন্দেহে?

.

নাকি মাঝে মাঝে পেতে চাইবেন নিজের এমনসব মুহূর্ত যখন মনে হবে আপনার রব সরাসরি আপনার সাথে কথা বলছেন?

৮৪

ইসলামে দাস প্রথা ১

-হোসাইন শাকিল

দাসপ্রথা নিয়ে প্রাচীনকাল থেকেই চলছে বিতর্ক। এই সামাজিক ব্যাধি নিয়ে বিতর্কের কূল-কিনারা পাওয়া বেশ মুশকিল। তবে পূর্বের প্রাচ্যবিদ আর বর্তমানে খ্রিস্টান মিশনারী, নাস্তিক-মুক্তমনা, আর কমিউনিস্টদের ইসলামকে আঘাত করার অন্যতম এক হাতিয়ার হলো দাসপ্রথা ও ইসলামের সম্পর্ক। তারা তাদের কথার মাধ্যমে সন্দেহের বীজ বুনে দিতে চায় যাতে ইসলাম সম্পর্কে সন্দিহান করা যায়। এর ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছে প্রাচ্যবিদদের দ্বারা যারা রাসুলুল্লাহর(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জীবনী লেখার নামে তার(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বিরুদ্ধে অতীব সুকৌশলে বিষ ঢুকিয়ে দিয়েছে। J.J. Pool, William Muir এসব কুখ্যাতদের নাম এইক্ষেত্রে অগ্রগন্য। তাদের যোগ্য উত্তরসূরী খ্রিস্টান মিশনারী আর নাস্তিক-মুক্তমনা এবং সামন্তবাদী কমিউনিস্ট, যাদের ইসলামকে বুদ্ধিবৃত্তিক ভাবে আঘাত করার জন্যে খুব বিখ্যাত চাল হলো ইসলামে দাসপ্রথা। এদের জবাবের পূর্বেই দাসপ্রথার অতি সংক্ষেপে ইতিহাস জেনে নেওয়া যাক।

.

প্রাচীন রোম আর গ্রীসে দাসপ্রথার জঘন্যতম পাশবিকতার বর্ণনা দেওয়া আসলেই কঠিন। তারা সারাবছরই ধন-সম্পদের লোভে যুদ্ধে লেগে থাকতো আর যুদ্ধে জয়ী হলে তারা নারী-পুরুষ সবাইকে দাস বানিয়ে পশুর মতো খাটাতো আর নারীদেরকে ভোগ্যপন্যের মতো ব্যবহার করত। তাদের জীবনের অন্যতম ভোগ ছিলো দাসী নারীদের নিয়ে ভোগ্যপণ্যের মতো ব্যবহার। দাসরা তাদের প্রভুর উপরে সামগ্রিকভাবে নির্ভর করত পিতার মতোই। এমনকি কোনো প্রভুরা তাদের দাসদের নিজেদের বাস্তবিকই সন্তান বলে পরিচয় দিত যাকে গ্রীক ভাষায় পাই আর ল্যাটিন ভাষায় পুয়ের বলা হতো।[1] দাসদের সাক্ষ্যও গ্রহন ও করা হতো না। সাক্ষ্য-প্রমান সংগ্রহ করার জন্য তাদের উপর ভয়াবহ অত্যাচার নিপীড়ন ও চলত। তাদেরকে কখনো কখনো ছেড়ে দেওয়া হতো হিংস্রসব মাছভর্তি চৌবাচ্চায় সামান্য কাচের দামী পানপাত্র ভেঙ্গে ফেলায়।[2] কখনো কখনো দাসদের বা যুদ্ধবন্দীদেরকে রোমান দর্শকদেরকে আনন্দ দানের জন্য ভয়ানক হিংস্র প্রাণির সাথে বা কখনো মারাত্মক অপরাধীদের সাথে লড়তে বাধ্য করা হতো যাদেরকে গ্ল্যাডিয়েটর বলা হতো[3] দুর্ভিক্ষের দিনে গ্ল্যাডিয়েটরদের নগর থেকে বিতাড়িত করা হতো খাবার বাচানোর জন্যে। এককথায় দাসদের কোনো প্রকার মানবিক অধিকার বলতে কিছু ছিলো না। তাদের উপর অমানবিক ও পাশবিক অত্যাচারের ফিরিস্তি অনেক বড় যা বর্ণনা করা এখানে উদ্দেশ্য নয়।

.

মূল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক। ইসলাম কেন দাসপ্রথাকে সমর্থন করে বা এই ধরনের হাজারো প্রশ্নের আগে চলুন একটু ঘুরে আসি ইসলামের প্রাথমিক যুগে। সেই সময়ে দাসপ্রথার কী অবস্থা ছিলো???

.

সেই সময়ে কয়েক উপায়ে দাস বানানো যেতঃ

.

(১) ঋণগ্রস্থ ব্যক্তি যদি সঠিক সময়ে ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হত তাহলে তাকে দাস বানানো হতো;

.

(২) অভাবের তাড়নায় বাবা মা সন্তানদের ভরনপোষনের জন্য ধনীদের কাছে দিলে ক্রয়কারীরা তাকে দাস করে রাখত নিজেদের কাছে;

.

(৩) যেহেতু অবকাঠামোগত তেমন সুযোগ-সুবিধা বিদ্যমান ছিলো না তাই অর্থনৈতিক কারনে সমাজের অনগ্রসর ব্যক্তিরা

নিজেদেরকে সমাজের অর্থনৈতিক দিক থেকে অগ্রসর ব্যক্তিদের পৃষ্ঠপোষকতায় নিয়ে যাওয়ার মাধ্যমে দাস হয়ে যেত;

.

(৪) ছিনতাই বা অপহরনের মাধ্যমে কাউকে বন্দী করে দাস বানানো;

.

(৫) অভিজাত শ্রেণির লোকদের সাথে অসদ্ব্যবহার করার জন্যে কাউকে দাস বানানো;

.

(৬) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কারন যুদ্ধ-বিগ্রহ। আরবে গোত্রভিত্তিক যুদ্ধ সবসময় লেগেই থাকত। এই সময়ে যুদ্ধের কারনে বিজিত জাতির নারী-পুরুষকে অনিবার্যভাবে দাস হয়ে যেতে হতো। মূলত যুদ্ধই প্রাচীনকাল থেকে দাস হওয়ার মূল কারন বলে বিবেচিত হয়ে থাকে হোক তা গ্রীক, রোমান, আরবীয় বা ভারতীয় সমাজ।

.

ইসলামের প্রাথমিক যুগে দাস-দাসী রাখা বা থাকা অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো বলা যেতে পারে সেই সময়কার সভ্যতার এক অবিচ্ছেদ্য অংশ ছিলো। এটি এমন এক ব্যাপার ছিলো যা কেউই অপছন্দ করতো না বা একে পরিবর্তনের চিন্তাও করত না। সেইসময়ে তা একেবারে অস্থি-মজ্জাগত বিষয় যাকে একেবারে উচ্ছেদ করা সম্ভব ছিলো না। এই কারনে অনেকে অভিযোগ করেন যে কেন ইসলাম দাসপ্রথাকে একেবারে গোড়া থেকেই উচ্ছেদ করে দেয়নি যেখানে মদ খাওয়াকে ধীরে ধীরে হারাম করা হয়েছে দাসপ্রথাকে কেন একেবারে হারাম করে দেওয়া হয়নি???

.

সেইসময়ে আরবের লোকেরা ছিলো মদের জন্য পাগলপ্রায়। তবে মদ যতটা তাদের সংস্কৃতির অংশ ছিলো তার তুলনায় দাস ব্যবস্থার প্রভাব ও প্রসার ছিলো আরো অনেক বেশি সূদুরপ্রসারী অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক অনেকদিক থেকেই দাসপ্রথার প্রভাব বিদ্যমান ছিলো তাই ইসলাম দাসব্যবস্থাকে একেবারে উতখাত না করে বরং কিছু অভূতপূর্ব বাস্তবমুখী কায়দায় দাসদের মুক্ত করার জন্য উতসাহ বা কখনো আবশ্যক করেছে সাথে সাথে দাস বানানের(Enslaving) সকল প্রথাকে বন্ধ করে দিয়ে শুধুমাত্র একটি উপায়কে উন্মুক্ত রেখেছে। যা পরে আলোচনা করা হবে। তার আগে ইসলাম কি কি উপায়ে দাসমুক্তির ব্যবস্থা করেছে তা আলোচনা করা হবে।

.

প্রথমত, ইসলামে দাসমুক্তির উপায়

.

ইসলাম এমন একটি জীবনব্যবস্থা যা বিশ্বজগতের এক এবং একচ্ছত্র অধিপতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার নিকট নিজেকে আত্মসমর্পণ করা। প্রতিটি মানুষই আল্লাহর দাস বা গোলাম যিনি তার দাসের স্রষ্টা, পালনকর্তা। যিনি তার দাসকে ভালোবাসেন নিজের গর্ভেধারন করা মায়ের থেকেও বেশি। ইসলামের সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হলো প্রতিটি মানুষ হোক সে ধনী বা গরীব, বড় বা ছোট, স্বাধীন বা দাস যে পর্যায়েরই হোক না কেন সকলকে সকল প্রকার মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর দাসত্বমনা করতে পারা। সকল প্রকার গোলামির পিঞ্জর থেকে বের করে এনে তাওহীদ ও ইসলামের ছায়াতলে এনে আল্লাহর দাস হিসেবে নিজেকে চিনতে পারাই দাসত্ব থেকে মুক্তির প্রথম উপায়। হয়তো শারীরিক দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্য আব্রাহাম লিংকন চুক্তি করেছিলো তবে সত্যিকারের দাসত্ব থেকে মুক্তি মিলেনি। তবে ইসলাম প্রথমেই যেই জিনিসের শিক্ষা দিলো সকলেই আল্লাহর বান্দা কারো উপর কারো কোনো প্রকার শ্রেষ্ঠত্ব নেই শুধুমাত্র ঈমান ও তাকওয়া ছাড়া।[4] এই এক শিক্ষা এতদিনের দাসত্বের শক্ত খাচা থেকে মুক্তি দিলো। তাই তো নিগ্রো সম্মানিত সাহাবী বিলাল ইবন রাবাহ(রাদি) ও ইসলামের তাওহীদের দাওয়াত পেয়ে হয়ে গেলেন মুক্ত পৃথিবীর কোনো শক্তিই তাকে আর আল্লাহর দাস হতে বাধা দিতে পারেনি। মরুভূমির উত্তপ্ত বালুতে চিত করে শুইয়ে বুকে পাথর রেখে দিলেও কখনো আহাদ!!আহাদ!! বলতে ভুল হয়নি কেননা ইসলাম তাকে সত্যিকারে মুক্তির স্বাদ আস্বাদন করিয়েছে এখন আর তিনি আল্লাহ ছাড়া কারো গোলাম নন। এই বিষয়টি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেননা ভেজাল মুক্তমনারা কখনোই সত্যিকার মুক্তমনের স্বাদ আস্বাদন করতে সক্ষম নয়।

.

তবে ইসলাম শুধুমাত্র এতটুকু করেই ক্ষান্ত হয়নি। ইসলাম দাসদের মুক্ত করার ব্যাপারে কিছু যুগান্তকারী পদ্ধতিও বাতলে দিয়েছেন। সেগুলো নিম্নরুপঃ

.

(১) ইতক বা স্বেচ্ছায় মুক্তিদান;

.

(২) গুনাহের কাফফারা;

.

(৩) মুকাতাবাহ

.

(৪) সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা

.

১। ইতক বা স্বেচ্ছায় মুক্তিদানঃ

.

কোন মনিব যদি চান সরাসরি স্বেচ্ছায় দাস-দাসীকে মুক্তি দিতে পারেন। কুরআন ও সুন্নাহয় এর অনেক ফযীলতের কথা বর্নিত হয়েছে।
আল্লাহ সৎকর্মের উল্লেখের সময় মুক্তিকামী ক্রীতদাসের জন্য ব্যয় করাকে উল্লেখ করেছেন।(সূরা বাকারাহ ২ঃ১৭৬)

.

এছাড়াও আল্লাহ বলেন,

.

আপনি কি জানেন সেই ঘাটি কি?? তা হলো দাসমুক্তি(সূরা বালাদ ৯০ঃ১২-১৩)

.

রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন,

.

"যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমকে দাসত্বের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করবে তাকে তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে প্রতিটি অঙ্গকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান করবেন"[5]

.

এছাড়াও স্বেচ্ছায় দাসমুক্তি বা ইতকের অনেক ফযীলত রয়েছে। এই কারনেই রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তার সাহাবারা এই ক্ষেত্রে অগ্রগন্য হয়ে অনেক দাসকে মুক্তি দিয়েছিলেন।

.

রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনেক দাসকে ইতক দিয়েছিলেন। এছাড়া আবু বাকর(রাদি) যিনি বেশ ধনী ছিলেন তিনিও দাসমুক্তির জন্যে অনেক অর্থ ব্যয় করেছেন। ইতিহাসে এর নজীর দ্বিতীয়টি নেই যে স্বেচ্ছায় কেউ এতো পরিমানে দাস মুক্ত করেছে। এর একমাত্র কারন আল্লাহর আনুগত্য ও তার জান্নাত লাভের খালিস ইচ্ছা আর কিছুই নয়।

.

(২) গুনাহের কাফফারাহঃ

.

ইসলামে কিছু গুনাহের জন্য দাসমুক্তির ব্যবস্থা রয়েছে। যেমনঃ

.

(ক) কোনো মুমিনকে ভুলবশত হত্যা করে ফেললে (সূরা নিসা ৪ঃ৯২)

.

(খ) ইচ্ছাকৃত ভাবে আল্লাহর নামে কৃত শপথ ভঙ্গ করে ফেলা (সূরা মায়িদাহ ৫ঃ৮৯)

.

(গ) যিহার।[6]

.

(ঘ) রোযার সময় ভুলবশত স্ত্রী মিলন করে ফেললে[7]

.

(৩) মুকাতাবাহ বা লিখিত চুক্তিঃ

.

মুকাতাবাহ বলতে এমন চুক্তিকে বোঝায় যার দ্বারা দাস নিজেই নির্দিষ্ট অর্থ পরিশোধের শর্তে তার মুক্তির জন্য তার মনিবের সাথে এমন চুক্তিতে আবদ্ধ হয় যাতে মনিব ও দাস উভয়েই ঐক্যমতে পৌছায়।
শায়খ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম আত তুওয়াইজিরী(রাহি) বলেন, "এটি হচ্ছে দাস দাসীর পক্ষ থেকে মনিবকে নির্দিষ্ট অর্থের বিনিময়ে আজাদ করার নাম"[৪]

.

আল্লাহ বলেন, "তোমাদের অধিকারভুক্ত যারা চুক্তিবদ্ধ হতে চায় তাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হও যদি তাতে কল্যান থাকে" (সূরা নূর ২৮ঃ৩২)
ইসলাম মুকাতাবাহকে সহজ করে দিয়েছে। যেহেতু

.

১। যাকাতের একটি খাত ইসলাম নির্ধারন করেছে দাসমুক্তি। (সূরা তাওবা ৯ঃ৬০);

.

২। গোলামের জন্য এই ছাড় আছে যে সে মনিবকে কিস্তিতে অর্থ পরিশোধ করবে;[9]

.

৩। মনিবের কর্তব্য হলো দাসকে অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে সহায়তা করা;

.

৪। দাস চুক্তি মোতাবেক অর্থ পরিশোধ করে দিলে সঙ্গে সঙ্গে সে মুক্তি লাভ করবে;

.

(৪) ইসলামী সরকারের পৃষ্ঠপোষকায়ঃ

.

ইসলামী সরকার যাকাতের খাত থেকে দাসমুক্তিতে ব্যবহার করতে পারে যেমনটা পূর্বে বর্ণনা হয়েছে। আর মুকাতাবাহ চুক্তি সম্পাদন করার পরে দাসের এই নিয়ে মোটেও চিন্তা করা লাগত না যে তার মনিব এই কারনে তার উপরে অত্যাচার করতে পারে কেননা ইসলামী সরকার তখন তার পৃষ্ঠপোষক হয়ে যান। এমনকি সরকার চাইলে বাড়তি অর্থ দিয়ে দাস ক্রয় করে তা মুক্ত করে দিতে পারে।

.

ইসলাম দাস বানানোর প্রায় সকল রাস্তাকে(একটি বাদে) বন্ধ করে দিলেও মুক্তির অভিনব পদ্ধতি দিয়েছে যা সম্পূর্ণ বাস্তবভিত্তিক। এমন সব উপায়ের সন্ধান দিয়েছে যার ধারে কাছে কোনো তথাকথিত আধুনিক রাষ্ট্র ভাবতেও পারেনি। যেখানে কমুনিস্ট আর সোশালিস্টরা সবকিছুকেই অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোন থেকে ভাবতে চায় সেখানে ইসলাম দাস ও স্বাধীন সকলকেই সত্যিকার মানসিক ও বাহ্যিক অর্থেও মুক্তির পথের দিশা দেয়। যেখানে আমেরিকার মতো রাষ্ট্র একের পর এক দাস বিদ্রোহে

জর্জরিত হয়ে দাস মুক্তির পথ অন্বেষণ করে তখন ইসলাম কালোত্তীর্ণ সমাধান ১৪০০ বছর আগেই দিয়ে গেছে।

.

[চলবে ইনশাআল্লাহ]

তথ্যসূত্রঃ

[1] রেদওয়ানুর রহমান, দাস বিদ্রোহ ও স্পার্টাকাস(২০১৫), পৃ-১৪

[2] ঐ, পৃ-১৬

[3] http://www.ancient.eu/gladiator/

[4] সূরা হুজুরাত ৪৯ঃ১৩

[5] সহীহ বুখারী, ইফা, কিতাবুল ইতক, হা-২৩৫১

[6] যিহার হলো স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে বলা যে তুমি আমার মায়ের পিঠের মতো হারাম এই কথা বললে সেই স্ত্রী স্বামীর জন্য হারাম হয়ে যাবে যেমন তার মা তার জন্য হারাম।

[7] সহীহ বুখারী, ইফা, ৩/২৫৮, হা-১৮১৩

[8] কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ফিকহ, ২/৪৪৬

[9] সহীহ বুখারী, কিতাবুল ইতক, হা-২৩৯৩

৮৫

ইসলামে দাস প্রথা ২

-হোসাইন শাকিল

[প্রথম পর্বের জন্য দেখুন (#সত্যকথন) ৮৪]

.

গত পর্বে ইসলামে দাসপ্রথা ও দাসমুক্তির ব্যাপারে ইসলামের যুগান্তকারী উপায়সমূহের ব্যাপারে অতি সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছিলো। এই পর্বে ইনশাআল্লাহ ইসলামে দাসপ্রথার স্বরুপ নিয়ে আলোচনা করা হবে।

কুরআন কারীমে দাসদের সাথে কেমন আচরন করা হবে তার আলোচনা আছে কিন্তু কোথাও দাস বানানোর বিষয় উল্লেখ নেই। কুরআন কারীমের কোথাও স্বাধীন মানুষকে দাস বানানোর আদেশ নেই। তবে যেহেতু সরাসরি কুরআনে দাস বানানোর ব্যাপারে ইতিবাচক বা নেতিবাচক আয়াত নেই তাই একে সরাসরি নিষেধ করার কোনো উপায় নেই।

.

ইসলাম পূর্ব সময়ে যে যে উপায়ে দাস বানানো যেত ইসলাম সেইসকল পথ বন্ধ করে দিয়েছে শুধুমাত্র একটি বাদে তা হলো আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে যুদ্ধবন্দিদের দাস বানানো। অর্থাৎ যুদ্ধবন্দী ছাড়া ইসলামে দাস বানানোর আর কোনো উপায় বাকী নেই। তবে তাও বেশ শর্তসাপেক্ষে যা একটু পরেই উল্লেখ হবে। তার আগে জেনে নেই যে ইসলামে মূলত জিহাদ কী ও কেন??

.

ইসলামে জিহাদ বলতে আল্লাহর রাস্তায় কাফিরদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধ করা।

.

শায়খ মুহাম্মাদ ইবন ইবরাহীম তুওয়াইজিরী(রাহি) বলেন, "আল্লাহর কালেমা তথা তাওহীদকে উড্ডিন করার নিমিত্তে তার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য কাফেরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে শক্তি ও প্রচেষ্টা ব্যয় করাকে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ বলে"[1]

.

জিহাদ মূলত বেশ কয়েকটি উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে।

.

১। ফিতনা দূরীভূত করা এবং দ্বীনকে পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহর জন্য করা(সূরা-আনফাল, ৮ঃ৩৯) এখানে ফিতনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো শিরক ও কুফর।

.

২। ইসলামী রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষার জন্য।

.

৩। মজলুম মুসলিমদের পাশে দাঁড়ানো এবং তাদের সাহায্য করা।(সূরা নিসা ৪ঃ৭৫)

.

৪। তাগুত অথবা জালিমের বিরুদ্ধে(সূরা নিসা ৪ঃ৭৬)

.

৫। আগ্রাসন রোধের জন্য(সূরা বাকারাহ ২ঃ১৯০)

.

মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে বের করে আল্লাহর গোলামীর দিকে নিয়ে যাওয়া, দুনিয়ার সংকীর্নতা থেকে আখিরাতের প্রশস্ততার দিকে নিয়ে যাওয়া, আর অন্যান্য দ্বীন বা মতবাদের অন্যায়-জুলুম থেকে ইসলামের ন্যায়বিচারের দিকে নিয়ে যাওয়াই

ইসলামের জিহাদের মূল উদ্দেশ্য, যেমনটি বিখ্যাত সাহাবী রাবঈ ইবন আমর(রাদি) পারস্য সেনাপতি রুস্তকে বলেছিলো(আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইফা, ৭/৭৭)

.

ইসলামী শরিয়াতের অনুমোদিত জিহাদে যুদ্ধবন্দীদের দাস বানানো যেতে পারে এই একটি রাস্তা ইসলাম খোলা রেখেছে তবে সেটিও শর্তসাপেক্ষে। জিহাদে যুদ্ধবন্দীদের ব্যাপারে খলীফা নিম্নের ৪টি সিদ্ধান্তের যেকোনো একটি সিদ্ধান্ত গ্রহন করা যেতে পারে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর স্বার্থ ও সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনায়ঃ

.

(১) বন্দী করে অনুগ্রহ করে সবাইকে বিনা মুক্তিপনে ছেড়ে দেওয়া;[2] যেমনটি রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মক্কা বিজয়ের দিন করেছিলেন সেদিন সমস্ত ক্ষমতা, প্রতাপ, আধিপত্য মুসলিমদের হাতে থাকা সত্ত্বেও, আরব ভূখন্ডে ইসলাম পূর্ণতা পেলেও, মুসলিমদের পরিপূর্ন বিজয়ের দিন, যেদিন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার করার শক্তি থাকা সত্ত্বেও দীর্ঘ ২৩ বছরের কত ব্যথার দগদগে স্মৃতিগুলোর প্রতিশোধ না নিয়েই সমস্ত কাফিরকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছিলো। কোথায় পাবেন এমন আদর্শ ইসলাম ছাড়া!!!!!!

.

(২) মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেওয়া;[3] যেমনটি রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বদরের যুদ্ধের সময় করেছিলেন।

.

(৩) তাদেরকে হত্যা করা[4] যদিও এই সম্পর্কিত আয়াতটি নাযিল হয়েছিলো বদর যুদ্ধের সময়ে যেখানে বন্দীদের হত্যা না করে মুক্তিপন নিয়ে মুক্তি দিয়ে দেওয়ার জন্য মুসলিমদের তিরস্কার করা হয়েছে। কেননা বদর যুদ্ধ মুসলিমদের প্রথম যুদ্ধ ও অত্যন্ত নাজুক পরিস্থিতিতে মুসলিমগন আল্লাহর ইচ্ছায় বিজয় লাভ করেছিলেন। সেই সময়ে বদর যুদ্ধের অবাধ্য কাফিরদেরকে শুধুমাত্র মুক্তিপন নিয়ে আবার মুসলিমদের বিপক্ষে আবার ষড়যন্ত্র করে ইসলামের দাওয়াতে বাধা সৃষ্টির সুযোগ করে দেওয়াটা কখনোই সুদক্ষ রাজনৈতিক কৌশলের অংশ হতে পারেনা। তাই আল্লাহ মুসলিমদের এহেন দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়ায় তাদের তিরস্কার করে সাবধান করে দিয়েছিলেন যাতে প্রয়োজনের সময় দ্বীনের স্বার্থে মুসলিমরা কখনোই কঠোর হতে ভুলে না যায় এবং অবাধ্য কাফিরদের যাতে উপযুক্ত সাজা দেয়। তবে গাযওয়ায়ে বানু কুরাইযাতে রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবাধ্য ইয়াহুদী কাফিরদেরকে যারা বার বার চুক্তি ভঙ্গ করে বিভিন্নভাবে মুসলিমদের কষ্ট দিচ্ছিলো তাদের বন্দী করে হত্যা করেছিলেন।[5] তবে তাও শুধুমাত্র দ্বীনের স্বার্থে।

.

(৪) তাদেরকে দাস বানিয়ে রাখা; উপরের তিনটি উপায়ের একটি ও যদি গ্রহনযোগ্য না হয়ে তবে মুসলিম খলীফা চাইলে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস বানিয়ে রাখতে পারে। তাদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে তাদের হক আদায় করে দাস হিসেবে রাখা যেতে পারে। দাস-দাসীদের অধিকার পর্বে এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

.

তো উপরোক্ত আলোচনা থেকে এই ব্যাপারটি স্পষ্ট হয়ে গেলো যে শরীয়তসম্মত জিহাদে খলীফা বা নেতা চাইলে বন্দীদের ব্যাপারে পরিস্থিতি মোতাবেক উপরোক্ত ৪টি সিদ্ধান্তের যেকোনো একটি গ্রহন করতে পারেন। তবে স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে ১ ও ২নং এর যেকোনো একটি গ্রহনই আল্লাহর কাছে পছন্দনীয়। ইসলাম কখনোই শত্রুদের রক্তপিপাসু না যে পেলো আর ধড়াধড় মেরে গেলো। তবে দ্বীনের দাওয়াতে বাধা দানকারীদের ব্যাপারে দয়ার কোনো সুযোগও নেই। আর ৩টির একটিও যদি উপযোগী না হয় তবে খলীফা চাইলে যুদ্ধবন্দীদেরকে দাস বানিয়ে রাখা যেতে পারে। এতে করে যা হবেঃ

.

(ক) যুদ্ধবন্দী যদি এমন হয় যে তার ফিরে গেলে মুসলিম উম্মাহর ও ইসলামের ক্ষতি করতে পারে বা পুনরায় ষড়যন্ত্র করতে পারে তাহলে তার ক্ষতি থেকে মুসলিমরা বেচে যাবে। এতে দ্বীনের দাওয়াত প্রসারিত হবে;
(খ) সবচেয়ে বড় উপকারীতা হলো মুসলিমদের সাথে বসবাস করতে করতে যদি কেউ ইসলামের সুমহান আদর্শের দ্বারা

প্রভাবিত হয় আর আল্লাহর ইচ্ছায় ইসলাম গ্রহন করে নিজেকে অনন্তকালের জাহান্নাম থেকে বেচে যায় এর থেকে বড় সৌভাগ্যের ও মর্যাদার আর কিছুই হতে পারেনা;

.

(গ) আর যদি তা নাও হয় তবুও দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য দাস-দাসী মনিবের সাথে মুকাতাবাত বা লিখিত চুক্তি করে নিতে পারে। মনিব এতে কল্যান দেখতে পেলে তাদের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে নিলে সে দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে;

.

প্রশ্ন হতে পারে যে, ইসলাম তাহলে কেন অন্যান্য সামাজিক ব্যাধির মতো এই দাসপ্রথাকে চিরবিলুপ্ত করে দেয়নি???

.

পূর্বেই আলোচনা থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে যে, ইসলামের আগমনই এমন সময় হয়েছে যখন দাসপ্রথার দৃষ্টিভঙ্গি বর্তমানের মতো ছিলোনা। দাসপ্রথার ওপর তখন অর্থনীতির ভিত্তি দাঁড়িয়ে ছিলো তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে এর শিকড় বিদ্যমান ছিলো তা ছিলো অত্যন্ত গভীরে প্রোথিত শিকড়। তাই ইসলাম সেইসময়ে দাসপ্রথাকে পরিপূর্ন বিলুপ্ত করেনি এতে করে পুরো সমাজব্যবস্থাই মুখ থুবড়ে পড়তো যা ইসলামী দাওয়াত প্রসারের পথে প্রতিবন্ধকতা স্বরুপ দেখা দিতে পারত তাই ইসলাম তখন দাসপ্রথাকে পরিপূর্ন ভাবে বাতিল না করে দিয়ে এর সমাধানের দিকে বেশি মনোযোগ দিয়েছে।

.

তাছাড়া ইসলামে জিহাদ যেহেতু চলমান প্রক্রিয়া তাই সুদূরপ্রসারী ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে যুদ্ধবন্দীদের দাসপ্রথা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত ঘোষনা করেনি যাতে কাফিরদের মোকাবেলায় যাতে যুদ্ধনীতি বা রাজনৈতিক নীতিতে ইসলামে স্থবিরতা না থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা জানেন আর আমরা খুবই কম জানি।

[চলবে ইন শা আল্লাহ]

---

[1] কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ইসলামী ফিকহ, ২/৭৮৫

[2] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ঃ৪

[3] সূরা মুহাম্মাদ ৪৭ঃ৪

[4] সূরা আনফাল ৮ঃ৬৭

[5] আর রাহীকুল মাখতুম, গাযওয়ায়ে বানু কুরাইযাহ দ্রষ্টব্য

৮৬

নবীজির (ﷺ) বৈবাহিক জীবন নিয়ে সমালোচনার জবাব

-Rain Drops

আজকাল দুই ধরনের লোক নবীজির ﷺ বিয়ে নিয়ে আক্রমণ করে, দুর্বল ঈমানের মুসলিম আর অমুসলিম। দুর্বল ঈমানের মুসলিমরা অবাক হয় এই ভেবে যে, নবীজি ﷺ কীভাবে এমন কাজ করতে পারলেন? তাদের জন্য উত্তর হলো--এটা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আল্লাহ তাআলা যা-ই আদেশ দেন না কেন, একজন মুসলিম হিসেবে তা মেনে নিতে হবে, এটা নিয়ে সন্দেহ বা সংশয় প্রকাশ করলে কিংবা প্রশ্ন তুললে মুসলিম থাকা যাবে না। নবীজির ﷺ সাথে আইশার (রা.) বিয়ে সাধারণ নিয়মের একটি ব্যতিক্রম, এটি সবার জন্য প্রযোজ্য নয়। কিন্তু নবীজির ﷺ জন্য এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দেশিত হুকুম ছিল। সুতরাং আল্লাহর ইচ্ছা নিয়ে প্রশ্ন করার কোনো অধিকার একজন মুসলিমের নেই।

.

আর যেসব অমুসলিম নবীজির ﷺ চরিত্র নিয়ে বাজে কথা বলে, তাদের মূল সমস্যা আসলে নবীজি ও আইশার বিয়ে নিয়ে নয়। তাদের সমস্যা হচ্ছে তারা মুহাম্মাদকে ﷺ আল্লাহর রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করে না--এটাই তাদের সমস্যা। আইশার সাথে নবীজির ﷺ বিয়ে একটি অজুহাত মাত্র। নবীজি যদি আইশাকে বিয়ে নাও করতেন, তবুও এই ইসলাম বিদ্বেষীরা কোনো না কোনো বিষয় খুঁজে নিয়ে তাকে আক্রমণ করতো। কারণ তারা নবীজিকে ﷺ আল্লাহর রাসূল হিসেবেই মানে না। তাই তাঁর সম্পর্কে ভুল ধরার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকে। অমুসলিমদের সাথে নবীজির ﷺ বৈবাহিক জীবন নিয়ে তর্কে লিপ্ত হওয়াটাই তাই অর্থহীন। যখন মক্কার কুরাইশরা রাসূলুল্লাহকে নানা ভাবে আক্রমণ করছিল, তখন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিছু আয়াত নাযিল করেন,

.

"তাদের কথাবার্তায় আপনার যে দুঃখ ও মনঃকষ্ট হয় তা আমি খুব ভালভাবেই জানি। কিন্তু তারা তো নিশ্চয়ই আপনাকে মিথ্যাবাদী বলে না, বরং এই জালিমরা আল্লাহর আয়াতকেই অস্বীকার করে।" (সূরা আনআম, ৬: ৩৩)

.

তারা ব্যক্তি মুহাম্মাদকে ﷺ অস্বীকার করেনি বরং তারা আল্লাহর বাণীকেই অস্বীকার করেছে। নবীজির সাথে তাদের আক্রমণাত্মক আচরণের কারণ ছিল এটাই যে তিনি আল্লাহর রাসূল। নবীজির ﷺ চরিত্রের জন্য আসলে তারা তাকে আক্রমণ করে না, বরং নবীজি ﷺ ইসলামের বার্তা প্রচারের মিশনে নেমেছেন দেখেই তাকে নিয়ে তাদের এতো ক্ষোভ।

৮৭

নাস্তিকদের অভিযোগ খণ্ডন – ১; “তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র” - এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম কি নারীকে ছোট করেছে? (১ম পর্ব)

-জাকারিয়া মাসুদ

ছোটবেলা থেকেই যখন নাস্তিকদের বিভিন্ন ধরণের লিখনী পড়তাম, দেখতাম যে তারা বেশীরভাগই এই আয়াতটিকে ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতো। ডঃ আজাদও সেটার ব্যতিক্রম করেন নি। ইসলাম সম্পর্কে অন্যান্য নাস্তিকদের তুলনায় তারও জ্ঞান সীমিত মাত্রায় থাকার কারণে তিনিও এই আয়াতটির মর্মার্থ ভালোভাবে অনুধাবন করতে পারেন নি। ড. আজাদ সুরা বাকারার এই আয়াতের দিকে ইঙ্গিত করে বলেছেনঃ

.

“সব ধর্মেই নারী অশুভ, দূষিত, কামদানবী। নারীর কাজ নিষ্পাপ স্বর্গীয় পুরুষদের পাপবিদ্ধ করা; এবং সব ধর্মেই নারী সম্পূর্ণ মানুষ। নারী কামকূপ,তবে সব ধর্মই নির্দেশ দিয়েছে যে নারী নিজে কাম উপভোগ করবে না, রেখে দেবে পুরুষের জন্যে; সে নিজের রন্ধ্রটি একটি অক্ষত টাটকা সতীচ্ছেদে মুড়ে তুলে দেবে পুরুষের হাতে। পুরুষ সেটি ইচ্ছামত ভোগ করবে, নিজের জমি যেভাবে ইচ্ছা চষে বেড়াবে। ইসলাম নারী সম্পর্কে এই ধারণাই পোষণ করে”। (হুমায়ুন আজাদ, নারী, পৃষ্ঠাঃ ৮২; আগামী প্রকাশনী, ৩য় সংস্করণ, ষষ্ঠদশ মূদ্রণ, মে ২০০৯)

.

ড. আজাদের উত্থাপিত অযৌক্তিক অভিযোগটির জবাব দেয়ার পূর্বে চলুন কোরআন কারীমের এই আয়াতটি প্রকৃতপক্ষে কি বলছে তা জেনে নেয়া যাক। মহান আল্লাহ বলেনঃ

.

“তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্যক্ষেত্র। তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর। আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও”। (সূরা বাকারাহঃ ২২৩ আয়াত)।

.

যাই হোক আয়াতটি শুনেই আপনার মনে ড. আজাদের মত হয়ত প্রশ্ন জাগতে পারে যে, (১) স্রষ্টা কেন নারীদেরকে শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করলেন?

.

(২) আর কেনই বা পুরুষকে যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার করার সুযোগ করে দেয়া হল?

.

তাহলে এই আয়াত কি নারীদের বিরুদ্ধে পুরুষকে স্বেচ্ছাচারী হতে উৎসাহিত করল?

.

আপনার এই প্রশ্ন দুটি একটু মনে রাখুন।

.

১ নং প্রশ্নের জবাব দেয়ার পূর্বে আমরা আয়াতটিকে একটু ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করি। আয়াতটি যদি আমরা একটু ভাগ ভাগ করে নেই তাহলে বিষয়টি বুঝা আমাদের জন্য সহজতর হবে।

.

আয়াতে প্রথমে বলা হয়েছে,

"তোমাদের স্ত্রীরা হলো তোমাদের জন্য শস্য ক্ষেত্র"।

.

এরপর বলা হয়েছে,

.

"অতএব তোমরা তোমাদের শস্যক্ষেত্রে যেভাবে ইচ্ছা গমন করতে পার"।
এবং আয়াতটির শেষাংশে বলা হয়েছে,

.

"আর নিজেদের জন্য আগামী দিনের ব্যবস্থা কর এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক। আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও"।

.

যাই হোক আয়াতটির প্রথম অংশ নিয়ে আমরা আগে আলোকপাত করি। ২২৩ নং আয়াতের প্রথমাংশে মহান আল্লাহ নারীদেরকে শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করেছেন।

.

কেন এমন করা হল?

.

কেন নারীদেরকে শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করা হল?
আসুন এর জবাবটাও কোরআন থেকেই নেই। কোরআন আমাদেরকে বলছেঃ

.

"নিশ্চয় আমি এ কোরআনে মানুষকে নানাভাবে বিভিন্ন উপমার দ্বারা আমার বাণী বুঝিয়েছি। মানুষ সব বস্তু থেকে অধিক তর্কপ্রিয়"। (সূরা কাহাফঃ ৫৪ আয়াত)

.

সূরা কাহাফের এই আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি যে, মহান আল্লাহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপমা ব্যবহার করে তার বাণীকে মানুষের সামনে সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করেছেন, যাতে মানুষ তার সঠিক অর্থ অনুধাবন করতে সক্ষম হয়। আর তাই এই আয়াতে নারীদেরকে তুলনা করা হয়েছে শস্যক্ষেত্রের সাথে। অর্থাৎ এই আয়াত আমাদের সামনে জীববিজ্ঞানের একটি জটিল শাখাকে উপমার দ্বারা সহজতর ভাবে উপস্থাপন করছে যাতে আমরা ব্যাপারটি বুঝতে পারি।

.

আসুন বিষয়টিকে আমরা আরেকটু ব্যাখ্যা করি।

.

আপনি হয়ত ভ্রূণবিদ্যা (Embryology) সম্পর্কে জেনে থাকবেন। ভ্রূণবিদ্যা হল জীববিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে মানব শিশু জন্মের ক্রমবিকাশ নিয়ে আলোকপাত করা হয়। ভ্রূণবিদ্যা আমাদেরকে বলছে, সন্তান উৎপাদনে একমাত্র সক্ষম দেহ হলো নারীদেহ। পুরুষের পক্ষে এটি অসম্ভব যে, সে তার গর্ভে সন্তান ধারণ করবে। সন্তান ধারণের জন্য প্রাকৃতিকভাবেই একমাত্র সক্ষম দেহ হলো নারীদেহ। আর সন্তান উৎপাদনের ক্ষেত্রে বীজ হিসেবে সহায়ক ভূমিকা পালন করে পুরুষের দেহ থেকে নিঃসৃত শুক্রানু (Sperm)। পুরুষ ও নারীর যৌনমিলনের মাধ্যমে স্খলিত শুক্রাণু নারীদেহে স্থানান্তর লাভ করে। এর পর শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে যাকে নিষেক বলে। এই নিষিক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বানোর মাধ্যমে নারীদেহে এক নতুন জীবনের সূচনা ঘটে। শুক্রাণু ও ডিম্বানো নিষিক্ত হওয়া থেকে শুরু করে একটি মানব শিশু জন্ম নেয়া পর্যন্ত তাকে অনেকটি জটিল ধাপ অতিক্রম

করতে হয়, যা নীচে অতি সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলোঃ

.

(1)Fertilization: প্রাথমিক পর্যায়ে নারী ও পুরুষের যৌনমিলনের মাধ্যমে পুরুষের দেহ হতে শুক্রাণু নারীদেহে পৌছায়। পুরুষের দেহ থেকে প্রায় একই সাথে ২০০-৩০০ মিলিয়ন শুক্রকীট (spermatozoa) নিঃসৃত হয়। তার মধ্যে প্রায় ৩০০-৫০০ মিলিয়ন নিষেকের (fertilization) জন্য ডিম্বানুর নিকটে গিয়ে পৌছায়। কিন্তু শুধুমাত্র একটি পরিপক্ক শুক্রকীটের দরকার হয় স্ত্রীর ডিম্বানু (ovum) নিষিক্ত হওয়ার জন্য। এই একটি শুক্রকীটকে ডিম্বানুর সাথে নিষিক্ত হওয়ার জন্য তিনিটি পর্দাকে ভেদ (penetrate) করতে হয়। পর্দা তিনটি হলোঃ

.

i) Corona radiate
ii) Zona pellucida
iii) Oocyte cell membrane.

.

এভাবে তিনটি পর্দা ভেদ করার পর শুক্রাণুটি ডিম্বানোর সাথে মিলিত হয় এবং ডিম্বানুটি পুরুষের শুক্রানোর দ্বারা নিষিক্ত হয়। নিষিক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বাণু থেকে ভ্রূণের (zygote) সূচনা হয়। নিষেকের পরে ডিম্বানু তার মিয়োসিস (Meiosis) কোষ বিভাজন সম্পন্ন করে। ২৩ ক্রোমসোম (Chromosome) বিশিষ্ট ডিম্বানু ও ২৩ ক্রোমসোম বিশিষ্ট শুক্রাণু নিষিক্ত হয়ে ৪৬ টি ক্রোমোসোমের সৃষ্টি করে। এর পর শুরু হয় প্রি-এম্ব্রায়োনিক পিরিয়ড (Preembryonic period)।

.

(2) Preembryonic period:

.

(a) Cleavage: ১ম ক্লিভেজ (cleavage) ঘটে নিষেকের ৩০ ঘণ্টা পর। মিয়োটিক কোষ বিভাজন ৩ দিন ধরে অনবরত চলতে থাকে। নিষিক্ত কোষ ক্রমান্বয়ে ছোট ছোট হয়ে বিভাজিত হতে শুরু করে। প্রতিটি বিভাজিত কোষকে blastomere বলে।

.

(b) Morula: ৭২ ঘণ্টা পর নিষিক্ত ডিম্বাণু জরায়ুতে (Uterus) প্রবেশ করে। একে মরুলা বলা হয়।

.

(c) Blastocyst: মরুলা ৪-৫ দিন যাবত অনবরত বিভাজিত হতে থাকে। যা পর্যায়ক্রমে ১০০ তে গিয়ে পৌছায়, এদের blastocyst বলে। Blastocyst অনান্তরিক (hollow) এবং তরল পদার্থ দ্বারা পূর্ণ থাকে। এর প্রাচীরগাত্রকে বলা হয় ট্রফোব্লাস্ট (Trophoblast) যা প্লাসেন্টা তৈরিতে সাহায্য করে।

.

(d) Implantation: নিষেকের ১০ দিন পর blastocyst এন্ডোমেট্রিয়াম এর ভিতরে প্রোথিত হতে শুরু করে। এটি ১ সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে।

.

(e) Primitive Streak: যখন মানব ভ্রূনের বৃদ্ধির বয়স ১৫-১৬ দিন হয় তখন এই ধাপ শুরু হয়। ২য় সপ্তাহের শেষের দিকে এসে hypoblastic কোষগুলো পুচ্ছ সংবন্ধীয় অঞ্চলে চলে আসে এবং একটি লম্বা অনচ্ছতা (opacity) সৃষ্টি করে একেই Primitive Streak বলা হয়। এর পর এ থেকে তিনটি কোষের স্তর সৃষ্টি হয়, যা ectoderm, mesoderm, endoderm নামে পরিচিত। Ectoderm থেকে চামড়া ও স্নায়ু তন্ত্র তৈরি হয়। Mesoderm থেকে কঙ্কাল তন্ত্র, পেশী, রক্ত সংবহনতন্ত্র, মুত্রতন্ত্র, এবং প্রজননতন্ত্র তৈরি হয়। Endoderm থেকে পরিপাকতন্ত্র, শ্বসনতন্ত্র, প্রজননতন্ত্রের কিছু অংশ তৈরি হয়।

.

(3) Embryonic Stages:

এটি ১৬ দিন বয়সে শুরু হয়। এটি আবার কয়েকটি ধাপে বিভক্ত।

(a) Neurula: স্নায়ুতন্ত্র ভ্রূণের বৃদ্ধির সহায়তাকারী অন্যতম প্রধান তন্ত্র। এই ধাপে এসে মস্তিষ্ক তৈরি হয় সেই সাথে spinal cord ও রক্ত সংবহনতন্ত্র তৈরি হয়। একটি সরল হৃদপিণ্ড এ সময়ে রক্ত প্রবাহের সৃষ্টি করে, যা ভ্রূণকে বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টি সরবারোহ করে।

.

(b) Embryonic Membrane: এই ধাপে এসে ভ্রুণের চারপাশে ভ্রুণীয় মেমব্রেন তৈরি হয়। যেমনঃ amnion (bag of waters), chornion (it becomes principal part of the placenta) ।

.

(c) Tailbud: এটি ৫ সপ্তাহ বয়সে শুরু হয়। এই সময়ে ভ্রূণের আকার একটি এসপিরিন ট্যাবলেটের মত হয়। এই ধাপকেই tailbud বলা হয়।

.

(d) Metamorphosis: এটি ৬ সপ্তাহে শুরু হয় এবং কমপক্ষে ২ সপ্তাহ ধরে চলতে থাকে। এই ধাপে এসে অংগুলি সহ দুই হাত,পা তৈরি হয়। ইন্দ্রিয়তন্ত্র এ সময়ে গঠিত হয়। চোখে পিগমেন্ট লেয়ার চলে আসে।

.

(4) Fetal Stages:

ফিটাস সব ধরণের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ধারণ করে। এই পর্যায়ে এসে মা ও সন্তানের মধ্যে সব ধরণের সংবহন শুরু হয়, ফিটাস মাতৃদেহ হতে তার প্রয়োজনীয় অক্সিজেন ও পুষ্টিলাভ করে। ২য় মাসে এসে কোমলাস্থি গুলো ক্রমান্বয়ে শক্ত হতে থাকে। ৩য় মাসে এসে ফিটাসে হাতের ও পায়ের আঙ্গুলে নখর তৈরি হয় এবং চুল গজায়। বৃক্ক সচল হতে শুরু করে এবং তার বিভিন্ন কার্যাবলী শুরু করে। এই ধাপে এসে বাচ্চা তার মুখ খুলতে পারে। চতুর্থ মাসে এসে বাচ্চার দ্রুত বৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে। বাচ্চা জরায়ুতে নাড়াচাড়া শুরু করে দেয়। পঞ্চম মাসে এসে বাচ্চা মায়ের পেটে লাথি দিতে সক্ষম হয়। এই ধাপে বাচ্চা তার আংগুল নাড়াচাড়া শুরু করে, হেঁচকি প্রদান করে এবং ঘুমাতে পারে। ছয় মাস বয়সে এসে তার শরীরে তৈলাক্ত গ্রন্থির উৎপত্তি ঘটে। সাত মাস বয়সে এসে বাচ্চা তার শরীরের তাপমাত্রা, বৃদ্ধি, গ্রাস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করতে পারে সেই সাথে তার মস্তিষ্ক বৃদ্ধি ঘটে। অষ্টম মাসে এসে তার চোখ আলো বুঝতে পারে, ঘ্রাণ নিতে পারে কিন্তু তার কানের স্নায়ু পরিপূর্ণভাবে তখনো বেড়ে উঠে না। নবম মাসে এসে ফিটাসের বৃদ্ধি পরিপূর্ণভাবে শেষ হয়ে যায়। বাচ্চাটি তখন নতুন পৃথিবীতে আসার উপযোগীতা অর্জন করে। এই বয়সে সে তার মায়ের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করে। আর দশম মাসে এসে সে নতুন পৃথিবীতে তার এক নতুন জীবনের যাত্রা শুরু করে।

.

{T.W Sadler, Lungman's Medical Embryology, (Lippincott Williams & Wilkins, A Wolters Kluwer Company, New York, 9th edition), R.G Harrison, A Textbook of Human Embryology (Blackwell Scientific Publications, First published, 1963), Rani Kumar, Textbook of Human Embryology, (International Publishing House, New Delhi, India, 2008)}.

.

উপর্যুক্ত আলোচনা আমাদেরকে একথা বুঝতে সহায়তা করে যে, একটি শিশু তার ভ্রূণাবস্থা থেকে বেড়ে উঠার সবগুলো ধাপই তার মায়ের দেহে সম্পন্ন করে এমনকি এ সময়ে তার জন্য যে পুষ্টির দরকার হয় সেটাও সে তার মায়ের দেহ থেকে লাভ করে।

.

এখন একটু শস্যক্ষেত্রের কথা চিন্তা করুন তো!

শস্যক্ষেত্রে ফসলের বীজ বপণ করা হয়, বীজ শস্যক্ষেত্র থেকে পুষ্টিলাভ করে বিকশিত হয় এবং পরিপক্ষতা লাভ করে।

.

এখন আপনিই বলুন সন্তান উৎপাদনে সক্ষম একমাত্র নারীদের দেহকে যদি শস্যক্ষেত্র বলা হয় তাহলে কি তা ভুল? কেননা উপরের জটিল প্রক্রিয়াগুলোর একটিও পুরুষের দেহে ঘটে না বরং সবগুলোই নারীদের দেহে ঘটে।

.

তাহলে সন্তান উৎপাদনে সক্ষম নারীদেহকে যদি ইসলাম সহজবোধ্যভাবে উপস্থাপনের জন্য শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করে তাহলে সেটা অবশ্যই যৌক্তিক এবং বৈজ্ঞানিক।

.

(ইনশাআল্লাহ চলবে.......................)

৮৮

নাস্তিকদের অভিযোগ খণ্ডন – ২; "তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র" - এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম কি নারীকে ছোট করেছে? (২য় পর্ব)

-জাকারিয়া মাসুদ

[আগের পর্বের জন্য দেখুন (#সত্যকথন) ৮৭]

.

গত পর্বে আমরা আপনার প্রশ্নের প্রথমাংশের জবাব দিয়েছিলাম। এখন আমরা আপনার প্রশ্নের ২য় অংশে আসি। আর আপনার এই প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পূর্বে চলুন এই আয়াতের আগের আয়াত অর্থাৎ ২২২ নং আয়াত থেকে একটু ঘুরে আসি। এই আয়াতে মহান আল্লাহ বলেনঃ

.

"আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা কষ্টকর। কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়। যখন উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে, যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবাকারী এবং অপবিত্রতা থেকে যারা বেঁচে থাকে তাদেরকে পছন্দ করেন"। (সূরা বাকারাহঃ ২২২ আয়াত)

.

সাহাবীরা যখন রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন তখন আল্লাহ তায়ালা তার জবাবে এই আয়াত নাযিল করেন,

.

"আর তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে হায়েয (ঋতু) সম্পর্কে। বলে দাও, এটা কষ্টকর।

.

এবং এই সময়ে স্ত্রীর সাথে যৌনমিলন করাকে হারাম ঘোষণা করেন।

.

"কাজেই তোমরা হায়েয অবস্থায় স্ত্রীগমন থেকে বিরত থাক। তখন পর্যন্ত তাদের নিকটবর্তী হবে না, যতক্ষণ না তারা পবিত্র হয়ে যায়"।

.

স্বামী ও স্ত্রীর মিলনের সময় নির্ধারিত করে দিয়ে মহান আল্লাহ এরপর বলেনঃ

"যখন উত্তম রূপে পরিশুদ্ধ হয়ে যাবে, তখন গমন কর তাদের কাছে"।
এখন কীভাবে একজন স্বামী তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হবে, তার নির্দেশ দিতে গিয়ে কোরআন বলছে,

.

"যেভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে হুকুম দিয়েছেন"।

.

এখন চলুন দেখে নেই এই আয়াতের ব্যাখ্যায় মুফাসসিরগণ কি মতামত প্রদান করেছেন।

.

মুজাহিদ (রাহি) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াত সম্পর্কে বলেনঃ এর অর্থ হচ্ছে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন

করবে যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে এবং মলদ্বার থেকে দূরে থাকবে।
ইবরাহীম (রাহি) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেনঃ এর অর্থ মিলনের স্থান শুধু স্ত্রী অংশ (যোনি/Vagina)।

.

আবার কেউ কেউ বলনে, অত্র আয়াতের অর্থ হচ্ছে তখন তাদের নিকট ঠিক সেভাবে গমন করবে যেভাবে গমন করার জন্য আল্লাহ তায়ালা নির্দেশ দিয়েছেন, আর তা হচ্ছে ঋতু থেকে নারীরা পবিত্র হওয়ার পর তাদের সাথে যৌনমিলন করবে। এ মত পোষণকারীদের দলীল নিম্নরূপঃ

.

ইবনে আব্বাস (রাযি) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশের ব্যখায় বলেন, এর অর্থ তাদের নিকট পবিত্র অবস্থায় গমন করবে, ঋতুকালে নয়।
আবু-রাযীন (রাহি) বলেন, এই আয়াতের অর্থ তাদের নিকট পবিত্রতার সময় গমন করবে।

.

ইকরিমা (রাহি) থেকে বর্ণিত, তিনি আলোচ্য আয়াতাংশ সম্পর্কে বলেন, এর অর্থ হচ্ছে তখন তাদের নিকট গমন করবে যখন তারা গোসল করে পবিত্র হবে।

কাতাদাহ (রাহি) এই আয়াতাংশের ব্যাখ্যায় বলেছেন, পবিত্রতার সময় স্ত্রীদের নিকট গমন করবে।

.

সুদ্দী (রাহি), দাহহাক (রাহি) থেকেও একই অভিমত বর্ণিত হয়েছে।

.

আবার কেউ কেউ এই আয়াতাংশের ব্যাখায় বলেছেন, এর অর্থ হলো তোমরা হালাল উপায়ে বিবাহের মাধ্যমে তাদের (নারীদের) সাথে গমন করবে।

.

ইবনুল হানাফিয়্যা (রাহি) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'তোমরা নারীদের নিকট বিবাহের সম্পর্কের মাধ্যমে গমন করবে, ব্যাভিচারের মাধ্যমে নয়।

.

ঈমাম আবু জাফর ত্বাবারী (রাহি) বলেনঃ উপর্যুক্ত দুটি ব্যাখ্যার মধ্যে আমার কাছে উত্তম ঐ ব্যক্তির অভিমত যিনি বলেন যে, অত্র আয়াতাংশের অর্থ হচ্ছে, "তোমরা তাদের নিকট পবিত্র অবস্থায় গমন করবে"।
(তাবারী, আবূ জা'ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর, তাফসীরঃ জামিউল কোরআন, ৪/১৬০; ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ , প্রকাশকালঃ মে, ১৯৯৪)।

.

মুফাসসিরদের মতামতকে একত্রিত করলে দেখা যায় যে, একজন নারীর সাথে যৌনমিলন কেবল তখনি জায়েজ যখন বিবাহের মাধ্যমে সে নারীকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করা পবে, হায়েজ চলাকালীন সময় হতে পারবে না এবং স্ত্রীর মলদ্বার (Anus) সে ব্যবহার করতে পারবে না।

.

এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম স্বামীকে তার স্ত্রীর সাথে যৌনমিলনের হালাল সময়, হারাম সময় ও পদ্ধতি নির্ধারণ করে দিয়েছে। পাশাপাশি এই আয়াত আমাদের একথাও অনুধাবন করতে সহায়তা করে যে, ইসলাম পুরুষকে নারীদের সাথে স্বেচ্ছাচারমূলক আচরণ করার মত কোন সুযোগ প্রদান করে নি। বরং ইসলাম স্ত্রীর সাথে মিলনের ক্ষেত্রে তাকে অনেক বিধিনিষেধ প্রদান করেছে। একজন স্বামী চাইলেই যে কোন সময়ে যে কোনভাবে তার স্ত্রীর সাথে মিলিত হতে পারবে না।

এজন্য তাকে ইসলাম নির্ধারিত সীমার মধ্যেই অবস্থান করতে হবে।

.

(ইনশাআল্লাহ চলবে.....................)

#হুমায়ুন_আজাদ - ১

৮৯

মুখোশের অন্তরালে নাস্তিকতা ১ –জাফর ইকবাল

-তানভীর আহমেদ

একজন লেখককে জানার সবচেয়ে ভাল উপায় হল তার লেখা পড়া। লেখায় মানুষের চিন্তা চেতনাগুলো ফুটে উঠে। সুনির্দিষ্ট চিন্তাগুলোকে অক্ষরের পর অক্ষর সাজিয়ে শব্দ, শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে বাক্য এভাবে একসময় পুরো একটি লিখা সম্পন্ন হয়। সেই লিখা লিখবার সময় লেখক চিন্তা করেছেন, হয়ত লিখে কেটেছেন, কোনও অংশ বাদ দিয়েছেন... সবশেষে তিনি যেটা চেয়েছেন সেটাই আমরা পাই। আর তার লিখাগুলোয় যদি একই বা একইরকম ধারণার বারংবার প্রকাশ ঘটে তবে আমরা লেখকের স্বরূপ, তার মতামত, ইচ্ছা ইত্যাদি সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারি।

.

আমি যে অনেকগুলো কারণে লিখি তার একটি হল সত্য থেকে মিথ্যা আর অনিশ্চয়তাগুলোকে সুস্পষ্টভাবে আলাদা করে চিহ্নিত করা। এই লিখাটিও লিখছি একই কারণে – যাতে সত্য স্পষ্ট হয়ে যায় আর অনিশ্চয়তাগুলো দূর হয়ে যায়, এরপরও যদি কেউ মিথ্যার পাড়ে দাঁড়িয়ে থাকে তবে বুদ্ধিমানেরা জানবে যে অমুক জেনেশুনে এখনও মিথ্যার পক্ষ নিয়েছে - এতটুকুই।

.

এমন একজন লেখকের বইগুলো ঘেঁটে দেখা শুরু করে রীতিমত অবাক হয়েছি। একবার দুইবার না... বারবার। এত সুন্দর আর সুচারুভাবে তিনি তার লেখায় নাস্তিকতা মিশিয়েছেন, তার তুলনাই হয় না। লেখকের নাম মুহম্মদ জাফর ইকবাল। প্রথমে ভেবেছিলাম তার সমস্ত লিখাগুলোয় যত নাস্তিকতা এসেছে সব একসাথে করে একটা নোট লিখে ফেলব। কিন্তু একথা ভেবে আসলে শ্রদ্ধেয় লেখকের অসম্মানই করলাম যেন। ওয়াল্লাহি তার লেখায় কখনও প্রতি প্যারায়, কখনও প্রতি বাক্যে বাক্যে এতই সুকৌশলে ধর্মবিদ্বেষ আর নাস্তিকতা ছড়ানো হয়েছে যে অবশেষে সিরিজ আকারে লিখারই সিদ্ধান্ত নিলাম। জানি এই লেখকের অনেক ভক্তদের হয়তো ব্যাপারটা খারাপ লাগবে, কিন্তু একবার পড়ে দেখলেই ব্যাপারটার ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারবেন। আল্লাহ আপনার আমার উভয়ের জন্য সত্য মেনে নেওয়ার তাওফিক দিন এবং সহজ করুন, এমনকি তা আমাদের অপছন্দনীয় হলেও।

.

[১] ক্যাথোলিক চার্চের ঘটনার আড়ালে সমস্ত ধর্মকে হেয় করা –

অ্যারিস্টটলের গ্রিক জ্ঞানগরিমায় প্রভাবের কারণে তার সব কথাই প্রায় অকাট্য হিসেবে গ্রহণ করছিল পরবর্তী জ্ঞানপিপাসুরা। এতে করেই খ্রিস্টাব্দ প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে বাইবেল সংকলনের সময় সেখানে অ্যারিস্টটলের জ্ঞানের প্রভাব থেকে যায়। ফলে খ্রিস্টপূর্ব থেকেই চলে আসা টলেমি আর অ্যারিস্টটলদের সমর্থনকৃত মতবাদ "পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে, আর সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রগুলো পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে" একথা চলে আসে। শুধু তাই না, দাপটের সাথে প্রায় ১৫০০ বছর ধরে বাইবেলে শোভা পায়।

.

সমস্যার শুরু হয় যখন বিজ্ঞানী কোপার্নিকাস বাদ সাধেন, আর দাবি করেন যে, "সূর্য মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে আর পৃথিবীসহ অন্যান্য সব গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।" চার্চের এত বছর ধরে শেখানো বিদ্যের বিপক্ষে যাচ্ছে বলে প্রভাব খাটিয়ে এই মতবাদ দমন করা হয়। কিন্তু পরবর্তীতে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও যখন নিজস্ব পর্যবেক্ষণ করে একই দাবি করে বসেন আর লিখালিখি শুরু করেন তখন চার্চের মাথা খারাপ হয়ে যায়। রচিত হয় "বিজ্ঞান আর চার্চের দ্বন্দ্ব" নামক ইতিহাস।

.

এখন গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল - এটা ছিল মূলত ক্যাথলিক চার্চের সাথে দ্বন্দ্ব। কিন্তু এখন কেউ যদি একে বিজ্ঞানের সাথে "ধর্মের"

দ্বন্দ্ব বলে প্রচার শুরু করে, আর এমন মেসেজ দেয় যে বিজ্ঞানই হল সেরা তখন ব্যাপারটা কী দাঁড়ায়?

.

জাফর ইকবাল লিখেছে –

“পর্যবেক্ষণ করে বিজ্ঞানের কোনো রহস্য বুঝে ফেলার একটা উদাহরণ তৈরি করে ছিলেন কোপর্নিকাস ... ... গ্যালিলিও যখন সেটিকে গ্রহণ করে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে লাগলেন তখন ধর্মগ্রন্থে লেখা আছে পৃথিবী সবকিছুর কেন্দ্র, সেই পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে ঘুরছে ঘোষাণা করা ধর্মগ্রন্থকে অস্বীকার করার মতো। ভ্যাটিকানের পোপেরা সে জন্য তাকে তখন ক্ষমা করেন নি। ব্যাপারটি প্রায় কৌতুকের মতো যে গ্যালেলিওকে ভ্যাটিকান চার্চ ক্ষমা করেছে মাত্র ১৯৯২ সালে। তাদেরকে দোষ দেয়া যায় না- ধর্মের ভিত্তি হচ্ছে বিশ্বাস, কাজেই ধর্মগ্রন্থে যা লেখা থাকে সেটাকে কেউ কখনো প্রশ্ন করে না, গভীর বিশ্বাসে গ্রহণ করে নেয়। বিজ্ঞানের বিশ্বাসের কোনো স্থান নেই। বিজ্ঞানের যে কোনো সূত্রকে যে-কেউ যখন খুশি প্রশ্ন করতে পারে, যুক্তি-তর্ক, পর্যবেক্ষ বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দিয়ে সেই সূত্রের সত্যতা তখন প্রমাণ করে দিতে হবে। কাজেই কেউ যদি বিজ্ঞান ব্যবহার করে ধর্মচর্চা করে কিংবা ধর্ম ব্যবহার করে বিজ্ঞানচর্চা করার চেষ্টা করে তাহলে বিজ্ঞান বা ধর্ম কারোই খুব একটা উপকার হয় না।” (একটুখানি বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ১৩)

লিখাটি বইয়ের একেবারে প্রথমের লিখা। “তাদেরকে দোষ দেওয়া যায় না...” থেকে শুরু করে সব ধর্মকে জেনারালাইজ করে একটা সিদ্ধান্ত টানা হয়েছে। কেবল বুদ্ধিমানরাই বুঝতে পারবেন, এখানে শুধু “Conflict Thesis” এর ধারণা কৌশলে ঢুকিয়েই দেওয়া হয় নি, সাথে সাথে সমস্ত ধর্মের প্রতি একরকম সমবেদনা দেখিয়ে বিজ্ঞানই সেরা এমন একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছে।

.

এখানে গুরুত্বপূর্ণ হল, “Conflict Thesis” বা "বিজ্ঞান আর ধর্মের দ্বন্দ্ব" কিন্তু মূলত ঘুরেফিরে ধর্মগ্রন্থে ভুল থাকা বোঝায়। আর কুরআনে অনেক আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে খ্রিস্টানরা তাদের কিতাব বিকৃতি করেছে। সুতরাং, ওদের কিতাবে ভুল থাকা অতি স্বাভাবিক। তাই বর্তমানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে সহজেই ভুলে ভরা বাতিল ধর্মগ্রন্থগুলোর অমিল থাকলে এত অবাক হওয়ার তো কিছুই নেই। কিন্তু সমস্যাটা শুরু হয় যখন কুরআনকেও ওই ধর্মগ্রন্থগুলোর সাথে একই কাতারে আনা হয়।

.

মানবজাতিকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া আল-কুরআন নিদর্শনে ভরপুর। সেখানে বারবার চিন্তাশীলদের জন্য আহ্বান জানানো হয়েছে। বলাই বাহুল্য, এখনও পর্যন্ত বিজ্ঞানের কোনো প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে কুরআনের কোনো কথা সাংঘর্ষিক হয় নি, হওয়া সম্ভব নয়। বরং বারবার কুরআনের মু'জিযা দেখেছে পৃথিবীর মানুষ। শুধুমাত্র এই সূর্য আর পৃথিবীর ব্যাপারটাতেই দেখুন আল্লাহ কী বলেছেন –

“ তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ। সমস্তকিছুই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে। ” (সূরা আম্বিয়া ২১:৩৩)

.

তাফসীরকারগণ বলছেন, ‘সমস্তকিছু’ বলতে সমস্ত ‘মহাজাগতিক বস্তু’ কে বোঝানো হয়েছে। মজার ব্যাপার হল, কোপার্নিকাস আর গ্যালিলিওর এতসব দরদভরা ইতিহাস রচনা করলেও তারাও যে “সূর্য মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে” অর্থাৎ, ‘সূর্য স্থির’ বলে ভুল করেছে সেকথা কিন্তু লেখক জাফর ইকবালের লেখায় আসে নাই। আর কুরআনের আয়াত সম্পর্কিত কোনোকিছুও আসে নাই।

কুরআন এখানে পরিষ্কার ভাবেই চাঁদ এবং সূর্যের একটি নিদিষ্ট অরবিটে ঘূর্ণনের কথা বলেছে। সূর্যের নিজ অক্ষে ঘুর্ণন এবং নিজস্ব অরবিটে গ্যালাক্সীর চারদিকে আবর্তন একটি সাম্প্রতিক আবিষ্কার। অথচ ১৫১২ সালে দেয়া কোপার্নিকাসের “Heliocentric theory” এর মতে সূর্য স্থির।

.

১৬০৯ সালে কেপলারের “Astronomia Nova ” নামক বইতে সব গ্রহের নিজ অক্ষের চারদিকে ঘুর্ণনের কোন কথা বলা হয় নি। সাম্প্রতিক গবেষনায় দেখা গেছে সূর্য ২৫ দিনে নিজ অক্ষে একবার ঘূর্ণন সম্পন্ন করে। কেবল গত শতাব্দীতে আমরা এইসব বিস্ময়কর তথ্য পাই। সূর্য 251km/s বেগে স্পেসের মধ্যদিয়ে 225-250 মিলিয়ন বছরে milkyway Galaxy এর কেন্দ্রের চারদিকে আবর্তিত হয়। অর্থাৎ বর্তমানে বিজ্ঞানের ঘোষণা হল "Sun rotates and Revolves."

.

ঠিক এ ঘোষণাই কুরআন ১৪০০ বছর আগে দিয়েছে। সূরা আম্বিয়ার ৩৩ নং আয়াতে যে শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে তা হল ‘ইয়াসবাহুন’। ‘সাবাহা’ শব্দটি থেকে এ শব্দটি এসেছে। এ শব্দটি কোন মাটিতে চলা লোকের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে বুঝতে হবে সে হাঁটছে অথবা দৌঁড়াচ্ছে। এ শব্দটি পানিতে থাকা কোন লোকের ক্ষেত্রে বলা হলে এর অর্থ এই না যে লোকটি ভাসছে, বরং বুঝতে হবে লোকটি সাঁতার কাটছে। এ শব্দটি কোনো মহাজাগতিক বস্তুর (Celestial body) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ করতে হবে এটা নিজ অক্ষে ঘুরছে সাথে সাথে কোন কিছুকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে!

.

বিদ্বেষীরা হয়তো বলবে যে, আয়াতটিতে পৃথিবীর আবর্তনের কথা আসে নাই। পৃথিবী কি তাহলে ‘সমস্ত মহাজাগতিক বস্তু’ থেকে বাইরে? তাছাড়া কুরআনের কোথাও ‘পৃথিবী স্থির’ একথা বলা হয় নাই। বাইবেলের প্রায় পাঁচটি জায়গায় সুস্পষ্টভাবে ‘পৃথিবী স্থির’ বলা হয়েছে। (কিছু না বলতে চেয়েও অনেককিছু বলে ফেললাম। এই বিষয়েও বিস্তারিত পরে লিখব ইন-শা-আল্লাহ)

.

এখন আমরা ধরে নিলাম যে জাফর ইকবাল কুরআনের এতসব তথ্য জানতো না। ব্যস্ত মানুষদের কুরআন নিয়ে চিন্তা ভাবনার সময় থাকে না... কিন্তু সে যদি নাই জানতো তাহলে এক চার্চের ঘটনা থেকেই সমস্ত ধর্মকে নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে কেন চলে আসা?

আচ্ছা একবার হলে বুঝলাম হয়তো আবেগের বশে লিখেছেন। কিন্তু একই ঘটনা বারবার এনে একসাথে সব ধর্মকে দোষারোপ তো ধর্মবিদ্বেষেরই প্রমাণ। একই বইয়ের ৩৮ পৃষ্ঠায় সে আরও লিখেছে -

" মহামতি গ্যালিলিও গ্যালিলির প্রতি যে অবিচার করা হয়েছিল সেটি বুঝতে ক্যাথলিক চার্চের সময় লেগেছিল মাত্র সাড়ে তিনশত বৎসর। পৃথিবীর কত বড় বড় মনীষীর হাঁটুর সমান মেধা নিয়ে শুধুমাত্র ধর্মের লেবাস পরে তাদের উপর নিপীড়ন করার উদাহরণ শুধু যে ক্যাথলিক চার্চে ছিল তা নয় অন্য ধর্মেও ছিল। শুধু যে অতীতে ছিল তাই নয় এখনও আছে।”
(একটুখানি বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ৩৮)

.

(চলবে ইন শা আল্লাহ)

.

শেয়ার করে বা অন্ধভক্তদের ট্যাগ দিয়ে তাদের অন্ধত্ব দূরীকরণের একটা ছোট চেষ্টা করে দেখুন। অবশ্য...
"It is not the eyes that are blind, but the hearts" (Surah Al-Haj, 22: 46)

#মুখোশের_অন্তরালে_নাস্তিকতা ১
#জাফর_ইকবাল

৯০

মুখোশের অন্তরালে নাস্তিকতা ২ –জাফর ইকবাল

-তানভীর আহমেদ

[প্রথম পর্বের জন্য দেখুন (#সত্যকথন) ৮৯]

.

বিজ্ঞান যেন তার রব

.

একজন মুসলিম যদি আল্লাহর নামে, ইসলামের নামে উল্টোপাল্টা কিছু রটাতে শোনে তার খারাপ লাগবে, রাগ লাগবে সেটাই স্বাভাবিক। আবার একজন হিন্দুও তার দেবতাদের নামে এমন রটাতে শুনলে তার খারাপ লাগবে। মোদ্দাকথা হল, যে যার যার ধর্মকে স্বাভাবিকভাবেই ভালবাসে, শ্রদ্ধা করে। আর এ থেকেই সে নিজের ধর্মের বিরুদ্ধে কিছু শুনলে নিজ জ্ঞান থেকে যথাসাধ্য ডিফেন্ড করতে চেষ্টা করে। এটা ওই ধর্মের উপর তার ঈমান আনার একটা লক্ষণ।

.

এবার এক মুহুর্ত চিন্তা করুন তো - যে মানুষ বিজ্ঞানকে নিজের রব করে নিয়েছে সে যদি বিজ্ঞান সম্পর্কে খারাপ কিছু শোনে? উত্তরটা সহজ। সে বিজ্ঞানকে ডিফেন্ড করতে চেষ্টা করবে, যেভাবে হোক বিজ্ঞানকে তার কলঙ্কমুক্ত করা চাই ই।

.

জাফর ইকবাল তার লিখায় ক্ষণে ক্ষণে বিজ্ঞানকে ডিফেন্ড করে থাকে। 'বিজ্ঞানের কোনো দোষ নেই... বিজ্ঞান আর প্রযুক্তি এক করে ফেলবেন না... প্রযুক্তি বাজে হতে পারে, বিজ্ঞান না...' ইত্যাদি ইত্যাদি। আবার কখনও আসে বিজ্ঞানীদের পক্ষে সাফাই – 'বিজ্ঞানীরা রাজনীতির স্বীকার হয়, ব্যবসায়ীদের লোভের স্বীকার হয়' ইত্যাদির মাধ্যমে সে স্বউদ্যোগে বিজ্ঞানীদের ডিফেন্ড করে যায়। বিজ্ঞানকে জাফর ইকবাল যেন রব করে নিয়েছে – কিন্তু এত সুন্দর করে ডিফেন্ড করার চেষ্টা সত্যিই অবাক করা।
'একটুখানি বিজ্ঞান' বইটির কিছু অংশ -

.

"মা এবং সন্তানের মাঝে তুলনা করতে গিয়ে একটা খুব সুন্দর কথা বলা হয়, কথাটা হচ্ছে 'কুপুত্র যদি বা হয়, কুমাতা কখনো নয়।' সন্তানের জন্য মায়ের ভালবাসা দিয়েই একটা জীবন শুরু হয় তাই মায়ের উপর এত বড় একটা বিশ্বাস থাকবে বিচিত্র কী? কুপুত্র এবং কুমাতা নিয়ে এই কথাটা একটু পরিবর্তন করে আমরা বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির জন্যে ব্যবহার করতে পারি, কথাটি হবে এরকম, "কুপ্রযুক্তি যদি বা হয়, কুবিজ্ঞান কখনো নয়।" যার অর্থ বিজ্ঞানটা হচ্ছে জ্ঞান আর প্রযুক্তিটা হচ্ছে তার ব্যবহার, জ্ঞানটা কখনোই খারাপ হতে পারে না, কিন্তু প্রযুক্তিটা খুব সহজেই ভয়ংকর হতে পারে। আইনস্টাইন যখন তার আপেক্ষিক তত্ত্ব নিয়ে চিন্তা ভাবনা করতে করতে লিখলেন E = mc2 তখন তার বুক একবারও আতঙ্কে কেঁপে উঠে নি। কিন্তু দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শেষের দিকে যখন হিরোশিমা আর নাগাসাকি শহরে নিউক্লিয়ার বোমা এক মুহুর্তে কয়েক লক্ষ মানুষকে মেরে ফেলল তখন তহন সারা পৃথিবীর মানুষের বুক আতঙ্কে কেঁপে উঠেছিল। এখানে E = mc2 হচ্ছে বিজ্ঞান আর নিউক্লিয়ার বোমাটা হচ্ছে প্রযুক্তি – দু'টোর মাঝে যোজন যোজন দূরত্ব।

.

প্রযুক্তি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রথমেই একটা কুৎসিত উদাহরণ দিয়ে সবার মন বিষিয়ে দেয়ার আমার কোনো ইচ্ছা নেই। মানুষ ক্রমাগত বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিকে গুলিয়ে ফেলে কাজেই দুটো বিষয়কে জোর করে হলেও আলাদা করে রাখা ভালো।"
(পৃষ্ঠা ১৬-১৭, একটুখানি বিজ্ঞান)

.

এতটুকু পড়ে হয়ত ভাববেন ভদ্রলোক তো ঠিকই বলছে। এখানে এত বাড়াবাড়ির কী আছে... আমিও তো বললাম সমস্যা নেই – সে তার দ্বীনকে ডিফেন্ড করছে। এটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু দেখুন এর পর পরই সে কী লিখেছে।

.

"... আলাদা করে রাখা ভালো। বিজ্ঞানের একটা গ্রহণযোগ্যতা আছে, আজকালকার ধর্মের বইগুলো দেখলেই সেটা বোঝা যায়। ধর্মীয় কোনো একটা মতকে সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে ফুটনোটে লেখা হয় "ইহা বিজ্ঞান মতে প্রমাণিত।" বিজ্ঞানের এই ঢালাও গ্রহণযোগ্যতাকে ব্যবহার করে প্রযুক্তি যদি ছদ্মবেশে আমাদের মাঝে জোর করে ঢুকে পড়ার চেষ্টা করে তার থেকে আমাদের একটু সতর্ক থাকা উচিত।" (পৃষ্ঠা ১৭, একটুখানি বিজ্ঞান)

.

কী বুঝলেন? প্রযুক্তিকে আলাদা বোঝাতে গিয়েও কৌশলে 'ধর্ম বিজ্ঞানের অধীন' এমন একটা মেসেজ দিয়ে দিলেন এই লোক। এটা নিয়ে এখনই অনেক কিছু লিখতে ইচ্ছে হচ্ছে কিন্তু এখনই নয়, এই বিষয়ে সামনে আলোচনা হবে ইন-শা-আল্লাহ। এখন আপাতত 'বিজ্ঞানকে যে এই লোক মোটামোটি নিজের রব বানিয়ে নিয়েছে তার আরও কিছু দৃষ্টান্ত দেখে নিই -

.

"... এটি এখন আর অস্বীকার করার উপায় নেই প্রযুক্তির মোহ আমাদের অনেক সময় অন্ধ করে ফেলছে, আমরা অনেক সময় কোনটা বিজ্ঞান আর কোনটা প্রযুক্তি সেটা আলাদা করতে পারছি না। বিজ্ঞানের কৃতিত্বটা প্রযুক্তিকে দিচ্ছি, কিংবা প্রযুক্তির অপকীর্তির দায়ভার বহন করতে হচ্ছে বিজ্ঞানকে।

.

ভোগবাদী পৃথিবীতে এখন খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে বিজ্ঞান এবং প্রয্যুক্তিকে আলাদা করে দেখা – তা না হলে আমরা কিন্তু খুব বড় বিপদে পড়ে যেতে পারি।" (একটুখানি বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ১৫)

.

"বিজ্ঞান নিয়ে কোনও সমস্যা হয় না কিন্তু প্রযুক্তি নিয়ে বড় বড় সমস্যা হতে পারে তার একটা বড় কারণ হচ্ছে বিজ্ঞানকে বিক্রি করা যায় না কিন্তু প্রযুক্তিকে বিক্রি করা যায়।" (একটুখানি বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ২১)

.

বিজ্ঞান যাদের রব তাদের কাছে আম্বিয়া কারা বলুন তো? সহজ উত্তর – বিজ্ঞান ধর্মের চর্চাকারী অর্থাৎ, বিজ্ঞানীরা! জাফর ইকবাল সাহেব লিখেছেন -

.

"পৃথিবীটাকে জঞ্জালমুক্ত করার জন্যে আবার তখন আমাদের বিজ্ঞানী আর প্রযুক্তিবিদদের মুখের দিকেই তাকাতে হবে। কারণ শুধু তারাই পারবেন আমাদের সতিকারের পৃথিবী উপহার দিতে।" (একটুখানি বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ২৩)

.

এমন উদাহরণ আরও বহু রয়েছে। সিরিজ শেষে একটা নোটে সবগুলো রেফারেন্স কাভার করব ইন-শা-আল্লাহ।

.

.

[৩] ধর্ম বিজ্ঞানের অধীন - এমন মেসেজ দেওয়া

"...ধর্মীয় কোনো একটা মতকে সাধারণ মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য করার জন্যে ফুটনোটে লেখা হয় "ইহা বিজ্ঞান মতে প্রমাণিত।" (পৃষ্ঠা ১৭, একটুখানি বিজ্ঞান)

.

এই লাইনটিতে এত কৌশল প্রয়োগ হয়েছে যে এটা নিয়ে আলাদা একটা প্যারাগ্রাফ লিখা লাগলো।

.

বিজ্ঞানের স্কেলে ধর্মের কোনো তথ্য মেপে দেখালে বিজ্ঞান ধর্মের চেয়ে উপরের স্তরে চলে যায় না। আর ইসলামের ব্যাপারটা

তো অন্যান্য ধর্মাবলি থেকে আলাদা। কারণ অন্যান্য ধর্মগ্রন্থগুলোর বিশুদ্ধতার ব্যাপারে সন্দেহ থাকলেও কুরআনের বিশুদ্ধতা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই – তা অবিকল ১৪০০ বছর আগে রাসূলুল্লাহ ﷺ এর উপর নাযিলকৃত কুরআনের অনুরূপেই রয়েছে। কিন্তু বিজ্ঞান ক্রমপরিবর্তনশীল - আজ এক কথা, কাল আরেক কথা বলে থাকে।

.

কুরআন যখন নাযিল হয়েছিল তখন 'আরবি সাহিত্য' এর স্কেলে একে মেপে দেখা হয়েছিল। বর্তমানে বিজ্ঞানের স্কেলে মেপে দেখা হয়। ভবিষ্যতে হয়তো অন্য কোনও স্কেলে মেপে দেখা হবে। কিন্তু স্কেল যেমন একটা tool ছাড়া কিছুই নয়, বিজ্ঞানও তেমনি আল্লাহর সৃষ্টিজগতকে বোঝার একটা tool ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই বুদ্ধিমান দায়ীরা স্কেল দিয়ে মাপার পর স্কেলের অবস্থানটাও পরিষ্কার করে দেন। সত্যকে যেকোনও স্কেল দিয়ে মেপে দেখাই যেতে পারে, স্কেল যদি ঠিক থাকে তো সত্যকে জয়ীই দেখা যাবে।

.

সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ... তাঁর চেয়ে সত্যবাদী কেউ হতে পারে না। আর একারণেই আল্লাহর পক্ষ থেকে কুরআন ও ইসলাম হল সর্বোচ্চ ও অপরিবর্তনীয়। কিন্তু আরবি সাহিত্যের তো তাও একটা নির্দিষ্ট ব্যকরণ ছিল, বিজ্ঞানের তো সেইরকম নির্দিষ্টতা বলতেও কিছু নেই – আজ এককথা তো কাল আরেক কথা। আর একই জিনিস নিয়ে হাজারটা থিউরি তো আছেই।

.

এছাড়াও আমরা 'থিউরি' বা তত্ত্বকে অনেক সময়ই 'ফ্যাক্ট' বা সত্যের সাথে গুলিয়ে ফেলি। মাল্টিভার্স থিউরি বা ইভল্যুশন থিউরি যতই চটকদার হোক না কেন, থিউরি কেবলই থিউরি - সত্য নয়।

.

মোদ্দাকথা হল, বিজ্ঞান মনুষ্যলব্ধ জ্ঞান আর ওহী হল স্বয়ং স্রষ্টা প্রদত্ত জ্ঞান। মনুষ্যলব্ধ জ্ঞান কখনও প্রমাণিত সত্য হলে স্রষ্টাপ্রদত্ত ওহীর সাথে মিলে যাবে সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই মিলে যাওয়াকে ব্যবহার করে সত্যের দিকে আহ্বান করলেই মনুষ্যলব্ধ জ্ঞান স্রষ্টাপ্রদত্ত জ্ঞান থেকে উপরের স্তরে চলে যায় না। মানুষের সেই জ্ঞানও আসলে স্রষ্টার রহমতস্বরূপ - তা তো খুব অল্পই বুঝতে পারে।

.

(চলবে ইন-শা-আল্লাহ)

.

শেয়ার করে বা অন্ধভক্তদের ট্যাগ দিয়ে তাদের অন্ধত্ব দূরীকরণের একটা ছোট চেষ্টা করে দেখুন। তবে...

.

"It is not the eyes that are blind, but the hearts" (Surah Al-Haj, 22: 46)

.

#মুখোশের_অন্তরালে_নাস্তিকতা ২
#জাফর_ইকবাল

৯১

নাস্তিকদের অভিযোগ খণ্ডন – ৪; প্রাক ইসলামিক যুগে আরবের নারীরা কি বেশি স্বাধীন ছিল? (১ম পর্ব)

-জাকারিয়া মাসুদ

[আগের পর্বগুলোর জন্য দেখুন(#সত্যকথ) ৮৭ ও(#সত্যকথন) ৮৮]

.

স্বঘোষিত নাস্তিক ড. হুমায়ুন আজাদ তার বিভিন্ন লিখনীর মাধ্যমে একথা প্রমাণ করতে চেয়েছেন যে, ইসলাম পূর্ব আরবে নারীদের অধিকার, মর্যাদা ও সম্মান বেশী ছিল এমনকি সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে নারীদেরকে বেশী মূল্যায়ন করা হত। কিন্তু আরবে ইসলাম যখন প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তখন নারীরা তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ড. আজাদের ভাষায়ঃ

.

" আরব নারীদের নানা ইতিহাস লিখা হয়েছে; সবগুলোতেই স্বীকার করা হয় যে ইসলাম পূর্ব আরবে অনেক বেশী ছিলো নারীদের স্বাধীনতা ও অধিকার। তারা অবরোধ থাকত না অংশ নিত সমস্ত সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ডে; এমনকি তাদের প্রাধান্য ছিলো সমাজে"। .... প্রচারের ফলে মুসলমানদের মধ্যে জন্মেছে এমন এক বদ্ধমূল ধারণা যে ইসলামপূর্ব আরবে নারীদের অবস্থা ছিলো শোচনীয়; ইসলাম উদ্ধার করে তাদের। প্রতিটি ব্যবস্থা পূর্ববর্তী ব্যবস্থার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালায়; তবে ঐতিহাসিক ভাবে সাধারণত সত্য হয় না"।

.

[হুমায়ুন আজাদ,নারী, অধ্যায়ঃ- পিতৃতন্ত্রের খড়কঃ আইন বা বিধিবিধান ; পৃষ্ঠাঃ-৮১; (আগামী প্রকাশনী,৩৬ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ৩য় সংস্করণ, ষষ্ঠদশ মূদ্রণ, মে ২০০৯)] ।

.

অন্যত্র তিনি লিখেছেনঃ- "ইসলামের আগে আরবের নারীদের অবস্থা যতোটা খারাপ ছিল বলে প্রচারিত ততোটা খারাপ ছিল না, ঐতিহাসিকদের মতে নারী অনেক বেশী স্বাধীন ছিলো অন্ধকার যুগের আরবে"।

.

(হুমায়ুন আজাদ, নারী, অধ্যায়ঃ- পিতৃতন্ত্রের খড়কঃ আইন বা বিধিবিধান ; পৃষ্ঠাঃ-৩৬৯)

.

কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, তিনি এই আলোচনা করতে গিয়ে না ইতিহাস থেকে কোন দলীল দিতে পেরেছেন। আর না তার পক্ষে কোন ঐতিহাসিকের মতামত উপস্থাপন করতে পেরেছেন। শুধুমাত্র একটি হাদীস উল্লেখ করেছেন যাও এই ক্ষেত্রে দলীল হিসেবে ব্যবহার করার অযোগ্য। আমরা আমাদের আলোচনা শুরুর পূর্বে একথা বলব, ড. আজাদ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে নারীদেরকে স্রষ্টার মনোনীত দ্বীন ইসলাম থেকে দূরে নিয়ে যেতে চেয়েছেন।

.

তিনি হয়ত ভেবেছেন তার নিজস্ব চিন্তাধারা এবং অযৌক্তিক মিথ্যা বক্তব্যের দ্বারা মুসলিম নারীদের তিনি অতি সহজেই বিভ্রান্ত করতে পারবেন। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছায় আমাদের সামনে মুসলিম জাতির ইতিহাস বিশুদ্ধ সনদে সংরক্ষিত রয়েছে। আমাদের সম্মানিত বিদ্বানরা তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে আমাদের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে যাচাই বাছাই করে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। আমাদের কে মিথ্যা প্রলোভন দেখিয়ে বিভ্রান্ত করার কোন সুযোগ নেই, আলহামদুলিল্লাহ। আমরা আমাদের কাছে সংরক্ষিত ইসলামের বিশুদ্ধ ইতিহাস ও সেই সাথে অমুসলিম ঐতিহাসিকদের মতামত থেকেই দেখাবো যে,

ইসলাম আগমনের পূর্বে আরব জাতির সামাজিক অবস্থা কত বর্বর ছিল এবং সেই সময়ে নারীদের অবস্থা কতটা শোচনীয় ছিল। মহান আল্লাহই তাওফীকদাতা।

.

কোরআনকে যেহেতু নাস্তিকরা দলীল হিসেবে মেনে নিতে অস্বীকার করে (কিন্তু আমাদের কাছে কোরআনই হল সর্বোত্তম দলীল) তাই আমরা প্রথমেই আপনার সামনে অমুসলিম লেখকদের বই থেকে ইসলাম পূর্ব আরবে বিদ্যমান নারীদের অবস্থার বর্ণনা প্রদান করছি।

.

বিখ্যাত অমুসলিম ঐতিহাসিক গীবন (Gibbon) আরবজাতির তৎকালীন বর্বরতার বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন -

.

"In this primitive and abject state, which will deserve the name of society, this human brute, without arts and laws, almost without sense and language, is poorly distinguished from the rest of the animal creation".

.

"আদিম সমাজ ও জঘন্য পরিস্থিতির মধ্যে আইন কানুন,ভাষা ও জ্ঞান বিবর্জিত সমাজ নামের অযোগ্য এই নররূপি পশুদিগকে অন্যান্য ইতর জীব হতে পৃথক করা যায় না"।

.

{Badruddoza, Muhammad(sm): His Teachings and Contribution, p.39.; (Islamic Foundation, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, 6th edition, 2009)}

.

ইসলাম বিদ্বেষী লেখক রবার্ট স্পেন্সার (Robert Spencer) ইসলাম পূর্ব আরবে নারীদের অবস্থার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে তার "The Truth About Mumammad" বইতে লিখেছে -

.

"Pagan Arabia was a rough land. Blood feuds were frequent, and the people had grown to be as harsh and unyielding as their desert land. Women were treated as chattel; child marriage (of girls as young as seven or eight) and female infanticide were common, as women were regarded as a financial liability".

.

"পৌত্তলিক আরব ছিল রুক্ষ ভূমি। সেখানকার লোকজন মরুভূমির মত অত্যন্ত একরোখা ও কর্কশ মনোভাব নিয়ে বেড়ে উঠত, রক্তগত শত্রুতা ছিলো পুনরাবৃত্তিমূলক। সেখানকার নারীদেরকে অস্থাবর সম্পত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হত। বাল্য বিবাহ (যেসব নারীদের বয়স ৭ অথবা ৮) এবং কন্যা শিশু হত্যা ছিল তাদের কাছে অতি সাধারণ ব্যাপার। নারীরা সমাজে আর্থিক দায়বদ্ধতার বস্তু হিসেবে বিবেচ্য হত"।

.

Robert Spencer, The Truth About Muhammad, p.34; (An Eagle Publishing Company, Washington, DC, 2006).

.

আরেক ইসলাম বিদ্বষী লেখক স্যার উইলিয়াম মুর (William Muir) প্রাক ইসলামিক আরবের অধঃপতনের চিত্র অংকন করেছে এইভাবে -

.

"The religion was a gross idolatry and their faith the dark superstitions dread of unseen beings; rather than belief in an overruling providence. The life to come and retribution for good and evil were, as motivates of action, practically unknown. Thirteen years before the Hijrat (July 2nd AD. 622) Mecca lay lifeless in this debased state".

.

"তাদের ধর্ম ছিল জঘন্য পৌত্তলিকতা এবং তাদের বিশ্বাস ছিল এক সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের স্থলে বিভিন্ন অদৃশ্য শক্তির জন্য কুসংস্কার ও অজ্ঞতা পূর্ণ ভীতি। কর্ম প্রেরণার উৎস হিসেবে পরকাল ও ভালো মন্দের ফলাফলের উপর বিশ্বাস ছিল আরবজাতির অজানা। হিজরীর ১৩ বছর মক্কা এই অধঃপতিত অবস্থায় নিষ্প্রাণ হয়ে পড়েছিল"।

.

Sir William Muir, Life of Mahomet, p.509, london,1858.

.

.

বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত মুক্ত বিশ্বকোষ 'উইকিপিডিয়াতে' ইসলাম পুর্ব আরবে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে বলা হয়েছে -

.

"Before Islam, women experienced limited rights, except those of high status. They were treated like slaves and were not considered human. Women were not considered "worthy of prayer" and played no role in religious life. It is said that women were treated no different from "pet goats or sheep". Women could not make decisions based on their own beliefs ...their view was not regarded for either a marriage or divorce. ...They could not own or inherit property or objects, even if they were facing poverty or harsh living conditions. Women were treated less like people and more like possessions of men. ...Essentially, women were slaves to men and made no decisions on anything, whether it be something that directly impacted them or not. If their husband died, his son from a previous marriage was entitled to his wife if the son wanted her".

.

"ইসলাম আগমনের পূর্বে অভিজাত শ্রেণি ব্যতীত অন্যান্য নারীদের খুবই সীমিত অধিকার ছিল। তাদেরকে দাসীর ন্যায় বিবেচনা করা হত এবং মানুষ বলেই গণ্য করা হত না। নারীরা ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন ভূমিকাই পালন করত না এবং প্রার্থনার ক্ষেত্রে তাদেরকে অযোগ্য বলে বিবেচনা করা হত। এটিও বলা হয় যে, পোষা ছাগল কিংবা ভেড়ার তুলনায় তাদেরকে আলাদা করে দেখা হত না। নারীরা তাদের বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করে কোন কোন পদক্ষেপ নিতে পারত না ...তালাক ও বৈবাহিক ব্যাপারে তাদের মতামত প্রদানের অধিকার ছিল খুবই সীমিত পর্যায়ের। ... উত্তরাধিকার সূত্রে তারা কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারত না এমনি দরিদ্রাবস্থা কিংবা জীবনের কঠোরতম অবস্থাতেও না। মহিলাদের খুব কমই মানুষ হিসেবে বিবেচনা করা হত বরং তারা পুরুষের অধিকৃত বস্তু হিসেবে বিবেচিত হত। ...মূলত নারীরা ছিল পুরুষের দাসী এবং কোন ক্ষেত্রেই তাদের মতামত প্রদানের অধিকার ছিল না। ...যদি কোন মহিলার স্বামী মারা যেত তাহলে উত্তরাধিকার সূত্রে তার সৎ ছেলে তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করত"।

.

https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_pre-Islamic_Arabia

.

এই হল অমুসলিম লেখকদের দেয়া ইসলাম পূর্ব আরবে বিদ্যমান নারীদের অবস্থা। উপরের বর্ণনাগুলো থেকে আমাদের কাছে এ কথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, ইসলাম পূর্ব আরবে নারীরা কতটা অধিকার বঞ্চিত, কতটা অত্যাচারিত, কতটা লাঞ্ছিত, কতটা

নিপীড়িত-নিগৃহীত ছিল।

.

ইসলাম পূর্ব আরবে নারীরা ছিল পুরুষের একান্ত বাধ্যগত দাসী। সামাজিকভাবে ছিল না তাদের কোন মর্যাদা। রাষ্ট্রীয়ভাবে তাদেরকে মতামত প্রদানের কোন সুযোগ প্রদান করা হত না। উত্তরাধিকার সূত্রে তারা কোন সম্পত্তির মালিক হতে পারত না। বিয়ে কিংবা তালাক কোন বিষয়েই তারা তাদের নিজস্ব মতামত প্রদান করার সুযোগ পেত না। আর ধর্মচর্চার ক্ষেত্রে তারা একান্তই অযোগ্য বলে বিবেচিত হত। সর্বোপরি অমুসলিম লেখকদের দেয়া বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, ইসলাম পূর্ব পৌত্তলিক আরবে নারীদেরকে মানুষ নয় বরং গৃহপালিত পশু হিসেবেই বিবেচনা করা হত। (তবে অভিজাত শ্রেণীর নারীরা ছিল এর ব্যতিক্রম; যাদের সংখ্যা ছিল নিতান্তই সামান্য)

.

আর এটাই হল ড. আজাদ বর্ণিত নারী স্বাধীনতার আরব। ড. আজাদের মত নাস্তিকরা যদি নারী অধিকারবঞ্চিত প্রাক-ইসলামিক আরবের পক্ষে কলম ধরে ইসলাম পরবর্তী আরবের বিরোধিতা করতে চান; তো আমাদের আর একথা বুঝতে আর বাকী থাকে না যে, নাস্তিকদের চিন্তাধারা কতটা নারী বিদ্বেষী!

.

তারা নারীদেরকে কতটা নীচে নামাতে চায়!
তারা নারীদেরকে কতটা অধিকার বঞ্চিত করতে চায়!

.

(ইনশাআল্লাহ চলবে ....)

.

#হুমায়ুন_আজাদ – ২

৯২

উপলব্ধিঃ ধর্মের আবশ্যকতা

-জাকারিয়া মাসুদ

সকাল সাড়ে নয়টা। আকাশে প্রচণ্ড মেঘ জমেছে। মেঘমালা ক্রমেই ঘনীভূত হয়ে আসছে। হয়ত বৃষ্টি নামবে। মেঘের কালো ছায়ায় দীপ্তিমান সূর্যটা যেন ক্রমেই আড়াল হয়ে যাচ্ছে। একটা সময় সূর্যটা যেন কোথায় হারিয়ে গেল। মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হল।

.

জানালার ফাঁক দিয়ে উকি মেরে বৃষ্টির রিম-ঝিম শব্দটা উপভোগ করছিলাম। ছোটবেলার কথা মনে পড়ছিল। আমি তখন ক্লাশ ফাইভে পড়ি। আমাদের স্কুলের ইংরেজি শিক্ষিকা ক্লাসে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন,
ছেলেরা, তোমরা কি কেউ বলতে পারবে Cats and dogs অর্থ কি?

.

আমরা সকলেই সমস্বরে বলে উঠলাম "বিড়াল এবং কুকুর", ম্যাম।

.

আমাদের উত্তর শুনে ম্যামের হাসি যেন আর থামছেই না। ম্যামের হাসির কারণটা অবশ্য ক্লাশ সেভেনে উঠার পর বুঝেছিলাম। ছোটবেলার কথা চিন্তা করতে করতে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম। হঠাৎ কলিংবেলের আওয়াজ।

.

মা বলল, দেখত কে এল?
- যাই মা।
আমি দরজা খুলতে গেলাম। দরজা খুলতেই কানে ভেসে আসল আসসালামুয়ালাইকুম।

.

- ওয়ালাইকুমুসসালাম। ফারিস, তুই?
- তুই না রাতে ফোন করে আসতে বলেছিলি?
- তাই বলে এত বৃষ্টিতে?
- আমি কথা দিয়েছিলাম দশটায় আসব। কথা তো রাখতেই হবে দোস্ত।

.

ফারিস আমার ক্লাশমেট। সেই ফার্স্ট ইয়ার থেকেই ছেলেটার সাথে আমার পরিচয়। মাঝারি গড়নের, ফর্সা, মাথার চুলগুলো পাতলা কিন্তু দাড়ি বেশ ঘন। দাঁতগুলো মুক্তার মত। ফারিসের সবথেকে নজরকাড়া বৈশিষ্ট্য হল তার হাসি। খুব সুন্দর মুচকি হাসতে পারে। কথা বলার সময় তার ঠোটের কোণায় সব সময় এক ঝলক হাসি লেগে থাকে। অনেক সুন্দর করে গুছিয়ে কথা বলতে পারে। পারবে না কেন? ও জানে প্রচুর। একাডেমিক পড়শুনার থেকে অন্যান্য বই-ই বেশি পড়ে। সময় পেলেই বই নিয়ে পড়ে থাকে। একটানা অনেকক্ষণ পড়তে পারে। বই পড়ার প্রতি ওর মাত্রাতিরিক্ত আগ্রহ দেখে আমরা প্রায়ই ঠাট্টা করে বলাম, ফারিস তোকে আমরা বই এর সাথে বিয়ে দিয়ে দেব। ও বই এতটাই দ্রুত পড়তে পারত যে, আমাদের একপাতা শেষ না হতে হতেই ও দুই পাতা পড়ে ফেলতে পারত।

.

প্রচণ্ড তাক্বওয়াবান ছেলে। নামাজ, রোজা, যিকির, ব্যক্তিগত আমলের ব্যাপারে খুবই সচেতন। আর সময়ের প্রতি তার সচেতনতার মাত্রাটা আমাদের সকলের থেকে বেশি। তাই এই তুমুল বৃষ্টিতে ভিজেও সে টাইমলি চলে এসেছে।

.

আমি বললাম, আয় ভেতরে আয়।

- চল।

.

ফারিসকে বসার ঘরে বসতে দিয়ে আমি ভেতর থেকে গামছা এনে বললাম,
এই নে ভেজা শরীরটা মুছে নে, নয়ত ঠাণ্ডা লাগবে।

.

ফারিস শরীর মুছতে মুছতে বলল, কি যেন বলবি বলেছিলি?

- এত তাড়া কিসের?

- রাহাতের সাথে দেখা করতে যেতে হবে। আর ১১ টায় যাব বলে কথা দিয়েছিলাম। তাই আর কি।

.

ফারিস কথা দিয়ে কথা রাখে নি এমন উদাহরণ নেই। ওর মুখে প্রায়ই শুনতাম কথা দিয়ে কথা না রাখা হল মুনাফিকদের লক্ষণ। অগত্যা চলে যাবে বিধায় আমি আসল ব্যাপারটা ওকে জানালাম।

.

আমার ফুপাত ভাই আসিফ। প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে বি.বি.এ করছে। কিছুদিন আগেও যে ছেলেটা নামাযে অবহেলা করত না, আজ সে সংশয়বাদীদের কাতারে নাম লিখাতে বসেছে। কোন এক নাস্তিক লেখকের পাল্লায় পরেছে। ধর্ম ব্যাপারটা তার কাছে নাকি আদিম বলে মনে হয়। তার বক্তব্য হল বিশ্বায়নের এই যুগে ধর্মের কোন প্রয়োজনীয়তা নেই। যে মানুষ রকেট বানাচ্ছে, কৃত্তিম উপগ্রহ বানাচ্ছে, সুপার কম্পিউটার বানাচ্ছে সে মানুষ তার জীবনবিধানও নিজেই নির্ধারণ করে নিতে পারে। তাই সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বেকার বিধান অনুসরণ করার কোন যৌক্তিকতা তার কাছে নেই। আমি আসিফের বিষয়টা ফারিসের কাছে খুলে বললাম।

.

ফারিস বলল, ও আছে বাসায়?

- হুম। কালকেই এসেছে।

- ওর সাথে কথা বলা যাবে?

- সে জন্যেই তো তোঁকে ডেকেছি। আচ্ছা আমি ডাকছি।

.

আসিফ! আ--সিফ! এই আসিফ! এইদিকে আয়।

.

ভেতর থেকে আসিফ এল। ততক্ষণে চাও চলে এসেছে। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে ফারিস বলল,

- ভালো আছ আসিফ?

- জ্বি ভাল।

- তোমার পড়াশুনা কেমন চলছে?

- ভাল।

- বই পড়তে কেমন লাগে?

- ভাল।

- হুমায়ুন আজাদের বই পড়েছ, 'আমার অবিশ্বাস'?

- হুম।

- তোমার সংশয় এই বই থেকেই উদ্ভব হয়েছে, তাই না?

- আপনি কি করে জানলেন?

.

ফারিস উত্তর দিল না। কারণ বইটা সে আসিফের অনেক আগেই পড়েছে। সে পাল্টা প্রশ্ন করল।

.

- আচ্ছা তুমি মাও সেতুং এর নাম শুনেছ?
- হ্যাঁ শুনেছি।

.

আমি বুঝতে পারছিলাম না যে আলোচনার মধ্যে হঠাৎ মাও সেতুং আসল কেন? চুপ থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই দেখে নীরব শ্রোতার মত ফারিস ও আসিফের কথোপকথন শুনছিলাম।

.

ফারিস আসিফকে লক্ষ্য করে বলল, তুমি কি জান মাও সেতুং এর কারণে গণচীনে কতজন নিরীহ লোকের প্রাণহানি হয়েছিল?
- না।
- তার প্রত্যক্ষ নির্দেশে ৬- ১০ মিলিয়ন লোককে হত্যা করা হয়।
আমি তো অবাক, প্রায় ১০ মিলিয়ন লোক! এই বেটা তো বনী ইসরাইলের সিরিয়াল কিলারের থেকেও বেশি খারাপ। আসিফ চুপ, ফারিস কেবল মুচকি হাসল।

.

এরপর ফারিস আসিফকে লক্ষ্য করে বলল, বলতে পারবে জোসেফ ষ্ট্যালিনের নির্দেশে কি পরিমাণ নিরীহ মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল?
আসিফ না সূচক মাথা নাড়ল।

.

- ষ্ট্যালিন ছিলেন সমজতান্ত্রিক পৃথিবীর এক কুখ্যাত নেতা যিনি তার প্রজাদের রক্তে নিজের হাতকে রঞ্জিত করেছিলেন। তার শাসনামলে প্রায় ২০ মিলিয়ন লোককে হত্যা করা হয় যার মধ্যে শুধুমাত্র ককেশাস অঞ্চলেই মৃতের সংখ্যা ছিলো ১০০০০০০ জন।

.

আমি অবাক হয়ে বললাম, বাপরে এই বেটা তো সন্ত্রাসীদের বাপ নয়, দাদা। বলতেই হাসির রুল পড়ে গেল।

.

- আসিফ তুমি কি জান সমাজতন্ত্রীদের কারণে বিশ্বে কি পরিমাণ লোক নিহত হয়েছিল?
- অনেক।
- অনেক নয় এক্স্যাক্ট সংখ্যাটা বল।
- মনে নেই।
- The Black Book of Communism এর দেয়া তথ্যানুসারে বিশ্বে প্রায় ১০০ মিলিয়ন লোক নিহত হয় এদের কারণে। আচ্ছা আসিফ বল তো এদের এই কাজগুলো ঠিক না ভুল?
- অবশ্যই ভুল।
- কিভাবে বুঝলে?
- নিজের বিবেক দিয়ে।
- তাদের বিবেক অনুসারে এই কাজগুলো ঠিক ছিল না ভুল?
- ঠিক।
- আসিফ, তুমি তো অবশ্যই জান আমাদের দেশে মিনি স্কার্ট পরে বের হওয়াটা কি?
- অসভ্যতা।

- পশ্চিমা দেশগুলোতে?
- স্বাভাবিক।
- শুধু স্বাভাবিকই নয় বরং তাদের দেশে যদি কেউ বিকিনি পরেও রাস্তায় বের হয় তাহলেও সেটা তাদের দৃষ্টিতে দোষের কিছুই নয়। আবার তুমি যদি দক্ষিণ ফ্রান্সের সমুদ্র সৈকতে যাও, দেখতে পাবে সেখানে সকল বয়সের অসংখ্য নারী শরীরের ঊর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ উলঙ্গ করে টপলেস হয়ে রৌদ্রস্নান করছে। আরেকটু এগিয়ে আমেরিকার পশ্চিম উপকূলে যাও, সেখানে সৈকতে অসংখ্য ন্যুডিস্টদের সম্পূর্ণ উলঙ্গ হয়ে রৌদ্রস্নান করতে দেখবে। তাহলে এখন বল তো কোন সংস্কৃতিটা আমাদের জন্য আদর্শ বলে বিবেচিত হবে?

.

আসিফ চুপ। কিছু বলছে না।

.

- আচ্ছা আসিফ বল তো আমাদের দেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ১৯৭১ সালে সংগঠিত যুদ্ধকে তুমি কিভাবে দেখ?
- এটা মুক্তিযুদ্ধ। এটা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে আমাদের দেশের স্বাধীনতার লড়াই।
- হ্যা, অবশ্যই। অবশ্যই এটা মুক্তিযুদ্ধ। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে এই যুদ্ধটা কি ছিল?

.

আসিফ কিছু বলল না, তার মানে উত্তরটা তার জানা।

.

- তাহলে বলতো আসিফ, তুমি জীবনের প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কোন মানদণ্ড দিয়ে মানুষের কর্মগুলোকে বিচার করবে?
- বিবেক।
- তুমি যদি কেবল বিবেক বুদ্ধির উপরেই নির্ভর করে সব কর্মগুলোকে যাচাই করতে যাও তাহলে অবশ্যই সেটা ভুল হবে।
- কেন ভুল হবে?
- কারণ তোমার বিবেক যেটাকে ঠিক মনে করছে, সেটা অন্যের কাছে ঠিক মনে নাও হতে পারে। আবার অন্যের বিবেকের কাছে যেটা ঠিক মনে হচ্ছে সেটা তোমার কাছে ঠিক নাও মনে হতে পারে। কি পারে না?

.

আসিফ হ্যাঁ সূচক মাথা নাড়ল।

.

- তোমার চোখে মিনি স্কার্ট কিংবা বিকিনি পড়ে রাস্তায় বের হওয়াটা অন্যায় কিন্তু জাপানীদের চোখে তা স্বাভাবিক। তোমার চোখে নগ্ন হয়ে সমুদ্রসৈকতে স্নান করাটা অন্যায় কিন্তু পশ্চিমাদের চোখে তা স্বাভাবিক। তোমার কাছে মাও সেতুং কিংবা জোসেফ স্টালিনের কর্মকাণ্ডগুলো সন্ত্রাসবাদ মনে হলেও তাদের চোখে ও তাদের একনিষ্ঠ অনুসারীদের চোখে তা স্বাভাবিক। তোমার দৃষ্টিতে ১৯৭১ সালের যুদ্ধটা মহান স্বাধীনতার যুদ্ধ হলেও, পশ্চিম পাকিস্তানের দৃষ্টিতে তা সন্ত্রাসবাদ। তোমার কাছে সমকামিতা অস্বাভাবিক ব্যাপার হলেও হুমায়ুন আজাদ কিংবা অভিজিৎ রায়দের কাছে তা স্বাভাবিক। তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই একটা কিছুকে স্ট্যান্ডার্ড ধরতে হবে, যার সাথে তুলনা করে আমরা আমাদের সকল কর্মকে বিবেচনা করে দেখব যে কোনটা ঠিক আর কোনটা ভুল। আর এই স্ট্যান্ডার্ড যদি মানুষ ঠিক করতে যায় তাহলে বিপত্তি ঘটবে।

.

- কেন?
- কারণ এক দেশের স্ট্যান্ডার্ড আরেক দেশে চলবে না। এক সমাজের স্ট্যান্ডার্ড আরেক সমাজে চলবে না। এক শতাব্দীর স্ট্যান্ডার্ড আরেক শতাব্দীতে চলবে না। তুমি যেমন পশ্চিমাদের স্ট্যান্ডার্ড মানবে না, তারাও তোমাদেরটা মানবে না। তুমি যেমন গ্রীকদের স্ট্যান্ডার্ড মানবে না তারাও তোমারটা মানবে না। তুমি যেমন নগ্নবাদীদের স্ট্যান্ডার্ড ফলো করবে না, তারাও তোমারটা ফলো করবে না। তুমি যেমন অভিজিৎ রায়ের মত সমাকামীদের স্ট্যান্ডার্ড ফলো করতে আনইজি ফিল করবে, তারাও তোমারটা ফলো করতে

আনইজি ফিল করবে। আর মানুষের তৈরি ষ্ট্যান্ডার্ড পরিবর্তনশীল। তাহলে বল কোন জিনিসটা ঠিক আর কোনটা ভুল আমরা তা কিভাবে নির্ণয় করব?

.

আসিফ এবার একেবারে চুপ। মাথা নীচের দিকে করে আছে।

.

- একটা সময় প্রাচীন গ্রীক ছিল সভ্যতার রাজধানী, এরপর রোমান সভ্যতা। কিন্তু কালের আবর্তনে তাদের সমাজে প্রচলিত ষ্ট্যান্ডার্ড বর্তমান বিশ্বে অচল । শুধু অচল নয় হাসির পাত্রও বটে। তাই ষ্ট্যান্ডার্ড যিনি ঠিক করতে পারেন তিনি হলেন আমাদের স্রষ্টা। সেই স্রষ্টাই আমাদের ষ্ট্যান্ডার্ড হিসেবে পাঠিয়েছেন ধর্ম। ধর্মের বিধিবিধান ঠিক করার জন্য তিনি পাঠিয়েছেন ওহী। আর ওহীকে বাস্তবায়ন করার জন্য পাঠিয়েছেন নবী ও রাসূলদের। স্রষ্টা প্রেরিত ওহীকে যদি আমরা সকল কর্মের ষ্ট্যান্ডার্ড হিসেবে বিবেচনা করি তাহলে আর কোন সমস্যাই থাকে না। মানুষ আমার কিংবা তোমার বিবেক প্রসূত ষ্ট্যান্ডার্ড মানতে বাধ্য না হলেও স্রষ্টা প্রণীত ষ্ট্যান্ডার্ড মানতে ঠিকই বাধ্য, কেননা স্রষ্টা তাকে সৃষ্টি করেছে। আর মহান স্রষ্টা কর্তৃক প্রণীত সেই ষ্ট্যান্ডার্ড এর নাম হল আল কোরআন, যাকে আমরা মুসলিমরা সকল কর্মের ষ্ট্যান্ডার্ড হিসেবে বিবেচনা করি।

.

ফারিসের কথা শেষ হতেই আসিফ মাথা নিচু করে আমাদের সামনে থেকে চলে গেল। আমি ওকে আটকাতে যাব এই মূহুর্তে ফারিস আমাকে মাথা নেড়ে নিষেধ করল।

.

ফারিসের যাবার সময় হয়ে এল। আমি ওকে বিদায় দিচ্ছিলাম, এমন সময় ভেতর থেকে হঠাৎ আসিফ এসে ওকে জড়িয়ে ধরল। আসিফের চোখ দিয়ে পানি গড়িয়ে পড়ছে। ফারিসকে অনেক শক্ত করে ধরে বলল, সরি ভাইয়া অনেক বড় ভুল হয়ে গেছে।

.

ফারিস আসিফের দিকে তাকিয়ে বলল,
- সত্য এমনি ভাইয়া। সত্য আমাদের সকলকে আকর্ষণ করে। আমাদের অন্তরকে ছুঁয়ে যায়। কেননা স্রষ্টা আমাদেরকে সত্যকে মেনে নেয়ার যোগ্যতা দিয়েই দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। আর তুমি সেই সত্যের দিকেই ফিরে এসেছ। আলহামদুলিল্লহ, আল্লাহ তোমার সহায় হোন।

.

এমন আবেগঘন মুহূর্তটা দেখব কল্পনাও করি নি। চোখের পানি আটকাতে পারলাম না। মনে মনে বললাম, ফারিস তুই পারিসও বটে।

৯৩
প্রাণ রহস্যের অন্বেষণ

-মোহাম্মাদ মশিউর রহমান

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

.

" দা অরিজিন অফ লাইফ " ...
অর্থাৎ,জীবনের উৎপত্তি ...

.

সর্বকালেই,সর্বযুগেই যা মানবজাতিকে ভাবিয়েছে।
" আমার সৃষ্টি কীভাবে হলো? " ,কিংবা " এই মহাবিশ্বে প্রাণের উৎপত্তি-ই বা কীভাবে হলো? " ইত্যাদি আরও অনেক শাখা-প্রশাখা নিয়ে বিস্তৃত এই বিষয়টি নিয়ে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে,হচ্ছে,আর ভবিষ্যতেও হবে।

.

যথেষ্ট চেষ্টা করা হয়েছে,এই বিশাল বিশ্বজগতের ক্ষুদ্র এক বিন্দুর সমান গ্রহে,সর্বপ্রথম কীভাবে প্রাণের স্পন্দন দেখা গেল -তার উত্তর দিতে।
কিন্তু যতগুলো উত্তরই,যতধরণের উপায়েই দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে/হচ্ছে না কেন;কোথাও না কোথাও,কোন না কোন ধরণের গোঁজামিল বা অসঙ্গতির ইঙ্গিত উঁকি দিয়ে থাকতে দেখা যায়,তা সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন।

.

.

যে জিনিসের উৎপত্তি খুঁজতে এত হাঙ্গামা,অর্থাৎ "জীবন" বা " প্রাণ";তার তথাকথিত "উৎপত্তি"-র ব্যাখ্যা দেওয়ার চেষ্টা করে, এমন বেশ কয়েকটি মতবাদ বা আরও স্পেসিফিক্যালি বললে," সাজেশন " আছে। সেগুলোর নিজেদের মধ্যেও আবার দেখা যায় পারস্পারিক বিরোধিতা বা হাতাহাতি লেগেই থাকে,যে ব্যাপারে কিছু পরে আলোচনার চেষ্টা হবে ইন শা আল্লাহ।

.

তবে সবগুলো ক্ষেত্রেই ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে,গায়ে-মাথায় হাত বুলিয়ে অর্থাৎ যতরকমে সম্ভব,সবরকমভাবে একটা জিনিসই বলার বা ইন্ডিকেট করার চেষ্টা করা হয় যে- " LIFE arose from LIFELESS compounds "।
অর্থাৎ " জীবন "-এর উৎপত্তি হয়েছে " জীবনহীন " পদার্থ বা যৌগ থেকে।

.

তো জীবনের উৎপত্তি সম্পর্কে,অর্থাৎ এই ধরিত্রীতে জীবনের বা প্রাণের শুরু কীভাবে হলো তার ব্যাখ্যা প্রদানের চেষ্টায় রত যেসকল "সাজেশনের" কথা বলা হচ্ছিলো,তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু "সাজেস্ট" করা ব্যাখ্যা এখানে উল্লেখ করা হলো।

.

.

বলা হয়ে থাকে,যে শুরুর দিকের পৃথিবীর অ্যাটমোস্ফিয়ার "সম্ভবত" / "হয়তোবা" ক্ষুদ্র,সিম্পল কম্পাউন্ড যেমন পানি,নাইট্রোজেন,কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং সামান্য পরিমাণে মিথেন ও অ্যামোনিয়া ধারণ করতো।
১৯২০ সালে,অ্যালেক্স্যান্ডার ওপারিন ও জে.বি.এস হ্যালডেন পৃথকভাবে "সাজেস্ট" করেন যে,সূর্যের আলট্রাভায়োলেট রেডিয়েশন কিংবা লাইটনিং ডিসচার্জের (বজ্রবিদ্যুৎক্ষরণ) কারণে প্রাচীন পৃথিবীর অ্যাটমোস্ফিয়ারের অনুগুলো থেকে সিম্পল অর্গানিক (কার্বন-কনটেইনিং) যৌগ গঠিত হয়েছে।

.

স্ট্যানলি মিলার ও হ্যারোল্ড উরে নামের দুই ব্যক্তি অনেকটা সেই একই ধরণের একটা এক্সপেরিমেন্ট করেন ১৯৫২ সালে এবং পাবলিশ করেন তার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে,যেখানে তারা পানি,মিথেন,অ্যামোনিয়া ও হাইড্রোজেনের একটি মিক্সচারকে একটি ইলেকট্রিক ডিসচার্জে প্রায় একসপ্তাহ রাখেন।

ফলাফলে তারা সেখানে কিছু অ্যামিনো এসিডসহ আরও কিছু পানি-দ্রবণীয় অর্গানিক কম্পাউন্ড দেখেন।

.

কিন্তু লুপহোল বা ফাঁক-ফোঁকর থেকেই যায়।

সবচেয়ে বড় লুপহোল হলো,এর সবটাই একটা "সাজেশন" বা "প্রস্তাব",অথবা "ধারণা"।

.

কারণ প্রথমত,প্রাইমোর্ডিয়াল বা আদি পৃথিবীর যে অ্যাটমোস্ফিয়ারের বিভিন্ন অণুর কথার ব্যাপারে যে ধারণাটি করা হয়েছে,তা একে তো একটি ধারণা;

.

তার ওপরে তখন সেই পরিবেশে কোন অণুর পরিমাণ কতটুকুই বা ছিলো,আর স্ট্যানলি মিলার ও হ্যারোল্ড উরে-এর এক্সপেরিমেন্টে যে ঠিক সেই পরিমাণের বা অনুপাতেরই কম্পাউন্ড নেওয়া হয়েছিল কিনা -তার কোন উল্লেখই নেই।

.

দ্বিতীয়ত,তারা অর্গানিক কম্পাউন্ড গঠন হবার কেবল একটা পদ্ধতিরই কথা মাথায় রেখে এক্সপেরিমেন্টটি করেছিলেন,তাই বলে যে শুধুমাত্র সেই পদ্ধতিতেই তা হয়েছিলো-তা ১০০ ভাগ নিশ্চয়তার সাথে কখনোই বলা যাবে না;কারণ তা "সায়েন্স"-এর কোমড়ের জোর,অর্থাৎ "পর্যবেক্ষণ" করা কখনোই সম্ভব নয়।

.

আর বাস্তবে খেয়াল করলে দেখা যাবে,প্রকৃত সায়ন্টিস্টরা তা বলেনও না;কেবলমাত্র বঙ্গদেশীয় আর্টস,কমার্স,কলা-সাহিত্যের বিজ্ঞানীরা ছাড়া।

.

যেমন একটা উদাহরণে ব্যাপারটা ক্লিয়ার করা যাক।

ধারণা করা হয়,উদ্ভিদদের আগে সায়ানোব্যাকটেরিয়ারাই ২.৩ বিলিয়ন বছর আগের আশেপাশে "গ্রেট অক্সিজিনেশন ইভেন্ট" ঘটানোর জন্য,বা একেবারে প্রাক্টিক্যালি ০% থেকে পরিবেশে অক্সিজেনের পরিমাণ বাড়ানোর জন্য দায়ী।

.

অর্থাৎ অধিকাংশ সায়েন্টিস্টরাই ভাবেন যে আদি বা প্রাচীন পৃথিবীর অ্যাটমোস্ফিয়ার রিডিউসিং বা অক্সিজেনবিহীন ছিল;সায়ানোব্যাকটেরিয়ারাই প্রথমে অক্সিজেন বাড়িয়ে প্রায় ১০%-এর কাছাকাছি এনেছিলো,সেখান থেকে পরবর্তীতে উদ্ভিদদের উৎপত্তি হয়ে তারা সালোকসংশ্লেষণ করে বর্তমান পরিবেশে অর্থাৎ প্রায় ২১%-এ নিয়ে আসে।

.

কিন্তু ২০১১ সালের এক আর্টিকেলে প্রকাশ পায় যে,হেডিয়ান ইওন (যা শুরু হয়েছিলো প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর পূর্বে পৃথিবী শুরুর সাথে,এবং শেষ হয়েছিলো 4 বিলিয়ন বছর আগে)-এর অ্যাটমোস্ফিয়ারিক অক্সিজেন লেভেল বর্তমান সময়ের মত একই ছিল।

তাহলে উপায়?

.

"কেমনে কী?"

"how what?"

.

তো এখন যদি ভিন্ন কেউ উঠে দাঁড়িয়ে বলে যে-
" না,আমি ল্যাবোরেটরিতে পানির মধ্যে ইলেক্ট্রোলাইসিস বা বিদ্যুৎ চালনা করে দেখেছি/পেয়েছি যে,হাইড্রোজেন থেকে অক্সিজেনকে মুক্ত করে পাওয়া যায়;
আদি পৃথিবীর অ্যাটমোস্ফিয়ার তো প্রচুর রাফ ছিল,বজ্রবিদ্যুৎ তো সেক্ষেত্রে কোন ব্যাপারই না,কাজেই তখনকার সময়ে পানিতে বিদ্যুৎক্ষরণের মাধ্যমেই অক্সিজেন মুক্ত হয়ে জমা হয়েছে... "
-তা হলে সেটাকে কলাভবনের বিজ্ঞানীরা "সায়েন্টিফিক্যালি" নাল অ্যান্ড ভয়েড বলবেন কোন যুক্তিতে?

.

সেটা যে ঠিক এইভাবেই হয়েছে,তার পর্যবেক্ষণের অভাবের যুক্তিতে?
স্ববিরোধীতায় ভর দিয়ে আর কদ্দুর যাবেন দেশের বিজ্ঞানের ঠিকাদারেরা?

.

এসবের জ্ঞান থাকার কারণেই হয়তো কিছু বিজ্ঞানীরা বেরসিকের মতো মিলার-উরের "অ্যাসাম্পশন" বা "ধারণা"-টি,মূলত গ্যাস মিশ্রণের প্রারম্ভিক উপাদান হিসেবে ব্যবহার হওয়ার ব্যাপারটিকে চ্যালেঞ্জ করে বসলেন।
যা একটি সঠিক "কাজের মত কাজ" ছিল,যার কারণ হিসেবে বলা যায় অতি সাম্প্রতিককালে পাওয়া কিছু ব্যাপার যেগুলো "সাজেস্ট" করে যে পৃথিবীর আদিম বা মৌলিক,কিংবা প্রাথমিক অ্যাটমোস্ফিয়ার হয়তোবা মিলার-উরের পরীক্ষায় ব্যবহৃত গ্যাসসমূহ থেকে ভিন্ন রকমের মিশ্রণের ছিল।

.

বা আরেকটা ব্যাপার কম কথায় বলতে গেলে,

.

একই ধরণের সকল পরবর্তী পরীক্ষায় বা ল্যাবে প্রাপ্ত মিশ্রণ দেখা যায় যে রেসিমিক ধরণের,অর্থাৎ একই যৌগের ডানহাতি ও বামহাতি রূপ একই সাথে তৈরী হয় এবং অবস্থান করে;অথচ প্রকৃতিতে বা বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে প্রাপ্ত প্রায় সকল যৌগই একটি নির্দিষ্ট ধরনের,হয় ডানহাতি (যেমন কার্বোহাইড্রেট) অথবা বামহাতি (যেমন অ্যামিনো এসিড তথা প্রোটিন)।

.

কিংবা বলা যায় ২০০৮ সালে মিলার ও উরের প্রাক্তন ছাত্র জেফরি বাদার মিলার-উরের মত একই ধরনের পরীক্ষায় খেয়াল করা,যে বর্তমানে প্রচলিত আদি পৃথিবীর যেসকল মডেল পাওয়া যায়,সে পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইড আর নাইট্রোজেন মিলে নাইট্রাইটসমূহ তৈরী করে,যা অ্যামিনো এসিডসমূহ যত দ্রুত গঠিত হয় ঠিক ততটাই দ্রুততার সাথে সেগুলোকে ধ্বংস করে ফেলে।

.

পরবর্তীতে যখন বাদা মিলার-উরে টাইপের পরীক্ষা আয়রন ও কার্বোনেট মিনারেলস বা খনিজ দিয়ে পুনরায় করেন,তখন সেখানে অ্যামিনো এসিডে সমৃদ্ধ হতে দেখেন।

.

এই খনিজের ব্যাপারটা খেয়ালে রাখার অনুরোধ রইলো।

.

.

তো সেই চ্যালেঞ্জ যেসকল বিজ্ঞানীরা করেছিলেন,তারা আবার "সাজেস্ট" করলেন যে,প্রথম বায়োলজিক্যাল মলিকিউলস বা অণুসমূহ কিঞ্চিৎ ভিন্নভাবে গঠিত হয়েছে;অন্ধকারে এবং পানির নিচে।
সমুদ্র তলদেশের হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট (কোন গ্রহের সারফেসে বিদ্যমান একধরণের ফাটল,যার মাধ্যমে জিওথার্মালি উত্তপ্ত পানি বের হয়ে আসে;এগুলো সাধারণত সক্রিয় আগ্নেয়গিরির স্থানে,যেসব স্থানে টেকটোনিক প্লেটগুলো সরে যাচ্ছে,সমুদ্র বেসিনসমূহ এবং হটস্পটের কাছে পাওয়া যায়) ,যা প্রায় ৪০০°সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ধাতব সালফাইডের সলিউশন বা দ্রবণ নিঃসৃত করে -

"হয়তোবা" সমুদ্রের জলে বিদ্যমান সিম্পল কম্পাউন্ড থেকে অ্যামিনো এসিড এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র অর্গানিক অণু গঠনের উপযুক্ত অবস্থা প্রোভাইড করেছে।

.

আবারও সেই "ফির পেহলে সে"।
ঘুরেফিরে সেই "প্রোবাবলি" / "মেবী" / "হয়তোবা" ইত্যাদির বাঁধছাড়া প্রবাহ।

.

আচ্ছা,এখন একটা কথা বলা যায়।
যে এইযে যে উল্লেখিত "হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট",এটি তো এখনো অবধি পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে।
তাহলে এখনো কেন সেই ফ্রম দা স্ক্র্যাচ বা একেবারে প্রথম থেকে "জীবনের উৎপত্তি" হতে দেখা যায় না?

.

পৃথিবীর কথা নাহয় বাদই দেওয়া হলো।
কিন্তু এও তো "বিলিভ" করা হয় যে Saturn বা শনির চাঁদ Enceladus এবং Jupiter বা বৃহস্পতির চাঁদ Europa -তেও হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট রয়েছে,এমনকি Mars বা মঙ্গলেও একসময় এনশেন্ট বা প্রাচীন হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট ছিল বলে " স্পেকিউলেট " বা " কল্পনা " করা হয়।
এখন যদি শনির চাঁদকে তার বয়স নিয়ে চলমান কথা কাটাকাটির কারণে,আর তার সাথে "বাই ওয়ান,গেট ওয়ান ফ্রী" প্যাকেজে মঙ্গলের কথাও বাদ দেওয়া হয়,

.

তবুও তো বৃহস্পতির চাঁদখানা বেচারা অম্লানবদনে উঁকি দিয়ে থাকে,যে সিনিয়র সিটিজেনের বয়স প্রায় ৪.৫ বিলিয়ন বছর।

.

পৃথিবীর বুকে জীবনের সবচাইতে পুরোনো যে ফসিল প্রমাণ পাওয়া যায়,তা হলো প্রায় ৩.৫ বিলিয়ন বছর আগের;যেখানে পৃথিবীর বয়স ধারণা করা হয় প্রায় ৪.৬ বিলিয়ন বছর।

.

আবার সায়েন্টিস্টরা রিসেন্টলি এও "ধারণা" করতেছেন যে ৪.১ বিলিয়ন বছর আগেই "হয়তো" প্রাণ অস্তিত্বশীল হতে পারতো,যখন পৃথিবীর বয়স খুবই কম ছিল।

.

অর্থাৎ সোজা কথায়,পৃথিবীতে জীবনের সূচনা "সম্ভবত" ৩.৮ ও ৪.১ বিলিয়ন বছরের মাঝামাঝি সময়ে হয়েছে।

.

তাহলে ধারণা,প্রমাণ যা-ই ধরে আগানো হোক না কেন,জীবন যদি সেই হাইড্রোথার্মাল ভেন্টের সাহায্যেই বিকশিত হত;

.

তাহলে কি মনে হয় না,যে প্রায় পৃথিবীরই সমবয়সী এবং হাইড্রোথার্মাল ভেন্ট-সম্পন্ন হওয়া বৃহস্পতির চাঁদ Europa -তেও এতদিনে জীবনের উৎপত্তি বা বিকাশ যেটাই বলা হোক না কেন,সেই একই সময়ের ব্যবধানে ইতিমধ্যেই তা হয়ে যেত?

.

আর হয়ে উন্নত ও বুদ্ধিমান কোন জীব/প্রাণী এতদিনে সেখান থেকে "গজিয়ে" এসে আমাদের পরিচিত বিশ্বজগতে ভাগ বসাতে ভিড় জমাতো?

.

যাই হোক,কলাসাহিত্যের ব্যাকগ্রাউন্ডের "বিজ্ঞানী"-দের উত্তর আশা না করে এগিয়ে যাওয়া যাক।

.

এরপর যেমন আবার আছে ঘনীভবনের ব্যাপার-স্যাপার।

অর্থাৎ সিম্পল মনোমার অণু থেকে কমপ্লেক্স বা জটিল পলিমার অণুর উৎপত্তি হবার কাহিনী।

.

তো সেক্ষেত্রে কনডেনসেশন বা ঘনীভবন প্রক্রিয়া থাকবে,যার মাধ্যমে উপরের কার্যকলাপ সংঘটিত হবে;অর্থাৎ সিম্পল অণু যুক্ত হয়ে কমপ্লেক্স অণু তৈরী হবে।

.

আবার হাইড্রোলাইসিস বা পানিযোজন প্রক্রিয়াও থাকবে,যার মাধ্যমে সম্পূর্ণ তার বিপরীত হবে;অর্থাৎ জটিল অণু ভেঙে গিয়ে সাধারণ অণুতে ফিরে যাবে।
তো উপায়?

.

ঘনীভবনের চেয়ে যদি পানিযোজন বেশি হয়,অর্থাৎ গড়ার চেয়ে যদি ভাঙনের হার বেশি হয় -তাহলেই তো কেল্লা ফতে!

.

কারণ তাহলে কোষের উপাদান গঠন হয়ে ওঠার আগেই তা ভেঙে যাবে,ফলাফল জীবের অস্তিত্ব : error 404,not found ।

.

কাজেই যখন নিজেদের অস্তিত্ব নিয়েই টানাটানি পড়ে গেল,তখন বলা হলো যে তাহলে পানিযোজনের চেয়ে ঘনীভবনের,অর্থাৎ ভাঙার চেয়ে গড়ার হার বেশি হতে হবে।

.

কিন্তু শুধু মুখের কথায় তো আর পানি গরম হয় না;প্রশ্ন আসে পানিযোজনের চেয়ে যে ঘনীভবন বেশি হবে,তা কীভাবে হবে? কোন যুক্তিতে হবে,আর কেনই বা পানিযোজন কম হয়ে ঘনীভবন বেশি হবে;যেখানে "জীবনের উৎপত্তি"-র একটা উল্লেখযোগ্য "সাজেশন"-ই বলে যে জীবন শুরু হয়েছিলো আন্ডার ওয়াটার,বা পানির নিচে?

.

এর জবাবে এখন বলা হলো,
তাহলে "হয়তোবা" ক্লে মিনারেলস,বা কাদার খনিজসমূহ সেসমস্ত বিক্রিয়ার প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছে,এবং বিক্রিয়ার উৎপাদসমূহকে পানি থেকে পৃথক রেখেছে।
লে হালুয়া!
ঘুরেফিরে আবারও সেই মিনারেলস,বা খনিজ।

.

কিন্তু যখন- ক্কুরআনে বলা হয়েছে যে মানুষ তথা আদম (আলাইহিস সালাম)-কে কর্দম,বা কাদামাটির " Extract "/ " Essence " বা নির্যাস থেকে তৈরী করা হয়েছে[১] -এমনটা দেখানো হয়,তখন তো তা বঙ্গদেশীয় শিয়াল,প্যাঁচা,ভাল্লুক ইত্যাদির মুখোশ নিয়ে মঙ্গল কামনা করতে বের হওয়া প্রবল "বিজ্ঞানমনস্ক" সম্প্রদায়ের বাঁ পায়ের তল দিয়েও যায় না।
ব্যাপারটা তো অনলাইন নিউজ পোর্টালগুলোর-

.

" আর্টস,কমার্স,সাহিত্য,ললিতকলা প্রভৃতির তুখোড় 'বিজ্ঞানী'-দের তীব্র নাক সিঁটকানো উপেক্ষা করে,
একি বললেন সায়েন্টিস্টরা?! (ভিডিও ছাড়া) "
-জাতীয় খবরের হেডলাইন হয়ে যাবার মতো যোগ্যতা রাখে।

.

অবশ্য এক্ষেত্রে একটা কথা পরিষ্কার করা ভাল,যে এদেশের বিজ্ঞানের ঠিকাদারদের কাছে কেবল সেই সমস্ত "বৈজ্ঞানিক" ব্যাপার-স্যাপারই গুরুত্ব বহন করে,যা স্থূল দৃষ্টিতে হলেও ইসলামের বিপরীতে যায়;তা সে কেবল এক "হাইপোথিসিস' বা "সাজেশন",কিংবা "ধারণা"-ই হোক না কেন।

অন্যদিকে সায়েন্সের যেসমস্ত ব্যাপার সামান্য হলেও ইসলামের পক্ষে যাবার সম্ভাবনা আছে,কিংবা অ্যাটলিস্ট বিপক্ষে যাবার ব্যাপারে দূর-দূরান্ত দিয়েও কোন আভাস-ইঙ্গিত নেই;এখন হোক তা সে প্রতিষ্ঠিত ফ্যাক্ট কিংবা আন্ডারগোয়িং রিসার্চ, তা তাদের কাছে সেই সামান্য "ধারণা"-টুকুরও মর্তবা পায় না,যা ইসলামের বিরুদ্ধে যাওয়া সামান্য এক "হাইপোথিসিস" বা "অনুমান"-ও তাদের কাছে পেয়ে থাকে।

.

আর এখানেই মুসলিমদের সাথে তাদের মোটাদাগের পার্থক্য।
কারণ মুসলিমরা কখনোই বিজ্ঞানকে "পরম সত্য"-এর মাপকাঠি বানিয়ে ইসলামের যৌক্তিকতা খুঁজতে যায় না,বরং তারা ইসলামের স্ট্যান্ডার্ডে বিজ্ঞানসহ জ্ঞানের যাবতীয় স্তরকে মেপে থাকে;এখন তা সে হোক ইসলামের পক্ষে কিংবা বিপক্ষে,তাতে দিনে দিনে তারা সেসমস্ত "মুক্তচিন্তক"-দের অনুসরণে সাপের মত খোলস পাল্টায় না।

.

আবার কখনো কখনো তথাকথিত বিজ্ঞানীদেরকে বলে দেখা যায় যে,ক্বুরআনেই যদি এসব দেওয়া বা বলা থাকে,তাহলে মুসলমানরা আগেই কেন তা আবিষ্কার করে না;কেন শুধু কিছু আবিষ্কার হবার পরেই বলে যে এটা আমাদের গ্রন্থে বা ধর্মে আগেই ছিল -যার মাধ্যমে তাদের "মুক্তচিন্তা"-র সীমাবদ্ধতাটা তারা নিজেরাই দেখিয়ে দেয়।

.

কারণ ক্বুরআন বা দ্বীন ইসলামের উদ্দেশ্য কখনোই সায়েন্টিফিক আবিষ্কার করা না,বরং মুসলিমদের কাজ হলো কেবল শোনা এবং মানা[২]।
দ্বীন ইসলাম কখনোই স্বীয় অস্তিত্বের জন্য বিজ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল না,বরং বিজ্ঞানই সেধে গিয়ে দিনে দিনে দ্বীন ইসলামের নির্ভরযোগ্যতা আরও বাড়াতে কাজ করে যাচ্ছে।

.

তবে ক্বুরআন,যেহেতু এটি একটি ঐশী বাণী,ফলে এর মধ্যে মহাবিশ্বের বেশ কিছু রহস্য ন্যাচারালি বা খুব স্বাভাবিকভাবেই উন্মোচিত হয়েছে-যা কেবলই আমাদের মুসলিমদের ঈমান বৃদ্ধির জন্য ক্যাটালিস্ট বা প্রভাবক হিসেবে কাজ করে।

.

কিন্তু এখন সমস্যাটা দেখা যায় তখনই,যখন তথাকথিত নাস্তিক,সেকুলার বা মোটের উপরে স্বঘোষিত বিজ্ঞানীরা,তাদের "উত্তরাধিকার সূত্রে" প্রাপ্ত সম্পত্তি বলে মনে করা "সায়েন্স" বা বিজ্ঞানকে তাদেরই ব্যঙ্গ-বিদ্রুপ,তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা দ্বীনের সমান্তরালে চলে আসতে দেখে।

.

লজ্জা-শরমের মাথা খেয়ে তখন বিজ্ঞান বিজ্ঞান করা সেসকল প্রাণীদেরকে যখন বাধ্য হয়ে স্বীকার করতে হয়,যে দ্বীনের সে বিষয়টা যেটিকে "অবৈজ্ঞানিক" বা "ভিত্তিহীন" বলা হয়ে গেছে,তাকেই আবার নিজেদেরই ভর দেওয়া খুঁটি দিয়ে অবলম্বনের স্বীকৃতি দিতে হচ্ছে -তখনই মূলত এ ধরণের যুক্তিহীন আক্রমণ করে ব্যর্থ ক্রোধ সংবরণের চেষ্টা করা হয়।

.

অথচ দেখা যায় যে, মার্কোনি সাহেবের আগেই যে স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু বেতার তরঙ্গের গবেষণা ও আবিষ্কার করেছিলেন,অথচ তাকে নোবেল বা কোন ধরণের স্বীকৃতি দেওয়া হয় নি -এই অন্তর-নিংড়ানো আক্ষেপ নিয়ে তাদেরই "বিজ্ঞানচর্চা"-র অন্যতম পরম আস্থার স্থান,মুক্তমনা ব্লগে বিশাল এক আর্টিকেল প্রকাশিত হয়ে বসে আছে;আবার এরাই মুসলিমরা কেন তাদের চোখে আঙুল দিয়ে সায়েন্স ও ইসলামের পূর্বঘোষিত সামঞ্জস্যতা দেখিয়ে দেয়,তা নিয়ে ক্ষোভে গাল ফুলিয়ে বসে থাকে।

.

ঠিক কতটুকু মানসিক সংকীর্ণতা এবং একচোখা মনোভাব থাকলে এমন এমন সব আশ্চর্যজনক feat বা হতবুদ্ধি করে দেওয়া কার্যকলাপ করা সম্ভব হয়ে ওঠে,তা এই অধমের ধারণারও বাহিরে।

.

.
যাই হোক।
তো যে ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিলো;দা অরিজিন অফ লাইফ,বা জীবনের উৎপত্তি।

.

ইতিপূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে জীবন বা প্রাণের উৎপত্তি/বিকাশের ক্ষেত্রে একটা পুরোনো কাসুন্দিকেই বারবার ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে ইন্ডিকেটের চেষ্টা করতে দেখা যায় যে, " LIFE arose from LIFELESS compounds "।
অর্থাৎ " জীবন "-এর উৎপত্তি হয়েছে " জীবনহীন " পদার্থ বা যৌগ থেকে।
তো নব্য মডারেট,সেকুলার কিংবা নাস্তিক প্রমুখ "বিজ্ঞানমনস্ক"-দেরকে দেখা যায়,"হা রে রে রে" আওয়াজ তুলে এসে বলে যে- "দেখছো,বলছিলাম জীবনের শুরু বা সৃষ্টিতে কোন গডের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন নেই?যত্তসব গন্ডমূর্খ,মধ্যযুগীয় চিন্তা-চেতনাধারীর দল..."

.

কিন্তু সেসমস্ত কলাসাহিত্যিক বিজ্ঞানীরা জানেই না,যে তাদের এই "গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়ল" টাইপ যুক্তির(!?!) দাবী বা প্রমাণ,কোন সায়েন্টিস্টরা শক্তভাবে করেন নি বা আরও স্পেসিফিক্যালি বললে,আজ পর্যন্ত করতে পারেন নি।

.

কারণ জীবন বা লাইফ,অথবা প্রাণ -যাই বলা হোক না কেন,তার কোন গ্রহণযোগ্য সংজ্ঞাই আজ পর্যন্ত পাওয়া যায় নি;আর যেগুলোও বা পাওয়া যায়,তারও সবই কন্ট্রোভার্সিয়াল বা বিতর্কমূলক।

.

তবে সেসবের মাধ্যমেই ঘুরিয়ে-পেঁচিয়ে যে জিনিসগুলোই বলার চেষ্টা করা হয়,সেগুলো হলো যে- অর্গানিজমসমূহ কোষ দিয়ে গঠিত,তাদের মেটাবোলিজম বা বিপাকক্রিয়া হয়,বৃদ্ধি হয়,বংশবিস্তার করে ইত্যাদি ইত্যাদি -এসবই হলো প্রাণ,বা জীবন।

.

অতঃপর অরিজিন অফ লাইফের "গোজাঁমিলীয়" ব্যাখ্যার চেষ্টায় এসমস্ত সংজ্ঞার দ্বারা তথাকথিত বিজ্ঞানমনস্করা এ-ই বুঝানোর চেষ্টা করে যে,"প্রাচীন পরিবেশে জীবনহীন মৌল বা যৌগ থেকে অর্গানিক কম্পাউন্ড যেমন অ্যামিনো এসিড 'ইত্যাদি' তৈরী হয়েছে,এবং সেভাবেই জীবনের উৎপত্তি হয়েছে।

.

এখানে ওইসব 'কনসেপ্ট অফ গড'-গুহাবাসী চিন্তা-ভাবনা..."।

.

কিন্তু এই জীবন বলতে যে তারা কী বোঝে,বা আদৌ কিছু কি বোঝে কিনা,আল্লাহু 'আলাম।

.

কারণ তারা এই জিনিসটা অনুধাবন করতে অক্ষম হয় যে এই সমস্ত অর্গানিক কম্পাউন্ড অর্থাৎ অ্যামিনো এসিড তথা প্রোটিন,কার্বোহাইড্রেট,লিপিড প্রভৃতি কাজ করে "লাইফ" বা "জীবন"/"প্রাণ"-এর " ভেসেল " বা " ধারক " হিসেবে,এমন এক এখনো অবধি আনআইডেন্টিফাইড জিনিসের " বাহক " হিসেবে সার্ভ করে;
যার জ্ঞান কেবলমাত্র মহান সৃষ্টিকর্তারই এখতিয়ারে[৩],যার ব্যাখ্যা বা বর্ণনা তো দূরের কথা,আজ পর্যন্ত যা এমনকি ঠিকমতো সংজ্ঞায়িত করাও সম্ভব হয় নি।

.

অন্যথায় যদি এসমস্ত কম্পাউন্ডই জীবনের উৎস হতো,কেবলমাত্র যদি প্রতিটা অণু থেকে অঙ্গাণু- তথাকথিত অসীম পরিমাণ "অ্যাক্সিডেন্ট"/"এমনি এমনি ঘটে যাওয়া"-র মধ্যেও সূক্ষাতিসূক্ষভাবে খাপে খাপ খেয়ে একেকটি কোষ,টিস্যু,অর্গানিজম বা প্রাণী কিংবা মানুষ গঠন হলেই তাকে প্রাণ আছে বলা যেত;তাহলে তো কোন মানুষকে কোনদিনই মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হতো না।

.

কারণ একজন মানুষ জীবিত অবস্থায় তার দেহে ঠিক যে পরিমাণ অণু,পরমাণু থাকে,যেসমস্ত বায়োমলিকিউলসমুহ থাকে;সে ব্যক্তি মারা গেলেও তো সেই একই বস্তুসমূহ তার দেহে বিদ্যমান থাকে।

.

তাহলে কোন সে অজানা বিষয়ের ফলে একজন মৃত মানুষের দেহে পুনরায় DNA-এর রেপ্লিকেশন হয় না,কোষ বিভাজন হতে দেখা যায় না,মেটাবোলিজম চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়,একই নিউরন সেল থাকা সত্ত্বেও ব্রেইন ডেড ঘোষণা করা হয়?

.

অথবা কোন সে অজ্ঞাত কারণে একজন জীবিত ব্যক্তির দেহ মৃত্যুর পরের মত ডিগ্রেড বা ক্ষয়ে যায় না, টিস্যু বা অর্গানগুলো পঁচে-গলে দুর্গন্ধ ছড়ায় না?

.

কী সেই কারণ?

.

কোষের কার্যকলাপকেই প্রাণ হিসেবে আখ্যায়িত করার চেষ্টায় রত বঙ্গদেশের আর্টস,কমার্সের স্বঘোষিত কিংবা মুক্তমনা,সামুর মত ব্লগে "বিজ্ঞানচর্চা" করা এবং "কলাভবন ল্যাবোরেটরি"-তে অধ্যয়নরত "বিজ্ঞানী"-রা,আর কতই বা কথা প্যাঁচানোর চেষ্টা করবে?
যেই বিভিন্ন বায়োমলিকিউলে গঠিত কোষে বিভিন্ন মেটাবলিক বা বিপাকীয় কার্যকলাপ চলে,সেই একই বায়োমকিউলসমৃদ্ধ কোষে কেন মৃত্যুর পর সমস্ত কার্যকলাপ স্তব্ধ হয়ে যায়?

.

মানে জিনিসটা অনেকটা এরকম যে আপনি একটি সাইকেল চালাচ্ছেন,তো এক ব্যক্তি আপনাকে থামিয়ে জিজ্ঞেস করলো এতক্ষণ সাইকেলটির চাকা ঘুরছিলো কেন,বা সাইকেলটি চলছিলো কেন।
আপনি,কিংবা যেকোন সুস্থ মস্তিষ্কের ব্যক্তিই জবাব দিবেন,যে সাইকেলটির প্যাডেল মারছিলেন বলেই চাকা ঘুরছিলো বা সাইকেলটি চলছিলো;
কিন্তু সে ব্যক্তি বললেন যে "না,এটা হতে পারে না।বরং সাইকেলটির চাকা ঘুরছিলো বা সাইকেলটি চলছিলো বলেই আপনি প্যাডেল মারছিলেন।"
খুব কি যুক্তিসঙ্গত বলে মনে হচ্ছে?

.

আসল ব্যাপারটা ঠিক এই জায়গাতেই।
কোষ কিংবা অর্গানিজম,অথবা মানুষ -যাই বলা হোক না কেন,
সে ব্যক্তি "জীবিত" আছে,বা তার মধ্যে "প্রাণ"-এর অস্তিত্ব আছে বলেই যে তার মধ্যে এসকল ক্রিয়াকলাপ চলছে বা চলে;
এর বিপরীত অর্থাৎ এসমস্ত ক্রিয়াকলাপ চলছে বা চলে বলে যে সে "জীবিত" নয়,বা সে কারণে যে তার মধ্যে "প্রাণ"-এর সঞ্চার হয় নি -সেসমস্ত স্বঘোষিত "বিজ্ঞানচর্চাকারী"-রা এই মৌলিক ব্যাপারটা বুঝতেই অক্ষম হয়ে পড়ে থাকে।

.

এরা কিছু হলেই বা কোথাও কোন মিল পেলেই কমন অ্যানসেস্টর বা সাধারণ পূর্বপুরুষ খুঁজে,তা ইন্টারমিডিয়েট ট্রানসিশনাল ইন্ডিভিজুয়াল বা মধ্যবর্তী পরিবর্তনশীল ধাপ,অথবা সহজ ভাষায় মিসিং লিঙ্ক থাকা না থাকার তোয়াক্কাও না করে মুহূর্তের মধ্যে এক পূর্বপুরুষ থেকে উৎপত্তির কথা ঢালাওভাবে প্রচার করতে পারে; কিন্তু একই ডিজাইনের হওয়া দেখে,অর্থাৎ ১১৪টি (রিসেন্টলি পাওয়া সমেত ১১৮টি) মৌলের মধ্য থেকে সমস্ত জীবিত প্রাণীরই কেবল কার্বন-বেইজড লাইফফর্ম হওয়ার পেছনে যে একজন MASTER DESIGNER -এর হাত আছে-তা তারা সামান্য পরিমাণে "স্পেকিউলেট"-ও করতে পারে না,এই হলো তাদের মুক্তচিন্তার দশা।

.

কাজেই চিন্তা করুন,
বিজ্ঞানকে "পরম সত্য"-এর মাপকাঠি ধরার ভ্রান্ত ধারণা থেকে বেরিয়ে আসুন।
মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হয়ে উঠুন।

তথ্যসূত্রঃ
[১] ■তিনিই তোমাদেরকে কর্দম/কাদামাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, ...
-সূরাহ আল-আন'আম,২ এর প্রথমাংশ
.
■... কিন্তু সে (ইবলিস/শাইত্বন) বললো:"আমি কি এমন ব্যক্তিকে সাজদাহ করবো,যাকে আপনি কর্দম/কাদামাটির দ্বারা সৃষ্টি করেছেন?"
-সূরাহ আল-ইসরা সূরাহ বানী ইসরাঈল,৬১ এর শেষাংশ
.
■আমি মানুষকে [আদম (আলাইহিস সালাম)] কর্দম/কাদামাটির সারাংশ/নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি।
-সুরাহ আল-মু'মিনূন,১২
.
■তিনিই দৃশ্য ও অদৃশ্যের জ্ঞানী,পরাক্রমশালী,পরম দয়ালু,
■যিনি তাঁর প্রত্যেকটি সৃষ্টিকে সুন্দর করেছেন,এবং মানব সৃষ্টির সূচনা করেছেন কর্দম/কাদামাটি থেকে।
-সূরাহ আস-সাজদাহ,৬-৭
.
■(স্মরণ করুন) যখন আপনার পালনকর্তা মালাইকাকে বললেন:"নিশ্চয়ই,আমি কর্দম/কাদামাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করবো"।
-সূরাহ সাদ,৭১
এবং এছাড়াও আরও অনেক স্থানে...
.
[২]
■এবং তোমরা স্মরণ করো আল্লাহর নিয়ামাতের কথা,যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং ঐ অঙ্গীকারকেও যা তিনি তোমাদের কাছে থেকে নিয়েছেন,যখন তোমরা বলেছিলে:"আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম"।এবং আল্লাহকে ভয় করো।নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের অন্তরের গোপন বিষয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ খবর রাখেন।
-সূরাহ আল-মায়িদাহ,৭
.
[৩] ■এবং তারা আপনাকে রূহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে।বলে দিন,"রূহ আমার পালনকর্তার আদেশে ঘটিত।এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দান করা হয়েছে।"
-সূরাহ আল-ইসরা বা সূরাহ বানী ইসরাঈল,৮৫
.
■... তাঁর জ্ঞানসীমা থেকে কোন কিছুই তারা বেষ্টিত/অনুধাবন/অর্জন করতে পারবে না,যতটুকু তিনি ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত। ...
-সূরাহ আল-বাক্বারাহ,২৫৫ (আয়াতুল কুরসী) এর শেষের কিছু পূর্বের অংশবিশেষ

৯৪

ইসলামে দাস প্রথা ৩

-হোসাইন শাকিল

[প্রথম দুটি পর্বের জন্য দেখুন (#সত্যকথন) ৮৪ এবং (#সত্যকথন) ৮৫]

.

এই পর্বে ইসলামকে আঘাত করার ও প্রোপাগান্ডা ছড়ানোর জন্য কমিউনিস্ট, সোশ্যালিস্ট, নাস্তিক-মুক্তমনা, খ্রিস্টান মিশনারী তথা ইসলামবিদ্বেষীদের অনেক মুখরোচক একটি অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ। আর তা হলো ইসলাম কেন যুদ্ধবন্দিনী দাসীদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা বৈধ করেছে?

.

প্রাচীন গ্রীসে নারীদেরকে সম্পত্তি বলে বিবেচিত করা হত, আর যুদ্ধবন্দী নারীদের ধর্ষন করা ছিলো "সামাজিক ভাবে ব্যাপক গ্রহনযোগ্য যুদ্ধনীতি" [1]

রোম, গ্রীস ছাড়া অন্যান্য স্থানে নারীদের এর থেকে ভালো ব্যবহারের নিদর্শন পাওয়া যায়না। যেখানে যুদ্ধের পরে একটি অতি স্বাভাবিক ব্যাপার ছিলো ধর্ষন। যেখানে দাসীরা ছিলো সমাজের সবচেয়ে নিচু পর্যায়ের তাদের সাথে যেমন খুশি তেমন ব্যবহার করা যেত, যেখানে তারা ছিলো পুরুষের যৌনভোগের সস্তা বস্তু। তারা ছিলো অবজ্ঞা-অবহেলার পাত্র। যার সামান্য বর্ণনা দিতে গেলেও পৃথক গ্রন্থ লেখার প্রয়োজন, যা আমার উদ্দেশ্য নয়।

.

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে দীর্ঘদিনের সামাজিক ব্যাধি দাসপ্রথাকে ইসলাম পরিশীলিত ও নিয়ন্ত্রিত করেছে একদিকে যেমন শরীয়াতসম্মত জিহাদের মাধ্যমে কাউকে দাস বানানোর(Enslaving) এই একটি মাত্র পথই ইসলাম খোলা রেখেছে অন্যদিকে এর বিপরীতে দাসমুক্তির বেশ কিছু বাস্তবভিত্তিক ও যুগোপযোগী পথ উন্মোচন করেছে। আর তাই ইসলাম একটি পূর্নাঙ্গ জীবনবিধান হওয়ার কারনে সুদীর্ঘকাল থেকে চলে আসা দাসীদের সাথে অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত যৌনতাকে বন্ধ করতে এবং পাশাপাশি দাসীদের জৈবিক চাহিদা পূরনের জন্য শুধুমাত্র বৈধভাবে মালিকানায় প্রাপ্ত দাসীর সাথে শারীরিক মেলামেশাকে বৈধ করেছে।

দাসীর সাথে শারীরিক মেলামেশা আল্লাহ বৈধ করেছেন যা কুরআনের বিভিন্ন আয়াত দ্বারা প্রমানিত যেমন { (সূরা নিসা ৪:২৪), (সূরা মুমিনূন ২৩:৬), (সূরা আযহাব ৩৩:৫০), (সূরা মাআরিজ ৭০:৩০)},

.

আচ্ছা, তাহলে একজন কীভাবে কোন দাসীর পরিপূর্ণ মালিকানা লাভ করতে পারে?? তা দুটি উপায়েঃ-

১। নিজে কাফিরদের বিপক্ষে জিহাদে অংশগ্রহন করে নিজের গনীমতের অংশ থেকে যদি দাসী লাভ করে থাকে;

২। যদি অন্য কারো নিকট থেকে যিনি শারঈভাবে দাসীর মালিক তার নিকট থেকে দাসীকে ক্রয় করে থাকে;

.

আর এখানে কিছু ব্যাপার লক্ষনীয় তা হলো -

ক) উপরোক্ত দুই উপায় ছাড়া আর কোনো ভাবেই দাসীর মালিকানা পাওয়া যায় না তাই এই দুটি পন্থা ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে কেউ যদি চাকরানীর সংগে বা চুক্তিবদ্ধ হয়ে উপপত্নীরুপে কারো সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করে তবে তা হারাম ও ব্যভিচার বলে গন্য হবে[2];

খ) শারঈ জিহাদ যেহেতু শুধুমাত্র কাফিরদের বিপক্ষে লড়া যায় তাই মুসলিমদের দুই পক্ষের মধ্যেকার রাজনীতি, ভাষা, অত্যাচার, নিপীড়ন, জাতীয়তাবাদ ইত্যাদির কারনে সংঘটির যুদ্ধকে জিহাদের নাম দিয়ে সেখানে মুসলিম নারীদেরকে দাসী বানানো হারাম হবে এবং তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন অবশ্যই ব্যভিচার বলে গন্য হবে। তাই অনেক মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনাধারী মুখোশের অন্তরালের ইসলামবিদ্বেষীদের ১৯৭১ সালে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাংলাদেশের মা-বোনের সাথে আচরনকে পুজি করে ইসলামকে কটাক্ষ করে থাকে, যা তাদের জ্ঞানের স্বল্পতাকে প্রমান করে;

গ) দাসীর সাথে এমন সম্পর্ক করা ইসলামই প্রথম শুরু করেনি বরং ইসলাম পূর্বেকার এই সম্পর্কিত যাবতীয় ঘৃন্যতা ও বল্গাহীন পাশবিকতাকে বন্ধ করে দিয়ে একে নিয়ন্ত্রিত ও মানবিক করেছে;

ঘ) দাসীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক করা ইসলামের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ নয় বরং তা বৈধ;

.

দাসী মিলনের ব্যাপারে দৃষ্টিকোনঃ-

(১) ইসলামী রাষ্ট্রের খলীফা যদি সিদ্ধান্ত নেন যে যুদ্ধবন্দীদের ছেড়ে দেওয়া হবে না এমনকি মুক্তিপনের বিনিময়ে ও নয় তাহলে মুজাহিদিনরা (যারা জিহাদে সরাসরি অংশগ্রহন করেছেন) যদি গনীমতের মাল হিসেবে দাসী তার নির্দিষ্ট অংশে (হিসসা) পেয়ে থাকেন তাহলেই শুধু দাসী হালাল হবে অন্যথায় নয়। আর গনীমত বন্টন হওয়ার পূর্বে কোনোমতেই গনীমত থেকে কিছু নেওয়া যাবেনা এটাই সাধারন নিয়ম[3]

.

আর হাদীছে গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বে কিছু নেওয়ার ব্যাপারে কঠিন নিষেধাজ্ঞা এসেছে যে এমন করবে সে রাসুলুল্লাহর (صلى الله عليه وسلم) উম্মাত বলে পরিগনিত হবে না বলে হাদীছে কড়া তিরস্কার আছে।[4] আর তাই যেহেতু গনীমত বন্টনের পূর্বে কোনোমতেই গনীমত থেকে কিছু নেওয়া যাবেনা তাই দাসীর সাথে মিলিত হওয়ার কোনো প্রশ্নই উঠেনা আর কেউ এমনটি করলে তা যিনা বলে বিবেচিত হবে এবং সে অবশ্যই রজমের যোগ্য হয়ে যাবে।

.

যেমন হাদীছ বর্ণিত আছে যে, খালিদ (রাদি) যিরার ইবনুল আহওয়াজকে পাঠালেন। তারা বানী আসাদকে আক্রমন করলে সেখানে এক সুন্দরী নারীকে তারা বন্দী করলে। তিনি বন্টন হওয়ার পূর্বেই তাকে তার সঙ্গীদের নিকট থেকে চেয়ে নিয়ে তার সাথে মিলিত হলেন, পরবর্তীতে তিনি অনুতপ্ত বোধে খালিদ(রাদি) এর নিকট যেয়ে বললে খালিদ(রাদি) উমার ইবনুল খাত্তাবের(রাদি) নিকট লিখে জানালে। তিনি বলেন, যিরার রজমের যোগ্য (যেহেতু তিনি গনীমতের মাল বন্টনের পূর্বেই নিজের ইচ্ছামত নারীকে বেছে নিয়ে মিলিত হয়েছেন), পরবর্তীতে রজম করার পূর্বেই যিরার ইবনুল আহওয়াজ মারা যান। [5]

.

এই হাদীস থেকে বুঝা যায় যে গনীমত বন্টনের পূর্বে কোনোমতেই দাসীদের স্পর্শ ও করা যাবেনা। হাদীসটি অভিযোগকারীদের মুখে চপেটাঘাত কেননা তারা অনেকে প্রোপাগান্ডা ছড়ায় মুসলিমরা নাকি যুদ্ধক্ষেত্রেই নারীদের ধর্ষন করে(!!!) নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক।

.

(২) গর্ভবতী যুদ্ধবন্দিনীর সাথে মিলিত হওয়া যাবেনাঃ

রাসুলুল্লাহ(صلى الله عليه وسلم) বলেছেন, “ কোন গর্ভবতী বন্দিনীর সাথে সন্তান প্রসবের পূর্বে ও কোনো নারীর সাথে হায়েজ থেকে পবিত্র হওয়ার পূর্বে মিলিত হবেনা” এই বিষয়ে বিভিন্ন হাদীছ বর্নিত আছে।[6]

.

(৩) বন্দিনী যদি গর্ভবতী না হয় তবে এক ইদ্দত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবেঃ

রাসুলুল্লাহ(صلى الله عليه وسلم) বলেছেন, “ কোনো গর্ভবতী বন্দিনীর সাথে সন্তান প্রসবের পূর্বে এবং অন্য নারীর(বন্দিনী) সাথে এক হায়েজ হতে পবিত্র হওয়ার পূর্বে মিলিত হবেনা” [7]

.

এই বিষয়ে অন্যান্য হাদীছ ও বর্নিত হয়েছে[8]

(৪) দুই ক্রীতদাসী বোনের সাথে একত্রে মিলিত হওয়া যাবে নাঃ

সাহাবী উছমান ইবন আফফান(রাদি), যুবাঈর ইবনুল আওয়াম(রাদি), অন্যান্য সাহাবী এবং ইমাম মালিক(রাহ) এর মতে দুই ক্রীতদাসী বোনের সাথে একত্রে(বুঝানো হচ্ছে এক বোনের সাথে সম্পর্ক থাকাকালীন সময়ে অন্য বোনের সাথে) সম্পর্ক রাখা যাবেনা।[9]

.

উমার(রাদি) এর মতে মা এবং কন্যার সাথে ও একই সময়ে মিলিত হওয়া যাবেনা।[10]

.

(৫) দাসী শুধুমাত্রই তার মালিকের জন্যঃ

ইসলামে দাসী নারীকে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি বলে বিবেচনা করা হয় না। যেখানে প্রাচীন গ্রীসে ও রোমানে দাসী নারীকে মনে করা হত জনগনের সম্পত্তি। সেখানে ইসলামে শুধুমাত্র মালিকের জন্যই দাসীকে বৈধ করেছে আর কারো জন্য নয়। নিজের বাবার[11] বা এমনকি নিজের স্ত্রীর[12] দাসীর সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও জায়েজ নেই। যদি স্ত্রীর সম্মতি থাকে তবে পুরুষকে ১০০ বেত্রাঘাত করা হবে এবং যদি স্ত্রীর সম্মতি না থাকে তবে তা জিনার দায়ে রজম করা হবে।

.

(৬) কৃতদাসীর বিয়ে দিয়ে দিলে সে মালিকের জন্য হারাম হয়ে যাবেঃ

রাসুলুল্লাহ (صلى الله عليه وسلم) বলেছেন, “ তোমাদের কেউ যদি পুরুষ দাসীকে ,তার নারী দাসীর সাথে বিয়ে দেয় তবে তার গুপ্তাঙ্গের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত হবেনা।[13]

.

(৭) দাসীর বৈবাহিক সম্পর্কঃ

কোনো মহিলাকে যদি স্বামীর পূর্বেই যদি দারুল ইসলামে বন্দী করে নিয়ে আসা হয় এবং স্বামী যদি দারুল হারবে থেকে যায় তাহলে তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে বিচ্ছেদ ঘটবে। আর যদি স্বামী এবং স্ত্রীকে একত্রে বন্দী করা হয় তবে স্বামীর পূর্বে স্ত্রীকে দারুল ইসলামে আনা যাবেনা এবং তাদের বৈবাহিক সম্পর্ক অটূট থাকবে। যেমনটি ইমাম মুহাম্মাদ বর্ণনা করেছেন তার সিয়ারুস সাগীর কিতাবে।[14] ইমাম সারাখসী ও এমনটিই বলেন।[15]

.

এখানে খুব মুখরোচক একটি প্রশ্ন আসতে পারে যে, ইসলাম কি বন্দিনীদের ধর্ষন করার অনুমতি দেয়, কেননা একজন মেয়ে কিভাবে এমন কারো সাথে শারিরীক সম্পর্ক করতে রাজী হতে পারে যে তার পরিবারের লোকদেরকে হত্যা করেছে?? সুতরাং মুসলিমরা নিশ্চয়ই ধর্ষন করে(নাউযুবিল্লাহ)।

.

প্রথমত, তারা কোন প্রমানই দেখাতে পারবেন না যে মুসলিম সৈন্যরা বন্দিনীদেরকে ধর্ষন করেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। কোন প্রমানই নয়। আর একজন মেয়ে কেন তার পরিবার হন্তাদের সাথে শারিরীক সম্পর্ক করতে যাবেন এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়, এই অভিযোগকারীদের অনেকেই ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞাত নয়।

.

জন ম্যাকক্লিনটক(মৃ-১৮৭০) লেখেন,

“ Women who followed their father and husbands to the war put on their finest dresses and ornaments previous to an engagement, in the hope of finding favor in the eyes of their captors in case of a defeat.[16]
নিজেই একটু দেখতে পারেন,

(https://books.google.com.bd/books...)

.

ম্যাথু বি সোয়ার্টজ লেখেন,

“The Book of Deuteronomy prescribes its own rules for the treatment of women captured in war [Deut 21:10-14] . Women have always followed armies to do the soldiers' laundry, to nurse the sick and wounded, and to serve as prostitutes

They would often dress in such a way as to attract the soldiers who won the battle. The Bible recognizes the realities of the battle situation in its rules on how to treat female captives, though commentators disagree on some of the details.

The biblical Israelite went to battle as a messenger of God. Yet he could also, of course, be caught up in the raging tide of blood and violence. The Western mind associates prowess, whether military or athletic, with sexual success.

The pretty girls crowd around the hero who scores the winning touchdown, not around the players of the losing team. And it is certainly true in war: the winning hero "attracts" the women. [17]

.

স্যামুয়েল বার্ডার(মৃ ১৮৩৬) লেখেন,

“It was customary among the ancients for the women, who accompanied their fathers or husbands to battle, to put on their finest dresses and ornaments previous to an engagement, in order to attract the notice of the conqueror, if taken prisoners.” [18]

নিজেই একটু দেখে নিতে পারেন,

(https://books.google.com.bd/books/reader...)

.

তাই বলা যায় যে, পরিবারের হন্তাদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা মোটেই আশ্চর্যজনক ব্যাপার নয় যেটা ইতিহাস দিয়েই প্রমানিত।

.

দ্বিতীয়ত, আমরা পূর্বের আলোচনা থেকে বুঝতে পারছি যে, বন্দিনীদেরকে ইদ্দত পালনের বা হায়েজ থেকে মুক্ত হওয়ার জন্যে সময় দেওয়া আবশ্যক। এখান থেকে গুরুত্বপূর্ন বিধান লক্ষ্য করা যায়, এই সময় দেওয়ার ফলে বন্দিনীদেরকে তাদের নতুন ইসলামী পরিবেশের সাথে মানিয়ে নেওয়ার জন্য সহায়তা করে থাকে যেমনটি মোল্লা আলী ক্বারী(রাহ)বলেছেন।[19]
এতে করে তারা নতুন ইসলামিক পরিবেশের সাথে পরিচিত হতে পারে, ইসলাম সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে পারে।

.

তৃতীয়ত, যদি বন্দিনীরা যদি তাদের সাথে সম্পর্কে রাজী নাই থাকত তবে মালিকরা তাদের বিক্রি করে দিত যাতে অন্য মালিকের কাছে দাসী চলে যেতে পারে এতে করে হয়ত দাসীর অন্য মালিকের সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটে। এখানে ধর্ষনের ব্যাপার স্যাপার কোথা থেকে আসলো?

.

চতুর্থত, বন্দিনীরা যখন দেখবে যে তারা এমন কিছু মানুষের সাক্ষাত পেয়েছে যারা একেবারে আলাদা, অনন্য ও অসাধারন, যারা বিশ্বমানবতাকে আল্লাহর দাসত্বের দিকে আহবান করে, যারা সকলকে আল্লাহর ভালোবাসা, তার সন্তুষ্টি ও জান্নাতের দিকে আহবান করে, যাদের নিকট তাদের নাবীর(صلى الله عليه وسلم) কথা সর্বোচ্চে ও সর্বোর্দ্ধে, যাদের নিকট আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই জীবনের এক ও একমাত্র লক্ষ্য, সেই মহান অধিপতির জন্য জীবন দেওয়াকে জীবনের যারা থেকে ও বেশী ভালোবাসে, যাদের কাছে এই দুনিয়ার ধনসম্পদ, নারী, বাড়ি, সুদৃশ্য গাড়ি তুচ্ছ, দিনের বেলা রোযা রেখে ওই জিহাদের ময়দানের বীর সেনানি যখন মানুষ যখন ঘুমে বিভোর তখন আরামের শয্যা ত্যাগ করে মহান সেই সত্তার কাছে সিজদাহয় অবনিত হয়, নিজের গুনাহর জন্য ক্ষমা চায়। এরা যখন দেখবে তাদের নেতা খেজুর পাতার ওপরেই আরামসে ঘুম দেয়, , তারা যখন প্রত্যক্ষ করবে এরা যারা দাসকে রুটি দিয়ে নিজেরা সন্তুষ্টির সাথে খেজুর খেয়ে দিনাতিপাত করে, নিজেরা তাই খায় যা দাস দাসীরা খায় এর তাই পরিধান করে যা দাস দাসীরা পরিধান করে, যাদের রাষ্ট্রনায়ক নিজে উটের রশি ধরে দাসকে উটের পিঠে বসায়, তারা যখন ইসলামের সৌন্দর্য ও স্বরুপ, ন্যায়বিচার, ক্ষমাপরায়নতা, দেখতে পাবে তখন তাদের স্বাচ্ছন্দ্যে রাজী হওয়া অস্বাভাবিক নয় বরং সম্পূর্ণ স্বাভাবিক।

.

দাসীর সাথে সম্পর্কের লুকায়িত হিকমাহ ও যৌক্তিকতাঃ

তার আগে আমরা একটু পিছনে দিকে ফিরে তাকাইঃ

পূর্বে, দাসীর বিয়ের পরেও দাসী মালিকের চাহিদা মেটাতে বাধ্য ছিলো। তাদের সম্পর্কের কারনে জন্ম নেওয়া বাচ্চার পিতৃত্ব ও তারা স্বীকার করত না।[20]

দাসীর সন্তান ও দাস হিসেবেই বিবেচিত হত। আর মালিক পিতৃত্ব স্বীকার করত না আর তার পক্ষেই দেশের প্রশাসন থাকত।[21]

ইহুদী সমাজে দাসীদেরকে পরিবারের ভিতরেই অথবা বাহিরে পতিতা হিসেবে ব্যবহার করা পূর্বে সাধারন ব্যাপার বলে গন্য করা হত।[22]

রোমান সমাজে বড় বড় ব্যবসায়ীদের দাসীদেরকে জোর করে পতিতা বানিয়ে রাখা হত অন্য পুরুষের খায়েশ পুরনের জন্যে।[23]

আসুন ইসলামের দিকে ফিরে আসি।

.

পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে যে ইসলামের দাসপ্রথার ভিত্তি কি? এবং এখন পর্যন্ত দাসপ্রথাকে কেন ইসলাম বৈধ করেছে? এই বৈধতার সীমাই বা কতটুকু? এই পর্বে আরো আলোচনা করা হয়েছে যে, ইসলামে দাসীর সাথে শারীরিক সম্পর্কের ভিত্তি ও সীমা। এর যৌক্তিকতা ও লুকায়িত সৌন্দর্য ও হিকমাহ গুলো নিচে উল্লেখ করা হলোঃ

(১) পূর্বে দাসীদেরকে যে কেউই ব্যবহার করতে পারত এমনকি একই পরিবারের অনেক সদস্য তাদেরকে ভোগ করতে পারত। তবে ইসলাম শুধুমাত্র মালিকের জন্যই বৈধ করেছে। এতে প্রাচীনকালে যেমন যুদ্ধ শেষে নারীদেরকে ধর্ষন করা হত, বা তাদেরকে বিভিন্ন অনৈতিক কাজে বাধ্য করা হত। ইসলাম সেই সুযোগকে মিটিয়ে দিয়েছে। ইসলামে বৈধভাবে মালিকানাপ্রাপ্ত মালিকের সাথে দাসীর শারীরিক সম্পর্কের সুযোগ রেখে নারীকে বেইজ্জতি থেকে বাচিয়েছে, তাদেরকে সম্মানিত করেছে, তাদেরকে নতুন একটি পরিবার দিয়েছে, তাদেরকে অন্ন-বস্ত্র,বাসস্থানের নিশ্চয়তা দিয়েছে;

(২) মালিক ও দাসীর সম্পর্ক অবশ্যই ঘোষনা করতে হবে। যাতে লোকমনে তাদের দুইজনের ব্যাপারে কোন প্রকার সন্দেহ ও সংশয় না থাকে। এতে করে নারীটি পায় যথার্থ সম্মান ও মর্যাদা;

(৩) এর ফলে দাসীটির শারীরিক চাহিদা পূরনের একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থা হয়, এতে একদিকে দাসীটির স্বাভাবিক চাহিদা পূরন হয় অন্যদিকে দাসীটি চাহিদা পূরন না করতে পেরে অবৈধ কোনো পন্থা বেছে নিবেনা এতে রাষ্ট্রে চারিত্রিক পবিত্রতা ও শৃংখলা বজায় থাকব;

(৪) মালিকের জন্য দাসীকে বিয়ে করা জায়েজ।[24]
যেমন হাদীছে এসেছে, যে ব্যক্তি দাসীকে উত্তম রুপে লালন-পালন, প্রতিপালন করে, তার প্রতি ইহসান করে, তাকে মুক্ত করে বিবাহ করে তার জন্যে আছে দ্বিগুন সওয়াব;[25]

(৫) দাসীকে কোনোমতেই ব্যভিচারে জোর করা যাবেনা যেমনটা রোমান সমাজে প্রচলন ছিলো;

(৬) দাসীকে অন্ন-বস্ত্রের নিশ্চয়তা দিতে হবে, সাথে উত্তম আচরন করতে হবে;

(৭) দাসী যদি উম্মুল ওয়ালাদ অর্থ ওই মালিকের সন্তানের জননী হয় তবে ওই দাসী বিক্রি হারাম হয়ে যাবে। হাদীছে এসেছে, তোমরা উম্মুল ওয়ালাদ বিক্রি করোনা। [26]

আর ওই দাসী মালিকের মৃত্যুর পরে মুক্ত হয়ে যাবে।[27] এতে যেমন দাসীর মুক্ত হওয়ার সুযোগ আছে, তেমনি সন্তানের পিতৃপরিচয়ের নিশ্চয়তা আছে। আর সন্তান ও মুক্ত বলে বিবেচিত হবে;

(৮) দাসীর জন্য এ সুযোগ ও রয়েছে সে মালিকের কাছে দাসত্ব থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আবেদন করতে পারে এবং দাসত্ব থেকে মুক্তি পেতে পারে। দাসত্ব থেকে মুক্তির উপায় নিয়ে এই সিরিজের পর্ব-১ এ আলোচনা করা হয়েছে;

(৯) সবচেয়ে বড় সুবিধা হলো এতে দাসী খুব কাছ থেকে ইসলাম সম্পর্কে জানতে, বুঝতে, উপলব্ধি করতে পারে। এতে হয়ত সে ইসলাম গ্রহন করে নিতে পারে, যা তার জন্যে চিরস্থায়ী জাহান্নাম থেকে মুক্তি আর চিরশান্তির জান্নাতের নিশ্চয়তা দিতে পারে;

[চলবে ইন শা আল্লাহ]

তথ্যসূত্রঃ

[1] https://en.wikipedia.org/wiki/Wartime_sexual_violence

[2] https://islamqa.info/en/26067

[3] তিরমিযী, হা নং- ১৫৬৩ এবং ১৬০০, শায়খ আলবানীর মতে সনদ সহীহ

[4] তিরমিযী হা নং-১৬০১, সনদ সহীহ

[5] সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, (দারুল কুতুব ইলমিয়্যাহ), পৃ-১৭৭, হা নং- ১৮২২২, হাদীছটির হারুন ইবনুল আসিম নামক রাবির কারনে দুর্বল।

[6] সহীহ মুসলিম, ইসে, ৫/৮৫, হা-৩৪২৬, সুনান আবু দাউদ, ইফা, ৩/১৬১, হা-২১৫৩-৫৫, তিরমিযী, হা-১৫৬৪

[7] সুনান আবু দাউদ, ইফা, ৩/১৬১, হা-২১৫৪

[8] ঐ, হা-২১৫৫-৫৬, তিরমিযী, ইবন হিব্বান।

[9] মুয়াত্তা মালিক, ইফা, ২/১৪৪-৪৫, রেওওয়ায়েত-৩৪-৩৫

[10] ঐ, রেওওয়ায়েত-৩৩

[11] ঐ, ১/১৪৬-৪৭, রেওওয়ায়েত-৩৬-৩৮

[12] সুনান আবু দাউদ, হা-৪৪৫৮-৫৯

[13] ঐ,হা- ৪১১৩

[14] কিতাবুস সিয়ারুস সাগীর (ইংরেজী অনুবাদ),অধ্যায়-২, অনুচ্ছেদ-৪৫, পৃ-৫১,

[15] ঐ, ফুটনোট-৪৬, পৃ-৯৩

[16] (John McClintock, James Strong, "Cyclopædia of Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature" [Harper & Brothers, 1894], p. 782)

[17] Matthew B. Schwartz, Kalman J. Kaplan, "The Fruit of Her Hands: The Psychology of Biblical Women" [Wm. B. Eerdmans Publishing, 2007] , pp. 146-147

[18] Oriental Customs Or, an Illustration of the Sacred Scripture, Williams and Smith, London, 1807 vol.2 p.79, no. 753

[19] মিরকাতুল মাফাতীহ (দারুল ফিকর), ৫/২১৮৯

[20] https://www.bowdoin.edu/~prael/projects/gsonnen/page4.html

[21] http://www.womenintheancientworld.com/women%20and%20slavery...

[22] The Cambridge World History of Slavery, vol.1, The ancient Meddeterrean World, pg-445

[23] Roman Social-Sexual Interactions, A critical Examination of the Limitations of Roman Sexuality, (University of Colorado, Undergraduate Honors Theses), pg-72

[24] সূরা নিসা ৪ঃ২৫

[25] সহীহ বুখারী, ইফা, হা-২৩৭৬, ২৩৭৯

[26] সিলসিলাহ সহীহাহ, ৫/৫৪০, হা-২৪১৭

[27] কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, ড, আবু বকর জাকারিয়া, ১/৪০৬

৯৫

তাকদীরের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য

- শায়খ মুহাম্মাদ সালিহ আল মুনাজ্জিদ

প্রশ্ন: তাকদীরের প্রতি ঈমান বলতে কী বুঝায়?

উত্তর: সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য।

তাকদীর বা ভাগ্য: এ মহাবিশ্বে যা কিছু ঘটবে আল্লাহ তাআলা কর্তৃক তাঁর পূর্বজ্ঞান ও প্রজ্ঞা অনুযায়ী সেসব কিছু নির্ধারণ করে রাখাকে তাকদীর বলা হয়।

তাকদীরের প্রতি ঈমান চারটি বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করে।

এক:

এই ঈমান আনা যে, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি বিষয় সম্পর্কে সমষ্টিগতভাবে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানেন। তাঁর এ জানা অনাদি ও অনন্ত -তাঁর নিজ কর্ম সম্পর্কে অথবা বান্দার কর্ম সম্পর্কে।

দুই:

এই ঈমান আনা যে, আল্লাহ তাআলা লওহে মাহফুজে সবকিছু লিখে রেখেছেন।

এ দুটি বিষয় সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: "তুমি কি জান না যে,নভোমণ্ডলে ও ভুমন্ডলে যা কিছু আছে আল্লাহ সবকিছু জানেন। নিশ্চয় এসব কিতাবে লিখিত আছে। নিশ্চয় এটা আল্লাহর কাছে সহজ।"[সূরা হজ্জ, আয়াত: ৭০] সহিহ মুসলিমে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, "আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি তিনি বলেন: আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকূল সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগে সৃষ্টিকূলের তাকদীর লিখে রেখেছেন।"

তিনি আরো বলেন: "আল্লাহ তাআলা প্রথম সৃষ্টি করেছেন কলম। সৃষ্টির পর কলমকে বললেন: 'লিখ'। কলম বলল: ইয়া রব্ব! কী লিখব? তিনি বললেন: কেয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের তাকদীর লিখ।"[আবু দাউদ (৪৭০০)] আলবানি সহিহ আবু দাউদ গ্রন্থে হাদিসটিকে সহিহ বলেছেন।

তিন:

এই ঈমান রাখা যে, কোন কিছুই আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে ঘটে না। হোক না সেটা আল্লাহর কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট অথবা মাখলুকের কর্মের সাথে সংশ্লিষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন: "আপনার পালনকর্তা যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন এবং (যা ইচ্ছা) মনোনীত করেন।"[সূরা কাসাস, আয়াত: ৬৮] তিনি আরো বলেন: "এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা সেটাই করেন"[সূরা ইব্রাহিম, আয়াত: ২৭] তিনি

আরো বলেন: “তিনিই মাতৃগর্ভে তোমাদেরকে আকৃতি দান করেন যেভাবে ইচ্ছা করেন সেভাবে।”[সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৬]

বান্দার কর্ম সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা বলেন: “আর আল্লাহ ইচ্ছা করলে অবশ্যই তাদেরকে তোমাদের উপর ক্ষমতা দিতে পারতেন। যাতে তারা নিশ্চিতরূপে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারত।”[সূরা নিসা, আয়াত: ৯০] তিনি আরো বলেন: “তোমার রব যদি ইচ্ছা করত, তবে তারা তা করত না”[সূরা আল-আনআম, আয়াত: ১১২]

অতএব, সকল ঘটনা, সকল কর্ম, সকল অস্তিত্ব আল্লাহর ইচ্ছাই হয়। আল্লাহ যা চান সেটাই হয়, তিনি যা চান না, সেটা হয় না।

চার:

যাবতীয় সবকিছুর জাত, বৈশিষ্ট্য, গতি ও স্থিতি সব আল্লাহর-ই সৃষ্টি।

আল্লাহ তাআলা বলেন: “আল্লাহ সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সবকিছুর তত্ত্বাবধায়ক।” [সূরা আয-যুমার, আয়াত: ৬২] তিনি আরো বলেন: “তিনি সবকিছু সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেককে যথোচিত আকৃতি দান করেছেন।” [সূরা ফুরকান, আয়াত:২] তিনি নবী ইব্রাহিম আলাইহিস সালাম সম্পর্কে বলেন তিনি তাঁর কওমকে উদ্দেশ্য করে বলেন: “অথচ আল্লাহই তোমাদেরকে এবং তোমরা যা কর তা সৃষ্টি করেছেন?” [সূরা আস্-সাফ্ফাত, আয়াত:৯৬]

যে ব্যক্তি এ বিষয়গুলোর প্রতি ঈমান এনেছে সে তাকদীরের প্রতি সঠিকভাবে ঈমান এনেছে।

এতক্ষণ আমরা তাকদিরের প্রতি ঈমান আনার যে বিবরণ দিলাম সেটা কর্মের ক্ষেত্রে বান্দার ইচ্ছাশক্তি থাকা ও ক্ষমতা থাকার সাথে সাংঘর্ষিক নয়। বান্দার ইচ্ছাশক্তি রয়েছে। বান্দা ইচ্ছা করলে কোন নেক কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে তা বর্জন করতে পারে। ইচ্ছা করলে কোন গুনাহর কাজ করতে পারে এবং ইচ্ছা করলে তা বর্জন করতে পারে। শরিয়তের দলিল ও বাস্তব দলিল বান্দার এ ইচ্ছাশক্তি সাব্যস্ত করে।

শরয়ি দলিল হচ্ছে- আল্লাহ তাআলা বলেন: “ঐ দিনটি সত্য। অতএব যার ইচ্ছা সে তার রবের নিকট আশ্রয় গ্রহণ করুক।”[সূরা নাবা, আয়াত: ৩৯]

তিনি আরো বলেন: “সুতরাং তোমরা তোমাদের ফসলক্ষেতে যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে গমন কর”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২২৩]

তিনি বান্দার সক্ষমতা সম্পর্কে বলেন: “অতএব, তোমরা যথাসাধ্য আল্লাহকে ভয় কর”[সূরা তাগাবুন, আয়াত: ১৬]

তিনি আরো বলেন: “আল্লাহ কোন ব্যক্তিকে তার সামর্থ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা অর্জন করে তা তার-ই জন্য এবং সে যা কামাই করে তা তার-ই উপর বর্তাবে।”[সূরা বাকারা, আয়াত: ২৮৬]

এ আয়াতগুলো সাব্যস্ত করে যে, মানুষের ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। এ দুটির মাধ্যমে সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে এবং যা ইচ্ছা তা বর্জন করতে পারে।

বাস্তব দলিল: প্রত্যেক মানুষ জানে যে, তার ইচ্ছাশক্তি ও ক্ষমতা রয়েছে। এ দুটোর মাধ্যমে সে যা ইচ্ছা তা করতে পারে এবং যা ইচ্ছা তা বর্জন করতে পারে। মানুষ তার ইচ্ছায় সাধিত কর্ম যেমন- হাঁটা এবং তার অনিচ্ছায় সাধিত কর্ম যেমন- রোগীর কাঁপুনি এতদুভয়ের মধ্যে পার্থক্য করতে পারে। তবে মানুষের ইচ্ছা ও ক্ষমতা আল্লাহর ইচ্ছা ও ক্ষমতার অনুবর্তী। এর দলিল হচ্ছে আল্লাহ তাআলার বাণী: "যে তোমাদের মধ্যে সরল পথে চলতে চায়- তার জন্য। আর তোমরা ইচ্ছা করতে পার না, যদি না সৃষ্টিকুলের রব আল্লাহ ইচ্ছা করেন।" [সূরা তাকবীর, আয়াত: ২৮-২৯]

তাছাড়া গোটা মহাবিশ্ব আল্লাহ তাআলার মালিকানাধীন। অতএব, তাঁর মালিকানাভুক্ত রাজ্যে কোন কিছু তাঁর অজ্ঞাতসারে অথবা অনিচ্ছায় ঘটা সম্ভব নয়।

আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

দেখুন: 'শরহু উসুলুল ঈমান' – শাইখ উছাইমীন।

৯৬

The Oedipus Complex

-শিহাব আহমেদ তুহিন

থেবেস নগরীতে কোনো কিছুরই অভাব নেই। তারপরেও রাজা লুইস আর তার স্ত্রী জকোস্টার মনে কোনো সুখ নেই। কারণ, তারা নিঃসন্তান। বহু বছর সন্তানহীন থাকার পর লুইস এক গণকের সাহায্য নিলেন। গণক ভবিষ্যৎবাণী করলো যে, রাজা লুইসের যদি কোনো পুত্র সন্তান জন্মায়, তবে সে তাকে হত্যা করবে আর নিজের মাকে বিয়ে করবে। দুঃখজনকভাবে, সে বছরেই তাদের একটি পুত্রসন্তান হলো। প্রফেসীটা ঠেকাতে রাজা লুইস ছেলেটার গোড়ালী কেটে ফেললেন যাতে ছেলেটা হামাগুড়িও না দিতে পারে। তারপর জকোস্টা ছেলেটাকে এক চাকরের হাতে তুলে দিলেন। চাকরটাকে নির্দেশ দিলেন ছেলেটাকে হত্যা করার জন্য।

.

কিন্তু এই নিষ্পাপ ছেলেটাকে হত্যা করতে লোকটার মন সায় দিলো না। তাই সে ছেলেটাকে এক রাখালের হাতে তুলে দিলো। পরবর্তীতে কয়েক হাত পালাবদল হয়ে, ছেলেটা শেষ পর্যন্ত পলিবাসের মহলে আশ্রয় পেলো। পলিবাস ছিলেন থেবেস এর প্রতিবেশী নগরী করিন্থ এর রাজা। রাজা আর রাণী ছেলেটাকে নিজের ছেলের মতই লালন-পালন করতে লাগলেন আর তার নাম রাখলেন "ইডিপাস" ।

.

ইডিপাস খুব সুখেই রাজমহলে বড় হতে থাকলো। কিন্তু যুবক বয়সে হঠাৎ এক মাতাল তাকে "জারজ" বলে গালি দিলো। মাতালটা তাকে আরো জানালো, ইডিপাস রাজা পলিবাসের নিজের সন্তান না। ইডিপাস তার বাবা মাকে ঘটনার সত্যতা জিজ্ঞেস করলে তারা তা অস্বীকার করলেন। সত্যটা জানতে ইডিপাস এক গণকের আশ্রয় নেয়। গণক তাকে শুধু এতোটুকু বলে যে, ইডিপাস নিজের বাবাকে হত্যা করবে আর নিজের মাকে বিয়ে করবে। এমন কুৎসিত পরিণতি এড়াতে, ইডিপাস করিন্থ নগরী থেকে পালিয়ে যায়।
"বিধির লিখন, যায় না খন্ডন"- বলে একটা কথা আছে। না হলে কেন ইডিপাস করিন্থ নগরী ছেড়ে নিজের জন্মভূমি থেবেসেই ফিরে আসবেন? থেবেসে আসার পরপরই সে এক রথের সামনে পড়ে আর রথের চালকের সাথে বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ঝগড়া এমন পর্যায়ে পৌছায় যে, ইডিপাস চালকটাকে হত্যা করে ফেলে। দুঃখজনকভাবে, সেই চালকটাই ছিলেন থেবেসের রাজা লুইস, ইডিপাসের জন্মদাতা। এভাবে নিজের জন্মদাতাকে হত্যা করে ইডিপাস ভবিষ্যৎবাণী আংশিক পূর্ণ করে ফেললো নিজের অজান্তেই। এক চাকর লুইসকে রাস্তায় মৃত দেখতে পেয়ে রাজমহলে অবহিত করলো। পুরো থেবেস নগরীতে শোকের ছায়া নেমে আসলো।

.

থেবেসের পথ চলতে চলতে ইডিপাস এক স্ফিংক্স (নারীর মুখ ও সিংহের দেহবিশিষ্ট দানাওয়ালা দানব) এর সামনে পড়লো। স্ফিংক্স পথিকদের ধাঁধা জিজ্ঞেস করতো। সঠিক উত্তর দিতে পারলে তাদের ছেড়ে দিতো আর ভুল উত্তর দিলে তাদের হত্যা করতো। দানবটা তাকে জিজ্ঞেস করলো, "কোন প্রাণী সকালে চার পায়ে, বিকেলে দুই পায়ে আর রাতে তিন পায়ে হাঁটে?" ইডিপাস উত্তর দিলো- "মানুষ"। শৈশবে তারা চারপায়ে হামাগুড়ি দিয়ে হাঁটে, পরিণত অবস্থায় দুইপায়ে আর বৃদ্ধাবস্থায় দুই পা আর লাঠি অর্থাৎ তিন পায়ে। ওডিপাসের উত্তর সঠিক হলো। দানবটা তাকে কাঁধে নিয়ে থেবেস ঘুরালো। থেবেসের সবাই অবাক হয়ে তা দেখলো, কারণ ইডিপাসই প্রথম এই দানবটার কাঁধে চড়তে পেরেছে।

.

এদিকে রাজার মৃত্যুতে রাণী জকোস্টার ভাই ঘোষণা করেছিলেন, যে স্ফিংক্স এর কাঁধে চড়তে পারবে তাকেই থেবেসের রাজা ঘোষণা করা হবে। তাই ওডিপাসকে থেবেসের রাজা ঘোষণা করা হলো আর রাজার বিধবা স্ত্রী জকোস্টার সাথে তাকে বিয়ে দেয়া হলো। তাদের সন্তান ও হলো। এভাবে ইডিপাস পুরো ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ করলো- "ছেলেটা নিজের বাবাকে হত্যা করবে আর নিজের মাকে বিয়ে করবে।"

.

বিয়ের কয়েক বছর পর রাজ্যে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ ছড়িয়ে পড়লো। জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়লো। এ অবস্থা ঠেকাতে রাজা ইডিপাস এক গণকের আশ্রয় নিলো। গণক জানালো, যদি রাজা লুইসের হত্যাকারীর শাস্তি হয় তবে নগরীতে শান্তি ফিরে আসবে। হত্যাকারীকে পরিচয় জানতে ইডিপাস থেবেসের ভাববাদী টায়ারসিয়াস এর সাহায্য চাইলো। টায়ারসিয়াস তাকে তিরস্কার করলো আর তাকে রাজা লুইসের হত্যাকারীকে খুঁজতে নিষেধ করলো। ইডিপাস আরো জানতে পারলো, এ নগরীতে দুর্ভিক্ষের কারণ হচ্ছে এখানে এক ব্যক্তি নিজ বাবাকে হত্যা করেছে আর মাকে বিয়ে করেছে। করিন্থ নগরীতে থাকা অবস্থায় শোনা ভবিষ্যৎবাণীটা ইডিপাসের মনে পড়ে গেলো। সে করিন্থ নগরীতে দূত পাঠিয়ে জানতে পারলো রাজা পলিবাস মারা গিয়েছেন।

.

পিতার মৃত্যুর সংবাদ শুনেও ইডিপাস স্বস্তি বোধ করলো। কারণ, এখন তো আর ভবিষ্যৎবাণী পূর্ণ হওয়া সম্ভব না। দূত তাকে আরো জানালো যে, সে জানতে পেরেছে- ইডিপাস রাজা পলিবাসের পালক সন্তান ছিলো। এ কথা শুনে ইডিপাস ধাঁধায় পড়ে গেলো। কারণ, রাণী জকোস্টা তাকে একবার বলেছিলো যে, রাজা লুইস আর রাণী জকোস্টা তাদের একমাত্র সন্তানকে এক চাকরের হাতে তুলে দিয়েছিলো। এদিকে রাণী জকোস্টা যখন সব শুনলেন আর ইডিপাসের গোড়ালীর দিকে তাকালেন তিনি সব বুঝতে পারলেন। তিনি বুঝতে পারলেন ইডিপাস আসলে তার আপন ছেলে। তিনি ইডিপাসকে নিষেধ করলেন, সে যাতে ব্যাপারটা নিয়ে আর না ঘাটায়। কিন্তু ইডিপাস থেমে গেলো না। যে চাকরটার হাতে রাণী জকোস্টার ছেলেকে তুলে দেয়া হয়েছিলো, ইডিপাস তাকে ডেকে পাঠালো। আর তার মাধ্যমেই সে জানতে পারলো, পলিবাসের পালকসন্তান আর রাণী জকোস্টার পরিত্যক্ত সন্তান একই ব্যক্তি। ইডিপাস নিজে!

.

রাণী জকোস্টা তীব্র লজ্জায় আত্নহত্যা করলেন। ইডিপাস মৃত মায়ের সামনে আসলো। আর কাঁদতে কাঁদতে বললো, "তুমি আমার মা! আর আমার চোখ কিনা তোমাকে কামনার দৃষ্টিতে দেখেছে!" অনুশোচনায় ইডিপাস নিজের চোখ মায়ের নেকলেস দিয়ে খোঁচাতে খোঁচাতে অন্ধ করে ফেললো। চলে গেলো নির্বাসনে।

.

গল্পটা গ্রীক পুরাণ থেকে নেয়া। সত্য নাকি মিথ্যা জানার উপায় নেই। ১৮৮০ সালে এ ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে একটি মঞ্চ-নাটক প্রদর্শিত হয়। নাটকটি বেশ ব্যবসা সফল হয়। যা সেসময়কার বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ সিগমুন্ড ফ্রয়েডকে বেশ প্রাভাবিত করে।

.

মনোবিজ্ঞানে সিগমুন্ড ফ্রয়েড বেশ বিখ্যাত (নাকি কুখ্যাত!) নাম। তিনি প্রায় সবকিছুই ব্যাখ্যা করতেন যৌনতা দিয়ে। এমনকি একটা ছেলে ছোটবেলা খেলনার প্রতি আকৃষ্ট হয়, এটাও তিনি যৌনতা দিয়ে ব্যাখ্যা করতেন। ফ্রয়েড দাবী করতেন সকল সামাজিক সম্পর্কই যৌনতাকেন্দ্রিক[১]।

.

ওডিপাসের গল্প থেকে তিনি এই উপসংহার টানেন যে, সকল ছেলেই তার মাকে কামনার বস্তু মনে করে। যার কারণে, তারা তাদের বাবার প্রতি হিংসা অনুভব করে। তিনি এটার নাম দেন "ইডিপাস কমপ্লেক্স"। ফ্রয়েডের ব্যাখ্যা এতোটাই হাস্যকর এবং বিকৃত যে, অনেক বিবর্তনবাদীরাও তার এইসব উদ্ভট ব্যাখ্যা মেনে নিতে পারেনি। তাদের মতে ফ্রয়েড কোনো বিজ্ঞানী নয় বরং

“গল্পকার”।

.

সমকামিতা প্রমাণের ক্ষেত্রে, অনেকের কাছেই ডারউইনের বিবর্তনবাদ শক্ত একটা দলিল। তাদের যুক্তি হচ্ছেঃ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীদের পূর্বপুরুষ একই হবার কারণে আচরণে আর প্রবৃত্তিতে অন্যান্য প্রাণীদের থেকে মানুষের খুব বেশী পার্থক্য নেই। তাই যদি পশুদের মধ্যে সমকামিতা থাকে, আমরা কেন তা করতে পারবো না? ঠিক একইভাবে প্রাণীদের মধ্যে যদি ইনসেস্ট বা অযাচার বিদ্যমান থাকে, তবে আমাদের তা করতে সমস্যা কি? সমকামিতা এখন পাশ্চাত্যে মোটামুটি খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। কিন্তু এই বিকৃত যৌনাচারের যুগেও বহু মানুষ ইনসেস্টকে স্বাভাবিকভাবে নিতে পারছে না। কারণ, দিনশেষে বিকৃতিরও তো একটা সীমা আছে। তাই ইনসেস্টকে বলা হয় “The last taboo”। কিছু বিকৃত মানুষ দাবী করে, এই স্বাভাবিক(!) প্রবৃত্তিকে স্বীকার করে নিতে পারলে নাকি আমরা পুরোপুরি মুক্ত হতে পারবো।

.

এদের জন্য আশার বাণী রেখে সম্প্রতি, স্পেন আর রাশিয়া পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে ইনসেস্টকে বৈধতা দিয়েছে[২]। জার্মানী ভাই-বোনের অযাচারকে বৈধতা দিয়েছে[৩]। আমেরিকাও বৈধতা দেয়ার পথে আগাচ্ছে।

.

অযাচারের ক্ষেত্রে, বিকৃতমনাদের খুব প্রিয় একটা যুক্তি হচ্ছে- “ If animals can do it, why can’t we?”

প্রথমত, বিজ্ঞানীরাও স্বীকার করেন কিছু কিছু নৈতিকতা শুধুমাত্র মানুষের জন্যই। আমরা যখন পশুদের আচরণের কথা বলি, তখন আমরা কখনোই “ধর্ষণ” কিংবা “বিয়ে” এই টার্মগুলো ব্যবহার করি না। এগুলো শুধুমাত্র মানুষের জন্যই স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়ত, প্রাণিজগতে ইনসেস্ট স্বাভাবিক, এটি একটি অসত্য কথা। জীববিজ্ঞানীরা বলেন, কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রাণিজগতে ইনসেস্ট একটি বিরল ঘটনা[৪]।
তৃতীয়ত, এমনকি প্রাণিদের মধ্যে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রয়েছে যে, তারা রক্তের সম্পর্কের কারো সাথে মিলিত না হয়ে দূরবর্তী কারো সাথে মিলিত হতে চায়। এটাকে বলা হয়, “Sexual imprinting”[৫] ।

.

উইকিপিডিয়াতে, ইনসেস্টের যে সংজ্ঞা দেয়া হয়েছে, তার মধ্যে কাজিনদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে, ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গী একেবারে পরিষ্কার। আমরা বলি, কাউকে আমাদের ভাই অথবা বোন হতে হলে অন্তত আমাদের বাবা কিংবা মা এক হতে হবে। জাহেলী যুগে, আরবদের একটি কালচার ছিলো। পিতা মারা গেলে পিতার স্ত্রী ছেলের অধিকারে চলে যেতো। এমনকি, সে সময়ে মিশর, ইরান ইত্যাদি দেশে অযাচার বিদ্যমান ছিলো। রাজারা নিজ কন্যাদের বিয়ে করতেন [৬] । আল্লাহতায়ালা কুর’আনে পরিষ্কারভাবে এসব নিষিদ্ধ করেনঃ

.

“যে নারীকে তোমাদের পিতা-পিতামহ বিবাহ করেছে তোমরা তাদের বিবাহ করো না। কিন্তু যা বিগত হয়ে গেছে। এটা অশ্লীল, গযবের কাজ এবং নিকৃষ্ট আচরণ।
তোমাদের জন্যে হারাম করা হয়েছে তোমাদের মাতা, তোমাদের কন্যা, তোমাদের বোন, তোমাদের ফুফু, তোমাদের খালা, ভ্রাতৃকণ্যা; ভগিনীকণ্যা তোমাদের সে মাতা, যারা তোমাদেরকে স্তন্যপান করিয়েছে, তোমাদের দুধ-বোন, তোমাদের স্ত্রীদের মাতা, তোমরা যাদের সাথে সহবাস করেছ সে স্ত্রীদের কন্যা যারা তোমাদের লালন-পালনে আছে। যদি তাদের সাথে সহবাস না করে থাক, তবে এ বিবাহে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রী এবং দুই বোনকে একত্রে বিবাহ করা; কিন্তু যা অতীত হয়ে গেছে। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাকরী, দয়ালু।” (সূরা নিসাঃ ২২-২৩)

.

বাইবেলেও ইনসেস্টকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে[৭]। কিন্তু দুঃখজনকভাবে একইসাথে, বাইবেলে দশটিরও বেশী অযাচারের গল্প বর্ণনা করা হয়েছে। যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ

--- লূত(আঃ) এর দুই মেয়ে তাদের বাবাকে পরপর দুইরাত মদ পান করায় এবং বাবার সাথে মিলিত হয়। ফলে, মেয়ে দুইটি বাবার দ্বারা গর্ভবতী হয়ে পড়ে[৮]।

--- ইব্রাহীম(আঃ) আর তাঁর স্ত্রী সারাহ এর বাবা একই ব্যক্তি ছিলেন। যার অর্থ, সারাহ ছিলেন ইব্রাহীম(আঃ) এর সৎ বোন[৯]।

--- দাউদ(আঃ) এর বড় ছেলে এবং সিংহাসনের উত্তরসূরী অম্লোন, তার বোন তামারকে ধর্ষণ করে[১০]। দাউদ(আঃ) এর আরেক ছেলে অবশোলম তার পিতার সাথে বিদ্রোহ করে খোলা আকাশের নীচে পুরো ইসরায়েলবাসীর সামনে তার পিতার উপপত্নীদের ধর্ষণ করে[১১]।

এখানে প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, আমাদের মুসলিমদের আকিদা হচ্ছে, সকল নবীরাই নিষ্পাপ ছিলেন। যদি এমন কোনো কিছু কোনো পূর্ববর্তী কিতাবে উল্লেখ করা হয় যা নবীদের চরিত্রকে কুলষিত করে, তবে তা বিকৃত এবং বানোয়াট।

.

বর্তমানে নাস্তিকসহ অনেকেই প্রশ্ন তুলে, যদি ধর্মগ্রন্থের পবিত্র ব্যক্তি আর তাদের সন্তানেরা এসব করতে পারে আর ঈশ্বর সেটা তাঁর কিতাবে উল্লেখও করতে পারেন, তবে আমাদের এসব করতে সমস্যা কি? বর্তমানে তাই পাশ্চাত্যে ইনসেস্ট ভয়াবহ আকারে বাড়ছে।
বেশী না, পঞ্চাশ বছর আগেও সবাই সমকামিতার মত ইনসেস্টকেও একটি বিকৃত যৌনাচার হিসেবে জানতো। পরিসংখ্যান অনুসারে, ১৯৫৫ সালে আমেরিকাতে প্রতি মিলিয়নে কেবল একজন মানুষ অযাচারে লিপ্ত হতো[১২]। আর এখন? প্রতি তিনটি মেয়ের মধ্যে একটি মেয়ে আর প্রতি পাঁচটি ছেলের মধ্যে একটি ছেলে তাদের বয়স ১৮ হবার পূর্বেই পরিবার কর্তৃক শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়[১৩]।

.

আচ্ছা, আমাদের এখানে কি অবস্থা? NDTV এর একটি রিপোর্টে প্রতিবেশী দেশ ভারতে অযাচারের একটি পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছে[১৪]। পরিসংখ্যান অনুসারে, ভারতে ৫৩% শিশু শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়। ৭২% শিশুকে নীরবে এই লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। ৬৪% অযাচারের শিকার শিশুদের বয়স ১০-১৮ বছর। ৩২% এর বয়স কেবল ২-১০। চিন্তা করা যায়? মাত্র দুই থেকে দশ! যারা এই অযাচারের শিকার হয় তাদের ৮৭% কে বারবার এই শারীরিক লাঞ্ছনার ভেতর দিয়ে যেতে হয়।

.

যারা আমার এই লিখা পড়ে এতোক্ষণ "এমন বিকৃত টপিক নিয়ে কেন লিখছি!" এমনটা ভাবছিলেন তাদের জন্য এই পরিসংখ্যানগুলো দেয়া। কয়েক বছর আগেও এমন বিকৃত কিছু যে মানবসমাজে থাকতে পারে তা আমার ধারণার বাইরে ছিলো। আর সত্যি বলতে যে কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক মানুষের নিকট এসব বিকৃত মনে হবে। আমি প্রথম ইনসেস্ট টার্মটার সাথে পরিচিত হই, বর্তমান সময়ে নাস্তিকদের নবী লরেন্স ক্রাউসের সাথে হামজা জর্জিসের এক ডিবেটে[১৫]। বিতর্কের এক পর্যায়ে, হামজা জর্জিস, লরেন্স ক্রাউসকে প্রশ্ন করেনঃ

.

"Why is incest wrong?" (অযাচার কেন ঠিক নয়?)
লরেন্স ক্রাউস জবাব দেন, " It's not clear(to) me that it's wrong." (আমার কাছে মনে হয় না যে এটা খারাপ কিছু।)

.

আমি জবাব শুনে থ' হয়ে গিয়েছিলাম। বিশ্বাস করতে পারছিলাম না যে, পৃথিবীতে এমনো মানুষ থাকতে পারে যারা এটাকে বৈধ মনে করতে পারে। বিতর্কের পর নাস্তিকদের সেরা নবী রিচার্ড ডকিন্স তার টুইটার একাউন্টে উত্তরটি শেয়ার করে তার

সম্মতি প্রকাশ করেন[১৬]।

.

আমাদের বাংলাদেশে কি অবস্থা? মিডিয়াতে যাদেরকে বাংলাদেশে বিজ্ঞানমনষ্ক(!) চিন্তাভাবনার রাজপুত্র বলা হয়, তাদের মধ্যে অন্যতম হলো- আসিফ মহিউদ্দিন, অভিজিৎ রায়, রাজীব হায়দার ওরফে থাবা বাবা। আমার কাছে প্রমাণ রয়েছে, এরা সবাই তাদের বিভিন্ন লেখায় অযাচারকে প্রমোট করেছেন।

.

এছাড়া বঙ্গদেশীয় নাস্তিকদের ধর্মীয়গ্রন্থ "মুক্তমনা" ব্লগে আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে আদনান নামে এক ব্লগার "নষ্ট রাত্রি" নামে একটি ছোটগল্প লিখেন[১৭]। তাতে কল্পনার অযোগ্য বিকৃতিতে লেখক বাবাকে নিয়ে দুই মেয়ের ফ্যান্টাসির কথা লিখেছেন। পুরো গল্পটিতে আসলে কি ছিলো সেটি আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। আমার রুচিতে কুলোচ্ছে না। লেখক তার অশ্লীল গল্পটাকে বিশেষায়িত করেছেন এভাবেঃ

.

"গল্পটি আসলে ক্ষীণদৃষ্টি, বিশ্বাসের দাসত্ব, আর নষ্টামির বিরুদ্ধে আমার, আপনার, ও আমাদের একটা সংগ্রাম। আর গল্পটি বলাও হয়েছে শিশ্নটির দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। কয়েকবার পড়লেই পাঠক বুঝতে পারবেন যে মানুষ ক্ষমতাবাণ হয়ে ওঠতে চায় নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে, কিন্তু আসলে ক্রমাগত সে তার নিজেরই ক্ষমতার দাস হয়ে ওঠে।"

.

আমার জানামতে, যে কারোর যে কোনো লিখাই মুক্তমনা ব্লগে প্রকাশ করা হয় না। মুক্তমনা ব্লগ আর তার সাথে সংশ্লিষ্ট সবাই এমন বিকৃত লেখা ব্লগে রেখে প্রমাণ করেছেন, তারা আসলে মুক্তচিন্তার নামে আমাদের প্রিয় বাংলাদেশে অশ্লীলতা আর বিকৃতমনষ্কতা ছড়িয়ে যাচ্ছেন।

.

আসলে ইনসেস্ট কেন ঠিক নয় সেটা নিয়ে আমার মনে হয় না কোনো কিছু লেখার প্রয়োজন আছে। যে কোনো বিকৃতিহীন মানুষের কাছেই এটা কল্পনার অযোগ্য।
ইনসেস্টের কারণে "Inbreeding" ঘটে। যার ফলে পরবর্তী প্রজন্মে বিভিন্ন জেনেটিক ডিজঅর্ডার ঘটে থাকে।

.

এমনকি, বিবর্তনবাদও ইনসেস্ট থেকে সতর্ক করে। কারণ, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে এই ইনব্রিডিং ঘটলে একটি প্রজাতির বিলুপ্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা রয়েছে[১৮]। অনেকেই প্রশ্ন করেন, ইনব্রিডিং তো কাজিনদের বিয়ে করলেও ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। ইসলামে কেন তাহলে কাজিনদের বিয়ে করার বৈধতা দিয়েছে?

.

একেবারে রক্তের সম্পর্কের কারো সাথে আমাদের ৫০% জীন কমন থাকার সম্ভাবনা আছে। যার ফলে খুব সহজেই ইনব্রিডিং ঘটে। কিন্তু কাজিনদের ক্ষেত্রে এটা কেবল ১২.৫%, অনেক কম[১৯]। এতোটুকু সম্ভাবনা অন্য যে কোনো শারীরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেই হতে পারে।

.

কাজিনদের বিয়ের ক্ষেত্রে যতোটুকু ঝুঁকি রয়েছে তা আরো সহজেই এড়ানো যাবে, যদি আমরা প্রজন্মের পর প্রজন্ম কাজিনদের বিয়ে না করি। আর এমনটা না করার পরামর্শ রাসূল(সাঃ) আমাদের দিয়ে গিয়েছেন[২০]।

.

পাশ্চত্যের বিভিন্ন পরিবারের দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে তুলে ধরা হয়। যেখানে দেখানো হয়ঃ ভাই-বোন, মা-ছেলে কিংবা বাবা-মেয়ে বিয়ে করে একসাথে নাকি সুখী(!) সংসার যাপন করছে।

.

বাস্তবতা কিন্তু একেবারে আলাদা কথা বলে। যেসব পরিবারে এসব বিকৃতি ঘটে থাকে তাদের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ থাকে না[২১]। ঝগড়া, এলকোহল, ড্রাগ ইত্যাদি একদম নিত্যনৈমত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়[২২]। যেসব মেয়ে তাদের পিতার দ্বারা এই অযাচারের শিকার হয় তাদের অনুভূতিতে চরম রাগ, ঘৃণা, অবিশ্বাস, ভয় আর লজ্জা মিশে থাকে[২৩]।

.

এটা অস্বীকার করার উপায় নেই, “Incest Taboo” কে ছুড়ে ফেলার মাধ্যমে মানবসমাজ বিকৃতির চরমে পৌঁছাচ্ছে। বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে নিজেকে পশু-পাখির চেয়েও নীচের কাতারে নামাচ্ছে। ডক্টর জেফরী খুব সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কিভাবে সিগমুন্ড ফ্রয়েড একটি রূপকথাকে আমাদের সামনে ভুলভাবে উপস্থাপন করেছেন[২৪]। তিনি এর নাম দিয়েছেন “The Real Oedipal Complex”। ইডিপাস কখনোই নিজের বাবাকে হত্যা করতে চায়নি, মার সাথে মিলিত হতে চায়নি। সে চেয়েছে এই কুৎসিত পরিণতি থেকে বাঁচতে। কিন্তু সে তার ভাগ্য থেকে বাঁচতে পারেনি। মানুষ কখনোই তার পরিবারের প্রতি কামুক হয়ে জন্মায় না। বরং এগুলো যে স্বাভাবিক না, এই বোধ নিয়েই সে জন্মায়।

.

আমার খুব অবাক লাগে এই বিকৃত যৌনাচারের জয়গান গাওয়া মানুষগুলোই আবার প্রশ্ন তুলে- কেন আমাদের নবী(সাঃ) নিজের ছেলের বউকে বিয়ে করেছিলেন?(মিথ্যা দাবী) কেন সাফিয়া(রাঃ) কে ধর্ষণ করেছিলেন?(আরেকটি মিথ্যা দাবী) তারা বলে আমাদের নবী শিশুকামী ছিলেন।(ভিত্তিহীন)

.

মানুষকে মুক্তির দীক্ষা দেয়ার দাবিদার মানুষগুলো তাদের কুৎসিত চিন্তা দ্বারা এতোটাই পরিবেষ্টিত যে; আজ তারা নিজেদের মাকে মা ভাবতে পারছে না, বোনকে বোন ভাবতে পারছে না। জীবন মানেই তাদের কাছে "Sex & Drugs & Rock & Roll"। পুরো দুনিয়াটাই তাদের কাছে “Sex Object”।

.

দিনশেষে এই মানুষগুলোই যে আলোকে অন্ধকার ভাববে, সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তাতে কি খুব বেশী অবাক হবার মতো কিছু আছে?

.

“In their hearts is disease, so Allah has increased their disease; and for them is a painful punishment because they [habitually] used to lie.” [Al Quran 2:10]

তথ্যসূত্রঃ

১। Inbreeding, Incest, and the Incest Taboo, Edited by Arthur P. Wolf and William H. Durham. (Page -23)

২। Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law , 14 March 2008. Retrieved 30 August 2012.

৩। http://www.independent.co.uk/.../german-ethics-council-calls-...

৪। Pusey and Wolf, “Inbreeding avoidance in animals,” (Page 202-205)

৫। Konrad Lorenz, “Der Kumpan in der Umwelt des Vogels,” Journal fürOrnithologie, vol. 83 (1935), (Page. 137–213, 289–413.)

৬। মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কি ক্ষতি হলো?- সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নাদবী (পৃষ্ঠা-৮০-৮১)

৭। Holy Bible: Leviticus 18:6-12, Leviticus 18:10, Leviticus 18:12-14, Deuteronomy 27:20-23

৮। Holy bible: Genesis 19:30-38

৯। Holy bible: Genesis 20:12

১০। Holy bible: 2 Samuel 13

১১। Holy bible: 2 Samuel 16

১২। S. K. Weinberg, Incest Behavior (New York: Citadel).

১৩। https://www.theatlantic.com/.../america-has-an-incest.../272459/

১৪। Incest: India's ugly secret tumbles out in series of cases- https://www.youtube.com/watch?v=vA61xBnVb14&t=1s

১৫। Lawrence Krauss vs Hamza Tzortzis - Islam vs Atheism Debate https://www.youtube.com/watch?v=uSwJuOPG4FI

১৬। https://twitter.com/richarddawki.../status/312320023035273216...

১৭। https://blog.mukto-mona.com/2012/07/23/27550/

১৮। Bateson, "Optimal outbreeding," in Mate Choice, ed. P. Bateson (Cambridge: Cambridge University Press, 1983), Page. 257–77.

১৯। Inbreeding, Incest, and the Incest Taboo, Edited by Arthur P. Wolf and William H. Durham. (Page -39)

২০। Why are first cousin marriages allowed in Islam? by Dr. Zakir Naik

https://www.youtube.com/watch?v=JV0S07EakCs&t=209s

২১। Herman, Father-Daughter Incest, p. 71.

২২। Kathleen C. Faller, "Women who sexually abuse children," Violence and Victims, vol. 2 (1987), pp. 263–75;

২৩। Patricia Phelan, "Incest and its meaning: The perspectives of fathers and daughters," Child Abuse and Neglect, vol. 19 (1995), pp. 7–24.

২৪। https://www.psychologytoday.com/.../.../the-real-oedipal-complex

৯৭

আল্লাহর ক্ষমাশীলতা ও ন্যায়বিচার

-হোসাইন শাকিল

#নাস্তিক_প্রশ্নঃ আল্লাহ কি আসলেই দয়ালু এবং ক্ষমাশীল (Quran 1:3) যিনি কিনা একটা উট হত্যার জন্যে পুরো গোষ্ঠীর লোকেদের মেরে ফেলতে পারেন(Quran 7:73-78, 54:26-31)

.

উত্তরঃ আল্লাহ অবশ্যই দয়ালু এবং ক্ষমাশীল, তার অন্যতম সিফাতী নাম আর রহমান ও আর-রহীম। তবে তিনি আল-আদিল(পরম ন্যায়বিচারক) এবং আল-কাহহার(প্রবল পরাক্রমশালী) ও বটে। যা আল্লাহ কুরআনের পরতে পরতে দৃশ্যমান।

.

আসুন তাদের অভিযোগকৃত সালিহ(আ) ও তার ছামূদ জাতির ঘটনা সংক্ষেপে জেনে নেওয়া যাকঃ

.

; ছামূদ জাতি আদ জাতির বংশধর। তাদের মধ্যে কালপরিক্রমায় মূর্তিপূজা শুরু হয়। এমতাবস্থায় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সালিহকে(আ) নবুওয়াতের দায়িত্ব দিয়ে নবী হিসেবে প্রেরন করলেন। তিনি যৌবনকাল থেকে শুরু করে বার্ধক্য পর্যন্ত তার জাতিকে তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে যান, তবে তেমন কেউ সাড়া দেয়নি। সালিহ(আ) যখন বার্ধক্যে উপনীত হন তখন তার জাতি সালিহের(আ) দাওয়াতে ত্যক্ত ও বিরক্ত হয়ে এবং সালিহের(আ) নবুওয়াতের সত্যতা পরীক্ষা করার বললো "তুমি যদি সত্যবাদী হয়ে থাক তবে আমাদেরকে পাহাড় থেকে একটি প্রাপ্তবয়স্ক উটনী বের করে দাও" তখন সালিহ(আ) এই বললেন যে "যদি আমি তোমাদের এই দাবি পূরন করি তাহলে কি তোমরা ঈমান আনবে?" তারা সবাই এই শর্তে অঙ্গীকারাবদ্ধ হলো। আল্লাহর কাছে সালিহ(আ) দুয়া করলে আল্লাহ তার দুয়া কবুল করে নিলেন, ফলে পাহাড়ের পাথর ফেটে একটি প্রাপ্তবয়স্ক, সুস্থ উটনী বের হলো। এই আশ্চর্যজনক ঘটনা দেখে তখনই কেউ কেউ ঈমান আনলো আর কেউ কেউ ঈমান আনার ইচ্ছাপোষন করলে ঠাকুর-পুরোহিত গোছের কিছু লোক বাধা দিলো। সালিহ(আ) তার জাতির এহেন অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে দেখে ভয় পেলেন যে এই জাতির উপর না আযাব চলে আসে। তাই নবীসুলভ দয়ার্দ্রতায় তিনি বললেন, "তোমরা এই উটনীর দেখাশোনা করো, এর কোনো ক্ষতি করোনা, তাহলে তোমরা হয়তো এই আযাব থেকে বেচে যাবে"। জাতির অন্যান্য উটনী থেকে এই উটনী ভিন্ন ছিলো। এই উটনী এক কুপের পানি একাই পান করে ফেলত, তাই আল্লাহর নির্দেশে সালিহ(আ) সিদ্ধান্ত দিলেন যে, তোমাদের উটরা একদিন ও আর এই উটনী আরেকদিন পালাক্রমে পানি পান করবে। কিন্তু অবাধ্য জাতি আল্লাহর নির্দেশ অমান্য করে সর্বসম্মতিক্রমে উটনীটিকে হত্যা করে ফেললো। সালিহ(আ) বললেন তোমাদের আর মাত্র ৩দিন সময় বাকি আছে এর মধ্যেই আযাব চলে আসবে, সেই অবাধ্য জাতির লোকেরা তখনও নিজেদের দাম্ভিকতা ও একগুয়েমি প্রদর্শন করে চললো, আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাওয়ার বদলে তারা সালিহকে(আ) নিয়ে মজা করতে লাগলো এবং তাকে হত্যা করার চেষ্টা চালায়। তবে আল্লাহ তাদের প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেন, তাদেরকে ভূমিকম্প ও বিকট এবং প্রবল আওয়াজ ঘিরে ফেলে, আল্লাহর আযাবে পুরো ছামূদ জাতি সমূলে ধবংস হয়ে যায়। আল্লাহ কুরআনে বিভিন্ন স্থানে তাদের বর্ণনা দিয়েছেন;

.

{(সূরা আরাফ ৭ঃ৭৩-৭৯), (সূরা হুদ ১১ঃ৬১-৬৮), (সূরা নামল ২৭ঃ৪৫-৫২), (সূরা ক্বমার ৫৪ঃ২৩-৩১)}

.

[বিস্তারিতঃ (কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, ২/৭৭৭-৭৮৩), (তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, ১/৪৩৬), (তাফসীরে ইবন কাছীর, ৮ম;৯ম;১০ম/৩৩১-৩৩৯), (তাফসীরে জালালাইন, ২/৪১৩-৪২০)]

.

ছামূদ জাতির আপরাধগুলো দেখা যাকঃ

.

(ক) তারা আল্লাহর সাথে শিরকে জড়িয়ে পড়েছিলো, তবে আল্লাহ নবী না প্রেরন করার পূর্বে কোনো জাতিকে আযাব দেন না তাই আল্লাহ সালিহকে(আ) নবী হিসেবে তাদের মধ্যে প্রেরন করলেন, যাকে আল্লাহ ছামূদ জাতির ভাই বলে সম্বোধন করেছেন (সূরা আরাফ ৭ঃ৭৩);

.

(খ) তারা নবী সালিহের(আ) তাওহীদের দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে ঔদ্ধত্যপূর্ন আচরণ করতে লাগলো, সালিহ(আ) তার যৌবনের শুরু থেকে বার্ধক্য পর্যন্ত তাদেরকে তাওহীদ ও ঈমানের দাওয়াত দিয়ে গেলেও ছামূদ জাতি দাওয়াতে সাড়া না দিয়ে অস্বীকার করতে থাকে;

.

(গ) তারা নিজে থেকেই সালিহের(আ) কাছে মুযিজা দেখানোর জন্য বললো, সালিহ(আ) নবীসুলভ দয়ার্দ্রতার কারনে ভাবলেন যে হয়ত মুযিজা প্রকাশ ঘটলে তারা ঈমান আনতে পারে। তাই সালিহ(আ) মুযিজা প্রকাশের আগে তাদের নিকট থেকে ঈমান আনার অঙ্গীকার নিলেন, তারা সর্বসম্মতিক্রমে সেই শর্তে রাজী হয়েছিলো;

.

(ঘ) যখন সালিহের(আ) দুয়া করার পরে আল্লাহর ইচ্ছায় ও অনুমতিক্রমে পাহাড়ের বুক ফেটে প্রাপ্তবয়স্ক একটি উটনী বের হলো তা তাদের জন্য আশ্চর্যজনক ছিলো এবং তারা সালিহের(আ) নবী হওয়ার সত্যতা উপলব্ধি করতে পেরেছিলো, এই ঘটনাই কি যথেষ্ট ছিলো না যে তাদের সকলের জন্য আল্লাহর প্রতি ঈমান আনয়ন করার জন্য, যেই দাওয়াত তাদের জাতিরই একজন যাকে আল্লাহ তাদেরই ভাই বলে সম্বোধন করেছেন, যিনি জীবনের শুরু থেকে শেষ দীর্ঘ সময় পর্যন্ত ক্রমাগত এই ঈমানের দাওয়াত দিচ্ছিলো, আর তারা মুযিজা প্রকাশের পূর্বেই ঈমান আনয়নের শর্তে আবদ্ধ ছিলো, তবুও তারা তাদের পূর্বপুরুষের ধর্ম, নিজেদের হটকারীতা ও দাম্ভিকতায় অটল থাকলো, এত বড় ঘটনা তাদেরকে সামান্য কিছুক্ষন বিস্ময়ে হতবাক করে দিলেও তারা ঈমান আনলো না;

.

(ঙ) এই ঘটনা দেখে কিছু সত্যানুসন্ধানী সাথে সাথে মানুষ ঈমান আনলো এবং আরো কিছু সংখ্যক ও ঈমান আনার ইচ্ছাপোষন করলো, সেখানে পুরোহিত গোছের কিছু লোক তাদেরকে বাধা প্রদান করলো, একে নিজেরা আল্লাহর সাথে শিরকে লিপ্ত অঙ্গীকার ভঙ্গ করলো, নিজেরা ও আল্লাহকে অস্বীকার করলো সাথে অন্যদেরকে ও বাধা দিলো ঈমান আনতে!!!;

.

(ঙ) সালিহ(আ) এতকিছুর পরেও আল্লাহর আযাব চলে না আসে এই ভয়ে তিনি নবীসুলভ দয়া দেখিয়ে বললো তার জাতিকে উটনীটিকে যথাযথ লালন-পালন করতে এবং ঊটনীটির কোনো প্রকার ক্ষতি করতে নিষেধ করলেন;

.

(চ) তারা তুচ্ছ পানির বন্টন নিয়ে ঊটনীটিকে হত্যা করে ফেললো আর আল্লাহর অবাধ্যতা করলো, যেখানে পানির সমবন্টন আল্লাহ নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন!!! এখানে ব্যাপারটি শূধুমাত্র ঊট হত্যা করা নয় বরং এখানে আল্লাহর অবাধ্যতা করাই মূল বিষয়, যেখানে আল্লাহ তাদেরকে এতসুযোগ দেওয়ার পরেও তারা ক্রমাগত আল্লাহর অবাধ্যতা করেই যাচ্ছিলো;

.

(ছ) যদি এমন হত কিছু লোক ঊটনী হত্যার সাথে জড়িত ছিলো বাকিরা সবাই নির্দোষ তবুও বলা যেত, কিন্তু না তারা সবাই এই জঘন্য কাজের সাথে জড়িত ছিলো, কাতাদাহ(রাহ) বলেন, " যে ব্যক্তি ওকে হত্যা করেছিলো তার কাছে সবাই গিয়েছিল এমনকি স্ত্রীলোকেরাও এবং বালকেরাও। তাদের সবারই উদ্দেশ্য ছিলো তার দ্বারা ওকে হত্যা করিয়ে নেওয়া" অর্থাৎ ঊটনীকে হত্যা করার জন্যে ছোট বড় সবাই হত্যাকারীকে সমর্থন দিয়েছিলো, তাদেরই পরামর্শে হত্যাকারী কিদার ইবন সালিফ প্রস্তুত হয়ে যায় ঊটনীকে হত্যা করার জন্য। জাতির লোকেরা বাধা প্রদানের বদলে হত্যাকারীকে পূর্ণ সমর্থন যোগাল!!!;

.

{তাফসীরে ইবনে কাছীর, (৮ম,৯ম,১০ম/৩৩৬-৩৭), (১৮/১৮১)}

.

তাদের এত এত অপরাধের পরেই আল্লাহ তাদের বিকট আওয়াজ ও ভূমিকম্পের শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দেন। আল্লাহ কখনই কোনো জাতি বা মানুষের সাথে তিল পরিমান জুলুম ও করেন না (সূরা নিসা ৪ঃ৪০), তিনি আর-রহমান , আর-রহীম। তিনিই তো মানুষকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি তার বান্দাকে ভালোবাসেন নিজ মায়ের থেকেও অনেক বেশী। তাই তো তিনি সামান্য পাথরের মূর্তি, গাছ, চন্দ্র-সূর্যের সাথে তাকে শরীক করে ফেলার পরেও নবী প্রেরন করে তাদেরই হেদায়াতের নিমিত্তে, সেই নবীদের মাধ্যমেই মুযিজা প্রকাশ করান মানুষের সন্দেহ দূর করার জন্য ও সত্যতা প্রমানের জন্য, কিন্তু এতকিছুর পরেও অনেক হতভাগারাই ঈমান আনেনা শুধুমাত্র পূর্বপুরুষ, অহমিকা এই তুচ্ছ দুনিয়ার দোহাই দিয়ে। তাই দেখা যায় সালিহের(আ) জাতি ছামূদের সাথে, যারা ক্রমাগত শিরক, মূর্তিপুজা আর আল্লাহর অবাধ্যতায় মেতে ছিলো, সালিহের(আ) রাত-দিনের ক্রমাগত দাওয়াত তাদের অন্তর নাড়া দেয়নি, তারা সালিহের(আ) সত্যতা প্রমানের জন্য মুযিজা প্রকাশের জন্য বললো, সালিহ(আ) তাদের অঙ্গীকারে ভাবলেন যদি এবার আমার জাতির লোকেরা ঈমান আনয়ন করে চিরসৌভাগ্য লাভ করতে পারে, মুযিজা প্রকাশ পাওয়ার পরেও তারা তাদের অবস্থা থেকে চুল পরিমান ও নড়লো না, মুষ্টিমেয় কিছু লোক ঈমান আনলেও যারা ঈমান আনার ইচ্ছা পোষন করলো তাদেরকে কিছু তথাকথিত সম্মানিতজন বাধা প্রদান করলো, এত কিছুর পরেও আল্লাহ তাদেরকে আযাব দিয়ে ধ্বংস করেননি, তাদের প্রতি নির্দেশ ছিলো তার মুযিজার নিদর্শনস্বরুপ সেই ঊটনীটির কোনোরুপ ক্ষতিসাধন করবেনা, তারা তাতেও বাধ সাধলো না

আল্লাহর অবাধ্যতার চূড়ান্ত সীমায় যেয়ে সেই ঊটনীকে হত্যা করতে উদগত হলো, সাথে হত্যাকারীকে বিন্দুমাত্র ও বাধা না দিয়ে বরং পূর্ণ সমর্থন করলো এবং আল্লাহর অবাধ্যতার সব সীমা পার করে ফেললো। আর তাই সর্বশেষ আল্লাহ আহকামুল হাকিমীন এই জাতিকে সমূলে ধ্বংস করে দিলেন ভূমিকম্প ও বিকট আওয়াজের মাধ্যমে, যারা দুনিয়ায় তাদের নির্মিত বড় বড় ইমারত নিয়ে খুব গর্ব ও দম্ভ প্রকাশ করত, এক আওয়াজই তাদের বিনাশের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলো। যার প্রমান আজো আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা পৃথিবীর বুকে রেখে দিয়েছেন নিদর্শনস্বরুপ।

.

আল্লাহ কখনোই তার বান্দাদের প্রতি জুলুম করেন না, তার প্রতিটি সিদ্ধান্তই পরিপূর্ণ প্রজ্ঞাময় ও ন্যায়সঙ্গত। তবে এই ঘটনার আবেদন বর্তমানেও হারিয়ে যায়নি, এমন লোক বর্তমানে ও পাওয়া যাবে যারা মহান রবের অবাধ্যতায় চুল থেকে নখ পর্যন্ত ডুবে রয়েছে, যাদের অন্তর প্রতিমূহুর্তে সাক্ষী দেয় আল্লাহ সত্য তার রাসুল(صلى الله عليه وسلم) সত্য আর সত্য তার দ্বীনে ইসলাম তবুও যারা নিজেদের দাম্ভিকতা, অহংকার, হটকারীতা ও জেদ ও এই তুচ্ছ দুনিয়ার সুখ-শান্তি-স্বাচ্ছন্দ্যের কারনে সত্যকে মুখে স্বীকার তো করেই না বরং সেই দ্বীনের বিরুদ্ধে স্পষ্ট প্রকাশ্য এবং স্পষ্ট অপ্রকাশ্য যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে যায়, তাদের এই ঘটনা থেকে অনেক কিছুই শিক্ষার রয়েছে, যে এই জীবন খুব বেশি দীর্ঘ নয় একদিন এই জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটবে, তাদের এই ঘৃন্য কাজগুলো নিদর্শন রুপে দুনিয়ার বুকে থেকে গেলেও তাদের ঠাই হবেনা, যেমন ছামূদ জাতির হাজার বছর পূর্বে তৈরী করা ইমারতের অনেকগুলো আজও আকাশ ছুয়ে গেলেও যারা এই সামান্য ইমারতের বড়াই করত তাদের আজ চিহ্ন পর্যন্তও নেই...

৯৮

কুরআনে কেন বার বার শপথ করা হয়েছে?

-হোসাইন শাকিল

#নাস্তিক_প্রশ্ন: কোন কথা আস্থাযোগ্য না হলেই মানুষ শপথ করে/কসম কাটে! তবে কেন আল্লাহকে কুরানে এতোবার কসম কাটতে হলো (Quran 57:1-4, 52:1-6, 53:1, 56:75, 70:40, 74:31-34, 84:16-18, 92:1-3, 95:1-3 ... ... ইত্যাদি)?

.

উত্তরঃ ইমাম জালালুদ্দিন মহল্লী রাহ (মৃ-৮৬৪হি) এই বিষয়ে লিখেন,

.

" তবে সাধারনত যে বস্তুর শপথ করা হয়, তার কিছু না কিছু প্রভাব সে বিষয়বস্তু প্রমানে অবশ্যই থাকে, যার জন্য শপথ করা হয়। প্রতিটি শপথের কথা চিন্তা করলে এ প্রভাব সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়।"

.

[তাফসীরে জালালাইন, ইসলামিয়া কুতুবখানা, ৫/৩৯৩]

.

মাওলানা তাকী উছমানী এই প্রসঙ্গে লিখেন,

.

" .... এক, নিজের কোন কথা বিশ্বাস করানোর জন্য আল্লাহ তা'আলার কোন কসম করার প্রয়োজন নেই। নিজের কোন কথা সম্পর্কে কসম করা হতে তিনি বেনিয়ায। কুরআন মাজীদে বিভিন্ন স্থানে যে বিভিন্ন কসম করা হয়েছে তার উদ্দেশ্য কথাকে সৌন্দর্যমন্ডীত, অলংকারপূর্ণ ও বলিষ্ঠ করে তোলা। অনেক সময় এ দিকটার প্রতি লক্ষ্য থাকে যে, যেই জিনিসটার কসম করা হচ্ছে, তার কিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে তার পরবর্তীতে যে বক্তব্য আসছে তা তার সত্যতার প্রমান বহন করে।"

.

[তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, মাকতাবাতুল আশরাফ, ৩/৪০৬]

.

অন্যস্থানে তিনি লিখেন,

.

" মুফাসসিরগন বলেন, শপথ হচ্ছে আরবী ভাষালঙ্কারের একটি বিশেষ শৈলী। এর দ্বারা কথা শক্তিশালী হয়, কথায় আসর হয়"

.

[তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, ৩/১৫৮]

.

মাওলানা আমিন আহসান এসলাহী লিখেন,

.

" কুরআনে উল্লেখিত আল্লাহর এই শপথগুলো দ্বারা শপথকৃত বস্তুকে শ্রদ্ধা বা সম্মান জানানো হয়না বরং কোনো দাবির স্বপক্ষে প্রমান উপস্থাপন করা হয়ে থাকে"

.

[Tadabbur-e-Quran, Mawlana Amin Ahsan Eslahi, exegesis of Surah Saffat]

.

" আমি আমার শিক্ষক মাওলানা হামিদুদ্দিন ফারাহীর "আকসামুল কুরআন" এর গবেষনার কিছু উল্লেখ করেছি যেখানে তার মতামত হচ্ছে কুরআনের বেশীর ভাগ শপথগুলোই সেই সূরারই কোনো আয়াতের স্বপক্ষে প্রমান হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে"

.

[Tadabbur-e-Quran, Mawlana Amin Ahsan Islahi, exegesis of Surah Tur]

.

একটু গভীর পর্যবেক্ষন করা যাক, ইনশাআল্লাহ-

.

শপথ তাদের যারা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়ানো, অতঃপর ধমকিয়ে ভীতি প্রদর্শনকারীদের, অতঃপর মুখস্থ আবৃত্তিকারীদের, নিশ্চয় তোমাদের মাবুদ এক। (সূরা সাফফাত ৩৭ঃ১-৪)

.

এই আয়াতে প্রথমেই সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে থাকা কারো শপথ করা হচ্ছে; এর ব্যাখ্যায় মুফাসসিররা বলেন, তারা হলেন ফেরেশতারা।

.

[তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, ৩/১৫৮, তাফসীরে জালালাইন,৫/৩৯০]

.

এখানে ফেরেশতাদের শপথ করার কারন হিসেবে বলা যেতে পারে যে, মক্কার মুশরিকরা কেউ কেউ ফেরেশতাদের আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কন্যা বলে অভিহিত করত আবার কেউ কেউ তাদেরকেই ইবাদাত করত আবার কেউ কেউ তাদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করত(নাউযুবিল্লাহ), তাই আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা ফেরেশতাদের এইসব গুনাবলী তারা সারিবদ্ধভাবে আল্লাহর ইবাদাত করেন বা আল্লাহর আদেশ পালনের জন্য সারিবদ্ধরুপ থাকেন, তারা শয়তাদের বিরুদ্ধে বাধা সৃষ্টি করে আর তারা আল্লাহর জিকরে ব্যস্ত থাকেন, যার মাধ্যমে প্রমান হয় যে, ফেরেশতারা আল্লাহর কন্যা নয় বা ফেরেশতাদের নিজস্ব কোনো শক্তি নেই যে তাদের ইবাদাত করা যায় বরং তারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার একান্ত অনুগত দাস ছাড়া কিছু নয়। এর মাধ্যমে সূক্ষ্ম শিরককে খন্ডন করা হয়েছে এর বিপরীতে ৪নং আয়াতে বলা হয়েছে " নিশ্চয়ই তোমাদের মাবুদ এক" অর্থাৎ প্রথম ৩ আয়াতে মুশরিকদের যুক্তি খন্ডন ও ফেরেশতাদের দাসত্বমনা প্রমান করে ৪ নং আয়াতে আল্লাহর তাওহীদের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

.

[(তাফসীরে জালালাইন, ৫/৩৯২), (Tadabbur-e-Quran, explanation of this ayat), তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, ৩/১৫৮-৫৯)]

.

এরপরে সূরা তূরের দিকে যাওয়া যাক-

.

কসম তূরপর্বতের, এবং লিখিত কিতাবের,যা লিখিত আছে প্রশস্ত পত্রে, কসম বায়তুল-মামুর তথা আবাদ গৃহের, এবং সমুন্নত ছাদের, এবং উত্তাল সমুদ্রের, আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী (সূরা তূর ৫২ঃ১-৭)

.

এই আয়াতগুলোতে ৫টি বস্তুর শপথ করা হয়েছেঃ-

.

(১) তূর পর্বতের যেখানে মুসা(আ)কে নবুওয়াত ও তাওরাহ কিতাব দেওয়া হয়েছিলো;

.

(২) লিখিত কিতাব যা লিখা আছে প্রশস্ত পত্রে বলতে এখানে তাওরাহকে অথবা প্রত্যেকের আমলনামাকে বুঝানো হচ্ছে;

.

(৩) বায়তুল মামূর যা সপ্তম আকাশে ফেরেশতাদের ইবাদাতঘর

.

(৪) সমুন্নত ছাদ ; অর্থাৎ আকাশকে বুঝানো হচ্ছে;

.

(৫) উত্তাল সমুদ্র;

.

তারপরই ৭নং আয়াতে আল্লাহর আযাবের কথার বর্ণনা এসেছে অর্থাৎ কিয়্মত দিবসের স্মরণ।

.

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, প্রথমদিকে তূর পাহাড়ের শপথ করা হয়েছে যেখানে মুসা(আ)কে নবুওয়াত দেওয়া হয়েছিলো ও তাওরাহ কিতাব দিয়েছিলেন। আখিরাত দিবস যে অবশ্যম্ভাবী, তা পূর্ববর্তী সব কিতাবেই ছিলো সেই প্রসঙ্গে মুসার(আ) উপর অবতীর্ন কিতাবের শপথ করা হয়েছে; তারপর লিখিত কিতাবের শপথ করা হয়েছে যা দ্বারা তাওরাতকে বুঝানো হলে উপরের আয়াতের প্রসঙ্গেই তাওরাত কিতাবকে উল্লেখ করা হয়েছে অথবা যদি মানুষের আমলনামাকে ধরা হয় তবে মানুষের আমলনামা লিখার কাজ প্রতিনিয়তই চলছে তা যদিও কেউ না জানুক বা সকলেই দৃষ্টির অন্তরালে আর একদিন এই আমলনামা প্রকাশিত হবে সকলের সামনে যা কিয়ামত দিবসের অপরিহার্যতাকে প্রমান করার জন্য জোরালো দলিল,তারপর বায়তুল মামুরের শপথ করা হয়েছে যা ফেরেশতাদের ইবাদাতখান, ফেরেশতারা যদিও
কোনো বিচারের প্রতিক্ষীত নন তবুও তারা ক্লান্তিহীনভাবে আল্লাহর ইবাদাত করে চলছেন আর সেখানে মানুষজাতি যাদের প্রতি আল্লাহর নির্দেশ মান্য করা আবশ্যক করা হয়েছে তারা দিব্যি আখিরাতকে ভুলে আল্লাহর আদেশ নিষেধ ভুলে গিয়ে দুনিয়ার সুখ-বিলাসিতায় মত্ত হয়ে আছে। তারপরে আল্লাহ এই পৃথিবীতে তার দুটি বড় নিদর্শন মহাকাশ যা লক্ষ-কোটি নক্ষত্র-নীহারিকায় পরিপূর্ণ আর সাগর যেখানে আছে হাজার হাজার প্রজাতির প্রানী যাদেরকে পানির নিচে বাচিয়ে রাখা হয়েছে যার বৈচিত্র্য মানবহৃদয়কে বিস্ময়ে হতবিহবল করে অর্থাৎ এই নিদর্শনের উল্লেখ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যারা আখিরাতকে অস্বীকার করে তাদের বোধোদয়ের জন্য, যাতে আল্লাহর এইসব মহান নিদর্শনকে দেখে বুঝা যায় যে এতকিছু তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি, এর একদিন সমাপ্তি ঘটবে, আর যিনি এই অকল্পনীয় বৈচিত্র্যময় পৃথিবী আর মধ্যেকার সবকিছুর স্রষ্টা তিনি সবকিছুর সমাপ্তির পরেও সবকিছুকে একত্রিত করতে পারেন আর হিসাব-নিকাশের সম্মুখীন করতে সক্ষম। তারপরে আল্লাহর আযাবের অপ্রতিরোধ্য আযাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেন যা যোগ্যদেরকে ঠিকই পাকড়াও করবে এমন এক দিনে যেই দিনকে তারা ঘৃনাভরে ও অহমিকাবশত অস্বীকার করেছিলো।

.

[(তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, ৩/৪১৭-১৮),(Tadabbur-e-Quran,explanation of SUrah Nazm)]

.

আবার সূরা ইনশিকাকের শপথের দিকে লক্ষ্য করা যাকঃ

.

আমি শপথ করি সন্ধ্যাকালীন লাল আভার , এবং রাত্রির, এবং তাতে যার সমাবেশ ঘটে, এবং চন্দ্রের, যখন তা পূর্ণরূপ লাভ করে, নিশ্চয় তোমরা এক সিঁড়ি থেকে আরেক সিঁড়িতে আরোহণ করবে। (সূরা ইনশিকাক ৮৪ঃ১৬-১৯)

.

এখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এখানে রক্তিম লাল আভার, রাত্রি ও রাত্রি যা ধারন করে এবং চাদের শপথ করেছেন,

এর রহস্য হিসেবে বলা যায় যে, সন্ধ্যাকে সাধারনত দিনের শেষ হিসেবে ধরা হয় যখন দিনের আভা নিষ্প্রভ হয়ে যায় আর তার স্থানে জায়গা নেয় সন্ধ্যা,আর রাতে যখন ওই আকাশে ওঠে চাঁদ যা তার সৌন্দর্যে ভুবন আলোকিত করে। এসবকিছুই আল্লাহর নির্দেশে নিজেদের নির্দিষ্ট কার্য সম্পাদনের পরে নিষ্প্রভ ও নিষ্ক্রিয় হয়ে যায়। তেমনি মানুষ ও শুক্র থেকে কৈশোর, যৌবন, মধ্য ও বার্ধক্য ইত্যাদি নানা পর্যায়ের সম্মুখীন হয়। চাঁদ যেমন আল্লাহর অনুমতিতেই তার নির্দিষ্ট সময় রাতের পরে সূর্যকে জায়গা করে দেয় ভুবন আলোকিত করার জন্য তেমনি সূর্য ও দিনশেষে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তেমনি মানুষও তার জীবনের বিভিন্ন পর্যায় শেষে আল্লাহর অনুমতিতে তার নিকটেই ফিরে যাবে।

.

[(তাফসীরে জালালাইন, ৭/৪০১-০২), (তাফসীরে তাওযীহুল কুরআন, ৩/৬৯২), (Tadabbur-e-Quran, explanation of Surah Inshiqaq, p-9)]

সুতরাং বলা যায়, কুরআনুল কারীমের শপথগুলো মোটেও কুরআনের ত্রুটি নয় কলেবর বড় হওয়ার আশঙ্কায় তা এখানে লেখা হলো না; এমন করে প্রতিটি আয়াত গভীর পর্যবেক্ষনের মাধ্যমে পাঠ করলে লক্ষ্য করা যাবে যে যেসব সূরাতেই এমন কোনো শপথ এসেছে তাতে অবশ্যই কোনো না কোনো সম্পর্ক পরের আয়াতের সাথে রয়েছে। বলা যায় এটি কুরআনুল কারীমের লুকায়িত সৌন্দর্য রয়েছে যা এই পৃথিবীতে শুধুমাত্র কুরআনুল কারীমের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নিসন্দেহে এই শপথগুলো আল্লাহর কালাম কুরআনুল মাজিদের অনন্য বৈশিষ্ট্য বা মুযিজাহ, পাঠক যখনই এর দিকে গভীর দৃষ্টিপাত করবে নিরপেক্ষ মন নিয়ে সে অবশ্যই এতে হেদায়েতের আলো দেখতে পাবে।

.

এই বিষয়ে মাওলানা হামিদুদ্দীন ফারাহীর বিখ্যাত একটি বই আছে “আল ঈমান ফি আকসামুল কুরআন” যার ইংরেজী অনুবাদের লিংক নিম্নে দেওয়া হলো আগ্রহীগন পড়ে নিতে পারেন।
পড়ুন অথবা ডাউনলোড করুন

.

goo.gl/uHgpWf

৯৯

নাস্তিক-মুক্তমনা লেখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিদ্বেষী পোস্টের জবাব - ১

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

বাংলাদেশের একজন নাস্তিক (নামের অদ্যাক্ষর S.P.) ইদানিং গল্প বলা স্টাইলে নাস্তিকতার প্রচার শুরু করেছে। ইসলামের বিভিন্ন অসঙ্গতি(!) প্রমাণের জন্য বিভিন্ন অপযুক্তি প্রদান করে সে নাস্তিকমহলে ব্যাপক বাহবা কুড়াচ্ছে। তার একটা ফেসবুক পোস্টের লিঙ্ক এক ভাই মেসেজ করে পাঠালেন। পোস্টটা পড়ে বরাবরের মতই এক গাদা অপব্যাখ্যা, মূর্খতা ও মিথ্যাচার দেখলাম। (S.P. অদ্যাক্ষরবিশিষ্ট সেই নাস্তিকের পূর্ণ নাম উল্লেখ করে তার আর জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করলাম না। যারা আগেই তার পোস্ট পড়েছেন, তারা এমনিতেই চিনতে পারবেন।)

.

বরাবরের মতই সে সুরা তাওবার ৫নং আয়াত উল্লেখ করে ইসলামকে রক্তপিপাসু ধর্ম প্রমাণ করার প্রয়াস পেয়েছেন।

সে লিখেছে -

// ‘মুশরিকদের যেখানে পাও সেখানেই হত্যা করবে’ –তাই তো? তাহলে এবার তুমিই বলো, এই আক্রমণের উশকানিটা কি আত্মরক্ষার্থে হয়েছিল? যে চারটি মাসে হত্যা রক্তপাত নিষিদ্ধ করা হয়েছে সেগুলো অতিবাহিত হয়ে গেলে মুসলমানদের বলা হচ্ছে মুশরিকদের জন্য গোপনে ওঁত পেতে থাকো আক্রমন করা জন্য। এবং বলা হচ্ছে, এই চারটি মাস মুশরিকরা স্বাধীনভাবে জমিনে ঘুরাঘুরি করুক, তারপরই তাদের ধরে ধরে জবাই করা হবে। তুমি কি এটাকে আত্মরক্ষা বলবে? কিংবা ‘যুদ্ধ’ তাও কি বলতে পারবে? তুমি কখনো শুনেছো যুদ্ধে আঁততায়ীর মত পিছন থেকে আঘাত করা হয়? এটা যুদ্ধের নিয়মের বিরুদ্ধে। //

.

আগের আর পরের আয়াতকে উপেক্ষা করে মনগড়া ‘তাফসির’(!) করে কুরআনকে বর্বর প্রমাণের পুরোনো নাস্তিকীয় প্রচেষ্টা। কুরআন খুলে সুরা তাওবার শুরুর আয়াতগুলো টানা পড়ে যান। আলোচ্য আয়াতের আগের আয়াত অর্থাৎ সুরা তাওবার ৪নং আয়াতেই উল্লেখ করা আছে যে, যেসব মুশরিক চুক্তি রক্ষা করেছে, এই নির্দেশ তাদের জন্য নয়।

.

এই আয়াতটি স্রেফ তাদের জন্য নাজিল হয়েছে যারা চুক্তি ভেঙেছিল। যে কোন একটি তাফসির গ্রন্থ থেকেই যদি এ আয়াতের আলোচনা দেখা হয় তাহলে উল্লেখ পাওয়া যাবে যে, ৬ষ্ঠ হিজরীতে যে হুদাইবিয়া সন্ধি হয়েছিল, তার ২ বছরের মধ্যে মুশরিকরা এ চুক্তি ভঙ্গ করে। হুদাইবিয়ার সন্ধিতে বলা ছিল যে কোন গোত্র চাইলে যে কোন পক্ষের (মুসলিম অথবা কুরাইশ) সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ হতে পারবে। এই ধারা অনুযায়ী বনু বকর গোত্র কুরাইশদের সঙ্গে যোগ দেয় এবং বনু খুযাআ গোত্র মুসলিমদের সঙ্গে মৈত্রীতে আবদ্ধ হয়।

কিন্তু ২ বছর যেতে না যেতেই ৮ম হিজরী সালে শক্তিশালী বনু বকর গোত্র দুর্বল বনু খুযাআকে আক্রমণ করে। এ আক্রমণে বনু খুযাআর অনেক মানুষ নিহত হয়। কুরাইশরা অস্ত্র দিয়ে এই কাজে সাহায্য করে এমনকি কুরাইশ যোদ্ধারাও এতে অংশ নেয়। এই ঘৃণ্য আক্রমণ ছিল রাতের বেলায় এবং তারা আশা করেছিল এই কারণে এর বিস্তারিত বিবরণ বাইরে ছড়াবে না।

এই প্রেক্ষিতে খুযাআ গোত্রের আমর বিন সালিম মদীনায় এসে মুহাম্মাদ(ﷺ) এর কাছে এসে এই জুলুমের বর্ণণা দেন এবং বলেন, “... কুরাইশগণ অবশ্যই আপনার প্রতিজ্ঞার বিরোধিতা করেছে এবং আপনার পরিপক্ক অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছে। তারা কোদা নামক স্থানে গোপন অবস্থান গ্রহণ করেছে এবং মনে করেছে আমি সাহায্যের জন্য কাউকে আহ্বান করব না। ...তারা রাত্রিবেলায় ওয়াতিরে আক্রমণ চালিয়েছে এবং আমাদেরকে রুকু ও সিজদাহরত অবস্থায় হত্যা করেছে। ...” [১]

.

বনু খুযাআ যেহেতু হুদাইবিয়ার সন্ধি অনুযায়ী মুসলিমদের মিত্র গোত্র ছিল, কাজেই এর প্রতিকারের দায়িত্ব ছিল মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর, বনু খুযাআকে সাহায্য করা অপরিহার্য ছিল। মুসলিমরা সন্ধিচুক্তি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ও শান্তির সাথে পালন করেছিল। অথচ তার জবাব কুরাইশরা দিয়েছিল রাতের বেলা অতর্কিতে আক্রমণ করে নামাজরত মানুষকে হত্যা করে।

নাস্তিক-মুক্তমনাগণের কাছে কিন্তু এগুলো মোটেও 'অমানবিক' বা 'বর্বর' কাজ বলে অভিহিত হয় না। বরং এই অমানবিক হত্যাকাণ্ডের কারণে যে পদক্ষেপের নির্দেশ আল্লাহ দিয়েছেন, মুক্তমনাদের কাছে সেটাকে 'বর্বর' বলে মনে হয়। যেন চোর-ডাকাতদের কর্মকাণ্ড 'মানবিক' আর আর তাদের অপকর্মের প্রতিকারকারী পুলিশেরা 'বর্বর'। সুবহানাল্লাহ, নাস্তিক-মুক্তমনাদের এ মানসিকতা দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে কারা আসলে 'বর্বর'।

.

সুরা তাওবার ৫নং আয়াতে এমন কথা পাওয়া যাচ্ছে না যে 'গোপন স্থান থেকে মুশরিকদের হামলা করতে হবে'। অথচ নাস্তিক মহোদয় এমন দাবিই করেছে। ঘাটি মানে কি গোপন স্থান?! এখানে কোথায় পেছন থেকে আক্রমণ করতে বলা হল?! আর কোথায়ই বা যুদ্ধের নিয়ম লঙ্ঘণ করা হল? যুদ্ধের নিয়ম আসলে কে লঙ্ঘণ করেছিল - কুরাইশরা, নাকি মুসলিমরা?? বাংলার নাস্তিক-মুক্তমনাকূলের অসামান্য যুক্তি অনুযায়ীঃ রাতের আঁধারে আক্রমণ করে মানুষ হত্যাকারী কুরাইশরা 'মজলুম', আর এই বর্বরতা প্রতিরোধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী মুসলিমরা 'জালিম'। এই হচ্ছে নাস্তিকীয় 'প্রজ্ঞা'। এমনকি ঐ আয়াতের পরের আয়াতে অর্থাৎ সুরা তাওবার ৬নং আয়াতেই এটাও বলা হয়েছে যেসব মুশরিক আশ্রয় চাইবে তাদেরকে নিরাপদ স্থানে পোঁছে দিতে হবে। ৭নং আয়াতে বলা হয়েছে যতক্ষণ তারা চুক্তি ভঙ্গ না করে, মুসলিমরাও যেন তাদের প্রতি সরল থাকে। এগুলো কিন্তু ভুলেও নাস্তিক মহাশয়ের চোখে পড়বে না। কিংবা চোখে পড়লেও তিনি এ নিয়ে টুঁ শব্দ করবেন না।

উপরন্তু ঘাড়ের রগ ফুলিয়ে তর্ক করে হয়তো বলে বসবে (অথবা পোস্ট দেবে): "মুমিনরা এখানে তাফসির আর সিরাহ থেকে রেফারেন্স দিছে! কুরআনে কোথায় চুক্তি আর চুক্তি ভঙ্গের কথা? এখানে সব অমুসলিমকে হত্যা করতে বলছে!!"

.

তার এহেন কথায় হয়তো কোন কোন অন্ধ নাস্তিক-মুক্তমনা যুদ্ধজয়ের আনন্দ পাবে, লাইক-কমেন্টে হয়তো তার পোস্ট ভাসিয়ে দেবে। কিন্তু কোন যুক্তিবান মানুষ তার এ কথার কোন মানে খুঁজে পাবে না। কেননা সুরা তাওবার ৫নং আয়াতটির আগের-পরের অনেকগুলো আয়াতে সুস্পষ্টভাবে চুক্তি ও এর চুক্তি ভঙ্গকারী মুশরিকদের কথা বলা আছে, যারা চুক্তি রক্ষা করেছে, তাদের প্রতি সরল থাকতে বলা হয়েছে (সুরা তাওবার ৪ ও ৭-১১নং আয়াত)।

.

মুমিন কিংবা যুক্তিবানের কাজ হচ্ছে কোন অভিযোগ দেখলে উৎস থেকে ব্যাপারটা যাচাই করে দেখা। আর অন্ধ নাস্তিক-ধর্মবিদ্বেষীর কাজ হচ্ছে প্রসঙ্গহীন ১-২টি উদ্ধৃতি দেখেই সেটাকে নিয়ে মেতে থাকা, সেটাকে তুলে ধরে নিজের মত অপব্যাখ্যা করে বিষোদগারে অনলাইন গরম করে নিজের মূর্খতাকেই প্রকাশ করা। আল্লাহ যথার্থই বলেছেনঃ

"অন্ধ ও চক্ষুস্মান সমান নয়, আর (সমান নয়) যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং যারা কুকর্ম করে। তোমরা তো অল্পই অনুধাবন করে থাক।" [সুরা মু'মিন(গাফির), ৪০:৫৮]

.

সুরা তাওবার এই আয়াত নাজিল হয়েছিল যেই মুহাম্মাদ ﷺ এর উপর, তিনি কীভাবে আমল করেছেন? মক্কা বিজয় করে তিনি কা'বার নিকট গিয়ে বললেন---

"ওগো কুরাইশ জনগণ! তোমাদের কী ধারণা, তোমাদের সঙ্গে আমি কীরূপ ব্যবহার করব বলে তোমরা মনে করছ?"
সকলে বললঃ "খুব ভালো। আপনি সদয় ভাই এবং সদয় ভাইয়ের পুত্র।"
নবী করিম ﷺ বললেন, "তাহলে তোমরা জেনে রেখ যে, আমি তোমাদের সঙ্গে ঠিক সেরূপ কথাই বলছি যেমনটি ইউসুফ (আলাইহিস সালাম) তাঁর ভাইদের সঙ্গে বলেছিলেন যে - আজ তোমাদের জন্য কোন নিন্দা নেই। যাও, আজ তোমাদের

সকলকে মুক্তি দেয়া হল।” [২]

.

অথচ মুহাম্মাদ ﷺ এবং তাঁর সাথীদের উপর এমন অত্যাচার করেছিল কুরাইশরা - তাঁদেরকে পূর্ণাঙ্গ বয়কট করেছিল, তাঁদের সাথে ব্যাবসা-বাণিজ্য, খাওয়া দাওয়া, বৈবাহিক সম্পর্ক বন্ধ করে দিয়েছিল, এমন অবস্থা হয়েছিল যে মুসলিমরা গাছের পাতা, চামড়া ইত্যাদি খেতে বাধ্য হয়েছিল, তাঁদেরকে না খাইয়ে মারার জন্য কুরাইশরা খাদ্যের দাম আকাশচুম্বী করে দিয়ে উপহাস করত, রাসুলকে ﷺ নামাজরত অবস্থায় উটের নাড়িভুঁড়ি চাপিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে, সাহাবিদেরকে কষ্ট দিয়ে হত্যা করেছে, মদীনায় হিজরত করে যাবার পরেও যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এমনকি হুমকি দিয়ে পত্র পর্যন্ত লিখেছে, নবী ﷺ কে মদীনায় পর্যন্ত হত্যা করবার অপচেষ্টা চালিয়েছে। [৩]
সেই মহাপাপীদেরকে মুহাম্মাদ ﷺ এভাবেই সাধারণ ক্ষমার ঘোষণা করে মুক্তি দিয়েছিলেন। গুরুতর অপরাধী অল্প কয়েকজন বাদে কাউকে সামান্যতমও শাস্তি দেয়া হয়নি।পৃথিবীর ইতিহাসে এর তুলনা কোথায়?

.

নাস্তিক সাহেব তার সেই সেই ‘দুর্ধর্ষ’ পোস্টটিতে আরো লিখেছে -

//মদিনার প্রথম মসজিদের জায়গা বিনামূল্যে দান করেছিল ইহুদিরাই। এবার আয়াতের ভাষাটা খেয়াল করো, এখানে কি হামলা আক্রমণের সরাসরি আহ্বান জানানো হচ্ছে না শুধুমাত্র ইসলামের ধর্মের সাথে একমত না হওয়ার কারণে। কেবল মাত্র হযরত মুহাম্মদকে নবী বলে স্বীকার না করার কারণে।//

.

কী অবলীলায় মিথ্যা কথা বলেছে সে। আর অবলীলায় তাতে লাইক দিয়ে উৎসাহ জুগিয়েছে বাংলার নাস্তিক-মুক্তমনাকূল। মদীনায় প্রথম মসজিদ ছিল কুবা মসজিদ। এই মসজিদ ছিল বনু আমর ইবন আওফের পল্লীতে। সেখানে 'কুবা' নামক স্থানে এ মসজিদ স্থাপিত হয়। এলাকাটি ছিল বনু আমর ইবন আওফের। কোথাও উল্লেখ নেই যে ইহুদিরা এই মসজিদের জন্য জায়গা দিয়েছিল। [৪]

.

মদীনায় এরপর প্রতিষ্ঠা করা হয় মসজিদুন নববী। মসজিদের স্থানের মালিক ছিল ২জন অনাথ বালক। নবী ﷺ ন্যায্য মূল্যে স্থানটি ক্রয় করেন এবং মসজিদুন নববী নির্মাণ করেন। [৫]
এই মসজিদে নববীরও কোনো জায়গার মালিক ইহুদিরা ছিল না।

.

সেই ‘মহাজ্ঞানী’(!) নাস্তিকের “দুর্ধর্ষ”(?) সেই পোস্টটির জবাব এখনো শেষ হয়নি; আরো আসছে আগামী পর্বে (ইন শা আল্লাহ)।ইসলামের বিরুদ্ধে তার ‘অসামান্য’ (!) যুক্তিগুলোর আরো পোস্টমর্টেম অপেক্ষা করছে আগামী পর্বে। আল্লাহু মুসতা’আন।

---

[১] দেখুন- তাফসির মাআরিফুল কুরআন(সংক্ষিপ্ত), মুফতি শফি(র), সুরা তাওবার প্রথম ৬ আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ৫৫৩; ‘আর রাহিকুল মাখতুম’, শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র), তাওহিদ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৪৫২-৪৫৩

[২] ‘আর রাহিকুল মাখতুম’, শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র), তাওহিদ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৪৬৫

[৩] ‘আর রাহিকুল মাখতুম’, শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র), তাওহিদ প্রকাশনী, ১৫১-১৬৯ এবং ২৩৮-২৩৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

[৪] দেখুনঃ সীরাতুন্নবী(স)- ইবন হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৬৬

http://life-in-saudiarabia.blogspot.com/.../7-unknown-facts-a...

http://www.arabnews.com/news/600996

[৫] আর রাহিকুল মাখতুম’, শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র), তাওহিদ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২২৮

১০০

নাস্তিক-মুক্তমনা লেখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিদ্বেষী পোস্টের জবাব - ২

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

গল্প বলা স্টাইলে নাস্তিকতা (আসলে ইসলা্মবিদ্বেষ) প্রচার করে যিনি ইতিমধ্যেই নাস্তিকমহলে ব্যাপক বাহবা কুড়িয়েছেন।অনেকেই ওনার একাউন্টে গিয়ে নিজের অজান্তেই তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে পারেন বিধায় তার সম্পূর্ণ নাম উল্লেখ না করে শুধু নামের অদ্যাক্ষর উল্লেখ করলাম।যারা আগেই তার পোস্ট পড়েছেন, তারা এমনিতেই চিনতে পারবেন।

.

[এই সিরিজের প্রথম পর্ব পড়ুন এখানে #সত্যকথন_৯৯]

.

S.P. লিখেছে -

// আরেকটা কথা, বার বার যে বলছ মক্কাতে মুসলমানদের অত্যাচার করা হতো- তা আসলে কতটা সত্য আর অতিরঞ্জিত? ইসলাম ঘোষণার প্রথম তের বছর আরবের পৌত্তলিকরা কি চাইলেই মুহাম্মদকে হত্যা করতে পারত না? তার তো তখন সেনা বাহিনী নেই যে পাহারা দিয়ে রাখবে। তাহলে কেন হত্যা করেনি?

কারণ মুহাম্মদ হাশিমি বংশের ছেলে ছিল। তাকে হত্যা করার মনোভাব অনেকেই করত পৌত্তলিক ধর্মকে বিকৃত করার অভিযোগ কিন্তু সেটা বাস্তবায়ন করতে পারত না কারণ তাতে বনু হাশিম বংশ তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। যতই মুহাম্মদ বাপ-দাদার ধর্মকে বিকৃত করুক, তার উপর হামলা হলে রক্তঋণ হাশিমিরা উশুল করে ছাড়ত। এর প্রমাণ পাবে সিরাত ইবনে হিশাম পাঠ করলে।। ... ... এবার বলো তো, মক্কা ১৩ বছর আরব পৌত্তলিকদের হাতে কয়জন মুসলমান খুন হয়েছিলো? একজনও না! আর যুদ্ধ হাঙ্গামা কারা বাধিয়েছিল? কারা মক্কার বাণিজ্য কাফেলায় হামলা চালিয়ে লুট করেছিল? কারা মুক্তিপণ আদায় করত? //

.

আবার মিথ্যার বেসাতি।

আসলে এই মিথ্যাচার খণ্ডণ করা এতই সহজ যে এর জন্য কোন সীরাহবিদ হবার প্রয়োজন নেই।

.

আচ্ছা, প্রাথমিক যুগে যে মুসলিমরা মক্কা ছেড়ে আবিসিনিয়াতে (বর্তমান আফ্রিকা মহাদেশের ইথিওপিয়া) হিজরত করেছিল, এটা তো সবাই জানে। যে কোন সিরাত বইতে অথবা ইতিহাসের বইতে এটা পাওয়া যাবে। S.P. নামের অদ্যাক্ষরের আমাদের আলোচ্য ইসলামবিদ্বেষী লেখকের কথা অনুযায়ী মুসলিমদের উপর অত্যাচারের কাহিনী যদি আসলেই অতিরঞ্জিত হয়ে থাকে, তাহলে মুসলিমরা আবিসিনিয়া গিয়েছিল কেন? কোন মানুষ কি সাধে তার জন্মভূমি ছেড়ে আরেক দেশে গিয়ে বসতি গাড়ে? যদি তার উপর অত্যাচার না হয়ে থাকে বা তার জীবনের উপর হুমকি না আসে? ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময়ে বাংলাদেশের অনেক মানুষ কেন ভারতে আশ্রয় নিয়েছিল?

.

ইসলাম গ্রহণ করার ‘অপরাধে’ প্রাথমিক যুগে অনেক সাহাবীকেই কুরাইশরা হত্যা করেছিল, অনেকের উপর অবর্ণণীয় নির্যাতন চালিয়েছিল। ইসলামের প্রথম শহীদ হচ্ছেন একজন নারী সাহাবী সুমাইয়া (রা), পাষণ্ড কুরাইশরা তাঁকে বর্শা দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে। ইয়াসির বিন আমির (রা) কে মরুভূমিতে নির্যাতন করতে করতে মেরে ফেলে। বিলাল (রা) এর বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে উত্তপ মরুভূমিতে শুইয়ে রাখে, খাবার ও পানি না দিয়ে কষ্ট দেয়। আম্মার (রা) কেও কখনো বুকে পাথর চাপা দিয়ে

মরুভূমিতে শুইয়ে রেখে আবার কখনো পানিতে চুবিয়ে শাস্তি দিতে থাকে। আবু ফুকাইহাহ (রা) এর জামা কাপড় খুলে লোহার শেকল দিয়ে বেঁধে মুরুভূমির গরম ও কঙ্করে ভরা প্রান্তর দিয়ে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে কষ্ট দেয়া হত, এরপর পিঠের উপর পাথর চাপা দিয়ে শুইয়ে রাখতো। খাব্বাব (রা) কে উত্তপ্ত শলাকা দিয়ে পিঠ ও মাথায় ছ্যাকা দেয়া হত, গ্রীবা মুচড়ে মুচড়ে কষ্ট দেয়া হত।এরপরেও ইসলাম ত্যাগ না করায় তাঁকে জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর শুইয়ে পাথর দিয়ে চাপা দিয়ে রাখা হয়েছে। তাঁর পিঠ পুড়ে ধবল-কুষ্ঠ রোগীর মত সাদা হয়ে গিয়েছিল কিন্তু ইসলাম ত্যাগ করেননি। রোমান কৃতদাসী যিন্নিরাহ(রা) ইসলাম গ্রহণ করায় তাঁর মনিব আঘাত করে তাঁর চোখ নষ্ট করে দেয়। আমির বিন ফুরায়রা (রা) কে এমন নির্যাতন করা হয় যে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। উসমান বিন আফফান (রা) কে খেজুর পাতার চাটাইয়ের মধ্যে জড়িয়ে নিচ থেকে আগুন জ্বালিয়ে ধোঁয়া দিয়ে কষ্ট দেয়া হত। এরকম আরো বহু অত্যাচার নির্যাতনের বিবরণ দেয়া যাবে। ইতিহাসের বইগুলো এমন বিবরণে ভরা। [১]

.

অথচ নাস্তিক-মুক্তমনাদের অসামান্য 'মানবিকতা'(!) বোধের কাছে এগুলো কিছু না।ইসলামবিদ্বেষই আসল কথা। হাশিমি বংশের বলে মুহাম্মাদ ﷺ কে কুরাইশরা কখনো হত্যা করার চেষ্টা করেনি বলতে গিয়ে আমাদের আলোচ্য নাস্তিক মহাশয় যে মিথ্যাচারটি করলেন, তার খণ্ডণে ইবন হিশামসহ বিভিন্ন উৎস থেকে কিছু ঘটনা উল্লেখ করছি -

.

■ ঘটনা ১: "একবার আবু জাহল বলল, হে কুরাইশ ভাইয়েরা! তোমরা লক্ষ্য করেছ কি, মুহাম্মাদ আমাদের ধর্মের সমালোচনা ও উপাস্যদের নিন্দা থেকে বিরত হচ্ছে না? আমাদের পিতা ও পিতামহকে সারাক্ষণ গালমন্দ করেই চলেছে (নির্জলা মিথ্যা। নবী ﷺ কাউকে গালি দিতেন না)। এ কারণে আমি আল্লাহর নামে প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমি একটি ভারী পাথর নিয়ে বসে থাকব, মুহাম্মাদ যখন সিজদায় যাবে, তখন সে পাথর দিয়ে তাঁর মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিব। এরপর যে কোন পরিস্থিতির জন্য আমি প্রস্তুত। ইচ্ছে হলে তোমরা আমাকে বান্ধবহীন অবস্থায় রাখবে, ইচ্ছে হ'লে আমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে। এরপর আবদে মানাফ আমার সাথে যেরূপ ইচ্ছে ব্যবহার করবে এতে আমার কোন পরোয়া নেই। .... [২]

.

■ ঘটনা ২: আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, একদিন রাসূল ﷺ বায়তুল্লাহর পাশে সলাত আদায় করছিলেন। আবু জাহল ও তার সাথীরা অদূরে বসেছিল। কিছুক্ষণ পর তার নির্দেশে ভুঁড়ি এনে সিজদারত রাসূলের ﷺ দুই কাঁধের মাঝখানে চাপিয়ে দিল, যাতে ঐ বিরাট ভুঁড়ির চাপে ও দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে তিনি মারা যান।

.

ইবনু মাস'ঊদ (রা) বলেন, আমি সব দেখছিলাম। কিন্তু এই অবস্থায় আমার কিছুই করার ক্ষমতা ছিল না। অন্যদিকে শত্রুরা দানবীয় উল্লাসে ফেটে পড়ছিল। এই সময় কিভাবে এই দুঃসংবাদ ফাতিমার (রা) কানে পৌঁছল। তিনি দৌঁড়ে এসে ভুঁড়িটি সরিয়ে দিয়ে পিতাকে (মুহাম্মাদ ﷺ) কষ্টকর অবস্থা থেকে রক্ষা করেন। ... [৩]

.

■ ঘটনা ৩: আনাস (রা) থেকে বর্ণিত; তিনি বলেন, একদিন মক্কার মুশরিকরা রাসুলুল্লাহকে ﷺ এমন নির্মমভাবে মারধর করল যে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়লেন। এ সময় আবু বকর(রা) দ্রুত সেখানে এসে পৌঁছালেন এবং মুশরিকদের উদ্যেশ্য করে বললেন,

"ওরে হতভাগার দল! তোমরা কি একজন ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে হত্যা করতে চাও যে তিনি বলেন আমার প্রভু হলেন আল্লাহ।"

লোকেরা পেছনে ফিরে বলল, "এ কে?"

তাদের মধ্য থেকে একজন জবাব দিল, "এ হল আবু কুহাফার পাগল ছেলে (আবু বকর রা.)।" [৪]

.

■ ঘটনা ৪: উরওয়াহ ইবন যুবাইর (রা) বলেন, একদিন আমি আবদুল্লাহ ইবন আমরকে (রা) জিজ্ঞেস করলাম, মুশরিকরা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সাথে কী ধরণের কঠোর আচরণ করেছে?

তিনি জবাব দিলেন, "একদিন আমি দেখলাম রাসুলুল্লাহ ﷺ কাবা শরীফে নামাজ পড়ছিলেন। এমন সময় উকবা বিন আবু মুআইত সেখানে এসে নিজের চাদর দিয়ে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর গলা এমনভাবে পেঁচিয়ে ধরল যে তাঁর শ্বাস রুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হল। তৎক্ষণাৎ আবু বকর (রা) সেখানে গিয়ে উকবাকে কাঁধে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিলেন এবং বললেন,

"তোমরা কি একজন ব্যক্তিকে শুধু এ কারণে হত্যা করতে চাও যে তিনি বলেন আমার প্রভু হলেন আল্লাহ। অথচ তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভুর নিকট থেকে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছেন।" [৫]

.

সব থেকে বড় কথা, কুরাইশরা যদি হত্যা নাই করতে চাইত - তাহলে রাসুলুল্লাহ ﷺ মদীনায় হিজরত করলেন কেন? হিজরতের রাতে কুরাইশরা তাঁর বাড়ি ঘেরাও করেছিল কেন? [৬]

এ ঘটনা দিয়েই তো নাস্তিক মহোদয়ের অপযুক্তি খণ্ডণ হয়ে যায়।

.

সে আরও লিখেছে -

// আরেকটা দিক দেখো, মদিনায় জীবন হাতে নিয়ে হিযরত করার যে কথা বলা হয় সেটাকে সত্য ধরে নিলে আমাদের বিশ্বাস করতে হয় মক্কা দখল করার পরই বুঝি প্রফেট মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু আমরা দেখি তিনি তার আগেই হজ করতে মক্কায় তার দলবল নিয়ে হাজির হোন এবং তার নিজস্ব নিয়মে হজ পালন করেন। এমনকি তিনি আবু বকর আর আলীকে পাঠিয়ে হজ মৌসুমে প্রচার করতে বলেন যে, আগামী বছর পর থেকে মুশরিকদের তিনি এই স্থান থেকে চিরতরে বিতাড়িত করবেন। //

.

সে আসলে কিসের ভিত্তিতে কোন কিছু সত্য বা মিথ্যা বিবেচনা করে সেটাই একটা প্রশ্ন। যা হোক, আমরা তাফসির ও সিরাহ মারফত জানতে পারি যে, রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ সীমাহীন অত্যাচারের শিকার হয়ে মদীনায় হিজরত করার পর বছরের পর বছর তাদের জন্য কাবায় ইবাদত করার কোন সুযোগ ছিল না। ৬ষ্ঠ হিজরীতে রাসুলুল্লাহ ﷺ ও সাহাবীগণ (রা) উমরাহ পালনের জন্য মক্কার দিকে রওনা করেছিলেন। তাঁদের এ সফর ছিল একান্তই ইবাদতের জন্য ও শান্তিপূর্ণ। তাঁরা কুরবানী পশুর গায়ে চিহ্ন দিয়ে ও ইহরাম বেঁধে যাত্রা করেছিলেন যাতে সবাই নিশ্চিত থাকে যে এ সফর শুধুই ইবাদতের জন্য এবং শান্তিপূর্ণ। কিন্তু এরপরেও কুরাইশরা তাদের কাবায় যেতে দেয়নি। নবী ﷺ তাদের সঙ্গে শান্তির সনদ 'হুদায়বিয়া সন্ধি' করে সে বছর উমরাহ না করেই মদীনা ফিরে যান। [৭]

পরবর্তীতে ২ বছরের মধ্যে কুরাইশরা এ সন্ধি ভঙ্গ করলে ৮ম হিজরীতে রাসুলুল্লাহ ﷺ শান্তিপূর্ণ উপায়ে মক্কা জয় করেন। এর আগ পর্যন্ত হজ বা উমরাহ করার কোন সুযোগ মুসলিমদের ছিল না। মক্কা বিজয়ের আগে হজ করবার অ্লীক ইতিহাস বলে নাস্তিক মহোদয় এক অভিনব উপায়ে মিথ্যাচারের প্রয়াস পেয়েছেন।

.

নাস্তিক মহোদয় আবু বকর (রা) এর যে ঘটনা উল্লেখের চেষ্টা করেছেন তা মক্কা বিজয়ের পরের ঘটনা। সুরা বারাআতের (তাওবা) একেবারে প্রথম অংশ এই সময়ের প্রেক্ষিতে (অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের পর) নাজিল হয়েছে। ৯ম হিজরীতে হজের মৌসুমে আবু বকর (রা) কে হজযাত্রীদলের নেতা করে পাঠান রাসুলুল্লাহ ﷺ। ১০ই যিলহজ আলী (রা) জনগণের উদ্দ্যেশ্যে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নির্দেশমালা পড়ে শোনান। তার মধ্যে এটাও উল্লেখ ছিল যেঃ যে মুশরিকগণ মুসলিমগণের সঙ্গে ওয়াদা পালনে কোন প্রকারের ত্রুটি করেনি, কিংবা মুসলিমদের বিরুদ্ধে অন্য কাউকে সাহায্য প্রদান করেনি, তাদের অঙ্গীকারনামা নির্ধারিত সময় পর্যন্ত বলবত রাখা হবে।

এ ছাড়া আবু বকর (রা) একদল সাহাবায়ে কেরামের মাধ্যমে ঘোষণা প্রদান করেন যে - আগামীতে কোন মুশরিক কাবায় হজ করতে পারবে না এবং কেউ জাহিলিয়াতের যুগ থেকে চলে আসা অশ্লীল রীতি উলঙ্গ হয়ে কাবা তাওয়াফ করতে পারবে না। [৮]

.

এটা ঠিক যে-- রাসুলুল্লাহ ﷺ মক্কা বিজয়ের পরে মুশরিকদের হজ করা নিষিদ্ধ হয়। কাবা মূলত ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) এর নির্মিত এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনা গৃহ। মক্কা বিজয়ের পর ইব্রাহিমি হজের বিধি-বিধান পুনরুদ্ধার করা হয় এবং পৌত্তলিকদের নব উদ্ভাবনকে নিষিদ্ধ করা হয়। এ গৃহে মূর্তিপুজা ও অন্যান্য নব উদ্ভাবিত পৌত্তলিক রীতিতে হজ করার অর্থ হচ্ছে এই গৃহের পবিত্রতা নষ্ট করা। উলঙ্গ হয়ে তাওয়াফ করার মত অশ্লীল কাজ ইসলাম কখনো বরদাশত করেনি, করবেও না। এ রীতি ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) কিংবা অন্য কোন নবীর রীতি নয়। কাজেই এই সকল শয়তানী রীতিকে সঙ্গত কারণেই ইসলাম নিষিদ্ধ করেছে। এ ছাড়া আমরা এটাও দেখছি যে, যেসকল মুশরিক মুসলিমদের সঙ্গে চুক্তি রক্ষা করেছে, মুসলিমদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য করেনি, তাদের সাথে চুক্তি রক্ষা করবার নির্দেশও সেই হজ মৌসুমে জানানো হয়েছিল। কাজেই এ ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ইসলামকে 'অশান্তিময়' প্রমাণ করার এই চেষ্টাও একটি ব্যর্থ চেষ্টা ছাড়া কিছু নয়।

.

(চলবে, ইন শা আল্লাহ। আল্লাহু মুসতা'আন।)

---

[১] 'আর রাহিকুল মাখতুম', শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র), তাওহিদ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ১১৬-১২০
আরো দেখুনঃ

➡ *http://islamiat101.blogspot.com/.../the-early-persecution-of-...*

➡ *http://www.musalla.org/ar.../Persecution_of_the_Muslims33.html*

➡ *http://www.islamreligion.com/.../172/muhammad-s-biography-pa.../*

➡ *https://en.wikipedia.org/.../Persecution_of_Muslims_by_Meccans*

[২] সীরাতুন্নবী (স)-ইবন হিশাম, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ২৬৪

[৩] বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত, হাদিস নং ৫৮৪৭

[৪] মুসতাদরাক হাকিম,(কিতাবু মাআরিফাতিস সাহাবা), হাদিস নং ৪৩৯৮; মুসনাদ আবু ইয়ালা, হাদিস নং ৩৫৯২

[৫] সহীহ বুখারী, (কিতাবুল মানাকিব), হদিস নং ৩৪০২, ৩৫৬৭; (কিতাবুত তাফসির), হাদিস নং ৪৪৪১

[৬] হিজরতের ঘটনা ও কুরাইশদের রাসুলুল্লাহকে ﷺ হত্যাচেষ্টার বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুনঃ 'আর রাহিকুল মাখতুম', শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র), তাওহিদ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ২০৬-২১০ দ্রষ্টব্য

[৭] বিস্তারিত দেখুনঃ 'আর রাহিকুল মাখতুম', শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র), তাওহিদ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৩৮৬-৩৯৪

[৮] বিস্তারিত দেখুনঃ 'আর রাহিকুল মাখতুম', শফিউর রহমান মুবারকপুরী (র), তাওহিদ প্রকাশনী, পৃষ্ঠা ৫০১

১০১

নাস্তিক-মুক্তমনা লেখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিদ্বেষী পোস্টের জবাব - ৩

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

গল্প বলা স্টাইলে নাস্তিকতা (আসলে ইসলামবিদ্বেষ) প্রচার করে যিনি ইতিমধ্যেই নাস্তিকমহলে ব্যাপক বাহবা কুড়িয়েছেন। অনেকেই ওনার একাউন্টে গিয়ে নিজের অজান্তেই তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে পারেন বিধায় তার সম্পূর্ণ নাম উল্লেখ না করে শুধু নামের অদ্যাক্ষর উল্লেখ করলাম। যারা আগেই তার পোস্ট পড়েছেন, তারা এমনিতেই চিনতে পারবেন।

.

[এই সিরিজের ১ম ও২য় পর্বের জন্য দেখুন (#সত্যকথন) ৯৯ ও (#সত্যকথন) ১০০]

.

S.P. লিখেছে -

.

//আয়াতটা [সুরা তাওবা ৫] যদি ভাল করে পড়ে থাকো তাহলে খেয়াল করেছো কি, শুরুতে কি বলা হয়েছে- ‘অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে’- এর মানে কি? এর মানে আরব পৌত্তলিকদের ধর্ম বিশ্বাস ছিল ১২ মাসের মধ্যে বিশেষ চারটি মাস হচ্ছে নিষিদ্ধ মাস বা পবিত্র মাস তাদের দেবতাদের কাছে। এই মাসগুলোতে আরবের কোন গোত্রই যুদ্ধ বিগ্রহ রক্তপাতে জড়াতো না। এই সময় সব আরব গোত্র নিজ নিজ ঘরে অবস্থান করত। মজাটি কি জানো, পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করা ইসলামের আল্লাহ কি করে পৌত্তলিক কাফেরদের এইসব ‘পবিত্র মাসের’ বিশ্বাসকে নিজেও পবিত্র বলে গোণ্য করেন? তিনি না ইব্রাহিম নবী মাবুত! তিনি না মুসা ঈসার মাবুত? কই তুমি একজনও ইহুদী খ্রিস্টানকে পাবে যারা বিশেষ আরবি চারটি মাসকে পবিত্র বা নিষিদ্ধ বলে মান্য করে বা সেসময় করত? পাবে না।//

.

.

>>>>> আরবের পৌত্তলিকরা পালন করত বলেই যে সেটা একতত্ববাদী কিংবা ইব্রাহিমি (Abrahamic) রীতি হবে না এমন কোন কথা নেই। আরবের মুশরিকরা এগুলোকে দেবতাদের পবিত্র মাস হিসাবে গণ্য করত না বরং আল্লাহর পবিত্র মাস হিসাবে গণ্য করত। কুরাইশ আরবরা ছিল ইব্রাহিম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এর বংশধর।বংশ পরম্পরায় বেশ কিছু ইব্রাহিমি রীতি তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল।ইসলাম সেগুলো বহাল রেখেছে।হারাম মাস তার মধ্যে একটি।ইসলাম কোন নতুন ধর্ম নয়, সব কিছু বাতিল করে দেয়া ইসলামের নীতি নয়; ইসলাম সকল নবী-রাসুলের ধর্ম।ইসলাম শুধু তাদের মধ্যকার নব উদ্ভাবনগুলো পরিত্যাগ করতে বলেছে।

.

আমাদের আলোচ্য ইসলামবিদ্বেষী লেখক দাবি করেছেন যেঃ ইসলাম মূলত পৌত্তলিকদের আচরিত হারাম(পবিত্র/sacred) মাসের বিধান গ্রহণ করেছে এবং হারাম মাসের রীতি ইহুদি-খ্রিষ্টান কোন আব্রাহামিক জাতির ভেতর ছিল না।চলুন দেখি বাস্তবতার নিরিখে এই দাবি কতটুকু সত্য।

.

জাহিলিয়াতে যুগে কুরাইশ আরবদের মধ্যে হারাম মাসের রীতি ছিল বটে; কিন্তু তা ছিল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান থেকে বিচ্যুত অবস্থায়। আল্লাহর নির্ধারিত হারাম মাস হচ্ছেঃ যিলকদ, যিলহজ, মুহাররাম ও রজব।কিন্তু কুরাইশরা আল্লাহ নির্ধারিত হারাম মাসকে বদলে ফেলেছিল।তারা এই মাসগুলো আগু-পিছু করে পালন করত। মোটেও খাঁটি ইব্রাহিমি রীতিতে পালন করত না। তাদের এই কাজের সমালোচনা করা হয়েছে সুরা তাওবার ৩৭নং আয়াতে। [১]

.

এর আগের আয়াতে(সুরা তাওবা ৩৬) আল্লাহর আদি অকৃত্রিম বিধানের বর্ণণা করা হয়েছে এবং মুসলিমদেরকে হারাম মাসের বিধান জানানো হয়েছে। রাসুলুল্লাহ(ﷺ) জানিয়ে দেন আল্লাহর নির্ধারিত হারাম মাস হচ্ছেঃ যিলকদ, যিলহজ, মুহাররাম ও রজব। [সহীহ বুখারী ৪৬৬২ ও সহীহ মুসলিম ১৬৭৯ দ্রষ্টব্য] কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি ইসলামে হারাম মাসের রীতি আরবের পৌত্তলিক কুরাইশদের থেকে ভিন্ন, রাসুলুল্লাহ(ﷺ) সৃষ্টির আদি থেকে চলে আসা সেই চিরন্তন রীতির দিকে মানুষকে আহ্বান করেছেন।

.

এখন প্রশ্ন হচ্ছেঃ ইহুদি-খ্রিষ্টান এইসব জাতির মাঝে কি কোন প্রকার হারাম মাসের(sacred months) রীতি ছিল?

.

ইসলাম ও ইহুদি উভয় ধর্মেই চান্দ্র মাসে বর্ষ গণণা হয়।উভয় ধর্মের ক্যালেন্ডারের ভেতরে মিল রয়েছে।আমরা সহীহ হাদিসে দেখতে পাই যে মদীনার ইহুদিরা আশুরার রোজা পালন করত। [২]

.

ইহুদি ও ইসলাম উভয় ধর্মের ক্যালেন্ডারের পারস্পরিক সম্পর্ক জানার জন্য বেন আব্রাহামসন ও যোসেফ কাৎজ এর এই গবেষণাপত্রটি দেখা যেতে পারেঃ “The Islamic Jewish Calendar How the Pilgrimage of the 9th of Av became the Hajj of the 9th of Dhu'al-Hijjah” [৩]

.

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থে মূলত তিনটি হাজ্জ{হিব্রু ‘হাগ’, ইংরেজি festival/pilgrimage} এর বিবরণ রয়েছে{Tanakh, Shemot chapter 23 দ্রষ্টব্য}। ইহুদিদের pilgrimage এর মাসগুলো পবিত্র মাস(sacred month) হিসাবে গণ্য হত এবং এ সময়ে যুদ্ধ নিষিদ্ধ ছিল। [৪]

.

ইহুদিদের ২য় টেম্পল ধ্বংসের পর হিব্রু ক্যালেন্ডারের আভ(Av) মাসের ৯তারিখে আরো একটি pilgrimage যুক্ত হয়। অতএব মোট pilgrimage হয় ৪টি।অর্থাৎ ৪টি পবিত্র মাস।

.

আরবের ইহুদিদের মধ্যেও এই পবিত্র মাসের রীতি প্রচলিত ছিল।অথচ আমাদের আ্লোচ্য নাস্তিক মহোদয় দিব্যি বলে দিলেন পবিত্র মাসের এ রীতি নাকি পৌত্তলিক রীতি, ইহুদি-খ্রিষ্টান কারো মধ্যে এমন কিছু ছিল না!!

.

আর খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে যা বলব--- আমি স্বীকার করি যে খ্রিষ্টানরা হারাম(পবিত্র) মাস পালন করে না, তখনো করত না। কিন্তু এটি সর্বজনবিদিত যেঃ খ্রিষ্টধর্ম রোমে গিয়ে ঈসায়ী ধর্ম থেকে এক পৌত্তলিক ধর্মে পরিনত হয়।তাওরাত অনুসারী বনী ইস্রাঈলের ইব্রাহিমি (Abrahamic) রীতিনীতি বাদ দিয়ে তারা বিভিন্ন রোমক সংস্কৃতি গ্রহণ করে।সেন্ট পলের দর্শন মানতে গিয়ে তারা অনেক আগেই তাওরাতের আইন বর্জন করেছে।কাজেই খ্রিষ্টানদের থেকে হারাম মাস পালন আশা করা যায় না।ইহুদি বা খ্রিষ্টান কোন ধর্ম আমাদের কাছে দলিল নয়।তাদের গ্রন্থগুলো বিকৃত হয়েছে এবং আমরা মুসলিমরা তাদের সকল রীতি-নীতির সাথে একমত নই। শুধুমাত্র আমাদের নাস্তিক মহোদয় হারাম মাসের বিধানকে ‘পৌত্তলিক’ বিধান সাব্যস্ত করলেন এবং এমন কোন কিছু ইহুদিরা পালন করত না বলে বিভ্রান্তিকর তথ্য দিলেন বিধায় ইহুদিদের এ রীতিগুলো সম্পর্কে আলোচনা করলাম।

.

[চলবে, ইন শা আল্লাহ।

সিরিজের পরবর্তী পর্বে এই ইসলামবিদ্বেষী লেখকের আরো অনেকগুলো মিথ্যাচার ও অপব্যাখ্যার পোস্টমর্টেম করা হবে। আল্লাহু মুসতা'আন।]

তথ্যসূত্রঃ

.

[১] বিস্তারিত দেখুনঃ তাফসির ইবন কাসির(হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী), ৩য় খণ্ড, সুরা তাওবার ৩৭ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ৬৭০-৬৭২

[২] সহীহ বুখারী ২০২৪,৩৩৯৭ ও সহীহ মুসলিম ১১৩০ দ্রষ্টব্য

[৩] ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://goo.gl/TJcU9m

[৪] "The Islamic Jewish Calendar How the Pilgrimage of the 9th of Av became the Hajj of the 9th of Dhu'al-Hijjah"; By Ben Abrahamson and Joseph Katz; page 4

অথবা

http://www.alsadiqin.org/en/index.php...

১০২

প্রসঙ্গ নবী (ﷺ) এর ইসরা ও মিরাজঃ ইসরার ঘটনার সত্যতা কতটুকু? মসজিদুল আকসা কি আসলেই সে সময়ে ছিল? -১

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর ইসরা ও মিরাজ নিয়ে প্রশ্ন তোলে নাস্তিক-মুক্তমনা ও খ্রিষ্টান মিশনারীরা। তাদের বক্তব্য হচ্ছে - মুহাম্মাদ ﷺ ইসরা ও মিরাজের রাতে মক্কা থেকে জেরুজালেমের আল আকসা মসজিদ ভ্রমণ করার দাবি করেছেন। কিন্তু এটি আদৌ সম্ভব নয়, কারণ সেখানে তখন কোন মসজিদ বা অন্য কোন উপাসনালয় ছিল না। তার বহু আগেই, ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোম সম্রাট টাইটাস ইহুদিদের মহামন্দির গুড়িয়ে দেয়। [https://goo.gl/NAFQgp] কাজেই ইসরা ও মিরাজের রাতে মহানবী ﷺ আকসা মসজিদে যাবার যে দাবি করেছেন তা মিথ্যা (নাউযুবিল্লাহ)।

.

চলুন দেখি, যুক্তি-প্রমাণ ও বিবেকের কষ্টিপাথরে, কার দাবি সত্য।

.

'মিরাজ' শব্দ এসেছে আরবি উরুযুন শব্দ থেকে। উরুযুন অর্থ সিঁড়ি আর মিরাজ অর্থ ঊর্ধ্বগমন। যেহেতু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা হয় সেজন্য রাসূলের ঊর্ধ্বগমনকে মিরাজ বলা ইসরা [إسراء] - মানে হল রাতে পরিভ্রমণ করা। পারিভাষিকভাবে এটি হল রাসুলুল্লাহ ﷺ এর মক্কার মসজিদুল হারাম থেকে জেরুজালেমের মসজিদুল আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ। এ ব্যাপারে আল্লাহর বাণীঃ

" পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা তিনি, যিনি স্বীয় বান্দাকে (মুহাম্মাদ ﷺ) এক রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় (বাইতুল মুকাদ্দাস) যার চারপাশকে আমি করেছিলাম বরকতময়,তাঁকে আমার নিদর্শন দেখানোর জন্য। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।"

[সূরা বনী ইসরাঈল, ১৭:১]

.

প্রথমে আমরা জেনে নিই—ইসলামী পরিভাষায় 'মসজিদ' কী।

আরবি ভাষায় 'মাসজিদ' শব্দের মানে হচ্ছে 'সিজদা করার স্থান'। শব্দটি এসেছে 'সুজুদ' শব্দ থেকে, যার মানে হচ্ছে 'সিজদা করা'। কাজেই একটা মসজিদকে দ্বীনি শিল্পকর্মে ভরপুর পিলার দ্বারা তৈরি বিশাল কোন স্থাপনা হতে হবে—এমন কোন কথা নেই। সীমানা দ্বারা ঘেরা যেকোন ইবাদতের স্থানই মসজিদ হতে পারে।আবার ছোট দেয়াল কিংবা পাথর দ্বারা তৈরি স্থাপনাও মসজিদ হতে পারে। ঐ এলাকাটিকে তাত্ত্বিকভাবে "মসজিদ" বা 'সিজদা করার স্থান' বলা যেতে পারে।

.

নবী মুহাম্মাদ ﷺ বলেনঃ

فُضِّلْتُ عَلَى الْأَنْبِيَاءِ بِسِتٍّ أُعْطِيتُ جَوَامِعَ الْكَلِمِ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ وَأُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَجُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ طَهُورًا وَمَسْجِدًا وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً وَخُتِمَ بِيَ النَّبِيُّونَ

"পূর্ববর্তী অন্যান্য নবীদের উপর ছয়টি বিষয়ে আমাকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। আমাকে দেয়া হয়েছে অল্প শব্দে অনেক বেশী অর্থবোধক কথা বলার যোগ্যতা, আমি অনেক দূর থেকে শত্রুবাহিনীর মধ্যে ভয় সৃষ্টির মাধ্যমে বিজয় প্রাপ্ত হই। গনিমত তথা পরাজিত শত্রুবাহিনীর ফেলে যাওয়া সম্পদ আমার জন্যে বৈধ করা হয়েছে। আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং মসজিদ বানানো হয়েছে। সমগ্র সৃষ্টিকুলের জন্য আমাকে নবী বানানো হয়েছে এবং আমার মাধ্যমেই নবী আগমনের ধারাকে সমাপ্ত করা হয়েছে।"

[সহীহ মুসলিম, হাদীস ৭১২]

হাদিস থেকে জানা গেল যে সমগ্র পৃথিবীই মসজিদের অন্তর্গত।

.

শাইখ মুহাম্মাদ ইবন সালিহ আল উসাইমিন (র) তাঁর মসজিদ ও নামাযঘর সংক্রান্ত এক ফতোয়ায় বলেছেনঃ

“সাধারণ অর্থ অনুযায়ী সমগ্র পৃথিবীই হচ্ছে মসজিদ কারণ নবী(ﷺ) বলেছেনঃ “আমার জন্য সমগ্র পৃথিবীকে পবিত্রতা অর্জনের মাধ্যম এবং মসজিদ বানানো হয়েছে। ”
সুনির্দিষ্ট অর্থ, মসজিদ হচ্ছে একটি স্থান যেদিকে স্থায়ীভাবে সলাতের(নামাযের) জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে এবং স্থায়ীভাবে বন্টণ করা হয়েছে, হোক সেটি পাথর, কাদা বা সিমেন্টে বানানো অথবা তা দ্বারা না বানানো। ...”

[ফতোয়া শাইখ উসাইমিন ১২/৩৯৪]

.

অতএব মসজিদের জন্য স্থান হচ্ছে মূখ্য বিষয়। ছাদবিশিষ্ট ইমারত থাকুক বা না থাকুক, সেটি মূখ্য নয়। মসজিদুল হারাম, মসজিদুল আকসা এগুলো স্বয়ং আল্লাহর পক্ষ থেকে স্থিরিকৃত স্থায়ী ইবাদতের জায়গা।

.

আবূ যার গিফারী(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! সর্বপ্রথম কোন মাসজিদ নির্মিত হয়েছে? তিনি বলেন: মাসজিদুল হারাম। রাবী বলেন, আমি আবার বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বলেন: তারপর মসজিদুল আকসা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, উভয়ের মধ্যে ব্যবধান কত বছরের? তিনি বলেন: চল্লিশ বছরের। এখন তোমার জন্য সমগ্র পৃথিবীই মাসজিদে। অতএব যেখানেই তোমার সলাতের ওয়াক্ত হয়, সেখানেই তুমি সলাত আদায় করতে পারো।

[সুনানু ইবনে মাজাহ, হাদিস ৭৫৩]

.

হাদিস ও কুরআনে ইব্রাহিম(আ) কর্তৃক নির্মিত হবার পূর্বে মসজিদুল হারামের স্থানটিকেও ‘আল্লাহর ঘর’ বলে অভিহীত করা হয়েছে। যদিও সেখানে তখন কোন ইমারত ছিল না।ছাদবিশিষ্ট ঘর ছিল না।

“... তারপর (আল্লাহর হুকুমে) ইব্রাহীম (আ) হাযেরা (আ) এবং তাঁর শিশু ছেলে ইসমাঈল(আ)-কে সাথে নিয়ে বের হলেন, এ অবস্থায় যে, হাযেরা (আ) শিশুকে দুধ পান করাতেন । অবশেষে যেখানে কা‘বা ঘর অবস্থিত, ইব্রাহীম (আ) তাঁদের উভয়কে সেখানে নিয়ে এসে মাসজিদের উঁচু অংশে যমযম কূপের উপরে অবস্থিত একটি বিরাট গাছের নীচে তাদেরকে রাখলেন ।

তখন মক্কায় না ছিল কোন মানুষ না ছিল কোনরূপ পানির ব্যবস্থা । পরে তিনি তাদেরকে সেখানেই রেখে গেলেন। আর এছাড়া তিনি তাদের কাছে রেখে গেলেন একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর এবং একটি মশকে কিছু পরিমাণ পানি । এরপর ইব্রাহীম (আ) ফিরে চললেন।

.

তখন ইসমাঈল (আ)-এর মা পিছু পিছু ছুটে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, হে ইব্রাহীম! আপনি কোথায় চলে যাচ্ছেন ? আমাদেরকে এমন এক ময়দানে রেখে যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সাহায্যকারী আর না আছে (পানাহারের) ব্যবস্থা। তিনি একথা তাকে বারবার বললেন। কিন্তু ইব্রাহীম (আ) তাঁর দিকে তাকালেন না। তখন হাযেরা (আ) তাঁকে বললেন, এ (নির্বাসনের) আদেশ কি আপনাকে আল্লাহ দিয়েছেন ? তিনি বললেন, হ্যাঁ । হাযেরা (আ) বললেন, তাহলে আল্লাহআমাদেরকে ধ্বংস করবেন না। তারপর তিনি ফিরে আসলেন ।

.

আর ইব্রাহীম (আঃ) ও সামনে চললেন । চলতে চলতে যখন তিনি গিরিপথের বাঁকে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী ও সন্তান তাঁকে আর দেখতে পাচ্ছেন না, তখন কা’বা ঘরের দিকে মুখ করে দাঁড়ালেন । তারপর তিনি দু’হাত তুলে এ দু’আ করলেন, আর বললেন,

“হে আমার প্রতিপালক ! আমি আমার পরিবারকে কতকে আপনার সম্মানিত ঘরের নিকট এক অনুর্বর উপত্যকায় ....যাতে আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে ।

(সুরা ইব্রাহিমঃ ১৪:৩৭)

...

...

... ঐ সময় আল্লাহর ঘরের স্থানটি যমীন থেকে টিলার ন্যায় উঁচু ছিল । বন্যা আসার ফলে তাঁর ডানে বামে ভেঙ্গে যাচ্ছিল। এরপর হাযেরা (আ) এভাবেই দিন যাপন করছিলেন। ... ... যখন তিনি তাঁর পিতাকে দেখতে পেলেন, তিনি দাঁড়িয়ে তাঁর দিকে এগিয়ে গেলেন। এরপর একজন বাপ-বেটার সঙ্গে, একজন বেটা-বাপের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে যেরূপ করে থাকে তারা উভয়ে তাই করলেন। এরপর ইব্রাহীম (আ) বললেন, হে ইসমাঈল। আল্লাহ আমাকে একটি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। ইসমাঈল (আ) বললেন, আপনার প্রভু আপনাকে যা আদেশ করেছেন, তা করুন। ইব্রাহীম (আ) বললেন, আল্লাহ আমাকে এখানে একটি ঘর বানাতে নির্দেশ দিয়েছেন। এই বলে তিনি উঁচু টিলাটির দিকে ইশারা করলেন যে, এর চারপাশে ঘেরাও দিয়ে, তখনি তাঁরা উভয়ে কা’বা ঘরের দেয়াল উঠাতে লেগে গেলেন। ...”

[সহীহ বুখারী , হাদিস ৩৩৬৪]

.

সব থেকে বড় কথা, যে আয়াতে (বনী ইস্রাঈল ১) মুহাম্মাদ ﷺ এর ইসরার কথা বলা আছে ও মসজিদুল আকসার কথা এসেছে, ঐ একই আয়াতে মসজিদুল হারামের কথাও এসেছে।“... যিনি স্বীয় বান্দাকে (মুহাম্মাদ ﷺ) এক রাতে ভ্রমণ করিয়েছিলেন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় ...” (বনী ইস্রাঈল ১৭:১) এই আয়াতে মসজিদুল হারামকে ‘মসজিদ’ বলা হয়েছে অথচ এটিও তখন ছিল একটি খালি জায়গা, মসজিদুল আকসার মতই! সেখানে কাবাঘর ছিল বটে, কিন্তু এর চারদিকে কোন ছাদবিশিষ্ট ‘মসজিদ’ ছিল না বরং খালি জায়গা ছিল। সে সময়ে কাবার খুব নিকটে মানুষজনের ঘরবাড়ী ছিল। মানুষজন কাবার চারদিকে ঐ খালি জায়গাতেই ইবাদত করত। এবং ঐ খালি জায়গাকেই উক্ত আয়াতে ‘মসজিদ’ বলা হয়েছে। যেসব ছিদ্রান্বেষী ঐ আয়াত দেখিয়ে বলতে চায় “খালি জায়গাকে কিভাবে আল আকসা মসজিদ বলা যেতে পারে”, তাদের এই তথ্যটি জেনে রাখা উচিত যে মসজিদুল হারামও “খালি জায়গা” ছিল, এবং সিজদার ঐ পবিত্র স্থানকেও আল্লাহ ‘মসজিদ’ বলে অভিহীত করেছেন। ঐ আয়াত থেকেই তাদের ভ্রান্ত দাবি খণ্ডণ হয়ে যায়।

.

যে স্থানে সুলাইমান (আ) এর মসজিদ (ইহুদিদের পরিভাষায়ঃ বাইত হা মিকদাশ, খ্রিষ্টানদের পরিভাষায়ঃ মহামন্দির বা Temple Mount) ছিল এবং নবী-রাসুলদের অনুসারী ইহুদিরা উপাসনার জন্য জড়ো হত, সেই এক সীমানার মধ্যেই বর্তমান আল আকসা মসজিদ স্থাপন করা হয়েছে। আর হুবহু সেই জায়গাটির উপর স্থাপন করা হয়েছে সোনালী গম্বুজের ‘কুব্বাতুস সাখরা’(Dome of Rock) মসজিদটি। কুব্বাতুস সাখরা মসজিদ স্থাপন করা হয়েছে বনী ইস্রাঈলের কিবলাহ পাথরের উপরে। আর সীমানা দেয়াল দ্বারা ঘেরা পুরো এলাকাটিই মুসলিমদের কাছে বাইতুল মুকাদ্দাস/বাইতুল মাকদিস/ আল আকসা/ হারাম আল শারীফ। মক্কার মসজিদুল হারাম যেমন একটি নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে অবস্থিত, একইভাবে আল আকসাও একটি নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে অবস্থিত।এই এলাকার মধ্যে সব জায়গাই “মসজিদ” বলে বিবেচিত হয়।

.

আগেই বলা হয়েছে যে—‘মসজিদ’ মূলত সিজদা করবার স্থান। ‘মসজিদ’ হবার জন্য কোন ইমারত থাকা জরুরী নয়। আল আকসায় সে সময়ে কোন ইমারত না থাকলেও সীমানাসহ জায়গাটি চিহ্নিত ছিল। মুহাম্মাদ ﷺ ইসরার রাতে জেরুজালেমের সে স্থানে গিয়েছিলেন। কাজেই এই তিনি সেদিন মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায় গিয়েছেন এ দাবির মধ্যে তাত্ত্বিকভাবে কোনই ভুল নেই বা মিথ্যা নেই। এমনকি কুরআন ও হাদিসের পরিভাষার সাথেও তা কোনক্রমেই সাংঘর্ষিক নয়।

.

বিরোধিরা এরপরেও দাবি করতে চায় - মুহাম্মাদ ﷺ আল আকসায় গমন বলতে শুধুমাত্র ঐ স্থানটিতে যাওয়া বোঝাননি বরং তিনি ইমারতবিশিষ্ট একটি মসজিদের কথাই বলেছেন।এর স্বপক্ষে তারা নিম্নোক্ত দলিলগুলো ব্যবহার করে -

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আমি হাজরে আসওয়াদের কাছে ছিলাম। এ সময় কুরায়শরা আমাকে আমার মিরাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করতে শুরু করে। তারা আমাকে বাইতুল মুকাদ্দাসের এমন সব বিষয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগল, যা আমি ভালভাবে দেখিনি। ফলে আমি খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লাম।

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ তারপর আল্লাহ তাআলা আমার সম্মুখে বাইতুল মুকাদ্দাসকে উদ্ভাসিত করে দিলেন এবং আমি তা দেখছিলাম । তারা আমাকে যে প্রশ্ন করছিল, তার জবাব দিতে লাগলাম। ...

[সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, কিতাবুল ঈমান অধ্যায়, হাদিস ৩২৮]

.

আমি হিজরে (হাজর আসওয়াদ) দাঁড়ালাম, বাইতুল মাকদিস দেখতে পেলাম এবং এর নিদর্শনগুলো বর্ণণা করলাম। তাদের মধ্যে কেউ কেউ জানতে চাইলো ঐ মসজিদে কতগুলো দ্বার আছে? আমি (আগে) সেগুলো গুনিনি কাজেই আমি এর দিকে তাঁকালাম এবং এক এক করে গুনলাম এবং এগুলোর তথ্য তাদের দিলাম।

[তাবাকাত আল কাবির খণ্ড ১, ইবন সা'দ, পৃষ্ঠা ২৪৬-২৪৮ দ্রষ্টব্য]

.

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আমার জন্য বুরাক পাঠানো হলো। বুরাক গাধা থেকে বড় এবং খচ্চর থেকে ছোট একটি সাদা রঙের জন্তু। যতদূর দৃষ্টি যায়, এক এক পদক্ষেপে সে ততদূর চলে। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেনঃ আমি এতে আরোহন করলাম এবং বাইতুল মাকদিস পর্যন্ত এসে পৌঁছলাম। তারপর অন্যান্য নবীগণ তাদের বাহনগুলো যে রজ্জুতে বাধতেন, আমি সে রজ্জুতে আমার বাহনটিও বাধলাম।

তারপর মসজিদে প্রবেশ করলাম ও দুই রাকাত নামায আদায় করে বের হলাম। ...

[সহীহ মুসলিম, খণ্ড ১, কিতাবুল ঈমান অধ্যায়, হাদিস ৩০৯]

.

এই বর্ণণাগুলোয় দেখা যায় যে রাসুলুল্লাহ ﷺ বলছেনঃ তাঁর সামনে বাইতুল মুকাদ্দাসকে উদ্ভাসিত করা হয়েছিল,তিনি মসজিদে প্রবেশ করেছেন ও তা থেকে বের হয়েছেন, তিনি মসজিদের কিছু দ্বারের কথা বলছেন। এ থেকে নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারীরা দাবি করে যে - তিনি ইমারতসহ একটি মসজিদের কথাই বলেছেন কেননা তিনি যদি খালি স্থানের কথা বলতেন, তাহলে তাঁর সামনে কী উদ্ভাসিত করা হল, খালি স্থান হলে তো দ্বার থাকার কথা না, খালি স্থানে কী করে তিনি প্রবেশ করলেন ও বের হলেন। কাজেই তিনি একটি ইমারতবিশিষ্ট মসজিদের কথাই বলতে চেয়েছেন যা একটি অসত্য কথা (নাউযুবিল্লাহ)।

.

প্রথম কথাঃ উদ্ভাসিত হওয়ার জন্য ইমারত থাকা জরুরী নয়।যে কোন স্থানই কারো সামনে উদ্ভাসিত হয়ে বা ফুঁটে উঠতে পারে।

.

দ্বিতীয় কথাঃ পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মসজিদুল হারাম যেমন একটা নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে গঠিত, বাইতুল মুকাদ্দাসও তেমনি একটি নির্দিষ্ট এলাকা নিয়ে গঠিত। সেই এলাকাটি সীমানা প্রাচীরে ঘেরা ছিল। সেই এলাকাতে ঢোকা ও বের হওয়া মসজিদে ঢোকা ও বের হওয়া হিসাবে বলা হয়েছে।

.

তৃতীয় কথাঃ বিবরণের মধ্যে দ্বার বা দরজার কথাও বলা আছে। বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকাটি সীমানা প্রাচীর দিয়ে ঘেরা ছিল এবং তাতে কিছু প্রবেশদ্বার ছিল।এখানে এই প্রবেশদ্বারের কথাই বলা হয়েছে।

.

নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারীরা এবার হয়তো বলতে পারেনঃ ঐ যুগে এলাকাটি সীমানা প্রাচীরে ঘেরা ছিল এবং তাতে প্রবেশদ্বার ছিল, তার প্রমাণ কী? মুহাম্মাদ ﷺ এর দাবির কোন সাক্ষী আছে? আর মুহাম্মাদ ﷺ যে ঐ প্রবেশদ্বার দিয়েই ঢুকেছেন তার প্রমাণ কী? কোন ঐতিহাসিক বিবরণ কি আছে?

. (চলবে ইন শা আল্লাহ... পরের পর্বে সমাপ্তি)

১০৩

নাস্তিকতার বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই ৫ – অবিশ্বাসের বিশ্বাস

-আসিফ আদনান

দুটো প্রশ্ন দিয়ে শুরু করা যাক।

.

১) আপনার মোবাইল অথবা ল্যাপটপ/পিসির যেই স্ক্রিনের দিকে তাকিয়ে আপনি এই মূহুর্তে এই বাক্যটা পড়ছেন তার আয়তন কত?

.

২) একটি মানুষের মূল্য কতোটুকু?

.

এই দুটো প্রশ্নের মধ্যে কোন মৌলিক পার্থক্য আছে বলে মনে করেন?
প্রথম প্রশ্নটার একটি সুনির্দিষ্ট উত্তর আছে। নির্দিষ্ট ও সুসংজ্ঞায়িত পদ্ধতি আছে যার মাধ্যমে এই প্রশ্নের উত্তর বের করা সম্ভব। আর কোন উত্তর পাওয়া গেলে সেই উত্তর সঠিক কি না, তা যাচাই করারও সুযোগ আছে।

.

এই একই কথাগুলো কি দ্বিতীয় প্রশ্নের ক্ষেত্রে খাটবে? আপনার মূল্য কতো? একজন কেমিস্ট হয়তো দেখবে আপনার দাতে কয়টা গোল্ড ফিলিং আছে, আর যদি থাকে তবে সম্ভবত সেটাই তার দৃষ্টিতে আপনার শরীরের সবচেয়ে দামি অংশ হবে। একজন সাইকোলজিস্ট হয়তো আপনার আইকিউ মাপার চেষ্টা করবেন। একজন সোশিওলজিস্ট হয়তো আপনার সামাজিক গুরুত্ব মাপার চেষ্টা করবেন। একজন রাজনৈতিক হিসেব অনুযায়ী নির্বাচনের বছর আপনার দাম বাড়বে, বাকি সময়টা শূন্যের কাছাকাছি থাকবে। ঢাকার রাস্তার ভাসমান পতিতারা হয়তো আপনাকে বেশি থেকে বেশি ঘন্টা ধরে রেইট বলতে পারবে।

.

সবাই নিজ নিজ অবস্থান থেকে, নিজ নিজ মাপকাঠি অনুযায়ী, নিজ নিজ মূল্যবোধের আলোকে বিভিন্ন উত্তর দেবে। এর মধ্যে কোন একটি উত্তর সঠিক কি না সেটা যাচাই করা আমাদের পক্ষে সম্ভব না। ইন ফ্যাক্ট, এই প্রশ্নের আদৌ কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর আছে কি না সেটাও আমরা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি না। একজনের মানুষের জীবনের মূল্য কি সবসময় ধ্রুব থাকে? সব মানুষের জীবনের মূল্য কি সমান? একজন ঘুষখোর সরকারী কর্মকর্তা আর একটি নিষ্পাপ শিশুর জীবনের মূল্য কি সমান? যদি সমান না হয় তাহলে কার জীবনের মূল্য বেশি? কিসের ভিত্তিতে তার নির্ধারন করা হবে?

.

এই প্রশ্নগুলো আর প্রথম প্রশ্নটি মৌলিকভাবে আলাদা। বিজ্ঞান একটির জবাব দিতে পারে। আরেকটির জবাব বিজ্ঞান দিতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ কি মানবজীবন মূল্যহীন? তার অর্থ কি আপনার অস্তিত্ব মূল্যহীন? তার অর্থ কি এই প্রশ্নগুলো অগুরুত্বপূর্ণ? বিজ্ঞান কোন প্রশ্নের উত্তর না দিতে পারার অর্থ, ঐ প্রশ্নের উত্তর নেই বা ঐ প্রশ্ন মুল্যহীন? নিঃসন্দেহে যেকোন সুবিবেচক মানুষ স্বীকার করবেন এই প্রশ্নগুলো এবং এদের উত্তর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যদিও বিজ্ঞানের পক্ষে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া সম্ভব না। আর যারা নিজেরা বিজ্ঞানী অথবা বিজ্ঞানকে পছন্দ করেন তাদেরও এখানে অখুশি হবার কোন কারন নেই। এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বিজ্ঞান দিতে পারে না। কারন এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া বিজ্ঞানের কাজ না। দর্শনের কাজ। এই প্রশ্নগুলো মেটাফিযিকাল, দার্শনিক।[1]

,

বিজ্ঞানের একটি সীমাবদ্ধ গন্ডী আছে। বিজ্ঞানের কাজ সেই গন্ডির ভেতরে। বৈজ্ঞানিক গ্রহনযোগ্যতা এই গন্ডির ভেতরের

প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কিন্তু যা কিছু এই গন্ডীর বাইরে সেসবের ব্যাপারে বিজ্ঞানের বক্তব্যকে বৈজ্ঞানিক, প্রমানিত সত্য হিসেবে গ্রহন করার কোন উপায় নেই। যেমন মানবজীবনের দামের ব্যাপারে কেমিস্ট, বায়োলজিস্ট, ফিযিসিস্ট কিংবা ফিজিশিয়ানের বক্তব্যকে যেমন প্রমানিত বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে গ্রহন করা সম্ভব না।

.

এবার আসুন অন্য কিছু প্রশ্নের দিকে তাকানো যাক।

.

- কেন কোন কিছু না থাকার বদলে কোন কিছু আছে?

.

- মানুষের আত্মা কোথা থেকে আসলো?

- বুদ্ধিমত্তা ও সচেতনতা[2] (Consciousness) কিভাবে সৃষ্টি হলো?

- মহবিশ্বের শুরু কেন হল?

.

.

এই প্রশ্নগুলোর বেশ কিছু উত্তর প্রচলিত আছে। আস্তিক ও নাস্তিকরা নিজ নিজ আদর্শিক থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়ার চেস্টা করে। নাস্তিক তবে আপনি যে উত্তরই গ্রহন করেন না কেন এর কোনটাকেই বৈজ্ঞানিক ভাবে সঠিক প্রমানিত করা সম্ভব না। আপনি আস্তিক হন কিংবা নাস্তিক। সেটা পাথরের সুপ থেকে সচেতনতা, বুদ্ধিমত্তা আর আত্মা সৃষ্টি হবার কথা বলুন, স্ট্যান্ডার্ড বিগ ব্যাং মডেলের কথা বলুন, কিংবা একজন সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কথা বলুন। কোনটাই বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত, সংশয়ের উর্ধে থাকা সত্য না।

সুতরাং দিনশেষে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর বিজ্ঞানের মাধ্যমে দেওয়া সম্ভব না। আস্তিক ও নাস্তিকরা নিজ নিজ বিশ্বাসের জায়গা থেকে এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়। কারো অবস্থানই বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমান্য বা অপ্রমান্য না। তাহলে কেন এই প্রশ্নগুলোর সম্ভাব্য উত্তরের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু উত্তরকে, অর্থাৎ নাস্তিকদের ব্যাখ্যা ও দৃষ্টিভঙ্গিকে সায়েন্টিফিক বা বৈজ্ঞানিক সত্য বলে ধরে নেওয়া হবে, প্রচার করা হবে – আর বাকিগুলোকে অবৈজ্ঞানিক বলে উডিয়ে দেওয়া হবে? অথচ এই প্রশ্নগুলোই বিজ্ঞানের গন্ডীর বাইরে এবং বিজ্ঞান এ প্রশ্নগুলোর উত্তর দিতে অক্ষম? এই প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে আস্তিক ও নাস্তিক দুই দলের অবস্থানই বিশ্বাসের উপর। আস্তিকদের বিশ্বাসের মতো নাস্তিকদের অবিশ্বাসও বিশ্বাসপ্রসূত। কিন্তু নাস্তিকরা তাদের ফেইথ-বেইসড এই উত্তরগুলোকে বিজ্ঞানের পোশাক পড়িয়ে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে প্রচার করতে চায়।

নাস্তিকরা মনে করে তাদের এমন কোন বিশেষ মর্যাদা আছে যে কারনে তারা তাদের বিশ্বাসকে মানুষের সামনে প্রমাণিত বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে উপস্থাপন করবে, আর তাদের এই বিশ্বাসকে বাকিদের সত্য হিসেবে গ্রহন করতে হবে। আস্তিক ও নাস্তিক উভয়েই যদি বিশ্বাসের জায়গা থেকে এঈ প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয় তাহলে কেন নাস্তিকদের বিশ্বাসকে সত্য বলে ধরে নিতে হবে আর আস্তিকদের বিশ্বাসকে মিথ্যা? নাস্তিকরা কেন মনে করে তারা প্রেফারেনশিয়াল ট্রিটমেন্ট পাবার যোগ্য?

"কেউ কি স্রষ্টার অনস্তিত্ব প্রমান করতে সক্ষম হয়েছে? কোয়ান্টাম কসমোলজি কি মহাবিশ্বের উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে পেরেছে? কেন-ই বা এর উদ্ভব সেই প্রশ্নের জবাব দিতে পেরেছে? মহাবিশ্বের মধ্যে বেশ কিছু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে মহাবিশ্ব এমন ভাবে তৈরি (fine tuned) যাতে করে এতে প্রাণের অস্তিত্ব সম্ভব হয় – এর কারন কি কেউ ব্যাখ্যা করতে পেরেছে? ফিযিসিস্ট আর বায়োলজিস্টরা যেকোন কিছু বিশ্বাস করতে রাজি শুধু ধর্ম ছাড়া? র‍্যাশনালিযম আর বিজ্ঞান কি পেরেছে ভালো-মন্দ, নৈতিক-অনৈতিকের সংজ্ঞা নির্ধারন করতে? রক্তাক্ত গত শতাব্দীতে সেক্যুলারিযমকে ভালোর পক্ষের শক্তি হিসেবে কাজ করেছে? বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানের দর্শনে এমন কিছু কি আছে যা তাদের এই দাবিকে যৌক্তিক প্রমান করতে পারে যে ধর্মীয় বিশ্বাস মাত্রই অযৌক্তিক (irrational)?"[3]

.

যদি আমরা ধরেও নেই যে অধিকাংশ বিজ্ঞানী নাস্তিকদের বিশ্বাসকে সমর্থন করেন সেক্ষেত্রেও প্রশ্ন হল এক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের সমর্থন কি আলাদা কোন গুরুত্ব পাবার দাবি রাখে? একজন পদার্থবিদের মানবতাবোধকে কি আমরা একজন রিকশাওয়ালার মানবতা বোধের চাইতে বেশি গুরুত্ব দিতে বাধ্য? একজন বিজ্ঞানি যে বিষয়ে তার স্পেশালাইযেশান তা নিয়ে যা বলবেন তা আমরা স্পেশালিস্ট অপিনিয়ন হিসেবে গ্রহন করতে পারি, কিন্তু শুধুমাত্র বিজ্ঞানী হবার কারনে সব বিষয়ে কি তাদের বক্তব্যকে প্রাধান্য দেওয়া হবে?[4] যদি বিজ্ঞানী হবার কারনে সব ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা প্রেফারেনশিয়াল ট্রিটমেন্ট চায়, যদি তারা চায় "বিজ্ঞানীরা বলেছে" – এটাই সবার জন্য প্রমান হিসেবে যথেষ্ট হয়ে যাক, তাহলে রাজনীতিবিদ, একনায়ক আর কাল্ট লিডারদের দোষ কি? এ কেমন বিজ্ঞানমনস্কতা?

.

বর্তমান সময়ে নাস্তিকরা যেসব বৈজ্ঞানিক "সত্য" –কে ব্যবহার করে আস্তিকদের সাব-হিউম্যান জাতীয় কিছু একটা প্রমান করতে চায়, সেগুলোর অধিকাংশ অপ্রমাণিত থিওরি ছাড়া আর কিছুই না। এবং বিজ্ঞানীরা যখন এসব থিওরি বা মডেল তৈরি করেন তখন তারা সম্পূর্ণ ভাবে নিরপেক্ষ ও আনবায়াসড ভাবে করেন না। এমনকি গবেষণার মাধ্যমে প্রাপ্ত ডেইটাকে ব্যাখ্যা করার কাজটাও বিজ্ঞানীরা সম্পূর্ণ আনবায়াসড ভাবে করেন না। অবশ্য অধিকাংশ বিজ্ঞানী এটা স্বীকার করেন না, আর স্বাভাবিক ভাবেই নাস্তিকরা এটা চেপে যায়। হাজার হোক নিজেদের বিশ্বাস আর সে বিশ্বাসের দেবতাদের ব্যাপার। তবুও কালেভদ্রে বিজ্ঞানীদের মধ্যে কেউ কেউ এবং অতি দুর্লভ ক্ষেত্রে নাস্তিকদের মধ্যে কেউ কেউ এ সত্যটা স্বীকার করেন।.

যেমন জর্জ এলিস ও স্টিফেন হকিং – এর The Large Scale Structure of Space-Time, এ সত্যটা স্বীকার করে বলেছেন –

.

"We [scientists] are not able to make cosmological models without some admixture of ideology."[5]

.

আমরা (বিজ্ঞানীরা) যেসব মহাজাগতিক মডেলগুলো তৈরি করি সেগুলো (আমাদের) আদর্শের মিশ্রন থেকে মুক্ত না।

.

নাস্তিক বিজ্ঞানী পপুলেশান জেনেটিক্স এর পুরোধা, এভোলিউশানারি বায়োলজিস্ট রিচার্ড সি লিউইনটন এর স্বীকারোক্তি আরো আন্তরিক। কার্ল স্যাগানের The Demon-Haunted World – এর রিভিউতে তিনি স্বীকার করেছেন -

.

"বিজ্ঞান ও অতিপ্রাকৃতের মাঝে আসল দ্বন্দ্বকে বোঝার চাবি হল সাধারন বিবেচনাবোধের সাথে সাজ্ঘর্ষিক বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা মেনে নিতে আমাদের (বিজ্ঞানীদের) স্বদিচ্ছার দিকে তাকানো। জীবন ও স্বাস্থ্যের উন্নয়নেরব্যাপারে নানা উচ্চাবিলাসী প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ব্যার্থ হবার পরও, বিজ্ঞানী সম্প্রদায়ের মধ্যে (বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ব্যাখ্যায়) নানা অপ্রমাণিত শিশুতোষ গল্প প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও, স্পষ্টতই অসম্ভাব্য কিম্ভূতকিমাকার নানা ব্যাখ্যা আমরা মেনে নেই – কেবলমাত্র বিজ্ঞানের পক্ষ নেয়ার জন্য। কারন আমরা আগে থেকেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আমরা বস্তুবাদের কাছে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ব্যাপারটা এমন না যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বা বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে এমন কিছু আছে যা আমাদের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা মেনে নিতে বাধ্য করে। বরং বস্তুবাদ ও বস্তুবাদী ব্যাখ্যার প্রতি আমাদের আনুগত্যের কারনে আমরা বাধ্য হই অনুসন্ধানের এমন একটি কাঠামো এবং এমন কিছু ধারনাকে তৈরি করতে যা শেষপর্যন্ত একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা বা ফলাফল দেবে। সেই ব্যাখ্যা যতোই কাউন্টার-ইন্টুয়িটিভ হোক না কেন, অদীক্ষিতের কাছে যটোই দুর্বোধ্য লাগুক না কেন। আর আমাদের এই বস্তুবাদ আমরা পূর্ণ ও শর্তহীন ভাবে ধারন ও প্রয়োগ করি। কারন কোন ঐশ্বরিক ব্যাখ্যাকে অনুমোদন দেওয়া সম্ভব না।"[6]

.

অর্থাৎ আস্তিকদের মতোই নাস্তিকরা একটি বিশ্বাসের জায়গা থেকে তর্ক করে, যদিও তারা তাদের অবিশ্বাসের বিশ্বাসকে “বিজ্ঞান” হিসেবে প্রমান করতে চায়। এটা সাধারন নাস্তিকদের ক্ষেত্রে সত্য, নাস্তিক বিজ্ঞানীদের ক্ষেত্রেও সত্য। অধিকাংশ নাস্তিকরা হয় এটা বোঝে না বা স্বীকার করার সৎ সাহস রাখে না। তবে নাস্তিকদের মধ্যে যারা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে সৎ তারা এই সত্যকে স্বীকার করে। নাস্তিকরা নিজেদের এই অযৌক্তিক বিশ্বাসকে বিজ্ঞানসম্মত প্রমান করার জন্য বিভিন্ন অদ্ভূত ব্যাখ্যার অবতারনা করে, যা বিজ্ঞানসম্মত তো না- ই বরং সাধারন বুদ্ধিবিবেচনার সাথেও সাংঘর্ষিক। লিউইনটনের ভাষায় “just-so-stories”.

.

তাই আমরা দেখি নাস্তিকদের রূপকথার জগতে সময়কে কাল্পনিক সংখ্যা (যেমন -১ এর স্কয়াররুট) দিয়ে প্রকাশ করা হয়[7], কোন কিছু না (nothing) কোন কিছুতে (something) এ পরিণত হয়[8], পাথরের সূপপ থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে বুদ্ধিমত্তা, সচেতনতা (consciousness) আর আত্মার (soul) উদ্ভব হয়[9], যা সংজ্ঞাগতভাবে অপ্রামান্য ও পর্যবেক্ষন করা সম্ভব না সেই মাল্টিভার্সের রূপকথায় বিশ্বাস করা যৌক্তিক মনে করা হয় এমনকি বিজ্ঞাসম্মতও।

.

আর এরা মনে করে তাদের এসব হাস্যকর বিশ্বাস সারা পৃথিবী মেনে নিতে বাধ্য। আর এসব বিশ্বাস ধারন করার কারনে নাস্তিককে বুদ্ধিমত্তার এক উচ্চতর পর্যায়ে বিরাজমান সত্ত্বা হিসেবে মেনে নিতে হবে?

.

কিন্তু কেন?

.

কেন তাদের এই ধর্মবিশ্বাসকে অন্য ১০টা ধর্মের চাইতে অটোম্যাটিকালি বেশি সম্মান করতে আমরা বাধ্য? কেন তারা স্পেশাল?

.

নাস্তিকরা অতিপ্রাকৃত শক্তি আর সত্ত্বায় বিশ্বাস নিয়ে ঠাট্টা করার চেষ্টা করে, কিন্তু ডার্ক এনার্জি আর ডার্ক ম্যাটার কি? এই অতিপ্রাকৃত, অপ্রমাণিত, কল্পনাপ্রসূত সত্ত্বাগুলোতে বিশ্বাস করে না?

.

তারা অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ইত্যাদি নিয়ে অনেক কিছু বলার চেষ্টা করে, কিন্তু কোপার্নিকান আর কস্মোলজিকাল প্রিসিনিপালের ব্যাপারে কেন তারা চুপ? এগুলো কি প্রমাণিত সত্য? নাকি অপ্রমাণিত বিশ্বাস? কুসংস্কার? বিপরীত প্রমান পাবার পরও তারা যেগুলোকে অন্ধ বিশ্বাসে আকড়ে আছে?

.

নাস্তিকরা শত শত, হাজার হাজার গালগল্পে বিশ্বাস করে, এগুলো তাদের কাছে যৌক্তিক, বিশ্বাসযোগ্য। কিন্তু মহাবিশ্বের একজন অতুলনীয় সৃষ্টিকর্তা আছেন, এই মহাবিশ্বে মানবজাতির অস্তিত্ব অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন, মানব জীবনের একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য আছে এবং একটি বিচারের দিন আসছে - মানুষের প্রকৃতিগত (ফিতরাহ/Natural Disposition) এই বিশ্বাসগুলো তাদের কাছে যৌক্তিক না। না, এগুলো মানা যাবে না। দেবতারা রাগ করবেন। অবিশ্বাসের বিশ্বাস ভঙ্গ হয়ে যাবে। ধর্মদ্রোহী হয়ে যাবার চ্যান্স আছে।

.

বস্তুত বিজ্ঞানমনস্কতার পোশাকের আড়ালে নাস্তিকরা একটি আবেগপ্রসূত এবং অপ্রমাণিত বিশ্বাসের উপর গড়ে ওঠা আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি ধারন করে। তারা অন্ধ বিশ্বাসী এবং সবচেয়ে নিম্ন পর্যায়ের, সবচেয়ে জঘন্য ধরনের অন্ধ বিশ্বাসী। আর তাদের অবিশ্বাসের বিশ্বাস একটি মিথ্যা, বাতিল ধর্ম ছাড়া আর কিছুই না। এছাড়া আর যা কিছু আছে তা হল উইন্ডো ড্রেসিং, প্রিটেনশান আর বুদ্ধিবৃত্তিক হাতসাফাই।

তারা ধারণা-অনুমান ছাড়া অন্য কিছুরই অনুসরণ করে না, আর তারা শুধু মিথ্যাই বলে। [সূরা ইউনুস, ১০]

রেফারেন্সঃ

[1] এখানে দর্শন ও মেটাফিযিক্স বলতে গ্রীক দর্শন বা এর সাথে সম্পর্কিত ধারনাগুলোকে বোঝানো হচ্ছে না। মানুষের অস্তিত্বের সাথে জোড়িত প্রশ্নগুলোর (Existential Questions) উত্তর খোঁজার জন্য মানবমনের যে সাধারন চিন্তার (দার্শনিক) প্রবনতা সেটাকে বোঝানো হচ্ছে।

[2] বাংলাতে Consciousness এর কোন যুতসই প্রতিশব্দ না থাকায় "সচেতনতা" ব্যবহার করা হল। যদিও Consciousness দিয়ে যা বোঝানো হয় তা সম্পূর্ণভাবে "সচেতনতার" মধ্যে ধরা পড়ে না।

[3] David Berlinski, The Devil's Delusion: Atheism and Its Scientific Pretensions

[4] argumentum ad verecundiam – Argument from Authority. Logical Fallacy
'One of the great commandments of science is, "Mistrust arguments from authority." ... Too many such arguments have proved too painfully wrong. Authorities must prove their contentions like everybody else.' [Carl Sagan, The Demon-Haunted World: Science as a Candle in the Dark]

[5] The Large Scale Structure of Space-Time ,(p. 34).

[6] "Our willingness to accept scientific claims that are against common sense is the key to an understanding of the real struggle between science and the supernatural. We take the side of science in spite of patent absurdity of some of its constructs, in spite of its failure to fulfill many of its extravagant promises of health and life, in spite of the tolerance of the scientific community for unsubstantiated just-so-stories, because we have a prior commitment, a commitment to materialism. It is not that the methods and institutions of science somehow compel us to accept any material explanation of the phenomenal world, but, on the contrary, that we are forced by our a priori adherence to material causes to create an apparatus of investigation and a set of concepts that produce material explanations, no matter how counter-intuitive, no matter how mystifying to the uninitiated. Morever, that materialism is absolute, for we cannot allow a Divine Foot in the door."
[Billions and Billions of Demons, New York Review of Books, 1st September 1997]

[7] Hartle–Hawking মডেল

[8] লরেন্স ক্রাউস, A universe from Nothing

[9] ডারউইনিযম

১০৪

প্রসঙ্গ নবী (ﷺ) এর ইসরা ও মিরাজঃ ইসরার ঘটনার সত্যতা কতটুকু? মসজিদুল আকসা কি আসলেই সে সময়ে ছিল? [বাকি অংশ]

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

(লেখাটির পূর্বের অংশ দেখুন (#সত্যকথন) ১০২ এ। লিঙ্কঃ https://goo.gl/FCR4zq)

.

মুহাম্মাদ(স) যখন ইসরা ও মিরাজে গিয়েছেন, তখন সেখানে কেউ না থাকলেও এর কয়েক বছর পর খলিফা উমার(রা) যখন জেরুজালেমে যান, তখন কিন্তু সেখানে অনেক লোক ছিল। খলিফা উমার(রা) কর্তৃক বাইতুল মুকাদ্দাসে ঢোকার বিবরণের মধ্যেও এটা উল্লেখ আছে যে – তিনি একটি দরজা দিয়ে সেখানে প্রবেশ করেছিলেন। এবং এটা ছিল সেই দ্বার যে দ্বার দিয়ে মুহাম্মাদ ﷺ ইসরার রাতে সেখানে প্রবেশ করেছিলেন। পরবর্তীতে তিনি সেখানে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। উমার(রা) এর বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময় সেখানে অনেক মানুষ ছিল, অনেক সাক্ষী ছিল। কাজেই সেখানে যে দ্বার বা দরজা ছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। এই ঐতিহাসিক ঘটনা অনেকেই লিপিবদ্ধ করেছেন। ইবন কাসির (র) এর বর্ণণা থেকেঃ

.

"...খলিফা উমার (রা) সম্মুখে অগ্রসর হয়ে বায়তুল মুকাদ্দাসের খ্রিষ্টানদের সাথে সন্ধিচুক্তি সম্পাদন করলেন এবং শর্ত করলেন যে, তিন দিনের মধ্যে সকল রোমান নাগরিক বায়তুল মুকাদ্দাস ছেড়ে চলে যাবে। এরপর তিনি বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশ করলেন। প্রবেশ করলেন সেই দরজা দিয়ে, মি'রাজের রাতে রাসুলুল্লাহ ﷺ যে দরজা দিয়ে প্রবেশ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে, বায়তুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের সময়ে তিনি তালবিয়া পাঠ করেছিলেন,ভেতরে গিয়ে দাউদ (আ)-এর মিহরাবের পার্শ্বে তাহিয়্যাতুল মসজিদ নামায আদায় করলেন।পরের দিন ফজরের নামায মুসলমানদেরকে সাথে নিয়ে জামাআতের সাথে আদায় করলেন। ...এরপর তিনি 'সাখরা' বা বিশেষ পাথরের নিকট এলেন।কা'ব আল আহবার (র) থেকে তিনি ঐ স্থান সম্পর্কে জেনে নিয়েছিলেন। কা'ব (র) এই ইঙ্গিতও দিয়েছিলেন যেন তিনি মসজিদটি ওই পাথরের পেছনে তৈরি করেন। হযরত উমার(রা) বললেন, ইয়াহূদী ধর্ম তো শেষ হয়ে গিয়েছে। তারপর বায়তুল মুকাদ্দাসের সম্মুখে মসজিদ নির্মাণ করলেন।এখন সেটি উমরী মসজিদ নামে পরিচিত। ... "

[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবন কাসির(র), ৭ম খণ্ড(ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পৃষ্ঠা ১০৭-১০৮]

.

ইমাম আহমাদ(র) আরো বর্ণণা করেন যে উমার(রা) বাইতুল মুকাদ্দাসে প্রবেশের পর ঠিক সেখানেই নামায পড়েন, যেখানে রাসুলুল্লাহ(ﷺ) নামায পড়েছিলেন।

[আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ইবন কাসির(র), ৭ম খণ্ড(ইসলামিক ফাউন্ডেশন), পৃষ্ঠা ১১২]

.

উমার (রা) দ্বার দিয়ে প্রবেশ করেন, নামায আদায় করেন, এবং পরে মসজিদ প্রতিষ্ঠা করেন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে— মসজিদ তৈরির আগেই সেখানে দ্বার ছিল। বিবরণ থেকে এটাও বোঝা যাচ্ছে যে, এই দ্বার হচ্ছে বাইতুল মুকাদ্দাস এলাকার প্রবেশদ্বার। বাইতুল মুকাদ্দাসের একটি মানচিত্রের ছবি দেখলে বিষয়টি আরো পরিষ্কার বোঝা যাবে। উমার(রা) এর প্রবেশদ্বার অন্য স্থানগুলো এতে চিহ্নিত করে দেখানো আছে।

[মানচিত্র ও এর বিবরণ ১ম, ২য় ও ৩য় কমেন্টে উল্লেখ করা হল।]

.

আসলে ঐ এলাকাটি সম্পর্কে স্থানীয়দের পরিষ্কার ধারনা রয়েছে। এই দ্বার ও মসজিদের খুঁটিনাটি তাদের জানা।এমনকি এখানে "বুরাক দ্বার" নামে একটি প্রবেশদ্বারও আছে[চিত্রে ৮ নং দ্বার] । এটি Western wall ও Wailing Wall নামেই পর্যটকদের কাছে বেশি পরিচিত।দ্বারটি বর্তমানে বন্ধ এবং স্থানীয়রা একে বুরাক দেয়াল নামে চেনেন। এই দ্বার ও এলাকাটির ভৌগলিক অবস্থান সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে, তারা মোটেও নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারীদের প্রচারণায় বিভ্রান্ত হন না। এ ব্যাপারে ঐ সব সরলমনা মুসলিম বিভ্রান্ত হন যারা ফিলিস্তিন থেকে অনেক দূরে বাস করেন, যাদের এলাকাটি সম্পর্কে ধারনা নেই এবং ইসরার ইতিহাস সম্পর্কেও বিস্তারিত জ্ঞান নেই।

.

আমরা আরো একটি বিবরণ দেখতে পারিঃ

.

"...এরপর তিনি [আবু বকর (রা)] সেখান থেকে সোজা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট চলে আসলেন এবং বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! আপনি কি এদের কাছে বলেছেন যে এই রাতে আপনি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন?

তিনি ﷺ বললেনঃ হ্যাঁ।

আবু বকর (রা) বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! সে মসজিদটির বর্ণণা দিন তো; আমি সেখানে গিয়েছিলাম।

তখন নবী ﷺ বললেনঃ তখন বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে তুলে ধরা হল। আমি তার দিকে তাঁকিয়ে দেখতে লাগলাম।

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রা) এর কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্ণণা দিতে লাগলেন। আর আবু বকর (রা) প্রতিবারই বলতে লাগলেনঃ আপনি সত্যই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসুল। ..."

[সীরাতুন নবী(সা.), ইবন হিশাম(র), ২য় খণ্ড(ইসলামিক ফাউন্ডেশন) পৃষ্ঠা ৭৪]

.

এখানে দেখা যাচ্ছে যে আবু বকর (রা) পুর্বে বাইতুল মুকাদ্দাসে গিয়েছিলেন এবং সেখানকার বর্ণণা তাঁর জানা ছিল। রাসুল ﷺ যে বর্ণণা দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে আবু বকর(রা) এর দেখা বাইতুল মুকাদ্দাস হুবহু মিলে গিয়েছিল।যদি বর্ণণা না মিলত, তাহলে তো আবু বকর (রা) বুঝতেন যে মুহাম্মাদ ﷺ সত্য বলেননি। অথচ আদৌ এমন কিছু হয়নি, মুহাম্মাদ ﷺ এর সত্যবাদিতাই আবু বকর(রা) এর কাছে প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল।

.

যেসমস্ত নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারী ইসরা ও মিরাজের ব্যাপারে মুহাম্মাদ(ﷺ)কে অপবাদ দেন, তাদের কি উচিত না এই বিবরণটি দেখা?

.

আরো একটি বিবরণ উল্লেখ করছিঃ

.

"...আমি (উম্মু হানি) বললামঃ হে আল্লাহর নবী! আপনি এ (ইসরা ও মিরাজ এর) কথা লোকদের কাছে প্রকাশ করবেন না। অন্যথায় তারা আপনাকে মিথ্যাবাদী বলবে ও আপনাকে কষ্ট দেবে।

.

কিন্তু তিনি বললেনঃ আল্লাহর কসম! আমি অবশ্যই তাদের কাছে এ ঘটনা ব্যক্ত করব।

তখন আমি আমার এক হাবশী দাসীকে বললামঃ বসে আছো কেন, জলদি রাসুলুল্লাহ ﷺ এর সঙ্গে যাও, তিনি লোকদের কী বলেন তা শোন, আর দেখ তারা কী মন্তব্য করে।

.

রাসুলুল্লাহ ﷺ বের হয়ে গিয়ে লোকদের এ ঘটনা জানালেন।তারা বিস্মিত হয়ে বললঃ হে মুহাম্মাদ! এ যে সত্য তার প্রমাণ? এমন ঘটনা তো আমরা কোনদিন শুনিনি।

তিনি বললেনঃ প্রমাণ এই যে, আমি অমুক উপত্যকায় অমুক গোত্রের একটি কাফেলার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম।সহসা আমার বাহন জন্তুটির গর্জনে তারা ত্রস্ত হয়ে পড়ে।ফলে তাদের একটি উট হারিয়ে যায়।আমি তাদের উটটির সন্ধান দেই।
আমি তখন শামের দিকে যাচ্ছিলাম।এরপর সেখান থেকে ফিরে আসার পথে যখন দাজনান পর্বতের কাছে পৌঁছি, তখন সেখানেও একটি কাফেলা দেখতে পাই, তারা সকলে নিদ্রিত ছিল।তাদের কাছে একটি পানিভরা পাত্র ছিল।যা কোন কিছু দিয়ে ঢাকা ছিল।আমি সে ঢাকনা সরিয়ে তা থেকে পানি পান করি।এরপর তা আগের মত করে ঢেকে রেখে দেই।

আর এর প্রমাণ এই যে — সে কাফেলাটি এখন বায়যা গিরিপথ থেকে সানিয়াতুত তানঈমে নেমে আসছে।তাদের সামনে একটি ধুসর বর্ণের উট আছে।যার দেহে একটি কালো ও আরেকটি বিচিত্র বর্ণের ছাপ আছে।

.

উম্মু হানী (রা) বলেনঃ এ কথা শোনামাত্র উপস্থিত লোকেরা সানিয়ার দিকে ছুটে গেল।তারা ঠিকই সম্মুখভাগের উটটিকে রাসুলুল্লাহ ﷺ এর বর্ণণামত পেল। তারা কাফেলার কাছে তাদের পানির পাত্র সম্পর্কে জিজ্ঞেস করল। তারা বলল, আমরা পানির একটি ভরা পাত্রে ঢাকনা দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ি। জাগ্রত হওয়ার পর পাত্রটিকে যেমন রেখেছিলাম তেমনি ঢাকা পাই, কিন্তু ভিতর পানিশূন্য ছিল।
তারা অপর কাফেলাকেও জিজ্ঞেস করল। সে কাফেলাটি তখন মক্কাতেই ছিল।তারা বললঃ আল্লাহর কসম! তিনি সত্যই বলেছেন। তিনি যে উপত্যকার কথা বলেছেন, সেখানে ঠিকই আমরা ভয় পেয়েছিলাম। তখন আমাদের একটি উট হারিয়ে যায়।আমরা অদৃশ্য এক ব্যক্তির আওয়াজ শুনতে পাই, যে আমাদের উটটির সন্ধান দিচ্ছিল। সেমতে আমরা উটটি ধরে ফেলি। ”

[সীরাতুন নবী ﷺ, ইবন হিশাম(র), ২য় খণ্ড(ইসলামিক ফাউন্ডেশন) পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭]

.

এই ঘটনায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, ইসরা ও মিরাজের ব্যাপারে সে যুগেও লোকজন সন্দেহ পোষণ করেছিল। আর মুহাম্মাদ ﷺ সন্দেহবাদীদেরকে যথাযথ প্রমাণ দেখান। সুস্পষ্টভাবে তাদের সামনে মুহাম্মাদ ﷺ এর কথার সত্যতা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল।

যেসমস্ত নাস্তিক ও খ্রিষ্টান মিশনারীরা মুহাম্মাদ ﷺ এর ইসরা ও মিরাজ মিথ্যা প্রমাণের জন্য কলম ধরেন, তারা কেন এই বর্ণণাটি উল্লেখ করেন না? সংশয়বাদীদের কি উচিত না, এই বর্ণণাটি ভালো মত লক্ষ্য করা, যাতে মুহাম্মাদ ﷺ সেই যুগের সংশয়বাদীদেরকে সুস্পষ্টভাবে তাঁর কথার স্বপক্ষে প্রমাণ দেখিয়েছিলেন?

.

সব শেষে বলব যে - ইসরা ও মিরাজ নবী মুহাম্মাদ ﷺ এর জন্য বিরাট এক মর্যাদা ও সাধারণ মানুষের জন্য পরীক্ষা। যুক্তি ও বিবেকের কষ্টিপাথরে কেউ যদি যাচাই করে, তাহলে সে এটা নিশ্চিত বুঝতে পারবে যে সারাজীবনের আল আমিন(বিশ্বস্ত) মুহাম্মাদ ﷺ ইসরা ও মিরাজের ব্যাপারেও সত্য কথা থেকে এক চুল বিচ্যুত হননি। এবং তাহলেই এ পরীক্ষায় সফল হওয়া সম্ভব হবে।

{ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلاَّ فِتْنَةً لِلنَّاسِ }

“আর আমি যে দৃশ্য আপনাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষের পরীক্ষার জন্য”
[সূরা বনী ইস্রাঈল(ইসরা) ১৭ : ৬০]

.

[লেখাটির প্রথম অংশ পড়তে ক্লিক করুন এখানে https://goo.gl/FCR4zq]

১০৫
নবী (ﷺ) -এর ইসরা ও মিরাজের সত্যতা
-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

২৭শে রজব লাইলাতুল মিরাজ এটি প্রমাণিত নয়। ইসরা ও মিরাজ সত্য কিন্তু এর তারিখ জানা যায় না।এবং এই রাতকে কেন্দ্র করে ইবাদত বন্দেগির উদ্ভব ঘটানো বিদআত। এ বিষয়ে বিস্তারিত জানতে খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর(র) এর এই বইটির ২২৮ পৃষ্ঠা থেকে দেখতে পারেনঃ https://goo.gl/qLxAvz

.

তবে আমি যে বিষয়টি নিয়ে লিখতে চাচ্ছি তা হচ্ছে--মিরাজের সত্যতা নিয়ে ইসলামবিরোধিদের আপত্তি।ইসলাম বিরোধীদের মুহাম্মদ(ﷺ)কে আক্রমণের অন্যতম লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে ইসরা ও মিরাজ।মুহাম্মদ(ﷺ) এর মিরাজকে নিয়ে প্রচুর পরিমাণে কটু কথা বলে খ্রিষ্টান মিশনারী আর তাদের মিডিয়া ইভানজেলিস্টরা। অথচ খোদ তাদের কিতাব থেকে কিন্তু ইসরা ও মিরাজের সত্যতা প্রমাণিত হয়!! চলুন দেখি তাদের কিতাবে কী লেখা আছে---

.

✡✡ ✝ " এদিকে যাকোব{ইয়া'কুব(আ)} বের-শেবা ছেড়ে হারণ শহরের দিকে যাত্রা করলেন।পথে এক জায়গায় বেলা ডুবে গেলে তিনি সেখানেই রাতটা কাটালেন। সেখানে কতগুলো পাথর পড়ে ছিল। যাকোব সেগুলোর একটা মাথার নিচে দিয়ে শুয়ে পড়লেন।

.

তিনি স্বপ্নে দেখলেন মাটির উপরে একটা সিঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে এবং তার মাথাটা গিয়ে স্বর্গে ঠেকেছে। তিনি দেখলেন ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা(ফেরেশতা) তার উপর দিয়ে ওঠা-নামা করছেন, আর সদাপ্রভু ঈশ্বর তার উপরে দাঁড়িয়ে বলছেন, "আমি সদাপ্রভু। আমি তোমার পূর্বপুরুষ আব্রাহামের{ইব্রাহিম(আ)} ঈশ্বর এবং ইসহাকেরও ঈশ্বর। তুমি যেখানে শুয়ে আছ সেই দেশ আমি তোমাকে এবং তোমার বংশের লোকদের দেব।তোমার বংশের লোকেরা দুনিয়ার ধূলিকণার মত অসংখ্য হবে। পূর্ব-পশ্চিমে এবং উত্তর-দক্ষিণে তোমার বংশ ছড়িয়ে পড়বে। দুনিয়ার সমস্ত জাতি তোমার ও তোমার বংশের মধ্য দিয়ে আশির্বাদ পাবে। আমি তোমার সংগে সংগে আছি; তুমি যেখানেই যাও না কেন আমি তোমাকে রক্ষা করব। এই দেশেই আবার আমি তোমাকে ফিরিয়ে আনব। আমি তোমাকে যা বলেছি তা পূর্ণ না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছেড়ে যাব না।"

.

পরে যাকোব{ইয়া'কুব(আ)} ঘুম থেকে উঠে বললেন, "তাহলে সদাপ্রভু নিশ্চয়ই এই জায়গায় আছেন অথচ আমি তা বুঝতে পারি নি।"এই কথা ভেবে তাঁর মনে ভয় হল। তিনি বললেন, "কি অসাধারণ এই জায়গা! এটা ঈশ্বরের ঘর ছাড়া আর কিছু নয়; স্বর্গের দরজা এখানেই।"
যাকোব খুব ভোরে উঠলেন এবং যে পাথরটা তিনি মাথার নীচে দিয়েছিলেন সেটা থামের মত করে দাঁড় করিয়ে তার উপরে তেল ঢেলে দিলেন। তিনি জায়গাটার নাম দিলেন বেথেল (বাইত+এল যার মানে "আল্লাহর ঘর")। এই জায়গাটার কাছের শহরটার আগের নাম ছিল লূস।"
[ইহুদি তানাখ/খ্রিষ্টান বাইবেল, পয়দায়েশ(আদিপুস্তক/Genesis) ২৮:১০-১৯]

.

মিরাজ সম্পর্কিত হাদিস---

.

✔✓ "মিরাজ সম্পর্কে আবু সাঈদ খুদরি(রা)-এর বর্ণনায় মুহাম্মাদ ইবন ইসহাক বলেন, আমি রাসূল(ﷺ) -কে বলতে শুনেছি যে,

বায়তুল মুকাদ্দাসের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর আমার সামনে মি'রাজ(একটি সিঁড়ি) উপস্থিত করা হল। আমার সঙ্গী জিবরাইল তার ওপর আমাকে আরোহণ করতে বলেন। সেটি আমাকে নিয়ে আকাশের একটি দরজায় উপস্থিত হল, যার নাম বাবুল হাফাযা অর্থাৎ প্রহরীদের ফটক। ইসমাইল নামক এক ফেরেশতা তার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। আবু সাঈদ খুদরি(রা) বলেন, রাসূল(ﷺ) ইরশাদ করেন, আমাকে যখন প্রথম আকাশের দরজার মুখে হাজির করা হল তখন প্রশ্ন করা হল, ইনি কে হে জিবরাইল! তিনি বললেন, মুহাম্মদ(ﷺ) । আবার প্রশ্ন করা হল, তাঁকে কি ডেকে পাঠানো হয়েছে? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তখন সেই ফেরেশতা আমার কল্যাণের জন্য দোয়া করলেন। সেখানে মানব জাতির পিতা আদম (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল।...
[বিস্তারিতঃ তাফসির ইবন কাসিরের সুরা বনী ইস্রাঈলের ১নং আয়াতের তাফসির]

.

---->>> বাইবেলের বিবরণ ও ইসরা-মিরাজ সম্পর্কিত হাদিসটিতে একটা কমন জিনিস দেখা যাচ্ছে। আর সেটা হলঃ একটি আসমানী সিঁড়ি।

.

//তিনি স্বপ্নে দেখলেন মাটির উপরে একটা সিঁড়ি দাঁড়িয়ে আছে এবং তার মাথাটা গিয়ে স্বর্গে ঠেকেছে। তিনি দেখলেন ঈশ্বরের স্বর্গদূতেরা(ফেরেশতা) তার উপর দিয়ে ওঠা-নামা করছেন, ...//

.

//বায়তুল মুকাদ্দাসের আনুষ্ঠানিকতা শেষ হওয়ার পর আমার সামনে একটি সিঁড়ি উপস্থিত করা হল। আমার সঙ্গী জিবরাইল তার ওপর আমাকে আরোহণ করতে বলেন। সেটি আমাকে নিয়ে আকাশের একটি দরজায় উপস্থিত হল, যার নাম বাবুল হাফাযা অর্থাৎ প্রহরীদের ফটক।...//

.

রাসুল(ﷺ) যে স্থান থেকে আসমানে গিয়েছিলেন{অর্থাৎ যে স্থানে মিরাজ(সিঁড়ি) আনা হয়েছিল}, ঠিক সেই স্থানেই একটি আসমানী সিঁড়ি রয়েছে বলে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কিতাবে লেখা আছে।
যেসমস্ত খ্রিষ্টান ও ইহুদি পণ্ডিত রাসুল(ﷺ) এর মিরাজ নিয়ে বাজে কথা বলেন, আমার বিশ্বাস তাদের কেউ এটা খেয়াল করেননি! করলেও বেমালুম চেপে গিয়েছেন।
রাসুল(ﷺ) নিঃসন্দেহে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কাছে রক্ষিত তাওরাতের পণ্ডিত ছিলেন না।তারা নিশ্চয়ই এটা বলতে পারবে না যে রাসুল(ﷺ) ইয়াকুব(আ) এর ঐ সিঁড়ির কথা ইহুদিদের কিতাব থেকে পড়েছেন!! তিনি আরবি ভাষাই লিখতে পড়তে জানতেন না যেখানে ওল্ড টেস্টামেন্ট/তানাখ এর ভাষা হিব্রু। {{সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ তানাখ/Old testament আরবিতে অনুবাদ করেন ইহুদি পণ্ডিত সাদিয়া গাওন; নবম শতকে। রাসুল(ﷺ) এর প্রায় ৩০০ বছর পরে।}} ঐ পাথরের স্থানে আসমানের দরজা এবং আসমানী সিঁড়ি আছে বলে নবী ইয়া'কুব(আ){Jacob} স্বপ্নে দেখেছেন বলে তাদের গ্রন্থে লেখা আছে এবং নবীদের স্বপ্নকে তারাও সত্য বলে বিশ্বাস করে। আরবিতে এ সিঁড়িকে বলে মি'রাজ।শত শত বছর ধরে রাসুল(ﷺ) এর মি'রাজ নিয়ে আহলে কিতাব ও অন্য সম্প্রদায়ের লোকরা কটূক্তি করে আসছে।

.

[ইয়াকুব(আ) এর ঐ স্থানের পাথরটির উপরেই বনী ইস্রাঈলের নবীগণের বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদ ছিল এবং হাজার হাজার বছর ধরে সেটা ইহুদিদের কিবলা। মসজিদুল হারাম কিবলা হবার আগ পর্যন্ত রাসুল(ﷺ)ও ঐদিকে মুখ করে সলাত পড়তেন।ঐ পাথরের উপরেই বর্তমানে সোনালী গম্বুজের কুব্বাতুস সাখরা মসজিদ।]

.

যে সমস্ত নাস্তিক-মুক্তমনারা মুহাম্মদ(ﷺ) এর ইসরা ও মিরাজ নিয়ে বক্রোক্তি করে, এখানে তাদেরও ভাবনার কিছু খোরাক রয়েছে।তাদেরকে তো অধিকাংশ সময়েই অবাধে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের গ্রন্থ থেকে কোট করতে দেখা যায়।

.

ইসলামবিরোধিরা ইসরা ও মিরাজের আরেকটি দিক নিয়ে ব্যাপক প্রশ্ন তোলে আর তা হচ্ছে--ইসরা ও মিরাজের সময়ে কি

আদৌ বাইতুল মুকাদ্দাস বলে কোন কিছু ওখানে ছিল? ঐতিহাসিক সূত্র অনুযায়ী ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোম সম্রাট টাইটাস ইহুদিদের Temple Mount(হিব্রুতে বাইত হা মিকদাশ) ধ্বংস করেন। তাদের এই অভিযোগের জবাব পাওয়া যাবে ২ পর্বের এই নোটে--

১ম পর্বঃ https://goo.gl/YdgBRs
২য় পর্বঃ https://goo.gl/OSlaOc

১০৬
কুরআনের আয়াতসংখ্যার ভিন্নতা কি কুরআনের ত্রুটি?

-হোসাইন শাকিল

কুরআনের একেক গণনা পদ্ধতিতে আয়াত সংখ্যার বেশ মতপার্থক্য দেখা যায় এটা কি কুরআনের ত্রুটি নয়?? (নাউযুবিল্লাহ)

.

আসুন এই অভিযোগের সামান্য বিশ্লেষণে যাওয়া যাকঃ-

.

কুরআনুল মাজীদের আয়াতসংখ্যা গণনার জন্য একটি বিশেষ শাস্ত্র আছে যার মাধ্যমে কুরআন কারীমের প্রত্যেক সূরার মোট আয়াত সংখ্যা ও পুরো কুরআন মাজীদের মোট আয়াত সংখ্যা জানা যায় যাকে ইলমুল কিরা'আত(علم القراءت) ও ইলমুল তাজওয়ীদের(علم التجويد) ইমামগণ ইলমু আদাদি আয়াতিল কুরআন) (علم عد د الآيات القرآن বলে জানে। যার অন্যতম বিষয় হলো ফাওয়াসিলুল আয়াত (فواصل الآيات) বা আয়াতের সূচনা-পরিসমাপ্তি জানা। বলে রাখা ভালো যে, এই শাস্ত্র উলুমূল কুরআনের অন্যতম একটি পৃথক শাখা শাস্ত্র।

.

ইলমে আদাদ এটি রাসুলুল্লাহর(ﷺ) শিক্ষার ফসল। তিনি(ﷺ) সাহাবাদের (রাদিয়াল্লাহু আযমাঈন) যে শিক্ষা দিয়েছেন তারই ফসল হলো এই ইলমে আদাদ। কুরআনুল কারীম আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে রাসুলুল্লাহর(ﷺ) উপর দীর্ঘ ২৩ বছরে বিভিন্ন ঘটনার ও পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছিলো। বিভিন্ন সূরার বিভিন্ন অংশ এভাবে বিভিন্ন সময় নাযিল হতে থাকে। রাসুলুল্লাহ(ﷺ) ও তার সাহাবীরা সেই আয়াত হিফজ মুখস্ত করে নিতেন। সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহুম আজমাঈন তাঁরা আয়াত মূখস্থ করার পাশাপাশি তা কোন সূরার অংশ, কোন আয়াতের শুরু কোথা থেকে শুরু হয়েছে বা কোন আয়াত কোথায় শেষ হয়েছে তা ও হিফজ করে নিতেন। পরবর্তীতে প্রজন্ম পরম্পরায় তাদের কাছ থেকে তাবিঈ ও তাবিঈদের থেকে তাবি-তাবিঈনরা কুরআন এভাবেই শিখে নিয়েছেন, এবং পরবর্তীতে তাঁদের থেকে ইলমুল কিরাআতের ইমামগণ এভাবেই শিখেছেন আর সেভাবেই এই সংক্রান্ত কিতাবসমূহে ব্যাপকভাবে ও অসংখ্য হাদীছ ও আছার দ্বারা বর্ণিত হয়ে এসেছে।

.

সাধাণত কয়েক ধরনের বা এলাকার গণনা পদ্ধতি প্রসিদ্ধ

(১) মাদানী গণনাঃ

.

মাদানী গণনা দুই ধরনের

(ক) প্রথম মাদানী গণনা (المدني الأول)ঃ

এই গণনা পদ্ধতি ইমাম নাফি ইবনে আবি নুয়াইম মাদানী(মৃ ১৬৯হি) আবু ইয়াযীদ ইবনে কা'কা(মৃ ১৩২হি) এবং শাইবা ইবনে নিসাহ(মৃ ১৩০হি) থেকে বর্ণনা করেন। এই গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী কুরআনের আয়াত সংখ্যা ৬২১৭

.

(খ) দ্বিতীয় মাদানী গণনা(المدني الثاني)ঃ

এই গণনা পদ্ধতি ইমাম ইসমাঈল ইবনে জাফর মাদানী(মৃ ১৮০হি) সুলায়মান ইবনে মুসলিম ইবনে জামমায থেকে বর্ণনা করেন এবং তিনি(সুলাইমান) আবু জাফর (মৃ ১৩২হি) ও শাইবা ইবনে নিসাহ (মৃ ১৩০হি) থেকে বর্ণনা করেন। এই গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী আয়াত সংখ্যা দাঁড়ায় ৬২১৪ বা ৬২১০টি।

.

(২) মক্কী গণনাঃ
এই গণনা পদ্ধতির ভিত্তি হলেন আব্দুল্লাহ ইবনে কাছীর (মৃ ১২০হি)।

.

(৩) শামী গণনাঃ
এই গণনা পদ্ধতির ভিত্তি হলেন ইয়াহইয়াহ ইবনে হারিছ আযযিমারী (মৃ ১৪৫হি) এই গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী মোট আয়াত সংখ্যা ৬২২৬টি।

.

(৪) বসরী গণনাঃ
এই গণনার ভিত্তি হলেন আইয়ুব ইবনে মুতাওয়াক্কিল ও আসেম আলজাহদারী, তারা দুজনেই ইলমের কিরায়াতের ইমাম ছিলেন। এই গণনায় আয়াত সংখ্যা ৬২০৪টি।

.

(৫) কুফী গণনাঃ
এই গণনার মূল বর্ণণাকারী হলেন তাবিঈ আবু আব্দুর রহমান আসসুলামী(মৃ ৭৪হি)। এই গণনা পূর্বে এবং বর্তমানে সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ছিলো এবং এখন ও আছে। এর গণনা পদ্ধতিতে আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬টি, এই গণনা অনুযায়ীই সাধারণত বর্তমানে মুসহাফগুলোতে চিহ্ন দেওয়া হয়ে থাকে।

.

ইলমুল আদাদ বা কুরআনের আয়াতসংখ্যার শাস্ত্রের উপর ইসলামের প্রথম যুগ থেকেই প্রচুর বই-পত্র রচিত হয়ে আসছে। প্রায় শতাধিক বিখ্যাত বই এই শাস্ত্র নিয়ে রচিত হয়েছে। নিম্নে অঞ্চলভিত্তিক গণনা পদ্ধতি ভিত্তিক কিছু বইয়ের নাম উল্লেখ করা হলোঃ

.

মদীনাবাসীদের নিয়ম অনুযায়ী (أهل المدنية)ঃ
১। কিতাবু আদাদিল মাদানিয়্যিল আওয়াল লিন নাফি (كتاب عدد المدني الأول لنافع)
২। কিতাবুল আদাদিছ ছানি আন নাফি (كتاب العدد الثاني عن نافع)
৩। কিতাবুল আদাদ লি ঈসা (كتاب العدد لعيسى)
৪। কিতাবু ইসমাঈল বিন আবি কাছির ফি মাদানীয়্যিল আখির (كتاب إسماعيل بن أبي كثير في مدني الأخر)

.

মক্কাবাসীদের নিয়ম অনুযায়ী (أهل مكه)
১। কিতাবুল আদাদ লি আতা বিন ইয়াসার (كتاب العدد لعطاء بن يسار)
২। খলফ বাজ্জার (خلف البزار)
কুফাবাসীদের নিয়ম অনুযায়ী (أهل الكوفة)
১। কিতাবুল আদাদ লি খলফ (كتاب العدد لخلف)
২। কিতাবুল আদাদ লি মুহাম্মাদ বিন ঈসা (كتاب العدد لمحمد بن عيسى)

.

বসরাবাসীদের নিয়ম অনুযায়ী (أهل البصرة)
১। কিতাবুল হাসান বিন হাসান ফিল আদাদ (كتاب الحسن بن أبي حسن في العد د)

.

শামবাসীদের নিয়ম অনুযায়ী (أهل الشام)
১। কিতাবু খালিদ বিন মাদান (كتاب خالد بن مدان)

২। কিতাবু ইয়াহইয়াহ ইবনুল হারিছ আযযামারী (كتاب يحيي بن الحارث الذماري)

.

অভিযোগকারীরা বলেন কুরআন সঠিকভাবে সংরক্ষন করা হয় নি সেই কারণেই কুরআনের আয়াত গণনায় পার্থক্য হয়েছে (আস্তাগফিরুল্লাহ)। বিভিন্ন গণনা পদ্ধতির মধ্যে মতপার্থক্যের কিছু উদাহরণ দেখে নেওয়া যাক এতে করে তাদের অভিযোগের অন্তসারশূন্যতার ও পরিচয় অধিক পরিষ্কার হয়ে যাবে। ইনশাআল্লাহ।

.

প্রথমেই আয়াত সংখ্যায় কিভাবে মতপার্থক্য হয়ে থাকে বা এই মতপার্থক্যের স্বরুপ কি তা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। আয়াত সংখ্যায় সাধারনত নিম্নবর্ণিত উপায়ে মতপার্থক্য হয়ে থাকেঃ-

.

· আয়াত গণনা পদ্ধতিতে বৈচিত্র্য;

· আয়াত গণনা পদ্ধতি এক হলেও আয়াতের সূচনা-শেষ নির্ধারনে(فواصل) মতভেদ হওয়ার কারণে;

কিছু উদাহরণ দেখি,

.

সূরা ইখলাসঃ

১. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، ২. اللَّهُ الصَّمَدُ، ৩. لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ، ٤. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ

সূরা ইখলাসে আছে ৪টি আয়াত, কূফী, বাসরী, মাদানী(১ম ও ২য়) গণনা পদ্ধতিতে এই সূরাতে ৪ টি আয়াত আছে। তবে মক্কী ও শামী গণনা পদ্ধতিতে এই সূরার সংখ্যা ৫টি। কিভাবে? আসুন দেখে নেই

১.قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد، ২. اللَّهُ الصَّمَد، ৩. لَمْ يَلِدْ، ٤. وَلَمْ يُولَدْ، ৫. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَد

এটি মক্কী ও শামী গণনা পদ্ধতি অনুযায়ী সূরা ইখলাস যেখানে ৫টি আয়াত দেখা যাচ্ছে। এটা কি এই কারণে যে এই গণনাতে একটি অতিরিক্ত আয়াত সংযুক্ত হয়েছে(নাউযুবিল্লাহ), মোটেও নয়। বরং এখানে দেখা যাচ্ছে যে, কূফী, বাসরী ও মাদানী(১ম ও ২য় উভয়) পদ্ধতিতে (لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَد) এই অংশটিকে একটি আয়াত হিসেবে গন্য করা হয়েছে যেখানে মক্কী ও শামী গণনায় (لَمْ يَلِدْ) অংশকে ১টি ও (وَلَمْ يُولَد) অংশকে আরেকটি পৃথক আয়াত হিসেবে গন্য করা হয়েছে। কোনো প্রকার সংযোজন বা বিয়োজনের কারণে এই পার্থক্য ঘটেনি। আরেকটি উদাহরন দেখে নেওয়া যাকঃ-

.

সূরা কুরাইশঃ-

১. لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ، ২. إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ، ৩. فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ، ٤. ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

কূফী, বাসরী ও শামী এই তিন গণনা পদ্ধতিতে সূরা কুরাইশের আয়াত সংখ্যা ৪ যা আমরা উপরে দেখলাম। আর মক্কী ও মাদানী(১ম ও ২য়) গণনা পদ্ধতিতে এই সূরার আয়াত সংখ্যা ৫টি। কিভাবে??

১. لِإِيلَٰفِ قُرَيْشٍ ، ২. إِۦلَٰفِهِمْ رِحْلَةَ ٱلشِّتَآءِ وَٱلصَّيْفِ ، ৩. فَلْيَعْبُدُوا۟ رَبَّ هَٰذَا ٱلْبَيْتِ ، ٤. ٱلَّذِىٓ أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ ، ৫.وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ

এই গণনা পদ্ধতিটি মক্কী ও মাদানীর। এখানে লক্ষ্যনীয় যে, উপরের কূফী, বাসরী ও শামী এই তিন পদ্ধতির গণনা পদ্ধতিতে (الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف) এই অংশটিকে পরিপূর্ণ একটি আয়াত হিসেবে গন্য করা হলে ও বাকী দুই পদ্ধতি অর্থাৎ, মক্কী ও মাদানী গণনা পদ্ধতিতে (الذي أطعمهم من جوع) কে একটি ও (وآمنهم من خوف) কে আরেকটি আলাদা আয়াত হিসেবে গ্রহন করা হয়েছে। তবে মূল পাঠ সবসময়ই এক ও অভিন্নই রয়েছে। কোনো সংযোজন বা বিয়োজনের কারণে এই পার্থক্য হয়নি।

.

সূরা আসরঃ-

১. وَٱلْعَصْرِ، ২. إِنَّ ٱلْإِنسَٰنَ لَفِى خُسْرٍ، ৩. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّٰلِحَٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلصَّبْرِ

সূরা আসরের আয়াত সংখ্যা সকল প্রকার গণনা পদ্ধতি অনুসারেই ৩টি। দ্বিতীয় মাদানী গণনা ছাড়া সকল প্রকার গণনা পদ্ধতিতেই এই ভাবেই আয়াতের সূচনা-শেষ বা ফাওয়াসিল(فواصل) নির্ধারন করা হয়েছে। আর দ্বিতীয় মাদানী পদ্ধতিতে নিম্নরুপ ভাবে ফাওয়াসিল (فواصل) নির্ধারন করা হয়েছে।

১. وَٱلْعَصْرِ إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ، ২. إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ، ৩. وَتَوَاصَوا بِٱلصَّبْرِ

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, দ্বিতীয় মাদানী ছাড়া অন্যান্য সকল গণনায় (وَٱلْعَصْرِ) ও (إِنَّ ٱلْإِنسَـٰنَ لَفِى خُسْرٍ) কে আলাদা আয়াত গণনা করা হয়েছে তবে মাদানী দ্বিতীয় পদ্ধতিতে দুইটি অংশকে একত্রে একটি আয়াত বলে পরিগনিত করা হয়েছে। আবার মাদানী দ্বিতীয় পদ্ধতিতে (وَعَمِلُوا۟ ٱلصَّـٰلِحَـٰتِ وَتَوَاصَوْا۟ بِٱلْحَقِّ) ও (وَتَوَاصَوا بِٱلصَّبْرِ) কে আলাদা আয়াত হিসেবে গন্য করা হলেও অন্যান্য সকল পদ্ধতিতে এই অংশটিকে একটি আয়াত হিসেবেই ধরা হয়েছে।

.

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, কুরআনের আয়াত সংখ্যার মতপার্থক্য কখনোই কুরআনের মূলপাঠের ভিন্নতা বা আয়াত কম-বেশি হওয়ার কারণে হয়নি বরং তা অন্য কোনো ভিন্ন কারণে হয়েছে যা উপরে বর্ণিত হয়েছে।

.

ইমাম আহমাদ ইবনে উমার আলানদারাবী রাহ. লিখেন,

“ এই ধরনের পার্থক্য মূলত বাহ্যিক ও নামের পার্থক্য। এই পার্থক্য আসলে ইখতিলাফ নয়। এটা গণনা পদ্ধতির পার্থক্য, কুরআনের আয়াত কমবেশি হওয়ার পার্থক্য নয়। এই বাহ্য ইখতিলাফের কারণেই কুরআনের মোট আয়াত সংখ্যা এত, আর কেউ বলে মোট আয়াত সংখ্যা এত(উদাহরণত কুফী গণনায় ৬২৩৬ এবং বসরী গণনায় ৬২০৪.....) তো এখানে বিষয় এমন নয় যে, এক পক্ষ কুরআনকে বেশি বলছে আর অপর পক্ষ কম বলছে অথবা এক পক্ষ কুরআনের কোন অংশকে কুরআন মানছে আর অপর পক্ষ(আল্লাহ মাফ করুন) তা কুরআনের অংশ বলে মানছে না। বিষয়টি আদৌ এমন নয়

[আলইযাহ ফিল কিরাআত]

.

এছাড়া ১৯৮১ সালে ইমাম নাফি(যিনি প্রথম মাদানী গণনা পদ্ধতির ইমাম) থেকে ইমাম ওয়ারশ'(উছমান ইবন সাঈদ) এর বর্ণনাকৃত কিরাআত মোতাবেক(অর্থাৎ প্রথম মাদানী) একটি মুসহাফ ছাপা হয়েছিলো যাতে আয়াতের চিহ্ন লাগানো হয়েছিলো কূফী গণনা অনুযায়ী। এতে কোনোই সমস্যাই হয়নি দুই আদাদী বা গণনা পদ্ধতিকে সমন্বয় করতে। যদি গণনা পদ্ধতির পার্থক্য কুরআনের আয়াত কম-বেশি হওয়ার(আল্লাহ মাফ করুন) পার্থক্যই হত তবে কিভাবে সম্ভব ছিলো ইমাম নাফীর বর্ণনায় কূফার বর্ণনা অনুযায়ী আয়াতের চিহ্ন লাগানো?? যেখানে ইমাম ওয়ারশ থেকে ইমাম নাফীর(ورش عن نافع) গণনায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২১৭, আর কূফার গণনায় মোট আয়াত সংখ্যা ৬২৩৬!!!!(এই মুসহাফটিই সর্বাধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে আমাদের দেশের মুসহাফগুলোতে ও সাধারনত এই গণনা পদ্ধতির ব্যবহার হয়ে থাকে)

.

সুতরাং বলা যায় যে, কুরআনের সংকলনের ভুলের কারণে বা অন্য যে কোনো কারণে ভুল হওয়ার কারণে কুরআনের আয়াত গণনায় মতভেদ হয়ে থাকে এই অভিযোগ পরিপূর্ন ভুল ও গলদ চিন্তাধারা এবং সংকীর্ণ মনোভাবের ফসল। আল্লাহু আ'লাম।

.

[বি:দ্র: উক্ত লেখাটি শায়েখ মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক লিখিত (আল্লাহ তাঁকে হিফাযাত করুন ও তাঁর ছায়া আমাদের মাঝে দীর্ঘায়িত করুন) মাসিক আল কাওসারের “কুরআনুল কারীম সংখ্যা” [প্রকাশকালঃ ১৪৩৭ হিজরী/২০১৬ ঈসায়ী; পল্লবী, মিরপুর-১২, ঢাকা] অবলম্বনে লেখা হয়েছে (দেখুনঃ- পৃ-৮৯-১০৬)]

১০৭

স্রষ্টার সন্ধানে সিরিজ, পর্ব১: স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস কি সহজাত (প্রাকৃতিক) ? স্রষ্টা কি বাস্তবতা? না কোন বিভ্রম ?

-একের আহবানে- Calling to the One

স্রষ্টার সন্ধানে সিরিজ, পর্ব ১: স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস কি সহজাত (প্রাকৃতিক) ?

স্রষ্টা কি বাস্তবতা* ? না কোন বিভ্রম ?.

...

স্রষ্টার অস্তিত্বে বিশ্বাস কি প্রাকৃতিক ?
না মানব মনের ওপর চাপিয়ে দেয়া কোন ভাইরাস ?
যেমনটা বলতে চান স্রষ্টার অস্তিত্বে অবিশ্বাসীরা ?

.

নাস্তিকতা এক অস্বাভাবিক অবস্থা যা মানুষের সহজাত প্রকৃতির বিপরীত।
নাস্তিকতা যে সহজাত (বা স্বাভাবিক) নয় সে প্রসঙ্গে (নাস্তিক) ড. অলিভেরা প্যাট্রোভিচ বলেন, ... নাস্তিকতা নি:সন্দেহে অর্জিত অবস্থা ...। তিনি তার গবেষণা থেকে প্রকল্প উপস্থাপন করেন, স্রষ্টার অস্তিত্বের এই সহজাত বিশ্বাস মানব ক্রমবিকাশের পথে কার্যকারণ সম্বন্ধের একটি ফল।

...

* (বাস্তবতা বলতে বিদ্যমানতা বোঝানো হয়েছে। স্রষ্টা বস্তু বা সৃষ্ট জগতের অংশ নন)

...

Proud to be atheist ? No ! Ignorant to be atheist !!

===

.

দেখুন একের আহবানে - Calling to The One [mention করে দিবেন]পেইজের চমৎকার একটী ভিডিও

.

ইউটিউব লিঙ্কঃ https://www.youtube.com/watch?v=8CH2Cra2auA&feature=youtu.be

.

ফেইসবুক লিঙ্কঃ https://www.facebook.com/callingtotheone/posts/1208580659264231

.

ভিডিও স্বত্ব: একের আহবানে- Calling to the One

১০৮

নাস্তিক-মুক্তমনা লেখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিদ্বেষী পোস্টের জবাব - ৪

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

কেউ ওনার একাউন্টে গিয়ে নিজের অজান্তেই তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে পারেন বিধায় তার সম্পূর্ণ নাম উল্লেখ না করে শুধু নামের অদ্যাক্ষর উল্লেখ করা হল।যারা আগেই তার পোস্ট পড়েছেন, তারা এমনিতেই চিনতে পারবেন।

.

S.P. লিখেছেনঃ--------

.

//ধড়িবাজ ইসলামি লেকচারাররাই আয়াত কাটছাট করে তোমাদের বোকা বানায় আর নাস্তিকদের আয়াত বিকৃতির জন্য দায়ী করে। যাই হোক, এবার তোমার কথার জবাবে বলি, সুরা মায়দার যে অংশটুকু তুমি বললে সেটা কিন্তু সুরা মায়দার বক্তব্য না। এই আয়াতে আল্লাহ বলছেন তিনি ইহুদীদের তাওরাতে ঐ কথাগুলো লিখে দিয়েছিলেন। আমি পুরো আয়াত বলি শোন- “এ কারণেই আমি বনী-ইসলাঈলের প্রতি লিখে দিয়েছি যে, যে কেউ প্রাণের বিনিময়ে প্রাণ অথবা পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করা ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করে। এবং যে কারও জীবন রক্ষা করে, সে যেন সবার জীবন রক্ষা করে। তাদের কাছে আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন...”(সূরা মায়েদা: ৩২)। অর্থ্যাৎ দাবী করা হচ্ছে এই কথা ইহুদীদের ঐশ্বিগ্রন্থে আল্লাহ ইহুদীদের উপদেশ দিয়েছিলেন। এ কারণেই বলছেন, আমার পয়গম্বরগণ প্রকাশ্য নিদর্শনাবলী নিয়ে এসেছেন। কুরআন কিন্তু এরকম উক্তি মুসলমানদের পালন করতে নির্দেশ করেননি। //

.

----- >>>> আমাদের নাস্তিক মহোদয় এবারে ‘মুফাসসিরের’(!) ভূমিকা পালন করলেন। কিন্তু আয়াতের এমন তাফসির(?) তিনি করলেন, যার সঙ্গে সাহাবী-তাবিঈ কারো তাফসিরের মিল নেই।

.

গায়ের জোরে অপব্যাখ্যা করলে যা হয় আরকি। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসিরে মাজহারীতে একটি হাদিস উল্লেখ আছেঃ বারা বিন আজিব(রা) বর্ণিত; রাসুল(ﷺ) বলেছেন, সারা পৃথিবী ধ্বংস করাও একজন মানুষকে হত্যা করার চেয়ে আল্লাহর নিকট কম অন্যায়।হাসান সূত্রে বর্ণণা করেছেন ইমাম ইবন মাজাহ। [১]

.

এ বিষয়ে প্রাসঙ্গিক আরেকটি হাদিস হচ্ছেঃ কবিরা গুনাহের মধ্যে সবচেয়ে বড় হচ্ছে আল্লাহর সাথে কাউকে শির্ক করা এবং কোন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা। ... [২]

সাহাবী ইবন আব্বাস(রা) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেনঃ এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তা’আলা যে প্রাণ হত্যা করতে নিষেধ করেছেন, তা যদি কেউ হত্যা করে, তাহলে সে যেন সমগ্র মানবজাতিকেই হত্যা করল। [৩]

আমিরুল মু’মিনীন উসমান(রা)কে যখন বিদ্রোহীরা ঘিরে ফেলে, তখন আবু হুরাইরাহ(রা) তাঁর কাছে গিয়ে বলেন, “হে আমিরুল মু’মিনীন, আমি আপনার পক্ষ হয়ে আপনার বিরুদ্ধাচরণকারীদের বিরুদ্ধে লড়তে এসেছি।এ কথা শুনে উসমান(রা) বলেনঃ তুমি কি সমস্ত লোককে হত্যা করার প্রতি উত্তেজিত হয়েছ যাদের মধ্যে আমিও একজন? আবু হুরাইরাহ(রা) উত্তরে বললেন, “না, না।” তখন তিনি বললেনঃ “জেনে রেখ যে, তুমি যদি একজন লোককেই হত্যা কর তাহলে যেন তুমি সমস্ত লোককেই হত্যা করলে।যাও, ফিরে যাও।আমি চাই যে, আল্লাহ তোমাকে পুরস্কৃত করুন, পাপকাজে লিপ্ত না করুন।”” [৪]

.

সুলায়মান ইবন আলী আর রাব’ঈ(র) বলেন, আমি হাসান বসরী(র)কে জিজ্ঞেস করলামঃ হে আবু সাঈদ, --{““এ কারণেই বনী

ইস্রাঈলের উপর এ বিধাণ দিলাম যেঃ নরহত্যা বা যমিনে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল।”-সুরা মায়িদাহ ৫:৩২} এর বিধান কি আমাদের জন্যও প্রযোজ্য?
তিনি বললেন, “অবশ্যই, সেই সত্তার শপথ, যিনি ভিন্ন আর কোন ইলাহ নেই – এ বিধান বনী ইস্রাঈলের মত আমাদের জন্যও সমান প্রযোজ্য। আল্লাহ তা’আলা বনী ইস্রাঈলের রক্ত আমাদের রক্তের চেয়ে বেশী দামী করেননি।” [৫]

.

তাবিঈ মুজাহিদ(র) বলেন, অন্যায়ভাবে একজন মানুষকে হত্যাকারী ব্যক্তি এমনভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করবে, যেমনভাবে জাহান্নামে প্রবেশ করে সকল মানুষের হত্যাকারী।
একারণেই এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফসির মাজহারীতে বলা হয়েছে, “নরহত্যা এবং ধ্বংসাত্মক কার্য—এই দুই অপরাধে অপরাধী ব্যক্তি ছাড়া অন্য কোন কারণে কেউ যদি কাউকে হত্যা করে—তবে সে হবে দুনিয়ার সকল মানুষকে হত্যাকারীর মত।আর কেউ যদি কারো প্রাণ রক্ষা করে, তবে সে হবে পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষাকারীর মত।বনী ইস্রাঈলের প্রতি এই বিধানটি আল্লাহপাক এখানে জানিয়ে দিয়েছেন।কেবল বনী ইস্রাঈলদের লক্ষ্য করে বলা হলেও বিধানটি কিন্তু চিরন্তন।পূর্বাপর সকল উম্মতের জন্য বিধানটি অবশ্য পালনীয়।” [৬]

.

সুরা মায়িদাহর ৩২নং আয়াতটির দ্বারা একটি চিরন্তন সত্যকে জানানো হয়েছে যে—একজন মানুষকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা সারা পৃথিবীর মানুষকে হত্যা করার মত এবং একজন মানুষের জীবন রক্ষা করা সারা পৃথিবীর মানুষের জীবন রক্ষা করার মত। এটি বনী ইস্রাঈলকে বিধান হিসাবে দেয়া হয়েছিল।উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্যেও এটি জানা জরুরী বিধায় আল্লাহ কুরআনেও তা উল্লেখ করেছেন। রাসুল(ﷺ) এর হাদিসেও আয়াতের অনুরূপ বক্তব্য পাওয়া যায়, সাহাবী-তাবিঈগণও এ আয়াত দ্বারা এটি বুঝেছেন যে এটি উম্মাতে মুহাম্মাদীর জন্যও পালনীয়।সে অনুযায়ী তাঁরা আমল করেছেন।

.

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সুরা মায়িদাহর ৩২নং আয়াত সম্পর্কে সাহাবি-তাবিঈগণ যেভাবে বুঝেছেন, তার আলোকেই ইসলামী লেকচারারগণ বক্তব্য দিয়ে থাকেন, এবং নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করতে নিষেধ করেন। ইসলামী লেকচারারগণের এই সঠিক ব্যাখ্যাকে ‘ধড়িবাজি’ বলে উল্লেখ করে আমাদের আলোচ্য নাস্তিক লেখক কি তার নিজ ‘ধড়িবাজি’র স্বরূপই উন্মোচন করলেন না?

.

[চলবে, ইন শা আল্লাহ।
সিরিজের পরবর্তী পর্বে এই ইসলামবিদ্বেষী লেখকের আরো অনেকগুলো মিথ্যাচার ও অপব্যাখ্যার পোস্টমর্টেম করা হবে। আল্লাহু মুসতা’আন।]

.

এই সিরিজের ১ম ও ২য় ও ৩য় পর্বের জন্য দেখুন
#সত্যকথন_৯৯ [লিঙ্কঃ https://goo.gl/9CmxBF],
#সত্যকথন_১০০ [লিঙ্কঃ https://goo.gl/WqL6fk]
ও #সত্যকথন_১০১ [লিঙ্কঃ https://goo.gl/baSp7n]

তথ্যসূত্রঃ

.

[১] তাফসির মাজহারী, সুরা মায়িদাহর ৩২নং আয়াতের তাফসির, খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৪৮৩

[২] সহীহ বুখারী ৬৮৭১

[৩] তাবারী ১০/২৩৩ এবং তাফসির ইবন কাসির, সুরা মায়িদাহর ৩২নং আয়াতের তাফসির

[৪] তাফসির ইবন কাসির, সুরা মায়িদাহর ৩২নং আয়াতের তাফসির

[৫] তাফসির তাবারী(ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ), ৮ম খণ্ড, সুরা মায়িদাহ এর ৩২নং আয়াতের তাফসির, রেওয়ায়েত নং ১১৮০০, পৃষ্ঠা ৪২০

[৬] তাফসির মাজহারী, সুরা মায়িদাহর ৩২নং আয়াতের তাফসির, খণ্ড ৩, ৪৮২নং পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

১০৯

নাস্তিক-মুক্তমনা লেখক ‘S.P.’ এর ইসলামবিদ্বেষী পোস্টের জবাব – ৫ (শেষ পর্ব)

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

মুক্তমনা লেখক S.P.এর ইসলামবিদ্বেষী পোস্টের জবাবের ৫ম ও #শেষ_পর্ব পোস্ট করা হচ্ছে আজ। কেউ ওনার একাউন্টে গিয়ে নিজের অজান্তেই তার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করতে পারেন বিধায় তার সম্পূর্ণ নাম উল্লেখ না করে শুধু নামের অদ্যাক্ষর উল্লেখ করা হল।

.

S.P. লিখেছেনঃ--------

.

//...কুরআনের ছোট্ট একটা ভুল ধরিয়ে দেই। কুরআনে আল্লাহ ‘যদি কেউ নিরাপরাধ ব্যক্তিকে হত্যা করল সে যেন পুরো মানবজাতিকে হত্যা করল’ বলে যেটা তিনি ইহুদীদের লিখে পাঠিয়েছিলেন মুসা নবীর উপর নাযিল হওয়া তাওরাতে দাবী করেছেন সেটি আসলে ইহুদীদের ‘তালমুদ’ নামের একটি প্রাচীন ধর্মীয় বইয়ের উক্তি। এই বইটি ইহুদীদের তাওরাত নয়। অথ্যাৎ ইহুদীদের ঐশ্বিগ্রন্থ নয়। অনেকটা আমাদের দেশে মাওলানারা যে রকম ইসলামী বই লেখেন সেরকম একটি বই। কোন একজন ইহুদী যাযক নীতিকথা মূলক একটি বই তালমুদে এটা লিখেছিলেন। সেটাই কুরআনে আল্লাহ’র উক্তি হিসেবে এসেছে। তালমুদের উক্তিটা আমি তোমাকে বলি তুমি সুরা মায়দার সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ো- ‘যে একটি আত্মাকে ধংস করে সে যেন পুরো পৃথিবী ধংস করে, আর যে একটি আত্মাকে রক্ষা করে সে যেন পুরো পৃথিবীকে রক্ষা করে (Jerusalem talmud sanhedrin 4:1)। আমাকে এবার তুমি বলো, এতবড় ভুল আল্লাহ কি করে করল? এটা তো তাওরাতে জিহোবার কথা নয়! //

.

---- >>>>> কুরআনের “ছোট্ট একটা ভুল”(!) ধরিয়ে দিতে গিয়ে বিশিষ্ট নাস্তিক লেখক মহাশয় নিজের বিশাল একটি মূর্খতার স্বরূপই উন্মোচন করলেন। তিনি নিজেই ভালো করে জানেন না ইহুদিদের তালমুদ জিনিসটা আসলে কী। এই অল্প বিদ্যা নিয়ে তিনি কুরআন থেকে ‘ভুল’(!) বের করার মত মূর্খতা করেছেন এবং ফেসবুকের বহু মানুষকে বিভ্রান্ত করেছেন।

.

ইহুদিদের বিশ্বাস হচ্ছেঃ-- ঈশ্বর মুসা(আ)কে তাওরাত দান করেছেন।এই তাওরাতের ২টি রূপ আছে; লিখিত ও মৌখিক।ইহুদিদের ‘তানাখ’{খ্রিষ্টানরাও এই কিতাবগুলোতে বিশ্বাস রাখে এবং এগুলো Old Testament হিসাবে বাইবেলে আছে} এর প্রথম ৫টি বই হচ্ছে ‘লিখিত তাওরাত’(written Torah)।আর মুসা(আ)কে ঈশ্বর যে মৌখিক শিক্ষা দিয়েছেন তা হচ্ছে ‘মৌখিক তাওরাত’(oral Torah)।এই ‘মৌখিক তাওরাত’কে পরবর্তীতে লিপিবদ্ধ করা হয়, যা ‘মিশনাহ’(Mishnah) নামে পরিচিত।অর্থাৎ ‘মৌখিক তাওরাত’ এর লিখিত রূপ হিচ্ছে মিশনাহ।ইহুদি পণ্ডিতগণ মিশনাহ এর বেশ কিছু ব্যাখ্যা লেখেন যা ‘গেমারা’(Gemara) নামে পরিচিত।মিশনাহ ও গেমারাকে একত্রে বলে ‘তালমুদ’(Talmud)। [১]

.

কুরআনে সুরা মায়িদাহ এ আদম(আ) এর ২ পুত্রের[হাবিল-কাবিল] কাহিনী বর্ণণা করা আছে এবং এরই প্রেক্ষিতে ৩২নং আয়াতে বলা হয়েছেঃ-- “এ কারণেই বনী ইস্রাঈলের উপর এ বিধাণ দিলাম যেঃ নরহত্যা বা যমিনে ধ্বংসাত্মক কাজ করার কারণ ছাড়া কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। ...” ইহুদিদের ‘মিশনাহ’তে[Mishnah Sanhedrin 4:5] একদম একইভাবে আদম(আ) এর ২ পুত্রের কাহিনী বর্ণণা করা আছে এবং এরপর বলা আছেঃ “কেউ কাউকে হত্যা করলে সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণ রক্ষা করলে সে যেন সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল”। [২]

.

আমরা দেখলাম যে, কুরআন বনী ইস্রাঈলের প্রতি দেয়া আল্লাহর একটি বিধাণের কথা বলছে যা এখনো ইহুদিদের কিতাবে বিদ্যমান। আমরা এও দেখলাম যে, ইহুদিদের 'মিশনাহ' তাদের কাছে মোটেও "যাজকদের লেখা বই" বলে বিবেচিত হয় না বরং মুসা(আ)কে দেয়া স্রষ্টার বাণী হিসাবে বিবেচিত হয় এবং একে ইহুদিরা মৌখিক তাওরাত(Oral Torah) হিসাবে গণ্য করে।

.

এবার খেয়াল করুন আমাদের আমাদের আলোচ্য নাস্তিক মহোদয় কী লিখেছেনঃ <<এই বইটি ইহুদীদের তাওরাত নয়। অথ্যাৎ ইহুদীদের ঐশ্বিগ্রন্থ নয়। অনেকটা আমাদের দেশে মাওলানারা যে রকম ইসলামী বই লেখেন সেরকম একটি বই। কোন একজন ইহুদী যাযক নীতিকথা মূলক একটি বই তালমুদে এটা লিখেছিলেন। >>

.

আমি সবসময়েই বলি যে নাস্তিকতার মূলেই আছে অজ্ঞতা, অহঙ্কার আর মূর্খতা। আমাদের আলোচ্য নাস্তিক মহোদয় এই কথাকেই আবার সত্যে পরিনত করলেন। যে কিতাবকে ইহুদিরা স্রষ্টার বাণী হিসাবে গণ্য করে, তাকে উনি দিব্যি 'যাজকের লেখা' বলে চালানোর চেষ্টা করলেন।তিনি নিজে যদি সত্যিই তালমুদ থেকে ঐ অংশটি পড়তেন তাহলে এটা দেখতে পেতেন যে সেখানে ঐ কথার আগে "considered by scripture" কথাটি লেখা আছে [কমেন্টে স্ক্রীনশট দেয়া হল] অর্থাৎ স্রষ্টার একটি বিধান হিসাবে সেটি ওখানে লেখা আছে।তিনি প্রমাণ করলেন যে ইহুদিদের তালমুদ সম্পর্কে তার বিন্দুমাত্র ধারণাও নেই, তিনি মোটেও এটা নিয়ে স্টাডি করেননি বরং তিনি যা অভিযোগ এনেছেন তা কোন মিথ্যুক এন্টি ইসলামিস্ট ওয়েবসাইট থেকে চুরি করা। বাংলার নাস্তিক-মুক্তমনাদের থেকে এর চেয়ে বেশী কিছু আমি আশা করি না।

.

চিন্তাশীলদের জন্য বরং এখানে ভাবনার অনেক খোরাক আছেঃ কুরআন কিভাবে প্রেক্ষাপট সহকারে ইহুদিদের গ্রন্থ থেকে সঠিকভাবে বিধানটি উদ্ধৃত করল? লক্ষ্য করুন, সে যুগে এখনকার মত অনলাইনে তালমুদের অনুবাদ পড়া যেত না; সেটি ছিল ৭ম শতাব্দী যখন কাগজ বলেই কোন কিছু ছিল না। লিখিত তাওরাত সর্বপ্রথম আরবিতে অনুবাদ করেন সাদিয়া গাওন, মুহাম্মাদ(ﷺ) এর সময়ের প্রায় ৩০০ বছর পরে। আর মৌখিক তাওরাত তো আরো দুষ্প্রাপ্য জিনিস ছিল। মুহাম্মাদ(ﷺ) নিশ্চয়ই হিব্রু ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন না।তিনি তো আরবি ভাষাই লিখতে-পড়তে পারতেন না, হিব্রু তো অনেক দূরের কথা। আলোচ্য আয়াত(মায়িদাহ ৩২) নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে কুরআন স্রষ্টাপ্রদত্ত আসমানী কিতাব।

.

//এবার আসো আসল বিষয়ে। তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেই সুরা মায়দার ৩২ নম্বর আয়তটি চরম শান্তির কথা বলা হয়েছে তাহলে এর ঠিক পরের ৩৩ নম্বর আয়াতটিকে কি বলবে? আমি তোমাকে শোনাচ্ছি সুরা মায়দার ৩৩ নম্বর আয়াতে কি বলা হচ্ছে, "যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং যমীনে ফাসাদ করে বেড়ায়, তাদের আযাব কেবল এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে কিংবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত ও পা কেটে ফেলা হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বের করে দেয়া হবে। এটি তাদের জন্য দুনিয়ায় লাঞ্ছনা এবং তাদের জন্য আখিরাতে রয়েছে মহাআযাব। (সূরা মায়েদা: ৩৩)"।...এই যে মায়দার ৩৩ নম্বর আয়াতটা বললাম, ইবনে কাথিরের সুরা মায়দার তাফসিরে গিয়ে দেখবে সেখানে ধর্মত্যাগীদের শাস্তি যে তাদের ধরে হত্যা করে ফেলতে হবে সেটা এই আয়াতকে দলিল ধরেই ইসলামী আইন তৈরি করা হয়েছে। নবী নিজে মদিনাতে ধর্মত্যাগীদের পিছন থেকে হাত-পা কেটে ফেলেন এবং চোখে গরম শলকা ভরে দেন! ...ভেবে দেখো সারাবিশ্বে জঙ্গিবাদের যারা তাত্বিক নেতা তারা কিন্তু কুরআন-হাদিস থেকেই রেফারেন্স নিয়ে জিহাদের প্রেরণা দিচ্ছেন। //

.

---- >>>> সুরা মায়িদাহ এর ৩৩নং আয়াতটি ভালো মত খেয়াল করলেই দেখা যায় যে এখানে নিরাপরাধ কোন মানুষকে শাস্তি

দেবার কথা বলা হচ্ছে না। আমাদের আলোচ্য নাস্তিক মহোদয় এখানে তাফসির ইবন কাসিরের প্রসঙ্গ টেনেছেন, {{উনি ইংরেজি এন্টি ইসলামিস্ট ওয়েবসাইট থেকে এই অভিযোগগুলো চুরি করেছেন; এ কারণেই "ইবন কাসির"কে "ইবনে কাথির" লিখেছেন।ইংরেজিতে এভাবেই লেখে।}} কাজেই আমিও ইবন কাসির থেকেই আলোচনা করছি ইন শা আল্লাহ। তাফসির ইবন কাসিরে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় উল্লেখ আছেঃ--- "এ আয়াতে অর্থ হচ্ছে বিরুদ্ধাচরণ করা এবং হুকুমের বিপরীত করা।এর ভাবার্থ হচ্ছে কুফরী করা, ডাকাতি করা, ব্যভিচার করা এবং ভূ-পৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকারের অশান্তি সৃষ্টি করা।" ইবন কাসিরে এটাও উল্লেখ আছে যে, "যারা আল্লাহ ও রাসুলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদেরকেও ক্ষমা করা হবে যদি তাওবাহ করে" এবং এ প্রসঙ্গে আলী(রা) ও আবু হুরাইরাহ(রা)র সাথে সংশ্লিষ্ট দু'টি পৃথক ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে যেখানে এমন অপরাধীদেরকেও নিরাপত্তা দেয়া হয়েছে যেহেতু তারা তাওবা করেছিল। [৩]

.

তাফসির ইবন কাসিরে এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সুস্পষ্টভাবে অপরাধী ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে।এ আয়াতের সরল অনুবাদেও বলা হয়নি যে নিরাপরাধ কোন মানুষকে শাস্তি দিতে হবে।এমনকি একটা সেকুলার রাষ্ট্রেও রাষ্ট্রদ্রোহিতা,হাইজ্যাকিং, ব্যভিচার-ধর্ষণ ইত্যাদি অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির ব্যাবস্থা থাকে। ফিতনা-ফাসাদ, সন্ত্রাস দমনের জন্য কুরআন যে আইন দিল, সেই আইনকেই জঙ্গীবাদের সাথে জড়িয়ে এক মহা মিথ্যাচারের অবতারণা করলেন আমাদের আলোচ্য নাস্তিক লেখক। কোন ইসলামী লেকচারার কখনো এটা বলেন না যে, "ইসলামে কোন হত্যা রক্তপাতের কথা নেই" বরং ইসলামী লেকচারাররা এটা বলেন যেঃ "ইসলাম কখনো নিরাপরাধ মানুষকে হত্যা করতে বলে না"। এবং প্রাসঙ্গিকভাবেই সুরা মায়িদাহ এর ৩২নং আয়াতের উদ্ধৃতি দেন।ইসলামী লেকচারারদের কথা বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে খাঁটি নাস্তিকীয় উপায়ে মিথ্যাচার করলেন আলোচ্য নাস্তিক লেখক। তাফসির ইবন কাসিরে আলোচ্য আয়াতের তাফসিরেও ঘটনাটি উল্লেখ আছে। 'উকল গোত্রের কিছু লোক প্রতারণা করে উটের রাখালকে হত্যা করে তাদের উটগুলোকে হাঁকিয়ে নিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিল। হত্যাকারী ও সম্পদের লুণ্ঠণকারী এই অপরাধীদেরকে হাত-পা কেটে ও চোখ উপড়ে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়। [৪]
আলোচ্য নাস্তিক লেখক এই ঘটনাটিতে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামীদের এত সব অপরাধের কথা পুরোপুরি চেপে গিয়ে বিকৃতভাবে ঘটনাটি উপস্থাপন করে নিজের মিথ্যুক চরিত্রের স্বাক্ষর রেখেছেন।

.

সত্যিই, বাস্তবের সঙ্গে এইসব জ্ঞানপাপী নাস্তিক-মুক্তমনাদের কথাবার্তার আকাশ-পাতাল পার্থক্য।

.

তাদের এই মিথ্যাচার আর ধোঁকাবাজি থেকে বেঁচে থাকার উপায় কী? উপায় হচ্ছে নাস্তিকের ফেসবুক স্ট্যাটাস থেকে ইসলাম না শিখে যথাযথ সোর্স থেকে ইসলাম শেখা।কোন কোন মুসলিম ভাইকে দেখেছি যে নাস্তিকদের লেখালেখি দেখে খুব বিব্রত হয়ে যান আর সন্দেহে নিপতিত হন। ইঞ্জিনিয়ারিং শিখবার জন্য যেমন কারো 'গীতাঞ্জলী' পড়ার কোন দরকার নেই, তেমনি নাস্তিক-মুক্তমনারা ইসলাম নিয়ে ফেসবুক বা ব্লগে কী বলল তা দেখেও ইসলাম সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তে পোঁছানো মহা অযৌক্তিক কাজ। ইসলামের স্বরূপ জানতে হলে কুরআন পড়তে হবে, হাদিস পড়তে হবে,নবী(ﷺ) এর সিরাহ অধ্যায়ন করতে হবে, আলিমদের কাছ থেকে শিখতে হবে।

.

[৫ পর্বের এই সিরিজ আজকে শেষ হল। এই সিরিজের ১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ পর্বের জন্য দেখুন
#সত্যকথন_৯৯, #সত্যকথন_১০০, #সত্যকথন_১০১ ও #সত্যকথন_১০৮
সম্পূর্ণ সিরিজ একসাথে ডক ফাইল হিসাবে ডাউনলোড করুন এখান থেকেঃhttps://goo.gl/LrJ2Qc। আর পিডিএফ হিসাবে ডাউনলোড করুন এখানে থেকেঃhttps://goo.gl/iIDjKQ । এই ফাইলগুলো প্রয়োজনমত দাওয়াহ এর কাজে ব্যবহার করুন, ডক ফাইল থেকে কপি করে অনলাইনে ইসলামবিদ্বেষী নাস্তিক-মুক্তমনাদের দাঁতভাঙা জবাব দিন। আলোচ্য সিরিজে যে নাস্তিকের কথা আলোচনা করা হয়েছে সে এখনো তার ইসলামবিদ্বেষী ও মিথ্যাচারে ভরা লেখা চালিয়ে যাচ্ছে। কাজেই ভবিষ্যতেও তার মিথ্যাচার অপনোদন করে আরো লিখবার আশা রাখছি।আল্লাহু মুসতা'আন।]

তথ্যসূত্রঃ

.

[১] ➡ http://www.jewfaq.org/torah.htm

➡http://www.chabad.org/.../8.../jewish/What-is-the-Oral-Torah.htm

➡ http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-oral-law-talmud-and...

আরো দেখুন, "ইজহারুল হক" (রহমাতুল্লাহ কিরানবী) ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৩০-১৩৬

{"ইজহারুল হক" ১ম খণ্ডের ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://goo.gl/7FGVmf

"ইজহারুল হক" ২য় খণ্ডের ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://goo.gl/BHzH6W}

[২] অনলাইন মিশনাহ থেকে সংশ্লিষ্ট অংশের লিঙ্কঃhttps://www.sefaria.org/Mishnah_Sanhedrin.4.5?lang=bi

{কমেন্টে স্ক্রীনশট দেয়া হল}

[৩] তাফসির ইবন কাসির, হুসাইন আল মাদানী প্রকাশনী, সুরা মায়িদার ৩৩নং আয়াতের তাফসির, ৬৪৯-৬৫৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

[৪] ইবন কাসির, কুরআনুল কারিম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির(ড.আবু বকর জাকারিয়া) ১ম খণ্ড, সুরা মায়িদাহর ৩৩নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ৫৫১ দ্রষ্টব্য

১১০

নাস্তিকদের অভিযোগ খণ্ডন – ৫; প্রাক ইসলামিক যুগে আরবের নারীরা কি বেশি স্বাধীন ছিল? (শেষ পর্ব)

-জাকারিয়া মাসুদ

[আগের পর্বগুলোর জন্য দেখুন (#সত্যকথন) ৮৭, (#সত্যকথন) ৮৮ ও (#সত্যকথন) ৯১]

.

.

সব থেকে বিশুদ্ধ ইতিহাস গ্রন্থ কোরআন কারীমেও প্রাক ইসলামিক যুগে নারীদের অবস্থা সম্পর্কে বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে। মহান আল্লাহ্ তৎকালীন নারীদের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন,

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ [١٦:٥٨] يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِن سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ [١٦:٥٩]

অর্থঃ "আর যখন তাদের কাউকে কন্যা সন্তানের সুসংবাদ প্রদান করা হয়; তখন তার চেহারা কালো হয়ে যায়। আর সে থাকে দুঃখ ভারাক্রান্ত। তাকে যে সংবাদ দেয়া হয়েছে, তার গ্লানি হেতু সে নিজ সম্প্রদায় হতে আত্মগোপন করে। সে চিন্তা করে হীনতা সত্ত্বেও সে তাকে (কন্যাকে) রেখে দেবে না মাটিতে পুঁতে ফেলবে! সাবধান! তারা যা সিদ্ধান্ত নেয় তা কত নিকৃষ্ট"। (সূরা আন-নাহলঃ ৫৮-৫৯)

.

এই আয়াত আমাদেরকে অত্যন্ত পরিষ্কার করে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, ইসলাম পূর্ব আরবের নারীরা কতটা অপমানিত হত। যে সমস্ত পিতাদের কন্যাসন্তান জন্মলাভ করত তারা লজ্জায় সমাজে মুখ লুকিয়ে বেড়াত। তাদের মনের মধ্যে ক্রোধ সৃষ্টি হত, এতটাই অপমানবোধ করতো যে কন্যাসন্তান কে রেখে দেবে নাকি মাটিতে পুতে ফেলবে তা নিয়ে ইতঃস্ততবোধ করতে থাকত। কেউ কেউ তাদের কন্যাসন্তানকে জীবিত মাটিতে দাফন করে দিত। কেননা কন্যা সন্তানকে তারা অপয়া মনে করত, তাদেরকে তারা সমাজের বোঝা মনে করত। আপনি যদি ইতিহাস গ্রন্থের দিকে তাকান তাহলেও এই ধরণের অসংখ্য উদাহরণ পাবেন। আমরা তার একটি ছোট্ট নমুনা আপনাদের সামনে পেশ করছি। "ইসলামের ইতিহাস" গ্রন্থে গ্রন্থকার লিখেন,

.

"বনী তামীম এবং কোরায়শদের মধ্যে কন্যা হত্যার সমধিক প্রচলন ছিল। তারা এজন্যে রীতিমত গর্ববোধ করতো এবং তাদের জন্যে সম্মানের প্রতীক বলে বিশ্বাস করতো। কোন কোন পরিবারে এ পাষণ্ডতা এতদূর পর্যন্ত গড়িয়েছিল যে, মেয়েরা যখন বেশ বড় হয়ে যেতো এবং মিষ্টি কথা বলতে শুরু করতো, তখন পাঁচ ছ' বছর বয়সে তাকে সুন্দর বেশভূষায় সজ্জিত করে পিতা তাকে লোকালয়ের বাইরে নিয়ে যেতো। পাষণ্ড পিতারা পূর্বেই সেখানে গিয়ে গর্ত খুড়ে আসত এবং পরে মেয়েকে সেখানে নিয়ে ধাক্কা দিয়ে গর্তে ফেলে দিত। অবোধ মেয়ে তখন অসহায় অবস্থায় চীৎকার করে করে বাপের কাছে সাহায্য চাইতো, কিন্তু পাষণ্ড পিতা তার দিকে বিন্দু মাত্র ভ্রুক্ষেপ না করে ঢিল ছুড়ে ছুড়ে তাকে হত্যা করতো বা জীবন্ত মাটি চাপা দিয়ে নিজ হাতে কবর সমান করে দিয়ে নির্বিকারে ঘরে ফিরে আসতো এবং আপন কলিজার টুকরা সন্তানকে জীবন্ত প্রেথিত করার জন্য সে রীতিমত গর্ববোধ করতো। বনী তামীমের জৈনেক কায়স ইবন আসিম এভাবে একে একে তার দশটি কন্যাসন্তানকে জীবন্ত প্রেথিত করে। কন্যা হত্যার এ অমানুষিক বর্বরতা থেকে আরবের কোন কবীলাই মুক্ত ছিলো না। তবে কোন কোন এলাকা্র কবীলায় এটি অনেক বেশী হত, আবার কোন কোন কবীলায় তা কম হত"।

.

{নজিবাদী, আকবর শাহ খান, ইসলামের ইতিহাস, ১/৬৮; (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা, ২য় সংস্করণ, জুন, ২০০৮)}।

.

এই হলো জাহেলী যুগের কন্যাশিশুদের উপর আরব জাতির করা নির্মম অত্যাচারের কিছু খণ্ডচিত্র। এবার চলুন হাদিস থেকে দেখি যে তাদের সময়ে সাধারন নারীদের কি ধরণের অত্যাচার করা হত। তাদের যৌন চাহিদা মেটাতে গিয়ে তারা নারীকে কিভাবে তাদের ভোগ্য পণে পরিণত করেছিল।

.

রাসূলুল্লাহ (ﷺ) এর সহধর্মিণী আয়েশা (রা) বলেছেনঃ জাহিলী যুগে চার প্রকারের বিয়ে প্রচলিত ছিল।

.

এক প্রকার হচ্ছে, বর্তমান যে ব্যবস্থা চলছে অর্থাৎ কোন ব্যক্তি কোন মহিলার অভিভাবকের নিকট তার অধীনস্থ মহিলা অথবা তার কন্যার জন্য বিবাহের প্রস্তাব দিবে এবং তার মোহর নির্ধারণের পর বিবাহ করবে।

.

দ্বিতীয়ত হচ্ছে, কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে মাসিক ঋতু থেকে মুক্ত হওয়ায় পর এই কথা বলত যে, তুমি অমুক ব্যক্তির কাছে যাও এবং তার সাথে যৌনমিলন কর। এরপর স্বামী তার নিজ স্ত্রী থেকে পৃথক থাকত এবং কখনো এক বিছানায় ঘুমাত না, যতক্ষণ না সে অন্য ব্যক্তির দ্বারা গর্ভবতী হত, যার সাথে যৌনমিলন করত। এটা ছিল তার স্বামীর অভ্যাস। এতে উদ্দেশ্য ছিল যাতে করে সে একটু উন্নত জাতের সন্তান লাভ করতে পারে। এ ধরণের বিবাহকে 'নিকাহুল ইসতিবদা' বলা হত।

.

তৃতীয় প্রথা ছিল যে, দশ জনের কম কতিপয় ব্যক্তি একত্রিত হয়ে পালাক্রমে একই মহিলার সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হত। যদি মহিলা এর ফলে গর্ভবতী হত এবং কোন সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ায় পর কিছুদিন অতিবাহিত হত, সেই মহিলা এই সকল ব্যক্তিকে ডেকে পাঠাত এবং কেউই আসতে অস্বীকৃতি জানাতে পারত না। যখন সকলেই সেই মহিলার সামনে একত্রিত হত, তখন সে তাদের বলত তোমরা সকলেই জান- তোমরা কি করেছ! এখন আমি সন্তান প্রসব করেছি, সুতরাং হে অমুক! এটা তোমারই সন্তান! ঐ মহিলা যাকে খুশী তার নাম ধরে ডাকত, তখন এ ব্যক্তি উক্ত শিশুটিকে গ্রহণ করতে বাধ্য থাকত এবং ঐ মহিলা তার স্ত্রীরূপে গণ্য হত।

.

চতুর্থ প্রকারের বিবাহ হচ্ছে, বহু পুরুষ একই মহিলার সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হত এবং ঐ মহিলা তার কাছে যত পুরুষ আসত কাউকে শয্যাশায়ী করতে অস্বীকার করত না। এরা ছিল পতিতা, যার চিহ্ন হিসেবে নিজ ঘরের সামনে পতাকা উড়িয়ে রাখত। যে কেউ ইচ্ছা করলে এদের সাথে যৌনমিলনে লিপ্ত হতে পারত। যদি এই সকল মহিলাদের মধ্য থেকে কেউ গর্ভবতী হত এবং কোন সন্তান প্রসব করত তাহলে যৌনমিলনে লিপ্ত হওয়া সকল কাফাহ পুরুষ এবং একজন কাফাহ (এমন একজন বিশেষজ্ঞ, যারা সন্তানের মুখ অথবা শরীরের কোন অঙ্গ দেখে বলতে পারত- অমুকের ঐরসজাত সন্তান)- কে ডেকে আনা হত সে সন্তানটির যে লোকটির এ সদৃশ্য দেখতে পেত তাকে বলতঃ এটি তোমার সন্তান। তখন ঐ লোকটি ঐ সন্তানকে নিজের হিসাবে গ্রহণ করতে বাধ্য হত এবং লোকে ঐ সন্তানকে তার সন্তান হিসাবে আখ্যা দিত এবং সে এই সন্তানকে অস্বীকার করতে পারত না। যখন রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে সত্য দ্বীনসহ পাঠানো হল তখন তিনি জাহেলী যুগের সমস্ত বিবাহ প্রথাকে বাতিল করে দিলেন এবং বর্তমানে প্রচলিত শাদী ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিলেন"।
{বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহিহ, অধ্যায়ঃ কিতাবুন নিকাহ, ৮/৪৭৫১ ; (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, আগারগাও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা,একাদশ সংস্করণ, জুন-২০১৩)}।

.

এই হল জাহেলী সমাজের কিছুটা বাস্তব চিত্র। তৎকালীন আরব অভিজাত বংশের নারীদেরকেই কেবল মাত্র সম্মান করা হত, তাদের কথা সমাজে গৃহীত হত, তাদেরকে রক্ষায় যুদ্ধ হত, এ কথা অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু অপরদিকে সমাজের সাধারণ স্তরের

নারীদের ছিলনা কোন মর্যাদা, ছিলো না সমাজ স্বীকৃত কোন অধিকার, তাদেরকে বিচ্ছিন্ন রাখা হত সামাজিক সকল ধরণের কর্মকাণ্ড হতে। তাদের সাথে যেনা ব্যাভিচার করা জাহেলী সমাজের সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছিল। নিম্ন বংশীয় নারীরা কেবল মাত্র পুরুষের মনোরঞ্জনের সামগ্রী হিসেবে বিবেচিত হত, তাদের কে পতিতা বানানো হত। অপরদিকে নারী দাসীদের অবস্থা আরও শোচনীয় ছিল। তাদের ছিলনা কোন সমাজ স্বীকৃত অধিকার, তাদের ছিল না কোন মর্যাদা, তাদের ছিল না কোন ধরণের প্রতিবাদ করার অধিকার। তাদের সাথে তাদের মালিকরা অনায়েসেই অবৈধ যৌনাচারে লিপ্ত হতে পারত। সমাজের কেউ কিছুই বলতো না।

.

ব্যাভিচার এতটাই বিস্তৃত ছিল যে, সমাজের কোন স্তরের লোকেরাই এ থেকে মুক্ত ছিল না। অবশ্য কিছু সংখ্যক নারী পুরুষ (যাদের সংখ্যা নগণ্য) তারা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহমিকার কারণে ব্যাভিচার থেকে বিরত থাকতো। জাহেলী যুগে একাধিক স্ত্রী রাখা দোষের কিছু ছিল না। দুই সহোদর বোনকে তারা একই সাথে বিয়ে করত। পিতার তালাক প্রাপ্তা স্ত্রী অথবা পিতার মৃত্যুর পর সন্তান তার সৎ মায়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতো। তালাকের উপর ছিল শুধুমাত্র পুরুষের একছত্র অধিকার। তাদের স্ত্রী গ্রহণ করার যেমন কোন সীমা ছিল না (কেউ কেউ দশের অধিক বিয়ে করত), ঠিক তেমনি তাদের তালাকেরও কোন নির্দিষ্ট সীমা ছিল না। যখন খুশি যাকে বিয়ে করত, যখন খুশি যাকে তালাক দিত এতে কোন নারী কোন ধরণের আপত্তি তুলতে পারতো না। তারা কোন ধরণের বিচার চাইতে পারতো না তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে।

.

{মুবারকপুরী, শফিউর রহমান, আর রাহীকুল মাখতুম, পৃষ্ঠাঃ ৬০-৬৪; আল কোরআন একাডেমী, লন্ডন, ২১ তম প্রকাশ, নভেম্বর, ২০১৩)}।

.

আরবের তৎকালীন ইতিহাস পাঠ করলে আমাদের সামনে অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপেই প্রতিয়মান হয় যে, তৎকালীন উচ্চ বংশীয় নারীরা ছাড়া, সমাজের অন্যান্য স্তরের নারীদের অবস্থা একেবারেই শোচনীয় ছিল। তাদের ছিল না কোন সমাজ স্বীকৃত অধিকার। ছিল না কোন সামাজিক মর্যাদা। তারা পুরুষের যৌন সামগ্রী হিসেবেই সমাজে বিবেচিত হত। সর্বোপরি নারীরা সে সমাজে মানুষ নয় বরং পুরুষের অধিকৃত সম্পত্তি এবং গৃহপালিত ছাগল ভেড়ার ন্যায় বিবেচিত হত।

.

কিন্তু ইসলাম আগমনের পড়ে তাদের এই ধরণের সকল অজ্ঞতা ও কুসংস্কার কে বাতিল বলে ঘোষণা করে। নারীদেরকে মানুষ হিসেবে পুরুষের সমান ঘোষণা করে। নারীদের কে ফিরিয়ে দেয় তাদের প্রাপ্য সম্মান, কন্যা শিশু হত্যাকে পাপের কাজ বলে ঘোষণা করে। ৪টির বেশী স্ত্রী রাখাকে হারাম করে দেয়। সমাজের নারী দাসীদের সাথে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন কে হারাম করে দেয়। নারীদের কে সম্পত্তিতে তার প্রাপ্য অধিকার প্রদান করে। মোটকথা একজন নারীকে স্ত্রী হিসেবে, মা হিসেবে, বোন হিসেবে তার প্রাপ্য ন্যায্য অধিকারকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করে। প্রত্যেক পুরুষকে তার অধীনস্ত নারীদের রক্ষনাবেক্ষন করা, তাদের মাল ইজ্জজের হিফাযত করা, তাদের সাথে সৌহার্দপূর্ণ আচরণ করা ইত্যাদিকে বাধ্যতামূলক করে দেয় ইসলাম। (ইনশাআল্লাহ বিস্তারিত আলোচনা সামনে আসবে)।

.

এ দাবি কেবল আমাদের নয়। অমুসলিমদের তৈরি এনসাইক্লোপিডিয়া “উইকিপিডিয়াতে” বলা হয়েছে,

“In 586 CE women were acknowledged to be human”

“৫৮৬ খৃষ্টাব্দে নারীদেরকে মানুষ বলে বিবেচনা করা হয়”

https://en.wikipedia.org/wiki/Women_in_pre-Islamic_Arabia

.

তাই ড. আজাদসহ নাস্তিকদেরকে আমরা বলতে চাই, আপনাদের কাছে প্রাক ইসলামিক আরবের কোন ইতিহাস বই থাকলে তা অধ্যয়ন করুন তারপর বিচার বিশ্লেষণ করে দেখুন যে কোন সমাজ নারীদেরকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করেছে। আর যদি সব

কিছু জেনে শুনেও প্রাক ইসলামিক আরবের পক্ষে কলম ধরেন তো আমাদের আর এ কথা বুঝতে বাকি থাকে না যে, আপনারা নারীদেরকে কতটা নীচে নামিয়ে দিতে চান। আপনাদের উদ্দেশ্য নারী স্বাধীনতা নয় বরং স্বাধীনতা নামক ফাকা বুলির আড়ালে নারীদেরকে যৌন দাসী বানিয়ে উপভোগ করা, যেমনি প্রাক ইসলামিক যুগের আরব পুরুষরা করত।

বস্তুত একমাত্র মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।

.

#হুমায়ুন_আজাদ – ২

১১১

কিবলা নিয়ে যত বিভ্রান্তি

-নাফিস শাহরিয়ার

নাস্তিকরা কিবলা নিয়ে প্রশ্ন করার সময় wikiislam থেকে ধার করা একটা ছবি ধরিয়ে দেয়। এরপর তারা দাবি করে এর অর্থ কুরআনে নাকি পৃথিবীকে সমতল হিসেবে বিবেচনা করেছে। মুসলিমরা এই প্রশ্নের ফাঁদে পড়ে বিভ্রান্ত হয়। নেটেও এ প্রসঙ্গে তেমন কোন লেখা পাওয়া যায় না। আজকে তাদের এই ছবির কেসগুলো পয়েন্ট বাই পয়েন্ট আলোচনা করবো ইনশাল্লাহ্। তবে তার আগে কিবলা নিয়ে কিছু কথা বলা জরুরি মনে করছি।

.

◑ কেন কা'বা'র দিকে মুখ করে সালাত পড়তে হবে?

.

যদি মুসলিমদেরকে কোনো এক বিশেষ দিক ঠিক করে না দেওয়া হয়, তাহলে কোনদিকে মুখ করে জামাতে দাঁড়াবে, তা নিয়ে মুসলিমদের মধ্যে ঝগড়া লেগে যাবে। কেউ বলবে স্মৃতি সৌধের দিকে, কেউ বলবে শহীদ মিনারের দিকে।
যেখানে জামাতে দাঁড়ানোর সময় লাইনের আগে না পরে পা দিয়ে দাঁড়াবো, এই নিয়েই অনেক সময় তর্ক শুরু হয়ে যায়, সেখানে যদি কিবলা ঠিক করে না দেওয়া হতো, তাহলে কোনদিকে মুখ করে মসজিদ বানানো হবে, তারপর সেই মসজিদে কোনদিকে মুখ করে জামাত হবে, সেটা নিয়ে দলাদলি, হাতাহাতি লেগে যেত।
অনেক বছর কষ্ট করে তৈরি করা ঐক্য ভেঙ্গে যেতে একদিনের ঝগড়াই যথেষ্ট। একারণেই মুসলিমদেরকে কিছু ব্যাপার, যা তাদের মধ্যে ঐক্য ধরে রাখার জন্য জরুরি, সেগুলো আল্লাহ নিজে নির্ধারণ করে দিয়েছেন, যেন এগুলো নিয়ে তর্ক করার কোনো সুযোগই না থাকে। [১] আর এজন্যই আমাদের কা'বামুখী হয়ে সালাত আদায় করতে হয়। এটা শুধু আমাদের ইবাদাতের জন্য দিক নির্দেশক, আর কিছু নয়।

.

◑ মুসলিমরা কি কা'বার সামনে মাথা নত করে?

.

মুসলিমরা কা'বার সামনে নয়, বরং কা'বার দিকে মুখ করে সালাতের অংশ হিসেবে আল্লাহর প্রতি মাথা নত করে। কা'বার কাছাকাছি গেলে কা'বা সামনে চলে আসবেই। কা'বার কাছে গিয়ে মানুষ নিশ্চয়ই অন্য কিছুর দিকে মুখ করে সালাত পড়বে না? এখন প্রশ্ন আসে, তাহলে মুসলিমরা হাজ্জ করতে কা'বার কাছে যায় কেন? তাও আবার কা'বাকে ঘিরেই ঘুরপাক খায়। এটাকে কি হিন্দুদের মতো এক বিশেষ মূর্তিকে ঘিরে ঘুরপাক খাওয়ার মতো হলো না?
প্রায় প্রতিটি ধর্মেই বিশেষ একটি জায়গা আছে যেখানে সারা পৃথিবী থেকে ধর্মপ্রাণ অনুসারীরা এসে একসাথে হন। এটা তাদের একতার প্রকাশ। এরকম একটি বিশেষ জায়গায় একসাথে হওয়াটা এটাই দেখিয়ে দেয় যে, সেই ধর্মের অনুসারীরা কোনো দেশ, জাতীয়তাবাদ, গায়ের রঙ, সমাজে স্ট্যাটাস, সম্পত্তি কোনো কিছুর পরোয়া করেন না। তাদের ধর্ম এসবের ঊর্ধ্বে। তারা নিজেদের মধ্যে সব ভেদাভেদ ভুলে গিয়ে, একই জায়গায় একসাথে হয়ে, একই কাপড়ে, একইভাবে প্রার্থনা করেন। হাজ্জ মুসলিম জাতির এই অসাধারণ ঐক্য এবং সমতার নিদর্শন।

.

কা'বার পাশে ঘুরপাক খাওয়ায়টা বৈজ্ঞানিকভাবেই একটি চমৎকার পদ্ধতি। হাজার হাজার মানুষ যদি সোজা কা'বার দিকে হেঁটে যেত এবং তারপর সোজা হেঁটে ফেরত আসতো, তাহলে বিরাট বিশৃঙ্খলা, ধাক্কাধাক্কি লেগে যেত। কারো আর পুরো কা'বা একবারও ঘুরে দেখা হতো না। এর থেকে ট্রাফিক পরিচালনা করার জন্য ভালো পদ্ধতি হচ্ছে কোনো কিছুকে ঘিরে ট্রাফিক

ঘুরতে থাকা, বাইরের থেকে ঘুরতে ঘুরতে ঢোকা এবং ঘুরতে ঘুরতেই বেরিয়ে যাওয়া।

.

এই পদ্ধতিটি এতই কার্যকর যে, ইংল্যান্ডে রাস্তার মোড়গুলোতে যেন ট্রাফিক জ্যাম না হয়, সেজন্য রাউন্ডএবাউট (Roundabout) বলে একটা ব্যবস্থা আছে। [২] রাস্তার মোড়ে গোলাকার একটা স্থাপনা থাকে। চারপাশ থেকে গাড়ি এসে সেই গোলাকার স্থাপনার চারিদিকে ঘুরতে থাকে। তারা ঘুরতে ঘুরতেই ঢোকে, তারপর ঘুরতে ঘুরতেই বেরিয়ে যায়। এভাবে গাড়ি নিয়ে যে কোনো রাস্তা থেকে প্রবেশ করে, যেকোনো রাস্তা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া যায়। রাস্তার মোড়ে কোনো ট্রাফিক লাইট দরকার হয় না। গাড়িগুলোকে অযথা দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না। ট্রাফিক লাইট ব্যবহার না করে রাস্তার মোড়ে এই অভিনব পদ্ধতির কারণে রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম দূর করা যায়, সংঘর্ষ এড়ানো যায়, রাস্তার মোড়ে এসে গাড়িগুলোকে অনেক কম সময় অপেক্ষা করতে হয়, যখন চালকরা রাস্তার নিয়ম মেনে ভদ্রলোকের মতো গাড়ি চালান। কা'বার চারপাশে ঘোরার অবিকল এই একই পদ্ধতি আজকে ইংল্যান্ডে হাজার হাজার রাস্তার মোড়ে ব্যবহার হচ্ছে।

হাজ্জের আরেকটি রাজনৈতিক গুরুত্ব রয়েছে। সম্প্রতি বছরগুলোতে ২০-৩০ লক্ষ হাজি হাজ্জ করতে যাচ্ছেন। এটা দেখিয়ে দেয় যে, মুসলিমরা কোনো ছোটখাটো, দুর্বল জাতি নয়। লক্ষ লক্ষ ধনী মুসলিম পৃথিবীতে আছে, যাদের হাজ্জ করার খরচ বহন করার সামর্থ্য আছে। ২০-৩০ লক্ষ মানুষ একসাথে হওয়া বিরাট ঐক্যের নিদর্শন। হাজিরা যখন সারা পৃথিবী থেকে হাজ্জে যান, বিভিন্ন দেশের বিমান-বন্দর, নৌবন্দর, এয়ারলাইন, নিরাপত্তা কর্মীদের মধ্যে সরগরম পড়ে যায়। লক্ষ অমুসলিম মুসলিমদের এই বিরাট উৎসব সম্পর্কে সচেতন হয়ে যায়। এই বিরাট ঘটনাটা অমুসলিম রাজনীতিবিদরা খুব ভালো করে লক্ষ্য করে।

.

'মুসলিমরা কা'বার পূজা করে' —অমুসলিমদের কা'বা সম্পর্কে এই ভুল ধারণার একটি বড় কারণ কিছু মুসলিমের কা'বার কাছে গিয়ে করা কাজকর্ম। হাজ্জের সম্প্রচারে দেখা যায়, কিছু মুসলিম মরিয়া হয়ে কা'বা ধরছে, কা'বার সাথে ঘষাঘষি করছে, কা'বার পাথরে চুমু খাওয়ার জন্য হাতাহাতি করছে। এগুলো দেখে যে কারো মনে হতে পারে যে, কা'বা হচ্ছে এক মহান পূজার বস্তু এবং মুসলিমরা আসলে কা'বার পূজা করে।

.

মুসলিমরা কোনোভাবেই কা'বার পূজা করে না। রাসূল (সা) পাথরে চুমু খেয়েছিলেন বিধায় আমরা মুসলিমরা তাতে চুমু খাই। হজরত উমার (রা)-এর একটা কথা এই ক্ষেত্রে বলা যায়- "সন্দেহ নেই তুমি শুধুই একটা পাথর, তোমার কারো উপকার বা অপকার কোনটাই করার সামর্থ্য নেই। আমি যদি আল্লাহর নবীকে তোমাকে চুম্বন দিতে না দেখতাম তাহলে আমিও চুম্বন করতাম না।"(সহীহ বুখারী, বুক ২, ভলিউম ২৬:৬৬৭)। এ থেকেই বুঝা যায় আমরা কা'বা ঘর বা হাজরে আসওয়াদের (পাথর) পূজা করি না। তাছাড়া মক্কা বিজয়ের পর বিলাল (রা) কা'বার উপরে উঠে আযান দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) কিন্তু তাকে এজন্য কোন তিরষ্কার করেননি। কা'বা মুসলিমদের উপাসনার বস্তু হয়ে থাকলে রাসূল (সা) কখনোই কাবার উপরে উঠে আযান দেয়ার অনুমতি দিতেন না। [৩] আর হাজ্জের সময় যে ভিড় থাকে তাতে এই কা'বার পাথরে চুমু খেতে যেয়ে কিছুটা হাতাহাতির মত পরিস্থিতি হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু এর মানে এই না যে মুসলিমরা কা'বার পূজা করছে।

.

◑ কুরআন কি পৃথিবীকে সমতল বলছে?

.

কুরআনের কোথাও পৃথিবীর আকারকে সমতল বলা হয়নি। কেউ অকাট্য যুক্তি-প্রমাণের সাহায্যে কুরআনের পৃথিবীকে সমতল বানাতে পারবেন না। কুরআনে পৃথিবীর আকারকে যে সমতল বলা হয় নি, বরং গোলাকারের (স্ফেরিক্যাল) দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে- সে ব্যাপারে সামান্য আলোচনা করছি।

.

※ ১ম প্রমাণ: সূরা ইন্শিক্বাক্বের ৩ নম্বর আয়াত দেখুন- "আর যখন পৃথিবীকে সমতল করা হবে।" (৮৪:৩)
'যখন সমতল করা হবে...' অর্থাৎ এখনই সমতল না। যদি আল্লাহ্ পৃথিবীকে সমতলই বলতেন, তাহলে আবার সমতল করার

কথা বলবেন কেন? এই আয়াত থেকেই স্পষ্ট বুঝা যায়, কুরআনে পৃথিবীকে সমতল বলা হয় নি। যদি এখানে মসৃণ সমতলের কথা বলা হত তা হলে আল্লাহ্ পরের আয়াতে এটি উল্লেখ করতেন না- "আর তার ভেতরে যা-কিছু রয়েছে তা নিক্ষেপ করবে এবং শূন্যগর্ভ হবে।" (৮৪:৪) এখানে মসৃণ সমতল নয়- একেবারে অরিজিন সমতল। যদি মসৃণ সমতলের কথা বলতেন, তাহলে পৃথিবীর উপরিভাগের কথা বলতেন। কিন্তু পুরো সূরাতে আল্লাহ্ কোথাও উপরি-অংশ বা উপরিভাগের কথা উল্লেখ করেন নি।

.

※ ২য় প্রমাণ: "তিনি রাত্রি দ্বারা দিনকে আচ্ছাদিত করেন এবং রাত্রিকে আচ্ছাদিত করেন দিন দ্বারা।" (সূরা আয-যুমার ৩৯:৫) উপরের আয়াতটিতে যে আরবি শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটি হলো "يُكَوِّرُ"। যার অর্থ কোন জিনিসকে প্যাঁচানো বা জড়ানো, যেমনটা মাথার পাগড়ির ক্ষেত্রে বুঝানো হয়। অবিরত প্যাঁচানোর পদ্ধতি- যাতে এক অংশ আরেক অংশের ভেতর ঢুকে যাচ্ছে। আমরা ভালোভাবেই জানি, পাগড়ি কিভাবে গোলাকারভাবে প্যাঁচানো হয়। এই আয়াতে বলা হচ্ছে, রাত ধীরে ধীরে ক্রমশ দিনে রূপান্তরিত হয়, অনুরূপভাবে দিনও ধীরে ধীরে রাতে রূপান্তরিত হয়। এ ঘটনা কেবল পৃথিবী গোলাকার হলেই ঘটতে পারে। পৃথিবী যদি চ্যাপ্টা বা সমতলভূমি হত, তাহলে রাত্রি থেকে দিনে এবং দিন থেকে রাত্রিতে একটা আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে যেত।

.

এছাড়া দেখুন আরও দুইটা আয়াত-
"আল্লাহ দিন ও রাত্রির পরিবর্তন ঘটান। এতে 'অর্ন্তদৃষ্টি-সম্পন্নগণের' জন্যে চিন্তার উপকরণ রয়েছে।" (সূরা নূর ২৪:৪৪)
"নিশ্চয়ই মহাকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে এবং 'রাত ও দিনের আবর্তনে বিশেষ নিদর্শন রয়েছে' জ্ঞানবান লোকদের জন্য।" (সূরা আলি ইমরান ৩:১৯০)

.

আল্লাহ্ কেন বললেন অন্তর্দৃষ্টির কথা? কেন বললেন না বাহ্যিক দৃষ্টির কথা? আমরা বাহ্যিকভাবে দেখি, সূর্য উদিত হয় বা অস্ত যায়। আসলেই কি তাই? 'রাত ও দিনের আবর্তনে বিশেষ নিদর্শন রয়েছে'- কি এমন 'বিশেষ' জিনিস রয়েছে যাতে আমাদের অন্তর্দৃষ্টি দিতে হবে? অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার আর পাগড়ির মত প্যাঁচানোর কথা বলে এখানে ইঙ্গিতে পৃথিবীর স্ফেরিক্যাল শেপ এবং ঘূর্ণায়মানতার কথা বলা হয়েছে।

.

※৩য় প্রমাণ: "তিনি দুই পূর্বের প্রভু, আর দুই পশ্চিমেরও প্রভু।" (সূরা রাহমান ৫৫:১৭)
কুরআনে যদি পৃথিবীকে সমতলই বলা হত- তাহলে দুইবার পূর্ব আর দুইবার পশ্চিমের কথা বলা হল কেন? পৃথিবী যদি সমতল হত তাহলে সমগ্র পৃথিবীতে সূর্যের উদয় ও অস্ত একবার করে হত। কিন্তু পৃথিবী গোলাকার হওয়ায় এমনটা হয় না। কারণ আপনি যখন দেখছেন সূর্য উঠছে, তখন আসলে অন্য জায়গায় সূর্য ডুবছে। আর যখন দেখছেন সূর্য ডুবছে, তখন আসলে অন্য অবস্থানে সূর্য উঠছে (প্রকৃতপক্ষে সূর্য অস্ত বা উদয় কোনোটাই হয় না। বুঝানোর সুবিধার্থে এভাবে বললাম)। মোট দুইটা পূর্ব, দুইটা পশ্চিম। বিষয়টা আসলে আরও অনেক গভীর এবং আলোচনার বিষয়। জায়গার অভাবে এই মুহূর্তে সেদিকে আর যাচ্ছি না।

.

※ ৪র্থ প্রমাণ: পৃথিবীর আকার যে গোলাকার- এ ব্যাপারে ইসলামিক স্কলারদের অসংখ্য ফতওয়া রয়েছে। এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবনে তাইয়িম্যার ফতওয়া রয়েছে। [৪] গত শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ ইসলামিক স্কলার শাইখ আব্দুল আজিজ ইবন বাযেরও এই ব্যাপারে ফতওয়া রয়েছে [৫] এছাড়াও আপনি দেখতে পারেন IslamQA-র ফতওয়া। [৬] আরও দেখতে পারেন IslamWeb-এর ফতওয়া। [৭]
'পৃথিবী সমতল' - এই ভুল ধারণা কোনকালেই মুসলিমদের মধ্য ছিল না। তবে ইউরোপীয় খ্রিষ্টানদের মধ্যে ছিল (বাইবেলবিশ্বাসী মৌলবাদী খ্রিষ্টানদের মধ্যে আজও আছে)। সেই প্রাচীনকালে ইসলামের স্বর্ণযুগে ইউরোপে কেউ যদি বলত

"পৃথিবী গোল", তাকে বাইবেল অবিশ্বাসের দায়ে আগুনে পুড়িয়ে মারা হত। মুসলিমরাই সর্বপ্রথম spherical trigonometry-র বিকাশ সাধন করে। [৮] এগারো শতকে মুসলিম গণিতবিদ আল বিরুনী spherical trigonometry ব্যবহার করে যেকোনো জায়গা থেকে কা'বা ঘরের দিক নির্ণয়ের পদ্ধতি বের করেন। [৯] এছাড়াও ভূপৃষ্ঠের যে কোন পয়েন্ট থেকে কিবলার দিক নির্ণয়ের জন্য মুসা আল খোয়ারিজমী, আল বাত্তানী, ইবনে ইউনুস, ইবনে আল হাইসাম, নাসিরুদ্দিন আল তুসীসহ প্রমুখ মুসলিম বিজ্ঞানীদের অবদান ছিল। [১০] এদের কেউই কিন্তু বর্তমান সময়ের না। এখনও কি আপনার মনে হয় মুসলিমরা পৃথিবীকে সমতল ভাবত?

.

◑ কিবলা নিয়ে যাবতীয় বিভ্রান্তির অবসান:

.

কিবলা আসলে কোন দিকে হবে- এটা বের করার বেশ কিছু পদ্ধতি আছে। আমি সেদিকে যাবো না। শুধু main concept-টা জেনে রাখুন- যে দিক দিয়ে কা'বা সবচেয়ে কাছে সেটাই আপনার কিবলা। পৃথিবী গোলাকার বিধায় (পুরোপুরি গোল না), কোন একটা নির্দিষ্ট পয়েন্ট থেকে বিভিন্ন উপায়ে আপনি কা'বায় যেতে পারবেন। কিন্তু এদের মধ্যে সর্বনিম্ন দূরত্ব যে দিকে সেটাই হবে আপনার কাঙ্খিত কিবলা। কয়েকটা complicated উদাহরণ দেখা যাক।
☞ [১ম কমেন্টে দেখুন চিত্রঃ ১]

.

কাবাকে কেন্দ্র করে পৃথিবীর মানচিত্র এটি আর গোলাকার হবার কারণে উত্তর আমেরিকার অবস্থান কাবার সাপেক্ষে বাস্তবে কিভাবে সেটা দেখুন। এখন কিন্তু কিবলা আর দক্ষিণ-পূর্ব দিকে নেই। কিবলা এখন উত্তর বা উত্তর-পূর্ব দিকে হয়ে গেছে। মনে হয় যে কিবলা দক্ষিণ-পূর্ব দিকে কিন্তু বাস্তবে সেটা উলটে যায়, হয়ে যায় উত্তর পূর্ব দিকে। ভৌগলিক দিকগুলো দেখিয়ে দেয়া হয়েছে এখানে তাই সমস্যা হবার কথা না। আলাস্কা থেকে কাবা বরাবর সরলরেখা টানুন সেটা আপনাকে ভৌগলিক উত্তর দেখাবে তার মানে আলাস্কার কিবলা উত্তর দিকে। আবার কানাডা আর আমেরিকার উত্তর দিকে উত্তর-পূর্ব বরাবর হয়। এই ম্যাপ দিয়েও আসলে ১০০% পরিস্কার ধারনা পাওয়া সম্ভব না কারন এটা তিন মাত্রার ব্যাপার আর ২ মাত্রায় তাকে দেখানো পুরোপুরি সম্ভব না।

.

তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়। পৃথিবী যদি গোলাকার হয় তাহলে তো পূর্ব দিক দিয়েও যেখানে যাওয়া যাবে, পশ্চিম দিক দিয়েও সেখানে যাওয়া যাবে। যেমন USA থেকে পশ্চিম দিকে এশিয়া হয়ে ইউরোপ যাওয়া যাবে আবার পূর্ব দিকে সরাসরি ইউরোপ হয়েও যাওয়া যাবে। অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে আমি পূর্ব বা পশ্চিম যেদিকেই মুখ ফিরাই না কেন কিবলার দিকেই থাকবে। কিন্তু মুখ ফেরানো থাকলেই হবে না। USA থেকে ইউরোপ যাত্রার ক্ষেত্রে পূর্ব দিকেই যাওয়া হয় কারন সেদিকে গেলে কম দূরত্ব যেতে হবে। কিবলার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। ঐ যে একটু আগে বললাম যেদিকে মুখ ফেরালে কা'বা ও আপনার বর্তমান দূরত্ব থাকে সবচেয়ে কম সেদিকেই মুখ ফেরাতে হবে।

.

যদি মেরুতে থাকি তাহলে কোন দিকে মুখ ফেরাতে হবে? উত্তর মেরুতে গেলে সব দিকেই দক্ষিণ আবার দক্ষিণ মেরুতে গেলে সবদিকেই উত্তর। এবার আরেকবার ম্যাপটি দেখুন। সেখান থেকে কি বোঝা যায় না কোন দিকে মুখ ফেরাতে হবে? উত্তর মেরুবিন্দুতে যখন থাকবেন তখন কোন দিকের খোঁজ করা বোকামি। আপনাকে দেখতে হবে কোন দিক থেকে কা'বা সবচেয়ে কাছে, সেটাই আপনার কিবলা। সব দিকে দিয়েই আপনি যেতে পারবেন কা'বায় কিন্তু দিকের সাথে সর্বনিম্ন দূরত্বের ব্যাপারটাও বলেছি। মেরুতে সাধারন কম্পাস কাজ করবে না। সেখানে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে Gyro compass (চুম্বকবিহীন একধরনের কম্পাস) [১১] এবং তারার অবস্থান হিসাব করে কিবলা ঠিক করতে হবে। একই নিয়ম দক্ষিণ মেরুর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

.

আরেকটা ব্যাপার। অনেকেই গাড়ি, বাস বা ট্রেনে নামাজ পড়েন। তারা কি করবেন? রাস্তা তো আঁকাবাঁকা। এ ক্ষেত্রে নামাজ শুরুর সময়কার কিবলা ঠিক রাখলেই হবে। নামাজরত অবস্থায় কিবলা পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে রাস্তার কারণে সেটা নিয়ে চিন্তা করার দরকার নাই। আর আজকাল অনেক অ্যাপ্লিকেশান/ সফটওয়্যার আছে যা দিয়ে সহজেই কিবলার দিক বের করা যায়। তবে যদি একেবারেই সম্ভব না হয়, তাহলে সুবিধামত যে কোন দিকে ফিরে পড়লেই সালাত আদায় হয়ে যাবে। [১৪]
এবার আসি wikiislam-এর বিখ্যাত সেই বিভ্রান্তিকর ছবি প্রসঙ্গে। নিচের ছবিটাই হল সেই বিভ্রান্তিকর ছবি-
☞ [২য় কমেন্টে দেখুন চিত্রঃ ২]

.

❑ কেস ১: তাদের দাবি- যেহেতু পৃথিবী গোলাকার তাই একেবারে কা'বার কাছাকাছি ছাড়া যে কোন পয়েন্ট থেকে কিবলার দিকে মুখ করার অর্থ আকাশের দিকে মুখ করা! নাস্তিক ভাইদের কাছে তাহলে একটা প্রশ্ন করি। আমাদের দেশ থেকে আমেরিকা আসলে কোন দিকে? আপনি যদি বলেন পশ্চিম দিকে, তাহলে কিন্তু ভুল বলছেন। কারণ আপনি সামনের দিকে আঙ্গুল তুললে সেটা তো হবে আকাশের দিকে, কারণ পৃথিবী তো গোলাকার!! আশা করি উত্তর পেয়ে গেছেন। আমরা যে কোন direction-ই চিন্তা করি পৃথিবীর surface বরাবর, আসমান বরাবর নয়।

.

❑ কেস ২: এখানে তারা দাবি করে কা'বার একদম opposite-এ কিবলা হবে মাটির ভেতর থেকে নিচে। তাদের এই দাবির সাথে আরেকটু যোগ করি। শুধু একদম বিপরীত পাশে না, আরও অনেক জায়গা থেকেই কিবলা মাটির দিক থেকে নিচে। 'প্রকৃতপক্ষে' কা'বামুখী হতে হলে বাংলাদেশের মানুষদের আকাশের দিকে পা তুলে মাটির দিকে মুখ করতে হবে। এটা একটা উদ্ভট ও অসম্ভব ব্যাপার। আল্লাহ্ কারও সাধ্যের অতিরিক্ত কিছু চাপান না এবং মানুষকে অদ্ভুতভাবে কষ্ট দেওয়াও আল্লাহর মর্জি না। বরং আল্লাহ্ মানুষের অন্তর দেখেন এবং তার সাধ্যের ভিতরে কাজ দেন। এ কারণে কা'বামুখী হবার জন্য নিকটতম রৈখিক দিকে (যেমন- বাংলাদেশ থেকে পশ্চিমে) মুখ করতে হয়। বোধসম্পন্নরা এখানে আল্লাহর অনুগ্রহ খুঁজে পায় এবং বক্রহৃদয়ের লোকেরা এখান থেকে আল্লাহ্ কিংবা রাসূল (সা)-এর ভুল খুঁজে পায়।

.

❑ কেস ৩: এই ছবিতে তাদের দাবি যেহেতু পৃথিবী গোলাকার, সেহেতু কা'বার দিকে মুখ ফেরার অর্থ হল একদিক থেকে কা'বাকে পশ্চাৎদেশ দেখানো! একই কথা কিন্তু আমাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেউ যদি আপনার পেছন দিকে থাকে, তার অর্থ সে ঘুরে এসে আসলে আপনাকে পশ্চাৎদেশ দেখাচ্ছে! কি অদ্ভুত যুক্তি! এবার তাদের যুক্তি খণ্ডন করি। কা'বা ঘরের সাথে যদি আপনার সামনাসামনি কোন যোগাযোগ না থাকে বা সামনে কোন পর্দা বা অন্তরায় থাকে তাহলে আপনি কা'বার দিকে ফিরে যে কোন কিছুই করতে পারবেন। দেখুন IslamQA-র ফতওয়া। [১২]

.

❑ কেস ৪: সর্বশেষ চিত্রটা হল কা'বার antipode নিয়ে (কোন কিছুর একদম opposite-কে antipode বলে)। এখানে নাকি সবদিক সমান, তাই কা'বামুখী হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোন দিক নাই। এইখানে এসে আমরা যে ব্যাপারটা ভুলে যাই তা হল The antipode also has an antipode. কা'বা ঘরের ভেতর যে কোন দিকে মুখ করেই সালাত আদায় করা যায়। আর সেই কা'বার antipode-এ যে কোন দিকে মুখ করে নামায আদায় করতে দোষ কি? দাঁড়ান, এখনও কথা শেষ হয় নি। প্রকৃতপক্ষে কা'বার antipode-এ কোন land area নেই। নিচের চিত্রটা দেখুন-
☞ [৩য় কমেন্টে দেখুন চিত্রঃ ৩]

.

এটা অবস্থিত প্রশান্ত মহাসাগরে, পলিনেশিয়া এরিয়ার ভেতর। কেউ যদি প্লেনে বা জাহাজেও থাকে, তাহলে তো চোখের নিমেষেই পার হয়ে যাবে। আর এই পয়েন্ট ছেড়ে গেলেই তো আবার সর্বনিম্ন দূরত্বের সাধারণ নিয়ম প্রযোজ্য হবে। তারপরেও যদি কেউ কোনভাবে exact এখানে অবস্থান করতে পারে, তাহলেও তার জন্য অসংখ্য direction থাকে না, কারণ পৃথিবী পুরোপুরি গোলাকার না। আর এজন্য সর্বনিম্ন দূরত্ব হিসাব করলে তার কাছে দুইটা direction থাকে, উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-

পূর্ব। আর এই antipode থেকে নিকটতম land area হল Tematagi. [১৩] আর এই নিকটতম স্থলভাগ যেহেতু উত্তর-পশ্চিম direction অনুসরণ করে, তাই সবথেকে ভাল হয় উত্তর-পশ্চিম দিকে ফিরে সালাত আদায় করা। আর যদি কোনভাবেই কিবলা চিহ্নিত করা না যায় (যে কোন ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য), তাহলেও কোন সমস্যা নাই। তখন যে কোন দিকে ফিরে নামায পড়লেই হবে। এই ব্যাপারে IslamQA-র ফতওয়া আছে। [১৪]

.

এবার সর্বশেষ যে প্রশ্নটি আপনারা করতে পারেন সেটার উত্তরও দিবো ইনশাল্লাহ্। ISS (International Space Station)-এ অবস্থানকারী কোন মহাকাশচারী যদি নামাজ পড়তে চান তাহলে তিনি কিভাবে পড়বেন- এটাই তো? এই ব্যাপারে সিদ্ধান্তের জন্য ২০০৬ সালে মালয়শিয়ান ন্যাশনাল স্পেস এজেন্সি একটি কনফারেন্সের আয়োজন করে বিজ্ঞানী ও ধর্মীয় স্কলারদের নিয়ে।[১৫] এই কনফেরেন্সে সিদ্ধান্ত হয় মহাকাশচারী তার ক্ষমতা অনুযায়ী কিবলা নির্ধারণ করবে। সেটা চারটা স্টেপে প্রাধান্য পাবে। ১. কাবার দিকে মুখ করে ২. কাবার প্রজেকশনের দিকে মুখ করে ৩. পৃথিবীর দিকে মুখ করে ৪. সুবিধামত যে কোন দিকে মুখ করে। কিন্তু তবুও একটা সমস্যা থেকে যায়, ধরা যাক পৃথিবীর দিকে মুখ করেই নামাজ শুরু করল। কিন্তু ঘূর্ণনের কারনে নামাজের মধ্যেই মুখ অন্য দিকে হয়ে যেতে পারে, তখন? গাড়ি বা ট্রেনে চলার সময়ের মত এখানেও শুরুতে কিবলা ঠিক করে নিলেই হবে, পরে পরিবর্তন হলেও কোন সমস্যা নেই।

.

আশা করি কিবলা নিয়ে আপনাদের বিভ্রান্তি দূর হয়েছে। আল্লাহ্ আমাদের সঠিক পথে থাকার এবং গভীরভাবে চিন্তা করার তাওফিক দান করুক।

তথ্যসূত্র:

[১] মা'রিফুল কু'রআন — মুফতি শাফি উসমানী।

[২] https://en.wikipedia.org/wiki/Roundabout

[৩] আর রাহীকুল মাখতুম

[৪] Majmû` al-Fatâwâ (5/150), Majmû` al-Fatâwâ (6/546-567)

[৫] http://www.binbaz.org.sa/noor/9167

[৬] https://islamqa.info/en/118698, https://islamqa.info/en/211655

[৭] http://www.islamweb.net/emainpage/index.php...

[৮] David A. King, Astronomy in the Service of Islam, (Aldershot (U.K.): Variorum), 1993.

[৯] The Determination of the Co-ordinates of Cities. See Lyons, 2009, p85

[১০] Moussa, Ali (2011). "Mathematical Methods in Abū al-Wafāʾ's Almagest and the Qibla Determinations". Arabic Sciences and Philosophy (Cambridge University Press)

[১১] https://en.wikipedia.org/wiki/Gyrocompass

[১২] https://islamqa.info/en/69808

[১৩] https://en.wikipedia.org/wiki/Tematagi#Antipode_of_Mecca

[১৪] https://islamqa.info/en/148900, https://islamqa.info/en/65853

[১৫] https://en.wikipedia.org/w.../National_Space_Agency_(Malaysia)

http://www.moonsighting.com/faq_qd.html

১১২

কুরআনে আল্লাহর নামের ক্ষেত্রে কি আসলেই ব্যকরণগত ভুল আছে?

-হোসাইন শাকিল

#নাস্তিক_প্রশ্ন: কুরআন আল্লাহর পাঠানো বানী হলে তাতে সর্বদা থাকবে পুরুষবাচক শব্দ(যেমন Quran 2:38) কিন্তু কুরান জুড়েই রয়েছে তিনি/যিনি/তার/

আমরা/আল্লাহ(নিজের নাম) ইত্যাদি সহস্র ব্যাকরনগত ভুল(Quran 1:1-7, 2:7-10. 26-29,31, 33.... 3:2-9, 18-21, 32-34, 40-41, 50-55, 62-63, 70, 73-74..... 4:1,5,11-15,17,

19-26,29,32,34,36..... 5:7-8,11-12,47,

51,54-56..... ইত্যাদি)! এ থেকে কি এটাই প্রতিয়মান হয় না যে কুরান নিরক্ষর মুহম্মদের নিজের মুখের কথা?

.

#উত্তরঃ প্রথমেই কুরআনের আল্লাহর নিজের ক্ষেত্রে বহুবচন ব্যবহার নিয়ে আলোচনা করা হবে।

.

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ٱلذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُۥ لَحَـٰفِظُونَ

.

আমি স্বয়ং এ উপদেশ গ্রন্থ অবতারণ করেছি এবং আমি নিজেই এর সংরক্ষক। (সূরা হিজর ১৫ঃ৯)

.

এছাড়া ও আল্লাহ কুরআনের বহু স্থানেই নিজেকে আমরা বলে সম্বোধিত করেছেন। তাই এটি আল্লাহর একত্ববাদের সাথে সাংঘর্ষিক হওয়ায় এটি কুরআনের ব্যাকরণগত ভুল!!!(নাউযুবিল্লাহ)

.

এটা এমন এক তথাকথিত ভুল যা সেইসময়কার কাফির যারা বর্তমানের বঙ্গদেশীয় অভিযোগকারীদের থেকে অনেক বেশি আরবী ভাষা, তার কাব্য ও রীতি-নীতি সম্পর্কে অধিক অবগত ছিলো তারা ধরতে না পারলেও বঙ্গদেশীয় ভাঙ্গাআরবি ভাষাবিদরা ঠিকই ধরে ফেলেছেন!!! সুবহানআল্লাহ!!!

.

মূল আলোচনায় প্রবেশ করা যাক;

.

একজন কখনো কখনো নিজেকে বহুবচন রুপে ভাষায় প্রকাশ করতে পারে এটি আরবি ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য, শুধুমাত্র আরবি নয় বরং ইংরেজী, ল্যাটিন, জার্মান, হিন্দী, উর্দু সহ অন্যান্য ভাষাতেও এই রীতি লক্ষ্য করা যায়।

.

ইংরেজী ভাষায় একে "রয়্যাল উই" Royal We বলা হয়ে থাকে।(https://en.m.wikipedia.org/wiki/Royal_we)

.

ল্যাটিন ভাষায় একে "প্লুরালিস ম্যাজেসটাটিস" "Pluralis Mejestatis" বলা হয়ে থাকে।

.

একে হিন্দী(हम) ও উর্দু (ہم) ভাষায় 'হাম' বলা হয়ে থাকে।

.

চীনা ভাষায় এই মর্যাদাজ্ঞাপক বহুবচন এই চিহ্ন (朕) দ্বারা প্রকাশ করা হত।

.

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, এই মর্যাদাজ্ঞাপক বহুবচন ব্যবহার কখনোই কোনো ভাষার ত্রূটি নয় বরং তা নির্দিষ্ট ভাষার ক্ষেত্রে অতীব স্বাভাবিক, তবে কুরআনের বেলায় ত্রূটি বলা, এমন দ্বিমুখী নীতি কেন???

.

আরবী ভাষাতেও মর্যাদাজ্ঞাপক বহুবচনের ব্যবহার আছে যাকে আরবী ভাষায় একে "যমীরুল আযমাহ" (ضمير العظمة) বা মহিমাজ্ঞাপক সম্বন্ধ বা সর্বনাম বলা হয়ে থাকে। আরবী ভাষাবিদগন একে সরাসরি বহুবচন না বলে মহিমাজ্ঞাপক একবচনের সর্বনাম বলে থাকেন। এই ধরনের সর্বনামকে তারা উপরোক্ত নামে ও পরিচয় (نون العظمة، ضمير المتكلم المعظم نفسه، ضمير المتكلم الواحد المطاع، لفظ المتكلم المطاع)

.

বাংলা ভাষায় এই নীতি প্রচলিত নেই সকল ভাষার রীতি-নীতি এক রকম নয়, যেমন বাংলা ভাষায় ক্রিয়াপদ ও সর্বনাম প্রকাশে সাধারন, তুচ্ছতাজ্ঞাপক ও গৌরববোধক পর্যায় আছে যেমনঃ তুমি চলো, তুই চল, আপনি চলুন এই প্রকাশগুলো আরবি বা ইংরেজীতে সম্ভব নয় সেখানে আরবীতে "আনতা" ও ইংরেজীতে "You" দিয়েই কাজ চালাতে হয় এইগুলো ভাষার ত্রূটি নয় বরং স্বকীয়তা।

.

এই মর্যাদাজ্ঞাপক বা রাজকীয় "আমরা" বা বহুবচন কেন ব্যবহৃত হয়?

.

উত্তর হলো এটি বক্তাপক্ষের প্রতিপত্তি বুঝানোর জন্য বা কখনো কখনো একজন যখন অনেকের পক্ষ হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে তখন এমনটা ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

.

যেমন "Royal We" এর এসেছে,

.

The use of "we" instead of "I" by an individual person, as traditionally used by a sovereign. (https://goo.gl/ghj15X)

.

হিন্দী উর্দূতে ও একই কারনে হাম (हम, ہم) ব্যবহৃত হয়ে থাকে। (https://goo.gl/meiOE6)

.

আরবি ভাষার এই দিক নিয়েই অনেক ভাষাবিদই আলোচনা করেছেন। ইমামুন নাহব রাযীউদ্দীন মুহাম্মাদ ইবনুল হাসান (মৃ- ৬৮৬হি) "আল-ওয়াফিয়া শারহে কাফিয়া" তে লিখেন,

.

" ويقول الواحد المعظم أيضا : نفعل وفعلنا، وهو مجاز عن الجمع لعدهم المعظم كالجماعة "

.

অর্থাৎ, অর্থাৎ সম্মানী ও মহান ব্যক্তি একজন হলেও বহুবচনের সর্বনাম ব্যবহার করে বলেন, نفعل বা فعلنا। এটি বহুবচনের রূপকার্থ হিসেবে ব্যবহার হয়ে থাকে। কারণ, একজন মহান ব্যক্তি একাই অনেক জনের সমষ্টিতুল্য।

.

আল্লাহ অবশ্যই সকল দিক থেকে লা-শারীক বা অংশীদারমুক্ত তবে তিনি অবশ্যই মহা সম্মান, প্রতিপত্তি, ইজ্জাহ ও জালালাতের অধিকারী আর সেই কারনেই আল্লাহর মহান প্রতিপত্তি বর্ণনা করার জন্যে বা কখনো পাঠকের মনোযোগ আকর্ষনের জন্য কুরআনে এই মহিমাজ্ঞাপক গৌরবার্থক বহুবচন ব্যবহৃত হয়েছে। এতে কালাম পরিপূর্ণ, মহিমাসম্পন্ন, সংক্ষিপ্ত ও আকর্ষনীয় হয় যা আরবি ভাষার একটি বৈশিষ্ট্য ও কুরআনের বালাগাতের (অলংকারশাস্ত্র) একটি সৌন্দর্য ও বটে, এটি মোটেও কুরআনের

ব্যাকরনগত কোনো সমস্যা নয়।

.

এই বিষয়ে বিশদে জানতে হলে মাসিক আল কাওসারের নিম্নোক্ত প্রবন্ধটি পড়া যেতে পারে আশা করি উপকারী হবে-

.

(http://www.alkawsar.com/article/1274)

.

কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ নিজের ক্ষেত্রে ১ম পুরুষ ব্যবহার না করে ৩য় পুরুষ ব্যবহার করাঃ

.

কুরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। তাই কুরআনে ভাব প্রকাশের জন্য আরবী বিভিন্ন দিকই প্রয়োজন মাফিক ব্যবহার করা হয়েছে। এটি আরবী ভাষার একটি সুপরিচিত ব্যাপার যে বক্তাকে একই ধরনের বক্তব্যে স্থির না থ মাঝে মাঝে বক্তব্যে পুরুষ (Gender) পরিবর্তন করে থাকে যাকে আরবী ব্যাকরনের ভাষায় বলা হয় "ইলতিফাত" যার অভিধানিক অর্থ কোনো দিকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়া/ ফিরিয়ে নেওয়া। অবশ্য আরবি ভাষাবিদগন বিভিন্ন নামে পরিচয় দিয়ে থাকেন যেমন "আস-সরফ" বা "ইনসিরাফ" "তালওয়ীন" "তালওয়ীনুল খিতাব" "ই'তিরাদ" ইত্যাদি। আরবি ভাষা প্রাচীন কাল থেকেই কবিতারুপে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে আরবরা যেমন কবিতা শূনতে তেমনি কবিতা লিখতে, তৈরী করতে অত্যন্ত ভালোবাসত। তো কখনো কবিতা একই পুরুষে বা একই ভাবে শুনতে শুনতে শ্রোতার যাতে বিরক্ত না আসে এই কারনে কখনো কখনো বক্তা তার ভাব বা পুরুষ পরিবর্তন করে কথা বলতে পারে যাকে "ইলতিফাত" বা ঘুরিয়ে দেওয়া বলা যেতে পারে। ইমাম বাদরুদ্দীন যারকাশী(রাহ) এই সম্পর্কে বলেন,

.

"কথার মাঝে ভাবের পরিবর্তন করা, এতে বক্তার কথাকে অধিক সূচারুরুপে উপস্থাপন করতে, শ্রোতার মনোযোগ বৃদ্ধি বা আগ্রহ বৃদ্ধির কারনে আবার কখনো একই ধরনের কথা শোনার দরুন শ্রোতামন্ডলীর বিরক্তিভাব দূর করতে সাহায্য করে"

.

[আল-বুরহান ফি উলূমিল কুরআন, ৩/৩১৪]

.

ইলতিফাত বিভিন্ন ভাবেই হতে পারে, যেমনঃ

.

(১) পুরুষে ইলতিফাত;
(২) বচনে ইলতিফাত;
(৩) খিতাব বা সম্বোধনে ইলতিফাত;
(৪) কাল বা সময়ে (Tense) ইলতিফাত;
(৫) বিশেষ্যের স্থলে বিশেষন ব্যবহার করে ইলতিফাত;

.

কুরআনে বেশির ভাগই পুরুষে (Gender) "ইলতিফাত" লক্ষ করা যায়। যেমনটি অনেকেই অভিযোগ করে থাকেন যে এটি কুরআনের ব্যাকরনগত ভুল !!!!তবে তাদের অনেকেরই আরবী সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান না থাকার কারনেই হয়ে থাকে।

.

ইলতিফাত কেন করা হয়ে থাকে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে

.

(ক) কুরআন সুস্পষ্ট আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে তাই এতে আরবির বিভিন্ন কাব্যিক ভাবই ব্যবহৃত হয়েছে। এতে কুরআন শ্রুতিমধুর হয়েছে, কুরআন বুঝতে সহজবোধ্যতা তৈরী হয়েছে।

.

(খ) কুরআন সমগ্র মানবজাতির জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে নাযিলকৃত কিতাব যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কালাম। একে আল্লাহ সেভাবেই করেছেন যেভাবে তার বান্দাদের বুঝতে সুবিধা হবে। যেমন সূরা ফাতিহায় আল্লাহ নিজেকে ৩য় পুরুষে সম্বোধন করেছেন এতে করে তার বান্দারা যখন সূরাটি পাঠ করবে এতে তারা কুরআনকে অধিক নিকটবর্তী, তাদের অন্তরের কথাগুলোই কুরআনে খুজে পাবে, অন্তরের প্রার্থনাগুলোকে তাদের ভাষায় কুরআনে খুজে পাবে;

.

(গ) কুরআন অন্যান্য বর্তমানের বিকৃত কিতাবগুলোর মত নয় বরং এটি সদাজাগ্রত একটি কিতাব একে প্রত্যহ নামাযে বা নামাযের বাইরে পাঠ করা হয়, তাই আল্লাহ প্রয়োজনমত পুরুষের পরিবর্তন করে দিয়েছেন যাতে কুরআন পাঠক পাঠ করতে পুলকিত বোধ করেন এতে ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে ও ভিন্ন আঙ্গিকে কুরআনকে বুঝতে পাঠক আগ্রহী বোধ করবেন।

.

(ঘ) এতে কুরআনের ভাবগাম্ভীর্যতা বৃদ্ধি পায়। যেমনঃ কোনো রাজা কোনো নির্দেশ প্রদানের সময় আমি না বলে "রাজা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে যে..............." এটি অধিক ভাবগাম্ভীর্যতা প্রকাশ পায় আর আল্লাহর কালাম সবচাইতে অধিক ভাবগাম্ভীর্যতার অধিকারী;

.

(ঙ) এটি আরবী ভাষার একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যা বক্তা প্রয়োজন মাফিক পরিবর্তন করতে পারেন এতে করে ভাষায় নমনীয়তা, সূক্ষ্মতা বজায় থাকে, তাছাড়া শ্রোতার মনোযোগ আকর্ষন বা বিরক্তিও দূর করে থাকে;

.

বিষয়ে বিস্তারিত পড়তে চাইলে এই প্রমানসমৃদ্ধ আর্টিকেলটি পড়া যেতে পারে-

.

http://www.islamic-awareness.org/.../Te.../Grammar/iltifaat.html

.

এইগুলো মোটেও কুরআনের সহস্র ব্যাকরনগত ভুল বা ত্রুটি নয় বরং যারা কুরআন বুঝতে চায় না তাদের জন্য কুরআন তার রহস্যের দরজা খুলে না তাই হয়ত তারা বুঝতে পারেনা, কারন তারা যে কুরআন বুঝতেই চায় না, তারা কুরআনের দিকে দৃকপাত করেই থাকে শুধুমাত্র তার ভুল অন্বেষণের জন্যেই।

১১৩

ইসলামে কি আদৌ ধর্ষণের শাস্তি বলে কিছু আছে?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্নঃ মানুষের জীবন বিধান কুরআনে ব্যাভিচারের সাজা থাকলেও 'ধর্ষণ'-এর জন্য কোন ধরণের সাজার নির্দেশ নেই (বরং আরো উৎসাহিত করে), কেন?

.

#উত্তরঃ অভিযোগকারী নাস্তিক-মুক্তমনারা বোধ হয় ভুলে গেছে যে ইসলামী শরিয়তের উৎস শুধু কুরআন না। কুরআনের পাশাপাশি সুন্নাহ, ইজমা ও কিয়াসও শরিয়তের উৎস।এসব ব্যাপারে সুস্পষ্ট দলিল রয়েছে। সুন্নাহ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে ধর্ষণের শাস্তি সাব্যস্ত হয়েছে।

.

"ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ(ﷺ)এর যুগে এক মহিলাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হলে রাসুলুল্লাহ(ﷺ) তাকে কোনরূপ শাস্তি দেননি, তবে ধর্ষণকারীকে হদ্দের শাস্তি দেন।" [১]

অনুরূপ মাতান(মূল অর্থ) এর বেশ কয়েকটি হাদিস সিহাহ সিত্তাহ গ্রন্থগুলোতে দেখা যায়।

.

লায়স (র) নাফি'(র)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, সফিয়্যাহ বিনত আবু 'উবায়দ তাকে সংবাদ দিয়েছেন যে, সরকারী মালিকানাধীন এক গোলাম গনিমতের পঞ্চমাংশে পাওয়া এক দাসীর সঙ্গে জবরদস্তি করে ব্যভিচার(ধর্ষণ) করে। তাতে তার কুমারীত্ব মুছে যায়।

'উমার (রা) উক্ত গোলামকে কশাঘাত করলেন ও নির্বাসন দিলেন। কিন্তু দাসীটিকে সে বাধ্য করেছিল বলে তাকে কশাঘাত করলেন না। [২]

.

জোরপূর্বক ব্যভিচারকে ধর্ষণ বলা হয়। ধর্ষণও এক প্রকারের ব্যভিচার। ইসলামী ফিকহ শাস্ত্রে ধর্ষণকারীর শাস্তি ব্যভিচারকারীর শাস্তির অনুরূপ। আর তা হচ্ছে—অবিবাহিত ধর্ষকের জন্য কশাঘাত(বেত্রাঘাত) এবং বিবাহিত ধর্ষকের জন্য 'রজম'(পাথর ছুড়ে মৃত্যুদণ্ড)। [৩]

ধর্ষণের অপরাধ প্রমাণের জন্য ৪ জন সাক্ষী আবশ্যক। তা না হলে অনেক সময় নিরাপরাধ ব্যক্তি শাস্তি পেতে পারেন। তবে যদি সাক্ষী না পাওয়া যায়, তাহলে ডিএনএ টেস্টের প্রমাণের দ্বারা ধর্ষককে শাস্তি দেয়া যেতে পারে। [৪]

.

এখানে অনেকেই একটি প্রশ্ন করে যে-- অববাহিত ধর্ষকের শাস্তি কি লঘু হয়ে গেল? আসলে পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিম দেশেই ইসলামী দণ্ডবিধি কার্যকর নেই, ইসলামী শাস্তির প্রয়োগ দেখে মানুষ অভ্যস্ত নয়, এ কারণেই এই প্রশ্ন। অবিবাহিত ধর্ষককে ১০০টি বেত্রাঘাত এর শাস্তি পেতে হয়। এই শাস্তি হয় প্রকাশ্যে। বেত্রাঘাত মোটেও সহজ কোন জিনিস না। এতগুলো চাবুকের আঘাত টানা হজম করা ভয়াবহ কঠিন ও কষ্টের ব্যাপার। যে এই শাস্তির শিকার হয় কেবল সে-ই এটি উপলব্ধি করতে পারে। তা ছাড়া এই শাস্তি হয় প্রকাশ্যে। হাজার হাজার লোকের সামনে এর শিকার হওয়া মানসিকভাবেও অপমানজনক। এই শাস্তি যাকে দেয়া হয় সে শারিরীক ও মানসিক উভয়ভাবেই শাস্তি লাভ করে। কাজেই এটি মোটেও সহজ বা লঘু কোন শাস্তি নয়। [৫]

.

যেহেতু এই শাস্তিগুলো প্রকাশ্যে দেয়া হয় (রজম ও বেত্রাঘাত) সমাজে এর একটা দীর্ঘস্থায়ী প্রতিক্রিয়া হয়। মানুষ প্রকাশ্যে এই শাস্তি প্রত্যক্ষ করে একটা বার্তা পায় যেঃ এই অপরাধ করলে এভাবেই প্রকাশ্যে ভয়াবহ শাস্তি পেতে হবে। শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি তো সাজা পাচ্ছেই, তার নাম-পরিচয় প্রকাশ হয়ে যাচ্ছে ফলে এটি তার পরিবারের জন্যও অপমানজনক একটি ব্যাপার। ইসলামী শরিয়তের এই হদ(শাস্তি) বাস্তবায়ন হলে সমাজ থেকে ধর্ষণ ও ব্যভিচারের মত অপরাধগুলো নির্মুল হয়ে যেতে বাধ্য।

.

ইসলামী ফিকহ শাত্র অনুযায়ী যে নারীকে ধর্ষণ করা হয় তিনি মোটেও দোষী হবেন না এবং তাকে কোন প্রকারের শাস্তি দেয়া হবে না। একজন নারীকে যদি কেউ ধর্ষণ করতে যায়, তাহলে তার পূর্ণ অধিকার আছে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করার। এই আত্মরক্ষা তার জন্য ফরয। এমনকি এ জন্য যদি কোন নারী ধর্ষণে উদ্যত ব্যক্তিকে হত্যাও করেন, তাহলেও এ জন্য তিনি দোষী গণ্য হবেন না।

.

ইমাম ইবনুল কুদামা হাম্বলী(র) এর “আল মুগনী” গ্রন্থে এসেছে-- "যে নারীকে কোন পুরুষ ভোগ করতে উদ্যত হয়েছে ইমাম আহমাদ(র) এমন নারীর ব্যাপারে বলেনঃ

"আত্মরক্ষা করতে গিয়ে সে নারী যদি তাকে মেরে ফেলে... ইমাম আহমাদ(র) বলেনঃ যদি সে নারী জানতে পারেন যে, এ ব্যক্তি তাকে উপভোগ করতে চাচ্ছে এবং আত্মরক্ষার্থে তিনি তাকে মেরে ফেলেন তাহলে সে নারীর উপর কোন দায় আসবে না। ..."

[আল মুগনী ৮/৩৩১] [৬]

.

নাস্তিক-মুক্তমনারা এরপরেও হয়তো প্রশ্ন তুলতে পারে যে – ধর্ষণের শাস্তির বিধান তো সুন্নাহ বা হাদিসে আছে; কুরআনে তো নেই! জবাবে আমরা মুসলিমরা বলবঃ ইসলামের সকল বিধি-বিধান যে কুরআনে থাকতে হবে ব্যাপারটা এমন নয়। কুরআনের বহু আয়াতে নবী মুহাম্মদ(ﷺ) এর আদর্শ তথা সুন্নাহ অনুসরনের নির্দেশ রয়েছে।

.

" যে লোক রাসুলের হুকুম মান্য করবে সে আল্লাহরই হুকুম মান্য করল। আর যে লোক বিমুখতা অবলম্বন করল, আমি আপনাকে [হে মুহাম্মদ(ﷺ)], তাদের জন্য রক্ষণাবেক্ষণকারী নিযুক্ত করে পাঠাইনি।"

(কুরআন, নিসা ৪:৮০)

.

" যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্যে রাসুলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে।"

(কুরআন, আহযাব ৩৩:২১)

.

"বলুন - যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসো, তাহলে আমাকে[মুহাম্মদ(ﷺ)] অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহ ও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদের পাপ মার্জনা করে দেন। আর আল্লাহ হলেন ক্ষমাকারী, দয়ালু।"

(কুরআন, আলি ইমরান ৩:৩১)

.

"আর রাসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক এবং আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা।"

(কুরআন, হাশর ৫৯:৭)

.

কুরআনের একটি আদেশ হচ্ছে নবী মুহাম্মদ(ﷺ) এর আদর্শ তথা সুন্নাহ অনুসরণ করা।অর্থাৎ সুন্নাহ অনুসরণ করা কুরআন অনুসরণেরই একটি ধাপ বা পর্যায়। যেহেতু কুরআন নির্দেশ দিচ্ছে সুন্নাহ অনুসরণ করার, কাজেই সুন্নাহ অনুসরণ মানেই হচ্ছে কুরআন অনুসরণ। নবী মুহাম্মদ(ﷺ) এর সাহাবীগণও ব্যাপারটা এভাবেই দেখতেন।

.

“একবার সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবন মাসউদ(রা) বললেনঃ “আল্লাহর লা’নত সে সব নারীদের উপর যারা দেহাঙ্গে উল্কি উৎকীর্ণ করে এবং যারা করায়; যারা ভ্রু চেঁছে সরু(প্লাক) করে এবং যারা সৌন্দর্যের জন্য দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে; এরা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃতকারী।”

এ কথা বনু আসাদ বংশের জনৈক মহিলা শোনে যার নাম ছিল উম্মে ইয়া’কুব। সে ইবন মাসউদের(রা) নিকট এসে বলেঃ “আমি শুনেছি আপনি অমুককে অমুককে লা’নত করেছেন?”

তিনি বললেনঃ “আমি কেন তাকে লা’নত করব না যাকে আল্লাহর রাসুল(ﷺ) লা’নত করেছেন এবং যার কথা আল্লাহর কুরআনে রয়েছে!”

সে বললঃ “আমি পূর্ণ কুরআন পড়েছি।কিন্তু আপনি যা বললেন তা তো পাইনি!”

তিনি বললেনঃ “তুমি কুরআন পড়লে অবশ্যই পেতে; তুমি কি পড়োনি--”

"আর রাসুল তোমাদেরকে যা দেন, তা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন, তা থেকে বিরত থাক...। (সুরা হাশর ৫৯:৭)

সে বললঃ “অবশ্যই।”

তিনি বললেনঃ “নিশ্চয়ই রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এসব কর্ম থেকে নিষেধ করেছেন।” [৭]

.

এ থেকে আমরা বুঝতে পারলাম যে রাসুল(ﷺ) এর সাহাবীগণ সুন্নাহতে কোন বিধান থাকলে সেটাকে কুরআনের বিধান বলেই গণ্য করতেন।

.

হাদিস তথা সুন্নাহর প্রামাণিকতা সম্পর্কে আরো বিস্তারিত দলিল-প্রমাণের জন্য ‘হাদিসের প্রামাণিকতা’ (সানাউল্লাহ নজির আহমদ) বইটি দেখা যেতে পারে। [ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://goo.gl/jFM1ZZ]

.

সুন্নাতে সাহাবা বা সাহাবী(রা)গণের আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে রাসুল(ﷺ) বলেছেন—

‘’আমি আল্লাহকে ভয় করার জন্য তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছি। আর (জেনে রাখ) তোমাদের ওপর যদি কোনো হাবশী(আবিসিনিয় নিগ্রো) গোলামকেও শাসক নিযুক্ত করা হয়, তবু তার কথা শুনবে এবং তার আনুগত্য করে চলবে। আর তোমাদের কেউ জীবিত থাকলে সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাত এবং সঠিক নির্দেশনাপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত অনুসরণ করাই হবে তোমাদের অবশ্য কর্তব্য। এ সুন্নাতকে খুব দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে এবং সমস্ত অবৈধ বিষয়কে এড়িয়ে চলবে। কেননা, প্রতিটি ‘বিদআত’ (দ্বীনী বিষয়ে নব উদ্ভাবন) হচ্ছে ভ্রষ্টতা।” [৮]

.

শরিয়তের দলিল হিসাবে সুন্নাতে সাহাবা বা সাহাবী(রা)গণের আদর্শ অনুসরণের ব্যাপারে আরো বিস্তারিত প্রমাণের জন্য খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর(র) এর ‘কুরআন-সুন্নাহর আলোকে ইসলামী আকিদা’ বইয়ের ৫৮-৬২ পৃষ্ঠা [বইটির ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://goo.gl/VNXVz2] এবং ‘এহইয়াউস সুনান’ বইয়ের ১০২-১০৭ পৃষ্ঠা [বইটির ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://goo.gl/qLxAvz] দেখা যেতে পারে।

.

এ আলোচনা থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল যে, ইসলাম ধর্ষণের ন্যায় জঘণ্য অপরাধটির ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট শাস্তির বিধান রেখেছে এমনকি এই অপরাধ নির্মূল করবার ব্যবস্থা করেছে। সুতরাং নাস্তিক-মুক্তমনাদের দাবির কোন ভিত্তি নেই।

.

তথ্যসূত্রঃ

[১] সুনান ইবন মাজাহ, পরিচ্ছেদ ১৪/৩০ {বল প্রয়োগে যাকে কিছু করতে বাধ্য করা হয়} হাদিস নং ২৫৯৮

[২] সহীহ বুখারী, অধ্যায়ঃ ৮৯ {বল প্রয়োগের মাধ্যমে বাধ্য করা (كتاب الإكراه)} হাদিস নং ৬৯৪৯

[৩] Ruling on the crime of rape – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)

https://islamqa.info/en/72338

[৪] ▪ “What is the difference between the ruling on rape and the ruling on fornication or adultery? Can rape be proven by modern methods?” – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)

https://islamqa.info/en/158282

▪ “Can we consider DNA test in case of adultary, in case of fornication(Rape) or instead of 4 witness ?” [Dr. Zakir Naik]

https://www.youtube.com/watch?v=1iqQrj4SFXU

[৫] "Description of flogging for an unmarriezd person who commits zina" – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)

https://islamqa.info/en/13233

[৬] "ধর্ষকের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য লড়াই করা কি ওয়াজিব?" – islamqa(শাইখ মুহাম্মদ সালেহ আল-মুনাজ্জিদ)

https://islamqa.info/bn/4017

[৭] সহীহ বুখারী ৪৮৮৬

[৮] আবু দাউদ ও তিরমিযী; রিয়াদুস সলিহীন :: বই ১ :: হাদিস ১৫৭

১১৪

ক্যামেরা

-তানভীর আহমেদ

Canon, Nikon আর Sony এর মত জায়ান্ট কোম্পানিগুলো নিজেদের ক্যামেরার Autofocus Sensor সবসময় আপগ্রেড করার চেষ্টায় রত থাকে। নিরলস চেষ্টা, লক্ষ মাপামাপি, প্রোগ্রামিং আর কোটি কোটি ট্রায়াল অ্যান্ড এররের মধ্য দিয়ে ক্যামেরাগুলোর Autofocus Sensor অনেক উন্নত আর দারুণ হয়ে উঠেছে।

.

আগেকার কিছু ক্যামেরায় ফোকাস করতে Sonar এর মতো প্রযুক্তি ব্যবহার হতো। একটা শব্দ যেয়ে ফিরে আসলে সেখান থেকে focal object কতদূরে রয়েছে তা ধারণা করে লেন্সের focal length বাড়িয়ে কমিয়ে ফোকাস করা হতো। এরও আগে প্রফেশনাল ক্যামেরাম্যানদের একজন সাহায্যকারী দরকার হতো যে কিনা দড়ি দিয়ে ক্যামেরা আর Focal object এর দূরত্ব মেপে ক্যামেরাম্যানকে জানাতো! আর এরপর ক্যামেরাম্যান হিসেব কষে ফোকাস করতেন। এখনকার আধুনিক ক্যামেরাগুলো Contrast, Sharpness ইত্যাদি মাপামাপি করে নিখুঁত প্রোগ্রাম করা সফটওয়্যারের মাধ্যমে ফোকাস করে থাকে।

.

কিন্তু এখনও সবচেয়ে অত্যাধুনিক ক্যামেরার Autofocus কীভাবে দক্ষতার সাথে ব্যবহার করতে হবে সেবিষয়ে Tutorial ভিডিও আসে। কোনো ক্যামেরার টাচস্ক্রিনে Focus area তে টাচ করলেই হয় তো কোনো ক্যামেয়ায় ছবি তোলার আগ মুহূর্তে বাটন দিয়ে Focus area নির্ধারণ করে দেওয়া লাগে। সাধারণত ছবির কোণায় থাকা বস্তু এত কসরত করে ফোকাস করা হয়।

.

অথচ চোখ Focusing করে আসছে শতসহস্র বছর ধরে। অন্যসব প্রাণির চোখ বাদ দিলাম, মানুষের চোখও প্রায় Instant focus করে থাকে (সেকেন্ডের ৩ ভাগের ১ ভাগ সময়ে)। এই মুহূর্তে স্ক্রীনে তাকিয়ে থাকা মানুষটি স্ক্রিনের পিছনে তাকালে সাথে সাথে Focus হয়ে যায়। আবার ফিরে তাকালে আবারও এখানে ফোকাস। এছাড়াও ক্যামেরার লেন্সগুলো হয় ঢাউস আকৃতির আর সেখানে কাঁচ সামনে পিছনে করে ফোকাস করতে হয়। অথচ চোখের ফোকাসিং কিনা হয় লেন্সের আকৃতি পরিবর্তন করে! (আধুনিক ক্যামেরার তুলনায় মানবচোখের কিছু ফিচার প্রথম কমেন্টে লক্ষণীয়)

.

শুধু মানুষের চোখের মত এত জটিল, এত উন্নত ফোকাসিং যে জিলিয়ন বছরের বিবর্তনেও সম্ভব না, বরং একজন Intelligent Designer এরই ডিজাইন করা সেটাই অধিক যুক্তিযুক্ত। এই তো গেল কেবল মানুষের চোখের কথা; ঈগলের চোখ তো মাইল দূর থেকেও ছোট জিনিস স্পষ্ট দেখতে পায়। একটা তুলনায় দেখা গিয়েছে, মানুষের এমন চোখ থাকলে দশ তলা সমান বিল্ডিংয়ের উপর থেকে ছোট পিঁপড়ে স্পষ্ট দেখতে পেত।

.

চোখের ব্যাপার নিয়ে ডারউইনও লিখতে বাধ্য হয়েছিল। On the origins of Species এর ষষ্ঠ অধ্যায়ে সে লিখেছে –

"To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree."

অর্থাৎ সহজভাষায় - চোখের ফোকাসিং, আলোক নিয়ন্ত্রণ এতসবকিছুর কার্যকলাপ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়ার মত বিষয়টি, স্বীকার করতেই হয়, ন্যাচারাল সিলেকশানের নামে চালিয়ে দেওয়া সবচেয়ে অযৌক্তিক বলে মনে হয়।

.

ডারউইন সত্যের কোনো দলিল নয়, দলিল নয় কোনো থিউরি বা বক্তব্যও। ডারউইনের এই বক্তব্যটুকু অনেকেই Creationism এর পক্ষে দলিল হিসেবে ব্যবহার করে। অথচ এই বিষয়ে সে অতটুকু বলেই থেমে যায় নি। বরং লম্বা ফিরিস্তি দিয়েছে, ন্যাচারাল সিলেকশনের অসম্ভবকে সম্ভব করার অবৈজ্ঞানিক ফিরিস্তি। [১]

.

.

কিছু বিবর্তনবাদী মানুষের চোখ কি 'নিখুঁত' সেই প্রশ্ন করে চলে যায় অন্যদিকে। ঈগলের চোখ বা অক্টোপাসের চোখ আরও বেশি কর্মক্ষম, নিখুঁত সেসব বর্ণনা দিয়ে তারা জাহির করে বেড়ায় যে মানুষের চোখ মোটেও 'নিখুঁত' বা 'উন্নত' নয়। ভাষার মারপ্যাঁচ ব্যবহার করে আলোচনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করা যেন তাদের রক্তে।

.

মানুষের চোখ নিখুঁত এই দাবি কেউ করে নাই। বরং চোখে আলো প্রবেশ করা, সেগুলো রেটিনায় উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি করা, সেই প্রতিবিম্ব আবার নিউরন কর্তৃক মস্তিষ্কে পৌঁছে দেওয়া, মস্তিষ্কে পৌঁছে উল্টো প্রতিবিম্ব আবার সোজা হয়ে গিয়ে শেষমেশ দেখার অনুভূতি তৈরি করা - এত এত ব্যাপার স্যাপার, এত কারসাজি যে প্রয়োজনানুযায়ী সুচারুভাবে সম্পন্ন হচ্ছে সেই প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে এতসব প্রক্রিয়া এত সুন্দর করে হওয়ার মেকানিজমের কথা।

.

'মানুষের চোখ Perfect না, এর থেকেও উন্নত চোখ প্রাণিকূলে রয়েছে। এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে উন্নত আর নিখুঁত চোখ অক্টোপাসের চোখ, সুতরাং এসব চোখের কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই, এগুলো একা একাই বিবর্তিত হয়ে বিভিন্ন মানের হয়েছে' – এসব কথাবার্তা এই কথাগুলোর মতোই অসার – Canon 70D ক্যামেরা Perfect ক্যামেরা নয়, এর থেকেও উন্নত Canon 80D, 1D ইত্যাদি রয়েছে। সুতরাং কোনো ক্যামেরারই কোনো Designer, Manufacturer নাই।

.

'মানুষ নিখুঁত সৃষ্টি না' এই দাবির পিছনে আরেকটা মেসেজ থাকে। আর সেটা হল - অতএব মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত না। অথচ মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত' তার ভিন্ন ভিন্ন প্রত্যেকটি ফিচারের জন্য করা হয় নাই, বরং সমস্তটা মিলে যে মানুষ, সেই মানুষকে সকল সৃষ্টির সেরা বলা হয়েছে। মানুষ তার মেধা, বুদ্ধি, দর্শন সবকিছু দিয়ে অন্যসবকিছুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে পারবে সেকারণে বলা হয়েছে। কিন্তু ডকিন্সরা লেকচারে আর জাফর ইকবালরা সায়েন্স ফিকশনগুলোতে যখন বিবর্তনের সাফাই গেয়ে মানুষের চোখ বিবর্তিত হয়ে (!) এখনও পুরোপুরি নিখুঁত হয়ে উঠে নাই টাইপের মেসেজ দিয়ে দেয় [২] তখন শিশু মনগুলো ভেবে বসে তবে তো বিবর্তনই সত্য, তাদের মনে প্রশ্ন উঠে তবে কীভাবে মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হয়, তখন যুক্তির ভ্রান্তিগুলো ধরিয়ে দেওয়ার মতো কেউ থাকে না।

.

বস্তুত, 'সর্বশ্রেষ্ঠ' আর 'সৃষ্টিজগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ' এক জিনিস নয়। আগামী দশ বছর পরের Canon 54321D মডেল বের করা মানে এই নয় যে এখনকার অপেক্ষাকৃত কম উন্নত 70D মডেলের কোনো Manufacturer নাই। এখনকার এই মডেলেই যে পরিমাণ জ্ঞান-বিজ্ঞান আর শ্রম প্রয়োগ করা হয়েছে তাই যদি এর পিছনে Manufacturer থাকার নির্দেশ করে, তবে চোখের ওই ছোট্ট কোটরে ক্রমাগত লেন্স আকিয়ে বাঁকিয়ে এই মুহূর্তে আপনার দেখার অনুভূতি সৃষ্টি করা, প্রয়োজনে লেন্সক্যাপ (চোখের পাতা) আর লিকুইড দিয়ে চোখকে ক্রমাগত রক্ষা করার মত কুশলী তো একজন Intelligent Design এর দিকেই ভিড়ায়।

.

মু'মিন অর্থাৎ, বিশ্বাসীদের জন্য কিন্তু সত্যমিথ্যা নির্ণয়ে রব্বের কথাই যথেষ্ট হয়। আর বাকিরা সত্য পেয়েও কথা পেঁচায় যেমনটা ডারউইন করেছিল, করছে এখনকার ডারউইনবাদীরা। [১]

“শীঘ্রই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাব পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে; যাতে তাদের কাছে স্পষ্ট হয় যে এটা সত্য। আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা, এটা কি যথেষ্ট নয়? ”

(সূরা ফুসসিলাত, ৫৩)

---

[১] To suppose that the eye with all its inimitable contrivances for adjusting the focus to different distances, for admitting different amounts of light, and for the correction of spherical and chromatic aberration, could have been formed by natural selection, seems, I freely confess, absurd in the highest degree. When it was first said that the sun stood still and the world turned round, the common sense of mankind declared the doctrine false; but the old saying of Vox populi, vox Dei, as every philosopher knows, cannot be trusted in science. Reason tells me, that if numerous gradations from a simple and imperfect eye to one complex and perfect can be shown to exist, each grade being useful to its possessor, as is certainly the case; if further, the eye ever varies and the variations be inherited, as is likewise certainly the case; and if such variations should be useful to any animal under changing conditions of life, then the difficulty of believing that a perfect and complex eye could be formed by natural selection, though insuperable by our imagination, should not be considered as subversive of the theory. How a nerve comes to be sensitive to light, hardly concerns us more than how life itself originated; but I may remark that, as some of the lowest organisms, in which nerves cannot be detected, are capable of perceiving light, it does not seem impossible that certain sensitive elements in their sarcode should become aggregated and developed into nerves, endowed with this special sensibility.

- On the origins of Species, Chapter 6

.

এখানে ডারউইন প্রথমে চোখের এমন কুশলী ন্যাচারাল সিলেকশনে বিবর্তনে হওয়া সম্ভব না বলে মনে হয় বলে স্বীকার করে। কিন্তু তারপর তা মানুষের জ্ঞানের স্বল্পতা বলে চালিয়ে দিল। বলল এখন নাকি আমরা চিন্তা করতে পারছি না। 'এমনিই এমনিই হয়ে গেছে' এমন রূপকথায় আমাদেরকে বিশ্বাস রাখতে বলল। কীভাবে হয়েছে তা বিজ্ঞান একসময় ব্যাখ্যা করবে। কিন্তু কেন হয়েছে সেটা? কেন এমনই হল সেটার উত্তর বিজ্ঞান কখনও বলে না। ‘কেন’ এর উত্তর সবসময় ‘এমনিতেই হয়েছে আর কি!’

.

[২] অক্টোপাসের চোখ, ডক্টর জাফর ইকবাল। এই সায়েন্স ফিকশনটিতে মানুষের Individual Feature পারফেক্ট না আর এটা বিবর্তনের ধারাতে আরও নিখুঁত হতে পারতো এমন একটা মেসেজ দেওয়া হয়েছে। যদিও শেষমেশ মানুষের নিজের ডিজাইন করা ত্রুটিবিহীন মানুষে সভ্যতার পরাজয় দেখানো হয়েছে, কিন্তু বিবর্তনবাদ সত্য ধরে নিয়ে ন্যাচারাল সিলেকশনে যা অর্জিত হয়েছে সেটাই ভাল এমন মেসেজ থেকেই গেছে। কখনও মেসেজ এমন হয় নাই যে সৃষ্টিকর্তার সিদ্ধান্তই ভাল।

১১৫
হুকুমের হিকমাহ

-তানভীর আহমেদ

সাধারণত নাস্তিক, সংশয়বাদী, চুশীলরা ইসলামের বিভিন্ন বিধিবিধান নিয়ে প্রশ্ন করে মুমিনদের চিন্তায় ফেলতে চায়। অনেকে বিধিবিধানের পিছনে হিকমাহ না জেনে হতবিহ্বল হয়ে পড়ে। 'পুরষদের চার বিয়ে জায়েজ, মহিলাদের কেন নেই', 'মদকে কেন পুরোপুরি রহিত করা হল, দাসপ্রথা কেন রেখে দেওয়া হল', 'হজ্জ করা ফরজ কেন করা হল?' অর্থাৎ 'এটা এমন দেওয়া হল কেন?' 'ওটা অমন হল কেন?' 'ওইরকম কেন হল না' - বিধিবিধানগত এমন সমস্ত প্রশ্নের মূল ও প্রাথমিক বিষয়গুলো আলোচিত হল।

.

প্রথমত, স্বঘোষিত নাস্তিক বা সংশয়বাদী কারও কাছে ইসলামকে ডিফেন্ড করবার জন্য আমাদের সৃষ্টি করা হয় নাই। আমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে আল্লাহর ইবাদাতের উদ্দেশ্যে। এমন নাস্তিক আর সংশয়বাদীদের কথায় মনোযোগ না দেওয়াই উত্তম। কারণ ওরা সাধারণত এটাই নিয়্যাত করে নেয় যে ঈমান আনবে না। বরং বিধি বিধান নিয়ে প্রশ্ন করে ঈমানদারদের ঈমান নিয়ে সংশয় সৃষ্টি করবেঃ ঠিক শয়তানের মত। শয়তান নিজে জাহান্নামী, আর সে আরও মানুষকে তার সাথে জাহান্নামে নিয়ে যেতে চায়। তাই এদের কার্যকলাপে মনোযোগ না দেওয়ার পরামর্শ থাকল।

.

দ্বিতীয়ত, বিধিবিধান নিয়ে যেসব প্রশ্ন করা হয় সেগুলো আলোচনারই দাবি রাখে না। এধরনের প্রশ্ন অবান্তর আর এর সহজ উত্তর হলঃ কারণ আল্লাহ বিধান প্রদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে অধিকারী এবং তিনি এমনটাই চেয়েছেন।

.

বিধিবিধান নিয়ে প্রকৃতপক্ষে নাস্তিক আর সংশয়বাদীদের প্রশ্ন করার আসল কারণ এই যে – তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে না। আল্লাহ এই মহাবিশ্বের সৃষ্টিকর্তা, তিনিই বিধান দেওয়ার একমাত্র অধিকারী। এই বোধটি যার থাকবে সে সহজেই বিধান মেনে নিতে পারে। নাস্তিকদের এই বোধ নেই বলেই তারা সবকিছুতে কেন প্রশ্ন করে। আল্লাহ যে বিধান কল্যাণকর মনে করেছেন তাই দিয়েছেন – একথা বললেও ঈমান না আনতে চাওয়া ওরা প্রশ্ন করবে, আল্লাহ কেন এটাকে কল্যাণকর মনে করলেন? কেন তার বিপরীত কাজটিকে কল্যাণকর মনে করলেন না? – ওদের প্রশ্ন কখনোই শেষ হবে না। কারণ ওরা বিশ্বাসই করতে চায় না। অথচ সমস্ত বিধানের পিছনে হিকমাহ আমাদেরকে জানানো হয় নাই। কারণ এই দুনিয়ার পরীক্ষা পাশ করতে সমস্তকিছুর উত্তর জানা আমাদের প্রয়োজন নাই।

.

সবকিছুতে 'কেন' প্রশ্ন যে অবান্তর তার একটা উদাহরণ দিই। যেমনঃ কোনো নাস্তিকের নাম 'আশিকুর' কেন হল? কেন 'ফাসিকুর' হল না? তার বাবা মা রেখেছে – তাই? কেন সেটাই রাখল? কেন অন্য নাম রাখল না?... এভাবে চলতেই থাকবে। কোনও নাস্তিক বা বিধিবিধান নিয়ে প্রশ্নকারী হয়তো তাদের নাম নিয়ে কখনো এভাবে ভেবে দেখে না অথচ প্রশ্নগুলো একই ক্যাটাগরির। তার বাবা মা এই নামটাই পছন্দ করেছে, তাই রেখেছে। তেমনি আল্লাহ সুবহানাহুতা'লাও যেকোনো বিধান দেওয়ার সবচেয়ে বেশি অধিকারী এবং তিনি তাঁর ইচ্ছামত উপযোগী বিধান দিয়েছেন - ব্যস।

.

তৃতীয়ত, কারও ঈমান আনিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমাদের দেওয়া হয় নাই। আমাদের দায়িত্ব শুধু পৌঁছে দেওয়া। ঈমান আনা বা না আনা ব্যক্তিগত ব্যাপার। তাই ঈমান কে আনলো আর কে নাস্তিকই রয়ে গেল তাতে সেই ব্যক্তি ছাড়া কারও কিছু যায় আসে না। এটা শুধুমাত্র ওই ব্যক্তিরই বিশ্বাসের ব্যাপার, ওই ব্যক্তিরই জান্নাত-জাহান্নামের ব্যাপার। দ্বিতীয় পয়েন্টে সমস্ত নাস্তিকদের

বিধান সম্পর্কিত সমস্ত প্রশ্নের মূল জবাব দেওয়া হয়েছে। কেউ মানলো কি না মানলো সেটা তার ব্যাপার।

.

পরিশেষে উল্লেখ্য, কিছু বিধিবিধানের হিকমাহ আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন আমাদের জানিয়েছেন। সেসব হিকমাহ আমাদের ঈমানকে শক্ত করে। কিন্তু কোনো হুকুমের পিছনে হিকমাহ জানা না থাকা প্রকৃত মুমিনদের হৃদয়ের ঈমান তো কমায়ই না, বরং সেই হিকমাহ জানা থাকা থেকেও বেশি ঈমান সঞ্চার করে। কারণ সে তখন পুরোপুরি আল্লাহর উপর ভরসা করে। তার বিশ্বাস তখন গায়েবে বিশ্বাসে গিয়ে বর্তায় – ঠিক যেমনটি আল্লাহ আমাদের থেকে চান।

.

হুকুম দিয়েছেন স্বয়ং আল্লাহ, তাই হুকুমের হিকমাহ না জেনেও বান্দা মেনে নেয়। নাস্তিক, সংশয়বাদী আর নাস্তিকতা আক্রান্ত চুশীলরা মনে প্রাণে বিশ্বাসই করে না যে আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন হলেন সৃষ্টিকর্তা। তানাহলে একথা বাচ্চারাও বোঝে – সৃষ্টি করেছেন যিনি, হুকুম দেওয়ার একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র তাঁরই।

১১৬

Mercy Killing

-তানভীর আহমেদ

মস্তিষ্কের নিচে গলার পিছন দিকটায় থাকে Spinal Cord যা বাংলায় সুষুম্না কান্ড হিসেবে পরিচিত। আর পুরো শরীরের সেন্সরি নার্ভ সিস্টেম গলার পিছনের এই স্পাইনাল কর্ড দিয়েই মস্তিষ্কে পৌঁছে।

.

শরীরের কোনো অংশ ব্যথা অনুভব হলেও সেই অনুভূতি Spinal Cord দিয়েই মস্তিষ্কে পৌঁছায়। এখন হঠাৎ কারও Spinal Cord বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলে সে কোনো যন্ত্রণা বুঝে উঠার আগেই মৃত্যুবরণ করবে। একারণে ফাঁসির ব্যবস্থায় দড়ি একটা নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের করতে বলা হয় যাতে আসামির ওজনের কারণে গলার পিছনের অংশের স্পাইনাল কর্ড ভেঙ্গে যথাসম্ভব কম কষ্টের মৃত্যু হয়। যদিও অনেকে মনে করেন যে ফাঁসি দিয়ে অক্সিজেনের অভাব ঘটিয়ে মৃত্যু নিশ্চিত করা হয়, কিন্তু আদতে সেটি লক্ষ্য থাকে না। ফাঁসির সময় স্পাইনাল কর্ড না ভেঙ্গে এমনটা হলে আসামির প্রচন্ড কষ্ট সহ্য করে মরতে হয়।

.

ইলেকট্রিক শক বা রাসায়নিক বিষক্রিয়ায় বাহ্যিকভাবে দেখে বুঝা না গেলেও সেখানেও যে প্রচন্ড যন্ত্রণা সহ্য করেই আসামির মৃত্যু হয় সেটা মেডিকেল স্পেশালিস্ট, ডাক্তার সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন। কারণ ওই যে Spinal Cord পুরো শরীরের যন্ত্রণা বয়ে নিয়ে যায় মস্তিষ্কে!

.

গলার পিছনে Spinal Cord কে ঢেকে থাকা হাড়ও হয় খুব নরম। তাই সেখানকার Spinal Cord বিচ্ছিন্ন করে দিয়ে রীতিমত বিনাকষ্টে মৃত্যু দেওয়াকে অনেকসময়ই Mercy Killing বলে অভিহিত করা হয়।

.

আর ভোঁতা কিছু দিয়ে সজোরে আঘাত করবার চাইতে ধারালো কিছু দিয়ে আরও দ্রুত Spinal Cord বিচ্ছিন্ন করা যেন মৃত্যুপ্রাপ্ত আসামির ওপরও সর্বোচ্চ দয়া দেখানো। তাই আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন যখন যুদ্ধের ময়দানেও হাতে, পায়ে, পেটে আঘাত করে কষ্ট দিয়ে মারতে না বলে মুসলিমদেরকে নির্দেশ দিলেন ,"অতঃপর যখন তোমরা কাফিরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন ওদের গর্দানে আঘাত হান..." (সূরা মুহাম্মাদ) তখনও আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন দয়া করলেন। এছাড়া আমরা জানি ইসলামে মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আসামীকেও গলায় ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করেই মৃত্যু দেওয়ার বিধান দিয়েছে। এর মাধ্যমে ইসলাম মৃত্যুপ্রাপ্ত আসামীরও সবচেয়ে কম যন্ত্রণায় মৃত্যু পাবার অধিকার দিল! দিল Mercy Killing!

.

দেখতে ভয়ঙ্কর হলেও এটাও বাস্তবতা। আর তাছাড়া দেখতে ভয়ঙ্কর বলেই এই পদ্ধতি কায়েম হলে সমাজে অপরাধপ্রবণতা কমে যায়। তথাকথিত উন্নত দেশগুলোর সাথে এক্ষেত্রে সৌদি আরবের বিভিন্ন অপরাধ সংগঠিত হওয়ার পরিসংখ্যান ঘেঁটে দেখতে পারেন। কোনোকিছু দেখতে বীভৎস হলেই যে তা অকার্যকরী, বর্বর হবে এটা একটা অপযুক্তি।

.

মজার ব্যাপার হল, ইসলাম গর্দানে মারতে বলে, তাই ইসলাম বর্বর - এমন ফালতু যুক্তি দেখানো কলা বিজ্ঞানীরা কখনও কিন্তু এই বিষয়টা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করতে চায় না, চলে যায় মানবিক দৃষ্টিকোণে। অথচ যৌক্তিকভাবে নাস্তিকতা কোনো মানবিকতা ধারণ করতে পারে না!

রেফারেন্সঃ

[১] https://www.verywell.com/how-we-feel-pain-2564638

[২] http://www.livescience.com/10767-execution-science-kill-per...

১১৭

ইফকের ঘটনাঃ আয়িশা (রা) এর উপর অপবাদের ঘটনা নিয়ে ইসলাম বিরোধীদের আপত্তি ও তার জবাব

-শিহাব আহমেদ তুহিন

মেয়েদের দেখে সবচেয়ে বেশী চোখ হেফাজতকারী ছেলের উপরেই মাঝে মাঝে চরিত্রহীনতার অভিযোগ আসে। অশ্লীলতা থেকে সবচেয়ে দূরে থাকা মেয়েটার উপরেই আসে চূড়ান্ত অশ্লীলতার অভিযোগ। নির্দোষ মানুষের পৃথিবীটা তখন খুব সংকীর্ণ হয়ে পড়ে। জীবনটা মেঘে আঁধার হয়ে পড়ে। কিন্তু তাঁরা আল্লাহর উপর ভরসা রাখেন। তাই আল্লাহ স্বয়ং তাদের ইজ্জতের হেফাজত করেন। যেমনটা করেছিলেন মরিয়াম(আঃ) এর ক্ষেত্রে। করেছিলেন আমাদের মা আয়েশা(রাঃ) এর ক্ষেত্রে। চারপাশের সকল মেঘ দূরীভূত হয়ে ঝকঝকে সূর্য উঠে। কিন্তু যাদের হৃদয়কে বক্রতা জেকে বসে, তারা কপটতা করবেই। সেকালে করেছে, একালেও করবে। আজকের গল্প তেমন একটা ঘটনাকে নিয়ে।

.

ঘটনাটা সীরাতের পাতায় "ইফকের ঘটনা" নামে পরিচিত। ঘটনাটি ঘটে পঞ্চম হিজরীর শাবান মাসে। বনু মুসতালিকের যুদ্ধে। এ যুদ্ধে আগে থেকেই বুঝা যাচ্ছিলো যে, তেমন কোন রক্তপাত ঘটবে না। মুসলিমরা বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জিতবে। তাই মদিনার বিপুল সংখ্যক মুনাফিকরা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলো। ইবনে সা'দ বর্ণনা করেন- "এই অভিযানে অসংখ্য মুনাফিক অংশগ্রহণ করে যা অন্য কোনো অভিযানে আগে দেখা যায়নি।"

.

রাসূল(সাঃ) যখন কোনো সফরে বের হতেন, তখন স্ত্রী নির্বাচনের জন্য লটারী করতেন। বনু মুসতালিকের যুদ্ধে অভিযানে সফরসঙ্গী হিসেবে লটারীতে আয়েশা(রাঃ) এর নাম আসে। আয়েশা(রাঃ) যাত্রাকালে প্রিয় ভগ্নি আসমা(রাঃ) এর একটি হার ধার নেন। হারটির আংটা এতো দূর্বল ছিলো যে বারবার খুলে যাচ্ছিলো। সফরে আয়েশা(রাঃ) নিজ হাওদাতে আরোহণ করতেন। এরপর হাওদার দায়িত্বে থাকা সাহাবীগণ হাউদা উঠের পিঠে উঠতেন। তখন আয়েশা(রাঃ) এর বয়স ছিল কেবল চৌদ্দ বছর। তিনি এতো হালকা গড়নের ছিলেন যে, হাওদা-বাহক সাহাবীগণ সাধারণত বুঝতে পারতেন না যে, ভিতরে কেউ আছে কি নেই!

.

সফরকালে রাতের বেলায় এক অপরিচিত জায়গায় যাত্রাবিরতি হয়। আয়েশা(রাঃ) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে দূরে চলে গেলেন। ফেরার সময় হঠাৎ গলায় হাত দিয়ে দেখলেন ধার করা হারটি নেই। তিনি প্রচণ্ড ঘাবড়ে গেলেন। প্রথমত, তার বয়স ছিল কম আর তার উপরে হারটি ছিল ধার করা। হতভম্ব হয়ে তিনি হারটি খুঁজতে লাগলেন। বয়স কম হবার কারণে তার ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ছিলো না। তিনি ভেবেছিলেন যাত্রা আবার শুরু হবার আগেই তিনি হারটি খুঁজে পাবেন আর সময়মতো হাওদাতে পৌঁছে যাবেন। তিনি না কাউকে ঘটনাটি জানালেন, না তার জন্য অপেক্ষা করার নির্দেশ দিলেন।

.

খুঁজতে খুঁজতে তিনি হারটি পেয়ে গেলেন কিছুক্ষণ পর। কিন্তু ততক্ষণে কাফেলা রওনা হয়ে গেছে। তারা ভেবেছিলেন, আয়েশা(রাঃ) হাওদার মধ্যেই রয়েছেন। এদিকে আয়েশা(রাঃ) কাফেলার স্থানে এসে কাউকে পেলেন না। তিনি চাদর মুড়ি দিয়ে সেখানেই পড়ে রইলেন। ভাবলেন, যখন কাফেলা বুঝতে পারবে তখন আবার এখানে ফিরে আসবে।

.

সে সফরে সাকাহ হিসেবে দায়িত্বে ছিলেন সফওয়ান(রাঃ)। সাকাহ বলতে কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণকারীদের বুঝানো হয়। তাদের কাজ ছিলো কাফেলাকে কিছু দূর থেকে অনুসরণ করা। কেউ পিছিয়ে পড়লে কিংবা কোনো কিছু হারিয়ে গেলে তা কাফেলাকে

পৌঁছে দেয়া। সফওয়ান(রাঃ) ছিলেন খুব বড়ো মাপের সাহাবী। তিনি পথ চলতে চলতে অস্পষ্ট অবয়ব দেখতে পেয়ে সামনে এগিয়ে গেলেন। আর চাদর মুড়ি দেয়া অবস্থাতেও আয়েশা(রাঃ) কে চিনতে পারলেন। কারণ, পর্দার বিধান নাযিল হবার পূর্বে তিনি আয়েশা(রাঃ) কে দেখেছিলেন। আয়েশা(রাঃ) তখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। তাকে সজাগ করার জন্য সফওয়ান(রাঃ) জোরে "ইন্না-লিল্লাহ" বলে আওয়াজ দিলেন। বললেন, "এ যে রাসূল(সা) এর সহধর্মিণী! আল্লাহ আপনার উপরে রহম করুন! কি করে আপনি পিছে রয়ে গেলেন?"

.

আয়েশা(রাঃ) কোনো কথার জবাব দিলেন না। সফওয়ান(রাঃ) একটি উট এনে তাতে আয়েশা(রাঃ) কে আরোহণ করতে বলে দূরে সরে দাঁড়ান। আয়েশা(রাঃ) উটের পিঠে আরোহণ করলে তিনি উটের লাগাম ধরে সামনে পথ চলতে থাকেন। অনেক চেষ্টা করেও ভোরের আগে তারা কাফেলাকে ধরতে পারলেন না।

.

ঘটনাটি এতোটুকুই। এবং যে কোনো সফরে এমনটা ঘটা একদম স্বাভাবিক। কিন্তু যাদের হৃদয়ে বক্রতা আছে তারা ঘটনাটিকে লুফে নিলো। কুৎসা রটাতে লাগলো। তবে যাদের হৃদয় পবিত্র তারা এসব শোনামাত্রই কানে আঙ্গুল দিয়ে বলতেনঃ আল্লাহ মহাপবিত্র! এটা সুস্পষ্ট অপবাদ ছাড়া কিছুই না।
আবু আইয়ুব(রাঃ) তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলেন, "হে উম্মে আইয়ুব! যদি তোমার ব্যাপারে কেউ এমন মন্তব্য করতো, তুমি কি মেনে নিতে?" তার স্ত্রী জবাব দিলেন, "আল্লাহ মাফ করুন, কোনো অভিজাত নারীই তা মেনে নিতে পারে না।" তখন আবু আইয়ুব(রাঃ) বললেন, "আয়েশা(রাঃ) তোমার চেয়ে অনেক অনেক বেশি অভিজাত। তাহলে তার পক্ষে এটা কিভাবে মেনে নেয়া সম্ভব!"

.

এ ঘটনা সব জায়গায় ছড়ানোর মূল হোতা ছিলো আব্দুল্লাহ ইবনে উবাই। আমিরুল মুনাফিকুন, মুনাফিকদের সর্দার। ঘটনাক্রমে আরো তিনজন সম্মানিত সাহাবী এই কুচক্রে জড়িয়ে পড়েন। হাসসান ইবনে সাবিত(রাঃ), হামনা বিনতে জাহশ(রাঃ) আর মিসতাহ ইবনে আসাসাহ(রাঃ)।

.

এদিকে আয়েশা(রাঃ) মদিনা পৌঁছানোর পর ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। তাই তিনি ঘটনাটি সম্পর্কে কিছুই জানতেন না। রাসূল(সাঃ) আর আবু বকর(রাঃ) তাকে কিছুই জানালেন না। আয়েশা(রাঃ) আর রাসূল(সাঃ) এর মধ্যে খুবই উষ্ণ সম্পর্ক ছিলো সবসময়। রাসূল(সাঃ), আয়েশা(রাঃ) কে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। এক সাথে দৌড় খেলতেন, ইচ্ছা করে হেরে যেতেন। আয়েশা(রাঃ) পাত্রের যে দিক দিয়ে পান করতেন, রাসূল(সাঃ) সেদিক দিয়ে পানি পান করতেন।

.

আয়েশা(রাঃ) অসুস্থ হলে তিনি দয়া আর কোমলতা প্রদর্শন করতেন। কিন্তু এবারের অসুস্থতায় আগের মতো কোমলতা প্রদর্শন করলেন না। আয়েশা(রাঃ) লক্ষ্য করলেন রাসূল(সা:) আর আগের মতো তার সাথে প্রাণ খুলে কথা বলেন না।
পুরো ব্যাপারটায় তিনি খুব কষ্ট পেলেন। তাই রাসূল(সাঃ) এর অনুমতি নিয়ে পিতৃগৃহে চলে গেলেন। তখনো তিনি আসল ঘটনাটি জানতেন না। পরবর্তীতে, একদিন রাতের বেলা প্রাকৃতিক প্রয়োজনে বাইরে বের হলে মিসতাহ(রাঃ) এর মা তাকে পুরো ঘটনাটি জানান। নিজের ছেলেকে মা হয়ে অভিশাপ দেন। আয়েশা(রাঃ) এর কাছে তখন সবকিছু পরিষ্কার হয়ে গেলো। তার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো। তিনি রাত-দিন অবিরত কাঁদতে থাকলেন।

.

এদিকে তার বিরুদ্ধে অপবাদকারীরা আরো জোরে শোরে তাদের কুৎসা রটাতে থাকে। প্রায় ১ মাস হয়ে যায়। কোনো মীমাংসা হয় না। মুনাফিক আর গুটিকয়েক ব্যক্তি ছাড়া সবাই বিশ্বাস করতো আয়েশা(রাঃ) নির্দোষ ছিলেন। তারপরেও স্বচ্ছতার স্বার্থে রাসূল(সাঃ) ঘটনার তদন্ত করলেন। তিনি উসামা(রাঃ) আর আলী(রাঃ) এর সাথে পরামর্শ করলেন। উসামা(রাঃ) বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আপনার পরিবার সম্পর্কে আমরা ভালো ভিন্ন আর কিছুই জানি না।" আলী(রাঃ) ঘটনার আরো সুষ্ঠু তদন্তের

জন্য রাসূল(সাঃ) কে ঘরের দাসীদের জিজ্ঞেস করতে বললেন। দাসীকে জিজ্ঞেস করা হলে সে বললোঃ তার মধ্যে আমি দোষের কিছুই দেখি না। কেবল এতোটুকুই যে, তিনি যখন-তখন ঘুমিয়ে পড়েন, আর বকরী এসে সব সাবাড় করে নিয়ে যায়।

.

রাসূল(সাঃ) বুকভরা কষ্ট নিয়ে সবার উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। বললেন, "লোকসকল! মানুষের কি হয়েছে? তারা আমার পরিবার সম্পর্কে আমাকে কষ্ট দিচ্ছে। তারা মিথ্যা বলছে আমার পরিবারের বিরুদ্ধে।"
রাসূল(সাঃ) এরপর আবু বকর(রাঃ) এর গৃহে আগমন করেন। আয়েশা(রাঃ)কে উদ্দেশ্য করে বললেনঃ হে আয়েশা! লোকেরা কি বলাবলি করছে তা তো তোমার জানা হয়ে গেছে। তুমি আল্লাহকে ভয় করো। আর লোকেরা যেসব বলাবলি করছে তাতে লিপ্ত হয়ে থাকলে তুমি আল্লাহর নিকট তওবা করো। আল্লাহতো বান্দার তওবা কবুল করে থাকেন।

.

আয়েশা(রাঃ) সে কষ্টের অভিজ্ঞতার কথা সম্পর্কে বলেনঃ আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে লক্ষ্য করে একথাগুলো বলার পর আমার চোখের অশ্রু সম্পূর্ণ শুকিয়ে যায়। আমার সম্পর্কে কুর'আন নাযিল হবে! আমার নিজেকে নিজের কাছে তার চাইতে তুচ্ছ মনে হয়েছে। তখন আমি বললাম- আমার সম্পর্কে যেসব কথা বলা হচ্ছে সে ব্যাপারে আমি কখনোই তওবা করবো না। আমি যদি তা স্বীকার করি তবে আল্লাহ জানেন যে আমি নির্দোষ আর যা ঘটেনি তা স্বীকার করা হয়ে যাবে। আমি ইয়াকুব(আঃ) আর নাম স্মরণ করতে চাইলাম। কিন্তু মনে করতে পারলাম না। তাই আমি বললাম- ইউসুফ(আঃ) এর পিতা যা বলেছিলেন, তেমন কথাই আমি উচ্চারণ করবোঃ
" সুন্দর সবরই(উত্তম) আর তোমরা যা বলছো সে ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি।" (সূরা ইউসুফঃ১৮)

.

এ পর্যায়ে আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী নাযিল হলো আয়েশা(রাঃ) সম্পর্কে-

.

"যারা মিথ্যা অপবাদ রটনা করেছে, তারা তোমাদেরই একটি দল। তোমরা একে নিজেদের জন্যে খারাপ মনে করো না; বরং এটা তোমাদের জন্যে মঙ্গলজনক। তাদের প্রত্যেকের জন্যে ততটুকু আছে যতটুকু সে গোনাহ করেছে এবং তাদের মধ্যে যে এ ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে, তার জন্যে রয়েছে বিরাট শাস্তি।
যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।" (সূরা নূরঃ ১১,১৯)

.

আয়াত নাযিলের পর আয়েশা(রা:) এর মা প্রচণ্ড খুশী হন। মেয়েকে বলেন: যাও মা! আল্লাহর রাসূলের শুকরিয়া আদায় করো। আয়েশা(রা:) তখন এক বুক অভিমান নিয়ে বললেন: আমি কখনোই তার শুকরিয়া আদায় করবো না। বরং যেই আল্লাহতায়ালা আমার নিষ্কুলষতার সাক্ষ্য দিয়েছেন, আমি কেবল তারই শুকরিয়া আদায় করবো।

.

বর্তমান সময়ের ইসলাম-বিদ্বেষীরা প্রশ্ন তোলে যে,
" যেহেতু আয়াত নাযিল হতে এক মাসের বেশী সময় লাগে, এতে কি বোঝা যায় না যে, মুহাম্মদ আসলে কনফিউজড ছিলেন যে তিনি কি ধরনের আয়াত উপস্থাপন করবেন? তিনি আসলে মাসিকের অবস্থা দেখে নিশ্চিত হতে চাচ্ছিলেন, আয়েশা নির্দোষ কি না! তা না হলে এক মাস অপেক্ষা কেনো?"

.

একেবারে কট্টর ইসলাম-বিদ্বেষী লেখকদের লেখা না পড়লে এ ধরনের সিদ্ধান্তে পৌঁছানো অসম্ভব। সত্যি বলতে, আমি যখন পুরো ঘটনাটি পড়েছি নির্ভরযোগ্য উৎস থেকে, তখন আমার ঈমান আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করছি।

.

লেখকরা যখন কোনো কিছু লিখেন তখন তাদের লেখায় তাদের জীবনের ছাপ ফুটে উঠে। এটা ফুটে উঠতে বাধ্য। এ ব্যাপারটা

মানবীয়। যদি কুর'আন সত্যিই রাসূল(সাঃ) এর নিজের আবিষ্কার হতো, তবে তিনি তৎক্ষণাৎ এ বিষয়ে আয়াত রচনা করতেন। কারণ, পৃথিবীতে তিনি তখন আয়েশা(রাঃ)-কেই সবচেয়ে বেশী ভালোবাসতেন। এক মাস অপেক্ষা করে জল-ঘোলা করার সুযোগ দিতেন না। এক মাসের বেশী বিলম্ব করাটাই প্রমাণ করে, কুর'আন তার নিজের লেখা নয়।

আর কতোটা কুৎসিত মানসিকতার হলে, পুরো ব্যাপারটিকে মাসিকের দিকে টানা যায়? তারা বুঝাতে চান যে, রাসূল(সাঃ) আসলে মাসিকের অবস্থা দেখে বুঝতে চেয়েছিলেন যে, সত্যিই আয়েশা(রাঃ) এ গুনাহের কাজ করেছিলেন কিনা! এটা একটা হাস্যকর যুক্তি। কারণ--

.

প্রথমত, আয়েশা(রাঃ) থেকে বেশ কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের ব্যাপারে। কিন্তু তিনি কখনো মা হতে পারেননি। তাই অবশ্যই এভাবে রাসূল(সাঃ) তাকে বিচার করবেন না।

দ্বিতীয়ত, আয়েশা(রাঃ) তখন রাসূল(সাঃ) এর নিকটে ছিলেন না। তিনি পিতৃগৃহে চলে গিয়েছিলেন।

তৃতীয়ত, ওহী নাযিলের ঠিক আগেও রাসূল(সাঃ) গুনাহ করে থাকলে আয়েশা(রাঃ) কে তওবা করতে বলেছিলেন। যার অর্থ, ওহী নাযিলের আগে তিনি নিজে সিদ্ধান্ত দেননি এ ব্যাপারে।

.

স্যার উইলিয়াম মেইবার তার “লাইফ অফ মুহাম্মদ” গ্রন্থে ইফাক নিয়ে ভয়াবহ সব কথা লিখেছেন। যার কোনো ভিত্তি নেই। তিনি নিজে থেকে গল্প ফেঁদেছেন। বর্তমান কালের ইসলাম বিদ্বেষীরা ধর্ম-গ্রন্থের মতোই এসব বানোয়াট কথাকে আঁকড়ে ধরেছে। তিনি আয়েশা(রাঃ) কে চরিত্রহীন প্রমাণ করতে চেয়েছেন। যেমনঃ একবার হাসসান(রাঃ) অনুতপ্ত হয়ে আয়েশা(রাঃ) কে কবিতা শোনান-

“তিনি পবিত্র, ধৈর্যশীলা, নিষ্কলঙ্ক-নির্দোষ।
তিনি সরলা নারীর গোশত খান না।”

.

স্যার উইলিয়াম মেইবার এই কবিতা নিয়ে লিখেন- "হাসসান অতি চমৎকার কবিতা রচনা করলেন। তাতে আয়েশা এর পবিত্রতা, সৌন্দর্য, বুদ্ধিমত্তা আর নিখুঁত কমনীয় দেহের বর্ণনা ছিলো। তোষামদে ভরা এ স্তুতিকাব্য আয়েশা ও হাসানের মনোমালিন্য দূরীকরণে কার্যকর ভূমিকা রাখলো।”

.

এ ধরনের মন্তব্য খুব হাস্যকর। কারণ, হাসসান(রাঃ) যখন এ কবিতাটি পাঠ করেন তখন আয়েশা(রাঃ) এর বয়স ছিল চল্লিশের কাছাকাছি। তখন তার দেহ কমনীয় কি করে হয়? যখন আমরা জানি, পনের-ষোল বছর বয়সেই তার দেহ ভারী হয়ে গিয়েছিলো।

তিনি লিখেছেনঃ যেহেতু নিখুঁত কমনীয় দেহের প্রতি আয়েশার ভীষণ গর্ব ছিলো, তাই লাইনটি শুনে তিনি অতি মাত্রায় উৎসাহিত হয়ে পড়েন। উৎসাহের আতিশায্যে কবিকে থামিয়ে বলেন- কিন্তু তুমি তো এমন নও।

.

আসলে লেখকের গোলমাল পাকিয়েছে এই লাইনে- “তিনি সরলা নারীর গোশত খান না।” সম্ভবত তিনি জানেন না, আরবী ব্যাকরণে “কারো গোশত ভক্ষণ করা” বলতে গীবতকে বোঝানো হয়। এ লাইন দ্বারা হাসসান(রাঃ) বুঝিয়েছিলেন, আয়েশা(রাঃ) কখনো কোনো নারীর গীবত করেন না। এ কথা শুনে আয়েশা(রাঃ) এর ইফকের ঘটনা মনে পড়ে গিয়েছিলো। হাসসান(রা:) নিজেই তার উপর অপবাদ আরোপ করেছিলেন। তাই তিনি বলেছিলেনঃ হে হাসসান! তুমি তো এমন নও। তুমি তো ঠিকই আমার বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালিয়েছিলে। তিনি মোটেই এ কথা বোঝাননি যে, তিনি দেখতে খুব সুন্দর আর হাসসান(রাঃ) কুশ্রী। অনেক কুযুক্তি দেয়ার পরেও শেষে স্যার উইলিয়াম মেইবার অবশ্য কিছুটা হতাশ হয়ে লিখতে বাধ্য হন- “আয়েশার আগের জীবন আমাদের আশ্বস্ত করে যে, তিনি সম্পূর্ণ নির্দোষ ছিলেন।”

.

ইসলাম বিদ্বেষীরা যেখানে কুৎসা রটনা ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না, সেখানেও আল্লাহ মুসলিমদের জন্য চমৎকার কিছু শিক্ষা রেখে দিয়েছেন। আমরা শিখতে পেরেছি, একজন সতী নারীর উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হলে তার কি করা উচিত? উন্নত দেশে যেখানে ধর্ষণের শাস্তি হয় না, সেখানে কুর'আন সতী নারীদের উপর ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ কারীদের জন্য কঠোর শাস্তি আরোপ করেছে।

"যারা সতী-সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে অতঃপর স্বপক্ষে চার জন পুরুষ সাক্ষী উপস্থিত করে না, তাদেরকে আশিটি বেত্রাঘাত করবে এবং কখনও তাদের সাক্ষ্য কবুল করবে না। এরাই না'ফারমান।" (সূরা নূরঃ৪)

.

মিসতাহ(রাঃ) ভুলক্রমে এ কুৎসায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। অথচ তার ভরন-পোষণ করতেন আবু বকর(রাঃ)। নিজের মেয়েকে এ অপবাদ দিতে দেখে, আবু বকর(রাঃ), মিসতাহ(রাঃ) কে আর সাহায্য করবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেন। তখন এ আয়াত নাযিল হয়ঃ

"তোমাদের মধ্যে যারা উচ্চমর্যাদা ও আর্থিক প্রাচুর্যের অধিকারী, তারা যেন কসম না খায় যে, তারা আত্নীয়-স্বজনকে, অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর পথে হিজরতকারীদেরকে কিছুই দেবে না। তাদের ক্ষমা করা উচিত এবং দোষক্রটি উপেক্ষা করা উচিত। তোমরা কি কামনা করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়।" (সূরা নূরঃ২২)

.

এ ঘটনাগুলো প্রমাণ করে, কুর'আন রাসূল(সাঃ) এর কোনো ব্যক্তিগত বই ছিলো না। তা না হলে নিজ স্ত্রীকে নিয়ে বাজে মন্তব্যকারীর সাহায্য বন্ধ হতে দেখে উনার খুশী হওয়া উচিত ছিলো। এটাই স্বাভাবিক এবং মানবীয়। এ ঘটনা প্রমাণ করে, এ কুর'আন মানুষের তৈরি কোনো বই না।

.

বরং এ কুর'আন আল্লাহর পক্ষ থেকে। কেবল তাঁর কাছে নিজেকে বিনীত করেই প্রকৃত "মুক্তমনা" হওয়া সম্ভব।

সহায়ক গ্রন্থাবলীঃ

১) আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া(চতুর্থ খণ্ড)- ইবনে কাছির(রহঃ) [পৃষ্ঠাঃ২৯৩-৩০১, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

২) সীরাতে আয়েশা- সাইয়্যেস সুলাইমান নদভী(রহঃ)-[পৃষ্ঠাঃ১২০-১৩৩, রাহনুমা প্রকাশনী]

১১৮

অণুগল্প – উপলব্ধি [স্রষ্টার অস্তিত্বের পক্ষে অকাট্য যুক্তি]

-জাকারিয়া মাসুদ

রাহাতের সাথে এভাবে দেখা হয়ে যাবে ভাবি নি। শেষবার তাকে দেখেছিলাম ভার্সিটির সমাবর্তনের দিন। হল ছাড়ার জন্য যখন ব্যাগ গোছাচ্ছিলাম, তখন সে আমার রুমে এসেছিল। ব্যস্ততার ফাকে সামান্য কিছু সময় তার সাথে কথা হয়েছিল। এরপর অনেক চেষ্টা করেও তার সাথে আর যোগাযোগ করতে পারি নি।

.

সেদিন শুক্রবার, আমি আসরের সালাত আদায় করে মসজিদ থেকে বের হচ্ছি, ঠিক এই সময়ে কেউ একজন আমার নাম ধরে ডাকল। আমি পেছন ফিরে তাকালাম। দেখলাম লম্বা সাদা পাঞ্জাবি, বাদামি বর্ণের টুপি, আর মুখভর্তি দাড়িওয়ালা এক যুবক। চিনতে একটু কষ্ট হচ্ছিল, তবুও ডাক শুনে তার কাছে গেলাম।

.

আমি কিছু জিজ্ঞেস করার আগেই সে বলল, আসসালামু আলাইকুম। আমি রাহাত।

.

আমি চোখ বড় করে তার দিকে তাকিয়ে আছি দেখে সে বলল, আমি রাহা--ত। রাহাত রায়হান।
চিনতে পেরেছিস?

.

নিশ্চিত হওয়ার জন্য বললাম আপনি কি সেই রাহাত, যার সাথে আমি বিশ্ববিদ্যায়ে পড়েছি?

.

সে কেবল মাথা নাড়ল।

.

আর আমি অবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলাম তার দিকে।

.

এইত কিছুদিন আগেও যে ছেলেটা স্রষ্টার অস্তিত্ব নিয়েই সন্দিহান ছিল, আজ সে দিব্বি ধার্মিক মুসলিম। গায়ে পাঞ্জাবি, মাথায় টুপি আর লম্বা দাড়ি দেখে বুঝারই উপায় নেই যে এ রাহাতই সেই রাহাত, যে একসময় নাস্তিক ছিল।
আমি মনে মনে এসব কল্পনা করতেই সে আমাকে বুকে জড়িয়ে নিল।

.

কথাবার্তার মাধ্যমে জানতে পারলাম সে তার খালাত ভাই এর শ্বশুর বাড়িতে বেড়াতে এসেছে। এরপর কুশলাদি বিনিময় করে আমরা মসজিদ থেকে বাইরে বের হলাম।

.

বের হয়েই আমি রাহাতের হাত শক্ত করে ধরে বললাম, আজ আর তোকে ছাড়ছি না। কত দিন তোকে খুঁজেছি কিন্তু কোন হদিস করতে পারি নি।

.

আমার কথা শুনেই সে তার চিরচেনা মুচকি হাসিটা উপহার দিল।

.

আমি বললাম, রাহাত KFC তে যাবি?

.

রাহাত তো অবাক এই অজপাড়া গায়ে আবার KFC আসবে কোথা থেকে?

.

আমি বললাম আরে চল না।

.

আমরা KFC তে পৌছেই চায়ের অর্ডার দিলাম।

.

চায়ে চুমুক দিয়েই রাহাত জিজ্ঞাসা করল, তুই না আমাকে KFC তে নিয়ে যাবি বললি?

.

আমি কিছু না বলে শুধু আংগুল দিয়ে উপরের দিকে ইশারা করলাম।

.

রাহাত উপরের দিকে তাকিয়েই হেসে কুটি কুটি।
হাসি থামিয়ে বলল, এই তোর KFC?

.

আমি বললাম, হুম।
দেখিস না লিখা আছে কামাল ফুড কর্ণার। কামালের K ফুডের F আর কর্ণারের C মিলিয়েই আমাদের গাঁয়ের বিখ্যাত KFC.

.

সে আরেক ফালি হাসি উপহার দিল।

.

আমি তাকে কিছু জিজ্ঞেস করতে যাব, এই মুহূর্তে সে বলল,
ভাই তুই যদি সেইদিন আমাকে কড়া কড়া কথাগুলো না বলতি, তাহলে হয়ত আমার মাথা থেকে নাস্তিকতার ভূত নামতই না।
কোন সুদূরে যে পড়ে থাকতাম তা বলাই বাহুল্য।

.

-সেইদিন মানে?

.

-তোর মনে নেই, সমাবর্তন পরবর্তী রাতের কথা।

.

আমি মাথা চুলকাচ্ছি দেখে সে বলল, আরে ঐ যে আমি তোকে কতগুলো উল্টাপাল্টা প্রশ্ন করেছিলাম, আর তুই খুব সুন্দর করে সেগুলোর জবাব দিয়েছিলি।

.

আমি বললাম, ওহ, হ্যাঁ মনে পড়েছে।

.

.

সারাদিন সমাবর্তন অনুষ্ঠানের পেছনে দৌড়াদৌড়ি করে রাতে বেশ ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। ভেবেছিলাম একদিন আরাম করে পরদিন সকালে রওয়ানা দেব কিন্তু বাসের অগ্রীম টিকিট কাটা ছিল বলে অগত্যা সেদিনই রওয়ানা দিতে হয়েছিল।
জিনিসপত্র গুছাচ্ছিলাম।
এমন সময় রাহাত এসে হাজির।

.

আমাকে দেখে বলল, চলে যাচ্ছিস?

-আমি মাথা নাড়লাম।

-আমার যে একটা প্রশ্ন ছিল?

- বল।

- আচ্ছা তোরা বিশ্বাসের প্রতি এত গুরুত্ব দিস কেন? এখন বিজ্ঞানের যুগ প্রযুক্তির যুগ, বিশ্বায়নের যুগ। সবকিছুকে বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করেই যাচাই করলেই হয় না। স্রষ্টা আর ধর্ম জিনিসটা আদিম ব্যপার ছাড়া কিছুই নয়।

.

একে তো ক্লান্ত শরীর, আবার যাওয়ার জন্য তাড়াহুড়ো করে ব্যাগ গোছাতে হচ্ছে, তার উপর আবার রাহাতের উপদ্রব। মাথাটা ভন ভন করছিল।

.

আমি কিছুটা উচ্চস্বরেই বললাম, হুমায়ুন আজাদের "আমার অবিশ্বাস" বই থেকে বলছিস, তাই না?

.

রাহাত বলল তুই কিভাবে বুঝলি?

.

কথার জবাব না দিয়েই আমি বললাম, আচ্ছা রাহাত! তুই যাদেরকে বাবা মা বলে ডাকিস, তারা তোর বাবা মা বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করেছিলি কোনদিন?

.

- না।

.

-তাহলে তুই কিভাবে বুঝলি যে যাদেরকে তুই বাবা মা বলে ডাকিস এদের থেকেই তুই জন্ম নিয়েছিলি? এরাই তোর আসল বাবা-মা? এমনও তো হতে পারে যে, তোকে একটি ডাস্টবিনে পাওয়া গেছে। ডাস্টবিনের ডাবের খোসা, পলিথিন, খাবাড়ের উচ্ছিষ্টের র্যান্ডম সংমিশ্রণের ফলেই তোর জন্ম হয়। তুই যাদেরকে নিজের পরিবারের সদস্য হিসেবে জানিস তারা তোকে ডাস্টবিনে পেয়ে দত্তক নিয়ে নিলো।

.

রাহাত বেশ চিন্তায় পড়ে গেলো। কেননা, সে তো তার প্রিন্সিপ্যাল থেকে সরতে পারে না। যা সে দেখেনি, তা বিশ্বাস করবে কেমন করে? তার কাছে তো আসলেই এমন প্রমাণ নেই যে সে যাদেরকে পিতামাতা হিসেবে জানে তাদের থেকেই তার জন্ম। কেননা আফটার অল, সৃষ্টিকর্তা বলে তো কিছু নেই। সবকিছুই তো র্যান্ডমলি ক্রিয়েট হয়েছে !!!

.

যাই হোক রাহাতের তাৎক্ষণিক জবাব ছিল, আমি ছোটবেলা থেকেই তাদেরকে বাবা মা হিসেবে দেখে আসছি। আর আমার ফ্যামিলি মেম্বার, আত্মীয়-স্বজন, প্রতিবেশী সবাই তো সাক্ষী দেয় যে, তারাই আমার বাবা মা।

.

-তার মানে তোর বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ ছাড়া কথার উপর ভিত্তি করেই তাদেরকে বাবা মা বলে ডাকিস?

.

-রাহাত কিছুটা নিচু গলায় বলল, হ্যাঁ।

.

-তাহলে এখানে তোর বিজ্ঞান কোথায় গেল? কেন বিজ্ঞান দিয়ে যাচাই না করেই তাদেরকে বাবা মা হিসেবে মেনে নিলি?

.

-আচ্ছা তোর বাবা মা তোকে ভালোবাসে?

.

-অবশ্যই। কেন বাসবে না?

.

-তাহলে বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ দে যে তোর বাবা মা তোকে ভালোবাসে। নয়ত আমি কিভাবে বুঝব?

.

- তুই কি পাগল! ভালোবাসা কি বিজ্ঞান দিয়ে মাপার জিনিস? এটা তো অনুভব করে নিতে হয়।

.

- স্রষ্টাও এমন জিনিস যাকে অনুভব করে নিতে হয়। বিজ্ঞান দিয়ে তাকে মাপা যায় না, তার অস্তিত্ব অনুভব করা যায়।

.

আমার উত্তরে সে সন্তুষ্ট হল কিনা জানি না, আমি আবার পাল্টা প্রশ্ন করলাম।

.

-আচ্ছা তোর দাদার বাবার নাম কি জানা আছে?

.

-সে তার দাদার বাবার নাম বলল।

.

-তুই যে তোর দাদার বাবা থেকে এসেছিস তা বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ কর।

.

-ইয়ে মানে...

.

-ইয়ে মানে করে লাভ নেই, বিজ্ঞান দিয়ে তোকে প্রমাণ করতেই হবে। নয়ত তুই তোর দাদার বাবা থেকে না বরং চিড়িয়াখানায় বানর থেকে এসেছিস বলে মেনে নিতে হবে।

.

সে এবার খানিকটা নড়ে চড়ে বসে বলল,

.

-আমি আমার দাদার বাবার কাছ থেকে এসেছি এর প্রমাণ আমি নিজেই।

.

-Exactly দোস্ত, তুই তোর দাদার বাবার কাছ থেকে এসেছিস এর প্রমাণ তুই নিজেই। ঠিক তেমনি এই মহাবিশ্বই প্রমাণ যে মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা আছে। মহাবিশ্বের প্রত্যেকেটি আনুবীক্ষণিক বস্তু থেকে শুরু করে দৃশ্যমান সকল বস্তুও কথার সাক্ষ্য বহন করে যে, মহাবিশ্বের একজন স্রষ্টা অবশ্যই আছে। চাই বিজ্ঞান দিয়ে তাকে প্রমাণ করা যাক বা না যাক।
বিজ্ঞানের সীমাবদ্ধতা আছে, আর মানুষের জ্ঞানেরও সীমাবদ্ধতা আছে। মানুষ তার মস্তিষ্কের খুব কম অংশই ব্যবহার করতে পারে। যার ফলে তার সীমাবদ্ধ জ্ঞান দিয়ে অসীম জ্ঞানের অধিকারী স্রষ্টাকে প্রমাণ করতে যাওয়ায়া হাস্যকরই বইকি।
পিতামাতাকে যদি বিজ্ঞানভিত্তিক প্রমাণ ছাড়াই তুই বিশ্বাস করিস, ভালবাসাকে তুই যদি বিজ্ঞান দিয়ে না মেপেই অনুভব করিস, তোর বংশপরিচয় যদি তুই যাচাই না করেই মেনে নিস; তাহলে স্রষ্টাকে মানতে আপত্তি কোথায়?

.

রাহাত কিছুটা কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে বলল, আচ্ছা! ভাল থাকিস।

.

আমি কাপড় গোছাচ্ছিলাম, পেছনে ফিরে তাকাতেই দরজা বন্ধের আওয়াজ পেলাম।

.

.

.

সেইদিনকার ঘটনাটি মনে মনে স্মরণ করতে গিয়ে চা খাওয়ার কথাই ভুলে গেছিলাম।

.

হঠাৎ রাহাত বলল, কিরে কই হারিয়ে গেলি? চা তো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে। তুই তো আবার ঠাণ্ডা চা খেতে পারিস না।

.

আমি মুচকি হেসে বললাম, এখনো মনে রেখেছিস।

.

চা খেতে খেতে রাহাত তার জীবনের অনেক কথাই বলল। আমি কেবল নিরব শ্রোতার মত শুনে যাচ্ছিলাম। মাঝে মাঝে হ্যাঁ, হুম, আচ্ছা ইত্যাদি ছাড়া আর কিছুই বলি নি।

.

মসজিদের মিনার থেকে মাগরিবের আজান ভেসে আসল। চায়ের বিল দিয়ে আমরা সালাতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলাম।

.

#স্রষ্টার_অস্তিত্ব – ১

১১৯
নিউরাল বেসিস অফ হলি 'রেইনট্রি'

-সাইফুর রহমান

পর্ব-১

.

রেইনট্রির ঘটনার দায় কার সে আলোচনায় কোনো আগ্রহ নাই। বিজ্ঞানের ছাত্র হিসাবে সব কিছুর মূল খোঁজার অভ্যাস থেকে আগ্রহ জন্মালো ঘটনার পিছনের সাইন্স বের করার। চোখ বন্ধ করে বা বাহ্যিক কিছু আলামত দেখেই কাউকে দোষী বা নির্দোষ বলে দেয়াটা সমীচীন নয়। রেইনট্রির ঘটনার বিস্তারিত বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার আগে আমাদের জানা দরকার, কলা-বিজ্ঞানী আর সেক্যুলারদের দাবি অনুযায়ী নারী ও পুরুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নাই, কথাটার আদৌ বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি আছে কি?

.

বিজ্ঞানের মতে সেক্সচুয়াল বিহেভিয়ার প্যাটার্ন নারী ও পুরুষে ভিন্ন। একজন নারী ও পুরুষের মধ্যকার চিন্তা-ভাবনা, অ্যাকশন অনেকটাই আলাদা। নারী ও পুরুষের জৈবিক চাহিদা হলো ব্রেইনের বিভিন্ন অংশ থেকে আসা ক্রিয়ার চরম অবস্থা। ব্রেইনের লিম্বিক সিস্টেমের এমিগডালা, হিপ্পোক্যাম্পাস ও লিম্বিক লোব মূলত জৈবিক ক্রিয়ায় ইনভল্ভ থাকে। জৈবিক চাহিদার উৎপত্তির জায়গা একই হলেও এক্টিভেশন ও রিঅ্যাকশন প্যাটার্ন নারী পুরুষে আলাদা হয়ে থাকে। ব্রেইনের এমিগডালা অংশ, যা সেক্স হরমোন ধারণ করে, নারীদের থেকে পুরুষে ১৬ শতাংশ বড় হয়ে থাকে। জৈবিক অনুভূতি জাগ্রত করার ক্ষেত্রে এমিগডালার এক্টিভেশন মূল ভূমিকা পালন করে। গবেষণায় প্রমাণিত হয়েছে, ভিজ্যুয়াল জৈবিক উদ্দীপক (যেমন, নগ্ন ছবি অথবা পর্ন) প্রদর্শনে নারী ও পুরুষে আলাদা জৈবিক আগ্রহ ও প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। অনুমিতভাবে পুরুষের ক্ষেত্রে আগ্রহ ও প্রতিক্রিয়া নারীদের থেকে অনেক বেশি। ২০০৪ সালের নেচার নিউরোসায়েন্স সাময়িকীতে একটা গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে, সেখানে গবেষকরা দেখিয়েছেন একই ধরণের ভিজ্যুয়াল জৈবিক উদ্দীপক ব্রেইনের এমিগডালা অংশকে নারীদের থেকে পুরুষদের অনেকগুন্ বেশি এক্টিভেট করে। এমনকি বিভিন্ন ধরণের উদ্দীপকের ক্ষেত্রে ব্রেইনের বিভিন্ন অংশ এক্টিভেট হওয়ার ক্ষেত্রেও নারী পুরুষে ভিন্নতা আছে।

.

উপরের বৈজ্ঞানিক তথ্য এটাই প্রমান করে, নারী ও পুরুষের চিন্তা চেতনায় অনেক পার্থক্য। মেয়ে ও ছেলে বন্ধুরা একই ধরণের হাস্যরস, খুনসুটি, কৌতুক, ছিনেমার গল্প একই সময়ে একই স্থানে বসে শুনলে বা করলেও এটা ভাবার অবকাশ নাই যে তাদের সবার ব্রেন এই কাজগুলোকে একই রকমভাবে ইন্টারপ্রেট করছে। ছেলেদের ভিজ্যুও-পার্সেপশনাল এবিলিটি, ইন্টারপ্রেটেশন ক্ষমতা ও প্যাটার্ন মেয়েদের থেকে আলাদা।

.

পর্ব-২

.

জৈবিক আকাঙ্খা জাগ্রত হয় সেক্স হরমোন নির্গমনের মধ্য দিয়ে, পুরুষের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরোন হরমোন আর নারীর ক্ষেত্রে ইস্ট্রোজেন এবং প্রোজেস্টেরন। টেস্টোস্টেরোন হরমোন পুরুষের যৌনতা, ডোমিনেন্স, এগ্রেসিভনেস ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। যারা বলে ছেলে মেয়ে একসাথে বসে গল্প করার সাথে যৌনতার সম্পর্ক কি? এমনকি কেউ এমন প্রশ্ন করলে তাকে চূড়ান্ত অসামাজিক আবার ব্যাক ডেটেড মনে করা হয়। বৈজ্ঞানিক গবেষণা কিন্তু উল্টো কথা বলে। সাম্প্রতিক গবেষণায় দেখা গেছে, মেয়েদের উপস্থিতি ছেলেদের টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা ৭.৮% বাড়িয়ে দেয় এমনকি মেয়েটি দেখতে কদাকার হলেও। নারীর মাত্র ৫ মিনিটের উপস্থিতি পুরুষের লালায় টেস্টোস্টেরোনের মাত্র বাড়িয়ে দিতে পারে। 'Rapid endocrine responses of

young men to social interactions with young women' শিরোনামে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে একটা ছেলে যখন একটা মেয়ের সাথে একাকী গল্পগুজব করে তখন সেই ছেলের লালায় টেস্টোস্টেরোনের পরিমান অন্য আরেকটি ছেলের সাথে একাকী সময় কাটানোর থেকে বেশি।

.

বন্ধুদের আড্ডায় যে ছেলেটিকে প্রাণবন্ত, ইম্প্রেসিভ ও অনেক খোলামেলা মনে হয়, যার কথা আপনাকে মুগ্ধ করে অথবা আপনি (মেয়ে) বুঝতে পারেন যে ছেলেটি আপনাকে ইমপ্রেস করার চেষ্টা করছে, ধরে নিতে পারেন এর পিছনে ছেলেটির হাই টেস্টোস্টেরোন লেভেল কলকাঠি নাড়ছে। 'Men with elevated testosterone levels show more affiliative behaviours during interactions with women' শিরোনামে আরেকটি প্রকাশনায় বলা হয়েছে, ফিমেল ইন্টারএকশনের মাধ্যমে টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা বেড়ে গেলে ছেলেদের বিহেভিওরাল পরিবর্তন আসে। কথায় মুগ্ধতা, চিত্তাকর্ষক আচরণ, নিজেকে মেলে ধরা ইত্যাদি দিকগুলো বেশি ফুটে উঠে। গবেষণাটিতে দেখানো হয়েছে ইন্ট্রাসেক্সচুয়াল কম্পিটিশনে ছেলেদের টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা বাড়ার ফলে মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ আগের থেকে বৃদ্ধি পায়। এমনকি পরবর্তীতেও এর কার্যকারিতা বহাল থাকে ফলে দেখা যায় ছেলেরা আগের থেকে বেশি হাসছে, নিজেকে উপাস্থপনের ক্ষেত্রেও অতিরঞ্জন করছে , মেয়েদের প্রতি চোখাচোখির পরিমান বেড়ে যাচ্ছে। মজার বিষয় হলো কম্পিটিশনটা যখন ছেলেদের নিজেদের মধ্যে থাকে তখন কোনো ছেলের মধ্যে এই ধরণের পরিবর্তন চোখে পড়ে না।

.

অনেকে হয়তো ভাবছেন, সুন্দর হাসি বা ঢং করে কথা বলা বা আড্ডা জমিয়ে রাখা ছেলেদের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা বাড়লেও যারা একটু বদমেজাজি, রাগী তাদের মধ্যে এই সব জৈবিক হরমোনের কোনো প্রভাব নাই, তাই তাদের সাথে মেলা মেশায় সমস্যা নাই। আপনাকে হতাশ করে দেয়া এই স্টাডিতে 'The presence of a woman increases testosterone in aggressive dominant men' বলা হয়েছে যারা দীর্ঘদিন যাবৎ সঙ্গীহীন বা রোমান্টিক সম্পর্কে নাই তাদের এগ্রেসিভ আচরণ ও ডোমিনেন্সির মূলকারণ উচ্চ মাত্রার টেস্টোস্টেরোন।

.

মূলকথা ও অপ্রিয় সত্য হলো, নারীর উপস্থিতি পুরুষের জৈবিক হরমোনাল রেগুলেশনের মূল অনুঘটক। আজকে আমাদের আশেপাশে ঘটে যাওয়া ঘটনার মূল উদ্ধার করতে গলদঘর্ম হওয়ার মূল কারণ নারী ও পুরুষের যে আলাদা দৃষ্টিভঙ্গি আছে সেই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া। এর আগের আমরা জেনেছি নারীদের ক্ষেত্রে জৈবিক ক্রিয়ার মেকানিজম পরুষের থেকে আলাদা। একই ঘটনা, একই জিনিস একই সময়ে একই স্থানে ঘটলেও পুরুষের ক্ষেত্রে তার প্রতিক্রিয়া নারীদের থেকে আলাদা। একটা মেয়ে যখন ছেলেদের সাথে আড্ডা দেয়, তখন মেয়েটার দৃষ্টিভঙ্গি একরকম থাকে আর অধিকাংশ ছেলেরা ব্যাপারটিকে অন্য মাত্রায় নিয়ে যায়, এর পিছনে যে বৈজ্ঞানিক কারণ আছে তা ইতিমধ্যেই পরিষ্কার হয়ে যাওয়ার কথা।শুধু আবেগ আর ট্রেন্ড ফলো না করে বাস্তবতা ও সত্যটাকে মেনে নিয়ে পথ চললে এসব দুর্ঘটনা থেকে বেঁচে থাকা খুবই সম্ভব।

.

পর্ব-৩

.

আমরা ইতিমধ্যেই জেনেছি, নারী ও পুরুষের হরমোনাল রেগুলেশন ও তাদের এক্টিভেশন প্যাটার্ন আলাদা। পুরুষের ক্ষেত্রে টেস্টোস্টেরোনের মাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্য যেমন নারীর উপস্থিতি ভূমিকা পালন করে তেমনি নারীদের এস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরন বেড়ে যাওয়ার পিছনেও অল্পবিস্তর হলেও পুরুষের উপস্থিতি ভূমিকা পালন করে। পার্থক্য হলো, পুরুষের বিহেভিওরাল সাইকোলজি নারী থেকে আলাদা।

.

এখন প্রশ্ন হলো, প্রাকৃতিকভাবে পুরুষের আত্মনিয়ন্ত্রণহীনতা, পারিপার্শিক পরিস্থিতির দ্বারা প্রভাবিত হওয়া কি তাদের অনৈতিক

কাজের বৈধতা দেয়? বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হলো যে নারীর উপস্থিতি পুরুষের মনকে প্রভাবিত করে, এর মানে কি তাহলে পুরুষেরা স্বনিয়ন্ত্রনের বাইরে চলে যাবে? এবং সব দায়ভার নারী ও চারপাশের পরিবেশের উপরে চাপাবে? অত্যন্ত জটিল ও সূক্ষ একটি বিষয়। মোটাদাগে বলতে হবে, অবশ্যই পুরুষেরা নিজেদের নিয়ন্ত্রণ করে চলবে। এখন প্রশ্ন হলো, এই 'নিয়ন্ত্রণের' মাত্রাটা কেমন হবে? এটা কে নির্ধারণ করবে? কেউ যদি চায় পুরুষ সবসময় ও যেকোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ করবে সেটা হবে অন্যায় ও অবিচারমূলক আবদার। একটি ভারসাম্যমূলক অবস্থাই এই পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারে। এমনকি আইন প্রয়োগ করেও এটা দূর করা সম্ভব নয়। স্ট্যাটিসটিক্স অনুযায়ী, সবচেয়ে বেশি ধর্ষণ সংগঠিত হওয়া দেশগুলোর আইন পরিস্থিতি বাকি বিশ্বের থেকে ভালো।

.

নৈতিকতা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি ছাড়া এই অবস্থা থেকে উত্তরণের অন্য কোনো উপায় নেই। প্রভোকেটিভ আচরণ পরিহার করলে বিপরীত লিঙ্গের অতি আক্রমণাত্মক ও অনিয়ন্ত্রিত আচরণ দূর হতে পারে। বাস্তবতা হলো, ফেমিনিস্টরা যতই চিল্লা ফাল্লা করুকনা কেনো, তাদের কোনো ক্ষমতা বা প্রভাব নেই এই অবস্থা উত্তরণের ক্ষেত্রে। স্বাধীনতার নামে আমি যা খুশি তা করবো এবং এর ফলাফল ভোগ করবো না এটা সম্পূর্ণ বাস্তবতা বিবর্জিত। সাধারণত ধর্মীয় মূল্যবোধে বিশ্বাসীরা এই ধরণের অনৈতিক আচরণ থেকে দূরে থাকে। কোনো প্রচলিত আইন বা শাস্তির ভয়ে নয়, বিশ্বাসের জায়গা থেকে তারা এসব পরিহার করে। ধর্মীয় জীবন যাপনে অভ্যস্ততা আনতে পারলে সমাজে প্রচলিত অনেক অন্যায় ও অনৈতিক কাজ থেকে দূরে থাকা সম্ভব।

১২০
ছবি ও মূর্তি সম্পর্কে হুমায়ুন আহমেদের একটি লেখা, সেকুলারদের অপপ্রচার, কিছু বিভ্রান্তি এবং এর নিরসন

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

হুমায়ুন আহমেদের একটা লেখাকে কেন্দ্র করে অনলাইনে বেশ বিভ্রান্তি ছড়িয়ে পড়েছে। লেখাটি ছবি ও মূর্তি বিষয়ক। বেশ কয়েকজন সেলিব্রেটি ঐ লেখাটা নিজ ওয়ালে পোস্ট করার পর সেটা এখন ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে গেছে [এ রকম একটা লেখার লিঙ্কঃ https://goo.gl/I4XNAU]। সেকুলার ফেসবুক সেলিব্রেটিদের প্রচারের ফলে অনেকেই এই ব্যাপারটা নিয়ে বিভ্রান্তিতে পড়তে পারেন এই কারণে লেখাটা লিখছি।

.

সেই লেখায় দাবি করা হয়েছেঃ

১। রাসুল(ﷺ) নাকি মক্কা বিজয়ের সময়ে কাবার ভেতর মরিয়ম(আ) এর ছবি রেখে দিয়েছিলেন।

২। আয়িশা(রা) যেহেতু পুতুল নিয়ে খেলতেন কাজেই মূর্তি রাখা নাজায়েজ কিছু না

৩। জেরুজালেম বিজয়ের পর প্রাণীর ছবিসহ একটি ধুপদানি উমার (রা) এর হাতে আসে আর তিনি সেটি মসজিদে নববীতে ব্যবহারের জন্য আদেশ দেন।

৪। বাংলাদেশে প্রচলিত মিলাদে যার কবিতা পাঠ করা হয় সেই শেখ সাদীর মাজারের সামনেই তার একটি মর্মর পাথরের ভাস্কর্য আছে। সেখানকার মাদ্রাসার ছাত্ররা তা ভাঙেনি।

.

এসব তথ্য উল্লেখ করে ছবি,মূর্তি, ভাস্কর্য ইত্যাদিকে জায়েজ বলবার চেষ্টা করা হয়েছে।

.

প্রথমেই বলিঃ হুমায়ুন আহমেদ কোন আলিম ছিলেন না।কাজেই তার নামে প্রচার হওয়া একটা লেখাকে কেন্দ্র করে হালাল-হারামের মত কোন ডিসিশনে চলে যাওয়া বুদ্ধিমানে কাজ নয়।তার লেখাগুলোতে যে রেওয়ায়েতগুলো আছে সেগুলো কতটুকু সহীহ সেটাও দেখার বিষয়।

.

সেই লেখাটায় ইবন ইসহাকের একটা রেওয়ায়েতের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে রাসুল(ﷺ) নাকি মক্কা বিজয়ের সময়ে কাবার ভেতর মরিয়ম(আ) এর ছবি রেখে দিয়েছিলেন।অথচ নির্ভরযোগ্য সনদে জানা যায় নবী(ﷺ) বরাবরই ছবি,মূর্তি ইত্যাদির চরম বিরোধী ছিলেন।

.

"আয়িশা(রা) বলেন, নবী(ﷺ) এর অসুস্থতার সময় তাঁর জনৈকা স্ত্রী একটি গির্জার কথা উল্লেখ করলেন। গির্জাটির নাম ছিল মারিয়া। উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা ইতোপূর্বে হাবাশায় গিয়েছিলেন। তারা গির্জাটির কারুকাজ ও তাতে বিদ্যমান প্রতিকৃতিসমূহের কথা আলোচনা করলেন। নবী(ﷺ) শয্যা থেকে মাথা তুলে বললেন, ওই জাতির কোনো পুণ্যবান লোক যখন মারা যেত তখন তারা তার কবরের উপর ইবাদতখানা নির্মাণ করত এবং তাতে প্রতিকৃতি স্থাপন করত। এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকৃষ্টতম সৃষ্টি।'

[সহীহ বুখারী হা. ১৩৪১ সহীহ মুসলিম হা. ৫২৮ নাসায়ী হা. ৭০৪]

.

“আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস(রা) বলেন, ‘(মক্কা বিজয়ের সময়) নবী(ﷺ) যখন বায়তুল্লাহতে বিভিন্ন প্রতিকৃতি দেখলেন তখন তা মুছে ফেলার আদেশ দিলেন। প্রতিকৃতিগুলো মুছে ফেলার আগ পর্যন্ত তিনি তাতে প্রবেশ করেননি।’
[সহীহ বুখারী হা. ৩৩৫২]

.

এই ছিল যাঁর আদর্শ, তিনি কী করে মরিয়ম(আ) এর ছবি আল্লাহর ঘর কাবার ভেতর থাকতে দিতে পারেন?
ইবন ইসহাকের যে রেওয়ায়েতের কথা বলা হচ্ছে তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ঘটনা এই সহীহ রেওয়ায়েতগুলোতে দেখা যাচ্ছে। সহীহ এর বিপরীতে ঐ ঘটনাটি প্রমাণ করে যে সেটি কোন সত্য ঘটনা নয়।

.

ইবন ইসহাকের কথিত রেওয়ায়েতের ব্যাপারে যা বলবঃ ইবন ইসহাকে যদি থেকেও থাকে, সেটা এই ঘটনার সত্যতার প্রমাণ না।ইবন ইসহাকের সিরাত গ্রন্থের ব্যাপারে আমাদের কিছু সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত। ইবন ইসহাকে প্রচুর জাল রেওয়ায়েত আছে। Satanic verse এর কুখ্যাত বানোয়াট ঘটনার রেওয়ায়েতও কিন্তু ইবন ইসহাকের সিরাত গ্রন্থে পাওয়া যায়।

ইবন ইসহাক(র) এর গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে ইবন হিশাম(র) এর সিরাত গ্রন্থ। ইবন ইসহাক থেকে এটি তৈরি করা হয়েছে। এটি ইবন ইসহাকের চেয়ে অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য। অনির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত অপেক্ষাকৃত কম।

ইবন হিশামের গ্রন্থে[সীরাতুন্নবী(স)--ইবন হিশাম, ৪র্থ খণ্ড {ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ}, পৃষ্ঠা ৬৯।] ঐ ঘটনার জায়গায় নবী(ﷺ) কর্তৃক কাবার ছবিসমূহ মুছে ফেলবার নির্দেশ দেবার কথা আছে। কোন ছবি রাখবার বিবরণ সেখানে নেই। [ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://goo.gl/F3BiUy] বাংলাভাষী পাঠকরা সহজেই চেক করে দেখতে পারেন। এটাও প্রমাণ করে যে মরিয়ম(আ) এর ছবি রেখে দেবার ঘটনাটা সত্য নয়।আর আর যারা মূল আরবি ইবারত চেক করতে পারবেন তাদের কাছে আরো কিছু জালিয়াতী ধরা পড়ে যাবে।
আর তা হচ্ছেঃ ইবন ইসহাক কিংবা ইবন হিশাম--কোন গ্রন্থেরই মূল আরবি ইবারতে ঐ ঘটনার অস্তিত্ব নেই।ইংরেজি ভাষার অনুবাদক আলফ্রেড গিয়োম অন্য জায়গা থেকে বর্ণনাটি সংগ্রহ করে সেখানে জুড়ে দিয়েছেন। আর তার বিভ্রান্তিকর অনুবাদ পড়ে অনেকেই ভুল জিনিস জেনেছেন।তাছাড়া হুমায়ুন আহমেদের ঐ লেখাতে বেশ কিছু (বিভ্রান্তিকর)তথ্য যোগ করা হয়েছে যা এমনকি গিয়োমের ইংরেজি অনুবাদেও নেই। [বিস্তারিত জানতে দেখুনঃ https://goo.gl/Bu5tCx] অর্থাৎ এখানে অনুবাদক আলফ্রেড গিয়োম কিংবা নিবন্ধকার হুমায়ুন আহমেদ কেউই বিশ্বস্ততার পরিচয় দেননি।

.

আর তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নিই যে হুমায়ুন আহমেদের নিবন্ধে উল্লেখিত ঘটনাটি সত্য, তাহলেও একটা কথা থাকে। সেই ঘটনাতেও তো মরিয়ম(আ)এর বাদে অন্য সকল ছবি-মূর্তি ভেঙে ফেলার কথা আছে! কাজেই ঐ ঘটনা থেকেও তো মূর্তি ভেঙে ফেলাই প্রমাণ হয়, সুবহানাল্লাহ। 😃:D ইসলামে মরিয়ম(আ) এর একটা আলাদা মর্যাদার স্থান আছে। তিনি কোন প্যাগান দেবী নন। কিন্তু পৌত্তলিকদের(pagans) দেব-দেবীদের(যেমন গ্রীক দেবী থেমিস) ক্ষেত্রে তো সে রকম কোন ব্যাপার নেই।কাজেই ঐ অনির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত থেকেও থেমিস বা অন্য প্যাগান মূর্তি ভেঙে ফেলার কথাই সাবেত হয়।

.

আয়িশা(রা) এর পুতুল খেলার ব্যাপারটি নিয়েও আলোচ্য লেখায় একটি বিভ্রান্তি আছে। আয়িশা(রা) কাপড়ে তৈরি যে পুতুল নিয়ে খেলতেন, সেগুলোর আজকের দিনকার পুতুলের মত কোন মাথা ছিল না। সেগুলোতে কোন নাক-মুখ-চোখ এগুলো বোঝা যেত না।সেই পুতুল মোটেও আজকের দিনের বার্বি ডলের মত কিছু ছিল না! এ রকম পুতুল দিয়ে খেলা জায়েজ। বিস্তারিত এই ফতোয়াতে দেখা যেতে পারেঃhttps://islamqa.info/en/9473
আর খোদ আয়িশা(রা) থেকেই এমন হাদিসের বিবরণ পাওয়া যায় যাতে ভাস্কর-চিত্রকরদের পরকালিন শাস্তির কথা আছে।

.

আয়িশা(রা) ও আব্দুল্লাহ ইবন উমার(রা) থেকে বর্ণিত, নবী(ﷺ) বলেছেন-

" এই প্রতিকৃতি নির্মাতাদের (ভাস্কর, চিত্রকরদের) কিয়ামত-দিবসে আযাবে নিক্ষেপ করা হবে এবং তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হবে, যা তোমরা 'সৃষ্টি' করেছিলে তাতে প্রাণসঞ্চার কর!'
[সহীহ বুখারী হা. ৭৫৫৭, ৭৫৫৮]

.

উমার(রা) সম্পর্কে যে ঘটনাটা বলা হয়েছে সেটা কুরআন ও সহীহ হাদিসের নির্দেশের বিপরীত।
এ কী করে সম্ভব যে উমার(রা) কুরআন ও সুন্নাহ নির্দেশিত কথার বিরোধিতা করে ছবিযুক্ত জিনিস রাখবেন?

.

কুরআন মাজীদে মূর্তি ও ভাস্কর্যকে পথভ্রষ্টতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এক আয়াতে এসেছে-

.

"হে প্রভু(আল্লাহ), এরা (মূর্তি) অসংখ্য মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে!"
[সূরা ইবরাহীম : ৩৬]
অন্য আয়াতে এসেছে-
''আর তারা বলেছিল, তোমরা পরিত্যাগ করো না তোমাদের উপাস্যদের এবং পরিত্যাগ করো না ওয়াদ্দ সুওয়াকে, ইয়াগূছ, ইয়াঊক ও নাসরকে। অথচ এগুলো অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে।''
[সূরা নূহ : ২৩-২৪]
এ আয়াতের ব্যাখ্যায় একটি দীর্ঘ ও প্রাসঙ্গিক হাদিস এসেছে যাতে উল্লেখ আছে যে মৃত ব্যক্তির স্মরণে তৈরিকৃত ভাস্কর্য থেকে পৃথিবীতে কী করে সর্বপ্রথম মূর্তিপুজার আবির্ভাব হয়েছে।হাদিসটির লিঙ্কঃ https://goo.gl/Q0u2U1
কুরআন মাজীদে একটি বস্তুকে ভ্রষ্টতার কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হবে এরপর ইসলামী শরিয়তে তা বৈধ ও গ্রহণযোগ্য থাকবে-এর চেয়ে হাস্যকর কথা আর কী হতে পারে!
এই আয়াতগুলো থেকে পরিষ্কার জানা যাচ্ছে যে, মূর্তি-ভাস্কর্য এসব জিনিস সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাজ্য।
হাদিসেও নবী(ﷺ) মূর্তি-ভাস্কর্য সম্পর্কে পরিষ্কার বিধান দান করেছেন।

.

আমর ইবন আবাসা(রা) থেকে বর্ণিত, নবী নবী(ﷺ) বলেন 'আল্লাহ তাআলা আমাকে প্রেরণ করেছেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখার, মূর্তিসমূহ ভেঙে ফেলার, এবং এক আল্লাহর ইবাদত করার্ ও তাঁর সঙ্গে অন্য কোনো কিছুকে শরীক না করার বিধান দিয়ে।
[সহীহ মুসলিম হা. ৮৩২]

.

"আবুল হাইয়াজ আসাদী বলেন, আলী ইবন আবী তালিব(রা) আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে ওই কাজের দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করব না, যে কাজের জন্য নবী(ﷺ) আমাকে প্রেরণ করেছিলেন? তা এই যে, তুমি সকল প্রাণীর মূর্তি বিলুপ্ত করবে এবং সকল সমাধি-সৌধ ভূমিসাৎ করে দিবে।' অন্য বর্ণনায় এসেছে,... এবং সকল চিত্র মুছে ফেলবে।'
[সহীহ মুসলিম হা. ৯৬৯]

.

আলী ইবন আবী তালিব(রা) বলেন, নবী(ﷺ) একটি জানাযায় উপস্থিত ছিলেন। তখন তিনি বললেন, 'তোমাদের মধ্যে কে আছে, যে মদীনায় যাবে এবং যেখানেই কোনো প্রাণীর মূর্তি পাবে তা ভেঙ্গে ফেলবে, যেখানেই কোনো সমাধি-সৌধ পাবে তা ভূমিসাৎ করে দিবে এবং যেখানেই কোনো চিত্র পাবে তা মুছে দিবে?' আলী(রা) এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রস্তুত হলেন।
এরপর নবী(ﷺ) বলেছেন, 'যে কেউ পুনরায় উপরোক্ত কোনো কিছু তৈরী করতে প্রবৃত্ত হবে, সে মুহাম্মাদের(ﷺ) প্রতি নাযিলকৃত দ্বীনকে অস্বীকারকারী।'
[মুসনাদ আহমাদ হা. ৬৫৭]

.

সুবহানাল্লাহ, কী স্পষ্ট কথা!

.

এই হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট জানা যাচ্ছে যেঃ প্রাণীর মূর্তি/ভাস্কর্যমাত্রই ইসলামে হারাম এবং তা বিলুপ্ত করে দেয়াই হল ইসলামের বিধান। আর এগুলো স্থাপনের পক্ষে সাফাই গাওয়া ইসলামকে অস্বীকারকারী সম্প্রদায়ের বৈশিষ্ট্য।কেউ এমন কাজ ভুলে করে ফেললে তার উচিত আল্লাহর নিকট তাওবা করা। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

.

আব্দুল্লাহ ইবন আব্বাস(রা) বলেন, আমি মুহাম্মাদ(ﷺ)কে বলতে শুনেছি, ''যে কেউ দুনিয়াতে কোনো প্রতিকৃতি তৈরি করে কিয়ামত-দিবসে তাকে আদেশ করা হবে সে যেন তাতে প্রাণসঞ্চার করে অথচ সে তা করতে সক্ষম হবে না।''
[সহীহ বুখারী হা. ৫৯৬৩]

.

আর সব শেষে শেখ সাদীর মাজারের ব্যাপারে যা বলব---ইসলাম চলে কুরআন আর সুন্নাহ দিয়ে।
শেখ সাদীর মাজার কোন দলিল নয়।
তার দেশ ইরান একটি শিয়া দেশ।শিয়ারা কী করল আর না করল তা কিভাবে ইসলামের দলিল হয়? শিয়ারা একটি বিদআতি ও পথভ্রষ্ট দল।শিয়াদের দেশে একটি মাজারের কাছে অবস্থিত প্রতিকৃতি দ্বারা মূর্তি-ভাস্কর্যকে ইসলামে জায়েজ বলবার চেষ্টা করা ইসলাম সম্পর্কে ভয়াবহ অজ্ঞতারই পরিচায়ক। বাংলাদেশ, সৌদি আরব, তুরস্ক, মিশর, ইরাক এমনকি সারা মুসলিম বিশ্বও যদি কোন হারাম কাজে লিপ্ত হয় তবুও সেটা ইসলামে জায়েজ হয়ে যায় না।

.

আল্লাহ আমাদের বুঝবার তৌফিক দিন।
ইসলামে হালাল-হারামের বিধান জানার জন্য ঔপন্যাসিক কিংবা সেকুলার ফেসবুক সেলিব্রেটির পোস্ট পড়া বর্জনীয়; আমাদের উচিত কুরআন-সুন্নাহ এবং আলিমদের লেখা থেকে এসব বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করা।ইসলামে হালাল ও হারাম সাব্যস্ত হয় কুরআন দ্বারা এবং নির্ভরযোগ্য সনদ থেকে প্রাপ্ত হাদিস তথা সুন্নাহ দ্বারা। নির্ভরযোগ্য সনদের রেওয়ায়েতের সমর্থন ব্যতিত কোন দুর্বল বা জাল রেওয়ায়েত থেকে কখনো কিয়াস হয় না।
এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত ইসলামী বিধান জানার জন্য "ছবি ও মূর্তির ব্যাপারে ইসলামের হুকুম" (আখতারুজ্জামান মুহাম্মাদ সুলাইমান) বইটি পড়া যেতে পারে।ডাউনলোড লিঙ্কঃ
https://islamhouse.com/bn/articles/278880/

১২১

অপ্রমাণ্যের প্রমাণ

-তানভীর আহমেদ

[১]

সকাল সকাল আবু বকরের (রদিআল্লাহু আ'নহু) কাছে উপস্থিত হয়েছে কিছু লোক। কী যেন শুনতে এসেছে তারা। চোখে মুখে উন্নাসিকতা আর উচ্ছ্বাস।

.

"তোমার বন্ধু সম্পর্কে এখন কী বলবে হে আবু বকর!? তিনি তো এখন দাবি করছেন - তিনি নাকি গতরাতে বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন, সেখানে নাকি ইবাদাত করেছেন, আবার একরাতের মধ্যেই মক্কায় ফিরে এসেছেন।"

.

আবু বকর (রদিআল্লাহু আ'নহু) ভাবলেন স্বভাবসুলভ মিথ্যাচারই হয়তো করছে কুরাঈশরা। "তোমরা আমাকে আগে বল তিনি কি সত্যিই একথা বলেছেন কিনা?" কুরাঈশ লোকগুলো হ্যাঁসূচক উত্তর দিল। "তিনি তো এখনও লোকেদের কাছে এই কাহিনী বর্ণনা করছেন।"

.

আবু বকর (রদিআল্লাহু আ'নহু) বললেন, "আল্লাহর কসম! যদি তিনি ﷺ একথা বলে থাকেন, তবে তিনি সত্য বলছেন। আর এতে এত্ত আশ্চর্য্যের কী আছে? তিনি যখন বলেন যে তাঁর কাছে আসমান থেকে ওহী নাযিল হয়, একজন ফেরেশতা তা তাঁর কাছে নিয়ে আসেন আমি তো সেসব কথায় বিশ্বাস করি; আর সেগুলোতো তোমাদের এখনকার বর্ণনার চেয়েও বিস্ময়কর!"

.

[২]

মানুষ প্রমাণ খুঁজে, প্রমাণের উপযুক্ততা নিয়ে প্রশ্ন তুলে শত আলোচনা করে জ্ঞান জাহির করে ছাড়ে। গবেষণা আর বিজ্ঞানচর্চার এই যুগে প্রমাণগুলো আজ বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠেছে। কিন্তু প্রমাণ চাই করতে করতে মানুষ যে গুরুত্বপূর্ণ একটি বাস্তবতা ভুলে যায় তা হল প্রমাণ ছাড়াই অনেক অপ্রমাণ্য বিষয়াদি সে বাস্তবজীবনে অনায়াসে স্বীকার করে নেয়, বিশ্বাস করে নেয় এমনসব অপ্রমাণ্য বিষয়াদি যা বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা যায় না।

.

দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাগত সত্য [Philosophical & Logical Truths] : বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক বা Theoretical বিষয়গুলো যুক্তি ও গণিতের উপর নির্ভর করে প্রমাণ করা হয় আর বিজ্ঞান যেসব দর্শন ও যুক্তিবিদ্যার উপর টিকে রয়েছে সেগুলো বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। যেমনঃ একইসাথে একটি বিষয় সত্য আবার মিথ্যা হতে পারে না – এই যুক্তিটির উপর ভিত্তি করে অনেকসময়ই সিদ্ধান্তে পৌঁছানো হয়। অথচ 'একইসাথে একটি বিষয় সত্য আবার মিথ্যা হতে পারে না' এই যুক্তিটির নিজেরই কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দেওয়া যায় না। এটা কেবলই উপলব্ধির বিষয়। তেমনি দর্শন ও যুক্তিবিদ্যাগত অন্যান্য সমস্ত সত্যগুলোই অপ্রমাণ্য, কেবল উপলব্ধির বিষয়। 'পৃথিবীর সমস্ত আপেল লাল' – এই বাক্য সত্য হলে ইকবাল সাহেবের কেনা আপেলটি যে লালই হবে তার আলাদা কোনো প্রমাণ দিতে হয় না। কারণ দর্শনগত ও যুক্তিগত ধারণাগুলো বিজ্ঞান প্রথমেই সত্য ধরে নিয়েই সামনে এগোয়, তাই সেগুলো আবার প্রমাণ করতে গেলে চক্রাকারে তর্ক ছাড়া আর কিছুই হবে না (argument in a circle).

.

আর গাণিতিক সত্যগুলোও (Mathematical Truths) দর্শনগত ও যুক্তিগত সত্যের আরেকটি রূপমাত্র। যেমনঃ যেকোনো ভাষাতেই 'এক' এর পর 'দুই' সংখ্যাটাই আসে বা এক এক যোগ করলে 'দুই' ই হয় – এমনসব অতিসাধারণ গাণিতিক সত্যগুলোও বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা যায় না, কেবল প্রয়োগে দেখানো যায় মাত্র। আর যেহেতু সকল পর্যবেক্ষণই অতীত হয়ে যায়, তাই পরবর্তী ১+১=২ হবে তা কেউ অস্বীকার করলে তাকে ভুল প্রমাণ করবার কোনো উপায় নেই। কিন্তু তবুও এগুলো কেউ অস্বীকার করে না, কোনোরকম প্রমাণ ছাড়াই আমরা মেনে নিই যে পরবর্তী ১+১=২ ই হবে।

.

অধিবিদ্যাগত / অবস্তুগত সত্য [Metaphysical Truths] : আমাদের এই জগতটা আসলে কোনো কম্পিউটার সিম্যুলেটর বা কারও স্বপ্ন নয়, বরং বাস্তবজগত আর যেসবকিছু হচ্ছে তা বাস্তবিকই হচ্ছে, ১০ মিনিট আগে যে ঘটনাটা অতীত হয়েছে তা সত্যিই ঘটেছে, নিজ স্বত্বা বা 'আমি' এর অনুভূতি, অন্যান্য মানুষের স্বত্বার বা মনের অস্তিত্ব ইত্যাদি সত্যগুলো এর অন্তর্ভূক্ত আর বিজ্ঞানের আওতারই বাহিরে। কোনোরকম প্রমাণ ছাড়াই আমরা এই জগতের বাস্তবতা, অতীতের বাস্তবতা, নিজ ও অপরাপর স্বত্বার অস্তিত্ব ইত্যাদি Metaphysical ব্যাপারগুলো দিব্যি মেনে নিই।

.

মানবিকতা ও নৈতিকতা [Morals & Ethics] : মানবিকতা ও নৈতিকতাকে কখনো বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা বা মাপা যায় না। নাৎসি বিজ্ঞানীরা যে গ্যাস চেম্বারে মানুষ হত্যায় মেতে উঠতো, হিংস্র সব গবেষণায় মেতে উঠতো সেগুলো যে নীতিবিবর্জিত, অমানবিক ছিল তা বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা সম্ভব নয়। এছাড়া ধর্ষণ, অযাচার ইত্যাদির মত নৈতিকতা বিবর্জিত কার্যকলাপের কোনো বৈজ্ঞানিক সদুত্তর নেই। বিজ্ঞান এগুলোর খারাপ প্রভাব দেখাতে পারে মাত্র। কিন্তু এগুলো অপরাধ কিনা সেই প্রশ্নে বিজ্ঞান নীরব।

.

ধর্মীয় বিশ্বাস আর বিধিবিধানে মুক্তচিন্তার দাবিদারেরা বিজ্ঞান টেনে আনলেও ধর্ষণ, সমকামীতার মত বিষয়াদিতে ঠিকই 'মানবিকতা' আমদানি করে, তখন তাদের বিজ্ঞান পালিয়ে বেড়ায়। বাস্তবতা বিবর্জিত হয়ে যারা LGBT rights বা সমকামিতা সমর্থন করে আর 'ভালবাসা যে কারও মধ্যে হতে পারে', 'এটা ব্যতিক্রম তবে অস্বাভাবিক কিছু না' এধরনের ফালতু বাহানা দাঁড় করায়, তাদের বেশিরভাগও অযাচার বা Incest কে অনৈতিক মনে করে; তখন তাদের ওইসব গাঁজাখুরি যুক্তি আর দেখা যায় না। আবার কিছু কুলাঙ্গার স্রষ্টাকে অস্বীকার করে বিজ্ঞানকে রব্বের আসনে বসায়। কিন্তু বিজ্ঞান নৈতিকতার প্রশ্নে অচল হওয়ায় ওই কুলাঙ্গাররাও রক্তসম্পর্কের অযাচারকে অনৈতিক প্রমাণ করতে পারে না; তবুও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এদেরকে যদি বলা হয় নিজ স্ত্রীকে নিজ ছেলের সাথে অযাচার করতে দেবে কিনা - তখন এদেরও নৈতিকতা উথলে উঠে। আর সর্বশেষ শ্রেণীর যেসব চূড়ান্ত কুলাঙ্গাররা সমকামীতা ছাড়াও নিজ বাবা-মা, ছেলেমেয়েদের সাথেও এমন অযাচারের বৈধতা দিয়ে দেয়, সেই কুলাঙ্গারদের ব্যাপারে বোঝাই যায় যে এরা আসলে সমাজে কী প্রতিষ্ঠা করতে চায়... এককথায় চূড়ান্ত মাত্রার ব্যাভিচার ও অরাজকতা – ঠিক যেমনটা শয়তান চায়।

.

নৈতিকতা এবং এর থেকে উৎসরিত অপরাধবিজ্ঞান গড়েই উঠেছে ধর্মীয় অনুশাসনগুলোকে কেন্দ্র করে। কেননা, কারও ইচ্ছা হলেই কোনোকিছু করে ফেলতে পারবে কিনা - এমন সমস্ত বিষয়াদি শেষমেশ নৈতিকতার প্রশ্নে এসে দাঁড়ায় যা বিজ্ঞানের আওতার বাহিরে। আর মানুষভেদে যেহেতু নৈতিকতার মূল্যায়ন ভিন্ন, তাই যে কেউ দাবি করতেই পারে যে সে আরেকজনের নির্ধারণ করে দেওয়া নৈতিকতার স্কেলে চলবে কেন – তাই এক্ষেত্রেও সবচেয়ে যৌক্তিক হল সৃষ্টিকর্তা নির্ধারিত সার্বজনীন নৈতিকতা মেনে নেওয়া। তাছাড়া, সৃষ্টিকর্তাই বিধান প্রদান ও নৈতিকতার স্কেল নির্ধারণের সবচেয়ে বেশি হকদার ও একচ্ছত্র অধিকারী। তানাহলে যে যা খুশি তাই করতে চাওয়ার অধিকার দিতে দিতে একসময় সভ্যতার পতন নিশ্চিত হয়; একারণেই আধুনিক Individualism, Secularism তথা সেক্যুলার ব্যবস্থা ক্রমান্বয়ে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যায়। আর সমস্ত অধঃপতনের সূত্রপাত হয় সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর নির্ধারিত নৈতিকতা ও অনুশাসন ছুঁড়ে ফেলে বিজ্ঞান দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টায় মেতে উঠে।

.

একটি বাস্তব উদাহরণ হল, আমেরিকায় ৩০ – ৪০ বছর আগে সমকামিতাকে অপরাধ আর মানসিক ত্রুটিরূপে দেখা হলেও এখন সেখানে এটা বৈধ করা হয়ে গেছে। এছাড়া বিশ্বের কিছু জায়গায় Incest Marriage এরও বৈধতা রয়েছে! আবার কিছু জায়গায় রীতিমত উলঙ্গ ঘোরাফিরার অধিকারের জন্য আন্দোলনও চলে। আর বলাই বাহুল্য, সভ্যবেশী অসভ্যদের দেশে মানুষ উলঙ্গ চলাফেরার নাকি নির্ধারিত বহু বীচ রয়েছে! আর এসমস্তকিছুর শুরু হয়েছে স্রষ্টাকে অস্বীকার করে, তাঁর নির্ধারিত নৈতিকতাকে অস্বীকার করে বিজ্ঞান দিয়ে সবকিছু ব্যাখ্যা করার চেষ্টার পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে। কারণ ওই যে, বিজ্ঞানে 'নৈতিকতা' প্রশ্নের কোনো উত্তর নেই!

.

শিল্পকলা ও নান্দনিকতা [Aesthetic and literature] : শিল্পকলার মূল্য বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। সৃজনশীলতা, সৌন্দর্য্যবোধ বিষয়গুলো বিজ্ঞানের আওতার বাহিরে আর তাই শিল্পসাহিত্যও বিজ্ঞান দ্বারা মাপা যায় না। সেকারণে পাথরের ভাস্কর্য যত নিখুঁতই হোক না কেন, বিজ্ঞানের হিসাবে তার মূল্য কেজিদরে অন্যান্য পাথরের মতই। তেমনি চিত্রকর্ম, সাহিত্যকর্ম বাস্তবে যতই সৃজনশীল ও নান্দনিক হোক না কেন সেগুলোর সবই বিজ্ঞানের হিসাবে রীতিমত মূল্যহীন। কারণ শিল্পসাহিত্য বিজ্ঞান দ্বারা অপ্রমাণ্য।

.

দেশীয় কলাবিজ্ঞানীরা আল্লাহকে অবিশ্বাসের জন্য এত বিজ্ঞান কপচায়, অথচ শিল্পকলারই যে কোনো বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই তা তাদের মনে থাকে না। এছাড়া শিল্পবোধে আসক্তি বেশিরভাগ সময়েই নগ্নতায় গিয়ে ঠেকে। প্রাচীন গ্রিক ভাস্কর্য থেকে উপমাহাদেশীয় প্রাচীন মূর্তি, চিত্রকর্ম, সাহিত্য সবকিছু সেই সাক্ষ্যই বহন করে। কামনা বাসনাকে নির্জীব এসব শিল্পমাধ্যমে ধারণ করা মূলত Objectophilia নামক বিকারগ্রস্থতার প্রায়োগিক রূপ। শিল্পচর্চাকারীদের বেশিরভাগই এই মানসিক বিকারগ্রস্থতায় আক্রান্ত হয়ে যায় আর নিজেদের সাহিত্যে-শিল্পকর্মে নগ্নতা, বিকৃত যৌনাচার ইত্যাদির প্রকাশ ঘটায়। চিত্রকর ছবিতে এগুলো ফুটিয়ে তোলে, সাহিত্যিক নিজের গল্প-কবিতা-উপন্যাসের কল্পিত চরিত্রদের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলে আর ভাস্কর ফুটিয়ে তোলে ভাস্কর্যে। শিল্পের আধুনিক রূপ সিনেমা, গান ইত্যাদিতেও শিল্পের নামে বেহায়াপনা, অশ্লীলতার প্রসার হয়। শিল্পের নামে ওদের কাছে সবই চলে।

.

কিন্তু ইসলামী অনুশাসন কখনও এরকম বেহায়াপনা, অশ্লীলতা, অবাধ যৌনাচার বা এমনকিছু হওয়ার সুযোগ রয়েছে তেমন বেশিরভাগ মাধ্যমগুলোরই বৈধতা দেয় না, বৈধতা দেয় না কোনোটিরই লাগামহীনতার। সেকারণেই যুগে যুগে কলাচর্চাকারীদের এত বিদ্বেষ। এককথায় তারা শিল্পের নামে যা খুশি করার স্বাধীনতা চায়। অর্থাৎ, তারা সেক্যুলারিজমই চায় 'শিল্প' নামক মুখোশের আড়ালে। একারণেই দেখা যায় - যেই শিল্পসাহিত্য সচেতন সেই সেক্যুলার। আবার যে সেক্যুলার, সেও শিল্পসাহিত্যের প্রতি অনুরাগী।

.

চৈতন্যবোধ [Conscience / Consciousness] : নিজস্ব অনুভূতি বা চৈতন্যবোধ কখনও বিজ্ঞান দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। বিজ্ঞান কখনোই বলতে পারে না ভালবাসার, ঘৃণার, রাগ-অভিমান করার বা বিশ্বাসঘাতকতার স্বীকার হবার অনুভূতি কেমন। স্ক্যান করে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় কিন্তু অনুভূতিগুলো আসলে কেমন তা জানা যায় না।

.

এছাড়াও অনুভূতি-অভিজ্ঞতা হয় একান্তই নিজস্ব ও ব্যক্তিভেদে একেকরকম। বিশ্বাস, ভালবাসা ইত্যাদি ছাড়াও সমুদ্রের পাড়ে সূর্যাস্ত দেখার অনুভূতি কেমন, ঝর্ণার মৃদু শব্দ শোনার অনুভূতি কেমন এসব থেকে শুরু করে সাধারণ লাল রং দেখার অনুভূতিটিও আসলে একজনের নিকট কেমন তা বিজ্ঞান তো দূরের কথা, ২য় আরেকজনও বলতে পারে না। এমনকি ২য় জনকেও হুবহু একই বিষয়াদি দেখানো-শোনানো হলেও। চেতনা, অনুভূতি, অভিজ্ঞতার একান্তই ব্যক্তিগত হওয়ার এই ব্যাপারটিকে Qualia বলা হয়ে থাকে।

.

[৩]

বিজ্ঞান দ্বারা এত এত অপ্রমাণ্য বিষয়াদি জানার পর কিছু বিষয় লক্ষণীয়।

.

প্রথমত, অনেকে বিজ্ঞানকে সব সমস্যার সমাধান মনে করে, মনে করে বিজ্ঞান হল Omnipotent. অথচ দর্শন, যুক্তি, মানবিকতা-নৈতিকতা ইত্যাদি বিষয়াদি যে বিজ্ঞান দিয়ে অপ্রমাণ্য তা তাদের মাথায় আসে না। তাছাড়াও 'বিজ্ঞান দিয়ে সব ব্যাখ্যা করা যায়' বা 'বিজ্ঞান হল Omnipotent' অথবা 'বিজ্ঞান একসময় ঠিকই উত্তর খুঁজে বের করবে' এই কথাগুলোও স্রেফ দর্শনগত উক্তি বা বিশ্বাসমাত্র। এই কথাগুলোরও কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই! এগুলোও বিজ্ঞানের প্রতি অন্ধবিশ্বাস – একে বলা হয় Scientism যা কিনা Neo-Atheism এর ভিত্তি।

.

দ্বিতীয়ত, বিজ্ঞান আসলে কী? পর্যবেক্ষণ, গবেষণা, যুক্তিতর্ক, দর্শন ইত্যাদির মাধ্যমে জগত সম্বন্ধে জানবার পদ্ধতিগত উপায়ই হল বিজ্ঞান। সাধারণত বিজ্ঞান দুই উপায়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছায় – Deductive reasoning আর Inductive Reasoning. Deductive reasoning এর মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য কিছু দর্শন, যুক্তিতর্ককে সত্য ধরে নিয়ে শেষমেশ সিদ্ধান্তে আসা হয়। আর Inductive Reasoning এ পর্যবেক্ষণের উপর ভিত্তি করে সিদ্ধান্তে আসা হয়। প্রথমটিতে যে কেবলই উপলব্ধি ও দর্শনগত কিছু সত্যকে মেনে নিয়েই সামনে আগানো হয় তা আগেই আলোচিত হয়েছে। আর ২য় উপায়ে অর্থাৎ, Inductive Reasoning এ পরবর্তী পর্যবেক্ষণ সবসময়ই ভিন্ন ফলাফল দেখাতে পারে। তাছাড়া আরেকজনের পর্যবেক্ষণ করে আসা সিদ্ধান্ত যে আসলেও সত্য - সেটা মেনে নিয়ে আমরা মূলত সিস্টেম নির্গত 'বিজ্ঞানী' দাবিদারদেরকে বিশ্বাস করে যাই। কেবল বিশ্বাস করতে পারি না ৪০ বছর ধরে 'আল-আমীন' বা বিশ্বাসী মানুষটি সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে শেষ নবুওয়্যাতের দাবি নিয়ে এলে, এক রাতের মধ্যে ইসরা-মিরাজের দাবি নিয়ে এলে। আর লেখাপড়া না জেনেও কুরআনের মত অশ্রুতপূর্ব বাণী নিয়ে এলে।

.

তৃতীয়ত, বিজ্ঞান বিভিন্ন বিষয়াদির ব্যাখ্যাস্বরূপ অনেক তত্ত্ব দাঁড় করায়। আর অনেকসময়ই সেসব তত্ত্ব পর্যবেক্ষণেরও অযোগ্য হলেও মানুষ তাতে 'বিশ্বাস' করে, স্রেফ সিস্টেম নির্গত 'বিজ্ঞানীরা' বিশ্বাস করেন বলে। যেমনঃ Multiverse Theory তে অনেক বিজ্ঞানীই বিশ্বাসী, অথচ সবাই জানে যে এই মহাবিশ্বের বাহিরে কোনোকিছু পর্যবেক্ষণও সম্ভব নয়। এখন স্রষ্টাও পর্যবেক্ষণ আওতামুক্ত, আবার অন্য মহাবিশ্বও পর্যবেক্ষণ আওতার বাহিরে। তাহলে কেন শেষমেশ থিউরিই বেছে নেওয়া! যেন স্রষ্টাকে অবিশ্বাসের জন্যই এতসব নাটক। তানাহলে যে বস্তুবাদী হওয়া যায় না, করা যায় না যা খুশি তা।

.

চতুর্থত, তাত্ত্বিক বিষয়াদি ছাড়াও মাপামাপিসহ অন্যান্য প্র্যাকটিকাল ক্ষেত্রের মূল বিষয়গুলোও আমরা কোন ধরনের প্রমাণ ছাড়া মেনে নিই। এখানকার মূল বিষয়গুলো হল এককগুলো। যেমনঃ এক মিটার আসলে কতটুকু? কেন এতটুকুই হল? কেন সামান্য বেশি বা সামান্য কম হল না – এই প্রশ্নগুলো আমরা কেউ করি না। কারণ এই ধরনের বিষয় মেনে না নিয়ে তর্ক করা আসলে অযথা কালক্ষেপণের খারাপ নিয়্যাতকেই নির্দেশ করে। অথচ একই জিনিস যে আল্লাহর দেওয়া বিধিবিধানগুলোর জন্যও প্রযোজ্য তা নাস্তিক আর সংশয়বাদীদের খেয়াল থাকে না। এই বিধান এমন কেন হল, ওইটা অমন কেন হল, কেন ওটা এইরকম হল না – এমন সমস্ত প্রশ্ন নাস্তিক, সংশয়বাদী আর সম ঘরানার প্রাণিরা তাই কেবল দুইটা কারণে করে থাকতে পারে। এক, তাদের বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তি লোপ পেয়েছে অথবা দুই, কেবল অবিশ্বাসের জন্য তারা ভন্ডামি বা Hypocrisy-তে মেতেছে।

.

পঞ্চমত, বিজ্ঞানের একটি শাখা Quantum Physics এর অনেক বিষয়ই আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে অনুধাবণ করা গেলেও বিজ্ঞান তার কোনো ব্যাখ্যা দিতে পারে না। যেমনঃ Quantum Entanglement হল ইলেকট্রনের মত উপপারমাণবিক কণিকাগুলোর এমন এক বিশেষ অবস্থা যখন বিলিয়ন আলোকবর্ষ দূরত্ব হলেও দু'টি কণিকার মধ্যে একরকম যোগাযোগ থাকে।

পুরো মহাবিশ্বে এই অবস্থায় কণিকারা বিরাজমান থাকায় পুরো মহাবিশ্ব রীতিমত একটা জীবন্ত দেহের মতো! অথচ এটা পদার্থবিজ্ঞানের অন্যতম সূত্র - মহাবিশ্বে আলোর গতিবেগ সর্বোচ্চ – এর বিপরীত। এর কারণ হিসেবে কোয়ান্টাম কণিকার জগত আর তার ধর্মকে আলাদা বিবেচনা করেই এর নিষ্পত্তি করা হয় কিন্তু বলাই বাহুল্য, অন্যান্য সবকিছুর মত এখানকার ‘কেন’ প্রশ্নেও বিজ্ঞান নীরব।

.

[৪]

Burden of Proof এর ভুল প্রয়োগ

.

এত এত কিছু প্রমাণ ছাড়া মেনে নিলেও কেবল স্রষ্টার ক্ষেত্রেই এসে Burden of Proof খোঁজাও আসলে ভান্ডামিই নির্দেশ করে। কিন্তু সেটা বাদ দিলেও ইতিহাসে Burden of Proof এর সবচেয়ে বাজে আর বুদ্ধিহীন প্রয়োগ সৃষ্টিকর্তার ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে, আর সেটা করে যত্তসব বুদ্ধিহীন অথর্বরাই। কারণ Burden of Proof এ by default বা আগে থেকেই ধরে নেওয়া হয় যে কোনো সৃষ্টিকর্তা নেই আর সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব এক নতুন দাবি। আর তাই দাবিকারীকে নিজ দাবির স্বপক্ষে প্রমাণ পেশ করতে হবে। যুক্তি ঠিক আছে তবে এক্ষেত্রে নয় মহাশয়, বরং সৃষ্টির নৈপুণ্য আর সুবিন্যাস থেকেই by default একজন Intelligent Designer / Manufacturer বা এককথায় স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। ঠিক যেমন এই লিখাটি পড়বার সময় by default একজন লেখকের অস্তিত্ব মন স্বীকার করে নেয়।

.

ডিএনএ কোডিংয়ের কথাও বাদ। মহাবিশ্বের উৎপত্তি, ছায়াপথ, নক্ষত্রসমূহ থেকে শুরু করে অণু এবং আণবিক কণার মত বস্তুর আকার আকৃতিও সূক্ষাতিসূক্ষ অনেকগুলো মৌলিক ধ্রবকের উপর নির্ভর করে। আর প্রতিটি সংখ্যায় যে পরিমাণ নিখুঁত সমন্বয় করা হয়েছে তা একজন Intelligent Designer কেই নির্দেশ করে। মহাকর্ষ ধ্রুবক যদি ১০^৬০ এর (অর্থাৎ, ১ এর পরে ৬০ টি শূন্য) এক ভাগ বেশি বা কম হতো, তাহলে কোনো ছায়াপথ, গ্রহ নক্ষত্র কিছুই সৃষ্টি হতো না। শুধুমাত্র এই ধ্রুবকের অত সূক্ষ্ম পরিমাণ বিচ্যুতিতেও মহাবিশ্বের সূচনালগ্নেই এর অতিব্যপ্তি হয়ে যেত বা মুহূর্তেই ধীর ব্যপ্তির কারণে পরক্ষণেই গুটিয়ে ধ্বংস হয়ে যেত। আবার, মহাজাগতিক ধ্রুবকের মান ১০^১২০ এর এক ভাগও এদিক সেদিক হলে তা মহাবিশ্ব সম্প্রসারণের হারে একই প্রভাব ফেলে কখনও এ পর্যন্ত আসা তো দূরের কথা, মহাবিশ্ব নিমিষেই ধ্বংস হয়ে যেত। যেসমস্ত বিচ্যুতির কথা বলা হচ্ছে তা যে আসলে কত ক্ষুদ্র তা বুঝতে পৃথিবীতে মোট যতটি বালুকণা রয়েছে তা কল্পনা করা যেতে পারে। এই সংখ্যক বালুকণা দিয়ে যদি একটা ধ্রুবক গঠিত হয়েছে বলে ধরা হয়, তবে পৃথিবীতে আরেকটি বালুকণা যোগ করলে বা একটি সরিয়ে নিলে আর কোনোকিছুরই অস্তিত্ব থাকতো না! প্ল্যাঙ্কের ধ্রুবক, পারমাণবিক মৌলিক কণিকাগুলোর ভর, হাবল ধ্রুবকসহ আরও বহু ধ্রুবকের এমন নিখুঁত ভারসাম্য বা Fine Tuning একজন বুদ্ধিমান সত্ত্বার দিকেই by default নিয়ে যায়। তাই Burden of Proof আসলে নাস্তিকদের ওপরেই বর্তায়। আমরা সৃষ্টিজগত থেকে স্বভাবজাতভাবেই সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বুঝি। এটাই হল by default. এখন তোমরা নিজেদের অস্বীকারের প্রমাণ দাও।

.

নাস্তিক্যবাদী বিজ্ঞানীরা এমন অসম্ভব নিখুঁত বিন্যাসকে স্রষ্টা ছাড়া ব্যখ্যা করার চেষ্টায় Multiverse Theory এনেছে যেখানে মূলত বলা হয় পদার্থবিজ্ঞানের সূত্রগুলোর যত সম্ভাবনা হওয়া সম্ভব, তার সবগুলো ক্রমান্বয়ে হয়ে চলছে আর আমরা সৌভাগ্যবশত যে মহাবিশ্বটির সবকিছু এক্কেবারে Perfect হয়ে গিয়েছে সেটাতেই রয়েছি। অথচ এই তত্ত্ববিশ্বাস প্রমাণের কোনো উপায় নেই কারণ অন্যকোন মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণই সম্ভব নয়। এই তত্ত্বও যে Burden of Proof এর দাবি রাখে সেকথা আর কেউ বলে না। কেবল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহকে অবিশ্বাসের জন্য এই রূপকথায় বিশ্বাস আর প্রচার-প্রসার করে চলে। অথচ না দেখেই আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বাসের কথা এলে, আল্লাহর ইচ্ছায় এক রাতে ইসরা-মিরাজ ভ্রমণের কথা এলে এরাই আবার রূপকথা বলে বলে ফ্যানা তোলে।

.

আগেকার যুগের জ্ঞানীরাও by default স্রষ্টার অস্তিত্বের দিকেই ভিড়তো। তখন কেবল শুধু আজকের মতো সূক্ষ মানসহ জানা ছিল না। নবী ইব্রাহিম (আলাইহিস সালাম) নভোমন্ডোল ও ভূমন্ডলের বৈচিত্র্যময় বিষয়গুলো দেখে চিন্তাভাবনা করে স্রষ্টায় বিশ্বাসে এসে পৌঁছেছিলেন (৬ : ৭৫) , তো অ্যারিস্টটল কল্পনা করেছিল সারাটা জীবন মাটির নিচে কাটিয়ে দেওয়া কিছু মানুষেরা হঠাৎ উপরে উঠে এলে সৃষ্টিবৈচিত্র্য দেখে ঠিকই একজন স্রষ্টায় বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। অবশ্য ইবরাহিম (আলাইহিস সালাম) যে আল্লাহরই কাছে আন্তরিকভাবে সাহায্য প্রার্থনাস্বরূপ বলেছিলেন, “যদি আমার প্রতিপালক আমাকে পথ-প্রদর্শন না করেন, তবে অবশ্যই আমি বিভ্রান্ত সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব।” (৬ : ৭৭) এমন সাহায্য চাওয়া অ্যারিস্টটল বা হালের অ্যান্টনি ফ্লিউদের বেলায় শোনা যায় না। অথচ স্রষ্টার অস্তিত্ব অনুধাবনের পর তাঁর কাছে আন্তরিকভাবে সাহায্য প্রার্থনাই হল সর্বপ্রথম দায়িত্ব যা কিনা প্রকৃত মুমিনরা সূরা ফাতিহার মাধ্যমে দিনে কমপক্ষে ১৭ বার করে থাকে।

.

[৫]

.

প্রমাণ খোঁজাতে সমস্যা নেই। সমস্যা হল, যাচাইয়ের সৎ মানসিকতা থেকে প্রমাণ না খুঁজে অবিশ্বাস পুষে রেখে কালক্ষেপনের জন্য প্রমাণ চাই, প্রমাণ চাই বলে বেড়ানো। এমন মানুষদের আরেকবার স্মরণ করিয়ে দিই, অন্তরে সৎ নিয়্যাত রয়েছে নাকি কালক্ষেপনের বা সংশয় সন্দেহে ডুবে থেকে দুনিয়াতে যা খুশি তাই করে বেড়ানোর ধান্দা রয়েছে তা সম্পর্কে আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল।

.

ইসরা ও মিরাজের রাতের পরদিন সকালে তাই মক্কার কাফিরদের জন্যও কাফেলার প্রমাণ দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু তারা বিশ্বাস করে নাই। অথচ আবু বকরও (রদিআল্লাহু আ'নহু) প্রমাণ খুঁজেছিলেন। আর অতঃপর প্রমাণ পাবার পর ঠিকই সাক্ষী দিয়েছিলেন যে মুহাম্মাদ ﷺ সত্য বলছেন। অর্থাৎ, প্রমাণের চেয়েও বড় হল আসলেও আপনি আন্তরিক কিনা। নইলে শতসহস্র প্রমাণেও কোনো ফায়দা হবে না। অবশ্য আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনই যে বান্দাদের থেকে গায়েবে বিশ্বাস চান সে অনুযায়ী কোনো প্রমাণই অকাট্য হবে না। আবু বকরের (রাদিআল্লাহু আ'নহু) মত সর্বোত্তম ঈমান না হোক, সামান্য বিশ্বাসের সদিচ্ছা আর আন্তরিকতা ব্যতীত কারও পক্ষেই বিশ্বাস সম্ভাবপর নয়।

.

“... এরপর আবু বকর (রদিআল্লাহু আ'নহু) সেখান থেকে সোজা রাসুলুল্লাহ ﷺ এর নিকট চলে আসলেন এবং বললেন, “হে আল্লাহর নবী! আপনি কি এদের কাছে বলেছেন যে এই রাতে আপনি বায়তুল মুকাদ্দাস গিয়েছিলেন?”

তিনি ﷺ বললেনঃ হ্যাঁ।

আবু বকর (রদিআল্লাহু আ'নহু) বললেনঃ হে আল্লাহর নবী! সে মসজিদটির বর্ণণা দিন তো; আমি সেখানে গিয়েছিলাম।

তখন রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন যে ঐসময় বায়তুল মুকাদ্দাসকে আমার সামনে তুলে ধরা হল। আমি তার দিকে তাকিয়ে দেখতে লাগলাম।

এরপর রাসুলুল্লাহ ﷺ আবু বকর (রদিআল্লাহু আ'নহু) এর কাছে বায়তুল মুকাদ্দাসের বর্ণণা দিতে লাগলেন। আর আবু বকর (রদিআল্লাহু আ'নহু) প্রতিবারই বলতে লাগলেন, “আপনি সত্যই বলেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহর রাসূল।”

.

Reference: [১] ও [৫] সীরাতুন্নবী ﷺ ইবন হিশাম (র), ২য় খণ্ড (ইসলামিক ফাউন্ডেশন) পৃষ্ঠা ৭৪

১২২

স্যাটানিক ভার্সেস -- Satanic Verses

-আরিফ আজাদ

রোববার আমাদের কাছে 'আড্ডাবার' বলে খ্যাত।
রোববারে আমরা শাহবাগে বসে আড্ডা দিই। আমাদের আড্ডার বিষয়বস্তু থাকে সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা, বিভিন্ন আবিষ্কার, বিভিন্ন বই নিয়ে।

.

গত রোববারের আড্ডায় আমাদের সাথে পিকলু দা'ও ছিলেন। পিকলুদা হলেন আমাদের সবার কাছে প্রিয় ও পরিচিত একটি মুখ। ক্যাম্পাসে পিকলুদাকে চিনেনা এমন মানুষ খুঁজে পাওয়াই দুষ্কর। কেনোই বা চিনবেনা? যে লোক জাপান, হংকং এবং কানাডা থেকে চার চারবার ফটোগ্রাফিতে গোল্ড মেডেল পায়, তাকে আবার চিনবেনা এমন কেউ থাকতে পারে নাকি?

.

আমরা পিকলুদাকে একজন উঁচু মাপের 'ফটোগ্রাফার' হিসেবে জানলেও, সাজিদের কাছে পিকলুদার কদর অন্য জায়গায়।
সাজিদ পিকলুদাকে একজন উঁচু মানের বই পড়ুয়া হিসেবেই চিনে।
সাজিদের ভাষ্যমতে, পুরো পৃথিবী থেকে যদি তন্ন তন্ন করে খুঁজে সেরা ১০ জন বই পড়ুয়া লোক খুঁজে বের করা হয়, তাহলে পিকলুদার Rank সেখানে সেরা তিনে থাকবে, শিওর....

.

পিকলুদার সাথে আমাদের চেয়ে সাজিদের সখ্যতাই বেশি।এর কারণ, ঢাবিতে ভর্তির পরে পুরো একবছর সাজিদ আর পিকলুদা হলের একই রুমে ছিলো। মুহসীন হলের ২১০ নম্বর রুম।
সাজিদের কাছে শুনেছি, একবার ঘোর বর্ষার সময়, পিকলুদা ঠিক করলেন যে উনি বান্দরবান যাবেন। চারদিকে করুণ অবস্থা। পানিতে টইটম্বুর সব। ভারি বজ্রপাতের সাথে বিরতিহীন বৃষ্টির ফোয়ারা- এর মধ্যেই পিকলুদা চাচ্ছে ক্যামেরা হাতে বেরিয়ে পড়তে।
সাজিদ খুবই অবাক হলো। বললো,- 'এরকম পরিস্থিতিতে কেউ কী বাইরে যায় নাকি?'
পিকলুদা কয়েক সেকেন্ডও সময় না নিয়ে বললেন,- 'Without such environment, you can't enjoy adventure, my dear...'

.

সাজিদ দেখলো, সেই যাত্রায় পিকলুদা ব্যাগের মধ্যে ক্যামেরার সাথে শেক্সপিয়ারের 'A mid Summer Night's Dream' এবং রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসের বই দুটোও পুরে নিচ্ছে। সাজিদ আবারো অবাক হলো। বললো,- 'বৃষ্টি বাদলের মধ্যে ভিজবে নাকি বই পড়বে?'
পিকলুদা সেবার কিছু না বলে মুচকি হেসে বেরিয়ে পড়লো।

.

পিকলুদা ফিরলো ঠিক দশদিন পরে। জ্বরে কাঁপাকাঁপি অবস্থা। অন্যকেউ হলে এই মুহূর্তে বেহাল দশা হয়ে যেতো। অথচ, পিকলুদার মুখে অসুখের কোন চিহ্নই নেই। মনে হচ্ছে মনের মধ্যে রাজ্য জয়ের সুখ বিরাজ করছে।
সাজিদ বললো,- 'কী অবস্থা করে এসেছো নিজের?'
পিকলুদা সাজিদের কথা কানে নিলো বলে মনে হলো না। গোল্ডলীফ সিগারেটে টান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বললেন,- 'জানিস তো, অনেকগুলো অসাধারণ ছবি তুলে এনেছি এবার। একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলে চলে গিয়েছিলাম। চারপাশে শুধু পাহাড়

আর পাহাড়। মনে হচ্ছিলো বাংলাদেশ ক্রস করে কোন এক পাহাড়ের দেশে ঢুকে পড়েছি।'

.

পরেরদিন ক্যাম্পাসে পিকলুদা আমাদের অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বান্দরবানের দূর্গম এলাকা থেকে তুলে আনা ছবিগুলো দেখাচ্ছিলেন। আমরাও খুব আগ্রহভরে দেখছিলাম ছবিগুলো। আসলেই সব কয়'টা ছবিই দারুন ছিলো। আমার সাধ্য থাকলে প্রতিটা ছবির জন্য পিকলুদাকে একটা করে গোল্ড মেডেল দিয়ে দিতাম।

আমরা সবাই ছবি দেখাদেখি নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও, সাজিদের সেদিকে মোটেও আগ্রহ আছে বলে মনে হলো না। কিছুক্ষণ চুপ থাকার পরে সে পিকলুদার কাছে জানতে চাইলো সাথে নিয়ে যাওয়া বইগুলোর ব্যাপারে। পিকলুদা ফিক করে হেসে দিলেন। এরপর, সাতখন্ড রামায়ণ পাঠের মতো করে উনি শেক্সপিয়ারের 'A mid summer night's dream' এবং রবি ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসের আদ্যোপান্ত বর্ণনা করা শুরু করলেন। আমরাও আগ্রহ ভরে শুনছিলাম আর আবিষ্কার করছিলাম সম্পূর্ণ ভিন্ন এক পিকলুদাকে। যিনি কেবল ছবির মাঝেই ডুব দেন না, বইয়ের মাঝেও অসাধারণভাবে ডুব দিতে পারেন......

.

বলছিলাম গত রোববারের আড্ডার কথা। সে আড্ডায় আমাদের সাথে পিকলুদাও ছিলেন। ছিলো রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সোহেল রানা এবং সমাজবিজ্ঞান অনুষদের সৌরভ ধর। আরো ছিলো ইংরেজী ডিপার্টমেন্টের আহমেদ ইমতিয়াজ এবং রসায়নের সুমন্ত বর্মণ দা। সুমন্ত দা খুব ভালো গিটার বাজাতে পারেন। তিনি যখন গিটারে তাল ধরেন, তখন সবাই সমস্বরে মান্না দা'র সেই বিখ্যাত গানটা গেয়ে উঠে-

'কাকে যেন ভালোবেসে, আঘাত পেয়েছে শেষে, পাগলা গারদে আছে রমা রায়

অমলটা ধুঁকছে দূরন্ত ক্যান্সারে, জীবন করেনি তাকে ক্ষমা হায়...... কফি হাউজের সেই আড্ডাটা আজ আর নেই, আজ আর নেই....'

কফি হাউজের আড্ডাটা না থাকতে পারে, আমাদের রোববারের আড্ডাটা ঠিকই রয়ে গেছে।

.

আমাদের আড্ডা শুরুর প্রাক্কালে, সৌরভ পিকলুদার কাছে জিজ্ঞেস করলো,- 'দাদা, তুমি কী সালমান রুশদীর 'The Satanic Verses' পড়েছো?'

পিকলু দা 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নেড়ে জানালেন যে উনি পড়েছেন।

এরপর সৌরভ সাজিদের কাছে জানতে চাইলো যে সে পড়েছে কিনা এই বই। সাজিদও 'হ্যাঁ' সূচক মাথা নাড়লো। পিকলুদা সাজিদের কাছে জানতে চাইলো,- 'তোর কেমন লাগলো রে এই বই?'

সাজিদ বাদাম ছিলে মুখে দিতে দিতে বললো,- 'ফিকশনাল বই হিসেবে বলতে গেলে এটা একটা দারুন বই।'

পিকলুদা খানিকটা অবাক হলেন বলে মনে হলো। বললেন,- 'মানে কী?'

- 'কিছুই না। ফিকশনাল বই হিসেবে এটা একটা দারুন বই। সাহিত্যমানের বিচারে বলতে গেলে বইটাকে আমি দশের মধ্যে ৯ দেবো।'

পিকলুদা আরো খানিকটা অবাক হলেন। বললেন,- 'বইটাতে রুশদী যে ইনফরমেশন ব্যবহার করেছে, সে ব্যাপারে তোর আপত্তি আছে?'

সাজিদ বললো,- 'আলবৎ আছে।'

- 'কিন্তু তুই কী জানিস অই বইতে রুশদী যা ইনফরমেশন ব্যবহার করেছে তার সবটাই ইসলামিক সোর্স থেকে নেওয়া?'- পিকলুদা বললেন।

- 'হ্যাঁ।'

- 'তুই বলতে চাচ্ছিস এসব ইসলামিক সোর্সে ভুল ইনফরমেশন দেওয়া আছে?'

- 'থাকতেও পারে। দুনিয়ায় কোরআন ছাড়া বাকিসব গ্রন্থ মানুষের লেখা। আর মানুষের লেখায় ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক।'- সাজিদের উত্তর।

.

(পাঠকদের বোঝার সুবিধার্থে আমি ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করে নিই।এরপরে আমরা আবার ঘটনায় চলে যাবো।

ইন্ডিয়ান লেখক সালমান রুশদী একটি বই লিখে খুবই বিতর্কিত হয়ে পড়েন। বইটার নাম- 'The Satanic Verses' (শয়তানের আয়াত)।

রুশদী সেই বইতে কিছু ইসলামিক (সীরাত) সোর্স থেকে দলিল টেনে ইসলামকে আক্রমণ করে এবং প্রমাণের চেষ্টা করে যে কোরআন আল্লাহর কাছ থেকে নাজিল হওয়া না, শয়তান থেকে প্রাপ্ত কিতাব। রুশদী সোর্স হিসেবে উল্লেখ করে 'আল তাবারি' এবং 'ইবন সা'দ' এর মতো সীরাত গ্রন্থকে।

আল তাবারি এবং ইবন সা'দ এ একটি ঘটনার উল্লেখ আছে। ঘটনাটি হলো এরকম,- 'রাসূল (সা:) মক্কায় যখন দাওয়াত প্রচার শুরু করলেন, তখন একদিন তিনি ক্বাবা শরীফের প্রাঙ্গণে বসে সদ্য ইসলামে দাখিল হওয়া মুসলিমদের মাঝে বক্তৃতা রাখছিলেন। সেখানে মক্কার অন্যান্য পৌত্তলিক কুরাইশরাও ছিলো।

ঠিক এমন সময়ে, হজরত জ্বিবরাঈল (আঃ) ওহী নিয়ে রাসূল (সাঃ) এর কাছে আগমন করেন। সেদিন জ্বিবরাঈল সূরা 'আন নাজম' নিয়ে অবতীর্ণ হন। তাবারি এবং ইবন সা'দ বলছে,- সেদিন সূরা আন নাজমের ১৯ এবং ২০ নাম্বার আয়াতের পর রাসূল সাঃ আরো বাড়তি দুটি আয়াত তিলাওয়াত করেন, যা আদতে জ্বিবরাঈল আঃ ওহী হিসেবে নিয়ে আসেন নি। এই দুই আয়াত মূলত শয়তান রাসূল সাঃ কে ধোঁকা দিয়ে কোরআনের আয়াতের সাথে মিশিয়ে দিয়েছিলো।

পরে, জ্বিবরাঈল রাসূল সাঃ কে এ ব্যাপারে সতর্ক করলে রাসূল সাঃ তা ওহী ছিলো না বলে বাদ দেন।

সূরা আন নাজমের ১৯ এবং ২০ নাম্বার আয়াতে হলো মুশরিকদের পূজিত সবচে বড় তিন দেবী- লাত, উযযা এবং মানাতকে নিয়ে।

সূরা আন নাজমের ১৯ এবং ২০ নাম্বার আয়াত হলো- 'তোমরা কী ভেবে দেখেছো লাত ও উযযা সম্পর্কে?'

'এবং আরেক (দেবী) মানাত সম্পর্কে?'

তাবারি এবং ইবন সা'দ বলছে, এই দুই আয়াতের পরে আরো দুটি বাড়তি আয়াত ছিলো যা পরে রাসূল সাঃ ভুল বুঝতে পেরে বাদ দিয়েছিলেন।সেই আয়াত দুটি এরকম,-

' These are the high-flying ones,

whose intercession is to be hoped for!'

('তাঁরা হলেন খুব-ই উঁচু পর্যায়ের (ক্ষমতাবান দেবী।তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়'...)

.

তাহলে, সূরা আন নাজমের ১৯ এবং ২০ নম্বর আয়াতের সাথে বাদ পড়া (তাবারি এবং ইবন সাদ এর বর্ণনামতে) আয়াত দুটো জুড়ে দিলে কী রকম শোনায় দেখা যাক-

.

'তোমরা কী ভেবে দেখেছো লাত ও উযযা সম্পর্কে?'

'এবং আরেক (দেবী) মানাত সম্পর্কে?'

'তাঁরা হলেন খুব-ই উঁচু পর্যায়ের(ক্ষমতাবান দেবী)

'এবং, তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়'...

.

ইবন সাদ এবং তাবারির দাবি,পরের দুই আয়াত শুনে মক্কার মুশরিকরা খুব উৎফুল্ল হয়ে উঠে। তারা ভাবলো, মুহাম্মদ সাঃ এবার তাদের দেবীদের প্রশংসা করলেন। তার মানে, মুহাম্মদ সাঃ তাদের দেবীদের প্রভূ হিসেবে মেনে নিয়েছেন। তাই, সেদিন মুহাম্মদ সা: এবং অন্যান্য মুসলিমদের সাথে মক্কার মুশরিকরাও সিজদা করেছিলো মক্কা প্রাঙ্গণে।

.

তাবারি এবং ইবন সা'দ এর এই রেফারেন্সগুলোকে ইসলাম বিদ্বেষীরা এবং খ্রিষ্টান মিশনারীরা লুফে নেয়। তারা এই ঘটনাকে

(অর্থাৎ, মুহাম্মদ সাঃ শয়তানের কাছ থেকেও অহী নিতেন) সত্য প্রমাণ করার জন্য সূরা আল হাজ্ব এর ২২ নম্বর আয়াতকে রেফারেন্স হিসেবে দাখিল করে থাকে।)

.

সাজিদের এরকম উত্তর শুনে পিকলুদা সন্তুষ্ট হতে পারেন নি। তিনি বললেন, - ' সালমান রুশদীর কথা বাদ দে। তুই কী বলতে চাইছিস ইবন সা'দ আর আল তাবারির বর্ণনা ভুল?'

- 'দাদা, আগেও বলেছি, ইবন সা'দ হোক বা আল তাবারি হোক বা অন্য যেকোন কেউ, তাদের কাছে তো আর ওহী আসতো না। যেহেতু তাদের গ্রন্থগুলো আসমানী কিতাব নয়, তাই তার মধ্যে ভুল ভ্রান্তি থাকতেই পারে।অস্বাভাবিক না তো.....'

এতোক্ষণ পরে সোহেল রানা ভাই মুখ খুললেন। বললেন,- 'আচ্ছা সাজিদ, ধরেই নিলাম তুমি ঠিক বলছো। ইবন সা'দ বা আল তাবারির বর্ণনা ভুল। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, কেনো তাদের বর্ণনা ভুল বা তোমার কাছে ভুল মনে হচ্ছে?'

.

এবার আমরা সবাই নড়েচড়ে বসলাম। এরই মধ্যে আড্ডায় চলে এসেছে পঙ্কজ দা, ইসলামিক স্ট্যাডিজের ইবরাহিম খলীল এবং ফিন্যান্সের শরীফ ভাই।

সোহেল ভাইয়ের সাথে সুর মিলিয়ে সৌরভ বললো,- 'Yes, explain, why you think renowned author both Al Tabari & Ibn Saad are wrong according to u...'

.

সচরাচর কোন দীর্ঘ বক্তৃতা শুরু করার আগে সাজিদ খানিকটা ঝেড়ে কেশে নেয়। আজও ঠিক তাই করলো। ঝেঁড়ে প্রথমে কেশে নিলো। এরপর সে বলতে শুরু করলো-

.

'প্রথমে, আমাদের বুঝতে হবে, ইবন সা'দ এবং আল তাবারির গ্রন্থে যা আছে, তা মানুষের রচনা। এরমধ্যে যেমন শুদ্ধ জিনিস, শুদ্ধ বর্ণনা আছে, ঠিক তেমনি ভুল জিনিস, ভুল বর্ণনা থাকাটাও স্বাভাবিক।কারণ, ইবন সা'দ বা আল তাবারি, কেউ-ই রাসূলের যুগের প্রত্যক্ষ সাক্ষী না।

তারা রাসূলের জীবনী লিপিবদ্ধ করতে গিয়ে যেখানে, যার কাছে যা পেয়েছেন, তাই লিপিবদ্ধ করে ফেলেছেন। ভুল-শুদ্ধ কতোটুকু- তা নির্ণয়ের চেয়ে আপাতত সংরক্ষণ করে ফেলতে পারাটাকেই তাঁরা প্রাধান্য দিয়েছিলেন।

তাদের রচনায় যে ভুল থাকতে পারে, তা স্বয়ং তারা নিজেরাও স্বীকার করে গেছেন।

আল তাবারি উনার কিতাবের শুরুতেই বলেছেন,- ' Hence, if I mention in this book a report about some men of the past, which the reader of listener finds objectionable or worthy of censure because he can see no aspect of truth nor any factual substance therein, let him know that this is not to be attributed to us but to those who transmitted it to us and we have merely passed this on as it has been passed on to us'

.

অর্থাৎ, তিনি শুধু তা-ই কিতাবে স্থান দিয়েছেন যা তাঁর পর্যন্ত পৌঁছেছে। এখন কেউ যদি তার কিতাবে কোন আপত্তিকর বিষয়াদি খুঁজে পায় যা ইসলামের ফান্ডামেন্টাল জিনিসের সাথে সাংঘর্ষিক এবং অন্যান্য সহী সূত্রে তা বাতিলযোগ্য দেখা যায়- তাহলে তাঁর দায় আল তাবারীর নয়, তিনি যার কাছ থেকে পেয়েছেন, কেবলই তার।তিনি এখানে কেবল একজন 'লিখিয়ে'র ভূমিকায়.....

সুতরাং, আল তাবারির বর্ণনা যে ভুল 'হতেও' পারে, তা আল তাবারিই বলে গেছেন। সেইম কথা, সেইম ব্যাপার ইবন সা'দ এর ক্ষেত্রেও।

.

এতোটুকু বলে সাজিদ থামলো। পিকলুদা বললেন, - 'ভুল হতেও পারে মানে এটা প্রমাণ হয় না যে- তিনি ভুল। ভুল হতেও

পারে এর পরের শর্ত কিন্তু সঠিকও হতে পারে। আমরা তাহলে কোনটা ধরে নেবো? উনি ভুল না শুদ্ধ?'

সাজিদ হাসলো। এরপরে বললো,- 'দেখা যাক কী হয়...'

.

সাজিদ আবার বলতে শুরু করলো-

সকল ইতিহাসবিদদের মতে, সূরা আন নাজম নাজিল হয় রাসূল সাঃ নব্যুয়াত লাভের পঞ্চম বছরে, রজব মাসে, যে বছর প্রথম একটি মুসলিম দল আবিসিনিয়ায় হিজরত করে। অর্থাৎ, রাসূল সাঃ এর মদিনায় হিজরতের আরো ৮ বছর আগে।

.

এখন, সালমান রুশদী এবং খ্রিষ্টান মিশনারীদের দাবি, রাসূল সাঃ শয়তান থেকে ওহী প্রাপ্ত হয়েছিলেন পরে, আল্লাহ কোরআনের ওহীর মাধ্যমে রাসূল সাঃ কে সংশোধন করে দেন।

তাদের দাবি, সূরা আল হাজ্বের ৫৩ নাম্বার আয়াত সেদিনই (যেদিন তথাকথিত Satanic Verses নাজিল হয়) নাকি অই ঘটনাকে কেন্দ্র করে যেখানে বলা হচ্ছে-

.

'আমি তোমার পূর্বে যে সব রাসূল কিংবা নবী পাঠিয়েছি, তাদের কেউ যখনই কোন আকাঙ্ক্ষা করেছে তখনই শয়ত্বান তার আকাঙ্ক্ষায় (প্রতিবন্ধকতা, সন্দেহ-সংশয়) নিক্ষেপ করেছে, কিন্তু শয়ত্বান যা নিক্ষেপ করে আল্লাহ তা মুছে দেন। অতঃপর আল্লাহ তাঁর নিদর্শনসমূহকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। কারণ আল্লাহ সর্বজ্ঞ, সর্বশ্রেষ্ঠ হিকমতওয়ালা।'

সালমান রুশদী এবং খ্রিষ্টান মিশনারীদের দাবি, এই আয়াত দিয়েই আল্লাহ মুহাম্মদ সাঃ কে তৎক্ষণাৎ সংশোধন করে দেন এবং মুহাম্মদ সঃ সূরা আন নাজমের সাথে মিশিয়ে ফেলা ওই আয়াত দুটো বাতিল করে দেন।

শত্রুপক্ষ এই গল্প খুব সুচতুরভাবে বানিয়েছে বলা যায়। কিন্তু ঘাপলা রেখে গেছে অন্য জায়গায়। সেটা হলো, সূরা আন নাজমের সাথে সূরা আল হাজ্ব এর নাজিলের মধ্যকার সময়ের ব্যবধান।

সূরা আন নাজম নাজিল হয় রাসূল নবুয়্যাত লাভ করার ৫ম বছরে, মক্কায়। সূরাটিও মাক্কী সূরার অন্তর্গত। আর, সূরা আল হাজ্ব নাজিল হয় রাসূল সাঃ নব্যুয়াত লাভের প্রায় ১২-১৩ বছরের পরে, হিজরতের প্রথম বছরে। সূরাটি মাদানী সূরা।

অর্থাৎ, তাদের কথানুযায়ী, রাসূল সাঃ ভুল করেন নব্যুয়াত লাভের ৫ম বছরে, আর সূরা আল হাজ্ব নাজিল হয় নব্যুয়াত লাভের ১৩ তম বছরে। দুই সূরার মধ্যে সময় ব্যবধান ৮ বছর।

অর্থাৎ, তাদের দাবিনুযায়ী, রাসূল সাঃ ভুল করেছেন আজ, আর আল্লাহ তা সংশোধন করেছেন ৮ বছর পরে...

সাজিদ জোরে বলতে লাগলো,- 'আচ্ছা বলুন তো, পাগল না হলে, কোন মানুষ কী এই গল্প বিশ্বাস করবে? ভুল করেছে আজ, আর তা সংশোধন হলো আরো ৮ বছর পরে।

এই আট বছরের মধ্যে, রাসূল সাঃ সূরা আন নাজমে লাত, উযযা, মানাতের মতো দেবীর প্রশংসা করেছেন (তাদের মতে), আবার কালেমায় বলেছেন- 'লা ইলাহা ইল্লাহহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই)।

একদিকে দেবীদের কাছে সাহায্য চাওয়ার বৈধতা, আবার অন্যদিকে 'লা ইলাহা ইল্লাহ' বলে তাদের বাতিল করে দেওয়া- এতোসব কাহিনী করার পরেও কীভাবে তিনি সেখানে 'আল আমীন' হিসেবে থাকতে পারেন? হাউ পসিবল?

ঠিক আছে, তর্কের খাতিরে ধরেই নিলাম যে, সূরা হাজ্বের সেই সংশোধনী আয়াত আল্লাহ সেই রাতেই নাজিল করেছিলেন এবং সেই রাতেই রাসূল উনার ভুল শুধরে নিয়েছিলেন এবং পরে ঘোষণা করলেন যে, লাত, উযযা, মানাতের কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না।'

খেয়াল করুন, দিনে বলেছেন এরকম-

.

'তাঁরা হলেন খুব-ই উঁচু পর্যায়ের(ক্ষমতাবান দেবী)

'এবং, তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়...'

.

আবার রাতে নিজের সেই কথাকে উইথড্র করে নিয়ে বলছেন, লাত, উযযা, মানাতরা বাতিল।

.

এমতাবস্থায়, মক্কার কাফির, পৌত্তলিকদের কাছে রাসূল সাঃ কী একজন ঠক, প্রতারক, বেঈমান বলে গন্য হবার কথা না? অথচ, ইতিহাসের কোথাও কী তার বিন্দু পরিমাণ প্রমাণ পাওয়া যায়? যায় না।
যাদের সাথে তিনি মূহুর্তেই এতোবড়ো বেঈমানি করলেন, তাদের কারো কাছেই তিনি 'ঠক' 'প্রতারক' 'মিথ্যুক' সাব্যস্ত হলেন না - এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের। রাসূল সাঃ কে অপমান করার এতোবড়ো সুযোগটা কীভাবে শত্রুপক্ষ মিস করলো?
তাছাড়া, ইতিহাস থেকে জানা যায়, মদীনায় হিজরতের আগের রাতে, রাসূল সাঃ হজরত আলী রাঃ কে উনার ঘরে রেখে যান, যাতে রাসূল সাঃ এর কাছে গচ্ছিত আমানত প্রাপকদের কাছে (যারা মুশরিক ছিলো) যথাযতভাবে ফিরিয়ে দেওয়া যায়।
ভাবুন তো, যিনি একদিনে দু রকম কথা বলতে পারে, (একবার দেবীদের প্রশংসা করে, আবার তা বাতিল করে) তাকে কিন্তু তখনও মক্কার কুরাইশরা বিশ্বাস করছে, ভরসা করে আমানত গচ্ছিত রাখছে। কীভাবে? একজন ঠক, প্রতারককে (যদি Satanic Verses incident সত্য হয়) কীসের ভিত্তিতে এতো বিশ্বাস?
আদৌ কী সেদিন Satanic Verses জাতীয় কিছু নাজিল প্রাপ্ত হয়েছিলো রাসূলের উপর? উত্তর- নাহ।

.

দ্বিতীয় প্রমাণ, তর্কের খাতিরে আবার ধরে নিই যে, Satanic Verses সত্য।
তাহলে চলুন, আরেকবার পাঠ করি সেই আয়াতগুলো-
(১৯) - 'তোমরা কী ভেবে দেখেছো লাত ও উযযা সম্পর্কে?'

(২০) - 'এবং আরেক (দেবী) মানাত সম্পর্কে?'

(২১)- 'তাঁরা হলেন খুব-ই উঁচু পর্যায়ের(ক্ষমতাবান দেবী)

(২২)- 'এবং, তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়'...

(২৩)- 'এগুলো তো কেবল (এই যে লাত, উযযা, মানাত এসব) কতকগুলো নাম যে নাম তোমরা আর তোমাদের পিতৃ পুরুষরা রেখেছ, এর পক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। তারা তো শুধু অনুমান আর প্রবৃত্তিরই অনুসরণ করে, যদিও তাদের কাছে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে পথ নির্দেশ এসেছে।'

.

খেয়াল করুন, ২১ এবং ২২ নম্বর আয়াত (সালমান রুশদী এবং খ্রিষ্টান মিশনারীদের ভাষ্যমতে) এর ঠিক পরে, আল্লাহর কাছ থেকে কোনরকম সংশোধনী আসার আগেই ঠিক ২৩ নাম্বার আয়াতে এসে বলা হচ্ছে- 'এগুলো (লাত, উযযা, মানাত ইত্যাদি) তো কেবল কতোগুলো নাম মাত্র যা তোমরা (মুশরিকরা) এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা রেখেছো। এদের (ক্ষমতার) পক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ নাজিল করেন নি।'

.

বড়ই আশ্চর্যের, তাইনা? একটু আগে বলা হলো,- তারা হলেন খুব-ই উঁচু পর্যায়ের। তাদের কাছে সাহায্যও চাওয়া যায়।'
তার ঠিক পরেই বলা হচ্ছে- 'এগুলো কেবল কিছু নাম যা তোমাদের মস্তিষ্কপ্রসূত।'
What a double stand! হাহাহাহাহা।
এরকম ডিগবাজী দেওয়ার পরেও, যারা একত্ববাদে বিশ্বাস রেখে নতুন ইসলামে এসেছে, তারা কী মুহাম্মদ সা: কে ছেড়ে তৎক্ষণাৎ চলে যেতো না?
আর, কুরাইশরা এতো পাণ্ডিত্যের অধিকারী হয়েও এটা বুঝতে পারলো না যে, মুহাম্মদ সঃ তাদের সাথে মাইন্ড গেইম খেলছে? হাহাহা।'....

.

সাজিদ হাসি থামালো। পঙ্কজ দা জিজ্ঞেস করলেন,- 'তাহলে, বলা হয় যে, আবিসিনিয়ায় হিজরত করা একটি দল এই ঘটনা

শুনে (মুহাম্মদ (সাঃ) কুরাইশদের দেব দেবীকে মেনে নিয়েছেন) ফেরত আসলো, তাদের ব্যাপারে কী বলবে?'
সাজিদ বললো, - 'হ্যাঁ, তারা ফেরত এসেছিলো ঠিকই, কিন্তু তারা ফেরত এসেছে এই ঘটনা শুনে নয়, অন্য ঘটনা শুনে। নব্যুয়াতের ৫ম বছরে তৎকালীন আরবের শ্রেষ্ঠ লোক উমার ইবনে খাত্তাব (রাঃ) এবং হামজা (রাঃ) এর মতো প্রভাবশালীরা ইসলাম গ্রহণ করেছে শোনার পরে, মক্কার পরিস্থিতিকে কিছুটা নিরাপদ ভেবে, তারা ফেরত এসেছিলো। তথাকথিত Satanic Verses নাজিলের কথা শুনে নয়।প্রত্যেক সহী রেওয়াতেই এটার বর্ণনা পাওয়া যায়।'

.

সবাই চুপ করে আছে। সাজিদ বললো,- 'পিকলু দা?'
- 'হু'
- 'আচ্ছা, তুমি ইশ্বরে বিশ্বাস করো?'
- 'নাহ।'
- 'ঠিক তো?'
- 'হ্যাঁ।'
- 'বিশ্বাস করো যে, ইশ্বর বলে কেউ নেই?'
- 'হুম। ইশ্বর বলে কেউ নেই।'
- 'আচ্ছা, তুমি কী বিশ্বাস করো শয়তান বলে কেউ আছে যাকে দেখা যায় না, ধরা যায় না, বোঝা যায় না?'
- 'আরে নাহ! আমি অমন ফাউ জিনিসে বিশ্বাস টিশ্বাস করি না।'
- 'ঠিক বলছো তো?'
- 'হ্যাঁ।'
এবার সাজিদ হোঁ হোঁ করে হাসা শুরু করলো। এরপরে বললো,- 'তাহলে কী করে তুমি সালমান রুশদীর Satanic Verses কে বিশ্বাস করছো যেখানে তুমি 'শয়তান' বলে কিছুতে বিশ্বাস-ই করো না? সালমান রুশদীকে বিশ্বাস করতে হলে তোমাকে আগে শয়তানের উপরে ঈমান আনতে হবে। তারপরেই না Satanic Verses (শয়তানের আয়াত) বিশ্বাস করা যাবে। হাহাহাহা......'

.

এতোক্ষণের নীরবতা ভেঙে সবাই এবার হাসিতে ফেঁটে পড়লো। অট্ট হাসিতে ভরে উঠলো আমাদের আড্ডা।

.

মাগরিবের আজান হচ্ছে। পিকলুদা, পঙ্কজ দা আর সৌরভ উঠে হাঁটা ধরলো। আমরা মসজিদের পথ ধরলাম।
দূরে পাখিরা নিজ নিজ আলয়ে ফিরে যাচ্ছে। আমি আর সাজিদ পাশাপাশি হাঁটছি। ভাবছি, ইশ! আজকের আড্ডাটা আরেকটু দীর্ঘ হলেও পারতো......!

.

'স্যাটানিক ভার্সেস এবং বাংলা নাস্তিকদের শয়তানের উপর ঈমান আনয়নের গল্প'/
সাজিদ সিরিজ, পার্ট- ০২, পর্ব- ০২

১২৩

নাস্তিকদের অভিযোগ খণ্ডন – ৩; “তোমাদের স্ত্রীগণ তোমাদের শস্যক্ষেত্র” - এই আয়াতের মাধ্যমে ইসলাম কি নারীকে ছোট করেছে? (শেষ পর্ব)

-জাকারিয়া মাসুদ

[আগের পর্বগুলোর জন্য দেখুন (#সত্যকথন) ৮৭, (#সত্যকথন) ৮৮, (#সত্যকথন) ৯১ ও (#সত্যকথন) ১১০]

.

.

এখন আপনার মনে হয়ত আবার প্রশ্ন জাগতে পারে, তাহলে আয়াতের এই অংশ দ্বারা কি বোঝানো হচ্ছে যেখানে বলা হয়েছে,
فَأْتُوا۟ حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ
“তোমরা যেভাবে ইচ্ছা তাদেরকে ব্যবহার কর”।

.

এই আয়াতাংশ প্রকৃতপক্ষে কি বুঝাতে চাচ্ছে? এই আয়াত কি পুরুষকে সহিংস করে তুলছে নারী জাতির উপর? কেড়ে নিচ্ছে নারীর স্বাধিকার? নারীকে পুরুষের কাছে করে তুলছে অসহায়? নাকি এই আয়াত নারী ও পুরুষকে প্রদান করছে যৌনতৃপ্তির অপার অধিকার। খুলে দিচ্ছে স্বামী স্ত্রীর ভালোবাসার মধ্যে বিবাদমান শত বাধন।
চলুন একটু সামনে আগাই।

.

আমরা প্রথমেই বলেছি যে, একটি আয়াত সম্পর্কে কেউ যদি সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করতে চায় তাহলে অবশ্যই তাকে সেই আয়াতটি নাযিলের প্রেক্ষাপট জানতে হবে, নয়তো সে ভুল বুঝবে এটাই স্বাভাবিক। কেউ যদি একটু আগ্রহ নিয়ে তাফসীরের যে কোন প্রসিদ্ধ কিতাব থেকে এই আয়াতের শানে নুযূলটির প্রতি একটু তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দেয়, তাহলে তার সামনে সকল কিছু দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

.

তাহলে চলুন জেনে নেয়া যাক এই আয়াতটি নাযিলের প্রেক্ষাপট কি?

.

একদা ওমর ইবনুল খাত্তাব (রা) রাসূলুল্লাহ (ﷺ) কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ﷺ) আমি তো ধ্বংস হয়ে যাচ্ছি। রাসূল (ﷺ) ওমরকে জিজ্ঞাসা করলেন ব্যাপার কি? ওমর বললেন, রাত্রে আমি আমার সওয়ারী উল্টো করেছি (অর্থাৎ আমার স্ত্রীর পেছনের দিক হতে তার যোনীতে সহবাস করেছি)। রাসূল (ﷺ) কোন উত্তর দিলেন না। পরক্ষনেই ওমরের প্রশ্নের জবাবে এই আয়াতটি নাযিল হয়।

.

অন্য বর্ণনায় এসেছে, মক্কার মুশরিকরা তাদের স্ত্রীদের সাথে সহবাসের সময় পার্শ্ব নিয়ে তেমন কোন চিন্তা ভাবনাই করতো না। তারা যেই পার্শ্ব দিয়ে তাদের খুশি সেই পার্শ্ব দিয়েই তাদের স্ত্রীদের যোনীতে সহবাস করতো। ইসলাম গ্রহণের পর মক্কার মুহাজির সাহাবাগণ যখন মদীনায় আগমন করেন, তখন মক্কা হতে আগত একজন মুহাজির সাহাবী মদীনার একজন আনসারী মহিলাকে বিয়ে করেন। বিয়ের রাতে সে স্ত্রীকে তার ইচ্ছামত সহবাসের প্রস্তাব প্রদান করেন, কিন্তু স্ত্রী সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং স্পষ্ট ভাষায় বলে দেন যে আমি ঐ একটি নিয়ম ছাড়া অন্য কোন নিয়মে সহবাস করার অনুমতি দেব না। কথা বাড়তে বাড়তে একসময় তা রাসূলুল্লাহ (ﷺ) দরবারে গিয়ে পৌছায়। অতঃপর এই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

.

{তাবারী, আবূ জা’ফর মুহাম্মাদ ইবনু জারীর, তাফসীরঃ জামিউল কোরআন, ৪/১৭০-১৭১, (ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ , প্রকাশকালঃ মে, ১৯৯৪), ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার, তাফসীরুল কোরআনীল আযীম, ২/২১৯-২২১(ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ, মার্চ, ২০১১), সুয়ূতী, জালালুদ্দীন আব্দুর রহমান ইবনে আবী বকর, তাফসীরে জালালাইন, ১/৪৮৫, (ইসলামিয়া কুতুবখানা, নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, তা.বি), মোহাম্মদ আমিনুল ইসলাম, তাফসীরে নূরুল কোরআন, ২/২৮১-২৮২ (আল-বালাগ পাবলিকেশন্স, স্যার সৈয়দ আহমদ রোড, মোহাম্মদপুর, ঢাকা, ৩য় প্রকাশ, আগস্ট, ২০০৮ ইং)}।

.

আয়াতটির শানে নুযূল আমাদেরকে বলছে, এই আয়াতাংশটুকু নাযিল হওয়ার কারণ হলো মুসলিমদের যৌনমিলনের পদ্ধতি কিরূপ হবে তা স্পষ্ট করে তোলা। ইহুদীরা মনে করতো স্বামী যদি পিছন দিক হতে তার স্ত্রীর যোনিতে সহবাস করে তবে সন্তান হলে তা টেরা হবে। তারা কেবলমাত্র নারীদের সাথে সামনের দিক হতে যোনীতে মিলন করতো। তাদের এই মিথ্যা দাবীকে খণ্ডন করে আয়াতটি নাযিল হয়। কেননা চিকিৎসা বিজ্ঞান অনুসারে এই কথা প্রমাণিত নয় যে, কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর সামনের দিক হতে যোনীতে মিলন না করে পার্শ্ব পরিবর্তন করে তো উৎপাদিত সন্তান টেরা কিংবা বিকলাঙ্গ হবে। তাই কোরআন ইহুদীদের এই দাবির অসারতা প্রমাণ করেছে এবং সাথে সাথে স্বামী ও স্ত্রীকে এই স্বাধীনতা প্রদান করেছে যে, তারা চাইলে যে কোন পদ্ধতিতে একে অপরের সাথে মিলিত হতে পারবে; তবে মিলনের একমাত্র স্থান হবে যোনি। কিন্তু যোনি ব্যাতীত অন্য কোন স্থান ব্যবহার করা যাবে না যেমন মলদ্বার কেননা এটা হারাম।

.

মলদ্বারে গমন করাকে উলামাদের সবাই হারাম বলে গণ্য করেছেন। ঈমাম আহমাদ বর্ণনা করেছেন যে, রসূলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, তোমরা লজ্জাবোধ কর কিন্তু আল্লাহ তায়ালা কোন ব্যপারে লজ্জাবোধ করেন না। তাই তোমরা স্ত্রীদের মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করো না।

.

ঈমাম তিরমিজী বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ﷺ) বলেছেন, পুরুষের সঙ্গে পুরুষ সমকাম করলে এবং পুরুষ স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করলে তাদের প্রতি আল্লাহ তায়ালা রহমতের দৃষ্টি প্রদান করেন না।

.

তাউস (র) হতে বর্ণিত তিনি বলেনঃ জনৈক ব্যক্তি ইবনে আব্বাস (রাযি) কে মলদ্বার দিয়ে সহবাস করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, তুমি কি আমাকে কুফরী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করছো?
ঈমাম আহমাদ বর্ণনা করেন যে, আবু হোরায়রা (রাযি) বলেনঃ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বলেছেন, সে ব্যক্তি অভিশপ্ত যে তার স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করে।

.

ঈমাম নাসায়ী বর্ণনা করেছেন যে, আবু হোরায়রা (রা) বলেনঃ রসূল (ﷺ) বলেছেন, তোমরা আল্লাহর ব্যাপারে যথাযথ লজ্জাবনত হও। তোমরা স্ত্রীদের মলদ্বার দিয়ে সঙ্গম করো না।

.

আবূ জাওরীয়া বলেনঃ জৈনেক ব্যক্তি আলী (রা) কে জিজ্ঞেস করলেন স্ত্রীদের মলদ্বার দিয়ে সহবাস করা সম্পর্কে। আলী (রা) উত্তরে বললেনঃ পেছনে করলে আল্লাহ পেছনে রেখে দেবেন। (অতঃপর বললেন) তুমি কি এই ব্যাপারে আল্লাহর কথা শোন নাই? আল্লাহ বলেছেন, তোমরা এমন নির্লজ্জতার কাজ করেছ, যা তোমাদের পূর্বে সমগ্র বিশ্বের কেউই করে নাই।

.

ইবন মাসউদ (রা), আবূ দারদা (রা), আবু হোরায়রা (রা), ইবনে আব্বাস (রা), আব্দুল্লাহ ইবন উমার (রা), আনাস ইবন মালিক (রা) প্রমুখ বড় বড় সাহাবাদের সবাই স্ত্রীর মলদ্বার দিয়ে সহবাস করাকে হারাম বলে গণ্য করেছেন। আবু হানিফা, শাফেঈ, আহমাদ ইবনু হাম্বাল, সাইদ ইবনু মুসাইয়াব, আবূ সালমা, ইকরিমাহ, তাউস, আতা, সাঈদ ইবনু যুনাইর, উরওয়া ইবন যুনাইর,

মুজাহিদ ইবনু যুবাইর, হাসান (রাহিমাহুমুল্লাহ) প্রমুখ বড় বড় আলিমগণ এটাকে হারাম বলেছেন।

.

{ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার, তাফসীরুল কোরআনীল আযীম, ২/২২৩-২২৯ (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ৫ম সংস্করণ, মার্চ, ২০১১)}।

.

আমাদের আলোচনার মাধ্যমে এই কথা অত্যন্ত জোরালোভাবেই প্রমাণিত হয় যে, ইসলাম বিদ্বেষীরা পবিত্র কোরআনের এই আয়াতকে যে অর্থে ব্যবহার করে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে চায় আয়াতটি তার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করছে। ড. আজাদের মত লোকেরা এই আয়াত উল্লেখ পূর্বক এ কথা বুঝাতে চান যে এই আয়াতের মাধ্যমে নারীদেরকে কেবলমাত্র পুরুষের কামসামগ্রী হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। পুরুষকে প্রদান করা হয়েছে যৌনাচারের অবাধ স্বাধীনতা আর নারীকে করেছে নিষ্কাম। নারীকে বানিয়েছে পুরুষের জন্য শস্যক্ষেত্র আর পুরুষকে বানানো হয়েছে সেই শস্যক্ষেত্রের ইচ্ছামত ব্যবহারকারী ইত্যাদি ইত্যাদি।

.

অথচ এই আয়াতটি তাদের ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত। ইসলাম এই আয়াতের মাধ্যমে নারীদের জন্য এমন কোন বিধান প্রণয়ন করে নি; যার দ্বারা নারীর যৌন স্বাধীনতাকে হরণ করা হয়েছে, তাকে বঞ্চিত করা হয়েছে তার প্রাপ্য অধিকার হতে, তার কামকে চাপিয়ে রাখতে বাধা প্রদান করেছে। কিংবা এই আয়াতটি পুরুষকে নারীর উপর সহিংস করা জন্য, নারীকে ইচ্ছেমত উপভোগ করার সুযোগ দেয়ার জন্য, নারীকে পুরুষের কামদাসী বানানোর জন্য নাযিল হয় নি। বরং পুরুষ ও নারী যাতে তাদের দাম্পত্য জীবনে যৌনাচার করে পারস্পরিক সন্তুষ্ট হতে পারে সে জন্যে মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেছেন।

.

আমরা উপর্যুক্ত আলোচনায় দেখেছি যে, ইহুদীরা স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক তৃপ্তিকে সীমাবদ্ধ করেছিল কিন্তু এই আয়াত স্বামী ও স্ত্রীর বৈবাহিক জীবনে যৌনাচারের ক্ষেত্রে তাদের কাম প্রকাশের পদ্ধতিকে সীমাবদ্ধ করেনি বরং কাম প্রকাশের পথকে করেছে উন্মুক্ত। একজন নারী চাইলে তার স্বামীর সাথে পেছন দিক হতে মিলিত হতে পারবে, চাইলে সামনের দিক হতে মিলিত হতে পারবে কিংবা বেছে নিতে পারবে এমন পদ্ধতি যা তার শারীরিক চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যশীল। ইসলাম আয়াতের মাধ্যমে নারীকে প্রদান করেছেন যৌন তৃপ্তির অধিকার। ইসলাম তাকে প্রদান করেছে অপার স্বাধীনতা, যেমন স্বাধীনতা প্রদান করেছে একজন পুরুষকে।

.

নারীর উপর একজন পুরুষ যাতে উগ্রতা প্রদর্শনপূর্বক তাকে কষ্ট প্রদান না করতে পারে সেজন্যে স্বামীর জন্যে নিষেধ করা হয়েছে তার স্ত্রীর মলদ্বারে (Anus) সঙ্গম করাকে। কেননা একজন নারীর কাছে মলদ্বারে সঙ্গম করাটা কখনোই আরামদায়ক কিংবা তৃপ্তিকর নয় বরং কষ্টদায়ক ও অসহনীয়ও বটে; সাথে সাথে তা বিভিন্ন ধরণের যৌনবাহিত রোগের (Sexually Transmitted Disease) কারণ।। মলদ্বার ব্যাতীত যে কোন পন্থায় স্ত্রীর যোনীতে (Vagina) মিলন করার ক্ষেত্রে ইসলামের কোন বাধা নেই বরং রয়েছে ব্যক্তির নিজস্ব স্বাধীনতা।

.

পাশাপাশি আমাদের এই আয়াতের শেষাংশও স্মরণ রাখা উচিত, যেখানে মহান আল্লাহ বলেছেনঃ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
"এবং আল্লাহকে ভয় করতে থাক আর নিশ্চিতভাবে জেনে রাখ যে, আল্লাহর সাথে তোমাদেরকে সাক্ষাত করতেই হবে। আর যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে সুসংবাদ জানিয়ে দাও"।

.

মহান আল্লাহ এই আয়াতাংশের মাধ্যমে এই বক্তব্যও সুস্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মানুষ যেন তাদের কর্মে আল্লাহকে ভয় করে অর্থাৎ এমন কোন কাজ যেন তার দ্বারা সম্পাদিত না হয় যার অনুমতি ইসলাম প্রদান করে নি। যেমনঃ স্ত্রীর সাথে খারাপ

আচরণ, তার সাথে অবৈধ পন্থায় যৌনমিলন, তাকে তার প্রাপ্য অধিকার হতে বঞ্চিত করা, তাকে কেবল যৌনদাসী হিসেবে বিবেচনা করা ইত্যাদি। পাশাপাশি ইসলাম একজন নারীর প্রত্যহ জীবনকে অত্যন্ত সম্মানের চোখে দেখেছে এবং তা নিয়ে কোন কটু মন্তব্য করে নি, যা নাস্তিক ড. আজাদ করেছেন। তিনি তার বইতে গর্ভবতী নারীকে তুলনা করেছেন গর্ভবতী পশুর সাথে। ড. আজাদ গর্ভবতী নারীদের সম্পর্কে বলেছেনঃ

“গর্ভবতী নারী অনেকটা দেখতে গর্ভবতী পশুর মতো, দৃশ্য হিসেবে গর্ভবতী নারী শোভন নয়, আর গর্ভধারণ নারীর জন্যে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। এক দিন হয়তো গর্ভধারণ গণ্য হবে আদিম ব্যাপার বলে”

[হুমায়ুন আজাদ, নারী, অধ্যায়ঃ ; পৃষ্ঠাঃ ৩৬৩; (আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ৩য় সংস্করণ, ষষ্ঠদশ মূদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৯, মে ২০০৯)]।

.

ইসলামে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক মুনিব এবং দাসের মত নয়। বরং ইসলামে স্বামী এবং স্ত্রীর সম্পর্ক হল,

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

অর্থঃ “তারা তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ”। (সূরা বাকারাহঃ ১৮৭ আয়াত)

স্বামী কেবল তার যৌনপ্তৃপ্তি লাভ করবে আর নারী তা থেকে বঞ্চিত হবে কিংবা পুরুষ তার স্ত্রীর উপর সহিংস হবে, ইসলামে স্বামী ও স্ত্রীর সম্পর্ক এমন নয় বরং স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক হল সৌহার্দ, সম্প্রীতি ও ভালোবাসার। মহান আল্লাহ স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক বর্ণনা করছেন এভাবে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ [٣٠:٢١]

আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তিতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। (সূরা রুমঃ ২১ আয়াত)।

.

ইসলাম স্বামী ও স্ত্রীর পারস্পরিক ভালোবাসাকে এতটাই গুরুত্বের চোখে দেখেছে যে, স্বামীর জন্যে তার স্ত্রীকে ভালোবেসে মুখে খাবাড় তুলে দেয়াকেও সাদাকাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছে। কোন স্বামী যদি তার স্ত্রীর ভরণপোষণের জন্যেও টাকা ব্যয় করে তবুও তা সাদাকাহ রূপে পরিগণিত হয়। রাসূল (ﷺ) বলেনঃ

حَدَّثَنَا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ أَخْبَرَنَا شُعَيْبٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ "إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتَّى مَا تَجْعَلُ فِي فَمِ امْرَأَتِكَ

সা’দ ইব্‌ন আবূ ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ্ (ﷺ) বলেনঃ ‘তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের আশায় যা-ই খরচ কর না কেন, তোমাকে তার সওয়াব অবশ্যই দেওয়া হবে। এমনকি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দাও, তারও।

{বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহিহ, অধ্যায়ঃ (০১), কিতাবুল ঈমান, পরিচ্ছেদঃ (৪১), আমল নিয়ত ও সওয়াবের আশা অনুয়ায়ী .... , ১/৫৪}।

.

সুবহানাল্লাহ, এই হাদিস একজন স্ত্রীর সম্মানকে, মর্যাদাকে এতটাই উপরে তুলেছে যে, তার মুখে খাবার তুলে দেয়াকে সাদাকাহ হিসেবে বিবেচনা করেছে। যা নাস্তিকরা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

.

তাই আমরা বলবো ইসলামের বিধান সম্পর্কে, কোরআন কারীমের ব্যাখ্যা সম্পর্কে, আয়াতের শানে নুযূল সম্পর্কে না জেনেই কেবলমাত্র একান্ত বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কলম চালনা করাটা কোন জ্ঞানবান লোকের কাজ নয়। এটা মূর্খরা করতে পারে যারা কোরআন কারীমের অন্তত একটি আয়াতও শুদ্ধ করে পড়ার মত যোগ্যতা রাখে না।

.

আমাদের শেষ কথা এটাই ইসলাম নারীকে শস্যক্ষেত্রের সাথে তুলনা করে কোন অযৌক্তিক কাজ করে নি বরং তা চিকিৎসা

বিজ্ঞান দ্বারা প্রমাণিত (যা ১ম পর্বে আলোচিত হয়েছে) এবং ড. আজাদের উত্থাপিত অভিযোগের মূল কেন্দ্রবিন্দু সূরা বাকারার ২২৩ নং আয়াতটি আমরা বিশ্লেষণ করে দেখেছি যে, এই আয়াত নারীকে পুরুষের দাসী হিসেবে, একান্ত সম্ভোগের বস্তু হিসেবে কিংবা পুরুষকে নারীর উপর সহিংস করে তোলার জন্য নাযিল হয় নি; বরং এর প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণই ভিন্ন যা ড. আজাদ উপলব্ধি করতে পারেন নি। তিনি এই আয়াতকে ব্যবহার করে যা বুঝাতে চেয়েছে, এই আয়াত তার সম্পুর্ণ বিপরীত অর্থ প্রকাশ করেছে। এই আয়াত পুরুষ ও নারীকে তাদের প্রাপ্য যৌন অধিকার প্রদান করেছে। সেই সাথে ইহুদীদের মিথ্যা দাবীর অসারতা প্রমান করেছে। পাশাপাশি নারীদের সাথে আচরণের বেলায় মহান আল্লাহকে ভয় করতে নির্দেশ প্রদান করেছে।

.

বস্তুত একমাত্র মহান আল্লাহই সর্বজ্ঞানী।

১২৪

নাস্তিকদের অভিযোগ খণ্ডন – ৬; ঋতুবতী নারীরা কি ইসলামে অবহেলিত? (১ম পর্ব)

-জাকারিয়া মাসুদ

ঋতুবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে ইসলামের মনোভাব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নাস্তিক *ড. হুমায়ুন আজাদ* তার লিখিত **"নারী"** বইতে বলেছেন,

.

"বাইবেল ও কোরআনে ও সব ধর্ম পুস্তকে ঋতুকে দেখা হয়েছে ভয়ের চোখে এবং ঋতুবতী নারীদের নির্দেশ করা হয়েছে নিষিদ্ধ ও দূষিত প্রাণীরূপে .... "ঋতুক্ষরণকে প্রতিটি ধর্ম ও আদিম সমাজ দেখেছে দানবিক ব্যপার রূপে"।

.

[হুমায়ুন আজাদ,নারী, অধ্যায়ঃ- লৈঙ্গিক রাজনীতি, পৃষ্ঠাঃ- ৪৪; (আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার ঢাকা, ৩য় সংস্করণ, ষষ্ঠদশ মূদ্রণ, বৈশাখ ১৪১৯, মে ২০০৯)]।

.

পরিতাপের বিষয় হল, ড. আজাদ শুধুমাত্র ধারণা ও আনাড়ি অনুবাদকের সাহায্য নিয়েই বেশ জোরেশোরেই ইসলামের বিরুদ্ধে কলম চালিয়েছেন। তিনি হয়ত ভুলেই গেছেন যে শুধুমাত্র একজনের অনুবাদের উপর নির্ভর করে আর ধারণার বশবর্তী হয়ে সমালোচনা করাটা কোন জ্ঞানবান লোকের কাজ নয়। আরও মজার বিষয় হলো তিনি এই বিষয়টির সমালোচনা করতে গিয়ে একটি মাত্র কোরআনের আয়াতের সাহায্য নিয়েছেন তাও আবার ভুল অনুবাদের, কিন্তু তিনি নবী (ﷺ) এর হাদিস থেকে এই বিষয়ে কোন দলিল পেশ করতে পারেন নি। তার এই মিথ্যাচার দেখে আল্লাহ্ তায়ালার একটি বানীর কথা মনে পড়ে গেল। মহান আল্লাহ্ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ
ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۖ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ

"মানুষের মধ্য কেউ কেউ আল্লাহ্ সম্বন্ধে বিতণ্ডা করে; তাদের কাছে না আছে জ্ঞান,না আছে পথনির্দেশ, না আছে কোন দীপ্তিমান কিতাব। সে বিতণ্ডা করে ঘাড় বাকিয়ে লোকদেরকে আল্লাহর পথ হতে ভ্রষ্ট করার জন্য তার জন্যে রয়েছে দুনিয়াতে লাঞ্ছনা এবং কিয়ামতের দিন আমি তাকে দহন যন্ত্রণা আস্বাদন করাব"। (সুরা হাজ্জঃ ৮-৯ আয়াত)

.

আমাদের আলোচনার শুরুতেই চলুন আমরা হায়েয (Menstruation) সম্পর্কে কিছুটা জেনে নেই। .
হায়েযের সংজ্ঞা প্রদান করতে গিয়ে শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমিন (রাহি) বলেন,

.

'হায়েযের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কোন বস্তু নির্গত ও প্রবাহিত হওয়া। আর শরীয়তের পরিভাষায় হায়েয বলা হয় ঐ প্রাকৃতিক রক্তকে, যা বাহ্যিক কোন কার্যকারণ ব্যাতীতই নির্দিষ্ট সময়ে নারীর যৌনাঙ্গ দিয়ে নির্গত হয়। হায়েয প্রাকৃতিক রক্ত, অসুস্থতা আঘাত পাওয়া, পড়ে যাওয়া এবং প্রসবের সাথে এর কোন সম্পর্কে নেই। এই প্রাকৃতিক রক্ত নারীর অবস্থা ও পরিবেশ-পরিস্থিতির বিভিন্নতার কারণে নানা রকম হয়ে থাকে এবং এই কারণেই ঋতুস্রাবের দিক থেকে নারীদের মধ্যে বেশ পার্থক্য দেখা যায়।'

.

{উসাইমিন, মুহাম্মাদ বিন সালেহ, নারীর প্রাকৃতিক রক্তস্রাব, অনুবাদঃ মীযানুর রহমান আবুল হোসাইন, পৃষ্ঠাঃ ০৪; (ইসলাম প্রচার ব্যুরো, রাবওয়াহ, রিয়াদ, সৌদি আরব, ১৪২৯ হি)}।

.

এইবার চলুন মেডিক্যাল সাইন্স অনুসারে আমরা দেখি যে হায়েয তথা রজঃস্রাব (Menstruation) কাকে বলে।

.

হায়েয হলো উচ্চতর প্রাইমেট (Primate) বর্গের স্তন্যপায়ী (Mammalian) স্ত্রী একটি শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া যা প্রজননের সাথে সম্পর্কিত। প্রতি মাসে এটি হয় বলে বাংলায় এটিকে মাসিক নামেও অভিহিত করা হয়। প্রজননের উদ্দেশ্যে নারীদের ডিম্বাশয়ে (Ovum) ডিম্বস্ফোটন হয় এবং তা ফ্যালোপিয়ান টিউব (Fallopeian Tube) দিয়ে নারীদের জরায়ুতে চলে আসে। এই পরিস্ফুটিত ডিম্ব জরায়ুতে ৩-4 দিন অবস্থান করে। এই সময়ের মধ্যে যদি কোন শুক্রানু নারীদেহের জরায়ুতে প্রবেশ না করে, তাহলে সেই ডিম্বাণু নষ্ট হয়ে যায়, সেই সাথে জরায়ুর এন্ডোমেট্রিয়াম (Endometrium) স্তর ভেঙ্গে পড়ে। আর যদি পুরুষের শুক্রাণু (Sperm) সেখানে পৌছে তাহলে তা নিষিক্ত হয়ে যায় এবং ভ্রূণের (Zygote) সূচনা ঘটে। এন্ডোমেট্রিয়াম এর ভঙ্গ ঝিল্লি, সঙ্গের শ্লেষ্মা ও এর রক্তবাহ থেকে উৎপন্ন রক্তপাত সব মিশে তৈরি তরল এবং তার সাথে তঞ্চিত এবং অর্ধ তঞ্চিত তরল কয়েকদিন ধরে লাগাতার যৌনি পথে নির্গত হয়। এই ক্ষরণই হায়েয নামে পরিচিত। কখনো কখনো একে গর্ভস্রাব হিসেবেও উল্লেখ করা হয়।। যদি জরায়ুতে অবমুক্ত ডিম্বটি পুরুষের শুক্রানো দ্বারা নিষিক্ত হয়ে Implantation শুরু হয় তবে আর হায়েয হয় না। তাই মাসিক রজস্রাব বন্ধ হয়ে যাওয়াকে মেয়েদের গর্ভধারণের প্রাথমিক লক্ষণ হিসেবে ধরা হয়। রজস্রাব যুবতীদের ক্ষেত্রে সাধারণত ২১-৪৫ দিন পর পর ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে ২১-৩১ দিন পর পর সংগঠিত হয়। এটি সাধারণত মেয়েদের ১১ বা ১৩ বছর বয়স থেকে শুরু হয়। মহিলাদের হায়েয একেবারে বন্ধ হয়ে যায় যখন তাদের Menopause শুরু হয়। তাদের এই রক্তপাত সাধারণত ২-৭ দিন স্থায়ী হয়।

.

Frederick R. Bailey, A Text Book of Histology, (William Wood and Company, New York, 3rd ed.)
"Menstruation and the menstrual cycle fact sheet". Office of Women's Health. December 23, 2014. Retrieved 25 June 2015.

.

ড. আজাদ তার বইতে হায়েয বিষয়ক ইসলামের বিধানের সমালোচনা করতে গিয়ে একটি মাত্র আয়াতের সাহায্য নিয়েছেন। আয়াতটি হল,

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ ۖ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ۖ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهُرْنَ ۖ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ
أَمَرَكُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ [٢:٢٢٢]

.

"আর তারা তোমাকে হায়েজ সম্পর্কে প্রশ্ন করে,বল তা কষ্টকর। সুতরাং তোমরা হায়েজ কালে স্ত্রী সঙ্গম (যৌনমিলন) বর্জন করবে এবং তারা পবিত্র না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী সঙ্গম করবে না। অতঃপর তারা যখন পবিত্র হবে তখন তাদের নিকট ঠিক সে ভাবে গমন করবে যেভাবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে আদেশ দিয়েছেন"। (সুরা বাকারাহঃ ২২২ আয়াত)

.

চলুন আমরা এই আয়াতের শানে-নুযূলটি একটু জেনে নেই। আয়াতটি মূলত ইহুদীদের লক্ষ্য করে নাযিল হয়। তারা হায়েযা মেয়েলোকদের সাথে অত্যন্ত খারাপ আচরণ করত। তাদের কে এই সময়ে ঘোড়ার আস্তাবলে রেখে দিত, ভালোমত খাবার গ্রহণ করতে দিত না, সমাজের লোকেরা তাদের সাথে এই সময়টাতে দেখা সাক্ষাৎ বন্ধ রাখতো। এভাবে ঋতু চলাকালীন সময়ে মেয়েলোকেরা অবহেলিত হত ইহুদিদের সমাজে। এমনকি মক্কার পৌত্তলিকরাও ঋতুবতী মহিলাদের কে অবজ্ঞা করত, তাদের খারাপ চোখে দেখত, তাদেরকে এই সময়ে আলাদা ঘরে রাখত। আবার তাদের সাথে এই সময়ে যৌনমিলনও করত তারা। তখন সাহাবারা তাদের স্ত্রীদের সাথে এই সময়ে কি ধরণের আচরণ প্রদর্শন করবেন তা আল্লাহর রাসুল (ﷺ) এর কাছে জানতে চাইলে এই আয়াত অবতীর্ণ হয়, যা নিম্নের হাদিস দ্বারা পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়।

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْيَهُودَ، كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ " . فَبَلَغَ ذَلِكَ الْيَهُودَ فَقَالُوا مَا يُرِيدُ هَذَا الرَّجُلُ أَنْ يَدَعَ مِنْ أَمْرِنَا شَيْئًا إِلاَّ خَالَفَنَا فِيهِ فَجَاءَ أُسَيْدُ بْنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّادُ بْنُ بِشْرٍ فَقَالاَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ الْيَهُودَ تَقُولُ كَذَا وَكَذَا . فَلاَ نُجَامِعُهُنَّ فَتَغَيَّرَ وَجْهُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى ظَنَنَّا أَنْ قَدْ وَجَدَ عَلَيْهِمَا فَخَرَجَا فَاسْتَقْبَلَهُمَا هَدِيَّةٌ مِنْ لَبَنٍ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَأَرْسَلَ فِي آثَارِهِمَا فَسَقَاهُمَا فَعَرَفَا أَنْ لَمْ يَجِدْ عَلَيْهِمَا.

.

যুহায়র ইবন হারব (র)...আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহুদীরা তাদের মহিলাদের হায়েয হলে তার সঙ্গে এক সাথে আহার করত না এবং এক ঘরে বাস করত না । সাহাবায়ে কিরাম এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) -কে জিজ্ঞেস করলেন । তখন আল্লাহ তায়াআলা এ আয়াত নাযিল করলেন:-“ তারা তোমার কাছে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে । বলে দাও যে, তা হলো কষ্টদায়ক .... ”। এরপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ কর। এ খবর ইয়াহুদীদের কাছে পৌছলে তারা বলল, এ লোকটি সব কাজেই কেবল আমাদের বিরোধিতা করতে চায় । অত:পর উসায়দ ইবন হুযায়র (রা) ও আববাদ ইবন বিশর (রা) এসে বললেন, ইয়া রাসুলুল্লাহ ! ইয়াহুদীরা এ রকম এ রকম বলছে । আমরা কি তাদের সাথে (হায়িয অবস্থায়) সহবাস করব না? রাসুলুল্লাহ (ﷺ) -এর চেহারা মূবারক বিবর্ণ হয়ে গেল । এতে আমরা ধারণা করলাম যে,তিনি তাদের ওপর ভীষণ রাগান্বিত হয়েছেন। তারা (উভয়ে) বেরিয়ে গেল । ইতিমধ্যেই রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে দুধ হাদিয়া এল । তিনি তাদেরকে ডেকে আনার জন্য লোক পাঠালেন । (তারা এলে) তিনি তাদেরকে দুধ পান করালেন । তখন তারা বূঝল যে, তিনি তাদের ওপর রাগ করেননি।

.

{মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায়ঃ (৩) হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৬০১; ইবনু কাসীর, ইসমাঈল ইবনু উমার, তাফসীরুল কোরআনীল আযীম, ১/৬০৯; ইবনু হাজার আসকালানী, বুলুগুল মারাম, অধ্যায়ঃ ঋতুবতী মহিলাদের যে সকল কাজ বৈধ, হাদিস নংঃ ১৪৩ (তাওহীদ পাবলিকেশন, ৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা-১১০০, ১ম প্রকাশ, আগস্ট, ২০১৩)}

.

কোরআনের এই আয়াতে আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা নারীদের হায়েজ কালীন সময়ের কথা বর্ণনা করেছেন। হায়েযকালীন সময় যে তাদের জন্য কষ্টকর, যন্ত্রনাদায়ক তা উল্লেখ করেছেন এবং সেই সময়ে তাদের সাথে যৌনমিলন করতে নিষেধ করেছেন। ডঃ আজাদ একটি যায়গায় মারাত্তক ভুল করেছেন আর তা হলো এই আয়াতের ক্ষেত্রে “আযা” (أَذًى(শব্দের তিনি ভুল অর্থ গ্রহণ করেছেন তার “নারী” বইতে। আর ভুল অর্থ গ্রহণ করেই তিনি ইসলামের সমালোচনা করেছেন কয়েক পৃষ্ঠা ব্যাপী। চলুন প্রসিদ্ধ অভিধান থেকে দেখে নেয়া যাক যে “আযা” শব্দের অর্থ কি কি হতে পারে ?

.

বিশ্ববিখ্যাত আরবী টু ইংরেজী অভিধান “A dictionary of modern written Arabic language” অনুযায়ী أَذًى শব্দের অর্থ গুলো হলোঃ

To suffer damage, be harmed, hurt, wrong, to molest, annoy, irritable, trouble.

.

{Hans wehr, Edited by:- J Milton Cowan, A dictionary of modern written arabic, p.12; (Spoken language servibe, Inc.,Ithaca, New York, 3rd edition,1976)}

.

“Al-Mawid (A modern Arabic to English dictionary)” অনুসারে “আযা” (أَذًى) শব্দের অর্থ হলোঃ

harm, damage, injury, wrong, detriment, lesion, grievance, nuisance, annoyance, harassment.

.

{Dr. Rohi Baalbaki, Al-Mawrid, p.67; (Dar-el-ilm, Lilmalayin, seventh edition, Beirut, Lebanon,1995)}

.

“আল-মু’জামুল ওয়াফী” অনুসারে “আযা” (أَذًى) শব্দের অর্থ হলোঃ
কষ্ট, ক্ষতি, অনিষ্ঠ, আঘাত।

.

{ড. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, আল-মু’জামুল ওয়াফী, পৃষ্ঠাঃ ৬২; (রিয়াদ প্রকাশনী, ৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা, ১৩শ সংস্করণ, ২০১৩)}।

.

আপনি লক্ষ্য করুন কোন অভিধানেই কিন্তু “আযা” (أَذًى) শব্দের অর্থ দানবিক, অপয়া, পশুর মত, নিষিদ্ধ, দূষিত প্রাণী ইত্যাদি নেই। ইসলামে নারীদের ঋতুকালীন অবস্থায় যে তাদের কে অবহেলা করা হয় এই বিধানটি ডঃ আজাদ কোন দলীলের (কোরআন ও সুন্নাহ) মাধ্যমে গ্রহণ করেছেন তা পরিষ্কার নয়। কেননা এই আরবী শব্দের অর্থগুলো আমরা প্রসিদ্ধ অভিধান গ্রন্থ থেকে দেখেছি। সেখানে কোথাও এই কথা বলা নেই যে, “আযা” (أَذًى) শব্দের অর্থ অপয়া, দানবিক ইত্যাদি। আর আল কোরআনে এমন কোন আয়াতও নেই যার দ্বারা ডঃ আজাদের এই কল্পনাপ্রসূত দাবীর সত্যতা পরিলক্ষিত হয়।

.

(ইনশাআল্লাহ চলবে ....)

১২৫

মুসা (আ) এর সময়কালে ফিরআউনের সহচর হামান (Haman): কুরআনের ঐতিহাসিক বর্ণনায় কি ভুল আছে?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

আল কুরআনে মুসা(আ) এর ঘটনায় মিসরের ফিরআউনের (Pharaoh) সাথে সাথে আরো একজন মন্দ ব্যক্তির কথা উল্লেখ আছে। আর সে হচ্ছে হামান (Haman)।সে ছিল ফিরআউনের সহযোগী। কুরআনের ৩টি সুরায়{কাসাস ২৮:৬-৮, আনকাবুত ২৯:৩৯, মু'মিন (গাফির) ৪০:২৪,৩৬} হামানের কথা উল্লেখ আছে। সুরা মু'মিনের ৩৬ ও ৩৭ নং আয়াতে উল্লেখ আছে যে ফিরআউন তামাশাচ্ছলে হামানকে এক সুউচ্চ ইমারত(tower) নির্মাণের নির্দেশ দেয় যাতে করে সে আকাশে উঁকি দিয়ে মুসা(আ) এর উপাস্য প্রভুকে দেখতে পায় [আয়াতের লিঙ্কঃ www.quran.com/40/36-37]।

.

খ্রিষ্টান মিশনারী ও নাস্তিক মুক্তমনাদের দাবি---কুরআনের এই বিবরণে ভুল আছে।
কেন?
কারণ বাইবেলে মুসা(আ) এর ঘটনায় হামান নামে ফিরআউনের কোন সহচরের বিবরণ নেই।তা ছাড়া বাইবেলেও একজন হামানের কথা উল্লেখ আছে, সেও একটি tower নির্মাণ করে [বাইবেলের সংশ্লিষ্ট অংশের লিঙ্কঃ https://goo.gl/noM3q7]। কিন্তু বাইবেলের এই হামান মুসা(আ) ও ফিরআউনের সময়ে বাস করত না বরং এর থেকে প্রায় হাজার বছর পরে পারস্যের রাজা অহশ্বেরশ(Xerxes) এর সময়ে বাস করত। এ কারণে তাদের দাবি হচ্ছে কুরআন হামান বিষয়ে ভুল তথ্য দিয়েছে, মুসা(আ) ও ফিরআউনের সময়ে কোন হামান মিসরে ছিল না এবং হামান মুসা(আ) এর হাজার বছর পরের মানুষ।

.

প্রথম কথাঃ খ্রিষ্টান মিশনারীদের দাবির না হয় একটা হেতু পাওয়া গেল, তাদের ধর্মগ্রন্থের ঘটনার সাথে সাংঘর্ষিক তথ্য কুরআনে আছে।
কিন্তু নাস্তিক মুক্তমনারা কি কোন ধর্মগ্রন্থে বিশ্বাস করে? তারা কেন সব সময়ে বাইবেলের ঘটনাকেই সঠিক ধরে নিয়ে কুরআনকে বিবেচনা করে? সাধারণ যুক্তি তো এটাই বলে যে—দু'টি গ্রন্থে যদি বিপরীত তথ্য থাকে, তাহলে এর যে কোন একটি সঠিক ও অন্যটি ভুল হতে পারে। যে কোন নিরপেক্ষ ব্যক্তির এভাবেই বিষয়টা দেখা উচিত। কিন্তু নাস্তিক-মুক্তমনারা কেন ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থকে প্রথমে সঠিক ধরে নেয় আর কুরআনের তথ্যে বৈপরিত্য থাকলে সেটাকে ভুল বলে ধরে নেয়? এর উল্টোটা হবারও তো সম্ভাবনা থাকে। নাস্তিক-মুক্তমনাদের এই একচোখা দৃষ্টিভঙ্গী প্রমাণ করে যে তারা আসলে ধর্ম নিরপেক্ষ না, তারা আসলে ইসলামবিদ্বেষী।

.

দ্বিতীয় কথাঃ কুরআন আর বাইবেলের কোন তথ্যে মিল থাকলেই খ্রিষ্টান মিশনারী আর নাস্তিক-মুক্তমনারা হৈচৈ করে বলতে থাকে যেঃ কুরআন বাইবেল থেকে কপি করা।হামান বিষয়ক এই ঘটনায় যেহেতু বাইবেলের তথ্যের সাথে কুরআনের ঘটনার কোন মিল নেই, কাজেই এখানে তাদের এই অভিযোগ আনবার কোন সুযোগ নেই।
কাজেই এখানে হয় বাইবেল সত্য, নাহলে কুরআন সত্য। অথবা উভয় গ্রন্থই ভুল।

.

চলুন এবার আমরা ঐতিহাসিক তথ্য প্রমাণাদির আলোকে নিরপেক্ষভাবে বিশ্লেষণ করে দেখি এখানে কোন গ্রন্থ সঠিক তথ্য দিয়েছে—বাইবেল নাকি কুরআন।

.
বাইবেলের Esther(বাংলা বাইবেলে 'ইষ্টেরের বিবরণ') নামক গ্রন্থে হামানের কথা উল্লেখ আছে। এটি বাইবেলের পুরাতন নিয়ম(Old testament) অংশের একটি গ্রন্থ।ইহুদিদের যে সকল কিতাবকে খ্রিষ্টানরা ঈশ্বরের বাণী হিসাবে বিশ্বাস করে, সেগুলোকে তারা বাইবেলের Old testament অংশে রেখেছে।এই অংশের গ্রন্থগুলো মূলত প্রাচীন ইহুদিদের লেখা। ইহুদিরা তাদের নিজেদের এ কিতাবকে কতটুকু বিশুদ্ধ বলে মনে করে? Jewish Encyclopediaতে Esther গ্রন্থবিষয়ক আলোচনায় Critical View অংশে বলা হয়েছেঃ "The vast majority of modern expositors have reached the conclusion that the book is a piece of pure fiction, although some writers qualify their criticism by an attempt to treat it as a historical romance. The following are the chief arguments showing the impossibility of the story of Esther"
অর্থাৎ:-- বেশীরভাগ আধুনিক ব্যাখ্যাকার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, এই বইটি নিখাদভাবে একটি কল্পিত গল্প(fiction)।
...
শুধু তাই না, এ আর্টিকেলের Improbabilities of the Story অংশে দেখানো হয়েছে বাইবেলের অন্য বইগুলোর তথ্যের সাথে Esther গ্রন্থের তথ্য কতটা সাংঘর্ষিক।
আর্টিকেলের Probable Date অংশে বলা হয়েছেঃ In view of all the evidence the authority of the Book of Esther as a historical record must be definitely rejected. Its position in the canon among the Hagiographa or "Ketubim" is the only thing which has induced Orthodox scholars to defend its historical character at all. Even the Jews of the first and second centuries of the common era questioned its right to be included among the canonical books of the Bible (compare Meg. 7a).
অর্থাৎ:-- সকল প্রমাণের আলোকে আমরা বলতে পারি যে, ঐতিহাসিক রেকর্ড হিসাবে Esther এর গ্রহণযোগ্যতা বাতিল হিসাবে গণ্য হবে।...এমনকি ১ম ও ২য় শতাব্দীর ইহুদিরাও বাইবেলের অনুমোদিত বই হিসাবে Esther এর অন্তর্ভুক্ত হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলতো।
[১]
.
খোদ Jewish Encyclopediaতে বাইবেলের গ্রন্থ Esther এর ঐতিহাসিক গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে এইসব মন্তব্য করা হয়েছে। যে ইহুদিরা এই গ্রন্থের লেখক, ধারক ও বাহক, তারাই এর নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে এ রকম প্রশ্ন তুলেছে। এ তো গেল ইহুদি গবেষকদের কথা। সেকুলার গবেষকগণও এই গ্রন্থ নিয়ে অনেক যৌক্তিক অভিযোগ এনেছেন যেগুলো আর এখানে উল্লেখ করলাম না। এমনই একটি "নির্ভরযোগ্য"(!!!) ঐতিহাসিক ডকুমেন্টের সহায়তা নিয়ে ইসলামবিরোধিরা কুরআনের ঐতিহাসিক তথ্যকে প্রশ্নবিদ্ধ করছেন। সুবহানাল্লাহ!
.
এবারে আমরা বিশ্লেষণ করে দেখি কুরআনে উল্লেখিত তথ্য কতটা সঠিক বা নির্ভরযোগ্য।
১৭৯৯ সালে নেপোলিয়ন বোনাপার্টের মিসর অভিযানের সময়ে তার একজন সৈন্য Rosetta Stone আবিষ্কার করে। Rosetta Stoneএ প্রাচীন মিসরীয় লিপি(hieroglyphics) এবং তার তুলনামূলক গ্রীক বর্ণমালার বিবরণ ছিল যার সাহায্যে গবেষকগণ প্রাচীন মিসরীয় লিপির পাঠোদ্ধার করতে সক্ষম হন। [২] প্রাচীন মিসরীয় লিপি(hieroglyphics) পাঠোদ্ধারের পর জানা গেছে যেঃ প্রাচীন মিসরে যারা পাথর দ্বারা নির্মাণকাজ করত তাদের নেতাকে বলা হত 'হামান'। অর্থাৎ ফিরআউন(pharaoh) এর মত 'হামান'ও একটা টাইটেল। [৩]
.
এই ব্যাপারটি অনুসন্ধান করার জন্য ড. মরিস বুকাইলি ফ্রান্সের একজন মিসরবিদদের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞেস করেন যে, হামান বলে কোন নাম তিনি তার প্রাচীন মিসরবিষয়ক রেকর্ডে দেখেছেন কিনা। তিনি তাঁর কাছে জানতে চান তিনি

কোথায় এই নাম পেলেন। তিনি তাকে রাসুল(ﷺ) এর কথা বলেন। মিসরবিদ তাঁকে বলেন যে এমন নামের সন্ধান পাওয়া তো তাঁর পক্ষে অসম্ভব কেননা রাসুল(ﷺ) এর যুগের অনেক কাল আগে প্রাচীন মিসরীয় ভাষা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তিনি তাঁকে আরো বলেন যে এইসব নামের রেকর্ডের জন্য তাঁকে জার্মানী যেতে হবে। তিনি সে অনুযায়ী জার্মানী যান এবং সেখানে গিয়ে প্রাচীন মিসরে মুসা(আ) এর সময়কালে ফিরআউনদের অধীনে নির্মাতা এবং স্থপতিদের ব্যাপারে অনুসন্ধান করতে থাকেন। এবং সুবহানাল্লাহ, তিনি 'হামান' নামটি পেয়ে যান! যারা পাথর দ্বারা নির্মাণকাজ করত তাদের নেতার উপাধী এটা। তিনি ফ্রান্সে ফিরে সেই মিসরবিদকে ডিকশনারীটির ফটোকপি দেখান যাতে তিনি 'হামান' এর সন্ধান পেয়েছেন। এরপর তিনি তাকে কুরআন থেকে হামানের আয়াত দেখান। এটা দেখে সেই ফরাসী মিসরবিদ বিস্ময়ে বাকরুদ্ধ হয়ে যান। ১৯৮৯ সালে প্যারিস থেকে প্রকশিত 'Réflexions sur le Coran' বইতে মরিস বুকাইলি তাঁর এ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। [৪]

.

পবিত্র কুরআনের বিবরণে আমরা দেখছি যেঃ মিসরের ফিরআউন 'হামান' বলে একজনকে ডেকে সুউচ্চ ইমারত বানাবার আদেশ দিচ্ছে; আর প্রাচীন মিসরীয় ভাষায় পাথরের নির্মান শ্রমিকদের নেতাকে ডাকা হত হামান বলে। সুরা কাসাসের ৩৮নং আয়াতে [লিঙ্ক: www.quran.com/28/38] এটাও বলা আছে ফিরআউন হামানকে ইট পুড়িয়ে ইমারত বানাতে বলেছিল। একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে মিসরবিদগণ(Egyptologists) জানতে পেরেছেন যে, প্রাচীন মিসরে কাদা পুড়িয়ে ইট বানানোর প্রচলন ছিল। কাদা পুড়িয়ে মজবুত ইট বানানোর জ্ঞান—প্রাচীন একটি সভ্যতার জন্য এটা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য একটা ব্যাপার। [৫] আর এই তথ্যটি আল কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে।

.

যে কুরআনকে খ্রিষ্টান মিশনারী আর নাস্তিকরা অভিযুক্ত করে "বাইবেল থেকে কপি" করা বলে, সেই কুরআনেই আমরা দেখছি এমন ঐতিহাসিক তথ্য আছে যা কোন ইহুদি বা খ্রিষ্টান পণ্ডিতের সেই যুগে জানা ছিল না। ঐতিহাসিক তথ্যে ভুল থাকা তো দূরের কথা, নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ দ্বারা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কুরআনে বিস্ময়করভাবে সঠিক ঐতিহাসিক তথ্য আছে। ইসলামবিদ্বেষীদের অভিযোগ আর সত্যের মাঝে সবসময়েই বিশাল ব্যবধান লক্ষ্য করা যায়।

.

প্রাচীন মিসরীয় ভাষা তো মুহাম্মাদ(ﷺ) এর শত শত বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।মুহাম্মাদ(ﷺ) এর যুগ ৭ম শতাব্দীতে পৃথিবীতে কেউ প্রাচীন মিসরীয় ভাষা জানতো না, কোন মিসরবিদও(Egyptologist) সে যুগে ছিল না। প্রাচীন মিসরীয় ভাষার পাঠোদ্ধার করা সম্ভব হয় মুহাম্মাদ(ﷺ) এর সময় থেকে এক সহস্রাব্দেরও বেশি সময় পরে, ১৮ শতকে। আজ থেকে ১৪শ বছর আগে এমন কে ছিল যে জানতো যে প্রাচীন মিসরে পাথরের নির্মাণশ্রমিকদের নেতার টাইটেল ছিল 'হামান' কিংবা প্রাচীন মিসরীয় সভ্যতার মানুষেরা পোড়ানো ইট দিয়ে ইমারত নির্মাণ করত? ৭ম শতাব্দীতে কে মুহাম্মাদ(ﷺ)কে বলে দিল প্রাচীন মিসরীয় লিপির মর্ম? কে তাঁকে নিখুঁতভাবে ঐতিহাসিক তথ্য বলে দিল? একমাত্র মহান স্রষ্টা আল্লাহ ছাড়া?

.

" তুমি[মুহাম্মাদ(ﷺ)] তো এর পূর্বে কোন কিতাব পাঠ করোনি এবং স্বহস্তে কোনদিন কিতাব লিখনি। এরূপ হলে মিথ্যাবাদীরা অবশ্যই সন্দেহ পোষণ করত।
বরং যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তাদের অন্তরে এটা (কুরআন) তো স্পষ্ট নিদর্শন। একমাত্র জালিম ছাড়া আমার নিদর্শন কেউ অস্বীকার করে না।"
(কুরআন, আনকাবুত ২৯:৪৮-৪৯)

.

" তারা কেন কুরআন নিয়ে গবেষণা করে না? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারো নিকট হতে হতো তবে তারা ওতে বহু গরমিল পেতো। "
(কুরআন, নিসা ৪:৮২)

.

তথ্যসূত্রঃ

.

[১] Jewish Encyclopedia; Article: Esther

http://www.jewishencyclopedia.com/articles/5872-esther

[২] 1799: Rosetta Stone found

http://www.history.com/this-day-in-hist.../rosetta-stone-found

[৩] ▪ "Biblical Haman » Qur'ānic Hāmān: A Case Of Straightforward Literary Transition?" - Islamic Awareness

http://www.islamic-awareness.org/.../Cont.../External/haman.html

▪ "10 - Historical Miracles in the Quran - Proof of Islam " (Abdur Rahim Green)

https://www.youtube.com/watch?v=K_ZMzUlxAkc

▪ "Hāmān - The Qur'an stands up to History "

https://www.youtube.com/watch?v=iLMFRkzPa94

[৪] ▪ Egyptology In The Qur'an - Exhibition Islam

https://goo.gl/SPbHiL

▪ "The Miracle of Quran | Haman The Architect of Pharaoh | Nouman Ali Khan "

https://www.youtube.com/watch?v=5QY0AfV1iAs

▪ Réflexions sur le Coran

http://www.iqrashop.com/Reflexions-sur-le-Coran-Professeur-...

[৫] ▪ "Were Burnt Bricks Used In Ancient Egypt In The Time of Moses? " - Islamic Awareness

http://www.islamic-awareness.org/.../Contrad/.../burntbrick.html

▪ Ancient Egyptian Mud Brick Construction: Materials, Technology, and Implications for Modern Man -Data Plasmid

https://dataplasmid.wordpress.com/.../ancient-egyptian-mud-b.../

১২৬

কুরআন কী করে স্রষ্টার বাণী হয় যেখানে এতে বিভিন্ন প্রার্থনামূলক বাক্য আছে?

-হোসাইন শাকিল

#নাস্তিক_প্রশ্ন: সুরা ফাতিহা'র (Quran 1:1-7) আয়াতগুলো দ্বারা মুহম্মাদ কর্তৃক আল্লাহর প্রশংসা করাটাকেই বোঝায়! তাহলে কুরআন কি করে আল্লাহর পাঠানো বানী হতে পারে?

.

#উত্তরঃ بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

শুরু করছি আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময়, অতি দয়ালু।

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ ٱلْعَـٰلَمِينَ

যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ তাআলার যিনি সকল সৃষ্টি জগতের পালনকর্তা।

ٱلرَّحْمَـٰنِ ٱلرَّحِيمِ

যিনি নিতান্ত মেহেরবান ও দয়ালু।

﴿٣﴾

مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ

যিনি বিচার দিনের মালিক।

﴿٤﴾

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ

আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং শুধুমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।

﴿٥﴾

ٱهْدِنَا ٱلصِّرَٰطَ ٱلْمُسْتَقِيمَ

আমাদেরকে সরল পথ দেখাও,

﴿٦﴾

صِرَٰطَ ٱلَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا ٱلضَّآلِّينَ

সে সমস্ত লোকের পথ, যাদেরকে তুমি নেয়ামত দান করেছ। তাদের পথ নয়, যাদের প্রতি তোমার গজব নাযিল হয়েছে এবং যারা পথভ্রষ্ট হয়েছে।

﴿٧﴾

.

যদি এই কারনেই কুরআন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার কথা/কালাম না হয় তাহলে নিম্নের আয়াতটি সম্পর্কে কি মত দেওয়া যেতে পারে??

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ ۖ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِى لَشَدِيدٌ

অনুবাদঃ যখন তোমাদের পালনকর্তা ঘোষণা করলেন যে, যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরও দেব এবং যদি অকৃতজ্ঞ হও তবে নিশ্চয়ই আমার শাস্তি হবে কঠোর। (সূরা ইবরাহীম ১৪ঃ৭)

.

এখানে তো আল্লাহ আমি সর্বনাম ব্যবহার করেছেন। এছাড়া ও এরকম আয়াত অসংখ্য আছে {(সূরা কাহফ ১৮ঃ৯৯-১০২), (সূরা ইবরাহীম ১৪ঃ৪-৫), (সূরা বাকারাহ ২ঃ২৩) (সূরা যুমার ৩৯ঃ ২), (সূরা আনকাবূত ২৯ঃ৬৯)} এ আয়াতগুলোই কি উক্ত প্রশ্নের খন্ডনের জন্য যথেষ্ট নয়?

.

এখন আসা যাক সূরা ফাতিহার ব্যাপারে। অভিযোগ এসেছে যে, সূরা ফাতিহার বর্ননাভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে রাসুলুল্লাহ(সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার প্রশংসা করছেন নিজের ভাষায় তাই কুরআন যেহেতু আল্লাহর কথা তাই তাতে মানুষের কথার মতো ভঙ্গি থাকতে পারে না। কিছু কথা-

.

(১) কুরআনুল কারীম সম্পূর্ন বিশ্ববাসীর জন্য হেদায়েত হিসেবে এসেছে। আর কুরআনে আছে মানুষেরই আলোচনা (সূরা আম্বিয়া ২১ঃ১০) যাতে মানবজাতি কুরআন পড়তে, বুঝতে এবং তার থেকে হিদায়াত পেতে পারে।

.

(২) সূরা ফাতিহা একটি দুয়া, আর দুয়া হলো যার মাধ্যমে কোনো কিছু চাওয়া হয়। তাই তো সূরা ফাতিহার এক নাম সূরাতুদ দুয়া (সূরা ফাতিহার তাফসীর, মাওলানা আব্দুর রহীম, পৃ-১৮) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কুরআনে অনেকগুলো আয়াত নাযিল করেছেন যার বিষয়বস্তু দুয়া বা প্রার্থনা। সেই দুয়াগুলোর দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যাবে সেখানে রব্বানা বা রব্বি অর্থাৎ আমাদের রব বা আমার রব ইত্যাদি সম্বোধন এসেছে যাতে মানবজাতিকে দুয়া করানো শিখানো হয়েছে।

.

(৩) সূরা ফাতিহা কুরআন নামক শহরের প্রধান ফটক। তবে সূরা ফাতিহা তার স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের কারনে এতোটাই বৈশিষ্ট্যপূর্ন যে পরিপূর্ন কুরআনকে এই সাত আয়াতের মধ্যে সংক্ষিপ্ত করা যায় এককথায় বলা যায়, সূরা ফাতিহা যেমন একদিক দিয়ে কুরআনের ভূমিকা তেমনি বলা যায় তা গোটা কুরআনের সারমর্মও বটে অন্যভাবে গোটা কুরআনই এই ছোট্ট সূরাটিরই ব্যাখ্যা।

.

এখন সূরা ফাতিহার বর্ননাভঙ্গির বিশ্লেষন করা যাক-

.

(ক)সূরা ফাতিহা আল্লাহর কালাম হওয়া সত্ত্বেও একে রাখা হয়েছে প্রার্থনামূলক। আল্লাহর কাছে কোন জিনিসের প্রার্থনা করতে হবে, কীভাবে করতে হবে, তার প্রনালী কেমন হওয়া উচিত, সত্যিকারের সঠিক পথ কোনটি ইত্যাদি বিশ্বমানবের সামনে তুলে ধরা হয়েছে (কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসীর, ড আবু বকর জাকারিয়া, পৃ-৪) আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মানুষকে তার নিজের ভাষায় দুয়া করাতে শিখানোর জন্যই মানুষের মত ভঙ্গি করে বলেছেন। যেমনঃ কোনো শিক্ষক তার ক্লাসের ছাত্রদের কাছ থেকে যা শুনতে চান তা নিজেই অনেক সময় বলে দেখান যে তিনি মূলত ছাত্রদের কাছ থেকে কোন কথা কিভাবে, কোন ভঙ্গিতে ও কোন ভাষায় শুনতে চাচ্ছেন। ব্যাপারটি আরো ভালোভাবে বুঝার জন্য একটি উদাহরন দেওয়া যেতে পারে। এক বাবা বাসায় ফিরে দেখলেন যে তার ছোট্ট বাচ্চাটি খেলছে যে কয়েকদিন ধরে আধো আধো বোল বলা শিখেছে, তাই বাবাটি তার বাচ্চাটিকে কোলে নিয়ে বাচ্চাটির মুখ থেকে আব্বু ডাক শোনার জন্য নিজেই বারবার বলে চলছেন” বল, বাবা “আব্বু, আব্বু, আব্বু” এখন বাচ্চাটি যদি তার বাবার থেকে শুনে আব্বু আব্বু ডাক দেয় তাহলে কি এই কথা বলা যাবে যে বাবাটি আব্বু আব্বু কেন বলবে?? এটা তো ওই বাবার কথা হতেই পারেনা। এটাত ওই বাচ্চারই কথা!!!

.

(খ) একটি বইয়ের ভূমিকায় সাধারনত লেখকের পরিচয় বা বইটি লেখার উদ্দেশ্য, বইয়ের বিষয়বস্তু সম্পর্কে সামান্য ধারনা পায় যা সাধারনত লেখা থাকে লেখকের নিজের ভাষায় তবে এই ক্ষেত্রে কুরআনের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল পাঠক যাতে এর নাযিলকারী আল্লাহর সামান্য পরিচয়, নাযিলকারীর সাথে পাঠকের সম্পর্ক, পাঠক এই বইটি থেকে পরবর্তীতে কি পেতে যাচ্ছে এবং সাথে সাথে বইটি থেকে সত্যিকারের উপকার হাসিল করতে চাইলে কী করতে হবে এইগুলো পাঠকের নিজের ভাষায় প্রার্থনা বা দুয়ারুপে বর্ননা করা হয়েছে যাতে পাঠক ভূমিকা থেকেই বইটির সাথে নিজের অন্তরের সাথে সূক্ষ্ম একাত্মতা খুজে পায়। যা পাঠককে কুরআনের প্রতি আগ্রহী করে তুলবে সাথে সাথে কুরআন থেকে উপকার পেতে সহায়ক করবে।

.

(গ) কুরআন যেহেতু বিশ্বমানবের হেদায়াতের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে তাই কুরআনের ভূমিকা সূরা ফাতিহার ভাবটিই এমন রাখা হয়েছে যা এর পাঠককে অবহিত করবে এই বই কার পক্ষ থেকে এসেছে, তার পরিচয়, সাথে সাথে এই বইটি থেকে সরল সঠিক পথের সন্ধান হলে পেতে তার অন্তরকে নিরপেক্ষ রাখতে হবে। তাই সূরা ফাতিহার মাধ্যমেই আল্লাহর নিকট

থেকে যারা সঠিক পথ পেয়েছেন তাদের মতো সরল, সোজা ও সঠিক পথ পাওয়ার প্রার্থনা এবং যারা এই পথ থেকে ছিটকে গেছে তাদের মতো হওয়া থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করা যায় কারন সূরা ফাতিহা হলো একটি প্রার্থনা আর পুরো কুরআনই হলো তার উত্তর।

.

(ঘ) মানুষ যখন আল্লাহর কালাম বা বানী তাদের অন্তরের সুপ্ত দুয়ারুপে পাঠ করবে তা পাঠককে আল্লাহর আরো নিকটবর্তী করে তুলবে যা কুরআনের অন্যতম উদ্দেশ্য।

.

(ঙ) এটা অনেক চোখ থাকতেও অন্ধের মতো ব্যক্তিদের কাছে কুরআনের ত্রুটি মনে হলেও সত্যিকার অর্থে এটি কুরআনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য যা কুরআনকে অন্যান্য ধর্মগ্রন্থ থেকে স্বতন্ত্র করে তা হলো এতে মানুষ নিজের আলোচনা পাবে, কখনো নিজের অন্তরের সুপ্ত কথাটিই কুরআনের পাতায় পাবে, কখনো মনে হবে কুরআন তার নিজের মনের মত করেই একের পর এক কথা বলে যাচ্ছে,কখনো বা নিজের অন্তরের দুয়াটিই কুরআনের পাতায় পাবে যা তাকে সত্যই আল্লাহর সাথে কথা বলার স্বাদ দিবে। এটি কুরআনের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

.

(চ) সূরা ফাতিহা যেহেতু প্রতি সালাতের প্রথমেই পাঠ করা বাধ্যতামূলক(বুখারী, কিতাবুল আযান, হা-৭২০) তাই সূরা ফাতিহার ভাবটি এমনই রাখা হয়েছে যাতে সালাত পড়ার সময় এর পাঠকারী আল্লাহর প্রশংসা, তার মহানত্ব, তার মহাশক্তি বর্ননা করতে পারে সাথে সাথে তারই কাছে সবচেয়ে সরল, সোজা ও সঠিক পথের দিশা চেয়ে প্রার্থনা করা যেতে পারে যা একজন মুমিনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন।

.

কুরআনকে তারা যেভাবে একটি সাধারন বইয়ের মত করে দেখে বা দেখানোর চেষ্টা কুরআন তার থেকে অনেক উর্দ্ধে ও অনেক উচ্চ তার উদ্দেশ্য।

১২৭

ডকিন্সনামা [পর্ব ১ ও ২]

-সাইফুর রহমান

মা বাপের ভবঘুরে সন্তান, মেডিক্যালে পড়তে গিয়ে ফেইল মারা ডারউইনের রূপকথা যখন মানুষ আস্তে আস্তে ধরতে পারছে ঠিক তখনি বনে বাদাড়ে 'মলিকুলার বায়োলজি'র গবেষণা করা ডারউইনকে বাঁচাতে কলা-বিজ্ঞানীরা আরেক 'নামধারী' 'সো কল্ড বিজ্ঞানী' রিচার্ড ডকিন্সকে সামনে নিয়ে এসেছে। রিচার্ড ডকিন্স বলতে অজ্ঞান মানুষের সংখ্যা এই পৃথিবীতে নেহায়েত কম নয়।বানররা যাদের বাপ্ দাদা তাদের কাছে ডকিন্স 'গড'। ডকিন্সের বাণীকে তারা ঐশ্বরিক বার্তার থেকে কোনো অংশে কম বিশ্বাস করে না বরং ধার্মিকেরা অনেক সময় ধর্মের বিধি বিধান নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও বানরের বংশধরেরা ডকিন্সের কথাকে অমোঘ বাণী হিসাবে মেনে নেয়। তাদের ভাষ্য মতে ডকিন্স এই পৃথিবীর মহাবিজ্ঞানীদের একজন!!! আমরা এবার দেখবো, ডকিন্স আসলেই কি বিশাল কোনো বিজ্ঞানী?

.

শিক্ষা জীবনের শুরুর দিকে বিজ্ঞান নিয়ে তার কারবার ছিল, পিএইচডি করেছেন প্রাণীবিদ্যার উপরে, আমেরিকাতে কিছুদিন শিক্ষকতা করেছেন, পরে অক্সফোর্ডে ফিরে এসে কিছু দিন প্রাণীবিদ্যার প্রভাষক হিসাবে কাজ করেছেন, ব্যাস এর পরেই তার বিজ্ঞান চর্চার পথ অন্যদিকে মোড় নেয়। প্রথম জীবনে বিজ্ঞান করা লোক হটাৎ বিজ্ঞান ছেড়ে দিয়ে অবৈজ্ঞানিক পথ ধরেন। ডকিন্স প্রথম থেকেই এটেনশন সিকার, আলোচনায় থাকতে সে পছন্দ করতো। বিজ্ঞান বাদ দিয়ে রাজনীতি ও অন্যান্য সামাজিক বিষয়ে তার আগ্রহ চোখে পড়ার মতো। বর্তমানে সে বিজ্ঞান গবেষণার পেশা ছেড়ে দিয়ে পাবলিকরে কিভাবে সাইন্স বোঝানো যায় সেই কাজ করে যাচ্ছে!!! গবেষণা কেন্দ্রিক পেশা ছাড়ার কারণ কি? এবার আসুন তার টিচিং এন্ড রিসার্চ ক্যারিয়ার নিয়ে আলোচনা করা যাক। উনি অক্সফোর্ডে ১৯৭০ সালে প্রাণীবিদ্যা বিভাগে লেকচারার হিসাবে যোগ দেন, ২০ বছর পরে, ১৯৯০ সালে 'রিডার' (অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর) হিসাবে পদোন্নতি পান। বলে রাখা ভালো, আনলাইক বাংলাদেশ পৃথিবীর বাকি দেশগুলোতে ইউনিভার্সিটি শিক্ষকদের পদোন্নতি অটোমেটিক্যালি হয়ে যায়না, পারফর্মেন্সের উপর সব নির্ভর করে।

.

ডকিন্স সাবের পারফর্মেন্স এতটাই ভালো ছিল যে লেকচারার থেকে রিডার হতে ২০ বছর সময় লেগে গেলো!!! একটা উদাহরণ দিলেই বুঝবেন কেন এইটা নিয়ে হাসি তামাশা করতেছি। ক্যামব্রিজে আমার ডিপার্টমেন্টের এক গবেষক ২০১০ সালের দিকে লেকচারার হিসাবে যোগ দেন ৫ বছর পরে, ২০১5 সালে রিডার হয়ে যান। পারফর্মেন্স ভালো হলে অতি দ্রুত প্রমোশন হয়ে যায়। এবার দেখি বিজ্ঞানের শিক্ষক ও গবেষক হিসাবে যে সময় তিনি কর্মরত ছিলেন তখনকার সময়ে সে গবেষণায় কেমন সাফল্য লাভ করেছেন। বায়োলজি ও মেডিকেল সাইন্সের গবেষণার তথ্য পাওয়ার সবচেয়ে জনপ্রিয় নেটওয়ার্ক ও সার্চ ইঞ্জিন হলো 'পাবমেড', আমেরিকার স্বাস্থ্য সংস্থার ডাটা বেইজ। আপনি যদি মাঝারি মানেরও গবেষক হোন, পাবমেডে আপনার নামে ৩০-৫০টা গবেষণা পত্র খুঁজে পাওয়া উচিত। ডকিন্সের নাম সার্চ দিলে সংখ্যাটা লেস দ্যান টেন!!! যা আছে তাও গাল গপ্পে ভরপুর, কোনো এক্সপেরিমেন্টাল ওয়ার্ক নয়। গবেষকদের মানদণ্ড হলো গবেষণা ও গবেষণা পত্রের মান ও সংখ্যা। এই হিসাব করলে ডকিন্স বর্তমান পৃথিবীর সেরা ৫০০০০ গবেষকদের মধ্যেও পড়বে কিনা আমার সন্দেহ। ধূর্ত প্রাণী রিচার্ড ডকিন্স বুঝতে পেরেছিলো বিজ্ঞান গবেষণা করে সারা জীবন পার করলেও কেউ তাকে চিনবে না, তাই ঐখানে ব্যর্থ হয়ে সাধারণ সহজ সরল মানুষ ও অ-সহজ সরল কলা-বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানের নাম দিয়ে মগজ ধোলাইয়ের পদ্ধতি অবলম্বন করে নেইম, ফেইম, মানি সব একসাথে কামাইতেছে, আর আবালগুলা হুদাই তারে মহা বিজ্ঞানী মনে করে পূজা করতেছে।

.

এর আগে সংক্ষেপে জেনেছি একাডেমিক এন্ড রিসার্চ এসেসমেন্ট অনুযায়ী রিচার্ড ডকিন্স মেইনস্ট্রিম বায়োলজিক্যাল

সায়েন্টিস্টের মধ্যে পড়ে না। বিজ্ঞান গবেষণা বাদ দিয়ে তিনি বিজ্ঞানকে সাধারণের মাঝে পৌছিয়ে দেয়ার যোগসূত্রের কাজ করছেন। যদিও এটাও বিজ্ঞান চর্চারই একটা অংশ, এই কাজটি করতে গিয়েও তিনি ভুল ব্যাখ্যা ও মনগড়া তথ্য দিয়ে মানুষদের বিভ্রান্ত করে চলেছেন দিনের পর দিন। গবেষকদের প্রকাশনা স্বাভাবিকভাবেই সাধারণ মানুষদের আন্ডারস্টেন্ডিংয়ের বাইরে, তাই ডকিন্সের মতো যারা গবেষণার ফলাফল ইন্টারপ্রেট করে জনসাধারণের মাঝে পৌঁছান তাদের ইমপ্যাক্ট সমাজে অনেক। সাধারণ মানুষ সত্যিকারের বিজ্ঞানীদের থেকে বিজ্ঞানের ইন্টারপ্রেটরদের বেশি বিশ্বাস করে, অনেকটা দোভাষীদের মতো। দোভাষী যদি কোনো ভুল অনুবাদ করে তার দায় যেমন মূলবক্তা নেয় না তেমনি ডকিন্সের বিজ্ঞানের ভুল ব্যাখ্যার দায়ও বিজ্ঞানীদের দেয়া অবিচারমূলক।

.

ডকিন্সের এই মাত্রাতিরিক্ত ভুল ব্যাখ্যার জের ধরে সম্প্রতি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মতামত সম্বলিত একটা গবেষণাপত্র যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত রাইস ইউনিভার্সিটি থেকে "Responding to Richard: Celebrity and (Mis)representation of Science" শিরোনামে 'পাবলিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং অফ সাইন্স' নামে একটি পিয়ার রিভিউড জার্নালে ছাপা হয়েছে। জরিপটিতে বিশ্বের ৮ টি দেশের মোট ২০০০০ বিজ্ঞানীর মতামত নেয়া হয়েছে এর মধ্যে যুক্তরাজ্যের ১৫৮১ জন বিজ্ঞানীও আছেন। যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীদের মধ্যে ১৩৭ জন ডকিন্সের ব্যাপারে বিশদভাবে কথা বলেন। এদের ৮০ ভাগ বিজ্ঞানী বিশ্বাস করেন ডকিন্স তার বইয়ে ও জনসম্মুখে বিজ্ঞান ও বিজ্ঞানীদের কর্মের ভুল ব্যাখ্যা করেছেন। এসব বিজ্ঞানীদের মধ্যে অধিকাংশই নন-রিলিজিয়াস তাই এখানে রিলিজিয়াস বায়াসনেস থাকার কোনো সুযোগ নাই। প্রবন্ধটির মূল ইনভেস্টিগেটর যেটা বলতে চেয়েছেন তা হলো, ডকিন্স বিজ্ঞানের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা নিয়ে ভুল ব্যাখ্যা করেন, মানে হলো নিজের মনগড়া কথাকে বিজ্ঞান বলে চালিয়ে দেন। একজন নন-রিলিজিয়াস ফিজিসিস্ট বলেছেন, ডকিন্স খুব শক্তভাবে ধর্মকে বাতিল করে দেন, অথচ একজন বিজ্ঞানী অনেক খোলামেলা, ধর্ম বা অন্য কোনো কিছুকে ডিনাই করতে হলে সেটা বিজ্ঞানের স্কোপের মধ্যে রেখেই করতে হয়। বিজ্ঞানের স্কোপের মধ্যে না থাকলে সেটা নিয়ে কথা বলার সুযোগ থাকে। হার্বার্ড প্রফেসর এও উইলসন, ডকিন্সকে বিজ্ঞানীই মনে করেন না, তার ভাষায় ডকিন্স একজন সাম্বাদিক, যে নিজে কোনো বিজ্ঞান গবেষণা করে না, অন্যের গবেষণার ফল প্রচার করাই তার কাজ!!!

.

প্রবন্ধটির শেষে গবেষকরা ডকিন্সকে একটা উপদেশ দিয়েছেন, তা হলো, সবচেয়ে ভালো বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ হচ্ছে কাউকে অপমান না করা ও দাম্ভিকতা প্রকাশ না করা। এইগুলা না করলে সাধারণ মানুষদের মাঝে বিজ্ঞানের প্রতি কৌতূহল জন্মাবে, মনের প্রশস্ততা ও গুণগ্রহীতা বাড়বে। তাই এসব অবৈজ্ঞানিক কাজ ভেবে চিন্তে করাই বাঞ্চনীয়।

.

সায়েন্টিফিক কমিউনিটি ডকিন্সের দীর্ঘদিন ধরে কৃত হটকারী আচরণে বিরক্ত হয়েই এই প্রবন্ধটি প্রকাশ করতে বাধ্য হয়েছেন। বিজ্ঞানীদের কষ্টের গবেষনা নিজের মতো ব্যাখ্যা করে সাধারণ মানুষদের মনে বিজ্ঞানের প্রতি বিতশ্রদ্ধা সৃষ্টি করা প্রকারান্তে বিজ্ঞান চর্চার পথে মহাপ্রতিবন্ধকতা তৈরি করার শামিল। ধর্মীয় কোনো কারণে নয়, শুধুমাত্র সঠিক বিজ্ঞান চর্চার জন্যই ডকিন্সের উল্টাপাল্টা লেখনী ও বক্তব্য প্রদান বন্ধ হওয়া উচিত।

১২৮
সূর্যের উদয়-অস্ত দ্বারা রোজা ও নামাজের সময় নির্ধারণসংক্রান্ত নাস্তিকদের প্রশ্ন ও জবাব

-নাফিস শাহরিয়ার

#নাস্তিক_প্রশ্নঃ

➽➽ একজন মুসলিমের জন্য রোজা ফরজ করা হয়েছে (Quran 2:183, 2:184, 2:187, Sahih Bukhari 1:2:7, 6:60:40 Sahih Muslim 1:9) যা সূর্য উদয়-অস্তের সাথে সম্পর্কিত (24 hour cycle)! কিন্তু আল্লাহ্ উত্তর এবং দক্ষিণ মেরুর বাসিন্দাদের ব্যাপারে কিছু ভেবে দেখেন নি! আপনার কি মনে হয় না যে এটা তখনই সম্ভব যখন তিনি মনে করবেন পৃথিবীর সর্বত্র একই সময়ে দিন-রাত্রি ঘটে (অর্থাৎ পৃথিবী সমতল)?

.

➽➽ কুরআন বলে যে একজন মুসলিমকে সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা পালন করতে হবে (Quran 2:187)! আবার প্রার্থনার ব্যাপারটাও সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্তের সাথে সম্পর্কিত (Quran 17:78)! কিন্তু সমগ্র মানুষের এই জীবন বিধানে Eskimo-দের ব্যাপারে কোন নির্দেশনা নেই! এটা কি কুরআন রচয়িতার অজ্ঞতা নয়?

.

➽➽ একই জাতীয় প্রশ্ন, মেরুর বাসিন্দারা নামায পড়বে কিভাবে যেহেতু সেখানে ৬ মাস পর পর দিন-রাতের পরিবর্তন হয়?

.

#উত্তর: নাস্তিকদের করা খুবই বিখ্যাত প্রশ্নগুলোর মধ্যে এটি একটি। এই প্রশ্নের উদ্ভাবক Wikiislam খুব চমৎকারভাবে (!) 'Ramadan Pole Paradox' শিরোনামের লেখা দিয়ে বহু মানুষকে অত্যন্ত সফলতার সাথে বিভ্রান্ত করেছে। আজকে উপরোক্ত প্রশ্নের সাথে তাদের এই paradox-এরও সমাধান করবো ইনশাল্লাহ। তাহলে চলুন একেক করে তাদের দাবিগুলো খণ্ডন করি।

.

দাবি ১: মুসলিমরা রোযা রাখে সুবহে সাদিক থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত, অথচ মেরুতে ৬ মাস পর পর দিন-রাত্রির পরিবর্তন হয়। তাই মেরুতে রোযা রাখতে গেলে তো মুসলিমরা না খেয়েই মারা যাবে!

.

খণ্ডন: গোটা পৃথিবীতে মানুষ আছে প্রায় ৭৫০ কোটি।[১] সেখানে উত্তর আর দক্ষিণ মেরু মিলিয়ে মানুষের সংখ্যা কত? সংখ্যাটা পাঁচ অঙ্ক পার হয় না। উত্তর মেরুতে প্রকৃত পক্ষে কোন মানুষই বাস করে না। না, ভাই! Eskimo বা Inuit-রা উত্তর মেরুতে না, উত্তর মেরুর কাছাকাছি বাস করে।[২] আর দক্ষিণ মেরুতেও কোন স্থায়ী বাসিন্দা নেই। এখানে দুই ধরণের মানুষ আসে- বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে এবং টুরিস্ট। গ্রীষ্মকালে জনসংখ্যা থাকে ৪০০০, শীতকালে যেটা এসে দাঁড়ায় মাত্র ১০০০-এ।[৩] এখন আপনার কি মনে হয় এত বিশাল জনসংখ্যার হিসেবে তাদের কথা আলাদাভাবে বলা কি খুব গুরুত্বপূর্ণ? অন্তরে সে যাই হোক, এবার দাজ্জাল সংক্রান্ত একটা বড় হাদিসের সামান্য অংশ উল্লেখ করছি।

.

"... আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'হে আল্লাহ্‌র রাসূল! যে দিনটি এক বছরের সমান হবে তাতে একদিনের নামায পড়লেই কি তা আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে?' তিনি বললেন, 'তোমরা সে দিনের সঠিক অনুমান করে নিবে এবং তদনুযায়ী নামায পড়বে (দিন

রাতের ২৪ ঘণ্টা হিসেবে)।'"[৪]

.

ইসলামি স্কলারগণ এই হাদিসের উপর ভিত্তি দুইটি ব্যাপারে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। প্রথমত, নামাজের ব্যাপারে- এখানে স্পষ্টভাবেই নির্দেশ দেয়া আছে মেরুতে কিভাবে নামায পড়তে হবে। দ্বিতীয়ত, রোজার ব্যাপারে- যেহেতু, নামাযের মতো রোযাও সূর্য উদয়-অস্তের সাথে সম্পর্কিত, তাই এই হাদিসে নিশ্চিতভাবেই আমাদের জন্য পথনির্দেশ রয়েছে।

.

যদি কোন মুসলিম মেরুতে থাকা অবস্থায় রমযান পায়, তাহলে সে নিকটবর্তী কোন দেশ, যে দেশে দিন এবং রাতের পার্থক্য করা যায়- সেই দেশের সময়সূচী অনুসরণ করে রোযা রাখবে। একইকথা, নামাযের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।[৫][৬]
তাই মুসলিমরা মেরুতে রোযা রাখতে পারবে না, এই কুযুক্তি ধোপে টিকলো না।

.

দাবি ২: এখানে তারা নরওয়ে, আলাস্কা এবং আইসল্যান্ডের রোযার সময়কাল হিসাব করে দেখিয়েছে যে সেখানে একজন মুসলিমকে প্রায় সারাদিনই রোযা রাখতে হয়!

.

খণ্ডন: ২০১৭ সালে সবচেয়ে দীর্ঘ রোযার সময়কাল হল ২১ ঘণ্টা, গ্রিনল্যান্ড এবং আইসল্যান্ডে।[৭] অস্বীকার করছি না যে, এত লম্বা সময় ধরে রোযা রাখা আসলেই কষ্টসাধ্য ব্যাপার, কিন্তু অসম্ভব না। ফিনল্যান্ডের এক মুসলিমের সাক্ষাৎকার দেখুন- তারা কিন্তু ভালোভাবেই পালন করে আসছে।[৮]

.

সাওমের মূল উদ্দেশ্য হলো তাকওয়া অর্জন। আল্লাহর কথা মনে রেখে নিজেকে অন্যায় থেকে দূরে রাখা। আল্লাহ্‌ বলেছেন-
"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের প্রতি রোযা ফরয করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের প্রতি ফরয করা হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পারো।"[৯]

.

তাই কে কত ঘণ্টা রোযা রাখলো, সেটা মুখ্য বিষয় না। যে বেশি সময় ধরে সাওম পালন করছে আল্লাহ্‌ তার তাকওয়া দেখবেন। এটা তার জন্য একটা পরীক্ষা। আর কারও পক্ষে যদি এত দীর্ঘ সময়ব্যাপী রমযান মাসে সাওম পালন করা কষ্টকর হয়, তাহলে সে অন্য সময় কাযা আদায় করে নিবে। এই 'অন্য সময়' হতে পারে বছরের সবথেকে ছোট দিনগুলো- তাতেও কোন সমস্যা নেই।[১০] আল্লাহ্‌ তো সে ঘোষণাও কুরআনেই দিয়ে দেখেছেন-
"রোজা নির্দিষ্ট কিছু দিন। তাই তোমাদের মধ্যে কেউ যদি অসুস্থ থাকে, বা সফরে থাকে, তাহলে পরে একই সংখ্যক দিন পূরণ করবে। আর যাদের জন্য রোজা রাখা ভীষণ কষ্টের, তাদের জন্য উপায় রয়েছে — তারা একই সংখ্যক দিন একজন গরিব মানুষকে খাওয়াবে। আর যে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাড়তি ভালো কাজ করে, সেটা তার জন্যই কল্যাণ হবে। রোজা রাখাটাই তোমাদের জন্যই ভালো, যদি তোমরা জানতে।"[১১]

.

"...আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজটাই চান, তিনি তোমাদের জন্য কঠিনটা চান না।..."[১২]

.

দাবি ৩: তারপরেও প্রশ্ন থেকে যায়। কেন একজনকে অন্য দেশের সময়সূচী অনুসরণ করতে হবে? এটা তো কোন যৌক্তিক সমাধান হতে পারে না!

.

খণ্ডন: এবার আমাদের নাস্তিক-মিশনারি বন্ধুগণদের কাছে ইসলামী সমস্যার সমাধানের জন্য দ্বারস্থ হতে হবে!! যে সমাধান আমাদের রাসূল (সা)-এর হাদিসের আলোকে করা হয়েছে সেখানে তাদের আপত্তি! আচ্ছা ভাই, একটা দেশ কি সবকিছুতে স্বয়ংসম্পূর্ণ? তার যে সমস্ত জিনিসের ঘাটতি আছে, সে অন্য দেশ থেকে সেটা আমদানি করে পুষায়। একইভাবে মেরু অঞ্চলে

সময়ের কিছুটা অসুবিধা, তাই নিকটস্থ দেশের সাথে সামঞ্জস্য করে নেয়া।

.

মেরুর বাসিন্দাদের ব্যাপারে নির্দেশনা না দেয়া থেকে কুরআন পৃথিবীকে সমতল বলছে এই সিদ্ধান্তটা নিতান্তই হাস্যকর। আমি যদি কোনো বক্তৃতায় বলি, 'আমরা তো সবাই কথা বলতে পারি, নাকি?' কথাটা কিন্তু ভুল হবে না। কারণ কথাটা generalized-ভাবে বলা এবং অধিকাংশ মানুষই কথা বলতে পারে সেই প্রেক্ষিতে উল্লেখ করা। একইভাবে আল্লাহ্ শুধু সাওম পালনের কিছু নীতিমালার কথা বলেছেন, কোনো জটিলতা করেন নি। কুরআন যে পৃথিবীকে সমতল বলছে না এব্যাপারে বিস্তারিত জানতে পড়ুন- https://goo.gl/WuKkoI

.

অতএব, মেরু অঞ্চলে মুসলিমদের সালাত এবং সাওম পালনের সময়সূচী নিয়ে কোন প্রকার বিভ্রান্তি নেই। আল্লাহ্ আমাদের সকলকে সঠিক পথে থাকার তাওফিক দান করুক।

তথ্যসূত্র:

[১] http://www.worldometers.info/world-population/

[২] https://www.nationalgeographic.org/encyclopedia/north-pole/

[৩] http://www.coolantarctica.com/.../can_you_live_in_antarctica....

[৪] জামে' তিরমিজি ২২৪০, সুনানে ইবনে মাজাহ ৪০৭৫, হাদিসে কুদসি ১৬২

[৫] https://islamqa.info/en/5842

[৬] https://islamqa.info/en/106527

[৭] https://www.y-oman.com/.../fyi-top-5-longest-ramadan-fasting.../

[৮] http://www.independent.co.uk/.../ramadan-2017-how-muslims-fas...

[৯] সূরা আল-বাকারাহ ২: ১৮৩

[১০] ফাসিঃ মুসনিদ ৮১পৃঃ

[১১] সূরা আল-বাকারাহ ২: ১৮৪

[১২] সূরা আল-বাকারাহ ২: ১৮৫

১২৯
মানুষ কি আসলেই হৃদয় দিয়ে চিন্তা করে?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্নঃ কুরআন দাবি করে মানুষ চিন্তা করে হৃদয় দিয়ে(Quran 11:5)। আমরা জানি যে মানুষ মস্তিষ্ক দিয়ে চিন্তা করে। এটা কি কুরআনের বৈজ্ঞানিক ভুল না?

.

#উত্তরঃ পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

.

"জেনে রাখো, নিশ্চয়ই তারা নিজেদের বক্ষদেশ ঘুরিয়ে দেয় যেন আল্লাহর নিকট হতে লুকাতে পারে। শোন, তারা তখন কাপড়ে নিজেদেরকে আচ্ছাদিত করে, তিনি তখনও জানেন যা কিছু তারা চুপিসারে বলে আর প্রকাশ্যভাবে বলে। নিশ্চয় তিনি জানেন যা কিছু বক্ষ/অন্তর সমূহে নিহিত রয়েছে।"
(কুরআন, হুদ ১১:৫)

.

"তারা কি এই উদ্দেশ্যে দেশ ভ্রমণ করেনি, যাতে তারা জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হৃদয় ও শ্রুতিশক্তিসম্পন্ন কর্ণের অধিকারী হতে পারে? বস্তুত: চক্ষু তো অন্ধ হয় না, বরং বক্ষস্থিত হৃদয়/অন্তরই অন্ধ হয়।"
(কুরআন, হাজ্জ ২২:৪৬)

.

"আর আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের হৃদয়/অন্তর রয়েছে, তারা এর দ্বারা বিবেচনা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, তারা এর দ্বারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, তারা এর দ্বারা শোনে না। ..."
(কুরআন, আ'রাফ ৭:১৭৯)

.

"অতঃপর আল্লাহ যাকে পথ প্রদর্শন করতে চান, তার বক্ষকে ইসলামের জন্যে উম্মুক্ত করে দেন এবং যাকে বিপথগামী করতে চান, তার বক্ষকে অত্যধিক সংকীর্ণ করে দেন-যেন সে সবেগে আকাশে আরোহণ করছে। এমনিভাবে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে না আল্লাহ তাদের উপর আযাব বর্ষন করেন।"
(কুরআন, আন'আম ৬:১২৫)

.

পবিত্র কুরআনে এমন প্রচুর আয়াত রয়েছে যেখানে চিন্তা, অনুধাবন এই জাতীয় কর্মগুলোর ক্ষেত্রে মানুষের বক্ষ অথবা হৃদয়কে সংশ্লিষ্ট করা হয়েছে। অনেক অনুবাদে صدر ও قلب এর স্থলে আক্ষরিকভাবে 'বক্ষ' ও 'হৃদয়' অনুবাদ করা হয়েছে।আবার কখনো কখনো শব্দগুলোকে 'অন্তর' লিখে অনুবাদ করা হয়েছে।

.

সাহাবী ইবন আব্বাস(রা) এ সংক্রান্ত ব্যাখ্যায় বলেনঃ "বক্ষ উন্মুক্ত" করার অর্থ হলঃ তাওহিদ ও ঈমানের জন্য তা প্রশস্ত হওয়া।[ইবন কাসির]
... ...মূলতঃ বক্ষ সংকীর্ণ করার অর্থ কঠিন, দুর্ভেদ্য করে দেয়া।উমার(রা) বলেনঃ মুনাফিকের ক্বলব হল অনুরূপ সেখানে কোন ভালো কিছু পৌঁছুতে পারে না। [তাবারী, ইবন কাসির]
মুজাহিদ(র) ও সুদ্দী(র) বলেন, এর অর্থ সন্দেহে পড়ে থাকা।মানসিক অশান্তিতে বিরাজ করা।[ইবন কাসির]

[সূত্রঃ কুরআনুল কারীম(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির), ড.আবু বকর জাকারিয়া, ১ম খণ্ড, সুরা আন'আমের ১২৫নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ৬৯২]

.

কুরআনে قلب শব্দের এমন ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে প্রখ্যাত দাঈ ড. জাকির নায়েক বলেনঃ আরবিতে قلب শব্দের ২টি অর্থ আছে।যথাঃ হৃদয় ও বুদ্ধিমত্তা।এ স্থলে সঠিক অনুবাদ হবে বুদ্ধিমত্তা। صدر শব্দের ২টি অর্থ হয় যথাঃ বক্ষ ও কেন্দ্র।এ স্থলে সঠিক অনুবাদ হবে কেন্দ্র।অর্থাৎ আয়াতসমূহের সঠিক অনুবাদ হবেঃ "আল্লাহ তাদের(ইসলাম অস্বীকারকারী) বুদ্ধিমত্তা মোহর করে দিয়েছেন..."(সুরা বাকারাহ ২:৭) এবং "...চক্ষু তো অন্ধ হয় না, বরং কেন্দ্রস্থিত বুদ্ধিমত্তা অন্ধ হয়।" (সুরা হাজ্জ ২২:৪৬) [১]

.

আমরা যদি ধরে নিই আলোচ্য আয়াতসমূহে আক্ষরিকভাবে বক্ষস্থিত হৃদয় দ্বারা চিন্তা করার কথা বলা হয়েছে, তাহলেও তা বিজ্ঞান দ্বারা ভুল প্রমাণ হয় না বরং সঠিক বলে প্রমাণিত হয়।একেবারে সাম্প্রতিক সময়ে আধুনিক বিজ্ঞানের গবেষণায় এটি প্রমাণিত হয়েছে যেঃ মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে হৃদয়(heart) এর ভূমিকা আছে।HeartMath Institute এর গবেষক হাওয়ার্ড মার্টিনের মতে, "আমরা জানি যে আমরা হৃদপিণ্ড থেকে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক শক্তি নির্গত করি এবং এটি মাপা যায়।এটাও জানা আছে যে ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক এই সিগনাল আমাদের মানসিক অবস্থার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। ... ... আমার মতে আমাদের আত্ম নিরাপত্তা ব্যবস্থা পুরোপুরি হৃদপিণ্ড/হৃদয়(heart) নিয়ন্ত্রিত।" শুধু তাই নয়, তিনি মানুষের চিন্তা ও অনুভূতির(thoughts and feelings) ব্যাপারে মন্তব্য করেছেনঃ "It all comes from the heart."। [২]

.

Dr. Mercolaর মতে, হৃদয়(heart) হচ্ছে সত্য ও আবেগের(অনুভবকারী) অঙ্গ। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন হৃদপিণ্ডেও এক প্রকার 'মস্তিষ্ক' রয়েছে এমনকি Neuronও রয়েছে। এবং এই Neuronগুলো সিদ্ধান্ত নেওয়ায় প্রভাব রাখে। heart প্রত্যক্ষভাবে মানসিক অবস্থায় ভূমিকা রাখে। [৩]

.

Gregg Braden এ ব্যাপারে ২২ বছরেরও অধিক সময় ধরে গবেষণা করেছেন। তাঁর মতেঃ হৃদয়ের(heart) আক্ষরিকভাবেই নিজস্ব মগজ আছে। এটি শুধুমাত্র রক্ত পাম্প করার অঙ্গ নয় বরং এর নিজস্ব neuron[সাধারণত মস্তিষ্কের কোষকে neuron বলে] এবং বুদ্ধিমত্তা আছে। [4]

.

আমেরিকান গবেষক Rollin McCraty(যিনি ক্যালিফোর্নিয়ার Institute of HeartMath এর প্রতিষ্ঠাতা) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন হৃদয় কিভাবে মস্তিষ্কের সঙ্গে দ্বিমুখী যোগাযোগ স্থাপন করে। [৫]
মস্তিষ্ক ও হৃদয়ের পারস্পরিক সম্পর্ক ও হৃদয়ের বুদ্ধিমত্তা নিয়ে তিনি The coherent heart নামে একটি বই লিখেছেন।এই বইতে হৃদয় ও মস্তিস্কের সম্পর্ক অত্যন্ত বিস্তারিতভাবে বর্ণাণা করা হয়েছে। [৬]

.

অতীতকালের ধারণা ছিল যে, মস্তিষ্ক থেকে নিউরাল সিগনাল আকারে হৃদপিণ্ডে নির্দেশ যায়। অর্থাৎ দেহের সিদ্ধান্তগ্রহণ ও চিন্তা নিয়ন্ত্রণ হয় মস্তিষ্ক থেকে। আধুনিককালে বিজ্ঞানীগণের গবেষণায় এর বিপরীত তথ্য উঠে এসেছে। HeartMath Institute এর গবেষকগণ দেখিয়েছেন যে মস্তিষ্ক থেকে হৃদপিণ্ডে যে পরিমাণ সিগনাল যায়, তার থেকে অনেক বেশি পরিমাণ সিগনাল হৃদপিণ্ড থেকে মস্তিষ্কে যায়! শুধু তাই না, হৃদপিণ্ড থেকে মস্তিষ্কে যে সিগনাল যায়, সেগুলো বোধসংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়াদি যেমনঃ মনোযোগ, উপলব্ধি,স্মৃতি এবং সমস্যা সমাধাণের ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে।তাঁদের গবেষণায় আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, হৃদপিণ্ড সহজাত জ্ঞান(intution) তৈরির ক্ষেত্রে মূল ভূমিকা পালন করে। তাঁরা এও বলেছেন যে এ ব্যাপারে(অর্থাৎ মানুষের বোধ ও চিন্তার ক্ষেত্রে হৃদপিণ্ডের ভূমিকা) মানুষের এখনো অনেক কিছু জানবার বাকি আছে।
"... HeartMath Institute have even indicated that the heart appears to play a key role in intuition.

Although there is much yet to be understood, it appears that the age-old associations of the heart with thought, feeling, and insight may indeed have a basis in science. ...” [৭]

.

প্রকৃতপক্ষে কুরআনে হৃদয় দ্বারা চিন্তার যে কথা বলা হয়েছে, তা বিশ্বাস করবার জন্য মুসলিমদের কোন বিজ্ঞান জার্নালের প্রয়োজন নেই। কেননা বিজ্ঞানের মতামত তো প্রতিনিয়তই পরিবর্তন হয়।মুসলিমদের বিশ্বাস হচ্ছেঃ কুরআন ও সুন্নাহ হচ্ছে ওহী, এগুলো স্রষ্টাপ্রদত্ত জ্ঞান। কাজেই এগুলো মানুষের যে কোন জ্ঞান-বিজ্ঞানের থেকে এগিয়ে আছে।মুসলিমরা বিজ্ঞানের আলোকে এগুলোকে বিচার করে না বরং কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মানুষের অর্জিত জ্ঞানকে বিচার করে।তবে আলোচ্য বিষয়ে কুরআনের তথ্য ও আধুনিক কালে বিজ্ঞানীদের গবেষণাকর্মের মধ্যে পর্যালোচনা করে দেখা যাচ্ছে যে এ দু'য়ের মধ্যে কোন বিরোধ নেই।
আধুনিক বিজ্ঞান সুস্পষ্টভাবে বলছে যে চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে হৃদয়ের ভূমিকা আছে।কাজেই আল কুরআনে উল্লেখিত তথ্য{চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে হৃদয়ের ভূমিকা} নিয়ে প্রশ্ন তুলছে যেসব তথাকথিত ‘বিজ্ঞানমনস্ক’(?) মানুষ, তাদের নিজেদেরই বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

এবং আল্লাহ ভালো জানেন।

তথ্যসূত্রঃ
[১] “Does the heart think or brain? What does the Quran say?” [Dr. Zakir Naik]
https://www.youtube.com/watch?v=O6xyVOzT7dc
[২] “It All Comes from the Heart” by Diane M. Cooper
http://www.spiritofmaat.com/archive/nov3/prns/martin.htm
[৩] “Modern Research Reveals Your Heart Does Have a Mind of Its Own” by Dr. Mercola
http://articles.mercola.com/.../03/05/brain-heart-emotion.aspx
[৪] “The Heart Literally Has Its Own Brain” ~ Gregg Braden on Heart Math
https://tv.greenmedinfo.com/gregg-braden-institute-of-hear.../
[৫] THINKING FROM THE HEART – HEART BRAIN SCIENCE
http://noeticsi.com/thinking-from-the-heart-heart-brain-sc.../
[৬] ডাউনলোড লিঙ্কঃ goo.gl/1oIokT
[৭] “The Heart-Brain Connection”
https://www.heartmath.org/.../emwave-self-regulation-technol.../

১৩০
রমজান নিয়ে একটি অবিশ্বাসী প্রশ্নের উত্তর

-মোঃ রাফাত রহমান

রমজান আসার সাথে সাথে নাস্তিকরা রোজা নিয়ে ইসলামের একটি ভুল ধরার চেষ্টা করে বিভিন্ন গ্রুপ বা পেজে প্রচারনা চালায়। বিষয়টা তাদের নিকট এমনভাবে শুনতে পারেন,

.

"আল্লাহ বলেছেন সূরা বাকারা: ১৮৭ আয়াতে,
'সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত পানাহার থেকে বিরত থাকতে হবে'
মূলত এ আয়াত দিয়ে বোঝা যায় আল্লাহর মক্কার বাইরের এবং পৃথিবীর বক্রতা ও দিন-রাত সংঘটিত হওয়ার বৈজ্ঞানিক নিয়ম সম্বন্ধে কোনো ধারণা ছিল না। পৃথিবীর আকৃতি ও বসবাসকারী মানুষ সম্পর্কে কোরানের লেখক অবগত ছিলেন না।তিনি জানতেন না পৃথিবীর সকল স্থানে একই সময় সূর্য ওঠে ও অস্ত যায় না। তিনি এও জানতেন না যে, কোথাও সুর্য ওঠা ও ডোবার মধ্যবর্তি সময় ১৩ ঘন্টা আর কোথাও ২২ ঘন্টা আবার কোথাও ছয়মাস । তাই যার এই সহজ জিনিসটি জানা নেই সে সৃষ্টিকর্তা হতে পারে না।"

.

#জবাবঃ
এখানে নাস্তিকের মূল অভিযোগ হচ্ছে আল্লাহ কি জানতেন বা জানতেন না তা নিয়ে। রোজা কিভাবে রাখা যায় তা নিয়ে প্রাকটিকাল চিন্তা করা নয়, অথচ যেখানেই হোক না কেন রোজা রাখার অনেকগুলো পদ্ধতি অনুসরন করেই মুসলিমরা সহজেই রোজা রাখছে, তাদের কোন সমস্যা হচ্ছে না। সমস্যা শুধু হচ্ছে নাস্তিকদের।
যাক গে, তবে আসুন প্রথমেই টেবিলটা উল্টে দেই।

.

উক্ত আয়াতের প্রেক্ষিতে নাস্তিকদের দাবি, আল্লাহ জানতেন না সুর্যের বিভিন্ন অঞ্চলের উদয়স্থলের কথা এবং কোরানের লেখকের ধারনা ছিল হয়ত পৃথিবি চ্যাপ্টা।
যদি নাস্তিকরা কোরান ঠিকমত পড়ত তবে নিশ্চয়ই তারা জানত আল্লাহ তা'লার জ্ঞানের কথা।

.

কারন কোরানেই স্পষ্ট করে লেখা আছে,
"Lord of the heavens and of the earth and all between them, and Lord of every point of the rising of the sun."
(Quran 37:5)
[অনুবাদেঃ ইউসুফ আলী, মুহসীন খান প্রমুখ]

.

তাহলে নাস্তিকদের কোরান সম্পর্কে আনা বৈজ্ঞানিক ভুলের অভিযোগটা এখানেই মাঠে মারা গেল। কারন কোরান অনুসারে আমরা দেখতে পাই আল্লাহর স্পষ্টত ধারনা ছিল সুর্যের বিভিন্ন উদয়স্থলের কথা, যদিও মানুষ খালি চোখে সুর্যকে রোজ এক জায়গা হতেই উদিত হতে দেখে, কিন্তু যিনি মহাবিশ্বের সৃষ্টা, তিনি ঠিকই জানেন সুর্য প্রতি মুহুর্তেই কোন না কোন পয়েন্টে উদিত হচ্ছে। এজন্যই তিনি লিখলেন every point of the rising of the sun অর্থাৎ এই আয়াত দিয়েও বোঝা যায় যে

পৃথিবী গোল তা কোরানের লেখক খুব ভালো করেই জানতেন।

.

এবার আসি রোজার ব্যাপারে।

নাস্তিকরা হয়ত ইসলাম সম্পর্কে খুব জ্ঞান রাখে না, কারন ইসলামে প্রথম নির্দেশ ফলো হয় কোরান হতে, দ্বিতীয় হাদিস হতে, যদি কোরান ও হাদিসেও স্পষ্টত না থাকে তবে ইজমা কিয়াস(যদিও কোরান হাদিসেই এই সমস্যা সমাধান এর অনেকগুলো ইংগিত রয়েছে) পরিবেশগত অবস্থা যে কোন সময় যেকোন কারনে চেইঞ্জ হতে পারে। আর এ জন্যই রোজার ব্যাপারে আল্লাহ মানুষকে সুর্যোদয় থেকে সুর্যাস্ত পর্যন্ত রোজা রাখার জেনারেল নির্দেশ প্রদানের সাথে সাথে অনেক বিকল্প নির্দেশও দিয়ে গেছেন, যা ইসলাম বিদ্বেষীরা কখনো আপনাকে দেখাবে না।

.

কোরানে আল্লাহ আরো বলেন,

"যে লোক অসুস্থ কিংবা মুসাফির অবস্থায় থাকবে সে অন্য দিনে গণনা পূরণ করবে। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ করতে চান; তোমাদের জন্য জটিলতা কামনা করেন না যাতে তোমরা গণনা পূরণ কর।"(সুরা বাকারা ১৮৫)

.

অর্থাৎ যে মুসাফির হয়ে অন্য কোথাও ভ্রমন করল, সে অন্য দেশের সময় বা যেখান থেকে ভ্রমন করেছে সেই সময় হতে রোজা রাখবে,তেমনি যদি কেউ উত্তর মেরুতে যায় তবে নিজ দেশ অথবা উক্ত অঞ্চলের আশেপাশে যেখানে ২৪ ঘন্টা দিন রাত তার হিসেবে বা যেভাবে তার সহজ হয় সেভাবে রোজা রাখবে।

এরপরও যদি কেউ রোজা রাখতে না পারে , আল্লাহ তারও বিধান দিয়েছেন এর আগের আয়াতেই, বাকারা ১৮৪

"গণনার কয়েকটি দিনের জন্য অতঃপর তোমাদের মধ্যে যে, অসুখ থাকবে অথবা সফরে থাকবে, তার পক্ষে অন্য সময়ে সে রোজা পূরণ করে নিতে হবে। আর এটি যাদের জন্য অত্যন্ত কষ্ট দায়ক হয়, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্যদান করবে।"

.

অর্থাৎ পৃথিবীর যেকোন প্রান্ত, হোক উত্তর মেরু বা দক্ষিন মেরু, সুর্য না দেখার জন্য বা যে কোন কারনে যদি রোজ রাখতে সমস্যা হয় তবে অন্য কোন সময় গননার মাধ্যমে সে উক্ত রোজা রাখবে, অথবা রোজা না রেখে কোন গরীব মিসকীনকে খাইয়ে দিবেন। দেখুন কত সুন্দর ও পরিপাটি বিধান।

আবার হাদিসে দীর্ঘ সময় দিন বা রাত যেখানে হবে সেখানে কিভাবে ইবাদত করতে হবে সেসম্পর্কে একেবারে স্পষ্ট বিধান রাসুল সাঃ দিয়ে গেছেন দাজ্জাল সংক্রান্ত মুসলিম শরীফ ২৩৯৭ হাদিসটিতে।

"We said: Allah's Messenger, how long would he stay on the earth? He (ﷺ) said: For forty days, one day like a year and one day like a month and one day like a week and the rest of the days would be like your days. We said: Allah's Messenger, would one day's prayer suffice for the prayers of day equal to one year? Thereupon he (ﷺ) said: No, but you must make an estimate of time. http://sunnah.com/urn/270150

অর্থাৎ এক দিন= ছয়মাস বা এক বছর যখন হবে তখন মুসলিমগন সময়ের হিসেব করে নিজেরা ইবাদতের কাজ চালাবে। একই ইজমা অনুসারে উত্তর মেরু বা দক্ষিন মেরুতে কেউ বসবাস করতে চাইলে সেখানেও তারা একই ভাবে সময়ের গণনার মাধ্যমে রোজা ও নামাজ এর কাজ সম্পন্ন করবে।

.

এত কিছুর পরেও যদি দ্বীন পালনে কোন অঞ্চলগত সমস্যা হয়, সেটা যে প্রকারেই হোক তবে আল্লাহ উক্ত অঞ্চল ত্যাগ করতে নির্দেশ দিয়েছেন,

.

"যারা নিজের অনিষ্ট করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম।
ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে?"
(সূরা নিসা ৯৭)

.

তেমনি উত্তর মেরু বা দক্ষিন মেরুতে যদি কারো থাকার কারণে দ্বীন ইবাদত পালনে অসুবিধা হয় তবে কোরানের নির্দেশ উক্ত অঞ্চল ত্যাগ করা। কারন প্রশস্ত পৃথিবীর বিশাল জায়গা বাদ দিয়ে উত্তর মেরু ও দক্ষিন মেরুতেই থাকতে হবে এটা কোন চিন্তা হতে পারে না। শুধু নাস্তিক্যবাদি আয়োডিনমুক্ত চিন্তায়ই হয়ত তা সম্ভব।

১৩১

সমকামি এজেন্ডাঃ ব্লু-প্রিন্ট

-আসিফ আদনান

১৯৮৭ সালে অ্যামেরিকান ম্যাগাযিন 'গাইড' এর নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত হয় মার্শাল কার্ক এবং হান্টার ম্যাডসেনের লেখা প্রায় ৫০০০ শব্দের একটি আর্টিকেল। দু'বছর পর নিউরোসাইক্রিয়াট্রি রিসার্চার কার্ক এবং পাবলিক রিলেইশান্স কনসালটেন্ট ম্যাডসেন একে পরিণত করেন ৩৯৮ পৃষ্ঠার একটি বইয়ে। হান্টার ও ম্যাডসেনের এই আর্টিকেল উপস্থাপিত ধারণা ও নীতিগুলো পরবর্তী ৩ দশক জুড়ে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করে রাজনীতি, মিডিয়া, অ্যাকাডেমিয়া, বিজ্ঞান, দর্শন ও চিন্তার জগতে। সারা বিশ্বজুড়ে। সমকামীদের ম্যাগাযিন গাইডে প্রকাশিত মূল আর্টিকেলটির নাম ছিল "The Overhauling of Straight America "। ৮৯ তে প্রকাশিত সম্প্রসারিত বইয়ের নাম দেওয়া হয় - After the Ball: How America Will Conquer Its Fear and Hatred of Gays in the 90s. কার্ক ও ম্যাডসেনের উদ্দেশ্য ছিল সিম্পল –সমকামিতা ও সমকামিদের প্রতি অ্যামেরিকানদের মনোভাব বদলে দেওয়ার জন্য একটি স্টেপ বাই স্টেপ ব্লু-প্রিন্ট বা ম্যানুয়াল তৈরি করা।

.

কিন্তু কেন প্রায় তিন দশক পর বাংলাদেশে বসে কার্ক-ম্যাডসেনকে নিয়ে চিন্তা করা? কার্ক-ম্যাডসেনের নাম শুনেছেন বা তাদের লেখার সম্পর্কে জানেন এবং মানুষ খুজে পাওয়া কঠিন। শুধু বাংলাদেশেই না, বিশ্বজুড়েই। কিন্তু তাদের ব্লু-প্রিন্টের প্রভাব কোন না কোন ভাবে প্রভাবিত করে নি এমন সমাজ বা রাষ্ট্র খুজে পাওয়াটাও কঠিন। গত ৩০ বছরে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরন, সমকামিতাকে স্বীকৃতি দেওয়া এবং সমকামিতার মধ্য এতোটা অস্বাভাবিক একটি বিষয়ের প্রতি মানুষের সংবেদনশীলতাকে নষ্ট করার জন্য যেসব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে তা প্রায় হুবহু মিলে যায় কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্টের সাথে। আর বাংলাদেশেও সমকামিতার প্রচার, প্রসার এবং সামাজিক গ্রহনযোগ্যতা তৈরির জন্য এখন এই একই পদক্ষেপগুলো নেওয়া হচ্ছে, একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে। বর্তমানে ২২টি দেশে সমলৈঙ্গিক 'বিয়ে' আইনগত ভাবে স্বীকৃত। কোন আগ্রাসী সেনাবাহিনী শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে এদেশগুলোর জনগোষ্ঠীর উপর সমকামিতা চাপিয়ে দেয় নি। তবে নিঃসন্দেহে মানুষের স্বভাবজাত মূল্যবোধ, ফিতরাহর বিরুদ্ধে গিয়ে জঘন্য একটি বিকৃতিকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয়ভাবে বৈধতা দেওয়া, মানুষের মাঝে এই বিকৃতির গ্রহনযোগ্য তৈরি করা একটি যুদ্ধের অংশ। এই যুদ্ধ মনস্তাত্ত্বিক, আদর্শিক। এই যুদ্ধ সর্বব্যাপী এবং ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় আপনি এই যুদ্ধের অংশ। আর এই যুদ্ধে শত্রুপক্ষের স্ট্র্যাটিজির মূল ভিত্তি কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্ট। আর তাই কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্ট সম্পর্কে জানা, শত্রুর কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জানা একটি আবশক্যতা, কোন অ্যাকাডেমিক কৌতুহল না।

.

যে মডেলের মাধ্যমে অ্যামেরিকায় অভূতপূর্ব সাফল্য পাওয়া গিয়েছে বাংলাদেশসহ অন্যান্য মুসলিম দেশে এখন সেই একই মডেল বাস্তবায়নের চেষ্টা করা হচ্ছে। তাই পায়ুকাম প্রচার করা ইয়াহু চ্যাট গ্রুপ, ফেইসবুক গ্রুপ, ফোরাম, রুপবান ম্যাগাযিন, শাহবাগে সমকামি প্যারেড, বইমেলায় সমকামিতা নিয়ে কবিতার বই প্রকাশ, গ্রামীনফোনের ফান্ডিং এ আরটিভিতে প্রচারিত নাটক, দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোতেও এনজিও গুলোর মাধ্যমে পায়ুকামে উৎসাহিত করা, বিনামূল্যে কনডম-লুব্রিকেন্ট বিতরণ - এই সবকিছুকে দেখতে হবে একটি বৃহৎ, গ্লোবাল এজেন্ডার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে।

.

. . . কার্ক-ম্যাডসেনের ব্লু-প্রিন্টের প্রথম ধাপ এটাই। মানুষকে সমকামিতার ব্যাপারে ডিসেনসেটাইয করা -

.

"প্রথম কাজ হল সমকামি এবং সমকামিদের অধিকারের ব্যাপারে অ্যামেরিকার জনগনের চিন্তাকে অবশ করে দেওয়া, তাদের সংবেদনশীলতা নষ্ট করে দেওয়া [desensitization]। মানুষের চিন্তাকে অবশ করে দেওয়ার অর্থ হল সমকামিতার ব্যাপারে

তাদের মধ্যে উদাসীনতা তৈরি করা...একজন স্ট্রবেরি ফ্লেইভারের আইস্ক্রিম পছন্দ করে আরেকজন ভ্যানিলা। একজন বেইসবল দেখে আরেকজন ফুটবল। এ আর এমন কী!" [Kirk & Madsen, The Overhauling of Straight America']

.

সমকামিতার প্রচার ও প্রসারের জন্য যারা কাজ করছে তাদের রেটোরিক খেয়াল করলে দেখবেন তাদের অধিকাংশ ঠিক এই মেসেজটাই দিতে চাচ্ছে। 'সমকামিতা ভালো বা খারাপ না, জীবনের একটা বাস্তবতা মাত্র'। পহেলা বৈশাখের সময় শাহবাগে সমকামি প্যারেড কিংবা ঈদের সময় ঈদের নাটক হিসেবে সমকামিদের গল্প তুলে ধরার পেছনে একটি মূল উদ্দেশ্য হল সমাজের বিকৃতকামী এক্সট্রিম মাইনরিটিকে সমাজের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে উপস্থাপন করা। একই সাথে সমকামিতাকে ঐতিহ্য, সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত করা, যেমনটা জাতিসংঘের Free & Equal ক্যাম্পেইনেও করা হয়েছে।

.

কার্ক-ম্যাডসেনের আরেকটি সাজেশান হল সমকামিদের ভিকটিম হিসেবে উপস্থাপন করা। সমকামিদের ভিকটিম হিসেবে চিত্রিত করার দুটি ডাইমেনশান থাকবে। প্রথমত, সমকামিতাকে একটি সিদ্ধান্তের পরিবর্তে প্রাকৃতিক বা জন্মগত হিসেবে উপস্থাপন করার মাধ্যমে সমকামিদের জন্মগতভাবেই ভিকটিম হিসেবে উপস্থাপন করা। দ্বিতীয়ত, সমকামিদের সমাজ দ্বারা নির্যাতিত হিসেবে চিহ্নিত করা।

.

বাংলাদেশে এবং বিশ্বজুড়ে যারা সমকামিতার প্রচার ও প্রসারের কাজ করে তাদের প্রপাগ্যান্ডা ও বক্তব্য আপনি সবসময় এ দুটো মোটিফ দেখতে পাবেন।

.

সমকামিরা জন্মগতভাবেই সমকামি এটা প্রমানের উদ্দেশ্য হল যদি সমকামিতাকে জন্মগত বা প্রাকৃতিক প্রমান করা যায় তাহলে সমকামিদের সম্পূর্ণ নৈতিক দায়মুক্তি সম্ভব। সমকামিতা যদি জন্মগত হয় তাহলে সমকামিতা একটি 'অ্যাক্ট' বা ক্রিয়া হিসেবে নৈতিকভাবে নিউট্রাল, কারন এর উপর ব্যক্তির কোন নিয়ন্ত্রন নেই। কিন্তু সমকামি জন্মগত – এই দাবির কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি তো নেই-ই, বরং বিভিন্ন পরীক্ষা ফলাফল ইঙ্গিত করে যে Sexual Oreintation নির্ভর করে ব্যক্তির 'চয়েস' বা স্বেচ্ছায় গৃহীত সিদ্ধান্তের উপর ।

.

আরেকটি বিষয় হল সমকামিতা যদি জন্মগত হয় তাহলে অন্যান্য বিকৃত যৌনাচার কেন জন্মগত বলে গন্য হবে না? শিশুকামি, বা পশুকামিদের কেন অপরাধী গণ্য করা হবে? ইন ফ্যাক্ট শিশুকামের সাথে সমকামের, বিশেষ করে পায়ুকামের সম্পর্ক তো হাজার বছরের পুরনো। প্রাচীন গ্রিসে শিশুদের সাথে মধ্য বয়স্ক পুরুষদের পায়ুকামী সম্পর্ক বা Pederasty প্রায় প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে চালু ছিল প্লেইটো তার রিপাবলিক ও ল'স – রচনাতে প্রাচীন পেডেরাস্টি এবং সমকামিতার ব্যাপক প্রচলনকে গ্রীসের অধঃপতনের একটি কারন হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

.

অ্যামেরিকাতেও অপ্রাপ্তবয়স্ক ছেলেদের সাথে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারের জন্য আন্দোলন করা NAMBLA (North American Man Boy Love Association) – দীর্ঘদিন ছিল গে-প্রাইড প্যারেডের নিয়মিত অংশ। বিখ্যাত অ্যামেরিকান কবি সমকামি অ্যালেন গিন্সবার্গ (সেপ্টেবর অন যশোর রোড – এর রচয়িতা) ছিল NAMBLA এর সদস্য। এছাড়া অসংখ্য সমীক্ষার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত যে সমকামিতার সাথে অন্যান্য যৌন বিকৃতির বিশেষ করে শিশুকামিতার ঘনিষ্ট সম্পর্ক আছে [৯]। সমকামিতার বিশেষ করে পায়ুকামিতার সাথে শিশুকামের গভীর সম্পর্কের ব্যাপারে সংক্ষেপে বোঝার জন্য পায়ুকামি ও শিশুকামি কেভিন বিশপের এই উক্তিটি যথেষ্ট -

.

"Scratch the average homosexual and you will find a pedophile" [Kevin Bishop in an interview. Angella Johnson, "The man who loves to love boys," Electronic Mail & Guardian, June 30, 1997]

১৩২

সমকামিতা কি আসলেই জেনেটিক্যাল?

-সাইফুর রহমান

এই কমিউনিটির মানুষরা অনেক দিন থেকেই দাবি করে আসছে সেক্সচুয়াল ওরিয়েন্টেশন বায়োলোজিক্যালি প্রি-ডিটারমাইন্ড, সহজাত এবং জন্মগত একটি বৈশিষ্ট্য। বাস্তবতা হলো, তাদের এই 'জন্মগতভাবে সমকামী' দাবির পক্ষে বৈজ্ঞানিক কোনো তথ্য, উপাত্ত নেই, বরং গত বছর আমেরিকার জন হপকিন্সের দুই বিখ্যাত সাইকিয়াট্রিক প্রায় ২০০ সাইন্টিফিক জার্নাল ঘেটে নিউ অ্যাটলান্টিস নামক জার্নালে একটা প্রতিবেদন ছাপিয়েছেন যেখানে তারা দেখিয়েছে সেক্সচুয়াল ওরিয়েন্টেশনের সাথে সহজাত, জন্মগত বা বায়োলোজিক্যাল যে সম্পর্ক এতদিন ভাবা হতো তার বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি নেই। কিছু বায়োলজিক্যাল ফ্যাক্টর আছে যার সাথে লৈঙ্গিক আচরণগত সম্পর্ক আছে কিন্তু সেটা কোনো মতেই ওরিয়েন্টেশনে ভূমিকা রাখে না।

.

ইদানিং অনেকে নেচার নিউজের একটা লিংক শেয়ার করছে, সেখানে নাকি দাবি করা হয়েছে সমকামিতার সাথে জিনের সম্পর্ক রয়েছে। এদের অজ্ঞতার সীমা নাই। প্রথমত, গবেষণাটি নেচার জার্নালে প্রকাশিত কোনো প্রবন্ধ না, এটা একটা সায়েন্টিফিক কনফারেন্সে একজন বিজ্ঞানীর দেয়া গবেষণার আপডেট। বিষয়টা হলো, সেখানে দাবি করা হয়েছে, সমকামিতার সাথে সম্ভাব্য জিনগত সম্পর্কটা প্রচলিত ক্লাসিকাল জেনেটিক্সের মতো নয়। এর সাথে এপিজেনেটিক্স নামে বায়োলজির নতুন একটি শাখার সম্পর্ক। সংক্ষেপে বলতে গেলে এপিজেনেটিক্স হলো, এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টর বা বাহ্যিক কোনো কারণে ক্রোমোসোমের কেমিক্যাল চেঞ্জ ঘটে যার ফলে ডিএনএ'র কোনো পরিবর্তন হয়না কিন্তু জিনের ফাঙ্কশন চেঞ্জ হয়ে যায়। এটা জীবনের যেকোনো পর্যায়ে হতে পারে। এপিজেনেটিক্যাল চেঞ্জ প্রাত্যাহিক জীবনের সাথে সম্পর্কিত অনেক কারণেও হতে পারে, যেমন, ড্রাগ, টক্সিক কেমিক্যাল, ডায়েট, স্ট্রেস এবং অন্যান্য এনভায়রনমেন্টাল ফ্যাক্টরস।

.

সমকামিতার সাথে এপিজেনেটিক্সের সম্পর্ক আছে কি নাই এটা বলার মতো অবস্থা এখনো প্রাথমিক পর্যায়ে তবে এখন আপনাদের মানুষের জীবনে প্রতিনিয়ত ঘটে যাওয়া প্রমাণিত কিছু এপিজেনেটিক্সের ফলাফল উদাহরণসহ উল্লেখ করবো।

.

১. ম্যাটার্নাল ইনফ্লুয়েন্স: আমরা অনেকেই কথাটা জানি, মায়েদের স্বাস্থ্যের উপরে গর্ভের সন্তানের সুস্থতা ও শারীরিক সক্ষমতা নির্ভর করে। এর মূল কারণটা অনেকেই জানে না যে, এটা এপিজেনেটিক্সের কারণেই হয়ে থাকে। ইঁদুরের উপরে এক গবেষণায় দেখা গেছে মাতৃত্বকালীন ডায়েট ও স্ট্রেস জরায়ুর ভ্রূণের উপরে প্রভাব ফেলে। আমরা অনেকসময় বলি, গর্ভবতী মায়েদের ধুমপান অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্যে বিরূপ প্রভাব ফেলে। গবেষণায় স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়েছে, গর্ভকালীন স্মোকিং ডিএনএ'র এক্সপ্রেশনে প্রভাব ফেলে। এমনকি মাতৃত্বকালীন সাইকোলোজিক্যাল ও সোশ্যাল বিহেভিয়র সাথে মানুষিক স্ট্রেস এপিজেনেটিক্যাল চেঞ্জ ঘটায়। ইঁদুরের ক্ষেত্রে দেখা গেছে, মা ইঁদুরের স্ট্রেসের কারণে নবজাতকের নিউরোলোজিক্যাল ডিফেক্ট হয়েছে।

.

২. প্যারেন্টাল ইনফ্লুয়েন্স: শুধু মায়েদেরই নয়, বাবাদের স্বাস্থ্যের সাথেও সন্তানের সুস্থতা সম্পর্কিত। অতিরিক্ত এলকোহল পান করলে ও টক্সিক কেমিক্যালের কারণে যথাক্রমে স্পার্মের ডিএনএ'র মিথাইলেশনে ও জার্মলাইনে প্রভাব পড়ে, যা একটি এপিজেনেটিক্যাল পরিবর্তন।

.

৩. পেরিনেটাল ইনফ্লুয়েন্স: অবাক করা তথ্য, সিজারিয়ান বেবিদের ডিএনএ'র মিথাইলেশন নরমাল ডেলিভারড বেবিদের থেকে

বেশি থাকে, যা এপিজেনেটিক্যাল। শিশুদের বেড়ে উঠার সময়ে পারেন্টসদের কেয়ার, সোশ্যাল বিহেভিয়ার, স্ট্রেস এডাপটেশন ইত্যাদি পরবর্তীতে ডিএনএ'র এপিজেনেটিক্যাল মোডিফিকেশনের মাধ্যমে বায়োলজিক্যাল মেমরি ও নিউরোন সার্কিট ডেভেলপমেন্টে ভূমিকা রাখে।

.

এইভাবে বয়ঃসন্ধিতে, সাবালকত্বে, অনেক এনভায়রনমেন্টাল ও সোশ্যাল ফ্যাক্টর আছে যা মানুষের শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যে ভূমিকা রাখে। এ সবই এপিজেনেটিক্যাল ডিএনএ মোডিফিকেশনের ফলাফল।

.

আমরা জানতে পারলাম যেসব এনভায়রনমেন্টাল ও সোশ্যাল ফ্যাক্টরস ডিএনএ'র ফাঙ্কশনে পরিবর্তন আনে, যাকে আমরা এপিজেনেটিক্স বলছি, তার সবগুলোই মানুষের 'চয়েস' বা ইচ্ছাকৃত। সমকামিতাও একটি 'চয়েস' যার ফলে পরবর্তীতে এপিজেনেটিক্যাল পরিবর্তন হচ্ছে (এখনো চূড়ান্তভাবে অপ্রমাণিত)।

.

ইনহেরিটেড জেনেটিক্যাল ডিসঅর্ডারগুলো (যেমন, এনিমিয়া, সিস্টিক ফ্রিব্রোসিস ইত্যাদি) ক্রোমোসোমাল পরিবর্তনের ফলে হয়ে থাকে। মায়ের থাকলে সন্তানের হওয়ার সম্ভাবনা প্রায় শতভাগ। এখানে মায়ের কিছুই করার থাকে না, কারণ এটা তার জিনের পরিবর্তনের ফল। পক্ষান্তরে, এপিজেনেটিক্যাল পরিবর্তনের জন্য মানুষের নিজস্ব কর্মকান্ড (ড্রাগ, এলকোহল, স্মোকিং, স্ট্রেস ইত্যাদি) দায়ী থাকে। সমকামিতার সাথে জিনের সম্পর্ক আছে দাবি করাটা ততটাই হাস্যকর যতটা হাস্যকর অতিরিক্ত মদপান, ধূমপান বা ড্রাগ এডিকশনের জন্য জিন দায়ী দাবি করাটা।

.

আরো একটি তথ্য জানিয়ে লেখাটা শেষ করছি, গ্রামীণ পরিবেশে বেড়ে উঠা একজন মানুষের সমকামী হওয়ার সম্ভাবনা শহরে বেড়ে উঠা কারো থেকে ন্যূনতম ৪ গুন্ কম, যা প্রমান করে সমকামিতা একটি পলিটিকাল, সোশ্যাল ও কালচারাল ট্রেন্ড।

১৩৩
মানুষ কি জন্মগতভাবে সমকামি হয়?
-আনিকা তুবা

এবার ঈদে সমকামিতা নিয়ে নাটক বানানো হয়েছে। বেশ ক' বছর থেকে হঠাৎ করেই আমাদের সমাজে সমকামিতার মত একটা জঘন্য অন্যায়কে জোর করে টেনে আনা হচ্ছে। বলা হচ্ছে, সমকামিতা একটা ন্যাচারাল বিষয়, সমকামীদেরকে সমর্থন করতে হবে। এক অমুসলিম সমকামী লোকের লেখা পড়েছিলাম অনেক দিন আগে, সে সমকামিতা থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসে। তার লেখাটাই অনুবাদ করে দিলাম। তার সাথে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য থাকতে পারে, তবে "গে" হওয়া যে কোনো ন্যাচারাল বিষয় না, আর গে থেকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসা যায়, সেটাই এই লেখা থেকে শিক্ষা নেওয়ার বিষয়।

"আমার মনে হয়, আমি দুর্ঘটনাবশত "স্ট্রেইট" হয়ে গেছি। ব্যাপারটা বুঝিয়ে বলি। আমি থেরাপি নিচ্ছিলাম। তবে স্ট্রেইট হতে চাই এমন কোন পরিকল্পনা থেকে সেটা নেওয়া হয়নি। আমার মাঝে কমিটমেন্ট রাখা নিয়ে কিছু সমস্যা ছিল, সেটা বদলাবার আশাতেই থেরাপির শরণাপন্ন হওয়া। যৌনতা পরিবর্তনের ইচ্ছা আমার কোনোকালেই হয়নি। অথচ শেষ পর্যন্ত সেটাই হয়েছে! আমার সব কিছুই বদলে গেছে।

.

বিশ্বাসই হয় না, কয়েকশ'রও বেশি সমকামী পার্টনারের সাথে থাকার পর আমি কিনা বিয়ে করেছি একজন নারীকে! এমনকি আমাদের একটা সন্তানও আছে। সত্যি বলতে, আমার জীবনটাই পুরোপুরি বদলে গেছে। আগে খুব কোলাহল-প্রিয় ছিলাম। যেখানে যেতাম, সবার চেয়ে গলার স্বর উঁচু থাকত আমার। সবার সাথে গলাবাজি আর উদ্ধত আচরণ করতাম। নিজের ভেতরকার অনিশ্চয়তা লুকিয়ে রাখতে তটস্থ হয়ে থাকতাম, তাই হইচই করে বেড়াতাম, হট্টগোল আর দেমাক দেখিয়ে আমার নিরাপত্তাহীনতা চাপা দিতে চাইতাম। এখন আমার স্বভাব-চরিত্র একদম বদলে গেছে। তেজী, আশাবাদী একজন মানুষে পরিণত হয়েছি। যুদ্ধের মুভিগুলো দেখতে ভালো লাগে। ৪৬ বছর চলছে। এই ৪৬ বছরের মধ্যে নিজেকে নিয়ে এতটা খুশি আর কখনোই হই নি।

.

আমার কাহিনীর গভীরে যাওয়ার আগে শুরুটা বলি। শুরুটা হয়েছিল এভাবে -
তখন আমার বয়স দশ কি এগার। আমার এক ছেলে কাজিন একদিন আমাকে বলল সে নাকি গে। আর তখনই আমার মনে হল, আমার আকর্ষণও আসলে একই রকম। দশ-এগারো বছর বয়স থেকে ছেলেরা মেয়েদের ব্যাপারে কৌতূহলী হতে থাকে, কিন্তু আমার আগ্রহ ছিল ছেলেদের প্রতি।

.

আমার টিন-এইজ জীবনটা যেন এক রকম নরকের মধ্যে কাটতে লাগল। মাঝেমধ্যেই আত্মহত্যার কথা ভাবতাম, কখনও কখনও নিজের শরীরের বিভিন্ন ক্ষতি করতাম। ওদিকে মদ খাওয়া, পর্নোগ্রাফির সমস্যা বাড়ছে তো বাড়ছেই। সমকামীদের তৈরি বাজে সব ভিডিও-ক্লিপ দেখতাম। আমার বয়স যখন সতেরো চলছে, একদিন চোখের পানিতে ভেসে বাবা-মায়ের সামনে হাজির হলাম। কিন্তু আমার বাবা-মা সত্যিই অসাধারণ! তারা বললো, তারা আগে থেকেই আমার গে হবার ব্যাপারটা জানত। তারা আমাকে আশ্বস্ত করল, আমি গে হলেও তারা আমাকে নিঃস্বার্থভাবেই ভালোবাসবে। আমার স্কুলের বন্ধুবান্ধবেরাও বলল, তারাও নাকি আমার বিষয়টা বেশ কিছুদিন থেকেই টের পেয়েছে। তারাও আমাকে সমর্থন করল। সব মিলিয়ে আমার "গে" হিসেবে আত্মপ্রকাশের সময়টা মারাত্মক ভয়াবহ বা যন্ত্রণাদায়ক কিছু ছিল না।

.

আঠারো বছর বয়সে, আমি নর্থ ইংল্যান্ড থেকে লন্ডনে চলে আসি। ততদিনে আমি গে হওয়াকে নিজের পরিচয় হিসেবে পুরোপুরি গ্রহণ করে নিয়েছি। আমার ভার্সিটিতে যে বিভাগে আমি পড়তাম, সেখানে আমিই সর্বপ্রথম গে হিসেবে জনসম্মুখে নিজের এই পরিচয় দিয়েছি। এমনকি ভার্সিটিতে একটা গ্রুপও খুলে ফেললাম। এলজিবিটি গ্রুপ। ছাত্রছাত্রীদেরকে জোরেসোরে বোঝাতে শুরু করলাম - যারা বলে গে হওয়াটা মানুষের ইচ্ছাধীন কিংবা গে হওয়া ভুল, তারা একেবারেই সঠিক না।

.

যা বলছিলাম, আমার কখনোই বদলাবার দরকার হয়নি। আমি জন্মেছি গে হয়ে, এটাই সবসময় জেনে এসেছি। ব্যাস খতম। আমি বড়ো হয়েছি ক্রিশ্চিয়ান হিসেবে, লন্ডনের সমকামী ক্রিশ্চিয়ানদের আন্দোলনে নিয়মিত যোগ দিতাম, কিন্তু খেয়াল করলাম আমি আসল মজা পাই শহরের সমকামীদের ক্লাবগুলোয় যখন নাচ-গান-পার্টি আর নেশা করি, তখন। অতিরিক্ত কামুক আর বিশৃঙ্খলভাবে জীবনযাপন করতে শুরু করলাম। আমার ধারণা, সে সময় আমার পার্টনারের সংখ্যা ২০০ ছাড়িয়ে গেছে।

.

শেষমেশ আমি বহুদিনের পুরোনো এক বয়ফ্রেন্ডের সাথে সেটল করলাম। সে একজন এক্স-সৈনিক, ফকল্যান্ড দ্বীপের পশুচিকিৎসক। আমরা ভাবছিলাম, দেশের বাইরে কোথাও গিয়ে বিয়ে করবো - অন্ততপক্ষে সামাজিকভাবে স্বীকৃত একটা সম্পর্ক শুরু করব। কিন্তু ঠিক সে সময়েই আমি অন্য আরেকজনের সাথে সম্পর্কে জড়িয়ে পড়লাম। তার নাম ক্রাইস্ট। এই সম্পর্কটাই আমাকে আমার জীবনটা গভীরভাবে যাচাই করার সুযোগ দেয়।

.

আমি বুঝতে পারলাম, আমার কিছু সমস্যা আছে। কমিটমেন্ট নিয়ে সমস্যা। আমি কারো সাথেই অঙ্গীকারবদ্ধ হতে পারিনা। আরও আবিষ্কার করলাম, আমি কারো থেকে "না" শুনতে পারিনা। আমার মধ্যে প্রত্যাখ্যিত হওয়া নিয়ে অসম্ভব একটা ভয় কাজ করে। ছোটোবেলা থেকেই আমি সব সময় বাড়াবাড়ি রকমের বিচলিত থাকতাম। আমার আশেপাশের মানুষদের ব্যবহার করতাম। আমার ভেতর জন্মগতভাবে পুরুষদের প্রতি একটা ভয় ছিল -- তারা সমকামিতাকে ঘৃণা করে সেটাকে আমি ভয় পেতাম না; বরং ভয়টা ছিল অন্য জায়গায়। আমার ভয় হতো পুরুষদের দেখে। আমার আর একজন সাধারণ "heterosexual" পুরুষের মাঝে যে বিস্তর ফারাক, সেটাই ছিল আমার ভয়ের মূল কারণ।

.

আমি সবকিছু নতুন করে শুরু করার চেষ্টা করলাম। বহুদিনের পুরোনো পার্টনারের সাথে সম্পর্কের ইতি টানলাম। এক বন্ধুর পরামর্শে থেরাপি নিতে শুরু করলাম যাতে আমার কমিটমেন্ট রাখার বিষয়টা সারিয়ে তোলা যায়। থেরাপিতে গিয়ে যেসব সাহায্য-সহযোগিতা পেয়েছি, তার কোনটাই পাশবিক, নির্মম, বা বিধ্বস্ত হবার মতো কিছু ছিল না। কিছু কিছু "গে থেকে স্ট্রেইটে রূপান্তর" ডকুমেন্টারিতে যেসব ভয়ঙ্কর কাহিনি শোনা যায়, তার কোনটাই আমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। আমার থেরাপিটা ছিল মূলত কয়েকটা চিন্তাগত ও আচরণগত থেরাপির সমন্বয়। আমাকে আমার মজ্জাগত বিশ্বাসগুলো নিয়ে প্রশ্ন করা হল, আমার চিন্তা-চেতনা, ধ্যান-ধারণা নিয়ে প্রশ্ন ছোঁড়া হত। আমার একপেশে ভাবনাগুলোকে যেন উপড়ে ফেলা যায়, আমার বহু বছরের বদ অভ্যাস, আমার সমস্যাপূর্ণ আচার-আচরণগুলোকে যেন বদলানো যায়, সেটাই ছিল এ থেরাপির উদ্দেশ্য।

.

আমি কেন খালি পুরুষদের প্রতি আকর্ষিত হই, তা নিয়ে আমার বা আমার থেরাপিস্ট কারোরই তেমন মাথাব্যথা ছিল না। তবে সঙ্গত কারণেই আমার গে হওয়া নিয়ে কথা বলাটা আলোচনার একটা অংশ ছিল, কারণ তা নাহলে আমার জীবনের একটা বড় অংশকে বাদ দিয়ে দেওয়া হবে। পুরো সময়টায় একটা মূল কাজ ছিল- ক্ষমা করে দেওয়া। যাদেরকে মাফ করে দেওয়া প্রয়োজন, তাদেরকে মাফ করে দেওয়া। আর আরেকটা ব্যাপার, আমি আমার খুব কাছের কিছু মানুষের সাথে যে দেয়াল তৈরি করেছিলাম, বিশেষ করে আমার বাবা-মা ও ভাইবোনের সাথে, সেটা বোঝা।

.

ধীরে ধীরে আমার কাছে পুরো বিষয়টা পরিষ্কার হতে লাগল। আমি বুঝতে পারলাম, আসলে বালক অবস্থায় আমি অন্যান্য পুরুষদের সাথে ভালোভাবে মিশতে পারতাম না। ছোটোবেলা থেকেই ভাবতাম যে আমি অন্য পুরুষদের থেকে প্রত্যাখ্যিত হচ্ছি।

আর তাই নিজের অজান্তেই নিজের ভেতর একটা প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছিলাম যে কখনও ছেলেদেরকে পুরোপুরি বা গভীরভাবে বিশ্বাস করব না। কেউ যখন আমার কাছে আসত, আমি তাকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করতাম আর নিজেকে বড় ভাবতাম। আমার বাবা আর বড় দুই ভাইয়ের সাথেও আমি এমন আচরণই করেছি। তাদেরকে দূরে সরিয়ে দিয়েছি। কাজেই "পুরুষ" ব্যাপারটা আমার জন্য রহস্যময় হয়ে দাঁড়াবে, সেটাই স্বাভাবিক। আর টিন-এইজে সেই রহস্যময়তা নেশায় রূপ নিল, আমি পুরুষ লোকের প্রতি দৈহিকভাবে আকর্ষিত হতে শুরু করলাম। সেই সাথে পর্নের মাধ্যমে নিজের এই সমস্যাটা দিনকে দিন আরো উসকে দিতে লাগলাম।

.

আমি বুঝতে পারলাম আমি নিজেকে নিঃসঙ্কোচে নারীদের জগতে ঠেলে দিয়েছিলাম। আমার পৌরুষত্ব এই সিদ্ধান্তের বিপরীতে কোনো প্রভাব খাটাতে পারেনি। অথচ আমি নারীদেরও ঘৃণা করতাম! তারা এত সহজে সাধারণ (স্ট্রেইট) ছেলেদের মন ভুলাতে পারত যে আমার অসহ্য লাগত। কেননা আমি গে হয়ে এই কাজটা কখনোই করতে পারতাম না। আমি আবিষ্কার করলাম যে আমার স্থান স্বাভাবিক ভাবেই নারীদের মধ্যে নয়। আবার নিজেকে আমি পুরুষদের মধ্য থেকেও বের করে এনেছি।

.

আমার অস্তিত্বের একদম কেন্দ্রীয় অনেক ব্যাপারকে চ্যালেঞ্জ করা হল - আমার চেহারা, আমার দেহ, আমার হাঁটার ভঙ্গিমা -- আমার থেরাপিস্ট আমাকে একটা চ্যালেঞ্জ দিয়েছিলেন: কোন কোন ব্যাপারে আমি বাকি সব পুরুষের মতো ছিলাম, আর কোন কোন ব্যাপারে ছিলাম না। তিনি আমার গলার স্বর, চালচলন নিয়েও কাজ করছিলেন। সত্যি বলতে, আমাকে ভিন্ন ভাবে চিন্তা করার আর ভিন্ন ভাবে আচরণ করার একটা সুযোগ দিচ্ছিলেন।

.

আমার ভয়, উদ্বেগ আস্তে আস্তে কমে আসতে লাগল। একটা সময় এমন হল যখন নারী-পুরুষ সবার কাছেই নিজেকে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হতে লাগল। আমার পুরুষ পরিচয়কে এতদিন পুরোপুরি অস্বীকার করে এসেছি, সেটাই এখন পুরোপুরি গ্রহণ করে নিলাম। আমার দাঁড়ানোর ভঙ্গি বদলে গেল, সোজা হয়ে দাঁড়াতাম। আগের মতো মেয়েলি ভাবে আর হাঁটতাম না, বড় বড় পা ফেলে একজন পুরুষের মতো হাঁটতে শুরু করলাম। এমনকি আমার গলার স্বরও পাল্টে ভারি হয়ে গেল। এতো সুন্দর ভরাট স্বর যে সবাই নিয়মিতই আমাকে আমার গলার স্বর নিয়ে কিছু একটা মন্তব্য দিতে লাগল।

.

আমার মনে হল, হয়ত বা, হয়ত বা আমি কখনোই সত্যিকার অর্থে গে ছিলাম না। হয়ত আমার মাঝে সবসময়ই এমন একজন পুরুষ ছিল, যে সত্যিকারের পুরুষ, যে এমন একজন উন্নত পুরুষ -- যেমন পুরুষদেরকে আমি বরাবর শ্রদ্ধার চোখে দেখেছি। হয়ত আমার ভেতরের এই পুরুষটি সবসময় মুক্ত স্বাধীন হওয়ার অপেক্ষায় ছিল।

নারীদের সাথে দৈহিক মেলামেশা অনেক বেশি আনন্দায়ক লাগতে লাগল, এমনকি একজন নারীর চুলে হাত বুলিয়ে দেওয়ার মাঝেই যে কত আনন্দ আছে সেটা বুঝতে পারলাম। একজন পুরুষ হবার আনন্দ উপভোগ করতে লাগলাম। নারীদের সঙ্গ বেশি প্রিয় হয়ে গেল। এর মানে এই না যে, আমি যত নারীকে দেখেছি সবার প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছি! আমি উত্তপ্ত তরুণ ছিলাম না। বরং এটা ছিল একটা ধারাবাহিক প্রক্রিয়া, যার ফলস্বরূপ প্রেম এবং সম্পর্ক শুরু হয়েছে।

.

আজ আমি একজন নারীর স্বামী। আট বছর যাবৎ আমরা বিবাহিত আছি। আর আমাদের একটা পাঁচ-বছর বয়সী মেয়েও আছে। আর্ট আর থিয়েটার ভালোবাসি। তবে টিম স্পোর্টসগুলো প্রচণ্ড টানে। আমার খুব প্রিয় একটা মুভি হলো - সেভিং প্রাইভেট রায়ান, এই মুভিতে ভ্রাতৃত্ববোধ আর পুরুষদের অন্তর্বর্তী বন্ধুত্বকে দেখানো হয়েছে -- যেই অসাধারণ জিনিসটা আমি আগে কখনোই উপভোগ করিনি।

অনেকে জিজ্ঞেস করে, আমি কি এখন পুরোপুরি একজন heterosexual? হ্যাঁ, প্রায় পুরোটা সময়ের জন্য এটাই সত্যি। কিন্তু বেশিরভাগ মানুষের জীবনেই এমন কিছু সময় আসে যখন যৌনতা বেশ বায়বীয় পর্যায়ে থাকে। হঠাৎ হঠাৎ আমার ক্ষেত্রেও সেটা সত্যি। তবে আমি আমার ফেলে আসা গে লাইফস্টাইল মোটেও মিস করি না। আমার থেরাপিরও প্রায় পাঁচ বছর পরে,

পুরোনো বয়ফ্রেন্ডের সাথে দেখা করেছিলাম। গে জীবনযাপনের ক্ষতিকর দিকগুলো তখন খুব ভালোভাবেই আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। আমার এক্স-বয়ফ্রেন্ডের গলার স্বর দেখলাম একেবারে মেয়েলি আর কেমন দুর্বল হয়ে পড়েছে, শুধু তাই নয়, সে ততদিনে এইচআইভি-ও বাধিয়ে ফেলেছে।

সেই মুহূর্তে একটা ব্যাপার খুব ভালোভাবে বুঝতে পারলাম - আমার থেরাপি নেওয়ার সিদ্ধান্ত এবং বিকৃতভাবে গড়ে ওঠা যৌন-আকর্ষণকে সারিয়ে তোলার জন্য পরবর্তীতে নেওয়া আরেকটি থেরাপি শেষপর্যন্ত আমাকে রক্ষা করেছে!

.

তবে আমার জীবনের পরিবর্তনগুলোর কারণে আমি কাউকে জোর করে বদলে যেতে বা "ধর্মপরিবর্তন" করে গে থেকে স্ট্রেইটে পরিণত হতে বলব না। কারো নিজেকে "কনভার্ট" হবার জন্য বাধ্য মনে করার দরকার নেই।

.

তবে একটি কথা বলব, আমি বিশ্বাস করি, মানুষ জন্মগত ভাবে গে হয় না। এবং যে কেউ-ই চাইলে নিজের ভেতর বাস করা লুকোনো সত্তাটি বের করে আনতে পারে। সেই সত্তা যেখানে আমি আমার পৌরুষত্বকে খুঁজে পেয়েছি।"

জেমস পার্কার।

****অনূদিত*

মূল লেখক জেমস পার্কার একটি প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামে কাজ করেন, যার নাম: জার্নি টু ম্যানহুড। প্রোগ্রামটি "পিপল ক্যান চেইঞ্জ" নামের একটি শিক্ষা ও সহযোগিতামূলক সংস্থা দ্বারা পরিচালিত।

১৩৪

নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা অপবিত্রতার উৎস

-আহমেদ আলি

[এই ধরণের লেখার জন্য আমি প্রথমেই সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। লেখাটা পড়ার মাঝে উত্তেজনা জাগ্রত হতে পারে। কিন্তু ইসলাম বিদ্বেষীরা যেভাবে ইসলামকে কটাক্ষ করছে, তার পরিপ্রেক্ষিতে কোনো পরিপূর্ণ জবাব দেওয়া প্রয়োজন, আর সে কারণেই আমার এই ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন। আমিন।
---আহমেদ আলি (ভারত)]

.

(To read the Original English Article, visit: https://m.facebook.com/Ahmed90830/photos/a.1715432292072902.1073741828.1711338255815639/1913416228941173/?type=3&_ft_=top_level_post_id.1913416228941173%3Atl_objid.1913416228941173%3Apage_id.1711338255815639%3Athid.1711338255815639%3A306061129499414%3A69%3A0%3A1498892399%3A4995384406927234260&__tn__=E)

.

আমরা যদি বলি, পরস্পর অবিবাহিত নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা ভালো নয়, তবে অনেকেই আমাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করবে।

.

আমরা জানি যে, তাদের অন্তরাত্মা তাদের এই অপবিত্র অবাধ মেলামেশাতে বাধা দেয়, কিন্তু তবুও প্রবৃত্তির অনুসরণ তাদের প্ররোচনা দিয়ে চলেছে এরূপ অপবিত্র বিষয়কে সমর্থন করতে।

.

তাই নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা যে অনুচিত, এটা প্রমাণ করতে আমরা প্রথমেই কিছু তথ্যসূত্র এখানে উপস্থাপন করব। যদি কেউ মনে করেন যে, আমরা সঠিক নই, তাহলে আমাদের যুক্তি খণ্ডনের জন্য তিনি সাদরে আমন্ত্রিত।

.

=> প্রথম তথ্যসূত্র

.

**ভারতীয় দর্শন হতে তথ্যসূত্র:

.

ভারতীয় দর্শন বিশ্বের দরবারে যৌনতা বিষয়ক তাদের নানাবিধ বিশ্লেষণ তুলে ধরেছে।

.

এই বিষয়ক এমন একটি গ্রন্থ হল *কামসূত্র* যেটি সারা বিশ্বে খুবই প্রসিদ্ধ।

.

কামসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে,

.

"মিলনের প্রথম দিকে **পুরুষের যৌন কামনা থাকে প্রবল এবং তার মিলন কাল হয় সংক্ষিপ্ত,**
কিন্তু ঐ একই দিনে পরবর্তী মিলনের ক্ষেত্রে এই ঘটনার বিপরীত প্রক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়।

.
অথচ *নারীর ক্ষেত্রে* এই বিষয়টি একেবারেই বিপরীত কারণ **তার(নারীর) ক্ষেত্রে মিলনের প্রথম দিকে যৌন কামনা থাকে দুর্বল(অল্প) এবং মিলন কাল হয় দীর্ঘস্থায়ী।**
কিন্তু ঐ একই দিনের অন্য সময়ে তার কামনা থাকে তীব্র কিন্তু মিলন কাল হয় সংক্ষিপ্ত, যতক্ষণ না তার কামনা পরিতৃপ্তি লাভ করে।"

.

("At the first time of sexual union **the passion of the *male* is intense, and his time is short,** but in subsequent unions on the same day the reverse of this is the case.

.

With the *female,* however, it is the contrary, **for at the first time her passion is weak, and then her time long**,
but on subsequent occasions on the same day, her passion is intense and her time short, until her passion is satisfied.")[1]

.

তাই এই জায়গা থেকে আমরা বলতে পারি, পুরুষের কামনা খুব শীঘ্র আসে, আবার খুব শীঘ্রই যায়; যেখানে নারীর কামনা ধীরে ধীরে আসে এবং ধীরে ধীরে যায়।

.

একারণে কোনো পুরুষ ও নারী(বিশেষত যারা রক্তের সম্পর্কের বাইরে) একে অপরের নিকটবর্তী হলে পুরুষটি ঐ নারীর প্রতি খুবই অল্প সময়ের মধ্যে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে(হরমোনের দ্রুত প্রতিক্রিয়ার কারণে), যেখানে নারী *হয়ত* ঐ পুরুষটির প্রতি অতটা তীব্রভাবে আকৃষ্ট হয় না(পুরুষের তুলনায় হরমোনের তুলনামূলক কম দ্রুত বা ধীর গতির প্রতিক্রিয়ার কারণে)।

.

যখন ঐ নারী, ঐ পুরুষের থেকে দূরে চলে যায়, তখন ঐ পুরুষের কামনা ও আকর্ষণ পূর্বের তুলনায় কমে যায়।

.

উদাহরণস্বরূপ, যখন কোনো প্রেমিক তার প্রেমিকাকে নিয়ে এখানে সেখানে ঘুরে বেড়ায়, তখন প্রেমিক কিছুক্ষণের মধ্যেই তার প্রেমিকার প্রতি প্রবল ভাবে আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, কিন্তু নারীর কামনা ধীরে ধীরে জাগ্রত হওয়ায়, প্রেমিকা তার প্রেমিকের সেই কামনা উপলব্ধি করতে পারে না।

.

এই একই প্রক্রিয়া কাজ করে যৌন মিলনের সময়ও। কামসূত্রে আরও উল্লেখ করা হয়েছে,

.

"***রতিক্রিয়ার প্রারম্ভিক কালে নারীর যৌন কামনা থাকে মৃদুতর*** এবং ***সে তার প্রেমিকের সক্রিয় রমণক্রিয়া গ্রহণ করতে পারে না***, কিন্তু ক্রমাগত তার(নারীর) কামনা জাগ্রত হয়, যতক্ষণ না সে(নারী) তার দেহ সম্পর্কে চিন্তা করা হতে বিরত হয় এবং অবশেষে পুনরায় মিলনের ইচ্ছা ত্যাগ করে।"

.

("***In the beginning of coition the passion of the woman is middling***, and **she cannot bear the vigorous thrusts of her lover**, but by degrees her passion increases until she ceases to think about her body, and then finally she wishes to stop from further coition.")[2]

.

তাই এই জায়গা থেকে আমরা বলতে পারি, বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিদের অবাধ মেলামেশা, পুরুষের মনে (অধিকাংশ ক্ষেত্রেই)

নারীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ সৃষ্টি করে।

.

=> দ্বিতীয় ও তৃতীয় তথ্যসূত্র

.

**"Norwegian University of Science and Technology" এর গবেষণা হতে তথ্যসূত্র:

.

এই গবেষণা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরে যা নিম্নরূপ-

.

"...journal Evolutionary Psychology এর একটি নতুন গবেষণা কিছু অপ্রতিদ্বন্দ্বী তথ্য প্রকাশ করেছে। নরওয়েতে অনুষ্ঠিত এই গবেষণা হতে পাওয়া যায় যে, পুরুষ ও নারী মৌলিক দিক দিয়ে একে অপরকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে না:

.

নারী, পুরুষের যৌন-আকাঙ্ক্ষার সংকেতকে বন্ধুত্বসুলভ আচরণ বলে মনে করে।

.

পুরুষ, নারীর বন্ধুত্বের সংকেতকে যৌন-আকাঙ্ক্ষা বলে মনে করে...."

.

("...a new study in the journal Evolutionary Psychology has some compelling findings. The research, conducted in Norway, found that men and women fundamentally misunderstand each other:

.

She interprets his signals of sexual interest as friendliness.

.

He reads her signals of friendliness as sexual interest...")[3]

.

তাই সহজ ভাষায়, যখন প্রেমিক, প্রেমিকার সাথে অবস্থান করে, তখন প্রেমিক চায় তার প্রেমিকাকে সন্তুষ্ট করতে, যেখানে প্রেমিকা চায় তার প্রেমিকের সঙ্গ উপভোগ করতে।

.

কিন্তু যখন প্রেমিকা তার প্রেমিকের সাথে অবাধে মিশছে, তখন প্রেমিক ভাবছে যে, তার প্রেমিকা হয়ত তার প্রতি যৌনসুলভ আকর্ষণ লাভ করছে, যেখানে প্রেমিকা এটা ভাবতেই পছন্দ করছে যে, তার ছেলে বন্ধুটি কেবল তার সাথে বন্ধুসুলভ আচরণ করে চলেছে।

.

এখানে উপরের ব্যাখ্যায় আমরা কামসূত্র হতে পেয়েছিলাম যে, পুরুষ অতি শীঘ্রই নারীর প্রতি (শারীরিক দিক দিয়ে) আকৃষ্ট হয়ে পড়ে, কিন্তু নারী এরূপ হঠাৎ আকর্ষণ লাভ করে না।

.

এখন এই দ্বিতীয় তথ্যসূত্রে আমরা এর প্রতিক্রিয়াটি দেখতে পাচ্ছি; সেটা হল পুরুষ(তার তৎক্ষণাৎ শারীরিক কামনার জন্য) নারীকে আকৃষ্ট করতে চায় এবং নারী যদি তার পুরুষ বন্ধুটির সাথে সঙ্গ দেয়, তবে পুরুষ বন্ধুটি মনে করতে চায় যে, তার মেয়ে বন্ধুটি তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে।

.

অথচ সেই মেয়ে বন্ধুটি(তার ধীর গতিতে জাগ্রত হওয়া শারীরিক কামনার জন্য) এটা ভাবতে চায় যে, তার পুরুষ বন্ধু তার সাথে বন্ধুত্বসুলভ হতে চাইছে।

.

***কিন্তু অন্য একটি গবেষণা এই সব মেয়েদের অন্তরের কু-বাসনা(যা বাইরে থেকে সাধারণত বোঝা যায় না) প্রকাশ করে দিচ্ছে যারা বলে থাকে - "আমরা তো শুধুই বন্ধু, আমাদের মধ্যে অন্য কিছুই নেই; তোমার মনে এত বাজে চিন্তা কেন"!!

.

যদিও কোনো মেয়ে তার পুরুষ সঙ্গীকে কেবল বন্ধু হিসেবেই গ্রহণ করতে পছন্দ করে, তবুও সেই মেয়ের মনে একটি সুপ্ত কামনা কাজ করে যেটা সে সহজে স্বীকার করে না।

.

***University of Chicago (Institute for Mind and Biology) এর গবেষণা বলছে,

.

"এই পারস্পরিক সম্পর্কগুলো আচরণগত বিষয় হতে নির্ধারিত পরিমাপের সঠিকতাকে সমর্থন করে এই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার মাধ্যমে যে,
গবেষণায় অংশগ্রহণকারী মেয়েরা তাদের প্রতি গবেষণায় অংশগ্রহণকারী পুরুষদের রোমান্টিক আকর্ষণকে যথাযথভাবেই শনাক্ত করতে সক্ষম হয়।"

.

("These correlations support the validity of the behavioral rating scales by demonstrating that **the female confederates were able to accurately detect those behaviors that were associated with participants'(male participants') romantic interest in them.**")[4]

.

তাই আমরা দেখতেই পাচ্ছি যে, এই গবেষণায় অংশ নেওয়া মেয়েরা যথাযথ ভাবেই তাদের গবেষণায় অংশগ্রহণকারী পুরুষদের রোমান্টিক আচরণকে শনাক্ত করতে পেরেছে(যে সব পুরুষ সদস্যদের সাথে এই মেয়েরা গবেষণার স্বার্থে একটি মুক্ত কথোপকথন সম্পন্ন করেছে)।

.

[এই গবেষণা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে নিচের তথ্যসূত্রে দেওয়া ৪ নম্বর তথ্যসূত্র(Reference no 4) এর লিঙ্কটি যাচাই করে দেখুন]

.

এই গবেষণা থেকে আমরা সহজেই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে,
***প্রেমিক বা পুরুষ সঙ্গীর সাথে অবাধে মেশার সময়, মেয়ে সঙ্গীটি তাকে(ঐ মেয়েটিকে) আকৃষ্ট করার জন্য তার পুরুষ সঙ্গীর প্রচেষ্টাকে শনাক্ত করতে পারে এবং মেয়েটি তার(পুরুষ সঙ্গীর) সঙ্গ উপভোগ করে এই অজুহাত দিয়ে যে, তারা শুধুই বন্ধু, এর বেশি কিছু না!! ***

.

আমি অবাক হয়ে যাই, কীভাবে তারা এই বিষয়টিকে *পবিত্র* বলার সাহস পাচ্ছে !!!

.

শুধু তাই-ই নয়! এখনও কিছু বাকি আছে।

.

এই গবেষণা আরও তুলে ধরছে যে, নারীর নিকটবর্তী হওয়ার দরুণ পুরুষের যৌন হরমোন এর প্রতিক্রিয়া তীব্রতর হয়ে ওঠে।

.

গবেষণাপত্রে বিষয়টিকে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে:

.

"এই গবেষণা সর্বপ্রথম নারীর সাথে পুরুষের সংক্ষিপ্ত মিথষ্ক্রিয়ার ফলে হরমোন সংক্রান্ত এবং আচরণগত প্রতিক্রিয়ার পরিমাপকে তুলে ধরার চেষ্টা করেছে। গবেষণার ফলাফল পুরুষের প্রজনন সংক্রান্ত প্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ।

.

পুরুষ, 'ফিমেল কন্ডিশনে'(নারীর সাথে পুরুষের কথোপকথনে) baseline level এর ওপর টেস্টোস্টেরন(পুরুষের যৌন হরমোন) এর তাৎপর্যপূর্ণ বৃদ্ধি প্রদর্শন করে এবং এর ফলে প্রদর্শিত তার অধিক বিনম্র আগ্রহকে পরিমাপ করা হয় এবং তা আচরণের মাধ্যমে ফুটে ওঠে, যেটা 'মেল কন্ডিশনে'(পুরুষের সাথে পুরুষের কথোপকথনে) ততটা পরিলক্ষিত হয় না।

.

এছাড়াও কথোপকথনে অংশগ্রহণকারী নারীদের প্রতি যেসব পুরুষরা **অধিক 'পূর্বরাগ'(বিবাহ বহির্ভূত প্রেম) ঘটিত আচরণ** দ্বারা পরিচালিত হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, তারা(ঐ সকল পুরুষরা) "T level(Salivary testosterone level)"[যৌন হরমোনের এক ধরণের মাত্রা নির্দেশক level] এর অধিক ধন্যাত্মক পরিবর্তন প্রদর্শন করে এবং তারা(ঐ সকল পুরুষরা) কথোপকথনে অংশগ্রহণকারী নারী সদস্যদেরকে **অধিক আকর্ষণীয় রোমান্টিক সঙ্গী হিসেবে চিহ্নিত করে।** মেল কন্ডিশনে(পুরুষের সাথে পুরুষের কথোপকথনে) এরূপ কোনো তাৎপর্যপূর্ণ সম্পর্ক পরিলক্ষিত হয় না।"

.

("This study represents one of the first attempts to assess hormonal and behavioral reactions of men to brief interactions with women. Results were generally consistent with the possibility of a mating response in human males.

.

Men in the female condition showed a significant increase in testosterone over baseline levels and were rated as having expressed more polite interest and display behaviors than were men in the male condition.

.

In addition, those men who were rated as having directed **more courtship-like behaviors** toward their female conversation partners also showed more positive changes in T levels and rated the female confederates as **more attractive romantic partners**. No such relationships were significant in the male condition.")[5]

.

এমনকি আরও মজার ব্যাপার হল এই যে, ব্রিটিশ সংবাদপত্র "ডেইলি মেইল" এই গবেষণার ওপর প্রলোভনমূলক মন্তব্য করেছে যা নিম্নরূপ:

.

সুন্দরী মহিলারা পুরুষের মুখে যেন লালা এনে দেয়

.

এটা বলা হয়ে থাকে যে, সুন্দরী মেয়েরা পুরুষের মুখে যেন লালা এনে দেয় এবং এখন বৈজ্ঞানিক গবেষণা বলছে, এটা সত্য।

.

একটি গবেষণাতে প্রকাশ পেয়েছে যে, কম বয়সের আকর্ষণীয় মেয়েদের সাথে অল্প কিছুক্ষণের কথোপকথনেই পুরুষের মুখের লালা নাটকীয়ভাবে পরিবর্তিত হয়।

.

এই গবেষণা বলছে যে, বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের সাথে অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের প্রেমসুলভ আচরণেই তাদের মুখে প্রায় লালা ঝরতে শুরু করে। আর যত তারা ঐ মেয়েদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করে, তত তাদের মুখে লালা নির্গত হয়..."

.

("***Pretty women make a man's mouth water***

.

They say the prettiest girls make men's mouths water - and now scientific research suggests that it is true.

.

A study has revealed that male saliva undergoes dramatic changes during small talk with attractive young women.

.

It suggests they almost start drooling during the briefest of flirtations with members of the opposite sex. And the more they try to impress, the more their saliva gives them away....")[6]

.

এখন এটা একদমই পরিষ্কার যে কী ধরণের খোঁড়া অজুহাত এই সকল প্রেমিক-প্রেমিকার দল দিয়েই চলেছে তাদের অপবিত্র কীর্তিকে ঢাকার জন্য।

.

=> কেন আমরা বিবাহ বহির্ভূত যৌনসম্পর্ককে অপবিত্র বলছি???

.

এখন যখন আমরা প্রমাণ করেছি যে, বিপরীত লিঙ্গের অবাধ মেলামেশা অপবিত্রতার উৎস, তখন কিছু নির্লজ্জ লোক প্রশ্ন করে বসতে পারে,

.

"যদি ছেলে আর মেয়ে দুই জনই রাজি থাকে, তাহলে বিয়ের বাইরে যৌনসম্পর্ক করলে কী সমস্যা?"

.

তাদের জন্যও আমাদের উত্তর আছে।

.

তবে যুক্তি দেওয়ার পূর্বে একটা বিষয় স্পষ্ট করে নেওয়া যাক।

.

যখন আপনারা বলেন যে বিবাহ বহির্ভূত যৌনমিলন পবিত্র, তখন আপনারা বোঝাতে চান যে এটাতে কোনো সমস্যাই নেই।

.

একইভাবে যখন আমরা বলি, বিবাহ বহির্ভূত যৌন আকাঙ্ক্ষা অপবিত্র, তখন আমরা এই বিষয়টিকে নির্দেশ করার চেষ্টা করি যে, ব্যভিচার, সমকামিতা এবং এরকম সম্পর্কগুলির অনুমতি প্রদানে অবশ্যই ব্যাপক আকারে সমস্যার সৃষ্টি হবে।

.

.

কিন্তু বর্তমানের আধুনিক সমাজে বিবাহ বহির্ভূত শারীরিক সম্পর্ক একটি সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

.

তাই এটাকে ভালো বা মন্দ হিসেবে বিচার করতে প্রথমে আসুন আমরা সকল ধর্মীয় এবং রাষ্ট্রীয় আইন উপেক্ষা করি।

.

i. এখন যদি ব্যভিচার, সমকামিতা সঠিক হয়, তবে যদি কোনো জুড়ি(দুইজন ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত হয় জুড়ি) এরূপ শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করে, তবে সেটি সঠিক।

.

ii. যদি অন্য আরেকটি জুড়ি এই একই কাজ করে, তবে সেটিও সঠিক।

.

iii. তাই উপরের এই দুটো পয়েন্টের প্রেক্ষিতে, যদি দুটি জুটি তাদের পরস্পরের মধ্যে তাদের সঙ্গীর আদান-প্রদান করে এবং এরূপ শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদন করে, তবে সেটিও সঠিক হবে।

.

iv. তাহলে উপরের পয়েন্টগুলোর ওপর ভিত্তি করে, যদি কোনো ব্যক্তি নিজের ইচ্ছায় অন্য যেকোনো ব্যক্তির সাথে দৈহিক সম্পর্কে লিপ্ত হয়, তবে সেটাকেও সঠিক বলা হবে।

.

এখন যদি এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকে, তবে বিবাহিত দম্পতির পরিমাণ এবং উত্তম ও সুস্থ মানসিকতাসম্পন্নশিশুর পরিমাণ কমতে শুরু করবে। তখন ভবিষ্যতে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তার, সমাজবিজ্ঞানী, বৈজ্ঞানিক, উত্তম নেতা, উত্তম জনগণ প্রভৃতির পরিমাণ কমতে থাকবে এবং সমাজে ভাঙন দেখা দেবে। ফলে মানব সভ্যতা ধীরে ধীরে ধ্বংসমুখে পতিত হবে এবং এই পৃথিবী বসবাসের অনুপযোগী হয়ে উঠবে।

.

আর এই অশুভ প্রক্রিয়াকে থামানো সম্ভব হবে যদি আমরা এর গোড়াতে থাকা সমস্যাটির সমাধান করি যা এরূপ ধ্বংসের জন্য দায়ী ছিল।

.

আর গোড়াতে থাকা সমস্যাটি হল বিপরীত লিঙ্গের অবাধ মেলামেশা যা থেকে অশ্লীল ও অপবিত্র আকর্ষণের ক্রমাগত বৃদ্ধি ঘটতে শুরু করে এবং সমাজে অপবিত্র সম্পর্কের প্রসার ঘটতে থাকে।

.

তাই আসুন এখন থেকে আমরা নিজেদের পরিবর্তন করি। এখনই সময় সঠিক পথটিকে অনুধাবন করা যা আমাদের নিয়ে যেতে পারে প্রকৃত পবিত্রতা এবং শান্তির নিকটে।

.

.

সৃষ্টিকর্তার শান্তি, দয়া এবং আশীর্বাদ আপনাদের সকলের ওপর বর্ষিত হোক।

.

আমরা লেখাটি শেষ করবো আরবি ধর্মীয় শাস্ত্রের একটি লাইন দিয়ে,

.

"কোনো পুরুষের সঙ্গে কোনো নারীই একাকী থাকে না, কেননা তৃতীয় যে থাকে সে হল শয়তান।"[7]

References:

.

[1] http://www.sacred-texts.com/sex/kama/kama201.htm
[2] http://www.sacred-texts.com/sex/kama/kama201.htm
[3] https://m.mic.com/.../science-shows-why-it-seems-impossible-f...
[4] https://labs.psych.ucsb.edu/.../ot.../reserve%20readings/ehb.pdf
[5] https://labs.psych.ucsb.edu/.../ot.../reserve%20readings/ehb.pdf

[6] http://www.dailymail.co.uk/.../Pretty-women-make-mans-mouth-w...
[7] Narrated by al-Tirmidhi (1171) and classed as saheeh by al-Albaani in Saheeh al-Tirmidhi

---

<<<{সমস্ত প্রশংসা এবং ধন্যবাদ সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার প্রতি এই লেখাটি সম্পন্ন করার সক্ষমতা প্রদান করার জন্য।
আরও ধন্যবাদ আরিফ আজাদকে(একজন বাঙালি লেখক) শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষণা সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ লিঙ্ক সরবরাহ করার জন্য}>>>

১৩৫

রাসূল (ﷺ) এর বৈবাহিক জীবন নিয়ে বিভিন্ন অভিযোগের খণ্ডন

-শিহাব আহমেদ তুহিন

সীরাতের পাতায় নবুয়্যওয়তের দশম বছরের আলাদা একটি নাম রয়েছে। একে বলা হয় "শোকের বছর"। কুরাইশদের দ্বারা বছর খানেক দীর্ঘ বয়কট কেবল শেষ হয়েছে। প্রায় সাথে সাথেই রাসূল (সা.) তাঁর চাচা আবু তালিবকে হারান। কুরাইশদের ভয়ঙ্কর অত্যাচারে যিনি রাসূল (সা.) এর জন্য ঢালের মত হয়েছিলেন। আবু তালিবের মৃত্যুর পর খাদিজা (রা.) ও পৃথিবী ত্যাগ করেন। রাসূল (সা.) হারান তাঁর প্রিয় স্ত্রীকে, যার সাথে কেটেছে তাঁর পঁচিশ বছরের দীর্ঘ দাম্পত্য জীবন। আবু তালিবের মৃত্যুর পর কুরাইশরা রাসূল (সা.) কে প্রচণ্ড কষ্ট দেয়া শুরু করে। রাসূল (সা.) বলেন, "আবু তালিবের মৃত্যুর আগে কুরাইশরা আমার সাথে এমন আচরণ করতে পারেনি যা আমাকে কষ্ট দেয়।"[১]

.

এ সময়ে রাসূল (সা.) এর দুই মেয়ে উম্মে কুলসুম(রা.) ও ফাতেমা (রা.) অবিবাহিতা ছিলেন। তাই তাদের দেখাশুনার জন্য রাসূল (সা.) বিয়ে করেন সওদা বিনতে যাম'আহ (রা.) কে। তিনি ছিলেন প্রথম দিকে ইসলাম গ্রহণকারীদের একজন। সওদা (রা.) এর প্রভাবে তার স্বামীও ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের অবর্ণনীয় কষ্ট সহ্য করতে হয়েছিল।[২] তিনি আর তার স্বামী হাবশায় হিজরত করেন। হাবশা থেকে আবার মক্কায় ফেরত আসার পর তার স্বামী সাকরান মারা যান। রেখে যান পাঁচ-ছয় জন সন্তান। তাদের নিয়ে সওদা (রা.) অকুল পাথারে পড়েন। রাসূল (সা.) তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তা খুশিমনে গ্রহণ করেন।[৩] রাসূল (সা.) তার সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্বসহ সওদা (রা:) কে বিয়ে করেন।[৪] এ সময়ে রাসূল (সা.) আর সওদা (রা.) দুইজনেরই বয়স ছিল পঞ্চাশ।[৫]

.

রাসূল (সা.) সংসার করেছিলেন সর্বমোট ১১ জন স্ত্রীর সাথে। এর মধ্যে খাদিজা (রা.) এবং জয়নাব বিনতে খুযাইমা (রা.), রাসূল (সা.) এর মৃত্যুর পূর্বেই মারা যান।[৬] স্ত্রীদের সাথে তিনি পালাক্রমে থাকতেন। কাউকে বেশী ভালোবাসালেও এ ক্ষেত্রে তিনি অবিচার করতেন না। আল্লাহ্‌র নিকট এই বলে দু'আ করতেন,

" হে আল্লাহ! যা আমার নিয়ন্ত্রণে (অর্থাৎ স্ত্রীগণের প্রতি আচার-ব্যবহার ও লেনদেন) তাতে অবশ্যই সমতা বিধান করি; কিন্তু যা আমার নিয়ন্ত্রণে নয় (অর্থাৎ কারো প্রতি ভালোবাসা) তার জন্য আমাকে ক্ষমা করো।"[৭]

.

আরবের নারীরা যেমন খুব কম বয়সে যৌবন প্রাপ্ত হতো ঠিক তেমনি খুব অল্প বয়সে বুড়িয়ে যেতো। যেমন: মাত্র চৌদ্দ-পনের বছর বয়সেই আয়েশা (রা.) এর শরীর ভারি হয়ে গিয়েছিল। রাসূল (সা.) যখন সওদা (রা.) কে বিয়ে করেন তখন তার বয়স ছিল পঞ্চাশ। এ বয়সেই তিনি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। এমনকি হজ্জে পর্যন্ত যেতে পারেননি অক্ষমতার কারণে।[৮] তাই বিয়ের বেশ কয়েক বছর পর তার যে পালা রাসূল (সা.) এর সাথে ছিল তা তিনি আয়েশা (রা.) কে দিয়ে দেন।[৯] সে সময়ে শারীরিকভাবে তার কোন চাহিদা ছিল না।

.

ইসলাম বিদ্বেষীদের কাজ হচ্ছে রাসূল (সা.) যা ই করেছেন তা নিয়ে সমালোচনা করা। তাই রাসূল (সা.) যখন নয় বছরের আয়েশা (রা.) এর সাথে সংসার করেছিলেন তখন তা নিয়ে তারা সমালোচনা করে। মধ্যবয়স্কা উম্মে হাবীবাহকে(৩৬) বিয়ে করা নিয়েও সমালোচনা করে। এমনকি সওদা (রা.) এর মত বিগত যৌবনা এবং বিধবা নারীর সাথে তাঁর সংসার জীবনেরও সমালোচনা করে। তারা দাবী করে যে, সওদা (রা.) যখন শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়েন, তখন রাসূল (সা.) তাকে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করেন। তাই তালাক থেকে বাঁচতে সওদা (রা.) নিজের পালা আয়েশা (রা.) কে দিয়ে দেন।

.

কিন্তু সীরাত থেকে আমরা এমন কোনো সহীহ বর্ণনা পাই না, যেখানে রাসূল (সা.) সরাসরি সওদা (রা.) কে তালাক দেয়ার ইচ্ছা করেছেন কিংবা এ বিষয়ে কারো সাথে কথা বলেছেন। একমাত্র যে বর্ণনাটি তারা উপস্থাপন করে সেটি আছে তাফসীর ইবনে কাসিরে। সূরা নিসার ১২৮ নং আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাসির (রহ.) একটি হাদীস বর্ণনা করেনঃ
"রাসূল (সা.), সওদা (রা.) এর নিকট তালাকের সংবাদ পাঠিয়েছিলেন। তিনি তখন আয়েশা (রা.) এর নিকট বসেছিলেন। রাসূল (সা.) সেখানে প্রবেশ করলে সওদা (রা.) বলেন, 'যে আল্লাহ্ আপনার উপর স্বীয় বাণী অবতীর্ণ করেছেন এবং স্বীয় সৃষ্টির মধ্যে আপনাকে মনোনীত করেছেন তাঁর শপথ! আমাকে ফিরিয়ে নিন। আমার বয়স খুব বেশী হয়ে গেছে। পুরুষের প্রতি আমার কোন আসক্তি নেই। কিন্তু আমার একান্ত ইচ্ছা যেন কিয়ামতের দিন আমাকে আপনার একজন স্ত্রী হিসেবে উঠানো হয়।' রাসূল (সা.) তাতে সম্মত হন এবং তাকে ফিরিয়ে নেন। তখন সওদা (রা.) বলেন, "হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি আমার পালার দিন ও রাত আপনার প্রিয় স্ত্রী আয়েশা (রা.) কে দিয়ে দিলাম।"

.

এটা সত্যি যে তাফসীর ইবনে কাসিরে এমন একটি বর্ণনা রয়েছে। কিন্তু এই হাদীসটি সম্পর্কে ইবনে কাসির (রহ.) নিজেই কি মন্তব্য করেছেন তা এই বিজ্ঞ(!) বিশ্লেষকরা কখনোই উল্লেখ করেন না। ইবনে কাসির (রহ.) এই হাদীসটিকে "মুরসাল" বলেছেন।[১০] হাদীসের পরিভাষায়, মুরসাল বলতে এমন হাদীসকে বোঝানো হয় যাতে বর্ণনাকারীদের মধ্যে ধারাবাহিকতা নেই। অর্থাৎ একজন বর্ণনাকারী এখানে অনুপস্থিত। এমন হাদীসকে কখনোই পরিপূর্ণ আত্মবিশ্বাসের সাথে রাসূল (সা.) এর সাথে সংশ্লিষ্ট করা যাবে না।

.

এটা সত্যি যে, সওদা (রা.) তার পালাটুকু আয়েশা(রা.) কে দিয়েছিলেন। সেটা তালাক থেকে বাঁচতে নয়, বরং রাসূল (সা.) এর সন্তুষ্টি অর্জন করতে। কারণ, তখন আর তাঁর নিজের চাহিদা ছিল না। এর মধ্যে তার প্রতি রাসূল (সা.) এর কোন অবিচার ছিল না বরং তিনি নিজেই স্ব-প্রণোদিত হয়ে এমনটা করেছিলেন৷ সহীহ বুখারীতে এসেছেঃ
"যখন আল্লাহ্র রাসূল কোন ভ্রমণে বের হতেন তখন সাথে কোন স্ত্রীকে নিবেন তার জন্য লটারী করতেন। লটারীতে যার নাম আসতো, তিনি তাকেই নিতেন। তিনি প্রত্যেক স্ত্রীর(সাথে থাকার জন্য) রাত ও দিন নির্দিষ্ট করে দিতেন। কিন্তু সওদা আল্লাহ্র রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য নিজ পালা আয়েশাকে দিয়ে দিলেন।"[১১]

.

আয়েশা (রা.) তাই সওদা (রা.) সম্পর্কে বলেন,
"আমি সাওদা বিনতে যাম'আহ এর চেয়ে অধিক স্নেহময়ী কোন নারীকে দেখিনি। আমি যদি একদম তার মতো প্রেমময়ী হতে পারতাম!" [১২]

.

শুধু সওদা (রা.) নয়, রাসূল (সা.) এর অন্যান্য স্ত্রীরাও মাঝে মাঝে তাদের পালা আয়েশা (রা.) কে দিয়ে দিতেন। এর মাধ্যমে তারা রাসূল (সা.) কে সন্তুষ্ট করতে চাইতেন। যেমনঃ
" একবার রাসূল (সা.), সাফিয়া(রা.) এর প্রতি খুব রাগ করলেন। সাফিয়া (রা.) তখন আয়েশা (রা.) এর নিকট গেলেন এবং বললেন, 'তুমি কি এমন কিছু করতে পারবে যাতে আল্লাহ্র রাসূল (সা.) আমাকে মাফ করেন? তাহলে আমি আমার দিনটা তোমাকে দিয়ে দিব।' আয়েশা (রা.) বললেন, 'হ্যাঁ'।
তারপর আয়েশা (রা.) তার হলুদ রঙের ওড়নাটি নিলেন। তাতে সুগন্ধী লাগালেন আর রাসূল (সা.) এর পাশে বসে পড়লেন। রাসূল (সা.) বললেন, 'আয়েশা! আমার কাছ থেকে দূরে থাকো। আজকে তোমার দিন না।' আয়েশা (রা.) জবাবে বললেন, 'আল্লাহ্র রহমত আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন।' তারপর তিনি পুরো ব্যাপারটা রাসূল (সা.) কে বুঝিয়ে বললেন। রাসূল (সা.) তখন সাফিয়া (রা.) কে ক্ষমা করে দেন।[১৩]

.

সীরাতকাররা রাসূল (সা.) এর বহুবিবাহের পিছনে যে যুক্তি প্রদান করেন, তার মধ্য অন্যতম হচ্ছে- বহুবিবাহের মাধ্যমে রাসূল (সা.) অসহায় নারীদের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এবং বিভিন্ন গোত্রের সাথে রাজনৈতিক সম্প্রীতি স্থাপন করেছিলেন।[১৪] ইসলামবিদ্বেষীরা সওদাহ (রা.) এর উদাহারণ টেনে প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, অসহায় নারীদের আশ্রয় দেয়া নয় বরং নারীদেহ ভোগই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। এতোক্ষণের আলোচনায় আমাদের নিকট এটা স্পষ্ট যে, তাদের এই দাবী সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।

.

তাদের দাবীতে যে কোন সত্যতা নেই সেটা আরো পরিষ্কার বোঝা যাবে যদি আমরা রাসূল (সা.) এর অন্যান্য স্ত্রীদের দিকে তাকাই। রাসূল (সা.) এর ১১ জন স্ত্রীদের মধ্যে দশ জনই ছিলেন হয় বিধবা না হয় তালাক প্রাপ্তা। কেউ আবার একইসাথে বিধবা ছিলেন আবার তালাকপ্রাপ্তাও ছিলেন। মক্কার সবচেয়ে সুদর্শন পুরুষ হয়ে পঁচিশ বছরে বিয়ে করেছিলেন তাঁর চেয়ে পনেশ বছরের বড় একজন নারীকে। আর তাঁর সাথে টানা পঁচিশ বছর সংসার করেছিলেন। অনেকে বলেন, খাদিজা (রা.) এর ভয়ে তিনি তখন আর বিয়ে করতে পারেননি। তারা কি বলতে পারেন যদি ভয়েই তিনি এমনটা করে থাকেন, তবে ঠিক কোন ভয়ে তিনি খাদিজা (রা.) এর মৃত্যুর বহু বছর পর তার গলার হার দেখে আবেগ আপ্লুত হয়ে পড়েছিলেন?[১৫] কেন তিনি তার মৃত্যুর বহু বছর পরও ভালোবাসার স্মরণে তার বান্ধবীদের নিকট গোশত উপহারস্বরূপ পাঠাতেন?[১৬] ঠিক কোন ভয়ে বহু বছর পর খাদিজা (রা.) এর বোন হালাহ (রা.) এর কণ্ঠস্বর শুনে তিনি এতোটা আবেগতাড়িত হয়েছিলেন যে আয়েশা(রা.) পর্যন্ত ঈর্ষান্বিত হয়ে পড়েছিলেন?[১৭]

.

খাদিজা (রা.) এর মৃত্যুর পর তার জীবনের বাকী বিয়েগুলো করেন ৫০-৬৩ বছর বয়সে। যে সময়টাতে পুরুষরা নারীদের প্রতি আকর্ষণ হারাতে থাকে, তাদের শারীরিক চাহিদা কমতে থাকে, সে বয়সেই তিনি এ বিয়েগুলো করেন। ঠিক কতটুকু অযৌক্তিক হলে তাঁকে এরপরেও "নারীলোভী" বলা যায়? আমরা যদি রাসূল (সা.) এর কয়েকজন স্ত্রীদের সাথে তাঁর বিয়ের কারণগুলো দেখি তাহলে ইসলামবিদ্বেষীদের যুক্তিগুলোর অসারতা আরো ভালোভাবে প্রমাণিত হবে।

.

হাফসা বিনতে উমার (রা.): তাঁর স্বামী খুনায়েস বিন হুযাফাহ উহুদ যুদ্ধে আহত হন এবং পরবর্তীতে মারা যান।[১৮] উমার (রা.) মেয়ের ব্যাপারে উসমান (রা.) কে প্রস্তাব করলে তিনি নাকচ করে দেন। এতে কিছুটা আহত হয়ে আবু বকর (রা.) কে প্রস্তাব দিলে তিনি মৌনতা অবলম্বন করেন। এতে উমার (রা.) আরো কষ্ট পান। পরবর্তীতে রাসূল (সা.), হাফসা (রা.) কে বিয়ে করেন। বিয়ের ফলে উমার (রা.) প্রচণ্ড খুশি হন।

.

যয়নাব বিনতে খুযাইমা (রা.): পর পর দুই স্বামীকে হারিয়ে তিনি বিয়ে করেন রাসূল (সা.) এর ফুফাতো ভাই আব্দুল্লাহ বিন জাহশ (রা.) কে। তিনিও উহুদ যুদ্ধে প্রাণ হারালে রাসূল (সা.) তাঁকে বিয়ে করেন। রাসূল(সা.) ছিলেন তাঁর চতুর্থ স্বামী। গরিব আর অসহায়দের প্রতি খুব দানশীল হবার কারণে তাকে "উম্মুল মাসাকীন" বা "মিসকীনদের মা" বলা হতো। তিনি রাসূল (সা.) এর সাথে কেবল তিন মাস সংসার করার পর মৃত্যুবরণ করেন।[১৯]

.

উম্মে হাবীবাহ রামালাহ বিনতে সুফিয়ান (রা.): স্বামী উবাইদুল্লাহ বিন জাহশের সাথে তিনি হিজরত করেছিলেন। দুঃখজনকভাবে, তার স্বামী হাবশায় হিজরত করার পর মুরতাদ হয়ে যান। ফলে, তাদের বিয়ে ভেঙ্গে যায়। দূরদেশে তিনি একা হয়ে পড়েন। রাসূল (সা.) তখন তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। বিয়ের প্রস্তাবে তিনি প্রচণ্ড খুশী হন। এতোটাই খুশি হন যে নাজশী বাদশাহর যে দূত বিয়ের সংবাদ নিয়ে যায় তাকে তিনি দুইটি কাঁকন, পায়ের দুইটি রুপার মল আর আঙ্গুলসমূহের রূপার আংটিগুলো দান করেন।[২০] তখন তার বয়স ছিল ৩৬ বছর। আবু সুফিয়ান সে সময়ে রাসূল (সা.) এর প্রধান শত্রু ছিলেন। এমনকি তিনিও মেয়ের সাথে রাসূল(সা.) এর সাথে বিয়ের সংবাদ শুনে বলেন, "মুহাম্মদের চেয়ে উত্তম স্বামী আর কে আছে?"[২১] উম্মে হাবীবাহ (রা.), রাসূল (সা.) এর প্রতি প্রচণ্ড শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একবার পিতা আবু সুফিয়ান মদিনায় তার ঘরে আসলে তিনি বিছানা সরিয়ে ফেলেন। আবু সুফিয়ান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করেন, "হে আমার মেয়ে! তুমি কি মনে করছো যে বিছানা আমার

জন্য উপযুক্ত না, না আমি বিছানার জন্য উপযুক্ত না?” উম্মে হাবীবাহ (রা.) তখন জবাব দেন, “এ হচ্ছে রাসূল(সা.) এর বিছানা, আপনি হচ্ছেন অপবিত্র মুশরিক।”[২২]

.

উম্মে সালামাহ হিন্দ বিনতে আবু উমাইয়া (রা.): তাঁর স্বামীও উহুদ যুদ্ধেও আহত হয়ে মারা যান। রেখে যান দুই ছেলে আর দুই মেয়ে। তাদের সাথে নিয়েই রাসূল (সা.) তাকে বিয়ে করেন।[২৩] তার পরামর্শ হুদাইবিয়ার সন্ধির সময়ে বেশ ফলপ্রসূ হয়।[২৪]

.

জুয়াইরিয়া বিনতুল হারেছ(রা.): বনু মুসতালিকের যুদ্ধে পুরো গোত্রসহ বন্দী হন। রাসূল (সা.) এর কাছে সাহায্য চাইলে তিনি তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। জুয়াইরিয়া (রা.) খুশীমনে তা গ্রহণ করেন। মোহর হিসেবে রাসূল (সা.) বনু মুসতালিকের ৪০ জনকে মুক্ত করেন। সাহাবীদের নিকট বিয়ের সংবাদ পৌঁছালে তারাও সকল দাসদের মুক্ত করে দেন। কারণ, বিয়ের ফলে তার গোত্রের লোকেরা রাসূল (সা.) এর শ্বশুর বাড়ীর লোকজন হয়ে যান। আয়েশা (রা.) বলেন, “রাসূল (সা.) কর্তৃক জুয়াইরিয়াকে বিয়ের ফলে বনু মুসতালিকের একশ পরিবার মুক্ত হয়ে যায়। নিজ সম্প্রদায়ের জন্য জুয়াইরিয়ার চেয়ে অধিক বরকতময় কোন নারী ছিল বলে আমার জানা নেই।”[২৫]

.

মায়মুনা বিনতুল হারেছ (রা.): তিনি প্রথমে মাসউদ ইবনে আমরকে বিয়ে করেন এবং তালাকপ্রাপ্তা হন। পরে, তিনি আবু রাহেমকে বিয়ে করেন এবং এ স্বামী মারা যায়। ফলে, তিনি বিধবা এবং তালাকপ্রাপ্তা হন। পরবর্তীতে, রাসূল (সা.) তাকে বিয়ে করেন।[২৬] তখন তার বয়স ছিল ৩৬ বছর।

.

রাসূল (সা.) জোর করে কাউকে ঘর সংসার করতে বাধ্য করেননি। বরং সবাই খুশি মনে তাঁকে বিয়ে করেছিলেন। উমাইমা বিনতুন নুমান(কারো কারো মতে ফাতিমা বিনতুয যাহহাক) নামে এক মহিলাকে তিনি বিয়ে করেছিলেন। তার নিকট নিভৃতে গেলে সে বলে উঠে, “আমি আপনার হাত হতে আল্লাহ্‌র স্মরণ গ্রহণ করছি।” রাসূল (সা.) তার উপর একটুও জোর করলেন না। বললেন, “তুমি এক মহান স্মরণদাতার স্মরণ গ্রহণ করেছ। নিজ পরিবারের কাছে চলে যাও।” মহিলাটি পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরেছিল। তাই সে উটের লেদ কুড়াতো আর বলত, “আমি দূর্ভাগা নারী।”[২৭]

.

অনেক সমালোচক যুক্তি প্রদর্শন করে যে, উম্মুল মুমিনীনরা রাসূল(সা.) এর ভয়ে তাঁর জীবদ্দশায় নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করতে পারেনি। মৃত্যুর পর ঠিকই একজন বিয়ে করা হারাম হওয়ার পরেও বিয়ে করেন।[২৮] এ ক্ষেত্রে যার কথা বলা হচ্ছে তার নাম কাতীলা বিনতে কায়স। রাসূল (সা.) তার সাথে ঘর করেননি এমনকি তাকে দেখেনও নি। মৃত্যুর কেবল দুইমাস আগে তাকে তিনি বিয়ে করেন। তার ব্যাপারে রাসূল (সা.) ওসীয়ত করে যান যে, “কাতীলাকে এখতিয়ার দেয়া হবে। সুতরাং সে ইচ্ছা করলে তার উপর নবীপত্নীসুলভ পর্দার হুকুম সাব্যস্ত হবে এবং মুমিনদের জন্য তাকে হারাম করা হবে। আর নতুবা যাকে ইচ্ছা তাকে সে বিয়ে করতে পারবে।” মৃত্যুর ঠিক আগেও রাসূল (সা.) একজন নারীর জীবনের দিকে খেয়াল রেখেছিলেন। পরবর্তীতে, সে ইকরিমা ইবনে আবু জাহলকে বিয়ে করে।[২৯]

.

উম্মে হানী (রা.) নামে রাসূল (সা.) এর এক চাচাতো বোন ছিল। তার সাথে রাসূল (সা.) কে জড়িয়ে এক শ্রেণীর নাস্তিকরা খুব কুরুচিপূর্ণ কথা লিখে। তিনি যখন প্রায় ৬০ বছরের কাছাকাছি ছিলেন তখন রাসূল (সা.) তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। উম্মে হানি (রা.) তখন বলেন, “আমার বয়স হয়ে গেছে। আমার অনেক সন্তান আছে। আমার ভয় হয় ওরা আপনাকে কষ্ট দিবে।” রাসূল (সা.) তখন খুশীমনে এ প্রস্তাব ফিরিয়ে নেন।[৩০] একজন অসহায় নারীর পাশে দাঁড়ানোর জন্য তাকে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তা নিয়ে এতো অশ্লীল কথা লেখার কারণ আমার নিকট পরিষ্কার না।

.

.

অবশ্য সমকামিতা, অযাচারের পক্ষে যারা কলম ধরেন তাদের নিকট বহুবিবাহ কিভাবে অশ্লীলতা হয় সেটাই তো একটা গবেষণার ব্যাপার।

তথ্যসূত্র:

[১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- হাফিজ ইবনে কাসির(রহ.) [তৃতীয় খণ্ড, ২৩২ পৃষ্ঠা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[২] ইবনে হিশাম ১/৩২১-৩৩২

[৩] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- হাফিজ ইবনে কাসির(রহ.) [তৃতীয় খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[৪] সিলসিলা সহীহাহ, হাদীস নং ২৫২৩

[৫] সীরাতুর রাসূল(ছাঃ)- মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব [পৃষ্ঠা ৭৬৩]

[৬] সীরাতুল হাবীব- সাইফুদ্দিন বেলাল [পৃষ্ঠা ১৪৬]

[৭] আবু দাউদ

[৮] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- হাফিজ ইবনে কাসির(রহ.) [তৃতীয় খণ্ড, ২৪৯ পৃষ্ঠা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[৯] আর রাহেকুল মাখতুম- আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী(রহ.) [পৃষ্ঠা ১৬০]

[১০] তাফসীর ইবনে কাসির- হাফিজ ইবনে কাসির(রহ.) [সূরা নিসার ১২৮ নং আয়াতের তাফসীর, পৃষ্ঠা ৫৮৫]

[১১] সহীহ বুখারী, খণ্ড-৩, হাদীস নং-৭৬৬

[১২] সহীহ মুসলিম, খণ্ড-৮, হাদীস নং-৩৪৫১

[১৩] ইবনে মাজাহ, কিতাবুন নিকাহ।

[১৪] আর রাহেকুল মাখতুম- আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী(রহ.) [পৃষ্ঠা ৫৪১-৫৪৬]

[১৫] সীরাতে মোস্তফা- মাওলানা ইদরীস কান্ধলভী(রহ.) [পৃষ্ঠা ৩৬৮]

[১৬] মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ- আব্দুল হামিদ মাদানি

[১৭] সাহাবী চরিত- মাওলানা যাকারিয়া(রহ.)

[১৮] সীরাতুর রাসূল(ছাঃ)- মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব [পৃষ্ঠা ৭৬৪]

[১৯] সীরাতুর রাসূল(ছাঃ)- মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব [পৃষ্ঠা ৭৬৫]

[২০] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- হাফিজ ইবনে কাসির(রহ.) [চতুর্থ খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[২১] Young Ayesha – Anwar Al Awlaki

[২২] আর রাহেকুল মাখতুম- আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী(রহ.) [পৃষ্ঠা ৪৫৪]

[২৩] সীরাতুর রাসূল(ছাঃ)- মুহাম্মদ আসাদুল্লাহ আল গালিব [পৃষ্ঠা ৭৬৫]

[২৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নংঃ ২৭৩২

[২৫] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- হাফিজ ইবনে কাসির(রহ.) [চতুর্থ খণ্ড, ২৯৩ পৃষ্ঠা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[২৬] সীরাতুল হাবীব- সাইফুদ্দিন বেলাল [পৃষ্ঠা ১৪৬]

[২৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- হাফিজ ইবনে কাসির(রহ.) [পঞ্চম খণ্ড, ৪৮৮ পৃষ্ঠা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[২৮] কুর'আনে রাসূল(সা.) এর স্ত্রীদের উম্মুল মুমিনীন বলা হয়েছে। শব্দটির অর্থ মুমিনদের মা। তাই তারা সকল মুসলিমদের কাছে বিবাহের জন্য হারাম ছিলেন।

[২৯] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- হাফিজ ইবনে কাসির(রহ.) [পঞ্চম খণ্ড, ৪৮৯ পৃষ্ঠা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

১৩৬
উপলব্ধিঃ "সমকামিতা একটি ভয়ানক ব্যাধি"

-জাকারিয়া মাসুদ

ফারিসের ইচ্ছা ছিল লাইব্রেরীতে যাওয়ার। আমিই ওঁকে জোর করে ধরে ক্যান্টিনে নিয়ে গেলাম। খুব চা খেতে ইচ্ছা করছিল তাই। ক্যান্টিনে পৌঁছে আমরা দক্ষিণ পার্শ্বের ছোট টেবিলটিতে বসলাম। খাবারের অর্ডার ফারিসই দিল। তবে চা নয়। কফি। চকলেট ফ্লেবারের কফি। আমরা কফি খাচ্ছিলাম আর গল্প করছিলাম। মিনিট দশেক পর রফিক ভাই এলেন। রফিক ভাই ভার্সিটির সংস্কৃতি সংঘের সভাপতি। সংস্কৃতি সংঘের সভাপতি হলেও সংস্কৃতির বদলে ইসলামের ভুল ধরার পেছনেই বেশি সময় ব্যয় থাকেন। কথায়-কথায় ইসলামকে আক্রমণ করাটা তাঁর অভ্যাস। ফারিসকে দেখে তিনি এগিয়ে এলেন। আমাদেরকে কফি খেতে দেখে একটু ঠাট্টা করেই বললেন, "কিরে মোল্লার দল? তোরা দেহি ক্যান্টিনে বইয়া বইয়া কফি খাইতাছস। কাম কাজ নাই"?

.

ফারিস বলল, "থাকবে না কেন ভাই? অবশ্যই আছে। কাজের মাঝে একটু বিরতি নিলাম। যাতে শরীরটা চাঙ্গা হয়। এই আর কি"।

- ভাল ভাল।
- কফি খাবেন ভাই?
- কফি! হ খাওয়া যায়। দিতে ক।

.

ক্যান্টিনের আসাদ মামাকে ডেকে আরও একটা কফি দিতে বললাম। রফিক ভাই একটা সিগারেট ধরালেন। তবে একটান দিয়েই নিভিয়ে ফেললেন। নেভানোর কারণটা অবশ্য ফারিস। রফিক ভাই জানেন, সিগারেটের গন্ধ ফারিস একদম সহ্য করতে পারে না। মিনিট পাঁচেক পর কফি এল। কফির কাপটা ফারিস রফিক ভাইয়ের দিগে এগিয়ে দিল।

.

কাপটা হাতে নিয়ে রফিক ভাই বললেন, "ঈদের অনুষ্ঠানে আরটিভি সমকামিতা নিয়া একটা নাটক প্রচার করল। সেইখানে না খারাপ কিছু দেহানো অইল। আর না খারাপ কোন কতা প্রচার করা অইল। তার পরেও হুজুররা এইডা নিয়া লাফালাফি শুরু করল। অনলাইন অফলাইনে এক্কেবারে ঝর তুইলা ফেলল। এই কামডা কি ঠিক অইল? তুঁই ক"?

.

যা ভেবেছিলাম তাই। আজও তিনি ফারিসের সাথে তর্ক করতে এসেছেন। ওনার প্রশ্নের জবাবে ফারিস বেশ শান্ত গলায় বললো, "হুজুররা কেন সমকামিতার বিরোধিতা করেন জানেন ভাই"?

- কেন আবার? তারা মানুষের কাজ কামের স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না, তাই।
- আপনার ধারণা সম্পুর্ণ ভুল ভাই।
- ভুল মানে?
- হুজুরদের বিরোধীতার আসল কারণটা আপনি জানেন না।
- জানি জানি। খুব জানি। হুজুরগো আমার চিনা আছে। খালি মসজিদ মাদ্রাসা লইয়া পইরা থাকে| আর মানুষের কাজে-কামে নাক গলায়। মানুষরে দাস বানাইয়্যা রাখবার চায়। এইডাই মেন কারণ।
- রফিক ভাই, আপনি আবারো ভুল বলছেন।
- ভুল কইতাছি? তাইলে ঠিকটা কি?

- হুজুরদের সমকামিতাকে সাপোর্ট না করা, কিংবা সমকামীদের বিরোধিতা করার কারণ হল- সমকামিতা একটি গর্হিত কাজ?
- গর্হিত কাম? হা হা হা। হাঁসাইলি ফারিস। হাঁসাইলি। সমকামিতা খারাপ কাম অইব কেন? এইডা মানুষের জেনেটিক বিষয়। মানুষ জন্মগতভাবেই সমকামী অইতে পারে। হেইডা কি তোর জানা নাই?
- আপনি একটা মস্তবড় ভুল ইনফরমেশন দিলেন ভাই।
- আমি ভুল ইনফরমেশন দিছি?
- এইতো, এইমাত্র দিলেন।
- তাইলে ঠিকটা তুই-ই ক। আমি শুনি।

.

রফিক ভাই এর কথা শেষ হলে ফারিস আমাকে লক্ষ্য করে বললো, "তুই তো হিস্টোলজি আমার থেকে ভাল করে পড়েছিস। রফিক ভাই কে একটু পায়ু ও যোনীর গাঠনিক পার্থক্যগুলি বল তো"।

.

ফারিসের কথা শেষ হলে আমি বললাম, "আসলে মেয়েদের যোনী যৌনমিলনের জন্য স্পেশালভাবে তৈরি একটি অঙ্গ। যোনী তিন স্তর বিশিষ্ট পুরু ও স্থিতিস্থাপক মাসল দ্বারা তৈরি। যোনীর অভ্যন্তরে রয়েছে ন্যাচারাল লুব্রিকেন্ট। যার ফলে যোনীর ভিতরে লিংগ অতি সহজেই ঢুকে যেতে পারে। ন্যাচারাল লুব্রিকেন্ট, তিন স্তর বিশিষ্ট লেয়ার ও স্থিতিস্থাপক মাসল থাকার কারণে যোনীতে লিঙ্গ প্রবেশের ফলে কোন রকম রক্তপাত কিংবা ঘর্ষণ পরিলক্ষিত হয় না। অপরদিকে মলাশয় একটি অত্যন্ত নাজুক অঙ্গ। মলাশয়ে নেচারাল লুব্রিকেন্ট অনুপস্থিত। মলাশয়গাত্র একেবারেই পাতলা। একস্তর বিশিষ্ট আবরণ থাকে। আর মলাশয়ে লিঙ্গ যোনীর মত সহযেই ঢুকতে পারে না। চাপ দিয়ে ঢুকাতে হয়। যেহেতু মলাশয় গাত্র পাতলা ও ন্যাচারাল লুব্রিকেন্ট অনুপস্থিত, তাই লিঙ্গ ঢুকানোর ফলে রক্তপাত হয়। ফলে বীর্য অতি সহজেই রক্তের সাথে মিশে ইনফেকশন তৈরি করতে পারে। ইউমিনোলজিক্যাল স্টাডি থেকে আরও জানা যায় যে, বীর্যরস ইমিউনোসাপ্রেসিভ। আর মানুষের এন্যাল রুটের ইমিনো সিস্টেম যোনির ইমিউনো সিস্টেমের তুলনায় দুর্বল হয়। বীর্যরস যদি মলাশয়ে নির্গত হয়, তাহলে মলাশয়ের ইমিনো সিস্টেম আরও দুর্বল হয়ে পরে। ফলে জীবাণু বিনা প্রতিরোধে শরীরে প্রবেশ করে। এবং বিভিন্ন রোগের সৃষ্টি করে"।

.

আমার কথা শুনে রফিক ভাই সন্তুষ্ট হতে পেরেছে বলে মনে হল না। তিনি এবার বললেন, "সবই বুঝলাম। কিন্তু বিজ্ঞানীরা যে গে জীন আবিষ্কার করছে। গে জীনডাই তো যথেষ্ট সমকামিতাকে জেনেটিক্যালি প্রোভ করবার জন্য"।
রফিক ভাইয়ের কথা শুনে ফারিস হাঁসতে শুরু করল। হাসি থামিয়ে রফিক ভাইকে বলল, "ভাই একটা প্রশ্ন করি"?
- আর কি প্রশ্ন করবি? এইবার তো তুই আমার কাছে হাইরা গেলি। হো হো হো।
- সে না হয় পরে দেখা যাবে। আগে বলেন তো, আপনি গে জীনের কথা কোথা থেকে শুনেছেন?
- হেইডা তোরে কওয়া যাইবো না। এইডা সিক্রেট ব্যাপার।
- আমি বলি?
- ক দেহি?
- 'অভিজিৎ রায়ের' বই থেকে। তাইনা?

.

ফারিসের সন্দেহটা ঠিক। রফিক ভাই কোন জবাব দিল না। রফিক ভাইইয়ের চুপ থাকাটাই মৌন সম্মতি নির্দেশ করে। এরপর ফারিস বললো, "আচ্ছা রফিক ভাই। আমি যদি গণিতবিদের কাছে অর্থনীতি বুঝতে যাই- তাহলে সেটা কেমন হবে"?
- পাগলে কয় কি? গণিতের লোকগো কাছে তুই অর্থনীতির কি পাইবি? অর্থনীতি বুঝতে চাইলে অর্থনীতিবিদদের কাছে যাইতে অইব'।
- তাহলে আপনি যদি ইঞ্জিনিয়ার এর বই পড়ে মেডিক্যাল সাইন্স বুঝতে চান সেটা কেমন হবে?

.

রফিক ভাই কিছু বলল না। ফারিস বলল, "সবারই অধিকার আছে মেডিক্যাল সাইন্সের বিষয় গুলি নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করার। তাই বলে মিথ্যাচার করার অধিকার কিন্তু কারো নেই"।

- তার মানে তুই কইবার চাস অভিজিৎ দাদা মিসা কতা লিখছে তার বইডার মধ্যে?

- শুধুই কি মিথ্যা? তার গোটা বইটাই মিথ্যার ফুলঝুড়ি দিয়ে সাজানো।

- দাদাতো বইডার মধ্যে রেফারেন্স দিয়াই লিখছে। নাকি?

- রেফারেন্স দিয়েছে ঠিকই। কিন্তু ভুল গবেষণার।

- ভুল?

- জ্বি ভাই। ভুল। অভিজিৎ রায় 'গে' জীনের কথা উল্লেখ করে দাবি করেছেন মানুষের সমকামী হওয়ার জন্য এই 'গে' জীন দায়ী। কিন্তু তথাকথিত 'গে' জীনের ফাদার উপাধিপ্রাপ্ত Dr. Dean Hamer 'গে' জীনের কথা সম্পূর্ণভাবে অস্বীকার করেছেন। 'Scientific American Magazine' যখন তাকে জিজ্ঞেস করেছিল যে, 'সমকামিতা কি জীনবিদ্যার সাথে সম্পর্কিত'? তখন তিনি তার উত্তরে বলেছিলেন, 'Absolutely not'.

'The Human Genome' প্রজেক্ট শুরু হয়েছিল ১৯৯০ সালে এবং শেষ হয় ২০০৩ সালে। এই প্রজেক্টে মানুষের জীন নিয়ে ব্যাপক গবেষণা করা হয়। কিন্তু তারা তথাকথিত 'গে' জীনের কোন অস্তিত্বই খুঁজে পায় নি।

Dr. George Rice, Dr. Neil and Whitehead, Drs. William Byne, Bruce Parsons এই সব বিজ্ঞানীরা দেখিয়েছেন যে, মানুষ কখনোই জন্মগতভাবে সমকামী হতে পারে না। আর 'গে' জীন বলে কোন জীনের অস্তিত্বই নেই। ছাড়াও অনেক বিজ্ঞানীই হেমারের গবেষণাকে ভুল প্রমাণ করেছেন। যে গবেষনায় তিনি দাবি করেছিলেন যে, 'মানুষ জন্মগতভাবে সমকামী হতে পারে'।

Laumann এর গবেষণায় দেখা গেছে যে, সমকামিতা সৃষ্টিতে শহর পরিবেশ গ্রাম্য পরিবেশের তুলনায় বেশি ভুমিকা পালন করে। যদি সমকামিতা জেনেটিক-ই হত তাহলে তো সব স্থানে এর বিস্তার সমান হওয়ার কথা ছিল। সমকামিতা আবেগ, কৌতুহল, আকর্ষণ ও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার ফলেই উদ্ভূত হয়। আর সমকামী সম্পর্ক অস্থায়ী। যা সময়ের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়।

এখন বলেন তো ভাই, অভিজিৎ রায় কি ভুল তথ্য আর মিথ্যা তথ্য দেন নি?

.

ফারিসের কথা শুনে রফিক ভাইকে কিছুটা চিন্তিত মনে হচ্ছে। তিনি বেশ কিছুক্ষণ চুপ রইলেন। এরপর কফির কাপে চুমুক দিয়ে বললেন, "শুনলাম আমেরিকার মনোবিজ্ঞানীরা নাকি সমকামিতারে মানসিক রোগের চার্ট থেইকা বাদ দিছে? যদি দিয়াই থাকে তাইলে তোর কথা কেমনে মানি? হেরা নিশ্চয়ই তোর চাইতে বিজ্ঞান বেশি জানে"।

.

রফিক ভাইয়ের কথা শুনে ফারিস বেশ হাসিমুখে বললো, "ভাই আপনি জানেন কি? ১৯৭৩ সালের আগ পর্যন্ত আমেরিকায় সমকামিতা একটি মানসিক ব্যাধি হিসেবে গণ্য হত"।

- না। এইডা আমার জানা ছিল না।

- সমকামিতাকে মানসিক ব্যাধির চার্ট থেকে বাদ দেয়ার কারণ বিজ্ঞান নয়। অন্য কিছু।

- তোরা না! সব কামোই খালি সন্দেহ খুজস। আইচ্ছা ক দেহি হেই কারণডা কি?

- পলিটিকাল কারণ।

- পলিটিকাল?

- জি ভাই। পলিটিকাল। কেননা রাজনৈতিক দলগুলো সমকামী ও তাঁদের প্রতি সহনশীল ব্যাক্তিবর্গের ভোট পাওয়ার জন্য আমেরিকান মনোবিজ্ঞান সংস্থাকে চাপ প্রয়োগ করতে থাকে। তাঁদের চাপের মুখে সংস্থাটি নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়। তবে তারা এটা বলার দুঃসাহস দেখায় নি যে- বিজ্ঞান এটা মেনে নিয়েছে। ২০০০ সালের মে মাসে 'American Psychiatric Association' ঘোষণা করে, 'Currently, there is a renewed interest in searching for biological etiologies

for homosexuality. However, to date there are no replicated scientific studies supporting any specific biological etiology for homosexuality'.

.

রফিক ভাই এবার চেয়ারের সাথে হেলান দিয়ে বসলেন। এরপর বললেন, "তা না হয় বুঝলাম। কিন্তু ব্যক্তিস্বাধীনতা বইলা তো একটা কথা আছে। নাকি? সমকামীরা তো সমাজের কোন ক্ষতি করতাছে না। তাইলে তাগো পিছনে লাইগ্যা লাভ কি? তারা তাগোর কাম করুক। আমরা আমাগোর কামে টাইম দেই। হেইডাই আমাগোর লাইগ্যা ভালা"।

- রফিক ভাই, একটা প্রশ্ন করি?

- হ কর।

- কেউ যদি আপনার সামনে গাঁজা খায় আপনি কি তাকে বাঁধা দেবেন?

- বাঁধা দিমু না মানে? এইডা তুই কি কস?

- কেন বাঁধা দিবেন? গাঁজা খাওয়াটা কি তার ব্যক্তিস্বাধীনতা নয়?

- রাখ তোর স্বাধীনতা। গাঞ্জা খাইলে হের শরীলো কি পরিমাণ ক্ষতি অইব তুঁই জানস? তারে অবশ্যই এই কাম থেইকা ফিরাইয়্যা রাহন লাগবো।

- সমকামীদেরও বাঁধা না দিলে যে বিভিন্ন ধরণের রোগ তাঁদের শরীরে বাসা বাঁধবে। সেটার খেয়াল কে করবে ভাই?

- মানে? তুই কি কইবার চাস?

- ভাই। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে যে, এনাল সেক্স অন্য যে কোন সেক্সের তুলনায় অধিক ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে 'সেক্সুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজ' গুলো অতি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। আর সে জন্যেই আপনি লক্ষ্য করলে দেখবেন- সমকামীদের মধ্যে এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া সহ সব যৌনরোগ গুলোর সংক্রমণের হার বেশি। 'গে-বাওয়েল সিনড্রোম' নামক রোগ সমকামীদের মধ্যে অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হয়। তাই এর নাম রাখা হয়েছে 'গে-বাওয়েল সিনড্রোম'।

আচ্ছা রফিক ভাই বলেন তো; এইডস, সিফিলিস, গনোরিয়া রোগগুলোর মধ্যে কোনটা মানুষের জন্য অধিক ক্ষতিকারক?

- কোনডা আবার? এইডস। এইডা তো সবাই জানে। কারণ এইডার কোন অশুধ এহনো আবিষ্কার অয় নাই।

- আপনি শুনলে হয়তো অবাক হবেন, মরণঘাতী এইডস এর অন্যতম কারণ হচ্ছে সমকামিতা।

- এইডা কি তর কতা? নাকি বিজ্ঞানীদের?

- আমার কথা কেন হবে ভাই? এটা বৈজ্ঞানিক গবেষণায় প্রমাণিত। আমেরিকান 'সেন্ট্রাল ফর ডিজিজ কন্ট্রোল' (CDC) এবং বিশ্ব স্বাস্থ্যসংস্থার UNAIDS দেয়া স্টাডি এ কথা প্রমাণ করেছে। তারা দেখিয়েছে যে, সমকামিতা এইডস এর অত্যন্ত বড় রিস্ক ফ্যাক্টর। CDC'র দেয়া তথ্য থেকে আরও জানা যায়, ১৯৯৮ সালে আমারিকায় নতুন এইচআইভি সংক্রামিত ব্যক্তিদের মধ্যে ৫৪%-ই ছিল সমকামী। ২০০৯ সালের আগষ্ট মাসে CDC'র দেয়া অপর একটি রিপোর্ট বলছে, সাধারণ জনগোষ্ঠীর চেয়ে সমকামীদের মধ্যে এইডস সংক্রমণের হার প্রায় ৫০গুণ বেশি। এছাড়া UNAIDS'র ২০১৫ এর একটি রিপোর্টও ঠিক একই কথাই বলেছে।

.

ফারিসের কথা শেষ হলে আমি বললাম, "আচ্ছা ফারিস। সমকামিতা কি যৌনরোগ ছাড়া অন্যান্য রোগের জন্যেও দায়ী? যেমনঃ ক্যান্সার বা এই টাইপের কিছু?"।

.

আমার প্রশ্ন শুনে ফারিস বললো, "গুড পয়েন্ট। অনেক সুন্দর একটা প্রশ্ন করছিস। প্রশ্নটা না করলে হয়তো আমার এই পয়েন্টটা মনেই আসতো না। সমকামিতা শুধু যৌনরোগই ছড়ায় না বরং অন্যান্য রোগও ছড়ায়। ক্যান্সার হল তাদের মধ্যে অন্যতম। এনাল সেক্সের ফলে মলাশয়গাত্রে অতি সহজেই ক্ষতের সৃষ্টি হতে পারে। যেটা কিছুক্ষণ আগে তুই নিজেই বলেছিস। আর প্যাপিলোমা ভাইরাস খুব সহজেই এনাল রুট দিয়ে প্রবেশ করতে পারে। ক্ষতের মাধ্যমে এই ভাইরাস অতি দ্রুত রক্তের সাথে মিশে যায়। যার ফলে এনাল ক্যান্সার সমকামীদের মধ্যে অনেক বেশি দেখা যায়। 'Nursing Clinic of North

America’র দেয়া ২০০৪ সালের একটি রিপোর্ট থেকে দেখা যায়- এইডস আক্রান্ত ৯০% এবং এইডস ব্যতীত ৬৫% সমকামীদের দেহে ‘Human Papilloma Virus’ রয়েছে। যা ক্যান্সারের জন্য দায়ী। সমকামীদের এনাল ক্যান্সারের ঝুঁকি বিষকামীদের থেকে ১০গুণ বেশি। আর এইডস আক্রান্ত সমকামীদের এ ঝুঁকির পরিমাণ আরও বেশি। প্রায় ২০গুণ। হেপাটাইটি-এ সমকামীদের মধ্যে বেশি হয়। ১৯৯১ সালে নিউইয়র্কে এ রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। সে সময়টাতে ৭৮% হেপাটাইটিস-এ তে আক্রান্ত ব্যক্তি ছিল সমকামী। এছাড়া বিভিন্ন প্যারাসাইট্রিক ও ব্যাকটেরিয়াল ডিজিজ সমকামীদের মধ্যে বেশি হয়ে থাকে। সমকামিতার আরও বড় সমস্যা হল, সমকামীরা একটা সময়ে এসে বিকৃত মস্তিষ্কের অধিকারী হয়ে যায়”।

.

ফারিসের পাশে বসা রফিক ভাই এতক্ষণ চুপই ছিলেন। কিন্তু ফারিসের কথা শুনে যেন তার টনক নড়ে উঠল। ভ্রূ যুগল কুঁচকে গেল। তিনি বেশ মোটা গলায় বললেন, “বিকৃত মস্তিষ্ক হইয়্যা যায় মানে? কস কি আবোল-তাবোল? এইসব ইনফরমেশন তোরে কেডায় দিছে?”

.

“Coprofilia কাকে বলে জানেন ভাই?” ফারিসের পাল্টা প্রশ্ন রফিক ভাইয়ের কাছে।

.

রফিক ভাই মাথা নাড়লেন। এরপর আবার চেয়ারে হেলান দিয়ে কফির কাপের দিকে মনোযোগ দিলেন। রফিক ভাইয়ের উত্তরটা জানা ছিল না বিঁধায় উত্তরটা ফারিস-ই দিল।

.

ফারিস বললো, “Coprofilia হল এমন একটি যৌন আচরণ যেখানে ব্যক্তি মলমুত্রের সংস্পর্শে এসে আনন্দলাভ করে। ফিনল্যান্ডের একটি সার্ভে থেকে জানা যায় যে ১৭% সমকামী এই অস্বাভাবিক যৌনাচারে লিপ্ত। একবার চিন্তা করুন ভাই। সমকামীরা মোট জনসংখ্যার একটি ক্ষুদ্রতম অংশ। তারপরেও এই অস্বাভাবিক যৌনাচার তাদের মধ্যে ১৭%। আনুপাতিক বিচারে এই পারসেন্টেজটা তাহলে কত বিশাল?
সমকামীদের মধ্যে ধর্ষকামও বেশি দেখা যায়। ৩৭% সমকামী এই অস্বাভাবিক যৌনাচারে লিপ্ত। সমকামীরা যৌনতাড়িত বেশি হয়। একটা পর্যায়ে এসে সমকামীরা আত্ম বিধ্বংসী চিন্তা-চেতনার অধিকারী হয়ে যায়। ‘New York Times’র একটি প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, এইডস আক্রান্ত সমকামী ব্যক্তির তার সেক্সুয়াল পার্টনারের মধ্যে এইডস এর ভাইরাস ছড়িয়ে দেয়ার পরেও এ নিয়ে কোন অনুতাপ নেই। কোন অনুশোচনা নেই। এছড়া সমকামীরা উন্নাসিক প্রকৃতির হয়। সমাজ ও রাষ্ট্র নিয়ে তাদের কোন মাথাব্যথাই থাকে না। অপরদিকে Bagley ও Tremblay’র রিসার্চ থেকে দেখা যায়, সমকামী ব্যক্তিদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা বিষকামীদের চেয়ে ২ থেকে ১৩.৯ গুণ বেশি”।

.

ফারিসের কথা শেষ হলে রফিক ভাই বললেন, “তোর লাস্ট পয়েন্টটার সাথে আমি একমত হইতে পারলাম না ফারিস”।
- কেন ভাই?
- আত্মহত্যা কস আর মানসিক সমস্যাই কস। এইগুলার জন্য কইলাম সমকামীরা দায়ী না। এইডার জন্য দায়ী হোমোফোবিয়া। দায়ী সমাজের হুজুরগুলা। যারা উঠতে বইতে সমকামীদের বিরোধীতা করে। আর হোমোফোবিয়া ছড়াইবার কাম করে। সমকামীদের সামাজিকভাবে মাইন্যা নিলে এই সমস্যাডা মনে অয় আর থাকবো না।
- ভাইয়ের নিশ্চয় জানা আছে, নেদারল্যান্ড এ সমকামী বিয়ে আইনসিদ্ধ। মানে সেখানে সামাজিকভাবে সমকামিতাকে কোন অপরাধ বলে গণ্য করা হয় না।
- হ জানি। জানুম না কেন?
- ভাল। নেদারল্যান্ডের General Psychiatry’র দেয়া রিপোর্ট থেকে জানা যায়, তাদের দেশে সমকামীদের মধ্যে মানসিক সমস্যা অনেক বেশি। সমকামীরা অনেক বেশি মেন্টাল ডিপ্রেশনে ভুগে। অপরদিকে কানাডা একটি উদার রাষ্ট্র। যেখানে সমকামিতা সাধারণ বিষয়। কানাডায় বছরে যে কটি আত্মহত্যার ঘটনা ঘটে তার মধ্যে ৩০% আত্মহত্যাকারী সমকামী। একটু

লক্ষ্য করুন ভাই। এই সব রাষ্ট্রে হোমোফোবিয়া নেই। তারপরেও এখানে সমকামীদের মানসিক সমস্যা বিষমকামীদের থেকে বেশি। আর এ থেকেই বুঝা যায়, সমকামীদের মানসিক সমস্যার কারণ হোমোফোবিয়া নয়। হুজুররাও নয়। তারা নিজেরাই এর জন্যে দায়ী। তাদের যৌন-উশৃঙ্খল জীবন যাপনই এর জন্য দায়ী।

- আইচ্ছা ফারিস। সমকামিতা তো খৃষ্টের জন্মেরও অনেক আগে থেইকাই চইলা আইতাছে। তাইলে এইডারে কি স্বাভাবিক আচরণ হিসেবে ধরা যাইবো না?

- আপনি ধর্ষণকে কীভাবে দেখেন? এটাকে কি আপনি স্বাভাবিক আচরণ মনে করেন?

- পাগলে কয় কি? হা হা হা। ধর্ষণরে কি কোন সুস্থ মানুষ স্বাভাবিক আচরণ বইলা মাইনা নিব? হা হা হা।

- কেন নিবে না ভাই? আপনার আপত্তি কোথায়? ধর্ষণ তো খৃষ্টের জন্মের অনেক আগে থেকে চলে আসছে।

.

রফিক ভাই চুপচাপ। কফির কাপটিকে ঘুরাচ্ছেন। কপাল ভাঁজ করে কি যেন চিন্তা করছেন? হয়তো মনে মনে ভাবছেন, 'আমার শেষ টোপটাও ফারিসকে গেলানো গেল না'। রফিক ভাই এর নিস্তব্ধতা আমাকে সত্যিই আনন্দিত করছে। আসলে মিথ্যা যতই বিশাল হোক না কেন, তার স্থিতি নেই। মিথ্যা তো সমুদ্রের ফেনার মত। আর ফেনা তো বিলীন হয়েই যায়।

.

রফিক ভাই চুপ করে আছেন দেখে ফারিস বললো, "সমকামিতাকে সহজলভ্য করার জন্য আমেরিকাকে আজ চরম মূল্য দিতে হচ্ছে। আমেরিকা আজ যৌন বিকারগ্রস্থ রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। যৌনরোগ সেখানে মহামারি আকার ধারণ করেছে। আমেরিকার ৬৫ মিলিয়ন নাগরিক বিভিন্ন যৌনরোগে আক্রান্ত। যশুধুমাত্র HIV-তে আক্রান্ত হল ১.২ মিলিয়ন। এদের মধ্যে সমকামীদের পরিমাণ হল ৫৪%। আমেরিকার মোট জনসংখ্যার মাত্র ৩.৫% হল সমকামী। তুলনামূলক অনুপাতে সমকামীরা একেবারেই নগণ্য। কিন্তু সংক্রমণের দিক থেকে এরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। শুধুমাত্র ২০১২ সালে ১৩,৭১২ জন এইডস আক্রান্ত রোগীর মৃত্যু ঘটে। যাদের মধ্যে মেক্সিমাম-ই হল গে অথবা লেজবিয়ান। যৌনরোগুলোর ৫৭% সমকামীদের দ্বারা ছড়ায়।

রফিক ভাই। একটু ভাবুন। ভেবে দেখুন, সকামীতা কতটা ভয়ানক ব্যাধি। সমাজের জন্য কতটা ক্ষতিকর। ব্যক্তির জন্য কতটা ধ্বংসাত্মক। এর পরেও যদি আপনি সমকামিতার পক্ষ নেন, আর সমকামিতার বিরোধীতা করার জন্য হুজুরদের সমালোচনা করেন; তো আমার বলার কিছুই নেই ভাই। এস ইউর উইস ব্রাদার"।

.

ক্লাসের সময় হয়ে গিয়েছিল। তাই আমি ফারিসকে ইশারা দিলাম। ওঁ কথা থামিয়ে দিল। রফিক ভাইয়ের কাছ থেকে আমরা বিদায় নিয়ে ফ্যাকাল্টির দিকে যাত্রা করলাম। চলে যাওয়ার সময় আমি রফিক ভাইয়ের মুখের দিকে তাকাচ্ছিলাম। তাঁর মুখটা বেশ শুকনো দেখাচ্ছিল। পরাজিত সৈনিকের মত মনে হচ্ছিল। আর হবেই না কেন? তিনি আজও ফারিসের কাছে হেরেছেন। মারাত্মকভাবে হেরেছেন। আসলে মিথ্যা কখনোই সত্যের সামনে জয়ী হতে পারে না। কেননা মিথ্যার সে ক্ষমতা নেই।

.

ক্লাসে পৌঁছানোর পর আমি ফারিসকে বললাম, 'আজ যা দেখালি না দোস্ত। রফিক ভাইকে একেবারে ভোঁতা করে ছেঁড়ে দিলি'।

.

ফারিস কিছু বললো না। কেবল ওঁর চিরচেনা হাঁসিটা উপহার দিল। বেশ নজরকাড়া হাসি। যেন মুক্তো ঝরছে।

তথ্যসূত্রঃ

1) S. S. Witkin and J. Sonnabend, "Immune Responses to Spermatozoa in Homosexual Men," Fertility and Sterility, 39(3): 337-342, pp. 340-341 (1983).

2) New Evidence of a gay gene' by AnastasiaTouefexis,Time ,November 13,1995,vol. 146,issue 20,p.95

3) http://www.theatlantic.com/.../no-scientists-have-not.../410059/
4) https://concernedwomen.org/images/content/bornorbred.pdf
5) George Rice, et al., "Male Homosexuality: Absence of Linkage to Microsatellite Markers at Xq28,"Science, Vol. 284, p. 667.
6) William Byne and Bruce Parsons, "Human Sexual Orientation: The Biologic Theories Reappraised," Archives of General Psychiatry, Vol. 50, March 1993: 228-239
7) Laumann EO, Gagnon JH, Michael RT, Michaels S. 1994. The Social Organization of Sexuality. Chicago: University of Chicago Press
8) American Psychiatric Association . Fact sheet - "Gay,Lesbian and Bisexual Issues," , May – 2000
9) http://www.evolvedworld.com/.../it.../169-back-to-school-sex-101
10) http://www.yourtango.com/experts/ava-cadell-ph-d—ed-d/3-reasons-men-cheat
11) Henry Kazal, et al., "The gay bowel syndrome: Clinicopathologic correlation in 260 cases," Annals of Clinical and Laboratory Science, 6(2): 184-192 (1976).
12) Hepatitis A among Homosexual Men—United States, Canada, and Australia," Morbidity and Mortality Weekly Report, CDC, 41(09): 155, 161-164 (March 06, 1992).
13) Glen E. Hastings and Richard Weber, "Use of the term 'Gay Bowel Syndrome,'" reply to a letter to the editor, American Family Physician, 49(3): 582 (1994).
14) Paraphilias," Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision, p. 576, Washington: American Psychiatric Association, 2000; Karla Jay and Allen Young, The Gay Report: Lesbians and Gay Men Speak Out About Sexual Experiences and Lifestyles, pp. 554-555, New York: Summit Books (1979).
15) http://www.cdc.gov/hiv/topics/msm/index.htm
16) http://www.springerlink.com/content/jx13231641717w48/
17) http://www.cdc.gov/hiv/resources/qa/qa22.htm
18) http://www.unaids.org/.../aboutuna.../unaidsstrategygoalsby2015/
19) http://www.cdc.gov/hiv/topics/surveillance/basic.htm...
20) Mads Melbye, Charles Rabkin, et al., "Changing patterns of anal cancer incidence in the United States, 1940-1989," American Journal of Epidemiology, 139: 772-780, p. 779, Table 2 (1994).
21) N. Kenneth Sandnabba, Pekka Santtila, Niklas Nordling (August 1999). "Sexual Behavior and Social Adaptation Among Sadomasochistically-Oriented Males". Journal of Sex Research.
22) Theo Sandfort, Ron de Graaf, et al., "Same-sex Sexual Behavior and Psychiatric Disorders," Archives of General Psychiatry, 58(1): 85-91, p. 89 and Table 2 (January 2001).
23) http://www.youth-suicide.com/gay-bisexual/gbsuicide1.htm
24) Edward O. Laumann, John H. Gagnon, et al., The social organization of sexuality: Sexual practices in the United States, p. 293, Chicago: University of Chicago Press, 1994
25) United States". HIV/AIDS Knowledge Base. University of California, San Francisco. Retrieved November 25, 2011.
26) "Estimating HIV Prevalence and Risk Behaviors of Transgender Persons in the United States: A Systematic Review". AIDS Behav. 12 (1): 1–17. Jan 2008. doi:10.1007/s10461-007-9299-3. PMID 17694429.
27) Centers for Disease Control and Prevention, (CDC) (June 3, 2011). "HIV surveillance—United States, 1981–2008". MMWR. Morbidity and mortality weekly report. 60 (21): 689–93. PMID 21637182.
28) http://www2.law.ucla.edu/.../How-many-people-are-LGBT-Final.p...

29) https://simple.m.wikipedia.org/wiki/Coprophilia
30) https://en.m.wikipedia.org/wiki/HIV/AIDS
31) https://en.m.wikipedia.org/wiki/Sadism

১৩৭

পৃথিবীর ২৩.৫° কোণে হেলে থাকাঃ রোজাদারদের উপর আল্লাহর ন্যায়বিচারের দৃষ্টান্ত

-আলী মোস্তাফা



প্রতি বছর রমযান মাস আসলেই অনেকের মনে একটি প্রশ্ন জাগে যে, মুসলিমদের কেন আরবি হিজরী সাল অনুযায়ী রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে? একইভাবে আরও একটি প্রশ্ন ওঠে যে, প্রতি বছরই রমজান মাসে কোনো কোনো জায়গার মানুষ মাত্র ১২-১৩ ঘণ্টা উপবাস, আবার কোনো কোনো জায়াগার মানুষকে ২০-২২ ঘণ্টা উপবাস থাকতে হয়। মনে হতে পারে, এটা কি আল্লাহ তায়ালার তাঁর বান্দাদের উপর অবিচার নয়?

.

এখানে আমি আমার সীমিত জ্ঞানের সাহায্যে ব্যাপারটি ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। আশা করি, জানাতে পারবো আল্লাহর অনুগ্রহ কতটা গভীর। যারা বুঝতে পারবেন, আমার মনে হয়, তারা আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের ভাষা হারিয়ে ফেলবেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিষয়টি থেকেও আল্লাহর অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। একজন আল্লাহ্ না থাকলে এটা কখনওই এত পরিকল্পিত হত না।

.

প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বলা যায় যে, যদি সৌরবছরের কোন নির্দিষ্ট মাসে রোযা রাখার নির্দেশ দেওয়া হত, তাহলে যে এলাকায় ওই সময় গ্রীষ্মকাল, সেখানকার লোকেদেরকে চিরকাল গ্রীষ্মকালেই রোযা রাখতে হত। আবার যে এলাকায় ওই মাসে শীতকাল, সেখানকার লোকেরা চিরকাল শীতকালেই রোযা রাখতেন।

হিজরি সাল অনুযায়ী রোযা পালন করার সুবিধা হল, এটি সৌরবছর থেকে ১১ দিন কম। যার ফলে রমযান মাস প্রতি বছর সৌরবছর (অর্থাৎ খ্রিস্টাব্দ) থেকে ১১ দিন করে এগিয়ে আসে। ফলে একই এলাকায় বিভিন্ন ঋতুতে রমজান মাস হয় এবং একই এলাকার মানুষ বিভিন্ন ঋতুতে রোযা পালন করার সুযোগ পান।

এ বছর মে মাসের শেষ সপ্তাহে রমযান আরম্ভ হতে চলেছে। পরের বছর রমযান মাস ১১ দিন এগিয়ে আসবে। হিসেব করলে দেখা যাবে, ঠিক ৩৩ বছর পর আবার এই মে মাসের শেষ সপ্তাহেই রমজান শুরু হবে। অর্থাৎ, কোন ব্যক্তি যদি একনাগারে ৩৩ বছর রমজান মাসে রোযা রাখে, তাহলে সে সমস্ত ঋতুতে রোযা করার সুযোগ পাবে। আবার মানুষের গড় আয়ু প্রায় ৭৫ বছর। তাই ধরা যেতে পারে একজন মানুষ মোটামুটি ৬৫ বছর রোযা করে (জীবনের প্রথম ১০ বছর বাদ দেওয়া হল)। আবার যেহেতু ৩৩ বছর অন্তর একই ঋতুতে রমযান মাস আসে, তাই কোন ব্যক্তি (পরপর ৬৬ বছরে) ৬৬টি রমযানে রোযা করলে ওই ব্যক্তি সারাজীবনে (একই জায়গায় থাকলে) একই ঋতুতে ২ বার রোযা করার সুযোগ পাবেন। অর্থাৎ, গ্রীষ্মকালে ২ বার, শীতকালে ২ বার, বর্ষাকালে ২ বার রমযান পাবেন। সুতরাং, এটা স্পষ্ট যে, চান্দ্রবছর অনুযায়ী রোযা রাখার নির্দেশের ফলে মানুষের যে সুবিধা হয়েছে ও সারা বিশ্বের মানুষের উপর যে সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে, সৌরবছর অনুযায়ী রোযা রাখার নির্দেশ দিলে তা কোনভাবেই সম্ভব হত না।

.

দ্বিতীয় আরেকটি যে প্রশ্ন ওঠে, তা হল, এবছর উত্তর ভারত, বাংলাদেশসহ কর্কটক্রান্তি রেখার কাছে অবস্থিত এলাকার লোকেরা মোটামুটি ১৫ ঘণ্টা উপবাস থাকেন। সেক্ষেত্রে, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ডেনমার্ক, নরওয়ের মত দেশের মানুষরা প্রায় ২০-২২ ঘণ্টা উপবাস থাকতে হয়! স্বাভাবিকভাবেই অনেকের মনে প্রশ্ন উঠছে যে, এটা কি আল্লাহতায়ালার তাঁর বান্দাদের উপর অবিচার নয়?

কিন্তু, হিসেব করলে দেখা যাবে, এটিও আল্লাহতায়ালার অবিচার নয়। বরং ন্যায় বিচারের আরেকটি দৃষ্টান্ত। নীচের আলোচনায় দেখা যাবে, প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর সবাই গড় হিসেবে একই পরিমাণ সময় উপবাস থাকে।

বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন, পৃথিবী সাড়ে তেইশ ডিগ্রি (23½°) হেলে সূর্যকে প্রদক্ষিন করে। আবার পৃথিবীর কক্ষপথ সম্পূর্ণ গোলাকার নয়, অনেকটা ডিম্বাকৃতি। যার ফলে ঋতু পরিবর্তন হয়। আবার পৃথিবী গোলাকৃতি হওয়ায় ও 23½° হেলে থাকায় পৃথিবীর সব জায়গায় দিনরাত্রির পরিমাণ সমান নয়, বিভিন্ন অঞ্চলের উষ্ণতাও আলাদা, এমনকি ঋতু পরিবর্তনও একই সময়ে হয় না। উত্তর গোলার্ধে যখন শীতকাল, দক্ষিণ গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। আবার দক্ষিণ গোলার্ধে যখন শীতকাল, উত্তর গোলার্ধে তখন গ্রীষ্মকাল। ২১শে জুন উত্তর গোলার্ধের সর্বত্র দিন সবচেয়ে বড় হয়। অন্যদিকে ওই দিনে দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সর্বত্র ছোট হয়। আবার ২২শে ডিসেম্বর দক্ষিণ গোলার্ধে দিন সবচেয়ে বড় হয়, কিন্তু উত্তর গোলার্ধে দিন সবচেয়ে ছোট হয়। কিন্তু হিসেব করলে দেখা যাবে, সারা বছরের গড় হিসেবে পৃথিবীর সর্বত্র দিনরাত্রির পরিমাণ প্রায় সমান।

নীচে কলকাতা, লন্ডন, আফ্রিকার কাম্পালা ও দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনের দিনের সময়ের তথা উপবাস থাকা সময়ের হিসেব দেওয়া হল।

.

কলকাতাঃ কলকাতার অবস্থান ২২°৩৪´উত্তর, ৮৮°২২´পূর্ব। কলকাতায় ২১শে জুন সূর্যোদয় শুরু হয় ৩টা ২৫ মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হয় ৬টা ২৭ মিনিটে। অর্থাৎ দিনের সময় ১৫ ঘণ্টা ২ মিনিট। আবার ২২শে ডিসেম্বর সূর্যোদয় শুরু হয় ৪টা ৫২ মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হয় ৫টা ১মিনিটে। অর্থাৎ, দিনের পরিমাণ ১২ ঘণ্টা ৯ মিনিট। সুতরাং সারাবছরের দিনের গড় সময় ১৩ ঘণ্টা ৩৫ মিনিট।

.

ঢাকাঃ ঢাকার অবস্থান ২৩°৪২´ উত্তর, ৯০°২২´পূর্ব। ঢাকায় ২১শে জুন সূর্যোদয় শুরু হয় ৩টা ৪৫ মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হয় ৬টা ৪৮ মিনিটে। অর্থাৎ দিনের সময় ১৫ ঘণ্টা ৩ মিনিট। আবার ২২শে ডিসেম্বর সূর্যোদয় শুরু হয় ৫টা ১৭ মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হয় ৫টা ১৬ মিনিটে। অর্থাৎ দিনের সময় প্রায় ১২ ঘণ্টা। অর্থাৎ, সারাবছরের দিনের গড় সময়ের পরিমাণ প্রায় ১৩ ঘণ্টা ৩১ মিনিট।

.

লন্ডনঃ লন্ডনের অবস্থান ৫১°৩০´উত্তর, ০°৭´৩৯” পশ্চিম। লন্ডনে ২১শে জুন সূর্যোদয় শুরু হয় ২টা ৪৪ মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হয় ৯টা ২৫ মিনিটে। অর্থাৎ দিনের পরিমাণ ১৮ ঘণ্টা ৪১ মিনিট। আবার ২২শে ডিসেম্বর সূর্যোদয় শুরু হয় ৬টা ২৩ মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হয় ৩টা ৫৭ মিনিটে। অর্থাৎ দিনের পরিমাণ মাত্র ৯ ঘণ্টা ৩৪ মিনিট। সারাবছরের দিনের গড় সময় ১৪ ঘণ্টা ৭ মিনিট।

.

কাম্পালাঃ আফ্রিকার উগান্ডার রাজধানী কাম্পালা। কাম্পালা নিরক্ষরেখার খুব কাছে অবস্থিত। এর অবস্থান ০°১৯´উত্তর, ৩৩°৩৫ পূর্ব। নিরক্ষরেখার কাছে অবস্থিত হওয়ায় কাম্পালায় সারা বছর প্রায় একই সময়ে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়। এখানে ২১শে জুন সূর্যোদয় শুরু হয় ৫টা ৩১ মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হয় ৬টা ৫৯ মিনিটে। অর্থাৎ দিনের´গড় সময় ১৩ ঘণ্টা ২৮ মিনিট। ২২শে ডিসেম্বর সূর্যোদয় শুরু হয় ৫টা ২৯ মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হয় ৬টা ৫৪ মিনিটে। অর্থাৎ দিনের সময় ১৩ ঘণ্টা ২৫ মিনিট। সুতরাং সারাবছরের দিনের গড় সময়ের পরিমাণ ১৩ ঘণ্টা ২৬ মিনিট (প্রায়)।

.

কেপটাউনঃ কেপটাউন দক্ষিণ আফ্রিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। এর অবস্থান ৩৩°৫৫´ দক্ষিণ, ১৮°২৫´পূর্ব। এখানে ২১শে জুন সূর্যোদয় শুরু হয় ৬টা ২১ মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হয় ৫টা ৪৮মিনিটে। অর্থাৎ দিনের গড় সময় ১১ ঘণ্টা ২৭ মিনিট। ২২শে ডিসেম্বর সূর্যোদয় শুরু হয় ৩টা ৪৫মিনিটে এবং সূর্যাস্ত হয় ৪টায়। অর্থাৎ দিনের সময়। অর্থাৎ সারা বছরের দিনের গড় সময় ১৩ ঘণ্টা ৫০ মিনিট।

.

উপরিউক্ত হিসেবগুলি থেকে দেখা যাচ্ছে, বিশ্বের প্রায় সব জায়গায় সারাবছরের দিনের গড় সময় প্রায় সমান। সব জায়গায় দিনের গড় পরিয়ামাণ সাড়ে তের ঘণ্টা থেকে ১৪ ঘণ্টার মধ্যে। সবা জায়গায় উপবাস থাকার গড় সময় সাড়ে তের থেকে ১৪ ঘন্টা। অর্থাৎ পৃথিবীর যে কোন জায়গার মানুষ যদি (প্রথম ১০ বছর বাদ দিয়েও) সারাজীবন রমজান মাসের ৩০ দিন রোযা রাখে, তাহলে সারাবিশ্বের সব মানুষই প্রায় সমান পরিমাণ সময় রোযা থাকে।

.

তাছাড়া, যেসব এলাকার মানুষরা (যেমন আইসল্যান্ড, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, উত্তর রাশিয়া) এবছর ২১ ঘণ্টা উপবাস থাকছেন, তাঁরা ৩৩ বছর পর মাত্র ৮ ঘণ্টা উপবাস থাকবেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, নিরক্ষীয় অঞ্চলে দিনের গড় সময় সাড়ে তের ঘণ্টা। কিন্তু ব্রিটেন, জাপান, কানাডার মত দেশগুলিতে এই গড় একটু বেশী। প্রায় ১৪ ঘণ্টা।

.

তৃতীয় আরেকটি প্রশ্ন অনেকেই করেন যে, আফ্রিকার (এবং ভারত-বাংলাদেশেরও) অনেকেই প্রচণ্ড গরমে অনেক কষ্ট করে রোযা রাখেন। এমন কি সাহারা মরুভূমির কোন দেশ থেকে এব্যাপারে আরবের শায়খদের কাছে মাসয়ালা জানতে চেয়ে প্রশ্ন এসেছে যে, এই অত্যধিক গরমেও তাদের উপর রোযা থাকা ফরয নাকি কোন ছাড় আছে!! শায়খরা এর জবাবে বলেছেন, রোযা প্রত্যেকের উপর ফরয। কোন ছাড় নেই। তবে মৃত্যুর আশংকা থাকলে প্রাণ বাঁচাতে যতটুকু দরকার, ততটুক জল পান করা যেতে পারে।

বাস্তবিক পক্ষেই নিরক্ষীয় অঞ্চলগুলিতে সারাবছর অত্যন্ত গরম থাকে। ০° থেকে ২৩.৫° উত্তর ও দক্ষিনে গড় তাপমাত্রা থাকে ২৭° সেলসিয়াসেরও বেশী, এমনকি আফ্রিকার কোন কোন এলাকায় ৫০° সেলসিয়াস পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠে যায়।। ২৩.৫° উত্তর/দক্ষিন অক্ষাংশ থেকে ৬৬.৫° উত্তর/দক্ষিন অক্ষাংশে গড় তাপমাত্রা থাকে ০°-২৭° সেলসিয়াস। ৬৬.৫° উত্তর/দক্ষিন অক্ষাংশ থেকে ৯০° উত্তর/দক্ষিন অক্ষাংশে তাপমাত্রা ০° সেলসিয়াসেরও নীচে থাকে।

.

স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে, ৬৬.৫° উত্তর/দক্ষিন অক্ষাংশের কাছে অবস্থিত এলাকার মানুষেরা মনোরম আবহাওয়ায় রোযা রাখতে পারেন, যার ফলে তাদের কষ্ট অনেক কম হয়। কিন্তু বাস্তবেই কি তাই? গ্রীষ্মকালে এই এলাকার মানুষদের প্রায় ২০ ঘণ্টা রোযা থাকতে হয়, যা অত্যন্ত দীর্ঘ সময়। কিন্তু নিরক্ষরেখার নিকটবর্তী মানুষদের এতো দীর্ঘ সময় রোযা থাকতে হয় না।

অতএব, স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে যে, আল্লাহতায়ালা কারো উপরই কোনোরকম অবিচার করেন নি। নিরক্ষীয় এলাকার লোকেরা প্রতিবছর অত্যধিক গরমে উপবাস থাকেন, কিন্তু প্রতিবছর তাদের প্রায় একই পরিমাণ সময় উপবাস থাকতে হয়। অন্যদিকে সুমেরু কিংবা কুমেরু এলাকার লোকেরা ঠাণ্ডা আবহাওয়ায় রোযা থাকলেও কোন কোন বছর তাদের অনেক দীর্ঘ সময় (২০-২২ ঘণ্টা) উপবাস থাকতে হয়, যা অত্যন্ত কষ্টকর। প্রকৃতপক্ষে সময় ও তাপমাত্রার এই সুষম বণ্টনের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার তাঁর বান্দাদের উপর অনুগ্রহ ও ন্যায়বিচারই ফুটে ওঠে। কে জানে, হয়ত আল্লাহতায়ালা মানুষের রোযা রাখার সুবিধার্থেই পরিকল্পনা করেই পৃথিবীকে ২৩.৫° কোণে হেলে পরিচালিত করছেন! যেমন, আল্লাহ্ বলেন-

.

"আল্লাহ্ উত্তম পরিকল্পনাকারী।" (সূরা আনফালঃ৩০)
"আল্লাহ্ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন?" (সূরা ত্বীনঃ৪)
"অতএব তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে?" (সূরা আর-রহমান)

.

পৃথিবীর ২৩.৫° হেলে থাকার আর কোন উপকারিতা দেখতে পাওয়া যায় না। আর পৃথিবী যদি হেলে না থাকতো, তাহলে সময়ের এরকম সুষম বণ্টন সম্ভব হত না। এর ফলে চিরকাল রমযান মাসে মেরু অঞ্চলের বাসিন্দারা কম সময় উপবাস থাকতো, অন্যদিকে নিরক্ষীয় অঞ্চলের বাসিন্দাদের অত্যধিক গরমের মধ্যেও অনেক বেশী সময় উপবাস থাকতে হত। এজন্যই হয়ত আল্লাহতায়ালা জ্ঞানীদের উদ্দ্যেশ্যে বলেছেন,
"আল্লাহর সৃষ্টিজগতে জ্ঞানবানদের জন্য নিদর্শন আছে।" (সূরা আল-বাক্বারাঃ আয়াত-১৬৪)
"আমি রাতকে ও দিনকে দুটো নিদর্শন করেছি।" (সূরা বনী ইসরাইলঃ আয়াত-১২)
"নিশ্চয় নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলে মুমিনদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে। দিবারাত্রির পরিবর্তনে...বুদ্ধিমানদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে"। (সূরা আল-জাসিয়াঃ আয়াত ৩-৫)
সুতরাং, এ থেকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত। আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ করা উচিত। কিন্তু এরপরেও কিছু ব্যক্তি আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করবে। রোজাদারদের উপর আল্লাহর এই ন্যায়বিচারকে অস্বীকার করবে। অনেকেই পৃথিবীর দিন-রাত্রি নিয়ে চিন্তা করবে এবং সত্যের কাছে পৌঁছাবে কিন্তু নিজেরদের গোঁড়ামির কারণে তা সত্ত্বেও আল্লাহ্কে স্বীকার করবে না, আল্লাহর নিদর্শনাবলীকে স্বীকার করবে না। আল্লাহ্ সবাইকে সঠিক পথে পরিচালিত করুন।

.

এখানে আরেকটি প্রাসঙ্গিক ব্যাপারে সংক্ষেপে আলোচনা করা হচ্ছে। তা হল, যেসব এলাকায় স্বাভাবিক নিয়মে সূর্য উদয় হয় না বা অস্ত যায় না, সেখানকার মানুষ কি করবে?
সুমেরু বৃত্তরেখার উত্তরে অবস্থিত নরওয়ে, ফিনল্যান্ড, সুইডেনের মতো দেশগুলির দক্ষিণ অংশে স্বাভাবিক নিয়মে সূর্যোদয়-সূর্যাস্ত হলেও উত্তর অংশের এলাকাগুলিতে গ্রীষ্মকালে সূর্য অনেকদিন অস্ত যায় না, তখন ওইসব এলাকায় দীর্ঘদিন দিনের মতো আলো ঝলমল করে; আবার শীতকালে সূর্য অনেকদিন ওঠে না, তখন ওই এলাকায় দীর্ঘদিন অন্ধকার থাকে। এরকমই একটি এলাকা হল ফিনল্যান্ডের উতসিয়োকি, যেখানে গত ১৫ই মে ১টা ৩২ মিনিটে সূর্যোদয় হয় এবং সূর্যাস্ত হবে আগামি ২৯শে জুলাই,১২টা ৪২ মিনিটে। অর্থাৎ রমযান মাসে সূর্য আর অস্ত যাবে না! যার কারণে এইসব এলাকার মুসলিমরা সেহরি ও ইফতারের সময়ের বিভিন্ন নিয়ম মেনে চলেন। যেমন, কেউ কেউ মক্কার সময় অনুযায়ী রোযা রাখেন। এদের যুক্তি মক্কা হল মুসলিমদের প্রধান কেন্দ্র। আবার কেউ কেউ নিকটবর্তী যেসব এলাকায় স্বাভাবিক নিয়মে সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত হয়, সেখানকার সময় অনুযায়ী রোযা

রাখেন। আবার কেউ কেউ রাজধানী শহরগুলির সময় মেনে চলেন। আবার ফিনল্যান্ডের উত্তরের কিছু সংখ্যক মানুষ তুরস্কের সময় অনুযায়ী রোযা রাখেন। এদের যুক্তি তুরস্ক হল এইসব এলাকার সবথেকে কাছের মুসলিম দেশ। প্রকৃতপক্ষে, প্রত্যেক গোষ্ঠীরই নিজেদের নিয়মের সপক্ষে উপযুক্ত যুক্তি আছে। তবে এব্যাপারে প্রায় সবাই একমত যে, ইসলাম একটি সহজ-সরল জীবনব্যবস্থা। এতে মানুষের জন্য কঠিন কোন নিয়ম রাখা হয় নি। আর রোযার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র দীর্ঘ সময় কষ্ট করে উপবাস থাকা নয়। তাই সবার মতে, এইসব এলাকায় রোযা রাখার সময় ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভর করে। উল্লেখ্য এইসব উপরিউক্ত দেশগুলির উত্তর অংশে কয়েক দশক আগে মুসলিম সংখ্যা না থাকলেও বর্তমানে অনেকেই এখানকার বিভিন্ন খনিতে কাজ করেন। এছাড়া ইরাক, আফগানিস্তান, সিরিয়া, লিবিয়া ইত্যাদি দেশের অনেক শরণার্থী এই এলাকাগুলিতে আশ্রয় নিয়েছে।

.

এ তো গেল উত্তর মেরুর কথা। দক্ষিণ মেরুতে কি হবে? দক্ষিণ মেরুর অ্যান্টার্কটিকা হল এমন একটি মহাদেশ যার প্রায় পুরো এলাকাতেই ৬ মাস দিন ও ৬ মাস রাত। যার কারণে এখানেও স্বাভাবিক নিয়মে রোযা রাখা অসম্ভব। উল্লেখ্য, এখানে কোন স্থায়ী বাসিন্দা নেই। কিন্তু গবেষণার কারণে অনেকে অবস্থান করেন। অনেকের মতে এখানে যারা থাকেন তাদের নিকটবর্তী অস্ট্রেলিয়া কিংবা নিউজিল্যান্ডের সময় মেনে রোযা থাকা উচিত। তবে ১৯৮৯ সালে সৌদি আরবের গবেষক ডাঃ ইব্রাহিম এ আলম ও আরও কয়েকজন অ্যান্টার্কটিকায় গেলে তাঁরা মক্কার সময় অনুযায়ী নামায পড়েন। সম্ভবত অ্যান্টার্কটিকাতে তাঁরাই প্রথম নামায পড়েন। আমার মতে, এখানে মক্কার সময়ানুযায়ী নামায ও রোযা করাই সুবিধাজনক। কেননা নিউজিল্যান্ড কিংবা অস্ট্রেলিয়ায় শীত ও গ্রীষ্মের সময়ের পার্থক্য অনেক। নিউজিল্যান্ডের ওয়েলিংটনে শীত ও গ্রীষ্মের সময়ের পার্থক্য প্রায় সাড়ে ছয় ঘণ্টা। যার ফলে কোন ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে অ্যান্টার্কটিকায় গেলে তাঁকে অনেক দীর্ঘসময় উপবাস থাকতে হবে কিন্তু কোন ব্যক্তি শীতকালে এখানে গেলে তাঁকে অনেক কম সময় উপবাস থাকতে হবে। অন্যদিকে মক্কার সময় অনুযায়ী রোযা থাকলে প্রায় সারাবছরই একই পরিমাণ সময় উপবাস থাকতে হবে। কেননা মক্কায় গ্রীষ্মকালে (২১ শে জুন) দিন ১৪ ঘণ্টা ৫৫ মিনিট ও শীতকালে (২২শে ডিসেম্বর) দিন ১২ ঘণ্টা ১৩ মিনিট।

.

তবে, উত্তর মেরু হোক কিংবা দক্ষিণ মেরু হোক, এইসব এলাকার মানুষরা যদি সারা জীবন বিশ্বের "যে কোন একটি নির্দিষ্ট জায়গা"র সময় অনুযায়ী রোযা রাখেন, অর্থাৎ অস্ট্রেলিয়া হোক কিংবা মক্কা কিংবা তুরস্কের সময় অনুযায়ী রোযা রাখেন, তাহলে এখানেও দেখা যাবে তারা গড় সময় (সাড়ে তের ঘণ্টা থেকে ১৪ ঘণ্টা) অনুযায়ীই রোযা রাখেন। এব্যাপারেও দেখা যাচ্ছে, সৃষ্টির সেরা মানবাজাতীর উপর আল্লাহ্ কোনরকম অবিচার করেননি। তাই বিশ্বের প্রতিটি জায়গার সব মানুষ সারাজীবন রোযা রাখলে আসলে তাঁরা প্রত্যেকেই সমান পরিমাণ সময় (গড়ে সাড়ে তের ঘণ্টা থেকে ১৪ ঘণ্টা) রোযা বা উপবাস থাকেন। তাই গরম দেশের মানুষ যারা অত্যধিক গরমে রোযা রাখছেন তাদের ভাবা উচিত উত্তর কিংবা দক্ষিণ মেরুর কাছে অবস্থিত দেশগুলির মানুষের কথা, যারা দীর্ঘ ২০-২২ ঘণ্টা রোযা রাখেন। আবার যারা উত্তর কিংবা দক্ষিণ মেরুর কাছে বসবাস করছেন, তাদের ভাবা উচিত নিরক্ষীয় দেশগুলির মানুষদের কথা, যারা অত্যধিক গরমে রোযা রাখেন। পরিশেষে একথাই বলবো যে, এখানে সময় ও তাপমাত্রার যে সুষম বণ্টনের কথা আলোচনা হল, তার জন্য প্রত্যেক মুমিনেরই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

তথ্যসূত্রঃ

সুর্যোদয়, সূর্যাস্তের সময়সূচী নেওয়া হয়েছে, www.sunrise-and-sunset.com, www.islamicacademy.org, www.islamicfinder.com থেকে। অন্যান্য তথ্য www.wikipedia.com ও অন্যান্য ওয়েবসাইট থেকে।

১৩৮

কুরআনে কি আসলেই খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ (Trinity) নিয়ে ভুল তথ্য আছে?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

কুরআনের সঠিকত্ব বা accuracy নিয়ে প্রশ্ন তুলে খ্রিষ্টান মিশনারী ও নাস্তিক-মুক্তমনারা যেসব অভিযোগ উত্থাপন করে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে কুরআনে ত্রিত্ববাদ (trinity) সম্পর্কিত তথ্য।ইসলাম বিরোধী এসব প্রচারকের দাবি হচ্ছেঃ কুরআনের লেখক খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে জানতেন না(!!), কুরআনে খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদকে নাকি ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে (নাউযুবিল্লাহ)। তারা বলে-- কুরআনে নাকি বলা হয়েছে খ্রিষ্ট ধর্মের ত্রিত্ববাদ ঈশ্বর, যিশু{ঈসা(আ)} ও মরিয়মকে নিয়ে গঠিত।অথচ খ্রিষ্টানরা এভাবে ত্রিত্বে বিশ্বাস করে না; তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ত্রিত্ব (trinity) ঈশ্বর, যিশু ও পবিত্র আত্মাকে নিয়ে গঠিত।

.

এই দাবির স্বপক্ষে তারা কুরআনের সুরা মায়িদাহর ১১৬নং আয়াত দেখায়।

.

✔✓ " যখন আল্লাহ বললেনঃ হে ঈসা ইবনে মরিয়ম! তুমি কি লোকদেরকে বলে দিয়েছিলে যে, আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাতাকে উপাস্য সাব্যস্ত কর? ঈসা বলবেন; আপনি পবিত্র! আমার জন্যে শোভা পায় না যে, আমি এমন কথা বলি, যা বলার কোন অধিকার আমার নেই। যদি আমি বলে থাকি, তবে আপনি অবশ্যই পরিজ্ঞাত; আপনি তো আমার মনের কথা ও জানেন এবং আমি জানি না যা আপনার মনে আছে। নিশ্চয় আপনিই অদৃশ্য বিষয়ে জ্ঞাত।"
(কুরআন, মায়িদাহ ৫:১১৬)

.

লক্ষ্য করুন, এ আয়াতে ঘুণাক্ষরেও ত্রিত্ব/তিন এরকম কোন কথা নেই। এখানে শুধুমাত্র খ্রিষ্টানদের দ্বারা ঈসা(আ) ও মরিয়ম(আ) এর উপাসনা করার কথা বলা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট আয়াত চেক করতেই খ্রিষ্টানদের ভ্রান্ত দাবির অসারতা পরিলক্ষিত হচ্ছে।

.

এখন প্রশ্ন আসতে পারেঃ খ্রিষ্টানদের ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে কুরআন কী বলে?
পবিত্র কুরআনে মোট ২টি আয়াত পাওয়া যায় যাতে ত্রিত্ববাদের কথা আলোচিত হয়েছে।চলুন দেখি সে আয়াতগুলোতে প্রকৃতপক্ষে কী বলা হয়েছে।

.

✔✓ "নিশ্চয় তারা কাফের, যারা বলেঃ আল্লাহ #তিনের_এক; অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোন উপাস্য নেই। যদি তারা স্বীয় উক্তি থেকে নিবৃত্ত না হয়, তবে তাদের মধ্যে যারা কুফরে অটল থাকবে, তাদের উপর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি পতিত হবে।"
(কুরআন, মায়িদাহ ৫:৭৩)

.

✔✓ "হে আহলে-কিতাবগণ! তোমরা দ্বীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করো না এবং আল্লাহর শানে নিতান্ত সঙ্গত বিষয় ছাড়া কোন কথা বলো না। নিঃসন্দেহে মরিয়ম পুত্র মসীহ ঈসা আল্লাহর রসূল এবং তাঁর বাণী যা তিনি প্রেরণ করেছেন মরিয়মের নিকট এবং রূহ-তাঁরই কাছ থেকে আগত। অতএব, তোমরা আল্লাহকে এবং তার রসূলগণকে মান্য কর। আর একথা বলো না যে, আল্লাহ #তিনের_এক, একথা পরিহার কর; তোমাদের মঙ্গল হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ একক উপাস্য। সন্তান-সন্ততি হওয়াটা তাঁর যোগ্য বিষয় নয়। যা কিছু আসমান সমূহ ও যমীনে রয়েছে সবই তার। আর কর্মবিধানে আল্লাহই যথেষ্ট।"

(কুরআন, নিসা ৪:১৭১)
[সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোর অনুবাদ নেয়া হয়েছে এই ওয়েবসাইট
থেকেঃ https://goo.gl/PRw2Up এবং https://goo.gl/DFwlQn ; অনুবাদক মাওলানা মুহিউদ্দীন খান।]

.

আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ত্রিত্ববাদ সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলোতে মোটেও মরিয়ম(আ) এর কথা উল্লেখ নেই!
অর্থাৎ কুরআনে ত্রিত্ববাদবিষয়ক তথ্যে ভুল আছে—নাস্তিক ও খ্রিষ্টান প্রচারকদের এই অভিযোগটি নির্জলা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয়।

.

বিরোধিরা হয়তো বলবেনঃ সরাসরি ত্রিত্বের কথা না থাকলেও কুরআন তো সুরা মায়িদাহর ১১৬নং আয়াতে দাবি করছে খ্রিষ্টানরা মরিয়মের উপাসনা করে। এই তথ্য কতটুকু সঠিক? কোন খ্রিষ্টান কি মরিয়ম(আ) এর নিকট প্রার্থনা করে?

.

এর উত্তরে আমরা মুসলিমরা যা বলব তা হচ্ছে—কুরআনের তথ্য সম্পূর্ণ সঠিক।
বর্তমান পৃথিবীতে খ্রিষ্টানদের যে দল বা ফির্কা আছে, তার মধ্যে সব থেকে বড় ও প্রধান ৩টি দলের দু'টি দল হচ্ছে ক্যাথোলিক ও অর্থোডক্স চার্চ। [১] এই ২ দলের বিশ্বাস হচ্ছেঃ মরিয়ম হচ্ছেন ঈশ্বরের মা(Mother of God)। [২]
শুধু তাই নয়, ত্রিত্বের অংশ মনে না করলেও এরা মূর্তি সহযোগে মরিয়মের নিকট প্রার্থনা করে।ঈশ্বরের নিকট সুপারিশকারী হিসাবে বিশ্বাস করে। [৩]

.

কাজেই আমরা দেখতে পাচ্ছি, কুরআন খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় বিশ্বাস সম্পর্কে যে তথ্য দিয়েছে তা বর্তমান সময়ের খ্রিষ্টানদের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

.

তর্কের খাতিরে যদি ধরেও নেয়া হয় কুরআনে মরিয়ম(আ)কে ত্রিত্ব বা ট্রিনিটির অংশ বলা হয়েছে, তাহলেও সেটি থেকে কুরআনের ভুল বের করা সম্ভব নয়।

.

কারণ-- খ্রিষ্টবাদের ইতিহাস প্রায় ২ হাজার বছরের পুরনো। এ ২ হাজার বছরের ইতিহাসে খ্রিষ্টানদের মধ্যে অজস্র দল-উপদলের সৃষ্টি হয়েছিল। প্রাচীন ও মধ্যযুগে হাজার হাজার খ্রিষ্টান দল ছিল যেগুলো বর্তমানে নেই{যেমনঃ Basilidians, carpocratians, Ebonites}। আবার বর্তমান যুগে অনেক দল আছে যা ২০০ বছর আগেও ছিল না{যেমনঃ Jehovah's Witness, Mormon}।
খ্রিষ্টবাদের প্রাচীন যুগ থেকে এমন কিছু দল ছিল যারা মরিয়মকে তাদের ত্রিত্বের অংশ বলে বিশ্বাস করত। Mariamites নামক এক খ্রিষ্টান দলের পরিচয় পাওয়া যায় যাদের ত্রিত্ব গঠিত ছিল পিতা(ঈশ্বর), পুত্র(যিশু) ও মাতা(মরিয়ম) নিয়ে। [৪]
Washington Irving ও Hugh Griffith এর মুহাম্মাদ(স) এর জীবনীমূলক বই 'Mohammed' এ উল্লেখ করা হয়েছেঃ Mariamiteগণ পিতা,পুত্র ও মাতা{God the Father, God the Son, God the Virgin Mary} এই ত্রিত্বে বিশ্বাসী ছিল। এ ছাড়া Collyridianনামে আরব অঞ্চলে একটি খ্রিষ্টান দল ছিল যারা কুমারী মরিয়মকে পুজা করতো ও তাঁর জন্য উৎসর্গ করতো। [৫]
এ ছাড়া George Sale, Reverend Gilbert Reid D.D, William Cook Taylor, John Henry Blunt D.D, Allan Freer, John William Draper, Reverend James Gardner সহ আরো অনেক খ্রিষ্টান বিশেষজ্ঞ উল্লেখ করেছেন যেঃ খ্রিষ্টধর্মের প্রাচীনকাল থেকেই বেশ কয়েকটি দল ছিল যারা কুমারী মরিয়মের উপাসনা করত এমনকি সরাসরি ত্রিত্বের অংশ হিসাবে বিশ্বাস করতো। [৬]

.

উপরের আলোচনা থেকে এটি সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হল—যারা কুরআন থেকে ভুল বের করতে যায়, তারা নিজেরাই বিশাল এক ভুলের মধ্যে নিপতিত আছে। আল্লাহ্ এই অজ্ঞতা ও বিপথগামিতা থেকে সকলকে রক্ষা করুন।

.

✔✓ “ মরিয়মের পুত্র মাসিহ{ঈসা(আ)} তো একজন রাসূল ছাড়া আর কিছুই নয়; তার পূর্বে আরও বহু রাসূল গত হয়েছে, আর তার মা একজন পরম সত্যবাদিনী, তারা উভয়েই খাদ্য আহার করত। লক্ষ্য কর! আমি কিরূপে তাদের নিকট প্রমাণসমূহ বর্ণনা করছি। আবার লক্ষ্য কর! তারা উল্টা কোন দিকে যাচ্ছে?

বল - তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর ইবাদাত করবে, যা তোমাদের জন্য কোন ক্ষতি ও উপকারের ক্ষমতা রাখে না? আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ’।

বল - হে আহলে কিতাবগন(খ্রিষ্টান), তোমরা স্বীয় ধর্মে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না এবং ঐ সম্প্রদায়ের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না, যারা পূর্বে পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথভ্রষ্ট করেছে। তারা সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েছে।“

(কুরআন, মায়িদাহ ৫:৭৫-৭৭)

তথ্যসূত্রঃ

[১] https://www.thoughtco.com/christianity-statistics-700533

[২] ■ https://en.wikipedia.org/wiki/Theotokos

■ http://www.catholic.org/mary/

■ http://www.motherofallpeoples.com/.../the-mother-of-god-in-t.../

[৩] ■ খ্রিষ্টানদের মরিয়মের নিকট প্রার্থনার ছবিঃ https://goo.gl/4BHNls

■ https://www.youtube.com/watch?v=UHjL6eBkYLM

■ https://blogs.ancientfaith.com/.../why-the-orthodox-honor-ma.../

■ http://www.antiochian.org/node/17079

[৪] https://www.infoplease.com/dictionary/brewers/mariamites

[৫] ■ বইটির গুগল বুক লিঙ্কঃ https://goo.gl/3cz8y1

■ Collyridianদের ব্যাপারে আরো দেখুনঃ http://www.biblicalcyclopedia.com/C/collyridians.html

[৬] বিস্তারিত দেখুনঃ

■ https://discoverthetruefacts.wordpress.com/.../tafsir-al-jal.../

■ https://discover-the-truth.com/.../trinity-mary-worshipped-a.../

■ http://www.islamic-awareness.org/.../C.../External/marytrin.html

১৩৯

প্রসঙ্গঃ আধুনিক দাস প্রথা

-হোসাইন শাকিল

[দাসপ্রথার ব্যাপারে লেখকের আরো কিছু লেখা দেখুন (#সত্যকথন) ৮৪, (#সত্যকথন) ৮৫ ও (#সত্যকথন) ৯৪ তে।]

.

আমরা হয়ত অনেকেই জানিনা যে, সারা পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ মানুষ দাসপ্রথার শিকার হয়ে আছে। অস্ট্রেলিয়াভিত্তিক মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান Walk Free Foundation এর The Global Slavery Index ২০১৬ এর রিপোর্ট অনুযায়ী যা ১৬৭টি দেশের ওপর চালানো হয়েছে তাতে দেখা যায় ৪৫.৮ মিলিয়ন লোক বিভিন্নভাবে দাসত্বের শিকার হয়ে আছে। [১]

.

মানবপাচারের মাধ্যমে বিভিন্ন দেশ থেকে পুরুষ, নারী, শিশুদেরকে নিয়ে আনা হয়।যার জন্যে মানবপাচার বর্তমানে বিশ্বের অন্যতম সুসংগঠিত ও লাভজনক ব্যবসায়ে পরিনত হয়েছে। ILO(International Labor Organization) রিপোর্ট মতে মানবপাচার থেকে প্রায় ১৫০ বিলিয়ন ইউএস ডলার অর্থ উপার্জিত হয়। [২]

.

পাচারের পরবর্তী সময়ে তাদেরকে বিভিন্ন কাজে নিয়োগ করা হয় যেমনঃ জোরপূর্বক কাজে লাগিয়ে দেওয়া হয়, কখনো নারীদেরকে পতিতালয়ে কাজ করার জন্য বলপ্রয়োগ করা হয় বা যৌনদাসী/রক্ষিতা রুপে রেখে দেওয়া হয় কখনো বা অঙ্গহানী করে ভিক্ষাবৃত্তিতে নিয়োগ করা হয়। ২০১২ সালের International Labor Organization এর রিপোর্ট মতে, প্রায় ২০.৯ মিলিয়ন লোককে জোরপূর্বক কাজে(ফোর্সড লেবার) যুক্ত করা হয়েছে। এদের মধ্যে প্রায় ৪,৫ মিলিয়নকে(২২%) যৌন নিপীড়ন, জোরপূর্বক পতিতাবৃত্তি করানো হয়[৩]। ১৫০বিলিয়ন ডলারের মধ্যে ৯৯ বিলিয়ন ডলারই সেক্সুয়াল এক্সপ্লোয়েশন খাত থেকে আসে!!!

.

অপরদিকে UNODC (United Nations Office on Drugs and Crime) এর ২০১১ এর রিপোর্ট মতে পাচারকৃতদের মধ্যে প্রায় ৪৯% ই হলো নারী।[৪] সাথে মোট পাচারের ৫৩% ই যৌন হয়রানীর জন্য হয়ে থাকে।[৫] ২০১২ এর রিপোর্ট এর মতে, ১০ জনের মধ্যে ৬জনই যৌন হয়রানীর শিকার হয়ে থাকে. [৬]

.

এই ক্ষেত্রে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অবস্থা দেখা নেওয়া যাক-

.

যুক্তরাষ্ট্রঃ-

.

The National Human Trafficking Resource Center এর রিপোর্ট অনুযায়ী আমেরিকার ২০১৬ সালের মানবপাচারের কিছু পরিসংখ্যান তুলে ধরা হলো

.

সর্বমোট রিপোর্টেড কেসের সংখ্যা ৭৫৭২টি। যার মধ্যে ৬৩৪০জনই নারী আর বাকী ৯৭৮জন মাত্র পুরুষ। যার অধিকাংশই যৌন দাসত্বের জন্যই বেশীরভাগ হয়ে থাকে যার সংখ্যা প্রায় ৫৫৫১টি।[৭]

.

ব্রিটেন

.

National Referral Mechanism রিপোর্ট মতে, ২০১৫ সালে ব্রিটেনে ২৪৫% মানবপাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৫ সালে প্রায় ৩২৬৬ জন পাচারের শিকার হয়েছে যেখানে ২০১৪ ও ২০১১ সালে এর পরিমান ছিলো যথাক্রমে ২৩৪০ ও ৯৪৮ জন।[৮]

.

ভারত

.

দক্ষিন এশিয়ায় আমাদের পাশের দেশ ভারতে লক্ষ লক্ষ নারী ও শিশুরা যৌন হয়রানীর শিকার হয় যেমনটা বিশেষজ্ঞরা অনুমান করে থাকেন। ভারতে নিজেদের রাজ্য থেকে তো বটেই তাছাড়াও বাংলাদেশ, নেপাল, বার্মা, মধ্য এশিয়া এবং অন্যান্য স্থান থেকে ভারতে নারী ও শিশুদেরকে পাচার করা হয়ে থাকে।[৯]

.

The Ministry of Women and Child Development এর রিপোর্ট মতে, ২০১৬ সালে ১৯২২৩ জন নারী ও শিশু পাচার করা হয়েছে (এটা শুধুমাত্র যতটুকু রিপোর্ট করা হয়েছে তার উপর ভিত্তি করেই পরিসংখ্যানকৃত কেননা অধিকাংশই ভয়ে রিপোর্ট করে না) যেখানে ২০১৫ সালে এর পরিমান ছিলো ১৫৪৪৮ জন, এ ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বেশি রিপোর্ট পাওয়া গেছে। বলা যায় দক্ষিন এশিয়ায় ভারত মানব পাচারের অন্যতম কেন্দ্রে পরিনত হয়েছে। [১০]

.

ভারতের ছত্রিশগড়ে প্রতি বছর প্রায় ১৩৫০০০ শিশু নিখোজ হয়ে থাকে। [১১]

.

National Crime Records Bureau (NCRB) এর ২০১৩ এর রিপোর্ট মতে, ভারতে গত ৫বছরে মানবপাচার সংক্রান্ত কেস প্রায় ৩৮.৫% বৃদ্ধি পেয়েছে। এবং এখানে সর্বোচ্চ পাচার হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ থেকেই।[১২]
Walk Free Foundation এর The Global Slavery Index ২০১৬ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী ভারত শীর্ষে ছিলো। [১৩]

.

.

ইসলামের দাসপ্রথার ব্যাপারে যারা প্রশ্ন তোলেন তারা কি এইগুলো দেখেন?? এই অন্ধকার জগত সম্পর্কে তারা কিছু জানেন?? নাকি দেখে ও না দেখার আর জেনেও না জানার ভান করেন?? তথাকথিত মুক্তমনাদের তো এইগুলো নিয়ে তেমন সোচ্চার হতে দেখা যায় না। নাকি তাদের সকল আক্রমনের মূলে একমাত্র ইসলাম!!! তাও আবার নোংরা মিথ্যাচার দিয়ে!!

তথ্যসূত্রঃ

[১] https://www.globalslaveryindex.org/findings/

[২] http://www.humanrightsfirst.org/r.../human-trafficking-numbers

[৩] International Labour Organization, ILO global estimate of forced labour: results and methodology, 2012, p. 13

[৪] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons, 2014, p.29

[৫] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons, 2014, p.33

[৬] United Nations Office on Drugs and Crime, Global Report on Trafficking in Persons, 2012, p. 7

[৭] https://humantraffickinghotline.org/states

[৮] (https://www.theguardian.com/.../.../modern-slavery-on-rise-in-uk) (http://ind.pn/2mZXslD)

[৯] https://www.state.gov/.../rls/tiprpt/countries/2016/258784.htm

[১০] http://timesofindia.indiatimes.com/.../articlesh.../57569145.cms

[১১] https://www.theguardian.com/.../child-trafficking-india-domes...
[১২] http://indianexpress.com/.../the-numbers-story-a-human-traff.../
[১৩] https://www.globalslaveryindex.org/findings/

১৪০

ফিলিস্তিন সংকটের আসল কারণ কী?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

সেই ছোটবেলা থেকেই খবরের কাগজ আর টিভি সংবাদে 'নতুন ইহুদি বসতি স্থাপন', 'ফিলিস্তিনিদের বাড়ীঘর বিধ্বস্ত', 'ফিলিস্তিনি হতাহত' এই জাতীয় জিনিস দেখে আসছি। আমার মনে হয় এ প্রজন্মের সবাই ছোটবেলা থেকেই কম-বেশি এ জাতীয় সংবাদ দেখে দেখে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। প্রত্যেক বছর কয়েকজন ফিলিস্তিনি মরবে, ১-২শ ইহুদি বসতি বৃদ্ধি পাবে, ইস্রায়েলী বাহিনী 'একটু-আধটু'(?) জুলুম করবে- এই সংবাদগুলো আমাদের এখন আর চোখে বা কানে পীড়া দেয় না। "ফিলিস্তিনি জাতটার সৃষ্টিই হয়েছে মার খাবার জন্য"— মোটামুটি সবার মনের ভেতরেই এমন একটা বিল্ট ইন প্রোগ্রাম সেট হয়ে গেছে। মুসলিম উম্মাহর শাসকদের মনগুলোও এই 'প্রোগ্রাম' থেকে মুক্ত নয়। এ কারণেই বছর বছর এই জাতীয় সংবাদ আসছে এবং আসতে থাকবে। যা হোক, এবার একটু ব্যতিক্রম কিছু সংবাদ এখলাম। "মশা-মাছির মত করে" তো প্রায়ই কিছু ফিলিস্তিনি মেরে ফেলা হয়, এবার ইহুদিরা আঘাত হেনেছে খোদ মসজিদ আল আকসা বা বাইতুল মুকদ্দাসে। এমন খবর সচরাচর দেখা যায় না। বেশ কয়েক দিন ধরে আল আকসা মসজিদে আগ্রাসন চালিয়ে গেল সন্ত্রাসী ইস্রায়েল বাহিনী [লিঙ্কঃ https://goo.gl/PM2emq ; https://goo.gl/TXA7Q8 ; https://goo.gl/amHVNP] ১৯৪৮ সালে অবৈধ ইস্রায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা এবং ১৯৬৭ সালে জেরুজালেম জবর-দখল করার পর এমন ঘটনা খুব বেশি ঘটেনি। 'বিজ্ঞ'(?) বিশ্লেষকরা সব সময়েই সংবাদ মাধ্যমে এই চলমান সংকট নিয়ে আলোচনা করছেন, কারণ বিশ্লেষণ করছেন ও সংকট নিরসনের পথ বাতলে দিচ্ছেন। পশ্চিমা বিশ্বও মায়াকান্না কেঁদে শান্তির রোডম্যাপ দেখাচ্ছে, আর সেই রোডম্যাপ বেয়ে ইস্রায়েল আস্তে আস্তে ফিলিস্তিনের সব ভুখণ্ড খেয়ে ফেলছে। তাদের ধোঁকাবাজি বিশ্লেষণ আর ধাপ্পাবাজি রোডম্যাপের ধুম্রজাল ভেদ করে অনেকেরই জানতে ইচ্ছা করে— আসলে কী কারণে এই সঙ্কট? ঐ ভুখণ্ডটাতে আসলে কী আছে? এই সংকট সমাধাণের উপায় কী? এটা কি আসলেই রাজনৈতিক বা জাতীয়তাবাদী ইস্যু? –এসব বিষয় নিয়েই আজকে কিছু লেখার চেষ্টা করছি।

.

প্রথমেই একটা জিনিস বলে নেই—এটা কোন রাজনৈতিক ইস্যু নয়। এটা আগা গোড়াই একটা ধর্মীয় ইস্যু। ফিলিস্তিনের সেকুলার নেতারা এবং ধোঁকাবাজ পশ্চিমারা সব সময়েই এটাকে ফিলিস্তিন-ইস্রায়েল জাতীয় ইস্যু বলে মূল সংকটকে ধামাচাপা দিয়ে দিয়ে রেখেছে।

.

ঠিক কী কারণে ঐ ভূমির প্রতি ইহুদিদের এত আকর্ষণ? কেন পশ্চিমা শক্তি তাদেরকে সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে?

এর উত্তর লুকিয়ে আছে তাদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে।

ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থের নাম হচ্ছে তানাখ(Tanakh)। ঈসা(আ) এর আগে যেসব নবী এসেছেন, তাঁদের নামে লেখা বিকৃত কিছু কিতাবের সমষ্টি এটি। খ্রিষ্টানরাও এই কিতাবগুলোকে ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করে। তানাখ এর বইগুলোকে খ্রিষ্টানরা তাদের বাইবেলের পুরাতন নিয়ম(Old testament) অংশে রেখেছে। অর্থাৎ খ্রিষ্টান বাইবেলের Old testament অংশের বইগুলো ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কমন ধর্মগ্রন্থ। বাইবেলের এই পুরাতন নিয়ম(Old testament) অংশে Promised Land(ওয়াদাকৃত ভূমি) বলে একটা ধারণা আছে। সেখানে আদিপুস্তক(পয়দায়েশ/Genesis) ১৫ নং অধ্যায়ে আব্রাম/আব্রাহাম{ইব্রাহিম(আ)} এর কাছে ঈশ্বর অঙ্গীকার করেছেন যে, তিনি মিসরের সীমা থেকে ইরাকের সীমা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চল অর্থাৎ বৃহত্তর শাম দেশ বা বৃহত্তর সিরিয়া-ফিলিস্তিন অঞ্চল তিনি তাঁর বংশধর বনী ইস্রাঈলকে দান করবেন [বাইবেল থেকে লিঙ্কঃ https://goo.gl/WrihNc]। আদিপুস্তক ৩৫:১০-১২তে ইয়াকুব(আ){Jacob} এর নামকরণ করা হয়েছে 'ইস্রায়েল' এবং তাঁর বংশধরদেরকে ঐ ভূমি দিয়ে দেওয়ার অঙ্গীকার করা হয়েছে [সংশ্লিষ্ট অংশের লিঙ্কঃ https://goo.gl/RB5kGb]। বাইবেলের Old Testamentএ বার বার

উল্লেখ আছে যে ইহুদিদেরকে ঐ ভূমিতে ফিরিয়ে আনা হবে
[লিঙ্কঃ https://goo.gl/FDUjDv ; https://goo.gl/27mz7X; https://goo.gl/oTrsLD]। যিরমিয় (Jeremiah) ১২:১৪-১৭তে বলা আছে, ঈশ্বর ইহুদিদেরকে ঐ ভূমিতেই প্রতিষ্ঠিত করবেন; এবং ইহুদিদের কোন প্রতিবেশি এটা মেনে না নিলে ঈশ্বর তাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন [লিঙ্কঃ https://goo.gl/jJZ4XC] জেরুজালেমে প্রতিষ্ঠা করা হবে ইহুদিদের ৩য় মহামন্দির(3rd Temple) [লিঙ্কঃ https://goo.gl/aYj6Uy ; https://goo.gl/m9Lt2u; https://goo.gl/Wg2PjD]।

.

শুধুমাত্র ইস্রাঈল বংশের মানুষ বলে তারা ঐ ভূমির মালিক। অর্থাৎ আক্ষরিকভাবেই তারা ফিলিস্তিনকে "বাপ-দাদার সম্পত্তি" ভাবে। খ্রিষ্টান এবং ইহুদি উভয় সম্প্রদায় এই গ্রন্থে বিশ্বাসী। কাজেই এটা তাদের ধর্মীয় আকিদার অংশ। তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী ইহুদিরা হচ্ছে 'chosen race' বা ঈশ্বরের বেছে নেওয়া জাতি। ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের উদ্ধৃতি দিয়ে জায়োনিস্ট ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ওয়েবসাইটগুলো কিভাবে ফিলিস্তিনের ভূমির একচ্ছত্র অধিকার একমাত্র ইহুদিদের বলে প্রচার করছে তা দেখুনঃ

১। https://goo.gl/TehmsD
২। https://goo.gl/Juwnt5
৩। https://goo.gl/YC4LrY

অর্থাৎ শুধুমাত্র ধর্মীয় কারণেই জায়নবাদী{Zionist-ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্রপন্থী} ইহুদি ও খ্রিষ্টানরা ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূখণ্ড থেকে উচ্ছেদ করে সেখানে বহিরাগত ইহুদিদের বসতি স্থাপন করতে চাচ্ছে। এই অসভ্য, বর্বর ও বর্ণবাদী কর্মের পেছনে একমাত্র কারণ হচ্ছে তাদের ধর্ম। এর পেছনে কোন রাজনৈতিক কারণ নেই। তারা যা করছে তা বাইবেল থেকে অনুপ্রাণিত হয়েই করছে। এর পেছনে অন্য কোন কারণ নেই। বাইবেলকে 'ঈশ্বরের বাণী' বলে বিশ্বাস করে বলে পশ্চিমা খ্রিষ্টানরাও ইস্রায়েলকে সাহায্য করতে বাধ্য। এ কারণে শত নিন্দার মুখেও আমেরিকা কখনো ইস্রায়েলের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে না।

.

উপরে সংক্ষেপে আলোচনা করলাম আসলে ঠিক কোন কারণে ফিলিস্তিন ভুখণ্ডের প্রতি ইহুদিদের এত আকর্ষণ এবং কেন পশ্চিমা শক্তি সবসময়ে এই অন্যায় দাবির প্রতি সমর্থন দেয়।
এবার প্রশ্ন জাগতে পারে - কেন এত বছর ধরে ফিলিস্তিনে এত অশান্তি আর রক্তপাত? এর মূল কারণ আসলে কোথায়? "ইহুদি রাষ্ট্র" প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল কী ফর্মুলা দেয়? রক্তপাতের পথ? নাকি শান্তির পথ? লেখার আগামী পর্বে ইন শা আল্লাহ এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করব।
#চলবে

.

"এবং যখন তোমার প্রভু ইবরাহিমকে কতিপয় বাক্য দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন, পরে সে তা পূর্ণ করেছিল;
তিনি[আল্লাহ] বলেছিলেনঃ নিশ্চয়ই আমি তোমাকে মানবমণ্ডলীর নেতা করব।
সে[ইবরাহিম(আ)] বলেছিলঃ আমার বংশধরগণ হতেও?
তিনি বলেছিলেনঃ আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের প্রতি প্রযোজ্য হবেনা।"
(কুরআন, বাকারাহ ২:১২৪)

.

"বলঃ হে ইহুদিরা! যদি তোমরা মনে কর যে, তোমরাই আল্লাহর বন্ধু, অন্য কোন মানবগোষ্ঠী নয়— তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও।"
(কুরআন, জুমু'আহ ৬২:৬)

.

"আর উপদেশ দেয়ার পর আমি যাবুরে লিখে দিয়েছি যে, "আমার যোগ্যতর বান্দাগণই পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হবে"।
নিশ্চয়ই এতে ইবাদাতকারী সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশবাণী রয়েছে।"

(কুরআন, আম্বিয়া ২১:১০৫-১০৬)

.

“ইবরাহিম ইহুদিও ছিল না, খ্রিষ্টানও ছিল না; বরং সে ছিল একনিষ্ঠ মুসলিম। আর সে মুশরিকদের(অংশীবাদী/polytheist) অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

নিশ্চয়ই মানুষের মধ্যে ইবরাহিমের সবচেয়ে নিকটবর্তী তারা, যারা তাঁর অনুসরণ করেছে এবং এই নবী[মুহাম্মাদ (ﷺ)] ও মুমিনগণ। আর আল্লাহ মুমিনদের অভিভাবক।

এবং কিতাবীদের[ইহুদি ও খ্রিষ্টান] মধ্যে এক দলের বাসনা যে, তোমাদেরকে পথভ্রান্ত করে; কিন্তু তারা নিজেদের ব্যতিত অন্য কাউকে বিপথগামী করেনা এবং তারা তা বুঝছেনা।”

(কুরআন, আলি ইমরান ৩:৬৭-৬৯)

১৪১

ফিলিস্তিনে রক্তপাত ও এর অধিবাসীদের উচ্ছেদের আসল কারণ কী?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

গতদিনের লেখায় ফিলিস্তিনি ভুখণ্ডের প্রতি ইহুদিদের দাবির কারণ ও পশ্চিমা খ্রিষ্ট ধর্মবিশ্বাসীদের নির্লজ্জ সমর্থনের কারণ আলোচনা করেছিলাম। লেখাটির লিঙ্কঃ https://goo.gl/N44B3Z। আজকের লেখায় ফিলিস্তিন দখলের ব্যাপারে বাইবেলের ফর্মুলা নিয়ে আলোচনা করব।

ইহুদি জাতি কী করে মিসরে ফিরআউনের কবল থেকে মুক্ত হয়ে ফিলিস্তিনের দিকে যাত্রা করে এবং পরিশেষে আবার ফিলিস্তিন অধিকার করে, তার বিস্তারিত বিবরণ বাইবেলে আছে। মুসা(আ) এবং বনী ইস্রাঈলের নামে যে কাহিনীগুলো বিকৃত গ্রন্থ বাইবেলে লেখা আছে, তাতে সুস্পষ্ট উপায়ে ইহুদি রাষ্ট্র স্থাপনের ইতিহাস ও উপায় বর্ণনা করা আছে। ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কাছে সেগুলো হচ্ছে 'ঈশ্বরের বাণী' ও 'পথনির্দেশ'। চলুন দেখি বাইবেলের কাহিনী অনুযায়ী কিভাবে ফিলিস্তিনে ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

.

(বিকৃত)বাইবেলের কাহিনী অনুযায়ী মোশি {মুসা(আ)/Moses} বনী ইস্রাঈলের মানুষদের নিয়ে যখন পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের দিকে যাচ্ছিলেন, তখন আশপাশের অনেকগুলো জাতিকে ঈশ্বরের নির্দেশে নৃশংসতম উপায়ে নির্যাতন করেন এবং তাদের উপর গণহত্যা চালিয়ে তাদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দেন (আসতাগফিরুল্লাহ, নাউযুবিল্লাহ)। কথাটা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে, কিন্তু ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ ঠিক তাই বলছে। আগের লেখাতেই আমি উল্লেখ করেছিলাম যে, ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তানাখ(Tanakh) এর বইগুলোকে খ্রিষ্টানরাও ঈশ্বরের বাণী বলে বিশ্বাস করে এবং তারা সেগুলোকে তাদের বাইবেলের পুরাতন নিয়ম(Old testament) অংশে রেখেছে। অর্থাৎ খ্রিষ্টান বাইবেলের Old testament অংশের বইগুলো ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের কমন ধর্মগ্রন্থ। বাইবেলের Old testament অংশের 'দ্বিতীয় বিবরণ'(Deuteronomy) গ্রন্থের ২য় অধ্যায়ে বলা হয়েছে যেঃ মুসা(আ) এর অনুগত বনী ইস্রাঈলীরা হিষ্বোন অঞ্চলের রাজা সীহোনকে পরাজিত করেন। এবং #প্রভু_ঈশ্বরের_নির্দেশে তারা সে অঞ্চলের পুরুষ, স্ত্রীলোক এবং ছোট শিশু সকলকে মেরে ফেলেন। বাইবেলের ভাষ্যমতে---

.

" কিন্তু প্রভু আমাদের ঈশ্বর সীহোনকে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। আমরা রাজা সীহোন, তার পুত্রদের এবং তার সমস্ত লোকদের পরাজিত করেছিলাম।

সেই সময় রাজা সীহোনের সব শহরগুলোই আমরা অধিকার করেছিলাম। প্রত্যেক শহরের সমস্ত লোকদের, সকল পুরুষদের, স্ত্রীলোকদের এবং ছোট ছোট শিশুদের আমরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করেছিলাম। আমরা কাউকেই জীবিত ছেড়ে দিই নি!

ঐ সমস্ত শহরগুলো থেকে আমরা কেবলমাত্র গবাদিপশু এবং মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী নিয়েছিলাম।"

[বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ(Deuteronomy) ২:৩৩-৩৫; লিঙ্ক থেকে চেক করে দেখতে পারেনঃ https://goo.gl/ACLG7n]

.

এরপর তারা পরবর্তী রাজ্য বাশনের রাজা ওগকে পরাজিত করেন এবং #প্রভু_ঈশ্বরের_নির্দেশে তারা সে অঞ্চলেরও নারী, পুরুষ, এবং ছোট শিশু সকলকে হত্যা করেন। বাইবেলের ভাষ্যমতে---

.

"৩ "সেই কারণে প্রভু আমাদের ঈশ্বর বাশনের রাজা ওগকে পরাজিত করতে সাহায্য করেছিলেন। আমরা তাকে এবং তার সমস্ত লোকদের পরাজিত করেছিলাম। তাদের আর কেউই বাকী ছিল না।

... ...

৬ হিষ্বোনের রাজা সীহোনের শহরগুলিকে আমরা যেভাবে ধ্বংস করেছিলাম, সেভাবেই এদেরও ধ্বংস করেছিলাম। প্রত্যেকটি শহরকে এবং সেখানে বসবাসকারী সমস্ত লোকদের এমনকি সমস্ত স্ত্রীলোকদের এবং শিশুদের আমরা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করেছিলাম।
৭ কিন্তু ঐ সমস্ত শহরের সমস্ত গোরু এবং সমস্ত মূল্যবান দ্রব্যসামগ্রী আমরা নিজেদের জন্য রেখে দিয়েছিলাম।"
[বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ(Deuteronomy) ৩:৩-৭; লিঙ্কঃ https://goo.gl/WdLf6w]

.

পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের দিকে এগিয়ে যাবার পথে যেসব জাতি পড়বে, বাইবেলের ঈশ্বর নির্দেশ দিচ্ছেন তাদের সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিতে এবং কোন প্রকার ক্ষমা প্রদর্শন না করতে। অর্থাৎ ঐসব জাতিকে সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত করে দেবার ফর্মুলা বা Ethnic cleansing। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী যা যুদ্ধাপরাধের শামিল। এটিই হচ্ছে 'পবিত্র' বাইবেল অনুযায়ী ইহুদিদের promised land দখল করার নিয়ম। বিশ্বাস হচ্ছে না? তাহলে বাইবেল থেকেই দেখুনঃ---

.

"প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, যখন তোমাদের নেতৃত্ব দিয়ে সেই দেশে নিয়ে যাবেন, যে দেশে তোমরা অধিগ্রহণের জন্য প্রবেশ করছো, তখন প্রভু তোমাদের সামনে অনেক জাতিকে দূর করে দেবেন – যেমন হিত্তীয়, গির্গাশীয়, ইমোরীয়, কনানীয়, পরিষীয়, হিব্বীয় এবং যিবূষীয় তোমাদের থেকে অনেক বড় এবং অনেক শক্তিশালী সাতটি জাতি।
প্রভু, তোমাদের ঈশ্বর, এই জাতিগুলোকে তোমাদের কাছে সমর্পণ করলে পরে তোমরা তাদের পরাজিত করবে এবং তাদের সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করবে। তাদের সঙ্গে কোনোরকম নিয়ম কোরো না। তাদের ক্ষমা প্রদর্শন করো না।"
[বাইবেল, দ্বিতীয় বিবরণ(Deuteronomy) ৭:১-২; লিঙ্কঃ https://goo.gl/5inHjZ]

.

বর্তমান সময়ে ফিলিস্তিনে মুসলিমদের সাথে ইহুদিরা যা করছে, তা কি বাইবেলের এইসব বিধানেরই প্রতিচ্ছবি নয়?

.

বাইবেলের ঈশ্বরের নির্দেশে ইহুদিরা মিদিয়ন অঞ্চলের সকল ছেলে শিশু এবং বিবাহিত নারীকে হত্যা করে। আর যে সকল বাচ্চা মেয়ে কখনো যৌন কাজ করেনি অর্থাৎ কুমারী, তাদেরকে ভোগের জন্য নিয়ে আসে। তারা বিপুল পরিমাণে গরু-ছাগল এবং অন্যান্য গবাদী পশু লুটপাট করে নিয়ে আসে। সেই সাথে বন্দী করে আনে ৩২,০০০ কুমারী অল্প বয়সী মেয়েকে। অবিশ্বাস্য লাগতে পারে, কিন্তু এটাই বাইবেল অনুযায়ী পবিত্র ভূমি ফিলিস্তিনের দিকে যাত্রাকারী ইহুদিদের প্রতি #ঐশ্বরিক_নির্দেশ। বাইবেলের গণনাপুস্তক(Numbers) এর ৩১ নং অধ্যায়ে এর বিশদ বিবরণ আছে।
লিঙ্কঃ https://goo.gl/GKhys5
অনেক খ্রিষ্টান মিশনারী বলতে চায় ইসলাম নাকি মানুষকে দাস বানাতে উৎসাহিত করে। ইসলামে গনিমতের মাল নিয়েও তাদের কটুক্তির শেষ নেই। তারা কি বাইবেলের এই বিধানগুলো দেখে না? অথচ ইসলাম কখনো এই রকম উপায়ে হত্যা, লুটপাট ও বন্দী করার নির্দেশ দেয়নি। ইসলামে জিহাদের বিধান, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ লাভের উপায় বাইবেল থেকে অনেক ভিন্ন।

.

বাইবেলের বিবরণ অনুযায়ী মুসা(আ) এর জীবদ্দশাতে বনী ইস্রাঈল ফিলিস্তিন পর্যন্ত আসতে পারেনি। তাঁর উত্তরাধিকারী ইউশা বিন নুন(আ) {যিহোশূয়/Joshua} এর নেতৃত্বে তারা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। ফিলিস্তিনে আসার অবশিষ্ট পথটিতে ঈশ্বরের নির্দেশে তাদের দ্বারা আরো ভয়াবহ সব নিষ্ঠুরতার বিবরণ বাইবেলে পাওয়া যায়। যিহোশূয়(যোশুয়া/Joshua) ২:৮-২১ এ উল্লেখ আছে বনী ইস্রাঈলের কারণে স্থানীয় জনগণ কী নিদারুণ ভয়ে দিন যাপন করত [বাইবেল থেকে সংশ্লিষ্ট অংশের লিঙ্কঃ https://goo.gl/9MBhg5] যিহোশূয়(যোশুয়া/Joshua) ৬:১৭-২২ এ উল্লেখ আছে বনী ইস্রাঈলের লোকেরা কিভাবে যিরীহো(Jericho)শহরের সকল যুবক যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, গরু, মেষ, গাধা সকলকে মেরে ফেলে এরপর সমস্ত শহর জ্বালিয়ে দেয়। [লিঙ্কঃ https://goo.gl/81dQQW ; https://goo.gl/cEfSRd] যিহোশূয়(যোশুয়া/Joshua) ৮:১-২৯ এ উল্লেখ আছে বনী ইস্রাঈল কিভাবে অয় শহরকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাড়খাড় করে দেয়, সেখানকার ১২,০০০ নারী-পুরুষকে হত্যা করে এরপর

ইউশা বিন নুন(আ) {যিহোশূয়/Joshua} সেখানকার রাজাকে মেরে গাছের সাথে সারাদিন ঝুলিয়ে রাখেন [লিঙ্কঃ https://goo.gl/5CrVkn]। কোন নৃশংস কাহিনীর হলিউডী ছবি নয়; এটি পৃথিবীর সব থেকে বেশি মানুষের অনুসৃত ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের কাহিনী।

.

ফিলিস্তিনে ঈশ্বরের ওয়াদাকৃত বনী ইস্রাঈলের promised land দখলের জন্য এমনই ভয়ঙ্কর সব উপায় বাইবেলে বর্ণনা করা আছে যেগুলো চিন্তা করলেও গা শিওরে ওঠে। ইহুদি ও খ্রিষ্ট ধর্মালম্বীদের 'পবিত্র' ধর্ম গ্রন্থে এমন ইতিহাসই লেখা যা আছে, যাতে নবী-রাসুলগণ গণহত্যা, অত্যাচার ও নির্যাতনের দ্বারা অনেকগুলো জাতিকে সম্পূর্ণরূপে নির্মুল করে ফিলিস্তিনের ভূমি দখল করেন (নাউযুবিল্লাহ)। আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসুলের নামে এই সকল অপবাদ ও মিথ্যাচারের নিপাত করুন। আজকের দিনে ইহুদিদের দ্বারা ফিলিস্তিনিদের জুলুম-নির্যাতন এবং তাতে খ্রিষ্টীয় পশ্চিমাদের মদদ প্রদানের রহস্য কি এবার বোঝা যাচ্ছে?

.

দখলকৃত ফিলিস্তিনি ভূমি ধরে রাখার ব্যাপারেও বাইবেলের কিছু ফর্মুলা আছে। বাইবেল বর্ণনা করেছে কিভাবে নবী-রাসুলগণ ফিলিস্তিনের দখলকৃত ভূমির শক্তি সংহত করতেন। বাইবেলে ২ শামুয়েল(2 Samuel) ১২:২৯-৩১ এ বলা আছে যে, ইহুদিদের বাদশাহ দাউদ(আ) রাব্বা শহর আক্রমণ করে তাদের পরাজিত করেন এবং সেখানের লোকদের বের করে এনে তাদেরকে করাত, কুড়াল এইসব অস্ত্র দিয়ে কেটে ফেলেন, তাদেরকে ইটের ভাটার ভেতর ঢুকিয়ে নৃশংসভাবে হত্যা করেন(নাউযুবিল্লাহ)। আম্মোনীয়দের সকল শহরেই তিনি এই কাজ করেন [লিঙ্কঃ https://goo.gl/1uHGmA ; https://goo.gl/8g3BNw]। এই হচ্ছে ইহুদি সাম্রাজ্য সংহত করার বাইবেলীয় ফর্মুলা।
বাইবেল বলে যে এই ফর্মুলা সর্বযুগের জন্য অনুসরণীয়। ইহুদি তানাখ/খ্রিষ্টান বাইবেলের পুরাতন নিয়মের গীতসংহিতা{সামসঙ্গীত/জবুর শরীফ/Psalms} ১১৯:১৬০ এ বলা আছে যে—ঈশ্বরের সকল আইনই সত্য এবং এগুলো চিরকাল কার্যকর থাকবে [লিঙ্কঃ https://goo.gl/YorxH4 ; https://goo.gl/MHdRTQ]। বাইবেলের নতুন নিয়মে(New Testament) যিশু খ্রিষ্ট বলছেন যেঃ পূর্বের সকল নবী-রাসুলের আইন চিরকাল কার্যকর থাকবে এবং তিনি সেগুলো প্রতিষ্ঠা করতেই এসেছেন[লিঙ্কঃ https://goo.gl/p89UvN]। এর সাথে প্রতিধ্বনী করে খ্রিষ্ট ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা সেইন্ট পল বাইবেলের ২ তিমথীয়(2 Timothy) ৩:১৬-১৭তে বলেছে-- পূর্বের কিতাবের কথাগুলো ঈশ্বরের থেকে এসেছে এবং এগুলো মানুষের জন্য উপকারী [লিঙ্কঃ https://goo.gl/JRzQAQ]।

.

পাশবিক, ভয়াবহ, নৃশংস, বর্বর---কোন শব্দমালা দিয়েই ইহুদি-খ্রিষ্টানদের বিকৃত গ্রন্থ বাইবেলের এই সকল ফর্মুলাকে বিশেষায়িত করা যাচ্ছে না। যে সকল অত্যাচার-নির্যাতনের বিবরণ চিন্তা করলেও শরীর শিওরে ওঠে, এই সকল জিনিসকে তারা "ঈশ্বরের বিধান"(!) ও "নবী-রাসুলের কর্ম"(!) বলে বিশ্বাস করে কেননা এগুলো তাদের ধর্মগ্রন্থে আছে। ফিলিস্তিনে আজ তারা যা করছে, এগুলো তাদের ধর্মগ্রন্থেরই প্রতিফলন। ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থের নির্দেশ হুবহু বাস্তবায়ন করলে ফিলিস্তিনিদের উপর যে আরো দুর্ভোগ নেমে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। নাউযুবিল্লাহ।

.

তার নিজ হাতে নিজেদের ধর্মগ্রন্থ রচনা করে এগুলোকে "ঈশ্বরের বাণী" বলে চালাচ্ছে এবং বানোয়াট বিধানের দ্বারা হীন স্বার্থ হাসিল করছে। তাদের বিকৃত গ্রন্থ সম্পর্কে আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ

.

" তারা কি এতটুকুও জানে না যে, আল্লাহ সেসব বিষয়ও জানেন যা তারা গোপন করে এবং যা প্রকাশ করে?
তাদের কিছু লোক অক্ষরজ্ঞানহীন। তারা মিথ্যা আকাঙ্খা ছাড়া আল্লাহর গ্রন্থের কিছুই জানে না। তাদের কাছে কল্পনা ছাড়া কিছুই নেই।
অতএব তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, "এটা আল্লাহর কাছ থেকে এসেছে"--যাতে এর বিনিময়ে সামান্য মূল্য লাভ করতে পারে।

অতএব আফসোস তাদের হাতের লেখার জন্য এবং আফসোস, তাদের উপার্জনের জন্যে।
(কুরআন, বাকারাহ ২:৭৭-৭৯)

.

আল কুরআনেও মুসা(আ) এবং বনী ইস্রাঈলের পবিত্র ভূমির দিকে যাত্রার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু কুরআনের বর্ণনা আর বাইবেলের বর্ণনায় বিশাল পার্থক্য রয়েছে। আল কুরআনে বাইবেলের নৃশংসতার ছিঁটেফোটাও নেই!
আল কুরআনে মুসা(আ) এর সঙ্গে বনি ইস্রাঈলকে পবিত্র ভূমিতে ঢুকবার নির্দেশের কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং তা সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণ উপায়ে। নারী-পুরুষ-শিশু হত্যা, জোর-জবরদস্তি, অগ্নি সংযোগ এমন কোন কিছুরই উল্লেখ নেই বরং এর উল্টোটাই উল্লেখ আছে। সেই সাথে এটাও উল্লেখ আছে যে জালিম লোকেরা আল্লাহর সেই নির্দেশকে বিকৃত করেছিল। ---

.

"আর স্মরণ কর, যখন আমি বললাম, 'তোমরা প্রবেশ কর এই জনপদে। আর তা থেকে আহার কর তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী, স্বাচ্ছন্দ্যে এবং দরজায় প্রবেশ কর মাথা নীচু করে। আর বল-- 'ক্ষমা'। তাহলে আমি তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেব এবং নিশ্চয়ই আমি সৎকর্মশীলদেরকে বাড়িয়ে দেব'।
অতঃপর যালিমরা পবিবর্তন করে ফেলল সে কথা যা তাদেরকে বলা হয়েছিল, ভিন্ন অন্য কথা দিয়ে। ফলে আমি তাদের উপর আসমান থেকে আযাব নাযিল করলাম, কারণ তারা পাপাচার করত।"
(আল কুরআন, সুরা বাকারাহ ২:৫৮-৫৯; লিঙ্কঃ https://goo.gl/Epv4uv)

.

একই রকম কথা উল্লেখ আছে সুরা আরাফ ৭:১৬১-১৬২ আয়াতে [লিঙ্কঃ https://goo.gl/UQAMSD]।
কোথায় বাইবেলের ধংসাত্মক প্রবেশ আর গণহত্যার কাহিনী আর কোথায় আল কুরআনের মাথা নিচু করে 'ক্ষমা'র কথা বলে প্রবেশের কাহিনী! এরপরেও তারা বলতে চায় যে কুরআন সন্ত্রাস শেখায় আর বাইবেল শান্তির কথা বলে! সুবহানাল্লাহ। তাদের দাবি আর সত্যের মাঝে আকাশ-পাতাল তফাৎ।

.

সুরা মায়িদাহ ৫:২১-২৪ আয়াতে উল্লেখ আছে যে--- বনী ইস্রাঈলকে পবিত্র ভূমিতে ঢুকতে বলা হলে তারা সেখানকার স্থানীয় অধিবাসীদের বের করে দিয়ে দিয়ে এরপর সেখানে ঢুকবার বায়না ধরে! {ঠিক যেভাবে আজও তারা ফিলিস্তিনিদের নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে তা দখল করতে চাচ্ছে} এরপরেও আল্লাহর উপর ভরসা করে সেখানে ঢুকতে বলা হলে তারা উল্টো বলে দেয় যেঃ মুসা(আ) এবং তাঁর প্রভু যেন সেখানে গিয়ে স্থানীয় অধিবাসীদের সাথে লড়াই করেন! নাউযুবিল্লাহ। কুরআনের বিবরণে মোটেও স্থানীয় অধিবাসীদের উপর জুলুম করার বিবরণ নেই লিঙ্কঃ https://goo.gl/4indVA

.

ইসলামে কোন অবস্থাতে এমনকি যুদ্ধের ময়দানেও মুশরিক(polytheists)দের সাথে নৃশংসতা করার অনুমতি নেই। ইসলামী বিধান অনুযায়ী নারী-শিশু, পলাতক ও নিরস্ত্রদের হত্যার উপর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে [রেফারেন্সঃ আবুদাউদ হা/২৬৬৯, মুসনাদ আহমাদ হা/১৫৬২৬, ১৬৩৪২; সম্পূর্ণ হাদিসগুলো দেখুন এই লিঙ্ক থেকেঃ https://goo.gl/HEgjd8]। নবী মুহাম্মাদ(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন যুদ্ধের জন্য কোন অভিযান প্রেরণ করতেন তখন বিশ্বাসঘাতকতা করা, চুরি করা, কারো অঙ্গহানি বা অঙ্গ বিকৃত করা, শিশু হত্যা করা—এসব কাজ থেকে নিষেধ করতেন। যুদ্ধের সময়ে তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান করা হত। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করত, তাহলে যুদ্ধ করা তো দূরের কথা, তাদেরকে অন্য সকল মুসলিমদের মত সমান সুযোগ সুবিধার ব্যাবস্থা করা হত। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করতে অস্বীকার করত, তাহলে তাদেরকে যৎসামান্য জিজিয়া কর প্রদানের আহ্বান জানা্নো হত। যদি তারা সম্মত হত, তাহলে আর কোন প্রকার যুদ্ধ হত না। এমনকি এরপরেও যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি হলে দুর্গের ভেতর থেকে শত্রুরা আল্লাহর যিম্মাদারি এবং নবীর(সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিম্মাদারি লাভের আশা করলে{অর্থাৎ নিরাপত্তা চাইলে} তাদের জন্য আল্লাহর যিম্মাদারি এবং নবীর (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যিম্মাদারি দান করবার নির্দেশ আছে। [রেফারেন্সঃ মুসনাদ আহমাদ ১৭৬২৮, মুসলিম ১৭৩১, তিরমিযী ১৩০৮, ১৬১৭, আবূ দাউদ ২৬১২;

হাদিসগুলোর লিঙ্কঃ https://goo.gl/CrFmyM]। এর সঙ্গে বাইবেলের ঈশ্বরের বিধানের তুলনা করুন---নারী, পুরুষ, শিশু, গবাদী পশু সবাইকে হত্যা করা, শহর জ্বালিয়ে দেওয়া, অন্যের ভূমি এভাবে দখল করে নেওয়া। এ থেকেই বোঝা যাচ্ছে অন্য ধর্মগুলোর সাথে ইসলামের পার্থক্য।

.

ফিলিস্তিনি ভুখণ্ডে দখলদার ইস্রায়েল বাহিনীর জুলুম ও রক্তপাত এবং এই অন্যায় কাজে পশ্চিমাদের সহযোগিতার কারণ নিশ্চয়ই এতক্ষণে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

তা হচ্ছে-- ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ বাইবেল।

বাইবেলের বিধানের কারণেই ইহুদিরা ফিলিস্তিনকে তাদের পৈতৃক সম্পত্তি মনে করে, বাইবেলের বিধানগুলোর কারনেই ফিলিস্তিনের স্থানীয় অধিবাসী আরব মুসলিমদের জুলুম নির্যাতন করে, হত্যা করে তাদের ভূখণ্ড দখল করা হচ্ছে। আর খ্রিষ্টীয় পশ্চিমারাও এ কাজে তাদের সহযোগিতা করছে। মূলত পশ্চিমাদের শক্তিতেই ইস্রায়েল শক্তিশালী। মুষ্টিমেয় ইহুদিদের পক্ষে কখনোই সম্ভব ছিল না উসমানী খিলাফতকে(Ottoman Empire) পরাজিত করে ফিলিস্তিন দখল করা। ব্রিটিশরা উসমানীদের পরাজিত করার ফলেই তারা ঐ ভূখণ্ড দখল করার সুযোগ পেয়েছে। আমেরিকার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ ছাড়া তাদের পক্ষে কখনোই ঐ দখলকৃত ভূখণ্ড ধরে রাখা সম্ভব ছিল না।

এই সমস্যার কারণ যেহেতু চিহ্নিত, সমাধাণও এ কারণে পরিষ্কার। আর তা হচ্ছে—ইহুদি ও খ্রিষ্টানদের বাতিল ও মিথ্যা মতবাদের চির অবসান এবং শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রতিষ্ঠা। এটাই এ সমস্যার একমাত্র স্থায়ী সমাধাণ। কুরআন ও হাদিসেও আমরা দেখি যে কিয়ামতের পূর্বে এই মতবাদগুলো নিশ্চিহ্ন হবে এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে এই কাজ করবেন মাসিহ ঈসা(আ)।

.

আল্লাহ রাসূল(ﷺ) বলেছেন, "যাঁর হাতে আমার জীবন আছে সেই সত্তার কসম! অবশ্যই এমন এক দিন আসবে, যেদিন তোমাদের মধ্যে ঈসা ইবনে মারইয়াম একজন ন্যায়পরায়ণ শাসকরূপে অবতরণ করবে; ক্রুশ ভেঙ্গে চুরমার করবেন, শূকর নিধন করবেন, জিযিয়া কর বাতিল করবেন, মাল-সম্পদ এত বেশী হবে যে, (দান বা সাদকা) গ্রহণ করার মত লোক থাকবে না। সেই সময় একটি সিজদাহ্ দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু রয়েছে তার থেকেও উত্তম হবে।" (অর্থাৎ, কিয়ামত নিকটে জানার কারণে ইবাদত মানুষের কাছে অতি প্রিয় হবে।)

এ হাদীস বর্ণনার পর আবু হুরাইরাহ (রাঃ) বললেন, তোমরা ইচ্ছা করলে, ক্বুরআন কারীমের এ আয়াত পাঠ করতে পার, (وَإِنْ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ) অর্থাৎ, আহলে কিতাবদের [ইহুদি ও খ্রিষ্টান] মধ্যে প্রত্যেকে নিজ মৃত্যুর পূর্বে অবশ্যই তাঁর[ঈসা(আ)] প্রতি ঈমান আনবে। (সূরা নিসা-৪:১৫৯)

[বুখারীঃ কিতাবুল আম্বিয়া; হাদিস নং ৩৪৪৮; লিঙ্কঃ https://goo.gl/neAS6r]

.

ফিলিস্তিন কেন মুসলিম উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

ফিলিস্তিনে রয়েছে আমাদের প্রথম কিবলাহ আল আকসা বা বাইতুল মুকাদ্দাস। এখান থেকেই রাসুল(ﷺ) মিরাজে গমন করেছেন, ইমামতি করে পূর্বের নবীদের সাথে সলাত পড়েছেন। বাইতুল মাকদিস হচ্ছে বিশ্বাসীদের ভূমি। এখন একমাত্র মুসলিমরাই শেষ নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) ও পূর্বের সকল নবীদের প্রতি বিশ্বাসী জাতি। তাছাড়া আরব মুসলিমরা ঐ অঞ্চলের স্থানীয় অধিবাসী। স্থানীয় অধিবাসীদের অবশ্যই নিজ ভূমির উপর অধিকার আছে। স্থানীয়দের জোর করে নিজ ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে বিজাতীয়দের তথাকথিত promised land দখল কিংবা থার্ড টেম্পল প্রতিষ্ঠা – এগুলো কোন সুস্থ বিবেকবান মানুষের চিন্তা হতে পারে না। জেরুজালেম কেন মুসলিম উম্মাহর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সে সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ(হাফিজাহুল্লাহ) এর এই ফতোয়াটি পড়া যেতে পারেঃ https://islamqa.info/en/7726

.

আল্লাহ মুসলিম উম্মাহকে কুরআন-সুন্নাহর ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে দিন এবং ফিলিস্তিন সংকটের দ্রুত সমাধাণ করে দিন।

১৪২

নাস্তিকদের অভিযোগ খণ্ডন – ৭; ঋতুবতী নারীরা কি ইসলামে অবহেলিত? (২য় পর্ব)

-জাকারিয়া মাসুদ

(প্রথম পর্ব দেখুনঃ (#সত্যকথন) ১২৪ এ)

.

গত পর্বে আমরা “আযা” (أَذًى) শব্দের অর্থ নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। এই পর্বে আমরা রাসূল (ﷺ) এর সহীহ হাদিস থেকে ঋতুবতী নারীদের সম্পর্কে ইসলামের বিধান নিয়ে আলোচনা পেশ করব ইনশাআল্লাহ।

.

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) ঋতুচলাকালীন সময়ে তার স্ত্রীদের সাথে কোনরূপ অবজ্ঞাভাব প্রকাশ করতেন না বরং এ সময় তার (ﷺ) আচরণ ছিল স্বাভাবিক। তিনি (ﷺ) ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একই পাত্রে খাবার খেয়েছেন, একই পাত্র থেকে পানি নিয়ে গোসল করেছেন, একই বিছানায় শয়ন করেছেন, প্রাত্যহিক কাজে তাদের সাহায্য গ্রহণ করেছেন, ঋতুবতী স্ত্রীর দ্বারা নিজের মাথা আঁচড়িয়ে নিয়েছেন, তাদেরকে পাশে রেখে কোরআন তিলাওয়াত করেছেন, সালাত আদায় করেছেন। আপনি শুনলে হয়ত অবাক হবেন যে, ঋতুবতী অবস্থায় মা আয়েশা (রাযি) যে দিক থেকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন, রাসূল (ﷺ) ও ঠিক সে দিকে মুখ লাগিয়ে পানি পান করতেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হাড় কে ঐ দিক থেকেই চিবাতেন যে দিক থেকে আয়িশা (রাযিঃ) ঋতুবতী অবস্থায় চিবাতেন । আমরা সহীহ হাদিস থেকে আপনার সামনে কিছু উদাহরণ তুলে ধরছি।

.

.

ঋতুবতী নারীদের সাথে এক বিছানায় শোয়াঃ

.

আল্লাহর রাসুল (ﷺ) তার সহধর্মিণীদের সাথে ঋতুকালীন সময়ে একই বিছানায় শয়ন করতেন কিন্তু কোন সঙ্কোচবোধ করতেন না। তাদের কে অপয়া মনে করতেন না, তাদের কে অশুচি মনে করতেন না। যা নিম্নোক্ত সহিহ হাদিস সমূহ দ্বারা পরিষ্কার ভাবে প্রতীয়মান হয়।

.

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ زَيْنَبَ ابْنَةَ أُمِّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ، بَيْنَا أَنَا مَعَ النَّبِيِّ، صلى الله عليه وسلم مُضْطَجِعَةً فِي خَمِيصَةٍ إِذْ حِضْتُ، فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حِيضَتِي قَالَ " أَنُفِسْتِ ". قُلْتُ نَعَمْ. فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ.

উম্মে সালমা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেনঃ আমি নবী (ﷺ) এর সাথে একই চাদরের নীচে শুয়ে ছিলাম। হঠাৎ আমার হায়েয দেখা দিলে আমি চুপি চুপি বেরিয়ে গিয়ে হায়েযের কাপড় পড়ে নিলাম। তিনি বললেনঃ তোমার কি নিফাস দেখা দিয়েছে? আমি বললাম হ্যা। তখন তিনি আমাকে ডাকলেন। আমি তার সঙ্গে চাদরের ভিতর শুয়ে পড়লাম।

.

বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহিহ, অধ্যায়ঃ হায়য, পরিচ্ছেদঃ (২০৭) হায়য অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলামেশা করা, ১/২৯৪ আরও দেখুন, ১/৩১৬,৩১৭; মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায়ঃ (৩), হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৫৮১ , আহমাদ ইবনু হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, অধ্যায়ঃ হায়য-ইস্তিহাযা ও নিফাস, পরিচ্ছেদঃ (৪), ... তাদের সাথে শোয়া ও খাওয়া দাওয়া বৈধ, ১/৩২৬, ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ, আস-সুনান ১/৬৩৭।

.

ঋতুবতী নারীদের সাথে যৌনমিলন ছাড়া সব ধরণের মেলামেশা করাঃ

.

এই সময়টাতে যৌনমিলন ছাড়া তাদের সাথে সব ধরণের মেলামেশা করা যায়। তাদের সাথে খাবার খাওয়া, চলাফেরা, তাদের সাথে বসা, স্বাভাবিক সকল কাজ কর্ম পরিচালনা করা, প্রভৃতি কোন কাজই ইসলাম এই সময়ে নিষেধ করে নি। বরং আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এই সময়ে তার স্ত্রীদের দ্বারা মাথা আঁচড়াতেন, তাদের সাথে যৌনমিলন ছাড়া সব কিছুই করতেন, তাদের প্রাত্যহিক কর্মে সহায়তা করতেন এবং সেই সাথে তিনি তার সাহাবাদের উৎসাহ দিতেন তাদের স্ত্রীদের সাথে ভালো ব্যবহার করার জন্য।

.

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ الْيَهُودَ، كَانُوا إِذَا حَاضَتِ الْمَرْأَةُ فِيهِمْ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا وَلَمْ يُجَامِعُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ فَسَأَلَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى { وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ} إِلَى آخِرِ الآيَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " اصْنَعُوا كُلَّ شَىْءٍ إِلاَّ النِّكَاحَ

যুহায়র ইবন হারব (র)...আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত যে, ইয়াহুদীরা তাদের মহিলাদের হায়েয হলে তার সঙ্গে এক সাথে আহার করত না এবং এক ঘরে বাস করত না । সাহাবায়ে কিরাম এ সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (ﷺ)-কে জিজ্ঞেস করলেন। তখন আল্লাহতায়াআলা এ আয়াত নাযিল করলেন: "তারা তোমার কাছে হায়েয সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে । বলে দাও যে, তা হলো কষ্টদায়ক। সুতরাং হায়েয অবস্থায় তোমরা মহিলাদের থেকে পৃথক থাকবে...... ।" এরপর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) বললেন, তোমরা (সে সময় তাদের সাথে) শুধু সহবাস ছাড়া অন্যান্য সব কাজ কর ।

.

মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায়ঃ (৩) হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৫৮৯, ৫৯০; আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহ আত-তিরমিযী, ১/১৩২; আহমাদ ইবনু হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, অধ্যায়ঃ হায়য-ইস্তিহাযা ও নিফাস, পরিচ্ছেদঃ (৪), ... তাদের সাথে শোয়া ও খাওয়া দাওয়া বৈধ, ১/৩২৪, আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহ আত-তিরমিযী, ১/১৩২।

.

وَعَنْ أَنَسٍ - رضى الله عنه - { أَنَّ اَلْيَهُودَ كَانُوا إِذَا حَاضَتْ اَلْمَرْأَةُ لَمْ يُؤَاكِلُوهَا, فَقَالَ اَلنَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - "اِصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا اَلنِّكَاحَ

আনাস (রাযি) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, ইয়াহুদী লোকেরা তাদের হায়েযা স্ত্রীর সাথে পানাহার করা পরিত্যাগ করতো। নবী (ﷺ) বলেনঃ তোমরা যৌনমিলন ছাড়া তাদের সাথে সবই করবে।

.

মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায়ঃ (৩), হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৫৮৬; বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহিহ, অধ্যায়ঃ হায়য,পরিচ্ছেদঃ (২০৭), হায়য অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলামেশা করা, ১/২৯৬,২৯৭, ইবনু হাজার আসকালানী, বুলুগুল মারাম, অধ্যায়ঃ ঋতুবতী মহিলাদের যে সকল কাজ বৈধ, হাদিস নংঃ ১৪৩, হাদিস সহীহ।

.

ঋতুবতী স্ত্রীকে আলিঙ্গন করাঃ

.

রাসূল (ﷺ) তার ঋতুবতী স্ত্রীকে আলিঙ্গন করতেন। তাদের গায়ের সাথে গাঁ মিশিয়ে শুইতেন, এই সময় তার ঋতুবতী স্ত্রীর যৌনাঙ্গে একটি কাপড়ের পট্টি বাধা থাকতো। যা নিম্নোক্ত হাদিস গুলোর দ্বারা বুঝা যায়।

.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كَانَتْ إِحْدَانَا إِذَا حَاضَتْ أَمَرَهَا النَّبِيُّ ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَنْ تَأْتَزِرَ بِإِزَارٍ ثُمَّ يُبَاشِرُهَا

আয়িশাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ হায়েযগ্রস্ত হলে নাবী (ﷺ) তাকে তার (লজ্জাস্থানে) পাজামা শক্তভাবে বাঁধার নির্দেশ দিতেন, অতঃপর তাকে আলিঙ্গন করতেন।

.

বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহিহ, অধ্যায়ঃ হায়য,পরিচ্ছেদঃ (২০৭), হায়য অবস্থায় স্ত্রীর সাথে মিলামেশা করা, ১/২৯৬, মালিক বিন আনাস, আল-মুয়াত্তা, অধ্যায়ঃ (২) পবিত্রতা অর্জন, পরিচ্ছেদঃ (২৬) স্ত্রী ঋতুমতী থাকিলে .... , ১/৯৪, ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ, আস-সুনান, অধ্যায়ঃ পবিত্রতা ও তার পন্থাসমূহ, ১/৬৩৫,৬৩৬।

.

ঋতুবতী স্ত্রীর সাথে একই পাত্রে খাবার খাওয়াঃ

.

আল্লাহর রাসূল (ﷺ) এই সময়ে তাদের কে এক সাথে নিয়ে, একই থালায় খাবার গ্রহণ করতেন। শুধু এক সাথে নিয়ে খাবারই নয় আল্লাহ্‌র রাসুল (ﷺ) ঐ দিকে ঠোঁট লাগিয়ে পানি খেতেন যেদিক দিয়ে মা আয়িশা (রাযিঃ) হায়িজা অবস্থায় পানি খেতেন, আল্লাহর রাসূল (ﷺ) হাড় কে ঐ দিক থেকেই চিবাতেন যে দিক থেকে আয়িশা (রাযিঃ) ঋতুবতী অবস্থায় চিবাতেন। নিম্নোক্ত সহিহ হাদিস দ্বারা ইসলামের এই আচরণ গুলো অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাবে প্রমাণিত হয়।

.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ مِسْعَرٍ، وَسُفْيَانَ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ كُنْتُ أَشْرَبُ وَأَنَا حَائِضٌ، ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ فَيَشْرَبُ وَأَتَعَرَّقُ الْعَرْقَ وَأَنَا حَائِضٌ ثُمَّ أُنَاوِلُهُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَيَضَعُ فَاهُ عَلَى مَوْضِعِ فِيَّ . وَلَمْ يَذْكُرْ زُهَيْرٌ فَيَشْرَبُ.

আয়েশা (রাযি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ আমি ঋতুবতী অবস্থায় পানি পান করতাম এবং পরে নবী (ﷺ) কে অবশিষ্টটুকু প্রদান করলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়ে পান করতাম তিনিও সেই স্থানেই মুখ লাগিয়ে পান করতেন। আবার আমি ঋতুবতী অবস্থায় হাড় খেয়ে তা নবী (ﷺ) কে দিলে আমি যেখানে মুখ লাগিয়েছিলাম তিনি সেখানে মুখ লাগিয়ে খেতেন।

.

মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, আস-সহীহ, অধ্যায়ঃ (৩) হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৫৯৯, আহমাদ ইবনু হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, অধ্যায়ঃ হায়য-ইস্তিহাযা ও নিফাস, অনুচ্ছেদঃ ঋতুবতী মহিলাদের সাথে খাওয়া দাওয়া .... , ১/৩২৭, ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ, আস-সুনান, ১/৬৩৪, আবু দাউদ, সুলাইমান ইবনু আশয়াস, আস-সুনান, ১/২৫৯ ।

.

حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ الْعَنْبَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالاَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنْ مُوَاكَلَةِ الْحَائِضِ فَقَالَ

আবদুলাহ ইবনু সা'দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি হায়িযা নারীর সাথে একত্রে পানাহাযর সম্পর্কে নাবী (ﷺ) কে প্রশ্ন করলাম। তিনি বললেনঃ তার সাথে খাও।

.

আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহ আত-তিরমিযী, ১/১৩৩, ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ, আস-সুনান ১/৬৫১, নাসাঈ, আহমাদ ইবনু শুয়াইব, আস-সুনান, ১/৭৬৮, ; ঈমাম আবূ 'ঈসা (রাহি) বলেন, এ হাদীসটি হাসান গরীব, শাইখ আলবানী বলেনঃ হাদীস সহীহ ।

.

ঋতুবতী স্ত্রীর দ্বারা মাথা আঁচড়িয়ে নেয়াঃ

.

আল্লাহ্‌র নবী (ﷺ) তাঁর ঋতুবতী স্ত্রীদের দিয়ে তাঁর মাথাকে পরিপাটি করে নিতেন। এমনকি তিনি যখন মসজিদে ইতিকাফ করতেন তখনও মা আয়িশা (রাযিঃ) রাসুলুল্লাহর মাথা আচড়িয়ে পরিপাটি করে দিতেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ (ﷺ) তাকে অশুচি, অপয়া বা পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট রূপে গণ্য করেন নি। যা আমরা নিম্নে উল্লেখিত সহীহ হাদিসের মাধ্যমে প্রমাণ পাই।

.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، قَالَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، أَنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَهُمْ قَالَ أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّهُ سُئِلَ أَتَخْدُمُنِي الْحَائِضُ

أَوْ تَدْنُو مِنِّي الْمَرْأَةُ وَهْيَ جُنُبٌ فَقَالَ عُرْوَةُ كُلُّ ذَلِكَ عَلَىَّ هَيِّنٌ، وَكُلُّ ذَلِكَ تَخْدُمُنِي، وَلَيْسَ عَلَى أَحَدٍ فِي ذَلِكَ بَأْسٌ، أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ أَنَّهَا كَانَتْ تُرَجِّلُ ـ تَعْنِي ـ رَأْسَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهِيَ حَائِضٌ، وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حِينَئِذٍ مُجَاوِرٌ فِي الْمَسْجِدِ، يُدْنِي لَهَا رَأْسَهُ وَهْىَ فِي حُجْرَتِهَا، فَتُرَجِّلُهُ وَهْىَ حَائِضٌ.

উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, ঋতুবতী স্ত্রী কি স্বামীর খেদমত করতে পারবে? অথবা গোসল ফরয হওয়ার অবস্থায় কি স্বামীর নিকটবর্তী হতে পারে? উরওয়া জবাব দিলেন এ সবই আমার কাছে সহজ। এ ধরণের সকল মহিলাই স্বামীর খেদমত করতে পারে। এ ব্যাপারে কারো অসুবিধা থাকার কথা নয়। আমাকে আয়িশা (রাযি) বলেছেনঃ তিনি ঋতুবতী অবস্থায় রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর চুল আঁচড়ে দিতেন। আর রাসুলুল্লাহ (ﷺ) মু'তাকিফ অবস্থায় মসজিদ থেকে তার হুজরার দিকে মাথাটা বাড়িয়ে দিতেন। তখন তিনি মাথার চুল আঁচড়াতেন অথচ তিনি ছিলেন ঋতুবতী।

.

বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহিহ,অধ্যায়ঃ হায়য,পরিচ্ছেদঃ (২০৪), হায়েযের সময় স্বামীর মাথা ধুয়ে দেয়া, ১/২৯২।

.

স্ত্রীর সাথে একই পাত্রে গোসল করাঃ

.

হায়েজা স্ত্রীদের সাথে একই পাত্রে পানি নিয়ে একই গোসলখানায় গোসল করা, ইসলাম সমর্থিত বিষয়, যা আমরা নবী (ﷺ) এর সহীহ হাদিস থেকে প্রমাণ পাই।

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ، حَدَّثَتْهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ حَدَّثَتْهَا قَالَتْ، بَيْنَمَا أَنَا مُضْطَجِعَةٌ، مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْخَمِيلَةِ إِذْ حِضْتُ فَانْسَلَلْتُ فَأَخَذْتُ ثِيَابَ حَيْضَتِي فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " أَنُفِسْتِ " . قُلْتُ نَعَمْ . فَدَعَانِي فَاضْطَجَعْتُ مَعَهُ فِي الْخَمِيلَةِ . قَالَتْ وَكَانَتْ هِيَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْتَسِلاَنِ فِي الإِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ

উম্মে সালামা (রাযি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ একদিন আমি রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর সঙ্গে একই বিছানায় ছিলাম। এমন সময়ে আমার ঋতু দেখা দিলে আমি....... .... । উম্মে সালামা একথাও বলেছেন যে, তিনি এবং রাসুলুল্লাহ (ﷺ) (নাপাক অবস্থায়) এক সাথে একই পাত্র হতে পানি নিয়ে পবিত্রতার জন্য গোসল করতেন।

.

বুখারী, মুহাম্মাদ ইবনু ইসমাঈল, আস-সহিহ, ২/৫৯০।

.

প্রাত্যহিক কোন কাজে ঋতুবতী স্ত্রীর সাহায্য নেওয়াঃ

.

উল্লেখিত কাজ ছাড়াও আপনি আপনার প্রত্যহিক যে কোন ধরণের কাজে আপনার ঋতুবতী স্ত্রীর সহায়তা নিতে পারবেন।

وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الآخَرَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم " نَاوِلِينِي الْخُمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ " . قَالَتْ فَقُلْتُ إِنِّي حَائِضٌ . فَقَالَ " إِنَّ حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ فِي يَدِكِ "

আয়িশা (রাযি) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেনঃ রাসুলুল্লাহ (ﷺ) ই'তিকাফ থাকা অবস্থায় মসজিদ থেকে আমাকে (হাত বাড়িয়ে) জায়নামাযটি দেয়ার জন্যে আদেশ করলেন। আমি বললামঃ আমিতো ঋতুবতী। তিনি আবার বললেনঃ তা আমাকে দাও, ঋতুতো আর হাতে লেগে নেই।

.

মুসলিম, আবুল হোসাইন ইবনুল হাজ্জাজ, অধ্যায়ঃ (৩), হায়েজ সম্পর্কিত বর্ণনা, ২/৫৯৭,৫৯৮; আহমাদ ইবনু হাম্বল, মুসনাদে আহমদ, অধ্যায়ঃ হায়য-ইস্তিহাযা ও নিফাস, পরিচ্ছেদঃ পরিচ্ছেদঃ (৫), ঋতুবতী মহিলার কোলে কুরআন তিলাওয়াত করা .... , ১/৩২৮, আলবানী, মুহাম্মাদ নাসিরুদ্দীন, সহীহ আত-তিরমিযী, ১/১৩৪, ইবনু মাজাহ, মুহাম্মাদ ইবনু ইয়াযিদ, আস-সুনান, ১/৬৩২ ।

চলবে ইনশাআল্লাহ ....

১৪৩

ইসলাম কি আসলেই মানুষের বানানো?

-সাইফুর রহমান

প্রায় ১.৬ বিলিয়ন মানুষের অনুসৃত ধর্ম ইসলামকে অনেকে মনে করে মানুষের বানানো ধর্ম !!! এইসব কলাবিজ্ঞানীদের মাথায় এতটুকু কমন সেন্স নাই, মানুষের দেয়া কোনো বিধান যুগে যুগে বিলিয়ন বিলিয়ন মানুষ ফলো করতে পারে না। মানুষেরা ধর্ম তৈরী করার কম চেষ্টা করে নি কিন্তু কোনো ধর্মই সমাদৃত হয়নি। শুধুমাত্র আঠারো শতকের পর থেকে আজ অবধি পৃথিবীতে মানবসৃষ্ট ধর্মের সংখ্যা একশ'র আশেপাশে!!! আধুনিক মানুষ আধুনিক ধারণা ও প্রযুক্তি দিয়ে সেকেলে ধর্মকে বাতিল প্রমাণ করতে অনেক বিধান তৈরী করেছে, কিন্তু ফলাফল শূন্য। বিজ্ঞান, অর্থনীতি, সমাজনীতি সহ সবধরণের নীতি সংস্বলিত ধর্ম বানানোর চেষ্টা করা হয়েছে, মানুষ গ্রহণ করেনি। অনেকে ধর্মীয়গ্রন্থও তৈরী করেছে তাদের ধর্মের, কেউ নিজে লিখেছে, কেউ বিভিন্ন জায়গা থেকে কপি পেস্ট করে চালিয়ে দিয়েছে, কোনোটাই মানুষ গ্রহণ করেনি। এই সব ধর্মের অধিকাংশের কেউ কোনো দিন নামও শোনেনি, ফলোয়ারদের সংখ্যা হাতে গোনা।
আধুনিক যুগের মানুষেরা মনে করে ইসলাম একটা সেকেলে পন্থা। অথচ আজ পর্যন্ত পৃথিবীর কোনো মানুষ ইসলামের অনুরূপ কোনো বিধান দাঁড় করতে পারেনি। অযথা আস্ফালন না করে, কলাবিজ্ঞানীদের উচিত ইসলামের অনুরূপ একটা জীবন ব্যবস্থা সৃষ্টি করে প্রমান করা যে ইসলাম মানবসৃষ্ট, যদিও এই চ্যালেঞ্জ আরো প্রায় ১৫০০ বছর আগেই দেয়া হয়েছে, কেউ গ্রহণ করেনি।

.

.

অবসরের ফাঁকে মাঝে মাঝে ক্যামব্রিজে টুর গাইড হিসাবে কাজ করি। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বিভিন্ন বয়সের শিক্ষার্থীদের কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির নামকরা কলেজ ও বিখ্যাত সব স্থাপনা ঘুরিয়ে দেখানো এবং এর ইতিহাস সম্পর্কিত তথ্য দেয়াই মূল কাজ। অল্পবিস্তর পড়াশোনাও করতে হয় এই কাজ করতে গিয়ে। পেমব্রুক নামক ক্যামব্রিজের একটি কলেজের ইতিহাস পড়তে গিয়ে অবাক হলাম। ১৩৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই কলেজের শুরুর দিকে একটা নিয়ম ছিলো, কোনো ছাত্র যদি দেখতো অন্য আরেকজন ছাত্র এলকোহল পান করছে বা ব্রোথেল হাউসে যাতায়াত করছে তখন কলেজ কর্তৃপক্ষের কাছে গিয়ে ওই ছাত্রের নামে রিপোর্ট করতে হতো!!!!
বর্তমান সময় ও পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এই নিয়মটিকে রূপকথার গল্প মনে হয়। খুব বেশিদিন আগের কথা নয়, যখন ক্রিস্টিয়ান নারীরা হিজাব পরতো। ইসলামের সাথে বাকিদের পার্থক্য এখানেই, ইসলাম তার স্বকীয়তা বজায় রেখে চলেছে গত ১৪০০ বছর ধরে। এ কারণেই বাকিরা লেজ কাটা শিয়ালের মতো চায় ইসলামও যেন তার অঙ্গ প্রতঙ্গ হারিয়ে বিকৃত হয়ে তাদের সাথে মিশে যাক।

১৪৪

ধার্মিকরা কি পরকালের পুরস্কারের লোভেই সব ভালো কাজ করে? তাহলে বিবেকের গুরুত্ব কোথায়?

-হোসাইন শাকিল

আজ ৮,৩০ থেকে ক্লাস তাই খেয়ে দেয়ে ৭,১৫ তেই ভার্সিটির উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলাম। একঘন্টার কমে ভার্সিটিতে পৌছানো কষ্টকর আর আগেভাগে না গেলে ৫মিনিট দেরী হলেই দিদার স্যার আজকের দিন এবসেন্ট দিয়ে দিবেন। এত সকাল সকাল স্যারেরা ক্লাস নিয়ে যে কি পান তা আল্লাহই ভালো জানেন, ফজর পড়ে কখনো যদি একটু ঘুমের ঝিমটি আসেও, তবুও ঘুম যাওয়ার কোনো উপায় নেই, এইসব ছাইপাশ ভাবতে ভাবতে বাসে উঠে গেলাম। বাসে উঠেই ইয়ারফোন কানে গুজে দিয়ে জুন্দুল্লাহ নাশিদটা ধরিয়ে দিলাম। চারপাশের শব্দ থেকে নিজের কানকে প্রটেক্ট করতে প্রিয় নাশিদটা এই মুহূর্তে বেশ কাজে দেবে।

.

নাশিদ শুনতে শুনতে চোখ দুটো সামান্য বন্ধ হয়ে আসছিলো হঠাত ফোনটা কেপে উঠলো, চোখ মেলতেই স্ক্রীনে ভেসে উঠলো আওয়াব নামটি। কল রিসিভ করতেই ওইপাশ থেকে কণ্ঠ ভেসে উঠলো,

.

-আসসালামু আলাইকুম, কি আসছিস ভার্সিটিতে?
-হুম, বাসে আছি। তুই কোথায়?
-ভার্সিটিতে। তুই আয় তাহলে আমি অপেক্ষা করতেছি ইনশাআল্লাহ।
-ইনশাআল্লাহ।

.

বাস থামলো ভার্সিটি গেটের সামনে। নেমে পড়েই আওয়াবকে খুজতে লাগলো আমার চোখ জোড়া, ওকে দেখতে না পেয়ে আমি কল দিতে যাবো এমন সময়ই পেছন থেকে কণ্ঠ ভেসে আসলো,

.

-আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ

.

-ওয়ালাইকুমুস সালামু ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু বলতে বলতে পেছনে তাকিয়ে সাদা-কালো মিক্সড চেক পাঞ্জাবী, কালো গোল টুপি আর টাখনু থেকে বেশ খানিকটা উপর পর্যন্ত ছাটা কালো প্যান্ট পরিহিত আওয়াবকে দেখতে পেলাম। বললাম "কিরে কোথায় ছিলি?"

.

-এই তো একটু ওদিকে ছিলাম

.

ও আওয়াব। পাঁচ ফুট ছয় ইঞ্চি উচ্চতার হালকা গড়নের ছেলে, চুল ঘন হলেও দাড়ি বেশ পাতলা। ওকে একবার ওর নামের অর্থ জিজ্ঞাসা করেছিলাম

.

-দোস্ত তোর নামের অর্থটা কি?

.

-আওয়াব অর্থ যে অধিক পরিমানে আল্লাহর নিকট তাওবা করে। হান্নাদ ইবনু সারীর কিতাবুয যুহদে এসেছে বিখ্যাত মুফাসসির ইমাম মুজাহিদ বলেন, “আওয়াব হলো তারাই যারা নিজেদের পাপসমূহকে গোপনে বেশি বেশি স্মরণ করে আর তার জন্যে আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে” এককথায় যারা প্রতিটি কাজেই আল্লাহর দিকে অভিমুখী তাদেরকেই আওয়াব বলে। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা সুলাইমান(আ) ও দাউদ(আ) কে আওয়াব বলে সম্বোধিত করেছেন। আল্লাহ যেনো আমাদেরকে সত্যিকারেই আওয়াবদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আমিন। আওয়াবের উত্তর

.

-আমিন

.

ও নিজের দ্বীন চর্চার ব্যাপারে অনেক বেশি সচেতন। ছেলেটাকে প্রথম দেখাতেই একটু আলাদা লেগেছিলো আর অন্য রকম একটা ভালোলাগা কাজ করেছিলো, হুজুর বলেই হয়ত এত ভালোবাসা পরস্পরে।

.

পুরোনো স্মৃতি মন্থন করতে করতে কোথায় যেন হারিয়ে গিয়েছিলাম, সম্বিতে ফিরলাম আওয়াবের ডাক শুনে

.

-এই যে মি. কোথায় হারিয়ে গেলেন এই ভার্সিটি গেটের সামনে দাঁড়িয়ে? হুম?

.

-না দোস্ত কোথাও না। চল ক্লাসে যাই দেরী না করে। দিদার স্যার ক্লাসে এসে পড়লে আর উনার পরে আমরা গেলে আজকে এত কষ্ট করে এসেও এবসেন্ট থাকতে হবে। চল চল।

.

-হুম।

.

সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে ক্লাসে যেয়ে ৩নং রো'এর ৫নং বেঞ্চে দুজন বসে পড়লাম। একটু পরেই আসলো আধুনিক যুগের ডিজিটাল ছেলে জনি। আমাদের দেখেই একগাল হাসি হেসেই বলে উঠলো, “আরে, হুজুরস! কি অবস্থা?” এই জনির চিরজীবনের অভ্যাস আমাদের দেখলেই তার টীকা-টিপ্পনী কাটতেই হবে তা না হলে যেন ওর দিনের শুরুটা ভালো হয়না।

.

-কি মি. আওয়াব? কি অবস্থা আপনার? জনির প্রশ্ন
-আলহামদুলিল্লাহি আলা কুল্লি হাল। ভালো তোর কি অবস্থা? আওয়াবের জবাব।
-ফাইন, ম্যান। ঘুরছি ফিরছি, বন্ধু-বান্ধব, আড্ডা আর গিটার নিয়েই ভালো আছি, মুক্ত স্বাধীন জীবন আমাদের। তোদের মত না যে এটা করা যাবেনা, ওইটা ধরা যাবেনা, সেটা ছোঁয়া যাবেনা। হিহ! তাচ্ছিল্যের সুর পরিষ্কার জনির ভাষায়।

.

নিশ্চুপ থেকে সুন্নাহ মোতাবেক মুচকি হাসি দিলো আওয়াব।

.

স্যার এসে পড়লো তা না হলে জনির উদরে হয়ত আরো কিছু কথা পরিপাক হচ্ছিলো মনে হয়। যাক ভালোই হলো। বাচা গেছে।

.

ক্লাস শেষ করে আমি আর আওয়াব সিড়ি দিয়ে নিচে নামছিলাম।

.

-এখন কোথায় যাবি, আওয়াব?
-দেখি ক্যান্টিনে যেয়ে কিছু চা-কফি খেতে পারি কিনা

-চল তাহলে

.

এমন সময় পিছন থেকে জনির ডাক শুনতে পেলাম,

.

-হুজুরস!! ও হুজুরস!!

.

-আমি একটু রাগত স্বরে বলে উঠলাম “কি ভাই তোর সমস্যা কি, আমাদের কি নাম ধাম নাই নাকি, হ্যা?” আওয়াব আমাকে ইশারায় আর কথা বাড়াতে নিষেধ করে দিলো।

.

- এত রাগ করার কি হলো? বন্ধুদের ডাক ও দিতে পারবো না নাকি? জনি প্রশ্ন ছুড়ে দিলো। আওয়াব সামান্য হেসে বলে উঠলো কেন পারবি না অবশ্যই পারবি।

.

-চল ক্যান্টিনে যাই, চা-কফি পিয়ে আসি। যাবি তোরা?

.

ডান হাতের পাঞ্জাবীর স্লিভটি সামান্য সরিয়ে ঘড়ি দেখলো আওয়াব।

.

-হুম, যাওয়া যায় তো। আসলে আমরাও ওদিকেই যাবার চিন্তা করছিলাম। যোহরের নামাযের জামাতের এখনো প্রায় ৪৫ মিনিট বাকী তাহলে যাওয়াই যায়। আর তাছাড়া ক্যান্টিন থেকে ভার্সিটির মসজিদ বেশি দূরেও না। চল যাওয়া যাক।

.

-চল তাহলে।

.

ক্যান্টিনে যেয়ে তিনজনের জন্য ৩টি কফি অর্ডার দিলো জনি। আমাদেরকে জিজ্ঞেস করলো যে আমাদের আর কিছু লাগবে কি না। আমরা না বলে দিলাম।

.

কফি আনার মাঝের সময়টাতে আওয়াব আবার ঘড়ি দেখলো।ত

.

-থাক, থাক। আর ঘড়ি দেখা লাগবে না। তোদের আর কাজ কারবার!! সারাক্ষন একটা টেনশনের মধ্যে মসজিদে যেতে হবে, জামাত ধরতে হবে। না গেলে এই শাস্তি, গেলে সেই ফযীলত। সারাক্ষন এই ভয়ের মধ্যেই থাকিস তোরা।

.

জনির কথা শুনে সম্ভবত কিছু বলতে যাচ্ছিলো আওয়াব তবে ক্যান্টিনের ভাই কফি নিয়ে আসাতে থেমে গেল আওয়াব।

.

কফির এক চুমুক নিয়ে.............

.

-তো জনি কি জানি বলছিলি? কি জানি ভয় সয়ের কথা বলছিলি?

.

বলছিলাম তোদের অবস্থা। সারাক্ষন একটা ভয় না হলে ফযীলতের লোভ। জাহান্নাম জান্নাত এগুলোর ভয়।

.

-তো এতে কি হয়েছে?

.

-কোনো স্বাধীনতা নাই, নিজস্বতা বলতে কিছু নেই। মেয়েদের দিকে তাকানো যাবেনা, গান শুনা যাবেনা তাহলে এই শাস্তি দেওয়া হবে নিজের টাকা অন্যকে দান করে বেড়াতে হবে, পাঁচ পাঁচ বার নামায পড়তে হবে তাহলে এই ফযীলত এই পুরস্কার। ধর্ম জিনিসটাই এমন শুধু লোভ দেখাবে না হয় ভয় দেখাবে।

.

-আচ্ছা, জনি। তুই কি ডগলাস ম্যাকগ্রেগরের ‘X’ & ‘Y’ থিওরীর কথা জানিস?

.

-একটু বিরক্ত হয়ে জনির উত্তর “আমি বলি কি আর আমার সারিন্দা বাজায় কি?”

.

-এটা তোর কথার প্রসঙ্গেই বলা। জানিস কি এই দুই থিওরীর ব্যাপারে?

.

-নাহ, মনে পড়ছে না তো। এর সাথে আমার কথার কি সম্পর্ক?

.

-একটু অপেক্ষা কর, জনি। তুই কি কিছু জানিস এই ব্যাপারে? আমাকে উদ্দেশ্য করে আওয়াবের প্রশ্ন
-হুম, জানি তো। আমি বললাম

.

-আচ্ছা, তাহলে ‘X’ থিওরীটার সারসংক্ষেপ আমাদের বলতো।

.

-১৯৬০ সালে সোশ্যাল সাইকোলজিস্ট ডগলাস ম্যাকগ্রেগর তার The Human Side of Enterprise বইতে ব্যবস্থাপনার দুইটি থিওরী দেন যা Theory X ও Theory Y নামেই সুপরিচিত। “X” থিওরীর অন্যতম প্রতিপাদ্য বিষয় হলো মানুষ কাজ অপছন্দ করে, কাজ করতে চায়না, কাজ করতে উদ্দীপনা পায় না তাই তাদেরকে কাজ করার জন্য একটু ভয় দেখাতে হয়, তাদের দিয়ে কাজ আদায় করে নিতে হয়, তারা কাজে উদ্দীপনা পায় না তাই তাদেরকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার জন্য পুরস্কারের ব্যবস্থা করতে হয় তাদেরকে প্রলুব্ধ করার জন্যে।

.

-ঠিক বলেছিস। আচ্ছা, জনি তোর কি মত এই ব্যাপারে?

.

-কি আবার হবে?

.

-এখানে ম্যাকগ্রেগর ও বলেছেন মানুষ কাজ করতে চায়না ভয় অথবা পুরস্কার ছাড়া তাই তাদেরকে প্রলুব্ধ করতে হয়।

.

-তাই তো দেখছি।

.

-আরেকটু ভালো করে লক্ষ্য কর। চাকুরী ক্ষেত্রে ভালো কাজের জন্য প্রমোশন আছে, কখনো কোনো অসদুপায় উপায় অবলম্বন করলে শাস্তির ব্যবস্থা আছে তাই না?

.

-হুম।

.

-শাসন বিভাগের বিভিন্ন আইন আছে, যেখানে বিভিন্ন অপরাধের শাস্তি বর্ণনা করা আছে। চুরি করলে জেল, জরিমানা, খুন করলে মৃত্যুদন্ড ইত্যাদি। আছে না?

.

-হ্যা।আছে।

.

-এই কারনে কি কখনো তুই বা কোনো সুস্থ মস্তিষ্কের কেউ শাসন বিভাগকে দায়ী করবে যে শাসন বিভাগ মানুষের স্বাধীনতা হরণ করেছে। ভয় দেখিয়ে চুরি, ডাকাতি করতে দেয়নি? বা অফিসে প্রমোশন দেওয়া হলে কি কেউ কি বলবে যে না "তাকে লোভ দেখানো হয়েছে, তাকে প্রলুব্ধ করা হয়েছে। এটা ঠিক হয়নি?"

.

-নাহ। তা বলবো না। তবে আমার স্বাধীনতা হরণ করার অধিকার কারো নেই। আর তাছাড়া নিজের বিবেক মত ভালো হয়ে চললে আর খারাপ থেকে বিরত থাকলেই তো হলো।

.

-আচ্ছা, কেউ যদি নিজের মেয়ের সাথে শারিরীক সম্পর্ক স্থাপন করতে চায়। এটাকে তুই কেমন দৃষ্টিতে দেখবি?

.

-ছি!ছি! এমন মানুষ ও হয় নাকি? এটা তো অত্যন্ত নিকৃষ্ট কাজ।

.

- ২০১৩ সালের পরিসংখ্যান মতে আমেরিকায় ৩-৪ জনের মধ্যে ১ জন এবং ৫-৭ জনের মধ্যে ১ জন ছেলে পরিবারের সদস্যদের দ্বারা নিপীড়িত হয়। তাছাড়া আমেরিকাতে প্রবল ভাবে অযাচার বিদ্যমান। National Crime Records Bureau (NCRB) এর রিপোর্ট মতে, ভারতে ২০০৯ সাল থেকে ২০১১ সালে প্রায় ৩০.৭% অযাচার বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি কিছু কিছু দেশে তো এই ধরনের সম্পর্ককে বৈধ করার আইন প্রনয়ন ও করা হচ্ছে। একটু খোজাখুজি করলে এই সম্পর্কে তুই অনেক তথ্য পেতে পারিস।

.

-কি বলছিস?

.

-হ্যা, এটাই সত্য।

.

-ভয়ানক

.

-তাহলে এখন বল আমাকে কিভাবে তুই শুধুমাত্র বিবেককে স্ট্যান্ডার্ড করে ভালো খারাপের সিদ্ধান্ত কিভাবে নিবি? কেউ এই জঘন্য কাজকে বৈধ মনে করে আর কেউ একে অত্যন্ত ঘৃনার চোখে দেখে।

.

-আসলেই তো মুশকিল।

.

-হ্যাঁ, মুশকিলই। কারন মানুষের বিবেক সীমাবদ্ধ, বিবেক সবকিছু বুঝে উঠতে পারবে না কখনোই, মানুষের এই সীমাবদ্ধতা থাকবেই। বিবেক স্থান, কাল, পাত্র ভেদে পরিবর্তিত হতেই থাকে, তাই বিবেক কখনোই সার্বজনীন কোনো স্ট্যান্ডার্ড বলে বিবেচিত হতে পারেনা।

.

-জনি নিশ্চুপ।

.

-আল্লাহ আমাদেরকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্যে কে কে তার অনুগত হয় আর কে হয়না। তিনি আমাদেরকে তার বিধানাবলী সুস্পষ্ট করে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তিনি এই দুনিয়ার পরীক্ষার ফলাফল হিসেবে কিছু লোককে জান্নাতে আর জাহান্নামে দিবেন। তিনি বারবার দুনিয়ার পরীক্ষার কথা কুরআনে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন, সতর্ক করেছেন জাহান্নাম থেকে আর আশা দেখিয়েছেন জান্নাতের। যাতে কিয়ামতের দিবস যেদিন পরিপূর্ণ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়ে যাবে সেদিন পরিপুর্ণ হিসাব নিকাশ হতে পারে। যারা আল্লাহর সতর্ক বানীকে থোড়াই কেয়ার করেছে, যারা আল্লাহর বিধানাবলীকে অস্বীকার করেছে বা স্বীকার করা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃত ভাবে মেনে চলেনি, যারা দুনিয়ার ভোগ বিলাসে ব্যস্ত থেকে নিজের, কখনো পরিবার, বা সমাজ রাষ্ট্রের ক্ষতি করেছে আল্লাহর আনুগত্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, সেদিন আর তাদের আর কোনো অযুহাত পেশ করার সুযোগ থাকবে না। তাদের শাস্তি মূলত আল্লাহ রাব্বুল আলামীন যিনি আসমান ও জমিনের একচ্ছত্র অধিপতি তার বিধানাবলী অস্বীকার করে নিজের ইচ্ছামত জীবনযাপন ও এর ফলস্বরুপ সমাজ ও রাষ্ট্রের ক্ষতির জন্য প্রতিদানস্বরুপ। অপরদিকে, যারা দুনিয়াকে সত্যিই পরীক্ষার স্থান হিসেবে ব্যবহার করেছে, তারা অবাধ্যদের মত লাগামহীন স্বাধীনতায় ডুব দেয়নি, তারা আল্লাহর বিধানকে জীবনে সবক্ষেত্রে সর্বোচ্চে স্থান দিয়েছে, তারা দুনিয়ার ভোগ বিলাসে মত্ত না থেকে আল্লাহর আনুগত্য দ্বারা জীবন সাজিয়েছে, কখনো তাদের ওপর বিপদের পাহাড় ধ্বসে পড়েছে, পার্থিব দুখ কষ্ট তাদের অন্তরকে ব্যথিত করেছে, তাদের অন্তর কখনো এফোড় ওফোড় হয়ে গেলে ও তাদের অন্তর কখনোই আল্লাহর আনুগত্য থেকে ফিরে যায়নি অনড় ও অটল ছিলো আল্লাহর রাস্তায়। কখনো তাদের কষ্টার্জিত অর্থ গরীব দুখীকে দিতে হয়েছে, কখনো বা নিজের সবচেয়ে প্রিয় বস্তু জীবনই আল্লাহর আনুগত্য করতে বিলিয়ে দিতে হয়েছে আল্লাহর রাস্তায়। তাদের জান্নাতের পথ কখনোই ফুলেল শয্যা নয় বরং তা কন্টকাকীর্ণ পথ, তবে তারা আল্লাহর জন্যেই সবর করেছে দুনিয়ায়। আর এজন্যেই আল্লাহ কুরআনে অসংখ্য বার জান্নাতের আশা ও সুসংবাদ দিয়েছেন যাতে তারা তাদের পথে অটল থাকে। আর তার ফলাফলস্বরুপ আল্লাহর রহমতে তাদের কষ্ট, ধৈর্য ও তারা মানুষের যে মঙ্গল করেছে তার ফলাফল তারা পেয়ে যাবে আখিরাতে জান্নাত লাভের মাধ্যমে। তবে মুমিন ব্যক্তির জন্য আশা ও ভয় একটি পাখির দুটি ডানার মত উড়তে হলে দুটিই প্রয়োজন, মুমিন আল্লাহর রহমতের আশায় আশান্বিত থাকবে আবার বিপরীত দিকে আল্লাহর আযাবের ও ভয় করবে।
আশা করি বুঝতে পেরেছিস।

.

জনি কোনো কথা না বলে বিল দিতে চলে গেলো। আওয়াব যেতে বাধা দিলো "আজকের বিলটা না হয় আমিই দেই"। জনিও বাধা দিলো না আওয়াবকে। আওয়াব নিজের ঘড়ি দেখে,

.

-আর ২০মিনিট মাত্র বাকী জামাত শুরু হতে। আমরা আসি জনি।
-হুম, ঠিক আছে।

.

আমরা ও মসজিদ অভিমুখে চললাম।

---

[১] https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_74.htm
[২] https://www.theatlantic.com/.../america-has-an-incest.../272459/
[৩] http://archive.indianexpress.com/.../alarming-increas.../741160/
[৪] সূরা মুলক, ৬৭:২

১৪৫

চন্দ্রগ্রহণ

-শিহাব আহমেদ তুহিন

আধুনিক সময়ে আমরা সবকিছু যুক্তি দিয়ে বিচার করতে পছন্দ করি। তবে প্রাচীনকালে কিন্তু যুক্তির চেয়ে বিশ্বাসই বেশী প্রাধান্য পেতো। যেমন চীনারা বিশ্বাস করতো কোনো বিশাল আকারের ড্রাগন উড়ে গিয়ে চাঁদে হামলা করেছে। চেষ্টা করছে চাঁদটাকে গিলে ফেলার। ফলে চন্দ্রগ্রহণ হচ্ছে। এ কারণেই হয়তো চায়নীজ ভাষায় eclipse কে বোঝাতে "Shi" শব্দটা ব্যবহার করা হতো। "Shi" বলতে কোনো কিছুকে গিলে ফেলাকে বোঝানো হয়।

.

তো চাঁদকে ড্রাগন নামক দৈত্যের হাত থেকে বাঁচাতে কি করতে হবে? তারা বিশাল আকারের ড্রাম নিয়ে বাজানো শুরু করতো। অনেকক্ষণ বাজানোর পর যখন চন্দ্রগ্রহণ শেষ হয়ে যেতো, তখন তারা ভাবতো তাদের বাদ্য-বাজনার শব্দে বুঝি ড্রাগন ভয়ে পালিয়েছে। এবার আনন্দ করার পালা।

.

পবিত্র কুর'আনে আল্লাহ্ তায়ালা কিয়ামতের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন এমন এক সময়ের কথা যখন চন্দ্র জ্যোতিহীন হয়ে পড়বে।(৭৫:৮-৯) তাই চন্দ্রগ্রহণ কিংবা সূর্যগ্রহণ কিছুটা হলেও আমাদের কিয়ামতের কথা মনে করিয়ে দেয়। মনে করিয়ে দেয় একদিন আমাদেরকে আমাদের রবের সামনে দাঁড়াতে হবে। রাসূল (সা.) তাই একবার সূর্যগ্রহণ হলে মুসলিমদের সাথে নিয়ে সালাত আদায় করেছিলেন।

.

তার মানে আমাদের মুসলিমদের বিশ্বাস কি প্রাচীন চীনাদের মতো? চন্দ্রগ্রহণ হয়েছে তার মানে নিশ্চয়ই খারাপ কিছু হয়েছে? নাকি বারো শতকের ইউরোপের মতো- যখন ইংল্যাণ্ডের রাজা হেনরী ১১৩৩ সালে সূর্যগ্রহণের পর মারা গিয়েছিলেন তখন পুরো ইউরোপে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছিল? তারা ভেবেছিলো সূর্যগ্রহণের কারণেই এমনটা হয়েছে। আরো খারাপ কিছু আসছে।

.

আমরা মোটেও এমন অন্ধ-বিশ্বাস রাখি না। কিন্তু আমরা নিজেদেরকে বিজ্ঞান দ্বারা অন্ধ করে রাখি না। আমরা বিশ্বাস করি সকল ন্যাচারাল ফেনোমেনা আল্লাহ্র অনুমতিতেই ঘটে থাকে এবং এর দ্বারা তিনি অবশ্যই আমাদের কাছে কোনো মেসেজ পাঠাচ্ছেন। তাই আল্লাহ্কে স্মরণ করি। তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। একই কারণে ভূমিকম্প হলে সবাই যখন ভূগর্ভস্থ প্লেটগুলোর নড়াচড়া নিয়ে বিশাল লেকচার দেয়া শুরু করে, আমরা তখন তাঁকে স্মরণ করি যার কাছে শুধু এই প্লেটগুলোকে নড়াচড়া করানোই নয় বরং পৃথিবীকে ধ্বংস করে দেয়া একেবারেই মামুলী ব্যাপার।

.

তবে আমরা কোনো মিথ্যা বিশ্বাস রাখি না। আমাদের নবী (সা.) আমাদের কোনো মিথ্যা বিশ্বাস রাখতে দেননি। রাসূল (সা.) এর একমাত্র জীবিত ছেলে ইব্রাহীম (রা.) যেদিন মারা যান, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিলো। সবাই বলাবলি শুরু করলো, "ইব্রাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে।" রাসূল (সা.) যদি সত্যিই ভণ্ড নবী হতেন তবে তার জন্য এটা খুব সুবর্ণ সুযোগ ছিল। উনি বলতে পারতেন, "আমি একজন নবী! আমার ছেলের মৃত্যুতে যদি সূর্যগ্রহণ না হয়, তবে কার মৃত্যুতে হবে?" কিন্তু তিনি এই কুসংস্কারকে চিরতরে বিনষ্ট করে বললেন, "সূর্য ও চন্দ্র মহান আল্লাহ্ তায়ালার দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এগুলোর গ্রহণ হয় না।"
রাসূল (সা.), ইব্রাহীম (রা.) এর মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন আর করেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, "চোখ অশ্রুসিক্ত, হৃদয় ব্যথিত। তবুও আমরা এমন কিছু বলি না যা আমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করে।"

.

.

“তিনিই সূর্যকে করেছেন দীপ্তিময় এবং চাঁদকে আলোময় আর তার জন্য নির্ধারণ করেছেন বিভিন্ন মনযিল, যাতে তোমরা জানতে পার বছরের গণনা এবং (সময়ের) হিসাব। আল্লাহ এগুলো অবশ্যই যথার্থভাবে সৃষ্টি করেছেন। জ্ঞানী সম্প্রদায়ের জন্য তিনি নিদর্শনসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন।” (আল কুর'আন, সূরা ইউনুস :৫)

১৪৬

মালাকাত আইমানুহুম - মারিয়া কিবতিয়া (রা)

-শিহাব আহমেদ তুহিন

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
আল্লাহ্‌র বান্দা এবং রাসূল মুহাম্মদ এর পক্ষ থেকে কিব্‌ত প্রধান মুকাওকিসের প্রতি-

.

সালাম তার উপর যে হিদায়াতের অনুসরণ করবে। অতঃপর আমি আপনাকে ইসলামের দাওয়াত দিচ্ছি। ইসলাম গ্রহণ করুন, শান্তিতে থাকবেন। ইসলাম গ্রহণ করুন, আল্লাহ্‌ আপনাকে দ্বিগুণ সওয়াব দান করবেন। কিন্তু যদি মুখ ফিরিয়ে নেন তাহলে কিবতীগণের পাপ আপনার উপরেই বর্তাবে।

.

হে কিবতীগণ! একটি বিষয়ের দিকে আসো -যা আমাদের মধ্যে ও তোমাদের মধ্যে সমান। তা এই যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো ইবাদত করব না, তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করব না এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া কাউকে পালনকর্তা বানাব না। তারপর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও যে, 'সাক্ষী থাক আমরা তো মুসলিম।'
হুদাইবিয়া সন্ধির পর রাসূল (সা.) বিভিন্ন অঞ্চলের সম্রাট ও গভর্নরদের চিঠি পাঠানো শুরু করেন। তারই অংশ হিসেবে তিনি এই পত্রটি পাঠান মিশরের বায়জেন্টাইন গর্ভনর জুরাইজ বিন মাত্তার নিকট। তার পদবী ছিল 'মুকাওকিস'। জুরাইজ চিঠিটি খুব সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন। তিনি তা হাতির দাঁতের তৈরি একটি বাক্সে রাখলেন এবং তাতে সীলমোহর লাগিয়ে তা যত্ন সহকারে রাখতে একজন দাসীকে নির্দেশ দিলেন। তারপর রাসূল (সা.) এর পত্রের জবাবে লিখলেন-

.

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম
মুহাম্মদ বিন আব্দুল্লাহ্‌র প্রতি কিব্‌ত প্রধান মুকাওকিসের পক্ষ থেকে-
আপনি আমার সালাম গ্রহণ করুন। অতঃপর আপনার পত্র আমার হাতে এসেছে। পত্রে উল্লেখিত কথাবার্তা ও দাওয়াত আমি উপলব্ধি করেছি। এখন যে একজন নবীর আবির্ভাব ঘটবে সে বিষয়ে আমার ধারণা রয়েছে। আমার ধারণা ছিল যে, শাম রাজ্য থেকে উনি আবির্ভূত হবেন।
আমি আপনার প্রেরিত লোকের যথাযোগ্য সম্মান ও ইজ্জত করলাম। আপনার প্রতি আমার গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ দুটি দাসী প্রেরণ করলাম। কিবতীদের মধ্যে যারা বড় মর্যাদার অধিকারিণী। অধিকিন্তু, আপনার পরিধানের জন্য কিছু পরিচ্ছদ এবং বাহন হিসেবে একটি খচ্চর পাঠালাম উপহার হিসেবে। আপনার খিদমতে পুনরায় সালাম পেশ করলাম।[১]

.

আজকের লিখা মুকাওকিসের পত্রের "আমার গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ দুটি দাসী প্রেরণ করলাম" এই অংশ থেকে শুরু। উল্লেখিত দাসী দুইজনের নাম হচ্ছে মারিয়া এবং শিরীন। রাসূল (সা.) নিজের জন্য মারিয়া (রা.) কে রাখেন এবং শিরীনকে হাস্‌সান বিন সাবিত (রা.) এর কাছে দিয়ে দেন। দুইজনই সম্ভ্রান্ত বংশের নারী ছিলেন। সমালোচকরা প্রশ্ন করতে পারেন যে, সম্ভ্রান্ত হলে তারা আবার দাসী কী করে হয়?
বনী ইসরাইলে নিজ সন্তানকে প্রার্থনালয়ে সেবার জন্য উৎসর্গ করে দেয়ার প্রথা ছিল। কুর'আনে এর উল্লেখও রয়েছে। মরিয়াম (আ.) এর মা হিন্না বিনতে ফাকুয আল্লাহ্‌র নিকট দুয়া করেছিলেনঃ
"হে আমার পালনকর্তা! আমার গর্ভে যা রয়েছে আমি তাকে তোমার নামে উৎসর্গ করলাম সবার কাছ থেকে মুক্ত রেখে। আমার পক্ষ থেকে তুমি তাকে কবুল করে নাও। নিশ্চয়ই তুমি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞাত।" [সূরা আলি ইমরান (৩):৩৫]

.

খ্রিষ্টানদের কাজই ছিল ইহুদীদের প্রথাগুলোকে বিকৃত করা। ইহুদীরা শুধু উপাসনালয়ের জন্য উৎসর্গ করলেও খৃষ্টানরা নিজ সন্তানদের দাসী হিসেবে ধর্ম-যাজকদের উপহার দিত। যাতে করে তারা দাসী হিসেবে সেবা করতে পারে। যাজকরা চাইলে তাদের ভিন্ন কাজেও ব্যবহার করতে পারতেন। সম্ভবত মারিয়া এবং শিরীন উচ্চ বংশের হয়েও এ কারণেই পিতামাতা কর্তৃক দাসী হিসেবে প্রেরিত হয়েছিলেন।

.

"দাসী" শব্দটা শুনে যারা আঁতকে উঠেছেন এবং এটা ইসলাম কর্তৃক আবিষ্কৃত বর্বর(!) কোন প্রথা কিনা সেটা নিয়ে ভাবনায় হারিয়ে যাচ্ছেন তাদের কিছু ইতিহাস পাঠ জরুরী। সাধারণত সবাই দাসী বলতে ইংরেজি "Concubine" কে বুঝে থাকে। মূলতঃ Concubine বলতে এমন কাউকে বুঝানো হয় যার নিচু সামাজিক মর্যাদার কারণে তাকে বিয়ে করা সম্ভব হয় না কিন্তু শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়।[২] বাংলায় এদের রক্ষিতা কিংবা যৌনদাসী বলা হয়। এ প্রথার শুরু প্রাচীন চীনে। সেখানে একজন পুরুষ তার সামাজিক পদ-মর্যাদা অনুযায়ী যত খুশি তত রক্ষিতা রাখতে পারতো।[৩] গ্রীসে রক্ষিতাদের মর্যাদা এতোটাই নীচে ছিল যে তারা মালিকের স্ত্রীদের সাথে একই ছাদে থাকতে পারত না।[৪]
ইহুদী ও খৃষ্টানদের পবিত্র ধর্মগ্রন্থ বাইবেলে শত্রুপক্ষের কুমারী নারীদের দাসী বানাতে বলা হয়েছে-

.

"সমস্ত মিদিয়নীয় পুরুষদের হত্যা করো। সমস্ত মিদিয়নীয় স্ত্রীদের হত্যা করো যাদের কোন পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক ছিল। কিন্তু যেসব যুবতী নারীরা কোন পুরুষের সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেনি তাদের বাঁচিয়ে রাখো।[৫]

.

শুধু তাই না বাইবেল অনুসারে, একজন পিতা চাইলে তার কন্যাকে দাসী হিসেবে বিক্রি করে দিতে পারে। আর একবার দাসী হিসেবে বিক্রি করা হলে সে কোন ভাবেই মুক্তি পাবে না। ইসলাম এই বর্বর প্রথাগুলোকে সংশোধন করেছে।[৬] বাইবেল অনুসারে, সুলাইমান (আ.) এর ৭০০ জন স্ত্রী এবং ৩০০ জন রক্ষিতা ছিল।[৭] হিন্দু ধর্মগ্রন্থেও দাসীদের কথা উল্লেখ রয়েছে।[৮]

.

ইসলামে একজন মালিক চাইলে তার দাসীকে শুধু পরিচারিকা হিসেবে ঘরে রাখতে পারে। আবার চাইলে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। আল্লাহ্ বলেন-
"যারা নিজেদের যৌনাঙ্গকে সংযত রাখে। তবে তাদের স্ত্রী ও মালিকানাভুক্ত দাসীদের ক্ষেত্রে সংযত না রাখলে তারা তিরস্কৃত হবে না। কেউ এদেরকে ছাড়া অন্যকে কামনা করলে সীমালংঘনকারী হবে। [সূরা মুমিনুন (২৩): ৫-৭] [৯]

.

যদি কোন নারী মুসলিমদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে এবং বন্দী হয়, তবে সে দাসী হিসেবে গণ্য হবে। এক্ষেত্রে তার দাসত্বের মূল কারণ হচ্ছে কুফর। যাতে সে সৃষ্টির উপাসনা থেকে স্রষ্টার উপাসনার দিকে যেতে পারে। এছাড়া রাসূল (সা.) এর যুদ্ধনীতি ছিল যে, যেসব নারী ও শিশুরা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি তাদের আক্রমণ না করা। জিযিয়া কর দেয়ার শর্তে শান্তিপূর্ণভাবে ইসলামিক রাষ্ট্রে বসবাস করতে দেয়া। তাই দাস-দাসীতে পরিণত করার প্রশ্নই আসছে না এখানে। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও তিনি নারী আর শিশুদের আক্রমণ না করতে সাহাবীদের নির্দেশ দিতেন।
ইসলাম দাসীদের সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষেত্রে অনেক শর্ত ও বিধি-নিষেধ আরোপ করেছে। যেমনঃ গর্ভবতী নারীদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না।[১০] দুই বোন কিংবা মা-কন্যার সাথে একসাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করা যাবে না।[১১] যদি নারীর সাথে স্বামীও বন্দী হয় তবে তার সাথে মিলিত হওয়া যাবে না।[১২] দাসীকে অন্য কারো সাথে বিয়ে দিলে তার গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকানোও যাবে না।[১৩]

.

যুদ্ধে বন্দীদের কথা শুনলেই এই আধুনিক সময়ে আমাদের মাথায় ভেসে আসে- কিছু নারী যুদ্ধক্ষেত্রে ছোটাছুটি করছে, বিজিত

সৈন্যরা অট্টহাসি দিয়ে তাদের ধাওয়া করছে। যদিও এটা আমাদের পক্ষে কল্পনা করা কঠিন কিন্তু সত্যি হচ্ছে যে, পরাজিত হলে নারীরা যে দাসীতে পরিণত হবে সেটা মেনে নিয়েই তারা যুদ্ধক্ষেত্রে আসতো। এমনকি তারা খুব সুন্দর করে সেজে আসতো যাতে তাদের ভাগ্যে ভালো কেউ জোটে। ইতিহাসবিদ স্যামুয়েল বার্ডার লেখেন-

.

"প্রাচীনকালে যেসব নারীরা তাদের পিতা কিংবা স্বামীর সাথে যুদ্ধক্ষেত্রে যেতো, তারা খুব সুন্দর জামা আর অলঙ্কার পড়তো। যাতে বন্দী হলে তারা বিজিতের দৃষ্টি খুব সহজেই কাড়তে পারে।"[১৪]

ইসলামে দাসীর কনসেপ্ট একেবারেই আলাদা। প্রথমত প্রশ্ন আসতেই পারে, ইসলাম এই দাসী করার প্রথাটাকেই একেবারে বিলুপ্ত করেনি কেন? এরকম প্রশ্ন আমাদের মাথায় আসে কারণ আমরা আধুনিক কালের সমাজব্যবস্থা দিয়ে প্রাচীনকালকে পরিমাপ করি। সেসময়ে সব নারীদের ভাগ্য খাদিজা (রা.) এর মতো ছিল না যে নিজেই ব্যবসা করে তারা জীবিকা নির্বাহ করবে। যুদ্ধে বন্দী নারীদের হাতে দুইটি পথ খোলা ছিল- হয় পালিয়ে গিয়ে পতিতা হয়ে বেঁচে থাকা নতুবা বন্দী হয়ে অধীনস্থের পতিতা হয়ে যাওয়া। ইসলাম নারীদের জন্য এসব থেকে অনেক মর্যাদার সন্ধান দিয়েছে।

.

ইসলামে একজন নারী দাসী হলেও তাকে সামাজিকভাবে স্বীকৃতি দিতে হয়। তার সন্তানেরা নিজ স্ত্রীদের মতোই উত্তরাধিকার লাভ করে। মালিক চাইলে দাসীকে বিয়ে করতে পারে। দাসীর সাথে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন করলে এবং এর ফলে উক্ত নারী সন্তান জন্ম দিলে তাকে অন্য কারো নিকট বিক্রি করা যাবে না। তাকে তখন "উম্ম ওয়ালদ" বলা হবে। আর সন্তান জন্মের মাধ্যমে সে মুক্ত হয়ে যাবে। কোন দাসী যদি মুক্তি চায় তবে আল্লাহ্ তায়ালা তাকে মুক্ত করে দিতে মুসলিমদের উৎসাহিত করেছেন। শুধু তাই না মুক্ত করার সময় তাদের একবারে নিঃস্ব অবস্থায় না ছেড়ে কিছু অর্থ দান করতেও বলেছেন। পূর্বে একজন নারীর সাথে যেমন অনেক পুরুষ মিলিত হতে পারতো, ইসলাম এমন জঘন্য রীতিকে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেছে-

.

"তোমাদের অধিকারভুক্তদের মধ্যে যারা মুক্তির জন্য লিখিত চুক্তি করতে চায়, তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি কর যদি জান যে, তাদের মধ্যে কল্যাণ আছে। (মুক্ত করার সময়) আল্লাহ তোমাদেরকে যে অর্থ-কড়ি দিয়েছেন, তা থেকে তাদেরকে দান কর। তোমাদের দাসীরা নিজেদের পবিত্রতা রক্ষা করতে চাইলে পার্থিব জীবনের সম্পদের লালসায় তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য কারো না। যদি কেউ তাদের উপর জোর-জবরদস্তি করে, তবে তাদের উপর জোর-জবরদস্তির পর আল্লাহ তাদের প্রতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।" [আল কুর'আন, সূরা নূর(২৪):৩৩]

প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এই প্রথাটির উপর যখন অন্য ধর্মগুলো কেবল কাঠিন্যই আরোপ করেছে, তখন ইসলামের এই বিধানগুলো নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখলে অবশ্যই প্রশংসার দাবী রাখে। ইসলামী নীতিমালায় সমাজে দাস-দাসী বৃদ্ধি পাবার কোন সম্ভাবনা নেই। বরং ধীরে ধীরে তা কমতে থাকে।

.

ইসলাম দাস-দাসীদের বিনা কারণে প্রহার করাও হারাম করেছে। সাহাবী আবু মাসউদ (রা.) একবার এক দাসকে প্রহার করছিলেন। হঠাৎ পিছন থেকে একটি কণ্ঠ বলে উঠলো, "হে আবু মাসউদ! মনে রেখো তোমার এই দাসের উপর যতোটা না কর্তৃত্ব রয়েছে, আল্লাহ্‌র তোমার উপরে তার চেয়ে অনেক বেশী কর্তৃত্ব রয়েছে।" আবু মাসউদ (রা.) পিছনে তাকিয়ে দেখতে পেলেন কণ্ঠটি রাসূল (সা.) এর। তিনি ভীত হয়ে বললেন, "আমি আল্লাহ্‌র জন্য তাকে মুক্ত করে দিলাম।" তখন রাসূল (সা.) বললেন, "তুমি যদি তা না করতে তবে জাহান্নামের আগুন তোমার জন্য উন্মুক্ত হয়ে যেতো।"[১৫]

শুধু তাই না, স্ত্রীর সাথে যেমন স্বামীর জোর করে সহবাস অনুত্তম, দাসীর সাথেও জোরে করে সহবাস করাটাকে অনুত্তম বলা হয়েছে।[১৬]

অনেকে বলার চেষ্টা করেন যে, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানের আর্মিরা আমাদের বোনদের যে লাঞ্ছনার শিকার করেছে তা নাকি ইসলামসম্মত ছিল! বরং ইসলাম অনুযায়ী, তাদের সবকিছুই ছিল চূড়ান্ত পর্যায়ের জুলুম। আর ইন শা আল্লাহ্ আমাদের রব, যিনি ন্যায় বিচারক, জালিমদেরকে এসবের প্রতিদান দুনিয়া আর আখিরাতে দান করবেন।

কিছু ব্যতিক্রম বাদ দিলে প্রায় সকল স্কলারই একমত যে, রাসূল (সা.) এর দুইজন দাসী ছিল।[১৭] একজনের নাম মারিয়া (রা.), অপরজনের নাম রায়হানা (রা.)। কেউ কেউ আবার বলেছেন, রাসূল (সা.) প্রথমে তাদের দাসী হিসেবে গ্রহণ করলেও পরবর্তীতে মুক্ত করে বিয়ে করেছেন। মারিয়া (রা.) কে নিয়ে ইসলাম বিদ্বেষীরা একটি মিথ্যা ঘটনা প্রচার করে থাকে। সেটা নিয়ে আলোচনার পূর্বে সূরা আত-তাহরীমের প্রথম তিনটি আয়াত নিয়ে আলোচনা করা যাক। এখন এটা অপ্রাসঙ্গিক মনে হলেও পরবর্তীতে পাঠকরা এর গুরত্ব বুঝতে পারবেন। আল্লাহ্ বলেনঃ

.

১) "হে নবী, আল্লাহ আপনার জন্যে যা হালাল করছেন, আপনি আপনার স্ত্রীদেরকে খুশী করার জন্যে তা নিজের জন্যে হারাম করেছেন কেন? আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।
২) আল্লাহ তোমাদের জন্যে কসম থেকে অব্যহতি লাভের উপায় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের মালিক। তিনি সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।
৩) যখন নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন, অতঃপর স্ত্রী যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ নবীকে তা জানিয়ে দিলেন, তখন নবী সে বিষয়ে স্ত্রীকে কিছু বললেন এবং কিছু বললেন না। নবী যখন তা স্ত্রীকে বললেন, তখন স্ত্রী বললেনঃ কে আপনাকে এ সম্পর্কে অবহিত করল? নবী বললেন, যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।
৪) তোমাদের অন্তর অন্যায়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছে বলে যদি তোমরা উভয়ে তওবা কর, তবে ভাল কথা। আর যদি নবীর বিরুদ্ধে একে অপরকে সাহায্য কর, তবে জেনে রেখো আল্লাহ জিবরাঈল এবং সৎকর্মপরায়ণ মুমিনগণ তাঁর সহায়। উপরন্তু ফেরেশতাগণও তাঁর সাহায্যকারী।"

.

সহীহ বুখারীতে এ আয়াতসমূহের প্রেক্ষাপট নিয়ে একটি ঘটনা বর্ণিত রয়েছে। রাসূল (সা.) মিষ্টি ও মধু ভালোবাসতেন। তিনি যয়নাব বিনতে জাহশ (রা.) এর ঘরে মধু পান করতেন। এ কারণে তিনি তার ঘরে কিছুটা বিলম্ব করতেন। এই জন্যেই আয়েশা (রা.) ও হাফসা (রা.) পরামর্শ করেন যে, তাদের মধ্যে যার কাছেই রাসূল (সা.) প্রথমে আসবেন, তিনি যেন রাসূল (সা.) কে বলেন যে, "আপনার মুখ থেকে মাগাফীরের[১৮] গন্ধ আসছে। সম্ভবত আপনি মাগাফীর খেয়েছেন।" তাই রাসূল(সা.) তাদের নিকটে আসলে তারা এ কথাই বললেন। রাসূল (সা.) মুখে দূর্গন্ধ থাকাটাকে খুবই অপছন্দ করতেন। তাই তিনি বললেন, "আমি যয়নাবের ঘরে মধু খেয়েছি। আমি শপথ করছি যে, আর কখনো মধু খাবো না।" তিনি তাঁর এই শপথের কথা অন্য কারো নিকট প্রকাশ করতে নিষেধ করলেন। কারণ সবাই যদি জানতে পারে রাসূল (সা.) নিজের জন্য মধু হারাম করেছেন, তাহলে প্রত্যেকেই নিজের জন্য মধু হারাম করে নিবে।
৩য় আয়াতে "নবী তাঁর একজন স্ত্রীর কাছে একটি কথা গোপনে বললেন" বলতে রাসূল (সা.) এর এই মধু পান না করার শপথের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর দু'জন স্ত্রী বলতে বোঝানো হয়েছে আয়েশা (রা.) এবং হাফসা (রা.) কে।[১৯]

.

রাসূল (সা.) নিষেধ করলেও একজন স্ত্রী তা অপরজনের নিকট প্রকাশ করে দেয়। আল্লাহ্ তায়ালা আয়াত নাযিল করে রাসূল (সা.) কে এ কথা অবহিত করেন। রাসূল (সা.) এ ব্যাপারে উক্ত স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলে যে স্ত্রী কথাটি প্রকাশ করেছেন তিনি খুবই অবাক হন এবং জানতে চান যে, কে রাসূল (সা.) কে এ ব্যাপারে জানিয়েছেন? তখন রাসূল (সা.) জবাব দেন, "যিনি সর্বজ্ঞ, সম্যক অবহিত, তিনি আমাকে অবহিত করেছেন।"
যেহেতু নবীদের স্ত্রীদের নিকট এমন আচরণ প্রত্যাশিত নয়, তাই আল্লাহ্ তায়ালা আয়াত নাযিল করে তাদেরকে তিরস্কার করেন এবং সংশোধনের নির্দেশ দেন।

.

এই চারটি আয়াতের প্রেক্ষাপট নিয়ে আরেকটি ঘটনা সীরাত ও তাফসীর গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। ঘটনাটি মারিয়া (রা.) কে কেন্দ্র করে। তাফসীরে ইবনে জারিরে রয়েছে, হাফসা (রা.) এর ঘরে তার পালার দিনে রাসূল (সা.), মারিয়া (রা.) এর সাথে মিলিত

হন। এতে হাফসা (রা.) দুঃখিতা হন যে, তার ঘরে তার পালার দিনে তারই বিছানায় রাসূল (সা.) কিনা মারিয়া (রা.) এর সাথে মিলিত হলেন! রাসূল (সা.) তখন হাফসা (রা.) কে সন্তুষ্ট করার জন্য বললেন, "আমি তাকে আমার উপর হারাম করে দিলাম। তুমি এ কথা কাউকে জানিয়ো না।" কিন্তু হাফসা (রা.) এ ঘটনাটি আয়েশা (রা.) কে জানিয়ে দিলে আল্লাহ্ তায়ালা এ আয়াতসমূহ নাযিল করেন।

এ ঘটনা সম্পর্কে বিখ্যাত ইতিহাসবিদ ইবনে কাসির (রহ.) বলেন, "এটি একটি গারীব উক্তি। সম্পূর্ণ সঠিক কথা হলো যে, এই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হবার কারণ ছিল রাসূল (সা.) এর নিজের উপর মধুকে হারাম করা।"[১৯]

.

রাসূল (সা.) এক স্ত্রীর পালা অন্যকে দিবেন এটা তাঁর নীতির বিরুদ্ধে ছিল। আয়েশা (রা.) কে তিনি সবচেয়ে ভালোবাসলেও অন্য কোন স্ত্রীর পালা আয়েশা (রা.) কে দিতেন না। একবার অন্য এক স্ত্রীর পালার দিনে আয়েশা (রা.) তাঁর নিকটে আসলে তিনি বলেন, " আয়েশা! আমার কাছ থেকে দূরে থাকো! আজকে তোমার দিন না।"[২০]

.

এটা খুব আশ্চর্যের যে, ইসলাম বিদ্বেষীরা সহীহ বুখারীর একটি সহীহ বর্ণনাকে উপেক্ষা করে গারীব উক্তিকে আঁকড়ে ধরছে কুৎসা রটানোর জন্য। এমনকি তারা গারীব ঘটনাটিতেও নিজেদের কথা যুক্ত করে। তাদের ভার্সন অনুযায়ী- রাসূল (সা.) মিথ্যা বলে হাফসা (রা.) কে বাবার বাড়ী পাঠিয়ে দেন। তারপর হাফসা (রা.) এর ঘরে প্রবেশ করে হাফসা (রা.) এর দাসী মারিয়া (রা.) এর সাথে মিলিত হন। এদিকে হাফসা (রা.) বাবার বাড়ী থেকে যখন নিজ গৃহে প্রবেশ করে রাসূল (সা.) কে নিজ দাসীর সাথে দেখতে পান তখন প্রচণ্ড রেগে যান। রাসূল (সা.) তাকে শান্ত করেন এবং এ ঘটনাটি কাউকে বলতে নিষেধ করেন। কিন্তু হাফসা (রা.) এ ঘটনাটি প্রকাশ করে দিলে সব স্ত্রীকে উচিত শিক্ষা দেবার জন্য রাসূল (সা.) সকল স্ত্রীর সাথে এক মাস দেখা করবেন না বলে শপথ করেন।

এ গল্পটি চূড়ান্ত পর্যায়ের মিথ্যাচার। এ গল্পের সমর্থনে সহীহ হাদীস দূরে থাকুক কোন জাল হাদীসও নেই। এখানে বলা হয়েছে, হাফসা(রা.) এর দাসী ছিলেন মারিয়া (রা.)। অথচ মারিয়া (রা.) ছিলেন রাসূল (সা.) এর দাসী যাকে কিনা মিশরের মুকাওকিস উপহার হিসেবে পাঠিয়েছিলেন।

এক মাস দেখা না করার যে শপথের কথা বলা হয়েছে সেটি সম্পূর্ণ আলাদা ঘটনা। ইতিহাসে এটি "ঈলার ঘটনা" নামে পরিচিত। আমরা জানি, রাসূল (সা.) অত্যন্ত সাদা-সিধে জীবনযাপন করতেন। আয়েশা (রা.) এর ভাষায়- টানা তিনদিন নবী পরিবারে খাবার জুটেছে কখনো এমনটা হয়নি। তিনি আরো বলেছেন- মাসের পর মাস চুলোয় আগুন জ্বলতো না। শুকনো খেজুর আর পানিতেই দিন কাটতো। উম্মুল মুমিনীনরা সবসময় দুনিয়ার চেয়ে আখিরাতকেই বেশী প্রাধান্য দিতেন। কিন্তু তারাও মানুষ ছিলেন। তাই সংসারের খরচ বাড়াতে তারা বারবার রাসূল (সা.) কে বারবার পীড়াপীড়ি করতেন। এ নিয়ে কিছুটা মনমালিন্যের প্রেক্ষিতে তিনি এক মাস স্ত্রীদের সাথে দেখা করবেন না বলে শপথ করেন।[২০] এ ঘটনার সাথে মধু নিয়ে শপথ করার ঘটনার কোন সম্পর্ক নেই।

.

মারিয়া (রা.) কে নিয়ে লেখাটি শুরু করেছিলাম, তাকে নিয়েই শেষ করি। রাসূল (সা.), মারিয়া(রা.) কে খুব পছন্দ করতেন। তিনি রাসূল (সা.) কে একটি ছেলে সন্তান উপহার দিয়েছিলেন। এ জন্য তাকে বলা হয় "উম্ম ওয়ালাদ"। ছেলে সন্তান জন্মানোর খবর রাসূল (সা.) এর নিকট পৌঁছালে তিনি বলেন, "তার সন্তান তাকে মুক্ত করে দিয়েছে।"[২১] ছেলেটির নাম ছিল ইব্রাহীম (রা.)। তিনি কেবল ষোল মাস বেঁচেছিলেন। তার মৃত্যুতে কিছু মুনাফিক বলাবলি করেছিল, "মুহাম্মদ আল্লাহ্‌র নবী হলে তার ছেলে এভাবে মারা যেতো না।"। অথচ ইব্রাহীম (রা.) এর জন্মের বহু আগেই সূরা আহযাবে আল্লাহ্ বলেছেন-

.

"মুহাম্মদ তোমাদের কোন ব্যক্তির পিতা নন; বরং তিনি আল্লাহর রাসূল এবং শেষ নবী। আল্লাহ সব বিষয়ে জ্ঞাত।" [সূরা আহযাব(৩৩):৪০]

এখানে আরবী "رجل" শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে। যার অর্থ পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তি। সুতরাং ইব্রাহীম (রা.) যদি বয়ঃপ্রাপ্ত হতেন, তবে

কুর'আনের এই আয়াত ভুল প্রমাণিত হতো। তাই শিশু ইব্রাহীম (রা.) এর মৃত্যুই প্রমাণ করে কুর'আন আল্লাহ্‌র বাণী আর মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রাসূল।

ইব্রাহীম (রা.) যেদিন মারা যান, সেদিন সূর্যগ্রহণ হয়েছিল। সবাই বলাবলি শুরু করলো, "ইব্রাহীমের মৃত্যুর কারণে সূর্যগ্রহণ হয়েছে।" রাসূল (সা.) যদি সত্যিই ভণ্ড নবী হতেন তবে তার জন্য এটা খুব সুবর্ণ সুযোগ ছিল। উনি বলতে পারতেন, "আমি আল্লাহ্‌র নবী! আমার ছেলের মৃত্যুতে যদি সূর্যগ্রহণ না হয়, তবে কার মৃত্যুতে হবে?" কিন্তু তিনি এই কুসংস্কারকে চিরতরে বিনষ্ট করে বললেন, "সূর্য ও চন্দ্র মহান আল্লাহ্‌র দু'টি নিদর্শন। কারো মৃত্যুর কারণে এগুলোর গ্রহণ হয় না।"

.

রাসূল (সা.), ইব্রাহীম (রা.) এর মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন আর করেছিলেন তাঁর সেই বিখ্যাত উক্তি, "চোখ অশ্রুসিক্ত, হৃদয় ব্যথিত। তবুও আমরা এমন কিছু বলি না যা আমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করে।"

যারা ইসলামে বর্বর দাস-প্রথা নিয়ে বিশাল সব লেখা লেখেন তারা কি জানেন মৃত্যুর আগে সবাইকে উদ্দেশ্য করে রাসূল (সা.) বারবার কি বলেছিলেন? তিনি বলেছিলেন-

"সলাত এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসী (এদের ব্যাপারে যত্নবান হও)।"

তথ্যসূত্রঃ

[১] আর রাহেকুল মাখতুমঃ আল্লামা শফিউর রহমান মোবারকপুরী (রহ.) – পৃষ্ঠা ৪০৬

[২] https://en.wikipedia.org/wiki/Concubinage

[৩] Shi Fengyi (1987): Zhongguo gudai hunyin yu jiating -Marriage and Family in ancient China. Wuhan: Hubei Renmin Chubanshe, p. 74.

[৪] James Davidson. Courtesans and Fishcakes: The Consuming Passions of Classical Athens. pp. 98–99.

[৫] Holy Bible- Book of Numbers: Chapter 31, verse 17-18

[৬] Holy Bible- Book of Exodus: Chapter 21, verse 7

[৭] Holy Bible- 1 kings : Chapter 11, verse 3

[৮] Mahabharata 4:72

[৯] এছাড়া দেখুন, আল কুর'আন- সূরা নিসা ৪:২৪, সূরা আযহাব ৩৩:৫০, সূরা মাআরিজ ৭০:৩০

[১০] সুনান আবু দাউদ, ৩/১৬১

[১১] মুয়াত্তা মালিক, ২/১৪৪-৪৫, রেওওয়ায়েত ৩৩ -৩৫

[১২] কিতাবুস সিয়ারুস সাগীর (ইংরেজী অনুবাদ),অধ্যায় ২, অনুচ্ছেদ ৪৫, পৃষ্ঠা ৫১,

[১৩] সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪১১৩

[১৪] Oriental Customs Or, an Illustration of the Sacred Scripture, Williams and Smith, London, 1807 vol.2 p.79, no. 753

[১৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নংঃ ৪০৮৮

[১৬] https://islamqa.info/ar/33597

[১৭] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- হাফিজ ইবনে কাসির(রহ.) [পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৭-৫০২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

[১৮] মাগাফীর হলো গঁদের সাথে সাদৃশ্যযুক্ত একটি জিনিস যা ঘাসে জন্মে থাকে এবং তাতে কিছুটা মিষ্টতা রয়েছে।

[১৯] তাফসীর ইবনে কাসীর, খণ্ড ১৭, পৃষ্ঠা ৫৫৯

[২০] সীরাতে আয়েশা-সাইয়্যেদ সুলাইমান নদভী(রহঃ), পৃষ্ঠা ১৪৯

[২১] আল-বিদায়া ওয়ান নিহায়া- হাফিজ ইবনে কাসির(রহ.) [পঞ্চম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৪৯৭-৫০২, ইসলামিক ফাউন্ডেশন]

১৪৭

গুহ্যকামীদের জন্য দুঃসংবাদ

-সাইফুর রহমান

কিছুদিন আগে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদের একটা তথ্য দিয়েছে, গনোরিয়া নামক সেক্সচুয়ালি ট্রান্সমিটেড ইনফেকশন বা যৌন সংসর্গের মাধ্যমে ছড়ানো রোগটি ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে।এই রোগের জীবাণু অ্যান্টিবায়োটিকের বিরুদ্ধে দ্রুত প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জন করছে। কার্যকর নতুন অ্যান্টোবায়োটিক উদ্ভাবনে খুব বেশি সাফল্য এখনও না আসায় পরিস্থিতি আরও বেশি নাজুক হয়ে পড়েছে। প্রতি বছর বিশ্বে প্রায় সাত কোটি ৮০ লাখ মানুষ এ রোগের সংক্রমণের শিকার হচ্ছেন।

.

গনেরিয়া রোগের জন্য দায়ী ব্যাক্টেরিয়ার বাস মূলত গলা ও মলদ্বারে স্বাভাবিকভাবে ওরাল ও গুহ্যদ্বারে সঙ্গমকারীরা মারাত্মক গনেরিয়া রিস্কে থাকেন। এন্টিবায়োটিক প্রতিরোধী গনেরিয়ার প্রকোপ গুহ্যকামিদের মধ্যে বেশি। ২০১৪ সালে আমেরিকার ন্যাশনাল সেন্টার ফর এইচএইভি/এইডস থেকে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছে, গনেরিয়া সৃষ্টিকারী ব্যাক্টেরিয়ার এন্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্স ক্ষমতা ০.৬ থেকে বেড়ে ২.৫ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। ৫০০০ এর উপরে বিভিন্ন ধারার নারী পুরুষের উপরে গবেষণা করে দেখা গেছে গুহ্যকামীদের ক্ষেত্রে গনেরিয়া সৃষ্টিকারী এন্টিবায়োটিক রেসিস্টেন্স ব্যাক্টরিয়ার উপস্থিতি ব্যাপক এবং অন্যদের থেকে বেশি।

.

এটাতো মাত্র একটা উদাহরণ সেখানে গুহ্যকামীদের জীবনবিনাশী রোগ হওয়ার সম্ভাবনা অন্যদের থেকে অনেকগুন বেশি, এই রকম আরো অনেক উদাহরণ আছে যার অল্প কিছু উল্লেখ করছি।
২০০০ সালে ওয়েস্ট জার্নাল অফ মেডিসিনে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে সমকামীদের স্বাস্থ্য সমস্যা নিয়ে তথ্য উপাত্ত সমেত ব্যাপক আলোচনা করা হয়। শুধুমাত্র দৈহিক নয়, মানসিক স্বাস্থ্যেরও করুন অবস্থা সমকামীদের। গুহ্যকামীদের আত্মহত্যার করার প্রবণতা অন্য স্বাভাবিকদের তুলনায় ৬ গুন্ বেশি, লেসবিয়ানদের ক্ষেত্রে এটা দ্বিগুন।এক তৃতীয়াংশ গুহ্যকামীরা মাত্রাতিরিক্ত এলকোহল ও ড্রাগ সেবন করে থাকে। মানসিক চাপের কারণে এদের অনেকেই ঘর ছাড়া হয়ে যায়। হোমলেস মানুষদের মধ্যে লেসবিয়ান ও গুহ্যকামীদের সংখ্যা বেশি।

.

লেসবিয়ানদের ক্ষেত্রে সারভিক্যাল ক্যান্সার হওয়ার রেট স্বাভাবিকের থেকে বেশি। এক সমীক্ষায় ৩০ শতাংশ লেসবিয়ানদের সাথে সেক্সচুয়ালি ট্রান্সমিটেড ডিজিজের সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া গেছে। গুহ্যকামীদের স্বাস্থ্যের অবস্থা আরো ভয়ানক। এদের সেক্সওয়ালী ট্রান্সমিটেড ডিজিজ হওয়ার সম্ভাবনা বহুগুন। এনাল-রিসেপটিভ ইন্টারকোর্সের কারণে তাদের এহেন কোনো ট্রান্সমিটেড ডিজিজ নাই যা হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এইডস, হেপাটাইটিস, গনেরিয়া সহ মারাত্মক সব রোগের জন্য তারা উৎকৃষ্ট ক্যান্ডিডেট। এনাল ক্যান্সার, জেনিটাল ওয়ার্টস সহ প্রাণঘাতী রোগেরও উৎস এই এনাল-রিসেপটিভ ইন্টারকোর্স।

.

সিদ্ধান্ত এখন আপনার হাতে। নিজের জীবনের উপরে মায়া থাকলে দ্রুত সরে আসুন এই অপ্রাকৃত ও অস্বভাবী পন্থা থেকে।

১৪৮

প্রসঙ্গঃ শরিয়া আইনে চুরির অপরাধে হাত কাটার বিধান

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্নঃ শুধুমাত্র চুরি করার জন্য আল্লাহ তার সৃষ্ট বান্দার (নারী/পুরুষ) হাত কেটে ফেলার নির্দেশ দেন (Quran 5:38) ! এটা কি আপনার কাছে কোন ভাবেই মানবিক বলে মনে হয়?

.

#উত্তরঃ আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ

.

" যে পুরুষ চুরি করে এবং যে নারী চুরি করে তাদের হাত কেটে দাও তাদের কৃতকর্মের ফল ও আল্লাহর পক্ষ থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হিসেবে। এবং আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রজ্ঞানময়।
অতঃপর স্বীয় সীমালঙ্ঘণের পর যে তওবা করে এবং সংশোধিত হয়, নিশ্চয়ই আল্লাহ তার তওবা কবুল করেন। অবশ্যই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।"
(কুরআন, মায়িদাহ ৫:৩৮-৩৯)

.

ইসলামী শরিয়ায় চুরির শাস্তি হিসাবে হাত কাটার জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্র আছে; এগুলো পূরণ না হলে হাত কাটা হয় না। চুরিকৃত বস্তুটি যদি মূল্যবান ও দরকারী কিছু হয়, চুরি যাবার আগে জিনিসটি যদি সম্পদ বা প্রয়োজনীয় দ্রব্য রাখার স্থানে রাখা হয়(খোলা স্থানে অরক্ষিতভাবে ফেলে রাখা না হয়), চুরির যদি অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায়, চুরি যাওয়া জিনিসটির মালিক যদি দাবি করে—কেবলমাত্র এ সব ক্ষেত্রে জন্য চোরের হাত কাটা যায়। [১]
এ ছাড়া একটি নির্দিষ্ট মূল্যমানের বেশি দামের দ্রব্য চুরি গেলে হাত কাটা যায়।হাদিস দ্বারা এই মূল্যমান নির্ধারিত হয়েছেঃ ১.০৬২৫ গ্রাম স্বর্ণের মূল্য। এর কম দামের কোন জিনিস চুরি গেলে সে জন্য হাত কাটা যায় না। বরং নিয়মাধীন অন্য শাস্তি দেয়া হয়। [২]

.

আমেরিকা পৃথিবীর উন্নত দেশগুলোর মধ্যে উন্নততম। কিন্তু চুরি, ডাকাতি ও অন্যান্য অপরাধের ক্ষেত্রে তার আছে সর্বোচ্চ রেকর্ড। [৩] এহেন আমেরিকায় যদি ইসলামের পূর্ণাঙ্গ বিধান প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে একদিকে প্রতিটি সার্মথ্যবান ব্যক্তি রীতিমতো যাকাত আদায় করছে অপর দিকে নারী বা পুরুষ চোর প্রমাণিত হলে তার শাস্তি হাত কেটে ফেলা হচ্ছে; তাহলে আমেরিকায় চুরি, ডাকাতির বর্তমান প্রবণতা কি বাড়বে? না একই রকম থাকবে? নাকি একেবারে কমে যাবে?
সঙ্গতভাবেই তা কমে যাবে।তদুপরি এই ধরনের কঠিন আইন থাকলে অনেক স্বভাবের চোরও নিজেকে এই ভয়ঙ্কর পরিণতি থেকে রক্ষা করতে চেষ্টা করবে। অর্থাৎ চুরি ডাকাতি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

.

ইসলামী এই বিধান কি আসলেই খুব বর্বর? এই বিধানের ফলে কি মানুষজন গণহারে তাদের হাত হারাতে থাকে?!!
ইসলামী এই বিধান বর্তমান পৃথিবীতে চালু আছে সৌদি আরবে। অথচ সেখানে কখনোই রাস্তায় কোন মানুষের হাত কাটা অবস্থায় দেখা যায় না।প্রকৃতপক্ষে এই ইসলামী আইন চালু থাকার ফলে ভয়েই কেউ আর চুরি করে না।সেখানকার সমাজে চুরির কোন অস্তিত্বই বলতে গেলে নেই। এর ফলে নাগরিকদের জান-মাল সংরক্ষিত থাকে। আর মানুষের হাতও অক্ষত থাকে।সৌদি আরবে শরিয়া আইন চালু আছে এবং সেখানে মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থা যথেষ্ট ভালো। আপাতদৃষ্টিতে এ অবস্থাকে কঠোর মনে হলেও এ কথা মানতেই হবে যে এর ফলে নাগরিকদের অধিকার সংরক্ষিত থাকছে—ভয়ে কেউ চুরি

করছে না(এবং হাত হারাচ্ছে না) এবং চুরি না হবার ফলে নাগরিকদের সম্পদও অক্ষত থাকছে।

.

এমনটি মনে হতে পারে যে বিশ্বব্যাপী চুরি-ডাকাতির বর্তমান যে হার তাতে ইসলামী শরিয়া অনুযায়ী হাত কাটা আইন চালু হলে লক্ষ লক্ষ লোক দেখা যাবে যাদের হাত কাটা। কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে -যে মুহূর্তে এই আইন ঘোষণা করা হবে, তার পরের মুহূর্ত থেকেই এ প্রবণতা অত্যন্ত দ্রুততার সাথে কমে আসতে থাকবে। পেশাদার চোরও এ পথে পা ফেলার আগে একবার ভেবে দেখবে ধরা পড়লে তার পরিনতি কী হতে পারে। শাস্তির ভয়াবহতাই চোরের ইচ্ছাকে দমন করার জন্য যথেষ্ট। তখন নিতান্ত দুরাত্মা ও দুর্ভাগা ছাড়া এ কাজ আর কেউ করবে না। সামান্য কয়েকজন লোকের হয়তো হাত কাটা যাবে, কিন্তু কোটি কোটি মানুষ লাভ করবে নিরাপত্তা,শান্তি এবং সর্বস্ব হারাবার ভয় থেকে মুক্তি। ইসলাম এভাবে ছোট ক্ষতির মাধ্যমে বড় ক্ষতি থেকে সমাজকে রক্ষার ব্যবস্থা করে। প্রকৃত ইসলামী ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হলে এই ছোট ক্ষতিটিও হবে না অর্থাৎ কেউ চুরিই করবে না। ইসলামী বিধান এই রকম বাস্তবধর্মী এবং প্রত্যক্ষভাবে ফলদায়ক।

.

এবং আল্লাহ ভালো জানেন।

[কৃতজ্ঞতা স্বীকারঃ ড. জাকির আব্দুল করিম নায়েক (হাফিজাহুল্লাহ)]

তথ্যসূত্রঃ

[১] "The hadd punishment for theft " – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/9935
[২] "There is no amputation of the hand except in the case of one who steals something worth one quarter of a dinar or more" – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/239920
[৩] "Countries With Highest Reported Crime Rates - World Top Ten" [Maps of World]
http://www.mapsofworld.com/.../countries-with-highest-reporte...

১৪৯

সত্যবাদী রাসূল সল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম

-তানভীর আহমেদ

মদিনা সেদিন ধূলিধূসর, মলিন। কিছুক্ষণ আগে ছোট্ট শিশু ইবরাহিম দুনিয়া ছেড়ে তার রব্বের কাছে চলে গেছে। এখনও পিতা স্বয়ং রাসূলুল্লাহর ﷺ কোলেই আছে সে। শুধু ছোট্ট উষ্ণ দেহটা শীতল হয়েছে, হৃৎস্পন্দন থেমে গেছে। তীব্র আবেগ কান্না হয়ে ঝড়ে পড়ছে।

.

অশ্রুসিক্ত নয়নে দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে, কণ্ঠ জড়িয়ে যায়। এমতাবস্থায়ও পিতা মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ বলে উঠলেন, "ওহে ইবরাহিম! আমরা তো তোমার জন্য কিছুই করতে পারি না। তোমার পিতার তো কেবল চোখের অশ্রু ঝড়ে আর তাঁর হৃদয় তোমার মৃত্যুতে শোকার্ত হয়। তবুও আমি যে এমন কিছুই বলব না যা কিনা আল্লাহর রাগকে আমন্ত্রণ জানাবে। আমরাও যে পরবর্তীতে তোমার অনুসরণ করব (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করব) এবিষয় যদি আল্লাহর পক্ষ থেকে নিশ্চিত সত্য ও ওয়াদাস্বরূপ না হতো, তবে নিশ্চয়ই আমি তোমার এই বিদায়ের সময় আরও বেশি কাঁদতাম ও শোকার্ত হতাম।" [১]

.

মদিনার শিশুদের সবচেয়ে কাছের মানুষটি ছিলেন যিনি, যাকে শিশুরা দেখলে জড়িয়ে ধরতো পরম আনন্দে, শিশুমনের সবকথা একমাত্র যে মানুষটির কাছে ভরসা করে অনায়াসে বলা যেত - সেই মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ﷺ নিজ শিশুপুত্রের মৃত্যু হল। আদর করে মুসলিম জাহানের পিতা ও আল্লাহর বন্ধু ইবরাহিমের (আলাইহিস সালাম) নামানুসারে পুত্রের নাম রেখেছিলেন ইবরাহিম।

.

প্রিয়নেতার কষ্ট মদিনাবাসীর মধ্যেও প্রবল, স্পষ্ট। আম্বিয়াদের (আলাইহিস সালাম) তো আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন সবচেয়ে ভালবাসেন, তাই তাঁদের জন্যই কঠিনতম পরীক্ষাগুলো ছিল সবসময় – এই ঘটনা সেকথাই যেন আরেকবার মনে করিয়ে দিল। কিন্তু একি! আকাশটা তো সকাল থেকে ঠিকই ছিল। এখন বেলা না পড়তেই কেমন অন্ধকার হয়ে আসছে যে! দেখতে দেখতেই সূর্যটা ঢেকে যাচ্ছে, অন্ধকার নেমে আসছে জমিনে!

.

গ্রহণের শুরু থেকেই গুঞ্জন শুরু হয়েছিল... মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ﷺ ছেলের মৃত্যুতেই প্রকৃতি এমন শোক প্রকাশ করছে। তিনি তো আল্লাহর নবী! সুতরাং তাঁর ছেলের মৃত্যুতে প্রকৃতির শোক প্রকাশ তো অতিস্বাভাবিক। সে গুঞ্জন কান এড়ায় নি তাঁর ﷺ. কিন্তু সদ্যপুত্রহারা মুহ্যমান রাসূলুল্লাহ ﷺ কিছু বললেন না, সূর্যগ্রহণ শুরু হতেই মাসজিদে প্রবেশ করলেন। গ্রহণ শেষ হওয়া অবধি চার রুকু আর চার সিজদাহ সহ দু' রাকাআত সলাত আদায় করালেন।

.

গ্রহণ শেষ হয়ে এলে সলাত আদায়ও শেষ হল। এরপর তিনি ﷺ লোকেদের উদ্দেশ্যে বললেন, "সূর্য এবং চন্দ্র হল আল্লাহর নিদর্শনগুলোর মধ্যে দু'টি নিদর্শন। এদের গ্রহণ কারও মৃত্যুর কারণে হয় না। তাই যখন কোনো গ্রহণের ঘটনা হয় তখন তোমরা সলাত আদায় করো এবং আল্লাহকে ডাকতে থাক, যতক্ষণ না গ্রহণ সমাপ্ত হয়ে যায়।" মদিনাবাসীর ভুল ধারণার অবসান হল। [২]

.

.

এই ছিল রাসূলুল্লাহর ﷺ জীবদ্দশায় নিজ পুত্র ইবরাহিমের মৃত্যুর দিনে সূর্যগ্রহণের ঘটনা। NASA এর হিসেব মতে, ৬৩২ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জানুয়ারিতে হওয়া একটি সূর্যগ্রহণ মদিনা থেকে প্রায় ৭৬% দৃশ্যমান হয়েছিল। আরবি হিসেবে দশম হিজরির

শাওয়াল মাস। ধারণা করা হয়, এই সূর্যগ্রহণটিই সেই ঐতিহাসিক সূর্যগ্রহণ। কিন্তু সূর্যগ্রহণের সেই ঘটনায় এর চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি লুকিয়ে আছে... তাদের জন্য যারা সুস্থ মস্তিষ্কে চিন্তা করতে পারে।

.

যখন মদিনার মানুষেরা নিজেরাই ভাবতে শুরু করেছিল যে প্রকৃতি বোধ হয় শোকের মাতম লাগিয়েছে, তখন একজন মিথ্যাবাদী তো সহজেই মানুষের ভেবে নেওয়া সেই ভ্রান্তিকে কাজে লাগানোর কথা। মিথ্যাবাদীরা তো সুযোগসন্ধানী হয়। নিজেকে রাসূল দাবি করা মানুষটির ছেলের মৃত্যুদিনেই কাকতালীয়ভাবে সূর্যগ্রহণ – একজন মিথ্যাবাদীর জন্য এমন সুযোগ তো সহস্রকোটি বছরেও মেলে না। কিন্তু মিথার পথে হাঁটলেন না সত্য ও সরল পথের নবী।

.

৪০ বছর ধরে ভালবাসা আর সত্যবাদিতায় ‘আল-আমিন’ বা বিশ্বাসী মানুষটি যখন আসমান-জমিনের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে শেষ নবুওয়্যাতের দাবি নিয়ে আসলেন, তখন তাকে চরম শত্রু বনে যাওয়া মানুষেরাও মিথ্যাবাদী দাবি করতে পারে নাই। তাঁর জীবদ্দশায় হওয়া সূর্যগ্রহণের ঘটনাটি এককভাবেও সেই সাক্ষীই দেয়... মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ কখনোই মিথ্যাবাদী ছিলেন না। সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়াসাল্লাম।

.

পরবর্তীতে পৃথিবীতে আসা সমস্ত গ্রহণের ঘটনাই যেন রাসূল মুহাম্মাদের ﷺ সত্যবাদিতার স্মরণিকা হয়ে রইল। এ যেন স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আ’লামীনের পক্ষ থেকে রাসূলের সত্যবাদিতার সাক্ষ্য, বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন, সত্যবাদিতার নাসীহা।

.

২১ আগস্ট, ২০১৭ তে আবারও সূর্যগ্রহণ দেখবে পৃথিবীবাসী। এর পরেও হবে আরো অনেক গ্রহণের ঘটনা। তখন কি মনে পড়বে না মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর ﷺ সত্যবাদিতার কথা?

---

[১] সীরাতে হালাবি ৩য় খন্ড, ৩৪ পৃষ্ঠা

[২] সহীহ আল-বুখারি, খন্ড ১৬, হাদিস ২২, ২৩, ২৪

১৫০

কা'বাঃ মূর্তিপুজকদের মন্দির, নাকি ইব্রাহিম (আ) এর নির্মাণ করা ইবাদতখানা?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

নাস্তিক-মুক্তমনা-খ্রিষ্টান মিশনারী এদের অভিযোগ হচ্ছে—কা’বা ছিল আরব মূর্তিপুজকদের মন্দির। মুহাম্মাদ(ﷺ) তাদের মন্দির থেকে তাদের উচ্ছেদ করে এক আল্লাহর উপাসনা ও হজ শুরু করেন। এছাড়া মুসলিমদের দাবি নাকি মিথ্যা—কা’বা নাকি কখনো ইব্রাহিম(আ) নির্মাণ করেননি।ইহুদি-খ্রিষ্টানদের প্রাচীন গ্রন্থ ইব্রাহিম(আ) এর ব্যাপারে ব্যাপক আলোচনা করে। কিন্তু কা’বার ব্যাপারে নাকি এসব গ্রন্থ কিছু বলেনি।ইত্যাদি ইত্যাদি।

.

মুক্তমনারা আরবের মূর্তিপুজকদের প্রতি খুব দরদ রাখবার দাবি করে, মুহাম্মাদ(ﷺ) নাকি তাদের মন্দিরকে এক আল্লাহর উপাসনালয় মসজিদুল হারামে রূপান্তরিত করেছেন।মুক্তমনারা কি এটা জানে যে খোদ আরবের মূর্তিপুজকরাই এটা দাবি করত যে তারা ইব্রাহিম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এর বংশধর এবং কা’বা ছিল তাদের পিতা ইব্রাহিম(আ) এর নির্মাণকৃত আল্লাহর ঘর? কা’বা যে ইব্রাহিম(আ) এর নির্মাণকৃত আল্লাহর ঘর—এটা নিয়ে মুসলিম কিংবা আরবের মূর্তিপুজক কারো কোন দ্বিমত ছিল না।দ্বিমত ছিল এটা নিয়ে যে মহাবিশ্বের প্রতিপালক আল্লাহর কোন শরীক আছে নাকি নেই।
ইব্রাহিম(আ) [prophet Abraham] যে মূর্তিপুজক ছিলেন না এবং এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর[ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থে Elohi] উপাসনা করতেন, এটা নিয়ে মুসলিম-ইহুদি-খ্রিষ্টান কারো দ্বিমত নেই।

.

“ঈশ্বর মোশিকে[নবী মুসা(আ)] আরো বললেন,“ইস্রায়েলিয়দের বলঃ সদাপ্রভু ঈশ্বর, তোমাদের পূর্বপুরুষদের ঈশ্বর—আব্রাহামের[নবী ইব্রাহিম(আ)], ইসহাকের,যাকোবের[নবী ইয়াকুব(আ)] ঈশ্বর আমাকে তোমাদের নিকট পাঠিয়েছেন। এটাই চিরকালের জন্য আমার নাম, এই নামেই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে আমাকে স্মরণ করা হবে। ””
[যাত্রাপুস্তক(Exodus) ৩:১৫]

.

মুক্তমনারা কুরআন এবং হাদিসের উপর সন্দেহ পোষণ করে। অথচ ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থের ব্যাপারে তাদেরকে এমন কোন কথা বলতে শোনা যায় না।ইব্রাহিম(আ) এর ব্যাপারে ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থকে তারা প্রামাণ্য হিসাবে ধরেছে এবং কা’বা সম্পর্কে মুসলিমদের দাবিকে মিথ্যা প্রমাণের জন্য তারা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থের কথা উল্লেখ করে বলেছে—“ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থে কা’বার কথা নেই।” এ দিয়েই মুক্তমনাদের একচোখা দৃষ্টিভঙ্গী বোঝা যায়।

.

যাহোক, চলুন আমরা দেখি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের গ্রন্থে আসলেই কা’বার কথা এসেছে কী না।

.

“[হে প্রভু] তারাই আশির্বাদধন্য যারা তোমার ঘরে বাস করে; তারা সদা-সর্বদা তোমার স্তুতি করে। তারাই আশির্বাদধন্য যারা তোমাতেই শক্তি খোঁজে, যারা তীর্থযাত্রার জন্য মনস্থির করে। যখন তারা বাকা উপত্যকা দিয়ে গমন করে, একে বসন্তের নিবাস বানায়। বসন্তের বৃষ্টি একে আশির্বাদে পূর্ণ করে। ”
[তানাখ(ইহুদি বাইবেল)/পুরাতন নিয়ম(খ্রিষ্টান বাইবেল); গীতসংহিতা(Psalms) ৮৪:৪-৬]

.

বাকা বা বাক্কা হচ্ছে মক্কার প্রাচীন নাম।গীতসংহিতা হচ্ছে দাউদ(আ) ের উপর নাযিলকৃত কিতাব[যাবুর] এর বিকৃত রূপ এবং এই কিতাবে আমরা বাকায় তীর্থযাত্রী(হজ কাফেলা) ের বিবরণ পাই।

.

“ নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম ঘর যা মানুষের জন্যে নির্ধারিত হয়েছে, সেটাই হচ্ছে এ ঘর, যা বাক্কায়[মক্কা] অবস্থিত এবং সারা জাহানের মানুষের জন্য হেদায়েত ও বরকতময়।

এতে রয়েছে মাকামে ইব্রাহিমের মত প্রকৃষ্ট নিদর্শন। আর যে, লোক এর ভেতরে প্রবেশ করেছে, সে নিরাপত্তা লাভ করেছে। আর এ ঘরের হজ করা হলো মানুষের উপর আল্লাহর প্রাপ্য; যে লোকের সামর্থ্য রয়েছে এ পর্যন্ত পৌছার। আর যে লোক তা মানে না— আল্লাহ সারা বিশ্বের কোন কিছুরই পরোয়া করেন না।”

(কুরআন, আলি ইমরান ৩:৯৬-৯৭)

.

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মীয় গ্রন্থ অনুযায়ী ইসমাঈল(আ) পারানে বাস করতেন[আদিপুস্তক(Genesis) ২১:২১ দ্রষ্টব্য]। তাঁকে শৈশবে তাঁর পিতা ইব্রাহিম(আ) পারানে রেখে গিয়েছিলেন। পারান স্থানটি লোহিত সাগরের সাথে সম্পর্কিত, এলাত [Elath/Eilat] এর পূর্ব ও পশ্চিম উভয় অংশই বাইবেলে বর্ণিত পারানের অন্তর্ভুক্ত। যার মধ্যে আরবও পড়ে যায়। অনেক খ্রিষ্টান পণ্ডিত এই দাবি করেন যে পারানের যে অংশে ইসমাঈল(আ)কে রেখে আসা হয়েছিল তা লোহিত সাগরের পশ্চিমে; পারান অঞ্চলটি কানান এবং মিসরের কাছাকাছি কোথাও। কিংবা ফিলিস্তিন এবং মিসরের সিনাই পেনিনসুলার চারপাশে। ইব্রাহিম(আ) আরবে আসেননি। এই দাবি তাদের জন্য মুহাম্মাদ(ﷺ)কে অস্বীকার করার ব্যাপারে সহায়ক হয়।

তাদের এমন দাবির লিঙ্কঃ ১। https://goo.gl/gv5EU1

২। https://goo.gl/dMrPjH

মুক্তমনারাও এসব ব্যাপারে খ্রিষ্টান পণ্ডিতদের মুখের কথার উপরে খুব আস্থাশীল। কোন কোন ইহুদি পণ্ডিত যেমন র‍্যাবাই সাদিয়া গাওন(Saadia Gaon) তার আরবি Torah(ইহুদি তাওরাত) অনুবাদে পারানকে হিজাজ ও মক্কা বলে উল্লেখ করেছেন।

.

ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ থেকেই আমরা দেখি, পারান আসলে কোথায়—লোহিত সাগরের পশ্চিমে নাকি পূর্বে। কানান কিংবা মিসরে নাকি আরব দেশে।

প্রথমত, ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে স্পষ্টতই বলা হয়েছে যে ইসমায়েলীয়রা[Ishmaelites, ইসমাঈল(আ) এর বংশধর] আরবে থাকত, মিসরে নয়।

.

“তারা যখন খাবার জন্য বসল তখন তারা দেখতে পেল গিলিয়দ থেকে ইসমায়েলীয়দের একটা কাফেলা আসছে। তাদের উটগুলো মশলা,সুগন্ধি তেল এবং গন্ধরস দ্বারা পূর্ণ ছিল।তারা সেগুলো মিসরে নিয়ে যাচ্ছিল। ”

(আদিপুস্তক(Genesis) ৩৭:২৫)

.

খ্রিষ্টান মিশনারী ও মুক্তমনাদের দাবি অনুযায়ী ইসমাঈল(আ) এর বংশধররা যদি মিসরের সিনাই পেনিনসুলা তেই থাকত, তাহলে তারা আবার কিভাবে মিসরে উটে করে জিনিসপত্র নিয়ে যাচ্ছিল? ঐতিহাসিকভাবেই এটা প্রমাণিত যে মক্কার আরবরা ইসমাঈল(আ) এর বংশধর। আর তারা উট ব্যবহার করত এবং দূর-দূরান্তে বাণিজ্য কাফেলা নিয়ে যেত। বাইবেলের আদিপুস্তক ৩৭:২৫ একদম সেই দাবিকেই সমর্থন করছে।এবং বাইবেলের এই পদ আমাদেরকে জানাচ্ছে যে ইসমায়েলীয়রা মিসরে বাস করত না।

.

ঐতিহাসিক ও সিরাতকারকদের মতে, মুহাম্মাদ(ﷺ) এর পূর্বপুরুষ ছিলেন ইসমাঈল(আ) এর ছেলে কেদার(কাইদার) [রাহিকুল মাখতুম(শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র), পৃষ্ঠা ৭৪(তাওহীদ পাবলিকেশন্স) দ্রষ্টব্য]। বাইবেল বলছে যে কেদারের বংশধরেরা আরবে বসবাস করত।

.

“আরবদেশ এবং কেদার বংশের সমস্ত নেতারা/যুবরাজরা [আদিপুস্তকে ভবিষ্যতবাণী রয়েছে যে ইসমায়েলের বংশ থেকে ১২জন নেতা আসবে] ছিল তোমার ক্রেতা। তারা মেষশাবক,ভেড়া ও ছাগ এগুলোর ব্যাপারে তোমার সাথে বাণিজ্য করত।”
(যিহিষ্কেল(Ezekiel) ২৭:২১)

.

খ্রিষ্টান মিশনারীরা দাবি করে যে পারান হচ্ছে মিসরের সিনাই মরুভূমির অংশ। কিন্তু তাদের এই দাবিও তাদের নিজ গ্রন্থ থেকেই খণ্ডণ হয়।

.

“অতঃপর ইস্রায়েলীয়রা সিনাই এর মরুভূমি থেকে যাত্রা করল এবং বিভিন্ন স্থানে ঘুরতে লাগল যতক্ষণ না মেখখণ্ড তাদেরকে পারানের মরুভূমিতে নিয়ে এল।”
(গণণাপুস্তক ১০:১২)

.

এ থেকে বোঝা গেল যে পারান ও মিসরের সিনাই মরুভূমি মোটেও এক জায়গা নয় বরং ভিন্ন জায়গা। ইহুদিরা সিনাই এর মরুভূমি থেকে পারানে গিয়েছিল।

পারানের সুনির্দিষ্ট অবস্থান আমরা বাইবেলের এই পদগুলো থেকে নিশ্চিতভাবে জানতে পারি—

.

“এগুলো হচ্ছে মোশির[মুসা(আ)] বাণী যা সে জর্ডানের পূর্বদিকের মরুভূমির মধ্যে সমগ্র ইস্রায়েল জাতিকে বলেছিল। জায়গাটি ছিল আরাবায়,সূফের উল্টো দিকে। পারান এবং টোফেল,লাবান,হাৎসেরোত ও দিষাহব এর মধ্যে”
(দ্বিতীয় বিবরণ(Deuteronomy) ১:১)

.

এ থেকে সন্দেহাতীতভাবে আমরা বুঝতে পারি যে পারান জর্ডানের পূর্বে। মানচিত্রে জর্ডানের ঠিক পূর্বের দেশ কোনটি? উত্তর হচ্ছে সৌদি আরব।

বাইবেল আমাদেরকে জানাচ্ছে যে পারানের পাহাড় সিনাই এর দক্ষিণে।

.

“প্রভু সিনাই পর্বত হতে এলেন, সেয়ীরের গোধূলি বেলায় যেন আলো উদিত হল। পারান পর্বত হতে যেন আলো জ্বলে উঠল। প্রভু তাঁর পাহাড়ের দক্ষিণ দিক থেকে ১০,০০০ পবিত্রজনকে তাঁর সাথে নিয়ে এলেন।”
(দ্বিতীয় বিবরণ(Deuteronomy) ৩৩:২)

.

বাইবেলের নতুন নিয়ম(New Testament) আমাদেরকে জানাচ্ছে যে সিনাই পাহাড়টিই আরবে অবস্থিত। এ থেকে নিশ্চিতভাবে প্রমাণ হচ্ছে যে পারানের মিসরে অবস্থিত হবার কোন সম্ভাবনাই নেই বরং পারান আরবে অবস্থিত। সেই সাথে সিনাই পাহাড়ের সাথে হাগার(বিবি) হাজিরাকে সংশ্লিষ্ট করে এটাই স্বীকার করে নেওয়া হচ্ছে যে তিনি{এবং তাঁর সন্তান ইসমাঈল(আ)} আরবের সাথে সংশ্লিষ্ট।

.

“হাগার হচ্ছেন আরব দেশের সিনাই পর্বতের মত এবং বর্তমান জেরুসালেম নগরের প্রতিরূপ।কারণ সে তার সন্তানদের সাথে দাসত্বে আবদ্ধ।”
(গালাতীয়(Galatians) ৪:২৫)

.

বাইবেলে বর্ণিত পারান আরবে অবস্থিত—এটি প্রমাণ করে যে ইব্রাহিম(আ) তাঁর স্ত্রী হাজিরা(Hagar) ও সন্তান ইসমাঈল(আ)কে আরবে রেখে এসেছিলেন, তিনি অবশ্যই আরবে এসেছিলেন। খ্রিষ্টান মিশনারী ও মুক্তমনাদের দাবি মিথ্যা।

.

ইসমাঈল(আ)কে আরব দেশে রেখে আসা হয়েছিল তার স্বপক্ষে বাইবেল থেকেই আরো প্রমাণ দেওয়া যায়। বাইবেল অনুযায়ী ইসমাঈল(আ) এর ১২ ছেলের ১জনের নাম ছিল 'হাদ্দাদ' [আদিপুস্তক(Genesis) ২৫:১৫ দ্রষ্টব্য]। 'হাদ্দাদ' একটি বিশুদ্ধ আরবি শব্দ; যার মানে হচ্ছেঃ 'কর্মকার'| সে কালে একমাত্র আরব জাতিগোষ্ঠীর লোকেদেরই আরবি নাম হত {বর্তমান সময়ে ইসলামের বিস্তৃতি এবং সর্বশেষ আসমানী কিতাব আরবি ভাষায় হবার কারণে অনারব জাতিগোষ্ঠীর ভেতরেও আরবি নামের আধিক্য দেখা যায় কিন্তু সে কালে এমন কোন সম্ভাবনা ছিল না।}| এ থেকে প্রমাণ হয় যে ইসমাঈল(আ) এর সন্তান আরবদের মাঝে ছিল এবং তাদের থেকে অনুপ্রানিত হয়েই তাঁর আরবি নাম রাখা হয়েছিল।

.

এ ব্যাপারে ২ জন ইহুদি পণ্ডিতের আলোচনা দেখা যেতে পারে।
ইহুদি র‍্যাবাই Reuven Firestone ইহুদিদের কিতাব থেকে প্রমাণ করেছেন যে, ইব্রাহিম(আ) তাঁর পুত্র ইসমাঈল(আ)কে যে স্থানে রেখে এসেছিলেন তা বর্তমান মক্কা। লিঙ্কঃ https://goo.gl/8u7SHJ

.

জায়োনিস্ট ইহুদি স্কলার Avi Lipkin প্রমাণ করেছেন যে, কা'বায় খোদ মুসা(আ) পর্যন্ত হজ করেছিলেন। কাজেই মক্কা ইহুদি-খ্রিষ্টানদের জন্যও পবিত্র স্থান বিবেচিত হওয়া উচিত!
লিঙ্কঃ https://goo.gl/bdbKtU

১৫১

কা'বা ঘরের ব্যাপারে ইসলাম বিরোধীদের অভিযোগসমূহ ও তাদের খণ্ডন

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

দ্বীন ইসলামের কেন্দ্রস্থল মক্কা নগরীর পবিত্র কা'বা ঘর সম্পর্কে নাস্তিক মুক্তমনা ও খ্রিষ্টান মিশনারীরা বিভিন্ন অভিযোগ তোলে। তাদের দাবিঃ কা'বা গৃহকে কিবলা হিসাবে গ্রহণ করা বিভিন্ন কারণে পৌত্তলিকতা বা paganism। কারণগুলো হচ্ছেঃ

.

❑ মুসলিমরা মানুষের তৈরি একটি স্থাপনার(কা'বা) দিকে মাথা নত করছে

❑ মুসলিমরা কা'বার উপাসনা করে

❑ কা'বায় এক সময় ৩৬০টি মূর্তি ছিল। যেখানে এক সময় মূর্তিপুজা হয়েছে তা কী করে একত্ববাদী ইবাদতের কেন্দ্র হয়?

.

তাদের এই অভিযোগগুলো দেখে অনেক সরলপ্রাণ মুসলিম বিভ্রান্ত হচ্ছেন। নিচে তাদের অভিযোগগুলো বিশ্লেষণ করে সেগুলোর খণ্ডন করা হল।

.

❑ মানুষের তৈরি একটি স্থাপনার(কা'বা) দিকে মাথা নত করাঃ

ইসলাম বিরোধীরা বলতে চায় যে, কা'বার দিকে মুখ করে উপাসনা করা একটি পৌত্তলিক রীতি।

মুসলিমরা কেন কা'বার দিকে মুখ করে উপাসনা করে? উত্তর হচ্ছেঃ কা'বা মুসলিমদের কিবলা (উপাসনার দিক)। এটি আল কুরআনের নির্দেশ যে কিবলা অর্থাৎ কা'বার দিকে মুখ করে সলাত আদায় করতে হবে {সুরা বাকারাহ ২:১৪২-১৪৬ দ্রষ্টব্য; এই লিঙ্ক থেকে পড়তে পারেনঃ https://goo.gl/8u9pVM }। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুক না কেন, মুসলিমমাত্রই কা'বার দিকে মুখ করে সলাত পড়ে। এটি মুসলিম উম্মাহর ঐক্যেরও একটি নিদর্শন।

পৃথিবীতে একটিও বহু ঈশ্বরে বিশ্বাসী কিংবা মূর্তিপুজারী কোন জাতি আছে যারা এরূপ কোন কিবলার দিকে মুখ করে উপাসনা করে?

উত্তর হচ্ছেঃ না।
ইসলাম ছাড়া আর একটিমাত্র ধর্মের লোকদের এইরূপ কিবলার কনসেপ্ট আছে। আর সেটি হচ্ছে ইহুদি ধর্ম।
বাইবেলের পুরাতন নিয়ম(Old testament) অংশটি ইহুদি-খ্রিষ্টান উভয় ধর্মালম্বীদের ধর্মগ্রন্থ। বাইবেলের এ অংশে উপাসনা সংক্রান্ত বিধি-বিধানের বিবরণ এসেছে এবং তার মধ্যে একাধিকবার এই কিবলার এই এসেছে। বাইবেল অনুযায়ী বনী ইস্রাঈলের নবীগণও কিবলার দিকে ফিরে উপাসনা করতেন। বনী ইস্রাঈলের জন্য কিবলা ছিল বাইতুল মুকাদ্দাস(Temple Mount) যেটি মুহাম্মাদ(ﷺ) এর শরিয়তেও প্রথম কিবলা ছিল। নবী দাউদ(আ) এর ইবাদতের বিবরণ দিয়ে বাইবেলে বলা হয়েছেঃ

.

" ঈশ্বর, আপনার পবিত্র মন্দিরের দিকে আমি মাথা নত করি। আমি আপনার নাম, প্রেম এবং নিষ্ঠার প্রশংসা করি। কারণ আপনার নাম এবং আপনার বাণীকে আপনি সমস্ত কিছুর উপরে সুউচ্চ করেছেন।"

(বাইবেল, গীতসংহিতা/সামসঙ্গীত/জবুর শরীফ ১৩৮:২)

I bow down toward your holy temple and give thanks to your name for your steadfast love and your faithfulness; for you have exalted your name and your word above everything.

(Bible, Psalms 138:2)

লিঙ্কঃ https://goo.gl/8gFwR9

.

বাইবেলে এটিই নবী রাসুলদের ইবাদতের রীতি এবং এ অনুয়ায়ী ইহুদিদের ধর্মীয় আইন হচ্ছে তাদের কিবলা অর্থাৎ মসজিদুল আকসা{বাইতুল মুকাদ্দাস/Temple Mount} এর দিকে ফিরে ইবাদত করা। হাজার হাজার বছর ধরে ইহুদিরা এভাবেই ইবাদত করে আসছে। [১]

বনী ইস্রাঈলের শরিয়তে যে কিবলার ধারণা ছিল তা আল কুরআন দ্বারাও প্রমাণিত [সুরা ইউনুস ১০:৮৭ নং আয়াত দ্রষ্টব্য; লিঙ্কঃ https://quran.com/10/87]। বাইবেলের নতুন নিয়ম(New Testament) এ যিশু খ্রিষ্ট বলেছেন যে পূর্ববর্তী নবীদের সকল আইন মেনে চলতে হবে এবং এগুলো চিরস্থায়ী আইন। বাইবেল অনুযায়ী তিনি নিজেও পূর্ববর্তী নবীদের শরিয়তের অনুসারী ছিলেন। [২] কাজেই আমরা দেখতে পেলাম যে, কিবলার দিকে ফিরে উপাসনা করা মোটেও পৌত্তলিক জাতির রীতি নয় বরং এটি বনী ইস্রাঈল জাতির একটি ধর্মীয় আইন। এবং এটি কুরআনের শরিয়তেও বহাল রাখা হয়েছে। যে সব খ্রিষ্টান মিশনারী মুসলিমদের কিবলার ধারণাকে পৌত্তলিকতার সাথে মিলিয়ে অপপ্রচার চালান, তারা নিজ ধর্মীয় গ্রন্থের বিধানকে গোপন করে এই মিথ্যাচার করেন। কিবলার দিকে ফিরে উপাসনা করা যদি পৌত্তলিকতা হয়, তাহলে বাইবেলের নবীগণও পৌত্তলিক (নাউযুবিল্লাহ)। বরং খ্রিষ্টানরাই সেইন্ট পলের দর্শন গ্রহণ করে তাওরাতের শরিয়ত ও বনী ইস্রাঈলের ইব্রাহিমী উপাসনার রীতি বাদ দিয়েছে এবং নব উদ্ভাবিত পৌত্তলিক রোমক উপাসনা রীতি গ্রহণ করেছে। যারা নিজেরাই পৌত্তলিক(pagan), তারা আবার অন্যদেরকে পৌত্তলিকতার জন্য অভিযুক্ত করে!

.

❑ মুসলিমরা কা'বার উপাসনা করেঃ

এটি পশ্চিমা বিশ্বে একটি খুব কমন ধারণা। খ্রিষ্টান মিশনারীদের লাগামহীন প্রচারণার দ্বারা এই ধারনা ব্যাপক 'জনপ্রিয়তা' লাভ করেছে।

কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে— ইসলামের মূল কথাই হচ্ছে আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনা করা যাবে না। কেউ যদি কা'বার উপাসনা করে, তাহলে সে ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে যায়। কুরআন ও হাদিসে কোথাও কা'বার উপাসনার কথা বলা হয়নি। বরং বলা হয়েছে কা'বার প্রভু আল্লাহ তা'আলার উপাসনা করতে।

.

" অতএব তারা যেন ইবাদত করে এই ঘরের(কা'বা) প্রভুর। যিনি তাদেরকে ক্ষুধায় আহার দিয়েছেন এবং ভীতি থেকে তাদেরকে নিরাপদ করেছেন। "

(কুরআন, কুরাইশ ১০৬:৩-৪)

.

প্রকৃতপক্ষে যারা এরূপ অভিযোগ করে তারা আসলে জানেই না যে পৌত্তলিকতা কী। সব থেকে অজ্ঞ মুসলিমটিও কখনোই কা'বাকে আল্লাহর মূর্তি বলে মনে করে না। বরং মুসলিমদের কাছে এটি আল্লাহর ইবাদতের ঘর। ঠিক যেমন ইহুদিদের কাছে বাইতুল মাকদিস বা বাইতুল মুকাদ্দাস {হিব্রুতে Bethel বা Bait HaMikdash, ইংরেজিতে Temple Mount} হচ্ছে ঈশ্বরের ইবাদতের গৃহ। অথচ ইহুদিদেরকে তারা বলে একত্ববাদী আর মুসলিমদেরকে বলে পৌত্তলিক!

সৌদি আরব থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দূরবর্তী স্থানে মুসলিমরা সলাত আদায় করে থাকে। পৃথিবীর অধিকাংশ মুসলিমদের থেকেই

কা’বা অনেক দূরে অবস্থিত। এমন কোন মূর্তিপুজারী কি আছে, যে তার দেবতার মূর্তিকে হাজার হাজার মাইল দূরে রেখে উপাসনা করে? কখনো যদি এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যে কিবলার দিক বোঝা যাচ্ছে না, তখন যে কোন দিকে ফিরে সলাত আদায় করা যায়। এমনকি কা’বাকে যদি কখনো ধ্বংসও করে ফেলা হয়, তাহলে মুসলিমরা কা’বা যে স্থানটিতে আছে, সেই স্থানের দিকে মুখ করে সলাত আদায় করবে। [৩] এ থেকে প্রমাণ হয় যে মুসলিমরা মোটেও কা’বার ইমারতের উপাসনা করে না বরং কা’বা মুসলিমদের জন্য শুধুমাত্র ইবাদতের দিক বা কিবলা। যে কোন পৌত্তলিকের কাছে তার দেবতা সব থেকে পবিত্র ও মহান। অথচ ইসলাম ধর্মে একজন মু’মিন মুসলিমের জান, মাল ও ইজ্জত কা’বার চেয়ে বেশি মর্যাদাবান। [৪]

কোন পৌত্তলিক কখনোই তার দেবতার মূর্তির উপর দাঁড়ায় না। কোন হিন্দু ধর্মালম্বী কি কখনো তার দেব মূর্তির উপর উঠে দাঁড়াতে পারবে? কিংবা কোন ক্যাথোলিক খ্রিষ্টান কি কখনো যিশু বা মরিয়মের মূর্তির উপর উঠে দাঁড়াতে পারবে? কখনোই না। মুসলিমদের কাছে কা’বা হচ্ছে কিবলা এবং ইবাদতের ঘর। এর উপর উঠে দাঁড়িয়ে মুসলিমরা আযান দিতে পারে। প্রতি বছর হজের মৌসুমে কা’বার ছাদে উঠে এর গিলাফ পরিবর্তন করা হয়। [৫]

এখানে ক্লিক করে কা’বার ছাদে দাঁড়িয়ে গিলাফ পরিবর্তনের ছবি দেখুনঃ https://goo.gl/ZgUjQT

এসব থেকে প্রমাণিত হয় যে কা’বা মুসলিমদের নিকট মোটেও মূর্তি বা প্রতিমা জাতীয় কিছু না এবং মুসলিমরা কখনোই কা’বার উপাসনা করে না।

.

❑ কা'বায় এক সময় ৩৬০টি মূর্তি ছিল। যেখানে এক সময় মূর্তিপুজা হয়েছে তা কী করে একত্বাবাদী ইবাদতের কেন্দ্র হয়ঃ

মুহাম্মাদ(ﷺ) এর আগমনের পূর্বে কা’বায় মূর্তিপুজা হত এই ইতিহাসকে ব্যবহার করে দ্বীন ইসলামের একত্ববাদী চরিত্রকে প্রশ্নবিদ্ধ করার চেষ্টা করে খ্রিষ্টান মিশনারী ও নাস্তিক-মুক্তমনারা। কা’বায় এক সময় মূর্তিপুজা হত এমনকি সেখানে এক সময় ৩৬০টি মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছিল; – কিন্তু এটাই কা’বার প্রাচীনতম ইতিহাস নয়। কা’বা মোটেও মূর্তিপুজার জন্য স্থাপন করা হয়নি বরং এর স্থাপনের উদ্দেশ্য ছিল সম্পূর্ণ উল্টো। কা’বা নির্মাণ করেন তাওহিদের(একত্ববাদ) দাওয়াহর মহানায়ক আল্লাহর নবী ইব্রাহিম(আ) এবং তাঁর পুত্র ইসমাঈল(আ)। আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ

.

“ স্মরণ কর, যখন ইব্রাহিম ও ইসমাঈল কা’বাগৃহের ভিত্তি স্থাপন করছিল। তারা দোয়া করেছিলঃ আমাদের প্রভু! আমাদের থেকে কবুল করুন। নিশ্চয়ই আপনি শ্রবণকারী, সর্বজ্ঞ।

হে আমাদের প্রভু, আমাদের উভয়কে আপনার আজ্ঞাবহ করুন এবং আমাদের বংশধর থেকেও একটি অনুগত দল সৃষ্টি করুন, আমাদের হজের রীতিনীতি বলে দিন এবং আমাদের ক্ষমা করুন। নিশ্চয়ই আপনি তাওবা কবুলকারী, দয়ালু।

হে আমাদের প্রভু, তাদের মধ্যে থেকেই তাদের নিকট একজন রাসুল প্রেরণ করুণ যিনি তাদের কাছে আপনার আয়াতসমূহ তিলাওয়াত করবেন, তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেবেন। এবং তাদের পবিত্র করবেন। নিশ্চয়ই আপনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। ”

(কুরআন, বাকারাহ ২:১২৭-১২৯)

.

এমনকি ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থেও কা’বার কথা উল্লেখ আছে এবং তাদের ধর্মগ্রন্থ থেকে আমি প্রমাণ করেছি যে ইব্রাহিম(আ) মক্কায় এসেছিলেন। এ সংক্রান্ত আমার পোস্টের লিঙ্কঃ https://goo.gl/VygdWp

কালক্রমে ইব্রাহিম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এর বংশধর মক্কার আরবরা একত্ববাদী ধর্ম ছেড়ে বিভিন্ন কাল্পনিক দেবতার মূর্তি সহকারে পুজা শুরু করে এবং কা’বাগৃহেও মূর্তি স্থাপন করে। ইব্রাহিম(আ) এর দোয়ার ফসল নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) আগমন করে তাদেরকে পুনরায় একত্ববাদী ইসলামের দিকে আহ্বান করেন এবং কা’বা ঘরকে মূর্তিমুক্ত করে পুনরায় এক আল্লাহর উপাসনার

গৃহে পরিনত করেন ঠিক যেমনটি ইব্রাহিম(আ) এর সময়ে ছিল। এটিই হচ্ছে কা'বাগৃহের ইতিহাস। [৬] অর্থাৎ মূর্তিপুজা ছিল ইব্রাহিম(আ) এর পরবর্তী লোকদের নব উদ্ভাবন ও পথভ্রষ্টতা। কা'বা নির্মাণের সাথে এর কোন সম্পর্কে নেই এবং এই ইতিহাস মোটেও কা'বাকে মূর্তিপুজার মন্দির প্রমাণ করে না।

.

এরপরেও যদি খ্রিষ্টান মিশনারীরা অপতর্ক করতে চায়, তাহলে আমরা বলব—বাইতুল মুকাদ্দাস তো আপনাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী ঈশ্বরের মহামন্দির(Temple Mount) যেখানে যিশু খ্রিষ্টসহ অন্য নবী-রাসুলগণ এক কালে উপাসনা করতেন ও শিক্ষা দান করতেন । [৭] বাইবেল অনুযায়ী এই মহা মন্দিরের গোড়াপত্তনকারী হচ্ছেন ইব্রাহিম(আ) এর নাতি ইয়া'কুব(আ), [৮] এবং এখানেও এক সময় পরবর্তী প্রজন্মের লোকেরা মূর্তিপুজা করেছে—ঠিক যেমনটি কা'বায় হয়েছে! এই তথ্য শুনে হয়তো অনেকেই চমকে উঠতে পারে, কিন্তু ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থে এমনটিই বলা আছে। ----

.

" ৩ তাঁর পিতা হিষ্কিয় যে সমস্ত উচ্চস্থান ভেঙে দিয়েছিলেন, মনঃশি আবার নতুন করে সেই সব বেদী নির্মাণ করেছিলেন। #বাল_মূর্ত্তির_পূজার_জন্য_বেদী বানানো ছাড়াও, ইস্রায়েলের রাজা আহাবের মতই মনঃশি আশেরার খুঁটি পুঁতেছিলেন। তিনি #আকাশের_তারাদেরও_পূজা_করতেন।
৪ #মূর্ত্তিসমূহের প্রতি আনুগত্য দেখিয়ে তিনি #প্রভুর_প্রিয়_ও_পবিত্র_মন্দিরের_মধ্যেও_বেদী_বানিয়েছিলেন। (#এই_সেই_জায়গা_যেখানে প্রভু বলেছিলেন, "আমি #জেরুশালেমে আমার নাম স্থাপন করব।")
৫ #মন্দিরের_দুটো_উঠোনে_তিনি_আকাশের_নক্ষত্ররাজির_জন্য_বেদী_বানান। "
(বাইবেল, ২ রাজাবলী(2 Kings) ২১:৩-৬)
বাংলা বাইবেল থেকে সংশ্লিষ্ট অংশের লিঙ্কঃ https://goo.gl/FtvZQj
ইংরেজি বাইবেল থেকে সংশ্লিষ্ট অংশের লিঙ্কঃ https://goo.gl/hN31FW

.

খ্রিষ্টান মিশনারীরা কা'বার বিরুদ্ধে যে (অপ)যুক্তি প্রদান করেন, সেই এক যুক্তি কিন্তু Temple mount এর ক্ষেত্রেও খাটে। কিন্তু এ ব্যাপারে তারা অন্ধের ভান করে কা'বার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করেন। নাস্তিক-মুক্তমনাদেরকেও কখনো বাইবেলের নবী-রাসুলদের Temple mountকে pagan temple বলতে দেখা যায় না; কারণ তাহলে যে জার্মানীর ভিসা নাও জুটতে পারে! এই হচ্ছে তাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড। প্রকৃতপক্ষে বাইতুল মুকাদ্দাস(Temple Mount) কিংবা কা'বা গৃহের মসজিদ(মসজিদুল হারাম) এর কোনটিই pagan temple(পৌত্তলিকদের মন্দির) নয় বরং উভয়টিই এক-অদ্বিতীয় আল্লাহর উপাসনাগৃহ।

.

নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) কা'বা থেকে মিথ্যা দেবতাদের মূর্তি অপসারণ করতে করতে যা বলছিলেন, ইসলাম বিরোধীদের উদ্দেশ্যে আমরাও ঠিক তাই বলি---

.

"সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল।"
(কুরআন, বনী ইস্রাঈল(ইসরা) ১৭:৮১)

---

[১] ■ "Why Do We Face East When Praying Or Do We - How to calculate mizrach - Questions & Answers" [chabad.org]
http://www.chabad.org/.../Why-Do-We-Face-East-When-Praying-Or...
■ *"Mizrah" - Wikipedia, the free encyclopedia*

https://en.wikipedia.org/wiki/Mizrah

■ *The Western Wall (Wailing Wall) - an Orthodox Jewish prayer. Jerusalem. Israel (You Tube)*

https://www.youtube.com/watch?v=5H-zCfM4Mws

[২] বাইবেল, মথি(Matthew) ৫:১৭-২০, লুক(Luke) ১৬:১৬-১৭

[৩] Question regarding Muslims worshiping Ka'bah and Hajr Aswad (islamqa Hanafi)

http://islamqa.org/.../muslims-worshiping-kabah-and-hajr-aswad

[৪] আবদুল্লাহ ইবনে আমর(রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ(ﷺ)কে কা'বা ঘর তাওয়াফ করতে দেখলাম এবং তিনি বলছিলেনঃ কত উত্তম তুমি হে কা'বা! আকর্ষীয় তোমার খোশবু, কত উচ্চ মর্যাদা তোমার! কত মহান সম্মান তোমার। সেই সত্তার শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আল্লাহর নিকট মু'মিন ব্যক্তির জান-মাল ও ইজ্জতের মর্যাদা তোমার চেয়ে অনেক বেশী। আমরা মু'মিন ব্যক্তি সম্পর্কে সুধারণাই পোষণ করি।

[সুনান ইবন মাজাহ, হাদিস নং ৩৯৩২]

[৫] "Hajj 2013 | Exclusive Kaba Kiswa change 2013-1434 Arafa Day " (You Tube)

https://www.youtube.com/watch?v=YRPWbfbq2lo

[৬] ■ "A brief history of al-Masjid al-Haraam in Makkah" --- islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)

https://islamqa.info/en/3748

■ *'আর রাহিকুল মাখতুম', শফিউর রহমান মুবারকপুরী(র) {তাওহিদ পাবলিকেশন্স} পৃষ্ঠা ৪৬৩-৪৬৬*

[৭] বাইবেল, মথি(Matthew) ২১:১২-১৫, ২১:২৩; লুক(Luke) ২:৪৬-৪৯, ২০:১, ২১:৩৭-৩৮

[৮] বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis) ২৮:১০-২২

১৫২

হজের রীতিগুলো কি আসলেই আরব পৌত্তলিকদের(pagans) থেকে নেওয়া?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

ইসলাম ধর্মের ৫টি স্তম্ভের মধ্যে একটি হচ্ছে হজ। সামর্থ্যবান মুসলিমদের উপর জীবনে অন্তত একবার হজ করা ফরয। ইসলামের এই গুরুত্বপূর্ণ বিধানের ব্যাপারে নাস্তিক-মুক্তমনা এবং বিশেষত খ্রিষ্টান মিশনারীদের অভিযোগ হচ্ছেঃ হজের রীতিগুলো মোটেও ইব্রাহিম(আ) এর সাথে কিংবা একত্ববাদের সম্পর্কিত নয় বরং এগুলো প্রাচীন আরবের পৌত্তলিক মূর্তিপুজারীদের থেকে ধার করা। তাদের এই অভিযোগগুলো দেখে অনেকের মনে হজ সম্পর্কে বিভ্রান্তির সৃষ্টি হচ্ছে। সুনির্দিষ্টভাবে হজের যে সব রীতিকে ইসলাম বিরোধীরা "পৌত্তলিকদের থেকে ধার করা" বলে অভিযোগ করে সেগুলো হচ্ছে---

.

◘ কা'বাকে কেন্দ্র করে পাক দিয়ে ঘোরা

◘ হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরকে চুমু খাওয়া

◘ সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌঁড়ানো ও শয়তানকে পাথর ছোড়া

নিচে তাদের অভিযোগগুলো বিশ্লেষণ করে সেগুলোর খণ্ডন করা হল।

.

◘ কা'বাকে কেন্দ্র করে পাক দিয়ে ঘোরা(তাওয়াফ):

হজ ও উমরার সময়ে মুসলিমরা তাওয়াফ করে বা কা'বাকে কেন্দ্র করে ঘোরে। এই ঘূর্ণন হয় ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে(anti clockwise)। খ্রিষ্টান মিশনারী ও নাস্তিক-মুক্তমনাদের মতেঃ এভাবে একটি ইমারতকে কেন্দ্র করে পাক দিয়ে ঘোরা পৌত্তলিকদের রীতি। এমন একটি অভিযোগের লিঙ্কঃ https://goo.gl/WePzp2 । তাদের মধ্যে কারো কারো যেমনঃ খ্রিষ্টান প্রচারক David Wood এর মতে এর কারণ হচ্ছে সূর্য, চন্দ্র এবং ৫টি গ্রহকে উপাস্য সাব্যস্ত করে পৌত্তলিক রীতির অনুকরণ। এ রকম নানা উদ্ভট অভিযোগ তারা করে থাকে। কিন্তু ব্যাপার হচ্ছেঃ সব থেকে অজ্ঞ মুসলিমটিরও কখনো হজের সময় মাথায় এটা থাকে না যে, সে চাঁদ-সূর্য কিংবা গ্রহের পুজা করছে। অথবা কা'বা গৃহটি আল্লাহ তা'আলার মূর্তি বা প্রতিকৃতি(নাউযুবিল্লাহ)। কা'বা ঘরে উপাসনাকে পৌত্তলিকতার সাথে মিলিয়ে ইসলাম বিরোধীরা যে সব অপপ্রচার চালায়, তার সবগুলোর খণ্ডন আমি আমার এই পোস্টে করেছিঃ https://goo.gl/MtZYPi । যা হোক, এখন প্রশ্ন হতে পারে যে, মুসলিমরা কেন হজ ও উমরার সময়ে কা'বাকে কেন্দ্র করে এভাবে পাক দিয়ে ঘোরে?

.

উত্তর হচ্ছে— এটিই নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) নির্দেশিত সুন্নাহ পদ্ধতি। [১] যেহেতু নবী(ﷺ) এভাবে হজ করতে শিখিয়েছেন, মুসলিমরাও আল্লাহর নবীর অনুসরণে এই কাজ করে। কোন মুসলিম কখনো কোন পৌত্তলিক জাতিগোষ্ঠীকে অনুকরণ করে এটা করে না অথবা কোন মুসলিম কখনো চাঁদ-সূর্যের পুজা করার নিয়তে এই কাজ করে না (নাউযুবিল্লাহ)। আল কুরআনে সুস্পষ্টভাবেই এর ঠিক উল্টো কথা বলা আছে অর্থাৎ চাঁদ-সূর্যের পুজা করতে নিষেধ করা হয়েছে।

.

" তাঁর[আল্লাহর] নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে দিবস, রজনী, সূর্য ও চন্দ্র।

তোমরা সূর্যকে সিজদা করো না, চন্দ্রকেও না; আল্লাহকে সিজদা কর, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা নিষ্ঠার সাথে শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদত কর।"

(কুরআন, হা-মিম সিজদাহ(ফুসসিলাত) ৪১:৩৭)

.

আল কুরআনে যা বলা হয়েছে, ঠিক তার উল্টো জিনিস ইসলাম ও মুসলিমদের উপর চাপিয়ে দিয়ে মিথ্যা অভিযোগ তোলে খ্রিষ্টান মিশনারী ও নাস্তিক-মুক্তমনারা।

ইসলাম বিরোধীরা এরপরে যদি বলতে চায়ঃ কা'বা ঘর তাওয়াফ পৌত্তলিক(pagan) উপাসনা না হলে প্রাচীন আরব পৌত্তলিকরা কেন তাওয়াফ করত?

উত্তরে আমরা বলবঃ আরব পৌত্তলিকদের করা ১০০% কাজই ভুল ছিল না। তারা ছিল ইব্রাহিম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এর বংশধর, তাঁদের একত্ববাদী দ্বীন ধীরে ধীরে তাঁদের বংশধরদের মাঝে বিকৃত হয়েছিল। তাদের ভেতর অল্প কিছু ইব্রাহিমী রীতি রাসুল(ﷺ) এর সময়েও অবশিষ্ট ছিল। এর মধ্যে আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ বা পাক দেওয়া অন্যতম।

.

আল কুরআনে বলা হয়েছেঃ

"আর স্মরণ কর, যখন আমি কাবাকে মানুষের জন্য মিলনকেন্দ্র ও নিরাপদ স্থান বানালাম এবং (আদেশ দিলাম যে,) 'তোমরা মাকামে ইব্রাহিমকে সালাতের স্থানরূপে গ্রহণ কর'। আর আমি ইব্রাহিম ও ইসমাঈলকে দায়িত্ব দিয়েছিলাম যে, 'তোমরা আমার গৃহকে তাওয়াফকারী, 'ইতিকাফকারী ও রুকূকারী-সিজদাকারীদের জন্য পবিত্র কর'। "

(কুরআন, বাকারাহ ২:১২৫; লিঙ্কঃ https://goo.gl/8KC8Hb)

.

" আর স্মরণ কর, যখন আমি ইব্রাহিমকে সে ঘরের (বাইতুল্লাহ, কা'বা) স্থান নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম, 'আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না এবং আমার ঘরকে পাক সাফ রাখবে তাওয়াফকারী, রুকূ-সিজদা ও দাঁড়িয়ে সালাত আদায়কারীর জন্য'।

'আর মানুষের নিকট হজের ঘোষণা দাও; তারা তোমার কাছে আসবে পায়ে হেঁটে এবং কৃশকায় উটে চড়ে দূর পথ পাড়ি দিয়ে।'

'যেন তারা নিজদের কল্যাণের স্থানসমূহে হাজির হতে পারে এবং তিনি তাদেরকে চতুষ্পদ জন্তু থেকে যে রিযক দিয়েছেন তার উপর নির্দিষ্ট দিনসমূহে আল্লাহর নাম স্মরণ করতে পারে। অতঃপর তোমরা তা থেকে খাও এবং দুস্থ-দরিদ্রকে খেতে দাও'।

'তারপর তারা যেন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়" ।'তাওয়াফ করে (বা'কা)তাদের মানতসমূহ পূরণ করে এবং প্রাচীন ঘরের ,

:২২হাজ্জ ,কুরআন)২৬-২৯ লিঙ্কঃ https://goo.gl/LmW7r9)

.

অর্থাৎ এই তাওয়াফ ছিল স্বয়ং ইব্রাহিম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এর সময় থেকেই আল্লাহ কর্তৃক নির্দিষ্ট রীতি। তাঁদের বংশধরদের মধ্যে পরবর্তীতে বিভিন্ন নব উদ্ভাবিত ধর্মীয় রীতি ও পৌত্তলিকতা বিস্তার লাভ করে। নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) তাদের মধ্য থেকে নব উদ্ভাবন ও পৌত্তলিকতাগুলো দূর করে দেন এবং ইব্রাহিমী রীতিগুলোকে আল্লাহর নির্দেশে বহাল রাখেন। ইসলাম বিরোধীরা যদি এরপরেও গোঁয়ারের মত বলতে চায় যে— আল্লাহর ঘরকে কেন্দ্র করে তাওয়াফ করা বা ঘোরা ইব্রাহিমী রীতি নয়, তাহলে আমরা বলবঃ আপনারা কি 'হজ' শব্দটির তাৎপর্য জানেন? আরবি 'হজ'(حَجّ) শব্দটি হিব্রু হাগ/খাগ(חָג) শব্দের ইকুইভ্যালেন্ট শব্দ। এমনকি বিখ্যাত বাইবেলের ওয়েবসাইট Biblehubএ ডিকশনারী অংশে এই হিব্রু শব্দটি ব্যাখ্যা করতে আল কুরআনের আরবি 'হজ'(حَجّ) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। এটি এমন একটি শব্দ যেটি বাইবেলে বনি ইস্রাঈল জাতির হজ সম্পর্কে ব্যবহার করা হয়েছে। Hebrew Language Detective ওয়েবসসাইট Balashonএও হিব্রু শব্দটি ব্যাখ্যা করতে আল কুরআনের 'হজ'(حَجّ) শব্দটি উল্লেখ করা হয়েছে। [২] এই হিব্রু শব্দটির ধাতুমূল(root-word) হচ্ছে חוג(খুগ/হুগ) যার মানে হচ্ছে "to

make a circle" বা "move in a circle" অর্থাৎ কোন বৃত্ত তৈরি করা। এই শব্দটির সাথে পাক দেয়া বা ঘোরানোর একটি সম্পর্ক আছে। এই কারণে হিব্রু ভাষায় টেলিফোনের ডায়ালের ক্ষেত্রে এই শব্দমূল থেকে উদ্ভূত חִיּוּג(খেউগ/হেউগ) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। [৩] এসব কারণে হিব্রুতে ইহুদিদের pilgrimage বা হজ বোঝাতে ব্যবহৃত 'হাগ' শব্দটি দিয়ে সরাসরি "পাক দিয়ে ঘোরা"ও বোঝানো হয়। [৪]

.

আমরা এতক্ষন শব্দটির উৎপত্তি ও তাৎপর্য আলোচনা করলাম। এবার আমরা বনী ইস্রাঈলের প্রাচীন ইতিহাসে ফিরে যাই। বনী ইস্রাঈলে আল্লাহ তা'আলা বহু নবী-রাসুল প্রেরণ করেন এবং এককালে তারা ছিল নবী-রাসুলদের দ্বীনের অনুসারী। ইহুদিরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে তাদের কিবলা হিসাবে গণ্য করে। ৭০ খ্রিষ্টাব্দে ইহুদিদের সেকেন্ড টেম্পল বা বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস হয়। এর আগে প্রাচীন ইহুদিরা কিভাবে তাদের হজ বা pilgrimage সম্পাদন করত? বাইতুল মুকাদ্দাসে ইহুদিদের হজ করা রীতি হচ্ছেঃ বাইতুল মুকাদ্দাসকে ঘড়ির কাটার বিপরীত দিকে(anti clockwise) ৭ বার পাক দিয়ে ঘোরা বা তাওয়াফ করা –ঠিক যেভাবে মুসলিমরা কা'বাকে ৭ বার তাওয়াফ করে! [৫] মুসলিমদের হজের সময় ৭ বার তাওয়াফ করাকে 'পৌত্তলিক'(!) রীতি বলে অভিহীত করে খ্রিষ্টান মিশনারী ও নাস্তিক-মুক্তমনারা, অথচ এই একইভাবে প্রাচীন ইহুদিরা বাইতুল মুকাদ্দাসে হজ করত বলে তাদের নথিপত্রে উল্লেখ আছে, এভাবে হজ করা তাদের ধর্মগ্রন্থের বিধান। মুসলিমদের হজের তাওয়াফ যদি পৌত্তলিক রীতিই হত, তাহলে কিভাবে এর সাথে প্রাচীন ইহুদিদের হজের মিল পাওয়া যাচ্ছে? মুসলিমদের ৭ বার তাওয়াফকে David Wood এর মত খ্রিষ্টান মিশনারীরা চাঁদ-সূর্য ও গ্রহের পুজা বলে মিথ্যাচার করে, অথচ ইহুদিদের ব্যাপারে কেন তারা এই অভিযোগ তোলে না? কেন এই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড?

.

ইসলাম বিরোধীরা এবার হয়তো নড়েচড়ে বসে বলবেঃ বুঝতে পেরেছি, মুহাম্মাদ(ﷺ) নিশ্চয়ই হজের রীতি ইহুদিদের নিকট থেকে কপি করেছেন; মদীনায় তো অনেক ইহুদি বাস করত...
কিন্তু ব্যাপার হচ্ছে, মদীনার ইহুদিরা মোটেও ওভাবে বাইতুল মুকাদ্দাসে হজ করত না। ৭০ খ্রিষ্টাব্দে রোম সম্রাট টাইটাস বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস করার পর থেকে ইহুদিরা আর বাইতুল মুকাদ্দাসে হজ করে না। ৭০ খ্রিষ্টাব্দের আগ পর্যন্ত ইহুদিরা বাইতুল মুকাদ্দাসকে ৭ বার তাওয়াফ করে হজ করত। [৬]

.

প্রাচীনকালের ইহুদি ও বর্তমানকালের মুসলিমদের হজে তাওয়াফের তুলনামূলক একটি ছবি দেখুন এই লিঙ্কে ক্লিক করেঃ https://goo.gl/k6H9DG

.

ছবিটির রেফারেন্সঃ "Divine Diversity: An Orthodox Rabbi Engages with Muslims by Ben Abrahamson";
বইটির আমাজন অর্ডার লিঙ্কঃ https://goo.gl/jfQDYu
অথবা দেখুন বইটির লেখকের নোটঃ https://goo.gl/SKWzFd

.

মুহাম্মাদ(ﷺ) এর পক্ষে কি সম্ভব ছিল তাঁর সময় থেকে ৫০০ বছর আগের ইহুদিদের রীতি-নীতি নকল করার? নাকি এটা ভাবাই অধিক যুক্তিসঙ্গত যে এক আল্লাহর থেকেই বিধানটি এসেছে বলে এই মিল দেখা যাচ্ছে -- বিবেকবানদের কাছে এই প্রশ্ন রাখলাম।

.

◘ হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরকে চুমু খাওয়াঃ

হজের সময়ে হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরকে চুমু খাওয়া নিয়ে খ্রিষ্টান মিশনারী ও নাস্তিক-মুক্তমনারা বহুমুখী অভিযোগ তোলে। অভিযোগগুলো শুধু মিথ্যাই নয়, অশ্লীলও।

প্রথমত, তারা বলতে চায়--হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথর নাকি নারীদের যোনীর প্রতিকৃতি যাতে মুসলিমরা চুম্বন করে (নাউযুবিল্লাহ, আসতাগফিরুল্লাহ)।

এ রকম কিছু অভিযোগের লিঙ্কঃ ১। https://goo.gl/fPz1mK ২। https://wikiislam.net/wiki/Kaaba

এই অভিযোগের আদৌ কোন ভিত্তি নেই। ইসলাম বিরোধীরা হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরের উপরিভাগের ছবিতে এর রূপালী বর্ণের ধারকটির আকৃত্রির দিকে ইঙ্গিত করে এই উদ্ভট অভিযোগ তোলে। শিয়াদের একটি ফির্কা কারামিতারা ৩১৭ হিজরীতে কা'বা থেকে হাজরে আসওয়াদ লুট করে, ২২ বছর পর ৩৩৯ হিজরীতে তা উদ্ধার করা হয়। এই ২২ বছর হাজরে আসওয়াদ ছাড়াই হজ সম্পাদিত হয়েছিল। কারামিতারা হাজরে আসওয়াদ ভেঙে টুকরো টুকরো করে ফেলেছিল। [৭] এ কারণে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া পাথরটিকে একত্রে জোড়া দিয়ে একটা গোল ধারক বা ফ্রেমের ভেতর স্থাপন করা হয়েছে। যে কারণে আমরা বর্তমানে গোল রূপালী রঙের ফ্রেমের মাঝে কালো পাথর বা হাজরে আসওয়াদ দেখি। প্রকৃতপক্ষে যদি আমরা পূর্ণ হাজরে আসওয়াদের ছবি দেখি, তাহলে কোনভাবেই এর সাথে নারীদের যোনীর আকৃতির কোন মিল পাওয়া যাবে না(নাউযুবিল্লাহ)। এই লিঙ্কে ক্লিক করে দেখুন হাজরে আসওয়াদ বা কালো পাথরের পূর্ণ আকৃতি কিরূপঃ

https://goo.gl/yXNpWA

ছবিটির উৎসঃ প্রাচ্যবিদ William Muir এর লেখা মুহাম্মাদ(ﷺ) এর জীবনী "The Life of Muḥammad", পৃষ্ঠা ২৯।

ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://goo.gl/PE7Thb ;

উইকিপিডিয়া থেকেও দেখা যেতে পারেঃ https://goo.gl/7yYTAo

.

মানুষ তো তার সন্তানকেও ভালোবেসে চুম্বন করে। এর মানে কি মানুষ তার সন্তানের উপাসনা করে? কোন পৌত্তলিক জাতিগোষ্ঠীগুলোর উপাসনার রীতি যদি আমরা লক্ষ্য করি, তাহলেও আমরা এর সাথে মুসলিমদের কোন মিল খুঁজে পাই না। কোন ক্যাথোলিক খ্রিষ্টান কি চার্চে গিয়ে মরিয়ম(আ) কিংবা যিশুর মূর্তিকে চুমু খায়? কিংবা কোন হিন্দু কি কখনো মন্দিরে পুজার সময় দুর্গা, স্বরস্বতী, কালি এসব দেব-দেবীর মূর্তিতে চুমু খায়?হাজরে আসওয়াদকে মুসলিমরা কখনোই আল্লাহ তা'আলার মূর্তি বা প্রতিকৃতি মনে করে না (নাউযুবিল্লাহ), একে কল্যাণ-অকল্যাণের মালিকও মনে করে না, এর কাছে কোন সাহায্যও চায় না। শুধুমাত্র নবী(ﷺ) এর সুন্নাত হিসাবে মুসলিমরা হজের সময় একে চুম্বন করে। অথচ পৌত্তলিকরা যেসব বস্তুর পুজা করে সেগুলো হয় তাদের উপাস্য দেবতার মূর্তি নয়তো তারা সেগুলোর কাছে কল্যাণ প্রার্থনা করে। কাজেই হাজরে আসওয়াদকে পৌত্তলিকতার সাথে মেলানো অত্যন্ত অযৌক্তিক একটি অভিযোগ।

.

উমর (রা) থেকে বর্ণিত যে, তিনি হাজরে আসওয়াদের কাছে এসে তা চুম্বন করে বললেন, আমি অবশ্যই জানি যে, তুমি একখানা পাথর মাত্র, তুমি কারো কল্যাণ বা অকল্যাণ করতে পার না। নবী(ﷺ)কে তোমায় চুম্বন করতে না দেখলে কখনো আমি তোমাকে চুম্বন করতাম না।

[সহীহ বুখারী ; হাদিস নং ১৫০২; লিঙ্কঃ https://goo.gl/BAcnhA]

.

হাজরে আসওয়াদের উৎস কী? এটি কা'বা ঘরে কেন রয়েছে?

কোন কোন বর্ণনা অনুযায়ী ফেরেশতা জিব্রাঈল(আ) হাজরে আসওয়াদ কা'বার স্থানটিতে রাখেন এবং ঐ স্থানের উপরেই ইব্রাহিম(আ) কা'বা নির্মাণ করেন। [৮]

.

এক্ষেত্রে আগ্রহোদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে, বাইবেল অনুযায়ী বনী ইস্রাঈল জাতির কিবলা বাইতুল মুকাদ্দাসের(Temple Mount/মহামন্দির) গোড়াপত্তনের সাথেও একটি পাথর জড়িয়ে আছে! বাইবেল অনুযায়ী – ইস্রায়েল জাতির পিতা যাকোব

{ইয়া'কুব(আ)/Jacob} একটি বিশেষ পাথরের উপরে বাইতুল মুকাদ্দাসের ভিত্তি স্থাপন করেন! শুধু তাই না, যাকোব {ইয়া'কুব(আ)} সেই পাথরটিকে স্তম্ভের মত করে দাঁড় করান এবং ভক্তিভরে তার উপর তেল ঢালেন!
এই ঘটনার রেফারেন্সঃ বাইবেল, আদিপুস্তক(Genesis/পয়দায়েশ) ২৮:১০-২২।বাইবেল থেকে সংশ্লিষ্ট অংশ পড়তে পারেন এই লিঙ্ক https://goo.gl/wk5Evv অথবা এই লিঙ্ক https://goo.gl/R9sSX2 থেকে।

.

খ্রিষ্টান মিশনারীরা কা'বা ঘরের হাজরে আসওয়াদের ব্যাপারে প্রশ্ন তোলেন অথচ তাদের নিজ ধর্মগ্রন্থে Temple Mount বা বাইতুল মুকাদ্দাসের গোড়াপত্তনের সাথে একটি পাথর জড়িয়ে আছে সে ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরব থাকেন। যাকোব{ইয়া'কুব(আ)}কে তারাও নবী বলে মানেন। মুসলিমদের হাজরে আসওয়াদে চুম্বন করা তাদের কাছে 'পৌত্তলিক আচরণ' হয়ে যায়, কিন্তু যাকোব কর্তৃক Temple Mount এর পাথরে ভক্তিভরে তেল ঢালা তাদের কাছে কোন পৌত্তলিকতা হয় না।
কেন এই দ্বিমুখী আচরণ?
বাংলার নাস্তিক মুক্তমনাদেরকেও কখনো দেখিনি এই ব্যাপার নিয়ে প্রশ্ন তুলতে। অথচ মুসলিমদের বিরুদ্ধে সব সময়েই তাদেরকে সরব দেখা যায়।

.

সেই পাথরটির(হিব্রুতেঃ Even Ha-Shetiya) উপরেই বনী ইস্রাঈলের নবীগণের বাইতুল মুকাদ্দাস মসজিদ(Temple Mount) ছিল এবং হাজার হাজার বছর ধরে সেটা ইহুদিদের কিবলা। পাথরটি আজও সে স্থানে আছে। সেই পাথরের স্থানে ফিলিস্তিনে বাইতুল মুকাদ্দাস এরিয়ার ভেতরে বর্তমানে সোনালী গম্বুজের কুব্বাতুস সাখরা(Dome of Rock) মসজিদ রয়েছে। [৯]
হজকে ব্যাঙ্গ করে খ্রিষ্টান মিশনারীরা মুসলিমদেরকে পাথরের উপাসক(!) বা 'উল্কা উপাসক' বলে অভিহীত করে {লিঙ্কঃ https://goo.gl/kZC3jU } অথচ খোদ বাইবেলে বলা আছে যে ঈশ্বর একজন পাথর এবং বাইবেলে বহু জায়গায় "ঈশ্বর-পাথরের" বন্দনাগীত করা হয়েছে! এমনকি বাইবেলে এ কথাও বলা হয়েছেঃ "যাবতীয় প্রশংসা পাথরের"!!
অবিশ্বাস্য মনে হচ্ছে? তাহলে দেখুনঃ বাইবেল এর --- ২ শামুয়েল(2 Samuel) ২২:২-৩, ২২:৪৭; গীতসংহিতা(সাম সঙ্গীত/জবুর শরীফ/Psalms) ১৮:২, ১৮:৪৬, ১৯:১৪, ২৮:১, ৩১:২-৩, ৪২:৯, ৬২:২, ৬, ৭১:৩, ৯২:১৫, ১৪৪:১। প্রকৃতপক্ষে বাইবেল জুড়ে "পাথরএত পরিমাণে বন্দনাগীত করা হয়েছে যে এর রেফারেন্স খুঁজে পাওয়া খুব সহজ। ইংরেজি ”ঈশ্বরের-my roc' বাইবেলের পিডিএফের সার্চ অপশনে গিয়েk' লিখে সার্চ দিলে বহুবার "পাথর ঈশ্বরের" অথবা শুধু পাথরের প্রচুর বন্দনা পাওয়া যাবে। খ্রিষ্টান মিশনারীরা মুসলিমদেরকে 'পাথরের উপাসক' বলে মিথ্যা অপবাদ দেয় অথচ তাদের নিজ ধর্মগ্রন্থের অবস্থা এইরূপ।

.

◘ সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌঁড়ানো ও শয়তানকে পাথর ছোড়াঃ

পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে যে—আরব পৌত্তলিকদের করা ১০০% কাজই ভুল ছিল না। তারা ছিল ইব্রাহিম(আ) ও ইসমাঈল(আ) এর বংশধর। তাঁদের বংশধরদের মধ্যে পরবর্তীতে বিভিন্ন নব উদ্ভাবিত ধর্মীয় রীতি ও পৌত্তলিকতা বিস্তার লাভ করে। নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) তাদের মধ্য থেকে নব উদ্ভাবন ও পৌত্তলিকতাগুলো দূর করে দেন এবং ইব্রাহিমী রীতিগুলোকে আল্লাহর নির্দেশে বহাল রাখেন। সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌঁড়ানো ও শয়তানকে পাথর ছোড়া-এগুলোও ইব্রাহিমী রীতি যেগুলোকে মুহাম্মাদ(ﷺ) বহাল রেখেছিলেন। নবী ইব্রাহিম(আ) আল্লাহর নির্দেশে তাঁর স্ত্রী হাজেরা(আ) এবং শিশুপুত্র ইসমাঈল(আ)কে আরবের মরুভূমিতে রেখে এসেছিলেন এবং পিপাসার্ত শিশু ইসমাঈল(আ) এর পানির জন্য তাঁর মা হাজেরা(আ) সাফা ও মারওয়া পাহাড়ে ৭ বার দৌঁড়েছিলেন। [১০] এ ছাড়া, পুত্রকে কুরবানী করতে যাবার সময় ওয়াসওয়াসা দানকারী শয়তানের উদ্দেশ্যে নবী ইব্রাহিম(আ) পাথর ছুড়েছিলেন। [১১] ইব্রাহিম(আ), হাজেরা(আ), ইসমাঈল(আ) – তাঁরা সকলেই তাকওয়া অবলম্বন করেছিলেন, আল্লাহর উদ্দেশ্যে আত্মসমর্পণ ও ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন। তাঁদের এই কর্মগুলোকেই মুহাম্মাদ(ﷺ) এর শরিয়তে হজের আনুষ্ঠিকতার ভেতরে অন্তর্ভুক্ত করে চিরস্মরণীয় করে রাখা হয়েছে। এখানে আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপাসনার

কোন ব্যাপার নেই। সাধারণ যুক্তির আলোকেও আমরা বলতে পারি—পৌত্তলিকরা কি কখনো তাদের উপাস্য দেবতার মূর্তিকে ঘৃণা করে বা পাথর ছোড়ে? নাকি তার উল্টো কাজ করে, মূর্তিকে ভক্তি করে এবং ফুল ও বিভিন্ন দ্রব্য দিয়ে পুজা করে? একই কথা সাফা-মারওয়া পাহাড়ে দৌঁড়ানোর ক্ষেত্রেও। এখানে আল্লাহর বিধানের আনুগত্য ছাড়া মুসলিমদের মানসপটে আর কোন কিছু থাকে না।

.

যারা হজের ভেতর বিভিন্ন প্রাচীন ঐতিহাসিক কর্মের অনুকরণমূলক কর্মকাণ্ডকে 'পৌত্তলিকতা' বলে, তাদের আসলে মিল্লাতে ইব্রাহিম{ইব্রাহিম(আ) এর ধর্মাদর্শ} কিংবা পৌত্তলিকতা এর কোনটা সম্পর্কেই সম্যক ধারণা নেই। মুহাম্মাদ(ﷺ) এর পূর্বেও অনেক নবী-রাসুল এসেছিলেন এবং তাঁরাও ইব্রাহিম(আ) এর দ্বীনেরই তথা ইসলামের অনুসরণ করতেন। বনী ইস্রাঈল বংশে বহু নবী-রাসুল এসেছেন এবং প্রাচীন ইহুদিরা ছিল নবী-রাসুলদের অনুসারী। তাদের ধর্মেও ছিল হজের বিধান। তাদের ধর্মগ্রন্থগুলো বিকৃত হলেও এখনো তাতে কিছু প্রাচীন বিধি-বিধান রক্ষিত আছে। তাদের ধর্মগ্রন্থে তিনটি হজের বিধান পাওয়া যায়। [১২] তাদের ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী—বনী ইস্রাঈলের শরিয়তে হজের বিধানেও কিছু প্রাচীন প্রসিদ্ধ ঘটনার অনুকরণের নির্দেশ রয়েছে। ইহুদিদের কিতাব অনুযায়ী, মুসা(আ) ও ফিরআউনের সময়ে মিসর ত্যাগ করে চলে যাবার আগে বনী ইস্রাঈলের মানুষেরা পশু কুরবানী করেছিল এবং তাড়াহুড়ার কারণে খাবার জন্য খামির(leaven) ছাড়া রুটি তৈরি করেছিল। এই ঘটনার স্মরণে ইহুদিরা তাদের 'নিস্তার পর্ব'{Pesach /Passover} pilgrimageএ পশু কুরবানি করত এবং খামিরবিহীন রুটি তৈরি করত। আজ পর্যন্ত ইহুদিরা এভাবেই Passover উদযাপন করে। মুসা(আ) যখন বনী ইস্রাঈলকে নিয়ে বাইতুল মুকাদ্দাসের দিকে যাত্রা করেছিলেন, তখন তারা সেই বিস্তীর্ণ যাত্রাপথে দীর্ঘকাল মরুভূমিতে খোলা আকাশের নিচে তাবুতে রাত কাটিয়েছেন। সেই ঘটনাকে স্মরণ করে ইহুদিরা তাদের Chag Sukkot বা Sukkot pilgrimage এ খোলা প্রান্তরে ছোট ছোট তাবুতে থাকে। [১৩] এমনকি বাইবেলের নতুন নিয়ম(New testament) অনুযায়ী যিশু খ্রিষ্ট তাওরাতের শরিয়তের সকল আইন অনুমোদন করেছেন এবং তিনি ইহুদিদের Pilgrimage feast উদযাপন করতেন। [১৪]

.

খ্রিষ্টান মিশনারীদের কখনও দেখা যায় না ইহুদিদের pilgrimage এ এই অনুকরণমূলক কাজগুলোকে 'পৌত্তলিকতা' বলতে কেননা তাহলে যে তাদের নিজ ধর্ম প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে যাবে। কারণ খোদ যিশু খ্রিষ্ট যে এ সকল আচার-অনুষ্ঠান অনুমোদন করে গিয়েছেন। জার্মানীর ভিসালোভী নাস্তিক-মুক্তমনাদেরকেও আর বাইবেলের pilgrimage নিয়ে প্রশ্ন তুলতে দেখা যায় না; তাদের যত আপত্তি মুসলিমদের pilgrimage বা হজ নিয়ে।

পরিশেষে এটাই বলব যে দ্বীন ইসলামের অন্যম রুকন বা ভিত্তি হজ এর অনুষ্ঠানাদির মধ্যে পৌত্তলিকতার লেশমাত্রও নেই এবং তা বিশুদ্ধ একত্ববাদী ইব্রাহিমী রীতিনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যারা হজের অনুষ্ঠানাদি নিয়ে প্রশ্ন তোলে, এক রাশ অজ্ঞতা ও ডাবল স্ট্যান্ডার্ড প্রয়োগ ছাড়া তাদের দাবির কোন সুদৃঢ় ভিত্তি নেই।

.

"বলঃ আল্লাহ সত্য বলেছেন; অতএব তোমরা ইব্রাহিমের সুদৃঢ় ধর্মের অনুসরণ কর এবং সে মুশরিক(অংশীবাদী)দের অন্তর্গত ছিলনা।
নিশ্চয়ই সর্বপ্রথম গৃহ, যা মানবমণ্ডলীর জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা ঐ ঘর যা বাক্কায়(মক্কায়) অবিস্থত; ওটি সৌভাগ্যযুক্ত এবং সমস্ত বিশ্ববাসীর জন্য পথ প্রদর্শক। তাতে সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে (যেমন) মাক্বামে ইব্রাহিম(ইব্রাহিমের দাঁড়ানোর জায়গা)। যে কেউ তাতে প্রবেশ করবে নিরাপদ হবে।
আল্লাহর জন্য উক্ত ঘরের হজ করা লোকেদের উপর আবশ্যক— যার সে পর্যন্ত পৌঁছার সামর্থ্য আছে এবং যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে, (সে জেনে রাখুক) নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্ব জাহানের মুখাপেক্ষী নন।

বলঃ হে কিতাবধারীরা(ইহুদি ও খ্রিষ্টান সম্প্রদায়), তোমরা কেন আল্লাহর নিদর্শনাবলীর প্রতি অবিশ্বাস করছো? তোমরা যা করছো আল্লাহ সে বিষয়ে সাক্ষী।”
(কুরআন, আলি ইমরান ৩:৯৫-৯৮)

---

[১] “The virtue of tawaaf around the sacred House” – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/234172
[২] ■ “Strong's Hebrew 2282. חַג (chag) -- a festival gathering, feast, pilgrim feast”
http://biblehub.com/hebrew/2282.htm
■ *“What Are Pilgrimage Festivals _ My Jewish Learning”*
http://www.myjewishlearning.com/artic.../pilgrimage-festivals/
■ *“Balashon - Hebrew Language Detective chag”*
http://www.balashon.com/2006/10/chag.html
[৩] ■ “Strong's Hebrew 2328. חוּג (chug) -- to draw around, make a circle”
http://biblehub.com/hebrew/2328.htm
■ *“Balashon - Hebrew Language Detective chag”*
http://www.balashon.com/2006/10/chag.html
[৪] ■ দেখুন ভিডিওর ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড থেকে ৯ মিনিট ২৫ সেকেন্ড পর্যন্ত অংশ
“The Bible proves Prophet MOSES did pilgrimage to MECCA - INTERESTING Insight by a JEWISH writer!” (YouTube)
https://www.youtube.com/watch?v=IW0FrgSd80k
■ *“The Christian's Biblical Guide to Understanding Israel - Insight Into God's Heart For His People” By Doug Hershey*
গুগল বুক লিঙ্কঃ https://goo.gl/QDZzLR
[৫] ■ “The Second Temple” (Jewish Virtual Library)
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-second-temple
■ *“Similarities between Masjid al-Haram and the Jewish Temple | Judaism and Islam – comparing the similarities between Judaism and Islam”*
http://www.judaism-islam.com/similarities-between-masjid-a.../
■ *“Circling seven times counter-clockwise on the Hajj (Chag)” (An Article By Rabbi Ben Abrahamson)*
https://www.facebook.com/notes/ben-abrahamson/circling-seven-times-counter-clockwise-on-the-hajj-chag/144816165544432/
[৬] ■ “The Islamic Jewish Calendar How the Pilgrimage of the 9th of Av became the Hajj of the 9th of Dhu'al-Hijjah”
ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://goo.gl/TJcU9m
■ *“The Second Temple” (Jewish Virtual Library)*
http://www.jewishvirtuallibrary.org/the-second-temple
[৭] “Questions about the Black Stone” – islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)
https://islamqa.info/en/45643
[৮] ■ ‘দারসে তিরমিযি’, মুফতি তাকি উসমানী; খণ্ড ৩, পৃষ্ঠা ৩৭
‘দারসে তিরমিযি’র লিঙ্কঃ https://archive.org/.../Dars-e-Tirmidhi-3Volumes-ByShaykhMuft...

■ *"What is the story behind the origin of the Black Stone, Hajre Aswat?When was it place by the Kaaba, and by whom? Is it true that it has turned black absorbing the sins of Muslims?" (islamqa Hanafi)*

https://goo.gl/CSm8sC

[৯]■ "Foundation Stone" (Wikipedia: The Free Encyclopedia)

https://en.wikipedia.org/wiki/Foundation_Stone...

■*"The Temple Institute: A CALL TO REMEMBER"*

http://www.templeinstitute.org/a-call-to-remember.htm

[১০] সহীহ বুখারী, ৩১২৫ নং হাদিস দ্রষ্টব্য। সম্পূর্ণ হাদিসটি পড়ুন এখান থেকেঃ https://goo.gl/xrvAeV

[১১] "Stoning the Devil at Hajj is Abrahamic - Dr Yasir Qadhi " (You Tube)

https://www.youtube.com/watch?v=SYy5unHxSV8

[১২] ■ Jewish Tanakh, Shemot(Exodus), অধ্যায় ২৩ দ্রষ্টব্য। লিঙ্কঃ https://goo.gl/6u93Hp

■ *Three pilgrimage festivals(Wikipedia: The Free Encyclopedia)*

https://en.wikipedia.org/wiki/Three_Pilgrimage_Festivals

[১৩]■ "3 Jewish Feasts of the Old Testament You Should Know"

http://www.seedbed.com/3-jewish-feasts-old-testament-know/

■ *"Judaism 101—Sukkot"*

http://www.jewfaq.org/holiday5.htm

■ *"The 3 Annual Biblical Pilgrim Feasts"*

http://www.bibletruth.cc/LetUsGoUp.htm

[১৪] বাইবেল, মথি(Matthew) ৫:১৭-২০ এবং ২৬:১৭-১৮ দ্রষ্টব্য

১৫৩

আল-কোরআনের বৈপরীত্য – বাস্তবিক নাকি মতিভ্রম?

-জাকারিয়া মাসুদ

সেদিন বৃহস্পতিবার। যথারীতি বিকেল পাঁচটায় ক্লাস শেষ হল। ভেবেছিলাম আসরের সালাত আদায় করে ফারিসকে নিয়ে বেড়াতে যাব। কিন্তু তা আর হলো না। সালাত আদায় করে সবেমাত্র বেরিয়েছি এমন সময় বৃষ্টি শুরু হল। মিনিট পাঁচেক হাঁটার পর দেখলাম বৃষ্টির মাত্রা ক্রমেই বেড়ে চলছে। দৌড়ে আমরা পাশের যাত্রী ছাউনীতে গিয়ে উঠলাম। তুমুল বৃষ্টি শুরু হল। যাত্রী ছাউনীতে আমাদের সাথে আরও বেশ ক'জন লোক ছিল।

যাত্রী ছাউনীর একটি লোক বারবার ফারিসের দিকে তাকাচ্ছিল। কিছুক্ষণ পর লোকটি আমার দিকে এগিয়ে এল। এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এভাবে খানিক সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, "কিছু বলবেন, আংকেল?"

.

লোকটি জবাবে বললো, "আমি জোবায়ের। জোবায়ের আহমেদ। অনুমতি দিলে একটা প্রশ্ন করি?"

"জ্বি করেন"।

লোকটি ফারিসের দিকে ইশারা করে বললো, "আচ্ছা বাবা, ঐ যে লোকটা দাঁড়িয়ে আছে তিনি কি ফারিস?"- হ্যাঁ আংকেল। যে ছেলেটা দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে বৃষ্টি দেখছে, ঐ-ই ফারিস।

- তাঁর সাথে একটু কথা বলা যাবে?

- জ্বি যাবে। দাঁড়ান আমি ডাকছি। ফারিস। এই ফারিস। এইদিকে একটু আয় তো।

.

ডাক শুনে ফারিস আসলে আমি বললাম, "এই আংকেল তোকে খুঁজছেন। কি যেন বলবেন"।

সালাম মোসাফা শেষে ফারিস বললো, "কি জানতে চান আংকেল"?বলুন ,

-আমি আপনাকে অনেকদিন যাবত খুঁজছি। কিন্তু এভাবে আপনার সাথে দেখা হয়ে যাবে ভাবি নি। যাক, দেখা হয়ে ভালই হল।

-আপনি আমায় কীভাবে চেনেন?

- অনলাইনে আপনার লিখা পড়েছি। আমার এক কলিগ আছেন যার ছেলে আপনাদের সাথে পড়ে। তার মুখে আপনার অনেক প্রশংসা শুনেছি। সে থেকেই আপনার সাথে দেখা করার অনেক ইচ্ছে। কিন্তু সময় করে উঠতে পারছিলাম না। কিন্তু কি সৌভাগ্য দেখুন - আজ কাকতালীয় ভাবে আপনার সাথে দেখা হয়ে গেল।

- অহ আচ্ছা। আংকেল আমি তো আপনার ছেলের বয়সী তাই আমাকে তুমি করে বললেই বেশি খুশি হব। তা আমার কাছে কি মনে করে?

- আসলে আমি একটা বিষয় নিয়ে তোমার সাথে ডিসকাস করতে চাচ্ছিলাম। তাই।

- কি ধরনের বিষয়?

- বলবো। সব বলবো। তবে এখানে নয়।

- তাহলে?

- আমার যে একটা আর্জি ছিলো?

- জ্বি বলুন।

.

ভদ্রলোক পকেট থেকে একটি কার্ড বের করে ফারিসকে দিয়ে বললেন, "এই যে আমার কার্ড। এখানে আমার বাসার ঠিকানা

আছে। আমার খুব ইচ্ছে একদিন তুমি সময় করে আমার বাসায় আসবে"।
ফারিস বললো, "কথা তো দিতে পারছি না। তবে ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করবো।"

ভদ্রলোকটির মুখে অপ্রসন্নতার ছাপ লক্ষ্য করা গেল। তিনি ফারিসের হাত ধরে বললেন, "বাবা আমাকে কথা দাও তুমি আসবে। প্লিজ"।

লোকটি এমনভাবে মিনতি করছিলো যে, হ্যাঁ করা ছাড়া কোন গত্যন্তর ছিল না। তাই ফারিস রাজি হয়ে গেল।

ভদ্রলোকটি বেশ হাসিমুখে বললেন, "থ্যাংক ইউ মাই সান। আর হ্যাঁ, অবশ্যই তোমার এই বন্ধুকে সাথে নিয়ে আসবে। আমি খুব খুশি হব।"

কিছুক্ষণ পর বৃষ্টি কেটে গেলো। আমরা যাত্রী ছাউনী থেকে নিজ-নিজ গন্তব্যের দিকে যাত্রা করলাম।.
প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে ভার্সিটি যেদিন বন্ধ ছিল, সেদিন আমি আর ফারিস জোবায়ের সাহেবের বাড়ীর খোঁজে রওয়ানা হলাম। প্রায় ঘণ্টা খানিক পর আমরা কাঙ্ক্ষিত বাসাটি খুঁজে পেলাম। বাসার কলিংবেল চাপতেই এক পিচ্চি এসে দরজা খুলে দিল। এরপর বললো, "আফনারা কারা? কি চাইন?"
ফারিস বললো, "জোবায়ের সাহেব আছেন বাসায়। আমরা তার সাথে দেখা করতে এসেছি?"
"যে আছেন। আফনারা বিতরে আইন। আমি বড় সাবরে ডাইক্কা দিতাছি"।
.
ছেলেটি আমাদেরকে বসার ঘরে বসতে দিয়ে বিদায় নিল। মিনিট পাঁচেক পর জোবায়ের আংকেল এলেন। আমাদেরকে দেখে তিনি বেশ খুশি হয়েছেন বলেই মনে হল। কুশলাদি বিনিময় শেষে বললেন, "তোমরা এসেছ আমি বেশ খুশি হয়েছি। তবে কষ্ট দেয়ার জন্য ক্ষমাপ্রার্থী"।
.
ভদ্রলোকের কথা শেষ হলে ফারিস বললো, "পাখি পালনের প্রতি আপনার বেশ ঝোঁক, তাই না?"

জোবায়ের সাহেব অবাক হয়ে বললেন, "কীভাবে বুঝলে?"
- আপনার বুক সেলফ দেখে।
- মানে?
- আপনার সেলফ ভর্তি পাখি পালন, পাখির পুষ্টি, পাখির পরিচর্যা ইত্যাদি বই দিয়ে ভর্তি। আর বাসার বাইরের বড় গাছগুলোতে দেখলাম মাটির হাঁড়ি বাঁধা। বেলকোনেতে পাখির খাঁচা; তাই বললাম আর কি"।
- অহহ আচ্ছা। তুমি দেখছি অনেক জিনিস খেয়াল করেছো।
.
ফারিস যেখানেই যাক না কেন, সেখানকার অবস্থাটা সে অবশ্যই ভালোকরে বিশ্লেষণ করবে। এটা তার চিরাচরিত অভ্যাস। সে আজো তার ব্যতিক্রম করে নি। জোবায়ের আংকেলের কথা শেষ হলে ফারিস জিজ্ঞেস করলো, "কি যেন প্রবলেম ডিসকাস করবেন বলে আসতে বলেছিলেন?"
- বলছি বলছি। এত তাড়া কিসের? আগে বল কি খাবে? চা না কফি?
- কফি।
.
জোবায়ের সাহেব কাজের ছেলেটিকে ডেকে কফি দিতে বললেন। এরপর ফারিসের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমি একটা সমস্যায় পরেছি। সেটার সমাধান দেবার জন্যই তোমাকে বাসা পর্যন্ত নিয়ে এসেছি"।

"কি ধরনের সমস্যা?" ফারিসের প্রশ্ন।

.

"সমস্যাটা আমার ছেলেকে নিয়ে। আমার একটি মাত্র ছেলে। নাম জনি। ক্লাস টেনে পড়ে। ছাত্র হিসেবে বেশ ভাল। কিন্তু ইন্টারনেটের প্রতি তাঁর খুব ঝোঁক। সময় পেলেই ফেসবুক, গুগল, ইমু ইত্যাদি নিয়ে পরে থাকে। খুব আদরের ছেলে বলে ওর কোন কাজে আমি বাঁধা দেই নি। যা চেয়েছে তার থেকেও বেশি দেয়ার চেষ্টা করেছি। আজ সেই ছেলেটাই আমার হারিয়ে যেতে বসেছে"।

জোবায়ের সাহেবের কথা শেষ হলে আমি বললাম, "কি হয়েছে ওর? ওর কি বড় ধরনের কোন অসুখ করেছে?"

জোবায়ের সাহেব বললেন, "না, না বাবা। অসুখ করে নি। অসুস্থতা ওর সম্যসা নয়। সমস্যা অন্য জায়গায়"।

.

ফারিস বললো, "ব্যাপারটা একটু খুলে বলবেন কি"?

- জ্বি, জ্বি। সেজন্যেই তো তোমাদেরকে ডেকেছি। আসলে সমস্যাটা হচ্ছে, জনি দিন-দিন সংশয়বাদী হয়ে যাচ্ছে। ইন্টারনেটে নাস্তিকদের যেসব ব্লগ রয়েছে ঐগুলি সে নিয়মিত ব্রাউজ করে। আর সেখান থেকে খুঁজে-খুঁজে আজগুবি সব প্রশ্ন বের করে আমার সাথে তর্ক করে। ইসলাম সম্পর্কে আমার জানাশোনা খুবই কম। যার ফলে আমি কখনো-কখনো ওর সাথে তর্কে হেরে যাই। আমার হারাটা মেজর প্রবলেম নয়। মেজর প্রবলেম হল, আমি তর্কে ওর সাথে পারি না বলে সে আমাদের ধর্ম নিয়ে ঠাট্টা করে। ওর কাছে মনে হয় কোরআনে অনেক স্ববিরোধী আয়াত রয়েছে। বৈজ্ঞানিক ভুল রয়েছে। তাই কোরআন কখনো স্রষ্টার বানী হতে পারে না। ভেবেছিলাম ওকে কোন আলেমের কাছে নিয়ে যাব। কিন্তু কোনভাবেই রাজি করাতে পারি নি। তাই তোমাদেরকে এতটা পথ কষ্ট দিয়ে বাসায় নিয়ে এসেছি। আই'ম সরি মাই সান।

- ইট'স ওকে আংকেল। জনি আছে বাসায়? কথা বলা যাবে ওর সাথে?
- আসলে কি ভাগ্য আমার, তোমরা এসেছো আর জনিও কিছুক্ষণ আগে বাসায় এসেছে। একটু বস। আমি দেখছি।

.

এরপর ভদ্রলোক বাড়ীর ভেতরে গেলেন। মিনিট দশেক পর ফিরে এলেন। সঙ্গে করে নিয়ে এলেন কফি, বিস্কুট আর চানাচুর। কফির কাপ আমাদের দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি সবেমাত্র কাপে চুমুক দিয়েছি, এমন সময় ভেতর থেকে একটি ছেলে এল। পরনে গেঞ্জি, হাতে ট্যাবলেট ফোন, কানে ইয়ারফোন। জোবায়ের সাহেব আমাদেরকে ছেলেটির সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। এই ছেলেটাই জনি। জোবায়ের সাহেবের একমাত্র সন্তান। জনি ফারিসের মুখোমুখি বসলো।

.

ফারিস জনিকে লক্ষ্য করে বললো, "কেমন আছ ভাইয়া"?

- ভালো। আপনি?
- আলহামদুলিল্লাহ। ভালো।
- পড়াশুনা কেমন হচ্ছে তোমার?
- এইতো চলছে কোনরকম।
- জনি, তোমাকে একটা প্রশ্ন করি?
- হ্যাঁ করেন।
- ধর আমি তোমাকে একটি ইংলিশ নোবেল বই গিফট করলাম। এরপর বললাম যে, 'বইটা পড়ে তোমার মতামত জানাবে'। কিন্তু তুমি বইটি পড়লে না। এমন একজনের কাছ থেকে বইটি সম্পর্কে ধারণা নিলে যে ইংরেজী ভাষা জানে না। ইংলিশ গ্রামারের রুলস জানে না। সম্পূর্ণ বইটি সে পড়েও নি কোনদিন। এরপর তুমি আমাকে ইনফরম করলে যে, 'বইটিতে অনেক সমস্যা আছে। স্ববিরোধী বক্তব্য আছে। গ্রামারটিক্যাল ভুল আছে'।

ব্যাপারটা কি ঠিক হবে, বল?
- না, না।
-তাহলে কোনটা করলে ভালো হত?
- সবথেকে ভালো হত বইটি নিজে আদ্যোপান্ত পড়ার পর মতামত দেয়া। আর নিজে না পড়তে পারলে যে ভালো ইংরেজী জানে তাঁর কাছ থেকে বইটি সম্পর্কে ধারণা নেয়া। এরপর মন্তব্য করা।
-এক্স্যাক্টলি। এক্স্যাক্টলি মাই ব্রাদার। এবার আমাকে বল, কেউ যদি নিজে কোরআন না পড়ে মুক্তমনা ব্লগ থেকে কোরআন কারীমের ভুল খুঁজতে যায় তাহলে সেটা কি ঠিক হবে?

.

জনি কিছুক্ষণ চুপ রইল। এরপর বললো, "তারা তো ভুল কিছু প্রচার করছে না। কোরআনের যে জায়গা গুলোতে সমস্যা রয়েছে সেগুলো আমাদের সামনে তুলে ধরছে। আমাদেরকে সতর্ক করছে"।

.

জনির মাথাটা যে বেশ খারাপ হয়েছে, তা ওর কথা থেকেই বুঝা যাচ্ছে। নচেৎ যে ব্লগের লেখকদের বাংলা ভাষাজ্ঞানই ঠিক নেই; তাঁরা আবার আরবী গ্রামারের ভুল ধরে কি করে? ফারিস জনির বক্তব্য শুনে মুচকি হেসে বললো, "আচ্ছা জনি, আমরা খোলাখুলি কথা বলি। কোরআনের কোন কোন জায়গা গুলোতে তুমি সমস্যা খুঁজে পেয়েছো? আই মিন মুক্তমনা থেকে জেনেছো?"

- অনেক জায়গায়।

- যেমন?

- একটু দাঁড়ান আমি বলছি।

.

.

জনি তাঁর মোবাইল থেকে একটি পিডিএফ ফাইল বের করলো। এরপর ফারিসকে বললো, "কোরআনের (৫১:৫৬) তে মানুষ সৃষ্টির কারণ বলা হয়েছে, কেবল আল্লাহর ইবাদত। কিন্তু ৭:১৫৮- তে বলা হয়েছে মুহাম্মাদের সুন্নাহ অনুসরণের কথা। তাহলে মানব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য কি? আল্লাহর ইবাদত নাকি মুহাম্মাদের সুন্নাহ অনুসরণ?"

.

ফারিস জনির প্রশ্নের জবাব না দিয়ে প্রশ্ন করলো, "জনি সত্যি করে বল তো, তুমি কি কোরআন পড়েছো?"
"কিছুটা"। জনির উত্তর।
"কিছুটা কোরআন আর মুক্তমনা ব্লগের লিখা থেকেই কি কোরআন সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়"?
. জনি কিছু বললো না। চুপ করে রইলো। ফারিস বললো, "এবার তোমার প্রশ্নে আসি। মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি? স্রষ্টার ইবাদত? নাকি মুহাম্মাদের (ﷺ) সুন্নাহ অনুসরণ? আমাদেরকে সৃষ্টি করার একমাত্র উদ্দেশ্য হল, মহান আল্লাহর ইবাদত করা। অন্য সমস্ত সৃষ্টির ইবাদত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়া। এককথায় নিজেকে শত ইলাহের গোলামী থেকে মুক্ত করে এক আল্লাহর গোলামীতে লিপ্ত করা।
- কিন্তু কোরআন তো অন্যকিছু বলছে।
- লেট মি ফিনিস ব্রাদার। কোরআন কারীমের সূরা আন-নাজমের ২-৪ আয়াতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল বলেন, "তোমাদের সঙ্গী বিভ্রান্ত নয়, বিপথগামীও নয়। এবং সে মনগড়া কথাও বলে না। এটাতো ওহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ হয়"।
সূরা আহকাফের ৯ নাম্বার আয়াতে বলা হয়েছে, "আমি আমার প্রতি যা ওহী করা হয় শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি এক

স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র"।
এসব আয়াত থেকে আমরা বুঝতে পারি, রাসূল)ﷺ) নিজ থেকে বানিয়ে-বানিয়ে কোন কথা প্রচার করেন নি। কোন শিক্ষা দেন নি। তিনি যা প্রচার করেছেন, যা শিখিয়েছেন তা আল্লাহ আযযা ওয়া জাল তাকে শিক্ষা দিয়েছেন।
আল্লাহ তায়ালা সূরা আল-হাক্কাহ এর ৪৪-৪৬ আয়াতে আরও স্পষ্ট করে বলেছেন, "সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত – আমি অবশ্যই তাঁর ডান হাত ধরে ফেলতাম। কেটে দিতাম তাঁর জীবন-ধমনী"।
এখন আমাকে বলতো, মুহাম্মাদের)ﷺ) সুন্নাহ প্রকৃতপক্ষে কার শিক্ষা?
- আল্লাহর।
- হ্যাঁ, মহান আল্লাহর শিক্ষা। আর তুমি কোরআন পড়লে দেখবে কোরআনের বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ আযযা ওয়া জাল মুহাম্মাদের (ﷺ) সুন্নাহ অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। কোরআন কারীমের সূরা আলে-ইমরানের ৩১ আয়াতে আল্লাহ আযযা ওয়া জাল মুহাম্মাদকে (ﷺ) লক্ষ্য করে বলেছেন, "তুমি বলঃ যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমদের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু"।
একটা জায়গায় তোমার মারাত্মক ভুল হয়েছে। আর সেটা হল, তুমি কোরআন সম্পূর্ণ পড় নি। পড়লে অবশ্যই এমন মতিভ্রম হত না। আমরা মুসলিমরা মুহাম্মাদের)ﷺ) সুন্নাহ এই জন্যে অনুসরণ করি না যে, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ ছিলেন। আমরা অনুসরণ করি এই জন্যে যে, আল্লাহ আমাদেরকে তার অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ যদি মুহাম্মাদের (ﷺ) সুন্নাহ অনুসরণ করার নির্দেশ না দিতেন, তাহলে আমরা কখনোই করতাম না।
- বিষয়টা আরেকটু ক্লিয়ার করলে ভালো হত।
- মনে কর, তুমি তোমার কোন প্রিয় লোককে ট্রেইনার হিসেবে কোথাও পাঠালে। তাকে সেখানে গিয়ে কি কি করতে হবে তা তুমি নিজ হাতে শিখিয়ে দিলে। এরপর বললে যে, 'আমি যেভাবে বললাম ঠিক সেভাবেই মানুষকে শিক্ষা দিবি'। সে তাঁর দায়িত্ব বুঝে নিয়ে চলে গেল। লোকটা নির্ধারিত স্থানে পৌঁছে মানুষকে বললো, 'আমাকে আমার বস মিঃ জনি এখানে পাঠিয়েছেন। আর তোমাদেরকে এই এই জিনিস গুলো শিক্ষা দিতে বলেছেন'। তুমি তাকে যেখানে পাঠালে সেখানকার মানুষ তাঁর কথাগুলো ঠিক সেভাবেই মানলো, যেভাবে তুমি তাকে শিখিয়েছিলে। এখন সেখানকার লোকজন যদি তোমার পাঠানো লোকের কথা অনুসরণ করে, তাহলে আলটিমেটলি ব্যাপারটা কি দাঁড়ায়? লোকজন কি তোমার পাঠানো লোকটার অনুসরণ করছে? নাকি ইনডাইরেকটলি তোমাকেই ফলো করছে? তোমার কথার আনুগত্য করছে?
- অবশ্যই আমার কথার আনুগত্য করছে। কেননা আমার পাঠানো লোকটাকে তো আমিই শিক্ষা দিয়েছি। আর সে আমার শিক্ষার বিপরীতে কোন কথা প্রচার করে নি।
- আমরা মুসলিমরাও মুহাম্মাদের (ﷺ) সুন্নাহ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহর আদেশ পালন করি। কেননা আল্লাহ আযযা ওয়া যাল তাকে অনুসরণের নির্দেশ দিয়েছেন। মুহাম্মাদ তার জীবনে আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত সত্যেরই দাওয়াত দিয়েছেন। নিজে থেকে বানিয়ে কিছু প্রচার করে নি। তিনি তাই বলেছেন, যা আল্লাহ তাকে বলার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি মানুষকে তাই করতে বলেছেন, যা আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন। তাই তাঁর সুন্নাহ অনুসরণ মানে আল্লাহর হুকুমের অনুসরণ। আর আল্লাহর হুমুক পালনের জন্যেই আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। সৃষ্টি করেছেন তার ইবাদতের জন্যে।

.

ফারিসের কথা শেষ হলে জনি আবার মোবাইলের দিকে নজর দিলো। আমি চানাচুর খাচ্ছিলাম আর ফারিস ও জনির কথোপকথন শুনছিলাম। জোবারের আংকেল বেশ চুপচাপ হয়ে বসে আছেন আর চা পান করছেন। মনে হচ্ছে যেন পিন-পতন-নীরবতা বিরাজ করছে। ।
এভাবে কিছু সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর জনি আবার ফারিসকে প্রশ্ন করলো, "আচ্ছা ভাই, কোরআনকে আপনারা সমগ্র মানবজাতির জীবন বিধান হিসেবে বিশ্বাস করেন কি?"

.

"কেন করবো না? অবশ্যই করি"। ফারিসের ঝটপট উত্তর।

“কোরআনের বহু আয়াতে মুহাম্মাদের পার্সোনাল সমস্যার সমাধান দেয়া হয়েছে। সমগ্র মানবজাতির জন্য পাঠানো বিধানে একজন নবীর জন্য আল্লাহর এত মাথাব্যথা থাকবে কেন? এ থেকে কি প্রমাণ হয়না যে, কোরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য পাঠানো কোন কিতাব নয়?”

.

জনির শিশুসুলভ প্রশ্ন আমাকে বেশ বিরক্ত করছিলো। কিন্তু ফারিস - ওর মুখে কোন বিরক্তির ছাপ নেই। খুব মনোযোগ দিয়ে সে জনির কথাগুলো শ্রবণ করছিলো।

.

জনির প্রশ্ন শুনে বেশ হাসিমুখে বললো, “আমি তো তোমাকে খুব ব্রিলিয়ান্ট ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি আমাকে হতাশ করলে ভাই। এমন একটা প্রশ্ন করলে, যা প্রশ্ন হবারই যোগ্য নয়। তবুও আমি তোমার প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছি। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল কোরআন কারীমের বিভিন্ন আয়াতের মাধ্যমে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (ﷺ)-কে আমাদের সকল কর্মের মডেল বানিয়েছেন। সূরা আন-নূরের ৫৪ নাম্বার আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, ‘বল, তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎ পথ পাবে। রাসূলের দায়িত্বতো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া’।
এছাড়া আরও অন্যান্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা রাসুলের (ﷺ) আনুগত্য করার, তার সুন্নাহকে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছেন”।

.

ফারিসের কথা শেষ না হতেই জনি বলে উঠলো, “তাতে কি আমার অভিযোগ খণ্ডন হয়”?
-আগে তো আমাকে বলতে দাও। তার পর না হয় মন্তব্য কর?
- আচ্ছা বলুন।
-ইসলাম এমন একটা দ্বীন যা, থিয়োরীর পাশাপাশি মানুষকে প্রাক্টিক্যাল শিক্ষা দেয়। ইসলাম শুধু তাঁর কোন বিধান বর্ণনা করেই ক্ষান্ত হয় নি। বরং প্রত্যেকটি মৌলিক বিধান হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছে। আর হাতে কলমে শিক্ষা দেয়ার জন্য আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (ﷺ) দুনিয়াতে পাঠিয়েছেন। যিনি একাধারে মানুষকে ওহীলব্ধ জ্ঞানের শিক্ষা দিয়েছেন। পাশাপাশি নিজের জীবনে তা পরিপূর্ণরূপে বাস্তবায়ন করেছেন। প্রত্যেকটি কর্মের ক্ষেত্রে আল্লাহ তায়ালা রাসূলকে মডেল বানিয়েছেন। আদর্শিক পুরুষ বানিয়েছেন। কোরআন কারীমের মধ্যে রাসূলে (ﷺ) পার্সোনাল সমস্যার সমাধান এ জন্য দিয়েছেন, যাতে মানুষ তাদের জন্যে প্রেরিত মডেলের জীবনী থেকে শিক্ষা নিতে পারে। যাতে মানুষ জানতে পারে, তাদের আদর্শিক পুরুষ জীবনের সমস্যাগুলো কীভাবে সমাধান করেছেন। মানুষ যাতে আল্লাহকে এই অপবাদ না দিতে পারে যে, আল্লাহ যাকে মডেল বানালেন তার কর্ম গুলোকে আমাদের সামনে আনলেন না কেন? মনে কর, আমি কোন সমস্যায় পরলাম। এখন এই সম্যসার সমাধান আমি তাঁর মধ্যে খুঁজে পেলাম না, যাকে আল্লাহ আমার জন্য আদর্শ হিসেবে নির্ধারণ করেছিলেন। তাহলে ব্যাপারটা কেমন হত? এজন্যেই রাসূলের (ﷺ) পার্সোনাল কিংবা পারিবারিক সমস্যার সমাধানগুলোও কোরআনে তুলে ধরা হয়েছে। আর আমাদের সমস্যার সমাধানও সেভাবে করতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, যেভাবে রাসূল (ﷺ) তাঁর সমস্যাবলির সমাধান করেছেন।

.

ফারিস এই পর্যন্ত বলে থামতেই আংকেল জনিকে বললেন, “কিরে মাথার জট খুলেছে? নাকি সব গুলিয়ে ফেলেছিস। ভালো করে জেনে নে তোর ফারিস ভাইয়ের কাছ থেকে। আমাকে আর জ্বালাতন করবি না”।
ফারিস সবেমাত্র চায়ের কাপটা হাতে নিয়েছে এমন সময় জনি বলে উঠলো, “আমার আরেকটি প্রশ্ন ছিল ভাইয়া”।
ফারিস বললো, “হ্যাঁ বল।”
“আপনি কি জানেন, কোরআনের মধ্যে অনেক বৈজ্ঞানিক ভুল আছে”?
“যেমন?”

.

জনি তাঁর মোবাইল ঘেঁটে আরেকটি প্রশ্ন বের করে বললো“ ,কোরআনের সূরা লুকমানের ৩৪ নাম্বার আয়াতের মধ্যে বলা হয়েছে, ‘মাতৃগর্ভে কি আছে তা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না’। অথচ আমরা জানি, ডাক্তাররা পরীক্ষা করে বলে দিতে পারে যে গর্ভের বাচ্চা ছেলে না মেয়ে। তাহলে কোরআনের এই আয়াত কি আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের পরিপন্থী নয়”?

“না, অবশ্যই নাফারিসের উত্তর।।”

-কেন না?

- আচ্ছা মানুষ কি বাইরে থেকে কোনরূপ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াই গর্ভের বাচ্চা ছেলে না মেয়ে, এটা শিউরলি বলে দিতে পারবে?

- তা হয়তো পারবে না। কিন্তু পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তো অবশ্যই পারবে।

- এরপরেও কিন্তু কোরআনের আয়াত ভুল প্রমাণিত হয় না।

- কেন? কেন হবে না। এটা তো আলটিমটলি ভুল হয়েই আছে।

- হাসালে জনি। এ বয়সে জ্ঞানের থেকে আবেগটা একটু বেশিই থাকে। তুমিও তার ব্যতিক্রম নও। আয়াতটি সত্যিকার অর্থে কি বুঝাতে চাচ্ছে, তুমি তা অনুধাবন করতে পার নি ভাই।

- তাহলে আপনিই বলেন আয়াতের মর্মার্থ কি?

- সউদি আরবের প্রখ্যাত আলেম শাইখ মুহাম্মাদ বিন সালেহ আল উসাইমীন (র.) ‘ফতোওয়া আরকানুল ইসলাম’ নামক কিতাবের ৩৫ পৃষ্টায় বলেন, “আয়াতটি গায়েবী বিষয় সংক্রান্ত। এখানে আল্লাহ তায়ালা মোট পাঁচটি বিষয় উল্লেখ করেছেন, যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তন্মধ্যে মাতৃগর্ভে কি আছে তা একটি। শিশু মাতৃগর্ভে থাকাবস্থায় গায়েবী বিষয়গুলো হল, ‘সে কতদিন মায়ের পেটে থাকবে। কত দিন দুনিয়াতে বেঁচে থাকবে। কি রকম আমল করবে। সৌভাগ্যবান হবে না দূর্ভাগ্যবান হবে। গঠন পূর্ণ হওয়ার পূর্বে (ভ্রুণ থেকে) ছেলে না মেয়ে হবে এ সম্পর্কে অবগত হওয়া’।

আর গঠন পূর্ণ হওয়ার পর মাতৃগর্ভে ছেলে না মেয়ে, এ সম্পর্কে অবগত হওয়া ইলমে গায়েবের বিষয় নয়। কেননা গঠন পূর্ণ হলে তা আর গায়েব না থেকে দৃশ্যমান হয়ে যায়।...... আর এ আয়াতে মাতৃগর্ভে ছেলে সন্তান বা মেয়ে সন্তান হওয়ার জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর কাছে – একথা বলা হয় নি। হাদীছেও এই মর্মে কোন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত নেই”।

.

ফারিস এই পর্যন্ত বলে থামলো। এরপর কফির কাপ তুলে চুমুক দিল। আমি চুপ করে পাশে বসে রইলাম। আংকেল চায়ের কাপটা হাত থেকে নামিয়ে বেশ বড় গলায় জনিকে বললেন, “কিরে, এমন চুপসে গেলি কেন? খুব তো পটপট করিস আমার সাথে। আমি কিছু জানি না বলে আমার সাথে তো ভালোই ভাব নিস। এখন কেন চুপ করে আছিস? আরও কিছু বলার থাকলে বল। কাল থেকে যেন আর ব্লগ ব্রাউজ করতে না দেখি। মনে থাকে যেন”।

.

আংকেলের কথা শেষ হলে জনি মাথা নীচু করে আমাদের সামনে থেকে চলে গেল। ও চলে যাওয়ার পর আংকেল কাঁদতে-কাঁদতে বললেন“ ,একটি মাত্র ছেলে আমার। আজ ওর এই অবস্থা। নিজেকে কোনভাবেই বুঝাতে পারছি না। কোনদিন ধারণাও করি নি যে আমার ছেলেটা এমন হবে”।

আংকেলের চোখে পানি দেখে আমার খুব খারাপ লাগছিলো। ছেলেকে উনি অনেক ভালোবাসেন। তাই হয়তো জনির অন্যায় দাবিগুলোও তিনি মুখ বুঝে সহ্য করে যাচ্ছেন। আংকেল চোখের পানি মুছে বললেন, “জানি না ওর বোধোদয় হবে কি না? হলে তো আলহামদুলিল্লাহ। আর আমাকে ক্ষমা করবে, তোমাদের দুজনকে আমি কষ্ট দিয়েছি। এতদূর নিয়ে এসেছি। তোমাদের ঋণ আমি কোনদিন শোধ করতে পারবো না। তোমাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। সময় পেলে অবশ্যই এই বুড়ো আংকেলে একবার দেখে যাবে”।

সেদিনকার মত আমরা আংকেলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম।

.

প্রায় মাস খানিক পর জোবায়ের আংকেলের একটা মেইল এল ফারিসের কাছে। যেখানে তিনি লিখেছিলেন, “আসসালামু

আলাইকুম ফারিস। আশা করি ভালো আছ। আমি যে আজ কতটা আনন্দিত, তা তোমাকে বুঝাতে পারবো না। আল্লাহ সত্যিই আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার ছেলের প্রতি করুণা করেছেন। জনি অন্ধকার থেকে ফিরে এসেছে। সত্যকে চিনতে শিখেছে। নিয়মিত নামাজ পড়ছে। দাড়িও রেখেছে। তুমি ওর জন্য প্রাণখুলে দোয়া করবে। আল্লাহ যাতে তাকে দ্বীনের উপর অটল রাখেন। আর আমিও আল্লাহ তায়ালার কাছে দোয়া করছি, তিনি যেন তোমার মত দায়ী ঘরে ঘরে তৈরি করেন। আল্লাহ তোমাকে জাজায়ে খায়ের দান করুন"।

১৫৪

কোরবানী নিয়ে 'কলাবিজ্ঞানী'র অপযুক্তি ও হুজুরের জবাব

-সাইফুর রহমান

'আপনারা যেভাবে নৃশংসভাবে পশুর গলা কেটে কোরবানি করেন, এর থেকে ভয়াবহ দৃশ্য আর কি আছে? আপনাদের মনে আসলে কোনো দয়া, মমতা, করুনা নাই'- কলাবিজ্ঞানী হুজুরের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালো।

.

'আপনার এই প্রশ্নের জবাব দেয়ার আগে অন্য কিছু নিয়ে আলোচনা করা যাক''-হুজুরের উত্তর। 'বলেন কি বলবেন'-কলাবিজ্ঞানী কিছুটা বিরক্ত।

.

'আপনার খাবারের মেনুতে চিকেন, ডাক,ফিশ এইগুলা কি কখনো থাকেনা? আর এইগুলা যে প্রাণী এদেরও প্রাণ আছে, এরাও ব্যথা পায় তাতো আপনার জানার কথা। তো এদেরকে যখন মারা হয় তখন আপনার মানবতা উথলিয়ে উঠেনা?'

.

কলাবিজ্ঞানী অপ্রস্তুত হয়ে, 'ঠিক আছে আপনার কথা মানলাম কিন্তু যারা ভেজেটেরিয়ান তারাতো আপনার এই আপত্তি থেকে মুক্ত?'- কলাবিজ্ঞানী মনে মনে কিছুটা স্বস্তি পেলো, যাক হুজুরের প্রশ্নের প্যাচ থেকে বের হওয়া গেছে।

.

হুজুর অবিচলিতভাবে বললো, 'শাকসবজিরও কিন্তু প্রাণ আছে? কিন্তু আমি আপনাকে আর অপ্রস্তুত করতে চাইনা।আচ্ছা বলুন দেখি, এমন কোনো ভেজেটেরিয়ান আছে আপনার পরিচিত যারা ডায়াবেটিস, ক্যান্সার জাতীয় মরণঘাতি রোগে আক্রান্ত?'

.

'অনেকেই আছেন, বাট পশু হত্যার সাথে এর সম্পর্ক কি?'-কলাবিজ্ঞানী চরম বিরক্ত।

.

হুজুর স্মিত হাসি দিয়ে, 'সম্পর্ক আছে দেখেই বললাম। আপনার জানা থাকার কথা, এইসব প্রাণঘাতী রোগের ড্রাগস্, এন্টিবডি ও অন্যান্য প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট মার্কেটে আসার আগে কতশত গবেষণার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। প্রতিদিন বিশ্বের বিভিন্ন ল্যাবরেটরিতে হাজার হাজার ইঁদুর, গিনিপিগ, বানর হত্যা করা হচ্ছে, এইসব প্রাণীদের জীবন আছে, তারা ব্যথা পায়। ভাবছেন ওরা ছোট খাটো প্রাণী ওদের আবার কষ্ট কি? অথচ সব প্রাণীরই অনুভুতি আছে তারা সবাই কষ্ট পায়, তারা সবাই আনন্দ পায়। বিজ্ঞানীরা একমত সমস্ত মেরুদন্ডী ও কিছু অমেরুদন্ডী প্রাণীরও আমাদের (মানুষ) মতো অনুভূতি আছে। তো আপনারা এইসব প্রাণী হত্যার বিষয়ে মুখ খোলেন না কেনো ? এটা কি আপনাদের ডাবল স্ট্যান্ডার্ড আচরণ নয়?'

.

কলাবিজ্ঞানী হুজুরের এই উত্তরের জন্য মোটেও প্রস্তুত ছিলোনা। আমতা আমতা করে বললো, 'আপনার যুক্তি ঠিক আছে, কিন্তু আপনার যেভাবে হত্যা করেন সেটা যে বর্বর, তা এটলিস্ট স্বীকার করেন?'

.

হুজুর নির্লিপ্তভাবে শুরু করলো- 'দেখুন আপনার জানার লেভেল কম জানতাম বাট এতো কম সেটা জানতাম না। পশু হত্যার পদ্ধতি নিয়ে অনেক আলোচনা ও গবেষণা আছে। এনিম্যাল ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের লোকদের ধারণা, ইহুদি ও মুসলিমরা সবচেয়ে নৃশংসভাবে পশু হত্যা করে। আসল কথা হলো বিজ্ঞানীরা এই দাবির পক্ষে কোনো যৌক্তিক কারণ খুঁজে পাননি।

বিজ্ঞানীরা কনভেনশনাল এনিম্যাল স্ল্যাউটরিং এর সাথে ইহুদি ও মুসলিমদের স্লাউটরিঙের তেমন কোনো পার্থক্য খুঁজে পাননি, সবক্ষেত্রেই ব্যাথা অনুভব করার মাত্রা সমান। কনভেনশনাল এনিম্যাল স্ল্যাউটরিং মেথড যেমন, ক্যাপটিভ বোল্ট গান, ইলেকট্রিক শক, গ্যাসিং সহ আরো অনেক পদ্ধতিতে যেভাবে প্রাণীকে অজ্ঞান করা হয় তাতে প্রাণীর যে কষ্ট হয় একই পরিমান কষ্ট হয় দ্রুত ঘাড়ের নিচে কেটে ফেলার মাধ্যমে হত্যা করলে। দ্রুত কেটে ফেলার দ্বারা এনিম্যাল দ্রুত অজ্ঞান হয়ে যায় কারণ ব্রেন এর সাথে ব্লাড ফ্লো খুব দ্রুত থেমে যায় এবং শরীর থেকে বাকি রক্ত দ্রুত বের হয়ে যায়। বিজ্ঞানীদের রিপোর্ট অনুযায়ী গলা কেটে ফেলার প্রথম ৫ সেকেন্ড প্রাণীরা তীব্র ব্যাথা অনুভব করে তারপর আস্তে আস্তে অবশ হতে থাকে, ৬০ সেকেন্ড পরে তারা একেবারে কিছুই অনুভব করতে পারেনা। প্রথম দিকের ব্যথা কোনো মেথড দিয়েই দূর করা সম্ভব নয়। কনভেনশনাল মেথোডেও প্রথম দিকে তীব্র যন্ত্রনা অনুভব করে। সুতরাং কোরবানি ও কনভেনশনাল এনিম্যাল স্ল্যাউটরিং এর মধ্যে বৈজ্ঞনিক কোনো পার্থক্য নেই। তবে পশু হত্যা করার উদ্দেশ্য যেহেতু তার মাংস খাওয়া, এই দিকটা বিবেচনা করলে, দ্রুত গলা কেটে ফেলার দ্বারা এনিম্যাল স্ল্যাউটরিং করলে তার মাংসের গুনাগুন কনভেনশনাল এনিম্যাল স্ল্যাউটরিং থেকে অনেকগুন্ ভালো থাকে। দ্রুত রক্ত বের হওয়ার ফলে পশুর দেহের ভিতরে রক্ত জমাট বাধতে পারে না ফলে মাংসের আয়রন টক্সিসিটি হওয়ার সম্ভাবনা কম থাকে যেটা কনভেনশনাল পদ্ধতিতে হওয়ার চান্স বহুগুনে।'

.

কলাবিজ্ঞানী হতাশ হয়ে পড়লো। আগের আলোচনাগুলোতে পর্যদুস্ত হওয়ার শোধ নেয়া দূরে থাক, নতুনভাবে পর্যদুস্ত হয়ে সে উঠে দাঁড়িয়ে প্রস্থানের প্রস্তুতি নিতে শুরু করলো।

.

হুজুর কিন্তু থামছে না, সে বলে চললো.. 'আপনাদের কোরবানির বিরুধীতার মূল কারণ ইসলামের প্রতি বিদ্বেষ। আপনার কি জানা নেই, পৃথিবীর সবচেয়ে বড় কসাইখানাগুলো কোনো মুসলিম দেশে না, এগুলো আমেরিকাতে। ম্যাক ডোনাল্ড, কে. এফ. ছি., সাবওয়ে, এরা প্রতিদিন হাজারো পশু হত্যা করছে তার খবর কি আপনারা রাখেন?'

.

কলাবিজ্ঞানী আর নিতে না পেরে, পরে কথা হবে, কোরবানির নৃশংসতা নিয়ে একটা কালপতাকা প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়েছে ওটাতে জয়েন করতে হবে, বলে সটান প্রস্থান করলো। হুজুর স্মিত হেসে, পরওয়ারদিগারের কাছে এদের হেদায়তের দুআ করতে লাগলো।

১৫৫

একটি শ্বেতসারীয় উপাখ্যান

-মোঃ মশিউর রহমান

কার্বোহাইড্রেট।

কিংবা শ্বেতসার।

.

.

এ বস্তুর নাম গোটা জীবনে অন্তত একবার হলেও শোনেনি -এমন আদমসন্তান বোধহয় খুঁজে পাওয়া বেশ শক্ত -এখন হোক সে বান্দা কম্পিউটার সাইন্সের ছাত্র, কি স্টাটিস্টিক্সের ছাত্র, অথবা রকেট সায়েন্টিস্ট বা ড্রোণ আবিষ্কারক, কিংবা চারুকলা ইন্সটিটিউটে গবেষণাকারী বিজ্ঞানমনস্ক সম্প্রদায়।

আর বিশেষ করে আমাদের এই দেশে- যেখানে মাঝেমধ্যে সকালের নাস্তা এবং বিভিন্ন ওকেশনের মেন্যুতে থাকা রুটি সহ মেজরিটি অফ দা পিপলের মূল খাদ্য হলো ভাত, তথা কার্বোহাইড্রেট।

.

ভাত, রুটি, চাল, গম -ইত্যাদি যাই বলা হোক না কেন, বায়োকেমিক্যাল পরিভাষায় এর সবগুলোকেই মোটাদাগে বলা হয়ে থাকে কার্বোহাইড্রেট -এর কোন হেরফের নেই।

তবে হ্যাঁ, পার্থক্য তো কিছু অবশ্যই আছে, তা না হলে এত বিশাল সীমাহীন বৈচিত্র্যময় বিশ্বজগত হলো কোথা থেকে?

.

যাই হোক, ডানে-বাঁয়ে না কেটে মূল আলোচনায় আসার চেষ্টা করা যাক।

.

কার্বোহাইড্রেট, কিংবা শর্করা, অথবা শ্বেতসার -যাই বলা হোক না কেন, অন্যতম ৫টি খাদ্য উপাদানের এই একটিকে ঢালাওভাবে মোট তিনটা ক্লাস বা শ্রেণিতে বিভক্ত করা যায়।

.

১. মনোস্যাকারাইড

২. অলিগোস্যাকারাইড এবং

৩.পলিস্যাকারাইড

.

মনোস্যাকারাইড হলো ১টি মাত্র শর্করা ইউনিট নিয়ে গঠিত, যেমন গ্লুকোজ;

অলিগস্যাকারাইড হলো রাফলি ২-১০টি ইউনিটে গঠিত, যেমন সুক্রোজ -যা চিনি হিসেবে বাজারে কিনতে পাওয়া যায়;

আর পলিস্যাকারাইডগুলো গড়পড়তায় ১০টির বেশি রিপিটিং ইউনিটে তৈরী -এগুলো হলো সব বেসিক ধারণা।

.

কিন্তু যখনই না একটু গভীরে ডুব দেওয়া শুরু হয়,বোঝা যেতে থাকে,

যে আমাদের দৈনন্দিন জীবনে, এই সাড়ে তিনহাত শরীরের অভ্যন্তরে, প্রতিটা মূহুর্তেই আমাদের অজান্তেই যে কত শত-হাজারটি ওয়ান্ডার্স আর মিরাকলস বিরতিহীনভাবে ঘটে চলেছে -খেয়াল করে দেখলে যেগুলো কল্পনাকেও হার মানিয়ে দেয় -যদি

দেখার উপযুক্ত চোখ এবং উপলব্ধি করার মত বাস্তব অর্থেই একটি মুক্ত মন থেকে থাকে।

.

যাই হোক, আলোচনায় ফেরা যাক।
কথা হচ্ছিল কার্বোহাইড্রেট নিয়ে।

.

তো এখন কথা হলো, আমাদের তথা বিশ্বের অনেক স্থানেই অধিকাংশ খাদ্যবস্তু ও এনার্জি সাপ্লাইয়িং সাবস্টেন্স হলো কার্বোহাইড্রেট।
আরও স্পেসিফিক্যালি বললে, মূলত পলিস্যাকারাইডস।

.

যেমন ধরা যাক চালে সঞ্চিত হয়ে থাকা স্টার্চের কথা।

.

এই স্টার্চ মূলত আর কিছুই না, বেসিক্যালি গ্লুকোজের ২টি পলিমার।
অর্থাৎ অসংখ্য গ্লুকোজ অণু বা ইউনিট একের পর এক সংযুক্ত হয়ে বিশাল বড় ২টি চেইন গঠন করে, যার একটি শাখাবিহীন এবং অন্যটি শাখাযুক্ত।

.

এভাবে পলিমারাইজেশন বা একত্রে অনেকগুলো অণু পরস্পর যুক্ত হয়ে বিশাল স্ট্রাকচার গঠনের অন্যতম সুবিধা হলো প্রয়োজনের সময় সহজেই বিপুল সংখ্যক গ্লুকোজ অণুর যোগান দেওয়া সম্ভবপর হয়।

.

এখন এই যেমন উদ্ভিদে সঞ্চিত বা স্টোরড কার্বোহাইড্রেট হিসেবে স্টার্চ রয়েছে, ঠিক তেমনিভাবে প্রাণীদেহে সঞ্চিত বা স্টোরড হওয়া কার্বোহাইড্রেটও আছে;
যার নাম হলো গ্লাইকোজেন -যেটাকে " প্রাণীজ স্টার্চ " নামেও অভিহিত করা হয়।

.

এই গ্লাইকোজেন আচার-আচরণে স্টার্চেরই কপি বলা যায়, কিন্তু সূক্ষ্ম কিছু পার্থক্য অবশ্যই আছে।

.

স্টার্চ ও গ্লাইকোজেন -উভয়েই গ্লূকোজের পলিমার হওয়া সত্ত্বেও স্টার্চে যেখানে ২টি চেইন থাকে, গ্লাইকোজেনে সেখানে থাকে ১টি চেইন।
গ্লাইকোজেনের চেইনটি স্টার্চের শাখাযুক্ত চেইনটির মতই সেইম- শাখাযুক্ত, কিন্তু শাখা সৃষ্টি হবার সংখ্যা স্টার্চের তুলনায় অনেক বেশি।

.

এসব ব্যাপারে কিছু পরে আসার চেষ্টা করা হবে ইন শা আল্লাহ।

.

তো পূর্বে যে ব্যাপারে আলোচনা হচ্ছিল, খাদ্য হিসেবে কার্বোহাইড্রেটের কথা।

.

আমরা যখন কোন খাবার খাই, তাতে যে কার্বোহাইড্রেটই থাকুক না কেন- মনো, অলিগো কিংবা পলিস্যকারাইড -সেটা থেকে এনার্জী পেতে হলে তাকে গ্লুকোজ ডিপেন্ডেড পাথওয়ে (গ্লাইকোলাইসিস) হয়েই যেতে হয়।

.

অর্থাৎ আপনি দুধ খান, কিংবা চিনি খান, অথবা ভাত খান কি রুটি খান -শক্তি পেতে হলে এর সবগুলোর কার্বোহাইড্রেট অংশকেই ভেঙে গ্লুকোজের পাথওয়ে হয়েই আগে বাড়তে হবে।

এখন হয় তা সরাসরি অল্টারড/চেইঞ্জড হয়ে পাথওয়েতে যাবে, আর নাহলে গ্লুকোজে রূপান্তরিত হয়ে পাথওয়েতে যাবে।

.

এখন আপাতত বোঝার ও আলোচনার সুবিধার্থে সবচাইতে সিম্পল কার্বোহাইড্রেট খাবার, অর্থাৎ ভাত নিয়েই কথা বলা যাক। কারণ ভাতের সম্পূর্ণটাই গ্লুকোজ, এর ভিন্ন আর কোন কার্বোহাইড্রেট নেই তাতে।

.

এই ভাত খাবার পর যখন তা হজম হওয়া আরম্ভ হয়, তখন তা " আলফা-অ্যামাইলেজ " নামক এক এনজাইমের প্রভাবে ভেঙে গ্লুকোজ মলিকিউল মুক্ত হয়।

.

এই গ্লুকোজ মলিকিউলগুলো ব্লাডের মাধ্যমে বিভিন্ন ডেস্টিনেশনে পৌঁছে যায়,
এবং ইনসুলিন নামক হরমোনের উপস্থিতিতে সেসব স্থানের কোষের মেমব্রেনে অবস্থিত ভিন্ন ভিন্ন ১২ ধরণের GLUT নামক ট্রান্সপোর্টার প্রোটিনের মাধ্যমে কোষের ভেতরে শোষিত হয়।

.

এ পর্যন্ত তো গেল খাওয়া থেকে হজম হওয়া, কোষে শোষিত হওয়া ইত্যাদি পর্যন্ত হওয়া কার্যক্রমের মোটামুটি রাফ একটা বর্ণনা -যার বিস্তারিত বায়োকেমিক্যাল ও বায়োফিজিক্যাল বিবরণ শুরু করলে আর্টস, কমার্স, সাহিত্য, ললিতকলা প্রভৃতি ব্যাকগ্রাউন্ডের বিজ্ঞানীরা দেখা যাবে ভিমড়ি খেয়ে জ্ঞানই হারিয়ে ফেলবেন।
এত আগেই প্যাঁচা, শিয়াল, বাঘ, ভাল্লুকের মুখোশ নিয়ে মঙ্গল কামনা করতে বের হওয়া প্রবল বিজ্ঞানমনস্ক সম্প্রদায়কে ভড়কে দেওয়াটা মোটেই তাদের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী না, আর তা এই মূহুর্তে উদ্দেশ্যও না।

.

কাজেই এগিয়ে যাওয়া যাক।

.

ভাত খাবার পর ব্লাডের মাধ্যমে স্বীয় ঠিকানায় তো বেশ অনেকখানি গ্লূকোজ পৌঁছে গেল;
কিন্তু যে গ্লুকোজ মলিকিউলগুলোর প্রয়োজনের অতিরিক্ত থেকে যায়, সেগুলো?

.

সেগুলোর কি কোন কাজ নেই?

.

যেহেতু বঙ্গদেশীয় বিজ্ঞানের ঠিকাদারেদের প্রমাণ ও ভিত্তিহীন দাবীনুযায়ী এসমস্ত কিছু 'এমনি এমনি"-ই তৈরী হয়ে যায় নি, কাজেই অতিরিক্ত গ্লুকোজ অণুগুলোরও অবশ্যই কাজ আছে।

.

আর সে কাজ হলো সেগুলো সেই পূর্বোল্লিখিত গ্লাইকোজেন হিসেবে দেহে, যেমন বলা যায় লিভার সেল বা যকৃতকোষে সঞ্চিত থাকে।

.

এই দেশের অনলাইনে কিংবা "চারুকলা ল্যাবোরেটরিতে" বিজ্ঞান চর্চাকারীরা যখন ঘাড়ের রগ কয়েক গুণ মোটা করে ফুলিয়ে ও "ত্যাঁড়া" করে- বিশ্বজগত ও এর মধ্যস্থিত যাবতীয় বস্তু শুধু কিছু অ্যাক্সিডেন্টেরই মাধ্যমে "হুদামুদাই" তৈরী হয়েছে -এ মতবাদ ঝাড়তে আসে,
তখন তারা সেটার স্বপক্ষে প্রমাণস্বরূপ অধিকাংশ সময়েই এই বিশাল সৃষ্টিজগতের সীমাহীন শৃঙ্খলা ও হারমোনীর মাঝে তথাকথিত কিছু "বিশৃঙ্খলা" খুঁজে বেড়ানোর চেষ্টা করে।

.

তো এ বার তাদের জন্য ব্যাপারটা নাহয় একটু সহজই করে দেওয়া যাক, নাকি?

.

তো ব্যাপারটা হলো-

.

ভাতে থাকে স্টার্চ, হজমের সময় যা এনজাইমের প্রভাবে ভেঙে গ্লুকোজ রিলিজ করে।
এই এনজাইমের সিক্রেশন বা ক্ষরণ হয় শক্তির বিনিময়ে, অর্থাৎ গ্লুকোজ থেকে শক্তি পাওয়ার আগেই বেশ কিছু অলরেডী শক্তি খরচ হয়ে গেল।

.

এরপর সেই মুক্ত হওয়া গ্লুকোজ রক্তের মাধ্যমে সারাদেহে পৌঁছাবে -আবার শক্তি খরচ।

.

সেল বা কোষে শোষিত হতে ইনসুলিন লাগবে -যা ক্ষরিত হতে পুনরায় শক্তি "খরচিত"।
তারপর ইনসুলিন আসলে গ্লুকোজ কোষে শোষিত হবে -আবারো শক্তির ব্যয়।

.

এরপর কোষের ভেতরে সেই গ্লুকোজ মেটাবোলাইজড অর্থাৎ বিপাক হবে, বিপুল সংখ্যক এনজাইম লাগবে -কথা কম, শক্তি দাও আগে।

.

কেবল শক্তি তৈরী করতেই ইতোমধ্যেই এভাবে শক্তি খরচ হতেই আছে, তার ওপর আবার অতিরিক্ত গ্লুকোজ অণুগুলো যখন লিভার সেলে স্টোর হবে,
সেখানে তারা আবার পুনরায় পরস্পর যুক্ত হয়ে পলিমার গঠন করে গ্লাইকোজেন হিসেব থাকবে, যেখানে আবার শক্তি লাগবে।

.

- "ফাইজলামি নাকি?"
- "কোন মানে হয় এগুলার?"

.

এমনিতেই শুরুর পলিমার স্টার্চ থেকে ভেঙে গ্লুকোজ পেতে এতকিছুর মধ্যে দিয়ে যাওয়া লাগলো, আবার সেই পলিমারই (গ্লাইকোজেন) তৈরি করার মানেটা কী?

.

কী, সহজ হয়ে গেল না স্বঘোষিত বিজ্ঞানীদের জন্য ব্যাপারটা?

.

দেহের কাজে যখন গ্লুকোজই লাগতেছে, তখন একবার সেইটার পলিমার ভেঙে আবারও সেই পলিমারই বানানোর মানে কী?
এতে শক্তি অপচয় না করে গ্লুকোজ হিসেবে স্টোর করলেই হলো, শুধুশুধু অনর্থক কাজ করাই কি প্রমাণ করে না, যে- "স্রষ্টা বলে কিছু নেই, ওসব গুহাবাসীয় চিন্তাভাবনা" ?
কারণ সৃষ্টিজগতের উদ্দেশ্যই তো যতটা সম্ভব কম এনার্জী খরচে অধিক পরিমাণে কাজ করে এনার্জী কনজার্ভ করে রাখা যায়।

.

এখন এই "স্রষ্টার অনুপস্থিতি"-র স্বপক্ষে থাকা এই অতীব সহজবোধ্য, সাবলীল এবং কংক্রীটতুল্য "যুক্তি"-র বিপরীতে "গণ্ডমূর্খের মত মধ্যযুগীয় কিছু এক্সপ্লেনেশন" দিতে হলে অন্য একটা ব্যাপারে একটু মনোযোগ দিতে হবে।
তবে তা কোন ব্যাপার না।

.

ইন্টারফেইল হয়ে কিংবা সাহিত্যকলার ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে এসে যদি তারা লাইফ সায়েন্স, ম্যাথমেটিক্যাল সায়েন্স, অ্যাস্ট্রোনমি প্রভৃতির বিশালাকারে বিস্তৃত জ্ঞানক্ষেত্রসমূহকে অবলীলায় নিজেদের পদচারণায় মুখরিত করতে পারে,অভিমানে গাল ফুলিয়ে বলতে পারে যে " বিজ্ঞান বুঝতে হলে যে কেবল সায়েন্সেই পড়তে হবে এমন কোন কথা নেই, আমরাও তা পারি " ; তাহলে আমাদের পক্ষেও তা খুব একটা কঠিন হবে না ইন শা আল্লাহ।

.

তো এখন সেই উল্লেখিত ব্যাপারটা হলো অসমোলারিটি, শুদ্ধ বাংলায় বললে অভিস্রাব্যতা।

.

ব্যাপারটা সহজে বলতে গেলে, ধরা যাক পানির একটা পাত্রের কথা -যার ঠিক মাঝখানে এমন একটা নেট না ফিল্টার দেওয়া, যার ভেতর দিয়ে শুধুমাত্র পানি-ই যেতে পারবে, পানিতে মিশে থাকা বস্তু নয়।

.

তো এখন সেই ফিল্টারের এক পাশে শুধু পানি বা কোন কিছু অল্প পরিমাণে কিছু মেশানো পানি,
আর অপর পাশে পানির সাথে সেই বস্তু বেশি পরিমাণে মিশিয়ে রাখলে -পানি ফিল্টারের কোন পাশ থেকে কোন পাশে যাবে, এবং কতটুকুই বা যাবে তা যেই ব্যাপারটা নির্ধারণ করে, তাই হলো অভিস্রাব্যতা।

.

অর্থাৎ ডানে শুধু পানি অথবা কম সলিউট বা দ্রব মেশানো পানি, এবং বামে বেশি পরিমাণে দ্রব মেশানো পানি রাখা হলে - পানির প্রবাহ হবে ডান থেকে বামে, অর্থাৎ যেখানে পানির পরিমাণ বেশি সেখান থেকে সে যেখানে তার পরিমাণ কম, সেখানে যেয়ে জমা হবে -যতক্ষণ না সবদিকে তা সমান হচ্ছে।

.

এখন কথা হলো, এই অসমোলারিটি বা অভিস্রাব্যতার একটা বড় পিকুলিয়ার বৈশিষ্ট্য আছে।

.

তা হলো, এটা দ্রবণে মিশ্রিত বস্তুর নাম্বার বা সংখ্যার ওপর নির্ভর করে,
সে বস্তুর আকার, আয়তনে, ওজন কিংবা ভর এগুলো কোনটার ওপরই নির্ভর করে না।

.

অর্থাৎ যদি কোন ফিল্টারের ডানপাশের পানিতে ১০টি ছোট ছোট কণা মেশানো থাকে, এবং বামপাশে যদি সেগুলোর চেয়ে বড় কেবল একটা কণা থাকে -তাহলেও পানি বামপাশ থেকে ডানপাশেই যাবে, তার বিপরীত কখনোই নয়।

.

তো এখন এই একই ব্যাপার সেল বা কোষের ক্ষেত্রে কল্পনা করা যাক- যার মেমব্রেনের ভেতরের অংশও জলীয়, এবং বাইরের অংশও জলীয়।

.

তো কোষে যদি গ্লুকোজ গ্লাইকোজেনরূপে জমা না হয়ে শুধু গ্লুকোজ্রূপেই জমা হতো, যার বাইরে গ্লুকোজের কনসেন্ট্রেশন কম - সেক্ষেত্রে কী হতো?

.

ধরা যাক, একটা গ্লাইকোজেন ড্রপলেট বা দানায় ৫টি গ্লুকোজ মলিকিউওল আছে।

.

তাহলে প্রশ্ন হলো, যদি কোন কোষে এই গ্লাইকোজেন দানাটি থাকে,তাহলে কি কোষটি বাইরে থেকে ভিতরে পানি বেশি ঢোকার ফলে কোষটি রাপচার হবে বা ফেটে যাবে;
নাকি তার বদলে এই ৫টি গ্লুকোজ মলিকিউল থাকলে তা বেশি পানি ঢোকার ফলে সহজে রাপচার হবে?

.

উপরিউক্ত আলোচনা বুঝে থাকলে জবাবের তীরটা অবশ্যই ২য় ক্ষেত্রের দিকে, অর্থাৎ ৫টি গ্লুকোজ অণুর দিকে যাবে।

.

তাহলে অস্তিত্বই যেখানে হুমকির মুখে -সেখানে শক্তি কনজার্ভ করা বেশি বুদ্ধিমানের কাজ, নাকি শক্তি খরচ করে প্রাণ বাঁচানোই অধিক জ্ঞানের পরিচয়?

.

তো এখন দেশের বিজ্ঞানের ঠিকাদারেরা মুখ ভোঁতা করে হয়তো বলতে পারে-

.

"আচ্ছা ঠিক আছে, মানলাম যে শক্তি বাঁচানোর চেয়ে প্রাণ বাঁচানো বেশী দরকারী।
কিন্তু সেটাও তো বাধ্য হয়ে নিজে থেকেই হতে পারে, কারণ তা নাহলে সে কোষের কার্যক্রমই হবে না।"

.

অতীব "সৌন্দর্য" যুক্তি।

.

তবে জবাবের আশা করার আগে তাদেরকে একটু সাজেস্ট করা উচিত- যে কোন একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের CSE ডিপার্টমেন্ট থেকে ঘুরে আসার জন্য।
তবে কেবল গেলাম আর বাতাস খেয়ে চলে আসলাম উদ্দেশ্যে না, কিছু জিনিস জানার উদ্দেশ্যে।

.

যেকোন কম্পিউটার সায়েন্সের স্টুডেন্টকে আপনি বলে দেখেন-

.

"এই যে আপনার হাতে এই কম্পিউটারটি -এটি তো আপনার বাংলা বা ইংলিশ, কিংবা অন্য কোন ভাষায় ইনপুট করা তথ্য বুঝতে পারে না, তার বুঝার জন্য সেগুলোকে বাইনারী কোডে রূপান্তরিত হতে হয়।
যেহেতু কম্পিউটারটি আপনার ইনপুট করা তথ্য বা ইনফরমেশন বুঝতে পারে না, আর বুঝতে না পারলে যেহেতু তার কার্যক্রমই চলতে পারবে না; কাজেই বোঝা যায় যে এই কম্পিউটারটি নিজে থেকেই তার কাজের সুবিধার জন্য এই মেকানিজমটি ডেভেলাপ করেছে, এর কোন ক্রিয়েটর নেই।"

.

এই কথা বলার পর যদি আপনাকে সুন্দরমত প্যাকেট করে আস্তে করে কোন মেন্টাল অ্যাসাইলামে পার্সেল করে দেওয়ার আয়োজন শুরু না হয়ে থাকে, তাহলেই বুঝবেন যে আপনার এই "যুগান্তকারী" যুক্তিটি একেবারে অব্যর্থ।

.

কারণ আপনি একজন CSE স্টুডেন্টকে যে "যুক্তি" দেখালেন, সে ছাত্র জানে যে তা কখনোই সম্ভবপর নয়।
কারণ সে জানে, যে একটি কম্পিউটারের নিজের কোনই কনশাসনেস নেই, নিজের ভালোমন্দের সেটার কোন চেতনা নেই -যে সেটি নিজেকে বিপদ থেকে রক্ষা করতে আপনা-আপনিই কোন পদ্ধতি বা মেকানিজম ডেভেলাপ করতে পারে।

.

সে বস্তুটি তো শুধুমাত্র সেসমস্ত কাজই করতে পারে, যা করার জন্য সে অলরেডী কোন একজন ইনটেলিজেন্ট বিইং দ্বারা প্রি-প্রোগ্রামড হয়ে আছে।

.

তাহলে একটি বায়োলজিক্যাল সেল, বা কোষ -যার কোন সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট নেই, কোন কনশানেসনেস বা চেতনা নেই, ভালোমন্দের কোন জ্ঞানবুদ্ধি নেই- সেটি কী করে নিজেকে ক্ষতি থেকে রক্ষা করতে নিজে থেকেই কোন মেকানিজম তৈরী করতে পারে?

.

কী জবাব হতে পারে এ প্রশ্নের,
একমাত্র- কোন HIGHER, INTELLIGENT & SPREME BEING দ্বারা প্রি-প্রোগ্রামিং -এর ব্যাখ্যা ছাড়া?

.

আসলে ব্যাপারটা হলো চক্ষুদানে দৃষ্টিক্ষম করে তোলার চেষ্টা কেবল অন্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য,
নিজের চোখ নিজেই খুলে ফ্রিজে রেখে দেওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে না।

.

যাই হোক, ভিন্ন একটা ব্যপারে আসি।

.

এতক্ষণ তো গেল একবার খাওয়া পলিমার এত কষ্ট করে ভেঙে আবারো সেই পলিমার হিসেবেই তৈরী করে দেহে জমা রাখার পেছনের একটা কথা, এবার আরও কিছু কথা জানার চেষ্টা করা যাক ইন শা আল্লাহ।

.

দেখা তো গেল যে অসমোলারিটি নামক বস্তুর কারণে রাপচার হওয়া থেকে রক্ষা পেতে সেল বা কোষে উপোরিল্লিখিত মেকানিজম ফলোড হয়।

.

কিন্তু মনোমার হিসেবে গ্লুকোজ সঞ্চিত না করে, পলিমার হিসবে গ্লাইকোজেনরূপে তা সঞ্চিত করার পেছনে যে সেই অসমোলারিটির ক্যারেক্টারিস্টিক্স ব্যবহার করে কী ধরণের মাইন্ড-ব্লোইং ডিজাইনিং রয়ে গেছে -সেটা?

.

কিছু পূর্বের আলোচনা থেকে তো এটা জানা গেল যে অসমোলারিটি, বা সহজ ভাষায় কোন ফিল্টারের মধ্য দিয়ে জলীয় পদার্থের প্রবাহ নির্ভর করে তাতে মিশে থাকা সলিউটের সংখ্যার ওপর ডিপেন্ড করে -সেগুলোর অন্য কোন বৈশিষ্ট্য যেমন ভর কিংবা আয়তন ইত্যাদি কোনকিছুর ওপরই নির্ভর করে না।

.

তাহলে এখন এমন একটি সেল বা কোষের কথা কল্পনা করা যাক, যার সলিউট বা দ্রব ধারণ ক্ষমতা ১০০টি।
অর্থাৎ সে কোষটির মেমব্রেনের বাইরের পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে রাপচার হওয়া থেকে বাঁচতে সর্বোচ্চ ১০০টি সলিউট সেটির ভেতর থাকতে পারবে, এর বেশি সেটি পারবে না।

.

অর্থাৎ ১০০টির জায়গায় ১০১ কিংবা ১০২টি সলিউট সেটির ভেতরে হলেই অতিরিক্ত পানি বাহির থেকে ভেতরে ঢোকা শুরু করবে, এবং একসময় ফলাফল হবে রাপচার।

.

এ কোষটী তাহলে কী করে দেহের এনার্জী ডিমান্ড পূরণ করবে?
জমিয়ে রাখা মাত্র ১০০টি গ্লুকোজ মলিকিউল টান পড়লে তো মূহুর্তের মধ্যেই নাই হয়ে যাবে, তারপর?

.

তাহলে তো শুধুমাত্র বেঁচে থাকতে হলেই আর সব কাজ ফেলে কিছুক্ষণ পরপর কন্টিনিউয়াসলি খেয়েই যেতে হবে, আর এ করতে করতেই জীবন পার হয়ে যাবে।

তাহলে উপায়?

.

আচ্ছা, এবার তাহলে আরেকটা সিনারিও কল্পনা করা যাক- যেখানে যাবতীয় কন্ডিশন একই।
অর্থাৎ এক্ষেত্রেও একটি কোষের সলিউট ধারণ ক্ষমতা সেই ১০০টি-ই।

.

কিন্তু এবার একটু ডিফরেন্স আছে, আর তা হলো দিস টাইম স্টোরেজ হিসেবে মনোমাররূপে গ্লুকোজ মলিকিউল না রেখে পলিমাররূপে গ্লাইকোজেন হিসেবে রাখা হলো।

.

তাহলে গ্লাইকোজেন ড্রপলেট বা দানাও সর্বোচ্চ সেই ১০০টিই থাকতে পারবে।

.

কিন্তু টুইস্ট হলো এখানেই।

.

যদি ধরে নেওয়া হয় যে প্রত্যেকটি গ্লাইকোজেন দানায় অ্যাটলীস্ট ১০০০টি করেও গ্লুকোজ মলিকিউল আছে,
তাহলেও পুরো কোষে সঞ্চিত অবস্থায় মোট (১০০ X ১০০০) অর্থাৎ ১০০০০০টি গ্লুকোজ মলিকিউল পাওয়া যাবে -যা পূর্বের তুলনায় ১০০০ গুণ বেশি।

.

can we even begin to imagine the sheer brilliance of this extraordinary design?!!

.

কেবলমাত্র কাল্পনিক এক সিনারিওতেই যেখানে ১০০টির বেশি গ্লুকোজ অণু থাকলে একটি কোষ রাপচার হয়ে যাচ্ছে, সেখানে জাস্ট এক পলিমারাইজেশনের মাধ্যমে তার চেয়েও অ্যাটলীস্ট ১০০০ গুণ বেশি গ্লুকোজ অণু ডিপোজিট করে রাখা যাচ্ছে কোষটির কোন ক্ষতিই না করে -যা বাস্তবের ডেটায় দেখতে গেলে জানা যাবে যে প্রকৃত অ্যামাউন্টটা তার চেয়েও কত লক্ষ-কোটিগুণ হিউজ।

.

আর এ তো গেল ছোট্ট এক মানবদেহের অভ্যন্তরের কোটি কোটি মিরাকলস -এর মাত্র সামান্য দুই-একটি, এর বাহিরে তো বিশাল অন্তহীন বিশ্বজগত পড়েই রয়েছে।

.

এরপরেও কিছু মানসিক বিকারগ্রস্থ বলে বেড়ায় যে বিশ্বজগত স্রষ্টাহীন, তা নিজে থেকেই স্রষ্টি হয়েছে।
তারা বলে বেড়ায় সৃষ্টিজগতের তৈরীর সাথে " আল-খালিক্ব " নামের কোন সম্পর্কই নেই।

.

আহ, কত "রসালো"-ই না সেসব কথা!
কত "মুক্ত মন"-ই না তাদের!

.

ঠিক কতখানি "চোখ থাকিতে অন্ধ" এবং "মেন্টালি অ্যাবনরমাল" হলে যে এমন এমন আশর্চর্জনক সব feats করে ওঠা সম্ভবপর হয় -তা এই অধমের ধারণারও বাইরে।

.

কাজেই খুঁজুন আপনার পালনকর্তার নির্দশন আপনার চারপাশে, উপলব্ধি করুন তাঁর নির্দশন আপনারই মাঝে। [১]

.

জানুন, যে এই সীমাহীন বিশ্বজগত আপনা থেকেই তৈরী হয়ে যায় নি। [২]

.

অতএব চিন্তা করুন, মানসিক দাসত্ব থেকে মুক্ত হউন। [৩]

---

[১]

■*অচিরেই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী প্রদর্শন করাবো পৃথিবীর দিগন্তে এবং তাদে নিজেদের মধ্যে, ফলে তাদের কাছে ফুটে উঠবে যে এ ক্বুরআন সত্য। এটাই কি যথেষ্ট নয়, যে আপনার পালনকর্তা সর্ববিষয়ে সাক্ষ্যদাতা?*

-সূরাহ ফুসসিলাত, ৫৩

.

■*তিনি সপ্ত আকাশ স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন। তুমি করুণাময় আল্লাহ তা'আলার সৃষ্টিতে কোন তফাৎ দেখতে পাবে না। আবার দৃষ্টি ফেরাও, কোন ফাটল দেখতে পাও কি?*

■*অতঃপর তুমি বার বার তাকিয়ে দেখ -তোমার দৃষ্টি ব্যর্থ ও পরিশ্রান্ত হয়ে তোমার দিকে ফিরে আসবে।*

-সূরাহ আল-মুলক, ৩-৪

.

.

[২]

■*তারা কি আপনা-আপনিই সৃজিত হয়ে গেছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা?*

■*না তারা নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডল সৃষ্টি করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করে না।*

-সূরাহ আত্ব-ত্বুর,৩৫-৩৬

.

.

[৩]

■*...এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্যে নির্দেশ সুস্পষ্টরূপে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা চিন্তা করো।*

-সূরাহ আল বাক্বারা, ২১৯ এর শেষাংশ

.

■*...এমনিভাবে আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্যে নিদর্শনসমূহ বর্ণনা করেন -যাতে তোমরা চিন্তাভাবনা করো।*

-সূরাহ আল বাক্বারা, ২৬৬ এর শেষাংশ

.

■*...আপনি বলে দিন: "অন্ধ ও চক্ষুমান কি সমান হতে পারে? তোমরা কি চিন্তা করো না?"*

-সূরাহ আল আনআম, ৫০ এর শেষাংশ

.

■*...আমার পালনকর্তাই প্রত্যেক বস্তুকে স্বীয় জ্ঞান দ্বারা বেষ্টন করে আছেন। তোমরা কি চিন্তা করো না?*

-সূরাহ আল আনআম, ৮০ এর শেষাংশ

.

■*...নিশ্চয়ই আমি প্রমাণাদি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি তাদের জন্য, যারা চিন্তা করে।*

-সূরাহ আল আনআম, ৯৮ এর শেষাংশ

.

■...ইনিই আল্লাহ, তোমাদের রব; কাজেই কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করো। তোমরা কি কিছুই চিন্তা করো না?
-সূরাহ ইউনুস, ৩ এর শেষাংশ

.

■তিনিই ভূমণ্ডলকে বিস্তৃত করেছেন, এবং তাতে স্থাপন করেছেন সুদৃঢ় পাহাড়-পর্বত ও নদনদী এবং প্রত্যেক ফলের মধ্যে দুটি করে প্রকার সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনকে রাত্রি দ্বারা আবৃত করেন। এতে তাদের জন্য নিদর্শন রয়েছে, যারা চিন্তা করে।

■এবং যমীনে বিভিন্ন শস্যক্ষেত্র রয়েছে -একটি অপরটির সাথে সংলগ্ন এবং আঙুরের বাগান আছে আর শস্য ও খর্জুর রয়েছে -একটির মূল অপরটির সাথে মিলিত এবং কতক মিলিত নয়। এগুলোকে একই পানি দ্বার সেচ করা হয়। আর আমি স্বাদে একটিকে অপরটির চাইতে উৎকৃষ্টতর করে দেই। নিশ্চয়ই, এগুলোর মধ্যে নিদর্শন আছে তাদের জন্য যারা চিন্তা করে।
-সূরাহ আর রা'দ, ৩ ও ৪

.

■...আল্লাহ মানুষের জন্য দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।
-সূরাহ ইবরাহীম, ২৫ এর শেষাংশ

.

■এটা (ক্বুরআন) মানুষের জন্য একটি সংবাদনামা এবং যাতে এতদ্বারা ভীত হয় এবং যাতে জেনে নেয় যে উপাস্য তিনিই -একক; এবং যাতে বুদ্ধিমানেরা চিন্তাভাবনা করে।
-সূরাহ ইবরাহীম, ৫২

.

■তোমাদের জন্যে পৃথিবীতে যেসব রং-বেরঙের বস্তু ছড়িয়ে দিছেয়েন, সেগুলোতে নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্যে যারা চিন্তাভাবনা করে।
-সূরাহ আন নাহল, ১৩

.

■যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার সমতুল্য যে সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি তবে চিন্তা করবে না?
-সূরাহ আন নাহল, ১৭

.

■আমি এই ক্বুরআনকে নানাভাবে বুঝিয়েছি, যাতে তারা চিন্তা করে। অথচ এতে তাদের কেবল বিমুখীতাই বৃদ্ধি পায়।
-সূরাহ আল ইসরা, ৪১

.

■তারা কি এই কালাম সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে না?...
-সূরাহ আল মু'মিনূন, ৬৮ এর প্রথমাংশ

.

■...বলুন: "যারা জানে এবং যারা জানে না, তারা কি সমান হতে পারে?" চিন্তাভাবনা কেবল তারাই করে, যারা বুদ্ধিমান।
-সূরাহ আয-যুমার, ৯ এর শেষাংশ

.

■তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নির্দশনাবলী দেখান এবং তোমাদের জন্যে আকাশ থেকে নাযিল করেন রুযী। চিন্তাভাবনা তারাই করে, যারা আল্লাহর দিকে ঋজু থাকে।
-সূরাহ গাফির, ১৩

.

■তারা কি ক্বুরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না, না তাদের অন্তর তালাবদ্ধ?
-সূরাহ মুহাম্মাদ, ২৪

.

■যদি আমি এই ক্বুরআন পাহাড়ের উপর অবতীর্ণ করতাম, তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি এসব দৃষ্টান্ত মানুষের জন্যে বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তাভাবনা করে।
-সূরাহ আল হাশর, ২১

১৫৬

রাজা-বাদশাহদের অহংকার এবং বিজ্ঞানের অক্ষমতা

-সাইফুর রহমান

আমেরিকার মানুষদের স্বাভাবিক বুদ্ধিমত্তা নিয়ে অনেক হাসি তামাশাপূর্ণ কথা প্রচলিত আছে। এবারের কর্মকান্ড মনে হয় তাদের পূর্বের সব নির্বুদ্ধিতাকে ছাড়িয়ে গেছে। রোহিঙ্গা মুসলিমদের সাম্প্রতিক দূর্দশার ছবি মনটাকে সর্বদা নিস্তেজ করে রাখে, এরই মাঝে মার্কিন ভাঁড়দের সর্বশেষ ভাঁড়ামো দেখে প্রচন্ড হাসি পেলো। হারিকেন ইরমা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ফেসবুকে দুটি ইভেন্ট খোলা হয়েছে, একটি হলো, বাসার সবার ফ্যান ইরমার দিকে তাক করে রাখা আরেকটি হলো, হারিকেন ইরমাকে লক্ষ্য করে গুলি ছুড়া। ইভেন্ট দুটিতে কনফার্মড পার্টিসিপেন্টের সংখ্যা যথাক্রমে প্রায় ৬০০০০ ও ১০০০০ এরও বেশি!!!

.

আপাত দৃষ্টিতে আমাদের কাছে হাস্যকর মনে হলেও এই ঘটনা দুটির তাৎপর্য অনেক। প্রচন্ড বিপদে মানুষ কতটা অসহায় আর হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়ে এটা তার একটি নমুনা মাত্র। তারা নিজেরাও জানে এসব দিয়ে এই ভয়াবহ দুর্যোগ মোকাবেলা একটা হাস্যকর চিন্তা ভাবনা ছাড়া আর কিছুই না তারপরেও মনকে স্বান্তনা দেয়ার শেষ চেষ্টা।
বিজ্ঞানের ক্ষমতা নিয়ে আমরা অনেক কথা বলি, বিশেষ করে কলাবিজ্ঞানীরা।

.

কলাবিজ্ঞানীদের ধারণা মানুষ একসময় ঝড়, বৃষ্টি, চন্দ্র, সূর্য সব কন্ট্রোল করবে। তাদের এসব প্রোপাগান্ডা যে মিথ্যাচার ও বাস্তবতা বিবর্জিত, ঘূর্ণিঝড় ইরমা তার প্রমান। সারা পৃথিবীর সবাই চেষ্টা করেও একটা সাগর সেঁচে ফেলতে পারবে না, অথচ সামান্য একটা ঘূর্ণিঝড় মাত্র ২৪ ঘন্টার ব্যবধানে দুটি বিশাল সমুদ্র সৈকত এমনভাবে সেঁচে ফেলেছে দেখে মনেই হয়না ওখানে কখনো সমুদ্র বলে কিছু ছিলো। কিছুদিন আগেও যদি বলা হতো বা কোরানে যদি বলা হতো সমুদ্রের পানি সেচে ফেলে সম্ভব, কলাবিজ্ঞানীরা একে অবৈজ্ঞানিক আর হাস্যকর কথা বলে উড়িয়ে দিতো। যারা এখনো কিয়ামতের ঘন্টা বাজার সাথে সাথে পাহাড় পর্বত তুলার মতো উড়তে থাকবে কথাটা মন থেকে মেনে নিতে চান না বা সংশয়ে আছেন বা বৈজ্ঞানিকভাবে কিভাবে সম্ভব বলে চিন্তা ভাবনা করছেন তাদের জন্য ইরমা একটা সতর্কবার্তা।

.

কল্পনা করে দেখুন, যেদিন মহাপ্রলয়ের সুর বেজে উঠবে, কি ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। মানুষ কেমন অসহায় হয়ে দিকবিদিক ছুটাছুটি করবে। ঘূর্ণিঝড় থেকে অন্য রাজ্যে বা দেশে চলে গেলে বাঁচা যায়, সেদিন পৃথিবীর কোনো জায়গা থাকবেনা যেখানে আশ্রয় নেয়া যাবে।
'মানুষ সেদিন বলবে, পালানোর পথ কোথায়?'

-

-

আগের যুগের প্রতাপশালী রাজা বাদশাহদের ইতিহাস আমরা জানি, তারা কেমন স্বেচ্ছাচারী ছিলেন ইতিহাসের পাতায় লিখা আছে। শুধুমাত্র সন্দেহ আর মনের ইচ্ছার কারণে অনেক নিরাপরাধ মানুষদের শুলে চড়িয়ে, আগুনে পুড়িয়ে মেরে ফেলতো। সাধারণ প্রজাদের কিছুই বলার থাকতো না, ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে অভিমত দেয়া তো আরো অনেক পরের কথা। রাজার আদেশ হাসিমুখে নির্দ্বিধায় মেনে নেয়া ছাড়া আর কোনো গত্যান্তর থাকতো না। টু শব্দ করলেই কল্লা চলে যেতো। রাজা বাদশাহদের যুগ বাদ দিলাম, আধুনিক যুগে এক রাষ্ট্র আরেক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জোর করে অন্যায় যুদ্ধ চাপিয়ে দিয়ে মিলিয়ন মিলিয়ন নিরাপরাধ মানুষ মেরে ফেলছে, কেউ প্রতিবাদ করার সাহস পাচ্ছেনা। প্রতিবাদ করলেও তা আমলে নিচ্ছে না।

.

উপরের কথাগুলো বলার কারণ হলো, দুনিয়ার সামান্য ক্ষমতা সম্পন্ন রাজা বাদশাহদের ভয়ে আমরা তটস্থ থাকি, তাদের স্বেচ্ছাচারী কাজ কর্মের কোনো প্রতিবাদ করার হিম্মত রাখি না, চুপচাপ সব মেনে নেই। কখনো বলতে পারিনা, রাজা মহোদয় আপনার এই আদেশটা অন্যায় মূলক বা অমানবিক। মানুষ কত বড় হিপোক্রেট আর অবিবেচক, দুনিয়ার সামান্য রাজা বাদশাহের কোনো হুকুমের ন্যায়-অন্যায়ের ব্যাপারে কথা বলার সাহস রাখেনা, সেখানে রাজাধিরাজ, মহাশক্তিময় প্রভুর দেয়া আদেশ নিষেধ নিয়ে প্রশ্ন তোলে। সর্বশক্তিমান কেনো আমাদের পাপের কারণে পরকালে শ্বাস্তি দিবেন, এই ধরণের জ্ঞানহীন প্রশ্ন তুলি। দুনিয়ার সামান্য ক্ষমতাধরের সামনে কি কখনো এই ব্যাপারে প্রশ্ন করার হিম্মত আমরা রাখি? এমনকি অন্যায়ভাবে শ্বাস্তি ভোগ করলেও? অথচ সর্বশক্তিমান কখনো অন্যায় করেন না, সুযোগ দেন, বার বার ক্ষমা চাওয়ার পথ খুলে রেখেছেন। স্বার্থপর, অবিবেচক মানব সম্প্রদায় আসলে দয়াময়ের দয়ার সুযোগের অপব্যবহার করে। চিন্তা করে দেখুন, সর্বশক্তিমান যদি দুনিয়ার কোনো বাদশাহের মতো আচরণ করতো, আমার আপনার পরিণীতি কি হতো? পারতাম কোনো প্রশ্ন তুলতে কেনো আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন বা যা করছেন অন্যায় করছেন, এই কথাগুলো বলতে?

মানব সম্প্রদায় জানে না তারা কত বড় হিপোক্রেট, অকৃতজ্ঞ আর অবিবেচক....

১৫৭

প্রেম এবং তার পরিশুদ্ধি!!!

-আহমেদ আলী

[বি:দ্র: লেখার মাঝে পাঠককে "তুমি" বলে সম্বোধন করা হয়েছে লেখনির ভাষাকে আকর্ষণীয় করার জন্য। যদি এরূপ সম্বোধনে কেউ অপমানিত বোধ করেন বা বিব্রত হন, তাহলে আমি এর জন্য আপনাদের কাছে আগে থেকে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি।
-আহমেদ আলি]

.

=> প্রেমে পড়ার বিষয়টা আসলে কী?:

ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রেম একটি মারাত্মক রোগ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই এটা বুঝতে পারে না।

.

তুমি পরিবারে তোমার মা-বাবা আর আত্মীয়দের মাঝে বেড়ে ওঠো এবং সাধারণত তাদেরকে সহজ ও স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করো। কিন্তু বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে তুমি হয়ত এমন কারও সন্নিকটে আসো যে বিশেষভাবে তোমার পরিবারের সদস্যদের অন্তর্ভুক্ত নয়।
তুমি সেই বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তির মধ্যে কিছু আলাদা বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাও এবং তার চেহারা, মনোভাব, কথা-বার্তা এবং আনুষঙ্গিক নানান বিষয় তোমার চিন্তাকে প্রভাবিত করে এবং তোমার মনে হতে থাকে যেন তুমি মনের মধ্যে এক ধরণের আনন্দ অনুভব করছো। যতই তুমি বিপরীত লিঙ্গের সেই মানুষটির দিকে তাকাও আর তার সাথে অবাধে মিশতে থাকো, ততই তুমি তার সঙ্গ লাভের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে পড়ো। আর তাই যখন তুমি একাকী অবস্থান করছো, তোমার মনের মধ্যে সেই বিপরীত লিঙ্গের ব্যক্তিত্বটিই যেন জায়গা দখল করে বসে থাকে। তার সঙ্গ না পেয়ে তোমার মনে হতে থাকে, তুমি যেন অগ্নিতে দগ্ধ হচ্ছো।

.

=> এটি আসলে কী ধরণের কামনা?:

.

এই বিষয়টাকে চিহ্নিত করা আসলেই কঠিন। বিভিন্ন সময় এটি বিভিন্ন ভাবে ক্রিয়াশীল হয়। কখনও কেবল বিপরীত লিঙ্গের সৌন্দর্যে কেউ আকৃষ্ট হতে পারে, কখনও আকর্ষণ কেবল কথা-বার্তার মধ্য দিয়েও আসতে পারে, কখনও তা হাটা-চলার ভঙ্গিমা বা চোখের চাহনি থেকেও হতে পারে, আবার কখনও কেউ কারও কোনো বিশেষ অঙ্গের প্রতিও আকৃষ্ট হতে পারে, কখনও আকর্ষণ চলার শব্দ থেকে বা শরীরে লাগানো সুগন্ধি বা পারফিউম থেকে আসতে পারে প্রভৃতি। কিন্তু সব সময় সরাসরি যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চিন্তা এক্ষেত্রে জাগ্রত হয় না, বরং যৌন আকাঙ্ক্ষার সাথে বন্ধুত্ব এবং অবাধে মেলামেশার তীব্র ইচ্ছাটাও এখানে মিশ্রিত অবস্থায় থাকে। এই পরিস্থিতিতে যদি এরূপ প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলতেই থাকে এবং তা আসক্তিতে পরিণত হয়, তবে তুমি যার প্রেমে পড়েছো তার প্রতি ধীরে ধীরে নিজেকে সমর্পণ করবে; বা অন্যভাবে বললে, তুমি তীব্র কামনা এবং অনুরাগের দরূণ সেই ব্যক্তিত্বের দাসত্বে পতিত হবে যে তোমার মনোজগতের রাজত্বকে হরণ করেছে।

.

=> এসবের কারণটা আসলে কী?:

.

এখানে আসল কারণ যেটা থেকে এত কিছুর উদ্ভব হল সেটা হল "হিজাব ভঙ্গ করা"("হিজাব" হল ইসলামিক দৃষ্টিভঙ্গিতে শালীনতা বজায় রাখার সুনির্ধারিত উপায়)। শালীনতা সম্পন্ন বস্ত্র দ্বারা শরীরকে ঢাকা, চোখের চাহনি, চলন-বলন এবং প্রতি মুহূর্তের আচরণ এবং মনোভাবে শালীনতা বজায় রাখা হিজাবের পদ্ধতিগত বিষয়গুলির অঙ্গ। যদি হিজাব পালনের ক্ষেত্রে এর একটি অংশও বিঘ্নিত হয়, তবে সেখানে আকর্ষণ সৃষ্টি হতে পারে।
প্রেম এধরণের আকর্ষণ থেকে জন্মায় এবং আমার মতে এই আকর্ষণ তিন ধরণের হতে পারে:

.

১) দেহ ও মনের প্রতি সমান আকর্ষণ;
২) দেহের প্রতি অধিক আকর্ষণ, মনের প্রতি কম আকর্ষণ;
৩) দেহের প্রতি কম আকর্ষণ, মনের প্রতি অধিক আকর্ষণ।

.

বিপরীত লিঙ্গের প্রতি যেকোনো এক প্রকারের আকর্ষণ কোনো এক নির্দিষ্ট মুহূর্তে নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তির ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হতে পারে। আর এধরণের আকর্ষণ মনকে দুর্বল করে দেয় এবং চিন্তা ও অনুভূতিকে তীব্র আকাঙ্ক্ষা দ্বারা পূর্ণ করে তোলে। এসব কিছু আসলে শুরু হয় আমাদের জ্ঞান-ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহারের মধ্য দিয়ে (এবং বিশেষ ভাবে বিপরীত লিঙ্গের সৌন্দর্য উপভোগের মাধ্যমে চোখের অপব্যবহারের মধ্য দিয়ে)।

.

যখন কেউ তার ইন্দ্রিয়ের অপব্যবহার করে, তখন সেখান থেকেই তার হিজাব ভঙ্গ হওয়া শুরু হতে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, যদি কোনো তরুণ ছেলে হঠাৎ ফ্যাশনওয়ালা পোশাক পরা কোনো সুন্দরী মেয়েকে দেখে, তবে, হয় সে আবার তার দিকে তাকিয়ে তাকে ক্রমাগত দেখেই যেতে পারে, নয়ত সে নিজের দৃষ্টিকে সংযত করে পরবর্তী বার তাকে দেখা থেকে বিরত হতে পারে। এখন যদি সে মেয়েটাকে দেখতেই থাকে, তবে তার(ছেলেটার) মন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়বে এবং সে(ছেলেটা) নিজের কামনার দাসত্বে পতিত হবে যা তার মানসিক পীড়াতে রূপান্তরিত হবে। সেই মুহূর্তে মাথায় যুক্তি কাজ করবে না এবং সে বুঝতে ব্যর্থ হবে যে, কামনার তীব্রতা থেকে মুক্তি পেতে দৃষ্টিকে সংযত করা উচিৎ কারণ তখন তার মন আনন্দ উপভোগের কাজে ব্যস্ত।

.

এই অনুভূতির মুহূর্তে অধিকাংশ ব্যক্তিই মনে করে যে, এটাই হল আসল শান্তি আর তাই এটা অবশ্যই সঠিক কাজ। এরকমটা ভাবার কারণ হল, তাদের মন তখন তাদের কামনার পিছনে ছুটে বেড়ানোর জন্য তাদেরকে প্ররোচনা দিতেই থাকে।
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি কোনো শান্তিই প্রদান করে না। বরং এটি হরমোনের প্রতিক্রিয়াস্বরূপ প্রকাশভঙ্গিকেই তুলে ধরে যা ক্রিয়াশীলতা লাভ করে জ্বলন্ত অগ্নির ন্যায়।
ফলস্বরূপ, মনের শান্ত অবস্থা রূপান্তরিত হয় উত্তেজনাপূর্ণ অনুভূতিতে এবং এই উত্তেজনা কমানোর চেষ্টা করা হয় কামনাসুলভ উপভোগের মাধ্যমে।

.

কিন্তু যখন তুমি ভাবছো যে এই উপভোগের মাধ্যমে তুমি তোমার উত্তেজনা কমাতে পারবে, তখন তুমি পড়ছো আরও একটি ফাঁদে!
কারণ এরূপ উপভোগ তোমার কামনাকে পূর্বের তুলনায় বর্ধিত করে এবং এই উপায় অবলম্বনে তুমি কখনই সন্তুষ্ট হতে পারো না বিধায় তোমার উত্তেজনা আরও অধিক হারে বেড়ে ওঠে।
তাহলে কীভাবে কেউ বলতে পারে যে, 'এই কামনার পিছনে ছুটে বেড়ানোটাই হল শান্তির পথ' !!!

.

কামনা হতে উদ্ভূত এরূপ মানসিক পীড়া প্রেমে রূপান্তর লাভ করে এবং তুমি পতিত হও তোমার আকাঙ্ক্ষা ও তোমার প্রেমের মানুষটির দাসত্বের বেড়াজালে। একারণেই মহান সৃষ্টিকর্তা কুরআনুল কারীমে উল্লেখ করেছেন যে, মানুষকে জ্ঞান-ইন্দ্রিয় ও

অন্যান্য অঙ্গ প্রদান করা সত্ত্বেও ন্যায়পরায়ণতার পরিবর্তে উত্তম জীবনব্যবস্থা ও ইবাদত(একমাত্র সত্য সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য ও তাঁর নিকট আত্মসমর্পণ) প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে সে প্রায়শই বেছে নেয় অধার্মিকতার পথ।

.

"আমি কি তাকে দু'টো চোখ দিই নি?
আর একটি জিহ্বা আর দু'টো ঠোঁট?
আর আমি তাকে (পাপ ও পুণ্যের) দু'টো পথ দেখিয়েছি।
(মানুষকে এত গুণবৈশিষ্ট্য ও মেধা দেওয়া সত্ত্বেও) সে (ধর্মের) দুর্গম গিরি পথে প্রবেশ করল না।"

(মহাগ্রন্থ আল-কোরআন, ৯০:৮-১১)

.

=> প্রেমের পরিশুদ্ধি:

.

আল্লাহ তায়ালা(মহান সৃষ্টিকর্তা) কোরআনে বলছেন যে, তিনি মানব জাতিকে পবিত্রতার পথ প্রদর্শন করেছেন এবং যে ব্যক্তি এই পবিত্রতার এই পথ অবলম্বন করে চলবে, আল্লাহ তায়ালার ইচ্ছায় সেই ব্যক্তি হবে সফলকাম।

.

"শপথ প্রাণের এবং যিনি তা সুবিন্যস্ত করেছেন, তাঁর,
অতঃপর তাকে তার অসৎকর্ম ও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন,
যে নিজেকে শুদ্ধ করে, সেই সফলকাম হয় এবং যে নিজেকে কলুষিত করে, সে ব্যর্থ মনোরথ হয়।"

(মহাগ্রন্থ আল-কোরআন, ৯১:৭-১০)

.

ইসলাম প্রেমকে পরিশুদ্ধ করতে বিবাহের পথ দেখিয়ে দেয়। যদি কেউ বিবাহে অসমর্থ হয়, তবে তাকে সওম(ইসলাম অনুযায়ী খাদ্য ও বিভিন্ন বিষয় হতে সংযমের সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়া) পালন করতে হবে কামনাকে সংযত রাখার জন্য।

.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

"হে যুব সম্প্রদায়! তোমাদের মধ্যে যারা বিয়ে করার সামর্থ্য রাখে, তারা যেন বিয়ে করে। কেননা, বিয়ে তার দৃষ্টিকে সংযত রাখে এবং লজ্জাস্থান হিফাযত করে এবং যার বিয়ে করার সামর্থ্য নেই, সে যেন সওম পালন করে। কেননা, সওম তার যৌনতাকে দমন করবে।"

(সহীহ বুখারী)

.

তাই বিয়ে বা বিবাহ করার মাধ্যমে কোনো ব্যক্তি অনুমোদিত উপায়ে বিপরীত লিঙ্গের সাহচর্য লাভ করে যা তার কামনাকে নিয়মনিষ্ঠ উপায়ে পূরণ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। এভাবে কারও আবেগপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা প্রশমিত হয় কেননা বিবাহ তার জীবনের কাঠামোকে এরূপ নিয়মানুবর্তিতার মাধ্যমে পরিবর্তিত করে যে, এটি তাকে সাহায্য করে অবৈধ সম্পর্ক থেকে দূরে থাকতে।

.

তদুপরি, ভালোবাসার প্রায়োগিক প্রকাশভঙ্গি কীরূপ হওয়া উচিৎ তাও বর্ণিত হয়েছে, যার অনুসরণের মাধ্যমে আমাদের চিন্তা ও অনুভূতিতে পবিত্রতা আনা এবং সৃষ্টিকর্তার নিকটবর্তী হওয়া সম্ভব।

.

নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন,

.

"তিনটি গুণ যার মধ্যে আছে, সে ঈমানের স্বাদ আস্বাদন করতে পারেঃ

১) আল্লাহ্(সৃষ্টিকর্তা) ও তাঁর রাসূল(নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তার নিকট অন্য সকল কিছু হতে অধিক প্রিয় হওয়া;

২) কাউকে একমাত্র আল্লাহর(সৃষ্টিকর্তার) জন্যই ভালবাসা;

৩) 'কুফরী'-তে প্রত্যাবর্তনকে ('কুফরী' বলতে সত্যকে প্রত্যাখ্যান করা বোঝায়) আগুনে নিক্ষিপ্ত হবার মত অপছন্দ করা।"

(সহীহ বুখারী)

.

এখানে প্রেমকে পরিশুদ্ধ করার কৌশল সমূহ বিবৃত হয়েছে।

(সেগুলো হচ্ছে) সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর প্রেরিত রাসূল(সত্যের সর্বশেষ বার্তাবাহক নবীজি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)-কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসা। আর সেটি সম্ভব হবে একমাত্র 'আল্লাহ তায়ালা'(সত্য সৃষ্টিকর্তা) এর নিকট নিজেকে সম্পূর্ণরূপে সমর্পণের মাধ্যমে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশগুলি পালনের মাধ্যমে।

.

অন্য কাউকে ভালোবাসতে হবে কেবলই আল্লাহ(সৃষ্টিকর্তা) এর খাতিরে।

.

আর কুফরী বা সত্য প্রত্যাখ্যানকে অপছন্দ করতে হবে ঠিক তেমনভাবেই, যেমনভাবে কেউ অপছন্দ করে আগুনে নিক্ষিপ্ত হতে।

.

এই পথ অবলম্বনের মাধ্যমে সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার নিকট নিজের ইচ্ছাশক্তি সমর্পণের মধ্য দিয়ে নিজ কামনা ও অন্য ব্যক্তিদের দাসত্ব হতে মুক্তি লাভ সম্ভব।

.

সৃষ্টিজগতের প্রতিপালকের নিকট আত্মসমর্পণের এই পথের অনুসরণ অন্তরে বারবার এই নির্দেশেরই প্রতিধ্বনিকে স্মরণ করিয়ে দেয় যে, "তুমি তো অন্য কোনো ব্যক্তিত্বের নও, বরং তোমার প্রতিপালক আল্লাহ এরই একমাত্র অনুগত দাস!"

.

আর এই প্রক্রিয়াতেই কেউ তার অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক হিজাবকে সঠিকভাবে পালন করতে সচেষ্ট হয়ে ওঠে এবং নিজের জ্ঞান-ইন্দ্রিয়, চিন্তা এবং ইচ্ছাশক্তিকে যথাযথ উপায়ে শালীনতার সাথে ব্যবহারের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা চালাতে থাকে।

.

এভাবেই সৃষ্টিকর্তার নির্দেশের প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে যে কেউ জীবনে চলার পথে এই বিষয়টিকে সামনে রেখে অগ্রসর হয় যে, 'আমাকে আমার সৃষ্টিকর্তাকে সন্তুষ্ট করতে হবে, আমার আশা-আকাঙ্ক্ষাকে নয়'।
একারণেই মহান আল্লাহ(সৃষ্টিকর্তা' (মুমিন'-দেরকের্ণ রূপে ইসলনির্দেশ দিয়েছেন পরিপূ (সত্য বিশ্বাসীদেরকে)ামে প্রবেশ করতে যাতে করে তারা ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জগতের অন্য সকল বন্ধনের শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করতে সক্ষম হয়।

.

"হে মুমিনগণ, তোমরা ইসলামে পূর্ণরূপে প্রবেশ কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না । নিশ্চয় সে তোমাদের জন্য স্পষ্ট শত্রু।"

(মহাগ্রন্থ আল-কোরআন, ২:২০৮)

১৫৮

কুরআনে কি আসলেই স্ববিরোধিতা(contradiction) আছে? ---১

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্নঃ আল্লাহর একদিন মানুষের কয়দিনের সমান? – ১০০০ বছর (Quran 22:47) নাকি ৫০০০০ বছর (Quran 70:4) !

.

#উত্তরঃ সংশ্লিষ্ট আয়াতগুলো নিচে উল্লেখ করা হল।

.

"তারা তোমাকে[মুহাম্মাদ(ﷺ)] আযাব ত্বরান্বিত করতে বলে। অথচ আল্লাহ কখনও তাঁর ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। তোমার প্রভুর কাছে একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান। "
(কুরআন, হাজ্জ ২২:৪৭)

.

" তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত কর্ম পরিচালনা করেন, অতঃপর তা তাঁর কাছে পৌছবে এমন এক দিনে, যার পরিমাণ তোমাদের গণনায় হাজার বছরের সমান। “
(কুরআন, সাজদা ৩২:৫)

.

“ফেরেশতাগণ এবং রূহ তাঁর(আল্লাহর) দিকে উর্ধ্বগামী হয় এমন এক দিনে, যার পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর।”
(কুরআন, মাআরিজ ৭০:৪)

.

আরবি ভাষায় يَوْم [উচ্চারণঃ ইয়াওম; বহুবচনঃ أَيَّام (আইয়াম)] শব্দটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়।আরবিতে শব্দটি দিন, পর্যায়কাল, সময়কাল ইত্যাদি অর্থে ব্যবহৃত হয়। [১]

.

সুরা হাজ্জ ২২:৪৭ ও সাজদা ৩২:৫ তে হাজার বছরের দিন এবং সুরা মাআরিজ ৭০:৪ এ ৫০ হাজার বছরের দিনের কথা উল্লেখ আছে। উল্লেখ্য যে, হাজ্জ ২২:৪৭ ও সাজদা ৩২:৫তে سَنَةٍ أَلْف বা ‘হাজার বছর’ এর দিনের কথা উল্লেখ আছে; যা দ্বারা যেমন নির্দিষ্টভাবে ১০০০ বছর বোঝাতে পারে, আবার ‘হাজার বছর’ তথা বিশাল দৈর্ঘ্যের একটি সময়কালকেও বোঝাতে পারে। এ ছাড়া সুরা ক্বফ ৫০:৩৮ এ আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী তৈরির প্রক্রিয়া ছয় ‘আইয়াম’ এ সংঘটিত হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কুরআনে শব্দটির ব্যবহারের এই বৈচিত্র্য দ্বারাই বোঝা যাচ্ছে যে-- يَوْم (ইয়াওম) শব্দটির অর্থ ব্যাপক; এ দ্বারা যে কোন সময়কালের দিনই বোঝাতে পারে। আরবি ভাষায় এ দ্বারা ২৪ঘণ্টা, ১ হাজার বছর, ৫০,০০০ বছর এমনকি হাজার বছর বা বিশাল দৈর্ঘ্যের একটি সময়কালকেও বোঝাতে পারে। মোট কথা, শব্দটি দ্বারা যে কোন time period বা পর্যায়কাল/সময়কাল বোঝাতে পারে।

.

সুরা হাজ্জ ২২:৪৭ এ বলা হয়েছেঃ “তোমার প্রভুর কাছে একদিন তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান।” আখিরাতের ১দিন

সার্বক্ষণিকভাবে দুনিয়ার ১০০০ বছরের সমান হবার পক্ষে বিভিন্ন হাদিসের সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায়। রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেন, নিঃস্ব মুসলিমগণ ধনীদের থেকে অর্ধেক দিন ৫০০ বছর পূর্বে জান্নাতে যাবে। (তিরমিযি ২৩৫৩, ২৩৫৪) সুতরাং আয়াতের অর্থ হবেঃ বান্দাদের ১০০০ বছর সমান হচ্ছে আল্লাহর ১ দিন। [২]

.

সুরা মা'আরিজের ৪নং আয়াতের ব্যাখ্যায় অধিকাংশ মুফাসসির বলেছেনঃ এখানে কিয়ামত দিবসের পরিমাণই উদ্দেশ্য নেয়া হয়েছে। অর্থাৎ উল্লেখিত আযাব সেই সংঘটিত হবে, যে দিনের পরিমাণ পঞ্চাশ হাজার বছর। আর এই মতটির পক্ষে হাদিস রয়েছে। বিভিন্ন হাদিসে কিয়ামত দিবসের পরিমাণ ৫০,০০০ বছর বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যেমন, যাকাত না প্রদানকারীর শাস্তির মেয়াদ বর্ণনার হাদিসে বলা হয়েছেঃ "তার এ শাস্তি চলতে থাকবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, তারপর তার ভাগ্য নির্ধারণ হবে হয় জান্নাতের দিকে না হয় জাহান্নামের দিকে।" (মুসলিম ৯৮৭, আবু দাউদ ১৬৫৮, নাসাঈ ২৪৪২, মুসনাদ আহমাদ ২/৩৮৩)
[কুরতুবী]
তা ছাড়া অন্য হাদিসে "যে দিন সমস্ত মানুষ দাঁড়াবে সৃষ্টিকূলের রবের সামনে" [সুরা মুত্তাফফিফীন ৬] এ আয়াতের তাফসিরে রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেন, "তা হবে এমন এক দিনে যার পরিমাণ হবে পঞ্চাশ হাজার বছর, তারা তাদের কান পর্যন্ত ঘামে ডুবে থাকবে।" (মুসনাদ আহমাদ ২/১১২)

.

সুতরাং এখানে কিয়ামত দিবসের পরিমাণই বর্ণণা করা হয়েছে। তবে তা লোকভেদে ভিন্ন ভিন্ন বোধ হবে। কাফিরদের নিকট পঞ্চাশ হাজার বছর বলে মনে হবে। কিন্তু ঈমানদারদের জন্য তা এ দীর্ঘ হবে না। হাদিসে এসেছে, সাহাবায়ে কিরাম রাসুলুল্লাহ(ﷺ)কে এই দিনের দৈর্ঘ্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেনঃ "আমার প্রাণ যে সত্তার হাতে, তাঁর শপথ করে বলছি এই দিনটি মু'মিনের জন্য একটি ফরয সলাত আদায়ের সময়ের চেয়েও কম হবে।" (মুসনাদ আহমাদ ৩/৭৫)
অন্য হাদিসে বর্ণিত আছে, "এই দিনটি মু'মিনদের জন্য যোহর ও আসরের মধ্যবর্তী সময়ের মত হবে।" (মুসতাদরাকে হাকিম ১/১৫৮, নং ২৮৩)

.

কিয়ামত দিবসের দৈর্ঘ্য ১০০০ বছর না ৫০,০০০ বছর? আলোচ্য আয়াতে (মা'আরিজ ৭০:4) কিয়ামত দিবসের পরিমাণ ৫০,০০০ বছর এবং অন্য আয়াতে হাজার বছর বা ১০০০ বছর বলা হয়েছে {হাজ্জ ২২:৪৭ ও সাজদা ৩২:৫ দ্রষ্টব্য}। বাহ্যত আয়াতগুলোর মধ্যে বৈপরিত্য আছে বলে মনে হয়। উপরে যে হাদিসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, তা দ্বারা এটি পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সেই দিনের দৈর্ঘ্য আমল অনুসারে বিভিন্ন মানুষের জন্য বিভিন্ন রকমের হবে। কাফিরদের জন্য এটি ৫০,০০০ বছর এবং মুমিনদের জন্য এর সময়ের পরিমাণ অনেক কম হবে। তাদের মাঝখানবে কাফিরদের বিভিন্ন দল থাকবে। অস্থিরতা ও সুখ-স্বাচ্ছন্দে সময় দীর্ঘ ও খাটো হওয়া প্রসিদ্ধ ও সুবিদিত। অস্থিরতা ও কষ্টের এক ঘণ্টা মাঝে মাঝে মানুষের কাছে এক দিন বরং এক সপ্তাহের চেয়েও বেশি মনে হয় এবং সুখ ও আরামের দীর্ঘতর সময়ও সংক্ষিপ্ত মনে হয়। [ফাতহুল কাদির দ্রষ্টব্য]
তা ছাড়া যে আয়াতে ১০০০ বছরের কথা আছে, সেই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে কোন কোন মুফাসসির বলেন, সেই আয়াতে পার্থিব ১ দিন বোঝানো হয়েছে। এই দিনে জিব্রাঈল(আ) ও ফেরেশতাগণ আকাশ থেকে পৃথিবীতে এবং পৃথিবী থেকে আকাশে যাতায়াত করে এত দীর্ঘ পথ অতিক্রম করেন যা মানুষ অতিক্রম করলে এক হাজার বছর লাগতো।ফেরেশতাগণ এই দূরত্ব খুব সংক্ষিপ্ত সময়ে অতিক্রম করেন। সে হিসাবে বলা যায় সুরা মা'আরিজে বর্ণিত ৫০,০০০ বছর সময় কিয়ামতের দিনের সাথে সংশ্লিষ্ট, যা পার্থিব দিন অপেক্ষা অনেক বড়। এর দৈর্ঘ্য ও সংক্ষিপ্ততা বিভিন্ন লোকের জন্য তাদের অবস্থা অনুযায়ী বিভিন্নরূপ অনুভূত হবে। আর সুরা আস সাজদাহতে বর্ণিত ১০০০ বছর সময় আসমান ও যমিনের মধ্যকার চলাচলের সময় বর্ণিত হয়েছে। সুতরং আয়াতগুলোতে কোন বৈপরিত্য নেই। [৩]

.

প্রখ্যাত দাঈ ড. জাকির নায়েক এ আয়াতগুলোতে স্ববিরোধিতা আছে কিনা এ সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে—এখানে

আয়াতগুলোতে বলা হচ্ছে যে, মহান আল্লাহর নিকট সময়ের গণনা পৃথিবীর সময়ের গণনার সাথে তুলনাযোগ্য নয়। মানুষের নিকট যা হাজার হাজার বছর, আল্লাহ তা'আলার নিকট এগুলো অতি ক্ষুদ্র পরিমাণের সময়।

ধরা যাক, কারো দুবাই থেকে আবু ধাবিতে যেতে ১ ঘণ্টা লাগলো। এবং দুবাই থেকে নিউ ইয়র্কে যেতে ৫০ ঘণ্টা লাগলো। এই তথ্যে কি কোন স্ববিরোধিতা বা বৈপরিত্য আছে? মোটেও না। কেননা এখানে ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কথা বলা হচ্ছে। একইভাবে কুরআনের আলোচ্য আয়াতগুলোতেও ভিন্ন ভিন্ন ঘটনার ভিন্ন ভিন্ন সময়ের কথা বলা হয়েছে।

কাজেই এ আয়াতগুলোতে কোন প্রকারের স্ববিরোধিতা নেই। [৪]

.

এবং আল্লাহ ভালো জানেন।

---

[১] "Translation and Meaning of yawm (day, period) in English Arabic Terms Dictionary"
http://www.almaany.com/.../di.../ar-en/yawm+%28+day,+period+%29/
[২] ইবন কাসির;
কুরআনুল কারীম(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির), ২য় খণ্ড, ড.আবু বকর জাকারিয়া, সুরা হাজ্জের ৪৭নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ১৭৮২
[৩] দেখুনঃ ফাতহুল কাদির, সুরা আস সাজদাহ, আয়াত নং ৫; তাবারী, সুরা আস সাজদাহ আয়াত নং ৫;
কুরআনুল কারীম(বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির), ২য় খণ্ড, ড.আবু বকর জাকারিয়া, সুরা মা'আরিজের ৪নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ২৬৮৩-২৬৮৪

[৪] ▪ Re: Allahs Days Equal to 1000 Years or 50,000 Years ? [Dr. Zakir Naik]
https://m.youtube.com/watch?v=EcJhBpHwGUY
▪ One day = 1000 year or 50000 years Contradictions in the Quran [Dr. Zakir Naik]

https://m.youtube.com/watch?v=YoK4VBCFwg0

১৫৯

উমার (রা) কে নিয়ে জঘন্য মিথ্যাচার - মুসলিমরা কি আসলেই আলেকজান্দ্রিয়ার লাইব্রেরী পুড়িয়েছিল?

-ফারহান গনি

মুসলিম জাহানের দ্বিতীয় খলিফা উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) তখন মিশর জয় করেছিলেন। মিশরের গভর্নরের দায়িত্বে ছিলেন সাহাবী আমর্ ইবনুল আ'স (রা)।

.

"ইয়াহইয়া আল নাহাউঙ্গ নামের এক জ্ঞানী লোক সেই সময় থাকতো মিশরের আলেকজান্দ্রিয়া শহরে। তিনি আমর্ ইবনুল আ'সকে কিছু দার্শনিক উক্তি শোনালেন আর আমর্ ইবনুল আস খুশি হয়ে তাকে কিছু দিতে চাইলেন। নাহাউঙ্গ তাঁর কাছ ' থেকে আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরির বইগুলো নিতে চাইলেন। কিন্তু আমর্ তা করার আগে খলিফা উমরের কাছে অনুমতি চেয়ে চিঠি লিখেন। চিঠির উত্তরে খলিফা উমর লিখে পাঠান, 'বইপত্রগুলো যদি কুরআনের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না হয়, তবে সেগুলো আমাদের দৃষ্টিতে নিতান্তই অপ্রয়োজনীয়। কাজেই এগুলোর ধ্বংস অনিবার্য। আর বইপত্রগুলোতে যদি কুরআনের শিক্ষার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কথা থেকেও থাকে, তবে সেগুলো প্রয়োজনের অতিরিক্ত। তাই বইগুলো ধ্বংস কর।' এরপর আমর্ ইবনুল আ'স বিশ্বের সবচেয়ে প্রাচীন লাইব্রেরিটির বইয়ের খন্ডগুলো আলেকজান্দ্রিয়া শহরের স্নানাগারে পাঠিয়ে দেন আর সেখানে পানি গরম করার জন্য এই বইগুলো জ্বালানো হল। সবগুলো বই জ্বালিয়ে শেষ করতে ৬ মাস লেগেছিল। "

.

এতক্ষন যা পড়লেন তা হল ইতিহাসে উমর (রা) এর নামে করা অন্যতম একটি মিথ্যাচার। তবে ইসলাম বিদ্বেষী মহলে এই গল্পটি খুবই ফেমাস। এই গল্প উল্লেখ করার পরই তারা লাইন জুড়ে দেয়, "দেখো মুসলমানরা কত নীচু প্রজাতির, জ্ঞানচর্চার প্রতি তাদের কী অনীহা, বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বহ লাইব্রেরী ধ্বংস করে তারা মানবসভ্যতাকে কয়েকশ বছর পিছিয়ে দিয়েছে, ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা ব্লা।

.

প্রথমেই বলে রাখি, উপরের গল্পটি সর্বপ্রথম ইবনে আল ক্বাফতির বর্ণনা হতে পাওয়া যায় যিনি এটি ইবনে আল আবারি থেকে বর্ণনা করেছিলেন খলিফা উমরের মৃত্যুর আরো কমপক্ষে ৫০০ বছর পরে। এরপর সিরীয় খ্রিষ্টান লেখক বার-হিব্রাইউস ইবনে আল ক্বাফতি থেকে কপি পেস্ট মারেন।[১] মজার ব্যাপার হল - বিখ্যাত ইসলামী ইতিহাসবিদদের কোনো বর্ণনাতেই এই ঘটনার অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। আল ওয়াক্বিদি, আত তাবারী, ইবনে আল আথির, ইবনে আব্দুল হাকাম, ইয়াকুত আল হামাবী কেউই কখোনোই নিজেদের গ্রন্থে এই ঘটনাটি উল্লেখই করেন নি।

.

যাই হোক, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী ইতিহাসে অনেকবারই যুদ্ধ আর অগ্নিকান্ডের শিকার হয়। প্রথম ঘটনাটি ঘটে খ্রিষ্টপূর্ব ৮৯-৮৮ অব্দে। এই সময়ে টলেমী-VIII আলেকজান্দ্রিয়ার শাসনকর্তা ছিলেন। এই সময়ে দেশে গৃহযুদ্ধের সূচনা হয় এবং লাইব্রেরীর কিছু অংশে অগ্নিসংযোগ ঘটে।

পরবর্তী অগ্নিসংযোগ হয় রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের মিশর জয়ের সময় খ্রিষ্টপূর্ব ৪৭ অব্দে। মিশর ও রোমের এই যুদ্ধের অংশ হিসেবে সিজার আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীতে আগুন ধরিয়ে দেয়। পরবর্তী অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে ২৭৩ খ্রিষ্টাব্দে। এই সময় পলিমারের রানী জেনেবিয়া সম্রাট অ্যারেলিয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন। এই বিদ্রোহ দমন করতে যেয়ে

অ্যালেরিয়ান ও জেনেবিয়ার মাঝে একটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে অ্যারেলিয়ান লাইব্রেরীটির যে অংশ অক্ষত ছিল সেখানেও আগুন লাগিয়ে দেন।
এইখানেই শেষ না। ৩৯১ খ্রিষ্টাব্দে বিশপ থিওফেলাস প্যাগানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষনা করেন এবং তিনি প্যাগান মন্দির বন্ধের নির্দেশ দেন। প্যাগানরা তাতে অস্বীকৃতি জানালে থিওফ্যালাস তাদের সকল মন্দিরে অগ্নিসংযোগ করেন। তখন লাইব্রেরীর যে অংশটুকু বেঁচেকুঁচে ছিল সেটাও ধ্বংস হয়।

.

তো ডিয়ার "কলা"জ, কি মনে হয় আপনাদের ? চারবার ভয়াবহ আগুন লাগার পরও আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী খলিফা উমরের সময় ছিল ? আর সেখানে এত্তওওগুলো বই ছিল যে তা জ্বালাতে ৬ মাস লেগেছিল ?

.

এবার আসুন কিছু সূত্র মেলানো যাক।
* যদি সেই সময় আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরীতে কোনো বই থেকেও থাকতো, তাহলে তো বাইজেন্টাইনরা মিশর ত্যাগ করার আগেই সেগুলো নিয়ে চলে যাওয়ার কথা।

* আমর্ ইবনুল আ'সকে যদি উমর (রা) সত্যিই বলে থাকতেন যে, "সবগুলো বই ধ্বংস করে দাও", তাহলে তো সাহাবি আমর্ এই নির্দেশ পালনে মোটেও কালক্ষেপণ করতেন না। বরং সাথে সাথেই পুরো লাইব্রেরীতে আগুন লাগিয়ে দিতেন বা সব বই সাগরে ফেলে দিয়ে নষ্ট করে দিতে পারতেন। সেখানে তিনি কেন বইগুলো ধ্বংস করতে ছয় মাস লাগালেন ?

মুসলিম এবং নন-মুসলিম সবগুলো সোর্সকে একত্র করলে এটা সহজেই বোঝা যায় যে, আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী ধ্বংসের জন্য উমর (রা) মোটেও দায়ী নন।

.

তিনজন বিখ্যাত নন মুসলিম হিস্টোরিয়ানের মতামত দিয়ে শেষ করবো।
আমেরিকান ইতিহাসবিদ বার্নার্ড লুইস বলেন, "THE MYTH OF THE ARAB DESTRUCTION OF THE LIBRARY OF ALEXANDRIA IS NOT SUPPORTED BY EVEN A FABRICATED DOCUMENT. "
অর্থাৎ আরবদের আলেকজান্দ্রিয়া লাইব্রেরী ধ্বংসের কাহিনী একটি জাল দলিলপত্র দ্বারাও সমর্থিত হয় না। [২]

.

কলাবিজ্ঞানিদের অতি শ্রদ্ধাভাজন স্যার বারট্রান্ড রাসেল বলেন, "CHRISTIAN PROPAGANDA HAS INVENTED STORIES OF MOHAMMEDAN INTOLERANCE, BUT THESE ARE WHOLLY FALSE AS APPLIED TO THE EARLY CENTURIES OF ISLAM",
অর্থাৎ "মুসলমানদের অসহিষ্ণুতা নিয়ে যে গল্পগুলো বলা হয় তা খ্রিষ্টান প্রোপাগান্ডা দ্বারা তৈরি এবং ইসলামের প্রাথমিক যুগের সাথে মিলালে তা সম্পূর্ণই মিথ্যা। "[৩]

.

আলফ্রেড জে বাটলারের উক্তিটি শোনার পর আপনার আর কোনো সন্দেহই থাকবে না। তিনি বলেন, "when one has deducted all the writings on vellum, how can it be seriously imagined that the remainder of the books would have kept the 4,000 bathfurnaces of Alexandria alive for 180 days ? The tale, as it stands, is ridiculous."
অর্থাৎ "বইগুলোর সংখ্যা এতবার হ্রাস পাওয়ার পরও কারো পক্ষে এটা কিভাবে ভাবা সম্ভব যে অবশিষ্ট বইগুলো ১৮০ দিন ধরে ৪০০০ স্নানাগারের চুলাকে জ্বালিয়ে রাখতে পারে ? গল্পটি খুবই হাস্যকর দাঁড়ায়।" [৪]

[১] Umar Ibn al-Khattab – His Life & Times, Dr. Muhammad Ali al-Sallabi, volume 2.

[২]What Happened To The Ancient Library Of Alexandria, Bernard Lewis, page 215.

[৩]Human Society In Ethics And Politics, Bertrand Russell, page 217.

[৪]The Arab Conquest Of Egypt And The Last Thirty Years Of The Roman Dominion, Alfred J. Butler, D. Litt., F.S.A., page 408.

১৬০

কীভাবে তোমার রবকে চিনবে?

-ড. আহমাদ ইবন উসমান আল-মাযইয়াদ, অনুবাদ: আব্দুল্লাহ আল মামুন আল-আযহারী

আল-কুরআনে মহান রব দু'টি উপায়ে তাঁকে চেনার জন্য বান্দাদেরকে আহ্বান করেছেন। সে পদ্ধতি দু'টি হলো:
প্রথমত: তাঁর সৃষ্টিকর্মের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া ও গভীরভাবে তাকানো।
দ্বিতীয়ত: তাঁর আয়াতসমূহে চিন্তা ও সেগুলো নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করা; তন্মধ্যে প্রথম প্রকার হলো তাঁর দৃশ্যমান আয়াত বা নিদর্শন আর দ্বিতীয় প্রকার হলো বিবেকগ্রাহ্য শ্রবণযোগ্য আয়াত বা নিদর্শন।

.

প্রথম প্রকারের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,
"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের বিবর্তনে, সে নৌকায় যা সমুদ্রে মানুষের জন্য কল্যাণকর বস্তু নিয়ে চলে (রয়েছে নিদর্শনসমূহ এমন জাতির জন্য, যারা বিবেকবান)।" [সূরা আল-বাকারা[১৬৪ :আয়াত ,

.

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,

"নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি এবং রাত ও দিনের বিবর্তনের মধ্যে রয়েছে বিবেক সম্পন্নদের জন্য বহু নিদর্শন।" [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১৯০] এ জাতীয় আয়াত আল-কুরআনে অনেক রয়েছে।

.

দ্বিতীয় প্রকারের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তা- ভাবনা করে না?" [সূরা মুহাম্মাদ, আয়াত: ২৪].
আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,
"তারা কি এ বাণী সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না?" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ৬৮]

.

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন,
"আমি আপনার প্রতি নাযিল করেছি এক বরকতময় কিতাব, যাতে তারা এর আয়াতসমূহ নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে।" [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ২৯] এ ধরণের অনেক আয়াত রয়েছে।

.

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেছেন
"বিশ্বজগতে ও তাদের নিজেদের মধ্যে আমি তাদেরকে আমার নিদর্শনাবলী দেখাব যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, এটি (কুরআন) সত্য।" [সূরা ফুসসিলাত, আয়াত: ৫৩]
অর্থাৎ আল-কুরআন সত্য। এ আয়াতে আল্লাহ বলেছেন যে, তিনি অবশ্যই তাদেরকে তাঁর দৃশ্যমান সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী দেখাবেন যাতে তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয় যে, তিলাওয়াতকৃত এ কুরআন সত্য।

.

তারপর তিনি তাঁর দেওয়া সাক্ষ্যকেই তাঁর পক্ষ থেকে আগত সকল সংবাদের সত্যতার জন্য যথেষ্ট বলে ঘোষণা করেছেন, কারণ; তিনি তাঁর রাসূলগণের সত্যতার উপর যাবতীয় দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

.

অতএব, আল্লাহ তা'আলার আয়াতসমূহ তাঁর সত্যতার প্রমাণ, আর আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তাঁর রাসূলগণের আয়াতসমূহের সত্যতার উপর প্রমাণ। তিনি নিজেই সাক্ষী ও সাক্ষ্য সাব্যস্তকৃত (সত্তা)। আর তিনি নিজেই প্রমাণ ও নিজের ওপর প্রমাণবহ। তিনি নিজেই নিজের জন্য দলীল। যেমন কোনো এক বিজ্ঞলোক বলেছেন,

.

'কিভাবে আমি তাঁর (আল্লাহর) প্রমাণ তালাশ করবো, যিনি নিজেই আমার কাছে সব কিছুর জন্য প্রমাণ?

তাঁর ব্যাপারে যে দলীলই তালাশ করি, তাঁর অস্তিত্ব সে গুলোর চেয়ে অধিক স্পষ্ট।'

.

এ কারণেই রাসূলগণ তাদের জাতির কাছে বলেছিলেন,
"(তাদের রাসূলগণ বলেছিল), আল্লাহর ব্যাপারেও কি সন্দেহ?" [সূরা ইবরাহীম, আয়াত: ১০]

.

তিনি তো সব জ্ঞাত বিষয়ের চেয়ে অধিক জ্ঞাত, সব দলিলের চেয়ে অধিক স্পষ্ট। প্রকৃতপক্ষে সব বস্তু তাঁর (আল্লাহর) দ্বারাই চেনা যায়, যদিও তাঁর কাজসমূহ ও হুকুমের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা ও দলীল-প্রমাণ তালাশের মধ্যেও তাঁকে চেনা যায়।

.

.

বইঃ ইবনুল কাইয়্যেম রহ.-এর আল-ফাওয়ায়েদ অবলম্বনে 'মুখতাসারুল ফাওয়ায়েদ'
লেখকঃ ড. আহমাদ ইবন উসমান আল-মাযইয়াদ
অনুবাদঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন আল-আযহারী
সম্পাদনা: ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া

১৬১

অনুগল্প: “পূজারী ও পূজিত কতই না দূর্বল!”

-জাকারিয়া মাসুদ

[এক]

.

গৌরাঙ্গ ও ফয়সাল দুজন একই ক্লাসে পড়ে। ভিন্ন ভিন্ন ধর্মের হলেও দুজনের মধ্যে একটা জায়গায় মিল – দুজনেই যথাসাধ্য ধর্ম পালন করার চেষ্টা করে। ফয়সাল নিয়মিত সালাত আদায় করে, আর গৌরাঙ্গ নিয়ম করে দুবেলা মন্দিরে যায়। সামনে গৌরাঙ্গদের পূজো। সবচেয়ে বড় দেবীর পূজো। দেবীর নাম দূর্গা। এই দূর্গা ছাড়াও তাদের আরও দেবী আছে, যেমনঃ কালী, স্বরস্বতী, লক্ষ্মী ইত্যাদি। তারা সাধারণত এই নারী দেবীগুলোর পূজাই ধুমধাম করে পালন করে।

.

ফয়সাল ভেবে পায় না, পূজো কেবল নারীর হবে কেনো? পুরুষরা কি দোষ করলো? ওদের ধর্মে তো অর্জুন, রাম, লক্ষণ, যুধিষ্ঠির, নারায়ণ, বিষ্ণু ইত্যাদি নামের পুরুষ দেবতাও আছে। কিন্তু ঐগুলোর পূজো তো এত ধূমধাম করে পালন করা হয় না? কেন? গৌরাঙ্গ সবসময় নারী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলে। কিন্তু পূজোর বেলায় কেবল নারী দেবীর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে। তাহলে এখানে তো নারী পুরুষের সমতা রক্ষা হলো না!
ফয়সালের মাথায় এইসব চিন্তা জট পাকিয়ে যায়। মনে মনে ভাবে গৌরাঙ্গকে একদিন জিজ্ঞেস করে এর উত্তর জেনে নেবে। অবশ্যি জিজ্ঞেস করার মত সুযোগ ফয়সালের আর হয়ে উঠে নি।

.

[দুই]

.

আজ নবমী। আজ বাদে কাল বিজয় দশমী। কাল গৌরাঙ্গদের দূর্গা মা'কে ডুবানো হবে। ডুবানোর পূর্বে গায়ের যত গয়না ছিলো সব খুলে ফেলা হবে। এরপর বাদ্য বাজাতে বাজাতে দেবীকে পানিতে ভাসিয়ে দেবে।
‘আচ্ছা! যে দেবতাকে পানিতে ডুবিয়ে ফেলা যায়, যার নিজ হাতে নিজেকে বাঁচানোর ক্ষমতা নেই, যে নড়াচড়া করতে অক্ষম; সে কী করে সবচেয়ে বড় ভগবানের আসনে বসে থাকে?’ ফয়সালের মনে এমন চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছিল। হঠাত পেছন থেকে গৌরাঙ্গের আওয়াজ শোনা গেলো।

“কিরে ফয়সাল, কেমন আছিস?” গৌরাঙ্গ জিজ্ঞেস করলো।
“ভালো।” ফয়সাল জবাব দিলো।
- “কাল আমাদের বিজয় দশমী। আসবি কিন্তু?”
- “নারে, আসতে পারবো না।”
- “কেন। কোন সমস্যা?”
- “হ্যাঁ।”
- “কী।”
- “আমাদের ধর্মে নিষেধ আছে।”
- “আরে রাখ। উৎসবের বেলায় আবার ধর্ম কী-রে? উৎসব তো উৎসবই। জানিস না, ধর্ম যার যার উৎসব সবার।”

.

ফয়সাল কিছু বলতে যাবে এমন সময় আযানের শব্দ শোনা গেলো। আযান শেষ হলে ফয়সাল গৌরাঙ্গের হাতটা শক্ত করে

ধরলো। এরপর তাঁকে মসজিদের আঙ্গিনায় নিয়ে গেলো। গৌরাঙ্গ চিৎকার করতে করতে বললো, "ছাড়, ছাড়। এ-কি করছিস?"
- "আজ কি বার জানিস?"
- "হুম জানি। শুক্রবার।"
- "আজ আমদের একটা উৎসবের দিন। শুক্রবার হলো সাপ্তাহিক ঈদের দিন। কেননা আমাদের নবীজী (ﷺ) বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা মুসলামানদের জন্যে এই দিনটিকে ঈদের দিন বানিয়েছেন।" [১]
- "তো আমি কী করবো?"
- "বললাম না, আজ আমাদের উৎসবের দিন। তোকে এনেছি আমাদের উৎসবে যোগ দেয়ার জন্যে। আর হ্যাঁ, তুই কিন্তু না বলতে পারবি না।"
- "আমি তোদের উৎসবে কী করবো?"
- "কী করবি আবার? তুই আমাদের উৎসবে যোগ দিবি। এই না কিছুক্ষণ আগে বললি – ধর্ম যার যার উৎসব সবার।"
গৌরাঙ্গ কিছুটা হতভম্ব হয়ে বললো, "দেখ ফয়সাল এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে!"
- "এতে বাড়াবাড়ির কী দেখলি?"
- "তোর আর আমার জাত আলাদা। আমি অন্য জাতের হয়ে তোদের উৎসবে যোগ গিতে পারি না। আর তুই ও আমাকে তোদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বলতে পারিস না। কেননা তোদের ধর্মে বলা আছে, 'লাকুম দিনুকুম ওয়ালিয়া দ্বীন – যার যার ধর্ম তার তার'।"

ফয়সাল গৌরাঙ্গের হাত ছেড়ে দিলো। এরপর বললো, "এই কথাটা তোর কিছুক্ষণ আগে মনে ছিলো না?"
গৌরাঙ্গ ফয়সালের প্রশ্নের জবাব দিলো না।

.

[তিন]

.

বিজয় দশমী শেষ হলো। পরদিন সকালবেলা ফয়সাল নদীর ধারে হাঁটতে বের হলো। নদীর স্নিগ্ধ হাওয়ায় অবগাহন করার মজাই আলাদা। নদীটা আজ বড়ই অচেনা লাগছে। ফয়সাল জবুথবু হয়ে নদীর দিকে তাকিয়ে রইলো। কাল যে দূর্গার মূর্তিগুলো পানিতে ডুবানো হয়েছে, আজ তা ভেসে উঠেছে। আর মূর্তিগুলোর চারিদিকে মাছি ভ্যান ভ্যান করছে। মূর্তিগুলোর এই অবস্থা দেখে ফয়সালের একটি আয়াতের কথা স্মরণ হলো।

"হে মানুষ! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, সেটা মনোযোগ দিয়ে শোন। তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদের পূজো করো, তারা কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না। যদিও তারা সকলে একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তবে তারা তার (মাছির) কাছ থেকে তা উদ্ধারও করতে পারবে না। পূজারী ও পূজিত কতই না দূর্বল!" [২]

আয়াতটি স্মরণ হতেই ফয়সাল মনে মনে বললো, "মহান আল্লাহ সত্য বলেছেন।"

---

১) ইবনু মাযাহ, আস-সুনান, ১/৩৪৯, আলবানী, সহীহুত তারগীব, ১/১৭২।

২) সূরা আল।৭৩হাজ্জঃ -

১৬২

‘সাবআতুল আহরুফ’ [৭টি উপভাষা / 7 Dialects] কি কুরআনের একাধিক ভার্শন?অনেকেই সাবআতুল আহরুফ বা কুরআনের ৭ হরফ (7 dialects)

-হোসাইন শাকিল

নিয়ে প্রশ্ন তুলে থাকেন এবং অভিযোগ করে থাকেন এটা নাকি কুরআনের বিভিন্ন ভার্শন বা সংস্করণ(নাউযুবিল্লাহ)। অনেক সময়ে খ্রিষ্টান মিশনারী কিংবা নাস্তিক মুক্তমনারা বিভিন্ন জায়গায় প্রাপ্ত প্রাচীন কুরআনের কপির কথা প্রচার করেন যেগুলোতে কিছু শব্দ ও বাক্য বর্তমানে প্রচলিত কুরআনের থেকে কিছুটা ভিন্ন। এভাবে তারা আল কুরআনের সংরক্ষণ ও সঙ্কলনকে প্রশ্নবিদ্ধ করেন, তারা বলতে চান যে কুরআন ঠিকভাবে সংরক্ষিত হয়নি এবং সাহাবীগণ আল কুরআনকে পরিবর্তন করে ফেলেছেন (নাউযুবিল্লাহ)। আসুন এইসব অভিযোগের স্বরুপ সন্ধানে যাওয়া যাক।

.

হারফ বহুবচনে আহরুফ(ج). حرف أحرف)অর্থ কিনারা, তট, কূলভূমি ইত্যাদি।[১]

.

যেমন আল্লাহ বলেন,
وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يَعْبُدُ ٱللَّهَ عَلَىٰ حَرْفٍۢ ۖ
অনুবাদঃ কিছু কিছু মানুষ আছে যারা দ্বিধার(প্রান্তে দাঁড়িয়ে) আল্লাহর ইবাদাত করে। (সূরা হাজ্জ, ২২:১১)

.

সাত হরফে কুরআন নাযিলের বিষয়টি অনেক হাদিস দ্বারা প্রমানিত। ،
ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন,” রাসূলুল্লাহ্(صلى الله عليه وسلم) বলেছেন, জিবরাঈল (আ) আমাকে একভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অনুরোধ করতে লাগলাম এবং পুনঃ পুনঃ অন্যভাবে পাঠ করার জন্য অব্যাহতভাবে অনুরোধ করতে থাকলে তিনি আমার জন্য পাঠ পদ্ধতি বাড়িয়ে যেতে লাগলেন। অবশেষে তিনি সাত হরফে তিলাওয়াত করে সমাপ্ত করলেন।” [২]

.

◘ এই সাত আহরুফ বা হরফ দ্বারা মূলত উদ্দেশ্য কি?

.

উলামারা অনেক আগে থেকেই এই সাত হরফ দ্বারা কি উদ্দেশ্য তা নির্ণয় করতে যেয়ে মতভেদ করেছেন। তবে সবচেয়ে বিশুদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য মত সম্পর্কে শায়খ সালিহ আল মূনাজ্জিদ বলেন,
أحسن الأقوال مما قيل في معناها أنها سبعة أوجه من القراءة تختلف باللفظ وقد تتفق بالمعنى وإن اختلفت بالمعنى: فاختلافها من باب التنوع والتغاير لا من باب التضاد والتعارض
“এই বিষয়ে উলামাদের থেকে বর্ণিত সর্বাধিক প্রাধান্যপ্রাপ্ত মত হলো যে এই সাবআতুল আহরুফ কিরায়াতের সাতটি বিশেষ পদ্ধতি যা শব্দের দিক থেকে সাংঘর্ষিক হলেও অর্থের দিক থেকে এক। আর যদি ও অর্থের দিক থেকে একে অপরের বিপরীত হয় ও, তবে তা বৈচিত্র্যের দিক থেকে সামগ্রিক ভাবে একে অপরের বিরোধী নয়”[৩]

.

আমরা এখন কুরআনের হরফ সাতটির সামান্য পরিচয় জানবো ও এই সম্পর্কিত কিছু উদাহরণ দেখে নেই-
কুরআনে হরফ সাতভাবে ভিন্ন হতে পারে

(১) ভিন্ন শব্দে একই অর্থ প্রকাশ;

(২) শব্দ ও অর্থ উভয়তেই পার্থক্য হওয়া;

(৩) শব্দের যোজন-বিয়োজনে অর্থের অভিন্নতা;

(৪) শব্দে আগ-পিছ হওয়া ও অর্থের অভিন্নতা;

(৫) ইরাবের ভিন্নতা ও অর্থের অভিন্নতা;

(৬) ওয়াক্বফে ভিন্নতা; ও

(৭) উচ্চারণে ভিন্নতা।

.

(১) ভিন্ন শব্দে একই অর্থ প্রকাশঃ

সাত হরফের প্রকারভেদের একটি হলো ভিন্ন শব্দ তবে একই অর্থ প্রকাশ করবে। যেমন নিম্নে উদাহরণ পেশ করা হলো-

.

আল্লাহ বলেন,

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ أَن تُصِيبُواْ قَوْمًۢا بِجَهَـٰلَةٍ فَتُصْبِحُواْ عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَـٰدِمِينَ

অনুবাদঃ মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিসাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও। (সূরা হুজুরাত, ৪৯:৬)

.

এটি হচ্ছে এই আয়াতের আমাদের পরিচিত কিরায়াতের ইবারাত(মূল টেক্সট)। উপরে মোটা অক্ষরে আন্ডারলাইন করা শব্দটি হলো ফাতাবাইইয়ানু(فَتَبَيَّنُوٓا) যার অর্থ হলো পরীক্ষা করে দেখবে(ফেলে আমর) । কিন্তু অন্যান্য কিছু কিরায়াতে এই ফাতাবাইইয়ানু(فتثبتوا)শব্দটির স্থলে এসেছে ফাতাছাব্বাতু(فتثبتوا). অর্থাৎ,

পরিচিত কিরায়াতঃ (إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوٓاْ)

ভিন্ন কিরায়াতঃ (إِن جَآءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَبَإٍ فتثبتواْ)

ফাতাবাইইয়ানু(فَتَبَيَّنُوٓا) ও ফাতাছাব্বাতু(فتثبتوا) এই দুটি শব্দের অর্থই এক তা হলো পরীক্ষা করে দেখা, প্রতিষ্ঠিত করা ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে, আরবরা নুকতা ব্যবহারে অভ্যস্ত ছিলো না তাই আমরা যদি ফাতাবাইইয়ানু ও ফাতাছাব্বাতু শব্দ দুইটিকে নুকতা ছাড়াই দেখি তবে দুটি শব্দই একই রকম।

.

(২) শব্দে ও অর্থ উভয়তেই পার্থক্য হওয়াঃ

সাত হরফের মধ্যে ২য় হলো যেখানে শব্দ ও অর্থ উভয়তেই পার্থক্য পরিগনিত হয়। যেমন উদাহরণস্বরুপ বলা যায়-

وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا

অনুবাদঃ আপনি যখন সেখানে বিশাল নেয়ামতরাজি ও সাম্রাজ্য দেখতে পাবেন। (সূরা ইনসান, ৭৬(২০:

এখানে মুলক(مُلْكً) অর্থ সাম্রাজ্য। তবে কিছু কিছু কিরায়াতে এসেছে আয়াতের মূলক(مُلْكً) শব্দের পরিবর্তে মালিক(مالك) অর্থাৎ, সম্রাট শব্দ এসেছে। অর্থাৎ,

পরিচিত কিরায়াত- (وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا)

অনুবাদঃ আপনি যখন সেখানে বিশাল নেয়ামতরাজি ও সাম্রাজ্য দেখতে পাবেন।

ভিন্ন কিরায়াত- (وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا ومالكا كَبِيرًا)

অনুবাদঃ আপনি যখন সেখানে বিশাল নেয়ামতরাজি ও মহান সম্রাটকে দেখতে পাবেন।

দুটি শব্দ পরিপূর্ণ ভিন্ন অর্থ প্রকাশ করছে। তবে সত্য কথা হলো এতে অর্থের পরিবর্তন মোটেও দোষনীয় নয়। কেননা মুলক বা সাম্রাজ্য দ্বারা জান্নাতকে বুঝানো হচ্ছে আর মালিক দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হচ্ছে। মালিককে দেখা বলতে আল্লাহর দর্শনকে

বুঝানো হচ্ছে। দুটি শব্দের অর্থই ইসলামী আকীদার সাথে সামঞ্জস্যশীল। তাই অর্থের ভিন্নতা এখানে মোটেই সমস্যার কারণ নয়।

.

(৩) শব্দে যোজন-বিয়োজন তবে অর্থের অভিন্নতাঃ

কখনো কখনো শব্দে যোজন বা বিয়োজনের কারণে পার্থক্য ঘটে থাকে। যেমন উদাহরণস্বরুপ বলা যায়-

আল্লাহ বলেন,

ٱلْأَنْهَـٰرُ تَحْتَهَا تَجْرِى جَنَّـٰتٍ لَهُمْ وَأَعَدَّ عَنْهُ وَرَضُوا۟ عَنْهُمْ ٱللَّهُ رَّضِىَ بِإِحْسَـٰنٍ ٱتَّبَعُوهُم وَٱلَّذِينَ وَٱلْأَنصَارِ ٱلْمُهَـٰجِرِينَ مِنَ ٱلْأَوَّلُونَ وَٱلسَّـٰبِقُونَ
ٱلْعَظِيمُ ٱلْفَوْزُ ۚذَٰلِكَ ۚ أَبَدًا فِيهَآ خَـٰلِدِينَ

অনুবাদঃ আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনছারদের মাঝে পুরাতন, এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কানন-কুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। (সূরা তাওবা, ৯:১০০)

আমরা কুরআনে অন্যান্য অনেক স্থানেই জান্নাতের নদীর বর্ণনায় তাজরী মিন তাহতিহাল আনহার উল্লেখ পাই শুধু এই আয়াতটি ছাড়া যেখানে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা জান্নাতের নদীর বর্ণনায় "তাজরী তাহতিহাল আনহার (ٱلْأَنْهَـٰرُ تَحْتَهَا تَجْرِى) ব্যবহার করেছেন। তবে অন্য কিছু কিরায়াতে এই স্থলেও তাজরী মিন তাহতিহাল আনহার(ٱلْأَنْهَـٰر تَحْتَهَا من تَجْرِى) এর ব্যবহার লক্ষ কর যায়। অর্থাৎ,

পরিচিত কিরায়াতে- (ٱلْأَنْهَـٰر تَحْتَهَا تَجْرِى جَنَّـٰتٍ لَهُمْ وَأَعَدَّ)

ভিন্ন কিরায়াতে- (ٱلْأَنْهَـٰر تَحْتَهَا من تَجْرِى جَنَّـٰتٍ لَهُمْ وَأَعَدَّ)

এই দুই কিরায়াতেই আয়াতের অর্থের সামান্যও পরিবর্তন না ঘটা সত্ত্বেও শুধুমাত্র শব্দের হয় যোজন অথবা বিয়োজন ঘটে থাকে।

.

(৪) শব্দের আগ-পিছ হয়ে থাকে এবং অর্থ অপরিবর্তিত থাকেঃ

এই ক্ষেত্রে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে-

.

(ক) আল্লাহ বলেন,

ٱلتَّوْرَىٰةِ فِى حَقًّا عَلَيْهِ وَعْدًا ۖ وَيُقْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ ٱللَّهِ سَبِيلِ فِى يُقَـٰتِلُونَ ۚ ٱلْجَنَّةَ لَهُمُ بِأَنَّ ۚلَهُموَأَمْوَ أَنفُسَهُمْ ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنَ ٱشْتَرَىٰ ٱللَّهَ إِنَّ
ٱلْعَظِيمُ ٱلْفَوْزُ هُوَ ۚلِكَوَذَ ۚ بِهِۦ بَايَعْتُم ٱلَّذِى بِبَيْعِكُمُ فَٱسْتَبْشِرُوا۟ ۚ ٱللَّهِ مِنَ بِعَهْدِهِۦ أَوْفَىٰ وَمَنْ ۚ وَٱلْقُرْءَانِ وَٱلْإِنجِيلِ

অনুবাদঃ আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর রাহেঃ অতঃপর মারে ও মরে। তওরাত, ইঞ্জিল ও কোরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেন-দেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। (সূরা তাওবা, ৯:১১১)

.

এখানে মোটা অক্ষরে ও আন্ডারলাইন করা দুটি শব্দ দেখতে পাচ্ছি যা হলো ফাইয়াকতুলুনা ওয়া ইয়ুকতালুন(وَيُقْتَلُونَ فَيَقْتُلُونَ)অর্থাত, তারা মারে ও মরে। তবে অন্য কিছু কিরায়াতে এই দুটি শব্দ আগে-পিছে হয়েছে। অর্থাৎ, ফাইয়ুকতালুনা ওয়া ইয়াকতুলুন()। অর্থাৎ,

পরিচিত কিরায়াতيُقَـٰتِلُونَ - (فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ)

ভিন্ন কিরায়াতে- (فيقتلون فيقتلونِ ٱللَّه سَبِيلِ فِى يُقَـٰتِلُونَ)

.

(৫) ইরাবে মতপার্থক্য ও অর্থে অভিন্নতাঃ

ইরাব বলতে আরবী শব্দের শেষের হারাকাত নির্ণয়ের পদ্ধতিকে বোঝায়। ইরাব তিন প্রকার যথা মারফু, মানসুব ও মাজরুর।

এর উদাহরণ নিম্নরুপ-

.

আল্লাহ বলেন,
ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ ۗ وَوَيْلٌ لِّلْكَـٰفِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ
অনুবাদঃ তিনি আল্লাহ; যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের সবকিছুর মালিক। কাফেরদের জন্যে বিপদ রয়েছে, কঠোর আযাব। (সূরা ইবরাহীম, ১৪:২)

.

আন্ডারলাইন করা অংশটি আল্লাহি(ٱللَّهِ)। আল্লাহ শব্দটির সঙ্গে ছোট হা এর নিচে কাসরাহ বা যের হয়ে আল্লাহি হয়েছে অর্থাৎ, এই শব্দটি মাজরুর অবস্থায় আছে। তবে কিছু কিছু কিরায়াতে এখানে আল্লাহি(ٱللَّهِ)) এর স্থলে দাম্মাহ দ্বারা মারফু ভাবে আল্লাহু(ٱللَّهُ) ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ,
পরিচিত কিরায়াতে- (ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ)
ভিন্ন কিরায়াতে- (ٱللَّهُ ٱلَّذِى لَهُۥ مَا فِى ٱلسَّمَـٰوَٰتِ وَمَا فِى ٱلْأَرْضِ)
অর্থে কোনো ভিন্নতা হয়নি।

.

(৬) ওয়াকফে মতপার্থক্যঃ
ওয়াকফ বলতে কুরআনের বিভিন্ন স্থানে থামার নির্দেশকে বোঝায়। বিভিন্ন কিরায়াতে এই ওয়াকফে মতপার্থক্য হয়েছে। যেমন,

.

আল্লাহ বলেন,
قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ ٱلرَّٰحِمِينَ
অনুবাদঃ বললেন, আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদের কে ক্ষমা করুন। তিনি সব মেহেরবানদের চাইতে অধিক মেহেরবান। (সূরা ইউসুফ, ১২:৯২)

.

এই আয়াতে আমাদের পরিচিত কিরায়াতে ওয়াকফ হবে (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ) এর পরে। তবে কিছু কিরায়তে ওয়াকফ করা হয়েছে (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ) এর পরে । অর্থাৎ,
পরিচিত কিরায়াতে- (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ)
ভিন্ন কিরায়াতে- (قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ۖ ٱلْيَوْمَ يَغْفِرُ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ)

.

এখানে দেখা যাচ্ছে যে, আলাইকুম(عَلَيْكُمُ) শব্দটির পরে ওয়াকফ হয়েছে আর আলইয়াওমা(ٱلْيَوْمَ) শব্দটি পরের আয়াতের শুরুতে যোগ হয়েছে। তখন এর অর্থ একটু ভিন্ন হবে পূর্বেরকার অর্থ থেকে। আর তা হলো-
"তোমাদের উপর (পূর্বের আলইয়াওমা শব্দটি না থাকায় "আজ"" হবেনা) কোনো অভিযোগ নেই, আজ(পূর্বের অনুবাদে "আজ" শব্দটি ছিলোনা) আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিন।"

.

(৭) উচ্চারণে পার্থক্যঃ
যেমন,
وَقَالَ ٱرْكَبُوا۟ فِيهَا بِسْمِ ٱللَّهِ مَجْرِىٰهَا وَمُرْسَىٰهَآ ۚ إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ
এই আয়াতে আন্ডারলাইনকৃত মাজরাহা(مَجْرِىٰهَا) শব্দকে আরবীতে অনেকে মাজরেহা ও উচ্চারণ করে থাকেন। এমনি ভাবে আরবী হরফ 'সিন'(س) ও সোয়াদ(ص) এর উচ্চারণে আরবদের মাঝে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। এ ধরনের উচ্চারণগত পার্থক্যের কারণে অর্থের কোনোই পরিবর্তন সাধিত হয়না।

.

এখানে একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ মূলনীতি মনে রাখতে হবে যে, এই সাত ধরনের কিরাআত সবগুলোই রাসুলুল্লাহ(ﷺ) এর অনুমোদিত ও তাঁর থেকে মুতাওয়াতির বর্ণনা দ্বারা প্রমানিত। এর প্রমান নিম্নের হাদিসটি থেকে পাই-

.

উমর ইব্‌ন খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি হিশাম ইব্‌ন হাকীম (রা) কে রাসূলুল্লাহ(ﷺ) এর জীবদ্দশায় সূরা ফুরকান তিলাওয়াত করতে শুনেছি এবং গভীর মনোযোগ সহকারে আমি তার কিরাআত শুনেছি। তিনি বিভিন্নভাবে কিরাআত পাঠ করেছেন; অথচ রাসূলুল্লাহ্(ﷺ) আমাকে এভাবে শিক্ষা দেননি। এ কারণে সালাতের মাঝে আমি তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য উদ্যত হয়ে পড়েছিলাম, কিন্তু বড় কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। তারপর সে সালাম ফিরালে আমি চাদর দিয়ে তার গলা পেঁচিয়ে ধরলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম,তোমাকে এ সূরা যে ভাবে পাঠ করতে শুনলাম, এভাবে তোমাকে কে শিক্ষা দিয়েছে? সে বলল, রাসূলুল্লাহ(ﷺ) -ই আমাকে এভাবে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি বললাম, তুমি মিথ্যা বলছ। কারণ, তুমি যে পদ্ধতিতে পাঠ করেছ, এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে রাসূলুল্লাহ্(ﷺ) আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। এরপর আমি তাকে জোর করে টেনে রাসূলুল্লাহ্(ﷺ) এর কাছে নিয়ে গেলাম এবং বললাম, আপনি আমাকে সূরা ফুরকান যে পদ্ধতিতে পাঠ করতে শিখিয়েছেন এ লোককে আমি এর থেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে তা পাঠ করতে শুনেছি। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ্(ﷺ) বললেন, তাকে ছেড়ে দাও৷ হিশাম, তুমি পাঠ করে শোনাও। তারপর সে সেভাবেই পাঠ করে শোনালএভাবেই ,যেভাবে আমি তাকে পাঠ করতে শুনেছি। তখন আল্লাহর রাসূল বললেন , সেভাবেই আমি ,তুমিও পড়। সুতরাং আমাকে তিনি যেভাবে শিক্ষা দিয়েছেন !হে উমর ,লেননাযিল করা হয়েছে। এরপর বল)পাঠ করলাম। এবারও রাসূলুল্লাহ্ﷺ) বললেন, এভাবেও কুরআন নাযিল করা হয়েছে। এ কুরআন সাত উপ (আঞ্চলিক) ভাষায় নাযিল করা হয়েছে। সুতরাং তোমাদের জন্য যা সহজতর, সে পদ্ধতিতেই তোমরা পাঠ কর। [৪]

.

এরকমটা করা হয়েছে উম্মাতের জন্যে সহজীকরণের জন্যেই। নিম্নের বর্ণনা দুটিতে এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায়।

.

উবাই ইবন কা’ব (রা-) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি মসজিদে ছিলাম । এক ব্যক্তি প্রবশে করে সালাত আদায় করতে লাগল । সে এমন এক ধরলের কিরাআত করতে লাগল আমার কাছে অভিনব মনে হল । পরে আর একজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী ব্যক্তি হতে ভিন্ন ধরনের কিরা-আত করতে লাগল । সালাত শেষে আমরা সবাই রাসুলুল্লাহ (ﷺ) এর কাছে গেলাম । আমি বললাম, এ ব্যক্তি এমন কিরা আত করেছে যা আমার কাছে অভিনব ঠেকেছে এবং অন্যজন প্রবেশ করে তার পূর্ববর্তী জন হতে ভিন্ন কিরা-আত পাঠ করেছে । তখন রাসুলুল্লাহ (ﷺ) তাদের উভয়কে (কিরা আত পাঠ করতে) নির্দেশ দিলেন । তারা উভয়েই কিরা-আত পাঠ করল । নবী (ﷺ) তাদের দু-জনের (কিরা-আতের) ধরনকে সুন্দর বললেন । ফলে আমার মনে নবী (ﷺ) এর কুরআনের প্রতি মিথ্যা অবিশ্বাস ও সন্দেহের উন্মোষ দেখা দিল । এমন কি জাহিলী যুগেও আমার এমন খটকা জাগেনি । আমার ভেতরে সৃষ্ট খটকা অবলোকন করে রাসুলুল্লাহ (ﷺ) আমার বুকে সজোরে আঘাত করলেন । ফলে আমি ঘর্মাক্ত হয়ে গেলাম এবং যেন আমি ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে মহা মহীয়ান আল্লাহর দিকে দেখছিলাম । নবী (ﷺ) আমাকে বললেন-, ওহে উবাই! আমার কাছে (জিবরাঈল (আঃ)-কে প্রেরণ করা হয়েছে যে, আমি যেন কুরআন এক হরফে তিলাওয়াত করি । আমি তখন তাঁর কাছে পূনরায় অনুরোধ করলাম আমার উম্মাতের জন্য সহজ করুন । দ্বিতীয়বার আমাকে বলা হল যে, দুই হরফে তা তিলাওয়াত করবে । তখন তাঁর কাছে আবার অনুরোধ করলাম, আমার উম্মাতের জন্য সহজ করে দিতে । তৃতীয়বার আমাকে বলা হল যে সাত হরফে তা তিলাওয়াত করবে এবং যত বার আপনাকে জবাব দিয়েছি তার প্রতিটির বদলে আপনার জন্য একটি সাওয়াল! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন । হে আল্লাহ ! আমার উম্মাতকে ক্ষমা করুন । আর তৃতীয় প্রার্থনাটি বিলম্বিত করে রেখিছি সে দিনের জন্য যে দিন সারা সৃষ্টি এমন কি ইবরাহীম (আঃ) ও আমার প্রতি আকৃষ্ট হবেন।[৫]

.

উবাই ইবন কা’ব (রা-) থেকে বর্ণিত যে নবী (ﷺ) বনূ গিফারের জলাভূমি (ডোবা)-র কাছে ছিলেন । উবাই (রা-) বলেন, তখন জিবরাঈল (আঃ) তাঁর নিকটে এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে আদেশ করেছেন যে আপনার উম্মাত এক ধরনের কুরআন পাঠ

করবে । তখন নবী (ﷺ) বললেন, আমি আল্লাহর কাছে তার মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি । আমার উম্মাততো এ হুকুম পালনে সমর্থ হবে না । পরে জিবরাঈল (আঃ) দ্বিতীয়বার তার কাছে আগমন করে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত দু'ধরনের কুরআন পাঠ করবে । নবী (ﷺ) বললেন, আমি আল্লাহর সকাশে তার মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি আমার উম্মাততো তা পালনে সমর্থ হবে না । তারপর তিনি তাঁর কাছে তৃতীয়বার এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত তিন হরফে কুরআন পাঠ করবে । নবী (ﷺ) বললেন, আমি আল্লাহর সমীপে তাঁর মার্জনা ও ক্ষমা প্রার্থনা করছি, আমার উম্মাত তো এটি পালনের সমর্থ রাখে না । তারপর জিবরাঈল (আঃ) চতূর্থ বার নবী (ﷺ) -এর কাছে এসে বললেন, আল্লাহ আপনাকে হুকুম করেছেন যে, আপনার উম্মাত সাত হরফে কুরআন পাঠ করবে এবং এর যে কোন হরফ ও ধরন অনুসারে তারা পাঠ করলে তা-ই যথার্থ হবে ।[৬]

.

আর এই কিরায়াতগুলো আমরা বিভিন্ন ইমামদের নামে চিনে থাকলে ও এর মূল সূত্র রাসুলুল্লাহ(ﷺ) পর্যন্ত পৌছে। উল্লেখ্য যে, স্বল্পসংখ্যক রাবী দ্বারা বর্ণনাকৃত(মুতাওয়াতির নয় এমন), কোনো অপরিচিত(গাইরি মাশহুর), মুনকাতি(বিচ্ছিন্ন) সনদে বর্ণিত, মাওদ্বু(জাল-বানোয়াট) সনদে বর্ণিত ও শায(বিরল) ধরনের কিরায়াত গ্রহনযোগ্য নয়। কিরায়াতের বিখ্যাত ইমামদের নাম নিম্নরুপঃ-

.

১। নাফিঈ ইবনু নুয়াইম(মৃ ১৬৯হি)

২। আসিম বিন নুজুদ(মৃ ১২৭হি)

৩। হামযাহ বিন হাবিব আল কুফি(মৃ ১৫৬হি)

৪। ইবনু আমির(মৃ ১১৮হি)

৫। আবুল হাসান কিসাঈ(মৃ ১৮৯হি)

৬। ইবনু কাছির (মৃ ১২০হি)

৭। আবু আমর ইবনু আলা(মৃ ১৫৪হি)

.

➫ সম্ভাব্য প্রশ্নঃ-

.

○ এক্, কুরআন যদি সাত হরফেই হয়ে থাকে তাহলে লাওহে মাহফুজে কোন হরফের কুরআন সংরক্ষিত আছে?

● উত্তরঃ এর জবাব হাদিসেই আছে। রাসূলুল্লাহ্(ﷺ) বলেছেন, জিবরাঈল (আ) আমাকে একভাবে কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। পরবর্তীতে রাসুলুল্লাহ(ﷺ) মানুষের সুবিধার জন্যে জিবরাঈল(আ) এর কাছে অন্যান্য হরফে শিখাতে অনুরোধ করেছেন তারপর জিবরাঈল(আ) সাত হরফে কুরআন শিখান। অর্থাৎ, কুরআন প্রথমে যেভাবে নাযিল হয়েছিলো সেই কুরআনই লাওহে মাহফুজে সংরক্ষন করা আছে। আল্লাহু আ'লাম।

.

○ দুই, কুরআন সংরক্ষনের দায়িত্ব তো আল্লাহই নিয়েছেন তাহলে এই কুরআন নিয়ে এত মতপার্থক্য কেন হবে?

● উত্তরঃ এগুলো এমন কোনো মতপার্থক্য মোটেই নয় যে এই কারণে কুরআনের চিরন্তন সত্যে একটুও ফাঁটল ধরেছে। আর পূর্বেই পরিষ্কার করা হয়েছে যে এই মতপার্থক্যের ধরন কেমন। এই কিরাআতের বা আহরুফের পার্থক্যের কারণে মোটেই

কুরআনকে প্রশ্নবিদ্ধ করা যায়না। বরং তখন থেকে আজ পর্যন্ত কুরআন টিকে আছে কোটি কোটি হাফেজ একে বুকে ধারন করে আজ ও জমীনের বুকে হাঁটে যার মধ্যে আরবীর প্রাথমিক জ্ঞান ও নেই এমন ও অনেকে আছেন। তবুও তারা সম্পূর্ণ বিদেশি ভাষার একটি বইয়ের আগাগোঁড়া মুখস্থ করে রেখেছেন ও যুগ পরম্পরায় এটি একমাত্র এবং একমাত্র কুরআনেরই মুযিযাহ যার সামান্যতম প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার মত আর কোনো বই এই ধরনীর বুকে পাওয়া যাবেনা। নিদর্শন তো ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছেই তবে নেওয়ার মত কেউ কি আছে?

---

[১] Arabic-English Dictionary for Quranic Usage, p-201; কুরআনের অর্থ বুঝার সহজ অভিধান, আবদুল হালীম, পৃ-৬৫(IslamHouse.com.bd)

[২] সহীহ বুখারী,(ইফা), ফাযায়িলুল কুরআন, ৮/৩৪০, হা-৪৬২৫

[৩] https://islamqa.info/ar/5142

[৪] সহীহ বুখারী, ফাযায়িলুল কুরআন

[৫] সহীহ মুসলিম,(ইফা), ৩/১৬৭, হা-১৭৮১

[৬] ঐ, হা-১৭৮৩

১৬৩

একটি লেজুড়বৃত্তির ব্যবচ্ছেদ

-মোঃ মশিউর রহমান

লেজ।

আরও স্পেসিফিক্যালি বললে, বঙ্গদেশীয় চারু-কারুকলা ব্যাকগ্রাউন্ডের বিজ্ঞানমনস্করা নিজেদের পরিচয় দেবার সময় যে প্রাণীর বংশধর হবার দাবী করে- সেই বানরের লেজ।
এই লেজ নিয়ে সেসব সাহিত্যকলার বিজ্ঞানীদের লেজুড়বৃত্তিটা বেশ দেখার মত।
.
ইন্টারফেইল কিংবা চারুকলা "ল্যাবোরেটরি"-তে বিজ্ঞান করা মুক্তমনারা যখন নিজেদেরকে বানরের উত্তরসূরী প্রমাণ করার চেষ্টা করে, তখন তাদেরকে বলতে দেখা যায়- যে এই লেজই নাকি তাদের গেছো পূর্বপুরুষদের সাথে বিদ্যমান সেতুবন্ধনের অন্যতম চিহ্নবিশেষ।
.
তারা বলে যে বিবর্তনের প্রবাহে মানুষের লেজ ব্যবহারের প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার ফলে তাদের পূর্বপুরুষদের লেজ থাকলেও বর্তমানে মানুষের লেজ নেই,
তবে সেই লেজের কিছু চিহ্ন নাকি আজও মানুষেরা দেহে বয়ে নিয়ে বেড়ায়।
.
এই দাবির স্বপক্ষে যখন প্রমাণ চাওয়া হয়, তখন বড়জোর পাওয়া যায় একটা মানবশিশুর দেহে "লেজ"সহ ইটারমিডিয়েট লেভেলের বইয়ের (উচ্চ মাধ্যমিক প্রাণীবিজ্ঞান by গাজী আজমল ফর এক্সাম্পল) একটা ছবি,
নয়তো "১৯০১" সালের তিনটি সাদাকালো ও একটি হাতে আঁকা ছবি, এবং "লেজ" দেখতে পাওয়া গেছে -শুধুমাত্র এটুকুই বলা একটা পেজ,
আর নাহলে তিনটি “ caudal appendage ” -এর "১৯৮০" সালে প্রকাশিত কেস রিপোর্ট/স্টাডি।
.
ব্যস, এটুকুই।
ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এগুলোই বারংবার চোখের সামনে দোলা খেতে থাকে।
এই একই জিনিস বারবার পুরনো কাসুন্দির মত ব্যবহার করে শেয়াল, প্যাঁচা, ভাল্লুক ইত্যাদির মুখোশ নিয়ে মঙ্গল কামনা করতে বের হওয়া প্রবল বিজ্ঞানমনস্ক সম্প্রদায় প্রমাণ করতে চায়- যে ব্যবহার ফুরিয়ে গেলেও পূর্বপুরুষের সেই হারানো বৈশিষ্ট্য লেজ এখনো মাঝেমধ্যে উত্তরসূরী মানুষের মাঝে দেখা যায়।
অতএব, জয়তু ডারউইন!!
.
আর এর স্বপক্ষে দেখা যায়,
মেরুদন্ডের কক্কিক্স নামক বোন বা হাড়কে "টেইলবোন",
এবং ভ্রূণাবস্থায় দেখা যাওয়া একটি "লেজ"সদৃশ স্ট্রাকচারকে "জার্মানির ডারউইন" আর্নস্ট হেকেল-এর বলা এক ভ্রান্ত, fraudulent মতবাদের অংশ হিসেবে "ভ্রূণীয় লেজ" বলে চালিয়ে দেবার ব্যাপক তোড়জোড়।

.
কিন্তু এর পেছনের গল্প পেছনেই রয়ে যায়।
কিংবা হয়তোবা মুক্তমনের দাবীদারেরা ইচ্ছাকৃতভাবেই পেছনে রেখে দেয়, পাছে তাদের মুক্তমনের সংকীর্ণতা প্রকাশ পেয়ে যায় -আল্লাহু 'আলাম।
তো আসা যাক সে কথায় ইন শা আল্লাহ।

.

.

জন্মের পরের তথাকথিত যে "লেজ" নিয়ে ব্যাপক উন্মাদনা, তার কারেক্ট টার্মটা হলো "caudal (lower back) appendage", যার সাথে "টেইলবোন" নামে প্রচারের চেষ্টা করা কক্কিজিয়াল বোনস বা কক্কিক্সের কোন সম্পর্কই নেই -যদিও বিবর্তনবাদীরা তা জোর করে স্থাপন করতে চায়।

.

এই caudal appendage গুলো ১০০০ জনে মাত্র ১-৩ জনে দেখা যায়, যার অধিকাংশই কেবলমাত্র স্কিন আর ফ্যাটি টিস্যুতে গঠিত।

.

আধুনিক এম্ব্রায়োলজির ভাষায়-

.

❝ Rarely a caudal appendage is found at birth. Such structures are of varied origin (some are teratomata); they practically never contain skeletal elements and are in no sense "tails". ❞
[O ' Rahilly , R. and Müller, F . , Human Embryology & Teratology , Second Edition , Wiley - Liss , 1996; in between pages 93-95]
[বইটির মোস্ট রিসেন্ট এডিশন হলো থার্ড এডিশন,মে ২০০১]

.

.

তো কক্কিজিয়াল বোনসগুলো/কক্কিক্সকে "টেইলবোন" নামে চালিয়ে দেওয়ার যে পাঁয়তারা করা হয়, তার ফুলিয়ে-ফাঁপিয়ে প্রচারের কারণে দেখা যায়,
যে অতীতে কিছু "নাদান" সার্জনরা কোন কারণ ছাড়াই, শুদ্ধ বাংলায় "হুদামুদাই" মানুষের কক্কিক্সকে বের করে ফেলতো।
ঠিক যেমনটা আগে কোন বাছবিচার ছাড়াই টনসিলের ক্ষেত্রে করা হতো।

.

কিন্তু পরবর্তীতে ঠিকই জানা গেল যে টনসিলের ফ্যারিঞ্জিয়াল রিজিওনে গুরুত্বপূর্ণ "চৌকিদারী"-র ভূমিকা আছে, ডানেবাঁয়ে না তাকায়ে তাকে কেটে ফেললে শক্ত কন্সিকোয়েন্স আছে; তো কক্কিক্সই বা বাদ যাবে কেন?

.

ফলাফল-
অকেজো, অকর্মণ্য বলে বের করে ফেলা কক্কিক্সের পেশেন্টের মারাত্মক সমস্যায় ভোগা।
যেমন উঠতে-বসতে কষ্ট, জন্মদানকালীন সমস্যা এমনকি সময়মত টয়লেটে না যেতে পারারও সমস্যা।

.

যার ফলে বর্তমানে কেবল এবং কেবলমাত্র এক্সট্রিম লাস্ট রিজর্ট হিসেবেই "কক্কিজেকটমী" করা হয়,
কিন্তু তখনও ক্রুশাল মাসলগুলো অন্যকোথাও অ্যাটাচ করার চেষ্টা করা হয়।

.

.

তবে এইসবের ভিত্তি হিসেবে যা ছড়ানো হয়, তা হলো সেই তথাকথিত "ভ্রূণীয় লেজ", যা প্রকৃতপক্ষে কোন "লেজ"-এর জাতেও পড়ে না।

.

এই "লেজ" নাম দেওয়ার চেষ্টা করা স্ট্রাকচার বা গঠনের সঠিক টার্ম হলো "caudal eminence", যার অভ্যন্তরে শুধুমাত্র নিউরাল টিউব বা নালীই থাকে, আর কিছু না।
আর তা সাধারণত ৫ সপ্তাহ থেকে কমতে থাকে, আর কখনো বা যদি জন্মের পর তা থাকে (হাজারে যা মাত্র ১-৩ জন), তাহলে হয় তা নিউরাল টিউবের "অকালপক্ক" বৃদ্ধির কারণে, আর না হলে সাথে প্যাকেজ হিসেবে "spina bifida" নামক মেডিকেল কন্ডিশনযুক্ত হয়ে থাকে।

.

অর্থাৎ জন্মের পর "লেজ" জাতীয় যা কিছুই দেখা যায়, সর্বক্ষেত্রেই তা অ্যানাটমিকাল অ্যানোমালি বলে সংজ্ঞায়িত করা হয় -কিন্তু কখনোই এই বঙ্গদেশের মত তাকে "লেজ" বলে চালিয়ে দেওয়া হয় না।

.

উপরোল্লিখিত এম্ব্রায়োলজীর টেক্সটবুকের ভাষায়-

.

❝ Supernumerary vertebral centra that would later degenerate are not present and hence no tail exists ❞
[page 336]
এবং,

.

❝ the caudal tip of the trunk appears particularly tapered at 5 weeks , because it contains merely neural tube , but is in no sense a (future) vertebrated " tail " . ❞
[in between pages 331-332]

.

.

তো এখন এসমস্ত তথ্যপ্রমাণাদির মুখে গাঁইগুঁই করে বলা হলো যে-
"আচ্ছা ঠিক আছে।
তবে কথা হলো লেজ নিয়ে জন্মানো এক তৃতীয়াংশেরও কম শিশুদের থাকে সিউডো টেইল যা কিনা লেজ নয়। বাট বাকিরা ট্রু লেজ নিয়ে জন্মায় যাতে নিউরাল টিউবের সাথে কশেরুকা, তরুনাস্থি, ঐচ্ছিক পেশী ইত্যাদি থাকে এবং পেশী সংকোচনের মাধ্যমে লেজ নাড়ানোর নজির ও আছে।"

.

.

ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে জন্মের পর তথাকথিত "লেজ" দেখতে পাওয়া যায় ১০০০ জনে মাত্র ১-৩ জনে।
সেই ১-৩ জনের আবার // এক তৃতীয়াংশেরও কম শিশুদের থাকে সিউডো টেইল যা কিনা লেজ নয়। // ,
সেখান থেকে আবার বাদবাকি কতজনই বা থাকে, তারা নাকি আবার // ট্রু লেজ নিয়ে জন্মায় যাতে নিউরাল টিউবের সাথে কশেরুকা, তরুনাস্থি, ঐচ্ছিক পেশী ইত্যাদি থাকে এবং পেশী সংকোচনের মাধ্যমে লেজ নাড়ানোর নজিরও আছে। // ।

.

সে কি অভূতপূর্ব হিসাব!
সত্যিই, শিহরিত হয়ে উঠতে হয়।

তবে শিহরণকে আপাতত শিকেয় তুলে রেখে উপরিউক্ত বক্তব্যের সত্যতা যাচাই করে দেখা যাক।

.

যদিও যে "লেজ" নাড়ানোর নজির থাকার কথা দাবী করা হয়েছে তা জন্মের পর দেখতে পাওয়া caudal appendage -এর ব্যাপারে, তবুও প্রথমে ভ্রূণাবস্থায় দেখা যাওয়া caudal eminence -এর কথা বলা যাক।

কারণে অন্তরে ব্যধিগ্রস্থদের জন্য কোনরকমের ফাঁকফোঁকর না রাখাই ভাল।

.

তো according to the same embryology textbook mentioned before-

.

❝ Between 4 and 7 weeks the caudalmost part of the trunk tapers, probably as a result of a precocious growth of the neural tube .
The proximal part of the projection contains some coccygeal vertebrae , whereas the distal portion , although it contains neural tube , is non-vertebrated. ❞
[page 93]

.

অর্থাৎ ভ্রূণাবস্থায় ভ্রূণের দূরবর্তী পৃষ্ঠদেশীয় অংশটি যে ক্রমশ সরু হয়ে আসে, তা ঘটে নিউরাল টিউবের "অকালপক্ক" বৃদ্ধির কারণে।
এই বর্ধিত অংশটির কাছের অংশে কিছু কক্কিজিয়াল ভার্টিব্রি থাকে, যেখানে দূরবর্তী অংশে নিউরাল নালী থাকে,কিন্তু তবুও তা নন-ভার্টিব্রেটেড হয়।

.

অর্থাৎ এই তথাকথিত "ভ্রূণীয় লেজ"ও বোন বা হাড়বিহীন হয়।

.

এখন প্রশ্ন হলো,
আজতক এমন কোনো মেরুদন্ডী প্রানীর লেজের হদিস কি পাওয়া গেছে, যা হাড়বিহীন হয়ে থাকে?
কীভাবে সম্ভব এজাতীয় কথাবার্তা?

.

এতেও যদি মন না ভরে, এবং caudal eminence -কে ভাঙা রেকর্ডের মত "ভ্রূণীয় লেজ" বলে চালিয়ে দিয়ে জোচ্চুরির চেষ্টা জারি থাকে,
তাহলে বলা যায় ২০০৪ সালে "Cell Tissues Organs" জার্নালে প্রকাশিত হওয়া ৫২টি ভিন্ন ভিন্ন হিউম্যান এম্ব্রায়ো নিয়ে ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন স্টেজের উপর করা একটি গুরুত্বপূর্ণ স্টাডির কথা।

.

সেই স্টাডিটিতে যে সেটির অথোরেরা বলেন,
যে এই caudal eminence অংশটি মানবদেহে এমনকি কোন টেম্পোরারী "লেজ"-ও গঠন করে না -ভুলেও কি তা জানার চেষ্টা করা হয়েছে?

.

❝ The eminence produces the caudal part of the notochord and, after closure of the caudal neuropore, all caudal structures, but it does not produce even a temporaray "tail" in the human. ❞
[Müller F and O'Rahilly R., "The primitive streak, the caudal eminence and related structures in staged human embryos," Cells Tissues Organs. 177(1):2-20, 2004]

.

কোথায় গেল তাহলে সেই ঢাকঢোল পিটিয়ে প্রচার করা "ভ্রূণীয় লেজ"?

.

.

কেন Keith L. Moore, T. V. N. Persaud , Mark G. Torchia তাদের লেখা মেডিকেল টেক্সটবই "The Developing Human" -এ বলে বসে আছেন-

.

❝ All evidence of the // caudal eminence // has disappeared by the end of the eighth week. ❞

.

কিংবা আরও একটুখানি "অসহিষ্ণুতা" দেখিয়ে যদি সেই বইটিতেই তারা আরও কী বলেছেন তার উল্লেখ করি-

.

❝ Toward the end of fourth week, a long "tail-like" // caudal eminence // is a characteristic feature. ❞

.

.

"caudal eminence" is a characteristic feature -বুঝা গেল কিছু?
কেন বলা হলো না, "এম্ব্রায়োনিক টেইল" ইজ এ ক্যারেক্টারিস্টিক ফীচার?
জবাবটা ঠিক কী?

.

আর ঠিক এর উপরেই তো তাদেরই এই একই বইয়ে-
অষ্টম সপ্তাহের শেষ দিকে সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে যায় "caudal eminence", কোন "লেজ" না
-বলা আছে তাও উল্লেখিত আছে।
তাহলে?

.

কীভাবে কী?
how what?

.

আসলে ব্যাপারটা হলো চক্ষুদানে দৃষ্টিক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা -অন্ধ ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য,
নিজের চোখ নিজেই খুলে ফ্রিজে রেখে দেওয়া ব্যক্তির ক্ষেত্রে না।

.

.

যাই হোক, আলোচনায় ফেরা যাক।

.

এবার যদি লক্ষ্য করা যায় জন্মের পরে পাওয়া "লেজ"-এর প্রতি, তাহলে একটি এম্ব্রায়োলজীর টেক্সটবুকের ভাষায় বললে-

.

❝ Rarely a caudal appendage is found at birth. Such structures are of varied origin (some are teratomata); they practically never contain skeletal elements and are in no sense " tails. " Projections that contain skeletal elements are caused by a dorsal bending of the coccyx, do not contain more vertebrae than normal, and have nothing to do with " atavism ". ❞

[O ' Rahilly , R. and Müller, F . , Human Embryology & Teratology , Second Edition , Wiley - Liss , 1996; in between pages 93-95]

.

অর্থাৎ যে সমস্ত বর্ধিত অংশে স্কেলেটাল এলিমেন্টস থেকে থাকে, তা কক্কিক্সে ডর্সাল বেন্ডিঙের কারণে হয়ে থাকে।
কিন্তু তারপরেও তাতে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি ভার্টিব্রি থাকে না,
এবং যা "atavism" -অর্থাৎ পূর্বপুরুষের হারানো বৈশিষ্ট্য ফিরে পাওয়ার সাথে কোনরূপেই সম্পৃক্ত না।

.

কোথায় তাহলে সেই তথাকথিত "অরিজিনাল টেইল"-এর প্রমাণ?

.

যেখানে বলাই হয়েছে যে এতে কঙ্কালিক উপাদান থেকে থাকলেও তা স্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন হয় না,
বরং স্বাভাবিক কক্কিক্সই পৃষ্ঠদেশীয় বক্রতার কারণে সেরকম হয়ে থাকে,
এবং তা শুধু গোড়ার দিকেই থাকে, আগার দিকে বা পুরো প্রজেকশন জুড়ে থাকে না -তাহলে?

.

সে বস্তুটি "অরিজিনাল টেইল" হলো কী করে?

.

সামু, মুক্তমনা প্রভৃতি ব্লগে বসে বসে প্রবল মাত্রায় বিজ্ঞান করা যে সম্প্রদায় নিজেদেরকে বানরের বংশধর প্রমাণের চেষ্টায় কেবল গলার রগ কয়েক গুণ ফুলিয়ে এবং ত্যাঁড়া করে কেবলমাত্র অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করতেই সক্ষম,
তাদের চক্ষুকোটর নামক গর্তে কি ধরা পড়ে না, যে Journal of Neurosurgery-র একটি পেপারের মতে-

.

❝ In all reported cases, the vestigial human tail lacks bone, cartilage, notochord, and spinal chord. It is unique in this feature. ❞

[Roberto Spiegelmann, Edgardo Schinder, Mordejai Mintz, and Alexander Blakstein, "The human tail: a benign stigma", Journal of Neurosurgery, 63: 461-462 (1985)]

.

অথবা Journal of Child Neurology -এর ২০১৩-র একটি পেপারেও যা বলতে দেখা যায়-

.

❝ // True tails are boneless //, midline protrusion usually attached to the sacrococcygeal region and capable of spontaneous or reflex motion. They consist of normal skin, connective tissue, muscle, vessels, and nerves and are covered by skin. // Bone, cartilage, notochord, and spinal chord are lacking. // ❞

[Surasak Puvabanditsin, Eugene Garrow, Meera Joshi-Kale, and Rajeev Mehta, "A Gelatinous Human Tail With Lipomyelocele: Case Report," Journal of Child Neurology, 28(1) 124-127 (2013) (emphases

added).]

.

.

কোথায় তাহলে সেই তরুণাস্থি, অস্থি, ঐচ্ছিক পেশীসহ অরিজিনাল লেজ এবং তার পেশী সংকোচনের মাধ্যমে নাড়ানোর নজির?

.

যেখানে বলা হয়েছে যে যদি সাধারণ গঠন থেকে ভিন্ন হয়ে caudal appendage -এ স্কেলেটাল এলিমেন্টস থাকে, তাহলে তার কারণ হলো কক্কিক্সের পৃষ্ঠদেশীয় বক্রতার ফলে কিছু অংশ সেই ফ্লেশি/ মাংসল স্ট্রাকচারের গোড়ার দিকে অর্থাৎ sacrococcygeal region বা পৃষ্ঠপ্রাচীরের যে অংশে সেটি যুক্ত সেখান দিয়ে কক্কিক্সের কিছু অংশ ঢুকে থাকা/যাওয়া।

.

কিন্তু তবুও সেখানে সেই স্বাভাবিক সংখ্যক বোনসই থাকে, আর এমনকি স্পাইনাল কর্ডের সোজা বরাবর থেকে সম্পূর্ণ সরে গিয়ে কর্ডের পাশ বরবার অবস্থিত হয়েও appendage হতে পারে -তাহলে?

.

এই তাহলে বঙ্গদেশের বিজ্ঞানের ঠিকাদারেদের "মুক্ত" মনের দশা?

.

.

কিংবা এছাড়াও যে The New England Journal of Medicine -এ "লেজ"-এর ওপরে দেওয়া একটা বিখ্যাত পেপারে বলা হয়েছে-
যে caudal appendage -এমনকি কোন প্রাথমিক ভার্টিব্রাল বা কশেরুকার অংশ থাকে না, এমন কোন প্রমাণ নেই যে কোনো caudal appendage -এ নিম্নপৃষ্ঠদেশীয় ভার্টিব্রি কিংবা অতিরিক্ত সংখ্যক ভার্টিব্রি আছে -সেটা?

.

❝ When the caudal appendage is critically examined, however, it is evident that // there are major morphologic differences between the caudal appendage and the tails of other vertebrates. //
First of all, the caudal appendage does not contain even rudimentary vertebral structures. There are no well-documented cases of caudal appendages containing caudal vertebrae or an increased number of vertebrae in the medical literature, and // there is no zoological precedent for a vertebral tail without caudal vertebrae. // ❞
[Fred Ledley, "Evolution and the Human Tail", The New England Journal of Medicine, 306 (20): 1212-1215 (May 20, 1982) (emphases added).]
-সেটা?

.

এই-ই তাহলে আর্টস, কমার্স, ললিতকলা ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে উঠে আসা বিজ্ঞানমনস্কদের "বিজ্ঞান করা"-র দশা?

.

.

প্রকৃতপক্ষে যখন লেজকাটা শেয়ালের মত নিজেরা পথভ্রষ্ট হওয়া এ সকল প্রাণীদের অন্যান্য স্বাভাবিক ভাইবোনদেরকেরকেও পথভ্রষ্ট করার এহেন প্রচেষ্টা ও কার্যকলাপ চোখে পড়ে,
তখন ভর্ৎসনার সাথে শুধু একটা কথাই মনে হয়-
যে কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের বলা "আবার তোরা মানুষ হ..." কথাটি তাহলে বোধহয় নিজের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে।

.

দিনশেষে, এদেরকে কেবলমাত্র রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) -এর মত করেই বলা যায়-

" সালামুন 'আলা মানিত্তাবা 'আল হুদা "

- সৎপথ অবলম্বনকারীদের প্রতি শান্তি

১৬৪

কেমন ছিলেন তিনি? (নবী (ﷺ) এর জীবনের বিভিন্ন দিক)

-শিহাব আহমেদ তুহিন

একজন মানুষকে দূর থেকে দেখলে অসাধারণ মনে হয়। ভুলের উর্ধ্বে মনে হয়। দূরত্ব যত কমে, মানবীয় দূর্বলতা ততো প্রকাশ পায়। কখনো কখনো ভেতরের কদর্য রূপও প্রকাশ পায়, যেটা হয়তো দূর থেকে আমরা চিন্তাও করতে পারি না। এ কারণেই একজন মানুষের ভেতর ও বাহিরের আসল রূপ সবচেয়ে ভালোভাবে জানতে পারে তার জীবনসঙ্গিনী। সে কি ডা. জেকিল না মি. হাইড সেটাও তার স্ত্রীর চেয়ে ভালো কেউই বলতে পারবে না। রাসূল (সা) তাই বলতেন, “তোমাদের মধ্যে সেই তো সবচেয়ে উত্তম, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম। আমি আমার স্ত্রীদের নিকট সবচেয়ে উত্তম।”

.

রাসূল (সা) যে তাঁর স্ত্রীদের নিকট সবচেয়ে উত্তম ছিলেন তা স্ত্রীদের সাথে তাঁর উষ্ণ ও মমতাপূর্ণ আচরণই বলে দেয়। প্রতিদিন সকালে তিনি ফজরের পর স্ত্রীদের সাথে দেখা করতেন। তাদের খোঁজ-খবর নিতেন। আসরের পর তাদের সাথে আরেকবার দেখা করতেন। সে সময়ে কখনো তাদের জড়িয়ে ধরতেন, কখনো বা চুমু খেতেন।

.

স্ত্রীর মর্যাদা দিয়েছিলেন সর্বমোট এগারোজনকে। এর মধ্যে দু'জন তাঁর জীবদ্দশাতেই মারা গিয়েছিলেন। বাকি নয় জন স্ত্রীদের সাথে তিনি পালাক্রমে থাকতেন। এ ব্যাপারে কখনো অবিচার করতেন না। একজন স্ত্রী প্রতি নয় দিন পর তাঁর সাথে থাকার সুযোগ পেতেন। যদি নয় দিন পর পর তিনি স্ত্রীদের সাথে দেখা করতেন, তবে তা তাদের জন্য অনেক কষ্টকর হতো। শূন্যতাবোধ যাতে সৃষ্টি না হয়, সেজন্য তিনি প্রতিদিনই দু'বার করে তাদের সাথে দেখা করতেন। স্ত্রীরা তাই ভাবতেন, “রাসূল (সা) তো সবসময় আমাদের সাথেই আছেন।” এখনকার সময়ে আমরা স্ত্রীদের অনুভূতির দিকে একেবারেই মনোযোগ দেই না। সারাদিন কাজ নিয়ে পড়ে থাকি। রাতের বেলা বিছানায় শরীর এলিয়ে দেই। অথচ তথ্য-প্রযুক্তির এই যুগে আমি চাইলে কিন্তু সহজেই পারি তাকে আমার অনুভূতির কথা অফিসে বসেই জানাতে। কাজের ফাঁকে তাকে ছোট্ট করে একটা মেসেজ দিয়ে রাখতে পারি। ভালোবাসার কথা জানাতে পারি।

.

যখন তিনি নতুন কাউকে বিয়ে করতেন, তখন সব স্ত্রীদের সাথে দেখা করতেন। তিনি জানতেন, স্ত্রী হিসেবে তাদের পক্ষে এটা মেনে নেয়া কষ্টকর। তাই দেখা করে যেন তাদের জানিয়ে দিতেন, “হয়তো নতুন একজনকে বিয়ে করেছি, কিন্তু তোমাদের কিন্তু একটুও ভুলে যাইনি। কখনো ভুলে যাবও না।”

.

সবার প্রথমে তিনি বিয়ে করেন খাদিজা (রা)-কে। তখন তিনি পঁচিশ বছরের টগবগে যুবক। খাদিজা (রা) এর বয়স ছিল চল্লিশ বছর। খাদিজা (রা) এর সাথে একটানা পঁচিশ বছর ঘর করেছেন। এ সময়ে তিনি আর কাউকে বিয়ে করেননি। নিজের দাম্পত্য জীবনের দুই-তৃতীয়াংশই কেটেছে তাঁর খাদিজা (রা) এর সাথে। তাই আবেগের একটি বড় অংশ ছিল খাদিজা (রা)- কে ঘিরেই। সে ভালোবাসা মৃত্যুর পরেও শেষ হয়ে যায়নি। যখনই তাঁর সামনে খাদিজা (রা) এর কথা উল্লেখ করা হতো, তাঁর মুখ উজ্জ্বল হয়ে যেতো। তিনি অকপটে স্বীকার করতেন, “আল্লাহ্ তায়ালাই তাঁর (খাদিজার) প্রতি ভালোবাসা আমার অন্তরে ঢেলে দিয়েছেন।”

.

সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন আয়েশা (রা)-কে। এমনকি আয়েশা (রা)-ও ঈর্ষাকাতর হয়ে যেতেন বারবার রাসূল (সা) এর মুখে

খাদিজা (রা) এর প্রশংসা শুনে। একবার তো বলেই ফেললেন, "মনে হয় খাদিজা ছাড়া দুনিয়াতে কোন নারীই নেই।"

.

আরেকবার খাদিজা (রা) এর বোন হালাহ (রা) রাসূল (সা) এর সাথে দেখা করার অনুমতি চাইলেন। তাঁর কণ্ঠস্বর ছিল অনেকটা খাদিজা (রা) এর মতোই। সে কণ্ঠস্বর শুনে রাসূল (সা) এর খাদিজা (রা) এর কথা মনে পড়ে গেল। তিনি বললেন, "হালাহ হবে হয়তো।" আয়েশা (রা) ঈর্ষাকাতর হয়ে বললেন, "আপনি কুরাইশের সেই দাঁত পড়ে যাওয়া মহিলাকে এখনো স্মরণ করেন! সে তো অনেক আগেই মারা গিয়েছে। আর আল্লাহ্ তায়ালা আপনাকে তাঁর চেয়েও উত্তম কাউকে দান করেছেন।" রাসূল (সা) প্রচণ্ড রাগ করে জবাব দিলেন, "আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে তার চেয়ে উত্তম বদলা দেননি। যখন সবাই আমাকে মিথ্যাবাদী বলেছে, তখন সে আমাকে সত্যবাদী বলেছে। যখন সবাই আমাকে বঞ্চিত করেছে, তখন সে আমাকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছে। আর তার মাধ্যমেই আল্লাহ্ আমাকে সন্তান দান করেছেন।"

.

বদর যুদ্ধে রাসূল (সা) এর মেয়ে যয়নাবের (রা) স্বামী বন্দী হয়েছিলেন। যয়নাব তখন স্বামীর মুক্তিপণ হিসেবে গলার হার পাঠিয়েছিলেন। সে হার যয়নাব (রা) এর বিয়ের সময় খাদিজা (রা) নিজ গলা থেকে খুলে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) এ হার দেখে নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারলেন না। তাঁর চোখ পানিতে ভিজে গেলো। তিনি সাহাবীদের বললেন, "তোমরা যদি রাজি থাকো, তাহলে এ হার ফিরিয়ে দাও এবং বন্দীকে পণ ব্যতীতই বন্দীকে মুক্ত করে দাও।" যখনই কোন ছাগল জবাই করতেন, তখন খাদিজা (রা) এর স্মরণে কিছু মাংস তাঁর বান্ধবীদের উপহারস্বরূপ পাঠাতেন। যদি বান্ধবী না পেতেন, তবে মদিনার পথে পথে খাদিজা (রা) এর বান্ধবীদের খুঁজে বেড়াতেন। এমনকি যদি জানতেন, কেউ খাদিজা (রা)-কে পছন্দ করতো, তাকেও তিনি উপহার পাঠাতেন।

.

রাসূল (সা) ছিলেন ভীষণ রোমান্টিক একজন স্বামী। স্ত্রীদেরকে ভালোবাসার কথা অকপটে জানাতেন। রাতের বেলা আয়েশা (রা) কে নিয়ে ঘুরতে বের হতেন। হালকা গল্প করতেন। দু'জন একসাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করতেন। হেরে গেলে পরেরবার আয়েশা (রা)-কে হারিয়ে তার প্রতিশোধ নিতেন। আয়েশা (রা) পাত্রের যে দিক থেকে পান করতেন উনিও সেখান থেকে পান করতেন। আয়েশা (রা) হাড্ডির যে স্থান থেকে কামড় দিয়ে খেতেন, উনি সেই স্থানেই কামড় দিয়ে খেতেন। একবার হাবশিরা যুদ্ধাস্ত্র নিয়ে খেলছিল। রাসূল (সা), আয়েশা (রা)- কে চাদর দিয়ে ঢেকে দিলেন। তারপর আয়েশা (রা) সে খেলা দেখতে থাকেন রাসূল (সা) এর কাঁধ ও কানের মধ্যে দিয়ে। আয়েশা (রা) যে খেলা দেখা খুব উপভোগ করছিলেন তা কিন্তু না। তিনি দেখতে চাইলেন রাসূল (সা) কতোক্ষণ তার জন্য এভাবে দাঁড়িয়ে থাকেন। একসময় আয়েশা (রা)-ই ধৈর্য হারিয়ে চলে গেলেন।

.

আরেকবার আয়েশা (রা) তাকে বিশাল এক গল্প বলা শুরু করলেন। উনি ধৈর্য ধরে পুরো গল্পটা শুনে গেলেন। শুধু তাই না গল্প নিয়ে সুন্দর মন্তব্যও করলেন। মৃত্যুর ঠিক আগে আয়েশা (রা) এর ব্যবহার করা মিসওয়াক তিনি ব্যবহার করেছিলেন। দুজনের লালা এক হয়ে গিয়েছিল। আর আয়েশা (রা) এর কোলে মাথা রেখেই তিনি আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করেন।

.

স্ত্রীদের আদর করে ছোট ছোট নামে ডাকতেন তিনি। কখনো ভালোবেসে আলাদা একটা নামই দিয়ে দিতেন। আয়েশা (রা)-কে আদর করে ডাকতেন 'হুমাইয়ারা' (লাল-সুন্দরী) নামে। আয়েশা (রা) কখনোই মা হতে পারেননি। তাই যখন তার বোন একটি ছেলে জন্ম দিয়েছিলেন, তখন রাসূল (সা) বললেন, "ছেলেটার নাম হবে 'আব্দুল্লাহ'। আর আজ থেকে তুমি হচ্ছো 'উম্মে আব্দুল্লাহ' (আব্দুল্লাহর মা)।' সবাই এরপর থেকে আয়েশা (রা)-কে 'উম্মে আব্দুল্লাহ' নামেই ডাকত। অনেকেই তাদের স্ত্রীকে আদর করে 'ময়না-পাখি', 'জানু'- এসব নামে ডেকে থাকেন। তারা হয়তো জানেন না যে, নিজের অজান্তেই রাসূল (সা) এর একটি সুন্নাহ তারা অনুসরণ করছেন।

.

সাফিয়া (রা) ছিলেন খাটো গড়নের। তাই যখন তিনি বাহনে আরোহণ করতেন তখন রাসূল (সা) তাকে ঢেকে দিতেন। তারপর হাঁটু বিছিয়ে দিতেন। সাফিয়া (রা) সে হাঁটুতে পা দিয়ে বাহনে আরোহণ করতেন। প্রত্যেক স্ত্রীই তাঁর কাছে ছিলেন রাণীর মতো। একজন রাণী রাজার কাছ থেকে যতোটা মর্যাদা পায়, তাঁর স্ত্রীরা তার চেয়েও বেশি সম্মান পেতেন।

.

প্রিয়তমাদের অনুভূতির দিকেও রাসূল (সা) সবসময় সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। নিজের জীবনে দুঃখ-কষ্টের কোন শেষ ছিল না, তারপরেও স্ত্রীদের কষ্ট তাঁর চোখ এড়িয়ে যেতো না। একবার আয়েশা (রা) কে বললেন, "আয়েশা! তুমি কখন আমার উপর সন্তুষ্ট হও, আর কখন রাগ করো, আমি কিন্তু ঠিকই বুঝতে পারি।" আয়েশা (রা) অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, "কীভাবে আপনি তা বোঝেন?" রাসূল (সা) বললেন, "যখন আমার উপরে সন্তুষ্ট থাকো, তখন তুমি বলো, 'এমন নয় মুহাম্মদের রবের কসম।' আর যখন কোন কারণে রাগ করো, তখন বলো, 'এমন হয় ইব্রাহীমের রবের কসম।'

.

একবার সব স্ত্রীদের নিয়ে রাসূল (সা) ভ্রমণে বের হলেন। হঠাৎ করেই সাফিয়া (রা) এর উটটি অসুস্থ হয়ে বসে পড়ল। সাফিয়া (রা) এ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন। তখন রাসূল (সা) এসে তার চোখের জল নিজ হাত দিয়ে মুছে দিলেন।

.

বিদায় হজ্জের সময় তিনি লক্ষ্য করলেন আয়েশা (রা) কাঁদছেন। তিনি বুঝতে পারলেন, আয়েশা (রা) এর মাসিকের সময় শুরু হয়েছে। তাকে সান্তনা দিয়ে বললেন, "সকল নারীদের জন্যই আল্লাহ্ এটা নির্ধারিত করে দিয়েছেন। হজ্জ করতে যা করা প্রয়োজন তুমি তার সবই করো, শুধু তাওয়াফটা করো না।"

.

অনেক স্বামীই স্ত্রীদের মাসিক শুরু হলে তাদের অচ্ছ্যুৎ মনে করে দূরে দূরে থাকেন। রাসূল (সা) মোটেও এমন করতেন না। আয়েশা (রা) এর মাসিকের সময়েই তিনি তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন। সে অবস্থাতেই তিনি রাসূল (সা) এর চুল আঁচড়ে দিতেন। একরাতে তিনি মায়মুনা (রা) এর সাথে একই চাদরের নিচে শুয়ে ছিলেন। হঠাৎ মায়মুনা (রা) এর মাসিক শুরু হলে, তিনি দ্রুত উঠে পড়েন যাতে রাসূল (সা) এর পবিত্র দেহে রক্ত না লাগে। রাসূল (সা) সব বুঝতে পেরে তাকে ডেকে কাছে নিয়ে আসেন, দুজন আবার একই চাদরের নিচে শুয়ে থাকেন। স্ত্রীরা অসুস্থ হলে তিনি নিজে তাদের রুকিয়া করে দিতেন।

.

জীবনসঙ্গিনীদের কাজের বোঝা চাপিয়ে দিয়ে কষ্ট দিতেন না। নিজের কাজ নিজেই করতেন। নিজের জুতো নিজ হাতেই ঠিক করতেন, নিজের কাপড় নিজেই সেলাই করতেন, নিজেই নিজের কাপড় ধুতেন। ছাগলের দুধ দোয়াতেন। স্ত্রীদেরকে ঘরের কাজে সাহায্য করতেন। নবাব সাহেবের মতো পা তুলে শুধু স্ত্রীকে অর্ডারের পর অর্ডার দিয়ে যেতেন না। ঘন ঘন মিসওয়াক করতেন। সুগন্ধি ব্যবহার করতেন। শরীরে যাতে কোন দুর্গন্ধ না থাকে সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন।

.

কখনোই কোন নারীকে তিনি প্রহার করেননি। মানুষদেরকে স্ত্রীদের প্রতি সদয় হবার নির্দেশ দিতেন। বলতেন, "নারীদের সৃষ্টি করা হয়েছে পাজরের বাঁকা হাড় থেকে। যদি একেবারে সোজা করতে চাও, তাহলে কিন্তু ভেঙ্গে ফেলবে।" বিদায় হজ্জের ভাষণে তিনি পুরুষদেরকে নারীদের প্রতি সদাচারণের নির্দেশ দিয়ে গেছেন।

.

মক্কার কুরাইশ নারীরা ছিল স্বামীর প্রতি অনুগত। অপরদিকে, মদিনার নারীরা ছিল কিছুটা বিপ্লবী মনোভাবের। হিজরতের পর কুরাইশ নারীরা আনসার নারীদের সাথে মেলা-মেশা করেন। ফলে তাদের মধ্যেও প্রবল আত্নসম্মানবোধের উদয় হয়। এ অবস্থা দেখে রাসূল (সা) তার স্ত্রীদের সাথে কুরাইশ পুরুষদের মতো আচরণ করেননি, বরং একজন আনসার যেভাবে তার স্ত্রীদের সাথে আচরণ করতেন, তিনিও সেরকম আচরণ করতেন। সর্বোচ্চ সহনশীলতা দেখিয়েছেন তিনি। একবার তিনি আয়েশা (রা) এর ঘরে থাকাকালে সাফিয়া (রা) রান্না করে খাবার পাঠালেন। আয়েশা (রা) ঈর্ষাকাতর হয়ে সে পাত্র ভেঙ্গে ফেললেন। অনেক

পুরুষই এ ক্ষেত্রে ক্ষেপে যাবে। কিন্তু রাসূল (সা) রাগ করলেন না। নিজ হাতে ভাঙ্গা পাত্রের টুকরো কুড়াতে কুড়াতে ভৃত্যকে বললেন, "তোমাদের মায়ের (আয়েশার) ঈর্ষা এসে গেছে।"

.

আবার, রূপকথায় যেমন 'অতঃপর রাজা-রাণী একত্রে সুখে শান্তিতে বসবাস করিতে লাগিল'- এমন দেখা যায়, তাঁর জীবন তেমনও ছিল না। তাঁর স্ত্রীরা কখনো কখনো রাগ করে তাঁর সাথে সারাদিন কথা বলতেন না। তিনি সহ্য করতেন। একবার তিনিই রাগ করে এক মাস তাঁর স্ত্রীদের সাথে দেখা করেননি। কারো কোন আচরণে কষ্ট পেলে কখনোই উগ্রপন্থা অবলম্বন করতেন না। যে স্ত্রীর প্রতি মনোক্ষুন্ন হতেন, তার সাথে কথা বলা কমিয়ে দিতেন। হাসি-ঠাট্টা করা কমিয়ে দিতেন। একসময় সেই স্ত্রীই নিজের ভুল বুঝতে পারতেন। তাঁর কাছে ক্ষমা চাইতেন।

.

স্ত্রীদের প্রতি আচরণে পক্ষপাতিত্ব করতেন না। একবার আয়েশা (রা) সওদা (রা) এর গালে খাবার মাখিয়ে দিয়েছিলেন। রাসূল (সা) হাসতে হাসতে সওদা (রা)-কে বললেন, তিনি যাতে আয়েশা (রা) এর গালে খাবার মাখিয়ে দেন। দুই সতীনের গালে খাবার মাখামাখি হয়ে একাকার হলো। যয়নাব (রা) একবার আয়েশা (রা)- কে কড়া কথা শোনালে, আয়েশা (রা) তার যথাযথ জবাব দেন। রাসূল (সা) তখন আয়েশা (রা) এর পক্ষ নেন। আবার আয়েশা (রা) যখন সাফিয়া (রা) এর খাটো অবয়ব নিয়ে তির্যক মন্তব্য করেছিলেন, তখন তিনি ঠিকই সাফিয়া (রা) এর পক্ষ নিয়েছিলেন। আয়েশা (রা) কে সাবধান করে বলেছিলেন, "তুমি এমন কথা বলেছো, যেটা সমুদ্রে নিক্ষেপ করলে গোটা সমুদ্রের পানি দূষিত হয়ে যেতো।"

.

একদিন ঘরে এসে দেখলেন সাফিয়া (রা) কাঁদছেন। কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন, হাফসা (রা), সাফিয়া (রা)-কে 'ইহুদীর মেয়ে' বলেছেন। তিনি সাফিয়া (রা) কে সান্তনা দিয়ে বললেন, "তুমি একজন নবীর (হারুনের) কন্যা, একজন নবী (মূসা) তোমার চাচা, আরেকজন নবী তোমার স্বামী। কীভাবে সে (হাফসা) তোমার থেকে উত্তম হয়?"

.

স্ত্রীদের হাতে কলমে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন। রমজানের শেষ দশ দিনের রাতে সব স্ত্রীদের ঘুম থেকে জাগিয়ে দিতেন। আল্লাহর ইবাদত করতে বলতেন। আয়েশা (রা) কে বলতেন, "একটি খেজুর দিয়ে হলেও আগুন থেকে বাঁচো।" আয়েশা (রা)- কে ছোট ছোট গুনাহের ব্যাপারে সাবধান করে দিতেন। আবার তাঁর স্ত্রীরা যাতে ইবাদতে উগ্রপন্থায় চলে না যায়, সেদিকেও খেয়াল করতেন।

.

সুযোগ পেলেই স্ত্রীদের সাথে হাসি-তামাশা করতেন। ছোটবেলা আয়েশা (রা) পুতুল নিয়ে খেলতেন। রাসূল (সা) তার একটি পুতুল দেখিয়ে বললেন, 'এটা কী?' আয়েশা (রা) জবাব দিলেন, 'ঘোড়া।' রাসূল (সা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, 'ঘোড়ার মধ্যে এ দুটি কী?' আয়েশা (রা) বললেন, 'এটা হচ্ছে ঘোড়ার ডানা।' রাসূল (সা) কৌতুক করে বললেন, 'ঘোড়ার আবার দুইটা ডানাও রয়েছে?' আয়েশা (রা) কম যান কীসে? সেই বয়সেই তিনি জবাব দিলেন, 'বারে! আপনি কি জানেন না যে, সুলাইমান (আ) এর ঘোড়ার দুইটা পাখা ছিল।' আয়েশা (রা) এর জবাব শুনে রাসূল (সা) এমনভাবে হাসলেন যে, তাঁর দাঁতের মাড়ি প্রকাশ পেয়ে গেলো।

.

আরেকদিন ঘরে এসে দেখলেন আয়েশা (রা) মাথা ব্যাথায় অতিষ্ঠ হয়ে বলছেন, "হায়! মাথা ব্যাথা।" রাসূল (সা) মজা করে বললেন, "আয়েশা! বরং আমার মাথায় ব্যথা হয়েছে। তোমার কোন সমস্যা নেই। তুমি যদি আমার পূর্বে মারা যাও তবে আমি তোমার পাশে থাকব, তোমাকে গোসল দিব, তোমাকে কাফন পরাব এবং তোমার জানাযার সলাত আদায় করব।" আয়েশা (রা) বললেন, "(হু! আমি মারা যাই) আর সে রাতেই আপনি আমার ঘরে অন্য বিবিকে নিয়ে থাকেন।" জবাব শুনে রাসূল (সা) হেসে ফেললেন।

.

রাসূল (সা) এর জীবনাদর্শে অনুপ্রাণিত হয়েই উমার (রা) এর মতো কঠোর স্বভাবের মানুষ পর্যন্ত বলেছিলেন, “একজন মানুষের উচিত তার স্ত্রীর সাথে শিশুর মতো খেলা করা। আর যখন প্রয়োজন তখন বাইরে আসল পুরুষের মতো আচরণ করা।”

.

.

রাসূল (সা) ছিলেন স্বামী হিসেবে পৃথিবীর সকল স্বামীর রোল-মডেল। তাঁর স্ত্রীরাই সে কথার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন। আয়েশা (রা) তাই তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলতেন, “কেন আমার মতো একজন নারী, আপনার মতো একজন পুরুষকে নিয়ে আত্মসম্মানবোধ করবে না?” সাফিয়া (রা) নির্দ্বিধায় স্বীকার করেছেন,.
“আমি আল্লাহর রাসূলের চেয়ে উত্তম আচরণের কোন ব্যক্তিকে দেখিনি।”

শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ এর “كَيف عَـاملهُم صلى الله عليه وسلم” (Interactions Of The Greatest Leader) গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা।

১৬৫

সন্ধানী ২

-‘হুজুর হয়ে’

কাপড় মেলতে মেলতে মেয়ের দিকে তাকালেন কল্যাণী দেবী। প্রতিদিন সকালেই ছাদে বসে বেশ কিছুক্ষণ মেডিটেশন করে সন্ধানী। ভালোই লাগে কল্যাণী দেবীর কাছে। ঠাকুরের মূর্তির সামনে যদিও বসে না সে। তারপরও এই যুগে ধর্মকর্ম করাটাই বা কম কীসে? ভার্সিটির ছেলেমেয়েগুলোর আজকাল যা অবস্থা! সে তুলনায় ঈশ্বর কত ভালো রেখেছেন তাঁর মেয়েটাকে। কল্যাণী টেবিলে নাস্তা আনতে আনতেই ছাদ থেকে নেমে এলো সন্ধানী।

.

"হ্যাঁ রে, সোনু! ধ্যান করা শেষ হলো?" খুনসুটির মতো বললেন কল্যাণী। জবাবে কিছু না বলে শুধু হাসি দিলো সন্ধানী। চেয়ারে বসে চোখ বন্ধ করে কল্যানীর রান্না করা সব্জির ঘ্রাণ নিলো। তারপর বললো, "মা, মা! এরপর থেকে সব্জিটাও আমি রান্না করি?"

.

সন্ধানীর বানানো রুটিগুলো থেকে কয়েকটা তার সামনে প্লেটে রাখতে রাখতে কল্যাণী বললেন, "বানাস। কদিন পর স্বামীর সংসারে যাবি। শুধু রুটি বেললে হবে? তরকারি রান্নাতেও হাতটা পাকিয়ে নে এখন থেকে।"

.

"উফফ, মা--!"

.

"হ্যাঁ হ্যাঁ, বুঝেছি। পড়ালেখা শেষ করবি, চাকরি করবি, নিজের পায়ে দাঁড়াবি, তারপর বিয়ে, তাই তো? ওটাই বললাম। তখন তো স্বামীর সংসারে যাবিই। নাকি?"

.

"মনে থাকে যেন, হ্যাঁ!"

.

"তা সোনু, একটা কথা বল দেখি। তুই ধ্যান করার সময় ঈশ্বরের কোন অবতারের কথা ভাবিস?"

.

"কোন অবতারের কথা ভাববো, মা? আমি তো প্রতিমার সামনে বসি না।"

.

"আহা, সেজন্যই তো বলছি। ঋষি-সন্ন্যাসীদের মতো করে নিরাকার ব্রহ্মার পূজোয় মন লাগাতে পারিস তুই?"

.

"একটু একটু চেষ্টা করি, মা।"

.

"নাকি সূর্যদেবের আরাধনা করিস?"

.

চুপ করে নাস্তা করতে লাগলো সন্ধানী। কল্যাণী সাহস দেয়ার স্বরে বললেন, "আরে আমাকে বলতে সমস্যা কী রে? ভগবান তাঁর সৃষ্টির সবকিছুতে ছড়িয়ে আছেন।"

.

সন্ধানী জবাব দিলো, "যা অস্ত যায়, তাকে আমার পছন্দ নয়, মা।"

.

"ওও বাবা! মেয়ে তো আমার সত্যিই ঋষিদের মতো কথা বলে আজ! যাক গে। তুই তোর মতো কর, আমার সমস্যা নেই। খালি যেন নাস্তিকদের মতো হয়ে যাস নে। বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌহদ্দি মাড়াই নি বটে। কিন্তু ওখানকার মানুষগুলো যে কেমন অবিশ্বাসী, তা কিন্তু আমি খুব জানি, হ্যাঁ!"

.

সন্ধানী তার মায়ের হাতটা বাঁ হাতে নিয়ে বললো, "তুমি কিচ্ছু ভেবো না, মা। আমায় নিয়ে তোমার সে ভয় করতে হবে না।"

.

আশ্বস্ত হওয়ার হাসি হাসলেন কল্যাণী। দুজন নীরবে খেলেন কিছুক্ষণ। তারপর সন্ধানী বললো, "আচ্ছা মা, সর্ব ধর্ম তো সত্য তাই না?"

.

"অবশ্যই," কল্যাণী দেবীর জবাব, "ঈশ্বর একজনই। তাঁর কাছে পৌঁছানোর পথ একেকজনের একেকরকম। সবই তাঁর কাছে গিয়েই শেষ হয়।"

.

"তাই বলে এত পার্থক্য? কোথাও গোহত্যা পাপ, কোথাও গরু কাটা উৎসব। কেউ প্রতিমাকে গড়প্রণাম করে, তো কেউ মূর্তি ভাঙতে পারলে বাঁচে। ঈশ্বর এত এপ্রিশিয়েটিভ কেন?"

.

"আরে পাগলী! তুইই তো আমাকে দেখালি না যে ইংরেজিতে ছয় লিখে সেটাকে উল্টে দেখলেই নয় হয়ে যায়? মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি আলাদা হয় রে, মা। কেউ না হয় গাভী জবাই করে গরীবদের মাংস বিলিয়েই খুশি হয়। বিশ্বাস কর, ঈশ্বরের তাতে কোনো আপত্তি নেই।"

.

"ঈশ্বর তো অমন নয়-ছয় হওয়ার কথা নয়, মা। আচ্ছা আমাকে বোঝাও তো, সূর্যকে প্রণাম করলে তোমার আপত্তি নেই। কারণ ভগবান তাঁর সৃষ্টির মাঝে বিরাজ করেন। আমি যদি এখন সন্ত্রাসী বদরুলকে প্রণাম করি? তার ভেতর কি ভগবান নেই?"

.

মাথায় হাত দিয়ে কল্যাণী বললেন, "আরে অত কঠিন কথা আমার মাথায় ঢোকে না রে, সোনু। বুড়ো বয়সে আমার মাথাটা খাবি নাকি?"

.

সন্ধানী দ্রুত সামলে নিয়ে বললো, "না, না। মানে মোট কথা হলো স্রষ্টা আর সৃষ্টি একই সত্ত্বা হতে পারে না। এটাই বললাম আরকি।" দ্রুত কথা শেষ করে চুপচাপ খেতে লাগলো সন্ধানী। বেশি বিরক্ত করে ফেলেছে মা-কে।

.

বাসন কোসন ধুতে ধুতে কল্যাণী আবার কথা শুরু করলেন। মাঝে মাঝে কঠিন লাগলেও মেয়ের সাথে কথোপকথন এনজয় করেন তিনি। "হ্যাঁ রে, সোনু। তুই যে আজকাল পালা পার্বণেও যোগ দিস না! মূর্তিপূজো না করলি, ভাইবোনগুলোর সাথে একটু মজা তো করতে পারিস, নাকি?"

.

"করিই তো, মা।" রান্নাঘরের মেঝে ঝাড়ু দিতে দিতে বললো সন্ধানী, "কোনো পূজোয় কাউকে গিফট দিতে বাকি রাখি আমি?"

.

"তা রাখিস না। কিন্তু নিজেও তো একটু আনন্দ করতে পারিস। ঢাকের বাড়ি শুনলে আমার এ বয়সেই মনপ্রাণ দুলে উঠে। আর তুই কিনা এককোণায় গুটিয়ে যাস। ইন্দ্র সেদিন দুঃখ করে আমাকে বললো, দেখো তো কাকী! দোলযাত্রা চলে গেলো। আর

আমার বোনটার গালে একটু রঙ দিতে পারলাম না।"

.

ইন্দ্রের নাম শুনতেই ঘৃণায় গা রি রি করে উঠলো সন্ধানীর। কিছুক্ষণ কথা না বলে চুপ রইলো সে। ধোয়া বাসনগুলো সাজিয়ে রাখতে রাখতে বললো, "আচ্ছা মা, তোমার কি মনে হয় না যে মূর্তিপূজা আর নির্লজ্জতা দুই বোনের মতো হাত ধরে হাঁটে?"

.

"কী বলতে চাস?" ভ্রু কোঁচকালেন কল্যাণী।

.

"দোলযাত্রার সময় কিছু লোক তো যা করলো...ছিহঃ!"

.

"ওসব কিছু না রে, মা। কিছু লোকের কোনো ধর্ম নেই। তারা চায়ই বিশৃঙ্খলা লাগাতে। দেখিস না গ্রেপ্তার হওয়া সবার নামের আগে ম-এ ও-কার?"

.

দীর্ঘশ্বাস ফেললো সন্ধানী। মা-কে এখন মিডিয়া নিয়ে জ্ঞানগর্ভ কথা শোনানো অবান্তর। সে বললো, "দোষটা কি মানুষের, না মূর্তিপূজার? তুমি একটু চোখ খুলে দেখো, মা। আমাদের দেবদেবীর পোশাকগুলোই দেখো। পূজারীদের দেখো। আমার তো মনে হয় এই গানবাজনাগুলো অশ্লীলতার বাহন! মাতাল করা বাজনা বাজে। নারী-পুরুষ ভুলে গিয়ে মাতালের মতো নাচে। এখানে ঈশ্বরের আরাধনার সৌন্দর্য কোথায়? তুমি জানো মা, এসব নাচানাচির দৃশ্য পর্ন হিসেবে ইন্টারনেটে পাওয়া যায়? কি হিন্দু, কি মুসলমান, কারো ল্যাপটপ ঘাঁটলেই..." কথা আটকে গেলো সন্ধানীর।

.

চুপ করে রইলেন কল্যাণী। নিজেও যে মাঝেমাঝে এমনটা ভাবেননি, তা নয়। হয়তো সবার মনেই মাঝে মাঝে আসে এসব। কেউ হয়তো কল্যাণীর মতো মাথা ঝাড়া দিয়ে সেসব চিন্তা দূর করে। কেউ বরং খুশিই হয় ধর্মের নামে নষ্টামোর সুযোগ পেয়ে।

.

সন্ধানীকে কাছে টেনে বললেন, "কাল থেকে ভার্সিটি খোলা না তোর? প্রতিদিন ফোন দিবি তো আমায়?"

.

"হোস্টেলে থাকলে কোনোদিন তোমাকে ফোন না দিয়ে চলে আমার, মা?"

.

চোখের পানি মুছলো দুজনই।

১৬৬

সন্ধানী ৪

-হুজুর হয়ে

সুব্রত সেন পকেট থেকে মানিব্যাগ বের করছিলেন অটোরিকশার ভাড়া দেওয়ার জন্য। কল্যাণী তাঁর হাতে একরকম ধাক্কা দিয়ে বললেন, "তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি!" মানিব্যাগ প্রায় পড়েই যাচ্ছিলো সুব্রত বাবুর হাত থেকে। বিরক্ত হয়ে স্ত্রীকে বললেন, "আহহা!"

.

সন্ধানী তার মায়ের কাঁধে হাত রেখে বললো, "মা, পূজো তোমাকে ফেলে চলে যাচ্ছে না। শান্ত হও।" কল্যাণী দেবীর শিশুসুলভ আনন্দমাখা চেহারা যেন আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠলো।

.

"নাও, এটা পূজোর বোনাস।" কিছু টাকা বেশি দিয়ে অটোওয়ালাকে বিদেয় করলেন সুব্রত বাবু।

.

দশমীর দিনে মেসো-মাসীর বাড়িতে সপরিবারে ঘুরতে এসেছে সন্ধানী। আত্মীয়দের মাঝে এদের বাসায়ই খুব ঘটা করে পূজো হয় প্রতিবছর। গেইটে পা রাখা মাত্রই আত্মীয়রা এসে তাদেরকে স্বাগত জানিয়ে ভেতরে নিয়ে গেলো। চোখ ধাঁধানো মণ্ডপে চলছে দশমীবিহিত পূজা।

.

সন্ধানীর সমবয়সী হওয়ায় মাসতুতো বোন প্রিয়ার সাথে তার ঘনিষ্ঠতা ভালোই। এসেই সন্ধানীর হাত ধরে টানতে টানতে বললো, "এই নাস্তিক সন্ধানী, চল তোকে দিয়ে আজ পূজো করিয়ে ছাড়বো।"

.

"চুপ থাক! আমি মোটেও নাস্তিক না।" কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে জবাব দিলো সন্ধানী।

.

বয়স্কা কিছু আন্টির চোখে "এ কী কলিকাল!" ভাব ফুটে উঠলো। কল্যাণীর কানে কানে একজন বললেন, "দিদি, এসব কী বলে? আসলেই নাস্তিক নাকি সোনু?"

.

"আরে না না!" দ্রুত হাত নাড়লেন কল্যাণী, "বাচ্চা ছেলেমেয়ে দুষ্টামি করে এসব বলে। নাস্তিক হলে উপবাস থাকবে কেন শুনি?"

.

আন্টিরা তখনই পুরোপুরি আশ্বস্ত না হলেও পরে সন্ধানীকে অঞ্জলী দিতে দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো।

.

হাঁটতে গিয়ে হঠাৎ কারো সাথে ধাক্কা লাগলো সন্ধানীর। পেছন ফিরে আচমকা থমকে গেলো। তারপর তিক্ত হাসি দিয়ে বললো, "Such an unpleasant surprise!"

.

"Indeed." বলতে বলতে দু হাত জোড় করে প্রায় কপাল পর্যন্ত তুললো ইন্দ্র, "নমস্কার, দিদি। ভাইকে আশীর্বাদ করবে না?"

.

নমস্কারের জবাব দিতে দিতেই ইন্দ্রের ফেসবুক স্ট্যাটাসটা ঘুরতে লাগলো সন্ধানীর মনে:

.

"মা! মা গো! গার্লফ্রেন্ডটা এবারের পূজোতেই জুটিয়ে দিয়ো মা! আবার এক বছর পর মর্ত্যে আসবে। ততদিন জ্বালা সইতে পারবো না।"

.

কমেন্ট সেকশনে সবার সে কী খুনসুটি আর প্রশ্রয়। ধুম ধাড়াক্কা ফেমিনিস্ট বান্ধবীগুলোও বাদ যায়নি।

.

ইন্দ্রের পাশে এসে দাঁড়ালো ফয়সাল। সন্ধানীর ভার্সিটির বন্ধু। সেই সাথে একই এলাকার প্রতিবেশী। সেই সুবাদে ইন্দ্রেরও দোস্ত। 'শহীদ বাবা' নামের একটা আইডি থেকে ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস নিয়ে ফেসবুকে লেখালেখি করে ফয়সাল রীতিমতো স্টার। সন্ধানী তাদের মুক্তমনা সার্কেলটা থেকে বেরিয়ে আসার পর থেকে ফয়সালের সাথে এখন আর আগের মতো বন্ধুত্ব নেই তার।

.

ফয়সালও যখন বিদ্রূপের হাসি দিয়ে নমস্কার দেখালো, সন্ধানীর তখন একটু বিরক্তই লাগলো। মনে মনে ভাবলো, "আর মানুষ কি না আমাকে মনে করে নাস্তিক!" মুখে বললো, "তা তুই কী মনে করে, ফয়সাল? খাওয়াদাওয়ার জন্য না সিঁদুর খেলা দেখার জন্য?"

.

"সে কী!" বললো ফয়সাল, "সম্প্রীতি বলে কি কিছু নেই? বিশ্বাস করি না বলে মজাও নিতে পারবো না...আই মিন, করতে পারবো না? কী বলিস ইন্দ্র?" কাঁধ দিয়ে তাকে একটা ধাক্কা মারলো সে।

.

হঠাৎ তাদের পেছন থেকে দুজনের কাঁধে দুইহাত রেখে আবির্ভূত হলো প্রিয়া, "অ্যাই কী নিয়ে কথা বলছিস? শোন এখানে আবার ঝগড়া-টগড়া লাগাস না। পূজো কর নাহলে পূজো দ্যাখ। বুঝলি?"

.

"আরে ধুর! বাচ্চা নাকি আমরা?" ফয়সাল বললো, "ঝগড়া লাগাবো কেন?"

.

"আরে বাদ দে!" ইন্দ্র বললো, "প্রিয়া চল, মায়ের সাথে কয়েকটা সেলফি তুলি।"

.

"হ্যাঁ হ্যাঁ, চল চল," খুব আগ্রহ নিয়ে বললো প্রিয়া। "শর্মিষ্ঠা, নিতু, তন্বী ওরাও আছে।" একটু দূরে গিয়ে বললো, "নাস্তিক সন্ধানীকে বল তো আসবে কি না।"

.

ফয়সাল ইচ্ছে করে গলা চড়িয়ে বললো, "নাস্তিক সন্ধানী! আসবি?"

.

সৌভাগ্যক্রমে কোলাহল আর বাদ্যের আওয়াজে কেউ তেমন শুনলো না।

.

মা-বাবা তাদের বন্ধু-আত্মীয়দের নিয়ে মেতে আছে। সন্ধানী অনেকটা একঘেয়ে ভাব নিয়েই বসে বসে দর্পণ বিসর্জন দেখতে লাগলো। প্রিয়া দূর থেকে দেখে বুঝলো সন্ধানী খুব একটা এনজয় করছে না। কাছে এসে বললো, "উপরে যাবি? চল রুমে বসে আড্ডা-টাড্ডা দিই।" প্রস্তাবটা সানন্দে লুফে নিলো সে।

.

বড়দেরকে বলে মণ্ডপ ছেড়ে উপরতলায় চলে গেলো দুজন। "তুই আমার রুমে গিয়ে বোস, আমি আসছি।" বলে কোথাও গেলো প্রিয়া। কম্পিউটারে বুঁদ হয়ে গেমস খেলতে থাকা জয়ন্তর পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো সন্ধানী। জয়ন্ত প্রিয়ার ছোট ভাই, এ বছর পিএসসি দেবে।

.

তার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে বললো, "কীরে? পূজোয় না গিয়ে বসে বসে কী গেমস খেলছিস?"

.

"Hi দিদি," পেছনে না তাকিয়েই বললো জয়ন্ত, "এখন বিরক্ত কোরো না। ব্যাটল অব গডস খেলছি।"

.

"ব্যাটল অব গডস?"

.

"হ্যাঁ। যেকোনো একটা গড বা ডেমি-গডের ক্যারেকটার নিয়ে অন্য গডদের সাথে মারপিট করতে হয়।"

.

"ওহ! তা তুই কোন ক্যারেকটার নিয়েছিস? মূষিক? না লক্ষ্মীপ্যাঁচা?"

.

"আরে এখানে সব রোমান গড। ওসব কোত্থেকে আসবে? আমি নিয়েছি শক্তির দেবতা পোটেসটাসকে।"

.

"এরকম অন্ধকার অন্ধকার কেন? গ্রাফিক্স বাজে নাকি?"

.

"নাহ। দুই লেভেল আগে সূর্যদেব সোল-কে খুন করেছি তো। তাই সূর্য ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।"

.

"কী সর্বনাশ!"

.

"সর্বনাশের দেখেছো কী, দিদি? পৃথিবীর দেবী টেরাও শেষ। এখন সময়ের দেবতা স্যাটার্ন চলছে।"

.

সন্ধানী মনিটরে দেখলো বিশাল এক দৈত্যের শরীরে দৌড়ে দৌড়ে তাকে অস্ত্র দিয়ে খোঁচাচ্ছে পোটেস্টাস। আর বিশাল হাত দিয়ে তাকে পিষে ফেলার চেষ্টা করছে স্যাটার্ন। রক্তারক্তির দিকে বেশীক্ষণ চেয়ে থাকতে না পেরে একটু সরে আসলো সন্ধানী। তারপর বললো, "আচ্ছা জয়ন্ত! পৃথিবীর দেবী মরে গেলে তুই এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আছিস? সময় ধ্বংস হয়ে গেলে অন্য সবকিছু টিকবে কীভাবে?"

.

"আরে যাও তো! অতকিছু ভাবলে গেম খেলবো কীভাবে?"

.

এমন সময় প্রিয়া চলে আসায় সন্ধানীসহ তার রুমে গেলো। দুজন খাটের উপর বসে গল্প জুড়ে দিলো। কথায় কথায় প্রিয়া বললো, "আচ্ছা সন্ধানী, ভার্সিটি লাইফে তো দুইবার চেইঞ্জ হলি। এখন কোন ধর্ম ফলো করিস আসলে?"

.

"আমার পরিবর্তন আসলে প্রতিদিন হচ্ছে রে, প্রিয়া। এমন না যে কেবল হিন্দু থেকে নাস্তিক হলাম, এরপর নাস্তিক থেকে আবার deist. প্রতিনিয়ত অনেককিছুই মাথায় ঘোরে। এখন যেমন বহু ঈশ্বরের ধারণাটা নিয়ে ভাবনা হচ্ছে।"

.

"তাই? যেমন?"

.

সন্ধানী কিছুক্ষণ ভাবলো। তারপর বললো, "এই যে দ্যাখ, মানুষ। মানুষ তার সমান বা কাছাকাছি ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষদের সাথে যুদ্ধ বা ঝগড়ায় লেগে থাকে। গড যদি একাধিক হয়, তাহলে কি একটা ব্যাটল অব গডস লেগে গিয়ে সৃষ্টিজগতই ধ্বংস হয়ে

যাওয়ার কথা না?"

.

"উমম...হয়তো। হতে পারে দেবদেবীদের নিজেদের মাঝে আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো। হয়তো যার যার কাজের ক্ষেত্র আলাদা। এরকম ঝগড়াঝাঁটি কখনো হবে না।"

.

"Okay, consider this. একসময় যেরকম ভাবা হতো আকাশ, বাতাস, মাটি, পানি সব আলাদা, আজকে সেগুলোর মাঝে ইন্টারকানেকশন বুঝতে তো খুব বেশি বিজ্ঞান জানতে হয় না, রাইট?"

.

"মে বি। কিন্তু তাতে কী প্রমাণ হয়?"

.

"মানে বনের দেবতা আর মেঘের দেবতা যদি আলাদা হয়...অথবা দেবী...তাহলে কার কাজের ক্ষেত্র আসলে কতটুকু? গাছপালা তো আবহাওয়ায় এরকম প্রভাব ফেলে যাতে বৃষ্টি হয়। তাহলে বনের দেবতা কি মেঘের দেবতার কাজে ভাগ বসালেন না?"

.

এমন সময় "উহহহহহ" করে গমগমে যান্ত্রিক কণ্ঠে একটা চিৎকার এলো কোত্থেকে যেন। জয়ন্ত হয়তো আরেকটা দেবতাকে মেরে ফেলেছে।

.

প্রিয়া বললো, "চিন্তার বিষয়। আমাদের ধর্মে আসলেই এমন কোনো আইডিয়া কি আছে নাকি? যে একজন বনের দেবতা, একজন মেঘের?"

.

"আচ্ছা দূর্গা প্রতিমার আশপাশের দেবতাদেরই ধর।" বললো সন্ধানী, "আমি সুন্দর হতে চাইলে সেটা কার কাছে চাইবো? কার্তিকেয়র কাছে? না লক্ষ্মীর কাছে? আমি কার্তিকেয়র কাছে পুরুষালি সৌন্দর্য চাই না, কিন্তু লক্ষ্মী আবার সৌন্দর্যের দেবী নন। আবার ধর, আমি ধনী হতে চাই। পড়ালেখা না করে লক্ষ্মী দেবীর আশীর্বাদে যদি আমি ধনী হই, তাহলে হয় দেবী অলৌকিকভাবে আমাকে সম্পদ দিয়েছেন আর নয়তো আমি দুর্নীতিবাজ। আমার পর্যবেক্ষণ হলো প্রথমটা ঈশ্বরের সাধারণ কর্মপদ্ধতি না। তিনি পার্থিব মাধ্যম ব্যবহার করেই ভক্তদের মনোবাসনা পূরণ করেন...বেশিরভাগ সময়...আমি মিরাকেলকে অবশ্য অস্বীকার করছি না। আর দ্বিতীয়টা হওয়া পসিবলই না। তাহলে ধনী হতে হলে আগে বিদ্যা অর্জন করে তার যোগ্য হতে হবে। হোক তা কৃষিশিক্ষা বা এঞ্জিনিয়ারিং। কিন্তু বিদ্যার দেবী আবার আরেকজন। তাহলে কি আমি বিদ্যা অর্জনের জন্য একজনের কাছে প্রার্থনা করবো, আর তার ফলাফলের জন্য আরেকজনের কাছে?"

.

এমন সময় আবারো গমগমে কণ্ঠ শুনে চমকে কান চেপে ধরলো দুজনই, "You challenge me, Potestas! The god of seas!" আরেকটা কণ্ঠ বললো, "A true god doesn't hide himself underwater, Neptune! Show yourself." ভুস করে পানি থেকে কিছু ওঠার আওয়াজ হলো। প্রথম কণ্ঠটা বললো, "You have disrespected a god for the last time, demi-god. Your death is close at hand."

.

"উফ! জয়ন্ত, সাউন্ডটা কমা।" চেঁচিয়ে বললো প্রিয়া। পাশের রুম থেকে আওয়াজটা একটু কমে এলো।

.

সন্ধানীর দিকে ফিরে প্রিয়া বললো, "আচ্ছা মানলাম। কিন্তু এমনটা কি হতে পারে না যে সব দেবদেবী আসলে এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন রূপ? একেকটা রূপ এক ঈশ্বরেরই বিভিন্ন অবতার?"

.

"Doesn't make sense to me. তাহলে কি রাম বা ব্রহ্মা নিজেই নিজেকে পূজো করে নিজেকেই অকালবোধনে উদ্বুদ্ধ করেছেন? নিজেই তারপর দেবী দূর্গা হয়ে আবির্ভূতা হয়েছেন? অথবা স্বর্গ থেকে দেবতারা বিতাড়িত হয়ে নিজেদের কাছেই নিজেদের দুঃখের কথা বলেন? তারপর নিজেরাই শম্ভু-বিষ্ণু সেজে তা শোনেন? তারপর নিজেদের তেজ থেকে নিজেদেরকেই দূর্গা নামে তৈরি করেন? আবার নিজেই গিয়ে সেই মহিষাসুরকে পরাজিত করেন, যেই মহিষাসুরের দাপটে নিজেরাই স্বর্গ থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন? আর একই লজিক অনুযায়ী, স্রষ্টা-সৃষ্টি একই সত্ত্বা হওয়াটা আরো বড় অবিচার। এর অর্থ দাঁড়ায় পরমাত্মা নিজেই রেপিস্ট হয়ে নিজেকেই রেপ করে, নিজেই বাস চালায়, আবার নিজেই মানববন্ধন করে নিজের ফাঁসি চায়।"

.

"এই দাঁড়া, দাঁড়া। এতক্ষণ তোকে একেশ্বরবাদী ভাবছিলাম। কিন্তু তোর শেষের কথাগুলো তো একেশ্বরবাদকেও ধ্বংস করে দিচ্ছে। সেই তো নাস্তিকদের মতোই কথা বলছিস।"

.

"উহুঁ, বলছি না। এখন পর্যন্ত আমার কনক্লুশন হচ্ছে স্রষ্টা আর সৃষ্টি আলাদা সত্ত্বা। নিরাকার স্রষ্টা আসলে এক অজানা আকার। ইনফ্যাক্ট, আকারের কনসেপ্টের স্রষ্টাও তিনি নিজেই। তাহলে তিনি এমন এক সত্ত্বা, যাকে আমরা মানবীয় কোনো attributes দিয়ে বুঝতে পারবো না।"

.

"ওকে। নো প্রবলেম। সেই সত্ত্বা চাইলেই কি মহাষষ্ঠীতে নিজের সত্ত্বাকে দূর্গা প্রতিমায় স্থাপন করতে পারেন না? তারপর দশমীতে দর্পণ বিসর্জনের মাধ্যমে ত্যাগ করতে পারেন না? তাহলেই তো তোর একেশ্বরবাদের আইডিয়ার সাথে পূজোর কোনো কন্ট্রাডিকশন থাকছে না।"

.

"হয়তো। কিন্তু সেটাও একটু uncanny. একেশ্বরবাদীরা এরকম ফেটিশে বিশ্বাস করে না। তুই একটা মসজিদ ভেঙে ফেললে মুসলমানরা কিন্তু বলবে না যে আল্লাহ ভেঙে গেছেন। কিন্তু দর্পণ বিসর্জনের আগ মুহূর্তে কেউ যদি দূর্গাপ্রতিমা ভেঙে ফেলে, তাহলে কিন্তু বলতে হয় যে ঈশ্বর ভেঙে গেলেন। কারণ সে সময় প্রতিমাটা একটা ফেটিশ। অন্তত ফেটিশ থাকাকালীন সময় দূর্গা-লক্ষ্মী-সরস্বতী-গণেশ-কার্তিকেয় সবাই মিলে একটা মাছিও কেন সৃষ্টি করেন না? মাছি কিছু নিয়ে গেলে তাঁরা কেন ঠেকান না?"

.

প্রিয়াকে একটু চিন্তিত দেখালো। হঠাৎ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললো, "আচ্ছাহ, খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। চল নিচে যাই।"

.

"হ্যাঁ, শিওর।"

.

জয়ন্ত তখনো কম্পিউটারের সামনে বসা। প্রিয়া যেতে যেতে ডাক দিলো, "অ্যাই এইটা অফ কর। খেতে আয়।"

.

পেছন পেছন যেতে যেতে সন্ধানী একটু থমকে দাঁড়িয়ে স্ক্রিনের দিকে তাকালো। পরাজিত নেপচুন একটা পাথরে হেলান দিয়ে হাঁপাচ্ছে। নিষ্ঠুর ভঙ্গিতে হেঁটে আসছে পোটেস্টাস। নেপচুন বললো, "No matter how many gods fall, there will always be another one to stand against you."

.

পোটেস্টাস বললো, "They will fall as well."

.

নেপচুন আবারো বললো, "You will never be able to kill all of them."

.

পোটেস্টাসের জবাব, "Then prepare for your death, Neptune."

.

তারপর পাশবিকভাবে তাকে মারতে লাগলো পোটেস্টাস। কৃত্রিম রক্তের ছিটা এসে স্ক্রিনটাকে লাল করে দিচ্ছে। সন্ধানী একবার ঢোক গিললো। নেপচুনকে টেনে হিঁচড়ে পাহাড় থেকে ছিটকে ফেললো পোটেস্টাস। অনেকক্ষণ যাবত পড়তে পড়তে ছপাস করে সাগরে পড়লো নেপচুনের মৃতদেহ। ঠিক যেন আরেকটা প্রতিমা বিসর্জন।

.

"অ্যাই সন্ধানী! তুইও গেমস খেলতে বসলি নাকি?" প্রিয়ার চিৎকারে সম্বিত ফিরে পেয়ে আবার হাঁটা দিলো সন্ধানী।"

১৬৭

কেমন ছিলেন তিনি? – ২

–শিহাব আহমেদ তুহিন

যখন ছোট ছিলাম, রাস্তায় পথ চলতে চলতে প্রায়ই দেখতাম মুরুব্বী গোছের একজন চোখ-মুখ শক্ত করে আমার দিকে তাকিয়ে আছেন। কী বেয়াদবি করেছি সেটা নিয়ে বিস্তর গবেষণার পর মনে পড়তো, "এই যা! সালাম দিতে ভুলে গিয়েছি।" কাঁচুমাচু ভঙ্গিতে সালাম দেয়ার পর অপর পাশের ঠোঁট নাড়া দেখে বুঝতে পারতাম সালামের উত্তর হয়তো নেয়া হয়েছে। মাঝে মাঝে ঠোঁটও নড়ত না, সালামের উত্তর নাকি মনে মনে নিয়েছেন। ছোটদের সালামের উত্তর সশব্দে নিলে সম্ভবত সম্মান কমে যায়।

.

তবে আমি যদি ১৪০০ বছর আগে মদিনার পথ ধরে হেঁটে যেতাম, তাহলে একজন মানুষ আমি সালাম দেয়ার আগেই আমাকে সালাম দিয়ে দিতেন।

হ্যাঁ! মুহাম্মদ (সা) এর কথাই বলছি।

তিনি এতোটাই নিরহঙ্কারী ছিলেন যে, চলার পথে শিশুদের দেখলে তাদের সালাম দিতেন। ছোট্ট মেয়েরা প্রশ্ন করার জন্য হাত ধরে তাঁকে যেখানে খুশি সেখানে নিয়ে যেতে পারত।

.

তাঁর সন্তান ছিল মোট সাতজন। ছেলে তিনজন, মেয়ে চারজন। ফাতেমা (রা) ব্যতীত সবাই তাঁর জীবদ্দশাতেই মারা গিয়েছিলেন। কখনো তিনি নিজের সন্তান আর অন্য মুসলিম সন্তানের মধ্যে পার্থক্য করতেন না। ভালোবাসা লুকিয়ে না রেখে প্রকাশে বিশ্বাসী ছিলেন। আরবরা যখন দেখত তিনি শিশু আর সন্তানদের এতো গুরুত্ব দিচ্ছেন, তারা অবাক হয়ে যেতো। এমন করার কারণ জিজ্ঞেস করলে উনি বলতেন, "যারা অন্যের প্রতি দয়া করে না, (কিয়ামতের দিন) তাদের প্রতি দয়া করা হবে না।"

.

যে সময়টাতে কন্যা শিশুদের জীবন্ত প্রোথিত করা হতো, সে সময়টাতে তিনি তাঁর কন্যাদের শুধু ভালোই বাসতেন না, সম্মানও করতেন। অনেকেই বেশি কন্যা সন্তান থাকাকে বোঝা মনে করেন। উনি কখনোই তাঁর মেয়েদেরকে বোঝা মনে করেননি। সবাইকে মমতার সাথে কন্যা শিশুদের লালন-পালন করতে বলতেন। কন্যা শিশুদের মর্যাদার কথা বলতে গিয়ে রাসূল (সা) বলেন, "যাদের কন্যা সন্তান দিয়ে পরিক্ষা করা হবে, আর তারা তাদের প্রতি সদয় থাকবে, (আখিরাতে) সেই কন্যারা তাদের আর জাহান্নামের মধ্যে পর্দা হয়ে দাঁড়াবে।"

.

তাঁর কন্যাদেরকে সবচেয়ে উত্তম ব্যক্তির সাথে বিয়ে দেয়ার চেষ্টা করতেন। কোন কন্যাকেই তিনি জোর করে বিয়ে দেননি। বিয়ের পূর্বে অবশ্যই কন্যার মতামত জানতে চাইতেন। সবাইকে সাবধান করে বলতেন, "একজন কুমারী মেয়ের অনুমতি ছাড়া তাকে বিয়ে দেয়া যাবে না।" একবার জানতে পারলেন, এক মেয়েকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে বিয়ে দেয়া হয়েছে। উনি সাথে সাথে সে বিয়ে বাতিল ঘোষণা করেন।

.

মোহর নির্ধারণের বেলায় কঠোরতা আরোপ করতেন না। ফাতেমা (রা) এর বিয়েতে মোহর বলতে ছিল কেবল একটি বর্ম। বর্তমান সময়ে অনেকেই বিয়েতে উচ্চ মোহর থাকাটাকে একটা প্রথা বানিয়ে ফেলেছেন। তাদের কাছে মোহর হচ্ছে সম্মানের মাপকাঠি। অথচ এ মাপকাঠি আল্লাহর রাসূল (সা) দিয়ে যাননি। যদি মোহর সত্যিই সম্মানের মাপকাঠি হতো, তবে তাঁর কলিজার টুকরা ফাতিমার চেয়ে অধিক সম্মানিত আর কে ছিল?

.

যখনই ফাতিমা (রা) তাঁকে দেখতে আসতেন, তাকে অভ্যর্থনা জানাতে তিনি দাঁড়িয়ে যেতেন। তাকে চুমু দিতেন, আর নিজের জায়গায় তাকে বসাতেন। আবার বাবা যখন তাকে দেখতে আসতেন, ফাতিমা (রা)-ও একইভাবে পিতাকে অভ্যর্থনা জানাতেন। মেয়েকে সবসময় সাধারণ জীবনযাপনে শিক্ষা দিতেন। ফাতিমা (রা) নিজ হাতেই সংসারের সব কাজ করতেন। জাঁতা ঘোরাতে ঘোরাতে তার হাত অবশ হয়ে যেত। একবার তিনি পিতার কাছে নিজের কষ্টের কথা জানিয়ে একজন দাসীকে চাইলে আল্লাহর রাসূল (সা) বললেন, "আমি কি তোমাকে এমন কিছুর কথা বলব না যা তোমার জন্য দাসীর চেয়েও উত্তম? ঘুমোতে যাবার আগে তুমি ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবার', ৩৩ বার 'সুবহানাল্লাহ' আর ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' বলবে।"

.

আল্লাহর রাসূলের (সা) সন্তান বলে তারা যাতে আত্মতুষ্টিতে না ভোগেন, সে কথাও তিনি বারবার তাদের মনে করিয়ে দিতেন। সাবধান করে বলতেন, "ওহে ফাতিমা! নিজেকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও। আল্লাহর সামনে আমি তোমাকে একটুও রক্ষা করতে পারব না।"

.

রাসূল (সা) ছিলেন একজন ধৈর্যশীল পিতা। সন্তানদেরকেও ধৈর্য ধারণের উপদেশ দিতেন। পৃথিবীতে থাকা অবস্থাতেই তাকে সহ্য করতে হয়েছে একে একে ছয় ছয়টি সন্তান হারানোর কষ্ট। ফাতিমা (রা)- ও যে তাঁর মৃত্যুর কিছুদিন পর মারা যাবেন, তাও তিনি জানতেন। মেয়ে উম্মে কুলসুল (রা) মারা যাওয়ার পর যখন তাকে গোসল দেয়া হয়েছিল, তখন নিজের পরনের ইজার খুলে দিয়েছিলেন। পিতার পবিত্র পোশাক মেয়ের দেহকে আবৃত করেছিল। উম্মে কুলসুমের (রা) মৃত্যুর পরে তিনি তার কবরের পাশে বসে থাকতেন। নীরবে চোখের জল ফেলতেন। একমাত্র জীবিত পুত্র ইব্রাহীম (রা) যখন মারা গিয়েছিলেন, তখনো তিনি অশ্রু সংবার করতে পারেননি। কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, "চোখ অশ্রুসিক্ত। হৃদয় ব্যথিত। তবুও আমরা এমন কিছু বলি না যা আমাদের রবকে অসন্তুষ্ট করে। ইব্রাহীম! (বাবা আমার!) আমরা তোমার মৃত্যুতে ব্যথিত।"

.

সাতজন নাতি-নাতনী ছিল তাঁর। সবাইকেই প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। কখনো তাদের ধমক দেননি। একবার হাসান (রা) তাঁর কোলে থাকা অবস্থায় প্রসাব করে দিয়েছিলেন। আবু লায়লা (রা) এ দৃশ্য দেখে হাসান (রা)- কে রাসূল (সা) এর কোল থেকে নিতে চাইলে তিনি বলেন, "আমার সন্তানকে ছেড়ে দাও। প্রসাব শেষ না করা পর্যন্ত তাকে ভয় পাইয়ে দিও না।"

.

হাসান (রা) আর হুসাইন (রা) এর জন্য তিনি দু'আ করতেন। তাদের দিকে তাকিয়ে বলতেন, "আমি তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই সকল শয়তান আর সৃষ্টি থেকে, সকল হিংসুটে চোখ থেকে।" একদিন ফাতিমা (রা) এর ঘরে যেয়ে আদর করে ডাক দিলেন, "ছোট্ট সোনামণিটা কি এখানে আছে?" হাসান(রা) বের হয়ে এলে দুজন দুজনকে জড়িয়ে ধরলেন। কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "হে আল্লাহ! আমি তাকে ভালোবাসি। আপনিও তাকে ভালোবাসুন। আর যে তাকে ভালোবাসে, তাকেও আপনি ভালোবাসুন।"

.

আরেকদিন মিম্বরে দাঁড়িয়ে খুতবা দেয়ার সময় লক্ষ্য করলেন হাসান (রা) আর হুসাইন (রা) বারবার হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাচ্ছেন। রাসূল (সা) খুতবা থামিয়ে মিম্বর থেকে নেমে দ্রুত তাদের কোলে তুলে নিলেন। সবাইকে লক্ষ্য করে বললেন, "এ দুইজনকে (এ অবস্থায়) দেখে আমি ধৈর্য ধারণ করতে পারিনি।"

.

মেয়ে যয়নাবের (রা) কন্যা উমামাহ (রা)- কে কাঁধে নিয়ে তিনি জামাতে নামায পড়িয়েছেন। রুকু আর সিজদা করার সময় তাকে নামিয়ে দিতেন, রুকু-সিজদা শেষ হলে আবার তাকে কোলে তুলে নিতেন। নামাযে রুকু করার সময় একবার হাসান কিংবা হুসাইন (রা) তার কাঁধে উঠে বসলেন। তিনি না থামা পর্যন্ত রাসূল (সা) রুকুতে অনেকক্ষণ স্থির হয়ে রইলেন। সবাই ভয় পেয়ে ভেবে বসল, রাসূল (সা) অসুস্থ হয়ে গিয়েছেন কিনা! নামায শেষে লোকদের আশ্বস্ত করে বললেন, "তেমন কিছুই হয়নি। আমার ছেলে আমার কাঁধে চড়ে বসেছিল। সে সুস্থির না হওয়া পর্যন্ত আমি তাকে নামানো পছন্দ করলাম না।"

অথচ আমাদের সময়ে আমরা শিশুদের মসজিদে অনাহূত মনে করি। তাদের সামান্য শব্দে কিংবা দুষ্টুমিতে বিরক্ত হয়ে যাই।

.

তিনি তার নাতিদের প্রায়ই জড়িয়ে ধরতেন। চুমু খেতেন। এক ব্যক্তি তাঁকে এভাবে চুমু দিতে দেখে একবার বলল, “আমার দশটা ছেলে-মেয়ে আছে। আমি কখনোই তাদের চুমু খাইনি।” রাসূল (সা) তার দিকে তাকিয়ে বললেন, “যাদের অন্তরে দয়া নেই, তাদেরকে দয়া করা হবে না।” হাসান-হুসাইনের লালা গড়িয়ে তাঁর পবিত্র দেহে পড়ত। তিনি একটুও বিরক্ত হতেন না।

.

ভ্রমণ শেষ করে ফিরে এলে তিনি নাতি-নাতনীদের সাথে দেখা করতেন। তাদের পিঠে উঠিয়ে নিয়ে খেলা করতেন। একদিন দাওয়াত খেতে যাবার সময় দেখলেন হাসান (রা) কিংবা হুসাইন (রা) রাস্তায় খেলছেন। নানাকে দেখে নাতি কখনো ডানে কখনো বা বামে দৌড়ে পালাচ্ছিল। নাতির সাথে সাথে নানাও দৌড়াচ্ছিলেন।

.

কখনো কখনো নাতি-নাতনীদের উপহারও দিতেন। একবার নাজ্জাশীর বাদশাহ রাসূল (সা)-কে উপহার হিসেবে স্বর্ণের গয়না উপহার পাঠালেন। তিনি সে গয়না উমামাহ (রা)-কে উপহার দিলেন।

.

যখন সংশোধন করা প্রয়োজন তখন আদ্রভাবেই তা করতেন। একদিন দেখলেন হাসান (রা) সদকা থেকে নেয়া খেজুর মুখে দিয়েছেন। উনি সাথে সাথে বললেন, “ফেলে দাও, ফেলে দাও। তুমি কি জান না আমরা সদকার খাবার খাই না?”

.

বলা হয়ে থাকে, “একজন ব্যক্তি কতোটুকু মহৎ তা বোঝা যায়, শিশুদের প্রতি তার আচরণ দেখে। কেউ কি এমন আছে কিংবা কখনো ছিল, শিশুদের প্রতি যার আচরণে রাসূল (সা) এর চেয়েও বেশি ভালোবাসা প্রকাশ পেয়েছে?

শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ এর “كَيف عَاملهُم صلى الله عليه وسلم” (Interactions Of The Greatest Leader) গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা।

১৬৮

ইসলাম বিকৃতির প্রোপাগান্ডা – "United For Peace"

-সত্যকথন ডেস্ক

ফেইসবুকে একটা পেইজ আছে United for Peace [https://www.facebook.com/unitedforp...] . পেইজটা অনেকের চোখেই পরার কথা। প্রায় ৭৫,০০০+ লাইক এবং গড়ে প্রতি পোষ্টে ৫০,০০০ হাজারের বেশি লাইক পাওয়া এই পেইজটার উদ্দেশ্য মুসলিমদের মধ্যে বিকৃত ভাবে ইসলামকে প্রচার করা। পেইজটিতে এমনভাবে কুর'আনের বিভিন্ন আয়াতের ভুল ব্যাখ্যা উপস্থাপন করা হয় যাতে করে সাধারন মানুষ বিভ্রান্ত হয় এবং এক সময় এমন কিছু বিশ্বাস করা শুরু করে, যা নির্জলা কুফর ও শিরক।

আপনি যদি পেইজটাতে ঢোকেন তাহলে আপনার চোখে পড়বে কুর'আনের আয়াত, মুসহাফের ছবি সম্বলিত পোস্ট। আপনার চোখে পড়বে, "মন ভালো করে দেওয়া" বিভিন্ন কথা। তবুও কেন আমরা বলছি এটা কাফিরদের পেইজ? কেন বলছি এই পেইজের উদ্দেশ্য বিকৃতভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করা এবং কুফর ও শিরক প্রমোট করা?

.

আসুন প্রমাণাদি সহ শারীয়াহর আলোকে এক এক করে দেখা যাক।

পোস্ট বিশ্লেষণ ১



সূরা আল ইমরানের ৩য় আয়াতঃ কুরআন তাওরাত এবং ইঞ্জিলের সত্যায়ন করে। কিন্তু এককভাবে এই আয়াতটি প্রচার করলে পূর্ণ জ্ঞানের প্রকাশ হয় না। প্রশ্ন জাগতেই পারে, তাহলে তাওরাত আর ইঞ্জিলও কি অবিকৃত সত্য? সেগুলো থেকে কি কিছু এখনও গ্রহণ করা যাবে? পোস্টটি দেখে তেমন মনে হওয়াই স্বাভাবিক।

অথচ আল্লাহ সুবহানাহু একথাও বলেছেন যে আহলে কিতাবরা অর্থাৎ, ইহুদি খ্রিস্টানরা তাদের

"কিতাবের বিকৃতি ঘটিয়েছে" (২:৭৫)

"তারা নিজ হাতে গ্রন্থ লিখত আর দাবি করত যে সেগুলো আল্লাহর কাছ থেকে অবতীর্ণ" (২:৭৯)

এছাড়াও আহলে কিতাবরা "সত্যের সাথে মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটাতো এবং সত্যকে গোপন করত" (৩:৭১)।

এছাড়াও আল্লাহ স্বয়ং বলেছেন "আল্লাহর কাছে একমাত্র গ্রহণযোগ্য দ্বীন হল 'আল-ইসলাম' "(৩:১৯)

শুধু তাই না, "ইসলাম ছাড়া আর কোনো দ্বীন আল্লাহর কাছে কস্মিনকালেও গ্রহণযোগ্য হবে না" (৩:৮৫)

সূরা আল-ইমরানের ৩য় আয়াতে আল্লাহ ‘সত্যায়ন’ বলে বুঝিয়েছেন, আগে যে তাওরাত ও ইঞ্জিল প্রেরণ করা হয়েছিল তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই ছিল সে কথার স্বীকৃতি আর তাই সেগুলো যে ‘আল্লাহর পক্ষ থেকেই প্রেরিত ছিল’ এই ব্যাপারে মুসলিমদের বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে। কিন্তু পরবর্তীতে উল্লেখিত আয়াতগুলোতে আল্লাহ আহলে কিতাবদের কিতাব বিকৃতি উন্মোচিত করে দিয়েছেন যার অর্থ সেগুলো আর অনুসরণযোগ্য নেই। তাহলে ‘United for Peace’ থেকে কেন পরবর্তী আয়াতগুলো প্রচার করা হচ্ছে না? অথচ পরবর্তী আয়াতগুলো প্রচার না করলে এই বিষয়ে অজ্ঞ মুসলিমদের ভুল ধারণা হওয়া স্বাভাবিক। আর আল্লাহর কাছে একমাত্র মনোনীত দ্বীনের আয়াত (৩ঃ ১৯) আর অন্যথায় হলে কী হবে (৩ঃ ৮৫) এই আয়াতগুলোও কেন প্রচার করা হচ্ছে না?

বস্তুত তারা এমন ভাবে বিষয়টি উত্থাপন করেছে যা থেকে মনে হওয়া স্বাভবিক ক্বুরআন বর্তমানের বিকৃত বাইবেল ও তাওরাতের স্বীকৃতি দেয়, এবং বিকৃত বাইবেল ও তাওরাতের যারা অনুসারী তাদেরও বিশ্বাসী হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া। অথচ ক্বুরআন এর উল্টোটা বলে।

পোস্ট বিশ্লেষণ ২



অধিকাংশ খৃষ্টান পবিত্র তিন সত্ত্বায় বিশ্বাস করে এবং তারাও মনে করে মুহাম্মদ (স:) একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন।/ Similarly most of the Christians believe in Holy Trinity... – এই লাইনে Holy Trinity দেখে প্রথমে মনে হচ্ছিল এটা খ্রিষ্টানদের পেইজ। কারন কোন মুসলিম কখনো খ্রিস্টানদের শিরকপূর্ণ ত্রিত্ববাদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে Holy Trinity বা পবিত্র তিন সত্ত্বা – শব্দগুলো ব্যবহার করবে না। অন্যদিকে কোন ইহুদিও কখনো এমনটা বলবে না। একারনে খ্রিষ্টানরা এ পেইজটি চালায় এমন মনে হওয়া স্বাভাবিক। তবে খ্রিষ্টানরা ছাড়াও আর একটি জাত আছে যারা এমন কথ বলে থাকে। এরা হল ইন্টাফেইথ ডায়ালগে বিশ্বাসী ঐসব সেক্যুলারাইযড মুসলিম যারা “সকল ধর্ম সমান, সব ধর্ম ভালো, সব পথের গন্তব্য এক”-জাতীয় বাতিল কথা প্রচার করে। পেইজের অন্যান্য পোস্টের বক্তব্যের দিকে তাকালে এই ধারণাটা শক্ত হয়। তবে খ্রিষ্টান, সেকুলারাইযড “মুসলিম” কিংবা অন্য যে-ই পেইজটার পেছনে থাক না কেন, তাদের উদ্দেশ্য যে ইসলামের পোশাকে কুফর ও শিরক প্রচার করা, তা নিয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ ﷺ অন্যান্য নবীদের সমকক্ষ, ইহুদী ও খ্রিষ্টানরাও বিশ্বাসী শুধু পার্থক্য হল তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ কে মানে না – এই জাতীয় কথা বলার মাধ্যমে লেখার মূল উদ্দেশ্য হল ইহুদী ও খ্রিষ্টানদের কাফির হওয়া নিয়ে একটি প্রশ্ন তোলা। এই প্রশ্ন তোলার প্রচেষ্টা নতুন কিছু না। হাল আমলের অনেক মর্ডানিস্ট ও কথিত মডারেট স্কলার ও সেলিব্রিটি দা’ঈও নানা ভাবে

বলতে চান ইহুদি-খ্রিষ্টানরা কাফির না, তাদের কাফির বলা যাবে না, তাদের কাফির না বলে “not yet Muslim” বলা উচিৎ - ইত্যাদি। ইহুদী-খ্রিষ্টানরা কাফির না, বা তাদের মধ্য শুধু কিছু অংশ কাফির এই ধরনের কথার জবাব আল্লাহ রাসূল ﷺ নিজেই দিয়েছেন।

.

রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন –
সেই সত্ত্বার কসম! যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! এই উম্মতের কোন ব্যক্তি – চাই সে ইহুদি হোক, অথবা নাসারা – আমরা প্রেরিত হবার খবর পেয়ে আমার নবুয়ত ও আমি যে দ্বীন এনেছি তার উপর ইমান না এনে যদি মারা যায়, তাহলে সে জাহান্নামী। [আবু হুরায়রা রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, সহীহ মুসলিম]
মুস্তাদরাক হাকিমে ইবন আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু তা’আলা আনহু-র বর্ননায়ও এই হাদিস এসেছে। এই হাদিসের ব্যাপারে ইবনে আব্বাস রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু বলেন – আমি রাসূলুল্লাহর এই বক্তব্য শুনে মনে মনে বলতে লাগলাম, কুরানুল কারীমের কোন আয়াত এই বক্তব্য সমর্থন করে? অবশেষে নিচের এই আয়াতটি মাথায় এল –

যারাই এটাকে (কুরআন) অস্বীকার করবে, জাহান্নামই হল তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। কাজেই এ সম্পর্কে তুমি কোন প্রকার সন্দেহে নিপতিত হয়ো না। এটা তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আগত প্রকৃত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ বিশ্বাস করে না। [সূরা হুদ ১৭]

.

বর্তমান যুগের ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা মুহাম্মাদ ﷺ কে আল্লাহর রাসূল হিসেবে মানে এবং তাঁর উপর নাযিলকৃত শারীয়াহ অনুসরণ করে? তিনি যে দ্বীন এনেছেন তার উপর ঈমান আনে? অবশ্যই না। কারণ যে ব্যক্তি এই কাজগুলো করেছে সে মুসলিমে পরিণত হয়েছ। ইসলাম ছাড়া আর কোন দ্বীন – হোক সেটা ইহুদিদের ধর্ম বা নাসারাদের ধর্ম – আল্লাহ ‘আযযা ওয়া জাল – এর কাছে গ্রহনযোগ্য না। আল্লাহ ‘আযযা ওয়া জাল বলেছেন –

আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দ্বীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তার সেই দ্বীন কবূল করা হবে না এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [আলে ইমরান, ৮৫]

অনেকে এ ক্ষেত্রে শর্ত দেন যে কারো কাছে ইসলাম ও মুহাম্মাদ ﷺ নবী হবার খবর পৌছানোর পর সে ইসলাম গ্রহন না করলেও তাকে কাফির বলা যাবে না। কেবলমাত্র তখনই তাকে কাফির বলা যাবে যখন তার কাছে ইসলামের খবর পৌছেছে, সে ইসলামকে সত্য হিসেবে অনুধাবন করেছে আর তারপর সে ইসলাম গ্রহন করা থেকে বিরত থেকেছে। এই কথা সম্পূর্ণভাবে বাতিল এবং অগ্রহনযোগ্য। স্বয়ং আল্লাহর রাসূল ﷺ বলেছেন “আমরা প্রেরিত হবার খবর পেয়ে” – এর বেশি তিনি ﷺ বলেননি। যদি কেউ এখন রাসূলুল্লাহর ﷺ চাইতে বেশি ইসলাম বোঝার দাবি করে তাহলে কিছু করার নাই।

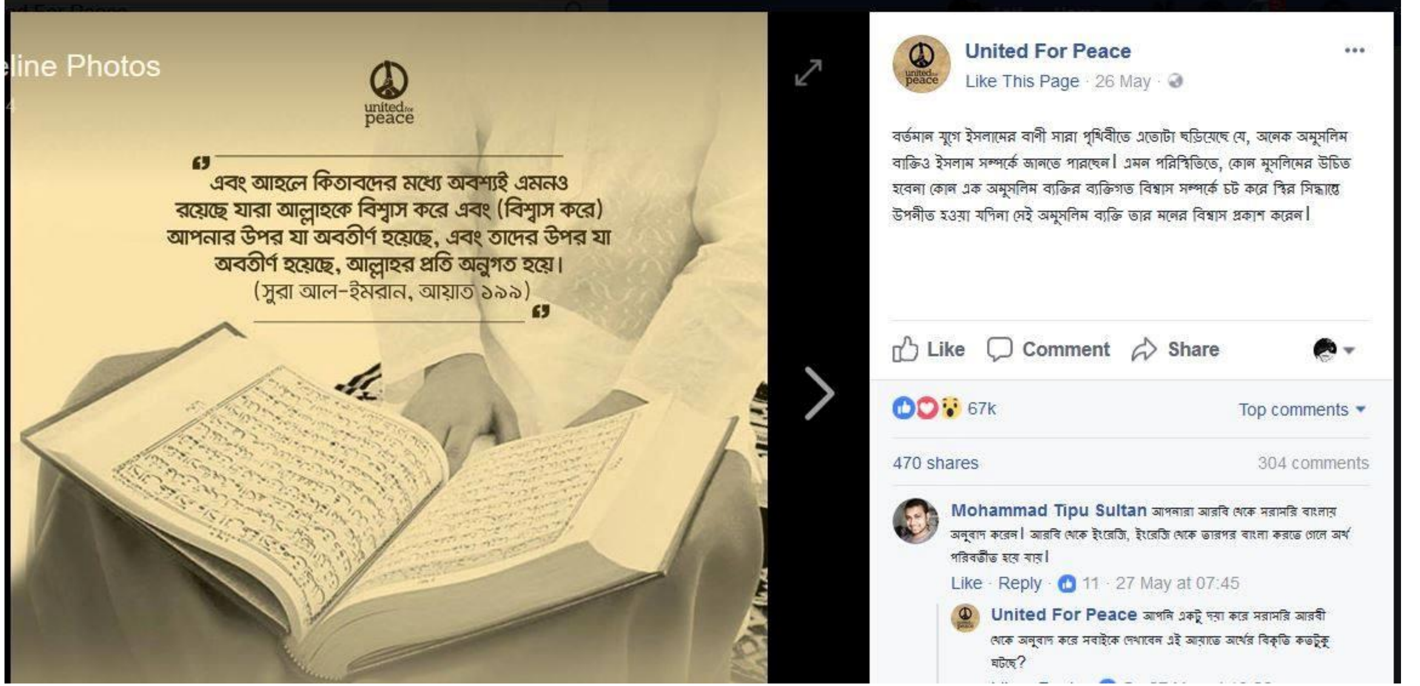
একই সাথে এই পোষ্টে খ্রিষ্টান আর ইহুদিরা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়া সাল্লাম) কে সাধারণ মানুষ মনে করে উল্লেখ করবার আড়ালে মুসলিমদের বিশ্বাস হিসেবে তাঁকে অন্যান্য নবী রাসূলগণের সমকক্ষ বলা হয়েছে। অথচ এই ব্যাপারটি সাধারণ মুসলিম মাত্রই জানে যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ’লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর মর্যাদা অন্যান্য নবী রাসূলগণের চাইতে বেশি। রাসূলগণের মধ্যেও যে সকলের মর্যাদা সমান নয়, সেকথা আল্লাহ নিজেই বলেছেনঃ
“এই রসূলগণ-আমি তাদের কাউকে কারো উপর মর্যাদা দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ তো হলো তারা যার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আর কারও মর্যাদা উচ্চতর করেছেন এবং আমি মরিয়ম তনয় ঈসাকে প্রকৃষ্ট মু’জিযা দান করেছি এবং তাকে শক্তি দান করেছি রুহূল কুদ্দুস (জিবরাঈলের) মাধ্যমে...” (সূরা বাকারাহ, ২৫৩)
“...আমি তো কতক পয়গম্বরকে কতক পয়গম্বরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি...” (সূরা বনী ইসরাঈল, ৫৫)

আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামাআ'হের উলামাগণ নির্দ্বিধায় একথার স্বীকৃতি দেন যে নবী রাসূলগণের মধ্যে মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) মর্যাদা সবচেয়ে বেশি। আমরা মুসলিম কোনও নবীকে ছোট করে দেখি না বা গালমন্দ করি না, আর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এ মর্যাদার স্বীকৃতি অন্য নবীদের মর্যাদাহানি ঘটায় না। এবিষয়ে আরও জানতে পড়ুনঃ

https://islamqa.info/en/83417

https://islamqa.info/en/7459

পোস্ট বিশ্লেষণ ৩



মে ২৬ এর পোস্ট থেকে তাদের এসব কথার উদ্দেশ্য আরো পরিষ্কার হয়।

এ পোষ্টে কুরআনের একটি আয়াত খন্ডিত ভাবে উপস্থাপন করে তারা বলছে – "কোন মুসলিমের উচিত হবেনা কোন এক অমুসলিম ব্যক্তির ব্যক্তিগত বিশ্বাস সম্পর্কে চট করে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যদি না সেই অমুসলিম ব্যক্তি তার মনের বিশ্বাস প্রকাশ করেন।" অর্থাৎ কোন মুসলিমের কোন কাফিরকে কাফির বলা উচিৎ হবে না, যদি না সেই কাফির নিজেকে কাফির বলে স্বীকার করে। অর্থাৎ আল্লাহ যাদেরকে কাফির বলেছেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) যাদেরকে কাফির বলেছেন, এই পেইজের মতে তাদেরকে কাফির বলা যাবে না। এক লোক আল্লাহয় বিশ্বাস করে না, অথবা রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বিশ্বাস করে না, অথবা কুরআনকে আল্লাহর বানী মনে করে না, অথবা শিরক করে, অথবা কুফর করে – কিন্তু আমরা তাদেরকে কাফির বলতে পারবো না ! এই হল এই পেইজের প্রস্তাবনা। মূলত এধরনের কথার মাধ্যমে তারা দুটো উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করতে চাচ্ছে, "ইহুদি ও খ্রিষ্টান ধর্মও কুরআন অনুযায়ী সঠিক" - এই কুফরকে প্রচার করতে চাইছে।

মে-৩র পোষ্টেও তারা একই রকমের কথা বলেছে, প্রথমে মুসলিমদের সম্পর্কে একটি হাদিস উপস্থাপন করেছে তারপর সেই হাদিস কে অমুসলিমদের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দাবি করছে – কোন কাফিরকেও কাফির বলা যাবে না, কারণ আমরা জানি না তার অন্তরে কী আছে!

অথচ শারীয়াহ এবং সাধারন যুক্তির কথা হল, যেহেতু আমরা জানি না কার অন্তরে কী আছে, তাই যে মুসলিম বলে নিজেকে পরিচয় দেয় তাকে মুসলিম গণ্য করবো। আর অন্যদেরকে কাফির গণ্য করবো। আমরা অন্তরের খবর জানি না, তাই দুনিয়ার

সবাইকে মুসলিম মনে করবো, যুক্তি কিংবা শরীয়াহর আলোকে এ কথা কোন ভাবেই গ্রহণযোগ্য না। আর স্বয়ং আল্লাহ যাদের কাফির আখ্যায়িত করেছনে তাদের কাফির গণ্য না করা নিঃসন্দেহে কুফর।

আর এ আয়াতে কেবল ঐ সব আহলে কিতাবদের বোঝানো হচ্ছে যারা রাসূলুল্লাহ এর নবুওয়্যাতের খবর জানার পর তার উপর ঈমান এনেছে, এবং ইসলাম গ্রহণ করেছে। বর্তমানের ইহুদি-খ্রিষ্টানদের ক্ষেত্রে কোন ভাবেই এ আয়াত প্রযোজ্য না।

পোস্ট বিশ্লেষণ ৪

জুলাই ২০ এর পোস্টের মাধ্যমেও তারা একই উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের চেষ্টা করেছে।



এই পোষ্টের মাধ্যমে মূলত তারা আবার দুটো বিষয় প্রচারে চেষ্টা করেছে। ১) তাওরাত ও ইঞ্জিলের বর্তমান রূপ সঠিক এবং এগুলো আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ কিতাব, ২) যারা এ দুটোর কিতাবের অনুসরণ করছে তারা আল্লাহ নাযিলকৃত দ্বীনেরই অনুসরণ করছে।

কারণ বইয়ের ভিন্ন ভিন্ন এডিশানের মধ্যে পার্থক্যের মূল কারণ হয় সংযোজন আর বিয়োজন। বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এক সংস্করণ থেকে অন্য সংস্করনে মৌলিক কোন পার্থক্য হয় না। কিন্তু আমরা বিশ্বাস করি, এবং এটাই সত্য যে বর্তমানে যে ইঞ্জিল ও তাওরাত আছে, তা বিকৃত হয়ে গেছে। এগুলো আল্লাহর নাযিলকৃত কিতাব না। এবং ক্বুরআন ও এসব কিতাবের মধ্যে সম্পর্ক নিছক একই বইয়ের এক সংস্করণের সাথে অন্য সংস্করণের পার্থক্যের মতো না। আবারও তারা মেসেজ দিতে চাচ্ছে যে ইহুদী ও খ্রিষ্টানরাও সঠিক পথেই আছে, কেবল পুরনো সংস্করণের অনুসরণ করছে। অথচ ক্বুরআন ও সুন্নাহ আমাদের জানাচ্ছে সত্য আসার পর, এবং সত্যকে জানার পর ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে, এবং সত্যকে ত্যাগ করেছে।

পোস্ট বিশ্লেষণ ৫



অমুসলিমদের প্রতি ঘৃণা ইসলাম ধর্মে অনুপস্থিত। কোন রেফারেন্স ছাড়াই কথাটি দেওয়া হয়েছে। আর এই কথার রেফারেন্স থাকারও কথা না, কারণ এটি সরাসরি কুরআনের আয়াত এবং রাসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হাদিস এর সাথে সাজ্ঘর্ষিক।

ইবরাহীম ও তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্যে তোমাদের জন্য আছে উত্তম আদর্শ। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল- 'তোমাদের সঙ্গে আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে তোমরা যাদের 'ইবাদাত কর তাদের সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করছি। আমাদের আর তোমাদের মাঝে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ শুরু হয়ে গেছে যতক্ষণ তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান না আনবে। [সূরা মুমতাহিনা, ৪]
জাবির বিন আব্দুলাহ(রা) হতে বর্ণিত, "মুহাম্মাদ(ﷺ) তাঁদেরকে প্রত্যেক মুসলিমকে পরামর্শ দেয়ার এবং প্রত্যেক কাফিরকে পরিহার করার শপথ করাতেন।" [মুসনাদ ইমাম আহমাদ ৪/৩৫৭-৮]
বাররা বিন আজিব(রা) হতে বর্ণিত যে, নবী(ﷺ) বলেনঃ 'আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করা হচ্ছে ঈমানের সবচেয়ে দৃঢ় বন্ধন।' [মুসনাদ আহমাদ]
ইবন শায়বা বলেন যে, মুহাম্মাদ(ﷺ) বলেছেনঃ "ঈমানের দৃঢ়তম বন্ধন হলো শুধুমাত্র তাঁরই জন্য ভালোবাসা এবং তাঁরই জন্য শত্রুতা।"
[তাবারানী, আল কবির, ইবনে শায়বা এটা ইবন মাসউদ(রা) থেকে মারফু রূপে বর্ণনা করেছেন এবং এটা হাসান রূপে আখ্যায়িত করেছেন]

ইবন আব্বাস(রা) হতে বর্ণিত, রাসূল(ﷺ) বলেছেনঃ "ঈমানের দৃঢ়তম বন্ধন হচ্ছে আল্লাহর জন্য আনুগত্য এবং তাঁর জন্য বিরোধিতা, আল্লাহর জন্য ভালোবাসা এবং তাঁর জন্য শত্রুতা।"
[আত তাবারানী, আল কাবির। ইমাম সুয়ুতী (র.) এর জামি আস সগীর ১/৬৯; আলবানী(র.) এটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন]

ইবন আব্বাস(রা) আরো বলেছেন, "যে আল্লাহর জন্য ভালোবাসে এবং আল্লাহর জন্য ঘৃণা করে, এবং যে আল্লাহর জন্য বন্ধুত্ব নষ্ট করে অথবা তার জন্য শত্রুতা ঘোষণা করে, সে আল্লাহর কাছ থেকে নিরাপত্তা পাবে। এটা ছাড়া কেউ প্রকৃত ঈমানের স্বাদ পাবে না, যদিও তার সাওম ও সলাত অনেক হয়। মানুষ দুনিয়াবী বিষয়ে সম্পর্ক গড়ে তোলে, যা তাদেরকে কোন উপকারই করতে পারবে না।"[ইবন রজব আল হাম্বলী, জামি আল উলুম ওয়াল হাকিম, পৃষ্ঠা ৩০]
এবং আল্লাহ কাদের ঘৃণা করেন সেটা তিনি আমাদের বিভিন্ন জায়গায় জানিয়েছেন –
"...অতএব যে কুফুরী করবে তার কুফুরীর জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কাফিরদের কুফর তাদের প্রতিপালকের ঘৃণাই বৃদ্ধি করে। কাফিরদের কুফর তাদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে।" [সূরা ফাতির, ৩৯]

উপরের আয়াত হাদিসগুলোতে আল্লাহর জন্য যে ভালোবাসা তাঁর জন্য শত্রুতার ব্যাপারে বলা হয়েছে তাঁর মূলনীতি দেওয়া আছে সূরা মুমতাহিনার আয়াতে। দেখুন এখানে ব্যক্তিগত কোন স্বার্থে বর্ণ, সামাজিক বা আর্থিক অবস্থা, জাত, গোত্র অথবা এধরনের কোন কিছুর ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার কথা বলা হচ্ছে না। বরং তাওহীদের ভিত্তিতে বন্ধুত্ব ও শত্রুতার কথা বলা হয়েছে। সুতরাং একজন মুসলিম যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে, যে বিশ্বাস করে শিরক সবচেয়ে বড় অপরাধ সে কখনো শিরকের উপর এবং প্রতি সন্তুষ্ট বা অনুরক্ত হতে পারে না। ঠিক যেমন সবচেয়ে খারাপ সন্তানও তার মা-বাবা-কে গালি দেওয়া ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব রাখতে পারে না, তেমনিভাবে একজন মুওয়াহ্হিদ (তাওহিদবাদী) কখনোই আল্লাহ্র বিরুদ্ধে শিরকে লিপ্ত ব্যক্তির সাথে বন্ধুত্ব রাখতে পারে না। শিরকের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে না। শিরককে মেনে নিতে পারে না। তবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কাফিরদের সাথে আচরণের ক্ষেত্রে সৌজন্য, ইনসাফ ও মুসলিমের জন্য উপযুক্ত উত্তম আদাব বজায় রাখতে ইসলাম আমাদের শিক্ষা দেয়। আর এক্ষেত্রে সাহাবীদের রাঃ উদাহরন আমাদের জন্য অনুসরনীয়।

পোস্ট বিশ্লেষণ ৬

আরেকটি পোস্টে সূরা আলে ইমরানের ২০ নং আয়াত কোনও ব্যাখ্যা ছাড়া এমনভাবে প্রচার করা হয়েছে।

united for peace
হযরত মুহাম্মদ (স:)
এর দায়িত্ব ছিল শুধুমাত্র
বার্তা পৌঁছে দেয়া

United For Peace
Like This Page · January 11 ·

সুরা আল-ইমরান -এর ২০ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন, "অতএব তারা যদি আপনার সাথে তর্ক করে, (তাহলে) বলুন, "আমি আল্লাহর প্রতি নিজেকে সমর্পণ করেছি, এবং (তারাও) যারা আমার অনুসরণ করে।" এবং যারা অজ্ঞ এবং যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছে, তাদেরকে বলুন, "তোমরা কি নিজেকে সমর্পণ করেছো?" এবং তারা যদি সমর্পণ করে, তারা সঠিক পথে আছে; কিন্তু তারা যদি ফিরে যায় - তাহলে আপনার দায়িত্ব শুধু (তাদেরকে) বলা। এবং আল্লাহ তার বান্দার উপর নজর রাখছেন।"

এর মানে হলো হযরত মুহাম্মদ (স:) -এর দায়িত্ব ছিল শুধু বাণী প্রচার করা। কাউকে জোর করে ধর্ম পালন করানো তার দায়িত্ব ছিল না। এটা শুধু হযরত মুহাম্মদ (স:) -এর সুন্নাহ ছিল না, বরং এটা পূর্ববর্তী সকল নবী-রাসুলদেরও সুন্নাহ ছিল।

Like Comment Share
192K Chronological
2,884 shares 2.5K Comments

অথচ এই আয়াতটিও যে এভাবে এককভাবে প্রচারের জন্য মোটেও নয়, তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) এর সীরাতের শিক্ষা থেকে সহজেই বোঝা যায়ঃ
"যদি তারা তোমার সাথে বিতর্কে অবতীর্ণ হয় তবে বলে দাও, 'আমি এবং আমার অনুসরণকারীগণ আল্লাহর প্রতি আত্নসমর্পণ করেছি।' আর আহলে কিতাবদের এবং নিরক্ষরদের বলে দাও যে, তোমরাও কি আত্নসমর্পণ করেছ? তখন যদি তারা

আত্নসমর্পণ করে, তবে সরল পথ প্রাপ্ত হলো, আর যদি মুখ ঘুরিয়ে নেয়, তাহলে তোমার দায়িত্ব হলো শুধু পৌছে দেয়া। আর আল্লাহর দৃষ্টিতে রয়েছে সকল বান্দা।" (৩: ২০)

উক্ত পোস্টটিতে জোর দিয়ে বলা হয়, রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) দায়িত্ব ছিল কেবলই পৌঁছে দেওয়া। মানুষকে জোর করে ধর্ম পালন করানো নয়। এমন আরেকটি আয়াত সরাসরি কুরআনে রয়েছে যেখানে আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন বলেছেন, "ধর্মের ব্যাপারে কোনও জবরসদস্তি নেই" (২: ২৫৬)

মজার ব্যাপার হল, এই আয়াতটি নিয়েও পেইজটির একটি স্বতন্ত্র পোস্ট রয়েছে। একইসাথে দু'টো পোস্টেরই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয়ে যাবে ইন-শা-আল্লাহ।



ব্যাপারটি হলঃ

হিদায়াত কেবলই আল্লাহ রব্বুল আ'লামীনের হাতে। আর তাই আল্লাহ বারবার তাঁর রাসূল মুহাম্মাদকে (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন যে, তিনি চাইলেও আল্লাহর ইচ্ছা না থাকলে কোনো ব্যক্তির হিদায়াত হবে না।

"আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে সৎপথে আনতে পারবেন না, তবে আল্লাহ তা'আলাই যাকে ইচ্ছা সৎপথে আনয়ন করেন। কে সৎপথে আসবে, সে সম্পর্কে তিনিই ভাল জানেন।" (২৮ঃ ৫৬)

কিন্তু,

তার মানে এই নয় যে মানুষ যা খুশি করে বেড়াবে। আল্লাহর জমীনে আল্লাহরই আইন প্রতিষ্ঠা করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ করা হয়েছে। এটাই 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এর দাবি।

রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) "কেবলই পৌছে দেওয়ার" জন্য প্রেরণ করা হয়েছে এ কথাকে খোদ রাসূলুল্লাহর ﷺ হাদিস দ্বারাই খণ্ডন করা যায়। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন -
"আমি ক্বিয়ামত দিবসের পূর্বে তরবারী হাতে এ উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি যে, ইবাদাত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য বরাদ্দ হয়ে যাবে, আর আমার রিযিক আসে আমার বর্শার ছায়া হতে, আর যারা আমার আদেশের বিরুদ্ধে যাবে তাদের জন্য অপমান (আর লাঞ্ছনা) তাকদীরে নির্ধারিত হয়েছে, আর যে কেউ তাদের অনুকরণ করে সে তাদেরই একজন।" (মুসনাদে আহমাদ ৪৮৬৯; সহীহ আল জামি' ২৮৩১)

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) কাজ তাওহিদের শিক্ষা পৌছে দেওয়া তার যার ইচ্ছা মানবে যার ইচ্ছা মানবে না, রাসূলুল্লাহকে (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) "কেবল পৌছে দেওয়ার জন্য" প্রেরণ করা হয়েছে এই ভ্রান্ত দাবির খন্ডন এই লাইনেই আছে – "আমি ক্বিয়ামত দিবসের পূর্বে তরবারী হাতে এ উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়েছি যে, ইবাদাত কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য বরাদ্দ হয়ে যাবে..."
তারপরও যদি কারো মনে সন্দেহ থেকে থাকে তবে তিনি নিচের হাদিসটি দেখতে পারেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন –

আমি মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।" সুতরাং যে ব্যক্তি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এ সাক্ষ্য দিবে তাঁর জান-মাল আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের কোনো হক ব্যতীত। আর তার অন্তরের হিসাব আল্লাহ তাআলার উপর ন্যস্ত। [সহিহ বুখারী, হাদিস: ২৭৮৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস: ১৩৪]
এছাড়া ক্বুরআনের অনেক আয়াত এবং হাদিস থেকে প্রমাণিত হয় যে রাসূলুল্লাহ কেবল "পৌঁছে দিতে" না বরং আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে আইন প্রণেতা, বিচারক, সংস্কারক, পথ প্রদর্শক এবং যোদ্ধা হিসেবে প্রেরিত হয়েছেন, এবং ইসলাম শুধু "পৌঁছে দেওয়ার" জন্য না বরং আল্লাহর যমীনে বাস্তবায়িত হবার জন্য পাঠানো হয়েছে। এবং আল্লাহ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল মানুষের উপর ফরয করেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর (সাল্লাল্লাহু আ'লাইহি ওয়াসাল্লাম) আনীত শারীয়াহর অনুসরণের।
আল্লাহ বলেন –
অতএব, (হে নাবি!) তোমার পালনকর্তার কসম, সে লোক ঈমানদার হবে না, যতক্ষণ না তাদের মধ্যে সৃষ্ট বিবাদের ব্যাপারে তোমাকে ন্যায়বিচারক বলে মনে না করে। অতঃপর তোমার মীমাংসার ব্যাপারে নিজের মনে কোন রকম সংকীর্ণতা পাবে না এবং তা সন্তুষ্টচিত্তে কবুল করে নেবে। [আন-নিসা, ৬৫]
তিনিই প্রেরণ করেছেন আপন রাসূলকে হিদায়াহ ও সত্য দ্বীন সহকারে, যেন এ দ্বীনকে অপরাপর দ্বীনের উপর জয়যুক্ত করেন, যদিও মুশরিকরা তা অপ্রীতিকর মনে করে। [সূরা তাওবাহ ৩৩]
"আর তোমরা তাদের সাথে লড়াই কর, যে পর্যন্ত না ফিতনার অবসান হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর যদি তারা নিবৃত হয়ে যায় তাহলে কারো প্রতি কোন জবরদস্তি নেই, কিন্তু যারা যালেম (তাদের ব্যাপারে আলাদা)।" (২ঃ ১৯৩)
"আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায়; এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন।" (৮ঃ ৩৯)
এছাড়া এ বিষয়ে আরো অনেক, অনেক প্রমাণাদি বিদ্যমান।

কিন্তু যখন "ধর্মের ব্যাপারে কোনও বাধ্যবাধকতা নেই" বা "আপনার কাজ শুধু পৌঁছে দেওয়া" এই আয়াতগুলো মূল বিষয় এড়িয়ে বিচ্ছিন্নভাবে উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের এই বিষয়ে জ্ঞান কম তারা ভুল ধারণা করতে শুরু করে আর ভাবে ইসলামে বোধ হয় শরীয়াতের ছায়াতলে আসতে বাধ্য করাতে বা আক্রমণাত্মক যুদ্ধ করবার কোনো নিয়ম নেই, অথবা যে যার যার মতো ধর্ম পালন করবে, আইন প্রনয়ন ও অনুসরণ করবে আর এ ব্যাপারে ইসলামের কিছু বলার নেই। । অথচ ব্যাপারটি মোটেও তা নয়।

সাধারণত কাফিরদের, মুসলিম নামধারী মুনাফিকদের আর দ্বীনকে ইহুদি খ্রিস্টানদের মত কেটে নিজের মনগড়া করা মডারেটদের তাই এই আয়াতগুলো বেশি বেশি বিচ্ছিন্নভাবে প্রচার করতে দেখা যায়।

পোস্ট ৭

একটি পোস্টে বলা হয়েছে আল্লাহ তাঁর সমস্ত সৃষ্টিকে ভালবাসেন। অথচ পবিত্র কুরআনে স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহুতা'লা প্রায় ২০ টি আয়াত বলেছেন আল্লাহ কাফিরদের, সীমা অতিক্রমকারীদের, দুষ্কৃতিকারীদের, অহংকারীদের ভালবাসেন না।



কয়েকটি আয়াতের অর্থসমূহ একে একে পেশ করা হল। একবার চোখ বুলাতে পারেনঃ

"... নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে ভালবাসেন না।" (২ঃ ১৯০)

"... নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা অতিক্রমকারীদেরকে পছন্দ করেন না।" (৫ঃ ৮৭)

"তোমরা স্বীয় প্রতিপালককে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে। তিনি সীমা অতিক্রমকারীদেরকে ভালবাসেন না।" (৭ঃ ৫৫)

"আল্লাহ তা'আলা সুদকে নিশ্চিহ্ন করেন এবং দান খয়রাতকে বর্ধিত করেন। আল্লাহ কোনোই কাফির পাপীকে ভালবাসেন না ।" (২ঃ ২৭৬)

"বলুন, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য প্রকাশ কর। বস্তুতঃ যদি তারা বিমুখতা অবলম্বন করে, তাহলে আল্লাহ কাফেরদিগকে ভালবাসেন না।" (৩ঃ ৩২)

"পক্ষান্তরে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রাপ্য পরিপুর্ণভাবে দেয়া হবে। আর আল্লাহ অত্যাচারীদেরকে ভালবাসেন না।" (৩ঃ ৫৭)

"আর উপাসনা কর আল্লাহর, শরীক করো না তাঁর সাথে অপর কাউকে। পিতা-মাতার সাথে সৎ ও সদয় ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, এতীম-মিসকীন, প্রতিবেশী, অসহায় মুসাফির এবং নিজের দাস-দাসীর প্রতিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ পছন্দ করেন না দাম্ভিক-গর্বিতজনকে।" (৪ঃ ৩৬)

এছাড়াও কুরআনের এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ যাদের ভালবাসেন না তাদের লিস্ট দিয়ে দিয়েছেনঃ

৩০ঃ ৪৫, ৩ঃ ১৪০, ৪২ঃ ৪০, ৩১ঃ ১৮, ৫৭ঃ ২৩, ৪ঃ ১০৭, ৪ঃ ১৪৮, ৫ঃ ৬৪, ২৮ঃ ৭৭, ৫ঃ ৮৭, ৬ঃ ১৪১, ৭ঃ ৩১, ১৩ঃ ২৩, ২২ঃ ৩৮, ২৮ঃ ৭৬

উপসংহার

বর্তমান সময়ে ইসলাম ও মুসলিমরা নানামুখী আক্রমনের শিকার। এবং বিভিন্ন কারণে মুসলিমরা দুর্বল অবস্থায় আছে। এ কারণে অনেক সময় আমাদের মধ্যে হীনমন্যতা কাজ করে। ইসলামবিদ্বেষী, অথবা কাফিররা যখন ইসলামের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ তোলে তখন অনেক ক্ষেত্রেই আমরা যে কোন মূল্যে ইসলামকে তাদের ঠিক করে দেওয়া মানদণ্ড অনুযায়ী "সঠিক" প্রমাণে ব্যস্ত হয়ে যাই। কিন্তু বর্তমান সভ্যতার মানবসৃষ্ট মানদন্ড আর আসমান ও যমিনের সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত মানদণ্ড এক না, একথাটি আমরা ভুলে যাই। আমাদের হীনমন্যতার আরেকটি ফলাফল হল যখনই কেউ ইসলামের পক্ষে কিছু বলছে বলে মনে হয়ে আমরা খুশি হয়ে তাকে সমর্থন দেওয়া শুরু করি। কিন্তু আদৌ সে যা বলছে সেটা ইসলামসম্মত কি না – আমরা যাচাই করে দেখি না।

এসব কারণে যখন আমরা দেখতে পাই কেউ ইসলামের সমর্থন এমেওন কোণ কথা বলছে যেটা পশ্চিমের নির্ধারিত মানদন্ডের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ অথবা পশ্চিমের উত্থাপিত অভিযোগগুলোর বিরুদ্ধে উত্তর হিসেবে উপস্থাপনযোগ্য, আমরা সেটাকে সমর্থন দেই। আর United For Peace এর মতো পেইজগুলো এই সুযোগটাকেই কাজে লাগায়। আমাদের হীনমন্যতা ও অজ্ঞতার সুযোগ নিয়ে এমন বিষয় প্রচার করে যা বাহ্যিকভাবে সুন্দর মনে হলেও আসলে কুফর ও শিরক। এ কারণে আমাদের প্রথমত উচিৎ এ ধরণের সুযোগসন্ধানীদের ব্যাপারে নিজে সতর্ক হওয়া ও অন্যকে সতর্ক করা। আর তারপর আমাদের উচিৎ ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলো সম্পর্কে, তাওহিদ সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জন করা। কারণ কেবল তাওহিদের জ্ঞান এবং তাওহিদের উপর দৃঢ় থাকার মাধ্যমেই আপনি পৃথিবীর ফিতনা থেকে এবং বিচার দিবসের ফিতনা থেকে রেহাই পেতে পারবেন।
দ্বীনের মধ্যে জবরদস্তির অবকাশ নেই, নিশ্চয় হিদায়াত গোমরাহী হতে সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। কাজেই যে ব্যক্তি মিথ্যে তাগুতকে (সকল মিথ্যা ইলাহ) অমান্য করল এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান আনল, নিশ্চয়ই সে দৃঢ়তর রজ্জু ধারণ করল যা ছিন্ন হওয়ার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা এবং সর্বজ্ঞাতা। [সূরা বাক্বারা, ২৫৬]
আল্লাহ আমাদের অনুধাবন করার এবং আমল করার তাওফিক্ব দান করুন, আমীন।

১৬৯

সংঘর্ষ তত্ত্ব

-তানভীর আহমেদ

[১]

খ্রিস্টেরও জন্মের ৩৫০ বছর আগের গ্রিস। সেসময়ে জ্ঞানচর্চার কেন্দ্রবিন্দু। জ্ঞান গরিমায় পর পর সক্রেটিস, প্লেটোর পর গ্রিসে জ্ঞানচর্চায় আরেকটি নাম ধ্বনিত হচ্ছে, অ্যারিস্টটল। দর্শন, যুক্তিবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, পৌরনীতি সব... সবকিছুতেই যেন অ্যারিস্টটলের কিছু না কিছু বলার আছে।

সাধারণ মানুষের খেটে খাওয়া জীবনে জ্ঞানচর্চার সময় অপ্রতুল, ইচ্ছে থাকলেও খরচাপাতির কারণে সেটা যেন উচ্চবিত্তদের জন্যই বরাদ্দ। কিন্তু জ্ঞানীদের ধ্যানধারণার খোঁজখবর তারা রাখে। অ্যারিস্টটল জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে টলেমি আর প্লেটোর সাথে মিল রেখে নিজের মতামত ব্যক্ত করলেন। আর তা হলঃ পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে, সূর্যসহ অন্যান্য গ্রহ আর মহাজাগতিক বস্তু পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।

.

প্রথম শতাব্দী, চলছে বাইবেলের সংকলনের কাজ। এখনও দাপটের সাথে টিকে আছে গ্রিক জ্ঞানগরিমা। এতই দাপট যে গ্রিক ভাষাই তখন সভ্য পৃথিবীর ভাষা। তাই প্রাচীন হিব্রুতে না করে গ্রিক ভাষাতেই নতুন সংকলন চলছে। বাইবেলে চলে এল জ্যোতির্বিজ্ঞান নিয়ে প্লেটো-অ্যারিস্টটলদের 'জিওসেন্ট্রিক' মতবাদ অর্থাৎ, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্রে রয়েছে সেকথা। তাও একটি দু'টি জায়গায় নয়। রীতিমত চার-পাঁচ জায়গায়। (Chronicles 16:30, Psalm 93:1, Psalm 96:10, Psalm 104:5, Ecclesiastes 1:5)

.

ষষ্ঠ শতাব্দীর আরব। মরুভূমির ভেতর একজন দাবি করলেন সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে সর্বশেষ নবুওয়্যাতের। নাম মুহাম্মাদ ﷺ. বাইবেল সংকলকদের মত লেখাপড়া জানা মানুষ নন। কিন্তু তিনি বলছেন অশ্রুতপূর্ব সব বাণী... আরবি জেনেও আরবরা মুগ্ধ। আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রেরিত শেষ আসমানি কিতাব 'আল-কুরআন' নিয়ে এসেছেন তিনি।

আল কুরআনে খ্রিস্টানদের কিতাব বিকৃতির কথা এল। অর্থাৎ, খ্রিস্টানরা তাদের জন্য প্রেরিত কিতাবে নিজ থেকে মনগড়া গল্প, সংযোজন, বিয়োজন যা পেরেছে করেছে। পূর্ববর্তী নবী রাসূল আর ঈমানদারদের ঘটনার পাশাপাশি মানব সৃষ্টিরহস্য, মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য সবকিছু নিয়েই আয়াত এল। কিন্তু সেই গল্প আরেকটু পর হলেই বরং উত্তম।

.

[২]

প্রায় সহস্র বছর পরের কথা। ১৬৩৩ সাল। ক্যাথোলিক চার্চ থেকে ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ এল ইতালিয়ান পলিম্যাথ, জ্যোতির্বিদ ও বিজ্ঞানী গ্যালেলিও গ্যালেলির নামে, যাকে আগে কয়েকবার সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল।

১৬০৯ এ বিজ্ঞানী কেপলারের Astronomia nova প্রকাশিত হয়। সেখানে বাইবেলের শিক্ষার বিরুদ্ধে গিয়ে বিজ্ঞানী কোপার্নিকাসের দেওয়া 'হেলিওসেন্ট্রিক থিউরি' এর পক্ষে ছিল সমর্থন। ঠিক পরের বছরই বের হয় গ্যালেলিওর Sidereus Nuncius, যেখানে ছিল গ্যালেলিওর নিজের বানানো টেলিস্কোপের প্রাথমিক অবজারভেশনগুলো। বইটিতে কেবল ইঙ্গিতেই সীমাবদ্ধ থাকলেও এর পরপরই বিজ্ঞানী গ্যালেলিও কোপার্নিকাসের হেলিওসেন্ট্রিক মতবাদের প্রতি জোরালো সমর্থন শুরু

করেন। কেবলই মতবাদ নয়, বরং তা সত্য হিসেবে প্রচার শুরু করেন।

.

এদিকে চার্চগুলো স্রেফ হাইপোথিসিস হিসেবে এতকাল হেলিওসেন্ট্রিক থিউরির তেমন বিরোধিতা না করলেও ফ্যাক্ট হিসেবে প্রচার দেখেই তাদের মাথা খারাপ হয়ে যায়। এর মূল কারণ ছিল বাইবেলের সেই আয়াতগুলো যেগুলো 'পৃথিবী কেন্দ্রে আর সূর্যসহ অন্যান্য গ্রহগুলো পৃথিবীর চারপাশে ঘুরছে' তথা জিওসেন্ট্রিক মতবাদকেই সমর্থন করে।

.

ক্যাথলিক চার্চ তাদের অবস্থান, ক্ষমতা ও অহমিকা প্রমাণ করেছিল ১৬০০ খ্রিস্টাব্দে আরেক বিজ্ঞানী জিওর্দানো ব্রুনোকে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করে। সেই একই কারণে... ব্রুনোও বলেছিল পৃথিবী নয় বরং সূর্যই কেন্দ্রে রয়েছে। জ্ঞানচর্চার যুগে বাইবেলের অনুসারীরাও যে কমবেশি রিজনিং আর কম্পেয়ার বেসড প্রচার-প্রসারে মেতে উঠেছিল তারই ফল ছিল এই ঘটনা। কেননা গ্রিক ভাষায় সংকলনের সময় সলিড ফ্যাক্ট হিসেবে জানা জিওসেন্ট্রিক মতবাদ সমর্থন করে এমনসব ভার্স ঢুকিয়ে পরবর্তীতে ফায়দা লুটা হয়েছিল অনেক। 'এই দেখ বাইবেল আধুনিক জ্ঞান সম্মত' ধরনের প্রচারণায় উক্ত ভার্সগুলো হরহামেশাই আনা হতো। তাই গ্যালেলিও যখন আগের শতাব্দীতে কোপার্নিকাসের দেওয়া 'হেলিওসেন্ট্রিক মতবাদ' নতুন করে ফ্যাক্ট হিসেবে প্রচার শুরু করেছিলেন, তখন তা এড়িয়ে যাবার উপায় ছিল না মোটেও। কেননা সাধারণেরাও দিব্যি জানতো যে তা বাইবেলের শিক্ষার বিরোধী হয়ে যাচ্ছে।

.

এমতাবস্থায় গ্যালেলিও যখন আবারও হেলিওসেন্ট্রিক মতকে সত্য প্রচারে নামেন তখন ক্যাথলিক চার্চের মাথা বিগড়ে যায়। ঘটনাক্রমে গ্যালেলিও নিজ ছাত্র Benedetto Castelli কে একটি চিঠি লিখেন যেখানে বাইবেলের ব্যাপারে 'গ্যালেলিওর দৃষ্টিভঙ্গি' উল্লেখ ছিল। পরবর্তীতে ১৬১৫ সালে এসে "Letter to The Grand Duchess Christina" নামে একটি খোলাচিঠি লিখেন যেখানে গ্যালেলিও নিজের মতামত শক্ত করে ব্যক্ত করার পাশাপাশি নিজেকে একজন ক্যাথলিক ধর্মভীরু হিসেবেও উল্লেখ করেন। সাথে তিনি বাইবেলের ভার্সগুলোর ভিন্ন ব্যাখ্যা থাকবার সম্ভাবনাও উল্লেখ করেন। এই চিঠির ব্যাপারটি রাতারাতি দিগ্বিদিক ছড়িয়ে যায়।

.

সেই চিঠির পরই মূলত গ্যালেলিওর উপর ক্যাথলিক চার্চের খড়গ নেমে আসে। গ্যালেলিওকে হেলিওসেন্ট্রিক মতবাদ প্রচার থেকে কড়াভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। সেই সাথে নিষিদ্ধ করা হয় কোপার্নিকান সকল লিখা ও বই। ১৬১৬ সালে ক্যাথলিক চার্চ হেলিওসেন্ট্রিজমকেই নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

.

এমনসব ঘটনার পর গ্যালেলিও রোমে চলে যান এবং এসব বিষয়ে নীরবতা অবলম্বন করতে থাকেন। কিন্তু কালক্রমে ১৬২৩ সালে পোপ পরিবর্তন হয়ে নতুন পোপ Pope Urban VIII আসে, যে কিনা গ্যালেলিওর ভক্ত ও অনুরাগী ছিলেন। তাই গ্যালেলিও এই সুযোগে আরেকটি বই লিখেন যা ১৬৩৩ সালে প্রকাশিত হয়। বইটির নাম "Dialogue Concerning the Two Chief World Systems" যেখানে তিনজন ব্যক্তির আলাপচারিতা আকারে টলেমি আরিস্টটলদের জিওসেন্ট্রিজমের অসাড়তা ও কোপার্নিকান হেলিওসেন্ট্রিজমের যৌক্তিকতা উল্লেখ করা হয়। বইটির তিনটি চরিত্রের একটি চরিত্র ছিল টলেমি-আরিস্টটলদের জিওসেন্ট্রিজমে বিশ্বাসী, আরেকটি চরিত্র ছিল হেলিওসেন্ট্রিজমে বিশ্বাসী আর শেষ চরিত্রটি ছিল নিরপেক্ষ জ্ঞানী।

.

পরোক্ষভাবে এইরূপ প্রচারেও গ্যালেলিওর শেষ রক্ষা হয় নি। ক্যাথলিক চার্চ থেকে এবার ধর্মদ্রোহিতার অভিযোগ এনে গ্যালেলিওকে আজীবন কারাদন্ড দেওয়া হয়। তবে শারীরিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে গৃহবন্দী করে রাখার সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হয়। গৃহবন্দী অবস্থাতেই ১৬৪২ সালের জানুয়ারিতে গ্যালেলিও মারা যান।

.

[৩]

ক্যাথলিক চার্চের সাথে বিজ্ঞানী গ্যালেলিও গ্যালিলির সংঘর্ষময় ঘটনাপ্রবাহ ‘Galileo affair’ নামে পরিচিত। একইসাথে এটি পরবর্তী বিজ্ঞানচর্চাকারী ও বিজ্ঞান অনুরাগীদের এক অনুপ্রেরণা হয়ে উঠে। কিন্তু কোপার্নিকাস, কেপলার আর গ্যালেলিওদের মতবাদে সূর্যকে কেন্দ্রে মনে করার বিষয়টি থাকলেও সূর্যকে মহাবিশ্বের কেন্দ্র ও স্থির হিসাবে বিবেচনা করা হয়েছিল।

.

আল্লাহ রব্বুল আ'লামীন বলেন, “তিনিই সৃষ্টি করেছেন রাত্রি ও দিন এবং সূর্য ও চাঁদ। সমস্তকিছুই আপন আপন কক্ষপথে বিচরণ করে।” (সূরা আম্বিয়া, ২১: ৩৩)”

.

উক্ত আয়াতে ‘বিচরণ করা’ অর্থে ব্যবহৃত শব্দটি হল ‘ইয়াসবাহুন’ যা কিনা ‘সাবাহা’ শব্দটি থেকে এসেছে। আর ‘সাবাহা’ শব্দটি Motion বা Change in Position অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অর্থাৎ, শব্দটি কোন মাটিতে চলা ব্যক্তির ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে বুঝতে হবে সে হাঁটছে অথবা দৌঁড়াচ্ছে। শব্দটি পানিতে থাকা কোন লোকের ক্ষেত্রে বলা হলে এর অর্থ এই না যে লোকটি ভাসছে, বরং বুঝতে হবে লোকটি সাঁতার কাটছে। অর্থাৎ সে তার অবস্থানের পরিবর্তন করছে৷ আর শব্দটি কোন মহাজাগতিক বস্তুর (Celestial body) ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে এর অর্থ হয় তা স্থির নেই!বরং গতিশীল ,

.

এছাড়াও আল্লাহ রব্বুল আলামীন বললেন ‘সমস্তকিছু’! অর্থাৎ, সমস্ত মহাজাগতিক বস্তু (celestial body) - পৃথিবী, চাঁদ, সূর্য, অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ, অন্যান্য নক্ষত্ররাজি, গ্যালাক্সিসমূহ কোনোকিছুই বাদ নয়। আজ ক্লাস নাইন টেনের সায়েন্স স্টুডেন্টরাও জানে পরম স্থিতি বা পরম গতি বলতে কিছু নেই কারণ মহাবিশ্বের সকল কিছুই প্রকৃতপক্ষে গতিশীল। অতি সাম্প্রতিক গবেষণায় সূর্যের নিজ অক্ষে ঘূর্ণন ও কক্ষপথ দিয়ে মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সিতে আবর্তনের ব্যাপারটি স্পষ্ট। সূর্য প্রায় ২৫ দিনে নিজ অক্ষে ঘূর্ণন সম্পন্ন করে আর প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ২৫১ কি.মি. বেগে মোট ২২৫ থেকে ২৫০ মিলিয়ন বছরে Milkyway Galaxy এর কেন্দ্রের চারদিকে আবর্তিত হয়। আবার Milkyway Galaxy ও নিকটতম Andromeda galaxy ও স্থির নেই। উভয়ই দুর্দান্ত গতিতে নিকটতম Virgo Cluster বা গ্যালাক্সিপুঞ্জের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

.

কুরআনের কোথাও ‘পৃথিবী স্থির’ একথা বলা হয় নাই। অথচ বাইবেলের প্রায় পাঁচটি জায়গায় সুস্পষ্টভাবে ‘পৃথিবী স্থির’ ইঙ্গিত দেয়। কিন্তু কুরআনের এই মু'জিযা আগেও আলোচিত হয়েছে বহুবার৷ আর বর্তমান প্রেক্ষাপটে এর চেয়েও চিন্তা উদ্রেককারী গুরুত্বপূর্ণ কিছু ব্যাপার আড়ালেই থেকে গেছে বারবার। সেই সাথে অধিকাংশ সময় আড়ালেই থেকে গেছে আমাদের জ্ঞানচর্চার কিছু মূলনীতি।

.

[8Conflict Thesis [

Conflict Thesis হল ধর্ম ও বিজ্ঞানের মৌলিক চিন্তাগত সংঘর্ষকে আবশ্যক ধরে নিয়ে করা ইতিহাসভিত্তিক পর্যালোচনা। শব্দগতভাবে নতুন হলেও ব্যাপারটি নাস্তিক্য ও সেক্যুলার সমাজে অল্প সময়েই জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং New Atheism এর ভিত্তিতে পরিণত হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর (১৮০১-১৯০০) দ্বিতীয়ার্ধে প্রাণসৃষ্টির ব্যাপারে খ্রিস্টীয় পাদ্রীদের সাথে বিজ্ঞানমহলের নতুন করে দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ১৮৭০ এর দিকে সেই দ্বন্দ্ব তুঙ্গে উঠে। এমতাবস্থায় John William Draper নামে একজন বিজ্ঞানী সেই পুরনো Galileo affair কে ভিত্তি বানিয়ে এক থিসিস লিখে ফেলেন যা ১৮৭৪ এThe Warfare of Science নামে বই আকারে প্রকাশিত হয়। ‘প্রাণসৃষ্টি’-কে কেন্দ্র করা এবারের দ্বন্দ্বে ডারউইনের ইভল্যুশন সমর্থনকারীরা প্রমাণ, গবেষণা ও যৌক্তিকতায় না হেঁটে ক্যাথলিক চার্চের ঐতিহাসিক নির্যাতনের আলোচনায় মোড় ঘুরিয়ে দেয়। জনপ্রিয় হয় Conflict Thesis. আর ‘Apeal To Emotion’ ফ্যালাসির ফাঁদে পা দিয়ে জন্ম হয় সায়েন্টিজমের।

.

সূর্যকে কেন্দ্রে ধরা হলেও একইসাথে 'স্থির' ও ক্ষেত্রবিশেষে 'মহাবিশ্বেরই কেন্দ্রে' দাবি করে কোপার্নিকাস, ব্রুনো আর গ্যালিলিওরা তাহা ভুল করেছিলেন। কিন্তু তবুও তাদের অবদান কেন এতটা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করা? অনেকে ভাবতে পারেন সেই সময়ে আরও আধুনিক প্রযুক্তি দিয়ে অবজারভেশন সম্ভব হয় নি। এটা সত্য হলেও মূল কারণ ছিল না। মূল কারণ ছিল এই বিজ্ঞানীদের ত্যাগ স্বীকারের ব্যাপারটি। ক্যাথলিক চার্চ থেকে অকথ্য নির্যাতনের সম্ভাবনার কথা জেনেও নিজেদের বিশ্বাসের প্রতি তারা অটল ছিলেন। জিওদার্নো ব্রুনোকে তো The Martyr of Science নামেও অভিহিত করা হয়। একারণে সুর্য স্থির বলে ভুল করলেও বিজ্ঞানী, বিজ্ঞান চর্চাকারী ও অনুরাগীদের অনুপ্রেরণা হয়ে যান ব্রুনো-গ্যালেলিওরা। কিন্তু সত্য খোঁজার অনুপ্রেরণা না হয়ে ব্যাপারটিকে 'ধর্ম ও বিজ্ঞানের চিরন্তন বিদ্বেষ' এ নিয়ে যাওয়া তো স্পষ্ট বাড়াবাড়ি, স্পষ্ট ভ্রান্তি।

.

Conflict Thesis এ Galileo affair এর পর ক্রমে ক্রমে Flat Earth vs Spherical Earth দ্বন্দ্ব এবং শেষে Evolutionism vs Creationism এর আলোচনা করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় কয়েকটি।

.

এক. রোমান ক্যাথলিক চার্চের সাথে হওয়া ঐতিহাসিক দ্বন্দ্বগুলোর বরাত দিয়ে 'সকল ধর্মের' সাথেই বিজ্ঞানের চিরন্তন দ্বন্দ্বের এক নীলনকশা আঁকা হয়েছে। এমনকি Draper এর সর্বপ্রথম থিসিসেও ইসলামের কথা বাদ যায় নি।

.

দুই. কোনোবিষয়ে বিজ্ঞান ও ধর্মের অমিল হলে সিস্টেমনির্গত বিজ্ঞানীদেরকেই সর্বদা সত্য আর বিজ্ঞানকে সুপিরিয়র বলে চালিয়ে দেওয়ার এক মানসিকতা রচনা করা হয়েছে। এবং আজ অবধি তা চালু রয়েছে। Hollywood এর সিনেমা থেকে শুরু করে দেশীয় জাফর ইকবালদের 'একটুখানি বিজ্ঞান' সমস্ত মাধ্যমেই তা স্পষ্ট হয়।

.

তিন. যেহেতু এক শ্রেণীর আস্তিকদের সাথেই দ্বন্দ্ব হয়েছিল, তাই আস্তিকতার দিকে যায় এমনসব বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও ফলাফল কঠোরভাবে দমন করা শুরু হল। আর নাস্তিক্যবাদী হাইপোথিসিসগুলোকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে প্রচার করা শুরু হল। গ্লোবাল সায়েন্টিফিক কমিউনিটিগুলোই ধীরে ধীরে নাস্তিকতার সিস্টেমে পড়ে গেল।

.

[৫]

ধর্ম ও বিজ্ঞানের সংঘর্ষ লাগিয়ে রাখার ব্যাপারটি কি সীমা অতিক্রম করে ফেলেছে? সায়েন্টিফিক কমিউনিটিগুলোর এখনকার অবস্থাই বা কেমন? বিজ্ঞানীদের কেউ কি এখনও বৈষম্য ও নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন? এই প্রশ্নগুলো গুরুত্বপূর্ণ। এবং এগুলোর উত্তর খুঁজতে গেলেই পাওয়া যায় গ্লোবাল সিস্টেমের আসল রূপ।

.

Dr. Richard Von Sternberg হলেন Molecular Evolution এবং Theoritical Biology তে আলাদাভাবে Phd করা একজন বিজ্ঞানী। ৩০ টিরও উপর Peer Reviewed সায়েন্টিফিক বই ও জার্নালে তার লিখা বিভিন্ন সময়ে প্রকাশিত হয়। এতকাল কোনো সমস্যা না হলেও ২০০৪ সালের আগস্টে তার দায়িত্বে আরেকটি Peer Reviewed Article প্রকাশিত হয়। আর্টিকেলটির মূল লেখক ছিলেন Stephen C. Meyer যিনি নিজেও কেম্ব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে PhD করা এবং Discovery Institute এর একজন সিনিয়র ডিরেক্টর। আর্টিকেলটির নাম ছিল "The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories"। সেখানে প্রাণসৃষ্টির আণবিক গঠন অত্যন্ত জটিল বলে ডারউইনিইয়ান ইভোল্যুশন এর বদলে "intelligent design" এর সম্ভাবনার কথা হয়েছিল আর বিজ্ঞানী Sternberg এর হাত ধরেই তা প্রকাশিত হয়েছিল।

.

কিন্তু আর্টিকেলটি প্রচারের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই Smithsonian Institution যা কিনা ওই জার্নালটির ফান্ডিং করতো, সেখানকার সিনিয়র বিজ্ঞানীরা ড. Sternberg কে অযোগ্য, ধর্মান্ধ নানা ভাষায় অপদস্থ করা শুরু করেন। বিজ্ঞানী Sternberg

কে টাকা খেয়ে একাজ করেছেন, খ্রিস্টীয় স্লিপার সেল অপারেটিভ – নানারকম অপবাদ দেওয়া হয়। Creationism এর পক্ষে যায় – কেবল এমন আর্টিকেলের অনুমতি দেওয়াতেই বিজ্ঞানী Sternberg এর উপর সায়েন্স কমিউনিটিগুলোর খড়্গ নেমে আসে। (১)

.

ইংল্যান্ডের Southampton থেকে Cell Biology তে PhD করা Dr. Caroline Crocker ভার্জিনিয়ার George Mason বিশ্ববিদ্যালয়ে Cell Biology এর কোর্স করাতেন। তার লেকচারে কোষের জটিল গঠন নিয়ে বলতে গিয়ে "intelligent design" এর সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছিলেন মাত্র। পাবলিকলি নিজ মত প্রকাশ করায় তিন বছর কন্ট্রাক্ট থাকা সত্ত্বেও আর্থিক অযুহাত দেখিয়ে Dr. Caroline Crocker কে চাকরি থেকে বহিষ্কার করা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কন্ট্রাক্ট শেষ হয়ে যাবার দাবি করা হয়। পরবর্তীতে তিনি আবিষ্কার করেন, চাকরির ক্ষেত্রে তিনি রীতিমত ব্ল্যাকলিস্টেড হয়ে গিয়েছেন। সর্বশেষ প্রকাশিত Free To Think বইয়ে তিনি ব্যাপারগুলো বর্ণনা করেছেন। (২)

.

ইভোলুশনিস্টদের গোঁয়ার্তুমি নিজেদের দিকেই ব্যাকফায়ার করার দৃষ্টান্তও রয়েছে। ২০০৮ সালে Professor Michael Reiss শিক্ষার্থীদের Creationism সম্পর্কেও পড়াবার মত প্রকাশ করার পরের সপ্তাহেই ব্রিটেনের Royal Society থেকে পদত্যাগ করেন। মজার ব্যাপার হল, Professor Reiss নিজেও একজন ডারউইনিস্ট। তিনি Creationism নিয়ে শিক্ষার্থীদের ক্রমাগত প্রশ্নগুলো ধামা চাপা না দিয়ে এটাও আরেকটা ওয়ার্ল্ড ভিউ হিসেবে আর ভুল - অন্তত এমনটা বলবার কথা বলেছিলেন। আর তাতেই কিনা তাকে Royal Society থেকে পদত্যাগ করতে হয়। (৩)

.

বায়োলোজিস্ট, নিউরোসায়েন্টিস্ট, জোতির্বিদ, পদার্থবিজ্ঞানী যারাই নিজেদের গবেষণাক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়াদির Cause হিসাবে Intelligent Design এর সম্ভাবনার কথা বলেছেন তাঁরাই নিগৃহীত হয়েছেন। Ben Stein পরিচালিত Expelled: No Intelligence Allowed নামক ডকুমেন্টারিতে Intelligent Design এর প্রস্তাবক অনেকের উপর নির্যাতনের বিবরণ ফুটে উঠেছে। (৪) বলাই বাহুল্য, নাস্তিকদের এই ডকুমেন্টারি পছন্দ হয় নাই। অথচ ডকুমেন্টারির ইতি টানা হয়েছিল বিজ্ঞানী ও গবেষকদের নিজস্ব ধারণা কোনোরকম জুলুম ছাড়া প্রকাশ করবার দাবি জানিয়ে। ঠিক যেমনটা Galileo affair এর পর চাওয়া হয়েছিল।

.

Conflict Thesis এর বর্তমান আলোচিত বিষয়গুলো Evolution vs Intelligent Design যা প্রাণসৃষ্টির ব্যাপারে দুই ওয়ার্ল্ড ভিউয়ের সংঘর্ষকে আলোকপাত করে। আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, Multiverse vs Intelligent Design যা মহাবিশ্ব সৃষ্টির ব্যাপারে দুই ওয়ার্ল্ড ভিউয়ের সংঘর্ষকে আলোকপাত করে। আজগুবি ইভোল্যুশন না বলে যেসব গবেষক ও বিজ্ঞানীরা 'বুদ্ধিমান সত্ত্বা' বলছেন তাদের উপরই বর্তমান সায়েন্স কমিউনিটিগুলোর নির্যাতনের ব্যাপারটি যেন ক্যাথলিক চার্চের সেই নির্যাতনের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়। অবশ্য নাস্তিক্যবাদী মহল নির্যাতন করবে নাই বা কেন... এখন Intelligent Design ই প্রমাণ হয়ে যাওয়া মানে তো সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্বই প্রমাণ হয়ে যাওয়া। তখন তো আর বস্তুবাদী নাস্তিকতা চলবে না!

.

[৬]

ক্যাথলিক যুগে ব্রুনো গ্যালেলিওর উপর নির্যাতনের ঘটনা থেকে ঢালাওভাবে 'সকল ধর্মই একইরকম' উপসংহারে চলে আসা সত্যিই হাস্যকর। "Conflict Thesis" বা বিজ্ঞান আর ধর্মের দ্বন্দ্ব কিন্তু মূলত ধর্মগ্রন্থে ভুল থাকাকে রেফার করে। আর কুরআনে অনেক আগেই ঘোষণা করা হয়েছিল যে খ্রিস্টানরা তাদের কিতাব বিকৃতি করেছে। সুতরাং, ওদের কিতাবে ভুল থাকা তো আশ্চর্যের কিছু নয়। তাই বর্তমানের প্রতিষ্ঠিত সত্যের সাথে সহজেই ভুল থাকা বাতিল ধর্মগ্রন্থগুলোর অমিল থাকা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু সমস্যাটা শুরু হয় যখন কুরআনকেও ওই ধর্মগ্রন্থগুলোর সাথে একই কাতারে আনা হয়।

.

সর্বশেষ আসমানি কিতাব কুরআনে কোনো ভুল নেই। এছাড়াও ১৪০০ বছরের আগের কুরআনের সাথে কোনোকিছু সংযোজন-বিয়োজন হয় নি। ড. মরিস বুকাইলির বিখ্যাত ঘটনা আরেকবার আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। Conflict Thesis থেকে আরেকটি যে উপসংহার টানা হয়, তা হল ধর্মগ্রন্থগুলো মুক্তচিন্তার পথে বাধা দেয়। সেটাও খ্রিস্টানদের ক্যাথলিক নির্যাতনের রেফারেন্স থেকে জেনারালাইজ করে বলা হয়। ইসলামী বিশ্বে এমন একটি উদাহরণও তারা দেখাতে পারে না। বরং ইমাম আবু হানিফা (রহ), ইমাম আহমাদ (রহ) দের শত নির্যাতনেও নিজেদের অবস্থানে, ঈমানে অটল থাকবার ঘটনা কৌশলে এড়িয়ে যাওয়া হয়।

.

আল্লাহ রব্বুল আলামীন কুরআনকে 'চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন' করেছেন। কিন্তু একইসাথে এই নাস্তিক্য যুগে আমরা মুসলিমরা যেটা ভুলে যাই তা হল কুরআন মূলত সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর পক্ষ থেকে 'পথনির্দেশক'। তাই ইসলামী স্বর্ণযুগেও ক্যাথলিক চার্চের মত নির্যাতনের খবর পাওয়া যায় না। কারণ মুসলিমরা কুরআনে সময়ে সময়ে মু'জিযা দেখলেও জীবন গঠনেই ফোকাস করতো। মু জিযার খোঁজে পড়ে রইতো না। আর মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহর'ﷺ শিক্ষাও এই।

.

বিজ্ঞান পরিবর্তনশীল। 'আধুনিক বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে যায়' এমন আয়াত-হাদিস দেখলে আমরা সবর করি এবং আমরা জানি যে বরং বিজ্ঞানই ভুল বলছে। কুরআন নির্ভুল। কিন্তু মানবীয় ছোঁয়া পাওয়া অন্যান্য ধর্মগ্রন্থের কথা ভিন্ন।

.

তবে 'জ্ঞান পরিবর্তনশীল আর ভবিষ্যতে অধিকতর সঠিকটা জানা যাবে' বিজ্ঞান সম্পর্কে এমন ধারণা রেখে বিজ্ঞানকেই সুপিরিয়র মনে করা কিছু মানুষ রয়েছে। এমন দর্শন উপজীব্য করে বেঁচে থাকা অবিশ্বাসীদের বলি, আমরাও কিন্তু একই কথাই বলে যাই সবসময় –

"না, সত্ত্বরই তারা জানতে পারবে। অতঃপর না, সত্বর তারা জানতে পারবে।" (সূরা নাবা, ৪-৫)

---

(১) http://www.discovery.org/p/11

http://www.washingtonpost.com/…/…/08/18/AR2005081801680.html

http://www.discovery.org/a/2399.

http://www.richardsternberg.com/publications.php

.

(২) https://www.linkedin.com/in/drccrocker

https://creation.com/review-free-to-think-caroline-crocker

(৩) http://www.independent.co.uk/…/creationist-row-forces-scien…
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7619670.stm

.

(৪) https://www.youtube.com/watch?v=V5EPymcWp-g

১৭০

উপলব্ধিঃ "ডারউইনিজম– সন্ত্রাসবাদের আঁতুড়ঘর"

-জাকারিয়া মাসুদ

বিশ্ববিদ্যালয়ের সবথেকে বিস্ময়কয় জায়গা হলো হলগুলো। যেখানে অধিকাংশ ছাত্র মানবেতর জীবন যাপন করে, আর কিছু ছাত্র রাজার হালে থাকে। কিছু কিছু হলের দিকে তাকালে আপনার কান্না চলে আসবে। ছাদ থেকে চুইয়ে পানি পড়া, দেয়ালের প্লাস্টার উঠে যাওয়া, একই কক্ষে গাদাগাদি করে দশজন পর্যন্ত বসবাস করা ইত্যাদি সেখানকার নিত্যনৈমিক ব্যাপার। আবার ছারপোকা ও টয়লেট সমস্যা তো আছেই। আবার কিছু কিছু হলে একেবারে রাজকীয় ভাব। টাইলস, মোজাইক, লিফট ইত্যাদির কোন কমতি নেই। ভালো হলে বরাদ্দ পাওয়ার পরও হলে থাকার সুযোগ হয় নি আমার। তাই হল লাইফ কেমন – আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়। শুনেছি হলে নাকি অল্প কিছুতেই মারামারি লেগে যায়। ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া চলে। কেন লেগে যায়, তা আমরা সবাই জানি। আমি সে কারণগুলো ব্যাখ্যা করতে চাচ্ছি না। অবশ্যি তার দরকারও নেই। কেননা আমাদের গল্পের সাথে তা সম্পর্কযুক্ত নয়।

.

কোন এক মারামারির বিচারে আমি আর ফারিস কবি নজরুল হলে বসা। রুম নাম্বার ২০২। সব মিলিয়ে রুমে আমরা পাঁচজন। আমি, ফারিস, নাসির, মিসবাহ, অপু। আলোচনা অনেক আগেই শুরু হয়েছে। তবে মূল আলোচনায় যেতে একটু বিলম্ব হচ্ছে। শাহেদ ভাই এলেই মূল পর্ব শুরু হবে। একটা জিনিস একটু ক্লিয়ার করলে ভালো হবে। মারামারি কী নিয়ে হয়েছিলো – সে বিষয়টা। গতকাল হলে অপু আর নাসিরের মধ্যে কথাকাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে হাতাহাতি। কালকের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা নিয়েই আজ আলোচনা।

.

হাতাহাতি কেন হয়েছিলো; সে কারণটা অবশ্যই জানা দরকার। কেননা তা গল্পের সাথে সম্পর্কযুক্ত। কাল নাসির আর অপুর মধ্যে আলোচনা হচ্ছিলো, ডারউইনিজম নিয়ে। এক পর্যায়ে নাসির বলে উঠলো, 'যত বড় বড় সন্ত্রাসবাদ এই পৃথিবীতে ঘটেছে; তাঁর মূলে রয়েছে ডারউইনিজম।'

.

এইতো অপু ক্ষেপে গেলো! এরপর দু'জনের মধ্যে কথাকাটাকাটি। পরে হাতাহাতি। অপু অতিকায় দেহ বিশিষ্ট্য প্রাণি। বদ মেজাজিও বটে। অল্পতেই রেগে যায়। রাগ উঠে গেলে আর রক্ষে নেই। থাকেও এক বদমেজাজি লোকের সাথে। দিন দিন ওর মেজাজ আরো চড়া হয়ে যাচ্ছে। নাসির হ্যাংলা পাতলা গড়নের। চুপচাপ স্বভাবের লোক। নিয়মিত সালাত আদায় করে। দাড়ি রেখেছে মাসখানিক হলো।

.

ওদের বিবাদ মিমাংসা করতেই আমরা জমায়েত হয়েছি। নাসিরের পক্ষে আমি আর ফারিস। আর অপুর পক্ষে মিসবাহ আর শাহেদ ভাই। যার জন্যে আমরা অপেক্ষা করছি, মানে শাহেদ ভাই; তিনি এলেন আধঘণ্টা পর। তিনি আসার পর নতুন করে আলোচনা শুরু হলো। আমরা যারা এখানে আছি, তাঁরা সবাই বিষয়টা আগে থেকেই অবগত। শাহেদ ভাইকেও আগেই জানানো হয়েছে। তাই কী হয়েছিলো সে বিষয়ে নতুন করে আলোচনার দরকার নেই। সরাসরি মূল পর্বে যাওয়াই ভালো। শাহেদ ভাই বললেন, 'অপু আর নাসির! তোদের কারো কিছু বলার আছে?'

.

দুজনেই চুপ থাকলো। কিছু বললো না। এরপর শাহেদ ভাই বললেন, 'যা হয়েছে, আমরা ভুলে যাবো। বন্ধু বন্ধুর মধ্যে এমন

হয়েই থাকে। তবে নাসিরের ক্ষমা চাইতে হবে।'

.

শাহেদ ভাইয়ের কথা শুনে আশ্চর্য হওয়া ছাড়া কোন উপায় নেই! যে ছেলেটা মিছেমিছি নাসিরকে আঘাত করলো, তাঁকে কিছু করতে হবে না; উল্টো নাসিরকে ক্ষমা চাইতে হবে। এ কেমন বিচার! তাই ফারিস বলে উঠলো, 'ভাই নাসিরের ক্ষমা চাইতে হবে; বিষয়টা বুঝলাম না!'

.

শাহেদ ভাই সে নাস্তিক টাইপের লোক, তা আমাদের অজানা নয়। তাই তিনি আরেক নাস্তিকের পক্ষ নেবেন এটাই স্বাভাবিক। তবে নাস্তিকরা ববারর দাবি করে থাকে, তাঁরা নাকি আস্তিকদের থেকে অধিক সৎ! কিন্তু শাহেদ ভাই কিংবা অপুকে সততা অবলম্বন করতে খুব কমই দেখেছি। আজও তাঁর ব্যতিক্রম হবে কেন?

.

ফারিসের প্রশ্নের জবাবে শাহেদ ভাই বললেন, 'না বুঝার কী আছে? নাসির মিথ্যা বলে অপুকে রাগিয়েছে। অপু তাঁর প্রতিবাদ করেছে। নাসির যদি ওই কথা না বলতো, তাহলে কি অপু ওর ওপর হাত উঠাতো? তাই দোষটা নাসিরের উপরেই বর্তায়।'

.

বাহ! কী সুন্দর ফয়সালা। শুনেই তো আমার জ্বালা করছিলো! নাসির যদি মিথ্যে কিছু বলতো, তাহলে শাহেদ ভাইয়ের কথা মেনে নেয়া যেতো। কিন্তু সত্য বললে কারো যদি গায়ে লাগে – এর জন্যে কি সত্যবাদীকে ক্ষমা চাইতে হবে? কী আশ্চর্য!

.

ফারিস বললো, 'ভাই! আমার একটা প্রস্তাব আছে।'

.

- 'কী?'

.

- 'যদি নাসির নাসিরের বক্তব্য মিথ্যা প্রমাণিত হয়, তবে নাসির ক্ষমা চাইবে। আর যদি নাসিসের কথা সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে অপু ক্ষমা চাইবে।'

.

ফারিসের কথা শুনে শাহেদ ভাই অবজ্ঞাসুরে বললেন, 'তাই নাকি! তো হয়ে যাক প্রমাণ! কী বলিস তোরা?'

.

অপু আর নাসির মাথা নেড়ে সায় দিলো। ওরা হয়তো ধরেই নিয়েছে – অপুর জয় হবে। নাসির পরাজিত হবে। এরপর নাসির ক্ষমা চাইবে। আর ফারিস মাথা নিচ করে বেড়িয়ে যাবে। ওরা জানেও না, সত্য কতটা শক্তিশালী হয়। আর যারা সত্যের পক্ষে লড়াই করে তারা কতটা আত্মবিশ্বাসী হয়।

.

ফারিস বললো, 'ডারউইন এর মতবাদের অন্যতম একটি স্লোগান ছিলো "জীবের অস্তিত্বের জন্য বেঁচে থাকার সংগ্রাম।" এ সংগ্রামে "শক্তিশালী বিজয়ী হবে এবং দুর্বল পরাজিত হবে" – এটিকে প্রাকৃতিক বিষয় হিসেবে দাড় করানোর চেষ্টা করা হয়। "প্রকৃতিতে অস্তিত্বের সংগ্রাম" ডারউইনিজমের এক অন্যতম দিক। এর ফলে শক্তিশালীদের মনে দুর্বলদের বিনাশ করার এক মানসিকতার উদ্ভব ঘটে। যার ফলে বিশ্বে শুরু হয় দুর্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার। কেননা বেঁচে থাকার সংগ্রামে তার-ই বিশ্বে টিকে থাকার অধিকার রয়েছে – যে অপরের তুলনায় অধিক শক্তিশালী।'

.

পাশ থেকে অপু বলে উঠলো, 'তোর কথাগুলো ডারউইনের কোন বক্তব্য থেকে নেয়া?'

.

ফারিস বললো, 'তুই তো নিশ্চয় ডারউইনের The Origin of Species বইটা পড়েছিস?'

.

কিছু কিছু ক্ষেত্র এমন আছে, যেখানে মানুষ মিথ্যে বলে তাঁর ব্যক্তিত্ব রক্ষা করতে চায়। অপুও এমন একটি পর্যায়ে আছে। মিথ্যে না বলে তাঁর উপায় নেই। তাই সে হ্যাঁ-সূচক মাথা নাড়লো। অবশ্যি অপু যে বইটা পড়ে নি তা আমি নিশ্চিত। এর আগেও তাঁর সাথে বইটা নিয়ে কথা হয়েছিলো। কিন্তু বইটা সম্পর্কে সে তেমন কিছুই বলতে পারে নি।

.

ফারিস বললো, 'The Origin of Species-বইটার একটি বক্তব্য এমন – "The Origin of Species by means of Natural Selection or the Preservation of Favoured Race in the Struggle for Life" অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রজাতি সমূহের উৎপত্তি অথবা জীবন সংগ্রামে আনুকূল্য প্রাপ্ত প্রজাতি সমূহের সংরক্ষণ।'

.

শাহেদ ভাই বললেন, 'এখানে সমস্যা তো কোথাও দেখছি না?'

.

ফারিস বললো, 'এখানেই তো বিরাট সমস্যা ভাই! ডারউইন বুঝাতে চেয়েছেন প্রকৃতিতে তাঁরাই টিকে থাকবে যারা অধিক শক্তিশালী। আর অপেক্ষাকৃত দুর্বলরা নিঃশেষ হয়ে যাবে। ডারউইন এটাকে প্রকৃতির সাধারণ নিয়ম হিশেবে গণ্য করতেন। এই আত্মঘাতী মতবাদ সাম্রাজ্যবাদী, পুঁজিবাদী ও অন্যান্য বস্তুবাদী সমাজে দ্রুততর ভাবে গৃহীত হয়। যে সমাজগুলো নীতিহীন এক শোষনমূলক রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিলো। এই রাজনৈতিক ব্যবস্থা পাকাপোক্ত করতে বৈজ্ঞানিক যুক্তিরও দরকার ছিলো। ডারউইনের এই বক্তব্যের মধ্যেই তাঁরা তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যৌক্তকতা খুঁজে পেয়েছিলো। আর এ মতবাদকেই সবল মানুষগুলো দুর্বলদের উপর অত্যাচার চালানোর প্রাকৃতিক কারণ হিশেবে চালিয়ে দিতো।'

.

- 'এটা কেবল তোর দাবি। এ দাবির যৌক্তিক কোন ভিত্তি নেই।'

.

শাহেদ ভাইয়ের প্রশ্ন শুনে ফারিস মুচকি হেসে বললো, 'না ভাই! এটা আমার নিছক দাবি নয়। অনেক বিজ্ঞানীর বক্তব্য ঘেঁটেই আমি একথা বলছি।'

.

পাশ থেকে মিসবাহ ফারিসকে লক্ষ্য করে বলে উঠলো, 'তোর কথার প্রমাণ চাই। প্রমাণ ছাড়া আমরা কোন কথাই বিশ্বাস করবো না।'

.

শাহেদ ভাইয়ের পক্ষের লোকজন সবাই মিসবাহ-এর সাথে একাত্মতা পোষণ করলো। ফারিস বললো, 'ঠিক আছে, আমি প্রমাণ দিচ্ছি। আমেরিকার প্রখ্যাত বিবর্তনবাদী ও জীবাশ্মবিজ্ঞানী Stephen Jay Gould এই ব্যাপারে বলেছেন –"এর ফলে (ডারউইনের বিবর্তনবাদ) দাস প্রথা, সাম্রাজ্যবাদ, বর্ণবাদ, শ্রেণী সংগ্রাম, লিঙ্গ বৈষম্য প্রভৃতি সামাজিক ও রাজনৈতিক অনাচার বিজ্ঞানের নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে।"

ইতিহাসের অধ্যাপক Jacques Barzun তার লিখা Darwin, Marx, Wagner-বইতে বর্তমান বিশ্বের নৈতিকতার অধঃপতনের কারণ পর্যালোচনা করেছেন। তিনি রাজনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে ডারউইনিজমের প্রভাব বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন – "১৮৭০ সাল থেকে ১৯১৪ সালের মধ্যে ইউরোপের প্রত্যেকটি দেশের যুদ্ধবাজ রাজনীতিবিদরা চাচ্ছিলো অস্ত্র। ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদী দল চাচ্ছিলো নিষ্ঠুর প্রতিযোগীতা। রাজতন্ত্রবাদীদের দাবি ছিল অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর উপর প্রাধান্য বিস্তার। সমাজতন্ত্রীদের দাবি ছিলো ক্ষমতা দখল করা। বর্ণবাদীদের দাবি ছিলো বিরোধীদের অভ্যন্তরীণ বহিষ্কার। এ সকল মতাদর্শই কোন না কোন ভাবে তাদের চিন্তাধারার স্বপক্ষে ডারউইনবাদকে ব্যবহার করে। ডারউইন ও স্পেনসার বিষয়টি পূর্বেই উপস্থাপন করেছিলেন। এতে বলা হয়েছে যেহেতু কোন বর্ণের শ্রেষ্ঠত্ব একটি জীবিজ্ঞানের বিষয়, সেহেতু তা মানব সমাজ সম্পর্কিত। তাই এটা বিজ্ঞানের বিষয়বস্তু, এটাই ডারউইনবাদ"।'

.

শাহেদ ভাই বললেন, 'দু একজন বিচ্ছিন্ন লোকের বক্তব্যের দ্বারা তোর কথা সত্য বলে প্রামণিত হয় না। ডারিউনিজম একটা বৈজ্ঞানিক মতবাদ। এ মতবাদ গ্রহণ করলেই সে সন্ত্রাসবাদের সাথে জড়িয়ে পড়বে – আমার কাছে কখনোই এমনটা মনে হয় না। বিজ্ঞানের তো আরও অনেক মতবাদ আছে, কিন্তু সেগুলোর কোনটাই মানুষকে সন্ত্রাসবাদের দিকে উদ্বুদ্ধ করলো না, কেবল ডারইনিজম করলো? কথাটা কেমন একপেশে হয়ে গেলো না? আমার মনে হয় কী ফারিস, তোরা ডারইনিজমের বিরোধিতা করিস অন্য কারণে। এই মতবাদ গ্রহণ করলে যে, ধর্ম নামক শেকলটা আর মানুষের পায়ে লাগাতে পারবি না। তাই এই মতবাদের বিরোধিতা করিস!'

.

ফারিস অত্যন্ত মনযোগ সহকারে শাহেদ ভাইয়ের কথা শুনলো। এরপর বললো, 'ভাই! অন্য এমন কোন বৈজ্ঞানিক মতামত নেই, যেখানে বলা আছে যে – প্রকৃতিতে কেবল তাঁরাই টিকে থাকবে, যারা অধিকতর শক্তিধর। তবুও আপনি যেহেতু আরও প্রামাণ চাচ্ছেন, ঠিক আছে। আমি প্রমাণ দিচ্ছি। কলম্বাস তাঁর আমেরিকা যাত্রার সময় দাবি করেন যে – "কোন কোন জনগোষ্ঠী অর্ধ পশুর চারিত্রিক বিশিষ্ট সম্পন্ন।"

তাঁর কাছে আমেরিকার অধিবাসীগণ মানুষ ছিলো না। বরং তারা ছিলো এক ধরণের উন্নত প্রজাতির পশু। এ ধারণা থেকেই তিনি যে সমস্ত দেশগুলি আবিষ্কার করেছিলেন, সেগুলি উপনিবেশে পরিণত করেন। নেটিভ আমেরিকানদের কৃতদাস হিশেবে ব্যবহার করেন। দাস ব্যবসা শুরুর কৃতিত্ব সম্পূর্ণটাই তার প্রাপ্য। কোন দ্বীপে যখন কলম্বাস প্রথম আগমন করেন তখন এর জনসংখ্যা ছিলো ২০০০০০। ২০ বছর পর এ সংখ্যা দাড়ায় ৫০,০০০। ১৫৪০ সালে এ সংখ্যা দাড়ায় মাত্র ১০০০।

ঐতিহাসিকগণের হিসাব অনুযায়ী কলম্বাস এই মহাদেশে পদার্পণ করার সময় থেকে ১০০ বছরের কম সময়ের মধ্যে ৯৫ মিলিয়ন লোককে হত্যা করে উপনিবেশবাদীরা। কলম্বাস যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন তখন নেটিভরা ছিলো ৩০ মিলিয়ন। কিন্তু গণহত্যার কারণে তা ২ মিলিয়নে নেমে যায়। এই ব্যাপক ও নিষ্ঠুর গণহত্যার কারণ হচ্ছে, নেটিভ আমেরিকনাদের তারা মানুষ হিসেবে নয় বরং পশু হিসেবে বিবেচনা করতেন।'

.

- 'তুই তো উপনিবেশবাদীদের চ্যাপ্টারে চলে গেলি। আমরা তো কথা বলছি ডারউইনিজম নিয়ে, উপনিবেশবাদ নিয়ে নয়।'

.

- 'ভাই! আমি নতুন চ্যাপ্টার খুলি নি। সাম্রাজ্যবাদীদের নির্যাতনের সাথে ডারউইনিজম-এর সম্পর্ক আছে। তাই আমি কথাগুলো বলেছি।'

.

- 'কীভাবে?'

.

- 'উপনিবেশবাদ থেকে সবচেয়ে বেশি লাভবান হয়েছে গ্রেট-বৃটেন। বৃটেন তাঁর নিজ স্বার্থে শোষণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে স্থানীয় অধিবাসীদের বিপর্যয়, দুঃখ-কষ্ট, সৃষ্টি করে। বৃটেনের এই নিপীড়নমূলক কার্যকলাপের যৌক্তিক ভিত্তি এবং তাদের নীতি সঠিক প্রমাণ কারার দায়িত্ব বৃটিশ সমাজবিজ্ঞানী ও বৈজ্ঞানিকদের উপর বর্তায়। তাঁদের পক্ষে সর্বপ্রথম এই বৈজ্ঞানিক ভিত্তি দাঁড় করান ডারউইন। কারন ডারউইন দাবি করেন যে, বিবর্তনবাদের বিভিন্ন স্তরে একটি শ্রেষ্ঠ মানবজাতির অস্তিত্ব বজায় আছে। আর এ সকল উন্নত প্রাণী হল শ্বেতাঙ্গ প্রজাতি। তিনি এও যুক্তি প্রদর্শন করেন যে, অন্যান্য মনুষ্য প্রজাতির উপর শ্বেতাঙ্গদের এই অত্যাচার, অবিচার ও নিষ্ঠুর আচরণ হলো একটি প্রাকৃতিক আইন। ভিক্টোরিয়া যুগের গ্রেটব্রিটেন ডারউইনিজমকে তাদের অত্যাচারের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক যুক্তি হিশেবে ব্যবহার করে।'

.

- 'দেখ ফারিস! এগুলো হলো তোর যুক্তি। যেটার কোনটাই তেমন শক্তিশালী নয়। কারণ ভিক্টরিয়া যুগের বৃটেন ডারউনিজমকে নয় বরং তাঁদের সামরিক শক্তিকে ব্যবহার করে নিপীড়নমূলক কার্যকলাপ পরিচালনা করেছে।'

.

- ‘আমি যদি আমার দাবির পক্ষে ঐতিহাসিকদের মতামত দেখাতে পারি, তাহলে কী মেনে নেবেন?’

.

- ‘আগে শুনিই না, কোন ঐতিহাসিক তোর পক্ষে কথা বলেছেন?’

.

- ‘বিখ্যাত ঐতিহাসিক James Joll তার লিখা Europe Since নামক পুস্তিকায় বিবর্তনবাদ, বর্ণবাদ, সাম্রাজ্যবাদের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন –“সাম্রাজ্যবাদীদের প্রধান উৎসাহব্যাঞ্জক মতবাদ হলো সাধারনভাবে যাকে সামাজিক ডারউইনবাদ হিসেবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়। এ মতাবাদে রাষ্ট্র সমূহ অস্তিত্বের জন্য এক চিরস্থায়ী সংগ্রামে লিপ্ত কোন মনুষ্য প্রজাতিকে অন্যদের চেয়ে বিবর্তনবাদী প্রক্রিয়ায় শ্রেষ্ঠ হিসেবে বিবেচিত। এবং এ সংগ্রামে সবচেয়ে শক্তিশালী প্রজাতি বল প্রয়োগের মাধ্যমে সবসময় তাদের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে।”

.

শাহেদ ভাই যখন ফারিসের বক্তব্যের বিরুদ্ধে কিছু বলার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন; তখন ফারিস জানালো যে – James Joll দীর্ঘদিন যাবত অক্সফোর্ড, স্ট্যানফোর্ড ও হ্যাভার্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাসের অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত ছিলেন। একথা শুনার পর শাহেদ ভাই বলার মত কিছু পেলেন না। ফারিস আরও বললো, ‘প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তুরস্কের বিরুদ্ধে বৃটেনের হত্যাযজ্ঞের পেছনেও ডারউইনিজম দায়ী।’

.

শাহেদ ভাই বললেন, ‘জোড়াতালি দিয়ে কিছু প্রমাণ করার চেষ্টা করিস না ফারিস। ১ম বিশ্বযুদ্ধ কেন হয়েছিলো তা তুইও জানিস। ডারউনিজমের সাথে সে যুদ্ধের মধ্যে বিন্দুপরিমান সম্পর্ক নেই।’

.

- ‘আমি যদি প্রমাণ দেখাতে পারি?’

.

- ‘দেখা তোর প্রমাণ!’

.

- ‘উনবিংশ শতাব্দীতে ডারউইনবাদ সাম্রাজ্যবাদীদের বৈজ্ঞানিক হাতিয়ারে পরিণত হয়। তাঁরা তুর্কিদের অনুন্নত জাতি হিসেবে বিবেচনা করতে থাকে। বৃটিশ প্রাধানন্ত্রী William Ewart Gladstone প্রকাশ্যে ঘোষণা দেন, “তুর্কি জনগোষ্ঠী মনুষ্য প্রজাতির সদস্যই নয় বা মনুষ্য পদবাচ্য নয়। এবং মানব সভ্যতার স্বার্থে তাদেরকে এশিয়ার Steppes অঞ্চলে বিতাড়িত এবং Anatolia থেকে বিতাড়িত করা উচিৎ।”’

.

- ‘William Gladstone-এর বক্তব্যের সাথে ডারউইনিজমের কী সম্পর্ক? নাকি তুই বলতে চাচ্ছিস, ডারউনের কোন বক্তব্য থেকে তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন?’

.

- ‘হ্যা ভাই! আপনি ঠিকই ধরেছেন। ডারউইন-এর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়েই William Gladstone তুর্কিদের ক্ষেত্রে এরূপ মন্তব্য করেছেন।’

.

- ‘হোয়াট? ডারউইন-এর এমন কোন বক্তব্য আমি পাই নি, যা দিয়ে তোর দাবি-কে সত্য বলে প্রমাণ করা যায়।’

.

- শাহেদ ভাইয়ের ভাবখানা দেখে মনে হচ্ছে তিনি ডারউইন-এর সব বক্তব্য মুখস্ত করে ফেলেছেন। ডারউইন-এর লিখা সব বই পড়ে শেষ করেছেন। কোনকিছু বাদ রাখেন নি। তবে বেশি ভাব নেয়া মাঝে মাঝে বিপদের কারণ হতে পারে। শাহেদ ভাইয়ের

ক্ষেত্রেও এমন হয় কি না – দেখার বিষয়!

.

ফারিস বললো, 'তুর্কিদের সম্পর্কে ডারউইন-এর মনোভাব প্রকাশিত হয় ১৮৮৮ সালে। তাঁর লিখা The Life and Letterts oc Charles darwin পুস্তকটির মাধ্যমে। তিনি তুর্কিদের সম্পর্কে বলেন –"আমি যদি আপনাকে সভ্যতার উন্নয়ন প্রক্রিয়ার প্রাকৃতিক নির্বাচনের সংগ্রাম এবং এর ধারাবাহিক ভূমিকা উল্লেখ করি তা বিশ্বাস করাই আপনার জন্য কঠিন হবে। স্মরণ করুন, কয়েক শতক পূর্বে তুর্কীদের দ্বারা বিপর্যস্ত হওয়ার আতংকের ঝুকির মধ্যে ইউরোপ সময় কাটিয়েছে। আর বর্তমানে যা একটি হাস্যস্পদ ব্যাপার। এ অস্তিত্বের সংগ্রামে অধিকতর সুসভ্য ককেশীয় (ইউরোপীয়) প্রজাতি যে উন্নত ও সুসভ্য প্রাজাতির দ্বারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে তার ইয়াত্তা নেই।"
ডারউইনের এই অসঙ্গতিপূর্ণ কথাবার্তা ঐ সময়ে ওসমানী খিলাফতের বিরুদ্ধে সাম্রাজ্যবাদীদের দলিল হিসেবে বিবেচিত হয়। আপনি যদি ডারউইনের কথাটির দিকে একটু গভীর দৃষ্টি দেন তাহলে দেখবেন, তিনি তুর্কীদের নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়াকে একটি সহজাত বিষয় বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, বিবর্তনবাদের ফলেই এমনটি ঘটবে। এর মাধ্যমে তিনি তুর্কিদের নির্মূল করার একটি ভুয়া বৈজ্ঞানিক মতবাদ দাড় করাতে চেষ্টা করেন। বৃটেন তুর্কীদের বিরুদ্ধে ভারত, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড এর অধিবাসীদের ব্যবহার করে। তাদের বুঝানো হয়েছিল বৃটেন এর বিপক্ষ অবলম্বন করা তাদের জন্য সম্মানজনক নয়। কারণ তুর্কিরা হলো অনুন্নত জাতি। আর বৃটেন উন্নত। ফলে এ যুদ্ধে তুর্কী সেনাবাহিনীর ২৫০,০০০ সেনা নিহত হয়।'

.

- 'দেখ ফারিস! এসব বিচ্ছিন্ন দু একটা মন্তব্যকে তুই ডারউনিজমের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারিস না। সাম্রাজ্যবাদীরা কখনোই এ কথা বলে নি যে, তাঁদের রাষ্ট্র ডারউনিজমের ওপর প্রতিষ্ঠিত। বরং তাঁদের সন্ত্রাসবাদের কারণ পুঁজিবাদ, সাম্রাজ্যবাদ। এখানে ডারউনিজম কোনভাবেই দায়ী নয়।'

.

- 'আপনার কথার সাথে আমি একটু দ্বিমত পোষণ করছি।'

.

- 'কেন?'

.

- 'কারণ বিশ্বের সবথেকে বড় বড় খুনিরা রাষ্ট্রীয়ভাবে ডারউইনিজমকে ব্যবহার করেছে তাঁদের স্বপক্ষের বৈজ্ঞানিক যুক্তি হিশেবে।'

.

ফারিসের কথা শুনে অপু বলে উঠলো, 'তোর কথার প্রমাণ কী?'
ফারিস বললো, 'প্রমাণ হচ্ছে গণচীন।'

.

অপু বললো, 'গণচীনে তো সমাজতন্ত্র ছিলো। ডারউইনিজমকে টানছিস কেনো?'

.

- 'ডারইউনিজমকে টানছি এই জন্য যে, গণচীন ডারউইনিজমের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলো।'

.

- 'এটা হাস্যকর দাবি।'

.

- 'এটা বাস্তব দাবি। হাস্যকর হতে যাবে কেনো? মাও সেতুং নিজ মুখে স্বীকার করেন যে গণচীন ডারউইনিজমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তিনি বলেন –"চীনা সমাজতন্ত্র ডারউইন ও তার বিবর্তনবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত"।'

.

সত্যকে জানার পরও কিছু মানুষ তা গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। কারণ তাঁরা সত্যকে ভয় পায়। অপু তাদেরই একজন। নয়তো ফারিস ওকে যতই বুঝাতে চাচ্ছে, ও বারবার পেঁচিয়ে যাচ্ছে। ফারিস ওকে যতই বুঝাচ্ছে গণচীন ডারউইনিজমকে রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বৈজ্ঞানিক যুক্তি হিশেবে ব্যবহার করেছে; ও ততই পেঁচিয়ে যাচ্ছে। তাই ফারিস বললো, 'আচ্ছা তুই এবার থাম! আমি তোঁকে আরও একটি উদাহরণ দিচ্ছি। তাঁর আগে আমাকে বল, তুই স্ট্যালিনকে চিনিস কি না?'

.

- 'এটা কোন প্রশ্ন হলো? তাঁকে কে না চেনে? সবাই চেনে। আমি চিনবো না!'

.

- 'স্ট্যালিনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাবাদের উদাহরণ আমি এখানে দিতে চাচ্ছি না। কেবল এতটুকুই বলবো, স্ট্যালিনের রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাবাদের পেছনেও এই ডারউইনিজম দায়ী।'

.

- 'কীভাবে?'

.

- কারণ স্ট্যালিন রাষ্ট্রীয়ভাবে ডারউইনিজমকে তাঁর হাতিয়ার হিশেবে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি বলেছেন –"জৈব পদার্থের মধ্যে দ্বান্দিক বস্তুবাদের আবিষ্কার হচ্ছে ডারউইনবাদের সর্বশ্রেষ্ঠ বিজয়"।'

.

- 'স্ট্যালিনের এই বক্তব্য থেকে কি তোর দাবি সত্য বলে প্রমাণ হয়?'

.

- 'আগে তো আমাকে শেষ করতে দে'!

.

'আচ্ছা বল।' -

.

' -স্ট্যালিন আরও বলেন –"কোন রকম দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ছাড়াই আমরা নির্ভুলভাবে ছাত্রদের তিনটি বিষয় শিক্ষা দিতে চাই । তা তা হলো- পৃথিবীর বয়স, ভুতাত্বিক সৃষ্টি তত্ব ও ডারউইন এর শিক্ষা।" তাঁর আরও অনেক বক্তব্য থেকে জানা যায় যে, তিনিও দুর্বলদের প্রতি অত্যাচার করতেন ডারউইন এর বক্তব্যে অনুপ্রাণিত হয়ে। কেননা তিনি বিশ্বাস করতেন, সবলেরা দুর্বলের প্রতি অত্যাচার করবে। আর দুর্বলরা তাঁদেরকে বিলিয়ে দেবে; যা ডারউইনিজমের অন্যতম দাবি। স্ট্যালিন শুধু বড় মাপের একজন হত্যাকারীই ছিলেন না; একজন বড় মাপের নাস্তিকও ছিলেন। তাঁর নাস্তিক হওয়ার পেছনেও ডারউইনিজম দায়ী।'

.

মিসবাহ এতক্ষণ কোন কথা বলে নি। কেবল হা করে তাকিয়ে ছিলো। কিন্তু ফারিসের বক্তব্য শুনে বলে উঠলো, 'ডারউইনের বই পড়ে তিনি নাস্তিক হয়েছিলেন – এ কথা আমি মানতে পারছি না ফারিস। আমিও তো ডারউইন-এর বই পড়েছি, কিন্তু নাস্তিক হই নি তো!'

.

ফারিস বললো, 'তোর মত আমিও মানতাম না যদি না স্ট্যালিনের ছোটবেলার বন্ধু আমাদেরকে এ তথ্য না দিতো।'

.

- 'কোন তথ্য?'

.

- 'স্ট্যালিনের বাল্যবন্ধু G Glurdjidze তার লিখিত Landmarks in the Life of Stalin নামক পুস্তিকায় বলেছেন – "শৈশবে তিনি (স্ট্যালিন) যখন গির্জার স্কুলে পড়াশুনা করতেন; তিনি তখন বিদ্রূপাত্মক ও বিশ্লেষণধর্মী চিন্তাধারার অধিকারী ছিলেন। পরবর্তীতে তিনি চার্লস ডারউইনের পুস্তকাদি পড়া শুরু করলেন এবং নাস্তিক হয়ে গেলেন"।'

.

ফারিসের কথা শেষ না হতেই শাহেদ ভাই কথা কেঁড়ে নিয়ে বললেন, 'তার মানে তুই আমাদেরকে এটাই বুঝাতে চাচ্ছিস যে – '?ডারউইনিজম সন্ত্রাসবাদের বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার

.

- 'না ভাই! আমি বুঝাতে চাই নি। আমি প্রমাণ করে দেখিয়েছি।'

.

অপু খুব অবজ্ঞাসুরে বলে উঠলো, 'বিশ্বের সবথেকে বড় সন্ত্রাসী ছিলো হিটলার। যার পরোক্ষ কারণে কয়েক কোটি মানুষ নিহত হয়। সে কোত্থেকে প্রেরণা লাভ করেছিলো? ডারউইনিজম যদি সন্ত্রাসীদের বৈজ্ঞানিক হাতিয়ার-ই হয়; তাহলে হিটলারেরও তো এই হাতিয়ার ব্যবহার করা উচিৎ ছিলো। সে কি তা করেছে?'

.

- 'অবশ্যই করেছে।' ফারিসের ঝটপট উত্তর।

.

শাহেদ ভাই বললো, 'তুই কি জোড়াতালি দিয়ে কিছু মেলাতে চাচ্ছিস, ফারিস?'

.

ফারিস বললো, 'জোড়া তালি দিয়ে মেলাবো কেনো ভাই। যা যৌক্তিকভাবেই মিলে আছে; তা জোড়াতালি দিয়ে মেলানোর কী দরকার?'

.

- 'যৌক্তিক ভাবে তুই তোর দাবির সত্যতা দেখাতে পারবি?'

.

- 'জ্বী পারবো।'

.

মিসবাহ বললো, 'তাহলে আর দেরি কেনো?'

.

ফারিস এক ফালি হেসে নিয়ে জবাব দিলো, 'হিটলার জার্মান জাতিকে সবথেকে উঁচু জাতি মনে করতেন। তিনি বলতেন – "নরভিক জার্মান জাতিকে বাদ দিলে বাঁদরের নাচ ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।"

.

শাহেদ ভাই বললেন, 'তাঁর এ বক্তব্য কি তোর দাবির স্বপক্ষে দলিল হিশেবে ব্যবহার করা যায়?'

.

ফারিস বললো, 'ভাই আমি এখনো শেষ করি নি।'

.

- 'ওকে ক্যারি অন।'

.

- 'হিটলার আরও বলেন – "একটি উন্নত প্রজাতি অনুন্নত বা নিচ প্রাজতিকে শাসন করবে .... এটা একটি অধিকার যা আমরা প্রকৃতিতে দেখতে পাই। এবং এটাই একমাত্র বোধগম্য ও যুক্তিসঙ্গত অধিকার যা বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।" উন্নত প্রজাতি অনুন্নত প্রজাতিকে শাসন করার অধিকার প্রাকৃতিক ভাবেই লাভ করে – তিনি এ মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। যা তাঁর বক্তব্যের দ্বারাই প্রমাণিত হয়। তিনি এও দাবি করেন, এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। আমাদের আর বুঝতে বাকি থাকে না যে, তিনি এ বৈজ্ঞানিক প্রমাণ কার কাছ থেকে ধার করেছিলেন।'

.

নাসির এতক্ষণ কোন কথা বলে নি, চুপ ছিলো। কিন্তু এবার বলে উঠলো, 'তাঁর মানে ষাট লাখ ইহুদিকে মারার যৌক্তিকতা তিনি ডারউইনের মতবাদে পেয়েছিলেন?'

.

ফারিস বললো, 'হু। তুই ঠিক ধরেছিস। হিটলার ইহুদিদেরকে খুব নিচু প্রজাতির মানুষ বলে বিবেচনা করতেন। তিনি বলতেন – "ইয়াহুদী জাতি একটি মানবেতর প্রজাতি গোষ্ঠী যা পূর্ব নির্ধারিত জন্মগত অধিকার হিসেবে খারাপ। যেমন নাকি নরভিক জার্মান জাতিকে মহৎ কাজের জন্যই সৃষ্টি করা হয়েছে। ইতিহাস এমন একটি হাজার বছরের মহান সাম্রাজ্য সৃষ্টি করবে, যার ভিত্তি হবে প্রজাতির মর্যাদা ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা যা প্রকৃতি কর্তৃক নির্ধারিত।"

হিটলারের ধর্মের প্রতি এই বীতশ্রদ্ধা দেখে Daniel Gasman তার লিখিত "Scientific Origins of Natural Socialism" বইতে লিখেছেন –"হিটলার প্রথাগত ধর্মের বিরুদ্ধে এককভাবে জৈবিক বিবর্তনবাদকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে বিবেচনা করতেন। তিনি বহুবার খৃষ্টধর্মকে হেয় প্রতিপন্ন করেন এই কারণে যে, ধর্মীয় বিশ্বাস ডারউইনবাদী শিক্ষার পরিপন্থী। হিটলারের কাছে আধুনিক বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির নির্দেশক হলো ডারউইনবাদ।"

.

.

আমাদের আলোচনার কিছুটা টান টান উত্তেজনা বিরাজ করছিলো। আমাদের বিপক্ষের লোকজন ফারিসের কাছে একেবারে ধরাশায়ী হয়ে পড়েছিলো। আমি মনে মনে চাচ্ছিলাম আলোচনা আরও কিছুক্ষণ চলুক। শাহেদ ভাই তাঁর ভুল বুঝতে পারুক। কিন্তু অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনা আমাদের আলোচনার ব্যাঘাত ঘটালো।

.

আমরা রুমের ভিতর ছিলাম, তাই সত্যিকার অর্থে কী ঘটেছিলো; তা বলতে পারবো না। কেবল ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার আওয়াজ পাচ্ছিলাম। শাহেদ ভাই দৌড়ে বেড়িয়ে গেলেন। সাথে সাথে অপু আর মিসবাহও দৌড়ালো।

---

1) Francis Darwin, On the Origin of Species, (The Pennsylvania State University press, October 1st, 1859).

2) Stephen Jay Gould, The Mismeasure of Man, (W.W. Norton and Company, New York, 1981).

3) Jacques Barzun, Darwin, Marx, Wagner, (Garden City, N.Y.: Doubleday, 1958, pp.94-95, cited in Henry M. Morris, The Long war Against God, Baker Book House, 1989).

4) Harun Yahya, Darwinism Refuted, (Goodword Books Pvt. Ltd, Nizamuddin West Market, New Delhi, 1st edition, 2000).

5) Harun Yahya, The Disaster Darwinism Brought Humanity, (Al-Attique Publishers Inc. Canada, 2001).

6) The Road to India and What Has Been Done for the Sake of Oil: Turkey and Britain.

7) Francis Darwin, The Life and Letters of Charles Darwin, Vol.I, p.285-286, (1888. New York D. Appleton and Company).

8) Kent Hovind,The False Religion of Evolution,

9) E. Yaroslavsky, Landmarks in the Life of Stalin, Moscow: Foreign Languages Publishing House, 1940, pp. 8.; cited by Paul G. Humber, Stalin's Brutal Faith, Vital articles on Science/Creation October 1987, Impact No. 172.

10) War Against Religion,

11) J. Tenenbaum., Race and Reich, (Twayne Pub., New York, 1956).

12) Jerry Bergman, Darwinism and the Nazi Race Holocaust,

13) L.H. Gann, "Adolf Hitler, The Complete Totalitarian", The Intercollegiate Review, Fall 1985).

14) Henry M. Morris, The Long war Against God, (Baker Book House, 1989).

15) L.H. Gann, "Adolf Hitler, The Complete Totalitarian", The Intercollegiate Review, Fall 1985.

১৭১

কেমন ছিলেন তিনি? -- ৩

-শিহাব আহমেদ তুহিন

কয়েকদিন আগে পত্রিকায় দেখলাম ছাগলে ক্ষেত খাওয়াকে কেন্দ্র করে বড় ভাইকে খুন করেছে ছোট ভাই। পড়ে খুব অবাক হলাম। কারণটা কতো তুচ্ছ! এতো তুচ্ছ কারণে কেউ কাউকে খুন করতে পারে? তাও আবার নিজের ভাইকে?
এই 'ওল্ড হোম' এর যুগে সম্পর্কগুলো খুব ঠুনকো হয়ে গিয়েছে। তাই সামান্য কারণেই তা তাসের ঘরের মতো ভেঙ্গে পড়ে। এ দেশে বাবা মারা গেলে চাচা-ফুফু'রা এতিম শিশুদেরকে তাদের সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে, জমি আত্নসাৎ করে। গ্রামে কিংবা শহরে সব জায়গাতেই ছড়িয়ে আছে এমন অজস্র উদাহারণ।
আবার আরেক শ্রেণীর মানুষ রয়েছে একদম উল্টো। আত্নীয়স্বজনদের বেলা তারা একদম অন্ধ হয়ে যায়। সকল অনৈতিক কাজে আত্নীয়দের সমর্থন করে। ন্যায়-অন্যায়ের চেয়ে রক্তের সম্পর্ক বেশি গুরুত্ব পায়।

.

জাহেলি যুগে আরবদের ছিল ভয়াবহ গোত্র-প্রীতি। সকল অন্যায় কাজে তারা নিজ গোত্র ও আত্নীয়দের সমর্থন করে যেতো। মাঝে মাঝে তুচ্ছ কারণে গোত্রে-গোত্রে যুদ্ধও লেগে যেতো। নিজ গোত্র অন্যায় করেছে জানার পরেও তারা গোত্রের পক্ষে যুদ্ধ করতো। রাসূল (সা) যেমন তাঁর আত্নীয়দের সাথে সদ্ভাব বজায় রাখতেন, ঠিক একইভাবে তিনি অন্ধ গোত্র-প্রীতিকেও নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি সবাইকে আত্নীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে বলতেন। যারা সামান্য কারণে আত্নীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তাদের সাবধান করে বলতেন, "আত্নীয়দের সাথে সম্পর্ক ছিন্নকারী ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" তবে অনেক সময় নিকটাত্নীয়দের জুলুম আমাদের জীবনকে বিপন্ন করে দেয়। সেক্ষেত্রেও, তিনি সর্বোচ্চ ধৈর্য অবলম্বন করতে বলতেন।

.

তাঁর চাচা ছিলেন এগারোজন, ফুফু ছয়জন। এদের মধ্যে মাত্র দুইজন চাচা আর একজন ফুফু ইসলামের পথে এসেছিলেন। চাচা আর ফুফুদের ভাগ্যে ইসলাম না জুটলেও তাদের ছেলেমেয়েরা ঠিকই ইসলামের সুশীতল ছায়ায় এসেছেন। তাঁর পঁচিশ জন চাচাতো ভাইয়ের মধ্যে দুইজন বাদে সবাই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। এগারো জন ফুফাতো ভাই আর তিনজন ফুফাতো বোনের মধ্যে প্রায় সবাই ই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। বাদ ছিল কেবল উবাইদুল্লাহ ইবনে জাহশ, যে শুরুতে ইসলাম গ্রহণ করলেও পরবর্তিতে মুরতাদ হয়ে যায়।

.

দুধ ভাই ছিলেন তিনজন, দুধ বোন দুইজন। তাঁর নিজের কোন ভাই-বোন ছিল না। দুধ ভাই-বোনদেরকে তিনি নিজের ভাই-বোনের মতই সম্মান করতেন। ভালোবাসতেন। হুনাইনের যুদ্ধে তাঁর বোন শায়মা বন্দী হয়েছিলেন। রাসূল (সা) যখন তার পরিচয় জানতে পেরেছিলেন, তখন তার সম্মানে নিজের চাদর বিছিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর সে জায়গায় বোনকে বসিয়েছিলেন। শায়মাকে আশ্বস্ত করে তিনি বললেন, "তুমি যদি আমার কাছে থাকতে চাও, তবে তোমার জন্য রয়েছে আমার হৃদয় নিঙড়ানো ভালোবাসা আর সম্মান। আর যদি তা না চাও, তবে তোমাকে উপহারসহ তোমার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে আমি পাঠিয়ে দিব।"

.

খুব ছোট থাকতেই মাকে হারিয়েছেন। বাবা তো জন্মের আগেই মারা গিয়েছেন। কুফরের উপর মারা যাওয়ার কারণে তারা দুইজনেই জাহান্নামে থাকবেন। সারা বিশ্বের মানুষকে তিনি জাহান্নাম থেকে জান্নাতে যাওয়ার পথ দেখিয়েছেন, অথচ নিজের বাবা-মাকে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচাতে পারেননি- এ কষ্ট তাঁকে প্রচণ্ড ব্যথিত করত। আল্লাহর কাছে নিজের মায়ের জন্য

ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু একজন কাফিরের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি আল্লাহ তায়ালা দেননি। আল্লাহ তায়ালার কাছে মায়ের কবরের কাছে যাওয়ার অনুমতি চাইলে আল্লাহ তায়ালা তাঁর প্রার্থনা কবুল করেন। মায়ের কবরের সামনে যেয়ে অঝোর ধারায় কাঁদতেন। তাঁর কান্না দেখে অনেকেই কেঁদে ফেলতো। সাহাবি বুরাইদা (রা) বলেন, "(তিনি যখন মায়ের কবরের সামনে কাঁদছিলেন, সে কান্না দেখে) মানুষজন কাঁদতে শুরু করেছিলো। আমি একসাথে এতো মানুষকে কখনোই কাঁদতে দেখিনি।"

.

আত্নীয় স্বজনদেরকে আকুল হয়ে ইসলামের দিকে ডাকতেন। জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেদের রক্ষা করতে বলতেন। আল্লাহর আযাবের ভয়াবহতার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছেন, "হে কুরাইশ! নিজেদেরকে বাঁচাও। আমি তোমাদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে কিছুই করতে পারব না। ওহে আবদে মানাফের সন্তানেরা! আমি তোমাদেরকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে কিছুই করতে পারব না। ওহে আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিব! আমি আপনাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে কিছুই করতে পারব না। হে আল্লাহর রাসূলের ফুফু সাফিয়া! আমি আপনাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে কিছুই করতে পারব না। ওহে মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমা! তোমার যা খুশি চেয়ে নাও। কিন্তু আমি তোমাকে আল্লাহর (আযাব) থেকে রক্ষা করতে কিছুই করতে পারব না।"

.

কুরাইশদের শত অত্যাচারে চাচা আবু তালিব তাঁকে রক্ষা করে গেছেন। তাই রাসূল (সা) শেষ পর্যন্ত প্রানান্ত চেষ্টা করে গেছেন, চাচাকে ইসলামের পথে আনতে। কিন্তু পারেননি। চাচার মৃত্যুশয্যায় তাকে কাতর হয়ে অনুরোধ করেছেন, "(শুধু একবার) বলুন, আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই। আমি আপনার ব্যাপারে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করব।" তাঁর সেই চেষ্টা দেখে আল্লাহ তায়ালা নাযিল করেন-
"তুমি যাকে পছন্দ করো, তাকে সৎ পথে আনতে পারবে না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎ পথ দেখান।" (সূরা ক্বাসাস ২৮:৫৬]
কাফির অবস্থাতেই আবু তালিব মারা যান।

.

কাছের লোকগুলো যাতে ছোট-বড় সকল প্রকার গুনাহ থেকে দূরে থাকে, সেদিকে খেয়াল রাখতেন। একদিন চাচাতো ভাই ফাযল (রা) এর সাথে উটে করে কোথাও যাচ্ছিলেন। সে সময়ে খাস'আম গোত্রের এক মহিলা রাসূল (সা) এর কাছে একটি বিষয় জানতে এলেন। মহিলা দেখতে ছিলেন খুবই সুন্দরী। রাসূল (সা) লক্ষ্য করলেন, চাচাতো ভাই মহিলার দিকে তাকিয়ে আছেন। তিনি সাথে সাথে হাত দিয়ে ফাযল (রা) এর চেহারা ঘুরিয়ে দিলেন।

.

আত্নীয়দের প্রতি সদাচারণ করতেন। তাদের প্রয়োজনের দিকে খেয়াল রাখতেন। ফাযল ইবনে আব্বাস (রা) ও আব্দুল মুত্তালিব ইবনে রাবি'আহ (রা) টাকা-পয়সার কারণে বিয়ে করতে করতে পারছিলেন না। তারা রাসূল (সা) এর কাছে এসে নিজেদের কষ্টের কথা জানালেন। মানুষের দেয়া যাকাত থেকে কিছু অর্থ তাদের নিজেদের জন্য চাইলেন। রাসূল (সা) বললেন, "মুহম্মদ কিংবা মুহাম্মদের পরিবারের জন্য যাকাত বৈধ নয়।" তিনি তাদেরকে অর্থ দিলেন না কিন্তু ঠিকই লোক ডেকে তাদের বিয়ের ব্যবস্থা করলেন।

.

বদর যুদ্ধে তাঁর চাচা আব্বাস (রা) বন্দী হয়েছিলেন। উমার (রা) ছিলেন বন্দীদের দায়িত্বে। তিনি কষে আব্বাস (রা)-কে বাঁধলেন। জোরে বাঁধার কারণে আব্বাস (রা) ব্যাথায় গোঙাতে থাকেন। রাসূল (সা) যখন জানতে পারলেন চাচা ব্যাথায় কষ্ট পাচ্ছেন উনি কষ্টে সারারাত ঘুমোতে পারলেন না। আব্বাস (রা)-কে তিনি তাঁর পিতার মতোই ভালোবাসতেন। কয়েকজন আনসার সাহাবী এটা জানতে পেরে আব্বাস (রা) এর বাঁধন খুলে দিলেন। রাসূল (সা) আনসার সাহাবীদের কাজে খুশি হয়েছিলেন। সাহাবীরা রাসূল (সা)- কে আরো খুশি করার জন্য মুক্তিপন ছাড়াই আব্বাস (রা)- কে ছেড়ে দিতে চাইলেন। কিন্তু

না! রাসূল (সা) আত্নীয় বলে তাকে এক্ষেত্রে আলাদা কোন প্রটোকল দেননি। অন্য সব বন্দীর মতোই মুক্তিপণ দিয়েই তাকে ছাড়া পেতে হয়েছিলো।
অনেকে হয়তো ভাবতে পারেন, "কী অর্থলোভী মানুষ রে বাবা! চাচাকে এতো ভালোবাসতো। তাও টাকা মাফ করে দিল না।" যারা এমনটা ভাবছেন তাদেরকে আরেকটু সামনে নিয়ে যাচ্ছি-

.

আব্বাস (রা) তখন মুসলিম হয়ে গেছেন। মদিনায় রাসূল (সা) এর সাথে থাকছেন। বাহরাইন থেকে বিপুল পরিমাণে অর্থ এলো। রাসূল (সা) সব অর্থ মসজিদের সামনে রাখতে বললেন। যথাসময়ে নামায পড়তে এলেন। একটিবারের জন্য এই বিপুল অর্থের দিকে ফিরেও চাইলেন না। নামায শেষে সবার মাঝে এগুলো বিলিয়ে দেয়া শুরু করলেন। আব্বাস (রা) মোটামুটি ধনী ছিলেন। কিন্তু বদর যুদ্ধে মুক্তিপন দেয়ার ফলে তখন তার আর্থিক অবস্থা নাজুক হয়ে পড়ে। তাই তখন তিনি রাসূল (সা) এর কাছে এসে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! আমি (বদর যুদ্ধে) আমার আর আকিলের মুক্তিপন দিয়েছি। আমাকেও এখন থেকে কিছু অর্থ দিন না!" আব্বাস (রা) এর কাঁধ যতোটুকু অর্থের ভার সহ্য করতে পেরেছিলো, রাসূল (সা) তাকে ঠিক ততোটুকু অর্থ দিলেন। এভাবে সবাইকে অর্থ বিতরণ করতে করতে একসময় কিছুই রইলো না।

.

স্বজনদের মধ্যে কেউ অসুস্থ হলে তিনি তাদের রুকিয়্যা করে দিতেন। কোনটা তাদের জন্য ভালো আর কোনটা খারাপ সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতেন। একদিন আলী (রা) এর সাথে এক আনসার সাহাবীর বাসায় গেলেন। আলী (রা) তখন কেবলই অসুস্থতা থেকে আরোগ্য লাভ করেছেন। তাঁদেরকে কাঁচা খেজুর খেতে দেয়া হলো। রাসূল (সা) খাওয়া শুরু করলেন। আলী (রা)-ও কিছু খেজুর খেতে চাইলেন। কিন্তু তিনি তো কেবল অসুস্থ থেকে সুস্থ হয়েছেন। তার দূর্বল পাকস্থলীতে তো এই কাঁচা খেজুর সইবে না। তাই রাসূল (সা) তাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, "তুমি না কেবল (অসুস্থ থেকে) সুস্থ হলে?"
এরপর তাদের সামনে সবজি আনা হলো। রাসূল (সা) তখন বললেন, "আলী! এটা খাও। এটা তোমার জন্য উত্তম হবে।"

.

চাচাতো ভাই জাফর (রা) আবিসিনিয়াতে হিজরত করেছিলেন। বহুদিন পর তিনি ফিরে এসে রাসূল (সা) এর সাথে দেখা করলেন। যেদিন এলেন সেদিনই রাসূল (সা) এর কাছে খায়বার যুদ্ধে জয়লাভের সংবাদ পৌঁছেছে। বহুদিন পর ভাইকে দেখে রাসূল (সা) প্রচণ্ড খুশি হলেন। তাকে চুমু দিলেন। হাসতে হাসতে বললেন, "আমি জানি না কীসে আমি খুশি হবো। খায়বার যুদ্ধে জয়লাভের সংবাদে নাকি জাফরের ফিরে আসাতে।" তিনি জাফর (রা)-কে মুতা যুদ্ধে যায়দ ইবনে হারিছ (রা) এরপর সেনাপতি বানিয়ে দেন। যুদ্ধে জাফর (রা) শহীদ হয়ে যান।

.

মৃত্যুর পর তিনি চাচাতো ভাইয়ের ছেলেমেয়েদের দেখাশুনা করেছেন। তিনবার তাদের জন্য দু'আ করেছেন এই বলে, "হে আল্লাহ! তুমি জাফরের পরিবারকে হেফাজত করো।" জাফর (রা) এর স্ত্রী রাসূল (সা) এর কাছে এসে নিজের কষ্টের কথা জানালেন। তার ছোট ছোট সন্তানেরা এতিম হয়ে গেছে, তিনি কিভাবে তাদের বড় করবেন তা নিয়ে দুঃশ্চিন্তার কথা বললেন। রাসূল (সা) তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, "আপনি কি তাদের জন্য দারিদ্র্যের ভয় করেন যখন এই দুনিয়া আর আখিরাতে আমি তাদের সহায়তা করে যাবো, রক্ষা করে যাবো?" এরপর থেকে জাফর (রা) এর এতিম সন্তানগুলোকে দেখলে তিনি তাদেরকে সামনে নিয়ে এসে বসাতেন। মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন।

.

অন্য আত্নীয়দের জন্যও তিনি প্রায়ই দু'আ করতেন। ইবনে আব্বাস (রা)-কে বুকে জড়িয়ে ধরে তিনি দু'আ করেছেন। বলেছেন, "হে আল্লাহ! তাকে তুমি প্রজ্ঞা দান করো।" রাসূল (সা) এর এই দু'আ মহান আল্লাহ তায়ালা কবুল করেছিলেন। সবচেয়ে প্রজ্ঞাময় কিতাব কুর'আনের জ্ঞান তার অন্তরে ঢেলে দিয়েছিলেন। আজ যে আমরা কুর'আনের অনেক আয়াতের ব্যাখ্যা জানতে পারি তা ইবনে আব্বাস (রা) এর কারণেই। আবু তালিবের মৃত্যুর পর তিনি আলী (রা) এর জন্য এতো সুন্দর দু'আ করেছিলেন যে আলী (রা) বলতেন, "সারা দুনিয়ার সকল উট আমাকে দিলেও (উনার) এই দু'আ আমি কাউকে দিবো না।"

.
চাচা হামজা (রা)-কেও তিনি প্রচণ্ড ভালোবাসতেন। উহুদ যুদ্ধে হামজা (রা)-কে হত্যা করার পর তার দেহ বিকৃত করে ফেলা হয়। হামজা (রা) এর বিকৃত দেহ দেখে রাসূল (সা) প্রচণ্ড কষ্ট পেয়ে বলেছিলেন, "আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন। আপনি আত্নীয়দের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখতেন। অনেক ভালো ভালো কাজ করতেন। যাদের আপনি দুনিয়াতে রেখে গেছেন তাদের কষ্ট যদি আরো বেড়ে না যেতো, তবে আমি আপনার দেহ এভাবেই রেখে দিতাম। যাতে (কিয়ামতের দিন) আপনি বিভিন্ন জায়গা থেকে পুনরুত্থিত হতে পারেন। আল্লাহর শপথ! আপনার বদলে আমি তাদের ৭০ জনকে এভাবে বিকৃত করে দেবো।"

.
রাসূল (সা) এ কথা বলার পর জিবরাঈল (আ) ওহী নিয়ে আসলেন। পরম করুণাময় আল্লাহ তায়ালা নাযিল করলেন-
"যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর তাহলে ঠিক ততখানি করবে যতখানি অন্যায় তোমাদের প্রতি করা হয়েছে; তবে তোমরা ধৈর্য ধারণ করলে ধৈর্যশীলদের জন্য ওটাই উত্তম।" [সূরা আন নাহল ১৬:১২৬]
এ আয়াত নাযিল হবার পর রাসূল (সা) নিজের শপথ ফিরিয়ে নিলেন। শপথের কাফফারা আদায় করলেন।

.
আত্নীয়দের ভালোবাসতেন ঠিকই, কিন্তু তাদের মধ্যে খারাপ কিছু দেখে থাকলে তিনি তা সমর্থন করেননি। সুবিচার করার সময় তিনি আত্নীয় আর অনাত্নীয় ভেদাভেদ করেননি। বলতেন, "মুহাম্মদের মেয়ে ফাতিমা যদি চুরি করতো, তবে আমি তার হাতও কেটে দিতাম।" আরাফার দিনে তিনি দাঁড়িয়ে সবার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন,
"জাহেলিয়াতের সব কিছুই (আজ থেকে) আমার পায়ের নীচে। বাতিল......। জাহেলিয়াতের সুদ বাতিল। আর সবার প্রথম সুদ আমি বাতিল করছি আমাদের পক্ষ থেকে। আব্বাস ইবনে আব্দুল মুত্তালিবের সুদ (আজ থেকে) বাতিল।"

.
[শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ এর "كَيف عَـاملهُم صلى الله عليه وسلم" (Interactions Of The Greatest Leader) গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা]

১৭২

কুরআন ও বাইবেল : কোন গ্রন্থটি আসলে কপি করে লেখা?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

প্রাচীনকালে মহাকাশ ও এর প্রকৃতি নিয়ে নানা রকমের মতবাদ মানুষের মাঝে প্রচলিত ছিল। এগুলোর মধ্যে প্রায় সব মতবাদই ছিল কাল্পনিক ও চরম অবৈজ্ঞানিক। যেমনঃ প্রাচীন মিসরের লোকেরা বিশ্বাস করত যে, আকাশ স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে। এই জাতীয় বিভিন্ন কথাবার্তা তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের মাঝেই ছিল। [১] প্রাচীন গ্রীসেও এ রকম মতবাদ প্রচলিত ছিল। তারা বিশ্বাস করত যে, আকাশ ও পৃথিবী উভয়েই স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে! [২] আধুনিক কালে টেলিস্কোপ আবিষ্কার ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার উন্মেষ ঘটবার আগ পর্যন্ত এ রকম বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক ধারণা মানুষের মাঝে প্রচলিত ছিল। বর্তমান যুগে আমরা জানি যে এ রকম কোন স্তম্ভ দ্বারা আকাশ বা পৃথিবী দাঁড়িয়ে নেই। বরং মহাকর্ষীয় বলের দ্বারা আকাশের বিভিন্ন উপাদান যেমনঃ পৃথিবীসহ বিভিন্ন গ্রহ, সূর্য ও বিভিন্ন নক্ষত্র ইত্যাদি তাদের ভারসাম্য রক্ষা করে আছে এবং নিজ নিজ কক্ষপথে আবর্তন করছে। [৩]

.

চলুন দেখি আকাশ ও পৃথিবী সম্পর্কে বাইবেল কী বলে।

.

“তিনি[ঈশ্বর] দুনিয়াকে তার জায়গা থেকে নাড়া দেন, তার #থামগুলোকে কাঁপিয়ে তোলেন।”
[বাইবেল, ইয়োব(আইয়ুব/Job) ৯:৬ {কিতাবুল মোকাদ্দস, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি অনুবাদ}]
লিঙ্কঃ https://goo.gl/bTxYDD

.

“He shakes the earth from its place so that its #pillars tremble.”
[Job 9:6; Holman Christian Standard Bible (HCSB)]
লিঙ্কঃ https://goo.gl/PGd5YJ

.

"#ভূগর্ভস্থ_থামগুলি_আকাশকে_ধারণ করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ঈশ্বর যখন তাদের তিরস্কার করেন তখন তারা ভয়ে চমকে যায় এবং কাঁপতে থাকে।"
[বাইবেল, ইয়োব(Job) ২৬:১১, বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি অনুবাদ]
লিঙ্কঃ https://goo.gl/nkYurD

.

"The #pillars_that_hold_up_the_sky tremble, astounded at His rebuke."
[Job 26:11; Holman Christian Standard Bible (HCSB)]
লিঙ্কঃ https://goo.gl/TBjffJ

.

আরো দেখুনঃ বাইবেল এর—Pslams(গীতসংহিতা/যবুর শরীফ) ৭৫:৩ [লিঙ্কঃ https://goo.gl/uuYRew], Isaiah(যিশাইয়/ইসাইয়া) ২৪:১৮ [লিঙ্কঃ https://goo.gl/tTKYFP] যে সব জায়গায় পৃথিবী কোন এক প্রকার পিলার বা স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়ে আছে সেগুলোর কথা বলা হয়েছে।

.

আকাশ ও পৃথিবী সম্পর্কে প্রাচীন মিসর ও গ্রীসে যে সব অবৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচলিত ছিল, তার সঙ্গে আমরা বাইবেলের তথ্যের অদ্ভুত মিল খুঁজে পাচ্ছি। অথচ খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারকরা সব সময় অভিযোগ করে আসে যেঃ তাদের বাইবেল হচ্ছে ঈশ্বরের বাণী এবং কুরআন হচ্ছে কপি করে লেখা গ্রন্থ। [[আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য উল্লেখ করি, বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্টের 'মূল কপি'র নামে খ্রিষ্টানদের কাছে যা আছে, সেগুলো গ্রীক ভাষায় লেখা। অথচ ঈসা(আ) মোটেও গ্রীক ছিলেন না, বরং তিনি ছিলেন বনী ইস্রাঈলের মানুষ এবং তাঁর সময়ে বনী ইস্রাঈলের লোকেরা এ্যারামায়িক ভাষায় কথা বলত।
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Language_of_Jesus]]
তাদের উদ্দ্যেশ্যে বিনীতভাবে বলতে চাই যেঃ "ঈশ্বরের বাণী"তে কী করে বৈজ্ঞানিক ভুল থাকে? "ঈশ্বরের বাণী"র সাথে কী করে প্রাচীন পৌরাণিক মতবাদের এমন মিল থাকে? তারা অভিযোগ করে যে কুরআন নাকি কপি করে লেখা। কোন গ্রন্থ যে আসলে কপি করে লেখা, তা বাইবেলের তথ্যের সাথে প্রাচীন পৌরাণিক মতবাদের মিল দেখেই বোঝা যাচ্ছে!

.

এবার চলুন, একই নিক্তি দিয়ে কুরআনকে পরিমাপ করি। দেখা যাক আকাশের গঠন সম্পর্কে আল কুরআন কী বলে।

.

"আল্লাহই ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন #স্তম্ভ_ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হলেন এবং সূর্য ও চাঁদকে নিয়মাধীন করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে, তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা তোমাদের রবের সাথে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে নিশ্চিত বিশ্বাস করতে পার।"
(কুরআন, রা'দ ১৩:২)
লিঙ্কঃ https://goo.gl/XADang

.

"It is Allah who erected the heavens #without_pillars that you [can] see; then He established Himself above the Throne and made subject the sun and the moon, each running [its course] for a specified term. He arranges [each] matter; He details the signs that you may, of the meeting with your Lord, be certain."
(Qur'an, Ra'd 13:2)
লিঙ্কঃ www.quran.com/13/

.

কুরআন নাজিল হয়েছিল ৭ম শতাব্দীতে। সে সময়ে পৃথিবীর মানুষের মাঝে আকাশ নিয়ে বিভিন্ন অবৈজ্ঞানিক মতবাদ প্রচলিত ছিল, মানুষ বিশ্বাস করত আকাশ দাঁড়িয়ে আছে বিশাল সব স্তম্ভের উপর। অথচ আল কুরআনে সরাসরি বলা হচ্ছে কোন প্রকার স্তম্ভ বা পিলার ছাড়াই আল্লাহ তা'আলা আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন। সেই সাথে কুরআনে চাঁদ, সূর্য ইত্যাদি মহাজাগতিক বস্তুর কক্ষপথের কথা বলা হয়েছে। যার সঙ্গে পৌত্তলিক পৌরাণিক মতবাদ, বাইবেলের তথ্য ইত্যাদির কোন মিল নেই। বরং আধুনিক কালে আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের মিল আছে। এটা তো কুরআনের বৈজ্ঞানিক অলৌকিকতার আরেকটি প্রমাণ, সুবহানাল্লাহ। কুরআন যদি কপি করেই লেখা হত, তাহলে কি এমনটি হত? এ কেমন "কপি করে লেখা"(!) গ্রন্থ যার সাথে তৎকালিন অবৈজ্ঞানিক তথ্যের কোন মিল নেই? মুহাম্মাদ(ﷺ) যদি বাইবেল থেকেই কুরআন কপি করতেন(নাউযুবিল্লাহ), তাহলে কী করে বাইবেল থেকে বৈজ্ঞানিক ভুলগুলো বাদ দিলেন??

.

ঈসা(আ) এর একত্ববাদী ধর্ম ফিলিস্তিন থেকে রোমে গিয়ে কী করে "রোমান" ধর্মে পরিনত হয়েছিল সে ইতিহাস পড়লে সে সময়কার মিসরীয়, গ্রীক এইসব পৌত্তলিক জাতির মতবাদের সাথে খ্রিষ্টান মতবাদের মিল দেখলে আর অবাক হতে হয় না। [৪] শুধুমাত্র মহাকাশ বিষয়ক তথ্যই না — বাইবেলে যিশুর জন্মকাহিনী [দেখুনঃ মথি ২য় অধ্যায়; লিঙ্ক https://goo.gl/jLh7r8 ;

লুক ২য় অধ্যায়; লিঙ্কঃ https://goo.gl/tjaqZj], “ঈশ্বরের জন্ম দেওয়া পুত্র”(?!) হওয়া, ক্রুশবিদ্ধ হয়ে মরা, এরপর পুনরুত্থিত হওয়া, মানুষের পাপের ভার বহন করা, ক্রুশের প্রতীক ইত্যাদি বিভিন্ন জিনিসের সাথে প্রাচীন মিসরীয় দেবতা Horus এবং রোমে পুজিত পার্সী দেবতা Mithras এর কাহিনীর অদ্ভুত মিল আছে। [৫] অথচ কুরআনে ঈসা(আ) এর জন্মকাহিনী [দেখুনঃ সুরা মারইয়াম; লিঙ্কঃ https://goo.gl/wijsrT] বাইবেল থেকে ভিন্ন এবং এর সাথে পৌত্তলিকদের পৌরাণিক কাহিনীর মিল নেই। খ্রিষ্টান মিশনারিরা কুরআনের বিরুদ্ধে লাগাতার অভিযোগ করে আসছেন যে এটা কপি করে লেখা। অথচ অনুসন্ধান করে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কুরআন আদৌ কপি করে লেখা নয় বরং খ্রিষ্ট ধর্মের ধর্মগ্রন্থের কিছু অংশ এমনকি তাদের প্রধান প্রধান আকিদা-বিশ্বাসগুলোও মূর্তিপুজকদের থেকে কপি করা। যাদের নিজেদের ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মগ্রন্থে এ রকম কপি-পেস্টের আলামত লক্ষ্য করা যায়, তারা কোন মুখে অন্য ধর্মের বিরুদ্ধে এইসব অভিযোগ আনেন?

.

আর যে সব নাস্তিক-মুক্তমনা খ্রিষ্টান প্রচারকদের সাথে গলা মিলিয়ে কুরআনের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক ভুল আর কপি করে লেখার অভিযোগ করেন তাদেরকে বলব---একমুখী অধ্যায়ন আর অন্ধ বিরোধিতার বদ অভ্যাস পরিত্যাগ করুন, এতে আপনাদেরই ভালো হবে। নচেৎ নিজেরাই হাসির খোরাক হবেন। মানুষ এখন সচেতন হচ্ছে। আপনাদের অভিযোগগুলোর ব্যাপারে অনুসন্ধান করে মানুষ উল্টো ইসলামের সত্যতা আবিষ্কার করছে। এর ফলে মুসলিমদের ঈমান আরো দৃঢ় হচ্ছে আর অমুসলিমরাও ইসলামের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় নিচ্ছে।

---

[১] ■ “Ancient Egyptian religion and mythology; The Djed Pillar”
http://www.ancientegyptonline.co.uk/djed.html
■ “Ancient Egypt: the Mythology – Nut”
http://www.egyptianmyths.net/nut.htm
[২] “ATLAS - Greek Titan God, Bearer of the Heavens”
http://www.theoi.com/Titan/TitanAtlas.html
[৩] ■ “Stars and galaxies” [BBC]
http://www.bbc.co.uk/education/guides/z496fg8/revision
■ “How does Earth keep its orbit around the Sun and not come closer to the Sun” [UCSB Science Line]
http://scienceline.ucsb.edu/getkey.php?key=770
[৪] "Christianity and Paganism" - Wikipedia The Free Encyclopedia
https://en.m.wikipedia.org/wiki/Christianity_and_Paganism
[৫] ■ “Mithra: The Pagan Christ” by Acharya S/D.M. Murdock
http://www.truthbeknown.com/mithra.htm
■ “Christ in Egypt: The Horus-Jesus Connection” by Acharya S/D.M. Murdock
https://goo.gl/g2UZrp
■ “Horus” -- Ancient Egypt Wikia
http://ancientegypt.wikia.com/wiki/Horus
■ “The Parallels Between Jesus and Horus”
http://hubpages.com/.../the-parallels-between-jesus-and-horus-
■ “The Pagan Origins of the Cross” By Abdullah Kareem
http://www.answering-christianity.com/.../cross_pagan_origins...

১৭৩

অনন্ত নক্ষত্রবীথি

-শিহাব আহমেদ তুহিন

তারাদের গল্প বলি। অবশ্য এ গল্প শুরু করলে তো শেষ হবে না।

কাকে দিয়ে শুরু করা যায়? Sirius-কে দিয়েই না হয় শুরু করি। বাংলায় একে বলে 'লুব্ধক তারা'। রাতের আকাশে এই তারাটাকে দেখতে সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখায়! খালি চোখে দেখা না গেলেও এটা মূলত দুইটা তারার সমষ্টি। একটির নাম Sirius-A। অপরটির নাম Sirius-B। Sirius-A সূর্য থেকে প্রায় দ্বিগুণ বড়। খুব একটা বড় মনে হচ্ছে না? খালি চোখে দেখলে সূর্য তো ছোট একটা বৃত্তের মতো। কিন্তু আসলেই কি তাই?

.

আমাদের পৃথিবীর ব্যাসার্ধ ৬৩৭১ কিলোমিটার। এমন বারোলক্ষ পৃথিবী এক সাথে করলে তা সূর্যের সমান হবে। অবশ্য সবচেয়ে বড় নক্ষত্রের তুলনায় সূর্য কিছুই না। সবচেয়ে বড় নক্ষত্রের নাম VY Canis Majoris। পৃথিবী থেকে প্রায় ৫০০০ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত এই নক্ষত্রটি সূর্য থেকে প্রায় ১৫৪০ গুণ বড়। অন্যদিকে, Sirius আমাদের পৃথিবী থেকে ৮.৬ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত। আলোকবর্ষ মানে যেন কী?

.

আলোকবর্ষ মানে আলো এক বছরে যে দূরত্ব অতিক্রম করে। এক বছর বাদ দেই, আলো এক সেকেন্ডে তিন লক্ষ কিলোমিটার অতিক্রম করে। যার অর্থ আলো এক সেকেন্ডে প্রায় ৬৩৮ বার ঢাকা থেকে সিলেট যেয়ে আবার ঢাকায় ফেরত আসতে পারবে। সবারই নিতান্ত শখের বশে হলেও মাঝে মাঝে এস্ট্রোনমি নিয়ে পড়াশুনা করা উচিৎ। দেখবেন মনের ইগো অনেক কমে যাবে। এই "Infinitely Finite" ইউনিভার্সের সাপেক্ষে চিন্তা করলে যদি পৃথিবীকে বলি, "অসীম সমুদ্রে এক ফোঁটা জল"- একটুও বাড়াবাড়ি হবে না। আমরা সেখানে কোন ছাড়!

.

আপনি যেই পাড়ায় থাকেন, তা আপনাদের গ্রামের তুলনায় খুবই ছোট। গ্রামটা আবার থানার তুলনায় অনেক ছোট। আবার পুরো জেলা হিসেবে চিন্তা করলে থানাটা কিছুই না। তারপর আসে বিভাগ-দেশ-মহাদেশ-আমাদের চেনা পৃথিবী। একবার ভাবুন তো পুরো পৃথিবীর কথা চিন্তা করলে আপনার চেনা জগতটা ঠিক কতোখানি ছোট? হিসেবটা এখানেই শেষ না। এরপর আছে-

.

Solar System: পুরো সোলার সিস্টেমের ভরের তুলনায় পৃথিবীর ভর কেবল ০.০০০৩%।

.

Solar Interstellar Neighborhood: প্রায় ৫৩ টা সোলার সিস্টেম নিয়ে গঠিত। আমাদের লোকাল সোলার ইন্টারসেলারকে অতিক্রম করতে লাগবে প্রায় ৩০ আলোকবর্ষ।

.

Galaxy: আমাদের গ্যালাক্সীতে প্রায় ৪০০,০০০সংখ্যক সূর্যের মতো তারা আছ (চারশো বিলিয়ন)০০০,০০০,ে। মিল্কিওয়ে একটি মাঝারি আকারের গ্যালাক্সী বা ছায়াপথ। সবচেয়ে বড়ো গ্যালাক্সী IC-1101 এ রয়েছে ১০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০(একশো ট্রিলিয়ন) সংখ্যক তারা।

.

The Local Group: আমাদের লোকাল গ্রুপে রয়েছে প্রায় ৪৭ টার মতো গ্যালাক্সি। লোকালগ্রুপকে বলা হয় গ্যালাক্সিগুচ্ছ(Galaxy cluster)। একটা বড়ো ধরনের cluster এ শত শত গ্যালাক্সী থাকতে পারে। আমাদের সোলার সিস্টেমের তুলনায় লোকাল গ্রুপ প্রায় ৫ মিলিয়ন গুণ বড়ো।

.

The Supercluster : একটা supercluster এ শত শত cluster থাকতে পারে। আমাদের Supercluster টির নাম "The Pisces-Cetus Supercluster Complex"- এখানে রয়েছে প্রায় ৬০টির মতো supercluster। আমাদের ডাটা অনুযায়ী The Pisces-Cetus Supercluster Complex এ প্রায় ৩৫,০০০ এরও বেশী গ্যালাক্সী রয়েছে।

.

The Observable Universe: এতে রয়েছে ১০ বিলিয়ন supercluster। ৩৫০ বিলিয়ন গ্যালাক্সী। আর কতোগুলো তারা থাকতে পারে সূর্যের মতো কল্পনা করতে পারেন?
আনুমানিক ৩০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক।
পৃথিবীর মতো গ্রহ কয়টা থাকতে পারে? সেটা তো অনুমান করতেও কষ্ট হয়।

.

এরপর অনেকে নিয়ে এসেছে "Multiverse theory"। যে থিওরী অনুসারে, এই অসীম সংখ্যক গ্রহগুলো নিয়ে গড়া আমাদের Observable Universe আসলে পুরো ইউনিভার্সের তুলনায় কেবল একটা বাবলের মতো। যেমনটা বলেছিলাম- "বিশাল সমুদ্রে এক ফোঁটা জল"।

.

এই অসীম মহাবিশ্ব আপনাকে শিখাবে এর স্রষ্টার বিশালত্ব, দেখবেন মাথা আপনাআপনি বাধ্য হবে তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদা - দেয়ার জন্য। তবে আপনি অন্ধ হলে ভিন্ন কথা। তখন ভাবা শুরু করবেন- এই বিশাল মহাবিশ্ব আপনাআপনি শুন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে। যেমনটা আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলেন-
"তারা কি শুন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই নিজেদের সৃষ্টিকর্তা? নাকি তারা আসমান ও জমিন সৃষ্টি করেছে? বরং, তাদের কোনো সঠিক বিশ্বাস নেই।" (কুর'আন ৫২:৩৫-৩৬)

.

আবার Sirius এর কাছে ফিরে যাই। Sirius কে আরবে 'মারযামুল জাওযা' বলা হতো। জাহেলী যুগে আরবরা এর উপাসনা করতো। কুরাইশদের প্রতিবেশী খুজা'আ গোত্র এর উপাসনার জন্য বিখ্যাত ছিলো। তারা বিশ্বাস করতো, এই তারার আমাদের ভাগ্যের উপর প্রভাব বিস্তারের ক্ষমতা রয়েছে। মিশরবাসীরাও এর উপাসনা করতো। কারণ, এর উদয়কালে নীলনদে জোয়ার ও প্লাবন হতো। আল্লাহতায়ালা তাই কুরআনে নাযিল করলেন-
"আল্লাহতায়ালাই হচ্ছেন Sirius এর রব।" (৫৩:৪৯)

.

মেসেজটা খুব ক্লিয়ার- Sirius এর বিশালত্বে মুগ্ধ হয়ে এটার ইবাদত না করে তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। কারণ, আল্লাহতায়ালাই এর সৃষ্টিকর্তা।

.

"আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে রাত ও দিন, সূর্য ও চাঁদ । তোমরা না সূর্যকে সিজদা করবে, না চাঁদকে। আর তোমরা আল্লাহকে সিজদা করো যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন- যদি তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে থাকো।" (কুর'আন ৪১:৩৭)

.

আকাশের তারাগুলো হচ্ছে আল্লাহ্ তায়ালার এক অসাধারণ নিদর্শন। আমরা যখন আকাশের তারাদের দিকে তাকাবো, তখন আমাদের করুণাময় আল্লাহ্‌র কথা মনে হবে। তাদের নিয়মতান্ত্রিক অবস্থান আমাদের জানিয়ে দেয় অবশ্যই এদের একজন স্রষ্টা রয়েছেন। এ কারণেই হয়তো পবিত্র কুর'আনে একটি সূরার নাম দেয়া হয়েছেঃ "আন-নাজম"। যার অর্থ "তারা।"

.

একবার এক লোক এক আরব বেদুঈন নারীকে রাতের বেলা একা পেয়ে গেল। সে বারবার মেয়েটাকে তার সাথে মিলিত হতে প্ররোচিত করতে লাগল। একসময় মেয়েটা বিরক্ত হয়ে বলল-

.

أي ثكلتك أمك أمالك زاجر من كرم ؟ أمالك ناه من دين ؟

" তোমার কি সমস্যা? কোথায় তোমার সম্মান? তোমার দ্বীন?"

লোকটা মজা করে জবাব দিল-

والله لا يرانا إلا الكواكب

"সখী! কেউই তো আমাদের দেখছে না, আকাশের ঐ তারাগুলো ছাড়া।"

.

লোকটাকে স্তম্ভিত করে মহিলাটি জবাব দিল-

وأين مكوكبها ؟

" আর তাঁর ব্যাপারে কি বলবে যিনি তারাগুলোকে আকাশে স্থাপন করেছেন?" (শুয়াবুল ঈমান)

১৭৪

আট চতুষ্পদ জন্তু সমস্যা সমাধান [উমর সিরিজ - ১]

-ফারহান গনি

চকবাজার মোড়ে চা খেতে খেতে আড্ডা দিচ্ছিলাম। সাথে ছিল এক্সট্রোর্ডনারি ট্যালেন্টেড উমর আর দ্যা জার্নালিস্টখ্যাত সাইফ। উৎপল দাও ছিলেন সাথে। উৎপল দা সম্পর্কে কিছু বলি। আমাদের চেয়ে সিনিয়র উনি। নিজেকে স্কেপটিক হিসেবে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন তিনি । সাহিত্য আর বিজ্ঞানে তাঁর দখল অসাধারণ, কিন্তু আমাদের উমরের চাইতে বেশি নয়।
উমরকে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে প্রায়ই প্রশ্ন করে থাকেন উৎপল দা। সেদিনও এর ব্যতিক্রম হয় নি।

.

চায়ে কয়েক চুমুক দেওয়া অলরেডি শেষ হয়েগিয়েছিল। উমর চায়ের একটু মনযোগী হয়ে পড়া মাত্রই উৎপল দার প্রশ্ন, "আচ্ছা! উমর! পৃথিবীতে মোট প্রাণীর সংখ্যা কত?"
উমর উৎপল দার দিকে তাকালো , "প্রাণীর সংখ্যা.... প্রায় ১৫ লক্ষ। আর এই সংখ্যা প্রতিদিনই বাড়ছে। "
-"এর মধ্যে চতুষ্পদ প্রাণীর সংখ্যা কত হবে?"
-"চতুষ্পদ প্রাণীরা বেসিকালি অ্যাম্ফিবিয়া , রেপটিলিয়া আর ম্যামিলিয়া শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। সব মিলিয়ে এদের সংখ্যা ২২ হাজারের মত হবে। "
-"আচ্ছা! কেউ যদি তোমাকে এসে বলে , চতুষ্পদ প্রাণীর সংখ্যা ৮ টি, তাহলে তাকে তুমি কি বলবে?"
উমর মুচকি হাসি দিয়ে উৎপল দার চেহারা থেকে দৃষ্টি সরিয়ে এমনভাবে চায়ের কাপের দিকে তাকলো যেন সে অলরেডি উৎপল দার মটিভ বুঝে গেছে।
চায়ে চুমুক দিয়ে সে বলল, "দাদা! আপনি সম্ভবত সুরা যুমারের ৬ নং আয়াত সম্পর্কে বলতে চাচ্ছেন । যেখানে বলা হয়েছে , তিনি তোমাদের জন্য আট প্রকারের চতুষ্পদ জন্তু অবতীর্ণ করেছেন। তাই না? "
উৎপল দা ও মুচকি হাসি দিলেন। অতঃপর চায়ে চুমুক দিয়ে হ্যা সূচক মাথা নাড়লেন।
আমি বুঝতে পারলাম ইন্টারেস্টিং কিছু হতে চলেছে। তাই কান খাড়া করলাম। সাইফও কান খাড়া করতে দেরি করেনি।

.

উমর বলল ,"দাদা! এই আয়াতটি কেউ পড়লে সে স্বাভাবিকভাবেই মনে করে নেবে যে, আল্লাহ পৃথিবীতে কেবল আটটি চতুষ্পদ প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। তাই, সুরা আনআমের ১৪৩-১৪৪নং আয়াতে যেতে হবে যেখানে এই আট প্রাণীর কথা বলা হয়েছে। এরা হল নর ও মাদী মেষ , নর ও মাদী ছাগল, নর ও মাদী উট, নর ও মাদী গরু। মোট আটটি প্রাণী যেগুলো হালাল হওয়া সত্ত্বেও কাফেররা নিজেদের জন্য হারাম করে নিয়ছিল। তাই , আল্লাহ এই আয়াতের মাধ্যমে এদের হালাল হওয়ার দিকটি তুলে ধরে বলেছেন, তোমাদের জন্য আল্লাহ আট প্রকারের জন্তু অবতীর্ন করেছেন। "

.

উৎপল দা হঠাৎ যেন নিজের কুল হারিয়ে ফেললেন। "তোর কি মনে হয় আমি সুরা আনআম না পড়ে তোর সাথে ডিবেট করতে এসেছি ? "
-"না। দাদা। আচ্ছা আপনি বলুন, এই আয়াত তাহলে কি বোঝাচ্ছে?"
-এখানে স্পষ্ট করেই বলা হয়েছে যে, "আল্লাহ আট প্রকারের প্রাণী সৃষ্টি করেছেন। "
-"আচ্ছা দাদা! আপনার কি মনে হয়? কুরআন কে লিখেছে?
-"দেখ! আমি স্পষ্ট করেই বলতে চাই। যদি কুরআন আল্লাহ লিখতো, তাহলে এতে ভুল থাকতো না। তোদের নবি মুহাম্মদ ই কুরআনের রচয়িতা। "

সাইফ আর ধৈর্য ধরতে পারলো না। বলে উঠল, "উৎপল দা! একজন নবি যে কিনা পড়ালিখা জানতেন না তিনি কুরআন লিখেছেন, এটা তো কোনো গাঁজাখোরই বলতে পারে। "

.

উৎপল দা কিছু বলার আগেই উমর বলে উঠল, "দাদা ধরে নিলাম কুরআন মুহাম্মদ সা লিখেছেন। কিন্তু তাঁরও তো কমন সেন্স ছিল। তাই না? পৃথিবীতে মাত্র আটটি চতুষ্পদ প্রানী আছে , এই কথা তিনি বলার আগে একশ বার ভাবার কথা তাই না ?"
উৎপল দা উত্তর দিতে দেরি করলেন না। "জি না । নবি মুহাম্মদ হয়তো মনে করতো যে আরবে যে উট , মেষ , ছাগল আর গরু আছে সেগুলো ছাড়া বোধ হয় , পৃথিবীতে আর কোনো চতুষ্পদ জন্তু নেই।"
আরও একবার মুচকি হাসি দিল উমর। এবার তার এক্সপ্রেশন দেখে বুঝতে পারলাম যে উৎপল দা বাঁশ খেতে চলেছেন।

.

উমরের সেই বাঁশটি ছিল এইরকম ,"কুরআনের সুরা নাহলের ১৬ নং আয়াতে ঘোড়া , খচ্চর আর গাধার কথা বলা হয়েছে। তিরমিযীর কিতাবুল বুয়ুর এক হাদিসে রাসুল সা বিড়াল ও কুকুরের বিক্রয়মূল্য নির্ধারন করতে নিষেধ করেছেন। তিরমিযীর আরেক হাদিসে শুকরকে হারাম বলা হয়েছে । বুখারির ফারায়িজ অধ্যায়ে বাঘের ঘটনা বলা হয়েছে। সুরা ফিলে হাতির কথা বলা হয়েছে। "
রাইফেলের গুলির মতো রেফারেন্স দিতে লাগলো উমর। আর একটু একটু করে বড় হত লাগলো উৎপল দার কপালের ভাঁজ। এরপর এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে উমর বলল , "তার মানে মুহাম্মদ সা অনেকগুলো চতুষ্পদ প্রানী সম্পর্কেই জানতেন।"
উৎপল দা -" উম মমম হতে পারে"
-"তার মানে কি আপনার মনে হয় নবি সা কুরআন লিখেছেন আর সেখানে ইচ্ছাকৃতভাবে ভুল করেছেন? তাই, এই আয়াত দিয়ে এটা বোঝানো হচ্ছে না যে পৃথিবীতে কেবল আটটি চতুষ্পদ জন্তু আছে। বরং এটি বোজানো হচ্ছে যে, এই আট প্রকারের জন্তু মানুষের কল্যানের জন্য অবতীর্ন করা হয়েছে।"

.

উৎপল দা আর কিছু বললেন না। হয়তো তিনি উত্তরটা পেয়েগিয়েছিলেন। তিনি ঘড়ির দিকে তাকালেন আর - "আই থিংক আই হ্যাভ টু গো। ওকে ভাল থাকিস।"
সাইফ তো পারছিল না আনন্দে চিৎকার করতে। আমি চার টাকাটা দিলাম।
সাইফ গলা নিচু করে বলল , "চালাই যা।"

১৭৫

নাস্তিকতা নিয়ে লেখালেখি

-আসিফ আদনান

গত প্রায় দু'বছরে নাস্তিকতা নিয়ে বেশ কিছু কাজ হয়েছে। ইসলামবিদ্বেষীদের বিভিন্ন অবান্তর প্রশ্ন, অপবাদ ও সৃষ্ট সংশয়ের জবাব দেয়া হয়েছে। এখনো হচ্ছে। সার্বিকভাবে বিষয়টি ইতিবাচক। ইসলামের সমর্থনে তরুণরা এগিয়ে আসছেন, সময় ও শ্রম দিচ্ছেন। এ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অনেক লেখক বের হয়ে আসছেন। গত প্রায় ১৫ বছর ধরে ক্রমাগত চলতে থাকে সিস্টেম্যাটিক এবং সিস্টেমিক ইসলামবিদ্বেষের ফলে মুসলিমদের আত্মবিশ্বাসে যে আঘাত লেগেছিল সামান্য হলেও সেটার মেরামত করা হচ্ছে – এগুলো নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় দিক। তবে মুসলিম সমাজের বিশ্বাস, কাজ ও আদর্শের সার্বিক উন্নতির ক্ষেত্রে "ইসলামবিদ্বেষীদের উত্থাপিত প্রশ্নের জবাব ও অভিযোগের খণ্ডন" – এর গুরুত্ব কতোটুকু, সার্বিক বিচারে এ কাজটির অবস্থান কোথায় – এ প্রশ্নগুলো সম্পর্কে আমাদের সঠিক ও পরিষ্কার ধারণা থাকা প্রয়োজন।

.

নাস্তিকদের অভিযোগ খণ্ডন মূলত একটি প্রতিক্রিয়া। ইসলামবিদ্বেষীরা আক্রমণ করছে, এটা ক্রিয়া। আমরা জবাব দিচ্ছি এটা হল, প্রতিক্রিয়া। সুতরাং মৌলিক বিচারে এটি একটি রক্ষণাত্মক অবস্থান। একই সাথে এটি এমন একটি অবস্থান যেখানে প্রতিপক্ষ সুবিধাজনক অবস্থায় আছে। যখন কোন ইসলামবিদ্বেষী কোন একটি অভিযোগ আনছে, ধরা যাক সে যিনার শাস্তিকে অমানবিক বলছে – তখন সে বিতর্কের টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশানস ঠিক করে দিচ্ছে। মানবতা কী? এর মাপকাঠি কী? সে ইতিমধ্যে ঠিক করে দিয়েছে। আমরা বাধ্য হচ্ছি তার ঠিক করে দেয়া মানবতার সংজ্ঞায় শরীয়াহকে মানবিক প্রমাণ করতে। এক্ষেত্রে সমস্যা হল নাস্তিকদের ঠিক করে দেয়া মানদণ্ডে ইসলাম সবসময় প্রমাণিত হবে – এমন কোন কথা নেই। পশ্চিমের আধুনিক বস্তুবাদী, উদারনৈতিক, সেক্যুলার ও ভোগবাদী যে চিন্তা দ্বারা বর্তমানের নাস্তিকরা প্রভাবিত, তার সাথে ইসলামের সংঘর্ষ ব্যাপক। অনেক ক্ষেত্রেই কোনভাবেই ইসলামের অবস্থানকে নাস্তিকদের বেঁধে দেয়া গ্রেডিং সিস্টেমে আমরা পাশ করাতে পারবো না। এটার কোন প্রয়োজনও নেই। সমস্যা ইসলামে না, সমস্যা নাস্তিকদের ঠিক করা মানবরচিত মানবিকতা, আধুনিকতা আর সভ্যতার কাঠামোতে।

.

কিন্তু নাস্তিকতা ও ইসলামবিদ্বেষের সফলতা হল, মুসলিমদের মধ্যে রক্ষণাত্মক মানসিকতা তৈরি করা এবং তাদের সেট করা টার্মস অ্যান্ড কন্ডিশানে ইসলামকে সমর্থন করতে মুসলিমদের বাধ্য করা। একই কথা ইসলামকে বিজ্ঞানসম্মত প্রমাণ করার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আল্লাহ আযযা ওয়া জাল কুরআনের দ্বিতীয় সুরার প্রথমেই আমাদের জানিয়ে দিচ্ছেন – এই কিতাবে কোন সন্দেহ নেই ঐ ব্যক্তিদের জন্য যারা গ্বাইবের উপর বিশ্বাস এনেছে। আধুনিক বস্তুবাদী বিজ্ঞান চিন্তা ক্যাটাগরিকালি গ্বাইবকে অস্বীকার করে। বস্তুবাদী ব্যাখ্যার সাথে সাংঘর্ষিক কোন প্রমাণিত উপসংহারও তারা মেনে নিতে রাজি না। অন্যদিকে অপ্রমাণিত নানা হাইপোথিসিসকে তারা ধ্রুব সত্য হিসেবে চিত্রিত করে। সুতরাং দুটি দৃষ্টিভঙ্গি মৌলিকভাবে বিপরীতধর্মী। এমন অবস্থায় কোন এক আদর্শের লোক যদি বাধ্য হয়ে কিংবা স্বেচ্ছায় অন্যের আদর্শের আলোকে, তাদের কাঠামোতে নিজের বিশ্বাস ও আদর্শকে সঠিক প্রমাণ করতে চায়, তখন ফলাফল কী হবে?

.

পশ্চিমা কিংবা নাস্তিকদের কাছে গ্রহণযোগ্য এমন সব ব্যাখ্যা তৈরি করতে হবে। সেটা করতে গিয়ে অবশ্যাম্ভাবীভাবেই ইসলামকে কাটছাঁট করে উপস্থাপন করতে হবে। সালাফ আস-সালেহিনের সঠিক দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থান থেকে সরে যেতে হবে। এবং তর্কে জেতার নিয়তে শুরু করলেও একসময় শরীয়াহর ব্যাপারে এই ছাড়গুলো সার্বিকভাবে মুসলিমদের চিন্তাকে প্রভাবিত করবে। ফ্রি-

মিক্সিং, বহুবিবাহ, মুরতাদের শাস্তি, জিহাদ শরীয়াহ রাষ্ট্র, সমকামিতার ব্যাপারে দৃষ্টিভঙ্গি, আল ওয়ালা ওয়ালা বারা সহ বিভিন্ন বিষয়ে পশ্চিমে অবস্থিত মুসলিমদের বর্তমান অবস্থার মধ্যে এর বাস্তব উদাহরণ আছে।

.

এ ব্যাপারে উস্তাদ সাইয়্যিদ কুতুবের রাহিমাহুল্লাহ একটি উক্তি প্রাসঙ্গিক -

.

একটি পূর্ণাংগ অথচ খুব সূক্ষ্ম কারিগরি শিল্পযন্ত্রের কোন একটি স্থানে যদি বাইরের কোন একটি পার্ট জুড়ে দেয়া হয় তবে সেই শৃঙ্খলাপূর্ণ ব্যবস্থাপনা স্বাভাবিকভাবেই পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে যায়। এমন অনেক লোক রয়েছে যাদের চিন্তা-কর্মের গতিধারা ও নিয়মপদ্ধতি অপরিচিত পথের বিষাক্ত প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। তারা মনে করে থাকে যে ইসলামের ভেতর এ সকল বিধান জুড়ে দিয়ে ইসলামের জন্য নবতর শক্তি সঞ্চয় করে দিয়েছেন। এ ধারণা নিতান্ত অমূলক ও বাতিল এবং ইসলামের জন্য খুবই মারাত্মক। এটা ইসলামের প্রান-আত্মা সম্পূর্ণ অকেজো ও অকর্মা করে দেয়, আর এটি একপ্রকার পলায়নী মনোবৃত্তিবিশেষও; যদিও তা পরিস্কারভাবে স্বীকার করা হয় না।
[ইসলামের সামাজিক সুবিচার]

.

আরেকটি সমস্যা হল নাস্তিক তথা ইসলামবিদ্বেষীদের মধ্যে অধিকাংশই প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য প্রশ্ন করে না। ব্যাপারটা এমন না যে তাদেরকে সঠিক ভাবে উত্তর দিতে পারলে তারা কলেমা পড়ে মুসলিম হয়ে যাবে। বরং এক প্রশ্নের জবাব দিলে তারা আরেক প্রশ্ন করবে, সেটার পর আরেকটা, তারপর আরেকটা। এভাবে চলতেই থাকবে। প্রশ্ন হল, মুসলিমরা কি ক্রমাগত এসব প্রশ্নের উত্তর দিতেই থাকবে? যদি তাই হয় তাহলে শেষ পর্যন্ত এতে মুসলিমদের লাভ কি? তর্কে জেতা? এতো সময়, শ্রম, এবং মনোযোগ ব্যয় করার উদ্দেশ্য হল যাদেরকে আমরা অলরেডি ভুল হিসেবে জানি তাদেরকে ভুল প্রমাণিত করা?

.

কিন্তু এসব কিছু ছাড়াও আরো একটি বড় ঝুঁকি আছে, যেটা নিয়ে চিন্তা করা প্রয়োজন। আর সেটা হল ইসলামকে মানবিক, বৈজ্ঞানিক কিংবা যৌক্তিক প্রমাণ করতে গিয়ে অনেক সময় মুসলিম তার্কিক ও লেখকরা কাফিরদের তৈরি করা চিন্তার কাঠামোকে গ্রহণ করে নেয়। অন্যদিকে ইসলামী আক্বিদা ও 'ইলমের (কুরআন ও সুন্নাহ) ব্যাপারে সঠিক ধারণা না থাকায় তারা এমন কিছু যুক্তি-তর্ক, প্রমাণ সামনে নিয়ে আসে যা আপাতভাবে উপকারী মনে হলেও, শেষ পর্যন্ত আক্বিদার ক্ষেত্রে চরম বিপর্যয় ডেকে আনে। জাহমিয়্যাহ, জাবারিয়্যাহ, মু'তাযিলা সহ ইসলামের ইতিহাসে বাতিল ফিরকাগুলোর অনেকগুলোর উৎপত্তিই এভাবে হয়েছে। ইসলামের পক্ষ নিয়ে নাস্তিকদের সাথে তর্কে অবতীর্ণ হওয়া বর্তমান বিশ্বের অনেক নামীদামী বক্তাদের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাত্রায় এরকম বিচ্যুতি ঘটেছে। সবচেয়ে বিপদজনক বিষয় হল, যেহেতু মৌলিক আক্বিদা বিষয়ক রচনার বদলে সাধারণ মানুষ এধরনের লেখা বেশ আগ্রহ নিয়ে পড়েন এবং এ লেখাগুলো দ্বারা প্রভাবিত হন, তাই একসময় এ বিচ্যুতিগুলো ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়ে যায়। শরীয়াহর বিভিন্ন বিধানের মতোই আক্বিদার বিভিন্ন বিষয়েও ছাড় দেয়া শুরু হয়, গোমরাহি মেইন্সস্ট্রিম হয়ে যায়। অন্যদিকে মুসলিমদের মধ্যে কেবলমাত্র আক্বলের বেইসিসে, অর্থাৎ মানবীয় বুদ্ধির আলোকে দ্বীনের হুকুম-আহকামকে ব্যাখ্যা করার প্রবণতা চালু হয়ে যায়।

.

সর্বোপরি আমার ভাবা প্রয়োজন যে কেবল নাস্তিকতা সংক্রান্ত লেখা মুসলিম সমাজের চিন্তার বিকাশে কতোটুকু সহায়ক হবে। আমাদের সমাজে নাস্তিকতার বুদ্ধিবৃত্তিক মোকাবেলার প্রয়োজনীয়তা আছে। একথা অনস্বীকার্য। কিন্তু একই সাথে তাওহিদের মৌলিক জ্ঞান ও সঠিক আক্বিদা তুলে ধরা, প্রচলিত ভুল ধারণার নিরসন, ইসলামী ভ্রাতৃত্ববোধ ও মুসলিম হিসেবে পরিচয়ের গুরুত্ব, মুসলিম উম্মাহর পুনঃজাগরনের সঠিক পথ ও পদ্ধতি সম্পর্কে ধারণা তৈরি, ইসলামের আলোকে সামাজিক সমস্যা ও অবক্ষয়গুলোর সমাধান তুলে ধরা, ফিকহুল ওয়াক্বি বা বাস্তবতা বুঝের বিকাশ করা, পাশ্চাত্যের দর্শন ও বাস্তবতাকে তুলে ধরা ও আক্রমণ করা, ইসলাহ, আত্মশুদ্ধি – ইত্যাদি বিষয় নিয়েও কাজ করা প্রয়োজন। কিন্তু এসব বিষয়ে কি যথেষ্ট কাজ হচ্ছে?

.

সঠিক আক্বিদা ও মানহাজ, সিরাতুল মুস্তাক্বিমের উপর থাকা, আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আহর অবস্থানের উপর থাকা হল আমাদের মূলধন। আর নাস্তিকদের জবাব দেয়া, তাদের সাথে তর্ক করা, তর্কে জেতা – ইত্যাদি হল মুনাফা বা লাভ। যেকোনো ব্যবসায় লাভ করার চেয়ে মূলধন সংরক্ষণ বেশি গুরুত্ব পায়। একারণে নাস্তিকতা বিষয়ক আলোচনার তুলনামূলক গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং ভারসাম্য বজায় রাখা প্রয়োজন। যেহেতু বর্তমানে বাংলায় এ বেশ লেখালেখি হচ্ছে, এবং আলহামদুলিল্লাহ অনেক লেখক এগিয়ে আসছেন তাই এ বিষয়গুলো নিয়ে সতর্ক হওয়া জরুরী।

১৭৬

ডারউইনের বিবর্তনবাদের সীমাবদ্ধতা

-আশরাফুল আলম

ডারউইন যখন প্রথম তাঁর থিওরি প্রদান করেন, তখন তাঁর থেকে শতগুণে যোগ্য একজন সমসাময়িক প্যালেওন্টোলজিস্ট লাওইস আগাসিজ ফসিল রেকর্ডের আলোকে ডারউইনের হাইপোথিসিসকে বাতিল করে দিয়েছিলেন। কিন্তু ডারউইন যেহেতু তাঁর তত্ত্বের আলোকে জীবের উৎপত্তির একটি বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দাঁড় করানোর চেষ্টা করছিলেন এবং যেহেতু পশ্চিমা বিশ্বে চার্চের সাথে বিজ্ঞানের যুদ্ধ চলছিলো, ডারউইনের এই মতবাদ পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্যপ্রমাণ-ভিত্তিক না হয়েও পরবর্তীতে গ্রহণযোগ্যতা পায়।

.

ডারউইন কৃত্রিম সংকরায়নের উপর পর্যবেক্ষণ করে বলেছিলেন প্রজাতিতে যে ভ্যারিয়েশন হয় সেগুলো প্রাকৃতিকভাবে নির্বাচিত হতে পারে এবং যথেষ্ট সময় দিলে তা নতুন প্রজাতিতে পরিণত হতে পারে। তাঁর এই প্রকল্পের বিপরীতে তিনি ফসিল রেকর্ডকেও দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু ফসিল রেকর্ডে দুটো সমস্যা তাঁর দৃষ্টিতেই বাধা মনে হচ্ছিলো:

.

১. ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোসন, এবং

২. গ্র্যাজুয়্যাল ইভলিউশনের জন্য ফসিল রেকর্ডে গ্র্যাজুয়্যাল ফসিল এভিডেন্সের অভাব।

.

তিনি এ দুটো ব্যাখ্যার অপূর্ণতার জন্য দায়ী করেছিলেন তৎকালীন ফসিল রেকর্ডের অপূর্ণতাকে। কিন্তু গত ১৫০ বছরের ফসিল অভিযান এই অপূর্ণতাকে সমাধান করেনি বরং আরও তীব্র করেছে।

.

ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোসন হলো জিওলজিকাল টাইম স্কেলে খুব ক্ষুদ্র একটি সময় (৫৩০ মিলিয়ন বছর থেকে ৫২০ মিলিয়ন বছর পূর্বে) যখন ভূস্তরে প্রাণীজগতের প্রায় ২০টি পর্বের (Phylum) একত্রে আগমন ঘটে। লক্ষ্যণীয় প্রাণীজগতের শ্রেণীবিন্যাসের যে ছয়টি স্তর আছে তার মধ্যে Phylum বা পর্ব হলো উপরে। এরপর যথাক্রমে Class, Order, Family, Genus, Species. একটি স্পিসিসের সাথে আরেকটি স্পিসিসে গাঠনিক পার্থক্য খুবই কম। এমনকি শুধু রঙের পার্থক্য ও রিপ্রোডাকটিভ আইসোলেশনের কারণে একটি স্পিসিস আরেক স্পিসিস থেকে ভিন্ন হতে পারে। কিন্তু শ্রেণীবিন্যাসের ক্রমে যত উপরের দিকে উঠা যায় ততই প্রাণীদের গাঠনিক পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে। বিশেষ করে পর্ব ও শ্রেণী পর্যায়ে প্রাণীদের স্পষ্টভাবে আলাদা করা যায়। পর্বগুলোর পার্থক্য হলো তাদের সম্পূর্ণ পৃথক 'Body Plan'। ডারউইনিয়ান পদ্ধতি সঠিক হলে ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোসনের আগে প্রি-ক্যামব্রিয়ান পিরিয়ডে (এডিয়াকারান পিরিয়ড) পর্যায়ক্রমিক জটিলতর 'বডি প্ল্যানের' অনেক ফসিল পাওয়ার কথা। কিন্তু প্রিক্যামব্রিয়ান স্তরে এ ধরণের ফসিল এভিডেন্স নেই। আছে শুধু এককোষী জীব এবং স্পঞ্জ জাতীয় প্রাণীর ফসিল।

.

ক্যামব্রিয়ান নিয়ে ডারউইনের এই সন্দেহ গত ১৫০ বছরের ফসিল রেকর্ডের আবিষ্কার, প্রি-ক্যামব্রিয়ান ফসিল না থাকার বিভিন্ন ব্যাখ্যার (যেমন: আর্টিফ্যাক্ট হাইপোথিসিস) ব্যর্থতা এবং জেনেটিক্স ও মলিকিউলার বায়োলজির বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির আলোকে আরো প্রকট হয়ে ডারউইনবাদের জন্য 'সন্দেহ' থেকে 'বিপরীত' এভিডেন্স হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে। কেন এবং কীভাবে তা হলো সেটা নিয়েই, ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে ফিলোসফি অব সায়েন্সে ডক্টরেট স্টিফেন সি. মায়ার তাঁর বই "Darwin's

Doubt" লিখেছেন।

.

বইটিতে একদিকে যেমন ডারউইনবাদের সাথে ফসিল এভিডেন্সের অসংলগ্নতা নিয়ে তথ্য-ভিত্তিক আলোচনা আছে, তেমনি জেনেটিক্সের সাথে ডারউইনবাদের আধুনিক সংস্করন নিও-ডারউইনিজমের ব্যর্থতা নিয়েও আলোচনা আছে।

.

প্রসঙ্গত, ডারউইন যখন প্রথম মতবাদ দেন, তখন তিনি জ্যঁ ব্যাপটিস্ট লামার্কের তত্ত্ব থেকে কিছু ধারণা তাঁর চিন্তায় ঢুকিয়েছিলেন। তাঁর ধারণা ছিলো প্রজাতিতে প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রয়োজনে বৈশিষ্ট্যে কিছু বংশানুক্রমে সঞ্চালনযোগ্য (হেরিটেবল) পরিবর্তন সূচিত হয় এবং প্রাকৃতিকভাবে তা নির্বাচিত হয়ে ধীরে ধীরে প্রজাতিতে পরিবর্তন আসে। কিন্তু গ্রেগর জোহানস মেন্ডেল যখন দেখালেন জীবের ভিতর জীবের বৈশিষ্ট্যগুলো জিন হিসেবে থাকে এবং বিভিন্ন জিন থাকার কারণে বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতা তৈরী হয়, তখনও মিউটেশন আবিষ্কার হয়নি। ফলে ডারউইনবাদ প্রাথমিকভাবে সমস্যায় পড়ে যায়। কিন্তু যখন মিউটেশন আবিস্কার হয় এবং দেখা যায় মিউটেশন প্রজাতির জিনে ক্ষতি সাধন করতে পারে তখন ডারউইনবাদকে জেনেটিক্সের সাথে মিশিয়ে নতুন সিনথেসিস করা হয় ১৯৪২ সালে, যার নাম নিও-ডারউইনিজম। এতে নেতৃত্ব দেন আর্নেস্ট মায়ার, থিওডসিয়াস ডবঝানস্কি, থমাস হাক্সলি প্রমুখ। নিও-ডারউইনিজমের মূল কথা- র‍্যান্ডম মিউটেশনের মধ্য দিয়ে প্রজাতিতে ভ্যারিয়েশন তৈরি হয় এবং ন্যাচারাল সিলেকশনের মধ্য দিয়ে ফেবরেবল ভ্যারিয়েশন বাছাই হয়। এভাবে মিলিয়ন বছরের ব্যবধানে একটি প্রজাতি আরেকটি প্রজাতিতে রূপান্তরিত হয়।

.

এরপর ১৯৫৩ সালে ফ্রান্সিস ক্রিক এবং জেমস ওয়াটসন আবিস্কার করেন- ডিএনএ। আবিষ্কার হয় কম্পিউটার যেমন বাইনারি নাম্বারে কোড ধারণ করে, ঠিক তেমনি ডিএনএ প্রোটিন গঠনের তথ্য কোড হিসেবে ধারণ করে। এডেনিন, গুয়ানিন, সাইটোসিন ও থায়ামিন এই চার ধরণের নাইট্রোজেন বেজ দিয়ে গঠিত হয় ডিএনএ কোড। প্রতি তিনটি নিউক্লিওটাইড একটি এমাইনো এসিডকে কোড করে। জীবে প্রাপ্ত প্রোটিন গঠিত হয় ২০ ধরণের এমাইনো এসিড দিয়ে। অন্যদিকে ৪টি নিউক্লিওটাইড ৩টি পজিশনে মোট ৪^৩ তথা ৬৪ রকমে বসতে পারে। সুতরাং দেখা গেলো, একেকটি এমাইনো এসিড একাধিক নিউক্লিওটাইড কম্বিনেশন দিয়ে কোড হতে পারে।

.

সময়ের সাথে সাথে জানা যায় মিউটেশন হলো নিউক্লিওটাইড সাবস্টিটিউশন, ইনসারশন, ডিলেশন ইত্যাদি ধরনের। মিউটেশনের মধ্য দিয়ে যদি এমন একটি নিউক্লিওটাইড সাবস্টিটিউশন হয় যে এমাইনো এসিড অপরিবর্তিত থাকে, তাহলে প্রোটিনের গঠনে কোনো পরিবর্তন হবে না। এ কারণে একই কাজ সম্পাদনকারী প্রোটিনের জেনেটিক কোডে পার্থক্য থাকতে পারে। এবং প্রজাতিভেদে ব্যাপারটা এরকমই পাওয়া যায়। এই বৈশিষ্ট্যকে কাজে লাগিয়ে গড়ে উঠেছে 'মলিকিউলার ক্লক' বা 'ফাইলোজেনেটিক স্টাডি'। অর্থাৎ একটি প্রোটিন যা একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন করে, বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে উক্ত প্রোটিনটির জেনেটিক কোডে ভিন্নতা ও মিল হিসেব করা হয়। এরপর মিউটেশনের হার ইত্যাদির আলোকে দেখা হয় যে দুটো সমজাতীয় প্রজাতির কত বছর আগে পরস্পর থেকে পৃথক হয়েছে (বিস্তারিত বইটিতে আছে)।

.

কিন্তু মজার ব্যাপার হলো যদি বিবর্তনের মাধ্যমে প্রজাতি এসে থাকে তাহলে বিভিন্ন জিন নিয়ে ফাইলোজেনেটিক স্টাডি করলে সমজাতীয় মলিকিউলার ট্রি পাওয়ার কথা, অথচ বিভিন্ন মলিকিউলার ইভোলিউশনারী বায়োলজিস্ট বিভিন্ন প্রজাতির বিভিন্ন প্রোটিন, বিভিন্ন পর্বের একই ধরণের জিন নিয়ে গবেষণা করে যে 'ট্রি'গুলো দাঁড় করিয়েছেন তাতে ইভোলিউশনারী টাইমিং-এর কোনো কনগ্রুয়েন্ট পিকচার নেই। এই বিষয়টি খুব সুন্দর চিত্রের আলোকে "Darwin's Doubt" বইটিতে লেখক দেখিয়েছেন।

.

প্রোটিন গঠিত হয় ২০ ধরনের এমাইনো এসিড দিয়ে এবং প্রোটিনের গঠন খুবই স্পেসিফিক। ধরা যাক, দুটো এমাইনো এসিড পরস্পর পেপটাইড বন্ড দিয়ে যুক্ত হবে। তাহলে সম্ভাব্য সমাবেশ হতে পারে, ২০x২০ তথা ৪০০ ধরণের। তিনটি হলে

২০x২০x২০ তথা ৮০০০ ধরণের, ৪টি হলে ২০^৪ = ১৬০০০০ ধরণের। অথচ, কোষের ভিতর ছোট আকৃতির একটি কার্যকরী (ফাংশনাল) প্রোটিন গড়ে ১৫০টি এমাইনো এসিডের সমন্বয়ে তৈরি হয়। সুতরাং ১৫০ ঘরে বিন্যাস হবে ২০^১৫০ তথা ১০^১৯৫ ধরণের। যার মধ্যে খুব অল্প সংখ্যক বিন্যাসই কার্যকরী প্রোটিন গঠন করতে পারে। এই সংখ্যাটা কত বড় তা বুঝানোর জন্য বলা যায়, আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বে ১০^৮০টি মৌলিক কণা আছে এবং আমাদের মহাবিশ্বের বয়স ১০^১৬ সেকেন্ড। সুতরাং র‍্যান্ডম মিউটেশনের মধ্য দিয়ে কি প্রোটিন আসা সম্ভব?

.

এই 'কম্বিনেটরিয়াল ইনফ্লেশন' নিয়ে প্রথম আগ্রহী হন MIT-র প্রফেসর অব ইঞ্জিনিয়ারিং এবং কম্পিউটার সায়েন্স মুরে এডেন, ১৯৬০ সালে। ১৯৬৬ সালে তিনিসহ আরো কয়েকজন ম্যাথমেটিশিয়ান, ইঞ্জিনিয়ার এবং বিজ্ঞানী উইসটার ইন্সটিউট অব ফিলাডেলফিয়ায় একত্রিত হন। তাঁরা প্রোটিনের গঠনের এই কম্বিনেটরিয়াল ইনফ্লেশনকে বিবেচনায় এনে নিও-ডারউইনিজমের সীমাবদ্ধতাগুলো তুলে ধরেন। তাঁরা দেখান যে সময় এবং রিসোর্সের সীমাব্দ্ধতার কারণে র‍্যান্ডম মিউটেশনের মধ্য দিয়ে একটি প্রোটিনও আসা সম্ভব নয়। তবে কনফারেন্সে এই তথ্যটাও উঠে আসে যে প্রোটিনের এই সিকোয়েন্স স্পেসে প্রোটিনগুলোর গঠন যদি কাছাকাছি থাকে তাহলে হয়তো একটি সম্ভাবনা আছে যে নিও-ডারউইনিজম র‍্যান্ডম মিউটেশন দিয়ে প্রোটিনের বিবর্তন ব্যাখ্যা করতে পারে। যদিও মুরে এডেন নিজেই এই সম্ভাবনায় বিশ্বাস করেননি। কারণ, একটি ভাষায় থাকে সিনটেক্স, গ্রামার, কনটেক্সট ইত্যাদি। ১৯৮৫ সালে অস্ট্রেলিয়ান জেনেটিসিস্ট মাইকেল ডেনটন দেখান, ইংরেজীতে একটি নির্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের বাক্যে বর্ণের সম্ভাব্য সকল কম্বিনেশনের মধ্যে অর্থযুক্ত বাক্যের (তথা সিকোয়েন্সের) সংখ্যা খুবই কম এবং দৈর্ঘ্য যত বড় হয় সংখ্যা ততই কমে যেতে থাকে। তিনি হিসেব করে দেখান ১২টি বর্ণের বাক্যে অর্থযুক্ত শব্দের সম্ভাব্যতা ১০^১৪ এর মধ্যে ১ বার। এভাবে ১০০টি বর্ণের বাক্যে ১০^১০০ এর মধ্যে একবার।

.

নিও-ডারউইনিস্টরা অবশ্য এ সুযোগটি গ্রহণ করে এবং আশাবাদী থাকে যে সিকোয়েন্স স্পেসে প্রোটিনের অবস্থান কাছাকাছি হবে। ক্যালিফোর্নিয়া ইন্সটিটিউট অব টেকনোলজি থেকে কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পিএইচডি করার সময় ডগলাস এক্স এ বিষয়টি পরীক্ষামূলকভাবে জানতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তিনি ক্যামব্রিজ ইউনিভার্সিটির ল্যাবরেটরি অব মলিকিউলার বায়োলজিতে এলান ফার্স্টের অধীনে রিসার্চের সুযোগ পেয়ে যান। তিনি ও তাঁর সহযোগিরা ১৫০ এমাইনো এসিডের সম্ভাব্য সিকোয়েন্স নিয়ে গবেষণা শুরু করেন।

.

প্রসঙ্গত প্রোটিন শুধু মাত্র এমাইনো এসিডের চেইন হিসেবে থাকে না। প্রোটিন তিনটি ধাপে ভাঁজ (ফোল্ড) হয়। এদেরকে প্রাইমারি, সেকেন্ডারি এবং টারশিয়ারি স্ট্রাকচার বলে। প্রোটিনের ত্রিমাত্রিক ফোল্ড সঠিক হওয়ার উপরই এর ফাংশন নির্ভর করে। সকল এমাইনো এসিড সিকোয়েন্স-এ যেমন ত্রিমাত্রিক ফোল্ড হয় না, তেমনি সকল ত্রিমাত্রিক ফোল্ড ফাংশনাল হয় না। ডগলাস এক্স প্রাথমিক ভাবে দেখতে পান যেই সংখ্যক সিকোয়েন্স ফাংশনাল ফোল্ড গঠন করে তাদের সম্ভাব্যতা ১০^৭৪ এর মধ্যে ১ বার। (মহাবিশ্বের বয়স ১০^১৬ এবং মিল্কি ওয়েতে পরমাণু সংখ্যা ১০^৬৫) এর মধ্যে যেই ফোল্ডগুলো কার্যকরী তাদেরকে হিসেবে নিলে সম্ভাব্যতা দাঁড়ায় ১০^৭৭। ডগলাস এক্স দেখেন যে আমাদের পৃথিবীতে প্রাণের ৩.৪ বিলিয়ন বছরের ইতিহাসে এখন পর্যন্ত ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা ১০^৪০। তিনি ধরে নেন যে প্রতিটি ব্যাকটেরিয়াতেই যদি একটি করে নিউক্লিওটাইড সাবস্টিটিউশন হয় (যা কখনোই হয় না) তাহলেও একটি ১৫০ এমাইনো এসিডের চেইনের প্রোটিন আসতে পারবে না। তবে, একটি বিদ্যমান প্রোটিনকে আরেকটি ফাংশনাল প্রোটিনে পরিণত করতে হলে র‍্যান্ডম মিউটেশনের জন্য কাজ কমে যায়। তখন শুধু একটি প্রোটিনকে আরেকটি প্রোটিনে পরিণত করতে কয়টি মিউটেশন লাগবে তা হিসেব করলেই হয়।

.

পাঠক লক্ষ্য করে থাকবেন এখানে মূল সমস্যাটি হল ডিএনএতে তথ্য যুক্ত করার সমস্যা। নিও-ডারউইনিস্টরা পপুলেশন জেনেটিক্স নামক ডিসিপ্লিন দিয়ে মিউটেশনের মাধ্যমে প্রজাতির জিনে নতুন ইনফরমেশন যুক্ত হওয়ার বিভিন্ন হিসেব নিকেষ কষে থাকেন। লেহাই ইউনিভার্সিটির বায়োকেমিস্ট্রির প্রফেসর মাইকেল বিহে এবং ইউনিভার্সিটি অব পিটসবার্গের ফিজিসিস্ট

ডেভিড স্নোক পপুলেশন জেনেটিক্সের উপর ভিত্তি করে একটি প্রোটিনকে আরেকটি ন্যাচারালি সিলেকটেবল প্রোটিনে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় মিউটেশন এবং তা আসতে প্রয়োজনীয় সময় হিসেব করেন। তারা দেখেন যে একটি প্রোটিন-প্রোটিন ইন্টারেকশন সাইট থেকে আরেকটি প্রোটিন-প্রোটিন ইন্টারেকশন সাইট আসতে হলে একই সাথে কয়েকটি স্পেসিফিক মিউটেশন লাগবে (কমপ্লেক্স এডাপটেশন) এবং তারা হিসেব করে দেখান যে এর জন্য কমপক্ষে দুই বা ততোধিক মিউটেশন একই সাথে স্পেসিফিক সাইটে হতে হবে। বিহে এবং স্নোক বাস্তবিক উদাহরণের উপর ভিত্তি করে দেখান যে, পৃথিবীর বয়স সীমায় দুটি মিউটেশন একসাথে হতে পারে যদি স্পিসিসের পপুলেশন সাইজ অনেক বড় হয়। কিন্তু দুইয়ের অধিক মিউটেশন একসাথে প্রয়োজন হলে তা পৃথিবীর বয়স সীমাকে ছাড়িয়ে যায়। অথচ, ডগলাক্স এক্স মলিকিউলার বায়োলজিস্ট এনে গজারকে নিয়ে পরীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, একটি প্রোটিন আরেকটি ভিন্ন ফাংশনের প্রোটিনে পরিণত করতে নূন্যতম ৫ বা তার বেশী সাইমালটেনিয়াস মিউটেশন তথা নিউক্লিউটাইড সাবস্টিটিউশন লাগবে।

.

র‍্যান্ডম মিউটেশনের এই সীমাবদ্ধতাগুলোর কারণে নিও-ডারউইনিস্ট বিজ্ঞানীরা জিনোম ভ্যারিয়েশন তৈরির অন্যান্য মেকানিজম প্রস্তাব করেছেন। যেমন: জেনেটিক রিকম্বিনেশন, এক্সন শাফলিং, জিন ডুপ্লিকেশন, ইনভারশন, ট্রান্সলোকেশন, ট্রান্সপজিশন ইত্যাদি। স্টিফেন সি. মায়ার তাঁর বইতে প্রত্যেকটি মেকানিজমের সীমাবদ্ধতা নিয়ে পৃথকভাবে আলোচনা করেছেন।

.

লক্ষ্যণীয়, কোষের ভিতর একটি প্রোটিন একা কাজ করে না। বরং কয়েকটি পরস্পর অন্তঃনির্ভরশীল প্রোটিনের নেটওয়ার্ক হিসেবে কাজ করে। আবার ডিএনএতে প্রোটিনের প্রাথমিক গঠনের তথ্য ধারণ করলেও, প্রোটিনগুলো কীভাবে কোষের ভিতর এরেঞ্জ হবে সেই তথ্য কিন্তু ধারণ করে না। এককোষী জীব থেকে বিভিন্ন উচ্চতর প্রাণীর পর্বগুলোকে কীভাবে ভাগ করা করা হয়? উত্তর হলো, কোষের প্রকারের উপর ভিত্তি করে। বহুকোষী জীব অনেক ধরণের কোষ নিয়ে গঠিত হয়। মজার ব্যাপার হলো প্রতিটি কোষই কিন্তু শরীরের পুরো জেনেটিক তথ্য ধারণ করে বলে আমরা এখন পর্যন্ত জানি। সুতরাং বুঝা যাচ্ছে যে প্রতিটি কোষের একটি নির্দিষ্ট অংশ সাইলেন্সিং করা থাকে। সাইলেন্সিং-এর কাজ কীভাবে হয়?

.

এ বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা করতে করতেই নতুন একটি শাখা খুলে গেছে যার নাম এপিজেনেটিক্স। এপিজেনেটিক্সের মধ্য দিয়ে দেখা যাচ্ছে, কোষ যে শুধু ডিএনএ তথ্য ধারণ করে তা-ই নয় বরং কোষের ঝিল্লীর যে সুগার মলিকিউল আছে সেগুলোর পজিশনও খুব স্পেসিফিক। একে বলা হচ্ছে সুগার কোড। একটি প্রোটিন তৈরি হওয়ার পর কোষের কোন্ অংশে সে যাবে তা নির্ধারণ করে সুগার কোড। একই জীবদেহের কোষগুলোতে এই সুগার কোডটি কপি হয় রিপ্রোডাকর্টিভ সেল উওসাইট থেকে। এটি ডিএনএতে কোড করা থাকে না। আবার মাইক্রোটিউবিউল নামক কোষের ভিতরের যে পরিবহন নেটওয়ার্ক সেটার পরিজশনও ডিএনতে কোড করা থাকে না। সুতরাং একটি বহুকোষী প্রাণীর কোষ ডিফারেনসিয়েশনে এই সুগার কোডও গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ শুধু ডিএনএ মিউটেশন দিয়ে এটি ব্যাখ্যা করা যাবে না। অন্যদিকে, জিন সাইলেন্সিং এর কাজটিও হয় ননকোডিং রিজিওনের বিভিন্ন তথ্য এবং হিস্টোন মিথাইলেশন, এসিটাইলেশন ও নিওক্লিওটাইড মিথাইলেশন ইত্যাদির মাধ্যমে। এপিজেনেটিক এই বিষয়গুলো কীভাবে নিও-ডারউইনিজমের জন্য একটি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দাঁড়িয়ে গেছে, তা ড. মায়ার খুব সুন্দর ভাবে একটি চ্যাপ্টারে তা আলোচনা করেছেন।

.

একটি পুংজনন কোষ একটি স্ত্রীজনন কোষকে যখন নিষিক্ত করে তখন জাইগোট গঠিত হয়। এর পর জাইগোটটি বিভাজিত হতে শুরু করে। অনেকগুলো কোষের একটি গুচ্ছ তৈরি করার পর এটি পর্যায়ক্রমিকভাবে বিভিন্ন কোষে বিভাজিত হতে থাকে এবং কোষগুলোর সঠিক অবস্থানে, সঠিক সময়ে সুগঠিতভাবে এরেঞ্জ করার কাজটি চলতে থাকে যতক্ষণ না তা পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে পরিনত হয়। একটু চিন্তা করলেই বুঝা যায় বিষয়টি কতটা জটিল এবং সুনিয়ন্ত্রিত। ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিউট অব টেকনোলজির এরিক ডেভিডসন তাঁর পুরো ক্যারিয়ারকে ব্যয় করেছেন এই ডেভেলপমেন্টাল জিন রেগুলেশনকে বের করতে। তিনি পর্যায়ক্রমিক জেনেটিক নিয়ন্ত্রণের এই হায়ারার্কির নাম দেন ডেভেলপমেন্টাল জিন রেগুলেশন নেটওয়ার্ক। তিনি তাঁর গবেষণায়

এ-ও দেখান যে ডেভেলপমেন্টের বিভিন্ন পর্যায়ের মিউটেশনের ফলে কী ভয়াবহ পরিণতি হয়। অথচ কোনো হেরিটেবল ভ্যারিয়েশন তৈরি হতে হলে রিপ্রোডাকটিভ কোষেই মিউটেশন হতে হবে।

.

নিও-ডারউইনিজমের এই সীমাবদ্ধতাগুলো দেখতে পেয়ে অনেক বিজ্ঞানীই নতুন নতুন ইভলিউশনের মডেল দিতে শুরু করেছেন। ফসিল রেকর্ডের সীমাবদ্ধতাকে কেন্দ্র করে যেমন নাইলস এলড্রেজ এবং স্টিফেন জে গোল্ড 'পাঙ্কচুয়েটেড ইকুইলিব্রিয়াম' দাঁড় করিয়েছিলেন, তেমনি 'পোস্ট-ডারউইনিয়ান ওয়ার্ল্ডে' অন্যান্য বিজ্ঞানীরাও অন্যান্য ইভলিউশনারী মডেল প্রস্তাব করেছেন: এভো-ডেভো, সেল্ফঅর্গ্যানাইজেশন মডেল, এপিজেনেটিক ইনহেরিটেন্স, ন্যাচারাল জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং ইত্যাদি। ড. মায়ার দুটো চ্যাপ্টারে এই মডেলগুলোর সাফল্য ও সীমাবদ্ধতা দুটো নিয়েই আলোচনা করেছেন।

.

আমরা যখন কোনো সফটওয়্যার দেখি, তখন এর পিছনে একজন প্রোগ্রামারের কথা চিন্তা করি। যখন কোন গাড়ি দেখি এর পেছনে একজন বুদ্ধিমান গাড়ি তৈরীকারীর কথা ভাবি। ঠিক তেমনি যখন আমরা বায়োলজিক্যাল সিস্টেমে ডিজাইন দেখতে পাই, স্বাভাবিকভাবেই একজন ডিজাইনারের কথা মাথায় আসে। সায়েন্টিফিক মেথডলজিতে 'এবডাকটিভ ইনফারেন্স' বলে একটি কথা আছে। বায়োলজিক্যাল বিইং এর ডিজাইনে এই মেথডের প্রয়োগ আমাদের ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইনের কথাই বলে। কিন্তু ডারউইনিয়ান ওয়ার্ল্ডে কোন জিনিসটি এই হাইপোথিসিসকে গ্রহণযোগ্যতা দিচ্ছে না? এর কারণ হিসেবে পাওয়া যায় 'মেথডলজিক্যাল ন্যাচারালিজম', যা সায়েন্টিফিক কমিউনিটিতে একটি অঘোষিত নিয়ম হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কিন্তু মেথডলজিক্যাল ন্যাচারালিজমকে ইউনিফর্মিটারিয়ান রুল হিসেবে প্রতিষ্ঠা করে নেয়ার সুযোগ আছে কি?

.

স্মিথসোনিয়ান ইনস্টিউটের ডাইরেক্টর রিচার্ড স্টার্নবার্গ (যিনি ইভলিউশনারী বায়োলজি ও সিস্টেমিক বায়োলজিতে দুটো পিএইচডিধারী) যখন স্টিফেন সি. মায়ারের ক্যামব্রিয়ান ইনফরমেশন এক্সপ্লোশন সংক্রান্ত একটি আর্টিকল ওয়াশিংটন বায়োলজি জার্নালে প্রকাশের সুযোগ করে দেন তখন নিও-ডারউইনিস্টরা তাকে ডিফেম করা শুরু করে, তাঁর উপর মিথ্যা অপবাদ দেওয়া হয়, তাঁর বিরুদ্ধে মিস-ইনফরমেশন ক্যাম্পেইন চালানো হয়, যতক্ষণ না তাঁকে তাঁর পদ থেকে অপসারণ করা হয়েছে। অথচ তখনও পর্যন্ত ড. মায়ারের আর্টিকলের যৌক্তিক সমালোচনা করে কোনো আর্টিকেল জার্নালে ছাপানো হয়নি। এটাকে কি বিজ্ঞান বলে?

.

ড. স্টিফেন সি. মায়ার তাঁর বইয়ের শেষের দিকে এই বিষয়গুলোকে অ্যাড্রেস করে 'ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন'কে প্রজাতির উৎপত্তির একটি মডেল হিসেবে কেন বিবেচনা করা যায় তার যুক্তিগুলো উপস্থাপন করার পাশাপাশি, নিও-ডারউইনিস্টদের সমালোচনাগুলোর জবাব দিয়েছেন।

.

লক্ষ্যণীয়, আমেরিকাতে গভার্নমেন্টের সমালোচনা করা গেলেও ডারউইনিজমের সমালোচনা করা যায় না, ঠিক যেমন আমাদের দেশে ডারউইনিজমের সমালোচনা করা গেলেও গভার্নমেন্টের সমালোচনা করা যায় না।

.

[বিঃদ্রঃ লেখাটি আব্দুল্লাহ সাঈদ খান ভাইয়ের পূর্ণ অনুকরণে লেখা। এখানে আমার ক্রেডিট নেই।]

১৭৭

বিকৃতি

-শিহাব আহমেদ তুহিন

“Most bestiality is legal, declares Canada's Supreme Court.”
Independent পত্রিকার এই শিরোনামে চোখ আটকে গেলো। বুঝলাম, কানাডার সুপ্রীম কোর্ট “bestiality” কে বৈধতা দিয়েছে।

.

‘Bestiality’ বলতে আসলে কি বোঝায় তা জানা ছিল না। ডিকশনারিতে সার্চ দিতে হলো। খুব কাঠখোট্টা একটা অর্থ পেলাম- ‘পশ্বাচার’। ঠিকমত বোঝা গেলো না। উইকিতে সার্চ দিয়ে পুরো ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে গেলো। Bestiality বলতে আসলে মানুষের সাথে পশুর যৌনাচারকে বোঝানো হয়। পত্রিকার ভেতরে কী লেখা আছে সেটা পড়তে গিয়ে দেখলাম পেটের ভেতরে যা আছে তা দলা পাকিয়ে বের হয়ে আসতে চাইছে। লেখা আছে, এক লোক তার সৎ মেয়েকে জোর করে এক পশুর সাথে যৌনাচার করিয়েছে। তার শাস্তি হলো ১৬ বছরের জেল। সেটা কতোটুকু দোষের তা নিয়ে এনালাইসিস করে কোর্ট এই বৈধতার রায় দিয়েছে। এখন হয়তো লোকটা আবার আপিল করার সুযোগ পাবে।

.

দুই বছর আগে আমি এই সময়ে পশ্চিমাদের মধ্যে খুব জনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব লরেন্স ক্রাউসের মুখে আরেকটা টার্ম শুনেছিলাম – ‘Incest’। হামজা জর্জিসের সাথে বিতর্কের এক পর্যায়ে, হামজা জর্জিস, লরেন্স ক্রাউসকে প্রশ্ন করেনঃ

“Why is incest wrong?” (অযাচার কেন ঠিক নয়?)

লরেন্স ক্রাউস জবাব দেন, “ It’s not clear(to) me that it’s wrong.” (আমার কাছে মনে হয় না যে এটা খারাপ কিছু।). খটকা লাগলো। Incest আবার কি? ডিকশনারিতে সার্চ দিয়ে দেখি, এটার অর্থ লেখা- অযাচার। অযাচার মানে জানা ছিল না। উইকিপিডিয়াতে সার্চ দিয়ে জানা গেলো, রক্তের সম্পর্কের কারো সাথে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করাটাকে ইনসেস্ট বলা হয়। সেটা নিজের মায়ের সাথে হতে পারে, নিজের বোনের সাথে হতে পারে। কিন্তু এটা কিভাবে সম্ভব? মানুষ কিভাবে এর কথা চিন্তাও করতে পারে?

.

একটু পড়াশোনা করে জানলাম বর্তমান সময়ে অযাচার নাকি একদম কমন ঘটনা। অনেক প্রগতিশীল(!) রাষ্ট্র এটার বৈধতাও দিয়েছে। NDTV এর একটি রিপোর্টে প্রতিবেশী দেশ ভারতে অযাচারের একটি পরিসংখ্যান দেখানো হয়েছে। পরিসংখ্যান অনুসারে, ভারতে ৫৩% শিশু শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত হয়। ৭২% শিশুকে নীরবে এই লাঞ্ছনা সহ্য করতে হয়। ৬৪% অযাচারের শিকার শিশুদের বয়স ১০-১৮ বছর। ৩২% এর বয়স কেবল ২-১০। চিন্তা করা যায়? মাত্র দুই থেকে দশযারা এই অযাচারের ! %৮৭শিকার হয় তাদের কে বারবার এই শারীরিক লাঞ্ছনার ভেতর দিয়ে যেতে হয়। ভয়াবহ পরিসংখ্যান! এসব কিছুই জানা ছিল না। কল্পনাও করতে পারিনি। আসলেই আমরা মোল্লারা অনেক পিছিয়ে আছি।

.

তবে বাংলাদেশের বিজ্ঞানমনষ্ক ব্যক্তিরা কিন্তু একেবারেই পিছিয়ে নেই। বঙ্গদেশী নাস্তিকদের ধর্মগ্রন্থ "মুক্তমনা" ব্লগে আজ থেকে প্রায় পাঁচ বছর আগে আদনান নামে এক ব্লগার "নষ্ট রাত্রি" নামে একটি ছোটগল্প লিখেন। তাতে কল্পনার অযোগ্য বিকৃতিতে লেখক বাবাকে নিয়ে দুই মেয়ের ফ্যান্টাসির কথা লিখেছেন। পুরো গল্পটিতে আসলে কি ছিলো সেটি আমার পক্ষে বলা সম্ভব না। আমার রুচিতে কুলোচ্ছে না।

.

মানুষকে মুক্তির দীক্ষা দেয়ার দাবিদার মানুষগুলো তাদের কুৎসিত চিন্তা দ্বারা এতোটাই পরিবেষ্টিত যে; আজ তারা নিজেদের মাকে মা ভাবতে পারছে না, বোনকে বোন ভাবতে পারছে না। জীবন মানেই তাদের কাছে "Sex & Drugs & Rock & Roll"। পুরো দুনিয়াটাই তাদের কাছে "Sex Object"।

.

আর Homosexuality! সমকামিতার বিপক্ষে কথা বলাই তো এখন এক প্রকার অবৈজ্ঞানিক কাজ হয়ে গিয়েছে। মানুষের অনুভূতি আজ এতোটাই ডিসেন্টিসাইজড হয়েছে যে এখন অনেকের কাছেই এটা একদম স্বাভাবিক ব্যাপার।। এমনকি ৫২% আমেরিকান মুসলিম মনে করে সমকামিতাকে সামাজিকভাবে মেনে নেয়া উচিৎ। এটা খারাপ কিছু না। খুবই মন খারাপ করা সংবাদ। তারা যদি এটাকে বৈধ মনে না করে নিজেরা সমকামী হয়ে যেতো, তাও এতোটা খারাপ লাগতো না। কারণ, তবুও তারা ফাসিক হয়েও এটলিস্ট মুসলিম থাকতো। কিন্তু আল্লাহ্ যা হারাম করেছেন সেটা হালাল মনে করলে কেউ তো আর মুসলিম থাকে না।

.

আজ থেকে দুইশো বছর আগে মানুষ বিয়ের আগে প্রেম করার কথা চিন্তাও করতো না। এখন তো বিয়ের আগে প্রেম না করা খ্যাঁত ব্যাপার হয়ে গিয়েছে। তারপর আসলো সমকামিতা। পশ্চিমা সমাজব্যবস্থা তা মেনে নিলো। এখন অযাচার, পশ্বাচার। হয়তো একশো বছর পর এগুলোও এই অসভ্য পৃথিবীতে স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে যাবে।

.

পশ্চিমা সমাজ ব্যবস্থা ব্যক্তি স্বাধীনতা আর মুক্ত চিন্তার দোহাই দিয়ে সমকামিতা, অযাচার, পশ্বাচার- কে মেনে নিতে পারে। সহ্য করতে পারে । তাদের কেবল সহ্য হয় না ইসলাম। ইসলামের 'barbaric(!) Shariah Law'। মানুষ যখন ফিতরাতকে ভুলে যায়, তাদের রবকে ভুলে যায়, তখন তাদের জন্য শয়তান নিযুক্ত হয়ে যায়। সে তাদের সামনে খারাপকে ভালো আর ভালোকে খারাপ হিসেবে উপস্থাপন করে।

.

দিনশেষে এই মানুষগুলোই যে আলোকে অন্ধকার ভাববে, সত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে তাতে কি খুব বেশী অবাক হবার মতো কিছু আছে?

.

"আর আমি সৃষ্টি করেছি দোযখের জন্য বহু জ্বিন ও মানুষ। তাদের অন্তর রয়েছে, (কিন্তু) তা দিয়ে তারা চিন্তা করে না, তাদের চোখ রয়েছে, (কিন্তু) তা দিয়ে তারা দেখে না, আর তাদের কান রয়েছে, (কিন্তু) তা দিয়ে তারা শোনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তাদের চেয়েও নিকৃষ্টতর। তারাই হল গাফেল, শৈথিল্যপরায়ণ।" [সূরা আল আরাফঃ ১৭৯]

---

1) http://www.independent.co.uk/.../bestiality-legal-canada-supr...
2) http://www.pewforum.org/.../pf_2017-06-26_muslimamericans-04.../
3) https://www.facebook.com/notes/shihab-ahmed-tuhin/the-oedipus-complex/1513593188674951/?hc_location=ufi

১৭৮

“পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি - ১!!” পর্ব ১

-আসিফ আদনান

ইসলাম নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব এবং তাদের প্রাচ্য দেশীয় আদর্শিক সন্তানদের সমালোচনার মূল একটি বিষয় হল নৈতিকতা। তারা নিজেদের আধুনিকতাকে একই সাথে প্রগতি ও নৈতিক হিসাবে দাবি করে। অন্যদিকে ইসলামকে অতি রক্ষণশীল, পশ্চাৎপদ এবং অনৈতিক প্রমাণের চেষ্টা চলায়। কিন্তু আধুনিক পশ্চিম আর তাদের আদর্শিক জারজদের নৈতিকতার ট্র্যাক-রেকর্ড কেমন? আসুন অন্ধকারের গল্প শোনা যাক।

.

“পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি - ১ !!”
পর্ব ১

১.
অপ্রত্যাশিতভাবে অনির্ধারিত কালের জন্য ছুটি পাওয়া গেছে। নানা কারনে নজরদারী নেই, জবাবদিহিতা নেই। চিন্তাহীন এবং আনন্দময় একটা সময়। আজ থেকে প্রায় ১৫ বছর আগের কথা। সকাল ন'টার মতো বাজছে। রোদ মাথায় নিয়ে হাকডাক করতে করতে ওয়ার্কাররা বাসার সামনের আন্ডার-কন্সট্রাকশান বিল্ডিং-এর ছাদ ঢালাই –এর কাজ করছে। নাস্তা শেষে এক তলার সামনের বারান্দাতে গল্পের বই নিয়ে বসলেও পুরোটা মনোযোগ বইয়ের দিকে নেই। পড়া ফেলে মাঝে মাঝেই এদিক ওদিক তাকাচ্ছি। পাহাড়ী এলাকায় বাসা। কিংবা বলা যায় পাহাড় কেটে বানানো আবাসিক এলাকা। বারান্দার ডান দিক ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পাহাড়ের খন্ডিত ছিটেফোঁটা।

.

বিক্ষিপ্ত ভাবে এদিক ওদিক তাকাবার সময় খেয়াল হল বারান্দার পাশে পাহাড়ের খন্ডিত ছিটেফোটার অংশে দাড়ানো কেউ একজন আমার দিকে তাকিয়ে আছে। বই থেকে পুরোপুরি মাথা না উঠিয়ে আড়চোখে তাকালাম। সমবয়েসী একটা ছেলে। জীর্ন-মলিন পোশাক। সম্ভবত পাতা কুড়োতে এই দিকে আসা। মনে হল আমার চাইতে হাতে ধরা বইয়ের প্রতিই দর্শনার্থীর মনোযোগ বেশি। আড়চোখে ছেলেটাকে বার দুয়েক দেখে নিয়ে কায়দা করে বইটাকে ঘুরিয়ে ধরলাম যাতে ছেলেটা পুরো প্রচ্ছদটা দেখতে পায়। মনে মনে এক গাল হেসে নিলাম। স্বাভাবিক। কেনার সময়ই বইটার প্রচ্ছদে চোখ আটকে গিয়েছিল। বইটার গল্প নিয়ে আমি সন্দিহান ছিলাম। তবুও বলা যায় প্রচ্ছদের আকর্ষনেই অন্যান্য বইগুলোকে ফেলে এ বইটাকে বেছে নেওয়া। মনে মনে বারকয়েক নিজের পিঠ চাপড়ে দিলাম। কাজ ফেলে সমবয়েসী একটা ছেলে আমার বইয়ের প্রচ্ছদের দিকে তাকিয়ে থাকা নিঃসন্দেহে আমার সিদ্ধান্তের যথার্থতার অকাট্য প্রমান।

.

বইটা ছিল সেবা প্রকাশনীর জনপ্রিয় কিশোর হরর সিরিযের। নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে এক্স-ফাইলস, গুসবাম্পস, রসওয়েল সহ হরর/থ্রিলার/সায়েন্স ফিকশান জাতীয় বিভিন ওয়েস্টার্ন টিভি সিরিয ও সিনেমার জনপ্রিয়তার সময়ে শুরু হয়েছিল “কিশোর হরর” সিরিযের। সেবা প্রকাশনীর নিয়মিত পাঠকদের কাছে, বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়া “তিন গোয়েন্দা” পাঠকদের

কাছে খুব দ্রুতই জনপ্রিয় ওঠে কিশোর হরর সিরিয। হরর সিরিযের জনপ্রিয়তার প্রভাবে কিছুদিন তিন গোয়েন্দা সিরিয থেকেও "কিশোর চিলার" নামে কিছু বই প্রকাশ করা হয়। আমার হাতে ধরা বইটার নাম ছিল বৃক্ষমানব। প্রচ্ছদে ছিল সবুজ রঙের বিকৃত বিকট এক মুখের ছবি। ৯৭ এ প্রকাশিত "বৃক্ষমানব" ছিল সেবা-র কিশোর হরর সিরিযের প্রথম দিকের বই এবং আমাদের (আমার ও আপুর জয়েন্ট ভেনচার) কেনা কিশোর হরর সিরিযের প্রথম বই। লেখকের নাম, টিপু কিবরিয়া।

.

২.

সেবার কিশোর হরর সিরিয আর সিরিযের লেখকের নাম নানা কারন প্রায় ভুলতে বসেছিলাম। বই পড়ার নেশা দীর্ঘদিন ভোগালেও ইংরেজি গল্প আর টিভি-শোর মধ্যম মানের নকল পড়ার চাইতে সোর্স ম্যাটেরিয়াল পড়াটাই বেশি লজিকাল মনে হত। এছাড়া স্কুলের দিনগুলোতে সম্পূর্ণ অবসর সময়টা বইয়ের জন্য বরাদ্দ থাকলেও সময়ের সাথে সাথে ক্রমান্বয়ে বইয়ের জন্য বরাদ্দটা কমতে থাকে। টিপু কিবরিয়ার বিস্মৃতপ্রায় নামটা মনে করিয়ে দেয় ২০14 এর জুন থেকে অগাস্ট পর্যন্ত প্রকাশিত বেশ কিছু নিউয রিপোর্ট। প্রায় দু'মাস ধরে প্রকাশিত এসব রিপোর্টের সারসংক্ষেপ পাঠকের জন্য এখানে তুলে ধরছি।

.

আন্তর্জাতিক শিশু পর্নোগ্রাফির ভয়ঙ্কর একটি চক্র বাংলাদেশে বসেই দীর্ঘ নয় বছর পথশিশুদের ব্যবহার করে পর্নো ভিডিও তৈরি করে আসছিল। আন্তর্জাতিক শিশু পর্নোগ্রাফির সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে দেশের তিনজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি)। ২০14 এর ১০ জুন ইন্টারপোলের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে শিশু পর্ণোগ্রাফি তৈরির দায়ে সিআইডি গ্রেফতার করে টি আই এম ফখরুজ্জামান ও তার দুই সহযোগীকে। সিআইডির পুলিশ সুপার আশরাফুল ইসলাম জানান, এ চক্র আন্তর্জাতিক গ্রাহকদের চাহিদা অনুযায়ী ছেলেশিশুদের দিয়ে পর্নো ছবি তৈরি করতো। এ চক্রের মূল হোতা টি আই এম ফখরুজ্জামান টিপু কিবরিয়া নামে অধিক পরিচিত। তার বাইরের পরিচয় তিনি দেশের একটি খ্যাতনামা প্রকাশনা সংস্থার কিশোর থ্রিলার ও হরর সিরিজের লেখক। এছাড়া তার বেশ কিছু শিশুতোষ গল্প উপন্যাসের বইও রয়েছে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে এখন তার অন্ধকার জগতের পরিচয়ই সামনে চলে এসেছে।

.

১৯৯১ সাল থেকে ১০ বছর টিপু সেবা প্রকাশনীর কিশোর পত্রিকার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। ২০০৩ সাল থেকে ফ্রি-ল্যান্স আলোকচিত্রী হিসেবে কাজ শুরু করেন। গড়ে তোলেন একটি ফটোগ্রাফিক সোসাইটিও। রাজধানীর মুগদায় তার একটি স্টুডিও রয়েছে। এ সময় তার তোলা ছেলে পথশিশুদের স্থির ছবি ইন্টারনেটে বিশেষ করে ফেসবুক, টুইটারম ফ্লিকারসহ সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আপলোড করতেন। এই ছবি দেখে সুইজারল্যান্ড ও জার্মানির পর্নো ছবির ব্যবসায়ীরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে নগ্ন ছবি পাঠানোর প্রস্তাব দেয়। বিনিময়ে টাকারও প্রস্তাব দেয়া হয়। প্রস্তাবে রাজি হয় টিপু। ফুঁসলিয়ে ও টাকার বিনিময়ে পথশিশুদের সংগ্রহ করে নগ্ন ছবি তুলে পাঠাতে শুরু করেন।

.

কিছু ছবি পাঠানোর পরই পর্নো ছবি পাঠানোর প্রস্তাব দেয়া হয় তাকে। শুরু হয় এই পর্নো ছবি (ভিডিও) তৈরির কাজ। সময়টা ২০০5 সাল। নুরুল আমিন ওরফে নুরু মিয়া, নুরুল ইসলাম, সাহারুলসহ কয়েকজনের মাধ্যমে বস্তিসহ বিভিন্ন জায়গা থেকে ছিন্নমূল ছেলে শিশুদের সংগ্রহ করেন টিপু। মুগদার মানিকনগরের ওয়াসা রোডের ৫৭/এল/২ নম্বর বাড়ির নিচতলায় দুই রুমের বাসা ভাড়া নিয়ে জমে ওঠে ফ্রি-ল্যান্স ফটোগ্রাফির আড়ালে পথশিশুদের দিয়ে পর্নো ছবি নির্মাণ ও ইন্টারনেটে বিদেশে পাঠানোর রমরমা ব্যবসা। নয় বছরে কমপক্ষে ৫০০ শিশুর পর্ণোগ্রাফিক ভিডিও তৈরি করে টিপু ও তার সহযোগীরা। ৮-১৩ বছরের এসব পথশিশুদের ৩০০-৪০০ টাকা দেওয়ার লোভ দেখিয়ে এ কাজে ব্যবহার করা হতো।

.

টিপু এবং তার ওই সহযোগীরা শিশুদের সঙ্গে বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত হতেন। আর বেশির ভাগই এসব ভিডিও করতেন টিপু নিজেই। একপর্যায়ে এই জঘন্য অপরাধ টিপুর নেশা ও পেশায় পরিণত হয়ে যায়। আদালতে দেওয়া জবানবন্দিতে টিপু বলেছেন, তিনি পর্নো ছবি তৈরি করে জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডের তিন ব্যক্তির কাছে পাঠাতেন। এঁদের একেকজনের কাছ থেকে

প্রতি মাসে তিনি ৫০ হাজার করে দেড় লাখ টাকা পেতেন। তবে তদন্তকারী সংস্থা সিআইডি জানিয়েছে, টিপু কিবরিয়া তাঁর তৈরি পর্নো ছবি ১৩টি দেশের ১৩ জন নাগরিকের কাছে পাঠাতেন। এসব দেশের মধ্যে আছে কানাডা, জার্মানি, সুইজারল্যান্ড, আফ্রিকা, উত্তর আমেরিকা, মধ্য ইউরোপ ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ। তদন্তে আরো জানা গেছে বেশির ভাগ ছবি ও ভিডিও পাঠানো হতো জার্মানি ও সুইজারল্যান্ডে। এরপর সেখানকার ব্যবসায়ীরা বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এসব পর্নো ছবি বিক্রি করতো। প্রতিটি সিডির জন্য ৩শ' থেকে ৫শ' ডলার পেতেন টিপু। এই টাকা অনলাইন ব্যাংকিং ওয়েস্টার্ন ইউনিয়নের মাধ্যমে টিপুর কাছে পাঠানো হতো।

.

টিপুর মাধ্যমে শিশু পর্নো ছবি বিক্রির দুই হোতা বাংলাদেশ ঘুরে গেছেন। চলতি বছরের প্রথম দিকে জার্মানির এক পর্নো ছবি বিক্রেতা বাংলাদেশে এসেছিলেন। আর ২০১২ সালে আসেন সুইজারল্যান্ডের আরেক পর্নো বিক্রেতা। তারা ওঠেন ঢাকার আবাসিক হোটেলে। সে সময় টিপু তাদের কাছে ছেলে শিশু পাঠান। তারা ওই শিশুদের নিয়ে বিকৃত যৌনাচারে লিপ্ত হন। এজন্য টিপু এবং তার সহযোগীরা পেয়েছেন ৮ হাজার ডলার।

.

ইন্টারপোলের দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে ১০ ও ১১ জুন খিলগাঁও, মুগদা এবং গোড়ানে অভিযান চালিয়ে টিপু কিবরিয়া এবং তার তিন সহযোগী নুরুল আমিন, নুরুল ইসলাম ও সাহারুলকে গ্রেফতার করে সিআইডির অর্গানাইজড ক্রাইম টিম। স্টুডিওতে আপত্তিকর অবস্থায় উদ্ধার করা হয় ১৩ বছরের এক শিশুর সাথে টিপুর সহযোগী নুরুল ইসলানকে। টিপুর খিলগাঁওয়ের তারাবাগের ১৫১/২/৪২ নম্বর বাড়ির বাসা ও স্টুডিও থেকে শতাধিক পর্নো সিডি, আপত্তিকর শতাধিক স্থির ছবি, ৭০টি লুব্রিকেটিং জেল, ৪৮ পিস আন্ডারওয়ার, স্টিল ক্যামেরা, ভিডিও ক্যামেরা, কম্পিউটার হার্ডডিস্ক, সিপিইউ, ল্যাপটপসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম উদ্ধার করা হয়।

.

http://bit.ly/2atUZJi
http://bit.ly/2aQzPe9
http://bit.ly/2atZg5N
http://bit.ly/2aPjZjN
http://bit.ly/2aPjTsf
http://bit.ly/2aPkiuM
http://bit.ly/2auZpmn
http://bit.ly/2atZFVN

.

টিপু কিবরিয়ার ফ্লিকার লিঙ্ক - http://bit.ly/2b1ZXiu
টিপু কিবরিয়ার ব্লগ (সামওয়্যার ইন ব্লগ) লিঙ্ক - http://bit.ly/2aHYxuv

.

উপরের তথ্যগুলো ভয়ঙ্কর। তবে বাস্তব অবস্থা এর চেয়ে লক্ষগুন বেশি ভয়ঙ্কর। টিপু কিবরিয়ারা একটা বিশাল নেটওয়ার্কের ছোট একটা অংশ মাত্র। বিশ্বব্যাপী চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি ও পেডোফাইল নেটওয়ার্কের ব্যাপ্তি, ক্ষমতা ও অবিশ্বাস্য অসুস্থ অমানুষিক নৃশংসতার প্রকৃত চিত্র এতোটাই ভয়াবহ যে প্রথম প্রথম এটা বিশ্বাস করাটা একজন ব্যাক্তির জন্য কঠিন হয়ে যায়। আর একবার এ অসুস্থতা ও বিকৃতির বাস্তবতা, মাত্রা, প্রসার, ও নাগাল সম্পর্কে একবার জানার পর এ ভয়াবহতাকে মাথা থেকে দূর করা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আমাদের চারপাশের বিকৃত অসুস্থ পৃথিবীটার এ এমন এক বাস্তবতা যা সম্পর্কে জানাটাই একজন মানুষের মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়ার জন্য যথেষ্ট। এ এমন এক অন্ধকার জগত যাতে মূহুর্তের জন্য উকি দেওয়া একজন মানুষকে আমৃত্যু তাড়া করে বেড়াতে পারে।

.

টিপু কিবরিয়ার লেখা কিশোর হরর সিরিযের বইগুলোর ব্যাক কাভারে সবসময় দুটা লাইন দেয়া থাকতো – “পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি!!” এ লাইনদুটো কিশোর হরর সিরিযের ট্যাগলাইনের মতো ছিল। সেবার বইগুলোর পাতায় উঠে আসা অন্ধকারের কল্পিত গল্পগুলোর জন্য লাইনদুটোকে অতিশয়োক্তি মনে হলেও, যে অন্ধকারে বাস্তবর জগতের চিত্র তুলে ধরতে যাচ্ছি তার জন্য এ লাইনদুটোকে কোনক্রমেই অত্যুক্তি বলা যায় না। তাই টিপু কিবরিয়াকে দিয়ে যে গল্পের শুরু সে গল্পের গভীরে ঢোকার আগে টিপুর ভাষাতেই সতর্ক করছি–

.

“পাঠক, সাবধান!
ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি!!”

[ইন শা আল্লাহ চলবে]

১৭৯

“পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি - ১!!” পর্ব ২

-আসিফ আদনান

টিপু কিবরিয়াকে যদি ম্যানুফ্যাকচারার হিসেবে চিন্তা করেন তবে তার বানানো শিশু পর্ণোগ্রাফির মূল ডিস্ট্রিবিউটার এবং ব্যবহারকারীরা হল পশ্চিমা বিশেষ করে ইউরোপিয়ানরা। শুধুমাত্র চোখের ক্ষুধা মেটানোয় তৃপ্ত না হয়ে টিপুর এ ইউরোপিয়ান ক্রেতাদের মধ্যে কেউ কেউ বাংলাদেশে ঘুরে গেছে। কিছু ডলারের বিনিময়ে টিপু কিবরিয়া তার ইউরোপিয়ান ক্রেতাদের জন্য তৃপ্তির ব্যবস্থা করেছে। দুঃখজনক সত্য হল, পেডোফিলিয়া নেটওয়ার্ক ও চাইল্ড পর্ণোগ্রাফির বিশ্বব্যাপী ধারা এটাই। ঠিক যেভাবে নাইকি-র মতো বৈশ্বিক ব্র্যান্ডগুলো কম খরচে তাদের পোশাকের চাহিদা মেটানোর জন্য ম্যানুফাকচারিং এর কাজটা “তৃতীয় বিশ্বের” দেশগুলোর কাছে আউটসোর্স করে, ঠিক তেমনিভাবে পশ্চিমারা বিকৃতকামীরা শিশু পর্নোগ্রাফি তৈরি এবং শিশুকামের জন্য শিশু সংগ্রহের কাজটা আউটসোর্স করে। টিপু কিবরিয়ার মতো এরকম এ ইন্ডাস্ট্রির আরো অনেক ম্যানুফ্যাকচারার ছড়িয়ে আছে বিশ্বজুড়ে। তিনটি উদাহরন তুলে ধরছি-

.

.

রিচার্ড হাকল – ১৯৮৬ তে ব্রিটেনে জন্মানো হাকল তার “নেশা ও পেশার” বাস্তবায়নের জন্য বেছে নেয় দক্ষিন পূর্ব এশিয়াকে। লাওস, ক্যাম্বোডিয়া, সিঙ্গাপুর এবং ইন্ডিয়াতে পদচারনা থাকলেও হাকল তার মূল বেইস হিসেবে বেছে নেয় মালয়শিয়াকে। কুয়ালামপুরের আশেপাশে বিভিন্ন দারিদ্র দারিদ্রকবলিত অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর মাঝে সক্রিয় খ্রিষ্টান মিশনারীদের সাথে সম্পর্কের কারনে সহজেই হাকল মালয়শিয়াতে নিজের জন্য জায়গা করে নেয়। কখনো ফ্রি-ল্যান্সিং ফটোগ্রাফার, কখনো ডকুমেন্টারি পরিচালক, কখনো ইংরেজী শিক্ষক, আর কখনো নিছক খ্রিষ্টান মিশনারী হিসেবে মালয়শিয়া সহ দক্ষিন এশিয়ার বিভিন্ন দরিদ্র জনগোষ্ঠীর শিশুদের কাছাকাছি পৌছুতে সক্ষম হয় হাকল।

.

২০০৬ থেকে শুরু করে প্রায় ৮ বছরের বেশি সময় ধরে দক্ষিন এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দরিদ্র শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন চালায় হাকল। তার নির্যাতনের শিকার হয় ৬ মাস থেকে ১৩ বছর বয়সী দুইশ’র বেশি শিশু। গ্রেফতারের সময় তার ল্যাপটপে পাওয়া যায় বিশ হাজারের বেশি পর্ণোগ্রাফিক ছবি। শিশু ধর্ষনের ভিডি এবং ছবি ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিক্রি করতো হাকল। ছবি ও ভিডিওর সাথে যোগ করতো বিভিন্ন মন্তব্য, ক্যাপশান। এরকম একটি ওয়েবপোষ্টে হাকল লেখে –
“পশ্চিমা মধ্যবিত্ত ঘরের শিশুদের চাইতে দরিদ্রদের শিশুদের পটানো অনেক, অনেক বেশি সহজ।“

.

তিন বছর বয়েসী একটি মেয়ে শিশুকে ধর্ষনরত অবস্থা ছবির নিচে গর্বিত হাকলের মন্তব্য ছিল – “আমি টেক্কা পেয়ে গেছি! আমার কাছে এখন একটা ৩ বছরের বাচ্চা আছে যে কুকুরের মতো আমার আনুগত্য করে। আর এ নিয়ে মাথা ঘামানোর মতো কেউ এখানে নেই!”

.

অন্যান্য শিশুকামীদের জন্য পরামর্শ এবং বিভিন্ন গাইডলাইন সম্বলিত "Paedophiles And Poverty: Child Lover Guide"” নামে একটি বইও লিখেছিল রিচার্ড হাকল। হাকলের স্বপ্ন ছিল দক্ষিন এশীয় গরীব কোন মেয়েকে বিয়ে করে একটি অনাথ আশ্রম খোলা যাতে করে নিয়মিত নতুন দরিদ্র শিশুদের সাপ্লাই পাওয়া যায় কোন ঝামেলা ছাড়াই। ২০১৪ সালে রিচার্ড হাকলকে গ্রেফতার করা হয়।

.

http://bit.ly/2ahsaVd
http://bit.ly/2azfNjo
http://bit.ly/2aMBJeb
http://bit.ly/2auZWEM
http://bit.ly/2aAOeXx

.

.

ফ্রেডি পিটস – হাকলের জন্মের আগেই হাকলের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করেছিল ফ্রেডি পিটস। সত্তর দশকের মাঝামাঝি থেকে শুরু করে ১৯৯১ পর্যন্ত প্রায় ১৭ বছর, গোয়াতে গুরুকুল নামে একটি অনাথ আশ্রম পরিচালনা করে ফ্রেডি। হাকলের মতো ফ্রেডিও ছিল ক্যাথলিক চার্চের সাথে যুক্ত। এলাকায় মানুষ তাকে চিনতো লায়ন ক্লাবের সিনিয়র সদস্য, নির্বিবাদী সমাজসেবক 'ফাদার ফ্রেডি' হিসেবে। টিপু কিবরিয়া এবং রিচার্ড হাকলের মতোই ফাদার ফ্রেডির আয়ের উৎস ছিল পেডোফিলিয়া এবং চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি। তার সাথে সম্পর্ক ছিল ব্রিটেন, হল্যান্ড, অ্যামেরিকাসহ বিভিন্ন দেশের শিশুকামী সংগঠনের। ফাদার ফ্রেডি তার আশ্রমের শিশুদের ইউরোপিয়ান টুরিস্ট, বিশেষ করে সমকামী ইউরোপিয়ান পুরুষদের কাছে ভাড়া দিতেন। শিশুদের ধর্ষনের বিভিন্ন অবস্থার ছবি তুলে ইউরোপীয়ান ক্রেতাদের কাছে বিক্রিও করতো ফ্রেডি। নিজেও অংশগ্রহন করতো ধর্ষনে। বিশেষ "ক্লায়েন্টদের" মনমতো শিশু সংগ্রহ করে তাদের ইউরোপে পাঠানোর ব্যবস্থাও করা হতো ফ্রেডির "গুরুকুল" থেকে। এভাবে প্রায় দুই দশক ধরে ফাদার ফ্রেডি গোয়াতে গড়ে তোলে এক বিশাল ইন্ডাস্ট্রি।

.

ফ্রেডির এসব কার্যকলাপের সাথে বিভিন্ন বিদেশী ব্যাক্তি এবং আন্তর্জাতিক চক্র জড়িত এমন প্রমান থাকা সত্ত্বেও গোয়ার রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্র সরকার সর্বাত্বক চেষ্টা করে এ বিষয়গুলো চাপা দেয়ার। এমনকি প্রথম পর্যায়ে চেষ্টা করা হয়েছিল দুর্বল মামলা দিয়ে ফ্রেডিকে খালাস দেয়ার। খোদ রাজ্যের এটর্নী জেনারেল এবং ট্রায়াল জাজের বিরুদ্ধে অভিযোগ ওঠে ফ্রেডির বিরুদ্ধে পাওয়া প্রমান ও নথিপত্র ধ্বংস করার চেষ্টার।

.

উচু মহলের এসব কূটকৌশলের সামনে রুখে দাড়ায় কিছু শিশু অধিকার সংস্থার এবং কর্মী। তাদের একজন শিলা বারসি। রাজ্য সরকার, মন্ত্রী, বিচারবিভাগ এবং মিডিয়ার বিরুদ্ধে গিয়ে ফ্রেডি পিটসের মামলার ব্যাপারে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছিলেন শিলা। গ্রেফতারকালীন রেইডে ফাদার ফ্রেডির ফ্ল্যাটে পাওয়া যায় ড্রাগস, পেইন কিলার, এবং সিরিঞ্জের এক বিশাল কালেকশান। ফ্ল্যাট থেকে উদ্ধার করা হয় ২৩০৫ টি পর্ণোগ্রাফিক ছবি। মামলার কারনে শিলা বাধ্য প্রতিটি ছবি খুটিয়ে খুটিয়ে দেখতে। ফাদার ফ্রেডির ফ্ল্যাটে পাওয়া ২৩০৫ টি ছবিতে যে অন্ধকার অমানুষিক পৈশাচিকতার জগতকে তিনি দেখেছিলেন তার ভয়াবহ স্মৃতি আমৃত্যু তাকে তাড়া করে বেড়াবে বলেই শিলার বিশ্বাস।

.

ডেইলি ইন্ডিপেন্ডেন্টকে দেয়া সাক্ষাৎকারে শিলা বলেন -

"সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ছবিটি ছিলে আড়াই বছর বয়েসী একটি মেয়ের। মেয়েটিকে ছোট ছোট হাত আর পা গুলো ধরে তাকে চ্যাংদোলা করে অনেকটা হ্যামকের মতো করে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল...একটা বিশালদেহী লোক...লোকটাকে...লোকটার শরীরের আংশিক দেখা যাচ্ছিল...বাচ্চাটাকে ধর্ষন করছিল। বাচ্চাটার কুঁচকানো চেহারায় ফুটে ছিল প্রচন্ড ব্যাথা আর শকের ছাপ। ছবি দেখেও পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল বাচ্চাটা সর্বশক্তি দিয়ে চিৎকার করছিল। "

.

ছবিগুলো দেখার পর শিলা সিদ্ধান্ত নেন যেকোন মূল্যে ফ্রেডির সর্বোচ্চ শাস্তি নিশ্চিত করার। ১৯৯২ সালে ফ্রেডি পিটসের বিরুদ্ধে চার্জশিট দেয়া হয়, এবং ৯৬ এর মার্চে তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কারাভগ্রত অবস্থায় ২০০- সালে ফ্রেডি

পিটস মারা যায়।

.

http://bit.ly/2aQxJuW
http://ind.pn/2atVuD3
http://bit.ly/2atZDgG
http://bit.ly/2aN0QxZ

.

.

পিটার স্কালি – পিটার স্কালির গল্পের মতো এতো বিকৃত, নৃশংস, এতোটা বিশুদ্ধ পৈশাচিকতার কাহিনী খুব সম্ভবত আমাদের এ বিকৃতির যুগেও খুব বেশি খুজে পাওয়া যাবে না। স্কালি অস্ট্রেলিয়ান। নিজ দেশে ব্যাবসায়িক ফ্রডের পর নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে চলে আসে ফিলিপাইনে। কিছুদিন রিয়েল এস্টেট ব্যবসার চেষ্টার পর মনোযোগ দেয় আন্তর্জাতিক বাজারের জন্য চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি বানানোয়। বেইস হিসেবে বেছে নেয় দারিদ্র কবলিত মিন্দানাওকে। গড়ে তোলে এক চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি সাম্রাজ্য।

.

টিপু কিবরিয়া, হাকল আর ফাদার ফ্রেডির মতো স্কালিও নিজেই ছিল, অভিনেতা, স্ক্রিপ্ট রাইটার ও পরিচালক। তবে বাকিরা শুধুমাত্র শিশুকামের গন্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকলেও, স্কালির বিকৃতিকে নিজে যায় আরেকটি পর্যায়ে। সে শিশুকামের সাথে মিশ্রণ ঘটায় টর্চারের। স্ক্লাইরর সবচেয়ে ভয়ঙ্কর ভিডিওতে ধর্ষনের পাশাপাশি মারাত্বক পর্যায়ের টর্চার করা হয়, ১৮ মাস বয়েসী একটি মেয়েশিশুকে। ১২ ও ৯ বছরের দুটি মেয়েকে বাধ্য করা হয় ধর্ষন ও নির্যাতনে অংশগ্রহন করতে। যখন ভিডিও বন্ধ থাকতো তখন বন্দী এ মেয়ে দুটিকে স্কালি তার বাসায় বিবস্ত্র অবস্থায় কুকুরের চেইন পড়িয়ে রাখতো এবং তাদের বাধ্য করতো বাসার আঙ্গিনাতে নিজেদের কবর খুড়তে। পরবর্তীতে এদের একজনকে স্কালি হত্যা করে, এবং নিজের রান্নাঘরের টাইলসের নিচে মেয়েটির লাশ লুকিয়ে রাখে। মেয়েটিকে হত্যা করার ভিডিও স্কালি ধারন করে এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে ভিডিওটি বিক্রি করা হয়।

.

স্ক্লালির ভিডিওগুলো দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপিয়ান পেডোফাইল এবং চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি নেটওয়ার্কে। রাতারাতি স্কালি এবং তার সাইট পরিণত হয় "সেলেব্রিটি কাল্ট-হিরোতে"। শুরুতে তার ভিডিওগুলোর জন্য Pay-Per View Streaming অফার করলেও, চাহিদা ওবং জনপ্রিয়তা বাড়ার ফলে এক পর্যায়ে স্কালি লাইভ স্ট্রিমিং করা শুরু করে। ২০১৫ এর ফেব্রুয়াত্রিতে স্ক্লালি ও তার সহযোগী দুই ফিলিপিনী তরুণীকে গ্রেফতার করা হয়। তদন্তকারী অস্ট্রেলিয়ান ও ফিলিপিনো পুলিশের ধারনা বিভিন্ন সময়ে পিটার কমপক্ষে ৮ জন শিশুর উপর যৌন ও শারীরিক নির্যাতন চালানোর ভিডিও ধারন করেছে। তবে প্রকৃত সংখ্যাটা আরো বেশি হতে পারে।

.

http://bit.ly/2ax6AuF
http://bit.ly/2ahqlHI
http://bit.ly/2aPkydq
http://bit.ly/2aMByzz
http://bit.ly/2azf9Co

[ইন শা আল্লাহ চলবে]

১৮০

প্রমাণ এবং বিশ্বাসের মধ্যকার পার্থক্য

-মাহফুজ আল আমিন

প্রমাণ আর বিশ্বাস, দুটি দুই মেরুর ভিন্ন দুটি বিষয়। ২+২=৪, এটা প্রমাণিত ফ্যাক্ট, পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে এটাও প্রমাণিত, চন্দ্র ও সূর্য পর্যায়ক্রমে দিন ও রাত আবর্তন ঘটায়, এই সবই প্রমাণিত।
এখন প্রশ্ন হলো, যেটা অলরেডি প্রমাণিত, সেটা বিশ্বাস করা আর না করার কিছু আছে কি? যেটা এমনিই প্রমাণিত, সেটা অবিশ্বাস করার মত কোন অপশন ই আসলে বাকি থাকে না। সৃষ্টিকর্তার অস্তিত্ব বিশ্বাস একটি যৌক্তিক বিশ্বাস, স্বভাবজাত, জন্মগত বিশ্বাস। মানুষ তার চারপাশে তাকালেই স্রষ্টার অস্তিত্বের নিদর্শন এমনিতেই চোখে পড়ে, এই পর্যন্ত আবিষ্কৃত ৯৩ বিলিয়ন আলোকবর্ষের মহাবিশ্ব স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি এবং এতো নিখুঁতভাবে সব কিছু নিয়ন্ত্রণ যে সম্ভব নয়, তা যে কোন যৌক্তিক মস্তিষ্ক সহজেই অনুধাবণ করতে জানে।

.

এখানে প্রমাণের জন্য বিজ্ঞানের মানদন্ড টেনে আনা মানে বিজ্ঞানকেই নিজের মনের অজান্তে স্রষ্টা হিসেবে মেনে নেয়া, যদিও একজন নাস্তিক না বুঝে অথবা নিজে পরীক্ষা না করে, বিজ্ঞান যা বলে তাই মেনে নেয়, অথচ এই বিজ্ঞানই প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল।
মানুষকে যেহেতু এই পৃথিবীতে পরীক্ষা করা হচ্ছে, সেহেতু এখানে অপশন রাখাই হয়েছে এমনভাবে, যে বিশ্বাস করার সে যেমন নিদর্শন খুঁজে পাবে, যে অবিশ্বাস করার সেও কোন না কোন অজুহাত খুঁজে পাবে। ব্যাপারটা এমন না যে, আল্লাহ তাআলা একদিন নেমে এসে সবাইকে দেখিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ। তারপরেই সবাই বিশ্বাসী হয়ে ধর্ম কর্ম করা শুরু করে দেবে! মানুষের বিশ্বাস অবিশ্বাস তার ইন্দ্রিয়ের, বা বুদ্ধিবৃত্তিক সিদ্ধান্তের চেয়ে বরং মানসিক সিদ্ধান্ত বা যৌক্তিক সিদ্ধান্তের উপর বেশি নির্ভর করে।

.

যে অবিশ্বাস করার নিয়ত করেই ফেলেছে, সে কোন না কোন অজুহাত খুঁজে বের করবেই, কেনোনা যদি সে তা না করে, তবে তার নিজেকে সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে হবে, যা সে মন থেকে চায়না। আল্লাহ তো বলেছেন ই-
"যদি আমি তাদের সামনে আকাশের কোন দরজাও খুলে দেই আর তাতে ওরা দিনভর আরোহণ ও করতে থাকে, তবুও ওরা একথাই বলবে যে, নিশ্চিত আমাদের দৃষ্টির বিভ্রাট ঘটানো হয়েছে অথবা আমরা যাদুগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।" (সূরা হিজর- ১৪-১৫)

.

মানুষ কেনো নাস্তিক সাজতে চায় তার সহজ একটা কারণ বলছি- মানুষ যখন নিজের মন মত, খেয়াল খুশি মত, প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে দেখে ধর্ম সেইখানে মূল বাধা, ধর্ম সেখানে সেইগুলোকে ডিসিপ্লিন এর মধ্যে আনতে বলে সেই অনুযায়ী চলতে বলে, সেই জন্য তার বিরুদ্ধে অন্তর কে তৈরি করতে আর নিজের খেয়াল খুশি মত চলতে বিপরীত এক শক্তিশালী অবস্থান এর দরকার হয়, আর তখনই মানুষ নাস্তিকতা কে ইচ্ছাকৃত ভাবে নিজের আদর্শ হিসেবে বেছে নেয়ার চেষ্টা করে।

.

কেনোনা পাপ করতে গিয়ে তার মনে যে আঘাত, কষ্ট অনুভূত হয়, তার প্রতি অন্তর কে সহনীয় করে তুলতে আর পাপ চালিয়ে যেতে অন্তর কে পাপ এর কষ্ট বিরোধী খাবার খাওয়াতে হয়, আর সেখান থেকেই নাস্তিকতার উৎপত্তি ঘটে। কোন মানুষের পক্ষেই নাস্তিক হওয়া আসলে সম্ভব নয়। কেনোনা স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাস মানুষের স্বভাবজাত এক বৈশিষ্ট্য। সাইন্স নিজেও ব্যাপারটা এড়িয়ে যেতে পারেনা- যেটা কে বলা হয় "গড মলিকিউল"।

.

স্রষ্টার অস্তিত্ব সত্যিকার অর্থে অন্তরে ধারণ করতে তাকে নিজের জীবনের সকল সমস্যার সমাধান, স্ট্যান্ডার্ড আর অস্তিত্বের প্রয়োজনেই তার দেয়া নিয়ম কানুন পালনের মধ্য দিয়ে খুঁজতে হয়, অনুধাবন করতে হয়। তথ্য প্রমাণ, নিজস্ব যুক্তির মারপ্যাঁচে স্রষ্টাকে নিজের মত অস্বীকার করা মানেই নিজের স্বার্থ বাঁচাতে সুবিধাবাদী নাস্তিক সাঁজা!

১৮১

“পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি - ১!!” (শেষ পর্ব)

-আসিফ আদনান

টিপু কিবরিয়া, রিচার্ড হাকল, ফ্রেডি পিটস, পিটার স্কালি। ভিন্ন ভিন্ন দেশের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাকগ্রাউন্ডের হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে, তাদের অপরাধ এবং বিকৃতির মধ্যে বেশ কিছু যোগসূত্র বিদ্যমান। এরা সবাই শিকারের জন্য বেছে নিয়েছিল দারিদ্রপীড়িত এশিয়ান শিশুদের। এদের মূল অডিয়েন্স এবং ক্লায়েন্ট বেইস ছিল পশ্চিমা, বিশেষ করে ইউরোপিয়ান। আর এরা চারজনই চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি এবং গ্লোবাল পেডোফিলিয়া নেটওয়ার্কের সাপ্লাই চেইনের খুব ক্ষুদ্র একটা অংশ। খুব অল্প পুজিতে, এবং অল্প সময় এরা সক্ষম হয়েছিল বিশাল গ্লোবাল নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে কিংবা এধরনের নেটওয়ার্কের সাথে সংযুক্ত হতে। এ দৃষ্টিকোন থেকে এ চারজনকে সফল উদ্যোক্তাও বলা যায়।

.

এ চার জন ধরা পড়েছে এটা মনে করে আমরা আত্বতৃপ্তি ভোগ করতেই পারি, কিন্তু বাস্তবতা হল একটা বিশাল মার্কেট, একটা বিপুল চাহিদা ছিল বলে, আছে বলেই এতো সহজে এ লোকগুলো তারা যা করেছে তা করতে সক্ষম হয়েছিল। আমাদের কাছে এ লোকগুলোর কাজ, তাদের বিকৃতি, তাদের পৈশাচিকতা যতোই অচিন্তনীয় মনে হোক না কেন বাস্তবতা হল পিটার স্কালি কিংবা টিপু কিবরিয়ারা এ অন্ধকার জগতের গডফাদার না, তারা বড়জোড় রাস্তার মোড়ের মাদকবিক্রেতা। একজন গ্রেফতার হলে তার জায়গায় আরেকজন আসবে।

.

২০১৪ তে রিচার্ড হাকলের গ্রেফতারের পর ২০১৫, সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হয় বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা শিশুকামী ও শিশুনির্যাতনকারী নেটওয়ার্কের হোতা ৭ ব্রিটিশ । ভয়ঙ্কর অসুস্থতায় মেতে ওঠা এই লোকেরা ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিশুদের উপর তাদের পৈশাচিক নির্যাতনে লাইভ স্ট্রিমিং বা সরাসরি সম্প্রচার করতো। বিশেষ অফার হিসেবে তারা লাইভ চ্যাটের মাধ্যমে অন্যান্য শিশুকামীদের সুযোগ দিতো ঠিক কিভাবে শিশুদেরকে নির্যাতন ও ধর্ষন করা হবে তার ইন্সট্রাকশান দেবার। এভাবে তারা অর্থের বিনিময়ে নিজেদের সহ-মুক্তচিন্তকদের আনন্দের ব্যবস্থা করতো। ব্রিটেন জুড়ে এরকম আরো অনেক সক্রিয় নেটওয়ার্কের অস্তিত্বের প্রমান মিলেছে।

http://bit.ly/26aoSXO।

.

ফ্রেডি পিটসের গ্রেফতারের পরও গোয়ার শিশুকাম ভিত্তিক টুরিস্ট ইন্ডাস্ট্রির প্রসার থেমে থাকেনি। ফাদার ফ্রেডির শূন্যস্থান পুরন করেছে অন্য আরো অনেক ফ্রেডি। তেহেলকা.কমের ২০০৪ এর একটি অনুসন্ধানী রিপোর্ট অনুযায়ী প্রতিবছর প্রায় ১০,০০০ পেডোফাইল গোয়া থেকে ঘুরে যায়। গোয়ায় অবস্থানকালীন সময়ে প্রতিটি পেডোফাইল গড়ে আটজন শিশুর উপর যৌন নির্যাতন চালায়।

http://bit.ly/2aPkH0u

http://bit.ly/2aQxpfC

.

২০১৫ তে অস্ট্রেলিয়াতে গ্রেফতার হয় ম্যাথিউ গ্র্যাহ্যাম। ২২ বছর বয়েসী ন্যানোটেকনোলজির ছাত্র ম্যাথিউ নিজের বাসা থেকে গড়ে তোলে এক অনলাইন চাইল্ড পর্ণগ্রাফি এবং পেডোফিলিয়া সাম্রাজ্য। ম্যাথিউ নিজে কখনো সরাসরি যৌন নির্যাতনে অংশগ্রহন না করলেও সক্রিয় পেডোফাইলদের জন্য সে অসংখ্যা সাইট এবং ফোরাম হোস্ট করত। বিশেষভাবে শিশুদের উপর

ধর্ষনের সাথেসাথে চরম মাত্রার শারীরিক নির্যাতনের ভিডিও প্রমোট করা ছিল ম্যাথিউর স্পেশালিটি। ম্যাথিউর নেটয়ার্কের সাথে সম্পর্ক ছিল আরেক অস্ট্রেলিয়ান পিটার স্কালির।

http://bit.ly/2aSy25e

.

১৫-তেই গ্রেফতার হয় আরেক অস্ট্রেলিয়ান শ্যানন ম্যাককুল। সরকারী কর্মচারী শ্যানন কাজ করত সরকারী প্রতিষ্ঠান অ্যাডিলেইড চাইল্ড কেয়ার সেন্টারে। এ সেন্টারের বিভিন্ন শিশুরা ছিল শ্যাননের ভিকটিম, এবং তাদের অধিকাংশ ছিল ৩-৪ বছর কিংবা বয়সী কিংবা তার চেয়েও ছোট। শ্যানন যৌন নির্যাতন এবং ধর্ষণের ভিডিও নিজের সাইট ও ফোরামের মাধ্যমে আপলোড ও বিক্রি করতো। খুব কম সময়েই শ্যাননের সাইট ও ফোরাম কুখ্যাতি অর্জন করে।

.

http://bit.ly/2ax9gbW

http://bit.ly/2aSBdtP

http://ab.co/1UpMm3Q

.

এভাবে প্রতিটি শূন্যস্থানই কেউ না কেউ পূরন করে নিয়েছে। টিপু কিবরিয়ার রেখে যাওয়া স্থানও যে অন্য কেউ দখল করে নেয় নি এটা মনে করাটা বোকামি। আমরা জানতে পারছি না হয়তো, কিন্তু যতোক্ষন পর্যন্ত চাহিদা থাকবে ততোক্ষন যোগান আসবেই। সহজ সমীকরণ। ইকোনমিক্স ১০১। ২০০৬ এ প্রকাশিত ওয়ালস্ট্রীট জার্নালে প্রকাশিত একটি রিপোর্ট অনুযায়ী চাইল্ড পর্ণোগ্রাফিতে প্রতিবছর লেনদেন হয় ২০ বিলিয়ন ডলারের বেশি। এটা ২০০৬ এর তথ্য। গত দশ বছরে মার্কেটে এসেছে হাকল, স্কালি, শ্যানন, গ্র্যাহামের মতো আরো অনেক “উদ্যোক্তা”, বেড়েছে মার্কেটের আকার। ২০১১ সালের একটি রিসার্চ অনুযায়ী ২০০৮ থেকে ২০১১, এ তিনবছরে অনলাইনে চাইল্ড পর্ণোগ্রাফি সংক্রান্ত ইমেজ এবং ভিডিও বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৭৭৪%।

http://on.wsj.com/2aAOh5I

http://bit.ly/2aPkxpT

.

ইন্ডেক্সড ইন্টারনেট বা সাধারনভাবে ইন্টারনেট বলতে আমরা যা বুঝি তার তুলনায় ডিপওয়েব প্রায় ৫০০ গুন বড়। এ ডিপওয়েবের ৮০% বেশি ভিযিট হয় শিশুকাম, শিশু পর্ণোগ্রাফি এবং শিশুদের উপর টর্চারের ভিডিও ইমেজের খোজে।

http://bit.ly/2aQyq7p

.

.

বিষয়টার ব্যাপকতা একবার চিন্তা করুন। এ বিকৃতির প্রসারের মাত্রাটা অনুধাবনের চেষ্টা করুন। পৃথিবীতে আর কখনো এধরনের বিকৃতি দেখা যায় নি এটা বলাটা ভুল হবে। পম্পেই, বা গ্রীসের কামবিকৃতির কথা আমরা জানি, আমরা জানি সডোম আর গমোরাহর ধ্বংসপ্রাপ্ত সম্প্রদায় কওমে লূতের কথা। কিন্তু বর্তমানে আমর যা দেখছি এ মাত্রার বিকৃতি ও তার বিশ্বায়ন, এ মাত্রার ব্যবসায়ন, এ ব্যাপ্তি মানব ইতিহাসের আগে কখনো দেখা গেছে বলে আমার জানা নেই। কেন এতো মানুষ এতে আগ্রহী হচ্ছে? কেন জ্যামিতিক হারে এ ইন্ডাস্ট্রি প্রসারিত হচ্ছে? কেন এতোটা মৌলিক পর্যায়ে মানুষের অবিশ্বাস্য বিকৃতি ঘটছে এ হারে? কেন মানুষের ফিতরাতের বিকৃতি ঘটছে? আর কেনই এরকম পৈশাচিক ঘটনার পরও এধরনের ইন্ডাস্ট্রি শুধু টিকেই থাকছে না বরং আরো বড় হচ্ছে? শ্যানন-স্কালি-টিপু কিরিয়াদের এ নেটওয়ার্কের গডফাদার কারা? কোন খুঁটির জোরে তারা থেকে যাচ্ছে ধরাছোয়ার বাইরে?

.

একে কি শুধুমাত্র বিচ্ছিন কোন ঘটনা, কিংবা অসুস্থতা বলে দায় এড়ানো সম্ভব? সমস্যাটা কি চিরাচরিত কাল থেকেই ছিল এবং

বর্তমান আধুনিক সভ্যতার যুগে এসে এর প্রসার বৃদ্ধি পেয়েছে? নাকি এর পেছনে ভূমিকা রয়েছে মিডিয়া ও পপুলার কালচারের? বিষয়টি কি মৌলিক ভাবে মানুষের যৌনতার মাঝে বিরাজমান কোন বিকৃতির সাথে যুক্ত? নাকি এ বিকৃতি আধুনিক পশ্চিমা দর্শনের যৌনচিন্তা এবং আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতার মৌলিক অংশ?

ইন শা আল্লাহ চলবে...

১৮২

আল্লাহর অস্তিত্ব থাকলে পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্ট কেন?

-নিলয় আরমান

জনৈক প্রগতিশীল পুরুষ একবার খুব শখ করে বলেছিলো, "বিয়ের পর আমি আমার স্ত্রীকে পূর্ণ স্বাধীনতা দেবো।" মানুষ প্রশংসা করবে কী, উল্টো তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো নারীবাদীরা। বললো, "স্বাধীনতা দেবো মানে কী? আপনি তাকে স্বাধীনতা দেওয়ার কে? আপনি স্বাধীনতা না দিলে সে স্বাধীন হতে পারবে না? সে তো জন্মগতভাবেই স্বাধীন। নিজেকে কী মনে করেন? ... " ইত্যাদি। বেচারার প্রতি সমবেদনা। উত্তরাধুনিকতাবাদ আমাদেরকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করিয়েছে যে, শুধু অন্যের অবাধ অধিকারে বিশ্বাস করাটাই যথেষ্ট না। কার কর্তব্য ও অধিকার কী হবে এটা যে কে ঠিক করে দেবে, তা-ও এখন অস্পষ্ট।

.

তবে আল্লাহর কর্তব্য ঠিক করে দেওয়ার ব্যাপারে অবিশ্বাসী ও সংশয়বাদী সম্প্রদায় খুবই দক্ষ। তারা যখন বলে "আল্লাহর অস্তিত্ব থাকলে পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্ট কেন?" তখন কিন্তু তারা নিজ থেকেই একটি শর্ত আল্লাহর উপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলো। সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন জাগে যে, এই চাপিয়ে দেওয়ার অধিকার তাদের আছে কি না। আল্লাহর অস্তিত্ব থাকা না থাকার সাথে পৃথিবীতে দুঃখ-কষ্ট থাকা না থাকার কি কোনো আবশ্যক সম্পর্ক আছে? প্রশ্নকারীদের প্রতি প্রশ্ন রইলো।

.

অবিশ্বাস ও সংশয়ের বিরুদ্ধে প্রতিটা ধর্মের হয়ে ওকালতি করাটা কঠিন। কারণ এক ধর্মের সাথে আরেক ধর্মের কনসেপ্টে বড়সড় পার্থক্য থাকে (এর অর্থ এই না যে জীবনদর্শন, নৈতিকতা, সামাজিকতা, রাজনীতি ইত্যাদি সকল কনসেপ্টে সকল অবিশ্বাসীরা একমত। তারাও নিজেদের মাঝে শতধা বিভক্ত)। একদিকে অবিশ্বাস আর আরেকদিকে ধর্মবিশ্বাসকে রেখে স্বপক্ষ নির্ধারণ করা কঠিন। তাই আমরা এখানে শুধুমাত্র ইসলামের দৃষ্টিকোণ থেকে বোঝার চেষ্টা করবো আল্লাহর অস্তিত্ব থাকার পরও পৃথিবীতে এত দুঃখ-কষ্ট কেন। এবং আল্লাহ ছাড়া কেউই আমাদেরকে এ কাজের সামর্থ্য দানে সক্ষম নয়।

.

আল্লাহ যেহেতু সমগ্র সৃষ্টিজগতের একচ্ছত্র অধিপতি, তিনি আসলে কারো কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নন। তিনি যদি আমাদের সৃষ্টিই না করতেন, আমাদের কিছু করার ছিলো না। তিনি যদি আমাদেরকে এই আকৃতিতে না বানিয়ে অন্য আকৃতিতে সৃষ্টি করতেন, আমাদের কিছু বলার ছিলো না। তিনি যদি আমাদেরকে সৃষ্টি করার পর আদেশ দিতেন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সেজদায় পড়ে থাকতে হবে, তাহলে আমাদের কিছু করার ছিলো না। যদি বলতেন এত বছরের সেজদার বিনিময়ে মৃত্যুর পর তিনি কোনো প্রতিদান দিবেন না, জাহান্নামে ফেলে দিবেন, তাহলেও আমাদের কিছু করার ছিলো না। আমরা যে প্রতিনিয়ত অক্সিজেন গ্রহণ করছি, আমাদের প্রতিটা ডিএনএ যে নিজ নিজ কাজ করে চলেছে, এ সবই আল্লাহর অনুগ্রহ। দিনে রাতে যে মাত্র সতের রাকআত ফরয সালাত আমাদের পড়তে হয়, বছরে যে মাত্র ত্রিশ বা তার চেয়ে কম ফরয সওম পালন করতে হয়, উদ্বৃত্ত সম্পদের মাত্র আড়াই শতাংশ যাকাত দিতে হয়, মাত্র একবার হাজ্জ করলেই হয়ে যায়, এ সবই আল্লাহর অনুগ্রহ।

.

আল্লাহ কোথাও দাবি করেননি যে সবাই তাঁর উপর ঈমান আনলে দুনিয়ায় সব দুঃখ-কষ্ট তিনি ভ্যানিশ করে দিবেন। সেই ওয়াদা তিনি করেছেন জান্নাতের ব্যাপারে, দুনিয়ার ব্যাপারে নয়। বরং এখানে দুঃখ-কষ্ট থাকবে, এটাই তাঁর প্রতিশ্রুতি। বিভিন্নজনের উপর বিভিন্ন কারণে বিপদ-আপদ দুঃখ-কষ্ট আসতে পারে। কোনো ক্ষেত্রে তা দুনিয়ার জীবনের পরীক্ষার একটা স্বাভাবিক অংশ।

.

এবং অবশ্যই আমি তোমাদেরকে পরীক্ষা করবো কিছুটা ভয়, ক্ষুধা, সম্পদ ও প্রাণের ক্ষতি এবং ফল-ফসল বিনষ্টের মাধ্যমে। তবে সুসংবাদ দাও ধৈর্যশীলদের। [সূরাহ আল-বাক্কারাহ (২):১৫৫]

.

রাসূলুল্লাহ ﷺ এর একটি হাদীস থেকে আমরা জানতে পারি যে, ঈমানদারের ব্যাপারটা বিস্ময়কর! তার উপর কোনো কল্যাণ আপতিত হলে সে আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে। আর কোনো বিপদ আপতিত হলে ধৈর্যধারণ করে। এই শুকরিয়াজ্ঞাপন ও সবর করার লাভটা কী? এগুলো অন্যান্য নেক আমলের মতোই আমলনামায় পয়েন্ট যোগ করে। দুঃখ-কষ্টবিহীন জান্নাতের দিকে যাওয়ার পথে আগে বাড়িয়ে দেয়।

.

আর মানুষের ঈমানের মজবুতির ভিত্তিতে তার পরীক্ষা কঠিনতর হতে থাকে। নবীগণকে তাই সবচেয়ে বেশি পার্থিব যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছে। 'আয়িশা ও অন্যান্য সাহাবা (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম) হতে বর্ণিত হাদীসসমূহ থেকে আমরা জানতে পারি রাসূলুল্লাহর ﷺ চেয়ে বেশি পার্থিব কষ্ট পেতে তাঁরা কাউকে দেখেননি। নিন্দুকরা তাঁর যুদ্ধগুলোর কথা এমনভাবে প্রচার করে যেন তিনি লুট করা স্বর্ণের পাহাড়ের উপর বসা কোনো ডাকাত ছিলেন। অথচ বাস্তবে তিনি এমন বিছানায় শুতেন যে শরীরে দাগ পড়ে যেতো।

.

দুনিয়ার সব সম্পদ ঈমানদারদের হাতে তুলে দিলে মুনাফিকদের আলাদা করা যেতো না। আবার সকল ভোগ-বিলাস শুধু কাফিররাই পেলে কেউ ঈমানদার হওয়ার মতো উদ্দীপনা পেতো না।

.

যদি সব মানুষ একমতাবলম্বী হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকতো, তবে যারা দয়াময় আল্লাহকে অস্বীকার করে, তাদেরকে আমি দিতাম তাদের ঘরের জন্য রৌপ্যনির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি, যার উপর তারা চড়তো। আর তাদের ঘরের জন্য দরজা দিতাম এবং পালংক দিতাম যাতে তারা হেলান দিতো। এবং স্বর্ণনির্মিতও দিতাম। এগুলো সবই তো পার্থিব জীবনের ভোগসামগ্রী মাত্র। আর পরকাল আপনার পালনকর্তার কাছে তাদের জন্যই, যারা ভয় করে। [সূরাহ আয-যুখরুফ (৪৩):৩৩-৩৫]

.

তারপরও তো মুসলিম বাদশাহর অধীনে অমুসলিম ঝাড়ুদার থাকে। তাহলে রাসূলুল্লাহ ﷺ একটি হাদীসে কেন বললেন "দুনিয়া মুমিনের কারাগার আর কাফিরের জান্নাত"? কারণ জান্নাতের তুলনায় দুনিয়ার বাদশাহী কারাগারের মতোই, আর জাহান্নামের তুলনায় দুনিয়ার ঝাড়ুদারগিরি হলো জান্নাতের মতো।

.

এছাড়া আমাদের বদ আমলের কারণেও বিভিন্ন দুর্যোগ এসে থাকে। এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সুযোগ দেন সময় থাকতে এসকল কাজ থেকে তাওবাহ করার।

.

স্থলে ও জলে মানুষের কৃতকর্মের দরুন ফাসাদ ছড়িয়ে পড়েছে। আল্লাহ তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করাতে চান, যাতে তারা ফিরে আসে। [সূরাহ আর-রূম (৩০):৪১]

.

গুরুশাস্তির পূর্বে অবশ্যই আমি তাদেরকে লঘুশাস্তি আস্বাদন করাবো, যাতে তারা ফিরে আসে। [সূরাহ আস-সাজদাহ (৩২):২১]

.

আর যখন কোনো জাতি সীমালঙ্ঘন করে, আল্লাহ তাদেরকে আযাবের মাধ্যমে ধ্বংস করে দেন। সেই আযাব কোনো প্রাকৃতিক ঘটনা আকারেও আসতে পারে, আবার ঈমানদারদের জিহাদের মাধ্যমেও আসতে পারে। দ্বিতীয়টার বিধান দিয়ে আল্লাহ বরং সীমালঙ্ঘনকারীদেরকে দয়া করেছেন। কারণ প্রথম ধরনের আযাবে পুরো জাতি নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতো, যেমনটা আদ ও সামূদ

জাতি ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের কারণে অনেকেই বেঁচে থাকে, বন্দী হয়, তাওবাহ করার সুযোগ পায়। বানী ইসরাঈল এবং মুহাম্মাদ ﷺ এর উম্মাতের পরিমাণ এত বেশি হওয়ার এটাও একটা কারণ।

... আল্লাহ যদি মানবজতির একদলকে আরেকদল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে গির্জা, ইবাদাতখানা, উপাসনালয় ও মাসজিদসমূহ ধ্বংস হয়ে যেতো, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। ... [সূরাহ আল-হাজ্জ (২২):৪০]

.

কিন্তু পৃথিবী তো গরীব মানুষে ভর্তি। আল্লাহ তাদেরকে এমন দুঃখ-কষ্টে কেন রাখেন? প্রথমে আমরা দেখি আল্লাহ কেন একটা শ্রেণীহীন সমাজ সৃষ্টি করলেন না, কেন এককে অপরের উপর বৈষয়িক উন্নতি দান করলেন।

.

তারা কি আপনার পালনকর্তার রহমত বণ্টন করে? আমিই তাদের পার্থিব জীবনে তাদের জীবিকা বণ্টন করেছি। আর তাদের একজনের উপর আরেকজনের (বৈষয়িক) মর্যাদা সমুন্নত করেছি যাতে তারা একে অপরকে সেবক হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। ... [সূরাহ আয-যুখরুফ (৪৩):৩২]

.

এটাই একটা বাস্তবমুখী সমাজব্যবস্থা যেখানে কেউ হবে বড় ব্যবসায়ী আর কেউ গাড়ির ড্রাইভার। প্রতিটা হালাল পেশার মানুষ একে অপরকে সেবা প্রদানের একটা নেটওয়ার্ক তৈরি করে সমাজটাকে টিকিয়ে রাখে। এটা কোনো অবিচার নয়। অবিচার তখনই হতো যদি ব্যবসায়ী এক রাকআত সালাত পড়ে ড্রাইভারের চেয়ে বেশি সাওয়াব পেতো। কিন্তু তা তো হয় না। বরং আখিরাতে জান্নাতের উচ্চতর স্তর লাভের প্রতিযোগিতায় ড্রাইভারেরও সুযোগ আছে ব্যবসায়ীকে ছাড়িয়ে যাওয়ার।

... কিন্তু তারা যা জমা করে, তার চেয়ে তোমার প্রতিপালকের রহমত উত্তম। [সূরাহ আয-যুখরুফ (৪৩):৩২]

.

তারপরও কথা থেকে যায়। পৃথিবীতে তো আমরা দেখছি ধনী আরো ধনী হচ্ছে, গরীব আরো গরীব হচ্ছে। পেটে খাবার না থাকলে মানুষ ধর্মকর্ম করবে কখন?

.

অন্ধ লোকেদের হাতি দেখার গল্প নিশ্চয় জানেন আপনারা। একেকজন হাতির একেক অঙ্গ ধরেছিলো। ফলে কান ধরে কেউ ভাবলো হাতি হচ্ছে কলাপাতার মতো, কেউ পা ধরে ভাবলো গাছের কাণ্ডের মতো, কেউ লেজ ধরে ভাবলো সাপের মতো। ইসলামকে আমরা খণ্ডিত করে দেখার একটা অভ্যাস গড়ে তুলেছি। উদাহরণ দেওয়া যাক।

.

নারী-পুরুষের আচার আচরণের ব্যাপারে ইসলাম কেমন? এমনটা ভাবতেই আমাদের মাথায় ভেসে ওঠে নেকাব পরা ভূতের মতো কিছু মহিলা ঘুরে বেড়াচ্ছে, চার বউওয়ালা হুজুররা দোররা মেরে আর পাথর নিক্ষেপ করে মানুষ মেরে ফেলছে। আসলে এগুলো হলো আমাদের ওই খণ্ডিত চিন্তার ফল। নারী-পুরুষের দৃষ্টি অবনমন, পোশাকের পর্দা, মাহরাম-গায়র মাহরামের বিধান, দ্রুত বিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহের বৈধতা, দেনমোহর, ব্যভিচারীর শাস্তি ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয় মিলে হলো ইসলামে নারী-পুরুষের আচরণের পূর্ণাঙ্গ বিধান। এই সব বিষয় থেকে প্রসঙ্গ ছাড়া একটা বিষয় আলাদা করে এনে যখন আমরা দেখি, তখনই এর সামগ্রিক সৌন্দর্যটাকে আমরা মিস করে যাই। আর ইসলামকে ভাবি বর্বর, অবাস্তব কোনো জীবনব্যবস্থা। শুধু ইসলাম না; যেকোনো মতাদর্শ, যেকোনো দর্শন, যেকোনো সিস্টেম বা যেকোনো সংবিধানকেই এভাবে খণ্ডিতভাবে দেখে সেগুলোকে বর্বর বানিয়ে তোলা সম্ভব।

.

ধনী-গরীবের পার্থক্যের ব্যাপারেও ইসলাম এরকমই সামগ্রিক বিধান দিয়েছে। সেই বিধানের প্রতিটা পার্টস যদি সিনক্রোনাইজড উপায়ে একসাথে কাজ না করে, তাহলেই পুরো মেশিনে সমস্যা দেখা দেয়। সুদ নিষিদ্ধকরণ, যাকাতের ফরয বিধান, সদকা,

লেনদেনের বিস্তারিত ফিক্বহ, জিযিয়া ইত্যাদি অনেকগুলো বিষয় মিলে তৈরি হয় ইসলামের অর্থনীতি বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ কাঠামোটা। আমাদের উপর আল্লাহপ্রদত্ত দায়িত্ব হলো এই কাঠামোটাকে বাস্তবে রূপদান। আল্লাহর ইচ্ছায় এই কাজটা করেছেন বলেই রাসূলুল্লাহ ﷺ, সাহাবাগণ (রাদ্বিয়াল্লাহু 'আনহুম) ও অন্যান্য নেককার শাসকগণ ধাপে ধাপে এমন একটা সমাজ গড়ে তুলেছিলেন, যেখানে যাকাত নেওয়ার মতো লোক পাওয়া দুষ্কর হয়ে গিয়েছিলো।

.

পূজার প্রতিমা বানাতেও তো কারো না কারো কর্মসংস্থান হয়। শহীদ মিনারে দেওয়ার জন্য ফুল আর ঈদের দিনে ফুটানোর জন্য পটকা বেচলেও কর্মসংস্থান হয়। সুদের কারবার করেও তো পেট চালানো যায়। কোনোটাকে তো সে অর্থে অপচয় বলা যাচ্ছে না। কিন্তু আল্লাহ যেসব জায়গায় খরচ করতে নিষেধ বা নিরুৎসাহিত করেছেন এবং যেসব জায়গায় খরচ করতে আদেশ বা উৎসাহিত করেছেন, তার অন্যথা করতে গেলে সামগ্রিক সিস্টেমটাতে অনিয়ম শুরু হয়। এই মানবরচিত অনিয়মের অর্থনীতির ফলেই আজকে আটজন শীর্ষ ধনী ব্যক্তির মোট সম্পদের পরিমাণ পৃথিবীর মোট সম্পদের অর্ধেক। ইসলাম কাউকে হয়তো এরকম ধনকুবের বানায় না। কিন্তু ধনী-গরীবের এই রাক্ষুসে পার্থক্যটাও তৈরি হতে দেয় না।

.

তাই আজকে যে আমরা মানুষকে না খেয়ে মরতে দেখি, এর জন্য আল্লাহকে দোষ দিয়ে লাভ নেই। আমরাই আল্লাহর বিধান লঙ্ঘন করে তাদের এসকল দুঃখ-কষ্টের কারণ হয়েছি।

.

পুরোটাকে সামারাইজ করলে দাঁড়ায় যে, বিভিন্নরকম দুঃখ-কষ্টের কারণ বিভিন্ন; এবং দুঃখ-কষ্টের অস্তিত্ব আল্লাহর অনস্তিত্বের প্রমাণ নয়। আশা করি আমরা কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছি। আল্লাহ আমাদের সকলকে দুনিয়া ও আখিরাতের সাফল্য দান করুন।

১৮৩

আল্লাহর অস্তিত্ব ছাড়া বাদবাকি সব ব্যাখ্যাই যৌক্তিক!

-ড্যানিয়েল হাক্কিকাতজু, অনুবাদ: সত্যকথন ডেস্ক

নাস্তিক এবং প্রকৃতিবাদীরা (naturalist) আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার জন্য উদ্ভট সব তত্ত্ব হাজির করে। তাদেরকে যদি প্রশ্ন করা হয় -

- আমাদের চারপাশের এ জগত কি এলিয়েন বা অন্য গ্রহের প্রাণীদের বানানো কোন কম্পিউটার সিমুলেশন?

: হতে পারে!

- আমাদের এ চেনা বিশ্ব কি এরকম অগণিত অসংখ্য বিশ্বের মধ্যে একটি মাত্র? ব্যাপারটা কি এমন যে আমাদের এ বিশ্বের মতোই অসংখ্যা মহাবিশ্ব আছে (Multiverse), তবে সেগুলোর অস্তিত্ব প্রমাণ বা সনাক্ত করা সম্ভব না?

: যুক্তিসঙ্গত মনে হচ্ছে।

- মহাবিশ্ব কি বিশাল এবং সুসংঘটিত কোন চেতনা (consciousness) যা নিজেই নিজেকে নিয়ন্ত্রন করে?

: হতে পারে।

- কিংবা মহাবিশ্ব কি কোন উন্নত শ্রেণীর অশরীরী এলিয়েনের একটি রূপ মাত্র?

: কুল ! অসাধারণ! এমন তো হতেই পারে।

- মহাবিশ্ব কি কোন সর্বশক্তিমান সত্ত্বার সৃষ্টি?

: কিসব অযৌক্তিক কথাবার্তা। এটা কি প্রস্তর যুগ? আপনি তো দেখা যাচ্ছে রূপকথায় বিশ্বাস করেন।

.

প্রশ্ন হল পৃথিবীর বিখ্যাত বিজ্ঞানীরাই বা কেন এধরনের কষ্টলিপ্ত, অদ্ভুত থিওরী তুলে ধরছেন ?

.

কারন তারা খুব ভালমতই জানে শুধুমাত্র বস্তুবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে মহাবিশ্ব সৃষ্টির রহস্য উদ্ঘাটন করা সম্ভব নয়। এসব ব্যাখ্যা সন্তোষজনকও না। কেবল প্রাকৃতিক ব্যাখ্যা (naturalist explanation) দিয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও বড় প্রশ্নগুলোর উত্তর দেয়া যায় না। মহাবিশ্বের গঠন বৈশিষ্ট্যের কারণে তারা এটা স্বীকার করতে বাধ্য হয় যে এটা সকল বিচারে একে পরিকল্পিত ভাব সৃষ্ট বলেই মনে হয়। যেন এ মহাবিশ্বের সৃষ্টির পেছনে কোন উদ্দেশ্য এবং তার পেছনে কোন বুদ্ধিমান সত্ত্বার সংকল্প (Will) আছে।

.

কিন্তু যখন কেউ এটা স্বীকার করে নেয় তখন আদতে সে যার কথা ভাবছে সেই স্বত্বাটি যে আল্লাহ এটাই তারা স্বীকার করতে রাজি না। তাই তারা এলিয়েন, কম্পিউটার সিমুলেশন, মাল্টিভার্সের মত অযৌক্তিক গল্পের আমদানি করে, যেগুলো কিনা প্রকৃত বিজ্ঞান বা বস্তুবাদ থেকেও অনেক দূরে। হয়ত একদিন নিজেরাই সেই সত্যকে উন্মোচিত করবে যা গোপন রাখার জন্য তারা দিনরাত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

১৮৪

'সাইকোসিস'

-মোঃ মশিউর রহমান

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

.

: " Finally!!

এতক্ষণে আসার সময় হলো? তোমার কি বিন্দু পরিমাণ ধারণা আছে, যে just how irritating it is-- শুধুশুধু হাত-পা গুটিয়ে বসে থেকে তোমাকে উঠবস করতে দেখা?"

- " কিছুটা দেরী হলেও- আসলাম তো, নাকি? কারও ধৈর্যধারণ ক্ষমতা কম হলে সেটা তো আর আমার দোষ না।

আর fyi, যেটাকে তুমি "উঠবস" করা বলে ভুল ধারণা করেছো -সেটা আসলে নামায ছিল- আমি নামায পড়ছিলাম। "

.

: " উঠবস, নামায -same difference!

কথা হলো যে আমাকে অযথা বসিয়ে রাখা হয়েছে। একে তো এতো ভীড় সর্বত্র -দমবন্ধ হয়ে আসে কোথাও যেতে চাইলে। মনে হয় যেন জনসংখ্যার কোন বম্ব ব্লাস্ট হয়েছে, যার ক্রেডিট যায় তোমাদের মোল্লা শ্রেণীর মানুষদের প্রতি।

তার পরেও এত মানুষের ভীড় ঠেলে যে এখানে আসলাম, সেখানেও কোন কারণ ছাড়াই বসিয়ে রাখা হলো।

Just how?

মানবিকতার ইতিহাসের চরম উৎকর্ষের যুগে আর কত নিচে নামতে পারো তোমরা অসামাজিক মানুষেরা? "

- " প্রথম কথা হলো, এখানে আসার জন্য কেউ তোমাকে জোর করে নাই; তুমি নিজের ইচ্ছাতেই আসছো। So don't try to play victim -ওইসব করে কাউকে বোকা বানানোর আশা ছেড়ে দাও।

আর দ্বিতীয় কথা হলো, জনসংখ্যার তথাকথিত "বিস্ফোরণ" মুসলিমদের ফল্ট কীভাবে হলো? কোন ভিত্তি-ও কি আছে এটা বলার, নাকি জাস্ট "মুখ আছে তাই বলে দিলাম" -টাইপ ব্যাপার? "

.

: " অবশ্যই ভিত্তি আছে! আমি একজন বিজ্ঞানমনস্ক মানুষ। তুমি কি মনে করো আমি কোন প্রমাণ ছাড়াই তোমাদের মত আষাঢ়ে গল্প ফেঁদে বসবো? "

- " এছাড়া তো আর কিছু আজ পর্যন্ত কিছু করতে দেখলাম না; but sure, go ahead... "

.

: " যত্তসব ফালতু কথাবার্তা! তুমি কি জানো, তোমার এই একটা কথার কাউন্টারই আমি হান্ড্রেড ডিফরেন্ট ওয়েজে করতে পারি?

কিন্তু আমি করবোনা, কারণ আমি একজন সেনসিবল পার্সন- unlike you।

বেহুদা ও ফালতু কথাবার্তা আমি পছন্দ করি না। "

- " yet I find you here, on every other day- making "বেহুদা" accusations, and asking "ফালতু" questions। "

.

: " ...আমি জানি তোমার উদ্দেশ্য কী। তুমি চাইছো আমাকে উত্তেজিত করে তুলতে, যাতে আমি কোন কিছুতে গড়বড় করি আর

তুমি তার ফায়দা নাও।
কিন্তু sorry to dissapoint you, তা হবে না। আমি আমার বক্তব্য রাখবোই, তা তোমার পছন্দ হোক বা না হোক। "
- " ওয়েল, এতক্ষণ ধরে তোমার বক্তব্যেরই অপেক্ষা করছি, সময় কি হয় নাই সেটার এখনো? "

.

: " শোনো তাহলে। আমার মতে জনসংখ্যার এত আধিক্যের পেছনে তোমাদের হুজুরগোষ্ঠীর হাত আছে। কুসংস্কারে ভরা এই সমাজকে আরও অন্ধকারে ঠেলে দিতে তাদের জুড়ি নেই। "
- " কীভাবে? "

.

: " কীভাবে?!
তোমরাই না বলে বেড়াও, "মুখ দিছেন যিনি, আহার দিবেন তিনি"? তোমরাই না জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রোপাগান্ডা চালাও -তা গ্রহণ না করার জন্য?
তোমরাই না "দুটি সন্তানের বেশি নয়, একটি হলে ভালো হয়" -এর মত গণসচেতনতামূলক ক্যাম্পেইনের বিরোধীতা করো?
তোমরাই না প্রচার করে বেড়াও, যে তোমাদের নবী নাকি তোমাদের অধিক সংখ্যা নিয়ে গর্ব করবে -তাই যত পারো জনসংখ্যা বাড়াও? "
- " ভালো ডেটা কালেক্ট করেছো। আরও কিছু... "

.

: " কোন কথাই বোলো না আর। "
মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললো।

: " তোমাদের আর কাজ কী? শুধু খাওদাও, ঘুরে বেড়াও, আর বছর বছর খালি বাচ্চা পয়দা করো -যার প্রভাবটা পড়ে গোটা সমাজের ওপর।
নিয়ন্ত্রণহীন জনসংখা একটা সমাজ, একটা রাষ্টের ওপর কোন লেভেলের ডেভেস্টেটিং আর্থ-সামাজিক প্রভাব ফেলে -কল্পনাও করতে পারো?
তোমাদের স্রষ্টা যদি এতই জন্মনিয়ন্ত্রণের বিপক্ষে হোন, তার নবীর জনসংখ্যা নিয়ে গর্ব করাকে যদি অ্যাপ্রুভই করেন -তাহলে কেন এমন দুনিয়া বানালেন, যেখানে সেই বিশাল পরিমাণ জনসংখ্যা একটা সমস্যা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করবে?
নাকি তার জানা ছিল না, যে এই জনসংখ্যা বিস্ফোরণ সাসটেইন করার জন্য- তারই বানানো দুনিয়া যথেষ্ট হবে না?
যে সেটিতে ভূমির পরিমাণ সীমিত হবে, যাবতীয় রিসোর্স সীমিত হবে?
ঠিক কোন লেভেলের হিপোক্রিসি এটা? "

.

- " Well that was something, while it lasted...!! "
হাহা করে হেসে উঠে বললো।

.

: " হাসা ছাড়া আর কী-ই বা বলার আছে তোমার? আমি জানতাম তো, যে যুক্তিতে না পেরে উঠলে সারকাজমের দিকে ঝুঁকবে -এটাই তো একমাত্র ডিফেন্স মেকানিজম তোমাদের, আর কী পারো তোমরা? "
- " আচ্ছা, সেসব কথা থাক। আমাকে বলো তো, কখনো “ নেফ্রন ” নামের কিছুর কথা শুনেছো? "

.

: " শুনি কিংবা না-ই শুনি, তার সাথে আমার বক্তব্যের কানেকশনটা কী?
ডানেবাঁয়ে না কেটে সোজা পয়েন্টে আসো, যদি পারো। "

- " আহা, এত অস্থির হলে কীভাবে হবে? তারচেয়ে আসো চা খাই। খাবে নাকি এককাপ? "
বলে ঘরটির দেয়ালের এককোণের দিকে তাকালো।
- " কী বলো? করা যাবে নাকি ব্যবস্থা, D? "

.

: " এই D -টা কে, যার সাথে প্রায়শই দেখি তুমি কথা বলতে থাকো? তোমার তথাকথিত গড, নাকি কোন ইমাজিনারি ফ্রেন্ড? "
- " নাহ, D কেবলমাত্র একজন অবজার্ভার। He's not always there and listening though, তবে মাঝেমধ্যে সে থাকে। সেজন্যেই কখনো কখনো জবাব পাই, আবার কখনো পাই না।

.

: "ফালতু বকবাকানি রাখো। নের্ফন না কীসের যেন কথা বলতেছিলে? সেটা আগে ক্লিয়ার করো। "
- " (দীর্ঘশ্বাস ফেলে) ঠিক আছে। "
দেয়ালের দিক থেকে ঘুরে বসলো।

.

.

- " নেফ্রন- not নের্ফন, fyi- হলো কিডনীর গাঠনিক একক। একটি দেহ যেমন অনেকগুলো কোষ দিয়ে গঠিত, একটি কিডনীও তেমনিভাবে অনেকগুলো নেফ্রন দিয়ে গঠিত। "
: " তো? কাজের কথায় আসো। "

.

- " তোমার আসলেই ধৈর্য্যের বড় অভাব, জানো? "
ঠং ঠং করে দরজায় দুইবার শব্দ হলো।
তার কিছু পরেই অপরপাশ থেকে কেউ একজন দরজার নিচের দিকের চারকোণা খোপের মত অংশটা দিয়ে মাঝারি মাপের একটা থার্মোমগ ভেতরে ঠেলে দিলো।

.

: " কী ওটা? "
- " কী আবার? চা। কার্টেসি অফ D।
খাবে না?"

.

: " তার আগে যা বলতেছিলে তা শেষ করো। নেফ্রন কিডনীর গাঠনিক একক -তো কী হয়েছে? "
- " তো যা হয়েছে, "
মগের ঢাকনাটা খুলে চায়ে চুমুক দিলো।
- " তা হলো এই নেফ্রনের সংখ্যা।
একটি কিডনীতে গড়ে প্রায় ১০-১২ লক্ষ, অর্থাৎ ১-১.২ মিলিয়ন নেফ্রন থাকে। প্রতিটা নেফ্রন আবার ৩ সেন্টিমিটার করে লম্বা। তাহলে যদি নেফ্রনের মোট সংখ্যা ১ মিলিয়নও ধরে নেওয়া হয়, তাহলে জানো একটা কিডনীতে থাকা সমস্ত নেফ্রনের মোট দৈর্ঘ্য কত হবে? "

.

: " কত? "
- " ৩০ কিলোমিটার! আর ১২ লক্ষ হিসেবে নিলে হবে তা ৩৬ কিলোমিটার!
কিন্তু আসল টুইস্টটা কোথায় জানো? আসল ইন্টারেস্টিং ব্যাপারটা হলো কিডনীর সাইজে- যা হলো মাত্র ১০-১২ সেন্টিমিটার! "
আরেকবার চুমুক দিয়ে মগটা নামিয়ে রাখলো।

- " চিন্তা করতে পারো, ৩০-৩৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একসারি নেফ্রন মাত্র ১০-১২ সেন্টিমিটারের একটা কিডনীতে দেওয়া আছে?!! "

.

: " এই হলো তোমাদের সমস্যা, সবকিছুতেই মিরাকল খুঁজতে যাও। "

মগটা তুলে নিয়ে চুমুক দিয়ে বললো।

: " এভাবে দেখতে গেলে রাত-দিনের আবর্তনটাকেও মিরাকল লাগা শুরু করবে। "

- " অবশ্যই লাগবে! আর লাগাটাই স্বাভাবিক।

কারণ এ সমস্ত মিরাকলের মাধ্যমেই মালিকুল মুলকের মহত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব, বড়ত্ব পরিস্ফুটিত হয়ে ওঠে -কেবলমাত্র দেখার মত চোখ, আর উপলব্ধি করার মত বাস্তবিক অর্থেই একটা “ মুক্তমন ” থাকা লাগে। "

.

: " আসল কথায় আসো। What's your point? "

- " আমার পয়েন্টে আসার আগে আরেকটা ফান ফ্যাক্ট ইনক্লুড করা যাক। "

.

: " Now what?!! "

খটাশ করে মগটা নামিয়ে রাখলো।

- " আহহা, নিজের ফ্রাস্ট্রেশন এভাবে জড়বস্তুর ওপরে অ্যাপ্লাই করে কী লাভ? "

মগটা তুলে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখলো।

- " আর এদিকে আমি আরও ভাবতেছিলাম যে you were supposed to be “ বিজ্ঞানমনস্ক ”। "

.

: " আর কতবার বললে কানে দিয়ে কথাটা যাবে?

Just get to point already!! "

- " আচ্ছা ঠিক আছে। তো যা বলছিলাম, আরেকটা ফান ফ্যাক্ট।

তো কথা হলো, একটা পূর্ণাঙ্গ মানবদেহে কোষের পরিমাণ জানো কত? ~৩৭.২ ট্রিলিয়ন, যেখানে ১ ট্রিলিয়ন হয় ১০০০ বিলিয়নে।

তো এই বিশাল সংখ্যক কোষের প্রত্যেকটিতেই DNA আছে -কারেক্ট? "

.

: " হুম, কারেক্ট। কারণ আমি যতদূর জানি, DNA ছাড়া নাকি দেহের কোন কাজই হবে না। "

- " এক্সাক্টলি। এখন কিডনী যেমন নেফ্রন দিয়ে গঠিত, এই DNA-ও আবার তেমন নিউক্লিওটাইড নামক গাঠনিক একক দিয়ে গঠিত -যা থাকে জোড়ায় জোড়ায়। "

সুড়ুৎ করে চায়ে চুমুক দিয়ে বললো।

- " অর্থাৎ ১টা নিউক্লিওটাইড পেয়ার বলা মানে সেখানে আসলে ২টা নিউক্লিওটাইড আছে। এখন আসল মজাটা ঠিক এখানেই। একটা কোষের DNA-তে ৩০০ কোটি বা ৩ বিলিয়ন এমন নিউক্লিওটাইড পেয়ার্স থাকে! তাহলে বলতে পারো, তাদের প্রকৃত সংখ্যাটা কত দাঁড়ালো? "

.

: " ৩ বিলিয়ন পেয়ার্স, তারমানে ৬ বিলিয়ন সিঙ্গল নিউক্লিওটাইড? "

- " এক্সাক্টলি! একটামাত্র কোষেই এতগুলো নিউক্লিওটাইড, তাহলে কল্পনা করতে পারো গোটা দেহের কোষ মিলিয়ে কতগুলো হবে? "

মগটা নামিয়ে রেখে বললো।

.

: " হুম, অনেক। "

মগটা তুলে চুমুক দিয়ে বললো।

- " আর যদি এই সবগুলো নিউক্লিওটাইডকে একের পর এক বসাতে থাকা হয়, তাহলে দৈর্ঘ্যটা কত দাঁড়াবে জানো?
৬৭ বিলিয়ন মাইল -যা প্রায় ৭০ বার সূর্যে আসা-যাওয়ার সমপরিমাণ দূরত্ব!!
মাথা নষ্ট করার মত ব্যাপার না?! "

.

: " Well, that's a lot of numbers। কিন্তু আমার এখনো বুঝে আসতেছে না যে তুমি কী বুঝাতে চাচ্ছো, আর আমি যা যা বললাম সেগুলোর সাথেই বা এগুলোর সম্পর্ক কোথায়? "

- " আমি জাস্ট এটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে তুমি কি সত্যি-ই বিশ্বাস করো, যে a SUPREME BEING -capable of feats of this caliber -এমন এক দুনিয়া বানাবেন,
যেখানে তিনি রিযিক্ব ও দারিদ্র্যের ভয়ে শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করে[*] পরবর্তীতে তাদেরই স্থানসংকুলান করতে পারবেন না? "

.

.

: " কী বলতে চাও তুমি? "

ভ্রূ কুঁচকে চায়ের মগটি নামিয়ে রাখলো।

.

- " বলতে চাই না, আমি বলছি! "

এতক্ষণ আটকে থাকা মগটাকে সুযোগ পেয়েই ছোঁ দিয়ে তুলে নিয়ে বললো।

- " তুমি কি জানো পুরো পৃথিবীর লোকসংখ্যা কত?
৭ বিলিয়ন। "

.

: " একচুয়ালি তা আরও বেশি, ভাল করে জেনে কথা বলো। "

- " আমি জানি তা আরও বেশি, 7.6 billion as of October 2017।
আমি ভগ্নাংশ বাদ দিয়ে হিসাব দেখাতে চাচ্ছিলাম, যাতে বুঝতে সুবিধা হয়।
'Cause I'm not so sure if you're gonna be able to grasp the following calculations -even withouth the fractions... "

.

: " মানে?!! "

- " মানে আমি খুব একটা আশাবাদী নই যে ভগ্নাংশ ছাড়া করা হিসাবও তোমার বুঝে আসবে কিনা। "

.

: " I know what it means you uncultured, medieval psychopath!!! "

খেঁকিয়ে উঠে বললো।

: " আমি বলছি যে কী বুঝাতে চাও তুমি এ কথার মাধ্যমে?! "

.

- " সেটাই বুঝাতে চাই -যেটা তুমি বুঝেছো। আর যেভাবে তুমি রিঅ্যাক্ট করলে- তাতে বুঝতে অসুবিধা হয় না, যে তুমিও জানো আমার কথা সঠিক। "

একগাল হাসি নিয়ে আবারও দেয়ালের সেই কোনার দিকে তাকালো।
- " ঠিক কিনা, D? "

.

.

: " আমি এখানে তোমার ইমাজিনারি অবজার্ভারের সাথে খোশগল্প করা দেখতে আসি নাই, you understand?!
কাজের কথায় আসো!!! "
- " চেঁচালেই কি সব সমাধান হয়ে যায়? "
দেয়ালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বললো।
- " তবে যাই হোক, আসল কথায় আসি। তো, ওয়ার্ল্ড পপুলেশন রাউন্ড ফিগার হিসেবে ধরে নেওয়া যাক ৭ বিলিয়ন। এখন আমি যদি বলি, যে এই ৭০০ কোটি মানুষকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ এলাকায়ই সাসটেইন করা সম্ভব -এবং তাও খুব ভালভাবেই সম্ভব, তাহলে? "

.

: " যে জিনিসের কোনরকমের ভিত্তির ভ-ও নাই, তা বলা আর না বলায় কী আসে যায়?
জনসংখ্যার চাপে সবার দম আটকে যোগাড়, আর এ আসছে পুরো ওয়ার্ল্ড পপুলেশনকে একাই একটা নির্দিষ্ট এলাকায় ধরিয়ে ফেলতে।
৭০০ কোটি বলতে যে ঠিক কত বোঝায় -তার কোন আইডিয়াও কি আছে কুয়ার ব্যাঙ কোথাকারের? "
- " জানতাম যে এমনই কিছু একটা রিঅ্যাকশন পাবো। আচ্ছা শুনো তাহলে, আমি যা বললাম তা অবশ্যই সম্ভব; পুরো পৃথিবীর জনসংখ্যাকে কেবল আমেরিকার এক টেক্সাস স্টেটেই জায়গা দেওয়া সম্ভব, তাও যথেষ্ট ফ্যাসিলিটিসহ। "

.

: " ওয়াও। কল্পকাহিনী আর কত চালাবে? শুনি তাহলে, কীভাবে সম্ভব? "
- " আচ্ছা, ধরো যদি ৭ বিলিয়ন লোকসংখ্যাকে ফর এক্সাম্পল- ৪ জন মানুষের একটা পরিবার হিসেব করে ভাগ করা হয়- তাহলে পুরো বিশ্বে মোট পরিবারের সংখ্যা দাঁড়ায় ১.৭৫ বিলিয়ন পরিবার।
এখন যদি আসি টেক্সাসে, তাহলে দেখা যায় যে আমেরিকার এই স্টেটটির টোটাল এরিয়া হলো ৬,৯৬,২৪১ বর্গ কিলোমিটার, অথবা ৭,৪৯৪.২৮ বিলিয়ন স্কয়ার ফীট।
তাহলে যদি ১.৭৫ বিলিয়ন পরিবারকে যদি এই একটা স্টেটেই সাসটেইন করা হয়, তাহলেও প্রত্যেকটা পরিবার (৭,৪৯৪.২৮ ÷ ১.৭৫) অর্থাৎ প্রায় ৪,২৮২.৪৫ স্কয়ার ফীটের জায়গা পাবে। "

.

: " কিন্তু...(খক খক করে কাশতে শুরু করলো),
কিন্তু ৪,২৮২.৪৫ স্কয়ার ফীট আর কতটুকুই বা হয়? গাদাগাদি করিয়ে, একজনের ওপরে আরেকজনকে উঠিয়ে রাখার মত কথা সাজেস্ট করছো ইডিয়টের মত? "
- " Really? Are you being serious right now?
তুমি কি জানো, যে ৩৫০০ স্কয়ার ফীটের বেশি জায়গার ওপর তৈরী করা যেকোন বাড়িই যেন একেকটা শো-পিস হিসেবে গণ্য করা হয়?!
সেখানে ৪০০০ স্কয়ার ফীটের ভেতরে ৫টা বেডরুম, ৩-৩.৩৫টা বাথরুম, ৩টা গ্যারেজের একটা ২ তলা বাড়ি দাঁড় করানো সম্ভব, আর হিসাবে তো এর চেয়েও প্রায় ৩০০ স্কয়ার ফীট বেশি পাওয়া যাচ্ছে!!
সাথে আপ-টু-ডেট কিচেন, হাই স্ট্যান্ডার্ডের লিভিং রুম তো আছেই। আর এর বাইরেও এক্সট্রা ফ্যাসিলিটিস যেমন স্টাডি, মিডিয়া রুম ইত্যাদির কথা আর না-ই বা বলি। "
এতক্ষণ ধরে একটানা কথা বলায় ঠান্ডা হয়ে যাওয়া চায়ের মগ নামিয়ে রেখে বললো।

- " আর এর সবই পুরো ওয়ার্ল্ড পপুলেশনের প্রত্যেকটা মানুষকে প্রোভাইড করা সম্ভব, তাও কেবলমাত্র আমেরিকার একটামাত্র স্টেটে রেখেই।
এর বাইরে তো শুধু আমেরিকারই আরও ৪৯টা স্টেট, ১টা ফেডারেল ডিস্ট্রিক্ট, ৫টা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল এবং বিভিন্ন অধিকারভুক্ত এলাকা পড়েই রয়েছে;
আর পুরো পৃথিবীর কথা তো বাদই দিলাম। "

.

.

: "......."
- " আসল সত্যটা হলো মালিকুল মুলক তার আবদ -এর জন্য শুধু এক পৃথিবী বানিয়েছেন,
কিন্তু যুগে যুগে একে " Divide and rule" -এর মত অগণিত এজেন্ডা নিয়ে খন্ড-বিখন্ড করেছে স্বার্থান্বেষী কুফফার ও মুনাফিকেরা; জাতের নামে, বর্ণের নামে, ভাষার নামে।
কাল্পনিক কিছু রেখা এঁকে দিয়ে বোঝানো হয়েছে যে এপাশের এটা তোমার দেশ, আর ওপাশের ওটা হলো বিদেশ।
যার কারণে দেখা যায় একই সীমানার একপাশে যখন মানবজন্ম রোধে ক্যাম্পেইন চালানো হয়, আইন বানানো হয়;
অন্যপাশে তখন জনসংখ্যা বাড়ানোর জন্য ক্যাম্পেইন চালানো হয়, ভাতা ও পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।
আর এসবের সাথে জনসংখ্যা সমস্যা কিংবা বিস্ফোরণের মত কিছু বুলিসর্বস্ব টার্ম গুলিয়ে খাইয়ে দেওয়া হয়েছে চিনির মত, যাতে করে তার মিষ্টি স্বাদের আড়ালে সমগ্র বিশ্ব ও তার সম্পদের ভান্ডারকে কুক্ষিগত করে রেখে কলকজা নাড়ানো যায়। "

.

.

: " ...আসলে, এহেম..আমার আসলে যাওয়া প্রয়োজন। দেরী হয়ে যাচ্ছে। "
- " কী কাজে? আরও কিছু মতবাদ খুঁজে বের করে নিয়ে আসার জন্য? "
হেসে উঠে বললো।

.

: "......."
- " জবাব নেই কেন? আরে দাঁড়াও দাঁড়াও, আমিও যাবো। তবে তার আগে একটা কথা বলে আসি। "

.

- " হ্যালোওওও, whadup dude!!
আজকে কী মনে হলো? এক্সপেক্টেশন পূরণ হয়েছে নাকি, D?
Or would you rather prefer me saying..."
পুনরায় সেই দেয়ালের কোনার দিকে তাকিয়ে হাসিমুখে গলা চড়িয়ে কথা বলতে শুরু করলো।

.

.

.

ক্রিং ক্রিং!!

.

কম্পিউটার স্ক্রীনের সামনে বসে থাকা ল্যাবকোট পড়া মধ্যবয়সী লোকটা পকেট থেকে মোবাইল ফোনটা বের করলেন, তার আগে স্ক্রীণে থাকা টাইমারটা এক ঝলক দেখে নিলেন।

.

: " স্যার, আপনাকে কেবিনে না পেয়ে ফোন দিলাম। ৬ নং বেডের পেশেন্ট আবারো ভায়োলেন্ট ফেইজে চলে গেছে, আপনাকে

আসার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
বাই দা ওয়ে, এই মুহূর্তে আপনি কোথায় আছেন? "
- " ডিআইডি উইংঙে। "
: " (ওপর প্রান্তে থাকা ব্যক্তিটি হেসে দিলো) আবারও সাবজেক্ট ২৭ স্যার? "
.
.
// হ্যালোওওও, wadup dude!! //
.
জবাবে কিছু একটা বলতে গিয়ে বাধা পেলেন মাঝবয়সী লোকটি।
মনিটর থেকে হাই ভলিউমে কথা আসছে।
.
//আজকে কী মনে হলো? এক্সপেক্টেশন পূরণ হয়েছে নাকি, D?
Or would you rather prefer me saying your full designation, Doctor? //
.
হেসে দিলেন ল্যাবকোট পড়া লোকটি।
যে মানুষ সিসিটিভি ক্যামেরার সিক্রেটলি ইন্সটল করার নতুন পজিশন আধাদিনের মাথায়ই খুঁজে বের করে ফেলতে পারে, তার ছোট্ট একটা চালাকি মিস করে ভুল করে ফেলেছেন তিনি।
.
যদিও প্রায় সময়েই যখন তিনি একে পর্যবেক্ষণ করেন, চেষ্টা করেন যেন সে টের না পায়।
কিন্তু আজ সে বুঝে গেছে, যে তিনি মনিটরের সামনে বসা আছেন।
কারণ তিনি এত গভীর মনোযোগের সাথে সবকিছু দেখছিলেন, যে আগেপিছে কিছু না ভেবেই হুট করে তিনি ওর চা -এর রিকোয়েস্টে সাড়া দিয়ে ফেলেছিলেন।
.
কে জানে, হয়তোবা এটাও এর একটা ট্রিক ছিল।
তাঁর অ্যাটেনশন সম্পূর্ণরূপে অন্যদিকে নিয়ে সাবকনশাসলি তাঁকে দিয়ে কাজটা করিয়ে নিয়েছে।
.
যার ফলে ঠিক এই মুহূর্তে হিডেন সিসিটিভি ক্যামেরার মধ্য দিয়ে স্ক্রীণের ওপর একগাল হাসি নিয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছে একই দেহে ১৯টি ভিন্ন ভিন্ন আইডেনটিটি বহন করা এ পেশেন্টটি,
এই মেন্টাল অ্যাসাইলামের ডিসোসিয়েটিভ আইডেনটিটি ডিসওর্ডার উইংঙের notorious সাবজেক্ট ২৭।
.
.
- " হ্যাঁ, ঠিক বলেছো। সাবজেক্ট ২৭ -ই। Very interesting case this one, I must say। "
কলারকে বললেন লোকটি।
- " যাই হোক, তোমরা ওই পেশেন্টকে রিস্ট্রেইন করো, সিডেটিভ দাও।
আমি আসছি। "
: " ওকে স্যার, থ্যাংক ইউ। "
.
চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তারটি।

" সামনের দিন থেকে এখানে নিজের পার্সোনাল ইন্টারেস্টস একপাশে সরিয়ে রেখে আরেকটু বেশি অ্যালার্ট থাকতে হবে" - ভাবতে ভাবতে তিনি বের হয়ে গেলেন মনিটরিং রুমটি থেকে।
আর পেছনের মনিটরে দেখা গেল ছোট্ট একটা রুমের মেঝেতে বসে থাকা এক যুবককে- একা একাই কথা বলতে এবং মাঝেমধ্যে হেসে উঠতে।

.

.

.

.

[*]

■...এবং তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা কোরো না, আমিই তোমাদেরকে রিযিক্ব দেই এবং তাদেরকেও।...

- সূরাহ আল-আনআম, ১৫১ -এর অংশবিশেষ

.

■এবং তোমাদের সন্তানদের দারিদ্র্যের কারণে হত্যা কোরো না, আমিই তোমাদেরকে রিযিক্ব দেই এবং তাদেরকেও। নিশ্চয়ই তাদেরকে হত্যা করা জঘন্যতম অপরাধ।

- সূরাহ আল-ইসরা (বনী ইসরাঈল), ৩১

১৮৫

“পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি -২!!” (১ম পর্ব)

-আসিফ আদনান

ফলো দা মানি!

.

ব্রুসঃ

রাইমাররা বিয়ে করেছিল অল্প বয়সে। প্রেগনেন্সির ব্যাপারে যখন জানতে পারলো, তখনো ওরা বিয়ে করেনি। জ্যানেটের বয়স ছিল ১৯, রনাল্ডের ২০। জ্যানেটের সবসময় শখ ছিল যমজ ছেলের যমজ দুই ভাই ব্রুস আর ব্রায়ানের জন্ম ছিল তাই স্বপ্ন সত্য হবার মতো। খুব তাড়াতাড়ি রনাল্ডের দুটো প্রমোশন হল। ছোট্ট এক রুমের অ্যাপার্টমেন্ট থেকে ওরা মোটামুটি বড়সড় একটা ঘরে আসলো। রাইমারদের জীবন সুন্দর ছিল। গৃহিণী মা, পরিশ্রমী বাবা। আর ঘর আলো করে রাখা যমজ দু'ই ভাই। পিকচার পারফেক্ট।

.

ছন্দপতন হল ছ'মাসের মাথায়। ডায়াপার বদলানোর সময় ব্যাপারটা প্রথম চোখে পড়ে। জ্যানেট ভেবেছিল ভেজা ডায়াপারের কারণেই হয়তো ওরা কাঁদতো। কিন্তু দেখা গেল ডায়াপার ছাড়া রাখলেও কান্না থামছে না। প্রস্রাবের সময় সমস্যা হচ্ছে। ডাক্তার জানালেন ওরা দুজনেই ফিমোসিসে ভুগছে। ফিমোসিস গুরুতর কোন সমস্যা না। মোটামুটি কমন। ছেলে বাচ্চারা ফিমোসিসের কারণে ঠিক মতো প্রস্রাব করতে পারে না। খুব বেশি চিন্তিত হবার প্রয়োজন নেই। অধিকাংশ, ক্ষেত্রে ফিমোসিস আপনাআপনিই ঠিক হয়ে যায় তবে সেইফ সাইডে থাকার জন্য সারকামসিশান, অর্থাৎ খৎনা করানোর পরামর্শ দিলেন ডাক্তার। যমজ দু ভাইয়ের ৭ মাস বয়সে তাদের সারকামসিশানের জন্য নিয়ে যাওয়া হয়।

.

সারকামসিশান বা খৎনা হাজার হাজার বছর ধরে চলে আসা খুব সহজ একটি প্রক্রিয়া। ৯৯% চেয়েও বেশি ক্ষেত্রে এতে বড় ধরণের কোন ঝামেলা দেখা যায় না। আমাদের দেশের গ্রামাঞ্চলে বাঁশের চিমটা, ক্ষুর আর কাঁচি দিয়েই খোলা আকাশের নিচে পিড়িতে বসিয়ে সুন্নাতে খৎনা করা হয়। কয়েক মিনিটের মামলা। পশ্চিমা বিশ্বেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পদ্ধতিই ব্যবহৃত হয়। তবে এয়ার কন্ডিশনড হসপিটালের অপারেশান থিয়েটারে, স্টেরিয়ালাইযড ক্ল্যাম্প আর স্ক্যালপেল দিয়ে। ব্রুস আর ব্রায়ানের ক্ষেত্রেও যদি এমনটা হত তাহলে হয়তো আমাদের এ গল্প অন্য কোন ভাবে শুরু করতে হতো। কিন্তু ব্রুস আর ব্রায়ানের অপারেশনের দায়িত্বে থাকা ৪৬ বছর বয়েসী জেনারেল প্র্যাক্টিশানার ডাঃ য'ন মারি স্ক্যালপ্যালের বদলে সেই দিন বোভি কটারি মেশিন ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেন। এ ডিভাইসে একটি ছোট জেনারেটরের মাধ্যমে একটি সূচের মতো ইলেক্ট্রোডের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হয়। বিদ্যুতের প্রবাহের কারণে ইলেক্ট্রোডে যে তাপ উৎপন্ন হয় তার সাহায্যে “কাটা” হয়। একটা ছুরি বা স্ক্যালপেলের সাথে এ ডিভাইসের পার্থক্য হল, এক্ষেত্রে মূলত পোড়ানোর মাধ্যমে “কাঁটা” হয়। এ পদ্ধতির সুবিধা হল তাপের কারণে সৃষ্ট হওয়া ক্ষতের প্রান্তগুলো পুড়ে যেতে থাকে। যার ফলে রক্তনালীগুলোর মুখ বন্ধ হয়ে যায় এবং ব্লিডিং তুলনামূলক ভাবে কম হয়। পদ্ধতিটিকে ইলেক্ট্রো-কটারাইযেশান (electrocautery) বলা হয়। মূলত আঁচিল জাতীয় গ্রোথ ফেলে দেয়ার জন্য ইলেক্ট্রোকটারাইযেশান বেশ কার্যকরী মনে করা হয়। কিন্তু সারকামসিশান বা খৎনার ক্ষেত্রে ইলেক্ট্রোকটারাইযেশান ব্যবহার অপ্রয়োজনীয় এবং অনেক ক্ষেত্রে বিপদজনক।

.

১৯৬৬-র এপ্রিলের ঐ সকালে ডাঃ যন মারির হাতের ডিভাইসটি বেশ কয়েকবার ম্যালফাঙ্কশান করে। প্রাথমিকভাবে ইলেক্ট্রো-

কটারি মেশিনের হেমোস্ট্যাট ডায়াল ‘মিনিমামে’ সেট করা হয়। কিন্তু প্রথমবার ডাঃ যন মারি চামড়া বিচ্ছিন্ন করতে ব্যর্থ হন। হেমোস্ট্যাট ডায়াল বেশ অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া হয়। তৃতীয় বার ব্রুসের যৌনাঙ্গের চামড়ার সাথে ইলেক্ট্রোড স্পর্শ করানোর সাথে সাথে রুমের সবাই মাংস পোড়ার শব্দ ও গন্ধ পেলো। ডাক্তাররা বুঝতে পারলেন খুব বড় ধরণের একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। হসপিটালের বেডে ঘুমন্ত ব্রুসের দু’পায়ের মাঝখানে জ্যানেট আর রনাল্ড পুড়ে কয়লা হয়ে যাওয়া সুতোর মতো কিছু একটা দেখতে পেল। পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে ব্রুসের সম্পূর্ণভাবে পুড়ে যাওয়া লিঙ্গ ধীরে ক্ষয় হতে হতে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। ডাক্তাররা ব্রায়ানের উপর সার্জারি না করার সিদ্ধান্ত নেন। অন্য আরো অনেকের মতোই ব্রায়ানের ফিমোসিসের সমস্যা আপনাআপনিই ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু ব্রুসের অপরিমেয় ক্ষতি হয়ে গেল। ১৯৬৬ তে প্লাস্টিক সার্জারি ছিল একেবারেই প্রাথমিক পর্যায়ে। রি-কনস্ট্রাকটিভ সার্জারির মাধ্যমে ভুল শুধরে নেয়ারও কোন উপায় ছিলো না।

.

কীভাবে কী হয়ে গেল, জ্যানেট আর রনাল্ড বুঝতে পারছিলো না। যেন মুহূর্তের মাঝে এক ঝড় এসে সব কিছু লণ্ডভণ্ড করে ফেললো। পুরো ব্যাপারটা নিয়ে চিন্তা করতে বসলে অনেকে সময় জ্যানেটের কাছে অবাস্তব মনে হতো। ব্রুস আর কোনদিনই আর দশটা ছেলের মতো হতে পারবে না, এ চিন্তাটা ভেতরে থেকে ওদের কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিলো। ওরা নিজেদের দোষী ভাবছিল।

.

ডঃ জন মানিকে রাইমাররা প্রথম দেখে টিভি পর্দায়। দুর্ঘটনার প্রায় দশ মাস পর। মধ্য ফেব্রুয়ারির এক সন্ধ্যায়। This Hour Has Seven Days নামের ক্যানেইডিয়ান ব্রডক্যাস্টিং কর্পোরেশানের জনপ্রিয় টক শো-তে। কালো মোটা ফ্রেমের চশমার পেছনের শান্ত চোখ দুটোতে বুদ্ধির ছাপ। ডানদিকে সিঁথি করা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো। নীরবতা এবং কথা বলার সময় নিয়ন্ত্রিত আত্মবিশ্বাস ভেতর থেকে ঠিকরে বের হয়। বুদ্ধিমান, ক্যারিযম্যাটিক। মানুষটা খুব ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলেন। দেখে মনে হয় তার উপর আস্থা রাখা যায়।সাইকলোজিস্ট, পিএইচডি, হার্ভার্ড। জ্যানেট আর রনাল্ড রাইমার মনে মনে এমন একজন মানুষকেই খুঁজছিলো। অতিথি হয়ে আসা জন মানি বাল্টিমোরে খোলা জনস হপকিন্স হসপিটালের নতুন একটি ক্লিনিক নিয়ে কথা বলছিলেন। মানির উদ্যোগে খোলা এ ক্লিনিকের উদ্দেশ্য ছিল সার্জারির মাধ্যমে প্রাপ্তবয়স্ক হিজড়া বা Hermaphrodite/Intersex নারী ও পুরুষদের লিঙ্গ পরিবর্তন করা। এটা ছিল অ্যামেরিকাতে এধরনের প্রথম ক্লিনিক। মানির গবেষণা ছিল মূলত এ বিষয় নিয়েই। রাইমাররা টিভির পর্দায় ডঃ-কে বলতে শুনলেন – “আমাদের কাছে গুরুতর মনে হলেও যেসব মানুষ মানবেতর জীবন যাপন করছেন, একটা সমাধানের জন্য মরিয়া হয়ে আছে, তাদের জন্য এধরনের সার্জারি সারকামসিশানের চেয়ে এমন আলাদা কিছু না।”

.

নিঃসন্দেহে ডঃ মানির সাক্ষাৎকার অত্যন্ত ইন্টারেস্টিং ছিল, তবে রাইমারদের জন্য হয়তো পুরো ব্যাপারটা বিচ্ছিন্নভাবে কৌতূহলজনক একটা স্মৃতি হিসেবেই থাকতো। কিন্তু অনুষ্ঠানের শেষ দিকে প্রশ্নোত্তর পর্বে একজন দর্শক ডঃ মানিকে এমন একটি প্রশ্ন করে যা রাইমারদের মনোযোগ দিতে বাধ্য করে। প্রশ্নটি ছিল অসম্পূর্ণ যৌনাঙ্গ নিয়ে জন্ম নেওয়া শিশুদের সম্ভাব্য চিকিৎসার ব্যাপারে। জবাবে মানি বলেন, জনস হপকিন্স ক্লিনিকে সার্জারি এবং হরমোন ট্রিটমেন্টের মাধ্যমে এধরনের শিশুদের নারী বা পুরুষে পরিণত করা সম্ভব। ডঃ মানি বলছিলেন – কোন শিশু নারী বা পুরুষ হিসেবে জন্ম নিলো কি না, সেটা তেমন গুরুত্বপূর্ণ না। শৈশবে শিশুদের লিঙ্গ পরিবর্তন করা সম্ভব। কোন ঝামেলা ছাড়াই ছেলে শিশুকে মেয়ে আর মেয়ে শিশুকে ছেলে হিসেবে বড় করা সম্ভব। রাইমাররা ঠিক করলো ওরা ভুল শুধরে নেয়ার চেষ্টা করবে। অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র জ্যানেট ডঃ মানিকে চিঠি লিখতে বসলো। কয়েক মাসের মধ্যে ওরা বাল্টিমোরে জন মানির অফিসে হাজির হল।

.

ব্রেন্ডাঃ

.

ব্রুসের কেইস হিস্ট্রি শোনার পর, ওর ফিযিকাল চেকআপের পর জন মানি পরামর্শ দিলেন ব্রুসকে মেয়ে হিসেবে বড় করার । প্রথমে castration এর মাধ্যমে ব্রুসের শরীর থেকে পুরুষ যৌনাঙ্গের অবশিষ্ট অংশ বাদ দেয়া হবে। কৈশোরের শুরুতে

হরমোন ট্রিটমেন্ট নিতে হবে। আর ট্রিটমেন্টের শেষ পর্যায়ে সার্জারি মাধ্যমে ওর শরীরে কৃত্রিম যোনি স্থাপন করা হবে। ও কখনো মা- হতে পারবে না, কিন্তু একজন সাধারণ নারীর মতো যৌন জীবন যাপন করতে পারবে। একজন অসম্পূর্ণ পুরুষের বদলে ও একজন পরিপূর্ণ নারী হতে পারবে। ডঃ মানি রাইমারদের অভয় দিলেন, প্রথম শোনায় যতোটা গুরুতর মনে হয় আসলে ব্যাপারটা তেমন কিছুই না। একজন মানুষ পুরুষ নাকি নারী এটা পাথরে লেখা কিছু না। জন্মসূত্রে একজন মানুষ নারী বা পুরুষ হয়ে জন্মায় না। বরং পারিপার্শ্বিকতার প্রভাবে একজন মানুষ ‘পুরুষ’ অথবা ‘নারী’ হিসেবে বেড়ে ওঠেন। প্রকৃতি না, পরিবেশ একজন মানুষকে ‘পুরুষ’ অথবা ‘নারী’ বানায়। সুতরাং কেউ কোন ধরণের শরীর নিয়ে জন্মাচ্ছেন তার চাইতে মানসিকভাবে কোন লৈঙ্গিক পরিচয় (Gender Identity/Gender Role) সে গ্রহণ করছে, সেটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ। জন্মের প্রথম দুই বছর একজন মানুষের লৈঙ্গিক পরিচয় ফ্লুয়িড বা পরিবর্তনশীল থাকে। এসময়ের মধ্যে একজন মানুষকে ঠিক কীভাবে বড় করা হচ্ছে তার উপর নির্ভর করবে সে নিজেকে নারী হিসেবে চিনবে নাকি পুরুষ হিসেবে। একই কথা খাটে যৌনতার ক্ষেত্রে। কে নারীর প্রতি আর কে পুরুষদের প্রতি আকৃষ্ট হবে, এটা পারিপার্শ্বিকতা আর পরিবেশ ঠিক করে দেয়। প্রকৃতি না। তাই ব্রুসকে মেয়ে হিসেবে বড় করা নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই। শুধু এটুকু নিশ্চিত করতে হবে, ব্রুস যেন সবসময় নিজেকে একজন মেয়ে হিসেবে চেনে।

.

ডঃ মানির তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, তীব্র আত্মবিশ্বাস আর ক্যারিযমার প্রভাব তো ছিলই, সাথে আরো ছিল জনস হপকিন্স আর স্টেইট অফ দি আর্ট ট্রিটমেন্টের নিশ্চয়তা। বিশ্ববিখ্যাত গবেষক ব্যক্তিগতভাবে ব্রুসের কেইস হ্যান্ডেল করছেন, ব্রুস সর্বোচ্চ মানের চিকিৎসার নিশ্চয়তা পাচ্ছে। মানির কথা না শোনার কোন কারণ উইনিপেগের ছোট্ট গ্রাম থেকে উঠে আসা রনাল্ড আর জ্যানেটের ছিল না। রাইমার দম্পতি যে ব্যাপারটা জানতো না তা হল, যা কিছু জন মানি তাদের বলেছিল তার পুরোটুকুই ছিল অনুমান। অপ্রমাণিত। ডঃ মানি হিজড়াদের উপর করা কিছু অপারেশানের ভিত্তিতে এই উপসংহার টানছিলেন যে স্বাভাবিক অবস্থায় জন্ম নেওয়া একজন ছেলে শিশুকে কোন জটিলতা ছাড়াই মেয়ে হিসেবে বড় করা সম্ভব। এ উপসংহারের মূল ভিত্তি ছিল তার এই বিশ্বাস যে লৈঙ্গিক পরিচয় ও যৌনতা দুটোই পরিবেশ ও প্রেক্ষাপট নির্ভর। প্রাকৃতিক ভাবে নির্ধারিত, অপরিবর্তনীয় কোন বিষয় না। এটা কেবল হিজড়াদের জন্য না, বরং সব মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। দীর্ঘদিন ধরে এ মত প্রচার করলেও বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রমাণের কোন সুযোগ মানি পাচ্ছিলেন না। কারণ কোন বাবা-মাই সুস্থ-স্বাভাবিক সন্তানের ওপর এধরনের পরীক্ষা করার অনুমতি দেবে না। ব্রুস ছিল তাই জন মানির হাইপোথিসিস প্রমাণের পারফেক্ট টেস্ট সাবজেক্ট। দু বছরের কম বয়স। স্বাভাবিক ছেলে সন্তান, দুর্ঘটনার কারণে যার যৌনাঙ্গ নষ্ট হয়ে গেছে। এবং ব্রুসের ছিল একজন আইডেন্টিকাল টুইন। অর্থাৎ বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে টেস্ট সাবজেক্ট ব্রুসকে, স্বাভাবিক ব্রায়ানের সাথে তুলনা করার সুযোগ ছিল। জন মানির দেওয়া ট্রিটমেন্ট ছিল বিপর্যস্ত রাইমার দম্পতির খড়কুটো ধরে বাচার চেষ্টা। ব্রুস ছিল নিজ থিওরি প্রমাণে মরিয়া জন মানির কল্পনার সোনার হরিণ।

.

সোমবার, ৩ জুলাই, ১৯৬৭। বাল্টিমোরের জনস হপকিন্স হসপিটালে বাইল্যাটারাল অর্কিডেকটমির মাধ্যমে বাইশ মাস বয়েসী ব্রুসের শরীর থেকে অণ্ডকোষ অপসারণ করা হয়। ঠিক হল নিয়মিত চিঠির মাধ্যমে জ্যানেট ডঃ মানিকে ব্রুসের ব্যাপারে আপডেট জানাবে। আর বছরে একবার চেকআপের জন্য বাল্টিমোরে ব্রুসকে নিয়ে যাওয়া হবে। মানি রাইমারদের জানিয়ে দিলেন, এ পর্যায়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল ব্রুস যেন নিজেকে একজন মেয়ে মনে করে বেড়ে ওঠে। ওর জীবনের প্রথম বাইশ মাসের ব্যাপারে দুই যমজকে কিছু না জানানোই ভালো হব। আর হ্যাঁ, ওর একটা নতুন নামের প্রয়োজন হবে। বাড়ি ফিরে তাই জ্যানেট আর রনাল্ড দ্বিতীয়বারের মতো তাদের সন্তানের নামকরণ করলো। ব্রুস পরিণত হল ব্রেন্ডায়।

.

চলবে ইনশা আল্লাহ্......

১৮৬

“পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি -২!!” (২য় পর্ব)

-আসিফ আদনান

ব্রেন্ডার বয়স যখন পাঁচ বছর তখন থেকে ডঃ মানি তার বক্তব্য, গবেষণা ও বইতে চাঞ্চল্যকর এ কেইসের কথা প্রকাশ করা শুরু করলেন। তবে সংগত কারণেই রাইমারদের পরিচয় প্রকাশ করলেন না। প্রায় রাতারাতি ব্রুস/ব্রেন্ডার কেইসের খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লো। জন মানি প্রচার করা শুরু করলেন – নারী বা পুরুষ হওয়া মানুষের সত্ত্বাগত কোন বৈশিষ্ট্য না। পরিবেশ, প্রেক্ষাপটের দ্বারা একজন মানুষ নারী বা পুরুষ হতে শেখে। আর এর অকাট্য প্রমাণ হল দুই যমজ ভাইয়ের মধ্যে একজন ছেলে হিসেবে এবং অন্যজন সুস্থ সবল মেয়ে হিসেবে বড় হয়ে উঠছে।

.

ব্রুস/ব্রেন্ডার কেইস ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। সাইকোলজি, সেক্সোলজি, জেন্ডার স্টাডি ইত্যাদি ডিসিপ্লিনের পাঠ্যবইয়ে এ কেইসের কথা যুক্ত করা হয়। এ কেইস ছিল মানবিক যৌনতা, লিঙ্গ ও মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে এক নতুন দিগন্তের উন্মোচক। এক মাইলফলক। প্রকৃতি বনাম প্রশিক্ষণের (Nature vs Nurture) যুদ্ধে প্রশিক্ষণের বিজয়ের অবিসম্বাদিত প্রমাণ ছিল ব্রুসের সফলভাবে ব্রেন্ডায় পরিণত হওয়া। এ উপসংহার বিভিন্ন জনের কাছে বিভিন্ন কারণে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। মানির জন্য এটা ছিল শিশু যৌনতা, লিঙ্গ ও যৌনতার মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে তার প্রিয় থিওরির প্রমাণ। সমকামী এবং অন্যান্য বিকৃত যৌনাচারে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের জন্য এ কেইস এবং এর উপসংহার গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ পরিবেশ ও প্রেক্ষাপটের কারণে যদি একজন ছেলে একজন মেয়েতে পরিণত হতে পারে, তাহলে একজন পুরুষ বা নারীর সমলিঙ্গের প্রতি আকর্ষণকে কেন অস্বাভাবিক, বিকৃত বা অসুস্থতা মনে করা হবে? খোদ নারী বা পুরুষ পরিচয়ই যদি পূর্ব-নির্ধারিত না হয়, অপরিবর্তনীয় না হয়, বরং অর্জিত (learned/acquired) হয়, তাহলে কীভাবে যৌনতা পূর্ব নির্ধারিত হতে পারে?

.

অন্যদিকে ফেমিনিস্টদের জন্য এ কেইস গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ তারা দীর্ঘদিন ধরে দাবি করছিল নারী ও পুরুষের মধ্য মৌলিক কোন পার্থক্য নেই। ছেলেরা যা পারে, মেয়েরাও তাই পারে। ছেলেরা যতোটুকু পারে ততোটুকুই পারে। তাই কিছু কাজে, যেমন ম্যাথম্যাটিকস বা শিল্পে (art), ছেলেরা মেয়েদের চেয়ে দক্ষ – এ কথার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পুরুষ ম্যাথম্যাটিশিয়ানদের সমান সংখ্যক নারী ম্যাথম্যাটিশিয়ান দেখা যায় না, কিংবা নারীদের মধ্যে কোন বেইতোভেন, মোৎযার্ট কিংবা মাইকেলেঞ্জেলোকে পাওয়া যায় না - এটা জাস্ট শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে চলে আসা পুরুষতন্ত্রের প্রভাব।

.

১৯৭৩ এর জানুয়ারি সংখ্যায় টাইম ম্যাগাযিন মন্তব্য করে – “চাঞ্চল্যকর এই কেইস নারীবাদীদের বক্তব্যের পক্ষে জোরালো সমর্থন দেয়।”

.

ডেইভিডঃ

.

কিন্তু মিডিয়ার রঙ্গিন আর অ্যাকাডেমিকদের এলিগ্যান্ট তত্ত্বের জগত থেকে দূরে উইনিপেগের ছবিটা ছিল অন্যরকম। একবারে শুরু থেকেই রাইমাররা অনুভব করতে পারছিলেন কোন একটা জায়গায় হিসেবে মিলছে না। কোথাও কোন একটা সমস্যা রয়ে যাচ্ছে। যদিও ওরা দু’জন এটা স্বীকার করতে চাচ্ছিলো না। একেবারে ছোটবেলা থেকেই ‘ব্রেন্ডা’র আচরণে মেয়েলিপনার কোন ছাপ ছিল না। ওর প্রিয় কাজ ছিল দৌড়ানো, ব্রায়ানের গাড়ি নিয়ে খেলা করা আর ছেলেদের সাথে পুরো দমে মারপিট করা।

পুতুল খেলা ছিল দু চোখের বিষ। স্কুলে ও ছিল একা। রাগী, একগুঁয়ে। মেয়েদের সাথে খেলতে চাইতো না। ছেলেরা ওকে খেলায় নিতো না। এমনকি বাসাতেও খেলার সময় ও নেতৃত্ব দিতো। ব্রায়ান ওর অনুসরণ করতো। ওর হাটা, চলা, কথা সবকিছুতে ব্রুসকে দেখতে পাওয়া যেতো, ব্রেন্ডাকে না।

বয়স বাড়ার সাথে সাথে সমস্যাগুলো বাড়তে থাকে। বাড়তে থাকে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, রাগ, কষ্ট। ও বুঝতে পারছিল ও অপরিচিত, অদ্ভুত। ও খাপ খায় না। এসব কিছুর প্রভাব পড়ছিল ওর পড়াশোনায়। প্রথমে গোপন রাখতে চাইলেও স্কুলে ক্রমাগত খারাপ পারফরমেন্সের পর শিক্ষকদের নানা ধরণের প্রশ্নের জবাবে রাইমাররা ওর অতীত সম্পর্কে জানাতে বাধ্য হয়। স্কুল থেকেই ওর জন্য সাইকলোজিস্ট ঠিক করে দেওয়া হয়। কিন্তু একের পর এক সাইকলোজিস্ট এ সিদ্ধান্তেই পৌছাতে বাধ্য হন, যদিও ব্রুস হওয়ার কোন স্মৃতি ওর নেই তবুও 'ব্রেন্ডা' কোন এক কারণে – তার রূপান্তরকে মেনে নিচ্ছে না। একের পর এক সাইকলোজিস্ট এবং জ্যানেট তার নিয়মিত চিঠিতে মানিকে ব্যাপারগুলো জানান। কিন্তু বরাবরই ডঃ মানি বিষয়টিকে "টমবয়ের স্বাভাবিক দস্যিপনা" বলে উড়িয়ে দেন।

.

তবে এক পর্যায়ে ডঃ মানিও বাধ্য হন ব্যাপারটিকে গুরুত্ব দিতে। কারণ তার পূর্নাঙ্গ থিওরিকে প্রমাণ করার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় ক্রমেই এগিয়ে আসছিলো। মানির থিওরি অনুযায়ী ব্রেন্ডার রূপান্তরকে সম্পূর্ণ করতে কৈশোরের আগেই সার্জারি মাধ্যমে ওর শরীরে যোনি স্থাপন করা আবশ্যক। এটাই হল রূপান্তরের ফাইনাল স্টেপ। কিন্তু ব্রেন্ডাকে কোন ভাবেই সার্জারির জন্য রাজি করানো যাচ্ছিলো না। সার্জারি কথা শুনতেই ও রাজি না। ডঃ মানি বিভিন্ন ভাবে ব্রেন্ডাকে বোঝানোর চেষ্টা করেন। নিজ অফিসের নির্জন রুমে তিনি ব্রেন্ডাকে ছবি দেখান। নারী ও পুরুষের নগ্ন ছবি। যৌনাঙ্গের ছবি। মিলন রত ছবি। প্রসবের ছবি। মানির যুক্তি ছিল, নারীত্ব ও যোনির গুরুত্ব বোঝানোর জন্য ব্রেন্ডাকে মানব যৌনতা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া ছিল আবশ্যক। যেহেতু মানি বিশ্বাস করতেন জন্ম থেকেই মানবশিশুর মধ্য যৌনতার অনুভূতি থাকে তাই এতে কোন বিপদের আশঙ্কাও ছিল না। ডঃ মানি জ্যানেট এবং রনাল্ডকে বাসায় বাচ্চাদের সামনে, বিশেষ করে ব্রেন্ডার সামনে সঙ্গম করার পরামর্শ দেন, যাতে করে যৌনতা সম্পর্কে ওদের ধারণা আরো পরিষ্কার হয়। ওরা অস্বীকৃতি জানালে, মানি পরামর্শ দেন জ্যানেট যেন অ্যাটলিস্ট গৃহস্থালির কাজ করার সময় নগ্ন থাকে। যাতে করে নারী পুরুষের পার্থক্য এবং নিজের নারীত্ব সম্পর্কে ব্রেন্ডার বিশ্বাস আরো গাঢ় হয়।[1] বিশ্ববিখ্যাত ডঃ-এর এই প্রেসক্রিপশান রাইমাররা মেনে চলার চেষ্টা করে। পুরো ব্যাপারটা ব্রেন্ডাকে আরো বিভ্রান্ত, আরো দিশেহারা করে তোলে। ব্রেন্ডার বয়স ছিল ৭ বছর।

.

ব্রেন্ডার "ট্রিটমেন্ট" চলতে থাকে। কিন্তু সময়ের সাথে সবার কাছে পরিষ্কার হতে থাকে ও আর দশটা মেয়ের মতো। বরং ব্রেন্ডার কোন কিছুই মেয়ের মতো না। ব্রেন্ডার বয়স বারো হলে ডঃ মানির পরামর্শে ওকে হরমোন ট্যাবলেট খেতে বাধ্য করা হয়। বন্ধুহীন, নিরাপত্তাহীন নিষ্ঠুর এক পরিবেশে ব্রেন্ডা বড় হতে থাকে। নিজের মেয়েলি পোশাক, নিজের অস্বাভাবিকতা, ভাঙ্গতে থাকা কণ্ঠস্বর, নিজের শারীরিক অসম্পূর্ণতা, সার্জারির জন্য বাবা-মার চাপাচাপি, একের পর একে সাইকলোজিস্টের সাথে সেশন, বাল্টিমোরের নির্জন রুমের অন্ধকার স্মৃতি, নিজের একাকীত্ব, হঠাৎ ড মানির কথা মতো ওর উপর জোর করে সার্জারি করা হবে – সব কিছু মিলিয়ে ক্রমেই গভীর হতে থাকা রাগ আর হতাশার এক ঘূর্ণিপাকে ব্রেন্ডাকে নিজেকে আবিষ্কার করে। ওর মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত লোকাল সাইকলোজিস্টের পরামর্শে, ডঃ জন মানির অমতে রনাল্ড আর জ্যানেট সিদ্ধান্ত নেয় ব্রেন্ডাকে ওর অতীত সম্পর্কে জানাবার।

.

১৯৮০-র মার্চের এক পড়ন্ত দুপুরে সাইকলোজিস্টের সাথে সাপ্তাহিক সেশনের পর রনাল্ড সব কিছু ব্রেন্ডাকে খুলে বলে। গাল বেয়ে পড়া পানি আর হাতের গলতে থাকে কোন আইসক্রিমের ফোটা কোলে জমতে থাকে। ও নিজের ভেতর মুক্তির স্বাদ অনুভব করে। বোধশক্তি হবার পর থেকে বিভ্রান্তি আর ওর কাছে দুর্বোধ্য, অজানা এক বাস্তবতার যে বোঝা ওর ওপর চেপে ছিল, মনে হল শেষ পর্যন্ত তা তুলে নেয়া হয়েছে। রনের কথা শেষ হবার প্রায় সাথে সাথেই ব্রুস ওর সিদ্ধান্ত জানিয়ে দেয়। ও

একজন ছেলে আর ও ছেলে হিসেবেই জীবন কাটাবে। অতীতের সব চিহ্ন মুছে ফেলার চেষ্টায় ও নিজের জন্য নতুন বেছে নেয়। ডেইভিড। বাইবেলের সেই ছেলেটার মতো যে বিশাল দানবকে যুদ্ধ হারিয়েছিল। ডেইভিড রাইমার।

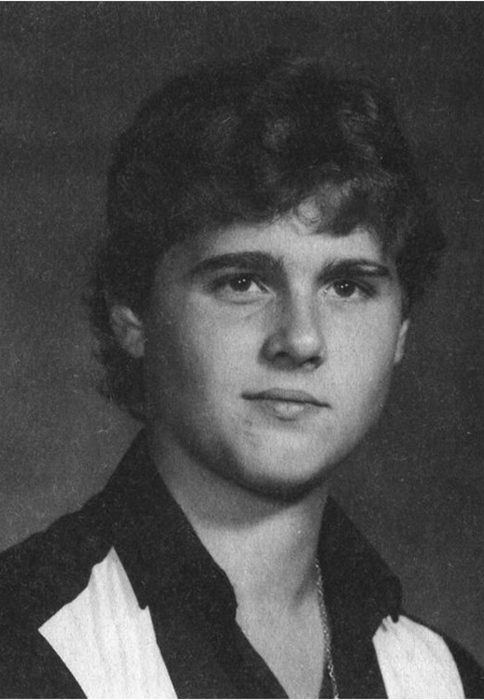
.

ছোটকালে হওয়া দুর্ঘটনার ক্ষতিপূরণ হিসেবে হসপিটাল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রাইমাররা কিছু টাকা পেয়েছিল। এ টাকা ডেইভিড সার্জারির জন্য খরচ করার সিদ্ধান্ত নেয়। তবে জন মানির প্রস্তাবিত সার্জারি না। বরং তার উল্টো রেসাল্টের জন্য। এই ফ্যালোপ্ল্যাস্টি সার্জারিতে ডেইভিডের ডান কবজি থেকে মাংস, নার্ভ আর আর্টারি এবং ওর বাম বাম পাজড় থেকে কার্টিলেজ নিয়ে ওর শরীরে একটি কৃত্রিম লিঙ্গ স্থাপন করার চেষ্টা করা হবে। বারো ধাপের এ সার্জারি শেষ করতে তিন জন সার্জেনের ১৩ ঘণ্টা সময় লাগে। সার্জারি সফল হয়। সেপ্টেম্বর ২২, ১৯৯০ এ ডেইভিড রাইমার জেইন ফন্টেইনকে বিয়ে করে।

.

গল্পটা এখানে শেষ হলে ভালো হতো। ডেইভিড সুখে-শান্তিতে তার বাকি জীবন কাঁটিয়ে দিল। ক্ষতবিক্ষত, ভ্রমণ ক্লান্ত, কিন্তু সন্তুষ্ট একজন মানুষ হিসেবে – এমন উপসংহার হয়তো সবার জন্যই ভালো হত। কিন্তু বাল্টিমোরে জন মানির সাথে নির্জন সেশনগুলোতে এমন কিছু হয়েছিল যার বীজ ও আর ব্রায়ান ভেতরে বয়ে বেড়াচ্ছিল। এমন এক অন্ধকারে উঁকি দিতে ওরা বাধ্য হয়েছিল, আমৃত্যু যা ওদের তারা করে বেড়াবে। শত চেষ্টার পরও যে অন্ধকারের কবল থেকে ওরা মুক্ত হতে পারেনি।

চলবে ইনশা আল্লাহ্ ......





---

[1] In Sexual Signatures, Money emphasized the importance of such parental genital displays for correct heterosexual child development, and even went so far as to recommend that parents engage in sexual intercourse in front of their children. "With a little calm guidance," he wrote, "the experience can be integrated into the child's sex education and serve to reinforce his or her own gender identity/role

১৮৭

“পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি -২!!” (৩য় পর্ব)

-আসিফ আদনান

খুব কম বয়সে ব্রায়ান মদ ধরে। সপ্তাহান্তে ফুর্তির জন্য মদ খাওয়া না। দুনিয়ার উপর জেদ নিয়ে, নিজের সাথে নিজে পাল্লা দিয়ে, দিনের পর দিন কখনো পুরোপুরি মাতাল না থাকার মতো করে মদ খাওয়া। ওর মাথার ভেতর, ওর মনে ভেতর কিছু একটা ওকে কুরে কুরে খাচ্ছিলো। সবসময় অনুতপ্ত, আর ডেইভিডকে নিয়ে দুশ্চিন্তাগ্রস্ত রণ আর জ্যানেটের হয়তো ব্যাপারটা খেয়াল করার মতো অবস্থা ছিল না, তবে সমস্যাটা সামনে আসতে শুরু করে যখন ডেইভিডের অতীতের ব্যাপারে সত্য দু ভাইকে জানানোর পর।

.

পুরো ঘটনায় সবার মনোযোগ ছিল ডেইভিডের উপর। সংগত কারণেই। ব্রায়ান ব্যাপারটা কীভাব হ্যান্ডেল করছে সেই দিকে মনোযোগ দেয়ার সুযোগ তেমন ছিল না। তাই যখন কিছুদিন পর ব্রায়ানের নার্ভাস ব্রেক ডাউনের মতো হল, তখন সেটা অপ্রত্যাশিত ছিল। দীর্ঘদিন ধরে একের পর এক দুর্ঘটনা আর বিপর্যয়ের মোকাবেলা করতে করতে অনেকটাই অবশ হয় আসা রাইমার পরিবার তাদের লম্বা দুর্ভাগ্যের লিস্টের আরেকটি দুর্ভাগ্য হিসেবে একে দেখে। কিন্তু সমস্যা বাড়তে থাকে। ব্রায়ানের মানসিক সমস্যাকে রাইমাররা সিরিয়াসলি নিতে বাধ্য হয় যখন ডেইভিডের সার্জারির দু সপ্তাহ আগে ব্রায়ান প্রথমবারের মতো আত্মহত্যার চেষ্টা করে। কদিন পরই ছিল দু'জনের ষোলতম জন্মদিন। কিছুদিন পর ব্রায়ান পড়াশুনা বন্ধ করে দেয়। এক পেট্রোল পাম্পে চাকরি নেয়। বাসা থেকে বের হয়ে গার্ল ফ্রেন্ডকে সাথে নিয়ে আলাদা থাকা শুরু করে। প্রথমবার বিয়ে করে ১৯ বছর বয়সে। কিন্তু দু সন্তানের জন্মের পরও বিয়েটা টেকে না। কয়েক বছরের মধ্যে ডিভোর্স হয়ে যায়।

.

নেশাতুর কয়েক বছর কাটাবার পর আবার বিয়ে করে ব্রায়ান। কিন্তু আবারো একই পরিণতি।
ভেতরের অস্থিরতা ওর জীবনকেও অস্থির করে তুলছিল। কিছু একটাকে ভুলে থাকতে, চাপা দিতে চাইছিল ও। নিজের কাছ থেকে নিজে পালিয়ে বেড়ানোর চেষ্টায় মদ আর ঘুমের ওষুধের নেশার গাড়, অবশ অনুভূতির চাদরে মনকে, চিন্তাকে ঢেকে রাখছিল। ঠিক কী থেকে ব্রায়ান পালাতে চাইছিল রন আর জ্যানেট বুঝতে পারছিল না। ওদের বোঝার উপায়ও ছিল না। পৃথিবীতে কেবল একজনই জানতো জাগ্রত মুহূর্তগুলোতে কোন স্মৃতি থেকে ব্রায়ান পালিয়ে বেড়াতো, আর অচেতন অবস্থায় কোন স্মৃতি দুঃস্বপ্ন হয়ে ওর সামনে হাজির হতো। কিন্তু ডেইভিড সংকল্প করেছিল ভুলে থাকার।

.

ডেইভিড আর ব্রায়ানের শৈশব কোন অর্থেই সহজ ছিল না। খুব অল্প বয়স থেকেই ডেইভিডকে তীব্র কষ্ট, হতাশা, প্রতিকূলতা আর ভয়ের মুখোমুখি হতে হয়েছে। একই মাত্রায় না হলেও একই কথা ব্রায়ানের ক্ষেত্রেও খাটে। কিন্তু সব কিছু ছাপিয়ে ডেইভিড এবং ব্রায়ানের সবচেয়ে অপছন্দের, সবচেয়ে ভয়ের স্মৃতি ছিল বাল্টিমোরের দিনগুলো। ডঃ মানির অফিসে কাটানো নির্জন সময়গুলোর দু ভাইয়ের মনে কী গভীর ক্ষত তৈরি করেছিল তার একটা ধারণা পাওয়া যায় ডেইভিডের এক দুর্লভ স্বীকোরোক্তি থেকে। ডেইভিড আর জেইন ডকুমেন্টারি দেখছিল। সিআইএ- এর টর্চার নিয়ে বানানো ডকুমেন্টারিতে দেখানো হচ্ছিল কীভাবে বন্দীদের যৌনাঙ্গে ইলেকট্রিক শক দিয়ে অত্যাচার চালানো হয়। হঠাৎ জেইন আবিষ্কার করলো ডেইভিড চিৎকার করে কাঁদছে। প্রলাপ বকছে। ভিডিওর ঐ দৃশ্য ওকে ভয়ঙ্কর কোন স্মৃতির কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। কান্নার দমকে এলোমেলো হয়ে যাওয়া কথাগুলো বুঝতে না পারলেও জেইন একটা নাম চিনতে পারছিল। জন মানি।

.

রাইমাররা বছরে একবার বাল্টিমোরে যেতো, রেগুলার চেকআপের অংশ হিসেবে। প্রথমে ওরা চারজন ডঃ মানির অফিসে বসতো। রন আর জ্যানেটের সাথে কিছুক্ষণ কথা বলার পর ডঃ মানি ব্রায়ান আর ব্রুসকে আলাদা রুমে নিয়ে যেতেন। প্রাইভেট সেশনের জন্য। একজন নারী হিসেবে স্বাভাবিক “বিকাশের” জন্য ব্রুস/ব্রেন্ডাকে নগ্নতা ও যৌনতার মুখোমুখি দাড় করিয়ে দেয়া ডঃ মানির মতে অপরিহার্য ছিল। “স্বাভাবিক বিকাশের” অংশ তিনি ব্রুস আর ব্রায়ানকে পর্ণোগ্রাফি আর স্টিল ইমেজ দেখান। যখন ওদের বয়স ৭, এক সেশনে ডঃ মানি ওদের দু জনকে কাপড় খুলে নগ্ন হবার নির্দেশ দেন। ৭ বছরের নগ্ন ব্রুসকে জন মানি হামাগুড়ি দেয়ার ভঙ্গিতে মেঝেতে চার হাত-পায়ে ভর দিতে বাধ্য করেন। মানি তারপর নগ্ন ব্রায়ানকে বলেন ব্রুসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াতে। আবার কোন কোন সেশনে মানি ব্রুসকে বলেন দু পা ছড়িয়ে করে চিত হয়ে শুতে। আর তারপর ব্রায়ানকে বাধ্য করেন ব্রুসের উপড়ে উঠতে। ছোট্ট এ যমজ শিশু দুটিকে জন মানি সেক্স্যুয়াল রোল-প্লে তে বাধ্য করেন।[2] এ অবস্থায় জন মানি ওদের ছবি তোলেন। তিনি ওদের এমন এক দুর্বিষহ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যেতে বাধ্য করেন যা সারা জীবনের জন্য ওদেরকে ক্ষতবিক্ষত করে দেয়। আর সব কিছুকে ছাপিয়ে এই “থেরাপি” সেশন দুই যমজের উপর সবচেয়ে গভীর প্রভাব ফেলে।

.

জীবনভর শত চেষ্টার পরও ওরা এ ভয়ঙ্কর স্মৃতি মুছে ফেলতে ব্যর্থ হয়। যখন ডেইভিড শেষ পর্যন্ত তার অতীত সম্পর্কে জানতে পারে তখন আর সব কিছু পেছনে ফেলে আসতে পারলেও এই বিকৃত যৌন নির্যাতনকে স্মৃতি থেকে মুছে ফেলা ওর আর ব্রায়ানের জন্য সম্ভব ছিল না। ১৩ বছর বয়সে যখন ব্রায়ান বুঝতে পারলো ওর বোন আসলে ওর ভাই, এবং জন মানি ওদেরকে দিয়ে যা করিয়েছিলেন তা অজাচার এবং সমকামের অনুকরণ – তখন পুরো ব্যাপারটা কীভাবে ওর মনের উপর ঠিক কী রকম প্রভাব ফেলেছিল? এ ধরণের স্মৃতি একজন মানুষকে দুমড়ে মুচড়ে, ভেঙ্গে চুড়ে দিতে বাধ্য।

.

ব্রায়ান চেষ্টা করেছিল। কিন্তু এ স্মৃতি, এ অন্ধকারের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিতে ও ব্যর্থ হয়। ওর ডিপ্রেশন, মুড সুইংস, মদ আর ঘুমের ওষুধের নেশা তীব্র হতে থাকে। ২০০২ এর বসন্তে ৩৬ বছর বয়সে ব্রায়ান আত্মহত্যা করে। ব্রায়ানের মৃত্যু ডেইভিডের উপর গভীর প্রভাব ফেলে। বিভিন্ন কারণে ওর আর্থিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। ডেইভিড নিজেও ডিপ্রেশনের চোরাবালিতে তলিয়ে যেতে শুরু করে। ব্রায়ানের মৃত্যুর প্রায় দু’ বছর পর, মে-র এক দুপুরে জেইন ওকে জানায় কিছু দিনের জন্য ও আলাদা থাকতে চাচ্ছে। যদিও জেইন আশ্বস্ত করে বলে ও ডিভোর্সের কথা ভাবছে না, ডেইভিড সবচেয়ে খারাপ পরিণতিকেই অবধারিত বলে ধরে নেয়। ও নিজেকে ব্যর্থ মনে করছিল। স্বামী হিসেবে, পুরুষ হিসেবে। সেদিন রাতে ডেইভিড ঘর ছেড়ে বের হয়ে যায়। কোন অঘটনের আশংকায় জেইন থানায় রিপোর্ট করে। পরদিন পুলিশ জানায় ডেইভিড সুস্থ আছে, বেঁচে আছে। তবে কোথায় আছে সেটা ও জেইনকে জানাতে চায় না। বিপদ এড়ানো গেছে ভেবে জেইন সেদিনকার মতো অফিসে যায়। ও বেড়িয়ে গেলে ডেইভিড বাসায় আসে। খুঁজে বের করে গ্যারজে নিয়ে ধীর স্থির ভাবে ওর শটগানের ব্যারেল চেঁছে নেয়। তারপর গাড়ি নিয়ে বেড়িয়ে যায়।
২০০৪ সালের ৪ই মে ওর বাসার কাছে এক সুপারস্টোরের পার্কিং লটে ডেইভিডের বিস্ফোরিত খুলির মৃতদেহ পাওয়া যায়। ওর বয়স ছিল ৩৮ বছর।[3]

.

জন মানি মারা যান ২০০৬ সালে, ৮৫ বছর বয়সে, পার্কিন্সন্সে ভুগে। বিশ্বখ্যাত, নন্দিত অ্যাকাডেমিক, মনস্তত্ত্ব ও যৌনতার গবেষণায় নব দিগন্তের সূচনাকারী পথিকৃৎ হিসেবে। মানির অনেক থিওরি মানবিক যৌনতা সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তকের প্রমাণিত সত্য হিসেবে গৃহীত হয়। Gender Role, Gender Identity এবং Gender Fluidity –এর মতো অনেক ধারণা ও পরিভাষা সরাসরি ডঃ মানির কাছ থেকে নেওয়া। .

.

ডেইভিড রাইমারের জীবনের প্রথম দিকে ডঃ মানি ব্যাপকভাবে কেইসটিকে তার থিওরির স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে প্রচার করেন। তিনি বলেন ডেইভিডের ঘটনা প্রমাণ করে মানুষের লৈঙ্গিক পরিচয় পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রকৃতির

মাধ্যমে না। মানি ডেইভিডের কেইসকে অমিশ্র সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেন। এ কেইসকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করে জনস হপকিন্সে এরকম আরো অনেক সার্জারি ও "ট্রিটমেন্ট" করা হয়। পুরো ব্যাপারটা যে রাইমার পরিবারের জন্য এক মহা বিপর্যয় ছিল, মানির লেখা থেকে বোঝার উপায় ছিল না। মানি এক সুখী পরিবারের ছবি এঁকেছিলেন যেখানে হাসিখুশি বাবা-মা পরম যত্নে তাদের দুই সুস্থ-স্বাভাবিক সন্তানকে বড় করছে। আর লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি মাধ্যমে যাওয়া শিশুটি সবদিক দিয়ে একজন স্বাভাবিক মেয়ে হিসেবে বেড়ে উঠছে।[4] .

অথচ বাস্তবতা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। যখন ১৩ বছর বয়সে ডেইভিড একজন পুরুষ হিসেবে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়, ডঃ মানিকে ব্যাপারটা জানাও হয়। কিন্তু মানি তার প্রকাশিত বই, জার্নাল, আর্টিকেল, বক্তব্য – সব জায়গাতেই এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি উল্লেখ করতে ভুলে যান। তবে ডেইভিডের কেইস সম্পর্কে কথা বলা কমিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালে যখন ডেইভিডের কেইসের আসল অবস্থার কথা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়, মানি তার এক্সপেরিমেন্টের ব্যর্থতার জন্য মিডিয়া হট্টগোলকে দায়ী করেন। কখনো রক্ষণশীল মিডিয়ার ষড়যন্ত্রের কথা বলেন আবার কখনো রন আর জ্যানেটের অভিভাবক হিসেবে যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যদিও এর আগে মানির নিজের মেডিকাল নোটসে দু'জনের ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ডেইভিড রাইমারের জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে জন মানির ভেতরে বিন্দুমাত্র অনুতাপ দেখা যায় নি।

.

তবে মানি স্বীকার না করলেও রাইমার যমজের দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবন আর আত্মহত্যার পেছনে তার এক্সপেরিমেন্ট এবং বিশেষ করে তার থেরাপি সেশনগুলোর ভূমিকা কোন সুস্থ, সুবিবেচক মানুষ অস্বীকার করার কথা না। ক্রমাগত তীব্র যৌনতার উপস্থাপন, যৌন সঙ্গম অনুকরণে বাধ্য করা, এমন অবস্থায় ছবি তোলা, ক্রমাগত তার যৌনাঙ্গ এবং যৌন পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা, সর্বোপরি একজন ছেলেকে জোর করে একজন মেয়েতে পরিণত করার চেষ্টা – এ বিষয়গুলো খুব সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপর এধরনের ঘটনার তীব্র ও গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। আর ডেইভিড আর ব্রায়ানের সাথে এ ঘটনাগুলো ঘটেছিল শৈশব থেকে।

.

একজন বিখ্যাত, সম্মানিত সাইকলোজিস্ট কেন শিশুদের এধরনের আচরণে বাধ্য করবেন, পাঠকের মনে এমন প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কোন মেডিকাল ডিগ্রি না থাকা একজন সাইকলোজিস্ট কীভাবে একের পর এক রোগীকে এতো বড় মাপের একটা সার্জারি করার পরামর্শ দিয়ে যেতে পারেন, সেটা নিয়েও প্রশ্ন জাগতে পারে।

ইনশা আল্লাহ্ সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাবে আগামী পর্বে......





---

[2] Money made Bruce assume the passive position and then ordered Brian to go behind him and mimic a thrusting motion. He repeated the same thing when he instructed Bruce to lay with legs spread and then ordered Brian to mount him. He forced them into sexual role play. Can't find the words to describe the ordeal in Bengali.
[3] Sex reassignment at birth. Long-term review and clinical implications. Diamond, M. & Sigmundson, H. K. (1997) John Colapinto wrote "As Nature Made Him: The Boy Who Was Raised as a Girl
http://www.bbc.co.uk/.../.../horizon/dr_money_prog_summary.shtml
[4] http://nyti.ms/2pBqu0N

১৮৮

“পাঠক, সাবধান! ভয়ের জগতে প্রবেশ করছ তুমি -২!!” (শেষ পর্ব)

-আসিফ আদনান

জন মানি মারা যান ২০০৬ সালে, ৮৫ বছর বয়সে, পার্কিন্সন্সে ভুগে। বিশ্বখ্যাত, নন্দিত অ্যাকাডেমিক, মনস্তত্ত্ব ও যৌনতার গবেষণায় নব দিগন্তের সূচনাকারী পথিকৃৎ হিসেবে। মানির অনেক থিওরি মানবিক যৌনতা সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তকের প্রমাণিত সত্য হিসেবে গৃহীত হয়। Gender Role, Gender Identity এবং Gender Fluidity –এর মতো অনেক ধারণা ও পরিভাষা সরাসরি ডঃ মানির কাছ থেকে নেওয়া।

.

ডেইভিড রাইমারের জীবনের প্রথম দিকে ডঃ মানি ব্যাপকভাবে কেইসটিকে তার থিওরির স্বপক্ষে অকাট্য প্রমাণ হিসেবে প্রচার করেন। তিনি বলেন ডেইভিডের ঘটনা প্রমাণ করে মানুষের লৈঙ্গিক পরিচয় পরিবেশ ও প্রশিক্ষণ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, প্রকৃতির মাধ্যমে না। মানি ডেইভিডের কেইসকে অমিশ্র সাফল্য হিসেবে তুলে ধরেন। এ কেইসকে মডেল হিসেবে উপস্থাপন করে জনস হপকিন্সে এরকম আরো অনেক সার্জারি ও “ট্রিটমেন্ট” করা হয়। পুরো ব্যাপারটা যে রাইমার পরিবারের জন্য এক মহা বিপর্যয় ছিল, মানির লেখা থেকে বোঝার উপায় ছিল না। মানি এক সুখী পরিবারের ছবি এঁকেছিলেন যেখানে হাসিখুশি বাবা-মা পরম যত্নে তাদের দুই সুস্থ-স্বাভাবিক সন্তানকে বড় করছে। আর লিঙ্গ পরিবর্তন সার্জারি মাধ্যমে যাওয়া শিশুটি সবদিক দিয়ে একজন স্বাভাবিক মেয়ে হিসেবে বেড়ে উঠছে।[4] অথচ বাস্তবতা ছিল পুরোপুরি ভিন্ন। যখন ১৩ বছর বয়সে ডেইভিড একজন পুরুষ হিসেবে জীবন কাটানোর সিদ্ধান্ত নেয়, ডঃ মানিকে ব্যাপারটা জানাও হয়। কিন্তু মানি তার প্রকাশিত বই, জার্নাল, আর্টিকেল, বক্তব্য – সব জায়গাতেই এ গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি উল্লেখ করতে ভুলে যান। তবে ডেইভিডের কেইস সম্পর্কে কথা বলা কমিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত ১৯৯৭ সালে যখন ডেইভিডের কেইসের আসল অবস্থার কথা ব্যাপকভাবে প্রকাশিত হয়, মানি তার এক্সপেরিমেন্টের ব্যর্থতার জন্য মিডিয়া হট্টগোলকে দায়ী করেন। কখনো রক্ষণশীল মিডিয়ার ষড়যন্ত্রের কথা বলেন আবার কখনো রন আর জ্যানেটের অভিভাবক হিসেবে যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। যদিও এর আগে মানির নিজের মেডিকাল নোটসে দু’জনের ভূয়সী প্রশংসা করেছিল। মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ডেইভিড রাইমারের জীবন ও মৃত্যুর ব্যাপারে জন মানির ভেতরে বিন্দুমাত্র অনুতাপ দেখা যায় নি।

.

তবে মানি স্বীকার না করলেও রাইমার যমজের দুঃখ ভারাক্রান্ত জীবন আর আত্মহত্যার পেছনে তার এক্সপেরিমেন্ট এবং বিশেষ করে তার থেরাপি সেশনগুলোর ভূমিকা কোন সুস্থ, সুবিবেচক মানুষ অস্বীকার করার কথা না। ক্রমাগত তীব্র যৌনতার উপস্থাপন, যৌন সঙ্গম অনুকরণে বাধ্য করা, এমন অবস্থায় ছবি তোলা, ক্রমাগত তার যৌনাঙ্গ এবং যৌন পরিচয় নিয়ে প্রশ্ন তোলা, সর্বোপরি একজন ছেলেকে জোর করে একজন মেয়েতে পরিণত করার চেষ্টা – এ বিষয়গুলো খুব সহজে এড়িয়ে যাওয়া যায় না। যেকোনো প্রাপ্তবয়স্ক মানুষের ওপর এধরনের ঘটনার তীব্র ও গভীর নেতিবাচক প্রভাব পড়া স্বাভাবিক। আর ডেইভিড আর ব্রায়ানের সাথে এ ঘটনাগুলো ঘটেছিল শৈশব থেকে।

.

একজন বিখ্যাত, সম্মানিত সাইকলোজিস্ট কেন শিশুদের এধরনের আচরণে বাধ্য করবেন, পাঠকের মনে এমন প্রশ্নের উদয় হওয়া স্বাভাবিক। কোন মেডিকাল ডিগ্রি না থাকা একজন সাইকলোজিস্ট কীভাবে একের পর এক রোগীকে এতো বড় মাপের একটা সার্জারি করার পরামর্শ দিয়ে যেতে পারেন, সেটা নিয়েও প্রশ্ন জাগতে পারে। কিন্তু যৌনতা, বিশেষ করে শিশু যৌনতা সম্পর্কে ডঃ মানির দর্শন সম্পর্কে জানার পর ব্যাপারটা অসুস্থ-বিকৃত মনে হলেও, আর অস্বাভাবিক মনে হয় না।

.

দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে তার বিভিন্ন বই, জার্নাল পেপার ও বক্তব্যে বার বার জন মানি ব্যাখ্যা করেছেন কেন শৈশবেই শিশুদের যৌনতার শিক্ষা দেয়া উচিৎ। টাইম ম্যাগাযিনের এপ্রিল, ১৯৮০ সংখ্যা মানি বলেন,
'শৈশবের যৌন অভিজ্ঞতা - যেমন তুলমামূলক ভাবে বয়স্ক কোন ব্যক্তির সাথে যৌন মিলন – শিশুর জন্য নেতিবাচকই হবে এমন কোন কথা নেই'।[5]

যদি কোন কোন পাঠক মানির উপরের কথার মধ্যে পেডোফিলিয়া বা শিশুকামিতার গন্ধ পেয়ে থাকেন তাহলে ডাচ পেডোফিলিয়া ম্যাগাযিন "পাইডিকা"-তে ১৯৯১ এর সাক্ষাতকারে বলা জন মানির নিচের কথাগুলো হয়তো অস্পষ্ট ছবিকে আরেকটু পরিষ্কার করবে –
"ধরুন আমি যদি দেখি ১০ বা ১১ বছর বয়সের একটি ছেলে বিশের বা ত্রিশের কোঠার কোন পুরুষের প্রতি তীব্র শারীরিক আকর্ষণ বোধ করছে, যদি তাদের সম্পর্ক পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে হয়, তাদের বন্ধন যদি পারস্পরিক হয়, তাহলে আমার মতে এধরনের সম্পর্ককে কোন ভাবেই বিকারগ্রসথ বা অসুস্থ (pathological) বলা যায় না।"[6]
পেডোফিলিয়া বা শিশুকামের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে একই সাক্ষাৎকারে জন মানি বলেন –
"স্নেহময় শিশুকাম (affectional pedophilia) হল সহজ ভাষায় শিশুদের প্রতি স্নেহময় আকর্ষণ। অভিভাবক সুলভ ভালোবাসা ও বন্ধনের যৌন ভালোবাসা ও বন্ধনে পরিণত হওয়া। এই স্নেহময় সম্পর্ক, পুরুষ শিশুকামের ক্ষেত্রে পিতৃ সুলভ ভালোবাসার মতো। এতে কেবল পিতৃ সুলভ ভালোবাসার সাথে যৌন বা প্রেমময় বন্ধন যুক্ত হয়েছে। স্নেহময় ভালোবাসার সাথে প্রেম ও কামনা যুক্ত হয়েছে।"[7]

.

পাইডিকার এডিটোরিয়াল বোর্ডের সদস্য ডাচ প্রফেসর থিও স্যানফোর্টের -Boys & Their Contacts with Men: A Study of Sexually Expressed Friendships – নামের বইয়ের ভূমিকাও লেখেন জন মানি। বইয়ের বিষয়বস্তু ছিল এগারো থেকে শুরু করে বিভিন্ন বয়সের ছেলেদের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষের সাথে পায়ুকামের আনন্দঘন বর্ণনা। থিও স্যানফোর্টের দাবি বইয়ের প্রতিটি বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। জন মানি এ বইয়ের ভূমিকায় লেখেন –
"২০০০ সাল ও তার পরে জন্ম নেওয়া প্রজন্মের জন্য আমরা হব ইতিহাস। শিশু যৌনতা ও এর মূলনীতির ব্যাপারে আমাদের আত্মকেন্দ্রিক, নৈতিকতা নির্ভর অজ্ঞতা নিঃসন্দেহে পরবর্তী প্রজন্মকে বিস্মিত করবে...শিশুকামিতা ততোটুকই ঐচ্ছিক, বাঁহাতি হওয়া বা অন্ধ হওয়া যতোটুক ঐচ্ছিক...এটি একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং অত্যন্ত ইতিবাচক বই।"[8]

.

Development of paraphilia in childhood and adolescence – নামক প্রবন্ধে জন মানি বলেন –
"শিশুকাম স্বেচ্ছায় বেছে নেওয়া না, আর ইচ্ছে করলেই একজন শিশুকামি একে ছেড়ে আসতে পারে না। শিশুকামি যৌনতার ব্যাপারে ব্যক্তির সিদ্ধান্ত বা অনুরক্তি বা, বরং এটি যৌন-মনস্তাত্ত্বিক গঠন। একজন মানুষের শিশুকামি হওয়া বাঁহাতি বা কালার ব্লাইন্ড হবার মতো (অর্থাৎ বিষয়টি তার সিদ্ধান্ত এবং ইচ্ছার ঊর্ধ্বে)।"[9]

.

শিশুকাম ছাড়া অন্যান্য যৌন বিকৃতির ব্যাপারেও মানির অবস্থান কম বিস্ময়কর না। জন মানি তার পাবলিক লেকচার এবং ক্লাসগুলোতে ইচ্ছাকৃত এমন সব বিষয় উপস্থাপন করতেন যা যে কোন বিবেচনায় চরম মাত্রার অশ্লীল হিসেবে গণ্য হবে। উইনিপেগের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে একবার অতিথি হয়ে লেকচার দিতে এসে প্রথমদিন উপস্থিত দর্শক, সাংবাদিক, প্রফেসর ও ফার্স্ট ইয়ার মেডিকাল ছাত্রদের সামনে মানি একটি ভিডিও উপস্থাপন করেন যেটাতে পশু কাম, মানব মূত্র পান, মানব বর্জ্য খাওয়া, অ্যাম্পুটেইশান ফেটিশ সহ বিভিন্ন যৌন বিকৃতির ছবি ও ভিডিও উপস্থাপন করা হয়। পরের দিন তিনি গ্রুপ সেক্সের একটি ভিডিও দেখান। ভিডিও শেষে ঘোষণা করেন, বিয়ে হল নিছক একটি অর্থনৈতিক বোঝাপড়া যেখানে হৃদয় মানিব্যাগের অনুসরণ করে। আর অযাচারকে অপরাধ বিবেচনা করা অনুচিত।[10]

.

আধুনিক সেক্সোলজির অন্যান্য আরো অনেক শব্দের মতো প্যারাফিলিয়া (Paraphilia) শব্দটিও উদ্ভাবন করেন ব্যক্তিগত জীবনে উভকামি জন মানি। এর আগে বিকৃত যৌনাচারের ক্ষেত্রে "Perversion" বা "বিকৃতি" শব্দটি ব্যবহৃত হত। কিন্তু জন মানি প্যারাফিলিয়া শব্দের প্রচলন ঘটান। "বিকৃতি"- এর সাথে নেতিবাচকতা যুক্ত থাকে। জন মানি শিশুকাম, অজাচার ও উভকামিতাসহ নানা বিকৃত যৌনাচারকে নেতিবাচকতার কবল থেকে মুক্ত করে কেবল "অপ্রচলিত" হিসেবে সংজ্ঞায়িত করেন। অন্যদিকে স্বাভাবিক যৌনাচারকে মানি সংজ্ঞায়িত করেন Normophilia হিসেবে। মানির ভাষায় Normophilia হল এমন সব ধরণের যৌনাচার যা কোন সমাজের বিদ্যমান মানদণ্ড অনুযায়ী – সেটা আইন, ধর্ম বা অন্য কোন কিছু হতে পারে - স্বাভাবিক (Norm) হিসেবে গণ্য হয়। অর্থাৎ যৌনতা কেবল প্রচলিত আর অপ্রচলিত। প্রথাগত আর প্রথাবিরোধী। প্রাকৃতিক ভাবে যৌনতার মধ্যে কোন ভালো বা মন্দ নেই। কোন সুস্থ যৌনতা আর কোন বিকৃত যৌনতা নেই। যৌনতার ব্যাপারে কেবল সমাজের ধারণা আছে। এভাবে ভাষার অত্যন্ত চাতুর্যপূর্ণ ব্যবহারের মাধ্যমে বস্তুত জন মানি সব ধরণের যৌনাচারকে স্বাভাবিক হিসেবে উপস্থাপন করেন। কারণ যদি কোন সমাজে শিশুকাম গ্রহণযোগ্য হয় তাহলে সেই সমাজের সেটাই প্রথা। এখানে নৈতিক বিচারে কোন জায়গা আর থাকে না। পুরো ব্যাপারটাই আপেক্ষিক। জন মানির জগতে কোন যৌনাচারই বিকৃত না। সব কিছুই স্বাভাবিক। তাই ৬/৭ বছরে বাচ্চাদের সমকামী যৌনতার অনুকরণে বাধ্য করা, যমজ দুই ভাইকে অজাচারের অনুকরণে বাধ্য করার সাথে "ঠিক বা ভুলের" কোন সম্পর্ক নেই।

.

ডেইভিড রাইমারের গল্পকে নিছক একজন ম্যাড সায়েন্টিস্টের পাগলাটে এক্সপেরিমেন্ট কিংবা একজন বিকৃতকামীর বিকৃতির বহিঃপ্রকাশ হিসেবে উড়িয়ে দেওয়া সহজ। কিন্তু বাস্তবতা হল তার নিজের দর্শনের জায়গা থেকে চিন্তার জায়গা থেকে ডঃ জন মানি নির্দোষ। মানির অপরাধ এবং রাইমারদের ট্র্যাজিক পরিণতি একটি নির্দিষ্ট দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গির ফলাফল। যদি এর থেকে আলাদা করে পুরো ব্যাপারটিকে একজন ব্যক্তির বিচ্ছিন্ন বিকৃতির ফলাফল হিসেবে চিত্রিত করা হয় তাহলে মূল সমস্যা ঢাকা পড়ে যায়। বিকৃতকামী, বিকৃত চিন্তার জন মানি নিঃসন্দেহে জঘন্য অপরাধী। কিন্তু তার অপরাধ হল উপসর্গ। মূল রোগ হল মানব যৌনতা ও যৌন- মনস্তত্ত্বের ব্যাপারে ঐ দর্শন ও দৃষ্টিভঙ্গি যার উপর ভর করে জন মানি তার কাজগুলোকে জায়েজ করছিল। আর এ দর্শনের মূলনীতিগুলো হল –

.

১) প্রতিটি মানুষ সর্বকামী (pansexual/omnisexual) হিসেবে জীবন শুরু করে। তারপর সে কোন এক বা একাধিক ধরনের যৌনাচারকে বেছে নেয়। এটি জন্মের সময় নির্ধারিত বা প্রাকৃতিক ভাবে নির্ধারিত না। প্রাকৃতিক ভাবে নারী ও পুরুষের মধ্যে যৌনতা সীমাবদ্ধ, এ কেবলই একটি সামাজিক প্রচলন।

.

২) মূলত সব ধরণের যৌনতাই স্বাভাবিক। সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন যৌনতার ব্যাপারে আমাদের ধারণা বদলায়। আমাদের সামাজিক চিন্তার কারণে আমরা কিছু যৌনাচারকে স্বাভাবিক আর কিছু যৌনাচারকে অস্বাভাবিক মনে করি।

.

৩) জন্মের পর থেকেই একজন শিশুর মধ্যে যৌনতার ধারণা ও বোধ বিদ্যমান থাকে। একারণেই শিশুকাম বা অজাচার অস্বাভাবিক কিছু না। কালার ব্লাইন্ড বা বাঁহাতি হবার মতো। সমাজের বিদ্যমান নৈতিকতার কাঠামো কারণে আমরা এ কাজগুলোকে অপরাধ বা বিকৃতি মনে করি।

***

ভয়ঙ্কর ব্যাপারটা হল এই চিন্তাগুলো জন মানির একার বিচ্ছিন্ন চিন্তা না। বরং পশ্চিমের আধুনিক যৌন-চিন্তা এ মূলনীতিগুলোকে সর্বজনীনভাবে স্বীকার করে। এবং গত চার দশক বা আরো বেশি সময় ধরে এর অসংখ্যবার এ সত্য প্রমাণিত হয়েছে। মৃত্যুর পরও জন মানির চিন্তা তার প্রভাব জানান দিচ্ছে। গত বেশ ক'বছর ধরে পশ্চিমে "ট্রান্সজেন্ডার রাইটস" নিয়ে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। মিডিয়ার মাধ্যমে ব্যাপকভাবে এ আন্দোলনকে সমর্থন দেওয়া হচ্ছে। "৫২ বছর বয়েসী ৭ সন্তানের ব্যাপারে এখন ৬

বছরের ট্রান্সজেন্ডার মেয়ে হিসেবে পরিচিত হতে চান", "ব্রিটেনের প্রথম জেন্ডার ফ্লুয়িড পরিবার: বাবা নিজেকে নারীতে পরিণত করছেন, মা নিজেকে পুরুষ মনে করেন, আর ছেলে বড় হচ্ছে জেন্ডার নিউট্রাল হিসাবে" – এধরনের খবর আশঙ্কাজনক বেড়ে গেছে। সাম্প্রতিক এক রিপোর্ট অনুযায়ী ব্রিটেনে প্রতি সপ্তাহে ৫০ জন শিশুকে Gender Dysphoria ও Gender Change সঙ্ক্রান্ত ক্লিনিকে পাঠানো হচ্ছে, যার মধ্যে ৪ বছর বয়েসী শিশুও আছে। ব্যাপারটা কী? পশ্চিমা বিশ্বে সবাই কি রাতারাতি হিজড়া হয়ে যাচ্ছে?

.

সর্বশেষ জরিপ অনুযায়ী প্রতি ২০০০ জনে ১ জন True Hermaphrodite বা intersex ব্যক্তিকে পাওয়া যায়। জনসংখ্যার ০.০৫% । এছাড়া বাকি ৯৯ মানুষ %৯৫/হয় নারী অথবা পুরুষ। অর্থাৎ মানুষের পরিচয় বাইনারি। অথচ এখন যে কোন মানুষ বা শিশু যদি বলে সে একজন নারী হিসেবে, বা পুরুষ হিসেবে, বা অন্য কোন "কিছু" হিসেবে পরিচিত হতে চায়, তবে তাই ধরে নিতে হবে। সে শারীরিকভাবে, জন্মসূত্রে যাই হোক না কেন! নিউ ইয়র্কে আইনি ভাবে ৩১ টি লৈঙ্গিক পরিচয়কে (Gender Identity) স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। ফেইসবুকে কোন জায়গায় ৬০টি, কোন জায়গায় ৭১ টি জেন্ডার আইডেন্টিটির লিস্ট থেকে "নিজের পরিচয়" বেছে দেওয়া অপশান দেওয়া আছে। ল'রিয়েল, ফোর্ড, নাইকি, টার্গেটসহ বিভিন্ন মেগা ব্র্যান্ড তাদের বিজ্ঞাপনে খোলাখুলি ট্রান্সজেন্ডার মডেলদের ব্যবহার করছে। বিভিন্ন ফ্যাশন হাউস জেন্ডার নিউট্রাল/জেন্ডার ফ্লুয়িড পোশাক বের করা শুরু করেছে। ব্রিটিশ ডিপার্টমেন্ট স্টোর জন লুইস ঘোষণা করেছে তারা বাচ্চাদের পোশাক আর "ছেলে" বা "মেয়ে" ট্যাগ দিয়ে আলাদা করবে না। এখন থেকে তারা বাচ্চাদের শুধু "Unisexz"/"Gender Neutral" পোশাক বিক্রি করবে।

.

মার্চে টাইম ম্যাগাযিন মানুষের মৌলিক পরিচয় ও যৌনতার পরিবর্তনশীল সংজ্ঞার এ যুগ নিয়ে কাভার স্টোরি করেছে। Beyond 'He' or 'She': The Changing Meaning of Gender and Sexuality – শিরোনামের এ লেখায় সমকামী অধিকার নিয়ে কাজ করা অ্যাডভোকেসি গ্রুপ GLAAD এর একটি জরিপের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে অ্যামেরিকার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ তরুণ এখন আর নিজেদের সম্পূর্ণভাবে স্বাভাবিক যৌনাচারে আকৃষ্ট (Heterosexual) অথবা সম্পূর্ণ ভাবে সমকামিতায় আকৃষ্ট মনে করে না। বরং "মাঝামাঝি কিছু একটাকে" বেছে নেয়। একইভাবে অ্যামেরিকান তরুনদের এক-তৃতীয়াংশ "পুরুষ" বা "নারী" হিসেবে নিজেদের পরিচয় দেয় না।[11] অ্যামেরিকাসহ পশ্চিমের অনেক দেশে "ট্রান্সজেন্ডার টয়লেট অধিকার" নিয়ে আন্দোলন চলছে। যার মূল সারমর্ম হল একজন পুরুষ যদি নারী হিসেবে পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে তাহলে নারীদের জন্য নির্ধারিত টয়লেট ব্যবহার করতে পারা তার আইনগত অধিকার। এমনকি কিছু কিছু জায়গায় যদি একজন পুরুষ যদি নিজেকে মেয়ে বলে পরিচয় দিতে চায় আর আপনি যদি তার ক্ষেত্রে he/him/his - ইত্যাদি সর্বনাম ব্যবহার করেন তবে সেটাকে বেআইনি ঘোষণা করার চিন্তাভাবনা চলছে। কারণ এটা ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ, মানবাধিকার ক্ষুণ্ণ করা এবং বৈষম্য। এমনকি কিছুদিন আগে বাংলাদেশের ডেইলি স্টার তাদের সাপ্তাহিক সাপ্লিমেন্ট "Lifestyle" এ Gender fluidity/ Gender Neutrality – কে সমর্থন করে কাভার স্টোরি করেছে।[12]

.

ঠিক দু'দশক আগে যেভাবে সমকামিতার স্বাভাবিকীকরন ও গ্রহণযোগ্যতা তৈরির জন্য মিডিয়াকে ব্যবহার করা হয়েছিল, বর্তমানে "ট্রান্সজেন্ডার রাইটস"-এর নামে ঠিক একই কাজ করা হচ্ছে। "যৌনতা, ব্যক্তি পরিচয় এসবই আপেক্ষিক। ব্যক্তির স্বাধীন সিদ্ধান্তের বিষয়। একজন মানুষ ভেতরে কেমন তাই মুখ্য। সামাজিক প্রথা আর পশ্চাৎপদতার কারণে মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ সৃষ্টি উচিৎ না। যখন কারো ক্ষতি হচ্ছে না তখন বিরোধিতা কেন?" – ইত্যাদি বিভিন্ন কথার মাধ্যমে এই বিকৃতি ও অসুস্থতাকে স্বাভাবিক, নির্দোষ কিছু হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা চলছে। আর এসব কিছুর মূলে আছে ডঃ জন মানির থিসিস ও ধারণা। তার কিছু অনুসিদ্ধান্ত বাদ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সার্বিক ভাবে তার এসব ধারণাকে গ্রহণ করা হয়েছে। তার তৈরি করা (কু)যুক্তি, ভাষা ও অপ-বিজ্ঞানের কাঠামোর মধ্যে দিয়েই এ বিকৃতিকে মিডিয়া, সাইকলোজিস্ট এবং সেক্সোলজিস্টরা জায়েজ করার চেষ্টা করছে। এর স্বপক্ষের বয়ান তৈরি করছে। যৌনতার ব্যাপারে পশ্চিমের বর্তমানের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা অনেকাংশেই জন মানির অবয়বে গড়া। ডেইভিড রাইমারের গল্প আর জন মানির অপরাধকে বুঝতে হলে ও বাস্তবতার আলোকেই বুঝতে হবে।

.

তবে জন মানির ধারণাগুলো তার নিজের ছিল না। সে এগুলোকে সুবিন্যস্ত কাঠামো দিয়েছিল সত্য, কিন্ত তা গড়ে উঠেছিল আরেকজনের স্থাপিত ভিত্তির উপর। একারণেই নিউইয়র্ক টাইমস বুক রিভিউ জন মানির “Man & Woman, Boy & Girl”- বইয়ের রিভিউতে বলেছিল, এ বইটি হল সেক্সোলজি সম্পর্কে শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের লিস্টে দ্বিতীয়। লিস্টের প্রথম বই কোনটা? পশ্চিমা যৌন চিন্তা সম্পর্কে লিখিত শতাব্দীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের লেখক কে? যৌনতা সম্পর্কে জন মানিসহ অগণিত গবেষক ও সাইকলোজিস্টের এবং সার্বিকভাবে পশ্চিমের চিন্তার ভিত্তিপ্রস্তর কে স্থাপন করেছিল? যে তিনটি মূলনীতির উপর ভিত্তি করে জন মানি তার বিকৃত উপসংহারে পৌঁছেছিল, কে ছিল সেগুলোর প্রবক্তা?
এ প্রশ্নগুলোর জবাব পেতে হলে আমাদের জানতে হবে ডঃ কিনসির ব্যাপারে।

(শেষ)



---

[4] http://nyti.ms/2pBqu0N

[5] “A childhood sexual experience, such as being the partner of a relative or of an older person, need not necessarily affect the child adversely.” [ATTACKING THE LAST TABOO (Time Magazine, April 14, 1980.)]

[6] If I were to see the case of a boy aged ten or eleven who's intensely erotically attracted toward a man in his twenties or thirties, if the relationship is totally mutual, and the bonding is genuinely totally mutual ... then I would not call it pathological in any way. [Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5.]

[7] Paedophilia is...affectional paedophilia in layman’s terms…the straight forward affectional attraction to children…a paedophilic attraction to children…an overflow of parental pairbonding into erotic pair bonding… The affectional relationship, in male paedophilia at least, is a fatherly relationship…with erotic or lover-lover pairbonding…a combination of affectionate love as well as the lust factor…[until] puberty. [Interview: John Money. PAIDIKA: The Journal of Paedophilia, Spring 1991, vol. 2, no. 3, p. 5.]

[8] . “For those born and educated after the year 2000we will be their history, and they will be mystified by our self-important, moralistic ignorance of the principles of sexual and erotic development in childhood... Pedophilia and ephebophilia are no more a matter of voluntary choice than are left-handedness or color blindness...It is a very

important book, and a very positive one." [Introduction - Boys & Their Contacts with Men] https://www.scribd.com/document/659...

[9] Pedophilia is not voluntarily chosen, nor can it be shed by voluntary decision. It is not a preference but a sexuerotic orientation or status. It maybe viewed as analogous to left-handedness or color blindness. [John Money - Development of paraphilia in childhood and adolescence]

[10] As Nature Made Him – John Colapinto

[11] http://ti.me/2mMG6K1
http://ti.me/2mCpbIk

[12] "Androgyny in a fair world" [Lifestyle, The Daily Star, 8th August, 2017]

১৮৯

'সঙ্কীর্ণ বস্তুবাদী দর্শনে 'প্রকৃতি' এবং ইসলাম'

-ড্যানিয়েল হাকিকাতজু, অনুবাদ: সত্যকথন ডেস্ক

নাস্তিক এবং সেকুলারিস্টরা অনেক সময় তাদের নৈতিকতার মানদণ্ড হিসেবে প্রকৃতিকে উপস্থাপন করার চেষ্টা করে। তারা দাবি করে, মানুষ হিসাবে ভালো ও মন্দের পার্থক্য করার জন্য প্রকৃতির দিকে তাকানোই যথেষ্ট। মানুষও অন্য দশটা পশুর মতোই। তাই মানুষ তার সহজাত প্রবৃত্তির অণুসরণ করলেই সুন্দর, স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে।

.

তারা প্রায়ই বলে, ধর্ম মানুষের সহজাত প্রবৃত্তির উপর হস্তক্ষেপ করে, স্বাভাবিক কামনা-বাসনা চরিতার্থ করায় বাঁধা দেয়। ধর্ম মানুষকে তার স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য থেকে বিচ্যুত করতে চায়। আর এজন্যই ধর্ম ব্যক্তিগত জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।

.

কোন কোন বিষয়গুলোকে ‘প্রাকৃতিক’, ‘সহজাত’, কিংবা ‘স্বাভাবিক’ ধরা হচ্ছে, কীভাবে এগুলোকে সংজ্ঞায়িত করা হচ্ছে, এ ব্যাপারগুলো তারা সযত্নে এড়িয়ে যায়।

.

‘প্রাকৃতিক’ বলতে কী বোঝায় – এ প্রশ্নের ব্যাপারে চিন্তা করলে আমাদের অধিকাংশের মাথায় ধরাবাঁধা নির্দিষ্ট কিছু ছবি ভেসে উঠে। কোলাহলপূর্ণ শহর আর সবুজ শ্যামল তৃণভূমির মধ্যে কোনটি বেশি প্রাকৃতিক? ক্যান্ডিবার আর সালাদের মধ্যে কোনটি বেশি প্রাকৃতিক? আমরা সবাই কিছু জিনিসকে প্রাকৃতিক এবং কিছু জিনিসকে কৃত্রিম বা ম্যান মেইড হিসেবে জানি।

.

কিন্তু একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখবেন যে প্রাকৃতিক ও কৃত্রিমের মধ্যে এ পার্থক্য তেমন তাৎপর্যপূর্ণ না। মানুষ যদি আর দশটা প্রাণীর চেয়ে বেশি কিছু না হয়, তাহলে মানুষের বানানো স্থাপনা, সরঞ্জাম, বাড়িঘর ইত্যাদিকে কেন প্রাকৃতিক হিসেবে গণ্য করা হবে না? কেন দালানকোঠা প্রাকৃতিক ন্য,কিন্তু পিঁপড়ার বাসা প্রাকৃতিক?

.

আসলে,কোন বিষয়টা প্রাণী আর জড় বস্তুকে আলাদা করে? সব পশুই কি অণু-পরমাণুউর কিছু নির্দিষ্ট অণু-পরমাণু আর বিন্যাসের ফলাফল না? যে অণু-পরমাণু দিয়ে পশুরা তৈরি, সে একই অণু-পরমাণু দিয়ে কি গাছপালা,নদী নালা, পাহাড়-পর্বত, সাগরের ঢেউ, হারিকেন ইত্যাদি তৈরি না? সবকিছু তো সেই একই অণু পরমাণুর সমষ্টি। আর যদি তাই হয় তাহলে সাইক্লোনের কারণে ধানক্ষেত ধ্বংস হয়ে যাওয়া আর পঙ্গপালের ঝাঁকের মাধ্যমে সেই একই ধানক্ষেত ধ্বংস হয়ে যাওয়ার মাঝে মৌলিক পার্থক্য কী? আর এ দুটোর সাথে মানুষের মাধ্যমে কোন ধান ক্ষেত ধ্বংস হয়ে যাবার মৌলিক পার্থক্য কী?

.

.

সঙ্কীর্ণ বস্তুবাদী দর্শন আপনাকে এধরনের উপসংহার টানতে বাধ্য করে। কিন্তু এধরনের চিন্তা ও উপসংহার যে মানুষকে নৈরাজ্যবাদ (Anarchism) ও ধ্বংসবাদের (Nihilism) দিকে ঠেলে দেয়, এটা নাস্তিক এবং সেক্যুলারিস্টরাও বোঝে। কিন্তু এধরণের চিন্তা ভাবনার মধ্যে যে অনেক ভুল-ত্রুটি রয়েছে তা নাস্তিক এবং সেকুলারিস্টরা ভালমতই জানে। তাই এধরনের বিষয়ে যে জটিলতা বিদ্যমান তা অস্বীকার করে এবং প্রাকৃতিক বনাম কৃত্রিমতা’র মাঝে দ্বন্দ্ব বাঁধিয়ে (যা কিনা তাদের চিন্তা ভাবনার সম্পূর্ণ বিপরীত) তারা তাদের বক্তব্যকে জোরালো করতে চায়।

বাস্তবতা হল, বস্তুবাদী দর্শনের আলোকে চিন্তা করে, কেবল "প্রকৃতি" বা "প্রাকৃতিক" – এর আশ্রয় নিয়ে মানব অস্তিত্বের কোন বিশেষ অর্থ বা মূল্য খুঁজে বের করা সম্ভব না। একটা বিভ্রান্তি তৈরি করা যায় কেবল। আর এ বিভ্রান্তি, কোনটা প্রাকৃতিক আর কোনটা না, এ প্রশ্নের একটি সুনির্দিষ্ট, সুস্পষ্ট এবং বৈজ্ঞানিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত উত্তর আছে, প্রচলিত এই ভুল ধারণার উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। যেমন ধরুন, সবুজ তৃণভূমি আর সালাদ যে প্রাকৃতিক এ নিয়ে সন্দেহের কোন সুযোগ নেই !

.

কিন্তু বস্তুবাদী দর্শনের অবস্থান থেকে খুব সহজেই বেশ কিছু প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়া যায়।যেমনটা আমরা দেখলাম। এখন পর্যন্ত কোন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নেই যে পরীক্ষায় 'প্রাকৃতিক' বলে কোন ফলাফল পাওয়া যায়। মাইক্রোস্কোপের মধ্যে দিয়ে সবুজ মাঠ বা সালাদের দিকে তাকালে 'প্রাকৃতিক' নামের কোন লেবেল অথবা ফলাফল আপনি পাবেন না।

.

.

তার মানে কি বাস্তবে প্রকৃতি বা প্রাকৃতিক বলে কিছু নেই?
এখানেই অস্তিত্বের দর্শন (Ontology) এবং মেটাফিযিক্স গুরুত্বপূর্ণ। আমরা দেখেছি অস্তিত্বের ব্যাপারে নাস্তিক ও সেকুলারিস্টদের প্রচারিত বস্তুবাদী দর্শন কখনই মজবুতভাবে প্রাকৃতিক আর কৃত্রিম-এর মধ্যে পার্থক্য বজায় রাখতে পারে না। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি এ ব্যাপারে কী বলে?

.

প্রকৃতির ধারণার পরিবর্তে ইসলাম আমাদের সৃষ্টি ও স্রষ্টার কথা বলে। সৃষ্টি ও স্রষ্টার ধারণা সরাসরি জানিয়ে দেয় যে, আমাদের চারপাশের জগত কোন চিরন্তন, এবং শাশ্বত সত্তা নয়, যার অস্তিত্ব থাকা অপরিহার্য, যার অস্তিত্ব ছাড়া অন্য কোন অস্তিত্ব কল্পনা করা সম্ভব না। বরং এক অর্থে 'প্রকৃতির' কোন অস্তিত্বই নেই। অর্থাৎ প্রকৃতি এমন কোন স্বয়ংক্রিয় ও স্বাধীন সত্তা না যা একটা ফাঁকা ক্যানভাসের মতো নিরন্তর বিদ্যমান। বরং মহাবিশ্ব এবং মহাবিশ্বে যা কিছু আছে সবই স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট। সব কিছুর এক মূহুর্ত থেকে তার পরবর্তী মূহুর্ত পর্যন্ত টিকে থাকা নির্ভর করে স্রষ্টার ইচ্ছার ওপর। তাঁর ইচ্ছার কারণেই সব কিছুর অস্তিত্ব সম্ভবপর হয়।

.

সুতরাং একেবারে গোড়া থেকেই বস্তুবাদী দর্শন এবং ইসলামের অবস্থানের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য রয়েছে। আমরা যদি আরও গভীরে যাই তাহলে তা আরও পরিষ্কার হয়। নিচের আয়াত গুলোর বক্তব্য নিয়ে চিন্তা করে দেখুন -

.

সাত আসমান, যমীন আর এগুলোর মাঝে যা আছে সব কিছুই তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। এমন কোন জিনিসই নেই যা তাঁর প্রশংসাসহ পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না। কিন্তু তোমরা বুঝতে পার না কীভাবে তারা তাঁর মহিমা ঘোষণা করে। তিনি পরম সহিষ্ণু, বড়ই ক্ষমাপরায়ণ। [আল-ইসরাইল, আয়াত ৪৪, (১৭:৪৪)]

.

"নিশ্চয় আমি আসমানসমূহ, যমীন ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত পেশ করেছি, অতঃপর তারা তা বহন করতে অস্বীকার করেছে এবং এতে ভীত হয়েছে। আর মানুষ তা বহন করেছে। নিশ্চয় সে ছিল অতিশয় যালিম, একান্তই অজ্ঞ।" [আল-আহযাব, আয়াত ৭২, (৩৩:৭২)]

.

"যখন তারা পিপীলিকার উপত্যকায় আসল তখন একটি পিপীলিকা বলল- 'ওহে পিঁপড়ার দল! তোমাদের বাসস্থানে ঢুকে পড়, যাতে সুলাইমান ও তার সৈন্যবাহিনী তাদের অগোচরে তোমাদেরকে পদপিষ্ট ক'রে না ফেলে।" [আন-নামল, আয়াত ১৮, (২৭:১৮)]

.

"অতঃপর হুদহুদ অবিলম্বে এসে বলল- 'আমি যা অবগত হয়েছি আপনি তা অবগত নন, আমি সাবা থেকে নিশ্চিত খবর নিয়ে

আপনার কাছে এসেছি।”[আন-নামল, আয়াত ২২, (২৭:২২)]

.

আরও অসংখ্য হাদিসে পাথর যা অনুভব করতে পারে, গাছের কান্না, পাহাড়ের ভালোবাসা ইত্যাদি বর্ণনা এসেছে। অস্তিত্বের এ দর্শন এমন জগতের কথা বলে যা স্রষ্টার নিরত উপাসনায় মগ্ন সৃষ্টি দ্বারা পূর্ণ। আমাদের চারপাশে যা কিছু আছে সব কিছুর সাপেক্ষে, এবং এ সব কিছুর জন্য কৃতজ্ঞ হয়ে যদি আমরা ‘প্রাকৃতিক’– কে সংজ্ঞায়িত করি, তাহলে স্রষ্টার প্রতি আত্মসমর্পণ করা, একমাত্র তাঁরই ইবাদত করাই মানুষের জন্য সবচেয়ে ‘প্রাকৃতিক’।

.

কুরআনের দিকে তাকালে মানুষ ও মানব অস্তিত্বের ব্যাপারে আমরা অন্যান্য আরো বক্তব্য পাই -

.

‘নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত; কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং সবরের’। [আল-আসর, আয়াত ২-৩, (১০৩:২-৩)]

.

‘সৃষ্টিগত ভাবে মানুষ ত্বরাপ্রবণ’।[আম্বিয়া,আয়াত ৩৭,(২১:৩৭)]

.

‘মানুষ তো সৃজিত হয়েছে ভীরুরূপে’। [মায়া’রিজ,আয়াত ১৯, (৭০:১৯)]

.

‘তারা (স্ত্রীরা) তোমাদের পরিচ্ছদ এবং তোমরা তাদের পরিচ্ছদ'। [বাকারাহ,আয়াত ১৮৭, (২:১৮৭)]

.আর অবশ্যই আমরা ফিতরাতের কথা পাই যা হল মানবজাতির মৌলিক স্বাভাবিক প্রবণতা যার বর্ণনা বিভিন্ন হাদিসে এসেছে, যেমন –

.

“প্রত্যেক মানুষ ফিতরাতের উপর জন্মগ্রহণ করে তারপর তার বাবা মা তাকে ইহুদি, খ্রিস্টান অথবা যাদুকর বানায়, যেমনিভাবে প্রত্যেক পশু নিখুঁত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নিয়ে জন্ম নেয়। তাদের মধ্যে তোমরা কোন খুঁত দেখতে পাও কি?” [সহিহ বুখারি, হাদিসঃ ১২৯২, সাহিহ মুসলিম ২৬৫৮]

.

.

ইসলামের দর্শন দূরে থাকুক, আমাদের শুধু ফিতরাত নিয়ে আলোচনা করলেই খন্ডের পর খন্ড ঢাউস বই হয়ে যাবে। নৈতিকতা ও রাজনীতি নিয়ে আজকের চলমান আলোচনাকে বোঝার জন্য বস্তুবাদী দর্শন আর ইসলামের অবস্থানের মধ্যেকার মৌলিক পার্থক্যগুলো বোঝা অত্যন্ত জরুরী। কারণ শেষপর্যন্ত ব্যক্তির নৈতিকতা তার জীবনবোধ, দৃষ্টিভঙ্গি ও অস্তিত্বের দর্শনের ওপরই নির্ভর করে। ভালো ও মন্দের সংজ্ঞা মৌলিক ভাবে মহাবিশ্ব, এর অস্তিত্ব এবং এ মহাবিশ্বে আমাদের অবস্থা ও উদ্দেশ্যের ওপর নির্ভর করে। আমরা মুসলিমরা যদি অজান্তে বস্তুবাদী অবস্থান গ্রহণ করি তাহলে তা আমাদেরকে নৈতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক এবং রাজনৈতিক ভাবে পঙ্গু করে ফেলবে।

.

অন্যদিকে আমরা যদি ইসলাম ও বস্তুবাদের মধ্যেকার পার্থক্যগুলো ভালভাবে জানি তাহলে নাস্তিক এবং সেকুলারদের তর্কের

ধরণ, তাদের লজিকাল ফ্যালাসি এবং বিশেষ করে তাদের ভুল ব্যবহৃত রেডিমেইড যুক্তিগুলোর ভুলগুলো চিহ্নিত করতে পারব ইনশা আল্লাহ্।

১৯০

কেমন ছিলেন তিনি? – ৪

-শিহাব আহমেদ তুহিন

প্রিয়জনদের সাথে মমতাময় আচরণ আমাদের স্বভাবজাত। প্রকৃত মহত্ত্ব তো তখন প্রকাশ পায় যখন রক্তের সম্পর্ক না থাকার পরেও, কোন স্বার্থ না থাকা সত্ত্বেও আমরা কারো সাথে উত্তম আচরণ করি। তার খোঁজখবর নেই, বিপদে-আপদে পাশে এসে দাঁড়াই। ঠিক এ কারণেই আমরা অনেকেই হয়তো একজন ভালো স্বামী, ভালো স্ত্রী, অনুগত সন্তান কিন্তু উত্তম প্রতিবেশী নই।

.

রাসূল (সা) যেমন ছিলেন আদর্শ স্বামী, মমতাময় পিতা, তেমনি তিনি একজন উত্তম প্রতিবেশীও ছিলেন। পবিত্র কুর'আনের এ আয়াতকে যেন তিনি তাঁর অন্তরে ধারণ করেছিলেন-
"তোমরা ইবাদাত করো আল্লাহর, তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না। আর ভালো ব্যবহার করো মাতা-পিতার সাথে, নিকট আত্মীয়ের সাথে, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট আত্মীয়- প্রতিবেশী, অনাত্মীয়- প্রতিবেশী, পার্শ্ববর্তী সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের মালিকানাভুক্ত দাস-দাসীদের সাথে। নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন না তাদেরকে যারা দাম্ভিক, অহঙ্কারী। [সূরা নিসাঃ ৩৬]

.

তিনি প্রতিবেশিদের সাথে উষ্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতেন। তাদের সম্মান করতেন, খোঁজখবর নিতেন। দুঃখ-কষ্টের সময় পাশে এসে দাঁড়াতেন। প্রতিবেশিরা বিরক্ত হয় এমন কিছু করা থেকে বিরত থাকতেন। প্রতিবেশী ভালো কিংবা খারাপ হোক, তিনি তাদের সাথে সবসময়ই উত্তম আচরণ করেছেন। মদিনায় তাঁর প্রতিবেশী হিসেবে ছিলেন আনসার ও মুহাজির সাহাবীরা। আনসার সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন সাদ ইবনে মুআয (রা), আবু আইয়্যুব (রা)। আর মুহাজিরদের সাহাবীদের মধ্যে ছিলেন আবু বকর (রা), আলী (রা), আব্বাস (রা)। তাদের সবার সাথেই তাঁর সুসম্পর্ক ছিল। সাহাবীরা রাসূল (সা) এর প্রতিবেশী হতে পেরে গর্ববোধ করতেন। বনু নাজ্জার গোত্র তো রীতিমত গর্বে ফেটে পড়তো। গর্বের সে অনুভূতি তাদের কবিতায় ফুটে উঠতো। রাসূল (সা) পাশ দিয়ে গেলে বালিকারা আবৃত্তি করতো-
"আমরা হচ্ছি বনু নাজ্জারের কন্যা,
মুহাম্মদের (সা) ন্যায় প্রতিবেশীর হয় না কোন তুলনা।"
রাসূল (সা) তাদের দিকে তাকিয়ে বলতেন, "আল্লাহ জানেন যে, আমি তোমাদের ভালোবাসি।"

.

আবার মক্কায় তিনি পেয়েছিলেন আবু লাহাব, আবুল আস ইবনে উমাইয়ার মতো বৈরী মনোভাবসম্পন্ন কিছু প্রতিবেশী। এরা তাঁর সাথে প্রচণ্ড বাজে আচরণ করতো, তাঁর বিরুদ্ধে কুৎসা রটাতো। তবুও তিনি তাদের সাথে কখনো খারাপ আচরণ করেননি। আবু লাহাবের স্ত্রী উম্মে জামিল তাঁর চলার পথে কাঁটা বিছিয়ে রাখতো। তিনি একবার সলাতরত অবস্থায় থাকাকালে এদের একজন তাঁর উপর ভেড়ার নাড়িভুঁড়ি ছুড়ে ফেলেছিলো। রাসূল (সা) দরজায় দাঁড়িয়ে তাদের উদ্দেশ্যে হতাশ কণ্ঠে বলেছিলেন, "ওহে আবদে মানাফের সন্তানেরা! প্রতিবেশীর সাথে এটা তোমাদের কেমন আচরণ?"

.

আনসার এক সাহাবী একদিন রাসূল (সা) কে এক ব্যক্তির সামনে দাঁড়ানো অবস্থায় দেখতে পেলেন। রাসূল (সা) তাঁর সামনে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিলেন। এটা দেখে আনসার সাহাবীর কষ্ট হতে লাগলো। লোকটি চলে যাবার পর সেই সাহাবী রাসূল (সা)-কে বললেন, "হে আল্লাহর রাসূল! ঐ লোকটা আপনাকে এতোক্ষণ দাঁড় করিয়ে রেখেছিলো যে আপনার জন্য আমার কষ্ট

হচ্ছিলো।” রাসূল (সা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি তাঁকে সত্যিই দেখেছো?” সাহাবী জবাব দিলেন, “হ্যাঁ।” রাসূল (সা) আবার জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি কি জানো সে কে?” সাহাবী জবাব দিলেন, “জ্বী না।” রাসূল (সা) তখন বললেন, “উনি ছিলেন জিবরাঈল (আ)। তিনি আমাকে প্রতিবেশিদের সাথে উত্তম আচরণ করতে উপদেশ দিচ্ছিলেন। একসময় আমার মনে হলো, প্রতিবেশিদের হয়তো উত্তরাধিকার বানিয়ে দেয়া হবে।”

.

জীবনের শেষ হজ্জে তিনি সবাইকে প্রতিবেশিদের সাথে সদাচারণ করতে বলেছেন। আবু উমামাহ (রা“ ,বলেন (নিজ উটে আরোহণরত অবস্থায় বিদায় হজ্জের সময় আমি রাসূল (সা) কে বলতে শুনেছি, ‘আমি তোমাদেরকে প্রতিবেশিদের সদাচারণ করতে উপদেশ দিচ্ছি’- তিনি এটা এতোবার বললেন যে, আমার মনে হলো, তিনি হয়তো প্রতিবেশিদেরকে আমাদের উত্তরাধিকার বানিয়ে দিবেন।”

.

প্রতিবেশিদের সাথে উত্তম আচরণ করা হচ্ছে ঈমানের নিদর্শন। রাসূল (সা) বলতেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহ ও শেষদিনের প্রতি বিশ্বাস রাখে, সে যেন প্রতিবেশীদের সম্মান করে।” শুধু তাই না, যদি কারো খারাপ আচরণ থেকে প্রতিবেশিরা নিরাপদ না থাকে, তবে তিনি তার ঈমানকে বাতিল ঘোষণা করেছেন। রাসূল (সা) বলেছেন, “আল্লাহর শপথ সে মুমিন না, আল্লাহর শপথ সে মুমিন না, আল্লাহর শপথ সে মুমিন না!” লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, “হে আল্লাহর রাসূল! কে সে?” রাসূল (সা) জবাবে বললেন, “যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশিরা নিরাপদ না।” এমনকি সে ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবেনা বলে তিনি সাবধান করে বলেছেন, “যে ব্যক্তির অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।”

.

পত্র-পত্রিকা খুললেই অসংখ্য খুনোখুনির সংবাদ নজরে আসে। এদের অধিকাংশই ঘটে প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে পরকীয়ার সম্পর্কের কারণে, তাদের সম্পদ অন্যায়ভাবে আত্নস্যাৎ করার কারণে। অথচ এসবই কাবীরা গুনাহ। আল্লাহর রাসূল (সা) এসব থেকে আমাদের বারবার সাবধান করে গেছেন। তিনি একদিন সাহাবীদের জিজ্ঞেস করলেন, “ব্যভিচার করার ব্যাপারে তোমরা কী বলো?” সাহাবীরা বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এটাকে হারাম করেছেন, তাই কিয়ামত পর্যন্ত এটা হারাম থাকবে।” রাসূল (সা) বললেন, “দশজন নারীর সাথে ব্যভিচার করার চেয়েও প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা বেশি পাপের কাজ।” তিনি আবার জিজ্ঞেস করলেন, “চুরি করা সম্পর্কে তোমরা কী বলো?” সাহাবীরা বললেন, “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এটাকে হারাম করেছেন, তাই কিয়ামত পর্যন্ত এটা হারাম থাকবে।” রাসূল (সা) তখন বললেন, “দশটা বাড়িতে চুরি করার চেয়েও নিজের প্রতিবেশীর বাড়িতে চুরি করা বেশি গোনাহের কাজ।”

.

এক ব্যক্তি এসে রাসূল (সা) কে তার প্রতিবেশীর ব্যাপারে অভিযোগ করলো। রাসূল (সা) তাকে ধৈর্য ধরতে পরামর্শ দিলেন। লোকটা বারবার এসে রাসূল (সা) কে একই অভিযোগ করল। রাসূল (সা) তখন তাকে বললেন, “(বাড়িতে ফিরে) যাও! তোমার সকল সম্পদ রাস্তায় ফেলে রাখো।” সে তাই করলো। মানুষজন সবকিছু নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তাকে এমনটা করার কারণ জিজ্ঞেস করলো। লোকটা তখন সবকিছু খুলে ফেলল। শুনে সবাই সে প্রতিবেশীকে অভিশাপ দিতে লাগল। অবস্থা বেগতিক দেখে সে প্রতিবেশী রাসূল (সা) এর কাছে গেলো। মানুষজন তাকে অভিশাপ দিচ্ছে বলে অভিযোগ করলো। রাসূল (সা) তাকে বললেন, “মানুষজন অভিশাপ দেয়ার আগেই আল্লাহ তায়ালা তোমাকে অভিশাপ দিয়েছেন।” লোকটা অনুতপ্ত হয়ে বলল, “আমি আর এমনটা করব না।” রাসূল (সা) তারপর সেই অভিযোগদানকারী ব্যক্তিকে বললেন, "সবকিছু বাড়িতে নিয়ে যাও। তোমার প্রয়োজন মিটে গেছে।”

.

অনেকেই আছেন পাঁচ ওয়াক্ত সলাত পড়তে পড়তে কপালে দাগ বসিয়ে ফেলেন, অথচ রূঢ় আচরণের কারণে প্রতিবেশিরা তার সাথে কথা বলতেও ভয় পায়। এমন ব্যক্তিদের রাসূল (সা) জাহান্নামের সংবাদ দিয়েছেন। এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে বলল, “হে আল্লাহর রাসূল! এক মহিলা তার সলাত, সিয়াম আর দানশীলতার জন্য পরিচিত। কিন্তু সে তার প্রতিবেশিদের কথা দিয়ে কষ্ট

দেয়।” রাসূল (সা) বললেন, “সে জাহান্নামে রয়েছে।” লোকটি আবার বলল, “একজন মহিলা নূন্যতম সলাত পড়ে, সিয়াম পালন করে, সামান্য কিছু শুষ্ক দুধ সদকা করে, কিন্তু সে তার কথা দিয়ে প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয় না।” রাসূল (সা) বললেন, “সে জান্নাতে রয়েছে।”

.

প্রতিবেশী হতে হলে যে তাকে কেবল মুসলিমই হতে হবে এমন কথা নেই। ইবনে হাজার আসকালানী (রহ) বলেন, “প্রতিবেশী শব্দটি দ্বারা মুসলিম এবং অমুসলিম, পূন্যবান এবং পাপী, বন্ধু কিংবা শত্রু, উপকারী কিংবা অপকারী, আত্নীয় অথবা অনাত্নীয়, কাছের কিংবা দূরের সবাইকেই বোঝানো হয়।” এ কারণেই সাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা) যখন নিজ বাড়িতে এসে ভেড়া জবাই করতে দেখেছিলেন, তিনি তার ইহুদি প্রতিবেশিদের কিছু ভেড়ার মাংস দেয়া হয়েছে কিনা তা জিজ্ঞেস করেছিলেন।

.

রাসূল (সা) প্রতিবেশিদের উপহার দিতে বলতেন। তিনি নিজেও প্রতিবেশিদের উপহার দিতেন। তাদের উপহার গ্রহণ করতেন। রাসূল (সা) বলতেন, “হে মুসলিম নারীরা! প্রতিবেশিদের (উপহার দেয়াকে) অবজ্ঞা করো না এমনকি যদি তা ভেড়ার ক্ষুরও হয়।” কেউ মাংসের ঝোল রান্না করলে তিনি তাতে পানি বাড়িয়ে দিয়ে প্রতিবেশিদের দিতে বলতেন। আমরা অনেকেই প্রতিবেশিদের খোঁজখবর একেবারেই নেই না। সে সুস্থ আছে নাকি অসুস্থ আছে, খেয়েছে কি খায়নি তা নিয়ে আমাদের অনেকেরই মাথাব্যাথা থাকে না। এদের সম্পর্কে রাসূল (সা) বলেন, “প্রতিবেশী ক্ষুধার্ত জেনেও যে পেটভরে খেয়ে ঘুমোতে যায়, সে আমার প্রতি বিশ্বাস রাখে না।”

.

আমরা ভালো কাজ করছি না খারাপ কাজ করছি সেটা জানার মাপকাঠি রাসূল (সা) আমাদের দিয়ে গেছেন। এক ব্যক্তি রাসূল (সা) কে জিজ্ঞেস করলো, “কীভাবে বুঝবো যে আমি ভালো কাজ করছি না খারাপ কাজ করছি?” রাসূল (সা) তাকে বললেন, “যদি তুমি তোমার প্রতিবেশিদের বলতে শোন যে তুমি ভালো কাজ করছো, তাহলে তুমি ভালো কাজ করছো। আর যদি তাদের বলতে শোন যে তুমি খারাপ কাজ করেছো, তাহলে তুমি খারাপ কাজ করেছো।”

শায়খ সালিহ আল মুনাজ্জিদ এর “كَيف عَـاملهُم صلى الله عليه وسلم” (Interactions Of The Greatest Leader) গ্রন্থ অবলম্বনে লেখা।

১৯১

সকল ইঞ্জিনিয়ারের সেরা ইঞ্জিনিয়ার

-শিহাব আহমেদ তুহিন

গত সেমিস্টারে আমাদেরকে কমিউনিকেশান ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে হয়েছিলো। এ সাবজেক্টের একটা বড় অংশ ছিল মোবাইল কমিউনিকেশনের উপরে। মোবাইল ফোনকে 'Cell-phone' ও বলা হয়।
কেন?

.

কারণ, আমরা যখন কথা বলি তখন সে কথাকে অপর পাশে পৌছানোর জন্য যে ট্রান্সমিটার ব্যবহার করা হয়, সে ট্রান্সমিটার যতোটুকু এরিয়াকে কভার করতে পারে তাকে 'Cell' বলা হয়। সেখান থেকেই এসেছে 'Cellular Phone' বা 'Cell Phone'। একটা সেলের শেইপ কেমন হলে ভালো হয় তা নিয়ে বিজ্ঞানীরা বেশ ভালোই গবেষণা করেছেন। বৃত্তকার শেইপ খুব ভালো অপশন। কারণ, কেন্দ্র থেকে পরিধির যে কোন বিন্দুর দূরত্ব যেহেতু সমান, তাই খুব সহজেই একটা ট্রান্সমিটার তার চারপাশের সকল এরিয়াকে একইভাবে কভার করতে পারে। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে, এক সেল দিয়ে তো আর সব জায়গায় কথা বলা যায় না। একটা সেলের ব্যস কতোটুকুই আর হতে পারে?
এক মাইল থেকে শুরু করে বিশ মাইল পর্যন্ত। আমি যদি এখন খুলনা থেকে ঢাকায় কথা বলতে চাই তখন কী করব? দূরত্ব তো তিনশো কিলোর মতো।

.

সেজন্য পুরো মোবাইল কমিউনিকেশান এরিয়াকে বেশ কিছু ছোট ছোট সেলে ভাগ করা হয়। দরকার হলে এক সেল থেকে আরেক সেলে কল ট্রান্সফার করা যায়। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে এই সেলগুলোর শেইপ যদি বৃত্তাকার হয়, তাহলে কিছু এরিয়া থেকে যায় যা কখনোই কভার করা যাবে না। সেজন্য বৃত্তাকার শেইপের চিন্তা বাদ। তাহলে কী করা যায়?
সমবাহু ত্রিভুজের আকৃতিতে বানাবো সেলগুলোকে? বর্গাকৃতি? নাকি হেক্সাগোনাল বা ষড়ভুজাকৃতি?

.

তিনটাই ভালো অপশন। তবে হালকা জিওমেট্রি আর ট্রাইগনোমেট্রি এপ্লাই করে দেখা গেলো, হেক্সাগোনাল শেইপ হচ্ছে সবচেয়ে উপযোগী। এই শেইপ ব্যবহার করলেই কম খরচে বেশি দূরত্ব কভার করা যায়।

.

অনেকক্ষণ বোরিং কথা বললাম, এবার ইন্টারেস্টিং কিছু বলি।

.

কখনো মৌমাছির চাক দেখেছেন? অনেকগুলো ছোট ছোট ঘরে ভাগ করা থাকে না পুরো চাকটা? খেয়াল করলে দেখবেন, এই ঘরগুলো কিন্তু হেক্সাগোনাল। মৌমাছিরা কিন্তু ট্রাইগনোমেট্রি কিংবা জিওমেট্রি কিছুই জানে না। তারা কোন ইঞ্জিনিয়ারও না। তাহলে কিভাবে তারা জানলো হেক্সাগোনাল শেইপের কথা? কিভাবে তারা বুঝলো এই শেইপে মধুগুলোকে রাখলে কম মোম খরচ করেই অধিক পরিমাণে মধু সংরক্ষণ করা যায়?



.

বিবর্তনবাদীরা বলে, এটা ন্যাচারালি তাদের 'Instinct'। অর্থাৎ, সত্তাগতভাবেই তারা এটা জানে। হুমায়ুন আহমেদের মতো সাহিত্যিকরা হয়তো লিখবেন- "প্রকৃতি গভীর মমতায় তাদের এটা শিখিয়েছে।"

.

আমরা বলি, এটা তাদের শিখিয়েছেন যিনি সকল ইঞ্জিনিয়ারদের সেরা ইঞ্জিনিয়ার। যার অসম্ভব সুন্দর ইঞ্জিনিয়ারিং পরিব্যপ্ত করে রেখেছে এ মহাবিশ্বকে। আমাকে, আপনাকে, আমাদের সবাইকে।

.

"তোমার রব মৌমাছির অন্তরে ইঙ্গিত দ্বারা নির্দেশ দিয়েছেনঃ তুমি গৃহ নির্মাণ কর পাহাড়, বৃক্ষ এবং মানুষ যে গৃহ নির্মাণ করে তাতে। এর পর প্রত্যেক ফল হতে কিছু কিছু আহার কর, অতঃপর তোমার রবের সহজ পথ অনুসরণ কর। ওর উদর হতে নির্গত হয় বিবিধ বর্ণের পানীয়, যাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিষেধক। অবশ্যই এতে রয়েছে নিদর্শন চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।" [সূরা আন-নাহল(মৌমাছি) ১৬:৬৮-৬৯]

.

"(অন্তরে ইঙ্গিত করা বলতে বোঝানো হচ্ছে) এমন জ্ঞান-বুদ্ধি যা প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করার জন্য প্রত্যেক জীবকে দেয়া হয়েছে।" [তাফসীর আহসানুল বয়ান]

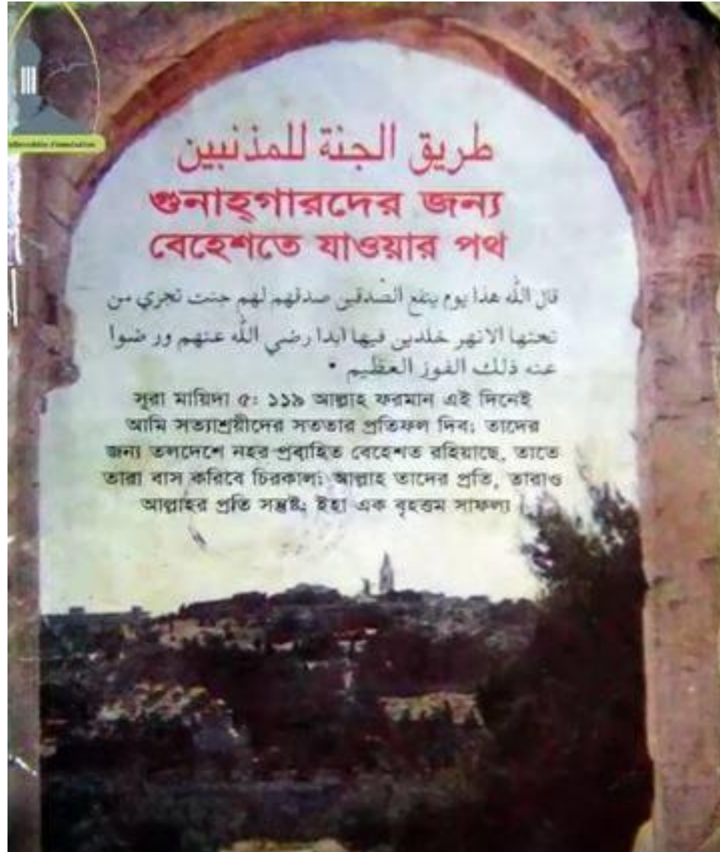
১৯২

খ্রিষ্টান মিশনারীদের অপপ্রচার: যে কৌশলে তারা সরলমনা মুসলিমদের ধর্মান্তরিত করে

-শিহাব আহমেদ তুহিন

‘গুনাহ্‌গারদের জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ’।

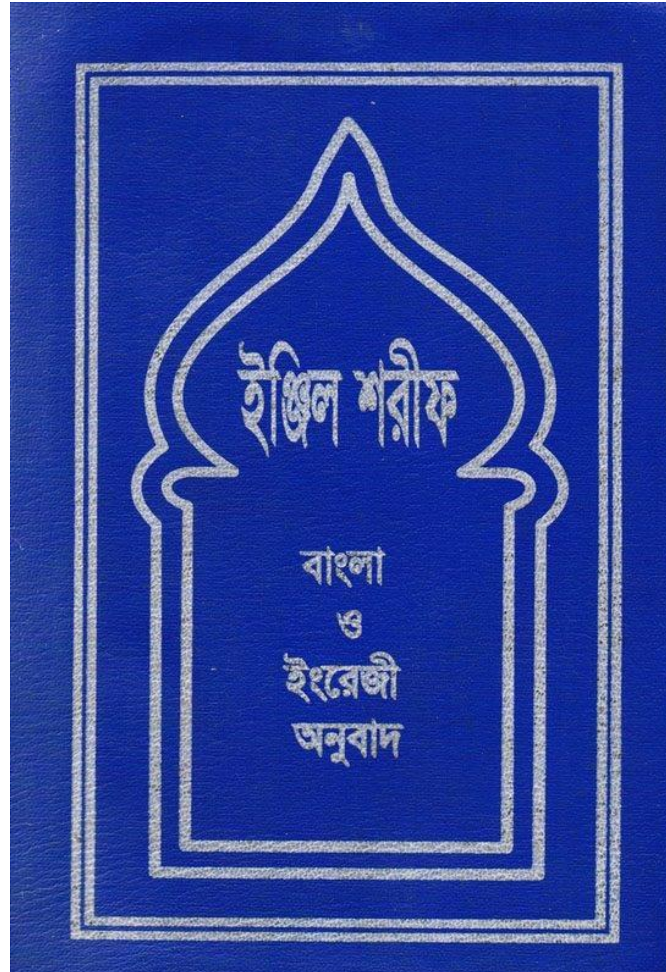
একটি বইয়ের নাম। দেখে মনে হয় আগা-গোড়া ইসলামিক বই। বই খুললেও দেখা যায়, জায়গায় জায়গায় পবিত্র কুরআনের আয়াত রয়েছে। মূসা (আ), ঈসা (আ) এর মতো সম্মানিত নবীদের কথা রয়েছে। কিন্তু পড়তে পড়তে এক জায়গায় এসে খটকা লাগবে। তাওরাত-ইঞ্জীল মানার নামে বিকৃত এক আকিদার কথা বলা হয়েছে। লেখা আছে, ঈসা (আ) নাকি আমাদের পাপের জন্য মারা গেছেন। এ বিশ্বাস নিজের মধ্যে রাখতে পারলেই মিলবে নাজাত। গোনাহ থেকে মুক্তি।



শুধু একটি বই নয় এমন অসংখ্য বই খ্রিষ্টান মিশনারীরা বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে দিয়েছে। নিজেদের বিকৃত ধর্মগ্রন্থকে ‘ইঞ্জিল শরীফ’ নাম দিয়ে তারা অনেক শিক্ষিত মানুষকেও ধোঁকা দিচ্ছে। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল ও পার্বত্য চট্রগ্রামের সহজ-সরল মানুষগুলো তাদের প্রধান টার্গেট। আর এ কাজে তারা অনেক সাফল্যও অর্জন করেছে। এসব জায়গায় গেলে দেখা মেলে এমন সব গ্রামের যেখানে পুরো গ্রামবাসী মুরতাদ হয়ে খ্রিষ্টান হয়ে গিয়েছে।



খ্রিষ্টান মিশনারীরা দাওয়াতের ক্ষেত্রে বেশ কৌশল অবলম্বন করে। তারা বলে, "দেখো! তোমাদের মতোই তো আমরা আল্লাহ-নবীতে বিশ্বাস করি। ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা- এদেরকে সম্মান করি। আমাদের কিতাবে উনাদের কথা লেখা আছে। এই যে আমাদের কিতাব 'ইঞ্জিল শরীফ'। আর পুরোটা পড়তে চাইলে এই যে 'কিতাবুল মোকাদ্দস'। কুরআনেও কিন্তু ইঞ্জিলকে মানার কথা বলা হয়েছে। আমরা ইঞ্জিলকে মানি। আমরা হচ্ছি 'ঈসায়ী মুসলিম'।



গ্রামের সহজ-সরল মানুষ তো বটেই, অনেক স্বল্প-শিক্ষিত ইমামরাও তাদের কথায় ধোঁকা খেয়ে যায়। উনাদের কথা বাদ দেই, শহরের অনেক হাইলি এডুকেটেড সো-কল্ড মুসলিমরা বিশ্বাস করে তাদের বলা বিকৃত ইঞ্জিল শরীফ হচ্ছে সেই ইঞ্জিল যা ঈসা (আ) এর উপর অবতীর্ণ হয়েছিল।

এই ওয়েবসাইটটিতে একবার ঘুরে আসুনঃ http://www.jibonerkotha.com/। একজন সাধারন মানুষ হয়তো ভাববে এটা কোন মুসলিমদের ওয়েবসাইট। যারা ঈসা মাসীহ (আ) এর জীবনাদর্শ প্রচার করছে। অথচ এটি পুরোটাই খ্রিষ্টান মিশনারীদের ওয়েবসাইট।



ইহুদী-খ্রিষ্টানদের ধর্মগ্রন্থ, সেটা 'কিতাবুল মোকাদ্দেস' বা 'The Holy Bible'- যাই হোক না কেন, তা যে বিকৃত এবং বানোয়াট তা বুঝতে বিশেষজ্ঞ হবার প্রয়োজন নেই। একটু নিরেপেক্ষভাবে বাইবেল পড়লেই অসংখ্য বিপরীতধর্মী কথা ও ভুল চোখে পড়বে। তবে তারা যে দাবী করে, 'আমরাও তোমাদের মতো আল্লাহ ও নবী-রাসূলে বিশ্বাস করি কিংবা তোমাদের মূসা-ঈসা আর আমাদের মুসা-ঈসা তো একই ব্যক্তি। তাদের বৈশিষ্ট্য তো একইরকম।'- এই ব্যাপারটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা প্রয়োজন। কারণ গ্রামের অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত এমনকি শহরের বহু শিক্ষিত মানুষও এই ধারণা পোষণ করে। অবশ্য তাদের দোষ দেয়ার কিছু নেই। অনেক আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন আলেমও(!) ইন্টারফেইথের নামে জেনে হোক আর না জেনে হোক, এসব অসত্য কথাকে প্রমোট করেছেন।

আমার এতো কথা বলার উদ্দেশ্য কী? ইহুদি-খ্রিষ্টানরা কি ইব্রাহিম (আ), মূসা (আ)- কে নবী হিসেবে বিশ্বাস করে না? তারা কি স্রষ্টায় বিশ্বাস করে না? হ্যাঁ করে। তো আমরাও কি স্রষ্টায় বিশ্বাস করি না? তাদেরকে (আ) রাসূল হিসেবে বিশ্বাস করি না? হ্যাঁ করি। কিন্তু আমরা তাদের মূসা-ঈসা'তে বিশ্বাস করি না। তাদের ধর্মগ্রন্থে আল্লাহ তায়ালার সম্মানিত রাসূলদের নামে যেসব কথা বলা আছে, আমরা সেগুলো ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি। শুধু তাই না, তারা স্রষ্টার সাথে এমন বৈশিষ্ট্য জুড়ে দেয়, যা থেকে আসমান ও জমীনের রব আল্লাহ তায়ালা পবিত্র। এ লেখায় তেমনই কিছু ব্যাপারে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব (চাইলে শুধু এই টপিকেই একটি বই লেখা যায়)। যাতে সাধারণ মানুষরা খ্রিষ্টানদের মিথ্যা কথা দ্বারা প্রভাবিত না হন। নিজেদের ঈমান না হারিয়ে ফেলেন।

God / ঈশ্বর

১) ঈশ্বর বিশ্রাম নেন: বাইবেলে সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে এভাবে-
"এইভাবে আসমান ও জমীন এবং তাদের মধ্যেকার সব কিছু তৈরী করা শেষ হলো। সপ্তম দিনে তিনি কাজ শেষ করলেন এবং বিশ্রাম গ্রহণ করলেন।" [Holy Bible, Genesis (আদিপুস্তক) 2:2]
অর্থাৎ, বাইবেল বলছে, আসমান ও জমীন সৃষ্টি করতে গিয়ে মহান ঈশ্বর ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। তাই তাকে বিশ্রাম নিতে হয়েছিল। অথচ পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তায়ালা বলেন,
"আমি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সব কিছু সৃষ্টি করেছি ছয় দিনে। আমাকে কোন ক্লান্তি স্পর্শ করেনি।" [আল কুরআন, সূরা ক্বা-ফ ৫০:৩৮]

২) ঈশ্বর অনুশোচনায় ভোগেনঃ বাইবেলের ঈশ্বর ভেবেছিলেন মানুষ সৃষ্টি করে তিনি ভুল করেছিলেন। যার কারণে তিনি অনুশোচনায় ভুগেছিলেন-
"পৃথিবীতে মানুষ সৃষ্টি করার জন্য প্রভুর অনুশোচনা হলো। তাঁর হৃদয় বেদনায় পূর্ণ হলো।" [Holy Bible, Genesis (আদিপুস্তক) 6:7]
তবে আমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা প্রজ্ঞাময়। তিনি ভূত-ভবিষ্যৎ সবকিছুই জানেন। তাঁর সকল কাজই নিখুঁত-
"প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব কিছুরই মালিক। আখিরাতেও প্রশংসা তাঁরই। তিনি প্রজ্ঞাময়। সব বিষয়ে অবহিত।" [আল কুরআন, সূরা সাবা ৩৪:১]

৩) ঈশ্বর নিদ্রা গ্রহণ করেনঃ বাইবেলে বর্ণিত ঈশ্বর কখনো কখনো ঘুমিয়ে পড়েন। তার খবর থাকে না। ডাকলে সাড়া পাওয়া যায় না।
"হে মালিক, জাগো, কেন তুমি ঘুমাচ্ছো?
ওঠো, চিরকালের জন্য আমাদের ত্যাগ করো না।" [Holy Bible, Book of Psalms (গীতসংহিতা) 44:23]
কিন্তু আমাদের রব মহান আল্লাহ তায়ালা কখনো ঘুমান না-
"আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন (সত্য) ইলাহ নেই, তিনি চিরঞ্জীব, সুপ্রতিষ্ঠিত ধারক। তাঁকে তন্দ্রা ও নিদ্রা স্পর্শ করে না।" [আল কুরআন, সূরা বাকারা ২:২৫৫]

৪) ঈশ্বর মানুষের সাথে বক্সিং করেন এবং হেরে যানঃ বাইবেলের ঈশ্বর, নবী ইয়াকুব (আ) এর সাথে যুদ্ধ করেন। অনেক চেষ্টা করার পরেও হেরে যান।
"লোকটি বললেন, "তুমি ঈশ্বর ও মানুষের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হয়েছ বলে তোমার নাম আর ইয়াকুব থাকবে না, তোমার নাম হবে ইসরাইল।" [Holy Bible, Genesis (আদিপুস্তক) 32:28]
আমাদের মালিক আল্লাহ তায়ালা সর্বশক্তিমান। পুরো পৃথিবী এক হলেও তাঁর সামনে দাঁড়াতে পারবে না।
"তারা আল্লাহকে যথাযথ মর্যাদা দেয় না। নিশ্চয় আল্লাহ মহাক্ষমতাবান। মহাপরাক্রমশালী।" [আল কুরআন, সূরা হাজ্জ্ ২২:৭৪]

৫) ঈশ্বরের উদ্ভট বর্ণনাঃ বাইবেলে বলা আছে, ঈশ্বরের নাক থেকে ধোঁয়া বের হয়। তাঁর বহন হচ্ছে চেরুব (কম বয়সী ডানাওয়ালা মেয়ে)।
"তাঁর নাক থেকে ধোঁয়া উপরে উঠলো। তাঁর মুখ থেকে ধ্বংসকারী আগুন বেরিয়ে আসলো। তাঁর মুখের আগুনে কয়লা জ্বলে উঠলো। তিনি আকাশ নুইয়ে নেমে আসলেন। তাঁর পায়ের নীচে ছিল ঘন কালো মেঘ। তিনি কারুবীতে (চেরুবে) চড়ে উড়ে আসলেন। দেখা দিলেন বাতাসের ডানায় ভর করে।" [Holy Bible, 2 Samuel (২ শমূয়েল) 22:9-11]

মহান আল্লাহ তায়ালা এসব নোংরা বিষয়ের সাথে সম্পর্কহীন-

“তারা যা বলে তা হতে আল্লাহ পবিত্র, মহান।” [আল কুরআন, সূরা আস-সাফফাত ৩৭:১৫৯]



ছবি: ভ্যাটিকান সিটিতে অবস্থিত চেরুবের মূর্তি। ঈশ্বর নাকি এর উপর চড়ে ঘুরে বেড়ান!

নবী-রাসূলদের ব্যাপারে ধারণা:

এটা সত্যি যে, ইহুদি-খ্রিষ্টান ও আমরা মুসলিমরা নবী-রাসূলদের ধারণায় বিশ্বাস করি। তবে আমাদের আকিদার সাথে তাদের আকিদায় ব্যাপক পার্থক্য রয়েছে। আমরা বিশ্বাস করি, নবী-রাসূলগণ নিষ্পাপ (মাসুম) ছিলেন। হ্যাঁ! তাঁদের দ্বারা ছোট-খাট ভুল হতে পারে। তবে তাঁরা কখনোই বড় কোন গুনাহে লিপ্ত হবেন না। যেমনঃ চুরি করা, ব্যভিচার করা। এটা কীভাবে সম্ভব যারা মানবজাতিকে সরল পথের দিকে আহ্বান করেছেন, তারা এসব বড় গুনাহে লিপ্ত হবেন? [IslamQA: Did the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) commit sin? https://islamqa.info/en/7208/]

ইহুদী-খ্রিষ্টানরা বিশ্বাস করে নবী-রাসূলরা কাবীরা গুনাহ করতে পারেন। এমনকি তাঁরা এমন সব গুনাহে লিপ্ত হতে পারেন, যা হয়তো আমাদের মতো গোনাহগাররাও চিন্তা করতে পারে না।

Noah / নূহ (আ)

বাইবেলে বলা আছে, একবার নূহ (আ) মদ খেয়ে মাতাল হয়ে সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় ছিলেন। তাঁর ছেলে হাম এ অবস্থা দেখে তার ভাইদের জানান। পরে এ কথা জানতে পেরে নূহ (আ) হামের ছেলে কেনানকে অভিশাপ দেন। কী অদ্ভুত তাই না! একে তো নিজেই মদ খেয়ে উলঙ্গ হয়ে থাকেন। তার উপর যে ছেলে ভুল করেছে তাকে অভিশাপ না দিয়ে নিজের নাতনীকে অভিশাপ দিয়ে বসলেন তিনি-

“নূহ্ চাষ-আবাদ করতে শুরু করলেন এবং একটা আঙ্গুর ক্ষেত করলেন। তিনি একদিন আঙ্গুর-রস খেয়ে মাতাল হলেন এবং নিজের তাবুর মধ্যে উলঙ্গ হয়ে পড়ে রইলেন। কেনানের পিতা হাম তাঁর পিতার এই অবস্থা দেখলেন এবং বাইরে গিয়ে তাঁর দুই ভাইকে তা জানিয়ে দিলেন। কিন্তু সাম আর ইয়াফস নিজেদের কাঁধের উপরে একটা কাপড় নিলেন এবং পিছু হেঁটে গিয়ে তাঁদের পিতাকে ঢেকে দিয়ে আসলেন।

তাঁদের মুখ উল্টাদিকে ফিরানো ছিল বলে পিতার উলঙ্গ অবস্থা তাঁদের চোখে পড়ল না। নেশা কেটে গেলে পর নূহ্ তাঁর ছোট ছেলের ব্যবহারের কথা জানতে পারলেন। তখন তিনি বললেন, “কেনানের উপর বদদোয়া পড়ুক। সে তার ভাইদের সবচেয়ে নীচু ধরনের গোলাম হোক।” [Holy Bible, Genesis (আদিপুস্তক) 9:20-25]

কুরআন নূহ (আ) কে বর্ণিত করছে একজন অনুগত বান্দা হিসবে। যিনি আল্লাহ তায়ালাকে ভয় করেছিলেন। নিজের ইচ্ছাকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করেছিলেন-
“(নূহ বলল) তারপরও যদি বিমুখ হও, তবে আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার বিনিময় রয়েছে আল্লাহর দায়িত্বে। আর আমার প্রতি নির্দেশ রয়েছে আনুগত্য অবলম্বন করার।” [আল কুরআন, সূরা ইউনুস ১০:৭২]

Lot / লূত (আ)

বাইবেলে বর্ণিত আছে, লূত (আ) নিজের মেয়ের সাথে যৌনাচারে (অজাচার) লিপ্ত হয়েছিলেন-
“তারা তাদের পিতাকে আঙ্গুর-রস খাইয়ে মাতাল করলো। তারপর বড় মেয়েটি তার পিতার সঙ্গে শুতে গেলো। কিন্তু কখন সে শুলো আর কখনই বা উঠে গেল লূত তা টেরও পেলেন না। পরের দিন বড়টি ছোটটিকে বলল, ‘দেখ, কাল রাতে আমি বাবার সংগে শুয়েছিলাম। চল! আজ রাতেও তাঁকে তেমনি করে মাতাল করি। তারপর তুমি গিয়ে তাঁর সঙ্গে শোবে। তাহলে বাবার মধ্য দিয়ে আমরা আমাদের বংশ রক্ষা করতে পারব।
এইভাবে তারা সেই রাতেও তাদের পিতাকে আঙ্গুর-রস খাইয়ে মাতাল করলো এবং ছোট মেয়েটি বাবার সঙ্গে শুতে গেল। মেয়েটি কখন যে তাঁর কাছে শুলো এবং কখনই বা উঠে গেল তিনি তা টেরও পেলেন না। এইভাবে লুতের দুই মেয়েই তাদের পিতার দ্বারা গর্ভবতী হলো। পরে বড় মেয়েটির একটি ছেলে হলে সে তার নাম রাখল মোয়াব (যার মানে ‘বাবার কাছ থেকে’)।” [Holy Bible, Genesis (আদিপুস্তক) 19:33-37]

বাইবেলে বর্ণিত, লূত (আ) কে আমরা চিনি না। আমরা তো তাঁর কথা জানি যাকে আল্লাহ তায়ালা অশ্লীল কাজে লিপ্ত জাতির হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। এটা কী করে সম্ভব যে তিনি নিজেই এমন অশ্লীল কাজে লিপ্ত হবেন?
“আর লূতকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও জ্ঞান। তাঁকে উদ্ধার করেছিলাম এমন এক জনপদ হতে যার অধিবাসীরা লিপ্ত ছিল অশ্লীল কাজে। তারা ছিল এক মন্দ ও পাপাচারী জাতি। আর আমি তাকে আমার রহমতের মধ্যে শামিল করে নিয়েছিলাম। সে ছিল সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভুক্ত।” [সূরা আল-আম্বিয়া ২১:৭৪-৭৫]

Moses / মূসা (আ)

বাইবেলে মূসা (আ) এর অনেক গুণের কথা বলা আছে। কিন্তু একই সাথে এটাও বলা হয়েছে, তিনি ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন না। তিনি ঈশ্বরের পবিত্রতা বজায় রাখেননি-
“(হে মূসা!) তোমার ভাই হারুন যেমন হোর পাহাড়ে মারা গিয়ে তার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে গেছে, তেমনি করে তুমিও নবো পাহাড়ে উঠে মারা যাবে এবং তোমার পূর্বপুরুষদের কাছে চলে যাবে। এর কারণ হলো, সীন মরুভূমিতে কাদেশের মরীবার পানির কাছে বনি-ইসরাইলদের সামনে তোমরা আমার প্রতি অবিশ্বস্ততার কাজ করেছিলে এবং বনি-ইসরাইলদের সামনে আমাকে পবিত্র বলে মান্য করোনি।

তাই দেশটা আমি বনি-ইসরাইলদের দিতে যাচ্ছি। আর তা তুমি কেবল দূর থেকে দেখতে পাবে কিন্তু সেখানে তোমার ঢোকা হবে না।" [Holy Bible, Deuteronomy (দ্বিতীয় বিবরণ) 32:50-52]

তারা মূসা (আ) সম্পর্কে যে মিথ্যা কথা বলে কুরআন তা নাকচ করে দিয়েছে। আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে মূসা (আ) এর নির্দোষ হবার কথা ঘোষণা করেছেন-
"হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছিল। আর তারা যা বলেছিল, তা থেকে আল্লাহ তাকে নির্দোষ ঘোষণা করেছেন। আর সে ছিল আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান।" [আল কুরআন, সূরা আহযাব ৩৩:৬৯]

Aaron / হারুন (আ)

মূসা (আ) তূর পাহাড়ে তাওরাতের আইন গ্রহণ করতে গিয়েছিলেন। তাঁর ফিরতে দেরি হবার কারণে বনি-ইসরাইলের লোকজন অধৈর্য হয়ে মূর্তি-পূজা শুরু করে। বাইবেল অনুযায়ী, সে পূজায় নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মূসার (আ) ভাই হারুন (আ)। তিনি নিজেও একজন নবী ছিলেন-

"পাহাড় থেকে নেমে আসতে মূসার দেরি হচ্ছে দেখে লোকেরা হারুনের চারপাশে জড়ো হয়ে বলল, 'পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আপনি আমাদের দেব-দেবী তৈরী করে দিন। কারণ ঐ মূসা, যে আমাদের মিসর দেশ থেকে বের করে এনেছে, তার কি হয়েছে আমরা জানি না।' জবাবে হারুন তাদের বললেন, 'তোমাদের স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কানের সোনার গয়না খুলে এনে আমাকে দাও।'
তাতে সকলে তাদের কানের গয়না খুলে এনে হারুনকে দিল। লোকেরা হারুনকে যা দিল তা গলিয়ে ছাঁচে ফেলে যন্ত্রপাতির সাহায্যে তিনি বাছুরের আকারে একটা মূর্তি তৈরী করলেন।
সেটা দেখে বনি-ইসরাইলরা বলল, "ভাইয়েরা, এর মধ্যে রয়েছে তোমাদের দেব-দেবী। মিশর দেশ থেকে এই দেব-দেবীই তোমাদের বের করে এনেছেন।" [Holy Bible, Exodus (যাত্রাপুস্তক) 32:3-4]

অথচ কুরআন বলছে মূর্তিপূজা দূরে থাক, তিনি বারবার বনি-ইসরাইলের লোকদের মূর্তিপূজা থেকে বিরত হতে আদেশ করছিলেন-
"হারূন তাদেরকে পূর্বেই বলেছিলঃ হে আমার সম্প্রদায়! এটা দ্বারা তো শুধু তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলা হয়েছে। তোমাদের রব দয়াময়। সুতরাং তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল।" [আল কুরআন, সূরা ত্ব-হা ২০:৯০]

David / দাউদ (আ)

বাইবেল বলছে, রাজা দাউদ (আ) সুন্দর দেহের অধিকারী বাতসেবাকে নগ্ন অবস্থায় গোসল করতে দেখে তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন। বাতসেবার সাথে ব্যভিচারে লিপ্ত হন। পরবর্তীতে বাতসেবার স্বামীকে হত্যা করে বাতসেবাকে নিজের কাছে নিয়ে নেন-
"একদিন বিকাল বেলায় দাউদ তাঁর বিছানা থেকে উঠে রাজবাড়ীর ছাদে বেড়াচ্ছিলেন। এমন সময় তিনি ছাদের উপর থেকে একজন স্ত্রীলোককে গোসল করতে দেখলেন। স্ত্রীলোকটি দেখতে ছিল খুব সুন্দরী। দাউদ স্ত্রীলোকটির খোঁজ নেবার জন্য লোক পাঠিয়ে দিলেন। একজন লোক বলল, "সে তো ইলিয়ামের মেয়ে! হিট্টীয় উরিয়ার স্ত্রী বাতসেবা।
দাউদ তাকে নিয়ে আসবার জন্য লোক পাঠালেন। সে কাছে আসার পর দাউদ তার সাথে সহবাস করলেন।" [Holy Bible, 2 Samuel (২ শমূয়েল) 11:2-4]

কুরআনে বর্ণিত দাউদ (আ) এর দ্বারাও ভুল হয়। কিন্তু সেটা এমন জঘন্য পাপ না। ক্ষুদ্র মানবীয় ভুল-

“যখন তারা দাউদের কাছে প্রবেশ করল, তখন সে তাদের দেখে ভয় পেয়ে গেল। তারা বলল ‘আপনি ভয় করবেন না, আমরা বিবদমান দু’পক্ষ। আমরা একে অন্যের উপর সীমালঙ্ঘন করেছি। আপনি আমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করুন। অবিচার করবেন না। আর আমাদেরকে সরল পথের নির্দেশনা দিন।’

‘এ আমার ভাই। তার নিরানব্বইটি ভেড়ী আছে, আর আমার আছে মাত্র একটা ভেড়ী। তবুও সে বলে, ‘এ ভেড়ীটিও আমার তত্ত্বাবধানে দিয়ে দাও’, আর তর্কে সে আমার উপর প্রাধান্য বিস্তার করেছে।’

দাউদ বলল, ‘তোমার ভেড়ীকে তার ভেড়ীর পালের সাথে যুক্ত করার দাবী করে সে তোমার প্রতি যুলম করেছে। আর শরীকদের অনেকেই একে অন্যের উপর সীমলঙ্ঘন করে থাকে। তবে কেবল তারাই এরূপ করে না যারা ঈমান আনে এবং নেক আমল করে। আর এরা সংখ্যায় খুবই কম।’ আর দাউদ জানতে পারল যে, আমি তাকে পরীক্ষা করেছি। তারপর সে তার রবের কাছে ক্ষমা চাইল, সিজদায় লুটিয়ে পড়ল এবং তাঁর অভিমুখী হলো।”

তখন আমি তাকে তা ক্ষমা করে দিলাম। আমার নিকট তার জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা ও শুভ পরিণাম।”

[আল কুরআন, সূরা সোয়াদ ৩৮: ২২-২৫]

শুধু এক পক্ষের কথা শুনে রায় দেয়ার কারণে দাউদ (আ) বুঝতে পেরেছিলেন যে, তাঁর দ্বারা ভুল হয়ে গেছে। বোঝার সাথে সাথেই তিনি সিজদায় লুটিয়ে পড়েছিলেন। সামান্য মানবীয় ভুল করেই যিনি এতোটা অনুশোচনায় ভোগেন, তাঁর উপর কি নির্লজ্জভাবেই না ব্যভিচারের অপবাদ আরোপ করা হয়েছে বাইবেলে। নিশ্চয়ই দাউদ (আ) এসব থেকে পবিত্র ছিলেন।

Solomon / সুলাইমান (আ)

বাইবেলের ভাষ্য অনুযায়ী, শেষ বয়সে এসে সুলাইমান (আ) স্ত্রীদের পাল্লায় পড়ে মূর্তিপূজা শুরু করেন। কুফরীতে লিপ্ত হয়ে পড়েন-

“তাঁর (সুলাইমানের) সাতশো স্ত্রী ছিল। তারা ছিল রাজপরিবারের মেয়ে। এছাড়া তাঁর তিনশো উপপত্নী ছিল। তাঁর স্ত্রীরা তাঁকে বিপথে নিয়ে গিয়েছিল। সুলাইমানের বুড়ো বয়সে স্ত্রীরা তাঁর মন দেব-দেবীদের দিকে টেনে নিয়েছিল। তার ফলে তাঁর বাবা দাউদের মত মন তাঁর ঈশ্বরের প্রতি ভয়ে পূর্ণ ছিল না। তিনি সিডনীয়দের দেবী অষ্টোরতের ও অম্মোনীয়দের জঘন্য দেবতা মিল্‌কমের সেবা করতে লাগলেন।” [Holy Bible, 1 Kings (১ রাজাবলি) 11:3-5]

কুরআন বলছে, সুলাইমান (আ) কখনো কুফরীতে লিপ্ত হননি-

“তারা অনুসরণ করেছে, যা শয়তানরা সুলাইমানের রাজত্বে পাঠ করত। আর সুলাইমান কুফরী করেনি; বরং শয়তানরা কুফরী করেছে।” [আল কুরআন, সূরা বাকারা ২:১০২]

Job / আইয়ুব (আ)

কুরআন এবং বাইবেল দুই জায়গাতেই বলা হয়েছে, আইয়ুব (আ) এর জীবনে প্রচণ্ড দুঃখ-কষ্ট এসেছিল। আমরা হয়তো এমন কষ্টের জীবনের কথা চিন্তাও করতে পারি না। এমন কষ্টে আইয়ুব (আ) কি পেরেছিলেন স্রষ্টার প্রতি তাঁর আনুগত্য ধরে রাখতে? বাইবেল বলছে কষ্ট সইতে না পেরে তিনি ঈশ্বরের প্রতি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বলেছিলেন-

“ঈশ্বর আমার প্রতি অন্যায় করেছেন। নিজের জালে তিনিই আমাকে ঘিরেছেন। আমার প্রতি অন্যায় করা হয়েছে বলে চিৎকার করলেও আমি কোন জবাব পাই না। কান্নাকাটি করলেও কোন বিচার পাই না।” [Holy Bible, Job (ইয়োব) 19:6-7]

আর কুরআনে বর্ণিত আইয়ুব (আ)? শত কষ্টেও তিনি ধৈর্য ধরেছেন। বুক ভরা আবেগ নিয়ে আল্লাহর কাছে করেছিলেন তাঁর বিখ্যাত দু’আ-

الرَّاحِمِينَ أَرْحَمُ وَأَنتَ الضُّرُّ مَسَّنِيَ أَنِّي
"(হে আমার রব!) আমি দুঃখ কষ্টে পতিত হয়েছি। আর আপনি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।" [আল কুরআন, আল-আম্বিয়া ২১:৮৩]

মহান আল্লাহ তায়ালা তাঁর ধৈর্যশীল বান্দার দু'আর জবাব দিয়েছিলেন। তাঁর দুঃখ-কষ্ট দূর করে দিলেন।

Ezekiel / যুলকিফল

"দুই বোন ছিল। তারা ছিল একই মায়ের মেয়ে। মিশরে যৌবন কালেই তারা পতিতা হয়ে উঠল। মিশরেই তারা প্রথম প্রেম করলো। পুরুষদের দিয়ে তারা তাদের চুচুক টেপাত ও স্তন ধরতে দিতো। বড় মেয়ের নাম ছিল অহলা আর তার বোনের নাম ছিল অহলীবা।... অহলীবা আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হয়েই চলল। বাবিলে সে দেওয়ালে খোদিত পুরুষের আকৃতি দেখল আর অহলীবা তাদের চাইলো। সে বাবিলে তাদের কাছে দূত পাঠালো। তাই ঐসব বাবিলের পুরুষরা তার প্রেম শয্যার পাশে এসে তার সাথে সহবাস করলো। তারা তাকে ব্যবহার করে এতো নোংরা করলো যে সে তাদের প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠল। প্রত্যেকেই দেখল যে অহলীবা অবিশ্বস্ত। তার নগ্ন দেহকে সে এত জনকে উপভোগ করতে দিল যে আমি তার প্রতি বিরক্ত হয়ে উঠলাম, যেমন তার বোনের প্রতি হয়েছিলাম। বার বার অহলীবা আমার প্রতি অবিশ্বস্ত হল। তারপর সে মিশরে তার যৌবন কালের প্রেমের কথা মনে করলো। সে গাধার মত শিশ্ন ও ঘোড়ার মত ভাসিয়ে দেয়া বীর্য সম্পন্ন প্রেমিকদের কথা স্মরণ করলো।"

মাফ করবেন! লেখার মধ্যে কোন অশ্লীল ও কুরুচিপূর্ণ গল্প ঢুকিয়ে পাঠককে বিব্রত করা আমার উদ্দেশ্য নয়। উপরে যে গল্পটা পড়লেন তা আসলে বাইবেল থেকে নেয়া! [Holy Bible, Ezekiel (যিহিস্কেল) 23: 2-3, 14-20]

বাইবেল গবেষকদের দাবী এই অশ্লীল গল্পটি ঈশ্বর নবী ইজিকিলকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিলেন। যে গল্প কিনা কোন সভ্য মানুষ তার বাবা-মা, সন্তান এমনকি স্ত্রীর সামনেও পড়তে পারবে না (যদি সে নারী ভদ্র হয়)। অথচ সে গল্প কিনা ঈশ্বরের এক বার্তাবাহক লিখেছেন!

কারো কারো মতে বাইবেলে বর্ণিত ইজিকিল আর কুরআনে বর্ণিত যুলকিফল (আ) একই ব্যক্তি ছিলেন। ইবনে কাসির (রহ) এর মতে, যুলকিফল (আ) একজন নবী ছিলেন। [ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রকাশিত তাফসীর ইবনে কাসির, খণ্ড-৭, পৃষ্ঠা-৩৩৩] আমরা মুসলিমরা কখনোই বিশ্বাস করতে পারব না যে, মহান আল্লাহর কোন বার্তাবাহক এমন অশ্লীল গল্প প্রচার করেছেন। আল্লাহ তায়ালা যুলফিকল (আ) সম্পর্কে বলেন-

"আর স্মরণ কর ইসমাঈল, ইদরীস এবং যুলকিফল- এর কথা। তাদের প্রত্যেকেই ছিল ধৈর্যশীল। আর তাদেরকে আমি আমার রহমতে শামিল করেছিলাম। তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ।" [আল কুরআন, সূরা আল আম্বিয়া ২১:৮৫-৮৬]

Jesus / ঈসা (আ)

মরিয়াম (আ) এর ছেলে ঈসা (আ)। সম্ভবত পৃথিবীর ইতিহাসে তাঁকেই সবচেয়ে ভুলভাবে জানা হয়েছে। ভুলভাবে মানা হয়েছে। ইহুদীরা তাকে বলে মুরতাদ। অন্যদিকে খ্রিষ্টানরা দিয়ে বসেছে ঈশ্বরের মর্যাদা। আমরা মুসলিমরা আছি সবচেয়ে ব্যালেন্সড পজিশনে। আমরা তাঁকে আল্লাহ তায়ালার একজন দাস ও সম্মানিত রাসূল মনে করি।

বিকৃত বাইবেলে তাঁকে অতিরিক্ত সম্মান দেয়ার চেষ্টা করা হলেও কিছু কিছু জায়গায় তার এমন চরিত্র ফুটে উঠেছে, যা নবী হিসেবে শোভনীয় নয়। একটা উদাহারণ দেই। বাইবেল অনুসারে, তিনি নিজের মাকে অভদ্রের মতো করে ‘মহিলা’ বলে ডাকতেন-

“এই মহিলা! তুমি আমায় কেন বলছ যে, আমার কী করা উচিত! আমার সময় তো এখনো আসেনি।” [Holy Bible, Gospel of John (যোহনের সুসমাচার) 2:4]

কুরআন বলছে, ঈসা (আ) মায়ের প্রতি কোমল ছিলেন। মায়ের অনুগত ছিলেন-

“(ঈসা বললেন) আর (আল্লাহ) আমাকে মায়ের প্রতি অনুগত করেছেন এবং তিনি আমাকে অহঙ্কারী, অবাধ্য করেননি।” [আল কুরআন, সূরা মারইয়াম ১৯:৩২]

গত দেড়শ বছরের ইতিহাসে যে মানুষটার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি বই লেখা হয়েছে, তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মদ (সা)। এই বইগুলোর অধিকাংশই লিখেছে খ্রিষ্টান মিশনারীরা। তারা আমাদের রাসূল (সা) এর উপর অনেক মিথ্যা ও জঘন্য অপবাদ দিয়েছে। মজার ব্যাপার, মিথ্যা সে অপবাদগুলোও জঘন্যতার মাত্রা অনুযায়ী তাদের ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত নবীদের ধারে-কাছেও নেই। মুসলিম হিসেবে আমরা নূহ (আ), লূত (আ), মুসা (আ), হারুন (আ), দাউদ (আ), সুলাইমান (আ), আইয়ুব (আ), ঈসা (আ) ও মুহাম্মদ (সা)- সবাইকেই সম্মান করি। আমরা অন্তর থেকে তাঁদের ভালোবাসি। তাঁদের নাম উচ্চারিত হলেই ভক্তিভরে বলি- আলাইহিস সালাম। কিন্তু একইসাথে আমরা ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করি তাঁদের নামে ছড়ানো বিকৃত গল্পগুলোকে।
“তাদের জন্যে আফসোস! যারা নিজ হাতে গ্রন্থ লেখে এবং বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ-যাতে তা তুচ্ছ মূল্যে বিক্রি করতে পারে। সুতরাং তাদের হাত যা লিখেছে তার পরিণামে তাদের জন্য ধ্বংস, আর তারা যা উপার্জন করেছে তার কারণেও তাদের জন্য ধ্বংস।” [আল কুরআন, সূরা বাকারা ২:৭৯]

১৯৩

আমার জীবন কি আমার বাছাই করা?

-মাহফুজ আল আমিন

আচ্ছা, আপনি কি করে বুঝবেন যে আপনার যাপিত জীবন আসলেই আপনার নিজের বাছাই করা? আপনার নিজের পছন্দের? মানে আপনার লাইফ স্টাইল কি আপনার স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করে, আপনার স্বতঃস্ফূর্ততা প্রকাশ করে না চারপাশের সমাজে জোর করে খাপ খাইয়ে নেওয়ার ব্যাপারটাকেই, অন্যদের পছন্দ অবচেতন মনে নিজের পছন্দ হিসেবে চাপিয়ে দেয়াকেই নিজস্বতা ভেবে সারা জীবন ভুল করে আসছেন?

.

জানি প্রশ্নটা একটু কেমন যেন উইয়ার্ড শোনাচ্ছে! আচ্ছা একটু ভেঙ্গে বলি-

.

চলুন কাল্পনিক এক টাইম মেশিনে চড়ে কয়েক হাজার বছর পেছনে যাওয়া যাক। ধরুন আপনি যদি ফারাও রাজাদের পিরামিড তৈরীর আমলে জন্ম গ্রহণ করতেন তাহলে আপনার জীবনধারা কেমন হতো? বা, যদি গ্রীক সভ্যতার এরিস্টটলের আমলে জন্ম নিতেন তাহলে লাইফ স্টাইল কেমন হতো? অথবা চৌদ্দশ বছর আগে আরবের জাহিলি যুগে যদি আপনাকে পাঠানো হতো তবে কি ধরনের মৌলিক প্রিন্সিপাল এর উপর আপনার জীবন ভিত্তি পরিচালিত হত তা একটু ভেবে দেখুন তো?
আচ্ছা অতীত ভালো না লাগলে চলুন আপনাকে ভবিষ্যতে নিয়ে যাই। আপনাকে যদি এখন না পাঠিয়ে আজ থেকে আরো দুইশ বছর পরে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স এর চরম উৎকর্ষতার যুগে পাঠানো হতো তাহলে আপনি কি সেই সময়ের হিসেবেই জীবন ভিত্তি করে নিতেন বা ২ হাজার বছর পরেও যদি পৃথিবী টিকে থাকে এবং আপনি তখন জন্ম নিতেন তাহলে কি সেই পারিপার্শ্বিক প্রেক্ষাপটেই নিজের জীবন সাজিয়ে নিতেন?

.

অনেক তো প্রশ্ন হলো এবার উত্তর নিয়ে ভাবা যাক-
আপনার বর্তমান লাইফ স্টাইল এর দিকে তাকান, আপনার জীবন সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির দিকে লক্ষ্য করুন, আপনার নীতি নৈতিকতার মানদন্ড, সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের স্বরূপ এর দিকে নজর দিন , আপনার পছন্দ-অপছন্দ অভ্যাস সর্বোপরি আপনার বিশ্বাস এই সব কিছুকে এক সুতোয় বেঁধে একটি মালা তৈরি করুন । কেননা এই মৌলিক বিষয়গুলো আপনার অস্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করে।

.

এবার আপনার এই অস্তিত্বের মালাটিকে বিভিন্ন সময়ের আমলে চিন্তা করুন। যদি আপনার মনে হয় একেক আমলে আপনার অস্তিত্বের নিজস্বতা একেক রকম হতো, মানে যুগ হিসেবে আপনার পছন্দ-অপছন্দ অভ্যাস দৃষ্টিভঙ্গি নীতি নৈতিকতা সামগ্রিক সত্তার মৌলিক ভিত্তি ভিন্ন ভিন্ন হতো তাহলে দুঃখের সহিত বলতে হয় বর্তমানে আপনি যেইভাবে নিজের জীবন যাপন করছেন সেটি আপনার নিজস্ব পছন্দ বা নিজস্ব বাছাই করা জীবন নয়, বরং নিজের উপর চাপিয়ে দেয়া প্রচলিত সমাজ এর একটি কপি পেস্ট জীবন।

.

আপনি হয়তো ভাবতে পারেন যে আমি এই কথা কেন বলছি? আশেপাশের আরো ৯ জন ফ্রেন্ডের আইফোন আছে বলে যেই ছেলেটা হাতে আইফোন থাকা কে তার স্মার্টনেস এর স্ট্যান্ডার্ড মনে করে, অতি জরুরি প্রয়োজন মনে করে, তার জন্য এই আইফোন ব্যবহার করা কিন্তু তার নিজস্ব প্রয়োজন নয়, অতি প্রয়োজনীয় কোন চাহিদা নয় বরং পারিপার্শ্বিকতার হিসেবে এক

কৃত্তিম চাহিদার বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

যেই মেয়েটা, ফেসবুকে তার ছবি দেয়ার ইচ্ছা না থাকা সত্বেও বাকি সকল বান্ধবীর ওয়ালে হাজারো পোজের ছবিতে লাইক কমেন্টের বাহার দেখে নিজের ছবিও পোস্ট করে দিচ্ছে সেটাও তার নিজস্ব বাছাই করা সত্বার বহি:প্রকাশ নয়, বরং নিজস্বতাকে বিসর্জন দিয়ে জাতে উঠার চেষ্টা মাত্র। এমন অনেক মেয়েই আছে, অনেক ছেলেই আছে যারা নির্দিষ্ট ওয়ে তে ড্রেস পড়ে, নির্দিষ্ট ওয়ে তে কথা বলে, খাবার খায় কারণ তার পছন্দের অপজিট জেন্ডার এই ট্রেন্ডটাকে পছন্দ করে, স্ট্যান্ডার্ড মনে করে, যদিও সেগুলো তার নিজস্ব পছন্দ থেকে নয় বরং আরেকজনের চোখে ফিট খাওয়ার জন্য, নিজেকে যুগ হিসেবে প্রমাণ করার জন্য, নিজের নিজস্বতা বিসর্জন দিয়ে।

.

তেমনি বসের তোষামোদি, নেতার চামচামি, সমাজের গোলামি প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে অধিকাংশ মানুষ নিজস্বতাকে বিসর্জন দিয়ে প্রচলিত সমাজের প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল রীতিনীতি কে জোর করে নিজের পছন্দ, স্বকীয়তা, স্ট্যান্ডার্ড বলে ধারণ করার চেষ্টা করে থাকে যা তার অস্তিত্বের কোন নিজস্বতা প্রকাশ করে না, স্বকীয়তা ও প্রমাণ করে না, বরং শুধুমাত্র কপি পেস্ট এক প্রাণি তে পরিণত করে যাকে যেই আমলে যেই সমাজে যেই স্থানে, যেই কালচারেই পাঠানো হোক না কেনো সে সেই সময়, স্থান, কাল, সমাজ, কালচারের আদলেই নিজেকে রাঙিয়ে নিয়ে নাচতে নাচতে অস্তিত্বের প্রতি বুড়ো আংগুল দেখিয়ে ভাব নেয়ার বিভিন্ন কায়দায় ব্যস্ত থাকবে, আর ভাববে, " ইয়ো ম্যান আই এম ইউনিক"!

.

তাহলে কখন আমরা বলতে পারবো যে আমার যাপিত জীবন আসলে আমার ই বাছাই করা, পছন্দ করা জীবন? এটা তখনই বলা সম্ভব যখন কোন মানুষ যেই স্থান কাল সমাজ, কালচারেই জন্মগ্রহণ করুক না কেনো ঘুরে ফিরে তার আদর্শ একই থাকবে, সে তার অস্তিত্বের বাস্তবতাকে উপলব্ধি করবে, একটা নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি থাকবে তার জীবনে, তার চলাফেরা আচার ব্যবহারে একটা নির্দিষ্টতা থাকবে, বিশ্বাস এর ধরণে মৌলিক কোন পরিবর্তন থাকবে না, সে সময় স্থান সমাজ কালচার কোন ভ্যারিয়েবল দ্বারা অন্ধভাবে প্রভাবিত হবে না, সাময়িকভাবে যদি হয়েও যায়, তবুও অস্তিত্বের টানে ভুল বুঝতে পেরে মূলে ফিরবেই মৃত্যুর আগে কোন না কোন সময়, সে নিজেকে গড়ে তুলতে চাইবে এমন এক স্ট্যান্ডার্ড আদর্শের আদলে যা তার স্বকীয়তা নিজস্বতার প্রকাশ ঘটাবে চাই সে মৌর্য আমলের লোক হোক, মিশরের ফারাওদের সময়ের হোক, আরবের ১৪০০ বছর আগের হোক, আজকের হোক বা আজ থেকে ২০০ বা ২০০০ বছর পরের ই হোক না কেনো।

.

এই মানুষগুলোর সংখ্যা কম হলেও এরা সব সময় ছিল, আছে থাকবে। এরাই সেই সত্য অনুসন্ধানী মানুষ যারা নিজেকে নির্দিষ্ট কোন গোত্র, দেশ, বর্ণ, ভাষা, প্রতিষ্ঠান এর সাময়িক হিসেবে নিজেকে সংজ্ঞায়িত করে না, অযথা গর্ব করেনা, বরং এরা নিজের সত্বার অস্তিত্বের কারণ এবং এর একমাত্র মালিকের উদ্দেশ্য বুঝে নেয়, সেভাবেই নিজেকে পরিচালিত করতে শেখে, যত বাধা বিপত্তি ই আসুক এই মানুষগুলোকে সময়ের সাময়িক কারাগারে বন্দী করে রাখা যায় না, এরা স্রষ্টা ব্যতীত আর কারো দাসত্ব মেনে নেয় না, এরা অন্তরের উপলব্ধির দিক থেকে সবাই একই সুত্রে গাথা আলোকিত হৃদয়ের মানুষ যাদের জন্যই তাদের রব পরকালে প্রস্তুত রেখেছেন প্রকৃত আবসস্থল জান্নাত।

.

কয়েক হাজার বছর আগে যেই সময়ে পুরো জাতি মুর্তিপূজা, অগ্নিপূজায় লিপ্ত, তখন নবী ইব্রাহিম আ. যেমন সত্য কে নিজের ফিতরাত বিবেক বুদ্ধির মাধ্যমে চিনে নিয়েছেন তেমনি আজ আমেরিকা নামক ইসলামোফোবিয়ার প্রোপাগান্ডা প্রচারক দেশে বসেও তারেক মেহেন্নার মত মানুষেরা হক্ক কে চিনে নেয়, আরবের পৌত্তলিকতার যুগে সেই আবু বকর রা. আনহু যেমন বিনা দ্বিধায় হক্ক কে চিনে ফেলেছিলেন, তেমনি আজ থেকে ২০০ বছর পরেও হয়তো ড. রেন্ডম ইন্টেলিজেন্স হক্ক কে চিনে নেবেন এবং সৃষ্টির শুর থেকে শেষ পর্যন্ত রবের রহমতপ্রাপ্ত এমন মানুষগুলোই যেই কোন সময়ে, যেই কোন যুগে, যেই কোন আমলে, সমাজে কালচারে জন্মেও তারা সত্য কে চিনে নিয়ে আলিঙ্গন করবেন, নিজস্বতা স্বকীয়তা উপভোগ করবেন, পরীক্ষা দেবেন, এবং রবের সন্তুষ্টি নিয়েই তার কাছে ফিরে যাবেন। তাদের বিশ্বাস, কর্ম, আচার ব্যবহার, প্রচার চিন্তা ধারণা, মৌলিকত্ব যেনো

প্রমাণ করবে তারা সবাই একই সত্বার সম্মিলিত বহি:প্রকাশ, অথচ তাদের মাঝে কত যোজন যোজন সময় এর পার্থক্য।

.

আমাদের জীবনের দিকে তাকাই, একটু নজর দেই, মিলিয়ে নেই আমরা কি আসলেই নিজের স্বকীয়তার জীবন যাপন করছি, আমাদের লাইফস্টাইল কি আসলেই নিজস্বতা বহন করে, স্বতন্ত্রতা প্রকাশ করে নাকি সময়ের হিসেবে অবচেতন মনে জোর করে চাপিয়ে দেয়া এক কপি পেস্ট জীবন, স্রোতের সাথে ভেসে যাওয়া খড়কুটোর প্রতিচ্ছবি দেখায়??
নিজেকে প্রশ্ন করার সময় কি আসেনি??
আমরা আর কত নিজেকে বোকা বানাবো, স্ব অস্তিত্বকে বিদ্রুপ করবো??

১৯৪

"বিবর্তনের কেচ্ছা কাহিনী (প্রথম পর্ব)"

-সাইফুর রহমান

গল্পটা আপনার কাছে এভাবে বলা হয়, হোমো হাবিলিস (২ মিলিয়ন বছর) বিবর্তিত হয়ে হোমো ইরেক্টাস (১ মিলিয়ন বছর) হয়ে গেলো তারপরে আসলো হোমো নিয়ান্ডার্থালেনসিস (৪ লক্ষ থেকে ৪০ হাজার বছর), তারপরে আধুনিক মানুষ (২ লক্ষ বছর থেকে বর্তমান)। সিকোয়েন্সটা এতদিন ভালোই মিলছিলো, একটা বিলুপ্ত হয়ে গেলে আরেকটা আসতো। প্যাচটা লেগে গেছে এ বছরের জুনে মরক্কো থেকে যখন আধুনিক মানুষের একটা ফসিল আবিষ্কার করে জীবাশ্মবিদেরা। নেচার জার্নালে প্রকাশিত হয় এই গবেষণা। এতে দেখা যায় পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের বিচরণ ছিল ধারণাকৃত বয়স (~২ লক্ষ) এর থেকেও কমপক্ষে ১ লক্ষ বছর আগে!!! অর্থাৎ, ফসিল গবেষকদের মতে সাড়ে ৩ লক্ষ বছর আগেও পৃথিবীতে আধুনিক মানুষের উপস্থিতি ছিল। তারমানে নিয়ান্ডারথাল আর আধুনিক মানুষ প্রায় একই সময়ে অবস্থান করতো। নিয়ান্ডার্থালকে এখন আধুনিক মানুষের পূর্বপুরুষ বলতে কলাবিজ্ঞানীদের গলা আটকে যাচ্ছে। চমকপ্রদ এই খবর খুব বেশি মানুষদের শেয়ার করতে দেখা যায়নি।

.

লিটারেচারগুলোতে কিছু ফানি গ্রিক পুরাণের গল্প দেখা যায়, এই ধরেন তারা বলে হোমো ইরেক্টাস আর নিয়ান্ডার্থালরা একসময় কো-এক্সিস্ট করতো, এমনকি এটাও প্রমাণিত, চল্লিশ হাজার বছর আগেও নিয়ান্ডার্থালরা পৃথিবীতে ছিলো, তারমানে কিছু ইরেক্টাস নিয়ান্ডারথাল হয়ে গেছিলো বাকিগুলা ইরেক্টাসই থেকে গেছিলো, আবার কিছু নিয়ান্ডারথাল মানুষ হয়ে গেছিলো আর কিছু নিয়ান্ডারথাল মানুষ না হওয়ার বেদনা নিয়ে ধরাধাম ত্যাগ করছিলো!!!

.

গ্রিক মিথোলজিও এর থেকে অধিকততর বিশ্বাসযোগ্য মনে হয়।

১৯৫

'বিবর্তনের কেচ্ছা কাহিনী (দ্বিতীয় পর্ব)'

-সাইফুর রহমান

ছোটবেলায় কাঠবিড়ালির ছবি মিলানোর ধাঁধার কথা মনে আছে? মাথা মিলাইতে গেলে লেজ ঠিক থাকেনা আবার লেজ ঠিক করতে গেলে মাথা মিলে না। হোমো ইরেক্টাস, নেয়ান্ডার্থালিস আর সেপিয়েন্স নিয়ে কলাবিজ্ঞানীরা এমন ধাঁধায় পড়ে গেছে। একটা মিলাইতে গেলে আরেকটা মিলেনা। একদল গবেষণা করে বের করলো, ইরেক্টাস থেকে নিয়ান্ডারথাল এবং নিয়ান্ডার্থালের আপডেট ভার্সন আধুনিক মানুষ বের হয়েছে, মানে একটা পরে আরেকটা এসেছে, খুব ছান্দিক আর কাব্যিক। আবার আরেকদল বিজ্ঞানী গবেষণা করে বের করলো, আধুনিক মানুষ, নিয়ান্ডারথাল আর ইরেক্টাসরা পৃথিবীতে কো-এক্সিস্ট করতো। ইন্দোনেশিয়াতে এরা প্রায় ৫০০০ বছর একসাথে বসবাস করেছে!!! কিছু ইরেক্টাস বিবর্তিত হয়ে মানুষ হলো আর কিছু অমানুষ (ইরেক্টাস) থেকে গেলো!!!

.

প্রশ্ন হইলো, তিন প্রজাতি যেহেতু একই সময়ে কো-এক্সিস্ট করতো তাহলে আধুনিক মানুষ টিকে থাকলো বাকি দুই গ্রুপ বিলুপ্ত হয়ে গেলো কেনো? এই প্রশ্নের জবাব গুলা বিশাল ধরণের হাস্যকর। একেকজনের একেক মত। অবৈজ্ঞানিক হাইপোথিসিস এ ভরপুর। একদল মনে করে প্রায় ৮০০০০ বছর আগে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার তোবা পর্বতে মহাপ্রলয়ংকারী অগ্ন্যুৎপাত হয়েছিল যার ফলে মানুষ ছাড়া বাকি দুই গ্রুপ শেষ!!!

.

আরেক দল (অ)বিজ্ঞানী মনে করে, আধুনিক মানুষের সাথে বাকি দুই গ্রুপের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গ্যাঞ্জাম লেগে যায়, মানুষ বাকি দু গ্রুপরে শেষ করে দেয় যদিও বাকি দুই গ্রুপ মানুষের চেয়ে শারীরিকভাবে পাওয়ারফুল ছিল আর অস্ত্রশস্ত্র আগেই বানানো শিখে নিয়েছিল। তারপরেও আধুনিক মানুষের কাছে তাদের হার মানতে হয়। আরেক গ্রুপ মনে করে, প্রচন্ড শীত আর বরফের কারণে বাকি দুই গ্রুপ শেষ, মানুষ বেঁচে ছিল কারণ তারা নাকি সুই সুতা দিয়ে কাঁথা সেলাই করতে পারতো!! আরেকদল কলাবিজ্ঞানী মনে করে মানুষের ব্রেন নাকি বাকি দুই গ্রুপের থেকে ভালো ছিল। সোজা বাঙলায়, বাকি দুই গ্রুপ কিছুটা মাথামোটা কিছিমের ছিল।

.

তো এখন প্রশ্ন হইলো, একই স্পেসিস থেকে উৎপত্তি হওয়া স্বত্তেও মানুষ বাকিদের থেকে বেশি মেধাবী আর টেকনিক্যালি সাউন্ড কেনো ছিল? এই প্রশ্নের যেসব হাস্যকর উত্তর আছে যার অধিকাংশই সাধারণ মানুষ জানেনা। কলাবিজ্ঞানীরা এই প্রশ্নে এসে যতটা মাইনকা চিপায় পড়েছে আর অন্য কোথাও পড়েনি। বাকি সব জায়গায় গোজামিল দিতে পারলেও এখানে এসে তারা নিজেরাই নিজেদের মধ্যে বিতর্কে জড়িয়ে পড়েছে।

.

বাংলাদেশের কলাবিজ্ঞানীরা ভেবেছিলো গোপন থাকা এই জায়গাটায় মনে হয় কেউ হাত লাগবে না। সামনে সময় পেলে 'তথাকথিত' আদিম মানুষ থেকে আধুনিক মানুষ হয়ে উঠা বা 'বিহেভিওরাল মডার্নিটি' নিয়ে কলাবিজ্ঞানীদের গাজাখোরি তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করার আশা রাখি।

১৯৬

কুরআন কি পূর্বের কিতাবগুলো অনুসরণ করতে বলে?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

বাংলাদেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে পড়েছে খ্রিষ্টান মিশনারীরা। বিশেষত দেশের সীমান্তের কাছাকাছি জেলাগুলোতে তাদের তৎপরতা বেশি। বর্তমানে এরা মুসলিমদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর জন্য ব্যাপক পদক্ষেপ নিচ্ছে, যার মধ্যে একটি হচ্ছে— কুরআনের অপব্যাখ্যা করে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করা এবং কুরআন থেকেই খ্রিষ্টবাদের দলিল দেওয়া। তারা কুরআনের যে সমস্ত আয়াত অপব্যাখ্যা করে তার মধ্যে একটি হচ্ছে সুরা ইউনুসের ৯৪নং আয়াত। খ্রিষ্টান মিশনারীরা মুসলিমদের সুরা ইউনুসের ৯৪নং আয়াত দেখিয়ে বুঝায় যেঃ পবিত্র কুরআন নাকি নির্দেশ দিচ্ছে বাইবেল অনুসরণ করার!! এভাবে বুঝিয়ে কম জানা সরলপ্রাণ মুসলিমদের বিভ্রান্ত করে ও ঈমানহারা করে।

.

প্রথম কথাঃ সমগ্র কুরআনের মধ্যে কোথাও ‘বাইবেল’ শব্দটি নেই।বাইবেলে অনুসরণের নির্দেশ তো অনেক দূরের কথা। এমনকি খোদ বাইবেলের মধ্যেও ‘বাইবেল’ শব্দটি নেই।সেখানে পর্যন্ত বাইবেল অনুসরণের কোন নির্দেশ নেই।

.

দ্বিতীয় কথাঃ খ্রিষ্টানরা কি মুহাম্মাদ(ﷺ)কে আল্লাহর নবী মানে? উত্তর হচ্ছে - না। যাকে তারা নবী হিসাবেই মানে না, তাঁর উপর নাজিলকৃত গ্রন্থ থেকে তারা কেন দলিল দেবে? দলিল দিতে চাইলে আগে তারা মুহাম্মাদ(ﷺ)কে আল্লাহর নবী হিসাবে মানুক। আমরা মুসলিমরা বাইবেল থেকে ইসলামের স্বপক্ষে দলিল দেই কেননা আমরা ঈসা(আ), মুসা(আ) এবং বনী ইস্রাঈলের অন্যান্য নবীদের উপর ঈমান রাখি। বাইবেলের কিছু অংশকে আমরা সঠিক এবং কিছু অংশকে বিকৃত মনে করি।

.

তৃতীয় কথাঃ সুরা ইউনুসের আলোচ্য আয়াতে মোটেও পূর্ববর্তী কোন কিতাব অনুসরণের নির্দেশ আসেনি।

প্রসঙ্গসহ সুরা ইউনুস(১০) এর ৯৪নং আয়াতঃ

(৯৩) আর আমি বনী ইসরাঈলকে দান করেছি উত্তম স্থান এবং তাদেরকে আহার করার জন্য দিয়েছি পবিত্র-পরিচ্ছন্ন বস্তু-সামগ্রী। বস্তুতঃ তাদের মধ্যে মতবিরোধ হয়নি যতক্ষণ না তাদের কাছে (আহকামের)জ্ঞান এসে পৌঁছেছে। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভু তাদের মাঝে মীমাংসা করে দেবেন কিয়ামতের দিন; যে ব্যাপারে তাদের মাঝে মতবিরোধ হয়েছিল

(৯৪) সুতরাং তুমি যদি সে জিনিস সম্পর্কে কোন সন্দেহের সম্মুখীন হয়ে থাকো যা তোমার প্রতি আমি নাযিল করেছি, তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস করো যারা তোমার পূর্ব থেকে কিতাব পাঠ করছে। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার নিকট সত্য বিষয় এসেছে। কাজেই তুমি কখনো সন্দেহকারী হয়ো না।

(৯৫) এবং তাদের অন্তর্ভুক্তও হয়ো না যারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে আল্লাহর বাণীকে। তাহলে তুমিও অকল্যাণে পতিত হয়ে যাবে।

(কুরআন, ইউনুস ১০:৯৩-৯৫)

.

>>>>> বাইবেলের গ্রন্থগুলোতে ইহুদিদের প্রতি আল্লাহ যে নবী-রাসুল প্রেরণ করেছিলেন তার বিস্তারিত কাহিনী আছে। পূর্বেও যে নবী-রাসুল প্রেরণ করা হয়েছিল তার সাক্ষী হচ্ছে ঐ পুস্তকগুলো। আল্লাহ বলছেন যে—সন্দেহ হলে ঐসব কিতাব পাঠকারীর

কাছে জানতে চাও যারা আগে কিতাব পড়েছে।

একই সাথে আল্লাহ এমন সন্দেহ করতে নিষেধ করে দিয়েছেন।

.

বাহ্যত ৯৪ নং আয়াতে সম্বোধন করা হয়েছে নবী(ﷺ)কে । কিন্তু রাসুলুল্লাহ(ﷺ) কখনও সন্দেহে ছিলেন না। কাতাদা(র) বলেন, রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেছিলেন যে, "আমি সন্দেহ করিনা এবং প্রশ্নও করিনা' [ইবন কাসীর]

আসলে যারা তাঁর দাওয়াতের ব্যাপারে সন্দেহ পোষণ করছিল তাদেরকে শুনানাোই মূল উদ্দেশ্য। এ সংগে আহলে কিতাবদের উল্লেখ করার কারণ হচ্ছে এই যে, আরবের সাধারণ মানুষ যথার্থই আসমানী কিতাবের জ্ঞানের সাথে মোটেই পরিচিত ছিল না । তাদের জন্য এটি ছিল একটি সম্পূর্ণ নতুন আওয়াজ। কিন্তু আহলে কিতাবের আলেমদের মধ্যে যারা ন্যায়নিষ্ঠ মননশীলতার অধিকারী ছিলেন তারা একথার সত্যতার সাক্ষ্য দিতে পারতেন যে, কুরআন যে জিনিসটির দাওয়াত দিয়ে যাচ্ছে পূর্ববতী যুগের সকল নবী তারই দাওয়াত দিয়ে এসেছেন। তাছাড়া আরও প্রমাণিত হচ্ছে যে, এ নবীর কথা পূর্ববর্তী কিতাবসমূহে বর্ণিত হয়েছে। যা তাদের কিতাবে লিখা আছে। ইবন কাসীর] তাদের কাছে তাওরাত ও ইঞ্জিলে লিপিবদ্ধ পায়"। [সুরা আল-আরাফ: ১৫৭]

[কুরআনুল কারীম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির – ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া, ১ম খণ্ড, সুরা ইউনুসের ৯৪ নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ১১০২]

.

৯৫ নং আয়াতে স্পষ্ট বলা হচ্ছে যে যারা আল্লাহর আয়াতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে[অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিষ্টান] তাদের অন্তর্ভুক্ত না হতে। এতে মোটেও বলা হচ্ছে না বাইবেল অনুসরণ করতে; বরং এ দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে যে পূর্ববর্তী নবীদের অনুসারীরা[অর্থাৎ ইহুদি ও খ্রিষ্টান] আল্লাহর বাণীকে মিথ্যা প্রতিপন্নকারী।

.

খ্রিষ্টান মিশনারীদের জবাবমূলক এবং সাধারণভাবে খ্রিষ্টানদের দাওয়াহ দেবার জন্য কিছু বইয়ের ডাউনলোড লিঙ্কঃ

.

'কিতাবুল মোকাদ্দস, ইঞ্জিল শরীফ ও ঈসায়ী ধর্ম ' -- খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর:
https://islamhouse.com/bn/books/438807/

.

'খ্রিষ্টধর্মের স্বরূপ' - মুফতি তাকী উসমানী: http://www.waytojannah.com/reality-of-christianity/

.

'ইজহারুল হক' - রহমাতুল্লাহ কিরানবী;
১ম খণ্ড: http://www.waytojannah.com/izharul-haq-1st-part/
২য় খণ্ড: http://www.waytojannah.com/izharul-haq-2nd-part/

.

পবিত্র বাইবেল পরিচিতি ও পর্যালোচনা - খন্দকার আব্দুল্লাহ জাহাঙ্গীর:
http://www.pathagar.com/book/detail/2492

১৯৭

আকাশ কি শক্ত কিছু দিয়ে তৈরি?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

#নাস্তিক_প্রশ্নঃ আসমান কি শক্ত কিছুর তৈরি যে তা স্তম্ভ বা পিলার(যা মানুষের কাছে অদৃশ্য) দিয়ে খাড়া রাখতে হবে (Quran 13:2) (This is originated from ancient Greek myth)

.

উত্তরঃ কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে—

.

আল্লাহ ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতিত, তোমরা এটা দেখছ। অতঃপর তিনি আরশে সমুন্নীত হলেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে নিয়মানুবর্তী করলেন; প্রত্যেকে নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত আবর্তন করে। তিনি সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বর্ণণা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে বিশ্বাস করতে পার। (কুরআন, রা'দ ১৩:২)

.

আয়াতের অর্থ উপরে করা হয়েছে যে, আল্লাহ আকাশমণ্ডলীকে কোন স্তম্ভ ব্যতিত উঠিয়েছেন; আমরা যা দেখতে পাচ্ছি [তাবারী,কুরতুবী ও ইবন কাসির] অর্থাৎ আল্লাহ এমন এক সত্তা যিনি আকাশমণ্ডলীকে কোন স্তম্ভ ব্যতিতই উচ্চে উন্নীত রেখেছেন যেমন আমরা আকাশমণ্ডলীকে এ অবস্থাতেই দেখি।আয়াতের অপর এক অর্থ হয় আল্লাহ আকাশমণ্ডলীকে অদৃশ্য ও অননুভূত স্তম্ভসমূহের উপর প্রতিষ্ঠিত রেখেছেন। ইমাম ইবন কাসির(র) প্রথম তাফসিরকে প্রাধান্য দিয়েছেন।
[কুরআনুল কারিম বাংলা অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তাফসির (ড.আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারিয়া) ১ম খণ্ড, সুরা রা'দের ২নং আয়াতের তাফসির, পৃষ্ঠা ১২৫৮ দ্রষ্টব্য]
আয়াতের উভয় অর্থের মধ্যে প্রায়োগিক কোন বিরোধ নেই।

.

ইসলামবিরোধীরা অপবাদ দেয় যে কুরআনের মহাবিশ্ব সম্পর্কে তত্ত্বগুলো আরবের প্রতিবেশি বিভিন্ন অঞ্চল যেমনঃ গ্রীসে প্রচলিত ধারণা থেকে ধার করা।কিন্তু এ অভিযোগ নেহায়েতই অসত্য। একাধিক তত্ত্ব বা তথ্যে মিল থাকার অর্থ এই নয় যে তার একটা আরেকটার নকল। কুরআনে মহাকাশ সম্পর্কে কোন ধারণাই বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল প্রমাণ করা সম্ভব হয়নি। কুরআনের সাথে ঐসব অঞ্চলের সেসব তত্ত্বেরই মিল দেখা যায় যেগুলো বৈজ্ঞানিকভাবে সত্য। কিন্তু সেসব তত্ত্বের ভুল দিকগুলো কুরআনে দেখা যায় না। এটা প্রমাণ করে যে কুরআনের তথ্যগুলো সেসব স্থান থেকে ধার করা নয় বরং এর এটি বিশ্বজগতের স্রষ্টার কাছ থেকে আগত। এরিস্টটলের মত ছিল পৃথিবী শক্ত ও মজবুত হয়ে মহাবিশ্বের মাঝখানে স্থির হয়ে বসে আছে। গ্রীক জ্যোতির্বিদ টলেমী(১০০-১৭৮ খ্রিষ্টপূর্ব) পৃথিবীকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের তত্ত্ব দেন এবং পৃথিবীকে স্থির বলে অভিহীত করেন। টলেমীর পর থেকে প্রায় ১৫০০ বছর এই ধারণা প্রচলিত ছিল। অথচ কুরআনে পৃথিবীর ঘূর্ণণের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়[আম্বিয়া ২১:৩৩]। এর প্রায় ১৫০০ বছর পর নিকোলাস কোপার্নিকাস অপেক্ষাকৃত সঠিক একটি তত্ত্ব দেন, তিনি সূর্যকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন এবং বলেন যে পৃথিবী ও অন্য গ্রহগুলো সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে।তবে তার তত্ত্বে এটা বলা ছিল যে সূর্য স্থির।আধুনিক বিজ্ঞান বলে যে সূর্যও আবর্তনশীল।অথচ কুরআন ১৪০০ বছর আগে বলেছে যে সূর্য আবর্তনশীল[ইয়াসিন ৩৬:৩৮,৪০]।

.

“আল্লাহ ঊর্ধ্বদেশে আকাশমণ্ডলী স্থাপন করেছেন স্তম্ভ ব্যতিত” - আয়াতের প্রারম্ভের এই গূঢ় বিষয়টি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই সুদূরপ্রসারী গুরুত্ব বহন করে।আমরা শুধুমাত্র আমাদের দৃশ্যমান মহাবিশ্বের সম্পর্কে জানি। মহাবিশ্ব বা আকাশমণ্ডলীর সীমানা বা শেষ প্রান্ত সম্পর্কে আমাদের কোন ধারণা নেই, আধুনিক বিজ্ঞান এ ব্যাপারে অবগত নয়। কাজেই “আসমান শক্ত কিছুর তৈরি কি না” এটি চট করে সিদ্ধান্তে যাবার মত কোন বিষয় নয়। তবে বিজ্ঞান এখন পর্যন্ত যেটুকু অগ্রগতি সাধন করেছে, তার আলোকেও বলা যায় যে এই আয়াতে কোন প্রকারের বৈজ্ঞানিক অসঙ্গতি নেই।কুরআনে ‘আকাশ’ কথাটি ব্যাপকার্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বায়ুমণ্ডলের ভেতরের অংশ যেখানে মেঘ ভাসমান থাকে সে স্থানকে ‘আকাশ’ বলা হয়েছে[যেমনঃ বাকারাহ ২:২২], সৌরজগত ও পৃথিবীর নিকটবর্তী মহাশূন্যকেও ‘আকাশ’ বলা হয়েছে [যেমনঃ মুলক ৬৭:৫], আবার সমগ্র মহাবিশ্বকেও আকাশ বলা হয়েছে[যেমনঃ সাজদাহ ৩২:৪]। কাজেই ‘আকাশ’ দ্বারা বিভিন্ন পরিমাণের এলাকাকে বোঝানো হয়। অতএব ‘সৌরজগত’, ‘গ্যালাক্সী’ ইত্যাদি বিভিন্ন পরিমাপের এলাকা ‘আকাশমণ্ডলী’র অন্তর্ভুক্ত। আর এই আকাশমণ্ডলীর বিভিন্ন উপাদান হচ্ছে নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহ,উপগ্রহ ইত্যাদি। অর্থাৎ আকাশমণ্ডলী হচ্ছে এর বিভিন্ন উপাদান যেমনঃ নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহ,উপগ্রহ ইত্যাদির সমষ্টি।একটি স্তম্ভের কাজ হচ্ছে কোন ভারী বোঝা উপরে তুলে ধরা।আমাদের নিকট আকাশ যেমন ভাসমান বলে প্রতীয়মান হয় তেমনি পৃথিবীর চারদিকে পরিব্যপ্ত বায়ুমণ্ডলের বাইরে নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী মহাশূণ্যের মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছেএই আয়াত থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আকাশমণ্ডলী বা মহাবিশ্বে ভেসে থাকা নক্ষত্রপুঞ্জ, গ্রহ,উপগ্রহসমূহের একটা ভার রয়েছে যা **১১শ**’ শতাব্দীতে আল-বিরূনী প্রকাশ করে গিয়েছেন এবং পরবর্তীকালে কুরআন নাজিল হওয়ার প্রায় **১২০০** বছর পর নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র আবিষ্কারের ফলে তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন যেমন আমরা জানি যে মহাকাশে বিরাজমান গ্রহ, উপগ্রহ বা কোন জড় বস্তু একটি শক্তি দ্বারা পরস্পরকে আকর্ষণ করছে। এই শক্তি ঐ সকল বস্তুর ভরের সমানুপাতিক এবং পারস্পরিক দূরত্বের বর্গায়তনের ব্যাস্তানুপাতিক। মহাকাশে বিরাজমান এ সকল গ্রহ, উপগ্রহ, জ্যোতিষ্কমণ্ডলী ভেঙে পড়ে না বা পরস্পরের মধ্যে কোন সংঘর্ষের সৃষ্টি করে না। কারণ নিরন্তর কক্ষপথ পরিক্রমা থেকে উদ্ভুত একটি ভারসাম্যপূর্ণ কেন্দ্রাতিগ শক্তি এরূপ বিপর্যয় থেকে রক্ষা করে। স্পষ্টতই কেন্দ্রাতিগ শক্তি দ্বারা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির ভারসাম্যকরণ এই আয়াতে উল্লেখিত “স্তম্ভ ব্যতিত আকাশমণ্ডলী স্থাপন” কিংবা “অদৃশ্য স্তম্ভের” ধারণাকে প্রতিষ্ঠিত করে। এটি মূলত কোন স্তম্ভ নয়, কিন্তু স্তম্ভের ন্যায় ভারসাম্য রক্ষা করে যাচ্ছে; অদৃশ্য স্তম্ভের মত কাজ করে যাচ্ছে। সূর্য, চন্দ্র ও জ্যোতিষ্কসমূহ আল্লাহর নির্দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তা কুরআনের একাধিক স্থানে আলোচিত হয়েছে।

.

একটি বিষয়ে সকলের ধারণা থাকা উচিত যে কুরআন কোন বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়। মহাগ্রন্থ আল কুরআন যখন অবতীর্ণ হয় তখন মানব সভ্যতার কোন অগ্রগতি সাধিত হয়নি যে মাধ্যাকর্ষণ বা কেন্দ্রাতিগ শক্তির সূত্র বা তত্ত্ব সম্পর্কে স্পষ্ট তথ্য জানতে পারবে। সে সময়ের মানুষের বোঝার জন্য উপযোগী শব্দমালা দ্বারা কুরআন মহাবিশ্বের এই সত্য তথ্য সম্পর্কে আলোচনা করেছে যা বর্তমান সময়ের বিজ্ঞানের আলোকেও সত্য বলে প্রমাণিত।

.

সহায়ক গ্রন্থঃ 'আল কুরআনে বিজ্ঞান'; অনুবাদ পরিষদ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

১৯৮

'নাস্তিকদের অসততা- আরো একটি তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'

-আরিফ আজাদ

মার্ক্সিজমের সাথে ডারউইনিজমের সম্পর্ক কী? সম্পর্ক হচ্ছে- দুইটাই একটা অন্যটার মাসতুতো ভাই। মুদ্রার এপিট-ওপিট। মার্ক্সিজমকে আমরা মোটাদাগে Materialism তথা বস্তুবাদ বলতে পারি। যদিও মার্ক্সিজমের দাবি- মার্ক্সবাদ সমাজের ক্লাসিফিকেশন নিয়ে কাজ করে, তথাপি, এটার রূট (Root) লেভেলে যা আছে, তা হচ্ছে একটা Godless পৃথিবীর ধারণা। যে পৃথিবীতে মানুষই সবকিছু। যেখানে কোন সুপার ন্যাচারাল পাওয়ারের হাত নেই, অস্তিত্ব নেই। মার্ক্সিজম তথা কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা, কার্ল মার্ক্সের ধর্ম নিয়ে একটি বিখ্যাত উক্তি আছে। সেটি হচ্ছে- "religion is an opium for the people" অর্থাৎ,- " ধর্ম হচ্ছে মানুষের জন্য আফিমের মতোন।"
অনেকেই এই উক্তির ভুল ব্যাখ্যা করে থাকে। তারা এটা দিয়ে বুঝাতে চায় যে, মার্ক্স নাকি ধর্মকে আফিমের সাথে তুলনা করে ধর্মের মাহাত্ম্য বুঝিয়েছে। এটা পুরোদাগেই একটা ভুল ধারণা। মার্ক্স যা বুঝিয়েছে তা হলো, - আফিম খেলে মানুষ যেমন অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে, ধর্ম মানলেও মানুষ ঠিক সেরকম অপ্রকৃতিস্থ হয়ে পড়ে।

.

মার্ক্সিজমের একেবারে রূট লেভেলে যা আছে, সেটাই হচ্ছে ডারউইনিজম তথা নাস্তিকতার মূল বিষয়বস্তু। নাস্তিকতার মূল বেইসিসটাই হচ্ছে- A Godless world... যেখানে কোন সুপার ন্যাচারাল পাওয়ার নেই, কোন স্রষ্টা নেই, কোন ইশ্বর, আল্লাহ কিচ্ছু নেই।
এখান থেকে আমরা বুঝতে পারি, মার্ক্সিজম তথা কমিউনিজম বলতে যা বুঝায়, ডারউইনিজম তথা এথেইজম বলতেও ঠিক তা-ই বুঝায়। এখানে কেবল কিছু শব্দের রকমফের।

.

কমিউনিজমের প্রতিষ্ঠাতা হলেন দু'জন। Karl Marx এবং Friedrich Engels। দুজনই ছিলেন জার্মান ফিলোসপার। মজার ব্যাপার হচ্ছে, Karl Marx এবং Friedrich Engels দুজনের সাথেই বিবর্তনবাদের জনক Charles Darwin এর ছিলো খুব ভালো সমঝোতা। Karl Marx উনার বিখ্যাত বই Das Kapital বিবর্তনবাদের জনক ডারউইনকে উৎসর্গ করেছিলেন।
যখন ডারউইনের প্রথম বই, The Origin Of Species প্রকাশিত হয়, Freiedrich Engels একটি চিঠিতে Karl Marx কে লিখেছিলো, - "Darwin , whom I am just now reading , is splendid" (১)
এর প্রতিউত্তরে Marx লিখেছিলেন, - " This is the book which contains the basis in natural history for our view" (২)

.

খেয়াল করুন, ডারউইনের The Origin Of Species এর জন্য Marx বললেন, - " এটাই সেই বই, যা আমাদের চিন্তাভাবনার বেসিস ধারণ করে।"
সুতরাং, মার্ক্সিজম তথা কমিউনিজমের বেসিস থেকে আমরা কোনভাবেই চাইলে বিবর্তনবাদকে আলাদা করতে পারিনা। মার্ক্স তার ফিলোসপি হিসেবে যা করেছেন বা করতে চেয়েছেন, তার সেই ফিলোসফি এবং ডারউইনের ফিলোসফি যে একই,সেটা মার্ক্স নিজেই স্বীকার করে নিয়েছেন।
শুধু তাই নয়, মার্ক্স Lessable নামে তাঁর এক বন্ধুকে আরেকটি চিঠিতে লিখেছেন, - " Darwin 's book is very

important and serves me as a basis in natural science for the class struggle in history " (৩)
ডারউইন তাঁর বই The Origin Of Species এ তাঁর ফিলোসফি হিসেবে যে শ্রেণী সংগ্রামের কথা উল্লেখ করেছিলেন, মার্ক্সের ফিলোসফিও তাঁর সাথে মিলে যায়।
Frederich Engels ডারউইন এবং মার্ক্সকে একই সমান্তরালে এনে লিখেছেন,- " Just as Darwin discovered the law of evolution in organic nature , so Marx discovered the law of evolution in human history" (৪)

.

কমিউনিজম এবং ডারউইনজমের মধ্যে যে সম্পর্ক, সেটা বুঝাতে গিয়ে কার্ল মার্ক্সের একটি বায়োগ্রাফিতে লেখা হয়েছে এরকম, - "Darwinism presented a whole string of truth supporting Marxism and proving and developing the truth of it . The spread of Darwinist evolutionary ideas created a fertile ground for Marxist ideas as a whole to be taken on board by the working class ... Marx , Engels , and Lenin attached great value to the ideas of Darwin and pointed to their scientific importance , and in this way the spread of these ideas was accelerated" (৫)

.

মার্ক্সের যে ফিলোসফি, সেই ফিলোসফিকে যিনি বাস্তবরূপ দান করেছিলেন, তাঁর নাম Lenin. Lenin যে আন্দোলনের মাধ্যমে রাশিয়ার ক্ষমতায় বসে তাঁর নাম Communist Bolsheviks Movement। এই Bolsheviks আন্দোলন ছিলো রাশিয়ার ইতিহাসের একটি রক্ষক্ষয়ী আন্দোলন। নিহত হয়েছিলো হাজার হাজার মানুষ। ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিলো প্রচুর।
এই Lenin ও ছিলো একজন নাস্তিক। তিনি বিবর্তববাদের জনক চার্লস ডারউইনকে নিয়ে বলেন, - " Darwin put an end to the belief that the animal and vegetable species bear no relation to one another , except by chance , and that they were created by God , and hence immutable" (৬)

.

লেনিনের পরে, রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র তথা কমিউনিজমের শক্তপোক্ত হয়ে যে ক্ষমতায় আসে,তাঁর নাম হলো Stalin. স্ট্যালিন সম্পর্কে খুব বেশি মনে হয় বলার দরকার নেই। স্ট্যালিন তাঁর অগ্রগামী অন্য কমিউনিস্ট নেতাদের মতোই একজন নাস্তিক ছিলেন। ইশ্বরে বিশ্বাস করতেন না। পুরোদস্তর একজন বস্তুবাদী।
ডারউইন সম্পর্কে স্ট্যালিন লিখেছে, - "There are three things that we do to disabuse the minds of our seminary students . We had to teach them the age of the earth , the geologic origin , and Darwin 's teachings" (৭)

.

স্ট্যালিনের এক বাল্যবন্ধু স্ট্যালিনের জীবনী লিখেছিলেন। তিনি সেই বইতে লিখেছেন, - "At a very early age, while still a pupil in the ecclesiastical school , Comrade Stalin developed a critical mind and revolutionary sentiments. He began to read Darwin and became an atheist" (৮)
স্ট্যালিনের সেই বাল্যবন্ধু আরো লিখেছেন যে, স্ট্যালিন তাঁকে বলেছে ডারউইনের বই পড়েই সে (স্ট্যালিন) নাস্তিক হয়ে পড়ে এবং তাঁকেও (তাঁর বন্ধুকে) ডারউইনের বই পড়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করেছিলো।

.

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে, কমিউনিজম = এথেইজম।
এখন, পৃথিবীতে কমিউনিজম তথা এথেইজমের নামে যতো গণহত্যা হয়েছে , যতো মানুষ খুন হয়েছে, যতো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে তার চারভাগের একভাগের সিকিভাগও একত্রে পৃথিবীর সব ধর্মগুলোর ধর্মযুদ্ধেও তা হয়নি। একা হিটলারই গণহত্যা করে খুন করেছে ৬০ লক্ষ ইহুদি।

লেনিন তো ভ্ললশেভিক আন্দোলনে গনহত্যা চালিয়েছেই, বিভিন্ন রেকর্ডমতে, স্ট্যালিন খুন করেছে প্রায় ১ মিলিয়ন মানুষ, এবং ঘরবাড়ি ছাড়া করেছিলো আরো ২০ মিলিয়ন মানুষকে।

(হিটলারের সাথে ডারউইনিজমের কী সম্পর্ক, তা এর আগের একটা লেখায় দেখিয়েছিলাম)

.

এই কমিউনিজম তথা নাস্তিকতার নামে রাশিয়াতে খুন করা হয়েছে প্রায় ২০ মিলিয়ন মানুষ। চীনে (মাও সে তুং এবং অন্যান্যদের হাতে) খুন হয়েছে প্রায় ৬৫ মিলিয়ন মানুষ, ভিয়েতনামে ১ মিলিয়ন মানুষ।উত্তর কোরিয়াতে ২ মিলিয়ন, কম্বোডিয়ায় ২ মিলিয়ন, পূর্ব ইউরোপে ১,৫০,০০০ , আফ্রিকাতে ১.৭ মিলিয়ন, আফগানিস্থানে ১.৫ মিলিয়ন মানুষ হত্যা করা হয়। (৯)

.

আমাদের নাস্তিক বন্ধুরা, যারা আবার প্রোফাইলে ধর্মের জায়গায় 'মানবতাবাদী' সেট করে রাখে, তারা কী আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করবে যে তাদের স্প্রিচ্যুয়াল এই সমস্ত 'গুরু'গণ 'মানবতার' নামে, সমাজতন্ত্রের নামে, শান্তির নামে, ধর্মহীনতার নামে যে সকল গনহত্যা চালিয়েছে, যে সকল ইতিহাস বিখ্যাত ভয়ঙ্কর নৈরাজ্য পৃথিবীতে ঘটিয়েছে, তা ঠিক কী বলে বিবেচিত হবে?
কথায় কথায় ধর্মবাদীদের মৌলবাদী ট্যাগ দেওয়া, ধর্মকে সন্ত্রাস, নৈরাজ্যের আঁতুড়ঘর হিসেবে আখ্যায়িত করা, ধর্ম মানেই সন্ত্রাস, ধর্ম মানেই খুন, হত্যা বলে বুলি আওড়ানো সেই সমস্ত মানবতাবাদী ভাই ব্রাদারগণ, যারা নিজেদের একইসাথে মানবতাবাদী, সমাজতান্ত্রিক, কমিউনিস্ট হিসেবে পরিচয় দিতে পুলক অনুভব করেন, তারা কী আমাদের জানাবেন যে- পল পট, স্ট্যালিন, মাও সে তুং, লেনিন সাহেবদের এহেন মহৎকর্মের কী নাস্তিকীয় ব্যাখ্যা থাকতে পারে?
কথায় কথায় মুসলিমদের জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ বলে চালানো নাস্তিক ভাইদের কাছ থেকে একটি সদুত্তর আশা করছি। আমি আশা করি, তারা খিস্তি খেঁউড় না করে, আমাকে প্রমাণ করে দেখাবেন যে- উপরে উল্লিখিত মহান নেতাগণ (!) আদতে নাস্তিক ছিলেন কী না। যদি নাস্তিক হয়ে থাকে, তাহলে তাদের কর্তৃক সংঘটিত গনহত্যাগুলোর ব্যাখ্য কী? যদি তারা নাস্তিক না হয়, তাহলে তারা আদতে কী ছিলো? বা, নাস্তিক হয়ে থাকলে তাদের কাজকে আপনারা কীভাবে ডিফেন্ড করবেন?

১, ২, ৩, ৪- Evolution, Marxian Biology & the social scene- 85-87

৫- The Biography Of Karl Marx, Oncu Yayinevi, 368

৬- False Religion Of Evolution, Kent Hovind

৭, ৮- Landmarks in the life Of Stalin, E. Yaroslavsky, 8

৯- 'The black book of Communism', Stephene Courtois, Nivolas Werth, Jean-Louis Panne, Andrzej Paczkowski, Karel Bartosek, Jean- Louis Margoli,
(Harvard University Press, 04)

১৯৯

'অন্যরকম উপলব্ধির গল্প' {সালমান ফারসী (রা)}

-জাকারিয়া মাসুদ

হুমায়ূন আহমেদ তার এক বইতে বলেছিল,“মৃতদেহ নিয়ে যে গাড়ি যায়, সেই গাড়ির দিকে সবাই খুব আগ্রহ নিয়ে তাকায়। গাড়িতে একটা লাল নিশান উড়ে। লাল নিশান মানেই শব বহনকারী গাড়ি। তবে সবাই আগ্রহ নিয়ে তাকালেও মৃতদেহের মুখ কেউ দেখতে চায় না। মৃতদেহ নিয়ে যারা যাচ্ছে তাদেরকে দেখতে চায়। মৃত মানুষ দেখে কি হবে? মৃত মানুষের কোন গল্প থাকে না। মানুষ গল্প চায়।”

.

হুমায়ুন আহমেদের কথা শতভাগ সত্যি কি না, আমি জানি না। তবে আজ আমি একটি গল্প বলবো। কোনো বানানো গল্প নয়, সত্যি গল্প। গল্পটা কার, তাঁর নামটা কি—এটা বলবো না। শুধুই গল্প।

.

যার গল্প বলছি—তিনি ছিলেন পারস্যের অধিবাসী। পারস্যের ইস্পাহান নগর। গ্রামের নাম জাই। তাঁর বাবা ছিলেন জমিদার। এলাকার প্রধান জমিদার। বাবা তাঁকে অনেক ভালোবাসতেন। নিজের সকল ধন সম্পদের চেয়ে বেশি। এমনকি অনান্য সন্তানদের চেয়েও বেশি। সে ভালোবাসা এতোটাই বেশি ছিলো যে, তাঁকে বাড়ীতে আটকে রাখতেন। যেন তিনি কখনো হারিয়ে না যান। কখনো যেনো চোখের আড়াল না হন।

.

তাঁর বাবা ছিলেন অগ্নিপূজক। মাজূসি ধর্মের অনুসারী। তিনিও তাঁর বাবার ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁদের গ্রামে অগ্নিপূজকদের বিশাল এক অগ্নিকুণ্ড ছিলো। সে অগ্নিকুণ্ডের প্রধান রক্ষক ছিলেন তাঁর বাবা। বাবার অবর্তমানে তাঁকে রক্ষকের দায়িত্ব দেয়া হয়। তিনি সে দায়িত্ব পালন করতে থাকেন। যেহেতু তিনি বাড়ীর বাইরে যেতে পারতেন না। তাই বাইরের আবহাওয়া সম্পর্কে তাঁর ধারণা ছিলো না।

.

ইতোমধ্যে তাঁর বাবা কয়েকটি প্রাসাদ নির্মাণ শুরু করেন। তিনি (তাঁর বাবা) নিজেই নির্মাণ কাজের দেখাশোনা করতেন। একবার তাঁর বাবার প্রাসাদের বাইরের খামারে কিছু কাজ পড়ে যায়। তাই তাঁকে ডেকে বলেন—“ছেলে আমার! প্রাসাদের কাজে ব্যস্ত থাকায়, আমি খামারে যেতে পারছি না। তাই তুমি যাও। কর্মচারীদের অমুক অমুক কাজ করতে বলো। ওখানে আটকে থেকো না যেনো! তুমি আটকে থাকলে, তোমার দুশ্চিন্তায় আমি অন্য কাজে মন দিতে পারবো না।”

.

বাবার আদেশ পেয়ে তিনি খামারের উদ্দেশে বের হলেন। পথিমধ্যে ছিলো এক গির্জা। খ্রিষ্টানদের। তিনি গির্জার ভেতরে উঁকি দেন। ভেতর থেকে প্রার্থনার আওয়াজ শুনতে পান। বেশ আগ্রহ তিনি জিজ্ঞেস করেন—“এখানে কী হচ্ছে?”

.

তারা বলে—“এরা খ্রিষ্টান। প্রার্থনা করছে।”

.

ওদের কথাশুনে তিনি গির্জার ভেতরে প্রবেশ করেন। সেখানে বসে যান। প্রার্থনাকারীদের অবস্থা দেখে তিনি মুগ্ধ হন। এতোটাই মুগ্ধ হন যে, কোনদিক দিয়ে সূর্য অস্তমিত হয়ে যায়—তিনি টেরই পান নি।

.

ধীরে ধীরে সন্ধ্যে নেমে আসে। তাঁকে খোঁজার জন্যে চতুর্দিকে লোক পাঠানো হয়। জমিদার বাবার খুব আদরের সন্তান ছিলেন কি-না—তাই।

.

সন্ধ্যের পর তিনি প্রাসাদে ফিরে যান। সেদিন আর খামারে যাওয়া হয় নি তাঁর। তাঁর পিতা তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, "কোথায় ছিলে (তুমি)? আমি কি তোমাকে কিছু বলিনি?'

.

জবাবে তিনি বলেন, "বাবা! আমি কিছু লোকের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম। যাদেরকে খ্রিষ্টান বলা হয়। তাদের উপাসনা ও প্রার্থনা আমাকে মুগ্ধ করেছে। তাই তারা কীভাবে কী করছে—তা দেখার জন্যে সেখানে বসে গিয়েছিলাম।"

.

পুত্রের মুখে এমন কথা শুনে পিতা কিছুটা হকচকিয়ে গেলেন। এরপর বললেন, "প্রিয় বৎস! তোমার ও তোমার পিতৃপুরুষের দ্বীন—ওদের দ্বীনের চে' উত্তম।"

.

তিনি বললেন, "না। আল্লাহর শপথ! আমাদের দ্বীন তাদের দ্বীনের চে' উত্তম নয়। তারা এমন এক সম্প্রদায়—যারা আল্লাহর গোলামি করে। তাঁকে ডাকে এবং তাঁরই উপাসনা করে। আর আমরা! আমরা তো আগুনের উপাসনা করি। যা আমরা নিজের হাতে জ্বালাই, আর আমরা দেখভাল ছেড়ে দিলে তা নিভে যায়।"

.

পুত্রের মুখে এ কথা শুনে পিতা যারপরনাই বিস্মিত হলেন। পুত্রকে হারানোর ভয় তার মাথায় ভর করলো। তাই তিনি কঠোর পদক্ষেপ নিলেন। তাঁর দু পায়ে শেকল লাগিয়ে দিলেন। একটি গৃহে বন্দী করে রাখলেন।

.

একদিন তিনি (পুত্র) খ্রিষ্টানদের কাছে একটি লোক পাঠালেন। উদ্দেশ্য—খ্রিষ্টানদের দ্বীনের উৎস সম্পর্কে জানা। তাঁর পাঠানো লোকটি এসে জবাব দিলো, "তাদের দ্বীনের উৎস শামে।"

.

তিনি লোকটিকে বললনে, "ওখান (শাম) থেকে লোক এলে আমাকে জানাবে।"

.

কিছুদিন পর শাম থেকে কিছু লোক পারস্যে আসে। এ খবর তাঁর কাছে পৌঁছে। তিনি সুযোগ খুঁজতে থাকেন পালিয়ে যাওয়ার। যখন শামের লোকজন তাদের কাজ শেষ করে ফিরে যাওয়ার মনস্থ করে, তখন তিনি শেকল ভেঙে পালিয়ে গিয়ে—তাদের সাথে যোগদান করেন। সফর করতে করতে শামে পৌঁছান।

.

শামে পৌঁছে তিনি খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে জানার জন্যে জিজ্ঞেস করেন, "এ দ্বীনের সর্বোত্তম ব্যক্তি কে?"

.

তারা একটি গির্জার দিকে ইঙ্গিত করে বলে, "এই গির্জাবাসী বিশপ।"

.

তিনি গির্জায় পৌঁছান। বিশপের কাছে গিয়ে বলেন, "আমার একান্ত ইচ্ছে—আপনার সাথে এ গির্জায় থেকে আল্লাহর উপাসনা করবো। এবং আপনার কাছ থেকে উপকারী জ্ঞান শিখবো।"

.

বিশপ তাঁর প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। তিনি বিশপের সাথে গির্জায় থাকতে লাগলেন। মানুষ বিশপকে ভালো মানুষ মনে করতো। কিন্তু বিশপ ছিল লোভী। বিশপ লোকদেরকে দান-খয়রাতের নির্দেশ দিতো, কিন্তু নিজে তা করতো না। লোকজন তার কাছে দানের টাকা প্রদান করলে, সে সেগুলো অভাবীদের না দিয়ে—নিজের কাছে রেখে দিতো। তিনি বিশপের এ অবস্থা থেকে অত্যন্ত

মর্মাহত হলেন। তাঁর মনে বিশপের প্রতি ঘৃণা জন্ম নিতে লাগলো।

.

কিছুদিন পর বিশপ মারা গেল। লোকজন বিশপকে দাফন করার জন্যে এলো। তিনি বললেন, “এ-তো একটি খারাপ লোক। সে তোমাদেরকে দান-খয়রাতে উদ্বুদ্ধ করতো। তোমাদের দানের টাকা নিজের কাছে জমা করে রাখতো, অভাবী মানুষকে দিতো না।”

.

তাঁর কথা শুনে লোকজন ক্ষেপে গেলো। তাদের দৃষ্টিতে যিনি মহৎ, তাকে তিনি মন্দ বলবেন—তা কী করে হয়? তাইতো তারা তাঁর কাছে প্রমাণ চাইলেন। তাদের কথা শুনে তিনি বললেন, “আমি তোমাদেরকে তার জমা করা সম্পদ বের করে দেখাচ্ছি।”

.

এ-বলে তিনি বিশপের লুকানো সাতটি পাত্র বের করে দেখালেন, যেখানে অনেক স্বর্ণ-রৌপ্য জমা করা ছিলো। লোকজন এ-দৃশ্য দেখে তাদের ভুল বুঝতে পারলো। বিশপকে তারা দাফন না করে শূলিতে চরালো। এরপর পাথর নিক্ষেপ করতে লাগলো।

.

ঐ বিশপ মারা যাওয়ার পরে, আরেকজন বিশপ নিয়োগ দেয়া হলো। যিনি ছিলেন অধিক উত্তম, সৎ, দুনিয়া বিরাগী ও অধিক উপাসনাকারী। তিনি নতুন বিশপের ভক্তে পরিণত হলেন।

.

যখন নতুন বিশপ মারা যাচ্ছিলো, তখন তিনি তার শিয়রে বসলেন। বসে জিজ্ঞেস করলেন, “হে অমুক! আপনি দেখতে পাচ্ছেন, আল্লাহর ফয়সালা (মৃত্যু) আপনার সামনে হাজির। আল্লাহর শপথ! আমি আপনাকে সবকিছুর চে’ বেশি ভালোবেসেছি। (এখন) আমাকে কী কী কাজ করার আদেশ দিচ্ছেন? কার কাছে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন?”

.

নতুন বিশপ বললেন, “বৎস! আল্লাহর শপথ! আমি কেবল একজনকেই চিনি, তিনি মসুলে থাকেন। তার কাছে যাও। গেলে দেখবে—তার অবস্থাও আমার মতোই।”

.

নতুন বিশপ মারা যাওয়ার পর তিনি মসুলে এসে উপস্থিত হলেন। মসুলের বিশপকে তিনি তার ব্যাপারে জানান। সব শুনে বিশপ খুব খুশি হন। তিনি মসুলের বিশপের সাথে সময় কাটাতে থাকেন।

.

একমসয় মসুলের বিশপের জীবন ঘনিয়ে আসে। তিনি তাকে তা-ই বলেন, যা শামের বিশপকে বলেছিলেন। তার প্রশ্নের জবাবে মসুলের বিশপ বলেন, “বৎস! আল্লাহর শপথ! আমি কেবল একজনকেই চিনি, তিনি নাসীবাইন এলাকায় থাকেন। তার অবস্থাও আমার মতোই। তার কাছে যাও।”

.

মসুলের বিশপ মারা গেলে তিনি নাসীবাইন পৌঁছান। সেখানকার বিশপের সান্নিধ্য গ্রহণ করেন। নাসীবাইনের বিশপ যখন জীবন সায়াহ্নে এসে পৌঁছান, তখন তিনি তাকেও একই কথা বলেন—যা অন্য বিশপদের বলেছিলেন।

.

তার কথা শুনে নাসীবাইনের বিশপ তাকে বাইজান্টাইন রাজ্যের আম্মূরিয়্যা এলাকায় যাওয়ার নির্দেশ দেন।

.

নাসীবাইনের বিশপকে দাফন করে তিনি আম্মূরিয়্যায় পৌঁছান। আম্মূরিয়্যার বিশপের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি কিছু অর্থ সম্পদ অর্জন করেন। ভেড়ার একটি ছোট্ট পাল ও কয়েকটি গাভীর মালিক বনে যান। যখন আম্মূরিয়্যার বিশপের মৃত্যু ঘনিয়ে আসে, তখন তিনি তার কাছেও নসীহাহ চান।

.

আম্মূরিয়্যার বিশপ বলেন, “বৎস! আল্লাহর শপথ! আমার মতো আর কোনো ব্যক্তি আছে বলে আমার জানা নেই, যার কাছে তুমি যেতে পারো। তবে সময় খুব কাছাকাছি এসে গিয়েছে। আল-হারাম থেকে একজন নবী প্রেরণ করা হবে। অগ্নেয়শিলায় গঠিত দুই অঞ্চলের মাঝামাঝি এলাকায় তিনি হিজরত করবেন। যে অঞ্চলের মাটি হবে কিছুটা লবণাক্ত ও খেজুর গাছবহুল। তাঁর মধ্যে কিছু স্পষ্ট নিদর্শন থাকবে। তাঁর দু কাঁধের মধ্যে থাকবে নবুওয়াতের সীলমোহর। তিনি উপহার গ্রহণ করবেন, কিন্তু সাদাকাহ গ্রহণ করবেন না। সেই অঞ্চলে যাবার সামর্থ্য থাকলে—চলে যাও। কারণ তাঁর আগমনের সময় খুব কাছাকাছি চলে এসেছে।”

.

কিছুদিন পর আরব ব্যবসায়ীদের একটি কাফেলার সাথে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাদেরকে আরব ভূমিতে পৌঁছে দেয়ার কথা বলেন। বিনিময়ে তাদেরকে তাঁর ভেড়া ও গাভীর পাল দেয়ার অঙ্গীকার করেন। ব্যবসায়ী কাফেলা তাঁর এ-প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। তিনি তাদেরকে তাঁর গবাদি পশুর পাল দিয়ে দেন। এরপর আরবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

.

আল-কুরা উপত্যকায় এসে ব্যবসায়ী কাফেলা তাঁর সাথে গাদ্দারী করে। তারা তাঁকে দাস হিসেবে সেখানে বিক্রি করে দেয়। এক ইয়াহূদী তাঁকে কিনে নেয়। তিনি সেখানে খেজুর গাছ দেখতে পান। খেজুর গাছ থেকে তাঁর মনে খুশির ঢেউ উঠতে থাকে। তিনি মনে মনে ভাবতে থাকেন—এটাই হয়তো সেই দেশ!

.

ইয়াহূদীদের একটি গোত্র—বানূ কুরাইযা'র এক লোক তাঁকে কিনে নেয়। এরপর তাঁকে মদীনায় আনা হয়। মদীনায় পৌছেই তিনি বুঝতে পারেন—এটাই সে শহর, যার সম্পর্কে আম্মূরিয়্যার বিশপ তাঁকে বলেছিলেন। তিনি তাঁর মনিবের অধীনে দাসত্বের জীবন কাটাতে থাকেন। অপেক্ষা করতে থাকেন সে মাহেন্দ্রক্ষণের। কখন তাঁর সঙ্গে সেই মহাপুরুষের দেখা হবে, যার কথা বিশপ তাঁকে বলেছিলেন। কখন সেই মহাপুরুষের নিকট থেকে সত্যের বাণী শ্রবণ করবেন? কখন তাঁর দীর্ঘ সফরের সমাপ্তি হবে?

.

একদিন তিনি খেজুর বাগানে কাজ করছিলেন। হঠাৎ তিনি শুনতে পেলেন—তাঁর মনিবের চাচাতো ভাই বলছে, “আল্লাহ বানূ কাইলা-কে শায়েস্তা করুন। আল্লাহর শপথ! তারা এখন মক্কা থেকে আগত এক ব্যক্তির চারপাশে জড়ো হয়েছে—কুবা-তে। তাদের ধারণা সে একজন নবী।”

.

এ-কথা শোনার পর তাঁর অন্তরে আনন্দের বন্যা বয়ে যায়। শরীরে কাপুনি শুরু হয়। অন্যরকম শিহরনবোধ হয়। মনে মনে ভাবতে থাকেন—এ ব্যক্তিটাই কী সেই মহাপুরুষ? তাহলে কী তার প্রতীক্ষার অবসান হতে চলেছে? তিনি কি সত্যের কাছে পৌঁছে গেছেন? এ চিন্তাগুলো তাঁর মনে এতোটাই ঢেউ খেলতে থাকে যে, তিনি গাছ থেকে পড়ে যাবার উপক্রম হন।

.

তিনি দ্রুত গাছ থেকে নেমে আসেন। এসে তাঁর মনিবের চাচাতো ভাইটিকে জিজ্ঞেস করেন, “কী সংবাদ? উনি কে?”
তিনি দাস ছিলেন। তাই তাঁর মুখে একথা শুনে মনিবের চাচাতো ভাই রেগে যান। তাঁর গালে কষে একটি থাপ্পড় বসিয়ে দেন। ভ্রু কুঁচকে জবাব দেন, “এ দিয়ে তোমার কী? যাও! নিজের কাজে যাও।”

.

তিনি বললেন, “না। তেমন কিছু না। কেবল একটি সংবাদ শুনলাম। তাই জানতে চাইলাম—ঘটনাটি কী?”

.

দিন গড়িয়ে সন্ধ্যে হলো। তাঁর কাজও শেষ হলো। তাঁর কাছে জমানো কিছু খেজুর ছিলো। সেগুলো হাতে করে রওনা হলেন। উদ্দেশ্য—সেই ব্যক্তিটির সাথে দেখা করা, যার কথা তাঁর মনিবের চাচাতো ভাই বলেছে।

.

তিনি সে মহাপুরুষের কাছে পৌঁছুলেন। এরপর বললেন, “শুনলাম—আপনি একজন ভালো মানুষ। আর আপনার সঙ্গে কিছু সাথি আছে, যারা এ এলাকায় অপরিচিত। আমার কাছে কিছু সাদাকাহ’র খেজুর আছে। মনে হলো এ অঞ্চলে আপনারাই হলেন এর হকদার। এই হলো খেজুর। এখান থেকে কিছু খান।”

.

তাঁর কথা শুনে সে মহাপুরুষ হাত গুটিয়ে নিলেন। খেজুরে হাত দিলেন না। খেলেনও না। তাঁর সাথিদের ডেকে বললেন, “তোমরা খাও।”

.

তিনি মনে মনে ভাবলেন—আম্মূরিয়্যার বিশপ তাঁকে মহাপুরুষের যেসব গুণাগুণ বলেছিলেন, তার একটা পাওয়া গেলো।

.

এই ভেবেই তিনি দ্রুত মনিবের বাড়ীতে ফিরে এলেন। কিছুক্ষণ পর আবারও সে মহাপুরুষের কাছে গেলেন। সাথে নিলেন—জমানো কিছু খাবার। মহাপুরুষের কাছে পৌঁছে তাঁর জমানো খাবার দিয়ে বললেন, “একটু আগে দেখলাম, আপনি সাদাকাহ’র জিনিস খান না। এটি উপহার। সাদাকাহ নয়।”

.

তাঁর কথা শুনে মহাপুরুষটি সে খাবার থেকে খেলেন এবং তাঁর সাথিদেরকেও দিলেন। এ-দৃশ্য দেখে তিনি ভাবলেন—আম্মূরিয়্যার বিশপের দেয়া, দুটো বৈশিষ্ট্য মিলে গেলো।

.

সেদিনকার মতো তিনি ফিরে এলেন।

.

এভাবে কিছুদিন কেটে গেলো। একদিন তিনি আবার সে মহাপুরুষের কাছে গেলেন। তিনি যখন মহাপুরুষের কাছে এলেন তখন দেখতে পেলেন, তিনি একটি লাশের পেছন পেছন যাচ্ছিলেন। তাঁর চারপাশে তাঁর সাথিরা।

.

তিনি মহাপুরুষের চারপাশে চক্কর দিতে লাগলেন। তাঁকে চক্কর দিতে দেখে সে মহাপুরুষ বুঝে ফেললেন যে, তিনি কী খুঁজে বেড়াচ্ছেন। তাই মহাপুরুষটি তাঁর গায়ের চাদর নামিয়ে ফেললেন।

.

তিনি দেখতে পেলেন—সে মহাপুরুষের দু কাঁধের মধ্যখানে সীলমোহর। যেমনটা আম্মূরিয়্যার বিশপ তাঁকে বলেছিলেন। তিনি কান্নায় ভেঙে পরেন। অবশ্যি এ কান্না দুঃখের কান্না নয়। এতোদিন পর যে তিনি সত্যকে খুঁজে পেয়েছেন, এ কান্না ছিলো তারই বহিঃপ্রকাশ। তিনি তা খুঁজে পেয়েছেন—যা তিনি হন্নে হয়ে খুঁজেছেন। তিনি সে মহাপুরুষকে খুঁজে পেয়েছেন—যার জন্যে তিনি বছরের পর বছর অপেক্ষা করেছেন।

.

তিনি দ্রুত সে মহাপুরুষের কাছে যান। উপুড় হয়ে নবুওয়তের সীলমোহরে চুমো খান। তাঁর চোখ-মুখ ভিজে যেতে থাকে। হাত-পা অসম্ভব রকমভাবে কাপতে থাকে। তিনি বুঝতে পারেন—এ মহাপুরুষই হলেন সে; যার আগমনের কথা বিশপ তাঁকে জানিয়েছিলেন। ইনিই হলেন আল্লাহর রাসূল—মুহাম্মাদ সল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

.

তাঁর কান্না দেখে আল্লাহর রাসূল ﷺ তাঁকে বলেন, “সালমান! এদিকে এসো।”

.

এই যা! বলেই ফেললাম—তাঁর নামটা। কি আর করার? আমি যার কাহিনী আপনাদের শুনাচ্ছি, তাঁর নাম সালমান। সালমান ফারিসী। যিনি সত্যকে আলিঙ্গন করার জন্যে—রাজকীয় জীবন পরিত্যাগ করেছেন। যিনি সত্যের স্বাদ আস্বাদন করার জন্যে—দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়েছে। যিনি সত্যকে খুঁজতে খুঁজতে এতোটা দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়েছেন। ক্লান্তি যাকে স্পর্শ করে নি।

যিনি বিরতিহীন ছুটেছেন। ছুটেছেন সত্যের পথে।

.

একবার মানচিত্রটা হাতে নিন। এরপর দেখুন—কোথায় পারস্য, আর কোথায় মদীনা। কতোটা দূরত্ব—এই দুটি শহরের মধ্যে। আর সে সময়ে দ্রুতগামী যানবাহন ছিলো অপ্রতুল। গন্তব্য পথে ছিলো সীমাহীন প্রতিকূলতা।

.

আসলে সত্যিকার অর্থে যে সত্যকে খুঁজে বেড়ায়, শত প্রতিকূলতা তাঁকে দমাতে পারে না। কোনো ঝড়-ঝঞ্ঝা তাঁকে টলাতে পারে না। কোনো প্রতিবন্ধকতা তাঁর গতিকে রুদ্ধ করতে পারে না। সালমান ফারিসী ছিলেন—তাদেরই একজন। রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু।

.

রাসূলের ﷺ কাছে তিনি সব ঘটনা খুলে বললেন। রাসূল ﷺ তাঁর মনিবের সাথে সালমানের মুক্তির বিষয়ে কথা বললেন। বিশাল মুক্তিপণ দিয়ে তাঁকে ছাড়িয়ে আনা হলো। এরপর থেকে মৃত্যু অবধি—তিনি সত্যের পথে ছিলেন।

.

মহান আল্লাহর জন্যে সমস্ত প্রশংসা, যিনি ছোট ছোট গল্পের মধ্যে—অনেক বড় বড় শিক্ষা রেখেছেন। সালমান ফারিসীর ঘটনাটা কি—তেমন একটি গল্প নয়?

.

এ গল্পে তাদের জন্যে শিক্ষা আছে, যারা সত্যিকার অর্থে সত্যকে খুঁজে বেড়ান।

ড. ইবরাহীম আলি, সীরাতুন নবি, পৃষ্ঠা : ৬০-৬৬; (মাকতাবাতুল বায়ান, প্রথম প্রকাশ, পহেলা রবিউল আওয়াল, ১৪৩৯ হিজরি)।

২০০

ইসলাম কি ছোঁয়াচে রোগের অস্তিত্ব অস্বীকার করে?

-মুহাম্মাদ মুশফিকুর রহমান মিনার

আল্লাহর সৃষ্টি এ পৃথিবীতে নানা উপকারী নিয়ামতের পাশাপাশি আছে বহু রোগ-ব্যাধি, অসুখ-বিসুখ। ইসলামবিরোধীরা দাবি করে যে, রোগ সংক্রমণ সম্পর্কে নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) এর হাদিসের বক্তব্য বৈজ্ঞানিকভাবে ভুল। এ দাবি প্রমাণের জন্য তারা কিছু হাদিস দেখায়। ---

.

আনাস(রা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী(ﷺ) বলেছেন, “রোগের সংক্রমণ ও অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে শুভ লক্ষণ মানা আমার নিকট পছন্দনীয়।”
[লোকেরা] বলল, শুভ লক্ষণ কী?
তিনি বললেন, উত্তম বাক্য।”
[সহীহ বুখারী ৫৭৭৬, সহীহ মুসলিম ৫৯৩৩-৫৯৩৪]

.

আমরা দেখছি যে এ হাদিসে বলা হচ্ছে রোগের সংক্রমণ(عدوى) বলতে কিছু নেই। এটা দেখিয়ে অনেকে বলতে চায় – আধুনিক বিজ্ঞান আমাদের জানায় জীবাণুর বিস্তারের দ্বারা এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে রোগের সংক্রমণ ঘটে; কাজেই হাদিসের বক্তব্য সঠিক নয়। যারা এরূপ বলে, তারা আসলে অর্ধেক সত্য উপস্থাপন করে। আমরা যদি এ সংক্রান্ত আরো হাদিস সামনে আনি তাহলে দেখব যে, এক প্রাণী থেকে অন্য প্রাণীতে রোগের জীবাণু ছড়ানো – এই প্রাকৃতিক নিয়মকে ইসলাম অস্বীকার করে না।

.

আবু হুরাইরা(রা) সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ(ﷺ) বলেছেনঃ সংক্রামক রোগ বলতে কিছু নেই। কুলক্ষণ বলতে কিছু নেই সফর মাসকেও অশুভ মনে করা যাবে না এবং পেঁচা সম্পর্কে যেসব কথা প্রচলিত রয়েছে(هَامَةَ) তাও অবান্তর। তখন এক বেদুঈন বললো, হে আল্লাহর রাসুল! আমার উটের পাল অনেক সময় মরুভূমির চারণ ভূমিতে থাকে, মনে হয় যেন নাদুস-নুদুস জংলী হরিণ। অতঃপর সেখানে কোনো একটি চর্মরোগে আক্রান্ত উট এসে আমার সুস্থ উটগুলোর সাথে থেকে এদেরকেও চর্মরোগী বানিয়ে দেয়। তিনি বললেনঃ প্রথম উটটির রোগ সৃষ্টি করলো কে?
মা‘মার (রহ.) বলেন, যুহরী (রহ.) বলেছেন, অতঃপর এক ব্যক্তি আবূ হুরাইরা(রা) সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি নবী(ﷺ)কে বলতে শুনেছেনঃ রোগাক্রান্ত উটকে যেন সুস্থ উটের সাথে একত্রে পানি পানের জায়গায় না আনা হয়।” ...
[সুনান আবু দাউদ ৩৯১১]

.

“...কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকো, যেভাবে তুমি বাঘ থেকে দূরে থাকো।”
[সহীহ বুখারী ৫৭০৭]

.

এক উট থেকে অন্য উটে রোগের জীবাণু সংক্রমিত হয়। এ ছাড়া কুষ্ঠ রোগীর নিকটে গেলে এর জীবাণু সংক্রমিত হবার সম্ভাবনা খুবই বেশি থাকে। [১] উপরের হাদিসগুলোতে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, “সংক্রামক রোগ বলতে কিছু নেই” বলবার সাথে সাথে এটাও বলা হচ্ছে যে, রোগাক্রান্ত উটকে যেন সুস্থ উটের কাছে না আনা হয় এবং কুষ্ঠ রোগীর থেকে যেন দূরত্ব

বজায় রাখা হয়। এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে, রোগের জীবাণু সংক্রমিত হবার প্রাকৃতিক এ প্রক্রিয়া হাদিসে উপেক্ষিত হয়নি। এ প্রক্রিয়া যদি হাদিসে অস্বীকারই করা হত, তাহলে , নবী(ﷺ) কেন কুষ্ঠ রোগীর থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে বললেন? আর কেনইবা রোগাক্রান্ত উটকে সুস্থ উটের কাছে আনতে নিষেধ করলেন?

.

আমরা আরো একটি হাদিস দেখতে পারি—

“যখন তোমরা কোন্ অঞ্চলে প্লেগের বিস্তারের সংবাদ শোন, তখন সেই এলাকায় প্রবেশ করো না। আর তোমরা যেখানে অবস্থান কর, সেখানে প্লেগের বিস্তার ঘটলে সেখান থেকে বেরিয়ে যেয়ো না।”

[সহীহ বুখারী ৫৭২৮]

.

কতই না উত্তম ও কার্যকর একটি ব্যবস্থা। মহামারী আক্রান্ত অঞ্চল থেকে রোগীরা যদি বেরিয়ে না যায় এবং সে অঞ্চলে যদি বাইরে থেকে লোক না আসে, তাহলে রোগের জীবাণু ছড়িয়ে যাবার সুযোগ অনেক কমে যায়। এটা দেখে কি আদৌ মনে হচ্ছে যে হাদিসে রোগের জীবাণু ছড়িয়ে যাবার প্রাকৃতিক নিয়মকে অগ্রাহ্য করা হয়েছে?

.

এখানে একটি প্রশ্ন আসতে পারে –তাহলে হাদিসে কেন এ কথা বলা হল “সংক্রামক রোগ বলতে কিছু নেই” ? এর উত্তর হাদিসের মূল বক্তব্যের মাঝেই লুকিয়ে আছে।

উপরে উল্লেখিত সুনান আবু দাউদ ৩৯১১ নং হাদিসে সাহাবীগণ যখন এক উটের সংস্পর্শে অন্য উটের রোগাক্রান্ত হবার ঘটনার কথা উল্লেখ করলেন, তখন নবী(ﷺ) বললেন, “প্রথম উটটির রোগ সৃষ্টি করলো কে?”

অর্থাৎ এই রোগের সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। যখন কেউ রোগাক্রান্ত ছিল না, তখন এই রোগ তিনি সৃষ্টি করেছেন। প্রথম রোগাক্রান্ত প্রাণী তো কারো নিকট থেকে সংক্রমণের শিকার হয়নি। রোগের জীবাণু সংক্রমিত হয় বটে, কিন্তু জীবাণু সংক্রমিত হওয়া মানেই রোগ সংক্রমিত হওয়া না। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সুস্থ রাখেন, যাকে ইচ্ছা রোগাক্রান্ত করেন। যদি আল্লাহর ইচ্ছা ও অনুমতি না থাকে, তাহলে জীবাণু সংক্রমিত হলেও রোগ হয় না। আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিত জীবাণুর সংক্রমিত হবারও যেমন সামর্থ্য নেই, আবার সংক্রমিত হয়েও কারো দেহে রোগ সৃষ্টি করার ক্ষমতা নেই। বিষয়টি তাকদিরের সাথে সম্পর্কিত। [২] সাধারণ পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিও এটাই বলে যে – জীবাণু সংক্রমিত হওয়া মানেই রোগ সংক্রমিত হওয়া না। জীবাণু সংক্রমিত হলেও অনেক সময়েই মানুষ রোগাক্রান্ত হয় না। যেমনঃ বসন্ত রোগীর সংস্পর্শে থাকলে কেউ কেউ এ রোগে আক্রান্ত হয়, আবার কেউ কেউ আক্রান্ত হয় না।

.

এ প্রসঙ্গে শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন(র) বলেছেনঃ

.

“....সুতরাং যদি জানা যায় যে, কোন বস্তু সংঘটিত হওয়াতে সঠিক কারণ রয়েছে, তাহলে তাকে কারণ হিসাবে বিশ্বাস করা বৈধ। কিন্তু নিছক ধারণা করে কোন ঘটনায় অন্য বস্তুর প্রভাব রয়েছে বলে বিশ্বাস করা ঠিক নয়। কোন বস্তু নিজে নিজেই অন্য ঘটনার কারণ হতে পারে না। ছোঁয়াচে রোগের অস্তিত্ব রয়েছে। নবী(ﷺ) বলেছেন, “অসুস্থ উটের মালিক যেন সুস্থ উটের মালিকের উটের কাছে অসুস্থ উটগুলো নিয়ে না যায়।” সুস্থ উটগুলো অসুস্থ হয়ে যাওয়ার ভয়ে নবী(ﷺ) এ রকম বলেছেন। নবী(ﷺ) আরো বলেনঃ “সিংহের ভয়ে তুমি যেমন পলায়ন কর, কুষ্ঠ রোগী দেখেও তুমি সেভাবে পলায়ন কর।” আক্রান্ত হওয়ার ভয়ে নবী(ﷺ) কুষ্ঠ রোগী থেকে দূরে থাকতে বলেছেন। এখানে রোগের চলমান শক্তির কথা স্বীকার করা হয়েছে। তবে রোগ নিজস্ব ক্ষমতাবলে অন্যজনের কাছে চলে যায় তা অনিবার্য নয়। নবী(ﷺ) সতর্কতা অবলম্বনের আদেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ বলেনঃ “তোমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিও না।” (সূরা বাক্বারাহ ২:১৯৫)

এটা বলা যাবে না যে, নবী(ﷺ) রোগের সংক্রমন হওয়াকে অস্বীকার করেছেন। কেননা বাস্তব অবস্থা ও অন্যান্য হাদিসের মাধ্যমে এ রকম ধারণাকে খণ্ডন করা হয়েছে।

.

যদি বলা হয় যেঃ--- নবী(ﷺ) যখন বললেন, রোগ সংক্রামিত হয় না, তখন একজন লোক বলল, হে আল্লাহর রাসূল(ﷺ)! মরুভূমিতে সম্পূর্ণ সুস্থ উট বিচরণ করে। উটগুলোর কাছে যখন একটি খুজ্‌লিযুক্ত উট আসে, তখন সব উটই খুজ্‌লিযুক্ত হয়ে যায়। তিনি বললেন, প্রথম উটটিকে কে খুজ্‌লিযুক্ত করল?

উত্তর হলঃ--- নবী(ﷺ) এর উক্তি "প্রথমটিকে কে খুজ্‌লিযুক্ত করল?" এর মাধ্যমেই জবাব দিয়েছেন। আল্লাহর ইচ্ছাতেই রোগের জীবাণু অসুস্থ ব্যক্তির নিকট থেকে সুস্থ ব্যক্তির নিকট গমণ করে থাকে। তাই আমরা বলব যে, প্রথম উটের উপরে সংক্রামক ব্যতীত আল্লাহর ইচ্ছাতেই রোগ নাযিল হয়েছে। কোন ঘটনার পিছনে কখনো প্রকাশ্য কারণ থাকে। আবার কখনো প্রকাশ্য কোন কারণ থাকে না। প্রথম উট খুজ্‌লিযুক্ত হওয়ার পিছনে আল্লাহর নির্ধারণ ব্যতীত অন্য কোন কারণ পাওয়া যাচ্ছে না। দ্বিতীয় উট খুজ্‌লিযুক্ত হওয়ার কারণ যদিও জানা যাচ্ছে, তথাপি আল্লাহ চাইলে খুজ্‌লিযুক্ত হত না। তাই কখনো খুজলিতে আক্রান্ত হয় এবং পরবর্তীতে ভা্লোও হয়ে যায়। আবার কখনো মারাও যায়। এমনিভাবে প্লেগ, কলেরা এবং অন্যান্য সংক্রামক রোগের ক্ষেত্রেও একই কথা। একই ঘরের কয়েকজন আক্রান্ত হয়। কেউ মারা যায় আবার কেউ রেহাই পেয়ে যায়। মানুষের উচিৎ আল্লাহর উপর ভরসা করা। বর্ণিত আছে যে, 'একজন কুষ্ঠ রোগী লোক নবী(ﷺ) এর কাছে আসলো। তিনি তার হাত ধরে বললেন, আমার সাথে খাও।' আল্লাহর উপর তাঁর অগাধ বিশ্বাস ও ভরসা থকার কারণেই তিনি তাকে খানায় শরীক করেছিলেন। ..." [৩]

.

এখানে আরো একটি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে যে, নবী মুহাম্মাদ(ﷺ) যে যুগের মানুষ ছিলেন, সে যুগে পুরো পৃথিবী ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন। বিভিন্ন প্রকার কুলক্ষণ, কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাস সে যুগে প্রচলিত ছিল। জাহেলী যুগে আরবরা হাম্মাহ(هَامَّة) বলতে কুসংস্কারপূর্ণ বিশ্বাসকে বুঝে থাকতো। তাদের ধারণামতে 'হাম্মাহ' ছিল হুতুম পেঁচা যা গভীর রাতে নিহত ব্যক্তির বাড়িতে উপস্থিত হয়ে তার পরিবারের লোকদেরকে ডাকাডাকি করে এবং প্রতিশোধ নেয়ার উৎসাহ দেয়। তাদের কেউ কেউ ধারণা করত যে, নিহত ব্যক্তির আত্মা পাখির আকৃতি ধরে উপস্থিত হয়েছে। তৎকালিন আরবরা এ পাখির ডাককে কুলক্ষণ মনে করত। কারো ঘরের পাশে এসে এ পাখি ডাকলে তারা বিশ্বাস করত যে, সে মৃত্যু বরণ করবে। আরবরা সফর মাসকে অপয়া মাস মনে করত। কোন জিনিস দেখে, কোন কথা শুনে বা জানার মাধ্যমে কুলক্ষণ মনে করাকে 'ত্বিয়ারাহ'(طِيَرَة) বলা হয়। নবী(ﷺ) এর যুগে এই সমস্ত ভ্রান্ত জিনিস আরবরা বিশ্বাস করত। [৪] যে হাদিসগুলো দেখিয়ে ইসলামবিরোধীরা বলতে চায় যে এগুলোতে ছোঁয়াচে রোগ সম্পর্কে 'ভুল'(!) তথ্য আছে, সেই হাদিসগুলোতেই প্রাচীন আরবদের এই সমস্ত কুসংস্কারের অপনোদন করা হয়েছে। ভুল তথ্য থাকা তো অনেক দূরের কথা, এই হাদিসগুলোতে কুসংস্কারের মূলোৎপাটন করা হয়েছে। এমনকি কুলক্ষণ বিশ্বাস করার মত জিনিসকে ইসলামে শির্ক বলে অভিহীত করা হয়েছে। [৫] কিন্তু যাদের অন্তরে ব্যধি আছে, তাদের অন্তর এই হাদিসগুলো থেকে শুধু ভুল(!)ই খুঁজে বের করে।

.

অতএব হাদিসের বক্তব্য থেকে যারা ভুল বের করার চেষ্টা করে, তাদের উদ্দেশ্য আবারও ব্যর্থ হল। 'ছোঁয়াচে রোগ' তো তাদের অন্তরে, যা তারা তাদের অপ্রপচারের দ্বারা মানুষের ভেতর ছড়ানোর চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সফলকাম করেন, আর যাকে ইচ্ছা ব্যর্থ করে দেন।

---

[১] 'Park's preventive and social medicine' by K. Park, Page 316;
স্ক্রীনশট: http://bit.ly/2Bc9Wh3

[২] এখানে তাকদিরের বিষয়টি বেশ জটিল; বিস্তারিত ব্যাখ্যা না করা হলে অনেকেই কনফিউশনে পড়তে পারেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যার জন্য আমার এ লেখাটি পড়া যেতে পারেঃ https://goo.gl/NJBMBh

[৩] 'ফতোওয়া আরকানুল ইসলাম' — শায়খ মুহাম্মাদ বিন সালিহ আল উসাইমিন(র), পৃষ্ঠা ১১৪-১১৬; ডাউনলোড লিঙ্কঃ https://goo.gl/5fje7v

[৪] "What did the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon him) mean by "No contagion ('adwa)"?" ---

islamqa(Shaykh Muhammad Saalih al-Munajjid)

https://islamqa.info/en/45694

[৫] আল্লাহর রাসুল(ﷺ) বলেন, ‘‘কিছুকে অশুভ লক্ষণ বলে মনে করা শির্ক। কিছুকে কুপয়া মনে করা শির্ক, কিছুকে কুলক্ষণ মনে করা শির্ক। কিন্তু আমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যার মনে কুধারণা জন্মে না। তবে আল্লাহ (তাঁরই উপর) তাওয়াক্কুল (ভরসার) ফলে তা (আমাদের হৃদয় থেকে) দূর করে দেন।’’ (আহমাদ১/৩৮৯, ৪৪০, আবূ দাউদ ৩৯১২, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহাহ ৪৩০)

লিঙ্ক: https://goo.gl/Ucnw4E

“সমাপ্ত”

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ